

২৭

বাংলা সাহিত্য

বিশাখ-আশ্বিন ১৩৬২

কুক- H05252-15-P30574

757.5
1074/75

(গল্প)—মানবেন্দ্র পাল	...	২৩২	ছড়ায় আঁকা (কবিতা)—মানন্দ বা	৫২০
বিতা)—গোপাল ভৌমিক	...	৫৩৫	জয়দিনে (কবিতা)—শ্রীকালিদাস	২৮
বতা)—সন্তোষকুমার অধিকারী	...	২১৮	জয়দিনে (কবিতা)—শ্রীমতী বাণী রায়	৬০৮
উপভাস)—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	...	৫৩৭	জহর রাজা (গল্প)—বিক্রমাদিত্য	১২২
গল্প)—সুমনাথ ঘোষ	...	২৯৯	জাল (কবিতা)—সাধনা চট্টোপাধ্যায়	২৪০
নে (গল্প)—শ্রীহরিকুমার চক্রবর্তী	...	৬২৮	জ্যোৎস্না-রাত্রি (কবিতা)—সুনীলকুমার গুপ্ত	৩১৭
কবিতা)—শান্তিকুমার ঘোষ	...	২৩৯	ডানা (উপভাস)—“বনফুল”	৫৭, ১৩৭, ২২৫
হনের জীবনদর্শন (প্রবন্ধ)			তখনো মাহুয থাকে (কবিতা)—শান্তিকুমার ঘোষ	৪৬৭
শ্রীঅমিয়কুমার সেন	...	৩৭	তার মৃত্যুর আগে (কবিতা)—আনন্দ বাগচী	৩৩৬
রাত (কবিতা)—অসিতকুমার	...	৬৬০	তাস (গল্প)—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	২৯
হন ছড়ায় খোলা (রসরচনা)			তিমিরের অভিসারে (কবিতা)—সুনীলকুমার লাহিড়ী	৩৩৫
-কুমারেশ ঘোষ	...	২৩০	তুমি (কবিতা)—শ্রীঅনিলেন্দু চক্রবর্তী	৬০৭
(শ্রুতিকথা)—শ্রীসঞ্জীকান্ত দাস	...	২, ৮২, ১৭৭, ২৭৬, ৩১৩	তোমার বিরহে (কবিতা)—অসিতকুমার চক্রবর্তী	৫৭১
বাস্তব (গল্প)—শ্রীঅমলা দেবী	...	৫০৭	ছটি শ্রুতি (কবিতা)—ফুদরিম দাশ	১১৮
দেশ—আলোর দেশ (প্রবন্ধ)			বিবিধ দৃষ্টিকোণ (গল্প)—“বনফুল”	৪৬৭
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	...	৪৪২	ধৈত (কবিতা)—শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য	১৪৮
(গল্প)—অমরেন্দ্র ঘোষ	...	৬০৯	ধর্ম (গল্প)—শ্রীঅমলা দেবী	২৪
ট (গল্প)—রঞ্জিতকুমার সেন	...	৬১৫	নববর্ষ (প্রবন্ধ)—তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫
(কবিতা)—কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	...	৫০৬	নানা রঙের দিনগুলি (শ্রুতিকথা)—পরিমল গোস্বামী	৪৭৬
(কবিতা)—মৃত্যুঞ্জয় মাইতি	...	৫২২	পথ চলে (কবিতা)—শ্রীকরণশ্রয় বসু	৪১৭
(গল্প)—শ্রীঅরবিন্দ মুখোপাধ্যায়	...	৫৮৫	পরিক্রমা (গল্প)—রঞ্জন	৪৮১
এ কন্দন (উপভাস)—দীপক চৌধুরী	...	২৮, ১০৫, ২০২, ৩০৫, ৩০৮	পরিণাম (কবিতা)—শ্রীকৃষ্ণদে	১৪৪
খ (কবিতা)—দিনেশ দাস	...	৫৭০	পাখি এক আঁক (কবিতা)—কুমুদ ভট্টাচার্য	৩০৪
গানিধান (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায়	...	২০১	পাঁচ ফুলের সাজি ও কুড়ানো মানিক	১
মিনী (কবিতা)—শ্রীকুমারদত্ত মল্লিক	...	৪৫৫	পাহাড় (কবিতা)—শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ	৩৬০
গল্প)—অবধূত	...	৬৭	পিজলা (কবিতা)—শ্রীকৃষ্ণদে	৪০০
ময় বর্ষা (কবিতা)—উমা দেবী	...	৩৯৯	পুনর্ভবা (কবিতা)—গোপাল ভৌমিক	২৭
(গল্প)—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য	...	৫২৬	প্রমোত্তর (কবিতা)—প্রভাত বসু	৫২২
মা নিয়ে ? (কবিতা)—অসিতকুমার	...	১১৮	প্রসঙ্গ কথা—নারায়ণ চৌধুরী	
পা পালিয়ে বেড়ায় (কবিতা)—অনাদি গুপ্ত	...	৫২	ইংরেজ বনাম পূর্বপুরুষ	৪৩
(প্রবন্ধ)—শ্রীনির্মলকুমার বসু	...	৪৩৬	পল্লীকেন্দ্রিক সাহিত্য	২১৯
চয়	৮১, ১৭০, ২৫৪, ৩৪৫, ৪৩৮		‘বস্তি’ সাহিত্য	৩৫৭
(কবিতা)—বাণী পালচৌধুরী	...	৪৯	শারদীয় সাহিত্য	৪৪৫
দয় ঘুম নেই (কবিতা)—শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য	...	৪৮০	সাহিত্য ও সমাজচেতনা	১৬৪
			সাহিত্যে ব্যক্তিবর্চা	৪২২
			পানী পানসিক হইল (কবিতা)—শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ	...

প্রার্থনা (কবিতা)—অসিতকুমার ...	৫৮৪	মেলা (গল্প)—মানবেন্দ্র পাল ...	৫৮৪
প্রিয়তমাহ (কবিতা)—আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ...	৪১	যবনিকা (গল্প)—শৈলজ্ঞানন্দ মুখোপাধ্যায় ...	৪১
প্রিয়তমাহ (কবিতা)—রণজিৎকুমার সেন ...	২৩৯	রম্যাপি বীক্ষ্য (ভ্রমণ-কাহিনী)—শ্রীহরীকুমার ...	২৩৯
কাহন (কবিতা)—অনাদি মণ্ডল ...	৩৩৫	চক্রবর্তী ১৭, ১১৯, ১২৩, ২	
ফ্যাকাশে চাঁদের আলো (গল্প)—অহু° ক্রীতরস বাগচী ...	৩৪২	রবীন্দ্রনাথের পত্র-সাহিত্য (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ র	৩৪২
বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (কবিতা)—শিবশঙ্কু পাল ...	১২২	রবীন্দ্রনাথের নাট্যরূপ (প্রবন্ধ)—অরবিন্দ পোদ্দার	১২২
বট-বিটপী (কবিতা)—শ্রীকুমারদত্ত মল্লিক ...	২৭৫	রবীন্দ্রনাথের বাংলা-সাহিত্য (প্রবন্ধ)	২৭৫
বন্ধন ও মুক্তি (কবিতা)—শ্রীধরকান্ত রায় চৌধুরী ...	৬২৭	—মন্মোগোপাল সেনগুপ্ত ...	৬২৭
বর্ম (গল্প)—শ্রীহারেন্দ্রনাথ নাগ ...	৪০৯	রাখাল (কবিতা)—শ্রীশান্তি পাল ...	৪০৯
মর্ষাঙ্গ (কবিতা)—শ্রীশান্তি পাল ...	৩৩৬	যোমাঞ্চ গান (কবিতা)—শান্তিকুমার ঘোষ ...	৩৩৬
বনস্ত-বিলাপ (কবিতা)—শ্রীদ্বিজীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ...	৪৫৪	লগ উদ্ধার (গল্প)—দীপক চৌধুরী ...	৪৫৪
বহির্বিষ :		“লব্” (গল্প)—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ...	৪৫৪
ইউরোপে রবীন্দ্রনাথ—পি. ফালোঁ, এম. জে.	৫০	লেখক ও পাঠক (প্রবন্ধ)—শিবনারায়ণ রায় ...	৫০
ইনিয়াৎসিও সিলোনে—চন্দ্ররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৪১৩	লেখকের চিঠি (গল্প)—সন্তোষকুমার ঘোষ ...	৪১৩
টি. এস. এলিঅটের কাব্য ও দর্শন		শয্যায় শিশুনায়ক (কবিতা)—আর্যপুত্র সুপ্রিয়	
—মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায় ...	২৫০	শরতের আহ্বান (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় ...	২৫০
পল ভ্যালেরির কবিতা—রবের অঁতোয়ান্ এম. জে.	৩৩২	শিক্ষক (গল্প)—“বনফুল” ...	৩৩২
স্টেফান ২মতাইক—চন্দ্ররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১৫০	শিল্পী ও মডেল (গল্প)—গজেন্দ্রকুমার মিত্র ...	১৫০
বিকল্প (গল্প)—নরেন্দ্রনাথ মিত্র ...	৩৬৯	শিল্পী রতন বাঁড়ুজ্জ (গল্প)—সুভাষ সমাধদার ...	৩৬৯
বিকেন্দ্রীকরণের তাৎপর্য (প্রবন্ধ)—শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ	২৬৫	শিশু ভরু (কবিতা)—কল্যাণী প্রামাণিক ...	২৬৫
বিচিত্র (কবিতা)—পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় ...	১১৭	ভক্তিস্নান (কবিতা)—শ্রীদ্বিজীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	১১৭
বিশ্ব-শিশু (রস-রচনা)—কুমারেশ ঘোষ ...	৫৯৩	শোভনার প্রত্যাশা (গল্প)—বৈপায়ন মিত্র ...	৫৯৩
বিষকন্ডা (কবিতা)—প্রণব মিত্র ...	২৪০	শ্রামলীর দ্বন্দ্ব (কবিতা)—শ্রীপ্রভাকর মাঝি ...	২৪০
বাইশে প্রাবণ (কবিতা)—শ্রীজয়সুনাথ রায় ...	৩২৫	শ্রীঅরবিন্দের বন্ধিমচন্দ্র (প্রবন্ধ)—অহু° পদ্মপতি	৩২৫
বাণীসাধনার পুরস্কার (প্রবন্ধ)—শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ	৫৭০	ভট্টাচার্য ৭৮, ১৪৫, ২৩৭, ৩২৬, ৪২	৫৭০
ভারতের গ্রন্থস্বত্ব (প্রবন্ধ)—সোমেন্দ্রচন্দ্র বসু ...	১২০	সংবাদ-সাহিত্য ৮৫, ১৭২, ২৫৭, ৩৪৮, ৪৭	১২০
ভারতীয় দৃষ্টিতে আইনস্টাইনের জীবনদর্শন (প্রবন্ধ)		সঙ্কেত (কবিতা)—শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় ...	
—শ্রীদ্বিজীপ্রসন্ন সেন ...	১৫৮	সময়-কল্যাণ (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ রায় ...	১৫৮
ভালবাসা (কবিতা)—শ্রীকৃতাসুনাথ বাগচী ...	৬৬	সাহিত্যে সত্য, নীতি ও প্রেরণা (প্রবন্ধ)	৬৬
মৎস্যগন্ধা (কবিতা)—শ্রীকৃষ্ণদেব দে ...	৪১৬	—শিবনারায়ণ রায় ...	৪১৬
মরুগ্রাম (গল্প)—সদর্পণ রায় ...	২৮২	স্বপ্ন-প্রিয়া (কবিতা)—শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় ...	২৮২
মা ও মেয়ে (কবিতা)—উমা দেবী ...	৫৩৬	স্বপ্নভঙ্গ (গল্প)—অমরেন্দ্র ঘোষ ...	৫৩৬
মাছ (গল্প)—সদর্পণ রায় ...	৫৭২	স্বপ্নায়ন (গল্প)—সুবোধ ঘোষ ...	৫৭২
মেঘু নেমেছিল—(কবিতা)—মৃত্যুঞ্জয় মাইতি	২৮	শ্রীশিক্ষাপ্রচারের আদিকথা (প্রবন্ধ)	২৮
মেঘালয়ে (কবিতা)—গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় ...	৩৩১	—শ্রীহরীকুমার দে ...	৩৩১
মেঘেটা (কবিতা)—আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ...	২৩৬	হয়তো জান না তুমি (কবিতা)—শ্রীশিবদাস চক্রব	২৩৬

পাঁচ ফুলের সাজি ও কুড়ানো মানিক

হৃষের বিজ্ঞানবুদ্ধি ও ইতিহাসবুদ্ধি যখন সম্যক জাগ্রত হয় নাই, সাহিত্যবুদ্ধিই প্রবল ছিল—অর্থাৎ যখন অল্প কিছু অপেক্ষা না রাখিয়া নিছক শিল্পরসেরই ছিল, তখন চিঠিপত্র ও দিনলিপির নির্বাচিত অংশ এই তাহার হৃদয়ের ক্ষুধা মিটিত। তুচ্ছ এবং একান্ত গত প্রসঙ্গ-সম্বলিত সমগ্রকে জানিবার আগ্রহ ছিল না। তখন ‘এমিয়েল্‌স্‌ জার্নাল’ অথবা ‘ছিন্ন-তাহার যথেষ্ট আনন্দবিধান করিত। ইদানীং তে পাই, পূর্বে পশ্চিমে সর্বত্র বৈজ্ঞানিক মানুষ আর দৃষ্ট হয়। ভূমাকে অর্থাৎ পূর্ণকে জানিবার জন্য শিল্প-বুদ্ধি বিসর্জন দিতেও তাহার বিধা নাই। এই হর বশে তাকে দুঃখভোগও কম করিতে হয় নাই; বরং কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের অথবা দেবচরিত্র কার্লাইলের ক শৈথিল্য ও চারিত্রিক ত্রুটিবিচ্যুতি তাহার কাছে হইয়া মনের আদর্শ দেবতার অপয্যুত্বতে তাহার র অন্ত নাই। তবু বিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে রাবরণ প্রকট পদ্ধতিই সে অহুসরণ করিয়া চলিতেছে। তাকে ও সাময়িকপক্ষে মহৎ ব্যক্তিদের অতি তুচ্ছ ত চিঠিপত্রে তেল-হুন-লকড়ির খবরও সমস্তে মুদ্রিত হ দেখিতে পাই। ঐতিহাসিকেরা বলেন, আর কোনও খবর বা তথ্য না থাকুক, চিঠিপত্রে স্থান ও কালের দলিলটাও তো মেলে। বর্তমান যুগের এই রেওয়াজই ফুলের সাজি’ ছাপিবার কৈফিয়ৎ। ভারতমাতার কৃতি সন্তানের পাঁচখানি চিঠি এই সাজির পাঁচটি ফুল।

লি ১৯২০ হইতে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ—এই আট বৎসর সময় লিখিত। ইহাকে লিখিত, তিনি এগুলিকে ত্রিশ বৎসরকাল সযত্নে রক্ষা করিয়া আদিত্যেছেন তদিনে আমাদের নির্বন্ধাতিশয্যে সাধারণের গোচরে ও রাজী হইয়া আমাদের কাছে কৃতার্থ করিয়াছেন।

হার নাম শ্রীযুক্ত অমৃপমা বন্দ্যোপাধ্যায়। বয়স

প্রায় সত্তর। পিতা ডাক্তার মতিলাল মুখোপাধ্যায়—সারু রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একজন আত্মীয়, নিবাস বলিরহাট মহকুমার ভ্যাবলা গ্রাম। মতিলাল কলিকাতার কান্দিপুরে অবস্থানকালে পরমহংসদেবের চিকিৎসা করিয়াছিলেন। আর্ট প্রেন্সের শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মতিলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র। অমৃপমা দেবীর শ্বশুরবাড়ি ত্রিবেণী। শ্বশুর অনন্তদেব মুখোপাধ্যায় বীরভূম জিলার রামপুরহাটে গিয়া বসবাস করেন। স্বামী মণীন্দ্রলাল কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট ছিলেন। ইহারই কনিষ্ঠ সহোদর স্বনামধন্য জে. এল. ব্যানার্জি—জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। বাল্যে পিতৃগৃহে একজন মেমসাহেবের সাহায্যে ইংরেজী শিখিয়াছিলেন, পরে স্বামীর সাহায্যে ও নিজের চেষ্টায় শিক্ষা অগ্রসর হয়।

এই ধর্মপরায়ণা তেজস্বিনী বঙ্গমহিলা মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া তাঁহার শ্রদ্ধা ও স্নেহ আকর্ষণ করেন, গান্ধীজী ইহাকে আপন ভগিনী বলিয়া পরিচয় দিতেন। কিন্তু ইহার আদর্শ মানুষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ইনি আবাল্য রবীন্দ্রনাথকে গুরুজ্ঞানে সম্মান করিতেন ও রবীন্দ্র-সাহিত্য হইতে অন্তরের খোরাক সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কিছুকাল পরে দিল্লীতে অস্থিত এশিয়া সম্মেলনের (এশিয়াটিক কনফারেন্স) সূচনায় রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখ না হওয়াতে ইনি গান্ধীজীর নিকট পত্রে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।

ইনি সরোজিনী-পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র পালের বিশেষ স্নেহপাত্রী ছিলেন। শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ইহার অন্ততম জামাতা।

নিম্নমুদ্রিত পত্রগুলি হইতে প্রতিভাত হইবে যে, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, চিত্তরঞ্জন, কবি কামিনী রায় ও সত্যজিৎর সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। পত্রগুলি কালক্রমিক ভাবে নিম্নে মুদ্রিত হইল।—

এক

[৫ মার্চ ১৯২০]

শান্তিনিকেতন

বিনয়সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

যে প্রহ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন তার সোজা উত্তর এই যে জ্ঞান সহ করা উচিত নয়। কিন্তু এর মধ্যে অসংখ্য বিষয় আছে। অর্থাৎ অন্তরের প্রতিকার নানা অবস্থায় নানা আকারে ঘটে—অন্যকে আঘাত করা কথন বা আবশ্যিক, নিজেকে আঘাত গ্রহণ করা কখনো বা তার চেয়েও আবশ্যিক। কল্যাণ কখনো বা ঘোষের আঁক দেখা দেয়, কখনো বা ক্ষমার আকারে। যদি অসহিষ্ণুতাই প্রবল হয় তাহলে অনেক সময়ে জ্ঞান বিচার করা কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক সময়েই ক্রোধ আমাদের দৃষ্টিতে প্রবৃত্ত করে, কর্তব্যবুদ্ধি নয়। সেই ক্ষণে যখন আঁক পাই তখন বিচার করবার ও দণ্ড দেবার পূর্বে ঘণ্টা সংখ্যের সঙ্গে চিন্তা করা আবশ্যিক হয়।

ছটির সময় কাছে আসচে। এবার চৈত্রের মাঝামাঝি গ্রীষ্মাবকাশ দেবার প্রয়োজন হবে—জলাভাব ঘটবে ইতি ২২ ফাল্গুন ১৩২৬

শ্রীযুক্তনাথ ঠাকুর

দুই

[পোস্টমার্ক ধানবাদ আর. এম. এস. ১৯২১ সনের কোন তারিখ]

On the way
to Giridhi

Dear Anupoma Devi,

I was delighted to receive your letter. Suprobha too wrote at the same time. Your Hindi effort is really good. I congratulate you on the energy you are putting in your work. You need not apologize for your mistakes in English. Why should one be expected to write faultless English. We have made of it a fetish and suffer for it.

I hope Mr. Bandopadhyay will soon be able to find a way out of his practice. I would love to visit Purulia if only to come closer to a family in which there is so much harmony and unpretentious solid work going on. You and your daughter have captivated me and I expect much from your family for the nation. Do please let Charulata write regularly & tell me of her progress.

Yours Sincerely
M. K. Gandhi

তিন

[২২ এপ্রিল ১৯২১]

৩

১৪৮নং রসা রোড

২২/৪/২১

সবিনয় নিবেদন,

নারীকর্মমন্ডির দেশের মহিলাগণের মধ্যে বর্তমান আন্দোলনের ভাব ফুটাইয়া তুলিবার জন্য প্রাণ দিয়ে যাচ্ছে। পবিত্র শাস্ত ও স্বাধীনতার ভিত্তি দিয়া মেয়েরা বাহ্যতে দেশের কাজে আত্মনিবেদন করছে।

রে সেরূপ শিক্ষার যথাসাধ্য চেষ্টা হইতেছে। ক্রমে ক্রমে ভাল পড়াশুনার বন্দোবস্ত করা হইবে। কল্যাণীয়া স্ত্রীমতী স্বপ্নভা এই নারীমন্দিরে আসিয়া অবধি মেয়েদের মধ্যে বেকরূপ উৎসাহ ও প্রাণের সঞ্চার করিয়াছে তাহাতে আশা হয় তাহার জীবনের দ্বারা দেশ ভবিষ্যতে গৌরবান্বিত হইবে। এইরূপ কন্ডার পিতামাতার পক্ষে ইহা কত মননের ও গৌরবের বিষয়। আপনাদের সঙ্গে আমরাও এই গৌরব অনুভব করিতেছি। স্ত্রীমতীকে আপনারা কয়েক মাসের জন্ত এখানে রাখিতে চাহিয়াছিলেন। আশা করি কল্যাণীয়াকে নারীকর্মমন্দিরে আরও অধিক কালের জন্ত রাখিয়া তাহার আত্মোন্নতি ও দেশের কার্যে সহায়তা করিবার সুযোগ দান করিয়া এই মহৎ অর্ঘ্যতানে সহায়তা করিবেন। এ বিষয়ে আপনাদের বেকরূপ উৎসাহ ও অহুরাগ তাহাতে অধিক কিছু বলাই বাহুল্য মাত্র। ইতি—

শ্রীচিন্তরঞ্জন দাশ

তার

[৩ নভেম্বর ১৯২৭]

38/2 Elgin Road

৩১১২৭

শ্রদ্ধাঙ্গীকার,

আপনার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি—নানা গোলমালের দরুন উত্তর দিতে বিলম্ব হইল—তজ্জন্ত ক্ষমা করিবেন।

আপনারও শরীর অসুস্থ, সুতরাং আপনার কষ্ট করা উচিত নয়। মিঃ ব্যানার্জি যদি এ দিকে আসেন তাহা হইলে আমার সঙ্গে কথাবার্তা হইবে। তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়াছিল—প্রেসিডেন্সি ও আলিপুর জেলে। তাঁহার সহিত কথা হওয়ার পর যদি আপনার সহিত কথাবার্তার প্রয়োজন থাকে তাহা হইলে আমি নিজে কবাব আপনার ওখানে আসিবার চেষ্টা করিব।

কাল সকালে ৭টা ৭০ টার সময়ে আসিলে ভাল হয় কারণ তখন লোকের ভিড় থাকে না। সে সময়ে সুবিধা হইলে সকালে ১১টার মধ্যে আসিতে পারেন। কাল সকালে সুবিধা না হইলে পরশুদিন সকালে আসিতে পারেন। আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি

বিনীত

শ্রীস্বভাষচন্দ্র বসু

পাঁচ

[১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০]

৪২এ হাজরা রোড

বালীগঞ্জ, কলিকাতা

১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৩০

প্রিয় ভগিনি,

গত ২৫শে ডিসেম্বর, যে দিন আপনার ওখানে আমার ঘাইবার কথা ছিল, সেই দিন আপনার জন্ত একখানা শোকসঙ্গীত সঙ্গে লইবার জন্ত আপনার নাম লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। আজ এই সঙ্গে পাঠাইতেছি।

আজ সকাল বেলা ডলীর একখানি চিঠি পাইলাম। সেও একখানি শোকসঙ্গীত চাহিয়াছে। আমি চিঠিখানি কোথায় রাখিয়াছি, এখন খুঁজিয়া পাইতেছি না। অতঃপর করিয়া তাহার ঠিকানাটা লিখিয়া পাঠাইবেন।

সব স্বামীর সম্পূর্ণ নাম ও তাহার ভাল নাম আমার বোধ হয় ঠিক জানা নাই, তাহাও লিখিয়া দিবেন। কতবার আপনার কাছে ঘাইতে ইচ্ছা হইয়াছে কিন্তু কোন যেন সুবিধা হইয়া উঠে না। আত্মীয় এবং বন্ধুদের মধ্যে যখন যখন মধ্য অনেকেই পরলোকগত হইয়াছেন, সেজন্য এবং উৎসবদিবস জন্তও কতকটা অবসরের অভাব টিয়াছে।

কাল শুনিবার প্রতিমার (Lady B. L. Mitter) ছেলেটি মারা গিয়াছে। এই ব্যাপার নিম্নতই ঘটতেছে কৃশা গৌতমীর প্রতি বৃদ্ধের বাক্য মনে পড়ে।

ব্যথা সহজে ঘাইবার নয়, কিন্তু আশা করি এই ব্যথার মধ্যেই শান্তি ও সান্ত্বনা পাইতেছেন।

আমার আন্তরিক শ্রীতি ও সহানুভূতি উভয়ে জানিবেন।

আপনাদের ব্যথায় ব্যথা

কামিনী রায়

২রা ফেব্রুয়ারী

আজ ভলীর চিঠিটা পাওয়া গিয়াছে। বইও পাঠাইয়াছি। এত দিন আপনার বইখানা বাহিরে পড়িয়া থাকায় একটু ময়লা হইয়া গিয়াছে।

কুড়ানো মানিক

শ্রীযুক্ত অম্বুপমা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি একসায়াসাইজ খাতায় তাঁহার সংসার-পথের পাথেররূপ রবীন্দ্রনাথের পত্ররচনার এবং চিঠিপত্রের অংশবিশেষ টুকিয়া রাখিয়াছিলেন, খাতার মলাটের তারিখ—জুলাই ১৯১৯, পুন্ডলিয়া। চিঠিপত্রের যে ভগ্নাংশগুলি চোখে পড়িল, বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত পাঁচ খণ্ড ‘চিঠিপত্র’ সেগুলি নাই। পত্রগুলি ঠিক কাহাকে লেখা তাহাও সংগ্রাহকের জানা নাই। তবে তিনি মনে করেন, শান্তিনিকেতনের কোনও প্রাক্তন ছাত্রের মনে বলসংকার করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ সেগুলি লিখিয়াছিলেন। পড়িয়া দেখিলাম, সমগ্র বাঙালী জাতির মনে এগুলি বলসংকার করিতে

পারিবে! কোনও সাময়িক পত্রে এগুলি সম্পূর্ণ অথবা অংশত প্রকাশিত হইয়াছে কি না আমাদের জানা নাই হইয়া থাকিলেও ভাল জিনিসের পুনঃপ্রচারে ঘোষ নাই বিবেচনায় এগুলিকে পত্রস্থ করিলাম। পত্রগুলি অজ্ঞাতনামা মালিকের প্রতি ইহাতে যদি অপরাধ হয় আশা করি, তিনি আমাদের সাধু উদ্দেশ্যের পরিচয় পাইয়া ক্ষমা করিবেন। কুড়ানো মানিক ক্রীত মানিকের চাইতে যে আনন্দ দেয়, এই টুকরা পত্রগুলি হাতে পাইয়া আমাদের তাহাই অহুত হইয়াছে।

পত্রাংশগুলি অম্বুপমা দেবীর খাতায় যে ভাল পর পর নকল করা আছে সেই ভাবেই ছাপা হইল তারিখওয়ারি সাজানো হইল না।

...জীবনের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত এবং কি করলে শ্রমের শুদ্ধতা দূর হয়? মোটামুটি এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ কিন্তু উত্তর পেলেই যে সেটা কাজে লাগানো সহজ এমন কথা বলতে পারি না। আমরা যে কোন কাজ এবং যে কোন অবস্থার মধ্যেই থাকি না কেন—নিজেকে যেন সত্য ক’রে উপলব্ধি করতে পারি এই লক্ষ্যই মনে স্থির রাখতে হবে। সত্য-আমি খুব মস্ত জিনিস—যে-আমি টাকাকড়ি খ্যাতিপ্রতিপত্তির মধ্যে বদ্ধ, সে-আমি আজ আছে কাল নেই; সে-আমি বাইরের জিনিস দ্বারা কেঁপে ওঠে এবং বাইরের জিনিসের অভাবে ছোট হয়ে যায়—কিন্তু আমার মধ্যে যে সত্য আছে, বিশ্বজগতের সঙ্গে তার যোগ, অনন্ত আনন্দস্বরূপের সঙ্গে তার চিরদিনের অন্তরতম সম্বন্ধ—মৃত্যু তাকে বিনাশ করে না, ক্ষতি তাকে ক্ষুদ্র করে না, তার সম্পদ তার অন্তরের মধ্যে—নিজের সেই চিরসত্যের প্রতি যদি দৃঢ় আস্থা রাখি তা হ’লে অন্তরে বাহিরে আর কোন ভয় থাকে না। আমরা বিজ্ঞান প্রভৃতি আলোচনা ক’রে বহির্বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানের সমস্ত বাধা যেমন কাটিয়ে উঠে শক্তি লাভ করচ, তেমনি জীবনকে সৎপথে চালনা ক’রে প্রবৃত্তির কলুষ কাটিয়ে উঠে নিজের চরম সত্যকে ক্রমশই বাঁধামুক্তভাবে উপলব্ধি ক’রে ভূমার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে সর্বদা অভয়ে আনন্দে এবং অপরিমেয়

কল্যাণের মধ্যে বিরাজ করবে এই হচ্ছে লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সাধন করতে হ'লে অত্যন্ত সাবধানে জীবনকে নির্মল রেখে প্রত্যহ মনকে তাঁর মধ্যে নিবিষ্ট করতে হবে যিনি অন্তর-বাহিরকে পূর্ণ ক'রে রয়েছেন; যিনি বিশ্বচরাচরকে সত্য ক'রে বিরাজ করছেন; যিনি পরিপূর্ণ সত্য, পরিপূর্ণ জ্ঞান, যিনি অমৃতময়, আনন্দময়, অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম।

কিন্তু এসব কথা যদি কেবল মুখের কথামাত্র হয় তবে তেমন ছুর্গতি মানুষের পক্ষে আর কিছু হতে পারে না। জীবনের ভিতর দিয়ে তাঁকে নিজের আত্মার মধ্যে পেতে হবে, কথার ভিতর দিয়ে নয়। অতএব তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে নিজের জীবনকে প্রশস্ত ক'রে স্বার্থপরতা এবং অহঙ্কার থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে বিশ্বের সেবার দ্বারা নিজের শক্তিকে সার্থক ক'রে প্রতিদিন অনন্ত পথের পাথে সঞ্চয় ক'রে চলা। বড় বড় কথা শোনবার এবং বড় বড় কথা আবৃত্তি করবার লোভ যদি পেতে হ'লে পথ হারাবে। জানতে চাও বলতে চেয়ো না—পেতে চাও লোকের কাছে নাকি জানতে পারি তা হ'লে পথ হারাবে।

মিতাচারী মিতভাষী হয়ে নম্র হয়ে শ্রদ্ধাবান হয়ে অন্তর্ধামীর প্রতি নির্ভর করে আপনার সাধনার পথে অগ্রসর হতে থাকো। অনেক বাধা-বিঘ্ন এসে পড়বে। অনেক উঠবে এবং পড়বে, সন্দেহ মনকে আবৃত্তি করবে, তুলবে, সেই সময় কাটিয়ে উঠে যখন অচিরে

দুঃখ ও অনিষ্ট কিন্তু তাহার চেয়ে গুরুতর পরিণাম নিজের মনটাকে নষ্ট
 করিতে গিয়া নিজেকে যেমন বঞ্চনা করি এমন আর কাহাকেও নষ্ট
 হইতে থাকে ততই বলহীন হইয়া পড়ে। আমাদের শাস্ত্রে বলে, বলহীন
 পারে না। অসত্য অশ্রান্ত পাপ মনের চারিদিকে কেবলই আবরণ
 জালে জড়াইয়া মলিন ও নির্জীব হইয়া মনুষ্য হারাইয়া অত্যন্ত দীনভাবে
 প্রতিজ্ঞা করি যে কখনো সত্যকে ছাড়িব না, মিথ্যাকে আশ্রয় করিব না
 যথাসাধ্য চলিতে পারি—যতই দুঃখ পাই, যতই ক্ষতি ঘটে, লোকে
 উপদেশে যদি সত্যকে রক্ষা করিয়া চলি তবে সমস্ত জীবনমন সত্যের জে
 তে বর্জিত হইয়া পরম গৌরব লাভ করে। তোমার অন্ত
 করেন, তাহার বিচারই শিরোধার্য করিতে হই

...শোভা
...রবে এবং অবসাদ
...আবচলিত আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ ক
কোরো না এ জিনিস বক্তৃতা ক'রে পাওয়া যায় বি। এ সমস্ত তোমাদের ক
অত্যন্ত নির্ভার সঙ্গে ধৈর্যের সঙ্গে অপ্রগল্ভ য়র সঙ্গে সমস্ত জীবন
মাছুষ লাভ করে—এসব জিনিস লঘুভাবে কথায় বাতায় ব্যবহার করবার নয়
তাকে অন্তরের মধ্যে কতক পরিমাণে উপলব্ধি করবার পূর্বেই যদি তে
প্রকাশ করতে আরম্ভ করি তা হ'লে তাতে আমাদের শক্তিকে নষ্ট ক'রে দেয়
অথচ চুলা ধরাতে বসলে তাতে ফল হয় এই যে: যখন রন্ধনের সময় উপস্থিত
নেই কেবল রাশিকৃত ছাই জ'মে আছে।

...“পিতা নোহসি” অথবা “শাস্ত্রং শিবমদ্বৈতং” অথবা ঈশ্বরের বে
বর্বাদই ধরিয়। রাখা চাই। যখনই মন বিক্ষিপ্ত হইতে চাহিবে তখন মনে মনে
উচ্চারণ করিয়। মনকে কিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিবে। অবশেষে
দ্রপ করিলেই ভয় চলিয়। যাইবে, ছঃখ থাকিবে না, কুচিন্তা লোপ পাইবে।
তখন মনে মনে আবৃত্তি করিবার অভ্যাস করিবে, আবৃত্তি করিবার সময় যা
আসে এমন করিবে নতুবা বিশেষ ফল হইবে না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

...মিথ্যাচরণ করিলে অশ্র লোকের নিকট বিশ্বাস হারাইতে হয় এবং
অনেক সময় অনেক অনুবিধা ঘটে, এ কথা সত্য কিন্তু এইটেই আসল কথা।

উপনিষদে এই উপদেশ আছে—

সত্যাম্ প্রমাদিতব্যঃ, কুশলাম্ প্রমাদিতব্যঃ।
মঙ্গল হইতে ভ্রষ্ট হইবে না, ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হইবে না।

আশীর্বাদ করি এই অনুশাসনটি স্বীকার করিয়া তোমার জীবন দিনে দিনে পবিত্র উন্নত উজ্জল ও বলশালী হইয়া উঠুক।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২ই কার্তিক ১৩১৭

...নিজের প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করা কঠিন তাহা জানি সেই জন্মই জয়ী হইলে এত আনন্দ এত পৌরব। আসল কথা যদি নিজেকে সন্নিহিত করিয়া দেখ তাহা হইলেই নিজের সমস্ত রিপুগুলি বড় হইয়া উঠে। কিন্তু যদি মনে রাখ তোমার জীবন মহৎ এবং সেই জীবন বিশ্বহিতে উৎসর্গ কর, যদি মনে রাখ জগতে যাহারা কল্যাণ বিতরণ করিয়াছেন তাঁহারা নিজের শরীরের নিজের ভোগ-সুখের কথা ভাবেন নাই, তাঁহারা সমস্ত ক্ষুদ্র সুখ হইতে আপনাকে অকাতরে বঞ্চিত করিয়াছেন তাহা হইলে রিপুসঙ্গে সংগ্রাম সহজ হইবে। তোমার লক্ষ্যকে যেমনি বড় করিবে অমনি তোমার শক্তি বাড়িয়া যাইবে। তোমার চারিদিকে যাহারা আছে তাহাদের জীবনের কোন উদ্দেশ্য নাই, তাহারা সর্বদা পক্ষ লেপন করিয়া লজ্জাও পায় না, হৃৎখণ্ড পায় না, পৃথিবীতে তাহারা পশুশালা যাপন করিতে চায় এইজন্য তাহাদের সংসর্গ মানুষকে নীচের দিকে টানে। তুমি তোমার অন্তরের মধ্যে মহাপুরুষদের সঙ্গ করিবে তাহা হইলেই নিজের আত্মার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিবে।

তুমি জয়ী হও, তুমি মহৎ হও, তুমি অগ্নিশিখার মত উজ্জল ও পবিত্র হইয়া আলোক বিতরণ করিতে থাক—এই আশীর্বাদ করি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

ল্যাগীয়েষু,

দীর্ঘকালের জ্ঞাত আমি দূর দেশে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। এতদিন আমি কাছে কাছে থাকিয়া তোমাদের তরুণ জীবনের উপর দৃষ্টি মেলিয়াছিলাম, আমার হৃদয়ের মঙ্গল কামনা তোমাদের দিকে প্রসারিত করিয়া বসিয়াছিলাম। আজ দূরে যাইবার সময় আমি একান্ত মনে তোমাদিগকে এই আশীর্বাদ করিয়া যাইতেছি যে, তোমরা আপনার সাধনায় আপনারা বলিষ্ঠ ও তেজস্বী হইয়া উঠ, আপনার অন্তরের মধ্যে প্রত্যক্ষরূপে নিকটতম করিয়া তাঁহাকে পাও যিনি তোমাদের অন্তর্যামী। সেই উপলব্ধির দ্বারা তোমরা কেবলই বড় হইয়া উঠিতে থাক—আপনার স্বার্থের উপরে বড় হও, সুখদুঃখের উপরে বড় হও, প্রবল প্রযুক্তির উপরে বড় হও, চারিদিকের সঙ্কীর্ণ সংস্কারের উপরে বড় হও, সত্যের মধ্যে বড় হও, মঙ্গলের মধ্যে বড় হও, অম্লান আনন্দের মধ্যে বড় হও। ব্রহ্ম শব্দের অর্থই বড়। যে পরিমাণ বড় হইবে সেই পরিমাণেই তাঁহাকে পাইতে থাকিবে, যে পরিমাণ তাঁহাকে পাইবে সেই পরিমাণেই তোমাদের জীবন কৃতার্থ হইয়া উঠিবে।

এই তোমাদের মন্ত্র হউক “মাংহ ব্রহ্ম নিরাকুর্ধাম্ মামা ব্রহ্ম নিরাকরোং”—যিনি সকলের বড় তিনি আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই। আমি যেন সেই বড়কে পরিত্যাগ না করি। ইতি ২৩শে আশ্বিন, ১৩১৮

তোমাদের চির শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

...যদি কারও মৃত্যু আসন্ন হয়ে আসে তখন আসক্ত হয়ে শোকাবুল হয়ে তাকে বন্ধ করবার চেষ্টা করা উচিত নয়—আমার জীবনে যতবার মৃত্যু এসেছে যখন দেখেছি কোন আশা নেই তখন আমি প্রাণপণে সমস্ত শক্তি একত্র করে মনে করেছি, তোমাকে ছেড়ে দিলাম, যাও তুমি তোমার নির্দিষ্ট পথে। নিজের সম্ভাবনাকেও আঁকড়ে রাখতে চাই নি, যেতে যখন হবেই তখন যেন আমার আসক্তি আমার বেদনা তাকে মর্ত্যের সঙ্গে বেঁধে না রাখে। তাকে বন্ধন ছিন্ন করবার জ্ঞাত যেন কষ্ট না পেতে হয়, যেন সুগম হয় তার পথ। যেখানে ত্যাগেই মঙ্গল সেখানে নিরাসক্ত হয়ে ত্যাগ করা উচিত। ঘটনা-প্রবাহ আমার হাতে নেই কিন্তু আমি তো আমার হাতে আছি। Inevitable-[অনিবার্য]-এর সঙ্গে তর্ক কখনও করি নে। যত অপ্রিয়ই হোক, যত বেদনাদায়কই হোক, যা নিশ্চিত ঘটবে তার সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্ষত হওয়া কিছু নয়—সেখানে নম্র হয়ে মেনে নিতে হয়, তাতেই কল্যাণ। আমার মৃত্যু-সময়ে যদি উপস্থিত থাক তা হ'লে কান্নাকাটি করে আকুল হয়ে পিছনে ডেকো না, একান্ত মনে ত্যাগ করে আমাকে, মনে হয় মুমূর্ষুর প্রতি সেই সবচেয়ে বড় কর্তব্য।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিক্ষক

“বনমূল”

ট্রেনের জন্ত সাহেবগঞ্জ স্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলাম। সমস্ত রাত অপেক্ষা করিতে হইবে, আমার ট্রেন ভাঙে। পত্নী এবং সন্তোজাত পুত্রটিকে ওয়েটিং-রুমে রাখিয়া আমি প্র্যাটকর্ষে পদচারণ করিতেছিলাম। দুই-তিনটা ট্রেন আসিল এবং চলিয়া গেল। স্টেশনে পূর্বপরিচিত কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হইল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আগাইয়া আসিয়া দু-এক মিনিট আলাপ করিলেন, অনেকে কেবলমাত্র মুচকি হাসিয়া বা ভুরু নাচাইয়া পূর্বপরিচয়ের মান রক্ষা করিলেন। এই সাহেবগঞ্জে বহুকাল পূর্বে আমি ছাত্র ছিলাম। বোর্ডিঙে থাকিতাম। এখান হইতেই ম্যাট্রিকুলেশন পাস করি। প্রায় বোল-সতের বছর আগেকার কথা। স্টেশন যখন জনবিরল হইয়া আসিল, তখন সেই পুরাতন দিনগুলির স্মৃতি মনের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া জাগিতে লাগিল। অনেক বাল্যবন্ধুর কথা, শিক্ষকদের কথা, বোর্ডিঙের ঠাকুর চাকরের কথা মনে পড়িল। কর্মব্যস্ত জীবনে ইহাদের কথা বড় মনে পড়ে না, সেদিন পড়িতে লাগিল।

...বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। প্র্যাটকর্ষে লোকজন বিশেষ নাই। কুলীরা সারি সারি শুইয়া ঘুমাইতেছে। আমাদের চোখে ঘুম নাই। আমি সেই লম্বা প্র্যাটকর্মটার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করিতেছি। হাতে সিগারেট। তখন সবে সিগারেট খাইতে শিখিয়াছি। প্রতিদিন এক টিন করিয়া সিগারেট ফুঁকি। সিগারেটের পর সিগারেট পুড়াইয়া চলিয়াছি।

আরে, কে? বিপিন নাকি?

সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটটা ফেলিয়া দিলাম। কোর্থ মাস্টারের কণ্ঠস্বর। এদিক ওদিকে চাহিয়া দেখিলাম, কেহ কোথাও নাই। জাগিয়া জাগিয়াই স্বপ্ন দেখিলাম নাকি। ও-কণ্ঠস্বর তো ভুল হইবার নয়? পর-মুহুর্তেই দেখিতে পাইলাম। ছইলার কোম্পানির বোকানটার পাশেই খানিকটা অন্ধকার স্থান ছিল। সেই অন্ধকারের ভিতর হইতে কোর্থ মাস্টার মহাশয় বাহির হইলেন।

ছোটখাটো মানুষটি। তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া প্রশ্ন করিলাম। দেখিলাম, ওই সন্ধ্যার স্থানটিতেই ছোট একটি শতরঞ্জ বিছাইয়া, ছোট একটি বিছানা করা রহিয়াছে। বালিশের বদলে ছোট একটি পুঁটুলি। বুঝিলাম, কোর্থ মাস্টার ঠিক তেমনিই আছেন।

আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছ, অনেক দিন পরে দেখা হ'ল—

ভাল আছি সার।

আর একটু হাসিয়া বলিলেন, তোমার সব বই পড়েছি। তোমার খ্যাতিতে আমাদেরও মুখ উজ্জ্বল হয়েছে। আশীর্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হও। তবে একটা কথা, তোমার ব্যাকরণ ভুল এখনও হচ্ছে মাঝে মাঝে—

কোর্থ মাস্টার মহাশয় আমার একটা বই হইতে গড়গড় করিয়া খানিকটা মুখস্থ বলিয়া গেলেন। তাহার পর বলিলেন, গভীর রজনী লিখেছ কেন। গভীর রজনী লেখা উচিত ছিল।

আজকাল বিশেষণের লিঙ্গ বদল হয় না সার। যেখানে ভাল শোনার সেখানেই কেবল হয়।

হওয়া তো উচিত। তোমাদের মত লেখকরা হওয়ালেই হবে।

কি বলিব, চুপ করিয়া রহিলাম।

মাস্টার মহাশয় আবার প্রশ্ন করিলেন, বিয়ে-খা করেছ। করেছি সার।

ছেলেমেয়ে হয়েছে?

একটি ছেলে হয়েছে।

কোথায় তারা? দেশে নিশ্চয়?

ওয়েটিং-রুমে।

ওয়েটিং-রুমে? চল, দেখে আসি।

মাস্টার মহাশয় হনহন করিয়া আগাইয়া বাইতে লাগিলেন। ওয়েটিং-রুম পার হইয়া চলিয়া গেলেন।

এই যে ওয়েটিং-রুম সার।

ও, তোমার সেকেন্ড ক্লাস টিকিট বুঝি?

গৃহিণী জাগিয়া ছিলেন। বলিতেই তিনি আগাইয়া

আত্মস্মৃতি

চতুর্থ প্রবাহ—প্রথম তরঙ্গ

আত্মদর্শন

শ্রীসঞ্জীকান্ত দাস

চতুর্থ প্রবাহের স্বত্রপাতে একটু গুরুগম্ভীর গবেষণা করা যাক। মোটামুটি একটা গড়পড়তা ধরিয়া দেখিতেছি, মানুষের বুদ্ধিদীপ্ত কর্মময় জীবন “প্রাপ্তে তু যোড়শে বর্ষে” আরম্ভ হইয়া একাত্তর বৎসরে শেষ হয়। অর্থাৎ ১৭ হইতে ৭১ মোট চুয়ান্ন বৎসরের ফলপ্রসূ জীবন মানুষের। মহা অসাধারণদের কথা স্বতন্ত্র। বীণাশ্রীষ্ট ও শঙ্করাচার্য তেজিশ বক্ত্রিশেই জীবনের বিপুল জ্ঞান ও কর্মসাধনায় পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া সমসাময়িক ও স্বপূর ভবিষ্যতের মানুষের হৃদয়ে চির-অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। অন্য দিকে প্রাচীনতম ঐতিহাসিক অবতার বুদ্ধদেব এবং আধুনিকতম মহামানব রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী-অরবিন্দেরা আশি বৎসর পর্যন্ত অজ্ঞান জ্যোতিতে ধরাধামে বিরাজ করিয়াছেন। কিন্তু ইহারা নিপাতনে সিদ্ধ, কাজেই ব্যতিক্রম। আমার গবেষণালব্ধ ১৭ হইতে ৭১—এই ৫৪ বৎসরকে তিন অংশে বিভক্ত

করিলে আঠার বর্ষের সমান তিনটি পর্ব-পাই। প্রথম পর্বে মানুষ বহিঃকেন্দ্রিক (অবজ্ঞেক্টিভ) থাকে, দ্বিতীয় পর্বে হয় আত্মকেন্দ্রিক (সাবজ্ঞেক্টিভ) এবং তৃতীয় পর্বে তাহার উচিত বাহির ও অন্তরের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ইষ্টকেন্দ্রিক হওয়া। উচিত বলিলাম এই কারণে যে, এই তৃতীয় পর্বে আমি সবে প্রবেশ করিয়াছি, আমার অভিজ্ঞতা আরও পাকা হইলে পোক্ত সাক্ষাই দিতে পারিব। প্রথম দুই পর্ব সম্বন্ধে আমার মতামত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

সতের বৎসর বয়সে পিতামাতার রেহাশ্রয় ছাড়িয়া ভাগ্যপরীক্ষার জন্ত বাহির হইয়া প্রতিকূল পরিবেশের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলাম। প্রথম পর্বের আঠার বৎসরে একেবারে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জ্যৈষ্ঠায়ি ‘বঙ্গশ্রী’র চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া দ্বিতীয় পর্বে

আসিয়া প্রণাম করিলেন। মাস্টার মহাশয় আশীর্বাদ করিলেন, সতীলক্ষ্মী হয়ে বেঁচে থাক মা।

টর্চ জালিয়া ধোকার মুখটা ভাল করিয়া তিনি দেখিলেন। তাহার পর আমার দিকে চাহিয়া মিটিমিটি হাসিয়া বলিলেন, খাসা ছেলে হয়েছে।

তাহার পর পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া ধোকার হাতে দুইটি টাকা দিলেন।

ও আবার কি করছেন সার?

বাঃ, বল কি, পৌত্রমুখ দেখলাম—

স্নিগ্ধ হাসিতে আবার তাঁহার শীর্ণ মুখ উদ্ভাসিত হইয়া গেল।

ওয়েটিং-ক্রম হইতে বাহির হইয়া আসিয়া একবার গলা-ধাকারি দিয়া মুছ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, অত সিগারেট খাচ্ছ কেন স্বাধিকাল? ওটা ভাল নয়, ছেড়ে দিও।

চুপ করিয়া রহিলাম।

একটু পরেই তাঁহার গাড়ি আসিল। তাঁহার থার্ড ক্লাসের টিকিট। থার্ড ক্লাসে ভয়ানক ভিড়। মাস্টার মহাশয় নিজের ছোট বিছানাটি এবং পুটুলিটি নিজেই লইয়াছেন। কুলী ডাকেন নাই, আমাকেও লইতে দেন নাই।

থাক থাক, বেশি ভারী তো নয়, আমিই পারব।

থার্ড ক্লাসে এত ভিড় যে ওঠাই মুশকিল।

বড্ড ভিড় সার। আপনার টিকিট না হয় বদলে দি, আপনি ইন্টারে চলুন।

না, এখানেই হয়ে যাবে কোথাও। বেশ না।

সেই ভিড়ের মধ্যেই ঠেলাঠেলি করিয়া অবশেষে তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

ফ্রেন ছাড়িয়া গেল, আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।

প্রবেশ করিলাম। বিগত ১৮ বছরে যাহা দেখিলাম, যাহা শুনিলাম, পর্বশেষে তাহারই একটা তামামি বা “দি সামিং আপ” যাহা দাঁড়াইল তাহার নাম দিলাম “অসহায়”—

বাসনা-বহিঃ অলুৎ অলিতে দাঁড়,
দেহ-জঞ্জাল পাবক-পরশকামী;
মৃত্যুর বক্ষে কেহ না বসন টানে,
শবের ললাটে সাজে না খয়েরী টিপ।
জীবনে বাঁচবে, তবু করিবে না ভুল,
কে তুমি পাবাপ, কে তুমি অহকারী—
চিরকাল যারে চলিতে হইবে পাথে,
বিপথে যাবে না, তাও সম্ভব কভু?
ভুল করে ভালবাসিবে না অধরায়,
কেবা সে প্রেমিক, রসিক বলি না তারে,
দিয়ে না আঘাত কভু যারে ভালবাস—
ভালবাসা সে কি লেজারে হিলাব রাখা?
অপচয় করি কাঁদিবে না অনুতাপে,
হোটলে মদের পাত্র সমুখে ধরি
বিমুখ করেছ প্রভাতে যে ভিখারীরে
কাঁদিবে না তুমি স্মরি তার রান মুখ?
বারাঙ্গনার অঙ্গ চাপিয়া বুকে
ভাবিবে না তুমি পকেটে রাখিয়া হাত,
কস্তারে তব কিনে দেবে ফুলখুরি
বলিয়া এসেছ অক্লিষ্ট বাবার কালে।
খেলিবে না রেস বাঁধা দিয়ে জ্বরী চুড়ি,
মাতাল হইয়া ঘরে ফিরিবার মুখে
অরিতে বেহাশ পত্নীর তরে তুমি
কিনিয়া বস্তনে দেবে না ফাউল-চপ।
মিহা কথা বলি ঠকাবে না বন্ধুরে—
পীড়িত ছেলের নামে দেওরা গরমায়
মোলস ফুডের বদলে কিনিয়া মদ
আরো পাঁচজনে ডাকিয়া খাবে না তাহা?

* * *
কতি কি এতই ভুল করে যদি থাকো,
খতরে দেখিলে দেখিবে সবারি ভুল—
এ রূপে না হয় দেখিবে অস্ত রূপে
নিখুঁত জ্যামিতি নহে মানুষের মন।

* * *
মামবী-গর্ভে ধরায় অন্নে খেবা
তার মত আর কেবা আছে অসহায়,
ভুল সে করিবে, বড়াই করিবে আরো
সব কাজে তার বজায় প্রিন্সিপল।

হার রে মানুষ, হার রে প্রিন্সিপল—
কে কোথায় আনি করিছে টহলবারি,
ভাবের ঘরেতে চুরি হয় তবু রোজই,
নয়নের জল ঝরিছে পৃথিবী জুড়ে।

অর্থাৎ আমি ধমকিয়া ভিতরের দিকে, চাহিলাম; আমার আত্মদর্শনের পর্ব আরম্ভ হইল।

এবং আরম্ভ হইল ‘বঙ্গশ্রী’তেই। আমার অন্তর্দ্বন্দ্বের এক পক্ষ আমার কবিপ্রকৃতি অর্থাৎ আমার বাধাবদ্ধহীন উন্মাদ ও উচ্ছৃঙ্খল যৌবন; প্রতিপক্ষ দাঁড়াইলেন আমার বিবেক-বুদ্ধির প্রতীক স্বরূপ স্বয়ং সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য—ভট্টাচার্য মহাশয়। ব্যবসায়বৃত্তিতে এবং আপিসগত ব্যবহারে পাকা সাহেব হইলেও তিনি আসলে ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের নৈষ্ঠিক বংশধর—পূর্ববঙ্গের নবদ্বীপ কোটালিপাড়ার ব্রহ্মণ্য ও পাণ্ডিত্য-গৌরব সম্বন্ধে নিত্য সচেতন। ভূদেবের পারিবারিক ও সামাজিক প্রবন্ধের বন্ধনে স্বেচ্ছাবদ্ধ ভট্টাচার্য মহাশয় গোড়া হইতেই আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। লেখনীমুখে নিঃসৃত প্রাচীন আদর্শবাদী যে “আমি”—তিনি প্রথমে তাহাকেই ভালবাসিয়াছিলেন এবং নির্বাচন করিয়াছিলেন; কিন্তু নবযুগের উদ্দাম বজ্রায় ভাসমান “আমার” সঙ্গে তাঁহার মিল ছিল না। তাঁহার স্বভাবত স্নেহপ্রবণ হৃদয় যাহাদের মধ্যে একসঙ্গে আদর্শ ও স্নেহের পরিচুতি খুঁজিত, সেই পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ও ছাত্র অমূল্য-ভূষণের দলে ভাগ্যান্বেষে আমিও পড়িয়া গিয়াছিলাম। দেবেন্দ্রনাথ ও আমি তাঁহাকে তাঁহার আদর্শ মোতাবেক সন্তুষ্ট করিতে পারি নাই, পীড়ারই কারণ হইয়াছিলাম। প্রকাশ্যে না হউক, ভিতরে ভিতরে সংঘাত শুরু হইয়াছিল ‘বঙ্গশ্রী’র দ্বিতীয় বর্ষের গোড়া হইতেই।

ভট্টাচার্য মহাশয়কে আমি গভীর শ্রদ্ধা করিতাম এবং এখনও করি। তিনি অক্লান্তকর্মা বিচক্ষণ ব্যবসায়ী বলিয়া নয়, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের নবজীবনদাতা বলিয়া নয়, কমান্ডিয়াল ক্যারিয়ার কোম্পানী, বঙ্গলক্ষ্মী সোপ ওয়ার্কস, মেট্রোপলিটান ইনসিওরেন্স কোম্পানী এবং মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউসের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক বলিয়াও নয়, শুধু তাঁহার কলিকাতা-সংস্কৃত-গ্রন্থমালার জঘ্ন তাঁহাকে প্রণাম করি। বাস্তববাদী মিঃ ভট্টাচার্যের পরিচয় তাঁহার ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলিতে রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু

আদর্শবাদী ভট্টাচার্য মহাশয়কে আজ কেহ মনে রাখে নাই। নূতনের সংঘাতে প্রাচীন ভারতের কল্যাণকর আদর্শের বিপর্যয় দেখিয়া তাঁহাকে খেদে ক্ষোভে অশ্রুবিসর্জন করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু নিছক অশ্রুবিসর্জনেই তাঁহার অন্তরের জ্বালা প্রশমিত হয় নাই; তিনি তাঁহার আরাধ্য আদর্শের প্রতিষ্ঠায় প্রভূত কর্মশক্তি ও অর্থশক্তিও নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাহারই প্রত্যক্ষ ফল তাঁহার “কলিকাতা-সংস্কৃত-গ্রন্থমালা”। ভারতবর্ষের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচারে ও সংরক্ষণে এই প্রতিষ্ঠান চিরস্মরণীয়।

এদিকে ‘বঙ্গশ্রী’র আসর দ্বিতীয় বৎসরের গোড়া হইতেই আরও জাঁকিয়া উঠিল। নূতন ছুইজনের আগমন বিশেষ উল্লেখযোগ্য; শ্রীমান মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিপূর্বেই একটি গল্প (“সরীসৃপ,” আশ্বিন ১৩৪০) লইয়া আসরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় বৎসরে একটি বিচিত্র উপন্যাস হস্তে তাঁহার শুভাগমন ঘটিল। এই উপন্যাসের ক্রমপরিণতির কাহিনীও বিচিত্র। আমার যতদূর ধারণা, এই উপন্যাসের ভিত্তিতেই মানিকের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়। মানিক তখন কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে বলিলেও চলে। মুখচোরা লাজুক ছেলে, কিন্তু “সরীসৃপ” গল্পেই তাঁহার পোক্ত-পরিণত মনের পরিচয় পাইয়াছিলাম, সে মন সরল সাধারণ নহে, কুটিল জটিল অসাধারণ। লেখাটির পরিণতি সম্বন্ধে তখনও অব্যবহিতচিত্ত মানিক “একটি দিন” নামীয় একটি সম্পূর্ণ ছোটগল্পের আকারে উপন্যাসটি উপস্থিত করিলেন। পড়িয়াই বলিলাম, করিয়াছ কি? একটা উপন্যাসের সম্ভাবনাকে এমনভাবে হত্যা করিবে? বিচলিত মানিক বিদায় লইলেন, আমি “একটি দিন” সম্পূর্ণ গল্পাকারেই ছাপিয়া দিলাম (বৈশাখ ১৩৪১)। অনতিবিলম্বে মানিক “একটি দিনে”র উপসংহার “একটি সন্ধ্যা” লইয়া উপস্থিত হইলেন। “একটি সন্ধ্যাতে”ই শেষ হইল না, দুই সংখ্যা পরে সন্ধ্যা “রাত্রি”তে গড়াইল এবং আরও দুই সংখ্যা পরে “রাত্রি”—“দিবারাত্রির কাব্য” হইল। এই উপন্যাসের নাম-পরিবর্তনে মানিকের মনের গঠনের ছাপ আছে। এই উপন্যাসটি ব্যক্তিগতভাবে আমার খুব প্রিয়, কারণ ইহার মধ্যস্থতায় আমি মানিককে জানিয়াছিলাম।

দ্বিতীয় নবাগত শ্রীঅমলা দেবী। আমি যখন এম.এস-সি.

সিক্স্‌থ্ ইয়ারে উঠিলাম, শ্রীমান লালতানন্দ গুপ্ত ফিক্স্‌ ইয়ারে ভর্তি হইলেন; তিনিও আদিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন ৬নং বাহুড়বাগান লেনের মেসে। আমি তখন লারেকিয়ানায় প্রবল প্রাণস্রব, লেখাপড়া ছাড়া আর সব কাজেই আমার প্রচণ্ড উৎসাহ, সাহিত্যচর্চা তন্মধ্যে একটি। লালতানন্দের মনে যে সাহিত্যের তুষ্ণের আগুন তখনই দিকিধিকি জ্বলিত তাহা টের পাই নাই। আমার সাহিত্য তখন বোলচালেই সীমাবদ্ধ ছিল, লিখিত কোনও দলিল লালতানন্দের কাছে দাখিল করি নাই। তথাপি তিনি কেন যে তখনই আমাকে গুরুত্ব বরণ করিয়াছিলেন তিনিই বলিতে পারেন। তারপর আমার বিজ্ঞান-ভারতীয় সেবাইতি-ত্যাগের সঙ্গে পরস্পর ছাড়াছাড়ি হইয়া যায়, ১৯২৪ সনের গোড়াতেই। দীর্ঘ দশ বৎসর পরে তিনি তাঁহার বাস ও কর্ম-স্থল বাঁকুড়া হইতে গুরুত্ব পরীক্ষা করিবার জন্ত শ্রীঅমলা দেবীর বেনারীতে একটি তীক্ষ্ণ শর প্রণামীস্বরূপ প্রেরণ করিলেন—“চন্দ্র-ডাক্তার”। প্রথমটা বিস্ময়বিমূঢ় ও আনন্দোৎফুল্ল হইলেও বাঁকুড়া ওয়েস্টলিয়ান কলেজের বিজ্ঞান-শিক্ষক শ্রীললিতানন্দ গুপ্ত এম. এস-সি.কে ধরিয়া ফেলিতে পারিলাম। বাংলা-সাহিত্যে শ্রীঅমলা দেবীর শুভাগমন ঘটিল ফাল্গুন ১৩৪০-এ প্রকাশিত “চন্দ্র-ডাক্তারে”র পিছু পিছু।

এই বৎসরে শ্রীপ্রমথনাথ বিশীকেও নূতন করিয়া পাইলাম, ঔপন্যাসিকরূপে। কবিতা-নাটক, ভ্রমণকাহিনী, সাহিত্য-প্রবন্ধ ও রসরচনাতেই তাঁহার সবিশেষ দক্ষতা। কবে ‘দেশের শত্রু’ নাম দিয়া একটি অক্ষম উপন্যাস রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন তিনি নিজেই হয়তো তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। হঠাৎ তিনি দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যাতেই বর্ধাকৃত ‘পদ্মা’র উদ্ধামতা লইয়া দেখা দিলেন। উপন্যাসে তাঁহার প্রতিষ্ঠা কায়ম হইল।

ওই সংখ্যাতেই সন্ত-স্বর্গত (কার্তিক, ১৩৩৯) ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় দেখা দিলেন তাঁহার সম্পূর্ণ নূতন ধরনের বাংলার ইতিহাস “বাঙ্গালার কথা” লইয়া। তাঁহার পুত্র ভূতপূর্ব হাইকোর্টের উকিল ও অধুনা অধ্যাপক শ্রীজিদিবনাথ রায় এই যোগাযোগ ঘটাইলেন। ভূদেব-পৌত্রী কবি-ঔপন্যাসিক ইন্দিরা দেবীর পুত্র কবিবন্ধু শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যেমন কালিঙ্গং

পথে ট্রেনে প্রথম পরিচয় হইয়াছিল, ত্রিদিবনাথের সঙ্গেও ঠিক তেমনি সীতারামপুর-রূপনারায়ণপুর এই রকম কোনও স্টেশনে ট্রেনে প্রথম পরিচয়। প্রভাতমোহনের বেলায় যেমন তাঁহার সন্তপত্নীবিয়োগকাতর পিতা এবং সহোদরারা আমাদের বন্ধু-স্বজ্ঞপাতের সাক্ষ্য ছিলেন, ত্রিদিবনাথের সঙ্গে প্রথম আলাপের সময়ে তেমনি তাঁহার পিতা বৃদ্ধ নিখিলনাথ সাক্ষ্য ছিলেন; একজনের কথা ভাবিতে গেলেই এই কারণে আর একজনের কথাও আমার মনে পড়ে। বাহা হউক, নিখিলনাথের “বাক্সালার কথা” প্রকাশের গৌরব ‘বঙ্গভূমি’ দ্বিতীয় বৎসরের গোড়াতেই অর্জন করিল। হুঃখের বিষয়, বইখানি ‘বঙ্গভূমি’র পৃষ্ঠাতেই রহিয়া গিয়াছে। এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

দ্বিতীয় বর্ষের চতুর্থ মাসে (অর্থাৎ বৈশাখ ১৩৪১ মালে) সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় আগমন রবীন্দ্রনাথের। হেমন্তবালা দেবীর দৌত্যে কাজ যতটুকু অগ্রসর হইয়াছিল, নিজের দুর্বুদ্ধিতে গুটি প্রায় কাঁচাইয়াও আনিয়াছিলাম। ১৯৩৩ সনের সেপ্টেম্বর মাস হইতে রামমোহন-তিরোভাবের শতবার্ষিক উপলক্ষে বর্ষকালব্যাপী রামমোহন-স্মরণোৎসবের সূত্রপাত হয়। বাংলা সাময়িক পত্র ও সভা-সমিতির ইতিহাসে ১৯৩৩-৩৪, ১৯৩৬-৩৭ সন রামকৃষ্ণ পরমহংসকে, ১৯৪১-৪২ সন রবীন্দ্রনাথকে এবং ১৯৪৪-৪৫ রামকৃষ্ণ-সারদা দেবীকে উৎসর্গিত। রামমোহন-বৎসরে আমরাও বিশেষ সংখ্যা বিশেষ প্রবন্ধাদি দ্বারা তাঁহার স্মৃতিপূজা করিয়াছিলাম, কিন্তু অপরাধ হইয়াছিল; সম্পূর্ণ অপক্ষপাতিত্বের অছিলায় কোনও-কোনও ক্ষেত্রে রামমোহন-দুষণও করিয়া বসিয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং “রিফিউজড” লিখিয়া সমোড়ক ‘শনিবারের চিঠি’ ও ‘বঙ্গভূমি’ ফেরত পাঠাইলে কি হইবে, তাঁহার কানে এই দুষণসংবাদ দিবার ধর-দূষণের অভাব হয় নাই। ফলে প্রায়-বিগলিত হিমালয় আবার শক্ত হইয়া গেলেন। কিন্তু বরফ একবার গলিতে আরম্ভ করিলে তাহাকে চেষ্টা করিয়া দৃঢ় রাখা কঠিন। রবীন্দ্রনাথও পারিলেন না। এইবার বরফ ভাঙার কাজে সাহায্য করিলেন মংগেহিণী শ্রীমতী সুধারাগী দাস। ইতিমধ্যে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের “গণ্ড ছন্দে”র উপর একটি

বক্তৃতা-প্রবন্ধ সংগৃহীত ও বৈশাখ (১৩৪১) সংখ্যার প্রথম রচনা হিসাবে মুদ্রিতও হইয়াছিল, কথা ছিল, বীতরাগ কর্তার অহুমতি ব্যতিরেকে তাহা ছাপা চলিবে না। অহুমতির অপেক্ষা না রাখিয়াই প্রবন্ধ ছাপিয়া বসিলাম। অহুমতি প্রার্থনা করা হইয়াছিল, কিন্তু বৈশাখের ৪ তারিখ পর্যন্ত তাহা পাওয়া না যাওয়াতে চিন্তায় পড়িয়াছিলাম। ইতিমধ্যে সুধারাগী যে নববর্ষের প্রথম দিনেই কবিশুদ্ধকে প্রণাম প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা আমার জানা ছিল না, হয়তো মাসীমা হেমন্তবালা দেবীর প্রেরণা ছিল। ঠঠাৎ ৪ঠা বৈশাখ আপিসে গিয়াই সচিব-মারফৎ কবির অহুমতি-পত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ উল্লাসভরিত হইলাম। উল্লাসের সঙ্গে একটু বিস্ময়ও মনে উকি দিয়াছিল, কিন্তু তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার অবকাশ ছিল না। কর্মক্লাস্ত দেহে রাজ্যে বাড়ি ফিরিবার পথে ট্রামে বসিয়া আবার বিস্ময়ের ঘোর লাগিল। ঘোর কাটিল বাড়ি ফিরিয়া পড়ার টেবিলে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে সুধারাগীর নামাক্তিত খামখানি দেখিয়া। সাগ্রহে চিঠি পড়িলাম—

ও

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়ায়,

তোমার নববর্ষের প্রণাম পেয়েছি, তুমি আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো।

এই মাসের শেষভাগে আমি সিংহলে যাত্রা করব। কলকাতা হয়ে যেতে হবে। তখন সন্ধানীকান্ত যদি কলকাতায় থাকেন তা হলে আমার সঙ্গে দেখা করার আশা আছে তোমাকে হয় তো আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসবেন।

বৎসরের আরম্ভে নানা ব্যাপারে আমাকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়েছে।

ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৪১

শুভাকাঙ্ক্ষী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দীর্ঘ সাত বৎসরের বিরতির পর এই চিঠিতে প্রেক্ষাগৃহের প্রথম ঘণ্টা পড়িল। অহুমতি-পত্রের রহস্তভেদ হইল। খুশি হইলাম—শুধু এই কথা বলিলে সবটুকু বলা হইবে না। ‘বঙ্গভূমি’র চাকুরিগত-যে কাটল মনে অস্বস্তির সৃষ্টি করিতেছিল, পুনর্মিলন-সম্ভাবনার মায়া-প্রলেপে সে অস্বস্তির কাঁটাটুকু কোথায় মিলাইয়া গেল। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ পাইলে সাহিত্য-জীবনে যে-কোনও পরিণতির জন্ত আমি প্রস্তুত হইতে পারিব—এই বোধ আমাকে নাহস দিল। আমি নির্ভর হইলাম।

ইতিমধ্যে আমার অবিমুগ্ধকারিতার অথবা হঠকারিতায় আর একবার অন্তরে ফাসাদ ঘটিল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনের পরে আমার ভাবপ্রবণ মনে বেশ খানিকটা বিপ্লব ধুমায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। ধূম বহিরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল অনেক কাল পরে “ভুলি নাই” শীর্ষক একটি কবিতায়। অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনের অব্যবহিত পরে আমি কিছুকাল মৃত ও জীবিত যোদ্ধাদের ফোটো, গোপনে ব্লক প্রস্তুত, মূদ্রণ ও প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলাম, আমার সহযোগী ছিলেন দৌনেশচন্দ্র লোধ নামক এক ভদ্রলোক। কিছুকাল সর্বদা বিপদ সঙ্গে লইয়া নিশীথ-রাত্রির অন্ধকারে কলিকাতা-চন্দননগর করিতে হইয়াছিল। চন্দননগরের দক্ষিণ তোরণদ্বারের মুখে একবার ধরা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছিলাম, আমাদের বাঁচাইয়াছিল তখন আমার নিত্যব্যবহৃত ট্যাক্সির চালক মদন সিং। এক-রকম প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত ছিলাম বলিয়া ভাবলোকে বিপ্লবকে জয়যুক্ত করা হয় নাই। সমস্ত যখন থিতাইয়া আসিল, উৎসাহ-উত্তেজনা-উদ্দীপনা নিবিয়া ছাই হইল তখন লিখিলাম “ভুলি নাই”। একটা টুকরা কাগজে লিখিয়াছিলাম, অন্যদরে তাহা হারাইয়া গেল অর্থাৎ ভুলিয়া গেলাম। প্রচেষ্টা কবি জীবনময় রায়—আমার জীবনদা যে সে-টুকরা কাগজটি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা আমার জানা ছিল না। ‘বঙ্গভী’র দ্বিতীয় বৎসরে জীবনদা কবিতাটি একাদন আমাকেই উপহার দিয়া বিস্মিত করিলেন। যতদূর স্মরণ হয়, সেই দিন সেই সময়ে শৈলজা-নন্দ, প্রণব, পাচুগোপাল ও ফকীরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা তখন ‘ছায়া’ (?) নামক সাময়িক পত্র বাহির করিতেছেন। তাঁহাদের আগ্রহে কবিতাটি তাঁহাদের সমর্পণ করিলাম। সাহিত্যিক বন্ধুদের ও পত্রিকার নাম সম্বন্ধে আমি স্থিরনিশ্চয় নাই, আশ্চর্যের বিষয় আমার ভাইরিতেও এই ঘটনার উল্লেখ নাই। তবে স্মরণ আছে, পত্রিকাটি “ভুলি নাই”-লাঙ্কিত হওয়াতে পুলিশের কবলে পড়িয়া লাঙ্কিত হইয়াছিল এবং জামিনের টাকা দাখিল করিতে না পারিয়া বিলুপ্ত হইয়াছিল। কবিতাটি এই—

যাহারা শোণিতসিক্ত পদচিহ্নে পথ রচি' বিহ্বল ধূলার
উত্তপ্ত বৃক্কের রক্তে মৃতপ্রাণী জননীর করিল তর্পণ,
মানবের মহালোভ, বাঁচিবার লোভ যারা ত্যজিল হেলায়,
নিশ্চিন্তে জীবনযাত্রা অমরাত্রি সার করি কৈল-বিসর্জন।

বাধীনতা ন'পি দিতে বহু লক্ষ পরাধীন আশাহীন জনে
পথ-কুক্কুরের মত পথে পথে তাড়া খেয়ে ফিরি' দীর্ঘদিন
কেহ বা বরিল কারা, কেহ মৃত্যু মহোদাদে প্রেম-আলিঙ্গনে—
খেদ্দাবুত অপঘাতে জীবনের সর্ব আশা করিল:বিলীন।
ক্লেদপঙ্ক-সমাকীর্ণ এ ভিমিরে তাহা বা আলোক-বাতবহু,
তাহা বা জানিবাছিল দিশাহীন অন্তরহীন নহে পারাবার,
ওরে হতভাগ্য দেশ, তাসেরে স্মরণ করি মৃত্যুবীক! লহ—
নবাগত হে পথিক, বিগত পথিকদলে কর নমস্কার।

তাদের বুদ্ধির লগ্নে গুনিয়াছি গণিতেবা করে আলোচনা,
কেহ কেহ মূর্খ তারা, দম্ভনার, চলেছিল ভুল পথ ধরি,
জীবনের রাজপথে চলিতে অক্ষম তারা, কৈল আনাগোনা
অলক্ষ্য অরণ্যপথে অন্ধকারে ত্রুণপথে দিবা-বিভাবরী—
মানব-কল্যাণ লাগি গুণ্ডহাশারী হয়ে অলক্ষিত লোকে
অমৃত-সন্ধানী তারা চিরমৃত্যু-আশঙ্কায় ঘাপিল জীবন।
মানি না তাদের কথা, আমি জানি অনিবার্য প্রাণের আলোকে
উদ্ভাসিত ভাল বার, মৃত্যুভীত কাপুরুষ নহে সেই জন।
লক্ষ লক্ষ অক্ষমের অপমানে আপনার অপমান মানি
হৃকঠোর দৃঢ়হৃদে যে;বুজিল প্রতিদিন তার প্রতিকার—
কাপুরুষ অপবান নহে তার, কতু নহে ইহা সত্য জানি
নবাগত হে পথিক, বিগত পথিকদলে কর নমস্কার।

হয়তো করেছে ভুল, হয়তো বা অকস্মাৎ বিনা প্রয়োজনে
করেছে মৃত্যুর পূজা, হনির্মম, চাহে নাই প্রিয়জন পানে—
জননীর আঁখিজল শুকাইল ঝরি ঝরি বিনিদ্র নয়নে,
প্রিয়ার পাণ্ডুর ওষ্ঠ আজো কাঁপে রহি রহি রক্ত প্রত্যাখ্যানে।
হুকোনল গৃহশয্যা ডাক;বিল আজো তবু রয়েছে অজ্ঞান,
মহামৃত্যু-নাশনার মিটিয়াছে সম্রাসীর অতৃপ্ত পিমান,
শব্দ হল আঁখিতারা, বা বুজিয়ে বৃষ্টি তার মিলেছে সন্ধান;
মহাকাল উদ্বেগ থাকি নেয় বলি, তবু যেন করে উপহাস।
আমরা কাঁপিয়' উঠি অকস্মাৎ বিলম্বিত আরাম-শয্যায়,
আকাশে ঝলিল তারা, লাভ-শ্রুতি কে গণিবে ধূলির ধার?।
তাদেরে দিও না গালি, হে শব্দিত, চাকিবারে আপন লজ্জায়,
মৃত্যু বরিয়াছে যারা মৃত্যুভয়ে তাহাদেরে কর নমস্কার।

বন্ধুবর মনোজ বসু দশ বৎসর পরে তাঁহার ‘ভুলি নাই’
উপভাসের মুখবন্ধ হিসাবে কবিতাটিকে স্থান দিয়া সম্মানিত
করিয়াছেন এবং বন্ধুত্ব্য হিসাবে তাঁহার গ্রন্থখানি আমাকে
উৎসর্গ করিয়াছেন। কবিতার মূল্য ইহার অধিক কোনও
দিনই কামনা করি নাই।

বাহিরে আমি যখন সংগ্রামরত এবং ক্ষতবিক্ষত,
পরিমলনা তখন বীরবিক্রমে আমার মৌলিক আশ্রয়

চিরদিনের কেলা অর্থাৎ তাঁহার পক্ষে হয়তো নকল এবং আমার পক্ষে আসল বুদ্ধিগড় রক্ষা করিতেছিলেন। বনফুলের* কথা পূর্বে বলিয়াছি। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য আরও অনেক সাহিত্যিক উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা বরাবরের জন্য শনিগোষ্ঠীভুক্ত হইয়াছেন।

গোড়াতেই বলিয়াছি, অবলোকন এবং পর্যবেক্ষণ-পর্ব আমার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। দেখিবার অনেক তবু বাকি ছিল; ১৬ই চৈত্র (১৩৪০) ভালতলা সাহিত্য-সম্মেলনীর সাহিত্য-শাখার অধিবেশনে যোগ দিয়া কিছু দেখিলাম। ডক্টর সুনীলকুমার দে সাহিত্য-শাখার সভাপতিরূপে “বর্তমান সাহিত্য-সঙ্কট” শীর্ষক ভাষণ দিলেন। পরবর্তী বৈশাখে ‘বঙ্গশ্রী’তে তাহা মুদ্রিত হইল। বোধাই হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন প্রমুখ সুনীলকুমারের কয়েকজন বন্ধুর সহিত পরিচিত হইলাম। গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরীর সহিত পুরাতন সম্পর্ক ঝালানো হইল। গিরিজাশঙ্কর রায়মোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে লইয়া আমার জীবনে নতুন সঙ্কটের সৃষ্টি করিলেন। সাহিত্য-সঙ্কট নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া জীবন-সঙ্কট হইয়া উঠিল। অনেক দেখিলাম, অনেক শিখিলাম।

নতুন কিছু শিক্ষা লাভ হইল সাহিত্যিক-চক্রে বসিয়া। সন্ধ্যায় বসিত গল্পচক্র—পুরোহিত শৈলজ্ঞানন্দ মুখোপাধ্যায়, স্থান কখনও বঙ্গশ্রী আপিস এবং কখনও প্রিন্সিপাল ঘাটের দুই দিকের দুই সিংহের পৃষ্ঠদেশ। অশোক চট্টোপাধ্যায়, দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞান রায়, কবি স্ববল মুখোপাধ্যায় ও আমি এই চক্রে শৈলজ্ঞানন্দের শিষ্য ছিলাম। শিষ্য অশোক রাজা-উজির-মারী গল্পে গুরু শৈলজ্ঞানন্দের সহিত পাঞ্জা দিতে পারিতেন। চক্রের উপকরণ ছিল ধূম। শৈলজ্ঞানন্দের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী পৃথিবী ও মানুষ সম্বন্ধে আমাদেরগিকে যথেষ্ট গুণাকিবহাল করিয়াছিল, তখনই অবজ্ঞেকটিভ সাবজেকটিভ হইবার পথ খুঁজিতেছিল।

* পরিসংখ্য জানাইয়াছেন, “আমি সাহেবগঞ্জে গিয়েছিলাম হাওয়া পরিবর্তনে, কিন্তু ছিলাম সেখানকার ফুল-বোড়ি-এ। আমি তখন দেকেও ক্লাসে (ক্লাস ২-এ) পড়ি। বনফুল মনিহারী থেকে মাইনর পাস করে তখন ক্লাস সেভেনে ভর্তি হয়।” অর্থাৎ বনফুল সাহেবগঞ্জে তাঁহার সহবাসী ছিলেন, সহপাঠী নয়।

—লেখক

একটু অধিক রাতে বসিত কবিতাচক্র—এই চক্রে প্রেমেন্দ্র প্রধান; নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, কিরণকুমার ও আমি শিষ্য; অধিবেশন বসিত কখনও কালীঘাটে, কখনও হাওড়ায়। ধূম কবিতার বকষ্মে পরিষ্কৃত হইয়া তরল মধুররূপে মদ্যলস-আবেশের সৃষ্টি করিত। আবৃত্তির মুখে কবিতার পংক্তির পর পংক্তি আবর্তিত হইয়া ফিরিত—তাহার মূল সুর হইতেছে—“বহুদিন মনে ছিল আশা—”। হাওড়া হইতে অনেক রাতে বাড়ি ফিরিবার সময় হাওড়ার পুরাতন পটুন ত্রিভুকে আমাদেরই মত অসংলগ্ন দেখিতাম। গঙ্গা পার হইবার কালে প্রেমেন্দ্র-নৃপেন্দ্রের কাব্যোচ্ছ্বাসে তরলী টলমল করিত। তারকাকায়ী পতঙ্গের ডানায় ভর করিয়া নতুন অভিজ্ঞতা লইয়া বাড়ি ফিরিতাম।

এই সব নানা উপকরণসমৃদ্ধ আমার মন ধীরে ধীরে বহির্বিধ হইতে দৃষ্টি সংবরণ করিয়া অন্তর্লোকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কল্পি-কটির ভাবনা প্রায় মিটিয়া আসিয়াছিল বলিয়া অর্থাৎ নিরাপদ হইতেছিলাম বলিয়া আমার চিত্ত আবার অশান্ত হইয়া বিপদ খুঁজিতেছিল। চাকরির ঠুলি-বাঁধা চোখে ঘানির চারিদিকের অত্যন্ত পথে বারংবার আবর্তিত হইতে হইতে বৃকে বিদ্রোহ ঘনাইয়া উঠিতেছিল। দড়ি ছিঁড়িয়া ঠুলি খুলিয়া অনভ্যন্ত পথে উন্মাদ হইয়া ছুটিবার দুস্তব্রুতি মনের মধ্যে সঞ্চয় করিতেছিলাম। অমৃতে যাহার অকুচি কালকূট তাহাকে পান করিতেই হইবে। আত্মদর্শন আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল; চারিদিকে বাহা দেখিয়াছিলাম, আমার কবিমানসে তাহাই রূপ লইয়াছিল (ফাল্গুন, ১৩৪০) এইভাবে—

পেরেছি যুত্মর বরাভর।

বিলাসের কঠলয় হয়ে কলুধিত হয়েছে বাহার,
লোভে ক্ষোভে মিহা-মুখে বাহাদের করিছে নিরত
দূর হতে লালাশ্রাবী প্রেম,
লোলুপ ছেলের মত জীবনের ভালবাসে যায়,
জীবনের ভালবাসে, ভালবাসে আর করে ভয়—
দু কথা তাদের কহি, পেরেছি যুত্মর বরাভর।

রোঁদ নাহি ভালবাসে, সাখার উপরে ঘোরে পাখা,
কৈসে যায় আকাশের হাওয়া।

ছবির মেয়ের বুক দেখে তারা দিনেমার টাল,
ষ্টুডিও-উইয়ের-টিবি হিমায়ে করিছে আঁধার।

জলপূর্ণ কাচপাত্রে তাহাদের নীলাবু-বিস্তার,
উঠানের টবে ছেঁরে বারিধির উন্নত নর্তন,
মাগরে জলের চেউ আছাড়িয়া তটেরে কাঁদায়।

বাণুসর বেলানুমে ছাতার আড়ালে রহে তার,
সেখাও ড্রইংরুম-প্রেম।

তাদের বসন্ত আসে, স্বরে না গাছের মরা-পাতা,
রঙে সাজে কাগজের ফুল,

নিখুঁত জ্যামিতি-কথা 'বেডে'-কোটে ফুল মরহুমী—
অপরাধ নাম তাহাদের;

সে নাম বাহারী শোনে, মানীয়ে ধুলার দিয়ে দাম,
তাহাদের কানে কানে শোনাব মৃত্যুর শতদাম।

দশ ধাপ সিঁড়ি উঠে, বেঞ্চ-পাতা 'হলে' বাহাদের
নির্জিহ্ন দেবতা শোনে চোখ বুজে অর্গ্যানে কোরাস;
তত ধর্ম যত গুণে হাই,

চর্মের ড্যানিটি-ব্যাগে দর্পণেতে দেবতার ছায়,
আমি সেই দেবতার দেখিয়াছি মৃত্যুর স্বরূপ—
ধূলি বালি কর্দম কঙ্কর।

মর্মর-বেদীর 'পরে' দেখিয়াছি হাসিছে কয়োটি—
দেবতা মৃত্যুর পায়ে পান করে জীবন-আসব—
পান করে, হাসে বলধল।

পসেটম-ক্রীম-চাকা চর্মে হার, লাগে না শিহর,
কর্মে নাহি পশে অটহাসি।

ধর্মের মন্দির গর্ভে চিতাবু দেখিয়াছি আমি—
প্রেমের বেদিকামূলে লেগিহান মৃত্যুর রসনা—
মহাকাল-করাল-অকুট।

মারা-মোহ-যবনিকা ধীরে ধীরে করি উন্মোলন
জীবনের রক্তমঞ্চে দেখাব মৃত্যুর অভিনয়—
মৃত্যুরে করিয়া মনস্কার।

আর্থের উদ্দাম লীলা লালসার উলঙ্গ মত্ততা,
প্রেমের মুখোশ পরি কি বীভৎস কামের কলুব।

সন্তান গড়িয়া তোলে অর্থলোভী আয়ার সাধনা,
ক্রীম স্বামী ঔদার্যের ছলে
গভীরে তুলিয়া দিয়া পরের মোটরে
পর-অর্থে চালায় সংসার।

... ..

শিশুর পীযুষ-স্রুত চাটতেছে দস্তানীন বুকের রসনা;
যে মরিবে সে মারিছে যে বাঁচিবে তারে;
গুরুভক্তি পিতৃভক্তি বংশের সম্মান,
বিক্রপ বীভৎস হয়ে জীবনের মোখিয়াছে পথ।

একের লালসা—

অর্থবল, লোকবল, অসহায় দরিদ্রের অন্ন-দানবল,
পদ-প্রতিপত্তি আর ক্ষুধিতের উদরের ক্ষুধা,
দরিদ্রের স্ত্রীকন্ডার বস্ত্র-অলঙ্কারে অভিজ্ঞাতি,
মোটর-বাসন আর হোটেল-বিলাস—

সব কিছু মিলিয়াছে মিটাইতে একের লালসা
বহুরে বঞ্চিত করি।

এক কাম-বন্ধি মাঝে বহু প্রেম দিতেছে আত্মত্যাগ;
দক্ষ প্রেম-ভঙ্গে অল্পে উদরের সামান্য সংস্থান।

রমণীর মাতৃস্বরে দিকে দিকে কবিত্তে সংহার
পুরুষের বিকল পৌরুষ;
বন্ধে স্বীর আসিতে না পার।
দেহ-বেচা অর্থে মাতা সন্তানের দুহু করে ত্রয়—
দেহ-জাত হায় রে সন্তান।

যুগযুগান্তর ধরি পৃথিবীর মানবের শিশু
কাঁদিয়ে মাগের কোলে বসি—

মাতা অসহায়—

মাত্রাভ্য ক্যান্টরি মদ আকিম কোকেন
তাড়িখানা বেজোর 'হোটেল'
পথে পণ্যরমণীর ক্ষুধাত 'ইন্ড্রিত'—
সভ্যতার রথচক্রে ঘর্ষিয়া ছুটিছে উদ্দাম।

লোভী ছেলে ছুটে যায় পথে,
জননীর চোখের সমুদ্রে
রথচক্রে তারে ছিন্নভিন্ন বেহ—
রক্তস্রোতে কর্দমান্ত ধূলি।

সে লোহিত ধূলিজালে দেবতার মহান প্রকাশ—
অপরাধ মৃত্যুর বৈভব।

চারদিকের এই বীভৎস বিকৃতি এবং আসন্ন ধ্বংসের
মধ্যে আমার মন কিন্তু কালকূটপায়ী মৃত্যুজয়ের সন্ধান
পাইয়াছিল, সে দমে নাই বা মুহূর্তমান হয় নাই। আমার
তদানীন্তন অশান্ত জীবনযাত্রার কাহিনী বাসবলোক
পর্বত পৌছিয়াছিল, ইন্দ্রিতে মতর্কবাণীও আসিয়াছিল;
আমি ভয় পাই নাই। কবিতায় জবাব দিয়াছিলাম—
আম্বিনে (১৩৪১) "বজ্র-আশীর্বাদ" ছাপিয়া। আসলে
ইহা আমারই চিরন্তন দেব-সংস্কারের সঙ্গে বোঝাপড়া—
সুখশান্তিময় নন্দনের জীবনের সঙ্গে চিরচলমান শাস্ত
মানবজীবনের আপোষহীন সংগ্রামের কবিতা।—

হান বজ্র, বজ্র হান, মেঘলোকবাসী হে বাসব,
বজ্র হান আমাদের শিরে।

দিতির সন্তান নহি, তবু মোরা দেবতা-বিরোধী—

অহর্মদ অহঙ্কারে শূন্যপানে আকাশিয়া বাছ,
মেঘলোকে তুলি শির উচ্চ কণ্ঠে কহিতেছি ডাকি—

ত্রিদিবের অধাধব আমি আছি—আর কেহ নাই,
সৃষ্টিধা নিখিল বিশ্ব, সৃষ্টিধ্বংস করি আমি আপন বেদালে,
জন্ম আর মৃত্যু—এই জগতের সত্য ইতিহাস
আমিই রচনা করি।

ভোগ করি, করি ক্ষয়, অপচয়ে আনন্দ আমার—
অতীতে করি না নতি, ভবিষ্যে করি না মঞ্চ,

বাহা আছে, বাহা পাই, মুঠি ভরি উড়াই ফুৎকারে,
অনন্ত কালের বন্ধে ক্ষণিকের বৃন্দ-বিলাস।
তোমরা উধেঠে থাক, হে দেবতা নন্দননিবাসী,
উজ্জ্বল হতে আমাদের কর কর বজ্র-আশীর্বাদ—
হান বজ্র আমাদের শিরে।
আমরা মরিতে চাই, মরিয়া বাঁচিতে চাই মোরা—
ধরার মুক্তিবাক্ষে পদচিহ্ন নিমেষে মিলায়—
অনন্ত অশেষ প্রেম তাও ধীরে শেব হয়ে আসে।
ক্ষণকাল পূজা করি অতি ব্যর্থ মৃতির মন্দিরে
মৃতির দশমস্তম্ব কালক্রোড়ে ফেলে দিই টানি।
মনে রাখি, তুলে বাই, ভালবাসি, ঘৃণা করি, পুনঃ
বাহারে তেলিয়া ফেলি তারি লাগি কাঁদিয়া ভাসাই।

যে হুংখ-দারিদ্র্য বেদনা-পীড়ন ক্ষয়-ক্ষতি মৃত্যুর মধ্য
দিয়া মানুষের জয়যাত্রা, সে সবকে উপহাস-উপেক্ষা করিয়াই
তাহার আনন্দ, পূর্বাধার মানুষের ইতিহাস এই সাক্ষ্যই
দিয়াছে—অবলোকন-পর্যবেক্ষণের ফলে আত্মচিন্তা করিয়া
আমি ধীরে ধীরে সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছিলাম।
পূর্বে “আত্মস্মৃতি”র পাঠককে যে “আমি”র স্মৃতিগান শুনাইয়া-
ছিলাম তাহারই পরিণত সংহত রূপ এই “বজ্র-আশীর্বাদ”—

আপনারে উপাসিয়া আবরিয়া ফেলি এ নিখিল,
ভেঙেচুরে চলে বাই নিশেধ গর্ভাক পদাঘাতে,
দলিয়া গিথিয়া মারি নিজ হাতে আপনার জনে,
নির্মম কুঠার হানি সন্মুখে রচিয়া চলি পথ,
পিছু ফিরে অকারণ ধলধল হাসি অটহাসি।
সবারে পশ্চাতে ফেলি দূরে গিয়ে ফেলি অশ্রুজল।
হতাশায় ভেঙে পড়ি, পথ ছেড়ে হই যে বৈরাগী,
মনে হয় মিথ্যা সব, কিছুতে নাহিক প্রয়োজন।
চোখে পুন লাগে রক্ত, ঘরা পড়ি, করি যে শিকার,
প্রিয়ে করি প্রিয়তর, প্রেমসীরে প্রিয়তমা করি।
মদিরাবিহীন নেড়ে মধ্যরাত্রে পুজি বারানন্দা,
সুচিন্তন কবি প্রাতে দেবীর মন্দিরে দিই পূজা।
এও ক্ষণিকের খেলা, মৃত্যুর বধির অন্ধকারে
নিঃশব্দে ডুবিয়া যাই অলক্ষিতে সহসা একদা।
চেউয়ের পশ্চাতে চেউ, এক ঘর, পুনঃ আর আসে,
আশানের শুক চরে গলি পড়ে, ফসল গজায়—
পাণাণে জলের লেখা—মানুষের এই ইতিহাস।

মানুষের মহামানবীয় রূপ তাহার মৃত্যুর মধ্যে; মৃত্যুকে
সে যেখানে ভয় করে নাই সেখানেই সে বাঁচিয়াছে।
নিশ্চিন্ত আশ্রমের মধ্যে, প্রগলভ বিলাসের মধ্যে এই সত্য
সেদিন উপলব্ধি করিয়া আমার আত্মঘাতী মানুষ-সত্তা
নিজেকে নিঃসহায়-নিরাবরণ সঙ্কটের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া
আর একবার আত্মপরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইতেছিল।
সঙ্কটের রকমটা তাহার আনা ছিল না, শুধু আরামটা তাহার
সহিতেছিল না। এক কথায়, বিপদ ডাকিয়া আনিতে
বন্ধপরিকর হইয়াছিলাম। নিজেকে সাহস দিবার জন্তই
যেন লিখিয়াছিলাম—

শাবত নন্দনে ভব, হে বাসব, কে আছে দেবতা—
পড়ে পাণাণের লেখা, গণে মর-জীবনের চেউ?

কেহ নাই, নিঃসঙ্কেতে হান হান হান বজ্রবাণ,
হান বজ্র আমাদের শিরে।
মরিতে করি না ভয়, যুগে যুগে মারিমাছি আমি—
আমার গগনস্পর্শী স্পর্শ কত মিশিল ধূলার—
কত উর, বাবিলন, ইজ্রপ্রহ, অবোধা, কার্শ্বক,
যুগে যুগে কত জাতি লয় নিল, মরিল নিঃশেষে—
কারাও, কাইসার কত, শালমেন, চের্সীজ, তৈমুর—
পাণাণ-মর্মর মূর্তি কারো আছে, কারো পড়ে ভেঙে,
মুতি সে পাণাণ ভার বিমুতির প্রত্যন্ত-সৌম্য।
বাঁচিবারে চাহি নাই, বাঁচি নাই শামুকের খোলে,
শাখা তাজি ধরাপৃষ্ঠে নারিমাছি যুত্যা-আকাঙ্ক্ষায়,
দেখচুবা দেবলোকে মুহূর্ত হ হানিতে কুঠার
করেছি আকাশবাণী কামনার ডানা ঝাপটিয়া।
নাগরে ভাসাই তরী, ডুবিয়াছি গহন গভীরে
অতিক্রম জলসর্প গুরে যেথা প্রবাল শয্যার।
মরুপথে অভিযান, ঘনারণ্যে খাপন-গুহার,
মর্ত্যের মুক্তিকা খুঁড়ি নন্দনের মাপিকা-সন্ধান,
হিমালয়-শৈলচূড়ে মৃত্যুনাথে বৃষ্টি বারবার,
তুষাবেতে পদচিহ্ন মুছে বার হিমসের-নাথে।
বহিবে কবেছি বন্দী, অশনি শোনার মোরে গান,
সে গানের অন্তরালে লক্ষ লক্ষ মৃত মানবের
উন্মিত্তেছে অবিরাম মৃত্যুজয়ী জগোলাসধনি।
তুমি কি শুনিতে পাও, হে বাসব, সে জয়-সঙ্গীত?
তোমারে উপেক্ষা করি মানবের এই অভিযান
স্নেহচক্ষে দেখিয়াছ, অভিলুপ্ত মানব-সন্তানে—
আমারে করেছ ক্ষমা?

দেখিয়াছ, হে দেবতা, যুগে যুগে কর আশীর্বাদ,
রক্ত বজ্র হানিয়াছ বারবার মানবের শিরে—
আজো হানিতেছ তাহা উধেঠে থাকি প্রবল ক্রিকেটে,
হান বজ্র আমাদের শিরে।
স্পর্শ মোর ভাসারেছ কতবার প্রলয়-দ্বাবনে,
ফুঁসিয়া বাতুকাঁ তব বারবার নাড়িয়াছে মাথা,
আমারে চাকিয়া গেছে লাভাস্রোত আগেরগিরি,
উত্তাল তরঙ্গাঘাতে কত তরী ডুবিল অন্তলে,
কত গৃহ উড়িল ঝড়ায়—
কত বজ্র হানিয়াছ যুগে যুগে মহানারী-রূপে।
কি তাতে হয়েছে ক্ষতি, হে বাসব? এরি মাঝখানে
আমার প্রচণ্ড দস্ত বারবার হাসে অটহাসি।
এরি মাঝখানে
মহাযুদ্ধে বারবার আপনারে করেছি হমন...
জ্বাল ধরীবন্ধ করিয়াছি মৃত্যুর দশন।
আত্মঘাতী দস্তে মোব, হে দেবতা, ওঠ না শিহরি?
কর নাকি বজ্র-আশীর্বাদ—
তোমার প্রচণ্ড বজ্র পড়ে নাকি নিফল হুকারে
অসতর্ক অসহায় আবরণহীন এই মানুষের শিরে?

এই কবিতা আমার ৩৫তম জন্মদিনে (২ ভাদ্র ১৩৪১)
লেখা, সঙ্কল্প কার্যকরী রূপ লইতে আরও সাড়ে চার মাস
সময় লাগিল।

[ক্রমশ]

রম্যানি বাম্বা

শ্রীম্ভবোদকুমার চক্রবর্তী

"There is a Permanent, a Truth hidden by a Truth where the Sun unyokes his horses.
The ten hundreds (of his rays) came together—That One. I saw the most Glorious
of the Forms of the Gods."—(Rigveda, V 61-62)

জ্যোতিষ শাস্ত্রে আর যেই বিশ্বাস করুক, আমি করি নি কোনকালে। জীবনের প্রথমেই একটা কঠিন ধাক্কা খেয়ে এ সত্য উপলব্ধি করেছি। অনেক পয়সার বিনিময়ে আমার ঠিকুজী করেছিলেন বিজ্ঞাপনে ভাস্বর যে জ্যোতিষার্ঘ্য, এখানে তাঁর নামোল্লেখ করে মানহানির মামলায় বিপর্যয় হতে চাই নে। শৈশবে আমার স্থলক্ষণাধার ফিরিঙ্গি স্তনে আমি কেন, নিম্নক প্রতিবেশীরাও একমত হয়েছিলেন যে, রাজা না হ'লেও এ ছেলে মন্ত্রী যে হবে, তাতে সন্দেহ নেই। সেই সব প্রতিবেশীরা আজ বিশ্বাস করেন না যে, আমি ডালহৌসি কোয়ারে এখন দশটা-পাঁচটা কলম পিষি।

রবিবারের কাগজে তবু সাপ্তাহিক ফল দেখি। আর দশটা ভাগ্যাত্মী উৎসাহীর মত প্রথমে ওই পাতাটাই খুলি। মনোরঞ্জন বলে, এমন কথা সেও লিখতে পারে। একই কথা ইনিয়-বিনিয়-বারে বারে বলার ব্যায়াম তো! "ভক্ত শনি ও রবির স্থান আশাহরুপ। কিন্তু মঙ্গলের অশুভ প্রভাব বাধা-বিঘ্ন ঘটতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল। আর্থিক ক্ষেত্র মন্দ নয়। ব্যবসায় এক প্রকার।" এ লেখা আর এমন শক্ত কি!

কিন্তু আজ চলতি মাসের মেলের একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় লাফিয়ে ওঠবার সময় প্রথমেই মনে হ'ল, মনোরঞ্জন বোধ হয় আমারই মত ভুল বলে। ভারতের ছত্রিশ কোটি লোককে যদি মাত্র বারোটা রাশিতে ভাগ করা হয়, তবে প্রত্যেক রাশির প্রত্যেক লোকই কি আশা করতে পারে, তার সাপ্তাহিক ফল হব্ব মিলে যাবে! তবু যে অনেকের অনেক কথা মিলে যায়—সেইটেই কি আশ্চর্যের নয়?

নিখিল থাকলে এর উত্তর দিত। সে স্ট্যাটিস্টিক্সের ছাত্র। বলে, অল্পই হ'লেই আমরা ডাক্তার দেখাই, আর ওষু

খাই। কিন্তু শতকরা নিরানব্বইটা লোক বাচে প্রকৃতির নিয়মে। আমরা বলি, ওষুধের গুণ। যে রোগীটা মরে, বলি—নিয়তি তাকে টেনেছে। আজ নিখিলের খিওরি মানতেও ইচ্ছে হ'ল না।

এবারের পূজোটা উত্তরপাড়ায় নিজের ঘরে ব'সেই কাটাব স্থির করেছিলুম। দু মাসের ঘর ভাড়া দিতে হবে, হোটেলের বিল, ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়ামও পড়েছে থাকি। সব মিটিয়ে রেলের খাঁই যোগাব কোথা থেকে! বাউণ্ডলে বন্ধুরা গিম্ব হ'ল খানিকটা। পয়দার যুক্তি বড় যুক্তি। সকলকেই মানতে হয় সেটা। আমার অভাব, নিখিল বলে, স্বভাবের দোষে। সংসারী হ'লে কি করতুম, সেই ভেবে তার ঘুম হয় না। মনোরঞ্জন একটা খোঁচা দিয়ে বলেছিল, তোর না এবার দেশভ্রমণের সম্ভাবনা আছে? অনেক দিনের বাসনা সফল হবে?

সেদিন কোনও জবাব দিতে পারি নি। এই সময় প্র্যাটফর্মে পেলে উত্তরটা দিয়ে যেতুম।

আজ আপিস হয়েই পূজোর ছুটি হয়ে গেল। কাল আর আপিস যেতে হবে না। ভয় হ'ল, কাল সকালেও আলো হবে তো আজকের মত!

আপিস পালিয়েও চারটে কুড়ির লোকালটা ধরতে পারলুম না। চারটে বিয়াল্লিশ পর্যন্ত প্র্যাটফর্মেই পায়চারি করতে হবে দেখছি। ওপর থেকে একটি মেয়ের গলার ঘোষণা শোনা যাচ্ছিল—তেতাল্লিশ নম্বর আপ মাস্ত্রাজ মেল সাত নম্বর প্র্যাটফর্ম থেকে চারটে পঞ্চাশ মিনিটে ছাড়বে। অনেক দিন মেল-ট্রেন দেখি নি। তাতেও কি যাত্রীরা কোলে পিঠে দরজায় জানলায় গাঙ্গাগাদি হয়ে হাতলে ঝুলে বাকারে চ'ড়ে দুর্গানামের বদলে রেল কোম্পানির বাপাস্ত করতে করতে ফেরে?

সাত নম্বর প্র্যাটফর্মে এসে চমকে গেলুম। এ যেন

হাওড়া স্টেশনই নয়। সেই টিনের শেড, সেই গাড়ি, সেই লাল-কালো-টুপিপরা রেলকর্মচারী, বইওয়ালা, খাবারওয়ালা, চাওয়ালা, ফলের পসরা, কুলির ধাক্কাধাক্কি, যাত্রীর ভিড়। তবু যেন তফাত কোন্‌খানে। কাঁধ থেকে বোলা ঝুলিয়ে কপি হাতে মাছ হাতে ছুটছে না কোন যাত্রী, মারামারি হচ্ছে না গাড়ির দরজার একটুখানি হাতল ধরবার অধিকার নিয়ে। ভেতরে যারা বসে আছে, তাদের যেন প্রাণ নেই, পুতুলের মত নিরাসক্ত তারা। যেন ভারে ভেঙে যাবার ভয়ে কোলে পিঠে উঠছে না নীচের যাত্রীরা। এত ফাঁকা, এত হাওয়া—দম আটকাচ্ছে না ওদের বেশি হাওয়ায়।

কাঁধে একটা ঝাঁকানি খেয়ে থমকে দাঁড়ালুম।

গোপাল কোথায় যাচ্ছ ?

চমকে চেয়ে দেখি, মামাবাবু রায় সাহেব অব্যবহৃত গোস্বামী, ইংরেজ সরকার আর দু বছর এ দেশে থেকে গেলে যিনি নিঃসন্দেহে রায় বাহাদুর হতেন। বছর কয়েক আগে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে যখন দেখা করতে গিয়েছিলুম তাঁর বালিগঞ্জের বাড়িতে, মামাবাবু চিনতে পারেন নি। না পারবারই কথা। মাঝেই চিন্তেন না ভাল করে। আপনার বোনকেই আজকাল লোকে ভুলে যাচ্ছে, তায় সম্বন্ধে বোন! আর গরিবকে চেনাও তো বিপদের কথা। চাই ছাড়া তো আর বব নেই এই পোড়া দেশে। সংক্ষেপে পরিচয় দিয়েছিলুম। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে পায়ের ধুলো নিতে তিনিও আশ্বস্ত হলেন। পথে নেমে নিজেও হাফা বোধ করেছিলুম সেদিন।

আজ এমন ভিড়ের ভেতর চিনেছেন মামাবাবু। বড় আনন্দ হ'ল। থপ করে পায়ের ধুলো নিয়ে বললুম, আজ্ঞে, বাড়ি ফিরছি।

বাড়ি ফিরছ, তা ভালই হ'ল। কত দূর যাবে ?

মামাবাবুর কণ্ঠস্বরে ধানিকটা খুশির আভাস পেলুম। বললুম, উত্তরপাড়া।

আমার উত্তরটা বোধ হয় তাঁর কানে গেল না ! তিনি ধ'রেই নিয়েছেন, আমিও এই গাড়িতে চলেছি। তাই সোজা হুজি তাঁর বিপদের কথায় নামলেন, কথায় বলে, স্বপ্নে থাকতে ভুতে কিলোয়—তাই হয়েছে তোমার মামীর। • বুড়োবয়সে বায়না ধরেছেন রামেশ্বরের তীর্থ করবেন। আর হাওড়া স্টেশনেই এই বিপদ !

জানলা দিয়ে দেখলুম, মামী করুণ চোখে তাকিয়ে আছেন আমাদের দিকে।

বিপদের কথাটাও মামাবাবু এক নিশ্বাসে বললেন, গুগুগোল পাকিয়েছে হতভাগা রামখেলাওন। সে লক্ষ্মীছাড়া সময়মত কোথায় যে সটকে পড়ল, তার টিকিট রইল আমার পকেটে। তুমিই বল গোপাল, এত দূরের পথ, আর আমার এই শরীর—

ব'লে নিজের দিকে একবার তাকালেন। আমিও তাকালুম। শরীরই বটে। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে যে প্রচুর খাটি জিনিস খেতে পেতেন, তার বিজ্ঞাপন এখনও লেগে আছে। বললুম, আজ্ঞা দাঁড়ান, আমি একটু খুঁজে দেখি।

দরজায় দাঁড়ানো একটি কুশাদী কন্যা খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। বললে, আপনি খুঁজে দেখবেন মানে ? চিনবেন কি করে ?

সত্যিই তো। থাকে দেখি নি কোনদিন, এই জনসমুদ্রের ভেতর সে নিজে ধরা না দিলে কে তাকে ধরবে।

মামাবাবু অহুযোগের স্বরে বললেন, এই জন্মেই তোমাদের বলি যে, বাড়িতে কেউ এলে একটু চা জলখাবার খেতে দেবে। সেদিন অমন শুকনো মুখে গোপালকে না ফেরালে—

হাসি পেল মামাবাবুর দূরদৃষ্টির পরিচয় পেয়ে। জবাব দিল তাঁর মেয়ে, আমি তো বলেছি বাবা, সে এককণ দ্বারভাঙ্গার পথে। শুনলে না, এগার নম্বর প্র্যাটফর্ম থেকে চারটে দশ মিনিটে ছাড়ল মোকামা এক্সপ্রেস ? কোন রকমে গঙ্গা পেরুলেই তো তার নিজের রাজস্ব।

হতাশভাবে মামাবাবু বললেন, হতচ্ছাড়া গোড়া থেকেই গাঁই-গুঁই করছিল।

আমি তার টিকিটের কথা ভাবলুম, বললুম, ফেরত দিয়ে আসব তার টিকিটটা ?

তাঁর উত্তরটা বড় মর্যাস্তিক শোনাল, টিকিট ফেরত দিয়ে তো আর সমস্তার সম্মাধান হয় না গোপাল ! এত দূরের পথ—

সত্যিই তো। আমি কিছু বলবার আগে মেয়ে তাঁর জবাব দিলে, ভয় পাচ্ছ কেন বাবা, আমি তো আছি সঙ্গে !

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মামাবাবু বললেন, শেষটার তোর ভরসায় খালে পা দেব। পই-পই করে শান্ত্রে বারণ করেছে, মেয়েমাছুয় নিয়ে পথে বেরবে না। আর শেষে—
কিনে মেয়ের ভরসায়—

চং চং করে পাঁচ মিনিটের ঘণ্টা পড়ল। মামাবাবু বিচলিত হয়ে উঠলেন। এতবড় শরীরে সাহসের এত অভাবও হয়। মামীর দিকে ফিরে বললেন, মালপত্র তা হ'লে নামিয়ে নিই?

বাবা রামেশ্বরের নামে যাত্রা করে বেরিয়েছি—মামী আমার দিকে চেয়ে বললেন, তুমি আমাদের সঙ্গে যেতে পার না গোপাল?

হঠাৎ থই পেয়ে মামাবাবু আমার হাত ছুঁটো জড়িয়ে ধরলেন।

আমি জাত-বাউতুলে। আপিসের দিনে আপিস পালাই, ছুটির দিনে বাড়ি ফিরি নে, বাইরের আকাশ আমাকে টানে। সেই টানে ঘরে মন বসল মা আজও। কাল থেকে আপিস ছুটি। ঘরে কেউ নেই, যার অহমতি নেবার প্রয়োজন আছে। তবু—

হাতে একটু ঝাঁকানি দিয়ে মামাবাবু বললেন, তুমি রাজী হয়ে যাও বাবা, তোমার সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

বড় অসহায় মনে হ'ল মামাবাবুকে। জানলার ভেতর মামীর চোখ ছুঁটো দেখলুম, ছলছল করছে বেদনায়। আর দরজায় দাঁড়িয়ে কুশালী মেয়েটি বড় বড় চোখ মেলে আছে উত্তরের প্রতীক্ষায়।

ভাববার সময় নেই। বড় তাড়াতাড়ি বাজিয়ে দিল শেষের ঘণ্টাটা। প্র্যাটকর্মের আলো বড় তীব্র। যেখানে চলেছে এই যাত্রীরা, সেই উল্লার দিগন্তের স্খিততার আভাস নেই এতে। চোখে রঙ লেগেছে, মনেও কি তার ছায়া পড়ল।

দরজা দিয়ে গেলে মামাবাবুকে তুলে দিলুম। সামনে সবুজ আলো, পেছনে গার্ডের বাঁশি আর সবুজ নিশান। চলতি ট্রেনে আমিও উঠে পড়লুম।

২

গাড়িতে মামীর পায়ে ধুলো নিতেই প্রায় কঁদে ফেলে বললেন তিনি, দীর্ঘজীবী হয়ে বেঁচে থাক বাবা।

মামাবাবু অত্যন্ত পরিশ্রান্তের মত তখন একটা বেঞ্চিতে বসে পড়েছেন। গাড়িতে আরও এক ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি একজন নিরপেক্ষ দর্শকের মত নিঃশব্দে সব কিছুই প্রত্যক্ষ করছিলেন। 'কালো চামড়া না হ'লে একে কাশ্মীরে পাঠানো চলত।

মালপত্র সব বিপর্যস্ত—ছড়ানো ছিল এমিকে সেমিকে। বিছানা বাস্প হটকেস অ্যাটাচিকেস টিফিন-বাস্প টিফিন-কারিয়ার ক্লাস জলের জগ ছাতা লাঠি পানের ডিবে গুদুখের বাস্প—সেগুলো যথাস্থানে গুছিয়ে রেখে স্থস্থ হয়ে বসতেই মামী বললেন, তোমার বোন স্বাতিকে বুঝি তুমি আগে দেখ নি গোপাল?

মাথা নেড়ে স্বীকার করলুম দেখি নি। স্বাতি বড় সপ্রতিভ, বললে, আমি কিন্তু গোপালদাকে দেখেছি আগে। নতুন কলেজে উঠে কনভোকেশন দেখতে এসেছি। মনে পড়ছে, গোপালদা এম. এ.র ডিগ্রী নিলেন গোড়ার দিকে।

ততক্ষণে মামাবাবু তাঁর দম ফিরে পেয়েছেন। পকেট থেকে টিকিটগুলো বার করে হলদে টিকিটখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন। এক দিকে কোণাকুলি করে লেখা 'সার্ভেট'। প্রসঙ্গটা কি ভাবে পাড়বেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। আমি তাঁকে সাহায্য করলুম, আপনি সন্কোচ করছেন কেন মামাবাবু? মহাত্মাজী যে গাড়িতে চড়ে তাঁর জীবন কাটিয়ে গেলেন, সে গাড়িতে আমার কষ্ট হবে না। ট্রেন ছাড়লেই আমি নেবে যাব।

আশ্বস্ত হয়ে মামাবাবু বললেন, সে তোমার খন্দরের বহর দেখেই জানি। কিন্তু এ ছাপ যেটাই কি করে?—বলে 'সার্ভেট' কথাটি দেখালেন আঙুল দিয়ে। আমি রহস্য করার স্বযোগ ছাড়তে পারলুম না। বললুম, ও দাগ তো আমাদের সকলের পিঠে মামাবাবু। কেউ পয়সার জন্তে গোলামি করে, আর কেউ পয়সা দিয়ে গোলামি করে স্বভাবের দোষে।

তা যা বলেছ।—হেঁ-হেঁ করে হাসলেন মামাবাবু। স্বাতির কান দুটো লাল হয়েছে দেখলুম।

খড়গপুর পর্যন্ত একত্র যেতে হবে। মামাবাবু তাঁর স্কাচেল থেকে ভ্রমণের ইটিনেরারি বার করলেন। স্বাতি উঠে গিয়ে তার ব্যাগ আর ক্যামেরাটা দেয়ালের জুকে টাঙিয়ে কাঁধটা হাল্কা করল।

মামাবাবু বললেন, পনের দিনে সমগ্র দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ—মাত্রাঙ্ক ত্রিটি মাত্রা ধরুফোটি রামেশ্বর পেরিয়ে কল্লাকুমারী। অগস্ত্যরাজা না হ'লে বাঁচি।

বালাই বাট!—ব'লে মামী যুক্তকর ঠেকালেন।

আমি প্রণাম করলুম সেই ঋষিকে, যিনি বিশ্বের প্রয়োজনে অগস্ত্যরাজা করেছিলেন। খ্রীষ্টের জন্মের সন দিয়ে সেদিনের হিসাব রাখা সম্ভব হয় নি, কৃষ্ণের জন্মের সন যে আমাদের জানা নেই। বিদ্যা সেদিন আকাশ ছুঁয়েছিল, বললে, সূর্যকে যেতে দেব না মাথার ওপর দিয়ে। দিন রাত্রি একাকার হয়ে গেল, সৃষ্টি বুঝি রসাতলে যায়। সেদিন শিষ্যকে শাস্ত্র করবার জগ্রে প্রয়োজন হয়েছিল অগস্ত্যের। প্রপত বিদ্যাকে তাঁর প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত নত হয়ে থাকবার নির্দেশ দিয়ে গুরু দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করলেন। আর ফিরলেন না। সে পথ অবস্খী-উজ্জয়িনীর পথ, অরণ্যকণ্টকিত নর্মদাবিধৌত বন্ধুর পথ।

অগস্ত্যই কি দক্ষিণ-ভারতে আৰ্য সভ্যতার ঋষিক?

সে যুগের ইতিহাস আজ জানা নেই। জানবার উপায়ও নেই—ইতিহাসের যে প্রয়োজন আছে, তা ভাবতে শেষে নি সেদিনের লোক। পুরাণ আমরা মানি নে। তাতে সন নেই, তারিখ নেই। গল্পের সঙ্গে ইতিহাসের তফাত হ'ল কোথায়? আজ যেটুকু তথ্য আমরা স্বীকার করি, তা ঠাকুরমার খুলি থেকে পাওয়া। লোকের মুখে মুখে চ'লে আসা গাল-গল্পে।

সে আজ খ্রীষ্টের জন্মের দু হাজার বছর আগের কথা। আৰ্যরা কাণ্ডশান গিরিধার, দোরা, খাইবার ও মালাকান গিরিধার পেরিয়ে ভারতের গান্ধার ও সপ্ত সিদ্ধবে আধিপত্য বিস্তার করেছেন। পশ্চিমে স্থলম্যান পর্বতমালা, উত্তর-পশ্চিমে হিন্দুকুশ, উত্তর-পূর্বে হিমালয় আর দক্ষিণে সরস্বতী নদী। পুরুষপুর ও তক্ষশীলায় আৰ্যসভ্যতা দানা বাঁধছে। আনুমানিক বারো শো খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে আৰ্যরা সরস্বতী নদী পেরিয়ে ব্রহ্মাবর্তে পৌছলেন। নতুন ঘাঁটি হ'ল কুরুক্ষেত্র ও ধানেশ্বর। মধ্যদেশ জয় করতে আরও দু-তিন শো বছর লাগল। কুরু, শূরসেন, কোশল দেশ। নতুন ক'রে উপনিবেশ গড়ে উঠল ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনাপুর মথুরা প্রাবস্তী কনৌজ অযোধ্যা কৌশাম্বী প্রয়াগ ও কাশীতে।

চতুর্থ অবস্থা ধরা যেতে পারে আট শো থেকে তিন শো খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে। পশ্চিমে সুরাষ্ট্র ও অবস্তী এল হাতে। বিদিশা ও উজ্জয়িনী নতুন আলোকে উজ্জ্বল হ'ল। পূর্বদেশে বিদেহ মগধ অঙ্গ ও বঙ্গ। প্রধান উপনিবেশ হ'ল বৈশালী রাজগৃহ ও চম্পার। তার দক্ষিণে প্রবাহিত দামোদর নদ, মোহনার ওপর তাম্রলিপ্তিতে তখনও অনার্য অধিকার। উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যে স্বাভাবিক বাধার সৃষ্টি ক'রে রইল ভূর্লজ্য বিদ্যা ও সাতপুরা পর্বতশ্রেণী, যা কাইমূর ও মাইকাল পর্বতশ্রেণীর পাহাড় ও বন ভেদ ক'রে ছোটনাগপুর ও রাজমহল পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত।

আৰ্যেরা দক্ষিণ-ভারতে প্রবেশ করলেন তিন পথে। পশ্চিমে পশ্চিমঘাটের পাদদেশ দিয়ে, মধ্যে সাতপুরা যেখানে শেষ হয়েছে সেই দণ্ডকবনের ভেতর নর্মদা পেরিয়ে, আর দামোদরের উৎপত্তিস্থল ডিঙিয়ে মহানদীর মোহনা অভিমুখে। সে আজ খ্রীষ্টের জন্মের এক হাজার বছর আগের ঘটনা।

ড্রাবিড় দেশে করকাই তখন আপন মহিমায় ভাস্বর। পবিত্র তাম্রপর্ণি যেখানে মল্লার উপসাগরে মিলেছে, সেই মোহনার ওপর করকাই অতি প্রাচীন শহর। গ্রীকেরা কি একেই Colchi বলত? গল্পে বলে, দক্ষিণের এই শহর থেকেই দক্ষিণের সভ্যতা ছড়িয়েছে উত্তর দিকে। বিক্ষুব্ধ বঙ্গোপসাগরের ঝড় থেকে একে রক্ষা করেছে রামচন্দ্রের সেতুবন্ধ। লঙ্কার সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা পেয়েছে নিশ্চিন্ত নিরাপদে। সারা পৃথিবীর ঐশ্বর্য ছিল করকাইয়ের সমুদ্রতলে। মুক্তা সে যুগে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, জগতের আদিকালের ইতিহাসে এত মুক্তা এক সঙ্গে কেউ কখনও কোনও দেশে দেখে নি। প্রতীচ্যে এ সংবাদ ছড়াল গ্রীকেরা। মুক্তা বেদিন অলঙ্কাররূপে মানুষের গলায় উঠেছে, করকাইয়ের বাণিজ্যের শুরু সেই দিন থেকে।

এই করকাই পত্তন করেন তিন ভাই, শেষ জীবনে যারা তিনটি রাজ্য স্থাপন করেন। সর্ব দক্ষিণে পাণ্ড্য, তার উত্তর-পূর্বে চোল, আর উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে চের। পাণ্ড্য রাজ্যের রাজধানী হ'ল করকাই। তার পরের যুগে রাজধানী স'রে গেল মাহরায়।

উত্তর-ভারতের আৰ্য ব্রাহ্মণেরা এদেশের এই সব রাজ্য দেখে সন্তোষিত হয়েছেন। এমন স্থানবিশেষ এমন ঐশ্বর্যময়

রাজ্যও থাকতে পারে অনার্ষ দেশে। রাজা কুলশেখ
পরম নিষ্ঠাভরে অগন্ত্যকে আপন সভায় গ্রহণ করলেন।
অগন্ত্য বই লিখলেন তাদেরই ভাষায়—নানা বিজ্ঞান
সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর।

উত্তরে যে আর্ষ-অনার্ষের সংঘাত হয়েছিল, দক্ষিণে তা
হ'ল না। বুদ্ধিতে ও শক্তিতে পরাক্রান্ত আর্ষের আক্রমণে
অনার্ষ তার অস্তিত্ব হারাল। যারা রইল, তারা নেমে গেল
সমাজের নিম্নতম স্তরে। দক্ষিণে যুদ্ধ হ'ল বুদ্ধির অস্ত্র
দিয়ে। অগন্ত্যের মত ব্রাহ্মণ-ঋষির পাণ্ডিত্যের কাছে
নতি স্বীকার না করে যে উপায় নেই।

দক্ষিণে তাই ব্রাহ্মণ-সভ্যতার বিস্তার হ'ল সূর্যোদয়ের
আলোর মত। বৃদ্ধ ছয়ার খুলে সেই জ্যোতির্ময়
আলোকে তারা নিজের ব'লে গ্রহণ করলে। তাদের
ভাষা তাদেরই রইল। শুধু ধর্ম ও চিন্তার বিমূর্ত সংজ্ঞা,
যার পরিভাষা ছিল না নিজেদের ভাষায়, তাই নেওয়া হ'ল
ব্রাহ্মণদের সংস্কৃত থেকে। তাদের প্রাচীন Vattezhath
বর্ণমালাও রইল তাদের। অশোক পছন্দ নতুন বর্ণমালায়
জন্ম তো মাত্র হাজার বছর আগে।

জনসাধারণ সংস্কৃতকে মেখেছিল প্রকার চোখে।
তাদের ভ্রাবিড় নামের সঙ্গে একটা সংস্কৃত শব্দ বহন করে
সে যুগের রাজারাও ধস্ত মনে করতেন নিজেদের। এই
জয়ই তো সত্যিকার জয়। অ্যাটম বোমা ফেলে হিরোশিমা
ধ্বংস করা যায়, জাপান জয় হয় না। অগন্ত্য জয় করে-
ছিলেন দক্ষিণ-ভারত।

করকাই ম'রে গেছে। তাত্রপর্ণির মোহনা ম'রে
গেছে সমুদ্রের দিকে। তারই পলিমাটির নীচে চাপা
পড়েছিল সেদিনের করকাই। সন্ধানীরা আবার আবিষ্কার
করেছেন এই শহরের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান ভূতিকাশিনের
কাছে। সমুদ্রসৈকত থেকে কয়েক মাইল ভিতরে। অগন্ত্য
আজও বেঁচে আছেন আপন মহিমায়। সে মহাপুরুষকে
প্রণাম করি।

মামাবাবু তাঁর টুর প্রোগ্রাম এগিয়ে ধরেছিলেন।
আমি হাত বাড়িয়ে সেখানা নিলাম। স্বাতি বললে, অনেক
কিছু বার পড়ে গেছে।

ক্রান্তকর্মে মামাবাবু বললেন, ফ্যাকড়া আর বাড়াস নে
মা, এতেই সব কাহিল হয়ে যাবে।

আমি বললুম, কলকাতা দেখলেই যদি বাংলা দেশ
দেখা হয় তো এত সব দেখবার পরেও দক্ষিণ-ভারত দেখা
হবে না।

মামী নিজের হুশিয়ার কথা পাড়লেন, বললেন, আমি
ভাবছি তোমার কথা গোপাল। টপ ক'রে এক কাপড়ে
বেরিয়ে পড়লে, এখন তোমার ব্যবস্থা কি করি?

মামাবাবু বললেন, কেন, আমার ধুতি আর পাঞ্জাবি
বার ক'রে দিও। সঙ্গে তো প্রয়োজনের চেয়ে বেশিই
এনেছ।

আমি তাঁর কাঁচি ধুতি আর গরদের পাঞ্জাবি মেলানুম
নিজের খকরের সঙ্গে। স্বাতি আমাদের বগুর তুলনা
ক'রে হো-হো ক'রে হেসে উঠল।

মামাবাবু একটু অপ্রতিভ হয়ে বললেন, না হয় কিনেই
নেওয়া যাবে মাদ্রাজে পৌঁছে। গাড়িতে আর আমার
কাপড়ে চলবে না?

মামী বললেন, তোমার একটা চাদর-বালিশের ব্যবস্থা
সহজেই হয়ে যাবে।

বললুম, তার আর দরকার হবে না মামীমা।

মামী আশ্চর্য হয়ে বললেন, বল কি, এত দূরের পথ,
শোবে না রাতে?

তৃতীয় শ্রেণীর বিলাস তাঁর জানা নেই। অপ্রিয়
উত্তরটা তাই দিলুম না।

মামাবাবু তাঁর ওয়ালেট বার ক'রে বললেন, কিছু টাকা
তোমার সঙ্গে রাখ গোপাল।

বললুম, তার দরকার এখন হবে না মামাবাবু, আমার
সঙ্গেও কিছু পয়সা আছে।

খড়গপুরের আগেই বিছানা পাতা হ'ল। মামী ও
মামাবাবু নীচে শোবেন, স্বাতিকে শুতে হবে ওপরে।
হটকেন্স থেকে একগাদা বই বার করল সে—সমস্তই
দক্ষিণ-ভারতের ইতিবৃত্ত। ট্যুরিস্ট ইন্ফরমেশন ব্যুরোর
প্যাম্ফলেটও দেখলুম খান কয়েক।

নামবার সময় মামী একটা চাদর ও বালিশ এগিয়ে
দিলেন। প্রয়োজন হবে না ব'লে আমি আর তা নিলুম
না। পাশেই একখানা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় শুঁটার সময়
দেখলুম, দরজায় দাঁড়িয়ে স্বাতি আমাকে লক্ষ্য করছে।

খবরের কাগজখানা ফেলে এসেছিলুম তাঁদের গাড়িতে।

সেখানে আনবার জন্তে গিয়ে থমকে দাঁড়ালুম।
মামাবাবু গভীরস্বরে উপদেশ দিচ্ছিলেন মামীকে, বেশি
লাই দিও না এদের; খরচা ক'রে নিয়ে যাচ্ছি, সেই যথেষ্ট।
কিরে আসাই সঙ্গত মনে হ'ল।

৩

বালেশ্বরে স্বাতি টিফিন-কারিয়ারের বাটিতে খাবার
দিয়ে গেল। তারপর একটা বাগিশ আর চাররঙ গছিয়ে
গেল জোর ক'রে। বললে, আপনি কি রাগ ক'রে
ভেতরেই ব'সে থাকবেন গোপালদা?

বললুম, এ জায়গাটুকু হাতছাড়া হ'লে সারারাত
দাঁড়িয়ে যেতে হবে।

স্বাতি বললে, কিন্তু আপনাকে জল দিতে আবার
আসতে হ'লে গাড়ি ছেড়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই।

বললুম, জলের ব্যবস্থা আমি ক'রে নেব। তোমাদের
চাই না তো?

হু দিনের মত কোটানো জল আছে সঙ্গে।

হাসতে হাসতে স্বাতি কিরে গেল।

বাইরে অন্ধকার ঘনিয়েছে অনেকক্ষণ। নির্মল
আকাশে পক্ষ্মীর এক ফালি চাঁদ পশ্চিমের দিকেই হেলেছে
ধানিকটা। পাখুর আলোর মাঠ ঘাট আর আকাশ
একাকার হয়ে গেছে। চলার বিরাম নেই, শব্দেরও শেষ
নেই। একঘেয়ে একটানা ঝিঁঝি-পোকাকার ডাকের মত
নিরবচ্ছিন্ন।

ও-পাশের কোণ থেকে মৈত্র মশায়ের নাক-ডাকার শব্দ
আসছে। ওই জায়গাটুকুর লোভে ভ্রলোক দুপুর থেকে
ধরনা দিয়েছিলেন। পা মুড়ে মুড়ে বাক্সে শুয়েছে যারা,
তারানা কি তাঁরও আগে এসে ইয়ার্ডের ভেতর জায়গা
প্রদল করেছে। ভ্রলোক হুঃধ ক'রে বলছিলেন,
এমন জানলে বড় ছেলেটাকে ভোর বেলাতেই স্টেশনে
পাঠিয়ে দিতুম।

এ যে ফুটবলের লীগ খেলা দেখার মত হ'ল।
কাপড়ের খুঁটে চিড়ে গুড় বেঁধে সাত-সকালে কিউয়ে
দাঁড়ানো!

গভীর মনোনিবেশ ক'রে মৈত্র মশাই কাগজ পড়েছেন।
বিজ্ঞাপনটুকুও বাদ দেন নি। একখানা কাগজ বাড়িয়ে

দিয়ে আমাদের উপদেশ দিতে কার্পণ্য করেন নি—যদি
বাঁচতে চান মশাই, তো চোখের মাথা খেয়ে পড়ুন।
তবেই এই তক্তার ওপর সিঁথে হয়ে ব'সে ঘুমুতে পারবেন।

ভ্রলোকের উপদেশ তখন গ্রহণ করি নি। এখন
তাঁর অভিজ্ঞতার প্রশংসা করছি। কোণায় কাত হয়ে
প'ড়ে অবিশ্রান্ত নাক ডাকাছেন। আর পাশের তেলেঙ্গা
ভ্রলোক কণে কণে চমকে উঠছেন। কেমন যেন ধর্মতম
করছে গাড়ির ভেতরটা।

বেপরোয়া তুলতে গিয়ে আমার পাশের লোকটার মাথা-
ঠুকে গেল পেছনের কাঠের দেওয়ালে। ভূতে ধরার মত
চমকে উঠেই আবার তুলতে লাগল নতুন উত্তমে।

কত রাত হ'ল কে জানে! বড়ি দেখবার ইচ্ছেও
যেন নিবে গেছে। কিন্তু এ লড়াই করাছ কার সঙ্গে?
লড়াই করা যায় সমানে সমানে, মাহুষে মাহুষে, ধরকার
হ'লে বাধে মাহুষে। কিন্তু এ যে অদৃশ্য শত্রু! বাক্সে
দেখতে পাই নে অথচ মানতে বাধ্য হই, সমস্ত জগৎ বাক্সে
মানছে প্রকান্ত ও প্রত্যক্ষ ভারব—এ যে সেই প্রকৃতির
সঙ্গে লড়াই। ঘুমে চোখ দুটো যেন তাদের গর্ভ থেকে
বেরিয়ে আসছে।

ও-ধার থেকে জীনিবাসলু হঠাৎ ভারতের রেল-সংস্থাকে
ভৎসনা শুরু করলেন, ক্লাসলেন্স ট্রাভেল! বড় বড় বক্তৃতা
শোনা গিয়েছিল।

আমি চেয়ে আছি দেখে যেন উৎসাহ পেলেন।
বললেন, ফার্স্ট ক্লাস উঠে হ'ল এয়ার কন্ডিশন। রাজা
উজির কোর্টালের জন্তে আছে বড় বড় বারো চাকার
গাড়ি, তাতে শোবার বসবার নাচবার ঘর—এক-একটি
চলন্ত রাজপুরী। আর আমাদের জন্তে এই থার্ড ক্লাস!

বললুম, এই তো ভারত। এখানেই তার সত্য
পরিচয়। মহাস্বামীও চ'ড়ে গেছেন এই গাড়িতে।

ভ্রলোক রুদ্ধভাবে ব'লে উঠলেন, রেখে দিন আপনার
মহাস্বামীর কথা। তিনি কি এমনি থার্ড ক্লাসে কখনো
চড়েছেন? যাতে চড়তেন, তা তাঁর নিজের ক্লাস।
দেখেছেন কখনও তাঁকে ট্রাভেল করতে?

দেখেছি বলতেই চ'টে গেলেন। বললেন, ছাই
দেখেছেন। থাকত এই মাঝের বেকিটা?

ব'লে সামনের লোক দুটির মাঝখানকার সংকীর্ণ ফাঁক-

টুকুতে একটা লাথি মারলেন। বললেন, যার জন্তে পা ছুখানাও ভাল ক'রে মেলতে পারলুম না উঠে অবধি। আর এই ফাঁক ফাঁক ভক্তার কটকটে বেঞ্চি।

কোনরকমে তাঁর ভারী বপুটি তোলবার চেষ্টা করলেন আসনের আসল রূপটা দেখাবার জন্তে। বললেন, কোমরের ব্যথা ঠেলে উঠছে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত।

ভত্রলোকের বাংলা ভাষায় দখল আছে দেখলুম। বললেন, ছ ইঞ্চি পুরু গদি পাতা হ'ত নারকেলের ছোবড়ার, তার ওপর তুলোর তোষক। জানলাম ঝন্ডস পিচকিরির জল ছিটানো হ'ত ভেতর ও বার থেকে।

এ সব নিন্দুকের কথা, তাই সায় দিতে পারলুম না।

হঠাৎ জানি না কেন, আমার চারটে কুড়ির লোকালের কথা মনে পড়ল। সেই ভিড়, সেই ঠেলাঠেলি ঝুলোঝুলি, তারও মধ্যে একটা উদার আশ্বাস ছিল। গাড়ি চললেই আনন্দ হ'ত—লিলুয়া, বেলুড়, বালি, উত্তরপাড়া। গাড়ি থেকে নেমে দু চোখে ঘোঁয়া দেখতুম খানিকক্ষণ, পা টলত অনেকক্ষণ। কিন্তু কি আরাম! কাল সকাল নটা কুড়ি অবধি কি অবাধ স্বাধীনতা।

গভীর রাত। একটা ছোট অন্ধকার স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। খানিকটা দূরে গাড়ির ভেতর ও বাইরে হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেল প্রবল উত্তম।

এই পটলা, পুঁটলি নামালি তোর? দু দিনের জন্তে যে বোকা এনেছিল হাদারাম, তোকেই আজ গাধা হতে হবে।...কই হে, চিঝা কোথায়?

কোনরকমে ঘাড় বেকিয়ে জানলা দিয়ে মুখ বার ক'রে দেখলুম, একদল ছোকরা নামল এই স্টেশনে। স্টেশনের নাম রস্তা।

ক্রীনিবাসলু আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করতে বললেন, ছেলেরা চিকিৎসা পিকনিক করবে বলে এসেছে। পিকনিক করবারই আয়গা বটে।

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল। বললেন, এইবারে দেখুন।

মৈত্র মশায়ের নাক ডাকা কখন বন্ধ হয়েছিল টের পাই নি। চোখ দুটো রগড়ে নিয়ে বললেন, কোন্ দিকে দেখি বলুন তো?

কোণার যে কাঠখণ্ড এতক্ষণ আরাম দিয়েছে তাঁকে, এইবারে সেইটেই তাঁর দুটি অবরুদ্ধ করেছে।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। দক্ষিণের দিগন্ত যেন হারিয়ে গেছে। অসংখ্য তারার আবছা আলোয় মনে হ'ল, বা দিকের আকাশ এসে রেল-লাইনকে ছুঁয়ে আছে। আকাশে আর জলে কোন পার্থক্য নেই কি? আকাশের তারায় আর জলের ছায়ায়? পার্থক্য বুঝি আমরাই গড়েছি। মাহুবে মাহুবে, দেশে দেশে, ভাষায় ধর্মে, সেকেণ্ড আর থার্ড ক্লাসে। এর গণ্ডি তো খুঁজে পাই নে, কতটা ডিঙলে এর পার পাওয়া যায়? সঙ্কীর্ণতার শেষ আছে তো?

মৈত্র মশায় কিছু বোধ হয় দেখতে পাচ্ছিলেন, বললেন, ওই যে জায়গায় জায়গায় অন্ধকার জড়ো হয়ে আছে, ওগুলো কি পাহাড়?

ক্রীনিবাসলু বললেন, পাহাড় জলের নীচে, আমরা শুধু মাথাগুলোই দেখতে পাচ্ছি। নৌকায় বেড়াবার সময় খুব সাবধানে ওসব এড়িয়ে চলতে হয়, মাঝিদের ব্যাপারেও হ'শিয়ার থাকতে হয়। স্রবিধে পেলো মাধায় বাড়ি দিতে ঘিধা করে না এরা।

চোখ বুজে আমি দেখলুম, সেই ছেলের দল ছোট ছোট নৌকায় হালকা জলের ওপর ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে। কেউবা মাঝিদের কাছে ধার নিয়ে ছোট ছিপ কেলে বসেছে চুপটি ক'রে। মাহ উঠলে সেই মাহ ভেঙ্গে খিচুড়ির সঙ্গে খাবে পাখরের ওপর ব'সে। চারিদিকে জল আর জল। মনে হবে মাধার ওপরের আকাশ নেমে এসেছে পায়ের তলায়, কিংবা পায়ের নীচের জল গিয়ে ছেয়ে কেলেছে ওপরের আকাশটা।

ক্লাস্তিতে কিংবা তৃপ্তিতে দু চোখ বুজে এল। মৈত্র মশায়ের মোটা নাক আবার তৎপর হয়ে উঠেছে। মনে পড়ল ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের উপদেশ। ভাবলুম, গোথুলির ধূসর আলোতে খুরে খুরে ধুলো উড়িয়ে তেড়ার পাল কিরছে ঘরমুখে। সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে পারে—একটার পর একটা, বিরামহীন বিজ্রামহীন।

আঃ, কি আরাম! চোখের জ্বালা যেন ঝিমিয়ে এল। বাইরে থেকে ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে কি গাড়ির ভেতরে!

ধর্ম শ্রীঅমলা দেবী

শেঠজী 'ধর্ম' করছেন। শহরের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী শেঠজী। ধনীও। নানা রকমের কারবার। তেল-ঘিয়ের মন্ত আড়ত। তেলের কল আছে দুটো। এ জেলায় একটা—হুমানজী অয়েল মিল। পাশের জেলায় একটা—গনেশজী অয়েল মিল। "খাটা সরিষার তৈল" প্রস্তুত হয় সেখানে। সরবরাহ হয় সারা জেলায় ও পাশাপাশি জেলায়। যে মহাপ্রাণ ব্যক্তির, বাঙালীর মেহে বেরিবেরি ও ডিসপেনসারি চুকিয়ে দিয়ে তাদের জীবন-যাত্রণাভোগের মেয়াদ দিন দিন কমিয়ে আনছেন, তাঁদের সঙ্গে পাশাপাশি পাড়ার যোগ্যতা হয়তো শেঠজীর নেই, তবে এ দিক দিয়ে তাঁর কৃতিত্ব নেহাত নগণ্য নয়।

তা ছাড়া চামড়ার কারবারও নাকি আছে। তবে গব্য ব্যাপার। স্বনামে নয়, বেনামে। পশ্চিমবঙ্গের একজন মুসলমান কারবারী বঙ্গ-বিচ্ছেদের পর কারবার বিক্রি করে দিয়ে পাকিস্তান চলে গেছে। শেঠজী এ ব্যবসা পত্তন করেন নি, চালু ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন মাত্র। তবু 'অস্ত্রের সঙ্গে 'অ্যাপেন্ডিক্সের মত বুদ্ধির সঙ্গে যে বিবেক জুড়ে দিয়েছেন ভগবান, সেই-ই গোলমাল শুরু করল। পিঁজরাপোলের মাসিক চাঁদার ব্যবস্থা করে তাকে কোন মতে শাস্ত করেছিলেন শেঠজী।

বেশ চলছিল। দু হাতে অর্থার্জন করছিলেন শেঠজী। ফাঁপে ব্যোপে উঠছিলেন দিন দিন। বৎসর খানেক হ'ল সময়টা মন্দ চলছে। প্রতি বৎসর বৎসরের প্রথমেই শেঠজী তাঁদের বাঁধা জ্যোতিষী পণ্ডিতজীকে ডাকিয়ে সারা বৎসরের ফলাফল জেনে নেন। কোন গ্রহের 'দৃষ্টি' সামলাতে হবে, কাকে তুষ্ট করতে হবে—জেনে নিয়ে তদনুসারে ব্যবস্থা করেন। এ বৎসরও তাই করেছিলেন। পণ্ডিতজী বলেছিলেন, রাহু ও শনি দুই-ই বিরূপ হয়ে উঠেছে। এ বৎসর সাবধানে থাকবেন। শুধু এ বৎসর নয়—পর বৎসরও। ভবিষ্যদ্বাণী হাতে হাতে ফলল। বৎসর শুরু না হতেই তাঁর হিসেবনবিস অস্থে পড়ল। লোকটি তাঁর দেশের লোক। হিসাবনিকাশে খুবই পাকা। 'ইংরেজ আমলেও তাঁর হিসাবের খাতায় কেউ কোন গলম ধরতে পারে নি। লোকটি দু মাসের দুটি

নিম্নে দেশে যেতে চাইল। অনেক দিন দেশে যায় নি সে। শেঠজী বাধা দিতে পারেন নি। দেশে গিয়ে লোকটির অস্থখ আরও বেড়ে উঠল। বৎসর খানেকের ছুটি বা চাকুরি ত্যাগ—এই মর্মে চিঠি দিল। শেঠজী তাকে বৎসর খানেক ছুটি দিয়ে নতুন লোক রেখে কাজ চালাতে লাগলেন। এমন অবস্থায় ইনকাম-ট্যাক্স আপিসের সাহেব হিসেবের খাতা তলব করলেন। নতুন লোকটিকে নিয়ে নিজে আপিসে হাজির হলেন। সামলানো গেল না। গলম ধরা পড়ল। দু লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হ'ল। শুধু তাই নয়, সাবধানে না চললে আরও বিপদ হবে—সতর্কবাণী শুনিতে দিলেন সাহেব।

সেই থেকে ভয় হয়ে গেছে শেঠজীর। এর চেয়ে আরও বেশি বিপদ কি হবে, কে জানে! পণ্ডিতজীকে ডাকিয়ে গ্রহচুড়ির ব্যবস্থা করালেন। মন খুঁতখুঁত করতে লাগল তবু। বিবেক বললে, 'ধর্ম' কর। শুধু অর্থ নয়, ধর্মও চাই। মদের সঙ্গে সোডার মত অর্থের সঙ্গে ধর্ম না মেশালে মন্দ হয় না। শেঠজী ভাবতে শুরু করলেন। কি 'ধর্ম' করবেন?—কাছাকাছি গঙ্গা থাকলে দিন দু বেলা ডুবে এসে পাপ তাপ ধুয়ে মুছে আসতেন। তার উপায় নেই। শহরের কাছে একটা নদী আছে। তাতে জল নেই—শুধু বালি। একটা বাজে নদীর বালি মেখে তো পাপ সাফ হয় না। ধর্মশালা মন্দির-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি তো এলাহী ব্যাপার। বড়বাজারী ব্যবসাদারদেরই পোষায়। তাঁর অবস্থায় কুলোবে না। অনেক ভেবে একটা উপায় ঠাওরালেন—'জীবে দয়া'। জীবে দয়ার মত ধর্ম আর কি আছে? অথচ খরচ কম। তাই শুরু করবেন স্থির করলেন। সপ্তাহে ছয় দিন অর্থ, একদিন 'ধর্ম'। এই এখন চলুক। প্রয়োজন হ'লে ডোজ বাড়িয়ে দেবেন।

সেই থেকে শেঠজী ধর্ম করছেন রুটিন মাসিক।

শহরের লাগাও একটা বাগান। বৎসর কয়েক আগে একজন বাঙালী ভ্রমলোকের কাছ থেকে শেঠজী কিনেছেন। বেশ বড় বাগান। চার দিকে কাঁটাভারের বেড়া। শেঠজীই দিয়েছেন। বাগানে নানা ফলের গাছ। মাঝখানে ছোট পুকুর। শেঠজী ঘাট বাঁধিয়েছেন। মাছ ছেড়েছেন

বিস্তর। ছোট বড়-মাছ কিলবিল করছে পুকুরে। শহরের মৎস্যশিকারী বাঙালীরা বাগানের আশেপাশে ছোক ছোক করে বেড়ায়। ঢোকবার উপায় নেই। কড়া পাহারার ব্যবস্থা। একজন গুর্খা সপরিবারে বাগানের এক পাশে বাস করে। দিনরাত পাহারা দেয়। বাগানের এক দিকে বাংলা-প্যাটার্নের বাড়ি। শেঠজী সম্প্রতি তৈরি করিয়েছেন। সপ্তাহে একদিন এখানে এসে সারাদিন কাটিয়ে যান। 'ধর্ম' করেন। সকালে পিপীলিকা-ভোজন। বেড়ার ধারে ধারে অজস্র পিপড়ের গর্ত। পিপড়াদের চিনি বিতরণ করেন। বৈকালে মৎস্য-ভোজন। বাঁধানো ঘাটে ব'সে ময়দার গুলি বিতরণ করেন মৎস্যদের।

পিপীলিকা-ভোজন চলছে এখন। শেঠজী বাগানের এক পাশের বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। দশাশই চেহারা। পেটের নীচে ভুঁড়ি—গলার নীচে থাক। পরনে লম্বা ধুতি, লম্বা কোট। মাথার পাগড়ি। পায়ে পাম্প-শু। হাতে শৌখিন ছড়ি। গোঁফ-দাড়ি পরিষ্কার করে কামানো। মাংসল মৎস্য মুখখানি, ঘামে নয়—খুব সম্ভব ধর্মান্বেষণজনিত আধ্যাত্মিক প্রভাব চক্চক্ করছে।

কাছেই একটা চিনি-ভর্তি বস্তা থেকে পিপড়ের গর্তে চিনি দিচ্ছে একটা লোক। শেঠজী স্ত্রেনদৃষ্টিতে চিনি বিতরণ দেখছেন। যেন কোন গর্ত বাদ না যায়। ছড়ি দিয়ে গর্ত দেখিয়ে দিচ্ছেন। নতুন গর্তের সন্ধান দিচ্ছেন। লোকটা পরিমাণে কম দিলে পরিমাণ বাড়িয়ে দেবার জন্ত হুকুম করছেন। একেবারে পক্ষপাতহীন নিখুঁত 'জীবে দয়া'। রাহ ও শনি এবং তাদের চেয়ে সাংঘাতিক ইনকাম-ট্যাক্স সাহেবের খরদৃষ্টি ক্রমেই কোমল হয়ে উঠছে ভেবে আশ্বপ্রসাদ অহুভব করছেন শেঠজী।

দুই

শেঠজীর বাগানের পাশ দিয়ে একটা পায়ে চলা পথ কতকটা প'ড়ো জমির উপর দিয়ে গিয়ে মাঠে নেমেছে। মাঠ পার হয়ে গিয়ে ও-পারে একটা গায়ে গিয়ে উঠেছে। নেহাত ছোট গা। কুড়িটার বেশি ঘর নেই। মাটির ছোট ছোট কুড়ঘর। ভাঙা ফাটা দেওয়াল। চালে খড় নেই কোনটারই। বাসিন্দারা সব জাতে বাউরী। পুরুষ ও মেয়েরা সব শহরের কলকারখানায়, বাড়ি-

তৈরির কাজ করে। পুরুষদের রোজগার মনের ভাটিতে মদে ও চাটেই চ'লে যায়; মেয়েদের রোজগারেই সংসার চলে সাধারণত। চিরকাল এই ভাবেই চ'লে এসেছে।

পাড়ার এক পাশে একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বাউরী মেয়ে বিলাসী। বয়স একুশ-বাইশ। বোগা ডিগড়িগে চেহারা। গায়ে খড়ি উড়ছে। মাথায় উকখুচ চুল। পরনে জীর্ণ মলিন শাড়ি। কোন রকমে আবস্ত বস্ত্র রেখেছে। পেটটা ধামার মত। অন্তঃসত্তা। কোলা কোলা মুখ। আসন্ন প্রসবা। চিন্তাকুল মুখে সামনে মাঠের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বিলাসীকে যারা দু মাস আগে দেখেছে, তারাও এখন ওকে দেখে চিনতে পারবে না। গায়ে নামডাক ছিল ওর রূপের, ওর দেহসৌষ্ঠবের, ওর ঠসকের, ওর ঠমকের। অনেক ভদ্রলোকের ছেলেরাও ওকে দেখে তেতে উঠত, মেতে উঠত। ওর আশেপাশে ঘুরঘুর করত পোষা কুকুরের মত। বিয়ে হয়েছিল ছেলেবেলায়। স্বামীর ঘর করে নি কোনদিনও। কাজ করত শহরে। কামিনের কাজ। রাজমিস্ত্রীদের হাতে হাতে মসলার বোগান দিত। মিস্ত্রীদের কাছে কাছে থাকত। ওদের সঙ্গে ঠাট্টা-মস্তুরা করত। রঙ্গে রসে গ'লে পড়ত, ঢ'লে পড়ত। পান-দোকান রসে বাঙানো ঠোটে হানির ঝিলিক খেলিয়ে মিস্ত্রীদের, এমন কি মনিবদেরও মন টলিয়ে দিত। বয়স্কা রূপহীনা কামিনরা হিংসায় পুড়তে পুড়তে ইট বইত, জল বইত আর ওর মুণ্ডপাত করত।

বেশ চলছিল দিন। দিনে রাজে রোজগার। নিজের একটি মনের মত করে ঘর তুলল। আসবাব-পত্র বাসন-কোসন করল। ভাইদের সংসার ছেড়ে বুড়ী মাকে নিয়ে নিজের ঘরে বাস করতে লাগল। হঠাৎ ওর মনে আগুন ধরল। কপালেও। ভালবাসল বিলাসী। শহরের একটা বাড়িতে কাজ করছিল। একজন বিদেশী মিস্ত্রী কাজ করছিল ওদের সঙ্গে। দেখতে সুনতে ভদ্র-লোকের ছেলেদের মত। কথাবার্তায়, হাবভাবেও। মদ খেত না, এমন কি বিড়িও না। পাঠশালায় প'ড়েও ছিল নাকি। বয়স বিলাসীর চেয়ে এমন কিছু বেশি নয়। জ্ঞাতিতে বাউরী নয়। অজ্ঞাত। বিলাসী ভালবাসল তাকে। হাবে-ভাবে হানি-চাউনিতে

ভালবাসা জানাল। মিস্ত্রীও নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকল না। ধরা দিল বিলাসীর জ্বালে—জড়িয়ে পড়ল আঠেপুঠে। স্বেচ্ছায় ও মানন্দে।

মিস্ত্রীকে নিয়ে সংসার করতে লাগল বিলাসী।

এক বৎসর বড় আনন্দে কাটল বিলাসীর। তারপর হঠাৎ মিস্ত্রী অসুখে পড়ল। বিলাসী ডাক্তার দেখাল। চিকিৎসা করাল। কিছুই হ'ল না। বিলাসীর মা বললে, ডাক্তারিতে কিছুই হবেক নাই। কবরেজি করাতে হবেক। ওষুধ করেছে উম্মাকে। বিশ্বাস হ'ল বিলাসীর। 'ওষুধ' করবার লোকের অভাব নেই গাঁয়ে। পাড়ার মেয়েরা তো ওর হিংসায় জ'লে পুড়ে মরছে দিন-রাত। ওদের জ্বালের কবরেজি ডেকে 'ওষুধ' তোলাল বিলাসী। চিকিৎসাও করাল। রোগ সারল না কিছুতেই, বরং দিন দিন বাড়তে লাগল। মিস্ত্রীর রোজগার বন্ধ। নিজে অন্তঃসত্ত্বা। তাতেও যতদিন পারল কাজ করল। মাস দুই হ'ল তাও বন্ধ হয়েছে। গতক দেখে ওর মা ম'রে পড়েছে। বিলাসী একেবারে একা প'ড়ে গেছে। দুজনের রোজগার থেকে কিছু কিছু সরিয়ে রেখে কিছু পুঁজি করেছিল। তাই ভেঙে ভেঙে কোন রকমে ফেন-ভাত চলেছে কিছুদিন। তারপর বাসন-কোসন বাধা দিয়ে, আসবাবপত্র বিক্রি ক'রে বাকি দিনগুলি চালিয়েছে। এখন প্রায় তাও ফুরিয়ে এসেছে। শুধু ভাত-খাবার খালাটি বাকি। এর পর কি ক'রে চলবে?

এদিকে মিস্ত্রীর অবস্থাও দিন দিন খারাপ হয়ে আসছে। আজকাল বিছানা থেকে উঠতে পারে না। সবাই বলছে, আর বেশি দিন বাঁচবে না। সেও তাই বুঝতে পেরেছে। তার নিজেরও দিন এগিয়ে এসেছে। দু-এক দিনের মধ্যে এসে ঠেকেছে বোধ হয়। তার যা শরীরের অবস্থা, সেও এ যাত্রা উঠতে পারবে কি না কে জানে!

সকালে একটু ভাতের ফেন খেতে দেয় মিস্ত্রীকে। আজ খেতে চাইল না। বললে, ও আর খেতে পারছি না।

কি খাবে তা হ'লে?—জিজ্ঞাসা করেছিল বিলাসী।

একটু চা খেতে ইচ্ছে করছে। অনেক দিন থাই নাই।

বাড়িতে চা-চিনি নেই। শহরে গিয়ে কিনে আনতে হবে। হাতে একটা পয়সাও নেই। কি করবে সে? আর কিছু নয়, একটু চা শুধু—তাও খেতে দিতে পারবে

না ওকে? যদি খেতে দিতে না পারে—আর দু দিন পরে ও ম'রে যায়, সারাজীবন ক্ষোভের সীমা থাকবে না বিলাসীর।

মাঠের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এই সব কথা ভাবছিল বিলাসী। শেষে স্থির করলে, ভাত-খাবার খালাটি নিয়ে গিয়ে দোকানীর কাছে বাধা দিয়ে চা-চিনি ও কিছু চাল কিনে নিয়ে আসবে। কিন্তু এতখানি রাস্তা সে হাঁটতে পারবে কি? সকাল থেকে বড়ই দুর্বল মনে হচ্ছে ওর। তা ছাড়া এই অবস্থায় এমনই একখানা শাড়ি প'রে শহরে যাওয়া যাবে কি? লজ্জা-সঙ্কোচ মনকে জড়িয়ে ধরতে লাগল বিলাসীর। স্বামীর কথা ভেবে লজ্জা-সঙ্কোচ সবলে ঝেড়ে ফেলল। খালাটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল এবং মাঠে নেমে ধীরে ধীরে শহরের দিকে চলতে লাগল।

শেঠজীর বাগানের কাছে এসেই থমকে দাঁড়াল বিলাসী। শেঠজীর বাড়িতে কাজ করেছিল একবার। কাছে এসে ব্যাপারটা দেখল। চিনি ছড়াচ্ছে। এত চিনি ছড়িয়ে দিচ্ছে! তাকে একটু দেবে না চাইলে! চাইবে না কি! সাহস হ'ল না প্রথমে। আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মনে মনে সাহস সঞ্চয় করতে লাগল বিলাসী।

হঠাৎ বিলাসী প্রার্থনা-ব্যাকুল স্বরে লোকটার উদ্দেশে ব'লে উঠল, বাবু! ও বাবু! কোন সাড়া মিলল না। কণ্ঠস্বর আরও উঁচু ক'রে বললে বিলাসী, ও বাবু! শুনছ?

লোকটা মুখ তুলে তাকিয়ে জুঁকুচে বললে, ক্যা?

বিলাসী সাহসনয়ে বললে, একটু চিনি ছান বাবু!—সোয়ামীর অসুখ করেছে। চা খেতে চাইছে—

লোকটা কড়া-চোখে তাকিয়ে চড়া গলায় ব'লে উঠল, নেহি মিলে গা, যাও—

বিলাসী বললে, দুটি ছান বাবু।

লোকটা ধমকে উঠল, ঝামেলা মাত্ কর, যাও—

বিলাসী শেঠজীর উদ্দেশে কক্ষণ কণ্ঠে বললে, শেঠজী, একটু হুকুম ক'রে ছান, ও শেঠজী!

ধর্মকার্যে বাধা! আধ্যাত্মিক ক্রোধ এতক্ষণ জ'মে উঠছিল। হঠাৎ বিস্ফোরণ হ'ল। বজ্র-গর্জনে হৈকে উঠলেন শেঠজী, ভাগো! ছড়ি উচিয়ে বললেন, ভাগো হিংসাসে।

চমকে উঠল বিলাসী। বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। চোখে জল এল। আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে শহরের দিকে চলল।

শুদ্ধিমান

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

এবার তোমার অন্তর হতে মুছে দাও মুছে দাও
সারা জীবনের যত অপমান মানি,
অশ্রুদাগরে সিনান করিয়া শুদ্ধিময় নাও,
অসহ দুঃখ নিরাকরণ ব্যথা হাসিমুখে নাও মানি।

সময় হয়েছে বিদায় নেবার সে কথা যেও না ভুলে
ওপারের তরী এপারে লাগিছে আসি,
যে আসে আহুক, রেখে দাও তব হৃদয়-দুয়ার খুলে
এ অপরাহ্নে বিবর্ণ মুখে ফুটাও শুভ হাসি।

আশা-প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়েছে, নিষ্ঠুর অপমানে
বিদূর্ণ হিয়া ব্যথায় শুমরি মরে,
যন্ত্রণা জলে মর্মে তোমার, এ দেহের অবসানে
কিছু রহিবে না, এই সান্ত্বনা অন্তরে রাখ ধরে।

ক্ষণভঙ্গুর জীবনের মায়া শূন্যল-বন্ধনে
বঁধে রেখেছিল, আজ খুলে দাও জটিল গ্রন্থি তার,
আপনারে আর ছোট ক'রো নাকো অসহায় ক্রন্দনে,
দেখ চেয়ে দেখ উদার আকাশে মহান অঙ্গীকার।
মহাজীবনের রূপময় বাণী আলোকে পুলকে ভরা
অনাহত হরে সঙ্গীতময়ী সেখায় বহুধরা।

পুনর্ভবা

গোপাল ভৌমিক

ভুলে ছিলাম ভালই ছিল,
ছিল সেটা না জানারই মত;
কিন্তু হঠাৎ মনে পড়া
সেটা যেন বিশ্বস্ত-প্রায় ক্ষত
খুঁচিয়ে তুলে রক্ত-দগে ঘা করা
যেমন করে পথের ভিখারীরা
পথচারীর রূপাদৃষ্টির লোভে,
পরিস্রবিত স্থণায় জলে শিরা-উপশিরা।

আমারও আজ তেমনি হ'ল ক্ষতি
হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ে :
ভেবেছিলাম ভালই আছ
বিশ্বস্তির অতল গহ্বরে
ঐতিহাসিক গবেষণার
বিষয়বস্তু হয়ে।

নিশ্চিন্ত ছিলাম আমি
ছিলাম অসংশয়ে
ভবিষ্যতে আর কোনদিন
তোমার সাথে আমার
দেখা হবার সম্ভাবনা
স্বপ্ন বুধে যাবার।

অঘটনই ঘটল শেষে,
নয়কো কিন্তু ট্রাম বা রেক্টোরায়;
কে জানত দেখব তোমায়
অন্ধকারে রূপালী পর্দায় ?
প্রথম চমক কাটল যদি
শুরু হ'ল ব্যথার টনটনানি—
পুরনো ঘা নতুন হ'ল,
স্থণা-করণ হ'ল হৃদয়ধানি।

এই গ্রন্থের কলন

দীপক চৌধুরী

॥ তৃতীয় স্কন্ধ ॥

আজ তিন দিন হ'ল কার্শিয়ংয়ে এসেছি। একদিনের
জন্তু ডাক্তার ডাকবার দরকার হয় নি। নিশীথ
তো প্রতি মুহূর্তে দরজায় পা বাড়িয়ে থাকে ছুটে গিয়ে
একজন ডাক্তার ডেকে আনবার জন্তে। সে এরই মধ্যে
এখানকার সবচেয়ে বড় ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়
ক'রে এসেছে। স্টেশনের কাছাকাছি কোন এক রাস্তার
পাশেই ডাক্তার প্রধানের বাড়ি। আমার যে কি ধরনের
অস্থখ, তার একটা বিস্তৃত ইতিহাস সে ডাক্তার প্রধানের
কাছে পেশ ক'রে এসেছে। রোগের বিবরণ শোনবার
পরে তিনি নাকি আমাকে দেখবার জন্তে বড় বেশি
ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। ভিজিট ছাড়াই তিনি আমাকে
একবারটি কেবল চোখে দেখে যাবার জন্তে আমার
অহুমতি চেয়ে পাঠিয়েছেন। তাঁর ধারণা, চিকিৎসা-
বিজ্ঞানকে উপহাস করবার জন্তে নাকি আমি এখনও
বৈচে আছি। ডাক্তার প্রধানের কথাগুলো নিশীথের
ভাল লাগে নি। চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা
করবার সময় এ নয়। নিশীথ তাঁকে ব'লে এসেছে যে,
প্রয়োজনের মুহূর্তে খবর পেলে যেন তিনি চ'লে আসতে
বিলম্ব না করেন। ঘরের সামনেই নিশীথ পায়চারি
করছিল। আমি শুকে ডেকে বললুম, ইয়া রে, ডাক্তার
ডাকবার জন্তে তুই এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস কেন? তেমন
দরকার বুঝলে, কলকাতা থেকে ডাক্তার সেনকে ডেকে
নিয়ে আসব।

সে তো অনেক দূরের পথ। ঘরের কাছে একজন
বড় ডাক্তার থাকা ভাল দ্বিধামণি।—বললে নিশীথ।

কিন্তু এখানে এসে এ কদিনের মধ্যেই আমার স্বাস্থ্য
অনেক ভাল হয়েছে। ভাবছি, কাল সকালে হাঁটতে
হাঁটতে দার্জিলিং চ'লে যাব।

কি বললে?—অবাক হয়ে নিশীথ আমার মুখের দিকে
এমনভাবে চেয়ে রইল যে, আমি একটা উত্তর না দিয়ে
পারলুম না। বললুম, আমার ফুসফুসের ফুটোগুলো সব

বুজে গেছে। লিভারটা একদম প'চে গ'লে নষ্ট হয়ে
গিয়েছিল ব'লেই তো এই তিন দিনের মধ্যে আমার একটা
নতুন লিভার গজিয়েছে। আমার সারাদেহে শক্তির তুফান
উঠেছে নিশীথ।

এ কেমন ক'রে হ'ল দ্বিধামণি? কলকাতায় কেন
এমন ওষুধের সন্ধান পাও নি?

সেই তো আমার মস্তবড় দুঃখ নিশীথ। যে সত্যি
সত্যি ঘুমোয় তাকে ধাক্কা মেরে তুলে দেওয়া যায়, কিন্তু
যে জেগে জেগে ঘুমোয় তার ঘুম কেউ ভাঙাতে পারে না।
কলকাতার লোক প্রেসের ফ্ল্যাটে আমার হাতের কাছে
ওষুধ ছিল প'ড়ে, অথচ আমি দেখতে পাই নি। বোধ হয়
আমি ইচ্ছে ক'রেই দেখতে চাই নি।

আমার কথা শুনে নিশীথ একটু হাসল। তারপর
হাসতে হাসতেই সে বললে, তুমি বড় ছেলেমানুষ
দ্বিধামণি। দশ বছর হয়ে গেল তোমার কাছে কাজ করছি,
কিন্তু এই দশ বছরের মধ্যে তোমার বয়স বাড়ল না।

আমার কি মনে হয় জানিস? মনে হয়, আজও সেই
দশ বছর বয়সের ছোট্ট মেয়েটি, কেটনগরের জঙ্গলে
ভবতোষের হাত ধ'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

ভবতোষবাবুয়াও বুঝি কেটনগরে থাকতেন?—
জিজ্ঞাসা করল নিশীথ।

ই্যা। বাড়ি আমাদের ছিল পাশাপাশি।...নিশীথ
বাইরের দরজায় কে যেন কড়া নাড়ছে! ডাক্তার
প্রধানকে তুই আসতে বলেছিস নাকি?

কই, না তো।

তবে এই সন্ধ্যাবেলা কড়া নাড়ছে কে?

কি জানি, ডাক্তার প্রধান হয়তো তোমার সঙ্গে
আলাপ করতে এসেছেন। এলেনই বা, ক্ষতি কি!
ডেকে নিয়ে আসব দ্বিধামণি?

কার্শিয়ং স্টেশনের কাছ থেকে এতটা পথ যখন
তিনি এসেই পড়েছেন, তখন তাঁকে ফিরিয়ে দিই কি
ক'রে? ডেকে আন।

একটু বাদে নিশীথ একাই ফিরে এল। এসে বললে, একজন পাত্রী সাহেব তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন, ডাক্তার সাহেব আসেন নি।

বিছানায় উঠে বসলুম আমি। কই, কোন পাত্রী-সাহেবকে তো আমি চিনি না—শোবার ঘরে ডেকে পাঠাই কি করে? আমি একটু ভাবছি দেখে নিশীথ বললে, এ অঞ্চলের সবাই পাত্রী সাহেবকে চেনে। আর ভালবাসেও খুব। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় তাঁর জ্ঞান আছে। ও-পাশের ওই ছোট্ট গীর্জাটার কাছে তিনি থাকেন। সাহেব খুব ভাল বাংলা বলেন দিদিমণি।

আচ্ছা, শোবার ঘরেই ডেকে নিয়ে আয়।

তাতে কোন দোষ নেই, সাহেবকে আমি বলেছি

তুমি অসুস্থ।—একটু হেসে নিশীথই আবার বললে, সাহেবের হাতে কিন্তু ওষুধের বাক্স দেখলুম না।

নিশীথ চ'লে যাবার পরে আমি লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়লুম। ঘরটা বড্ড এলোমেলো হয়েছিল। গোছাবার সময় গেলুম না। টপয়ের ওপরে ত্র্যাণ্ডির বোতলটা যেমন ছিল তেমনই রইল। ভাবলুম, হাত বাড়িয়ে বোতলটা টেনে নিই, লুকিয়ে রাখি লেপের তলায়। একজন বিদেশী ধর্ম-বাক্কের সামনে নিষ্পেক্ষে এমনভাবে প্রকাশ করা বোধ হয় উচিত হবে না। নিশীথ এতক্ষণে হয়তো তাঁকে আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই ব'লে দিয়েছে। আমি যে কলকাতায় একজন অধ্যাপিকা ছিলাম, সে খবরটা পাত্রী সাহেবের নিশ্চয়ই জানা হয়ে গেছে। নিশীথের সবচেয়ে বড় গর্ব যে, সে একজন শিক্ষিতা মহিলার কাছে কাজ করে। নিজের নিরক্ষরতার মানি হয়তো তাতে ওর অনেকটা কেটে যায়।

ঘরে ঢুকেই পাত্রী সাহেব কপালের কাছে হাত তুলে বাংলায় বললেন, নমস্কার।

আমিও তাঁকে প্রতিনমস্কার জানিয়ে বললাম, বসুন।

বিছানায় পাশেই চেয়ার ছিল। তিনি বসলেন সেখানে।

ঘরের চারিদিকটা চকিতের মধ্যে দেখে নিলেন একবার।

ত্র্যাণ্ডির বোতলের ওপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল না এক সেকেন্ডের জন্তে। বইয়ের শেলফ'টার দিকে পাত্রী সাহেব চেয়ে রইলেন মিনিট দুই। মনে হ'ল, দু-চারখানা বই তাঁর পরিচিত। সাধারণ পরিচয়ের বই নয়, গভীর আত্মীয়তার সম্বন্ধ আছে ব'লেই আমার বিশ্বাস হ'ল। আমি বুঝতে

পারলুম, চোখে মুখে তাঁর গভীর আনন্দের চিহ্ন ফুটে বেরিয়েছে। কিন্তু বই সম্বন্ধে কোন কথা না ব'লে পাত্রী সাহেব বললেন, আজ দু দিন থেকে ভাবছি আপনার কাছে এসে খবর নিয়ে যাই। আমি আপনার খুব নিকটেই থাকি। একটু থেমে পাত্রী সাহেব কি যেন ভাবতে লাগলেন। আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। স্বর্গ ব'লে কোন বিশেষ স্থান আছে কি নেই, আমি তা জানি না। কিন্তু পাত্রী সাহেবের মুখখানা যেন স্বর্গের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এঁরা ভগবান ও মান্নুষের সেবা করবার জন্তে জীবন উৎসর্গ করেন, সংসার করেন না। যদি করতেন, তা হ'লে বোধ হয় মান্নুষ জাতির স্বাস্থ্যোন্নতি হ'ত অনিবার্হভাবে।

চেয়ারে ব'সে পাত্রী সাহেব তাঁর ক্যসকের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কি যেন খুঁজছিলেন ব'লে মনে হ'ল আমার। জিজ্ঞাসা করলুম, কিছু হারিয়ে গেল না কি? আপনাদের কাছ থেকে তো সহজে কিছু হারায় না।

কি রকম?—এই ব'লে পাত্রী সাহেব এমন ভাবে হাসলেন যেন মনে হ'ল, তাঁর মত এতবড় ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমার দ্বিতীয় আর কেউ নেই।

বললুম, কোটি কোটি হারানো আত্মা আপনারা উদ্ধার করেন, যারা হতভাগ্য, যারা অশুচি, যারা নির্ধাত্ত, যারা হারিয়ে যায়, তাদের আপনারা—

কথাটা আমায় শেষ করতে দিলেন না পাত্রী সাহেব। তিনি ব'লে উঠলেন, এই তো পেয়েছি।

কি পেয়েছেন?

চিঠি।—এই ব'লে তিনি সত্যি সত্যি আমার হাতে একখানা খাম দিলেন। দেখলুম, খামের ওপর লেখা রয়েছে পাত্রী সাহেবের নাম-ঠিকানা। হাতের লেখাটা আমার খুবই চেনা। খামের মধ্যে থেকে চিঠিখানা বার করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় তিনি বললেন, আমি ফরাসী দেশের লোক। কিন্তু সবাই ইংরেজী উচ্চারণ করেন। তাই আমায় এঁরা ডাকেন ফাদার হেনরী ব'লে।

ফাদার হেনরী যখন কথা বলছিলেন, তখন চিঠিখানা আমার পড়া শেষ হয়ে গেছে।

সন্ধ্যা হয়ে এল। দক্ষিণ দিকের কাচের জানলাগুলো সব খোলা ছিল। আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেখতে

লাগলুম, সেন্ট মেরী পাহাড়টায় অন্ধকার নেমে এসেছে। গীর্জার চূড়াটা আর এখান থেকে দেখা যায় না। দিনের বেলায় খণ্ড খণ্ড মেঘ চূড়াটাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চারদিকে ছুটোছুটি করে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি চেয়ে থাকি সেই দিকে। মুহূর্তের জন্তো আমার শ্রান্তি আসে না। আসে না একঘেষেমির বিরক্তি। মনে হয়, খণ্ড খণ্ড ওই মেঘগুলোর সঙ্গে আমার ঘন কোথায় একটা অদ্ভুত মিল রয়েছে। ওদের মত আমিও সারাটা জীবন স্বাধীন-সত্তা নিয়ে ভেসে বেড়িয়েছি সমাজ-আকাশে। কিন্তু ওদের মত কোন কিছু ছুঁতে পারি নি আমি। যে-চূড়াটা সর্বোচ্চ সত্য তার শিরে বহন করে আজ আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তার দৃষ্টি আমার 'এ জীবনে আর বোধ হয় ঘুচবে না।

ফাদার হেনরী বললেন, এত বেশি ঠাণ্ডা আপনার পক্ষে ভাল হবে না। জানলাগুলো বন্ধ করে দিই।

তিনি উঠলেন। আমি বললুম, না না, আপনি কেন কষ্ট করবেন, নিশীথ এফুনি এসে যাবে। আমার আপত্তি তিনি শুনলেন না। আমি ভাবলুম, জানলা বন্ধ করতে গিয়ে তিনি নিশ্চয়ই টাপয়ের ওপর একবার অসম্ভব দৃষ্টি ফেলবেন এবং ত্র্যাণ্ডির বোতল ও গেলাসের মধ্যে যে একটা নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে তাও তিনি লক্ষ্য করবেন। আমি তাঁর কঠিন সমালোচনার ভাষা শোনবার জন্তো প্রস্তুত হয়ে রইলাম। জানলাগুলো তিনি বন্ধ করে দিলেন বটে, কিন্তু নিষিদ্ধ এলাকার দিকে তিনি ভুল করেও চাইলেন না একবার। বইয়ের শেল্ফের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। আমি যে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপিকা ছিলাম, সে সম্বন্ধে তাঁর আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না।

শেল্ফের কাছ থেকে ফিরে এসে ফাদার হেনরী বললেন, আমার স্বদেশের অনেক লেখকই দেখছি আপনার শেল্ফে রয়েছে। দু-চারজন ধর্মযাজকের লেখা বইও আছে দেখলুম। ফরাসী লেখকদের প্রতি আপনার পক্ষপাতিত্ব যে-কোন লোকের চোখেই ধরা পড়বে।

আমি বললুম, আমার জীবনদর্শন আমি ফরাসী দেশেই খুঁজে পেয়েছি।

কর কাছে পেলেন? জঁ পল সার্তর? Existentialism? শেল্ফে আপনার দেখলুম তাঁর প্রসিদ্ধ বই-

খানাও আছে, L'etre et le néant।—এবার ফাদার হেনরী বেশ একটু জোরে জোরেই হাসতে লাগলেন। নিশীথ এই সময় চা নিয়ে এল। ফাদার হেনরীর সামনে একটা টাপয়ের ওপর ট্রে-টা সাজিয়ে দিয়ে সে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি দেখলুম, নিশীথ এইটুকু সময়ের মধ্যে সাহেবের জন্তে দুখানা কাটলেট ভেজে এনেছে। সাহেবটিকে যে ওর খুবই পছন্দ হয়েছে, সে সম্বন্ধে আমার আর সন্দেহ রইল না।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে ফাদার হেনরী বললেন, প্রথম পরিচয়েই আমার জন্তো আপনার বেশ কিছু খরচ হয়ে গেল।

পুণ্যবানদের জন্তে খরচ করবার সুযোগই বা কখন পায়!

এমন করে আমায় লোভ দেখাবেন না, রোজ এসে তা হ'লে এখানে হাজির হব।—ফাদার হেনরী প্রথম কাটলেটটির শেষটুকু মুখের মধ্যে ভরে দিয়ে বললেন, চিঠিখানা আজই আমি পেয়েছি। কিন্তু পরশুদিন যখন প্রথম এসে উঠলেন, তখনই ভেবেছিলুম, এসে খবর নিয়ে যাই। এমন জায়গায় বাড়ি কিনলেন যে, আমরা ছাড়া আপনার আর দ্বিতীয় কোন প্রতিবেশী নেই।

বাড়িটা কেনবার সময় কেবল এই কথাটাই বিবেচনা করেছিলাম।

কোন কথাটা?—জিজ্ঞাসা করলেন ফাদার হেনরী।

প্রতিবেশী কেউ থাকলে আমি বাড়ি কিনতাম না। চ'লে যেতাম কাকনজ্জবার কোন নিকটবর্তী স্থানে। আপনাদের অবশিষ্ট আমি প্রতিবেশী বলে বিবেচনা করি না।

ধারা Existentialist, অর্থাৎ 'নিছক অস্তিত্ব'-এর বাইরে ধারা দ্বিতীয় কোন সত্যের সম্ভাবনা পান না, তাঁরা কেউ মানুষকে মানুষই মনে করেন না। কিন্তু ভগবানের কি অশেষ করুণা যে, তা সত্ত্বেও তিনি আমাদের মানুষ করে রেখেছেন।

কর করুণা আমি জানি না, কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মানুষ যা করতে চায় তা সে করে না। অথচ মানুষ যা করে তার জন্য দায়ী কেবল মানুষই—আপনি এই কথাটা মানেন কি না-মানেন তাতে

কিছু এসে-যায় না, কারণ এইটাই সত্য। তিক্ত সত্য
সম্প্রদেহ নেই, তবু সত্য তো বটে।

হাঃ, হাঃ, হাঃ।—Les Temps Modernes—ফাদার
হেনরী উঠে গিয়ে আমার শেল্ফ থেকে বইখানা নিয়ে
এসে বললেন, এই তো আপনার অথরিটি? সার্ত্তর-এর
অটো-ইরটিক আমোদ-চক্রের বাইরে নিজের প্রতিবিম্ব
আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, মিস বোস। আর একদিন
আসব। আজ বড় ঘেরি হয়ে গেছে। বাই দি ওয়ে,
এখানে কোন ডাক্তার কি আপনি ঠিক করেছেন?

না। নিশীথ বলছিল, এখানে নাকি ডাক্তার প্রধানের
খুব নাম।...ফাদার, আপনি কেন আমার চিকিৎসার
ভাব নেন না।

আলখান্নার মত লম্বা ক্যাসকের পকেটে হাত ঢুকিয়ে
দিয়ে ফাদার হেনরী বললেন, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার
ওপর আপনার বিশ্বাস আছে?

কেন থাকবে না, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কি
বৈজ্ঞানিক নয়? ফাদার, পকেট থেকে আপনার ওষুধের
বাস্কটটা বার করুন না।—ইচ্ছে ক’রেই আমি আমার গলায়
ধানিকটা আবদারের স্বর ভাসিয়ে তুললুম। অল্প
পরিচয়েই আমার ধারণা জন্মেছে যে, ফাদার হেনরীর মত
মাত্রের কাছে জীবনের সবচেয়ে কঠিনতম আবদারও যদি
পেশ করা যায়, তবে তিনি তা সানন্দ চিত্তে পালন করবার
চেষ্টা করবেন।

পকেট থেকে হাত বার ক’রে তিনি বললেন, এই যাঃ!
ওষুধের বাস্কটটা তো ফেলে এসেছি।

আমি একটু হেসে বললুম, বাস্কটটার বদলে পকেট থেকে
যা আপনি বার করলেন, সেটাও তো মস্ত বড় দামী ওষুধ।
ইন ফ্যাক্ট, আপনাদের কাছে এর চেয়ে বড় ওষুধ দ্বিতীয়টি
আর নেই।

ইন ফ্যাক্ট, বাইবেলখানা এনেছিলাম আপনার
জন্তেই। মিস বোস, আপনি পীড়িত—চিঠিতে আপনার
সব বিবরণ পাঠ ক’রে আমার মনে হয়েছে যে, ক্রাস্টী-
লেখক সার্ত্তর-এর জীবনদর্শন আপনাকে ভয়ানক রকমে
অস্থস্থ ক’রে তুলেছে। এই বয়সে আপনার লিভারটা
প’চে গেল কেন? সার্ত্তরকে ত্যাগ করুন। শেল্ফটাকে
সাফ করার দরকার হয়েছে—

বাধা দিয়ে আমি বললুম, ফাদার, প্রীজ—একটু থামুন
ফাদার। আমার লিভারের সঙ্গে জীবনদর্শনের কি সম্বন্ধ?

আছে, সম্বন্ধ আছে মিস বোস। La Néant—
শূন্যতা ছাড়া জীবনে আপনাদের আর কোন সত্য
নেই। শুরু থেকেই একটা ক্লাস্তিকর নৈরাশ্রজনক
শূন্যতাবোধ—সব কিছু ক’য়ে যাচ্ছে, কোন কিছুই ধ’রে
রাখতে পারলেন না, এমন কি লিভারটা পর্যন্ত গ’লে
গেল। আজ উঠি, চিঠিখানা আমায় ফিরিয়ে দিন।

চিঠিখানা ফাদার হেনরীর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললুম,
এমন সুন্দর বাংলা বলতে শিখেছেন যে, বিদেশী ব’লে
আর বোঝাই যায় না।

আর তো আমি বিদেশী নই মিস বোস। স্বাধীন
ভারতবর্ষের সনদপ্রাপ্ত নাগরিক আমি। সে থাক,
ভবতোষকে কাল আমি একটা জবাব লিখে পাঠাব।
ডাক্তার-বস্তির ব্যবস্থা কাল যা হয় করা যাবে। কোন
কিছু অস্থবিধা ঘটলে নিশীথকে দিয়ে আমায় খবর
পাঠাবেন। ভগবান আপনার মঙ্গল কল্লন।

লিভারটা প’চে যাওয়ার পরে আমি আর ভগবানের
হাতেও নেই ফাদার। কিন্তু ভবতোষের সঙ্গে আপনার
পরিচয় কবে থেকে?

ফাদার হেনরী যাওয়ার জন্তে উঠে পড়েছিলেন।
চেয়ারে না ব’সেই তিনি বললেন, অনেক দিন থেকে।
ক্রাস্টী দেশ থেকে আমি যখন প্রথম ভারতবর্ষে আসি,
তখন কেটনগরের মিশনে আমি যোগ দিই। সেখানে
আমি পাঁচ বছর ছিলাম। আপনি নিশ্চয়ই জানেন,
আমাদের মিশনের খুব বড় কেন্দ্র হচ্ছে কেটনগর।
ভবতোষের সঙ্গে আমার পরিচয় সেখান থেকেই। তারপরে
বিলেতেও আমরা একসঙ্গে ছিলাম। কোন একটি বিশেষ
বিজ্ঞা সম্বন্ধে গবেষণা করবার জন্তে আমায় সেখানে বছর
দুই থাকতে হয়েছিল। ভবতোষের সঙ্গে সেখানে আমার
প্রায় প্রত্যেক দিনই দেখা হ’ত। আপনার কথা আমি
তখন থেকেই জানতুম।

জানতেন?—আমি বিজ্ঞানায় উঠে বসলুম। ফাদার
হেনরীকে আমি অল্পদিনের স্বরে বললুম, প্রীজ, স্ত্রীর একটু
ব’সে যান। আজ থেকে প্রায় পনেরো বছর আগেকার
কথা। দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. পাস ক’রে সবেমাত্র কলেজে

চাকরি নিয়েছি। পাস করার প্রয়োজনে দর্শনশাস্ত্র পড়েছি। কিন্তু জীবনে তা প্রয়োগ করবার প্রাণ ওঠে নি তখনও। ভবতোষ নিয়মিত বিলেত থেকে চিঠি লিখছে আমার। ভালবাসার উত্তাপে প্রতিটি কথা উত্তপ্ত হয়ে থাকত। ফস্ ক'রে ওর চিঠি কখনও তাই আমি কোনদিনও খুলতুম না। র'য়ে ব'সে, ধীরে, সময় নিয়ে একটু একটু ক'রে খামখানা খুলতুম। চিঠিপড়া চাড়াচাড়া শব্দ হয়ে যাবে মনে ক'রে প্রতিটি শব্দ আমি বানান ক'রে ক'রে পড়তুম। ফাদার, মনস্তত্ত্ববিজ্ঞান আমার কণ্ঠস্থ ছিল বটে, কিন্তু জীবনে এর কোন প্রয়োজন আছে তা আমি একদিনের জন্তেও বিশ্বাস করি নি। ক্রমে ক্রমে যতই দিন পার হতে লাগল, ভবতোষের চিঠিতে আমি মনস্তত্ত্ববিজ্ঞান খুঁজে বেড়াতে লাগলুম। ওর চিঠির প্রতিটি লাইনই কেবল পড়তুম না, দু লাইনের মাঝখানে কোন গুপ্ত ইঙ্গিত পাওয়া যায় কি না তার সন্ধান করতে লাগলুম। সন্ধান করলুম উনিশ শো পয়ত্রিশ থেকে আটত্রিশ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। সন্দেহ আমার সত্যে পরিণত হ'ল।

হ্যাঁ, সময়টা ঠিকই হয়েছে। ইয়োরোপে তখন কোন একটা ভারতীয় নাচিয়ের দল নাচ দেখিয়ে বেড়াচ্ছিল। ভবতোষ প্যারিসে গিয়েছিল নাচ দেখবার জন্তে। সেখান থেকে আর সে লগুনে ফিরে আসে নি। পরীক্ষাও দিল না। নাচিয়েদের সঙ্গে ইয়োরোপের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে ভারতবর্ষে যখন সে ফিরে এল, ইয়োরোপে তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। মিস বোস, সেই সময় আপনার যে কত কষ্ট হয়েছিল আমি বুঝতে পারি। কিন্তু ইয়োরোপের কথা ভাবুন তো। আপনার মত কত লক্ষ লক্ষ মেয়ের স্বপ্ন সেদিন ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল। ভবতোষ কুমার যোগ্য নয়, কিন্তু তবুও আপনি যদি তাকে কমা না করেন, তা হ'লে তার যে নরকেও স্থান হবে না। নিশীথকে বলবেন, শেল্ফ থেকে ওই বইগুলো যেন সে সরিয়ে ফেলে।...মিস বোস, বইগুলো সরিয়ে না ফেললে, মাহুসকে কমা করবার মত মনের বিস্তৃতি অর্জন করতে পারবেন না। আজ চলি। অন্ত আর একদিন আসব।—এই ব'লে ফাদার হেনরী চ'লে যাচ্ছিলেন। আমি পেছন থেকে ডাকলুম, 'একটু দাঁড়ান ফাদার। তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন আমার দিকে মুখ ক'রে। আমি বললুম, আমার দৃঢ়বিশ্বাস

আপনি আমাদের সম্বন্ধে সব কথাই জানেন। কেবল জানেন বললে মিথ্যে বলা হবে। আপনি কোথায় কেমন ক'রে যেন আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন ব'লে সন্দেহ হচ্ছে। ফাদার, আপনি কি বন্ধাকে চেনেন না?

চিনতুম, চিনতুম।—ব'লে তিনি স্বীকৃতিসূচক মাথা নাড়তে লাগলেন। নিমেষের মধ্যে তন্নয় হয়ে গেলেন তিনি। কি যেন ভাবতে লাগলেন। প্রায় চোদ্দ বছর পেছন থেকে কি একটা সংবাদ সংগ্রহ ক'রে এনে তিনি বললেন, উনিশ শো আটত্রিশ খ্রীষ্টাব্দে ইয়োরোপের এমন কোন রাজধানী ছিল না যেখানে তার নৃত্য-শিল্প নিয়ে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয় নি। মধ্যপ্রাচ্যেও শুনেছি, কোন কোন জায়গায় পেট্রলের চেয়ে রক্তার নাচের দাম ছিল অনেক বেশি।

তার সম্বন্ধে আর কোন খবর রাখেন না?

রাখি মিস বোস।...ভগবান তাকে শাস্তি দিন।... শুভ নাইট মিস বোস।

*শুভ নাইট ফাদার।

একটু হেসে ফাদার হেনরী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি লক্ষ্য করলুম, হাসির মধ্যে তাঁর চুঃখের চিহ্নটা স্পষ্ট ভাবে ভেসে উঠল। আমার কাছে তিনি কোন কিছুই গোপন করতে পারলেন না। কেবল ভবতোষ নয়, রক্তাও তাঁর মনের জগতে নিকটতম বাস্তব।

ফাদার হেনরীকে এগিয়ে দেবার জন্তে নিশীথ গেল তাঁর পেছনে পেছনে বাইরের দরজা পর্যন্ত।

মিনিট পাঁচ হয়ে গেল, নিশীথ তবু ফিরল না। বুঝলুম, সে গীর্জা পর্যন্ত গেছে। ফাদার হেনরীর থাকবার জায়গাটা না দেখে সে ফিরে আসবে না। ফাদার হেনরী আজ আমার কেবল বিষ্মিত করেন নি, আমার এই গল্পের একটা হারানো স্রোত তিনি আমার খুঁজে এনে দিয়েছেন। ভবতোষের চরিত্রের একটা অন্ধকার জায়গায় নতুন আলোকপাত ক'রে গেলেন কাথলিক ধর্মযাজকটি। অতি-পরিচিত ভবতোষকেও যেন আজ মনে হচ্ছে, স্বপ্ন-পরিচিত—চল্লিশ বছরের চেনামাহুসটি যেন আমার কাছ থেকে কেবল একটা মুহূর্তই লুকিয়ে রেখেছিল। সেই একটা

মৃত্তকের গুরুত্ব আজ চল্লিশ বছরের চেয়ে বেশি হয়ে
পাড়িয়েছে।

কেটনগরে আমরা পাশাপাশি বাড়িতে থাকতুম।
শহরের এই দিকটা তখন ছিল সবচেয়ে ধারাপ।
বাড়িগুলো সব পুরনো। বুনো ঘাস আর জঙ্গলের জন্তে
কোন বাড়িরই একতলাটা বাইরে থেকে দেখা যেত না।
প্রতি রাজেই বাঘ আসত। গোয়ালের দরজা খোলা
পেলে গরু-বাছুর রক্ষা পেত না বাঘের মুখ থেকে।

আমাদের বাড়িতে আমি আর মা থাকতুম। বাবা
সরকারী কাজ করতেন এলাহাবাদে। দু-এক বছর পর পর
তিনি কেটনগরে আসতেন। কিন্তু শেষের দিকে প্রায়
বছর চার পর্যন্ত বাবা আর এখানে আসেন নি। মাকে
আমি প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতুম, বাবা কেন আমাদের
এলাহাবাদে নিয়ে যান না? মা আমার প্রশ্নের জবাব
দিতেন না। প্রতি মাসে বাবা মনিঅর্ডার করে আমাদের
টাকা পাঠাতেন। মনিঅর্ডার সহ করে টাকা রাখতুম
আমি।

কেটনগর ছেড়ে আসবার দু-এক মাস আগে হঠাৎ মা
আমায় একদিন বললেন, জয়া, জানিস তোর বাবা আমাদের
এলাহাবাদ নিয়ে যান না কেন?

জানি না মা। ইস্কুলের মেয়েরা আমায় কত কথাই না
বলে। তা ছাড়া, ভবতোষ—

বাধা দিয়ে মা বললেন, আমার একটা পা খোঁড়া, রূপ
নেই, তিনি তাই আমায় এখানে ফেলে রেখেছেন। জয়া,
আমায় নিজের জন্তে হুঁশ কিছু নেই। কিন্তু তোর প্রতি
তিনি অবিচার করছেন।

না মা, তুমি এমন কথা বলো না। ইস্কুলে আমার মাইনে
লাগে না—আমি প্রথম হয়ে। ফ বছরই পাস করছি। কিন্তু
ভবতোষ কি বলে জান? বাবা নাকি আবার বিয়ে
করেছেন।

মা মাথা নীচু করে রইলেন, কোন জবাব দিলেন না।
জবাবের আর প্রয়োজন হ'ল না। মা অস্থির পড়লেন।
শ্রীমৎ দেড়েক ঘন্টা-ভাঙার টানাটানি চলল। কলকাতা
থেকে আমার মামা এলেন। ডক্টর ঘান্স মিত্র, বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ভারত-ইতিহাসের কি এক গুপ্ত
ধর খুঁজে বার করার জন্তে তাঁর তখন বেশময় নাম

ছড়িয়ে পড়েছে। নামের জন্তে আমার খুব লোভ ছিল না।
তিনি ইংরেজ কর্মচারীদের স্নানঘরে পড়তে চেয়েছিলেন।
উত্তরকালে পড়েও ছিলেন। সে কথা পরে লিখব।

মামা তাঁর সাধ্যমত চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন।
বাবাকে আমি সব কথা লিখে জানালাম। সেখান থেকে
কোন জবাব এল না, এমন কি মাসিক টাকা পাঠানোও তিনি
বন্ধ করে দিলেন। একদিন ভোরবেলা মা মারা গেলেন।
ভবতোষ মার বিছানার পাশেই ব'সে ছিল সারারাত।
বাইরের বারান্দায় একটা ঝঞ্জি-চেয়ারে শুয়ে মামা রাত
কাটাতেন।

আমি মার পায়ে কাছ ব'সে ছিলাম। হঠাৎ ভবতোষ
বললে, জয়া, মামাবাবুকে একবার ডাক তো।

কেন?

দরকার আছে।

আমি দেখলুম, ভবতোষ তার হাতের উল্টো পিঠটা
মায়ের নাকের কাছে তুলে ধরে নিশ্বাস পরীক্ষা করছে।
বয়সে ভবতোষ আমার চেয়ে বছর দুই কি তিন বড়।
আমি তখন দশ পার হচ্ছি। মামাকে ডেকে নিয়ে এলুম।
তিনি ঘরে ঢুকেই ভবতোষকে বললেন ডাক্তার ডাকতে।
একটু বাদেই ডাক্তার এলেন। তিনি পরীক্ষা করে বললেন,
মা মারা গেছেন।

ইচ্ছে হচ্ছিল, খুব চোঁচিয়ে চোঁচিয়ে কাঁদি। বোধ হয়
কাঁদবার চেষ্টাও করেছিলুম। কিন্তু চোখে আমার জল
এল না। মনের ওপর দিয়ে তখন আমার রাগের তুফান
ব'য়ে যাচ্ছে। মাহুঘের ওপর আমি শ্রদ্ধা হারাতে লাগলুম।
দশ বছর বয়সে এই আমার প্রথম সন্দেহ হ'ল যে, কেট-
নগরের জঙ্গলেই কেবল বাঘগুলো আড্ডা জমায় নি, শহরের
বড় বড় রাস্তা দিয়েও অনেক রকমের হিংস্র জন্তু চলাফেরা
করে।

শ্রাশানে আমিও গিয়েছিলুম। মার চিতার পাশে
দেখলুম, একটি যুবতী মেয়ের শবদেহের ওপর কাঁঠ সাঝানো
হচ্ছে। ভবতোষ আমার পাশেই ব'সে ছিল। আমি তাকে
বললুম, মেয়েটি কি সুন্দর। যাদের রূপ নেই, যাদের
একটা পা একটু খোঁড়া, তারাই কেবল মরে না—সুন্দরী
মেয়েরাও মরে।

ভবতোষ আমার ডান হাতটা ওর হ হাতের মধ্যে চেপে

ধরে বললে, জ্বা, এবার তো মামা তোমায় কলকাতা নিয়ে যাবেন। আর তো দেখা হবে না।

কেন, তুমি কি কলকাতা আসবে না?

ম্যাট্রিক পাস করলে তবে হয়তো কলকাতায় যাব। যাব, তাও জোর ক'রে বলতে পারি না। বাবা হয়তো বলবেন, এখানকার কলেজে পড়তে। ততদিন কি কেউ কাউকে মনে ক'রে রাখতে পারে?

মাতুষ যদি জন্তু না হয়, তবে নিশ্চয়ই পারে। আমি গিয়ে তোমায় চিঠি লিখব। তুমি জবাব দেবে তো?

জবাব দিতে আর অস্বীকার কি! কিন্তু চিঠি পাঠাব কি ক'রে?

কেন?

খাম কিনতে পরয়া লাগবে তো। বাবার কাছ থেকে একটা আখলা পর্যন্ত গলানো যায় না।

তা হ'লে কি হবে ভবতোষ?

ঠিক আছে, এমনিতে না দেয়, বাবার পকেট থেকে চুরি করব।

না না ভবতোষ। তা হ'লে চিঠি লেখার স্বরকার নেই। লিখলেও তোমার চিঠি আমি পড়ব না।

ভবতোষের কথা শুনে সেদিন আমি খুবই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। সে মিশনারী সাহেবদের ইচ্ছলে পড়ত। সেখানকার শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে চরিত্রগঠনের শিক্ষা ছিল সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিধি। তা ছাড়া কয়েক বছর দেখা হবে না ব'লে ভবতোষ আমায় মনে ক'রে রাখতে পারবে কি না সে সম্বন্ধেও সে নিশ্চয় ক'রে কিছু বলতে পারে না।

পরের দিন আমার সঙ্গে আমি কলকাতা রওনা হলুম। গাড়িতে বসে সেদিন আমি কেবল বাবার নিষ্ঠুরতার কথাই ভাবি নি, ভবতোষের কথাও ভেবেছি। দশ বছর বয়সে মাতুষ সম্বন্ধে এমন সব অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি কলকাতা এলুম যে, উদ্ভবকালে সে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র বেড়েই চলল, কিন্তু সঙ্কুচিত হ'ল না।

রাত্রি, রাত এখন খুব বেশি নয়। নিশীথ গেছে সাহেবকে পৌছে দিতে। এতক্ষণে ওর ফেরা উচিত ছিল। শুয়ে শুয়ে আমি কেটনগরের কথা ভাবছিলুম। আজ আর

তোকে চিঠি লিখতে ইচ্ছে করছে না। ভাল লাগছে না লিখতে। সন্ধ্যার সময় আজ কি একটা অভূত ব্যাপার ঘটে গেল। একজন কাথলিক পুরোহিতের কাছে ভবতোষ চিঠি দিয়েছে আমার অস্বপ্নের সব খবর দিয়ে। সেই চিঠি নিয়ে ফাদার হেনরী এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। দু-চার মিনিটের মধ্যে তাঁর সঙ্গে এমন একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক সৃষ্টি হ'ল যে, কোন কিছু গোপন করবার মত আমাদের মধ্যে সিকি ইঞ্চিরও ব্যবধান রইল না। ব্যবধান রাখতে চাইলেও রাখতে পারতুম না। বোল বছর আগে থেকেই ফাদার হেনরী আমাদের জীবনের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন অতি নিশ্চয়। জীবনের শেষ ক'টা দিন আমি আর তাঁকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখতে চাই না। সেট মেরী পাহাড়ে আজ আমি প্রথম প্রতিবেশী পেলুম—ফাদার হেনরী।

আজ আর আমার চিঠি লেখা হবে না। তোর কাছে ছুটি চাইছি ভাই। ফাদার হেনরী চলে যাওয়ার পরে চোখ ভেঙে আমার ঘুম আসছে। বোধ হয় এক ঘুগ পরে আজ আমি রাত্রিবেলা ঘুমতে বাচ্ছি। ফাদার হেনরী যাওয়ার আগে ঘরের বাতাসে কি ঘুমের ওষুধ ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন?

ঘরের বাইরে খুঁচ ক'রে শব্দ হ'ল। জিজ্ঞাসা করলুম, কে?

আমি, আমি নিশীথ।

কখন এলি?

একটু আগে।

গীর্জা পর্যন্ত গিয়েছিলি বুঝি?

হ্যাঁ।

সাহেব কি বললেন রে?

তোমার জন্তে ওষুধ নিয়ে আসবেন।

ওষুধ বোধ হয় তিনি রেখে গেছেন।

বিশ্বাস থাকলে, তুমি ভাল হয়ে উঠবে দিদিমণি।

বিশ্বাস না থাকলে আজ বোধ হয় আমার ঘুম আসত না। আলোটা নিবিয়ে দে—আমি এবার ঘুমোব। নিশীথ আলো নিবিয়ে দিল।

[ক্রমশ]

নববর্ষ

ভারতীয় বন্দোপাধ্যায়

কাল অসীম অনন্ত, কাল নিরবধি। সে কালকে মাহুষ গণনা করে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তে, আবার অস্ত থেকে উদয়ে; দিন ও রাত্রিতে। নিয়মিত সংখ্যক একটি দিনরাত্রির অস্তে সে গণনা করে বর্ষান্ত ও বর্ষারম্ভ। এই সময় ৩৬৫ দিনের মধ্যে পৃথিবী তার কক্ষপথে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ ক'রে ঘুরে আসে এবং আবার শুরু করে নতুন প্রদক্ষিণ। এই দিনটিই মাহুষের গণনায় নববর্ষ। মাহুষের আছে জন্মদিন—৩৬৫ দিন পর প্রতি জন্মদিনে সে স্মরণ করে তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনকে ও ক্ষণকে। নববর্ষে মাহুষ স্মরণ করে, কল্পনা করে পৃথিবীর প্রথম আবির্ভাব-লগ্নকে—তার বুকে প্রথম সূর্যোদয়কে। এর মধ্যেই পাই পুরাতন পৃথিবীকে নতুন রূপে; নতনের মধ্যে নবীনতার প্রকাশেই কালের প্রকাশ। কালের ক্ষণে ক্ষণে জীর্ণতার ক্ষয়, পুরাতনের লয়—নবীনতার আবির্ভাব, নতনের জন্ম। নববর্ষে তাই প্রত্যাশা নতুন দিনের, নবীন আশার, নতুন উপলব্ধির, নব সংকল্পের; সংসারে হিসাবের খাতায় তাই নতুন পতন, জীবনে নতুন কল্পনা, আমার চির পুরাতনকে নতুন রসে নতুন রঙে অভিসিঞ্চন। নববর্ষ আদি পুরাতনকে স্মরণ, সর্বাধিক নতনকে বরণ; অপকল্পের নবরূপে প্রকাশ। নববর্ষ নতনের অভ্যুদয়। নববর্ষে নবীন আশায় নতনকে আমরা আহ্বান করি—

“হে নতুন এসো তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি।”

সংকল্প করি—

“চাব না পশ্চাতে মোরা মানিব না বন্ধন জন্মদ

হেরিব না দিক।”

আমরা নির্ভয়ে এগিয়ে চলব অভয়ের অভিযুগে। ভয়ই আমার অ-স্বথ, আমার অ-শান্তি,—ভয়ই আমার পরাজয়। ভয়ের জন্তই পৃথিবীতে আমি আনন্দের ভোজে বঞ্চিত, ভয়ের জন্তই পাই না আমি মৃত্যুর মধ্যে অমৃতকে। আমরা অতৃপ্তি থেকে এগিয়ে চলব তৃপ্তির দিকে, বিগত বর্ষে তৃপ্তি আমরা পাই নি, নববর্ষে আমাদের আশা—তৃষ্ণা মিটিয়ে পরিতৃপ্তিকে আমরা পাব। আমরা পূর্ণ হতে পারি নি, অপূর্ণতার মধ্যেই শেষ হয়েছে বিগত বর্ষ। নববর্ষে আমাদের কল্পনা, আমাদের সাধনা—আমরা পূর্ণতায়

উপনীত হব; আমরা অনন্তের পথের যাত্রী; বিগত বর্ষের অন্তের মধ্যে অনন্তের মুখে আমাদের যাত্রা থণ্ডিত হয় নি। নববর্ষ এগিয়ে এসে আমাদের আহ্বান জানিয়ে বলেছে—এস, এগিয়ে এস। চল—চল—চল। মহাকাল তার বাণী পাঠিয়েছেন—আমি চলেছি, চিরচলমান আমি, নববর্ষ আমার একটি নতুন পদক্ষেপ। তার সঙ্গে তোমরাও এস, চল; চলাই জীবন। নববর্ষে আমার নবপদক্ষেপের কল্যাণে তোমরা লাভ কর নবজীবন। জীর্ণ বস্ত্রের মত শিছনে প'ড়ে রইল পুরাতন বর্ষ, পুরাতন জীবন, পুরাতন আমি; অভ্যুদয় হ'ল নতুন কালের, নবীন আমার।

* * *

বসন্তের শেষে গ্রীষ্মারম্ভে চৈত্রের শেষ দিন মহাবিশুব-সংক্রান্তি অস্তে বৈশাখে আমাদের বর্ষারম্ভ—নববর্ষ। দ্বাদশ রাশিতে সূর্যের অবস্থানে দ্বাদশ মাসে আমাদের বৎসর পূর্ণ হয়। দ্বাদশ রাশির আদি রাশি মেঘ। বৈশাখেই মেঘ-রাশিতে সূর্যের অবস্থান। সেই হেতু এলা বৈশাখ আমাদের নববর্ষ। বৈশাখের রূপ ভৈরবের রূপ, তপস্বী কব্রের রূপ। তপস্রায় আমাদের বর্ষারম্ভ। আমাদের নববর্ষে বিলাসের চেয়ে বৈরাগ্য বড়, সমারোহের চেয়ে সংকল্প প্রধান সজ্জার চেয়ে শুচিতাই আমাদের কাম্য।

আমাদের নববর্ষের সূচনা হয়েছে বর্ষশেষে—মহাবিশুব-সংক্রান্তিতে বিগত বর্ষকে গাজনের শিব হিসাবে পূজা করেছি; স্মরণ করেছি পিতৃপুরুষকে অর্থাৎ আমাদের অতীতকে, অন্যদের মধ্যে আদিকে, ঘটোৎসর্গ ক'রে জল দান করেছি; নীলের উপবাস ক'রে অশোকের উপাসনা করেছি। অনেক কিছু করেছি। যারা দেশের সমাজ-জীবনকে জানেন, তাঁরা জানেন আমাদের ব্রত-উপাসনার শতকরা পঁচাত্তর ভাগের পালন এই বৈশাখ মাসে। শুধু তার চৈত্র-সংক্রান্তিতে। জলদান, ফলদান, অন্নদান—দানব্রতের শেষ নেই। উপনিষদে পাই, মহর্ষি বাজপ্ৰবা পরলোকে অর্গকামনায় সর্বদান-যজ্ঞাহুষ্ঠান করেছিলেন। তাঁর পুত্র ছিলেন নচিকেতা। নচিকেতা ভাবলেন, পিতার সর্বস্বের মধ্যে আমি পুত্র আমিই তো সর্বস্বের শ্রেষ্ঠ এবং প্রথম। কিন্তু কই, পিতা তো আমাকে দান করছেন না

কাউকে। অথচ আমাকে দান না করলে তো তাঁর যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে না। এই ভাবনায় আঁহর হয়ে তিনি বাজস্রবা ঋষিকে বার বার তিনবার জিজ্ঞাসা করলেন, সর্বস্বদান-যজ্ঞে আমাকে কাকে দান করছেন? তিনবারের বার ঋষি বিরক্ত হয়েই বলেছিলেন, যমকে। সত্যসন্ধ নচিকেতা তৎক্ষণাৎ পিতার চরণে প্রণাম করে বিদায় নিয়ে যমের কাছে গিয়ে বলেছিলেন, আমার পিতা সর্বস্বদান-যজ্ঞে আমাকে আপনাকে দান করেছেন; আপনি আমাকে গ্রহণ করুন। যম অর্থাৎ মৃত্যুর স্বরূপ জেনে সংসারকে সেই তত্ত্ব তিনি দান করে গেছেন। বোধ করি, মহর্ষি বাজস্রবা সে যজ্ঞের অহুষ্ঠান করেছিলেন এই বৈশাখে—নববর্ষের প্রারম্ভে।

পৃথিবীর সকল দেশেই তাদের উপলব্ধি অহুযায়ী নববর্ষে শুভেচ্ছা পাঠানোর রীতি আছে। আমাদের দেশে সংকল্প প্রদান। আগের কালে সংকল্প করতাম—ওঁ তৎসৎ, ওঁ অজ্ঞ বৈশাখ মাসি মেঘরাশিস্থে ভাস্করে অমুক তিথৌ ইত্যাদি। এই সেদিনও দেশব্রত গ্রহণ করেছিলাম আমরা সংকল্প করে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পুরোহিত, তিনি পড়িয়েছিলেন যজ্ঞ—

“নববৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা।”

সে দীক্ষাগ্রহণ আমাদের ব্যর্থ হয় নি। নববর্ষে নববর্ষে কালের পদক্ষেপের সঙ্গে পুরাতন নূতন হয়েছে। স্বর্গ হয়েছে স্বদেশ। মাহুষ হয়েছে দেবতা।

নববর্ষে নববর্ষে ভাব থেকে ভাবান্তরে বন্ধিমচন্দ্র চিম্ময়ী আত্মশক্তিকে ধরিজীর মধ্যে দেশের বৃকের ভিতর প্রত্যক্ষ করেছিলেন, বন্দেমাতরম্ বলে প্রণত হয়েছিলেন। কমলাকান্তরূপে তিনি কেঁদেছিলেন, বলেছিলেন, “আর বঙ্গভূমি, তুমিই বা কেন মণি-মাণিক্য হইলে না, তোমায় কেন হার করিয়া কণ্ঠে পরিতে পারিলাম না। তোমাকে স্বর্ণের আসনে বসাইয়া, হৃদয়ে দোলাইয়া দেশে দেশে দেখাইতাম। ইউরোপে আমেরিকায় মিসরে চীনে দেখিত —তুমি আমার কি উজ্জল মণি।”

সাধকের সে সাধের সাধনাও পূর্ণ হয়েছে। পরাধীন ভারত স্বাধীন হয়েছে—সে তার আপন সাধনার মহিমায়

সমুজ্জল। সে মণি তো রাজার মুকুটে ধারণের জন্ম নয়, সে মণি তো বিলাসিনীর কণ্ঠহার খচিত করার জন্ম নয়, সে মণি সজীবনী মাণ। সে মণির প্রভায় হিংসা হয় শাস্ত, ক্ষোভ হয় ক্ষমা, লোভ হয় মুক্ত, কামনা হয় সাধনা, সিদ্ধি হয় সমর্পণ, মৃত্যু হয় অমৃত। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বের নববর্ষে এই মেঘরাশিস্থ ভাস্করে বৈশাখী পূর্ণিমায় জন্মেছিলেন পরমবুদ্ধ। তাঁর অমৃত তপস্তার পুণ্য জ্যোতি এই মণির সর্বাঙ্গে; উপনিষদে ঋষিদের সাধনার ছাতি তাঁর অন্তরলোকে। সে মণির পুণ্যপ্রভায় সজীবিত হবার জন্ম পৃথিবী আজ উদ্গীব। বাইরে তার মার্জনা—নবগঠন দিকে দিকে। এ দেশের নববর্ষ আসছে সৌভাগ্যের মধ্যে, তপস্তার মধ্যে। ১৩৬২ সালের নববর্ষ।

আমার নববর্ষ। আমার নববর্ষ—আমার হৃৎকণ্ঠস্থ হৃদয়ের জন্ম আনো শান্তির খাস, অশান্তি-ক্ষোভের প্রবাস। আমার পুরাতন হৃদয়কে, মনকে নবীনতার রসে অভিষিক্ত কর, রঙে রঞ্জিত কর, গন্ধে পরিপূর্ণ কর। আমাকে উপলব্ধি দাও, আমি সেই মাহুষ—আমার দেশ নেই, জাতি নেই, ধর্ম নেই, আমার আছে শুধু কাল—অনন্তের পথে ধাবমান কাল; তারই সঙ্গে আমিও ধাবমান। এই নিরবধি কালপ্রবাহ বর্ষে বর্ষে চলেছে—চলেছে—চলেছে—দিন ও রাত্রিতে জাগরণ ও নিদ্রার মত জীবন ও মরণের ভাবনায় আমাকে রেখেছে তুলিয়ে। আমাকে রেখেছে ভাবিত। কিন্তু আমাকে উপলব্ধি দাও, আমি চিরকাল-ব্যাপী। এই ভারত-সজীবনী মণির জ্যোতি-ছাতি আমার অন্তরলোকে প্রতিভাত কর। তুমি হৃৎ নিয়ে এস, তুমি হৃৎ নিয়ে এস, এনো না তার সঙ্গে হৃৎের মোহ, হৃৎের মুগ্ধমানতা; আনো তুমি তপস্তা, তার সঙ্গে এনো না তপস্তার রক্ততা। আনো তুমি জয়, এনো না যেন বিজয়মালা। চিন্তকে কর জাগ্রত, বীর্ষকে কর সেবারত। আর আমার জন্ম আনো তুমি চোখের জল। আমার হৃৎখে আমি কাদি, আমার হৃৎখে আমি কাদি; কান্নার মধ্যেই পাই আমার হৃৎের চরম ভোগ, পরমতৃপ্তি। আমি আমার জন্ম কাদি, আমি পরের জন্ম কাদি। যাকে চেয়ে মাহুষ পায় না, তবু যুগ যুগ কাদে, আমি তার জন্ম কাদি।

আইনস্টাইনের জীবনদর্শন

("The world as I see it")

শ্রীঅমিয়কুমার সেন

[সিটি কলেজের অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার সেন জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের জীবনদর্শন আবিষ্কারে ও মাতৃভাষায় প্রচারে কিছুকাল হইতে তৎপর হইরাছেন। আলবার্ট আইনস্টাইনের জীবনদর্শন লইয়া তিনি এই সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের দেহান্তর ঘটাতে সকলেই তাঁহার জীবন ও জীবনদর্শন তাঁহারই নিজের কথায় বাঙালী পাঠকের গোচর করিয়া

সর্বপ্রথম বঙ্গভারতীয় মণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। সম্ভ্রুতি পৃথিবীর জীবনদর্শন সম্বন্ধে জানিবার ক্ষমতা অগ্রহণীয়। এই মহাবিজ্ঞানীর অধ্যাপক সেন তাঁহারের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন।—স. প. চি.]

মানবজীবনের ষথার্থ উদ্দেশ্য কি?—এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে ধর্মকে স্বীকার করিতে হয়; অনেক এই প্রশ্নকে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে করেন; কিন্তু যে ব্যক্তি নিজ অথবা তাহার সমধর্মী অন্তরের জীবনকে অর্থহীন বলিয়া মনে করে, সে হতভাগ্য; জীবন ধারণের অযোগ্য।

পারে, কিন্তু ইচ্ছা অল্পসারে ইচ্ছা করিতে পারে না।" যৌবন হইতেই এই মত আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে এবং জীবনের নানা সংগ্রামের মধ্যে সাহসনা ও ধৈর্যের উৎসর্গে কাজ করিয়াছে। দায়িত্বজ্ঞান অনেক সময় আমাদের কর্মশক্তিকে অবসাদগ্রস্ত করে; কিন্তু উপরোক্ত অল্পভূতি এই দায়িত্বজ্ঞানকে সংযত করিয়া দেয়; ফলে আমাদের ও অন্তরের সম্বন্ধে অতিরিক্তভাবে চিন্তাগ্রস্ত (serious) হইতে পারি না।

আমাদের প্রত্যেকেরই একটি আদর্শ আছে, যাহা আমাদের চিন্তা ও কর্মশক্তিকে প্রেরণা দেয়; এই অর্থে আমি কখনও আশ্রয় ও স্বথকে আমার জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করি নাই, বরঞ্চ এইরূপ নৈতিক ভিত্তিকে আমি পাশবিক বলিয়া মনে করি। আমার আদর্শ "সত্য শিব ও সুন্দর"—ইহাই আমার জীবনে আলোক প্রদর্শন করিয়াছে এবং জীবনসংগ্রামকে আনন্দসহকারে গ্রহণ করিবার নূতন সাহস দান করিয়াছে। সমধর্মী মানুষের সহযোগিতা, এবং সৌন্দর্য ও বৈজ্ঞানিক গবেষণাক্ষেত্রে চির অপ্রাপ্যীয় (unattainable) আদর্শের অল্পভূতি ব্যতীত জীবন শুষ্ক ও শূন্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। বিষয়-সম্পত্তি, বাহিরের কৃতকার্যতা প্রভৃতি যাহা কিছু সাধারণ মানবের লোভনীয়, আমার নিকট সমস্তই মূল্যহীন।

মানুষ ও মানবসমাজের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করিবার কোন স্পৃহা আমার নাই, অথচ সামাজিক দায়িত্বজ্ঞান আমার অত্যন্ত প্রবল। আমি একাকী পথ চলিতে ভালবাসি, সমগ্র হৃদয় দিয়া কখনও স্বদেশ, বন্ধু-বান্ধব, এমন কি পরিবারের সঙ্গে নিজেই মিলাইয়া দিতে পারি নাই। ব্যোবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই একাকিত্বের প্রবণতা আমার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। অন্য লোকের সঙ্গে সহানুভূতি এবং পরস্পর বুঝাপড়ার (understanding) সীমা সম্বন্ধে

আমরা প্রত্যেকেই অল্পদিনের জন্ম ইহলগতে বাস করি; যদিও মানবজীবনের উদ্দেশ্য মনে চিন্তা ও অল্পভূতি জাগায়, তবু উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা আমাদের নাই। দৈনন্দিন জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, আমরা আমাদের সহযাত্রী মানবগণের কল্যাণের জন্মই জীবন ধারণ করি; আমরা জীবন ধারণ করি প্রথমত তাহারদের জন্ম, যাহাদের কল্যাণের উপর আমাদের স্বর্থ নির্ভর করে; যে সব অপরিচিত লোকের ভবিষ্যতের সহিত আমাদের জীবন সহানুভূতিহীন প্রথিত, তাহারদের স্বর্থ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে আমাদের জীবন সার্থকতা লাভ করে। প্রতিদিন বহুবার আমি নিজেই এই কথা স্মরণ করাইয়া দিই যে, আমার অন্তর ও বহির্জীবন জীবিত ও মৃত শত শত লোকের কর্মপ্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে; সুতরাং আমি অতীতে ও বর্তমানে তাহারদের নিকট যে সাহায্য লাভ করিয়াছি ও করিতেছি, তাহার প্রতিদানস্বরূপ আমারও কর্মশীল হওয়া উচিত। আমি সহযাত্রী লোক-দিগের কর্মফলের অত্যধিক অংশ গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি—এই চিন্তা অনেক সময় আমাকে পীড়িত করে; ফলে আমি যতদূর সম্ভব সামান্যভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করি।

আমি দার্শনিক অর্থে ব্যাকুলগত স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি না; আমরা প্রত্যেকেই বহির্জগতের ও অন্তর্জগতের অলঙ্ঘনীয় বিধানানুসারে কাজ করি। শোপেনহাওয়ার বলিয়াছেন—“মানুষ নিজ ইচ্ছা অল্পসারে কাজ করিতে

আমি সচেতন ; তবে সেজ্ঞ আমার দুঃখ নাই। এই প্রকার একাকিত্বের জ্ঞ উদারতা এবং হৃদয়ের ক্ষুতির লাঘব হইতে পারে বটে, কিন্তু সহচরদিগের মতামত, সিদ্ধান্ত ও অভ্যাসের প্রভাব হইতে স্বাধীনতা লাভ করা যায়।

আমি গণতন্ত্রবাদী ; আমার মতে প্রত্যেক মানুষকেই মানুষ-হিসাবে তাহার সম্মান দেওয়া উচিত ; কোন লোককেই অবতার বা ভগবান-রূপে পূজা করা অস্বাভাবিক। অদৃষ্টের ফেরে নিজের দোষগুণ-নিরপেক্ষ ভাবে আমি লোকদের নিকট অত্যধিক সমাদর লাভ করিয়াছি ; আমি জানি, যে কোন একটা কঠিন কার্যকে সুসম্পন্ন করিতে হইলে একজন লোককে সমস্ত চিন্তা পরিচালনা ও দায়িত্বের ভার গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু বাহ্যিক আকাজক্যের কারণে তাহাদের উপর জোর করা উচিত নয়। প্রত্যেক লোককেই নিজ পরিচালক নির্বাচন করিবার অধিকার দিতে হইবে। একনায়কত্বের শাসনে সমাজের অধোগতি হয়। নীচমনা লোকেরাই ক্ষমতার দ্বারা প্রলুব্ধ হয়। অবিসংবাদী নিয়মামুসারেই যেন শক্তিমান একনায়ক-সম্রাটের উত্তরাধিকারী হয় দুর্বল। বর্তমান যুগের যুরোপে গণতন্ত্র অত্যন্ত ব্যাহত হইয়াছে। এর জ্ঞ দায়ী গণতন্ত্রের আদর্শ নয় ; এর জ্ঞ দায়ী শাসনাধিকারের অধিনায়করা ; তাঁহাদের মধ্যে স্থিরত্বের (stability) অত্যন্ত অভাব। এর জ্ঞ দায়ী নির্বাচন-প্রণালী ; ইহা আজকাল একেবারে ব্যক্তিনিরপেক্ষ (impersonal) হইয়া পড়িয়াছে। মানব-জীবনের যে প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে অসুভূতিশীল সৃষ্টিপ্রবণ ব্যক্তিত্বেরই সত্যকারের মূল্য আছে, রাষ্ট্রের নাই। এই ব্যক্তিত্বই প্রকৃত মহত্বের, প্রকৃত ভূমার সৃষ্টি।

আমাদের সমগ্র জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টার পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের যত কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা, যত কিছু কাজকর্ম সমস্তই অজ্ঞান মানবজীবনের সহিত নিগূঢ়ভাবে সম্পর্কিত। অন্ন বস্ত্র বাসগৃহ সমস্তই অপরের কর্মপ্রসূত। জ্ঞান মত ও বিশ্বাসের বেশির ভাগই অস্ত্রেরা তাহাদের সৃষ্ট ভাষার মাধ্যমে আমাদের মনে সঞ্চারিত করিয়াছে। ভাষার আবিষ্কার না হইলে আমাদের মানসশক্তি অজ্ঞান উচ্চতরের পণ্ডর মানসিক শক্তির তুলনায় নগণ্য হইয়া থাকিত। মানবসমাজে

বাস করি বলিয়াই আমরা অজ্ঞান প্রাণীর অপেক্ষা উন্নততর। মানুষ যদি আজ্ঞান মানবসমাজ হইতে দূরে একাকী বাস করিত তাহা হইলে তাহার চিন্তা ও ভাবধারা এত পাশবিক হইত যে, আমরা তাহার অসুমানও করিতে পারি না। বিশাল মানবসমাজ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে চালিত করে। এই সমাজের জীব বলিয়াই তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ, তাহার জীবনের সার্থকতা। মানুষ সমগ্র মানবের কল্যাণসাধনের জ্ঞ তাহার ভাব ধারণা ও কর্ম যতখানি নিয়োজিত করে, সম্প্রদায়ের নিকট তাহার ব্যক্তিত্বের মূল্য ঠিক ততখানি। আপাতদৃষ্টিতে এইরূপ বোধ হইলেও ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে মানবসমাজের ক্রমবিকাশ যদি পর্যালোচনা করি, দেখিতে পাই যে আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক যত কিছু মূল্যবান সম্পদ আমরা সমাজের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছি সে সমস্তই হৃদয় অতীতে কোন না কোন সৃষ্টিপ্রবণ মহাত্মার ব্যক্তিগত দান। অগ্নির আবিষ্কার, জীবনধারণোপযোগী শস্ত্রের কৃষি, বাষ্পীয় এঞ্জিন—সমস্তই একক মানবের দান। ব্যক্তিই চিন্তা করিয়া সমাজের জ্ঞ নূতন নূতন মূল্যবোধের (values) সৃষ্টি করে ; ব্যক্তিই নূতন নৈতিক আদর্শ স্থাপন করে ; এই মূল্যবোধ (values) ও এই আদর্শই পরে সমগ্র সমাজ গ্রহণ করিয়া লয়। যেমন সমাজজীবনের সাহিত্য বিযুক্ত হইলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় না, তেমনই স্বাধীনভাবে চিন্তাশীল সৃষ্টিপ্রবণ ব্যক্তির অভাবে সামাজিক জীবনের উন্নতি হৃদয়পরাহত। আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য দেশের বাণিজ্য ও বাস্তবিক শিল্পের বিশেষ উন্নতি হওয়াতে জীবন-সংগ্রাম অত্যন্ত কঠোর হইয়া পড়িয়াছে, ফলে স্বাধীন-ভাবে ব্যক্তিবিকাশের পথে বহু বাধাবিধ উপস্থিত হইয়া তাহার অবনতি ঘটতেছে। অথচ যন্ত্রের উন্নতি হইলে সমাজের প্রয়োজন মিটাইবার জ্ঞ একক মানবের কার্যভারের লাঘব হয়। এ ক্ষেত্রে নিদিষ্ট পরিকল্পনামুসারে শ্রমবিভাগের প্রয়োজন ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে ; এরূপ শ্রমবিভাগ হইলে একক মানবের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা (security) বর্ধিত হইবে ; মানুষও নিশ্চিন্ত মনে তাহার অবসর (leisure) এবং কর্মশক্তি প্রয়োগ করিয়া নিজ ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধন করিতে পারিবে। ফলে

সমাজ নূতনভাবে তাহার স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য ফিরিয়া পাইবে।

মানুষের আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা ও তাহার বিকাশ জরুরীকরণ করিতে হইলে আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, মানুষের চিন্তা ও কার্য, অভাবপূরণ অথবা ব্যথানিবারণের জন্যই প্রযুক্ত হয়। মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা ও সৃষ্টির পশ্চাতে রহিয়াছে তাহার অহুভূতি এবং ইচ্ছা (desire); সুতরাং তাহার ধর্মচিন্তা ও ধর্মবিশ্বাসের পশ্চাতে কি ইচ্ছা ও অহুভূতি রহিয়াছে—এই প্রশ্ন স্বতই মনে জাগে। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে, ধর্মমত ও ধর্মের অভিজ্ঞতা বিবিধ পরিবর্তনীয় ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভয়—ক্ষুধার, হিংস্র জীবজন্তুর, নানা প্রকার ব্যাধি ও মৃত্যুর ভয়—হইতেই আদিম মানবের ধর্মমতের উৎপত্তি। মানব-জীবনের এই স্তরে (stage) কার্যকারণসম্বন্ধের জ্ঞান অত্যন্ত অল্পবিকশিত। এই কারণে মানব-মন কতকগুলি আত্মসাদৃশ্য সত্তার সৃষ্টি করে এবং ভাবে যে, উপরোক্ত ভয়ঙ্কর ঘটনাবলী এই সকল সত্তার ইচ্ছা ও কাঙ্ক্ষার উপর নির্ভরশীল। বংশপরম্পরায় গত ঐতিহ্য অনুসারে যে সকল কার্য ও যে সকল বলি-উপহার তাহার সৃষ্ট দেবগণের তুষ্টিসাধন করে, সেই সমস্ত কার্য করিয়া ও বলি-উপহার দিয়া দেবতাদের সন্তোষবিধানই মানুষের একমাত্র কাম্য হইয়া পড়ে। ইহাই ভয়ের ধর্ম। কালে কালে একটি পুরোহিতগোষ্ঠী স্থাপিত হয়; তাহারা ভয়ভীত আদিম মানব ও তাহাদের দেবগণের মধ্যে মধ্যবর্তী (mediator) কাজ করে; এইরূপে তাহারা ক্রমে ক্রমে সাধারণ মানুষের উপর তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিয়া এই ভয়ের ধর্মকে স্থায়ী করিয়া তুলে। অনেক ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর নায়ক অথবা রাজা অথবা একটি ভাগ্যবান শ্রেণী (privileged class) পার্থিব (secular) কর্তৃত্বের সহিত পুরোহিতের কার্য সমন্বিত করে এবং ফলে পার্থিব শক্তি দৃঢ়তর ও স্থায়ী হইয়া উঠে। অনেক ক্ষেত্রে আবার রাজা ও পুরোহিত পরস্পর সন্ধিবদ্ধ হইয়া নিজ নিজ স্বার্থরক্ষায় যত্নবান হয়।

সামাজিক অহুভূতি (feelings) ধর্মের আর একটি উৎস। পরিবারের পিতামাতা, গোষ্ঠীর নায়ক ভ্রাতৃ ও মৃত্যুর অধীন; এজন্য তাহারা এমন একজনকে পাইতে চাহেন, যিনি পথপ্রদর্শক ও আশ্রয়স্থল, ইহার সহিত

শ্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। এইরূপে ভগবানের সম্বন্ধে সামাজিক ও নৈতিক ধারণা জন্মে। ইনি বিধাতা; ইনি পালন করেন, পূরিত্ত্ব করেন, আবার শাস্তিও দেন; এই দেবতা, মানব-মনের ধারণা অনুসারে, ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীর অথবা সমগ্র মানবজাতির জীবনকে শ্রীতির চক্রে দেখিয়া সমুদ্র করেন; ইনিই দুঃখে সাহসনা দেন, আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন, ইনিই মৃত্যুর পরপারে বিগত-দেহ আত্মার গতি ও আশ্রয়; ইহা ভগবানের নৈতিক ও সামাজিক স্বরূপ।

ইহুদীয় ধর্মগ্রন্থে ভয়ের ধর্ম হইতে নৈতিক ধর্মের ক্রমবিকাশ বর্ণিত আছে। সভ্যজগতের সকল জাতির, বিশেষত প্রাচ্য জাতির, ধর্ম প্রধানত নৈতিক। ভয়ের ধর্ম হইতে নৈতিক ধর্মে পরিণতি বিকাশের পথে জাতীয় জীবনের একটি বিশিষ্ট পদক্ষেপ। আদিম মানবের ধর্ম কেবলমাত্র ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ও সভ্যজাতির ধর্ম নৈতিক ভিত্তির উপর গঠিত—এ ধারণাটি একদশদর্শী ও স্বাস্থ্য। সকল ধর্মেই ভয় ও নীতি মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। তবে এ কথা সত্য যে, সামাজিক জীবনের উচ্চস্তরে নৈতিক ধর্মের প্রভাবই অধিক। সকল ধর্মেই ভগবানের মানবীয় স্বরূপ বর্তমান। অসামান্য শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি, অথবা অসামান্য উন্নতমনা সম্প্রদায়ই ভগবানের এই মানবীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য উদ্ভূত পাবে।

সকল ধর্মের মধ্যেই তৃতীয় এক অহুভূতির স্থান আছে। অতি অল্প ধর্মে এই অহুভূতি অনাবিলভাবে বর্তমান। ইহাকে মহাজাগতিক ধর্মাহুভূতি (cosmic religious feeling) বলা যাইতে পারে।

মানুষ নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার তুচ্ছতা অহুভব করে; প্রাকৃতিক ও চিন্তাজগতের অপূর্ব মহিমা ও অনির্বচনীয় শৃঙ্খলা তাহার মনকে আচ্ছন্ন করে। নিতের ব্যক্তিগত জীবন তাহার নিকট কারাগাররূপে প্রতিভাত হয়; সে সমগ্র জগৎকে সার্থক অথও সত্তারূপে দর্শনের অভিলাষী হয়। দাউদের গীতির (Psalms of David) অনেক-গুলিতে, বাইবেল গ্রন্থে, ভবিষ্যদ্বাণী ঋষিদের উক্তিতে এই ধর্মাহুভূতির প্রাথমিক বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। শপেনহাওয়ের মতে বৌদ্ধ ধর্মে ইহার উন্নততর প্রকাশ।

প্রত্যেক দেশের বিশিষ্ট ধর্মসাধকেরা এই প্রকার

মহাজাগতিক ধর্মাত্মভূতির দ্বারা চিহ্নিত; ইহার কোন বিশেষ ধর্মমত (dogma) নাই; ইহার ভগবান মাত্মবোধ প্রতীক নহেন; কোন ধর্মমণ্ডলীয় মতবাদ এই অত্মভূতির ভিত্তিতে গঠিত হইতে পারে না। প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক দেশে প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে বাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের আত্মা এইরূপ প্রকৃষ্ট ধর্মাত্মভূতি দ্বারা সমৃদ্ধ। লোকে তাঁহাদিগকে অনেক সময় নাস্তিক বলিয়া ঘৃণা করিয়াছে, আবার সাধু বলিয়া পূজাও করিয়াছে। এই অত্মভূতির ভিত্তিতে ভগবানের কোন বিশেষ স্বরূপ অথবা ধর্মের কোন বিশেষ মতবাদ যদি গঠিত হইতে না পারে, তাহা হইলে ইহা একজনের মন হইতে অস্ত্রের মনে সঞ্চারিত হইবে কিরূপে? আমার মতে যে মন এই অত্মভূতি ধারণ করিতে সমর্থ তাহার মধ্যে ইহাকে উদ্ভূত করিয়া জীবিত রাখাই সাহিত্য ও বিজ্ঞানের একটি প্রধান কর্তব্য। এই দৃষ্টিভঙ্গী অমূল্য ধর্ম ও বিজ্ঞানের পরস্পর সম্পর্ক বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পরবিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বলিয়া মনে হয়; ইহাদের মধ্যে কোনরূপ সমন্বয় সাধন অসম্ভব বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। বৈজ্ঞানিক সমগ্র জগতে নিয়মের লীলা দর্শন করেন; তিনি বিশ্বাস করেন যে, জগৎ নিয়ম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ; কোন সত্তা যে নিজশক্তি দ্বারা ঘটনাপরম্পরাকে কোন কার্যকারণ নিয়ম-নিরপেক্ষভাবে পরিবর্তন করিতে পারে—বৈজ্ঞানিক এরূপ ধারণাই করিতে পারেন না; তাঁহার নিকট ভীতির ধর্ম, সামাজিক ধর্ম, এমন কি নৈতিক ধর্মের কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। মাত্মবোধ কার্যকলাপ, অন্তর্জগতের ও বহির্জগতের প্রয়োজন (necessity) দ্বারা নির্ধারিত, সুতরাং ভগবানের চক্ষে সে তাহার কার্যের জন্ত দায়ী হইতে পারে না; গতিস্থিতির জন্ত যেমন প্রাণহীন বস্তুর কোন দায়িত্ব নাই, নিজ কার্যের জন্তও সেরূপ মহত্ত্বের কোন দায়িত্ব নাই—ইহাই বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস; ভগবান পাপ-পুণ্য অমূল্যে মাত্মবোধকে পুরস্কৃত করেন অথবা শাস্তি দেন—এ ধারণা তাঁহার পক্ষে অসম্ভবনীয়। এই জন্ত অনেক সময় বিজ্ঞান নীতির ভিত্তি শিথিল করিয়া দেয় বলিয়া অভিযোগ করা হয়। কিন্তু মাত্মবোধ নৈতিক ব্যবহার সহায়ভূতি, শিক্ষা ও সামাজিক বন্ধনের উপর প্রতিষ্ঠিত; ইহার ভিত্তি-

স্বরূপে ধর্মের কোন প্রয়োজন নাই। নৈতিক ব্যবহারকে যদি মৃত্যুর পর পুরস্কারের লোভ অথবা শাস্তির ভয় দ্বারা নিয়মিত করিতে হয় তাহা হইলে মত্মবোধের মর্যাদা কোথায় থাকে? সুতরাং চার্চ (Church) যে সর্বদাই বৈজ্ঞানিকদের উৎপীড়ন করে এবং বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাহাতে আশ্চর্য্যবিত্ত হইবার কিছুই নাই। অথচ মহাজাগতিক ধর্মাত্মভূতি আমার মতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সর্বপ্রধান উৎস। তত্ত্বমূলক বিজ্ঞানের (Theoretical Science) প্রাথমিক গবেষণার জন্ত অত্যন্ত পরিশ্রম ও একাগ্রতার প্রয়োজন; লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রাত্যহিক জগতের বাস্তব সত্তা হইতে দূরে গবেষক যে তাঁহার কাজ করিয়া যান তাহার মূলে কোন শক্তি কাজ করিতেছে? নির্জনে, লোকালয় হইতে দূরে, বৎসরের পর বৎসর কেপলার ও নিউটন কতই না পরিশ্রম করিয়া সৌরজগতে প্রচলিত মেকানিকসের (Mechanics) নিয়মগুলি সূক্ষ্ম বিবেচনা দ্বারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন; হুদীর্ঘকাল তাঁহারা যে এইরূপ একাগ্রচিত্তে গবেষণা করিয়াছিলেন তাহার প্রধান ভিত্তি ছিল (ক) জগতের যৌক্তিকতা (rationality) সম্বন্ধে গভীর ও হৃদৃঢ় বিশ্বাস, এবং (খ) এই সমস্ত জাগতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে অসীম রহস্যময় মনের প্রকাশ, তাহার অতি অস্বচ্ছ প্রতিবিম্ব মনে ধারণ করিবার একান্ত আকাঙ্ক্ষা। চতুর্দিকে অবিশ্বাসী ও অন্ধবিশ্বাসী লোকের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সর্বদেশে ও সর্বকালে অবস্থিত সমধর্মী বিজ্ঞানসেবিগণকে পথপ্রদর্শন করিয়া বাহারা চলিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে সাধারণ লোকে অনেক সময় ভুল ধারণা পোষণ করে। তাহারা কেবল বৈজ্ঞানিক গবেষণার বাহিরের ফলাফল বুঝিতে পারে, অন্তরের প্রেরণা সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান অতি সংকীর্ণ। শত সহস্র পরাজয়ে অপরাধিত রহিয়া নিজেদের আদর্শে স্থিরবিশ্বাসী থাকিবার যে শক্তি, তাহার উৎসের সন্ধান কেবল সমধর্মী সমকর্মীরাই দিতে পারেন, অন্য কেহ পারেন না। মহাজাগতিক ধর্মাত্মভূতি এই শক্তির উৎসস্বরূপ। এই জড়বাদী যুগে একমাত্র বৈজ্ঞানিক গবেষকরাই প্রকৃত ধার্মিক। বাহারা গভীরভাবে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই কোন না কোন প্রকার ধর্মাত্মভূতি আছে। কিন্তু এই ধর্মাত্মভূতি সাধারণ মাত্মবোধের ধর্ম হইতে

বিভিন্ন। সাধারণ মানুষের ধারণা যে, ঈশ্বর একজন ব্যক্তি; তিনি শাসক ও পালক। তাঁহার স্নেহময় পালনই মানুষের মঙ্গলসাধন করে, আর তাঁহার রক্ত শাসকমূর্তি মানুষের মনে ভয়ের সঞ্চার করে। শিশু ও তাহার পিতার মধ্যে যে অহুত্ব ভর্তমান তাহারই উদগতি (sublimation) সাধারণ মানুষের ধর্মাহুত্ব। ভগবানের সহিত তাহার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ; এই সম্বন্ধবোধ ভয়মুক্ত বিশ্বাস দ্বারা রঞ্জিত।

বৈজ্ঞানিক সর্বগত কার্যকারণবোধের (Universal Causation) অহুত্ব দ্বারা আবিষ্ট। তাঁহার মতে অতীতের দ্বারা ভবিষ্যৎও সম্পূর্ণভাবে নিয়মিত। প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে যে সঙ্গতি (harmony) বিদ্যমান, তাহা তিনি বিমুগ্ধ বিশ্বাসে পর্যবেক্ষণ করেন; এই সঙ্গতির মাধ্যমে একটি উচ্চতর মানসের প্রকাশ তাঁহার অন্তদৃষ্টির সম্মুখে বিভাসিত হয়। তিনি অহুত্ব করেন, মানব-মন এই উচ্চতর মানসের অতিদুর্লভ প্রতিবিম্ব। এই অহুত্ব তাঁহার জীবনের পথপ্রদর্শক, প্রকৃত ধর্মিকের ধর্মাহুত্বের সহিত ইহার সাদৃশ্য অত্যন্ত প্রকট।

জগতে যে গভীর রহস্য বিদ্যমান, সে রহস্য অনেক সময় মানবের মনকে আকর্ষণ করে। এই রহস্যের অহুত্বই সত্যকারের আর্ট (Art) এবং বিজ্ঞানের উৎস। বাহার অভিজ্ঞতায় এই অহুত্ব নাই, যে ভীতবিশ্বাসে বিশ্বরূপদর্শন করিতে পারে না, সে জীবমৃত; তাহার আত্মার মৃত্যু ঘটিয়াছে। ভয়রঞ্জিত এই রহস্যবোধ ধর্মেরও প্রকৃত উৎস। এমন একটি সত্তা আছে যাহার মধ্যে আমার স্তিমিত বুদ্ধি প্রবেশ করিতে পারে না, মনের মধ্যে তাহারই আভাস, অন্তরে অতি গভীর প্রজ্ঞা (reason) ও জলন্ত সৌন্দর্যের আংশিক প্রকাশ—এ সমস্তের যে অভিজ্ঞতা অহুত্বক্ষেত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার উপরই প্রকৃত ধর্ম প্রতিষ্ঠিত; এ অর্থে আমি অত্যন্ত ধর্মপ্রবণ। অনন্ত জীবনের রহস্য, বাস্তব জগতের যে অপূর্ব সংস্থা বিরাজিত, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস, জগৎকে জ্ঞানবুদ্ধির গোচরে আনিবার একাগ্র প্রচেষ্টা—এ সমস্ত লইয়াই আমি সন্তুষ্টচিত্তে, জীবন যাপন করিতেছি।

প্রিয়তমাসু

আবু জাকর ওবায়দুল্লাহ

এক

একটা ছেঁড়া গামছা ছিল,
তাই দে' দিলে ফাঁস,
ম'রেও মেয়ে দায় ঠেকালে,
ঢাকব কী দে' লাশ।

দুই

কুঁচবরণ কস্তে তোমার
মেঘবরণ চুল,
চুলগুলো সব বা'রেই গেল
সুঁজব কোথা ফুল।

তিন

তোমায় দেব ভেবেছিলেম
সাতনহরীর হার,
গলায় দড়ি তার চেয়ে কি
মন্দ অলঙ্কার?

চার

নাই-বা পেলাম পৃথিবীতে
ফুলশস্যার রাত,
কবরেতে জড়িয়ে নেব
তোমার চুলে হাত।

পাঁচ

পাতালপুরে তোমার বাসর-
শয্যা রচি আমি,
ছয় বেহারার পালকি চড়ে
কত্না এস তুমি।

জোনাক পোকা দীপ জ্বালাবে
চাঁদ যদি নেই জেগে,
বকুলঝরা মাটির ফুলে
তোমায় দেব ঢেকে।

ছয়

সোনার বরণ চাঁদ দেখেছি,
আরো সোনা কী,
গায়ে রূপের ঢল নেমেছে
সোনার লাবণি।

সোনার সোনা মাথিয়ে দেব
হলুদ বেটেছি,
সোনার দেহে লাগল কালি
উপায় করি কী?

সাত

চাপার বনে রঙ লেগেছে
তোমায় দেখে কি?
কেই-বা চাপা, কেই-বা তুমি
চিনতে পারি নি।

চাপার ডালে নিরাভরণ
ফুলের কাকনে
লুকিয়ে যদি রইলে তবে
চিনব কেমনে।

আট

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদেয় এলো বান,
মুক্তোবতী জল-কত্তার
বেজায় ভারী মান।

মান করেছে, বাগ করেছে,
খিল দিয়েছে ঘরে,
সেই বারতা র'টে গেল
কানা-গলির মোড়ে।

মিকির গানে বিষ্টি নামে
সরু আকাশ বেয়ে,
চুল বাধে নি, টিপ পরে নি
কানা-গলির মেয়ে।

নয়

কুঞ্চুড়ার ডালে ডালে
আগুন লেগেছে
পলাণবনে লাল-পরীরা
নাইতে নেমেছে,

কে দেখেছে? কে দেখেছে?
কন্তে দেখেছে,
নীল দীঘিতে স্বপ্ন-কলস
ভেসে উঠেছে।

কে বলেছে? কে বলেছে?
শালুক বলেছে,
এলো ধোঁপা বাঁধতে গিয়ে
কন্তে কেঁদেছে।

কে শুনেছে? কে শুনেছে?
কেউ তো শুনেছে,
সোনার কাকই খুঁজতে মেয়ে
জলে ডুবেছে।

প্রসঙ্গ কথা

ইংরেজ বনাম পূর্বপুরুষ

নারায়ণ চৌধুরী

পরিচিত কথাসাহিত্যিক শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় কলিকাতা গ্রাশনাল হাইস্কুল ভবনে অনুষ্ঠিত সম্প্রতিক এক সম্বর্ধনা-সভায় বাংলা-সাহিত্যের নতুন ধারা বিষয়ে কিছু আলোচনা করেন। শ্রোতার বা পাঠকের মনে চিন্তাশীলতার উদ্রেক করে এমন কিছু কিছু কথা এই আলোচনায় আছে, প্রসঙ্গে রায় মহাশয়ের কোন কোন মন্তব্য স্বচ্ছন্দ এবং সানন্দ চিত্তে গ্রহণ করবার পথেও অন্তরায় দেখি নে, কিন্তু ওই ভাষণে এমন একটি মন্তব্য তিনি করেছেন যার প্রতিবাদ করা জাতীয় আত্মসম্মানের দিক থেকে একান্ত আবশ্যক বলে মনে করি।

শ্রীযুত রায় আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের মূল্যবিচার-প্রসঙ্গে যে সকল কথা বলেছেন তার ভাল-মন্দ সম্পর্কে এখানে কিছু বলতে চাই নে। এ সকল প্রশ্ন যেহেতু কচির প্রশ্ন, রসগ্রহণ-ক্ষমতার তারতম্যের প্রশ্ন, সে-কারণে এ সব বিষয়ে বিভিন্ন মাত্রার মধ্যে মতৈক্য কিংবা মতভেদ হওয়া স্বাভাবিক। তা ছাড়া, সমকালীন বাংলা-সাহিত্যে ছোটগল্প ভাল লেখা হচ্ছে কি রম্যরচনা ভাল লেখা হচ্ছে এ সকল বিচার বৃহত্তর জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে কিঞ্চিৎ মূল্য-হীনও বটে। আমরা সাহিত্যব্যবসায়ীরা সাহিত্য-ভাবনায় এমন একমনস্ক ভাবে মেতে আছি যে, অনেক সময় অতি সাধারণ সাহিত্য-বিষয়ক প্রশ্নদ্বকেও অহুপাত-অতিরিক্ত মর্যাদা দিয়ে বসি।

কিন্তু এমন কিছু-কিছু বিষয় আছে যা সকলকে সম-ভাবে স্পর্শ করে এবং যার তাৎপর্য অতিশয় দূরপ্রসারী। বর্তমান নিবন্ধে শ্রীযুত রায়ের আলোচনার যে অংশটির উপর মনোযোগ স্থাপন করা হবে, তার সম্ভাব্যতাও এরূপ দূরপ্রসারী বলে আমাদের ধারণা। স্তত্রায় বিষয়টিকে অলক্ষ্য বা অনালোচিত রাখা কোন মতেই উচিত হবে না। আলোচ্য বক্তৃতার কোন কোন উক্তি নিয়ে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় কিছু আলোচনা হয়েছে, কিন্তু কেউ ওই বিষয়টি নিয়ে উচ্চবাচ্য করবার প্রয়োজন বোধ করে নি। তাতেই

প্রমাণ, শুধু বিষয়ের পরিবর্তে লঘু বিষয় নিয়ে মন্তক ঘর্ষাক্ত করতে আমরা সমধিক ভালবাসি, এবং অনেক সময় সক্রী় স্বার্থের তাড়নায় বৃহদ্ব্যাপারকে ক্ষুদ্র ব্যাপারের যুপকারে স্বেচ্ছায় বলি দিই। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলা-সাহিত্যে নতুন যুগ আসবে বলে আশা করা গিয়েছিল, সে আশা পূর্ণ হয় নি। শ্রীযুত রায়ের এই উক্তি নিয়ে লেখকদের মধ্যে মোরগোলের অন্ত নেই, কিন্তু তিনি যে অল্প একটি উক্তিতে বাঙালী লেখকদের প্রায় ইংরেজ বানিয়ে ছেড়েছেন সে দিকে কারও চোখ পড়ল না। অধিক বাস্তবায়ন করে আমরা বক্তৃতার সংশ্লিষ্ট অংশটি তুলে দিলাম—

“মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের নামমাত্র পারস্পর্য আছে। প্রথম প্রথম দেখা গেল খোলটা পুরোনো, কিন্তু নলচেটা নতুন। তার-পর দেখি নলচেটা বদলে গেছে, এখন খোল আর নলচে দুই নতুন। ছাপাখানা ছিল না, ছাপাখানা হল। গল্প ছিল না, গল্প হল। প্রবন্ধ ছিল না, প্রবন্ধ হল। উপন্যাস ছিল না, উপন্যাস হল। ছোট গল্প ছিল না, ছোট গল্প হল। নাটক ছিল না, নাটক হল। অমিত্রাক্ষর ছিল না, অমিত্রাক্ষর হল। সনেট ছিল না, সনেট হল। এমন কত কী ছিল না, কত কী হল। আবার তার প্রত্যেকটির কত রকম বিবর্তন হল। কেবল রূপ বা গড়ন নয়; ভাব অল্প প্রকার হল, মূল্য অল্প প্রকার হল। আধুনিক বাঙালীর মূল্যবোধ পরিবর্তিত হতে হতে যেখানে এসে ঠেকেছে সেখানে আধুনিক ইংরেজের সঙ্গে তার খুব বেশি প্রভেদ নেই। তার চেয়ে বেশি প্রভেদ তার নিজের পূর্বপুরুষের সঙ্গে।”

এ কথা খুবই সত্য যে, ইংরেজ-অভ্যুদয়ের পরবর্তী বাংলা-সাহিত্য আর মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্য ঠিক এক বস্তু নয়। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব বাংলা-সাহিত্যের যে নানা দিক দিয়ে মুক্তি ঘটেছে, তদ্বিষয়ে মুহূর্তেকের অল্প সন্দেহ করা চলে না। উক্ততাংশে কথিত

প্রতিটি নতুন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সংস্পর্শ-জনিত প্রভাবের ফল, এ কথার সারবস্তা নিয়ে সংশয়-প্রকাশেরও কোন কারণ দেখি না। ইংরেজী সাহিত্যের খাত-বেয়ে-আসা নতুন ভাবধারার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে আর কিছু হোক বা না-হোক, এই একটা মস্ত লাভ আমাদের হয়েছে যে, আমরা সাহিত্যে বিষয়বস্তুর এক-ষেমেমির পীড়ন থেকে মুক্তি পেয়েছি। বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের লীলা-প্রসঙ্গের অন্তহীন পুনরাবৃত্তি, মঙ্গলকাব্য-গুলির ভিতর বারংবার একই ধাঁচে লৌকিক দেবদেবী-সমূহের মাহাত্ম্যাবর্ণন, একই রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে সংখ্যাভীত অহুবাধের সঙ্কলন, চৌতিশা, যারমাশ্রা, সত্যপীরের গান, গাজীর গান প্রভৃতি নানান ধরনের লোকগীতিগুলির পরস্পরের মধ্যে ক্লাস্তিকর ভাবৈক্য দীর্ঘকাল ধরে বাংলা-সাহিত্যকে বৈচিত্র্যহীনতার নিরুদ্ধ পঞ্চলে নিমজ্জিত করে রেখেছিল। ইংরেজী সভ্যতার সঙ্গে সংস্পর্শ ও সংঘাত এই নিমজ্জনদশা থেকে আমাদের মুক্ত করে। ব্রিটিশ-উত্তর বাংলা-সাহিত্যে আমরা নানাবিধ বৈচিত্র্যের সন্ধান পাই—এই বৈচিত্র্য কি বিষয়বস্তু, কি রচনার ফর্ম উভয়ত সাধিত হয়েছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে, এই দুই মৌলিক বৈচিত্র্যপ্রয়াসের সূত্রেই আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের বাধাবদ্ধহীন অগ্রাভিধান সূচিত হয়।

কিন্তু তথ্য হিসাবে এ সকল কথার মূল্য এক, আর তা থেকে মনোমত সিদ্ধান্ত আহরণের চেষ্টা আর। ব্রিটিশ-শাসনের আওতায় ইংরেজী ভাবধারার সঙ্গে আমাদের যতই ঘনিষ্ঠ পরিচয় সংসাধিত হোক না কেন, মনোভাবের দিক দিয়ে আমরা আধুনিক ইংরেজের স্বগোত্র হয়ে গেছি, এ কথা আদৌ ঠিক নয়। আধুনিক ইংরেজের সঙ্গে আমাদের যে প্রভেদ, তার চাইতে অধিক প্রভেদ আমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে—এই উক্তির মধ্য দিয়ে এক ধরনের বিজাতীয়তা-প্রীতি প্রকাশ পেয়েছে বলে মনে করি। এই বিজাতীয়তা ইংরেজী শিক্ষার আবহাওয়ায় বহিত সমাজের উচ্চতলায় অধিষ্ঠিত একটি বিশেষ শ্রেণীর মানুষের জীবনে সত্য হ'লেও হতে পারে, কিন্তু তার সঙ্গে সাধারণ বাঙালী-জীবনের কোন যোগ নেই। বরং পরাহকরণের পথে না গিয়ে এই রুঢ় সত্য আমাদের স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে, আমরা

মনোভাবের দিক দিয়ে যে পরিমাণে পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য থেকে দূরে সরে যাবার চেষ্টা করেছি সে পরিমাণে চরিত্রভ্রষ্ট হয়েছি। ইংরেজ আমাদের শিখিয়েছে অনেক, ইংরেজী সাহিত্য থেকে আমরা জেনেছি প্রচুর। তা বলে পূর্ব-পুরুষের চাইতে আমরা ইংরেজের অধিক আত্মীয় হয়ে যাই নি। রিচার্ডসন-ডিরোজিওর শিষ্য 'ইয়ং বেঙ্গলের' প্রতিনিধিগণ এক সময়ে তা হতে গিয়েছিল, সেই উচ্ছৃঙ্খল দাপাদাপিতে না হয়েছে তাঁদের স্বকীয় কল্যাণ, না দেশের কল্যাণ।

কোন একটা দেশের কিছু-কিছু ভাল জিনিস গ্রহণ করলেই কেউ সেই বিশেষ দেশের অন্তর্ভূত হয়ে যায় না। ইংরেজের সাহিত্য ও জীবন থেকে আমরা বহুবিধ উপকরণ আহরণ করেছি সত্য, তার মানে এ নয় যে আমরা স্বদেশীয় ঐতিহ্যের ধারাবিচ্যুত হয়ে ইংরেজী সভ্যতার নিকট আত্মসমর্পণ করেছি। মানুষের মনোজীবনের উপর পূর্ব-পুরুষের উত্তরাধিকারের প্রভাব ক'মে গিয়ে যখন সেখানে বিদেশী প্রভাব বলবৎ হয়ে ওঠে তখন মানুষের আত্মিক মৃত্যু ঘটে। এ কথা কি ব্যক্তি, কি জাতি উভয়ের পক্ষে সমান সত্য। ভারতীয় সভ্যতার সনাতন ঐতিহ্যের সব কিছুই গ্রহণীয়, এমন কথা বলি না। বস্তুত তার কিছু কিছু মন্দ দিকও আছে। কিন্তু মন্দ দিক যেমন আছে তেমনি তার অনেক ভাল দিকও আছে। এই ভাল দিকগুলির সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের মধ্য দিয়েই ভারতীয় সভ্যতার অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তার ধারাবাহিকতা অঙ্গুল আছে একই কারণে। আমরা বহিজীবনে ইংরেজের পদ্ধতি-প্রকরণ যতই কেন না অহুসরণ করি, ইংরেজী সাহিত্যের ভাবসম্পদ দ্বারা যতই কেন না আমাদের মানসিক জীবন পরিপুষ্ট করে তুলি, পূর্বপুরুষের সঙ্গে আমাদের ভাবগত যোগ ছিন্ন হয় নি, ছিন্ন হবার নয়। তা যদি হ'ত, ভারতীয় হিসাবে, বাঙালী হিসাবে আমাদের অস্তিত্ব মুছে যেত, ভারতবর্ষের মাটিতে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও মানসিকতার দিক থেকে আমরা কতকগুলি দো-আসলা জীব হয়ে থাকতুম। আমরা যে এই অশ্রদ্ধেয় সঙ্কর অস্তিত্ব মেনে নিই নি তাতেই প্রমাণ, আজও আমরা মনে-প্রাণে বাঙালী আছি, ভারতীয় আছি; আধুনিক ইংরেজের তুলনায় আমাদের পূর্বপুরুষের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা অনেক

বেশি দূরপ্রসারী, গভীর, স্থায়ী। এ কথা যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, বরং এমন একটি স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপারে যে যুক্তিতর্কের অবতারণা করতে হয় সেইটেই পরিভাষার।

শ্রীযুত রায় ভাবধারার কন্টিনিউয়িটি এবং ডিস্কন্টিনিউয়িটির প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলতে চান, মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের ধারাবাহিকতার এমন মৌলিক পার্থক্য যে, এই দুইটি যুগের মধ্যে ধারাবাহিকতা বা পরস্পরের সম্পর্ক স্বীকার করে নেওয়া চলে না। ইতিমধ্যে ইউরোপখণ্ডে এমন কয়েকটি বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটেছে যার ফলে মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের স্বরূপের পার্থক্য স্পষ্টীকৃত হয়ে ওঠে, এবং এক সময়ে দুই যুগের বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়। বক্তার মতে এই বৈপ্লবিক সংঘটনগুলি হল রেনেসাঁ, রিফর্মেশন, ফরাসী বিপ্লব ও শিল্প-বিপ্লব (ইনডাস্ট্রিয়েল রিভলিউশন)। এ সকল ‘যুগান্তকারী’ ঘটনা ইউরোপে সংঘটিত হ’লেও এর ফল শুধু ইউরোপেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, ধীরে ধীরে সমগ্র বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। “এক এক করে এগুলির প্রতিধ্বনি ভারতে পৌঁছল। এর যোগফল ভারতের জীবনের সর্বস্তরে আধুনিকতা সঞ্চার করল। নাহিত্যেও।” এটি ঐতিহাসিক সত্য। কাণ্ডেই কথাগুলির সারবস্তুর সংশয় প্রকাশের কারণ দেখি না। কিন্তু তা থেকে এ উক্তি নিশ্চয় করা চলে না যে, আমাদের দেশের মধ্যযুগের ভাবধারার সঙ্গে আমরা সকল রকমের যোগ হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের মধ্যযুগীয় পূর্বপুরুষগণ আমাদের কেউ নন, পক্ষান্তরে আধুনিক কালের ইংরেজ হল আমাদের আত্মীয়তার মূল শরিক—এ জাতীয় মনোভাবের পিছনে যে মনস্তত্ত্ব সক্রিয় তার ভিতর স্বজ্ঞাতিলোহ তথা শোধানাতীত ইউরোপ-প্রীতি কিয়ৎ পরিমাণে মিশে আছে ব’লে মনে হয়। ভারতবাসীর স্বাধীনতালাভের পরিপ্রেক্ষিতে এই মনোভাব কোন ক্রমেই সমর্থন করা যায় না।

হয়তো বলা হবে আমার উক্তির মধ্যে সংকীর্ণ জাতীয়তার মনোবৃত্তির আভাস আছে, সূত্রাং তা অগ্রহণীয়। এখনকার কালের বহুমাত্র উদার আন্তর্জাতিকতার আদর্শের মানদণ্ডে এ-জাতীয় সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ স্বীকার করে নেওয়া যায় না। এ অভিযোগের

উত্তরে বলব, পূর্বপুরুষের সঙ্গে ভাবগত পরস্পরা রক্ষার প্রশ্নে জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতার কথা ওঠে না। পূর্বপুরুষের স্মৃতি আমাদের রক্তে, আমাদের সত্তার গভীরে পূর্বপুরুষগণের নিয়ত পদপাত। আধুনিক যুগের সরণি বেয়ে আমরা আন্তর্জাতিকতার বহু দূর পথ অতিক্রম করেছি সত্য, তা ব’লে পিতৃপুরুষের পুণ্যভূমি আমাদের লক্ষ্যের বহির্ভূত হয়ে যায় নি। যে কোন ভারতবাসী তথা বাঙালীর মনোজীবনের উপর একটু আঁচড় কাটলেই দেখা যাবে যে, ভারতীয় সংস্কার তার অস্তিত্বের শিরায় উপশিরায় প্রবল ধারায় বহমান। এইটে আমাদের পক্ষে অগৌরবের কথা নয়, বরং এইটেই বেঁচে থাকার সার্থকতার বড় প্রমাণ, বড় নিশানা। পূর্বপুরুষদের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তার যোগসূত্র এত ক্ষীণ নয় যে, সামান্য বাইরের সংস্পর্শে তা ছিন্ন বা শিথিল হয়ে যাবে। গেলে এ কথাই শুধু প্রমাণ হ’ত যে, ভারতবাসী হিসাবে আমরা বাঁচবার অধিকার হারিয়েছি; সে ক্ষেত্রে ধরাপৃষ্ঠ থেকে বাঙালী জাতির নাম মুছে গেলেও ক্ষতি ছিল না।

একটা কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে ভেবে দেখা দরকার। আমরা যখনকার মাল্লুখ তখনকার কালেই বাঁচি বটে, কিন্তু আমাদের চৈতন্যের মূল বহু গভীরে প্রোথিত, বহু দূর কালে সম্ভ্রান্তরিত থাকে। একটা গোটা জাতির বহু সহস্র বৎসরের ধ্যান-ধারণা আশা-বিশ্বাস স্বপ্ন-কামনা সংহত আকারে প্রতি উত্তরপুরুষের ভিতর বিরাজ করছে। ইচ্ছা করলেই কিছু সেই ঐতিহ্যসম্পন্ন ধারিঙ্গ করা যায় না। এ কথার প্রমাণ উনবিংশ শতাব্দীতে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষিগণ। এ কালের পটভূমিতে আমরা মুখ্যত ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত স্বদেশসেবাব্রতী বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতাদের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতে পারি। মাইকেল মধুসূদন কিংবা রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্মাস্তর গ্রহণ তাঁদের জাতীয়তাবাদের সূচনা করে নি; এক নামের ধর্ম থেকে অন্য নামের ধর্মে উত্তরণ তাঁদের মনোজীবনের বহিঃপ্রকাশ মাত্র স্পর্শ করেছিল। তাঁরা এবং তাঁদের অসংখ্য এই ধরনের অগ্রাগ্রা বিশিষ্ট কৃতিগণ মনে প্রাণে ছিলেন বাঙালী, এবং আজীবন তাঁরা মাতৃভূমির সেবা করে গেছেন। মাইকেল পূর্বপুরুষদের নিকট তাঁর

অপরিমেয় ঋণের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক'রে গেছেন এবং ধর্মাত্মের গ্রহণের সূত্রে জাতীয় সংস্কার থেকে আপনাকে বিচ্যুত করবার সাধনা করতে গিয়ে কী ভুল করেছিলেন, মর্যাস্তিক অহুশোচনার মধ্য দিয়ে নিজেই সেই খেদ প্রকাশ ক'রে গেছেন। বিদেশী জীবনযাপন-প্রণালী ও বিদেশী বৈশবাস-অবলম্বন করেছিলেন ব'লেই মাইকেল কিছু বিদেশী ব'নে যান নি। ইউরোপীয় কাব্যসাধনার শ্রেষ্ঠ সংস্কার তাঁর কাব্যে রূপায়িত হয়েছিল ব'লেই তিনি কিছু ইউরোপবাসীর স্বজাতীয় হয়ে যান নি। সাময়িক বিশ্বরণের বশে পূর্বপুরুষের যে ঐতিহ্য তিনি অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন, সেই ঐতিহ্যের স্মৃতি তাঁর সত্তার গহনে অস্তর্লীন থেকে তাঁকে চরম স্বপ্নভঙ্গের আঘাত দিয়ে পুনরায় স্বস্থ করেছিল। শ্রীমধুসূদনের মোহনিত্রা থেকে জাগরণ চরম বেদনার জাগরণ—ওই বেদনার মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর হারানো জাতীয় সত্তাকে খুঁজে পেয়েছিলেন।

এ তো গেল গত শতকের কথা। তখন আধুনিকতার পর্বের সবে শুরু। বর্তমান শতকে আধুনিক যুগের অভিধান বহু দূর অগ্রসর হয়েছে, এ কাল থেকেও অম্লরূপ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যায়। আমরা শ্রীঅরবিন্দের নাম করতে পারি। শ্রীঅরবিন্দকে অবশ্য ধর্মাত্মের পরিগ্রহের মানি ও বেদনা সহিতে হয় নি, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ধর্মবুদ্ধির স্থান গ্রহণ করেছিল ইউরোপীয় শিক্ষাদীক্ষা কৃতি ও মেজাজ। সকলেই জানেন, শ্রীঅরবিন্দের বাল্য ইংলণ্ডে কেটেছে। তাঁর শিক্ষাদীক্ষাও বিলাতে। তিনি যখন বরোনার শিক্ষা-বিভাগের চাকুরি গ্রহণ ক'রে এ দেশে আসেন, তখন তিনি ছিলেন পুরোনস্তর সায়েব। বাইরের আচার-আচরণে না হ'লেও মেজাজ এবং মানসিকতার দিক থেকে তো বটেই। কেন না, ইউরোপীয় শিক্ষার প্রকৃতির মধ্যেই এমন কিছু-একটা আছে, যা মানুষের সহজ মানসিকতার রূপান্তর ঘটায়, বিশেষ সে শিক্ষা যদি ইউরোপের মাটিতেই অর্জিত হয়। শ্রীঅরবিন্দের বেলায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ ছিল না। কিন্তু এমন যে সায়েব অরবিন্দ, যিনি তাঁর মাতৃভাষাও ভাল ক'রে জানেন না, মাস্টার রেখে থাকে বাংলা জিজ্ঞাসে হয়, তিনি যখন তাঁর মনোজীবনের অপূর্ণতা উপলব্ধি ক'রে ভারতীয় শিক্ষা ও সাধনার অন্তরে প্রবেশ করলেন, দার্শনিকালসিক্ত পূর্বপুরুষের সংস্কার যেন তাঁর রক্তে

কথা ক'রে উঠল। তারপর বহু কাল একটানা চলল আত্ম-আবিষ্কারের পালা, জাতীয় ধর্ম, ঐতিহ্য ও রীতিনীতি গভীর অন্ধার আত্মস্বকরণের ছেদহীন প্রক্ৰিয়া। শ্রীঅরবিন্দের পরেকার ইতিহাস দেশবাসীর নিকট সুবিদিত। আমরা সবাই জানি, শ্রীঅরবিন্দের পরবর্তী মনোবিকাশের ইতিহাসে জাতীয়তাবাদী আশা আকাঙ্ক্ষা অভীক্ষা ও তৎসংলগ্ন সংগ্রামী প্রয়াস একটা মন্ত বড় জায়গা জুড়ে আছে। এখানে সে কথা বিবেচ্য নয়, বিবেচ্য শ্রীঅরবিন্দের জীবনরহস্যের সংবাদ। কোথায় ছিল এই পূর্বপুরুষের সংস্কার যখন অরবিন্দ বিলাতে ব'সে আর পাঁচজন ইংরেজ বালকের মত গ্রাক ও ল্যাটিন ব্যাকরণ অভ্যাস করতেন, ইংরেজের ছাঁদে চলতেন ফিরতেন কথা বলতেন?—ছিল তাঁর অস্তিত্বের গহনতম প্রদেশে, ছিল তাঁর চৈতন্যের মর্মমূলে, ছিল তাঁর অস্থিতে মজ্জায় শোণিতে। সেই প্রস্তুত প্রবৃত্তি যখন অমূল্য পরিবেশ পেলে, পেলে মাতৃভূমির পুণ্যমুস্তিকার সঙ্গীবনী আলো-হাওয়ার স্পর্শ, দেখতে দেখতে তা পূর্ণ জাগরিত হয়ে শ্রীঅরবিন্দের জীবনের ধারা আমূল বদলে দিয়ে গেল।

এমনিই হয়, এমনিই ঘটে থাকে। নইলে কে কবে ভাবতে পেরেছিল যে, শ্রীজগদ্বলাল নেহরুর মত স্বজাতি-বিমুখ পাশ্চাত্যভিমুখী হারোয়-পড়া ছেলে মনেপ্রাণে ইংরেজী সভ্যতার অমুরাগী হয়েও পরিণত জীবনে ভারত-আবিষ্কারের সাধনায় আত্মনিয়োগ ক'রে তাঁর পূর্বতন আত্মসিক্ত ইউরোপপ্রীতির প্রায়শ্চিত্ত করবেন? শ্রীনেহরুর ভারত-আবিষ্কার প্রকারান্তরে তাঁর নিজেই আবিষ্কার। শ্রীনেহরু বাঙালী নন যদিও, তবে তাঁর দৃষ্টান্ত অতিমাত্রায় ইউরোপসচেতন যে-কোন ইংরেজীশিক্ষাভিমাত্রী 'আধুনিক' বাঙালীর দৃষ্টান্তের প্রতিতুলনাস্বরূপ গণ্য হতে পারে। ধারাবাহ্যে, দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্বাসে আধুনিক ইংরেজের সঙ্গে শ্রীনেহরুর নানা দিক দিয়ে মিল ছিল, সেই তুলনায় পূর্ব-পুরুষের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য দৃশ্যত ছিল সামান্য। কিন্তু জাতীয়তাবাদী মুক্তি সংগ্রামের সূত্রে দেশবাসীর স্বধর্ম-অংশীদার হতে গিয়ে, দেশের জন্ত লাঞ্ছনা বরণের মধ্য দিয়ে কী অভূতপূর্ব উপলব্ধিই না তাঁর হ'ল! আর ওই নবোন্মিত গভীর উপলব্ধির হাত ধরে সত্যিকার ভারতের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হতে এবং তদবসরে ভারতের আত্মাকে খুঁজে

পেতে ত্রিনেহরুর বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। গান্ধীজী এই ক্ষেত্রে ত্রিনেহরুর প্রাথমিক পথপ্রদর্শক ছিলেন, বাকি পথ জগদ্বরলাল নিজেই চেষ্টাতেই অতিক্রম করেন। জগদ্বরলালের 'দি ডিস্‌কভারি অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থ এই সার্থক পথ অতিক্রমণের এক মনোজ্ঞ দলিল।

শ্রীযুত রায় সাহিত্যে আধুনিকতার কথা বলেছেন। শ্রীযুত রায়ের মত পর্যালোচনা করবার উদ্দেশ্যে বাংলা-সাহিত্য থেকে আমরা ছুটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করব। আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের দুই প্রধানতম পুরুষ হলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। এরা দুজন পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত ছিলেন, পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে ভাবধারা ও আঙ্গিকের উপকরণ দুজনেই আহরণ করেছেন প্রচুর। ইংরেজী সাহিত্যের আবহাওয়ায় বঙ্কিম ও রবীন্দ্র-সাহিত্য সমাচ্ছন্ন বললেও চলে। তা ব'লে এমন কথা কোন মতেই বলা চলবে না যে, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একালীন ইংরেজের যে ভেদ, তা থেকে অধিক ভেদ ছিল তাঁদের স্বীয় পূর্বপুরুষের সঙ্গে। এমন কথা আভাসে বললেও বঙ্কিম এবং রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের প্রতি অবিচার করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহ্যপ্রীতি সুবিদিত, ভারতীয় পূর্বপুরুষগণের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এত গভীর ছিল যে অনেকে এই সূত্রে তাঁকে রক্ষণশীল বলতেও দ্বিধা করে নি। হয়তো বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ধাতুগত স্বভাবে কিয়ৎপরিমাণে রক্ষণশীল ছিলেন, সেই তথ্যের ভালমন্দের মধ্যে না গিয়ে ওটিকে শ্রীযুত রায়ের অভিমতের প্রতিকূল নজিররূপে খাড়া করা যায়। রেনেশাঁ, রিকর্মেশন, ফরাসী বিপ্লব, শিল্প-বিপ্লব প্রভৃতি ঘটনার ঐতিহাসিক তাৎপর্য সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র সবিশেষ অবহিত ছিলেন, ফরাসী-বিপ্লব ও শিল্প-বিপ্লবের খাত-বেয়ে-আঙ্গা সমসাময়িক সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার সঙ্গেও এই বাঙালী মনীষীর পরিচয় ছিল নিবিড়। কৌতের পজিটিভিজম ও মিলের হিতবাদের অন্তর্গত মানবতাবাদী ভাবাদর্শ তিনিই ব্যাপকভাবে বাংলা ভাষায় প্রচার করেন। ইউরোপখণ্ডে সংঘটিত এ শতাব্দীর সমাজতাত্ত্বিক বিপ্লব বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে অবশ্য তাঁর জীবদ্দশায় দূরদর্শন করা সম্ভব ছিল না, তবে এমনতর বিপ্লবের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে যে তিনি অচেতন ছিলেন না তাঁর অধুনা-বাতিল 'সাম্য' গ্রন্থে সে কথার প্রমাণ মিলবে। এত সব সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র মানসিক

ভাবনামা হারান নি, তিনি তাঁর স্বদেশীয় ঐতিহ্যের আশ্রয়-ভূমির উপর দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান থেকে প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় ভূখণ্ডের আলো-হাওয়ার আগম-নির্গমের জ্ঞান স্বীয় মনো-বাতায়ন মদা-উন্মুক্ত রেখেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ হওয়ার সাধনা করেন নি, পক্ষান্তরে ইংরেজের চিন্তায় ও কল্পনায় যা-কিছু ভালর মদান পেয়েছেন তার দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে পরিপুষ্ট ক'রে তুলেছেন। পূর্বপুরুষের ত্যক্ত উত্তরাধিকারের সম্পদবৃদ্ধির জগাই মূলত বঙ্কিমচন্দ্রের ইউরোপীয় ভাবধারার অচুশীলন; ইংরেজ হবার স্বপ্ন তাঁর কল্পনায়ও স্থান পায় নি।

রবীন্দ্রনাথ ভারতের জাতীয় ঐতিহ্যে হৃদভাবে স্থিত ছিলেন। ভারতীয় শিল্পসংস্কৃতি ও ধর্মসাধনার অগ্রনায়ক পূর্বসূরী মাত্রেয়ই তিনি ছিলেন সার্থক উত্তর-সাধক। কবির সুবিদিত আন্তর্জাতিকতাবাদ, বিশ্বদৃষ্টি, শেলী-কীটস-সুইনবার্ন-প্রীতি কিছুই তাঁকে তাঁর পূর্বপুরুষের সংস্কার থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। আধুনিক কালে তিনি ছিলেন উপনিষদীয় ভাবধারার শ্রেষ্ঠ উদ্গাতা। রেনেশাঁর অন্তর্নিহিত চিন্তের মুক্তির আদর্শ, ফরাসী বিপ্লবের অন্তর্নিহিত সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার আদর্শ কবির কল্পনাকে উচ্চকিত করেছে সন্দেহ নেই, তবে তার চাইতেও বোধ হয় তিনি বেশি প্রভাবিত হয়েছেন উপনিষদের আত্ম-সমাহিত প্রশান্ত ধর্মবোধের দ্বারা, বৌদ্ধধর্মের সঙ্কর্য ও অহিংসার দ্বারা, ভারতের মধ্যযুগের সাধকদের সহজিয়া পন্থী উদার মানবতাবাদী আদর্শের দ্বারা। ইউরোপ-খণ্ডে রেনেশাঁ যদি যুগান্তকারী সংঘটন হয়, তবে ভারতের মধ্যযুগে বৈষ্ণবধর্মের অভ্যুত্থানও কিছু কম যুগান্তকারী সংঘটন নয়। খ্রীষ্টতত্ত্বের আবির্ভাব সমগ্র বিশ্বের পটভূমিতে একটি অপরিহার্য তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনারূপে চিহ্নিত হওয়া উচিত, ক্ষোভ এই যে ঘটনাটির গুরুত্বের বোধ ভারতের অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল। আবার, সমাজতাত্ত্বিক বিপ্লবের আদর্শ যদি এ কালের এক শ্রেষ্ঠ আদর্শ হয়, তবে তার পিঠে গান্ধীজীর সত্য ও অহিংসার আদর্শকে শ্রেষ্ঠতর আদর্শ হিসাবে অনায়াসে স্থাপন করতে পারি। উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে উপায়ের বিশুদ্ধতার উপর গুরুত্ব আরোপ ক'রে গান্ধীবাদ পশ্চিমী সমাজতত্ত্ববাদ থেকে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে

গেছে। গান্ধীবাদ সাম্যবাদ অপেক্ষা স্বতই অধিকতর বৈপ্লবিক সম্ভাবনাপূর্ণ, দূরপ্রসারী, আয়াসসাধ্য ব্যাপার।

সত্য বলুন, অহিংসা বলুন, এ সবারই মূল ছিল আমাদের পূর্বপুরুষের জ্ঞানের সঞ্চয়ের ভিতর। আর রবীন্দ্রনাথের শিল্পকর্মের মধ্যে ওই চিরন্তন ভারতীয় সাধনার বাণীই সব ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ প্রতিটি ভারতীয় বিপ্লবী ভাবের আন্দোলন থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তাঁর কাব্য-সাহিত্যকে পুষ্ট করেছেন। এর দ্বারা তাঁর বিশ্বদৃষ্টি আচ্ছন্ন হয় নি, বরং স্বচ্ছতর হয়েছে। পূর্বপুরুষের সাধনার শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের সঙ্গে রবীন্দ্র-সাহিত্য গভীরভাবে যুক্ত বলেই তদন্তগত আধুনিকতার ভাবটি এত পাকা, এত জোরালো। মধ্য-যুগের উৎকৃষ্ট ভাবরাজি (যেমন বৈষ্ণব ধর্ম, যেমন কবির দাছ নানক সুরদাস প্রমুখ সমস্ত শ্রেণীর মানুষের প্রচারিত উদার মানবধর্ম)-র সঙ্গে রবীন্দ্রমানসের কন্টিনিউয়িটি যদি নষ্ট হয়ে যেত, তা হ'লে রবীন্দ্রনাথকে ভারতবাসী আমরা এমন নিকটজন হিসাবে পেতাম কিনা সন্দেহ। পুনরায় বলি, এটি সঙ্গীর্ণ জাতীয়তার কথা নয়, অতীতপ্রয়িতাও একে বলা চলে না। প্রতিভার স্মৃতি সব দেশে সব কালে মুখ্যত জাতীয় ভাব অবলম্বন করেই ঘটে এসেছে। আমরা আন্তর্জাতিক আদর্শের পরম অহুসারী হলেও জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জন দিতে পারি না। উদার মানবতাবাদের মধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় বৈশিষ্ট্য দুইয়েরই স্থান আছে, থাকা উচিত। জাতীয় চৈতন্যবিবজ্জিত যে বিশ্বচৈতন্য, তা শূন্যগর্ভ অতএব অশ্রদ্ধেয়।

আরও এক দিক থেকে শ্রীযুত রায়ের মত পরীক্ষা করা যেতে পারে। এই পরীক্ষা বক্তার প্রতি অকৃত্রিম প্রত্যাশাবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ, সে কথা পরিষ্কার করে নেওয়া ভাল। শ্রীজগদীশচন্দ্র ওই ভাষণেরই উপসংহার করেছেন এই বলে যে, সাহিত্যে নবযুগের সূচনা দেখা দিয়েছে। এই নবযুগ আসবে আধুনিক সংস্কৃতির সঙ্গে লোকসংস্কৃতির সম্মেলন মধ্য দিয়ে। “যুগটাই ধীরে ধীরে বা দ্রুতবেগে জনগণের অভিমুখে চলেছে, কিংবা বলতে পারো, জনগণকে নিজের অভিমুখে টেনে আনছে। এই যে জনসংযোগ এটা রাজনীতিক্ষেত্রে যেমন রূপই নিক

না কেন, সাহিত্যে এর রূপ হবে আধুনিক সংস্কৃতির সঙ্গে লোকসংস্কৃতির সম্মেলন। কেমন করে এটা সম্ভব হবে জানিনে, কিন্তু এই একমাত্র পথ।” কথাগুলি স্মরণ। তবে জিজ্ঞাস্য এই, লোকসংস্কৃতির প্রতি এই আস্থা-পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যের প্রতি আস্থারই নামান্তর নয় কি? লোকসংস্কৃতি দেশের সাধারণ মানুষের গূঢ়তম আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন-দুঃখের প্রতিচ্ছবি। জাতীয় ঐতিহ্যে এর আশ্রয়, জাতীয়তায় এর বিস্তার। শ্রীযুত রায় নিজেই তাঁর এক নিবন্ধে লিখেছেন যে, লোকসাহিত্যের সঙ্গে যোগসূত্র ক্ষীণ হ'লে সাহিত্যের রসগন্ধ ক্ষয়ে পড়ে। লোকসাহিত্যের সঙ্গে এ কালের বাংলা দেশের সম্পর্ক লুপ্তপ্রায়। সেইজন্যে রসের ভাণ্ডারও নিঃশেষিত হয়ে আসছে। [“হারামণি”, “আধুনিকতা”] তাই যদি হয়, তার দ্বারা প্রকারান্তরে এই স্বীকারোক্তিই কি করা হচ্ছে না যে, আধুনিক সাহিত্যের উপর রেনেসাঁর বিকর্ষণ, ফরাসী বিপ্লব, শিল্প-বিপ্লব এমন কি একালীন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাবই যথেষ্ট নয়, আধুনিক সাহিত্যকে সত্যকার মনোজ্ঞ রূপ দিতে গেলে তাকে জাতীয় ভাবে স্থিত লোকসংস্কৃতির সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকে দু'হাতে উপকরণ আহরণ করতে হবে? লোকসংস্কৃতি যেহেতু জাতীয় মনের দর্পণ, সেই হেতু লোকসংস্কৃতির চর্চা মানেই জাতীয়তার চর্চা। স্তব্ধতা বোঝা গেল, আধুনিক ইংরেজের সঙ্গে ভাবসাম্য স্থাপন করাই একালীন বাঙালীর পক্ষে যথেষ্ট নয়, তার মনে একটা মস্ত স্ফূর্তি ফাঁক রয়েছে, আর এই ফাঁক শ্রীযুত রায় লোকসংস্কৃতির দ্বারা ভরিয়ে তোলবার পরামর্শ দিয়েছেন। সুবিজ্ঞ বক্তার বিশ্লেষণ অনুসারে যদি সত্যই বাঙালীর জীবনে এমনতর দুর্দৈব ঘটে থাকে যে, সে পূর্বপুরুষের চাইতে আধুনিক ইংরেজের সঙ্গে সমধিক আত্মীয়তা অনুভব করে, সে ক্ষেত্রে আত্মসম্মতিক পাশ্চাত্যমুখিনতার অসমরতা স্বতই প্রমাণ হয়ে পড়ে। শ্রীযুত রায়ের বহুলপঠিত এপিক উপন্যাস ‘সত্যাসত্য’-এর নায়ক বাদল জাতীয় ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে ইংরেজিয়ানার উপাসনা ও অহুসীলন করতে গিয়েছিল, লেখক বাদলের জীবনের ব্যর্থতাই সে গ্রন্থে চিত্রিত করেছেন। এ সব নজির থেকে এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত যে, পূর্বপুরুষকে অস্বীকার করে নয়, পূর্বপুরুষের সঙ্গে সমধিক আত্মীয়তার চর্চার দ্বারাই শুধু বিজাতীয়তার বিষবৃত্ত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব, এ ছাড়া যোগ প্রতিষেধের অস্ত্র শুদ্ধ নেই।

চিরন্তন

বাণী পালচৌরুরী

সেদিন উষাকালে প্রথম যখন তাকিয়ে দেখেলেম,
একান্ত তৃপ্তিভরে দেখেছিলাম আকাশ ছিল নীল ;
তার সাথে মিল ছিল বুঝি আমার খুশি মনেরও :

এটুকু ছিল তো জানা, সেই একই আকাশে রয়েছে
তোমারও আশিষল,
একই উজ্জল হুরে বাঁধা ছিল তোমারও বীণাখানি,
মনেও তোমার উঠেছিল সেই আনন্দই রণরণিয়ে—
সে যে কী আবেগ, কী তীক্ষ্ণতা, তা তো বলে
বোঝাতে পারি নে।

ধরাও যায় নি, ছোঁয়াও যায় নি, সকল মন ভ'রে
ছিল যে স্বরাস্থানি,
তবু ইচ্ছা তো হয়েছিল, কল্পরীর গঞ্জে পাগল
হরিণীর মত অহেতুক উজ্জলতায় অকারণেই ছুটে বেড়াই।

যেমনই ছিল সে অখীর আকুলতা,—হায়, অস্থির
গতিও তার তেমনই,
মিলালও তাই অকস্মাৎ ;
সে যে ক্ষণিকের ; বর্ষাশেষের ইন্দ্রধনুচ্ছটার মত বর্ণোজ্জল,
আবার লুপ্তও হ'ল তেমন নিমেষে।

তবু, তবু—অবসান কি হয় এত সহজেই !
হৃদয়ের অন্তস্থলে সন্ধান করলে যে দেখি,
অন্তরে মণিদীপ যে সেই সাক্ষ্য দিয়ে জ্বলছে অনিবার্ণ :
—স্বপ্নপরিসর সেই কয়টি মুহূর্ত
তারা তো নয় ক্ষণিকের—তারা যে চিরকালের।

তারপরে গত হ'ল কত দিন, এল গেল কত লোক,
ঘটল তো কতই স্মরণীয় ঘটনা।
কিন্তু তবু তাদের সবার উপরে, ফুটে রইল ভাস্বরতম
সেই উষাকালটি—চিরদিনের পাথের আমার দিল সে
স্বপ্ন ভ'রে।

বর্ষাসজল আবণ-সন্ধ্যায় সেই যে পড়েছিলাম মহাকবির কাব্যে,
আজ হ'ল তার নবোপলব্ধি।
কাঞ্চনের আবেষ্টনে হয়ে উঠেছে আরও প্রদীপ্ত মহামূল্য
মণিকিরণ
সেইমত—‘তোমারও ভাল লেগেছিল’ শুধু এই ভাবটুকুই
উজ্জলিত আনন্দে আমার ক'রে তুলেছে আরও
ধীপ্তিমান

সকল অনাগত দিনের তরে ॥

বাহির্বিশ্ব

ইউরোপে রবীন্দ্রনাথ

পি. ফাল্গো এম. জে.

১৫ বৎসর আগে একজন বিদেশী সাহিত্যিক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন, “ভবিষ্যতে পৃথিবীর সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পড়বার ব্যবস্থা থাকবেই, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের লেখা যাতে সবাই অমূল্য ছাড়া পাঠ ক’রে পূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারে।” তিনি এই কথা উপলব্ধি করেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র আমাদের বঙ্গদেশের কবি নন। বিশ্বের সাহিত্য-দরবারে বাঙালী কবির অমর কাব্যসৃষ্টি জগৎ-বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ কবিদের সৃষ্টির সমতুল্য, এটা তো অনস্বীকার্য। জগতের সর্বস্থানে বহু রসপিপাসু ছাত্র ও সাহিত্যরসিক ব্যক্তি পোখে, হাইনে, রিল্কে প্রভৃতি জার্মান কবিদের কবিতা পড়বার সোডে জার্মান ভাষা আয়ত্ত করেছে; বোম্বেলয়ার মালার্মে রিঁবো ভালেরি ক্লোদেল ইত্যাদি ফরাসী কবিদের গ্রন্থ মূলভাষায় পাঠ করবার আগ্রহে অনেকে ফরাসি শিখেছে। ইউরোপের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক তো রয়েছেন; কালিদাসের শকুন্তলা, জয়দেবের গীতগোবিন্দ ইত্যাদি কাব্যের রস কি অমূল্য উপভোগ করা যায়। আমাদের রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এঁদের কারও অপেক্ষা ছোট নন।

তবু দুঃখের সঙ্গে এই কথা আজ এখানে বলতে চাই যে, পাশ্চাত্য জগতে রবীন্দ্রনাথের নাম ও কীর্তি দ্রুত বিলুপ্ত হতে চলেছে। ‘গীতাঞ্জলি’র কবি রবীন্দ্রনাথের নাম একদিন পাশ্চাত্যের সকল দেশে সম্মান ও সমাদর লাভ করেছিল। ইংরেজ কবি ইয়েট্‌স্‌, ফরাসী সাহিত্যিক আন্দ্রে জিদ, স্পেনীয় লেখিকা গাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল প্রভৃতি বহু রসগ্রাহী পাশ্চাত্য মনীষী বাঙালী কবির আবির্ভাব ও অহিমায় সংবাদ প্রচার করেছিলেন। আমার মনে আছে, ছেলেবেলায় জিদের অনূদিত ‘গীতাঞ্জলি’ ও ‘ডাকঘর’ পাঠ ক’রে কত আনন্দ পেয়েছিলাম। ইংলণ্ড,

ফ্রান্স, স্পেন ও দক্ষিণ আমেরিকা, ইতালি, জার্মানি প্রভৃতি দেশের সাহিত্য-জগতে ‘গীতাঞ্জলি’র আবিষ্কার কি যে আলোড়ন জাগিয়েছিল, কত আশা ও প্রতীক্ষা সঞ্চার করেছিল—এই কথা সকলেই জানেন। চল্লিশ বৎসর অতিবাহিত হয়েছে, বিদেশে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আর কে পড়ে! গত বৎসরে আমি বেলজিয়াম ফ্রান্স ইতালি ঘুরে এসেছিলাম। গভীর লজ্জা ও দুঃখের সঙ্গে সেখানে গিয়ে বুঝেছিলাম, দু-একজন প্রবীণ ব্যক্তি ছাড়া আর রবীন্দ্রনাথের নাম কেউ জানে না। সেখানকার কোনও সাহিত্যপত্রে তাঁর সম্বন্ধে আর কেউ কিছুই লেখে না। তাঁর অধিকাংশ কাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক কিংবা প্রবন্ধ-সাহিত্যের অমূল্য কোনদিন হয় নি এবং যা কিছু অমূল্য কোনমতে করা হয়েছিল তার বেশির ভাগ আর ছাপা নেই। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের দ্বারা এমন ভাবে উপেক্ষিত ও বিস্মৃত হয়ে গিয়েছেন কেন? এর নানাবিধ কারণ আছে সম্ভবতঃ নেই। দু-একটি কারণ উল্লেখ করব মাত্র।

৪০ বৎসর পূর্বে ‘গীতাঞ্জলি’ যখন পাশ্চাত্যের ভাষা-গুলিতে অনূদিত হয়, তখন ইয়েট্‌স্‌, “A. E.” অর্থাৎ জি. রাসেল, ম্যাটেলিক, রমি রল্‌ ইত্যাদি লেখকেরা বহুজনপ্রিয় ছিলেন। এঁদেরই সহধর্মী ও নমজাতীয় বলে ‘গীতাঞ্জলি’র কবি সহজে জনপ্রীতি অর্জন করেছিলেন। বর্তমান কালে ইয়েট্‌সের কবিতা আর তেমন আদৃত হয় না, ম্যাটেলিক রাসেল রল্‌ প্রায় বিস্মৃত হয়ে গিয়েছেন। ‘গীতাঞ্জলি’ ও ‘ডাকঘর’-এর ফরাসী অমূল্যক আন্দ্রে জিদ পর্যন্ত আজ অনাদৃত। ‘গীতাঞ্জলি’র লেখকও সেইরূপ অনাদৃত ও বিস্মৃত।

‘গীতাঞ্জলি’র লেখক হিসাবেই যদি রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার না পেতেন, তা হ’লে বোধ হয় তাঁর প্রতি একপ অবিচার ও অনাদর কখনও হ’ত না। দ্বারা কবিগুরু

কাব্য মূল বাংলা ভাষায় পাঠ করেছে তারা তো জানে যে, 'গীতাঞ্জলি' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি নয়। কিন্তু বিদেশে সে কথা কে বা জানে! তা ছাড়া তারা 'গীতাঞ্জলি' পাঠ করেছে ইংরেজী অম্ববাদে; এই অম্ববাদ বর্তমানে স্বন্দর হোক না কেন, মূল কবিতাগুলির রস তাতে পাওয়া সম্ভব হয় না।

আমি পাশ্চাত্যের নানা স্থানে জোর করে এই কথা বলেছি যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টি সম্যকভাবে বিচার করতে হ'লে তাঁর 'মিষ্টিক' কবিতাগুলি বাদ দিয়ে নতুন করে আবিষ্কার করতে হবে তাঁর অপূর্ব রোমান্টিক কবিতা, তাঁর সকেতধর্মী বা সিঙ্কলিষ্ট কবিতা। কিন্তু সেই সব কবিতার কি অম্ববাদ আছে? দু-একটা আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রীয় সাহিত্যের অম্ববাদ মোটেই সফল ও সন্তোষজনক হয় নি।

বিদেশের কাছে রবীন্দ্রনাথের যে পরিচয়, সেই পরিচয় আংশিক মাত্র। সেখানে অনেকে মনে করে যে, রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত ও প্রধানত একজন দার্শনিক ও ঋষি ছিলেন। তিনি একজন সাধক-কবি ছিলেন; দর্শনযোগে সাধনাযোগে যে অপারিখ অম্বভূতি লাভ করেছিলেন সেইটি তাঁর কাব্যের মুখ্য উপাদান। এই ভ্রান্ত ধারণার জন্মই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মহিমা ও কাব্যগৌরব তারা উপলব্ধি করতে পারে নি। করবেই বা কেমন করে?

আমরা যদি 'মানসী' ও 'চিত্রা' না জানতাম; "এবার কিরাও মোরে" "স্বর্গ হইতে বিদায়", "উর্বশী", "স্বয়ম্বেদ প্রার্থনা", "বধু", "মেঘদূত" ইত্যাদি কবিতাগুলির ছন্দোময় ভাবাবেগ ও চিত্রময় কল্পনা-প্রাচুর্যের সন্ধান না পেতাম; তবে কি রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ পরিচয় লাভ করতাম? 'কথা' ও 'কাহিনী'র অনিন্দ্যস্বন্দর ব্যালাভগুলি "বন্দী বীর", "পূজারিণী", "গাঙ্গারীর আবেদন", "কর্ণকুন্তী-সংবাদ", "দেবতার গ্রাম" ইত্যাদি না জানলে রবীন্দ্রনাথের কি বা জানতাম? 'বলাকা'র "ছবি", "চঞ্চলা", "সবুজের স্নিগ্ধান", "শা-জাহান" ও "বলাকা" কবিতাটি যদি না পড়ে থাকতাম, তা হ'লে আমরা কি তাঁকে বোমবেলার বা রিঁবোর চেয়ে বড় ব'লে মনে করতাম? 'পুনশ্চ' 'গ্রামলী' 'নবজাতক' 'মানসী' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে এলিয়ট অডেন স্পেন্ডার ক্লোয়েল-এর রসগ্রাহী

পাঠক আমরা কি রবীন্দ্রনাথের পূর্ণতা উপলব্ধি করতাম?

বিদেশে যদি আমাদের কবি যথোচিতভাবে সমাদর না পেয়ে থাকেন, তার জন্য আমরা দায়ী। আমরা তাঁর বিশাল ও বহুবিচিত্র সাহিত্যসৃষ্টির অম্ববাদ ও আলোচনা আংশিকভাবেই করেছি এবং যে অংশটুকুর পরিচয় দিয়েছি সেই অংশ কবির শ্রেষ্ঠ কীর্তি নয়।

আমি সকলকে একান্তভাবে অনুরোধ করছি, নতুন ভাবে বাঙালী কবিগুরুর শ্রেষ্ঠ কবিতাবলী অম্ববাদ করার ব্যবস্থা করুন। এই নতুন অম্ববাদে যাতে কবির পূর্ণ পরিচয় ফুটে ওঠে তার দিকে লক্ষ্য রাখুন। এই অম্ববাদে 'গীতাঞ্জলি'র আধ্যাত্মিক কবিতার সঙ্গে, 'কড়ি ও কোমল'এর লৌকিক আনন্দ, 'মানসী' ও 'চিত্রা'র রোমান্টিক চিত্রধর্মী কল্পনা, 'সোনার তরী'র স্বপ্নাবিষ্ট ভাবুকতা, 'কথা' ও 'কাহিনী'র ঐতিহাসিক স্মৃতির সহজ গভীরতা যাতে স্থান পায়। 'বলাকা'র সঙ্গে যাতে এই অম্ববাদে "ক্যামেলিয়া" "সাধারণ মেয়ে" "বাণিওয়ালী" "ইস্টেপশন" ইত্যাদি কবিতাও বিদেশী পাঠক পড়তে পারে, তার জন্য চেষ্টা করুন। জানি, এই অম্ববাদকার্য অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু কঠিন ব'লে কি সেই কাজ করতে নেই? আমি সম্প্রতি মালার্মে ভালেরি রিঁবো বোমবেলার প্রভৃতি ফরাসী কবির অনেক দুর্লভ কবিতার অতি স্বন্দর বাংলা অম্ববাদ পড়েছি। এলিয়ট-এর কবিতা, রিলকে-র কবিতাও পাঠ করেছি সরল বাংলা অম্ববাদে। তবে কি জার্মান ফরাসী ইংরেজ লেখক বাঙালীর সাহায্য লাভ করে রবীন্দ্রনাথের কবিতা অম্ববাদ করতে সক্ষম হয়ে উঠবেন না? তাঁদের সাহায্য পেতে গেলে আগেই তাঁদের বোঝাতে হবে যে, তাঁরা আজ পর্যন্ত আসল রবীন্দ্রনাথকে জানতে পারেন নি। নানা বই ও প্রবন্ধের মারফতে তাঁদের বলতে হবে যে, 'গীতাঞ্জলি'র প্রচলিত অম্ববাদ-গুলিতে কবি-প্রতিভার যে আভাস তাঁরা একদিন পেয়েছিলেন, এইটা হ'ল এক আভাস মাত্র। গোথের সঙ্গে তুলনা করে, লামার্তিন ম্যাসে লগো বোমবেলার ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা করে, ইংরেজী স্পেনীয় ইতালীয় সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রীয় সাহিত্যকে তুলনা করে বিদেশের সাহিত্যিকগণকে উপলব্ধি করতে হবে যে, আমাদের বাঙালী কবি সত্যিই একজন বিশ্বজনীন কাব্যশ্রী।

তাতে আমাদের বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির মর্যাদা বৃদ্ধি লাভ করবে, তৎসঙ্গে কবির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভ ক'রে বিশ্বজগতের সকল সাহিত্যরসিক সহৃদয় ব্যক্তির মনে নূতন ও নির্মল আনন্দ এবং অপূর্ব সাহিত্যপ্রেরণা সঞ্চারিত হবে বিশ্বাস করি।

আমি দুঃখের কথা বলেছি, অভিযোগও করেছি; কিন্তু এই রবীন্দ্র-জয়ন্তী দিবসে কবিগুরুর উদ্দেশে আমি গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক অভিবাধনের কথাও জানাতে চাই। আমাদের একজন সুসাহিত্যিক কবি শান্তিনিকেতনকে 'সব পেয়েছির দেশ' বলে অভিহিত করেছেন; 'রবীন্দ্রো কাব্যজগৎ সব পেয়েছির দেশই বটে। এই স্বপ্ন-দিয়ে-

যেরা দেশটির বিচিত্র সুকোমল সৌন্দর্য, এই দেশের বর্ষা ও বসন্তের হানিকামা, এই দেশের অতীত ঐতিহ্য ও বর্তমান আদর্শ, এই দেশের সর্বশ্রেণীর অন্তরঙ্গ পরিচয় ও বর্ণনা রবীন্দ্র-কাব্যের মধ্যে তো পেয়েছি। শুধু এই দেশের কেন? রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবেরই মন ও হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা তাঁর অমৃত কবিতার ভাষায় ও ছন্দে রূপায়িত ক'রে অজীবন গান ক'রে গিয়েছেন। এই বিশ্ববরণ্য কবিসম্রাটের উদ্দেশে আমি শ্রদ্ধাবনত চিন্তে ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ মনে প্রণাম জ্ঞাপন করছি।*

* ১৪ই বৈশাখ ১৩৬২, রবীন্দ্র-সংস্কৃতি-পরিষদে পঠিত।

কেন ওরা পালিয়ে বেড়ায়

অনাদি মণ্ডল

মাগরের কূলে কূলে বালুকার খেলা;
অনৌম আগ্রহে আমি প্রত্যাহ ছবেলা
দেখি আর ভাবি—
কত না স্তম্ভর সেই সমুদ্রের পাখী
গুড়ো সাদা পালকেতে ঢাকা যা নাকি।
নরম নরম গুড়ো বালি
মিষ্টি হাতের যেন কঁকনকিঙ্কিত করতালি।
কখনও বা ভেবেছি এমন,
মুঠোর বালিকে করি নিতান্ত আপন
পালকে পালক দিয়ে ভ'রে নিই হৃদয়-পেশম।
কিন্তু অকস্মাৎ—
আঙুলের পাশ দিয়ে বালিগুলো বালি হৌয়
আমি হতবাক।
কত ভাল লাগে এই জল শুধু জল
অশান্ত অতল—
স্নানায় মাথায় ধার কালো চেটে খোঁপা
করে না তো কেউ লেখানোখা
কত সাদা লাল ফুল প'রে করে শেষ।
একমুঠো জল হাতে নিই,

তীর কুতূহলে
চোখে চোখ রাখি, কিন্তু হারায় যে খেই
একটু কৌতুক ক'রে সে জল মিলায় সেই
অসীম জলেই।

প্রিয়ার চোখের হাসি কত না মধুর
সে আশ্চর্য স্বর
হৌয়া পেয়ে মল্লিকা ও বেল
উর্ধ্ব মুখী রূপগন্ধে উদ্ভাস্ত উদ্বেল।
মনে হয় ফ্রেমে-আটা ছবির মতন
বুকে বেঁধে রাখি—
উর্ধ্ব কঠিন সূত্রে বেঁধে করি অন্তরের সাথী।

ধরা তো যায় না কারে কেমনে বা ধরি—
ওরা সব অন্তমনা পরী
একটু হিলোল তুলে, তুলে এক রামধনু স্বর—
ক্রান্ত ভ্রমপদে যায় অসীম সূদূর।
হৃদয়ের কোণে আগে প্রেমের অঙ্গুর
কেন ওরা পালিয়ে বেড়ায়—
ধরাই দেবে না যদি কেন ধরে, কেন বা ছাড়ায়?

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা-সাহিত্য

নন্দগোপাল মেন্ডপ্ত

বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রোত্তর যুগ ব'লে সত্যি সত্যিই কোন যুগ এসেছে কি না এবং এসে থাকলে, সে যুগে কোন মহৎ বা অরবীন্দ্র সাহিত্য রচিত হয়েছে কি না, তা নিয়ে সাহিত্য-বিচারকদের মধ্যে মতভেদের অস্ত নেই। এক দল বলেন, রবীন্দ্রনাথের পর গল্পে প্রভাতকুমার, উপন্যাসে শরৎচন্দ্র, প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী, আর খুবই যদি উদারভাবে দেখেন তো কবিতায় সত্যেন দত্ত কিছুটা নূতনত্বের পরিচয় দিয়েছেন—কিন্তু সে নূতনত্ব রবি-রশ্মিরই প্রতিফলন মাত্র, কাজেই তাকে স্বতন্ত্র একটা যুগ বলা চলে না। আর এঁদের পর ধারা দেখা দিয়েছেন, তাঁরা সাহিত্যের বস্তু ও বাচনভঙ্গী নিয়ে যতই কেন না পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান, সার্থক সাহিত্য তাঁরা সৃষ্টি করেছেন সামান্যই। অর্থাৎ এঁদের মতে বাংলা-সাহিত্যে অজ্ঞাবধি রবীন্দ্র-যুগেরই অম্লবৃষ্টি চলছে।

আর এক দল বলেন, রবীন্দ্রনাথ মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন ঠিকই, কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি যা-কিছু লিখেছেন, তাই মহৎ নয়। যুগ ও জীবনের প্রবণতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শেষের অধ্যায়ে দীর্ঘদিন তিনি নিজের গড়া একটি ভাব-জগতের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থেকেছেন—এই অধ্যায়ে তিনি প্রভূত পরিমাণেই আত্মাহু-করণ করেছেন। ভক্তিবিশুদ্ধ স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই অংশকে খুব উঁচু মূল্যে চিহ্নিত করা যায় না। কাজেই এই সাহিত্যের অম্লসরণে অস্ত্রেরা যা লিখেছেন, তার দাম প্রায় কানাকড়িও দাঁড়ায় না। এই গতাহুগতিকতা থেকে বাংলা-সাহিত্যকে মুক্ত করেছেন ১৯২৫ থেকে ৫৫ সনের মধ্যে আবির্ভূত সাহিত্যিকরা। তাঁরা শুধু নূতন বিষয় এবং আঙ্গিক নিয়েই পরীক্ষা করেন নি—তাঁরা সমগ্রভাবে রূপ দিয়েছেন একটি নূতন জীবন-দর্শনকে। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাঁরা প্রবর্তন করেছেন একটি নূতন মূল্যমান, যা রবীন্দ্র-মান থেকে স্বতন্ত্র। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ যেমন নিজে একটি যুগ, রবীন্দ্রোত্তর লেখকেরা সকলে মিলে একটি যুগ।

এই পরম্পরবিরোধী দুই সিদ্ধান্তের মধ্যে আমি দ্বিতীয়টিরই পক্ষে, যদিও এ কথা আমি পুরোপুরি স্বীকার

করি না যে, শেষ জীবনে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'মহা', 'বনবাণী', 'চার অধ্যায়', 'মালক' ইত্যাদির বা তারও পরের 'বীথিকা', 'প্রান্তিক', 'ছেলেবেলা', 'গল্পসল্প' ইত্যাদির কোনই সাহিত্যিক মূল্য নেই। আর এটাও আমি স্বীকার করি না যে, রবীন্দ্রাদর্শের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রেই আধুনিকরা নূতন একটা সাহিত্যাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমার বিবেচনায়, জৈব প্রকৃতির মত মানস-প্রকৃতিও অভিব্যক্তির নিয়মাবলী—একদিন যে সব চিন্তা বীজাকারে স্থপ্ত থাকে পূর্বসূরীদের লেখায়, আর একদিন তাই অম্লকুল আবেষ্টনীতে অঙ্কুরিত হয়ে নব বনস্পতির আবির্ভাব সম্ভবপর ক'রে তোলে। রবীন্দ্র-চিন্তার মধ্যেই আধুনিক সাহিত্যের বেশির ভাগ প্রাণবীজ বিক্ষিপ্ত ছিল—সহায়ত্বের উত্তাপে তারা পরিস্ফুট হয় নি, কেন না কবির মনোমর্মই তার অম্লকুল ছিল না। আধুনিকদের বৈশিষ্ট্য এখানে যে, তাঁরা এই উপেক্ষিত বীজগুলিকেই সাহিত্যের স্রষ্টিকায় নূতন ফসলে রূপ দিয়েছেন। সাহিত্যের ইতিহাসে অভিব্যক্তি এমনি ক'রেই হয়—রাত্রি-প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে ছট ক'রে হঠাৎ হয়ে যায় না কিছু।

২

১৯২৫ থেকে ৫৫ সনের মধ্যে দেশে ধারা নূতন সাহিত্যিকরূপে দেখা দিয়েছেন, একদা তাঁদের পক্ষ থেকে দাবি করা হ'ত অনেক বেশি। অম্লরাগীরা বলতেন, বাংলা-সাহিত্যে তাঁরাই প্রথম উপেক্ষিত, নিগূহীত এবং সমাজ-সৌখের নীচুতলায় অবস্থিত মানুষের সমস্মান স্বীকৃতি দিয়েছেন। আর অনন্ত, অদীপ ও অরূপের কারাগারে বন্দী মানুষের বাস্তব ক্ষুধা-তৃষ্ণা, তার প্রাত্যহিক আঘাত-সংঘাতকে তাঁরাই প্রথম ভাষা দিয়েছেন। অর্থাৎ এক কথায়, যুগোচিত বাস্তবতাবাদ বনাম নব্য মহত্ত্ববাদে তাঁরাই প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন। এ দাবি একেবারে আজগুবি বা অসমর্থনীয় এমন কথা বলব না, যদিও এই সিদ্ধান্তের উত্তর-দক্ষিণ একটু চেপে নিতে হবে। কারণ আগেই বলেছি যে, এই সব 'বাদে'র আদি উপাদান অল্প-বিস্তর সবই পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথে এবং রবীন্দ্রনাথ থেকে

তথাকথিত ‘কল্লোল’-যুগে আসতে মাঝখানে পড়েন যে সাহিত্যশ্রষ্টারা, তাঁদের রচনায়ও এই সব বাদেরই কতকটা পর্যন্ত রূপায়ণ স্পষ্টতর হয়েছে দেখা বাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করছি মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও নজরুলের কবিতার এবং সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও জগদীশ গুপ্তের উপন্যাস-গল্পের। কথা-সাহিত্যে রবীন্দ্র-শরৎ-পর্বের পর এই শেষোক্ত তিন জনের, বিশেষত জগদীশ গুপ্তের অগ্রগামী ভূমিকা স্বীকার করতেই হবে আধুনিকদের। আর কবিতার রাজ্যে প্রথম তিনজনের অতুপ্রেরণাও অস্বীকার করতে পারবেন না কেউই।

অবশ্য একদিন সত্যেন্দ্র গুপ্তের ‘কমলের ছাং’ বা নরেশ সেনগুপ্তের ‘রক্তের ঋণ’ প্রভৃতি বইকে একাধারে জ্বোলা, ফুবেয়ার গোর্কি ও হামসনের লেখনীর যোগ্য বলে গলাবাজি করা হ’ত—ভেলেন, মালার্মে ও বদলেয়ারের সঙ্গে যতীন সেনগুপ্ত বা নজরুলের কবিতার তুলনা করা হ’ত এবং প্রকারান্তরে সেই জ্বোগে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে বাস্তববিমুখ, স্বপ্নবিলাসী ও অযুগসিদ্ধ সাহিত্যিক বলেই ব্যঙ্গ করা হ’ত। আজ পরিবর্তিত কালের বিচারে দেখা যাচ্ছে, এসব অত্যাক্তি শুধু অর্থহীন নয়, হাশ্বাদ্যোপক, তবু এঁরা যে বাংলা-সাহিত্যের যুগবিবর্তন তথা দৃষ্টিবিবর্তনের পথে উল্লেখযোগ্য কাজই করেছেন, এবং শুধু যুগ-সন্ধির লেখক বলে নয়, সার্থক সাহিত্যিকরূপেই যে এঁদের কয়েকজন গ্রহণীয় ও অনগ্রণীয়, তা নিয়ে মতবৈধ নেই। ছাংয়ের বিষয়, সাহিত্যব্যোদ্ধা অনেকেই আজ আর মাঝখানকার এই দলটিকে ছায়া মূল্যে স্বীকার করতে চান না—তঁারা নরেশ সেনগুপ্ত, সত্যেন্দ্র গুপ্ত ও জগদীশ গুপ্তকে ভুলেই গেছেন। মোহিতলালকে কবিরূপে নয়, রক্ষণশীল শিবিরের একজন দুর্মুখ প্রাবন্ধিক বলেই মনে রেখেছেন। নজরুলের প্রতি তাঁদের দয়া ও দরদ আছে, কিন্তু তাঁর সাহিত্য দেশবাসীর অমরাগল্লভ হয়েছে। অধুনা লোকান্তরিত হওয়ায় যতীন সেনগুপ্তের কথা মাঝে মাঝে আলোচিত হচ্ছে, কিন্তু তাঁর কবিতাও পঠিত হয় কোথায়? মানুষ অনেক সময় অকৃতজ্ঞ হয় এবং ইতিহাসও তার ফলে অসত্যে কলুষিত হয়।

কিন্তু যাক এ কথা। রবীন্দ্র-শরৎ-সাহিত্য নিয়ে একদিন নালিশ উঠেছিল যে, তাতে বাস্তবের বার্তা নেই—

অব্যক্তিক ভাব-কল্পনার পাখায় ভর ক’রে কবি উড়ে গেছেন বস্তু-সংসারের ওপর দিয়ে, কোনদিন কোন দৈন্ত, মানিত্ত, ব্যর্থতা ও পরাভব স্পর্শ করে নি তাঁকে, তাই সাহিত্যে তিনি চিরস্থবান্দকেই ব্যক্ত করেছেন বরাবর। গানে ও লিরিক কবিতায় এই অপার্থিবতা মানিয়ে গেছে, কিন্তু নাটকে ও গল্প-উপন্যাসে এই নিরভিজ বস্তুবোধ অসামর্থ্যকতারই স্রোতক হয়েছে। তাই রবীন্দ্র-সাহিত্যের মানুষরা আসলে রক্ত-মাংসের মানুষ নয় নি—হয়েছে এক-একটি ভাবের মানবায়িত বাহন। শরৎচন্দ্র এখান থেকে অনেক অনেক অগ্রসর হয়েছেন—সত্যিকার জীবনের পরিচয় তাঁর ছিল, সে জীবনকে ফুটিয়েছেনও তিনি, কিন্তু তাঁর সেই নিরাসক্ত শিল্পদৃষ্টি নেই, যা থাকলে জীবনকে যথার্থ আঁকা যায়। দেশে দরদী কথাশিল্পী বলে তিনি সম্মানিত হয়েছেন—দরদী তিনি ঠিকই, কিন্তু এই দরদের প্রাবল্যেই তাঁর সাহিত্যে পতিতা বহুতামতী বিহ্বা হয়েছে, হোটলের কি ভদ্রমহিলার ওপর আসন নিয়েছে বিজ্ঞা-বৈদ্যের জোলুস দেখিয়ে। এই যে অবাস্তব কারুকলা, এ থেকে বাংলা-সাহিত্যকে মুক্ত করল ‘কল্লোল’-যুগ...এই হ’ল সে যুগের দাবি।

৩

গোড়াতেই বলেছি, এ দাবি আমি মোটামুটি স্বীকার করি। কারণ সাহিত্যিকের মননশীলতা যে ধনী থেকে দরিদ্রের, স্থায়ী থেকে অস্থায়ী এবং আদর্শ থেকে বাস্তবের পথে স্পষ্টভাবে মোড় ফিরেছে এই জায়গায় এসে, এটা ইতিহাসের সত্য। তাই সেদিন বস্তির ছেলে, কমলাখানের ও চা-বাগানের কুলি-কামিন, চোর, ডাকাত, জুয়াড়ী, গাঁজাখোর, পতিতা, ডিম্বুক, এদের নিয়ে সাহিত্য লেখা শুরু হয়েছে—বেরিয়েছে ‘কমলাকুঠি,’ ‘নারীমেধ,’ ‘কলরব,’ ‘পাক,’ ‘বেদে,’ ‘চৈতালী ঘূর্ণি’। শুধু ভদ্রলোক, ভদ্রসমাজ ও ভদ্রচিন্তার ছনিয়া এড়িয়ে নতুন এবং সাধারণের অপরিজ্ঞাত মানুষদের মুহূর্তেই চ’লে যান নি লেখকরা, সেই সব তৃষ্ণা, দাবি ও বেদনাকে নির্ভয়ে রূপও দিয়েছিলেন তাঁরা, যা দিবালোকে দেখলে আঁতকে উঠবেন অনেকেই। এই অভিনবতার স্বীকৃতি তাঁদের অবশ্যই আছে—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই ‘সাহিত্য-ধর্ম’ নামিক প্রবন্ধে

এই সব রচনার নোংরা আবেষ্টনী ও জৈব আভ্যন্তরীণতা
নিম্না ক'রে এদের ঐতিহাসিক স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।
কিন্তু মজা এই যে, এই সব রচনার কোনটাই অমর তো
দূরস্থান, দীর্ঘজীবীও হয় নি। কেন?

তার উত্তরে বলতে হবে যে, নূতন আদর্শ ও চিন্তাধারা
প্রবর্তনের যে গরজ সাহিত্যিকরা অনুভব করেছিলেন,
সেটা খাঁটি। কিন্তু সেই অনুভূতিকে সৃষ্টির মধ্যে
রূপায়িত করার ক্ষেত্রে চাই যে নিজস্ব ব্যক্তিক জীবনবোধ,
যে ব্যাপক সত্য-উপলব্ধি, তা তাঁদের ছিল না—
তাঁরা প্রয়োজনেই আন্দোলন করেছিলেন, কিন্তু
তার মাল-মসলা নিয়েছিলেন বিদেশী বই থেকে,
দেশের মাটি থেকে নয়। তাই অপরিণত বয়সের
কেনা কেটে গিয়ে যখন লিখনশক্তি পরিপক্ব হ'ল তাঁদের,
তখন দেখা গেল তাঁরা আর সেই বিপ্লবাত্মক পথের
পথিক নন—সবাই পরিচিত জীবনের ভেতর থেকেই
সাহিত্যসৃষ্টি করছেন এবং তার ক্ষেত্রেই সর্বজনপ্রিয় হয়ে
উঠেছেন। 'পথের পাঁচালী,' 'ইন্ডলী বাকের উপকথা,'
'উপনায়ন,' 'জননী,' 'কাক-জ্যোৎস্না,' বা কিছু ভাল লেখা
হয়েছে এই ধাপে, প্রাণধর্মের তা 'কল্লোল'-যুগের রচনা থেকে
সম্পূর্ণ তফাত। তা হ'লেই দাঁড়াচ্ছে, 'কল্লোল' নূতন
সাহিত্য-সম্ভবের পথ ক'রে দিয়েছিলেন, কিন্তু সার্থক নূতন
সাহিত্যসৃষ্টি করতে পারে নি—সেই লেখকরাই শ্রেষ্ঠ
সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন 'কল্লোল'ের জীবনাবসান হবার পরে
এবং কল্লোলী ধারা সম্পূর্ণ পরিহার ক'রে।

আসলে বাংলা-সাহিত্যে সেদিন ফ্রেডবাদের ও মার্ক্স-
বাদের প্রতিধ্বনি এসেছে—লেখকেরা পেয়েছেন তার
অনুপ্রেরণা এবং ইংরেজী অনুবাদের ভেতর দিয়ে পেয়েছেন
সমসাময়িক ফরাসী, জার্মান, রুশ ও নরওয়েজিয়ান
সাহিত্য। এ দিয়েই তাঁরা গড়তে গেছেন রবীন্দ্রোত্তর
সাহিত্যের ইমারত—তাই জিনিসটা সত্যিকার প্রাণ পেতে
পারে নি, যদিও তা সত্ত্বেও, বাংলা-সাহিত্যে দৃষ্টি এবং
চিন্তার প্রসার ঘটিয়েছে তা প্রচুর পরিমাণেই, আর
ভাষাকেও সংহত, সাবলীল ও সকল রকম ভাবপ্রকাশের
উপযুক্ত করেছে। আমার দুঃখ হয়, নিছক নূতনত্ব সন্ধানের
ক্ষেত্রে নয়, প্রকৃত জীবনবোধের প্রেরণায় যদি তাঁরা তথা-
কথিত অবহেলিত জীবনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হতেন এবং

সেখান থেকে গল্প, উপন্যাস ও নাটকের মাল-মসলা আহরণ
করতেন, তা হ'লে আজ তাঁরা সত্যি সত্যিই কি মহান ও
অভিনব সাহিত্যই সৃষ্টি করতে পারতেন! সে নিষ্ঠা ছিল
না ব'লেই ও জীবন থেকে স'রে আসতে হ'ল তাঁদের, এবং
তার ফলেই যে বিরাট সম্ভাবনীয়তার অগ্নি আশাঘিত
করেছিল একদিন অনেককে, তা কোনদিনই সত্য হ'ল না।
সেই লেখকরাই আজ কেউ রাজনীতি করছেন, কেউ
ছায়াচিত্র-পরিচালনা করছেন, কেউ ধর্মগ্রন্থ রচনা করছেন—
আর সবাই নিজের নিজের সেবা গল্প, নির্বাচিত রচনা
ইত্যাদি প্রকাশ ক'রে পুরানো পুঁজির ওপরেই নূতন স্থিতির
আশানীড় তৈরি করছেন। এ সব ক্ষয় ও পরাভব ছাড়া
আর কিছু নয়।

8

আমি শুধু কথা-সাহিত্যের কথাই বলেছি—তার কারণ
রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা-সাহিত্যে আসলে গল্প-উপন্যাসই
লেখা হয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে, এবং সেই বিভাগেই নূতনত্ব
বলুন, উৎকর্ষ বলুন, অনেক কিছু দেখা যাবে। উপন্যাস
বললাম বটে, কিন্তু বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখানি ও
তারশঙ্করের দু-একখানি ছাড়া পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস তো লেখাই
হয় নি বিশেষ এ যুগে—ছোট ও বড় গল্পই লেখা হয়েছে,
এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারশঙ্কর
বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের দান এই
বিভাগে অল্প নয়। গল্পের পরে বলা দরকার কবিতার
কথা—কবিতায় যুগের বাণী, জীবনের বাণী, মানুষ ও
মহুয়াবের বাণী যতটা পর্যন্ত আশা করা উচিত এ যুগে, তার
অতি সামান্যই এখনও পর্যন্ত পূর্ণ হয়েছে। জীবনানন্দ দাশ,
প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ কবিদের রচনা দেশে
সমাদৃত হয়েছে, এঁদের মধ্যে বুদ্ধদেবই পূর্ণতর কবি, যদিও
সর্বাধিক রবীন্দ্র-প্রভাবিত, প্রেমেন্দ্র মিত্র সর্বাধিক
যুগধর্মাত্মগামী, আর জীবনানন্দ সর্বাধিক ছবোধী।
রবীন্দ্রোত্তর যুগের এঁরাই মুখ্য কবি। এঁদের পর কবিতার
ক্ষেত্রে যে সব পরীক্ষা শুরু হয়েছে, তার সম্বন্ধে একটা কথা
শুধু বলা আবশ্যিক যে, যে যুগে সর্বজনের উন্নয়ন এবং সর্ব-
মানবের মধ্যে শিল্প-সংস্কৃতির পরিব্যাপ্তিতেই মানুষের মুক্তি
ব'লে স্বীকৃত হচ্ছে, সে যুগে শিক্ষিত মানুষেরও কিছুমাত্র

বোধগম্য হয় না এমন সব রচনাকে মহৎ কবিতা বলা এবং সেই সব কবিদেরই প্রগতিশীলরূপে চিহ্নিত করা হচ্ছে, এটা কি সাহিত্যের সঙ্গে শঠতার মতো নয়?

প্রকৃতপক্ষে এ যুগে খণ্ড খণ্ড দৃষ্টি ও টুকরো টুকরো চেষ্টার ভেতর দিয়েই একটা নূতন চেতনা, একটা নূতন জীবনদর্শন জন্মগ্রহণ করেছে ও করছে; কিন্তু সেই সৃষ্টিকে আশ্রয় করে কোন বৃহৎ স্রষ্টা আজও দেখা দেন নি। যে দিন দেবেন, সে দিন এই সব দর্শন, মনন, চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তির ওপরই গড়ে উঠবে তাঁর সর্বস্বীকৃত কীর্তির ইমারত, এবং আজকের এই সব খণ্ড প্রতিভার অধিকারী কবি ও গল্পকাররা এক অখণ্ড সাহিত্য-নায়কের ভেতর হারিয়ে যাবেন। অবশ্য সাহিত্য সে দিন কি রূপ নেবে, সেটা এখনই অসম্ভব ক'রে লাভ নেই। তবু এঁদের স্থান ও মানের মূল্য যে কম নয়, এবং ভাবী দিনের সাহিত্যকে যে এঁরাই এগিয়ে দিয়ে গেছেন—এ কথা আজ অস্বস্তি আমরা স্বীকার ক'রে রাখি। অর্থাৎ বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রোত্তর-যুগ সত্যি সত্যিই একটা যুগরূপে এসেছে, সে যুগের জীবন ও মনন তার নিজস্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী চলতেও চাইছে, কিন্তু তা চালাবার মত শক্তিশালী প্রতিভা

এখনও ওঠেন নি। তাই এ যুগের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কি বলতে হ'লে কোন একজন সাহিত্যিকের রচনার কথা বলা যায় না—বলতে হয় এক রাশ নাম। কেননা, as individuals they are not very much significant or important, but as a composite fraternity, they have produced a mass of poetry and story, that one can mark, not merely as good compositions, but as definite departure from the trodden path of our elders! অর্থাৎ এক-একজন ক'রে ধরলে, আধুনিক লেখকরা হয়তো খুব বড় বা খুব বেশি বিশেষত্বের অধিকারী হবেন না, কিন্তু সমগ্রভাবে একটা গোষ্ঠী হিসাবে তাঁরা যে সব গল্প-কবিতা লিখেছেন, তা শুধু ভাল লেখা নয়, আমাদের পূর্বতনদের চলা পথ থেকে তা সম্পূর্ণ পৃথক পথের সৃষ্টি বলেও গণ্য হবার যোগ্য। বর্তমান ইংরেজী সাহিত্য সম্বন্ধে ইংরেজ সমালোচকের এই উক্তি দিয়েই রবীন্দ্রোত্তর বাংলা-সাহিত্যের আলোচনার ওপর আপাতত উপসংহার দিচ্ছি। ভবিষ্যতে সময় ও সুযোগ হ'লে বিষয়টি নিয়ে আরও বিশদভাবে আলোচনা করব, যার প্রাথমিক ভিত্তিটাই মাত্র স্থাপন করা রইল এই প্রবন্ধে।

সময়-কন্যাকা

রবীন্দ্রনাথ রায়

শীতল যুতার মত তোমার পরশখানি হিম
নিরঞ্জন শুভ্রতার নিলাজ নয়তা
চুলের বস্ত্রায় আরো কত—কত সময়ের ঢেউ
প্রবাল ঠোঁটের কোণে
কাঁপে এক শেষ কথা—বাসনার স্তীর্ণ বিদ্রোহ।
চোখের নীলায় এক দুঃস্বপ্ন শপথ
অহুচ্চার বাণী কোন্ নিশাস্তের ময়-চেতনায়।
সময়-কন্যাকা তুমি; হে কঠিন পাষাণের মেয়ে।
দিগন্তের রেখাভটে তোমার সে বর্ণের খেয়াল
ধারমান ইতিহাস গড়ে তোলে কটির মেখলা

রঙ আর রঙ শেষ—
নীলার নিষ্ঠুর লাশ—বার বার অসহ্য স্নান।
কালো মূর ওখেলোর চোখে জাগা মরণ-মাতন।
অনেক তারার পথে পথে
অনেক রাতের প্রান্তে, অনেক দিনের স্বর্ধালোকে
বহুশত জীবনের লাভ ক্ষতি পার হয়ে এসে
সময়-কন্যাকা তুমি,
সময়-সমুদ্র থেকে চুলে লাগা ছন
তবুও পাষাণ হিম।
আজ্ঞাহুল্লসিত তবু নিলাজ নয়তা।

ডানা

“বনফুল”

১৫

পরদিনই ভাস্কর বহুর সঙ্গে দেখা হ'ল ডানার। ভাস্কর বহু নিজেই এসেছিলেন দেখা করতে। তিনি যখন আসছিলেন তখন ডানা তাঁকে দূর থেকে দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু চিনতে পারে নি। যে লোক সিগারেটটি পর্যন্ত খেত না, তার মুখে যে অত বড় পাইপ ঝুলবে তা প্রত্যাশা করতে পারে নি সে। পরনে থাকী রঙের হাফ-প্যান্ট, হাফ-শার্ট, হাতে ছোট একটা বেত, চোখে গাঢ় কালো রঙের গগলস্। ডানা বারান্দায় বসে চিঠি লিখছিল, লিখতে লিখতে একবার চোখ ভুলে দেখতে পেয়েছিল তাকে। দেখে বিরক্তই হয়েছিল। তার মনে হয়েছিল কোনও বেকার ছোকরা বোধ হয় আসছে তাকে বিরক্ত করতে। অনেকে আজকাল আসে অমরবাবুর ‘পক্ষীনিবাস’টা দেখতে। অসংলগ্ন অবাস্তব প্রশ্ন করে নানারকম। প্রশ্ন শুনলেই মনে হয় পাখির সম্বন্ধে কোনও কোঁতুহল নেই, কেবল খানিকটা সময় কাটাতে এসেছে।

চিনতে পারছ আমাকে ?

গগলস্ খুলে বারান্দার নীচে এসে দাঁড়ালেন ভাস্কর বহু। বজ্র পড়ে ডানার স্বপ্নসৌম্য ঘন চুরমার হয়ে গেল। এই সেই ভাস্কর ? এত পরিবর্তন হয়েছে ! চোখের কোলে কালি, রঙও ময়লা হয়ে গেছে, কেবল চোখের দৃষ্টিটাই উজ্জ্বল আছে তেমনি। আরও উজ্জ্বল হয়েছে বোধ হয়। ডানা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে উঠল।

ভাস্কর ! এস, এস। তুমি এমন ভাবে আসবে তা প্রত্যাশা করি নি। কাল আনন্দবাবুর মুখে যখন শুনলাম যে, ভাস্কর বহু নামে একজন ম্যাজিস্ট্রেট এসেছেন এখানে, তখন—

আমি এসেই তোমার খবর পেলাম এস. পি. মিস্টার গুপ্তের কাছে। মিস্ ডানা শুনেই সন্দেহ হয়েছিল। তারপর তিনি যখন বামা রেকিউজি বললেন, তখন আর সন্দেহ রইল না। শুনলাম, এখানে তুমি কোন পক্ষীনিবাসের কর্ত্তী হয়েছ ? ব্যাপারটা কি ? পোল্ট্রি ?

না। চাকরি। এখানকার জমিদার অমরেশবাবু

একজন পক্ষীতত্ত্ববিৎ। তিনি অনেকরকম পাখি ধরে রেখেছেন এখানে। তারই তত্ত্বাবধান করি আমি।

আই সি। কতদিন আছ ?

ছ মাস হয়ে গেল। নভেম্বর মাসের শেষে এসেছিলাম। একাই আছ ? মিস্টার গুপ্ত তাই বললেন যেন।

ভাস্কর বহু উঠে এসে আরাম-কেন্দারাতায় বসে পাইপে টান দিয়েই বুঝলেন, পাইপ নিবে গেছে। নিবিষ্ট মনে সেইটেই ধরতে লাগলেন।

একাই আছি।

আর সবাই কোথা ?

মারা গেছে। আমি ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। তুমি শোন নি ?

বাই জোভ, বল কি। না, কিছু শুনি নি তো। আমি অনেকদিন এদেশে ছিলাম না।

ভাস্কর বহু সোজা হয়ে বসলেন চেয়ারের উপর। ডানা চুপ করে রইল।

তারপর সব বলতে লাগল। তার নতুন জীবনের মাঝখানে পুরাতন জীবনটা হঠাৎ এসে হাজির হ'ল যেন খানিকক্ষণের জন্য।

১৬

ষিপ্রহরের প্রথম রোমে সন্ধ্যানী ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন চরের উপর। জ্যোৎস্নার মত রোদটাকেও তিনি উপভোগ করবার চেষ্টা করছিলেন। দৈহিক কষ্টটাকে আমলই দিচ্ছিলেন না; যে বোধশক্তি আরাম বা কষ্টের কারণে সেই শক্তিটাকেই তিনি আরক্তে আনবার চেষ্টা করছিলেন, যাতে সে কষ্টটাকেও স্বাধ ব'লে গণ্য করে। তাঁর মনে হচ্ছিল, যে মুহূর্তে তিনি স্বপ্ন-চুম্বের অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করতে পারবেন সেই মুহূর্তে সত্যকেও উপলব্ধি করবেন। স্বপ্ন আকাশে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে একটা শব্দই উড়ছিল। তারই দিকে নিনিমেমে চেয়ে ছিলেন তিনি। হঠাৎ হাত ভুলে তাকে নমস্কার করলেন। মনে মনে বললেন, স্বপ্ন আকাশে উঠেছ তুমি। অনেক জিনিসই তোমার চোখে পড়ছে।

ভক্তমেঘমালা স্তরে স্তরে সজ্জিত রয়েছে দিখলয়ের কাছে। কিন্তু আমি জানি, তুমি ওসব কিছুই দেয় না। তুমি ব্যাকুল হয়ে সন্ধান করছ, মড়া কোথায় আছে! ওই ব্যাকুল একাগ্রতা যদি আমারও থাকত! কিছুতেই একাগ্র হতে পারছি না, কিছুতেই নিস্পৃহ হতে পারছি না। মায়া কেটেও যেন কাটছে না। এই স্থানটার মোহ যেন পেয়ে বসেছে তাঁকে। আবার পদচারণ শুরু করলেন। গম্ব খব ছোলা মটর সব কাটা হয়ে গেছে। চরের যে সব জায়গায় ফসল ফলেছিল সে সব জায়গা আবার প্রস্তুত হচ্ছে নতুন ফসলের জন্য। সম্যাসী চেয়ে দেখলেন সত্ত-কথিত জমিগুলোর দিকে। যে গম্ব খব ছোলা মটর তাদের অলঙ্কৃত করেছিল একদিন, বুকে ক'রে ধ'রে রেখেছিল যাদের, তাদের সম্বন্ধে সামান্ততম শোক বা মোহের চিহ্ন তো নেই। ভূমি নির্বিকার। তার কাছে ভাল গাছ খারাপ গাছ দুইই সমান; ফুল, শস্ত, খাত্ত, বিষ সমস্তই সে উৎপাদন করে, কিন্তু কাউকে আঁকড়ে থাকতে চায় না। তারা দলে দলে আসে আর চ'লে যায়। সে নির্বিকার। নির্বিকার ব'লেই এত অসংখ্য সন্তানবান জননী সে। সম্যাসী সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে শুয়ে পড়লেন ভূমির উপর। উত্তপ্ত চরের নিদারুণ উষ্ণতা প্রবেশ করতে লাগল তাঁর দেহের রক্তে-রক্তে। তাঁর মনে হতে লাগল, বীর্ধবতী জননীর আশ্বাসবাণী যেন সঞ্চারিত হচ্ছে তাঁর সর্বাঙ্গে। তিনি যেন বলছেন—ভয় নেই, ভয় নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে; থেমনো না, এগিয়ে চল। সম্যাসী আবার উঠে বসলেন। স্থির হয়ে ব'সে রইলেন চোখ বুজে। তাঁর খুব কাছে একটি বকও ধ্যানমগ্ন হয়ে ব'সেছিল অনেক আগে থেকেই। সম্যাসীকে দেখে সে স'রে গেল না। সম্যাসীকে চিনত সে। নিঃসংশয়-জানত, এর দ্বারা কোনও অনিষ্ট হবার আশঙ্কা নেই তার। অনেকদিন এসেছেন, বসেছেন, বেড়িয়েছেন, স্নান করেছেন, কোনদিন তাকে মারতে বা ধরতে যান নি। অনড় হয়ে ব'সে রইল বক। সম্যাসীও অনড় হয়ে ব'সে রইলেন ধানিকক্ষণ—বেশ ধানিকক্ষণ, তারপর উঠে দাঁড়ালেন। গুন গুন ক'রে গান গাইতে গাইতে নদীর জলে নামলেন। স্নান করলেন অনেকক্ষণ ধ'রে। তারপর উঠে ভিক্ষে কাপড় পরেই নিজের সেই ভাঙা ঘরটির উদ্দেশ্যে চলতে লাগলেন। স্নান করবার পর

ক্ষুধার উদ্বেগ হয়েছিল। এদিক ওদিক চাইতে চাইতে আসছিলেন, খাওয়ার মত যদি কিছু জুটে যায় পথে। বিশেষ কিছু চোখে পড়ল না। আশা করতে লাগলেন, নদীর ধারে যে বেলগাছটা আছে তাতে একটা বেলও অস্তুত পেয়ে যাবেন। ঘরে ফিরে অবাক হয়ে গেলেন। দেখলেন, ডানার চাকর এক বুড়ি ফল নিয়ে ব'সে আছে। ঠিক এই রকম ব্যাপার আর একদিনও হয়েছিল। চাকর বললে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মাইজীকে অনেক ফল পাঠিয়ে দিয়েছেন, তিনি আপনাকে কিছু পাঠিয়ে দিলেন। সম্যাসী একটি মাত্র ল্যাংড়া আম তুলে নিয়ে বললেন, আর আমার লাগবে না। ওগুলো তুমি ফিরে নিয়ে যাও।

আরও কিছু রাখুন।

না। আর দরকার নেই।

সম্যাসী ঘরে ঢুকে গেলেন। চাকরটা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ধানিকক্ষণ, তারপর চ'লে গেল।

১৭

প্রথম কয়েকদিন ডানার সঙ্গে ভাস্কর বহুর যে পরিচয়টা হ'ল তা ঠিক পুরনো পরিচয় ঝালানো নয়, তা সম্পূর্ণ নতুন পরিচয়। ভাস্কর বহু যে ডানাকে দেখলেন, সে ডানা ঠিক তাঁর পূর্বপরিচিতি তবী রূপসীটি মাত্র নয়। বর্ষীয় জাপানী বোমা না পড়লে যাকে তিনি বিয়ে ক'রে এক ড্রয়িং-রুমের পরিবেশ থেকে আর এক ড্রয়িং-রুমের পরিবেশে অনায়াসে স্থানান্তরিত করতে পারতেন, এ ডানা সে ডানা নয়। এর দেহ মন আরও পরিপুষ্ট হয়ে অনেক বদলে গেছে। এখন মুখের দিকে চাইলে এ আগেকার মত চোখ নিচু করে না, লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে না, বেশ সপ্রতিভ ভাবে চেয়ে থাকে। প্রশ্ন করলে ঘাবড়ে যায় না, বেশ ভেবে চিন্তে উত্তর দেয়, অনেক সময় পালটা প্রশ্নও করে। অবশ্য সেজন্ত আগের চেয়ে ঢের বেশি স্থলয়, ঢের বেশি লোভনীয়ও হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তিত্ব ওকে আরও মোহিনী করেছে, মনে হ'ল সেই ব্যক্তিত্বের বেড়াটা পেয়ে তার কাছে যাওয়া শক্ত, ঘনিষ্ঠ হওয়া আরও শক্ত।

ডানাও দেখলে, যে ভাস্কর বহুকে সে চিনত, যাকে নিয়ে তার মন স্বপ্ন স্থপ্তি করেছিল একদিন, এই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবটি ঠিক সে লোক নন। তদ্বৎ তেজস্বী রিসার্চ-

ভাস্কর ভাস্কর বহুর স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিভার দীপ্তি নিবে গেছে। তার সঙ্গে এ লোকটির কিছু সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু সে খুশী নেই। একটা বহুমূল্য আসবাব অমূল্যে বাইরে পড়ে থাকলে যেমন হয়, অনেকটা যেন তেমনি। রঙ চটে গেছে, জোলুস নেই। ডানা একে দেখে প্রথমে হতাশ হয়েছিল বটে, কিন্তু দু-চার দিন দেখবার পর সে ভাবটাও কেটে গেল। কোতুল হ'ল বরং। বাইরেটা বদলেছে। ভিতরটাও বদলেছে কি? দুজনেই পরস্পরের অন্তরের খবর-নেবার চেষ্টা করছিল সোজাসুজি কোন প্রশ্ন না করে। কথায় কথায় যদি কিছু বেরিয়ে পড়ে! কিন্তু কিছুই বেরাচ্ছিল না। দুজনেই সাবধানী। এই ভাবেই চলছিল।

অসহ্য গরম ছিল সেদিন। গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ছিল না। ডানা নিজের ঘরের জানলা কপাট বন্ধ করে ক্যাম্প চেয়ারটায় শুয়ে হাতপাখা নাড়তে নাড়তে ভাস্কর বহুর কথাই ভাবছিল। রোজই প্রায় ওর সঙ্গে দেখা হচ্ছে, কিন্তু ও বিয়ে করেছে কি না তা এখনও পর্যন্ত জানা যায় নি। সে নিজেও বলে নি, ডানা লজ্জায় ও প্রসন্ন তোলেই নি। কিন্তু কথাটা জানবার জন্তে তার মন ছটফট করছে। মনে হচ্ছে যদি...কিন্তু না, কথাটা মনে করতেও লজ্জা হচ্ছে। সে নিজের মুখে কিছুতেই বলতে পারবে না। নিজের মনের এই ছাংলাপনাত্তেই সে মরমে মরে যাচ্ছে। কিন্তু একটা সত্য সে কিছুতেই এড়াতে পাচ্ছে না, বরং ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে উঠছে সেটা। ভাস্করের সঙ্গে যদি তার বিয়ে হয়ে যায় তা হ'লে অচিরে তার জীবনের সমস্ত সমস্তার সমাধান হয়ে যায় আপাতত। কিন্তু বিয়ে-সম্বন্ধটা করবে কে? যে সমাজে সে মানুষ হয়েছে, তা যদিও ঠিক গোড়া বাঙালী সমাজ নয়; কিন্তু সে সমাজেও পিতামাতারাই বিবাহ ব্যাপারে প্রধান উত্তোগী। তার তো কেউ নেই, তা হ'লে কি নিজেই তাকে নিজের ব্যবস্থা করতে হবে? ভাস্কর বহুর ছলা-কলায় ভুলিয়ে বিবাহ-বন্ধনে বাঁধতে হবে অবশেষে? মংশিকারীরা টোপের লোভ দেখিয়ে মাছ ধরে যেমন করে? কথাটা ভাবতেও খারাপ লাগছিল তার। কিন্তু তার চিন্তাশ্রোতে বাধা পড়ল। বন্ধ ঘারে টোকা পড়ল। মনে হ'ল; টোকা নয়, বুধি। কপাট খুলে দেখলে, বকুলবালা

দাঁড়িয়ে আছেন। বোদের ঝাঁবে লাল হয়ে উঠেছে মুখটা। পিছনে চণ্ডীও রয়েছে।

আসুন, আসুন।

বকুলবালা বললেন, একটু ঠাণ্ডা জল দিতে পারেন?

ডানা কুঁজোতে হাত দিতেই বললেন, খাব না, পা ধোব। পা দুটো বলসে গেছে আমার। রাস্তার ধূলা যেন তপ্ত খোলার বালি।

তা হ'লে চানের ঘরে চলুন।

চানের ঘরে ঢুকে উপযুপরি কয়েক ঘটি জল ঢেলে বকুলবালা পা ধুলেন। তারপর নিজের কাপড়ের আঁচল দিয়েই গুছলেন পা দুটি। ডানা একটা তোয়ালে এগিয়ে দিচ্ছিল, তিনি নিলেন না।

বললেন, কি হবে তোমার ফরসা তোয়ালেটা ময়লা করে? আমাকে তো একটু পরে কাপড় ছাড়তেই হবে। তখন ভাল করে থুপে কেচে নেব। এখন যে জ্ঞা এসেছি তা বলি। চমৎকার পাখিটি পাঠিয়েছ ভাই। আমার অনেক আগেই আসা উচিত ছিল, কিন্তু ফাঁকই পাই নি। উনি কদিন ছুটি নিয়েছিলেন, বাড়িতে বসেই আপিসের কাজকর্ম করছিলেন। আমরা এখান থেকে বদলি হয়ে গেছি, মাসখানেক পরেই বোধ হয় চ'লে যেতে হবে। আজ উনি আপিসে গেছেন, তাই চ'লে এসেছি আমি।

পাখি নিয়ে কিন্তু অনেক কাণ্ড হয়েছে ভাই। উনি পাখি দেপে ভয়ানক চটে গেছেন। বলছেন, অমরবারুর জ্বীই মিথ্যে করে ঠুর নামে লাগিয়ে ঠুকে এখান থেকে বদলি করিয়েছেন, তাঁর উপহার ফেরত দাও। আমি কিছুতেই রাজী হই নি। বাড়িতে সে কি ধুমধুম কাণ্ড ওই পাখি নিয়ে, চণ্ডীকে জিগ্যেস কর না। বল না রে—

চণ্ডী কিছু বলল না, মুচকি মুচকি হাসতে লাগল শুধু।

বকুলবালা বলতে লাগলেন, আমি শেষে বলেছি, আমি নিজে কিছুতেই পাখি ফেরাতে পারব না। একজন উদর-লোকের মেয়ে একটা উপহার পাঠিয়েছেন তা আমি কোন্ মুখে ফিরিয়ে দিতে যাব? তোমার যদি চোখের চামড়া না থাকে তা হ'লে তুমি নিজে গিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে এস।

এই বলে বকুলবালা এমন ভাবে ডানার দিক্কে চাইলেন যেন ডানাই রূপচাঁদবাবু। ডানা স্থিতমুখে চুপ করে রইল, কি আর বলবে?

বকুলবালা তখন আসল প্রসঙ্গে উপনীত হলেন।

উনি যে বকম জেদী লোক, ঠিক পাখিটা তোমাকে ফিরিয়ে দিতে আসবেন। তখন তুমি যেন ঘুণাক্ষরেও ব'লো না যে, আমি অমরবাবুর জীর কাছে পাখি চেয়ে-ছিলাম; তা হ'লে কিন্তু কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করবেন বাড়ি গিয়ে। উনি পাখি যদি ফেরাতে আসেন, তা হ'লে তুমি চুঁ শব্দটি না ক'রে পাখিটি নিয়ে নিও। চণ্ডে তার পরদিন এসে পাখিটি তোমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে, নিয়ে গিয়ে আমাকে দিয়ে আসবে, বলবে—ও আর একটা পাখি, ও এক পাখিওলার কাছ থেকে যোগাড় করেছে। কি রে চণ্ডী, যা বলছি তা করবি তো? নিজে যেন গাপ ক'রো না পাখিটি। তোমার এয়ার গান আমি দেব—যখন বলেছি ঠিক দেব। সেই পাখিওলাটার সঙ্গে দেখা ক'রে তাকে ব'লে রাখিস, উনি যদি জিজ্ঞেস করেন তা হ'লে যেন বলে সে-ই পাখি দিয়েছে। কিছু পয়সা দেব বললেই রাজী হয়ে যাবে। ভাল বুদ্ধি করি নি ভাই, পাখির গায়ে তো আর নাম লেখা নেই। চমৎকার পাখিটি। এর মধ্যেই এমন মায়া ব'সে গেছে। কি মন্দর ক'রে আজ সকালে ডাকল—ইষ্টিকুটুম! না রে চণ্ডে?

চণ্ডী বললে, একবার 'খোকা হোক'ও বলেছিল। তুমি তখন চানের ঘরে ছিলে।

মিথু্যক কোথাকার! চানের ঘরে থাকলে আমি শুনেতে পাব না? কানের মাথা খেয়েছি না কি?

আমার কিন্তু মনে হ'ল।

ভুল শুনেছ তুমি। ইষ্টিকুটুম ছাড়া আর কিছু বলে নি। বলবে অবশ্য ক্রমশ। আর একটু পোষ মালুক।

একটা গাড়ি হর্ন দিয়ে এসে থামল বাড়ির সামনে।

কেউ এল বোধ হয় ভাই। আমি পালাই, লুকিয়ে এসেছি তো। উনি হয়তো আজ সকাল সকালই আপিস থেকে এসে পড়বেন। ষা'বার আগে আর একদিন আসবার চেষ্টা করব ভাই। যা যা বললুম সব মনে থাকবে তো?

ভানা মুহু হেসে বললে, থাকবে।

পালাই তা হ'লে। পিছনের দরজা আছে? তা হ'লে ওই দিক দিয়েই যাই।

চণ্ডীকে নিয়ে বকুলবালা খিড়কি-দরজা দিয়ে চ'লে গেলেন।

পর-মুহুর্তেই ভাস্কর বহু এসে দাঁড়ালেন দ্বারপ্রান্তে।

আমার গাড়িটা আজ কোলকাতা থেকে এল। বাইরে বেরুচ্ছি একটু। তোমার হাতে যদি তেমন বিশেষ কাজ না থাকে, চল না ঘুরে আসবে আমার সঙ্গে।

কতদূর যাবে?

বেশি নয়, মাইল যোল। ঘণ্টা দুই লাগবে।

এই গরমে বেরুবে?

মোটর চললে বেশি গরম লাগে না। হাওয়া লেগে আরামই লাগে বরং। আমাকে যেতেই হবে—একটা এনকোয়ারি আছে। তুমি যদি না যেতে চাও, থাক তা হ'লে।

ভানা নোমনা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মুহুর্তকাল। এই সময়ের সম্ভাব্য ফলাফলের ভাল-মন্দ দুটো দিকই মুহুর্তের মধ্যে জেগে উঠল তার মনে। তারপর যেন মরীয়া হয়ে বললে, বেশ, চল।

বেরিয়ে পড়ল দুজনে।

ভাস্কর নিজেই ড্রাইভ করছিল। পিছনে ব'সে ছিল চাপরাসী। পোস্ট-অফিসের কাছে এসেই ভানার একটা কথা মনে প'ড়ে গেল। সম্মানসূচক কথা। তিনি বলেছিলেন, পোস্ট-অফিসে তাঁর নামে খাতা আছে। সেই খাতা থেকে ভদ্রলোকের আসল পরিচয়টা জেনে নেবে ভেবেছিল সে।

পোস্ট-অফিসের কাছে একটু থামো তো। একটু দরকার আছে।

ত্রেক ক'বে ভাস্কর জিজ্ঞেস করলে, কি দরকার?

নদীর ধারে এক প'ড়ো বাড়িতে একটি সম্মানী থাকেন। শুনেছি এই পোস্ট-অফিসে তাঁর সেভিংস্ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে। ভদ্রলোকের আসল নামটা সম্ভবত সেই খাতা থেকে পাওয়া যাবে। আমাকে বলবে কি—

তোমাকে না বলতে পারে, আমাকে বলবে।

ভাস্কর চাপরাসীকে আদেশ দিলেন পোস্টমাস্টার-বাবুকে সেলাম দিতে। হস্তদস্ত হয়ে ছুটে এলেন তিনি।

এখানে নদীর ধারে অমরবাবুদের একটা প'ড়ো বাড়িতে এক সম্মানী আছেন শুনলাম। তাঁর এখানে নাকি একটা সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে। সেই অ্যাকাউন্টে তাঁর কি নাম আছে একটু দেখে-বলুন তো।

পোস্টমাস্টার বললেন, কয়েক দিন আগেই তিনি টাকা

বার করেছেন। তাঁর নাম হচ্ছে—বিশ্বপতি ভট্টাচার্য।
আমিও তাঁকে চিনতাম না, তাঁকে আইডেন্টিফাই করলেন
আপনারই আপিসের একজন ক্লার্ক বিনয়বাবু। তিনি গুরু
খবর সব বলতে পারবেন।

কত টাকা আছে গুরু আঁকাউণ্টে?

সাত হাজার টাকা। অনেক দিন ধরে পড়ে আছে।

ও। আচ্ছা।

আবার মোটর চলতে শুরু করল।

ভানার বিন্ময় সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল।
ব্যাকে বার সাত হাজার টাকা, সে উজ্জ্বলধারী! কেন?...
অশ্রুমনক হয়ে এই কথাই ভাবতে লাগল সে।

ভাস্কর বহু উঠলেন এসে একটা ডাক-বাংলোয়। নদীর
ধারে বেশ মনোরম বাংলাটি। ম্যাক্সিম্বেট সাহেবের জন্ত
দারোগা-জাতীয় কয়েক জন লোক অপেক্ষা করছিলেন।
ভাস্কর ভানাকে বললেন, আমি যত শিগগির পারি কাজটা
সেয়ে নিচ্ছি। তুমি যদি গাড়িতে বসতে চাও—

ভানা বললে, তুমি কাজ সার। আমি নদীর ধারে
ধারে ঘুরে বেড়াই একটু। দু-চারটে পাখির দেখা নিশ্চয়ই
পাব।

নদীর উপর গোটা দুই কালো-পেট গাংচিল উড়ছিল।
তাঁদের সহজ স্বন্দর স্বচ্ছন্দ ওড়ার দিকে চেয়ে ভানা দাঁড়িয়ে
রইল খানিকক্ষণ। তারপর দেখতে পেলে দুটো বাঁশপাতি
উঁচু পাড়ের গর্ভ থেকে মুখ বাড়ানো। আর একটু এগিয়ে
দেখল দুটো নয়, অনেক। গর্ভও অনেক। বাঁশপাতিরা
পাড়া বসিয়ে কেলেছে একটা। ছরবীনটা আনে নি বলে
দুঃখ হতে লাগল। গাংশালিকও আছে মনে হ'ল।

অন্ধকার হয়ে এসেছিল। সমস্ত দিনের অসহ্য গরমের
পর ঝিরঝির করে স্বন্দর হাওয়া উঠেছিল। বিজ্ঞানী
ঝঙ্কারে স্পন্দিত হচ্ছিল অন্ধকার। ভানা চুপ করে
বসে ছিল একটা ক্যাম্প-চেয়ারে হেলান দিয়ে। ভাস্কর বহুও
পাশেই বসে ছিলেন। কেউ কোনও কথা বলছিল না।
না-বলা কথার ভারে পরিবেশটা যেন আরও নিবিড় আরও
ঘন হয়ে উঠেছিল। ভাস্কর হঠাৎ দেশলাই জ্বলে পাইপটা
ধরালেন, নিবিড় ভারটা কেটে গেল।

চা দিতে তো বড্ড দেরি করছে। দুধ যোগাড় করতে
পারে নি বোধ হয়। আমি টাটকা দুধ দিয়ে চা তৈরি
করতে বলেছি। দেখি।

ভাস্কর বহু উঠে ডাক-বাংলোর সামনের দিকে গেলেন।
ভানা চুপ করে বসে রইল। নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে
হাঁটতে সে অনেক দূর চলে গিয়েছিল। কয়েকটা কান-
খোঁচা আকৃষ্ট করেছিল তাকে। গ্রীষ্মকাল প্রায় শেষ
হতে চলল, এদের এতদিন এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়া
উচিত ছিল। এরা বোধ হয় এখনও এদেশের মায়া
কাটাতে পারে নি। এরা কোন্ জাতের, গ্রীন স্যান্ডপাইপার
(Green Sandpiper), না, কমন স্যান্ডপাইপার
(Common Sandpiper) তা বোঝা যাচ্ছিল না।
উড়লে গ্রীন স্যান্ডপাইপারের সাদা পিছন দিকটা থেকে
বোঝা যায়—অমরবাবুর দেওয়া একটা বইয়ে পড়েছিল
সে। তাই দেখবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু পাখিগুলো
এমনভাবে উড়াচ্ছিল যে, পিছন দিকটা দেখতে পাওয়া
যাচ্ছিল না। এই করতে করতে অনেক দূর গিয়ে
পড়েছিল সে নদীর ধার দিয়ে দিয়ে। নদীর তীরে
এক জায়গায় ঝোপের মত ছিল একটু, তারই পাশে
গিয়ে বসল সে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু অস্তগামী
সূর্যের দিকে চেয়ে তার সমস্ত ক্লান্তি চলে গেল।
ছোট কবিতাও মনে পড়ল একটা। আনন্দবাবু তার
খাতায় লিখে দিয়েছিলেন কিছুদিন আগে। কবিতাটা
মনে গেঁথে গিয়েছিল তার।

দূরের আকাশে অনেক সূর্য উঠেছে এবং অস্ত গেছে

কাছের আকাশে এখনও ওঠে নি কেউ

দূরের বাগানে অনেক ফুলেরা ফুটেছে বয়েছে অতীত কালে

কাছের বাগানে এখনও ফোটে নি কেউ

কাছের আকাশে উঠবে সূর্য কাছের বাগানে ফুটেবে

ফুলেরা জানি

মনের ভিতরে তবুও কিন্তু কাহারো বসিয়া করে যেন

কানাকানি

বিরাট সূর্য খুব কাছে এলে সহ্য করতে পারবে কি

তাকে হায়

খুব কাছাকাছি ফুটলে ফুলেরা লাগবে কি তব

রসবোধ চেতনার

ভানার সূর্য গন্ধ বর্ণ কেউ?

কবি সজ্ঞাতসারেই তার মনের কথাটা লিখেছিলেন ওই কবিতাটোতে। তাই মনে থেকে গেছে। হঠাৎ সেই কাদাখোঁচা পাখির দল খুব কাছে এসে বসল এবং উড়ল তখনই। এবার সামান্য পিছন দিকটা স্পষ্ট দেখা গেল। ডানা বুঝতে পারল ওরা গ্রীন স্ট্রাউপাইপারই। ভারি আনন্দ হ'ল বুঝতে পেরে। তারপরই মনে হ'ল, কেন এই আনন্দ? সত্য নির্ণয় করে? না, নিজের অহঙ্কার তৃপ্ত হ'ল বলে? আবার পাখিগুলো এসে বসল, আবার উড়ল। এবার উড়ে অনেক দূরে চলে গেল। আকাশের ভিতর মিলিয়ে গেল যেন। ডানার মনে পড়ল ওরা দূরের যাত্রী। তারপরই সে সচেতন হ'ল যে, তাকেও ফিরতে হবে। ভাস্করের কাজ হয়তো হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে। ফিরতে ফিরতে অহঙ্কার হয়ে গেল। এসে দেখলে, ভাস্কর সত্যিই তার অপেক্ষায় বসে ছিল।

ওদিকের ঘরটায় চা দিয়েছে, চল।

চল।

ডাক-বাংলোয় খাওয়াদাওয়া করবার জন্ত যে ঘরটা নির্দিষ্ট থাকে, তাতে বেশ কেতাছরস্তভাবে চা-পানের আয়োজন করা হয়েছিল। পেট্রোম্যাক্স জ্বলছিল একটা ঘরের কোণে। চাপরাঙ্গী চা ঢেলে দিতে যাচ্ছিল, ডানা তাকে মানা করলে। নিজেই চা ঢালতে লাগল সে। চাপরাঙ্গী বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। ভাস্কর বহু নির্নিমেমে চেয়ে রইলেন ডানার আনত মুখের দিকে। আরার নীরবতা ঘনিয়ে এল। একটা সঙ্কটই যেন ঘনিয়ে এসেছে, ডানার মনে হচ্ছিল। এমন সময় অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল একটা। অনেক ফুল নিয়ে দ্বারপ্রান্তে একটি লোক এসে দাঁড়াল। ভাস্কর ঘাড় ফেরাতেই হুঁকৈ সেলাম করল লোকটি। তারপর ঘরে ঢুকে একটা চিঠি দিল। ভাস্কর অকুণ্ঠিত ক'রে চিঠিটার দিকে চেয়ে দেখল একবার। তারপর লোকটিকে বললে, আচ্ছা, দ্বিগুণ ঝাণ্ডা ও গুলো। বাবুজীকে আমার সেলাম দিও। লোকটি ফুলগুলো চাপরাঙ্গীর হাতে দিয়ে চলে গেল।

ভাস্কর যত্নে হেসে চিঠিটা এগিয়ে দিলে ডানার দিকে। ডানা দেখলে লেখা রয়েছে—মিসেস বসু, জন্তে কিছু

ফুল পাঠলাম। আপনারা আমার নমস্কার জানবেন। ইতি
-রুক্ষলাল

বেচারা জানেই না যে, আমি বিয়ে করিনি।

ও! খবরটা আমিও তো জানতুম না।

ডানার মুখে মুহূর্তে হাসি ফুটে উঠল।

ভাস্কর বহু অশ্রুযোগ ছাড়লেন না।

বললেন, তোমার ডানা উচিত ছিল। সব ফুলে গেছ নাকি? তোমার স্মৃতিশক্তির ওপর আমার আস্থা ছিল, এখনও আছে।

ডানা মনে মনে যা প্রত্যাশা করছিল, যা চাইছিল, তাই হ'ল। কিন্তু সে-সহসা উত্তর দিতে পারল না কিছু। চোখ নীচু ক'রে চামচেটা চায়ের পেয়ালার ভিতর নাড়তে লাগল আস্তে আস্তে। কিন্তু বলবে মাথাতেই এল না।

তুলে গেছ-সর?

না। কিছুই তুলি নি, তবে—

আবার থেমে গেল সে।

তবে কি?

কিছুই নয়, তেমন। চল, এবার ফেরা থাক।

ডানা উঠে দাঁড়াল। ভাস্কর বহু কিছু ব'সেই-রইলেন। কথাটা শেষ ক'রেই দাঁও না ঘাবড়ান আগে।

শেষ করবার তো কিছুই নেই। ধীরে স্বপ্নে আলোচনা করা যাবে। এখন চল।

আলোচনা করবার মত কিছু আছে নাকি?

আছে কি না সেইটেই আলোচ্য।

হেয়ালির মত শোনাচ্ছে।

ডানা কোনও উত্তর না দিয়ে হাসিমুখে চেয়ে রইল তার মুখের দিকে। হঠাৎ নজরে পড়ল, ভাস্করের চোখের নীচেটা কোলা কোলা। আগে তো এমন ছিল না। এর আগে তার চোখেও পড়ে নি।

কি দেখছ এমন ক'রে?

কিছু নয়, চল। আমার কাজ আছে।

দ্রুতনে বেরিয়ে পড়ল।

কল্পনার নূতন খোঁজকে পেয়ে কবি মেতে উঠেছিলেন। তাঁর প্রথম জীবন কেটেছিল কাব্যচর্চায়। বিশেষ

ক'রে সংস্কৃত কাব্য তাঁকে পেয়ে বসেছিল যেন। তারপর যখন কলেজে তিনি চাকরি পেলেন, তখন মেতে উঠলেন ছাত্রদের নিয়ে। তাঁর স্বজনীপ্রতিভা লেগে পড়ল ছাত্র-ছাত্রীদের সৃষ্টি-সৃষ্টি করবার কাজে। কলেজের বা পাঠ্য তা তো তাঁদের পড়াতেনই নানা রকম ক'রে, যা পাঠ্য নয় তাও পড়াতেন। কালিদাস ষাঁদের পাঠ্যতালিকা-ভুল, তাঁরা ভবভূতি ভারবী ও মাঘেরও আশ্বাদ পেতেন কিছু কিছু। ছাত্রদের নিয়েই মেতে ছিলেন তিনি তাঁর চাকরি-জীবনে। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে যখন দেশে ফিরলেন তখন একটু মুশকিলে পড়েছিলেন। বাল্য-বন্ধু রূপচাঁদ ছিলেন অবস্থা, কিন্তু তার মধ্যে এমন কিছু ছিল না, যা মাতিয়ে দিতে পারে। তার চতুর বৈষয়িকতায় কোনও প্রেরণা পেতেন না তিনি। তবু তাকে নিয়েই দিন কাটছিল। তার পাল্লায় প'ড়েই নীটশের দু-একখানা বইও পড়েছিলেন। খুব ভাল লাগে নি তাঁর। মনে হয়েছিল, তখনকার হেইও-মার্কী বীরপুরুষদের মন রাখবার জন্তই ভক্তলোক বুদ্ধির কসরৎ করেছেন নানা-রকম। যারা শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শকে উপলব্ধি করেছে, তাদের কাছে নীটশের 'স্বপারম্যান' খুব ফিকে। এ দেশে চার্বাক কলকে পায় নি, নীটশেও পাবে না। এ নিয়ে রূপচাঁদের সঙ্গে তর্ক হ'ত মাঝে মাঝে। অর্থাৎ নীটশেকে নিয়েই মেতে থাকবার চেষ্টা করতেন তিনি। কিন্তু জমত না। এমন সময় অমরবাবু এলেন তাঁর অপরূপ মানসিক ঐশ্বর্য নিয়ে। যে জগৎ তিনি উদ্ঘাটিত করলেন তাঁর চোখের সামনে, তা শুধু পাখির জগৎ নয়, তা এক অদ্ভুত রহস্যময় অমরাবতী। তার পর এল ডানা। অপরিচিতা, রূপসী, যুবতী। মানবী নয়, যেন স্বপ্ন। নূতন রঙে, নূতন রসে মেতে উঠল তাঁর বক্সনা। শুক তরু মুগ্ধরিত হয়ে উঠল, যা পাষণ মনে হচ্ছিল তা ফেটে গেল হঠাৎ, কুলকুল ক'রে বেরিয়ে পড়ল কাব্য-নিখরিত্রী। চলল কিছুদিন। এখন সে ভাবটাও কেটে গেছে। এখন নূতন স্বর লেগেছে মনে। অমরবাবুর জমিদারির ম্যানেজার হওয়ার পর থেকে প্রজাদের দিকে তাঁর নজর পড়েছে। কি করলে তারা ভালভাবে থাকতে পারে—এই হয়েছে এখন তাঁর প্রধান চিন্তা। ওই নিয়েই মেতে উঠেছেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে

বেড়াচ্ছেন, প্রজাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপন করবার চেষ্টা করছেন। ডানার কাছ থেকে মন স'রে গেছে অনেক দূরে। জোর ক'রে যে সরিয়ে দিয়েছেন তা নয়। নদীর মত আপনিই স'রে গেছে।

...দুপুরের রোদ অগ্রাহ্য ক'রে সেদিন বেরিয়েছিলেন তিনি ইছাপুর গ্রামের উদ্দেশে। হেঁটে নয়, গরুর গাড়ি ক'রে। ইছাপুরের প্রজারা জানিয়েছে যে, এবার তাদের ফসল ভাল হয় নি। তার উপর গ্রামে কলেরার মড়ক লেগেছে। পুকুরে জল নেই, কাদা উঠছে। যে কটি কুপ আছে তাও শুষ্ক হয়ে আসছে। আনন্দবাবু ডাক্তার পাঠিয়ে কলেরার প্রকোপটা আগেই কমিয়েছিলেন। নবাগত ম্যাজিস্ট্রেট ভাস্কর বহুর সহায়তায় কয়েকটা কুপের জীর্ণ-সংস্কারও হয়েছে। দু-একটা টিউবওয়েল করিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি। কবি যাচ্ছিলেন স্বচক্ষে সব দেখবার জন্তে। একটা বাগানের কাছাকাছি এসে গাড়োয়ানটা বললে, ছজুর, গরু দুটোকে একটু জল খাইয়ে আনি। বড্ড ইঁপাচ্ছে। কাছেই নদী, আমি ঘাব আর আসব। চান করিয়ে নিলে আরও ভাল হয়। যা রোদ!

কবি বললেন, বেশ, যাও। খুব বেশি দেরি ক'রো না। আমার বিছানাটা একটা গাছের তলায় বিছিয়ে দাও তা হ'লে। গাড়িতে ব'সে থাকার চেয়ে ওখানে ব'সে থাকা ভাল—

ছায়াহীনতল একটি বড় গাছের নীচে বিছানাটি পেতে দিয়ে গাড়োয়ান চ'লে গেল। কবি উপবেশন করলেন। উপবেশন ক'রেই অস্থব করলেন, এক অদ্ভুত স্বর্ণরাজ্যে তিনি প্রবেশ করেছেন। চতুর্দিক যখন রোদে পুড়ে যাচ্ছে, তখন এই শ্রামান্ত্রিনী কানন-লক্ষ্মী আশ্চর্য কৌশলে অদৃশ্য এক স্নেহ-অঞ্চলের আড়ালে এই স্থানটুকুকে রোদের অত্যাচার থেকে বাঁচিয়ে ফেলেছেন। অদ্ভুত পরিবেশ। তাকিয়া ঠেস দিয়ে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ। সমস্ত অস্তর দিয়ে উপভোগ করতে লাগলেন পরিবেশটা। তার পর গান শুরু করলে একটা দোয়েল পাখি। গ্রাম-সংস্কারের কথা মনে রইল না আর। কবিতার খাতা বেরুল পকেট থেকে। দেখলেন পুরোনো খাতাটা

এনেছেন। মাত্র চার-পাঁচ পাতা সাদা আছে। মাঝে মাঝে যে সব পাখি নিয়ে কবিতা লিখেছেন, তাই পরিষ্কার করে টোকা আছে এতে। বছবার-পড়া কবিতাগুলোতেই চোখ আটকে গেল আবার। আবার পড়তে লাগলেন।

ক

গাই-বক, কৌচ-বক, রাত-বক
কেউ সাদা, কারো গায়ে নানা ছক।
নদী-নালা-পুকুরেতে চূপচাপ
বসে বসে মাছ খায় কুপকাপ।
এক মনে বসে থাকে নড়ে না
চোখে তার আর কিছু পড়ে না।
আকাশেতে ওঠে রবি, তারা, চাঁদ,
বাগানে রূপের বান ভাঙে বাঁধ।
বাতাসেতে কত লীলা স্বরভির
কত সাহানার কত পুরবীর।
বকদের প্রাণে নেই কোন শব্দ
গাই-বক, কৌচ-বক, রাত-বক,
মেখে শুধু চুনো-পুঁটি মারে ঘাই
তার চোখে আর কিছু পড়ে নাই।
বক কয়, কবি, মোরা সত্যিই নাজেহাল
তোমাদের মত বল কোথা পাব বেড়াঙ্গাল।

ময়ূর

নীল-সবুজের সাথে ইন্দ্রধনু করেছে মিতালি
ছন্দ সাথে মহানন্দে মিলিয়াছে মনের আবেগ
উজ্জ্বলিত পেশমেতে জ্বলিতেছে বর্ণের দীপালি
প্রেমসী এসেছে কাছে, আকাশেতে উঠিয়াছে মেঘ।

ভকী-ভরা দৃপ্ত গ্রীবা অপাঙ্গে কি বহি-বিভা
প্রতি পর্বে বর্ণময় স্বর,
তালে তালে নাচিছে ময়ূর।
নাচিছে কবির চিত্ত বনভূমি হ'ল তীর্থ
স্থল রূপ হ'ল স্মৃতি, হৃৎকণ হ'ল দূর
তালে তালে নাচিছে ময়ূর।

নাচে পক্ষী-নটরাজ পরিয়া অপূর্ব সাজ
গ্রীষ্মও যে হ'ল স্বপ্নাতুর,
শাল তাল কর্ণিকার ভাষা নাহি বর্ণিবার
সর্ব অঙ্গে তাহাদের রোমাঞ্চ ময়ূর।
প্রিয়া-পাশে নাচিছে ময়ূর।

শকুনি

কলির জটায়ু তুমি জয়, জয়, জয়
ক্ষুধারুণী রাবণেরে করেছ দমন
জীবন্ত কোন সেনা নাহি করি ক্ষয়।
মরিয়া পড়িয়া থাকে ভাগাড়ে যারা
অভিনব তব রূপে বোঝা তারা
শবের বাহিনী লয়ে এ শিব-দোসর
ক্ষুধা-হরে কর পরাজয়।
নহ তুমি মনোহর, বিলাসী নহ,
হৃৎকণের রক্ষতা অঙ্গে বহ
মৃত্যুর সাথে তব কি হৃৎসহ
ঘনিষ্ঠ বোর পরিচয়।
জয়, জয়, জয়।

বাবুই

চোখ দিয়ে যা দেখছ তুমি
আসল সেটা দেখাই নয়,
আসল দেখা হয় যে অনেক পুণ্যে।
বাবুইটাকে ভাবছ পাখি?
কিন্তু ওরা পাখিই নয়
ক্যাবিলনের শিল্পী ওরা
শহর বানায় শূন্যে।
খড়ের বোতল বানিয়ে ওরা
ছলিয়ে দিল ভালগাছে,
না, না ভায়া, তাড়ির নেশায় নয় গো,
খোজখোজ আর কোটর ছেড়ে
নূতন কিছু করল ওরা
শিল্পী-মনের সেই তো পরিচয় গো।

নাইক তাঁত, নাইক হাত

নাইকো কোন যন্তর

তালগাছেতে তুলল শহর

এ কোন্ বাত মস্তুর।

আছে কেবল ছোট্ট মুখ

হলদে মাথা, হলদে বুক,

এবং-আছে কল্লনা

নেহাত দেটা অল্প না!

তাই কি বুড়ো তালগাছটা সমস্তম্বে যেন

পাতার ছাতা ধরছে মাথায় ওদের?

কিন্তু ওরা মশগুল যে, তোয়াক্কা নেই বোদের।

শুভ্রে শহর তুলছে

এই আমোদেই রোম বৃষ্টি ভুলছে।

আরও অনেক পাখির বিষয়ে অনেক কবিতা লেখা

আছে। কিন্তু দোয়েল পাখিটার অশ্রান্ত গানের তাগিদে

পড়া বন্ধ করতে হ'ল তাঁকে। দোয়েল যেন ভৎসনার

স্বরে তাঁকে বলতে লাগল—কি কাণ্ড তোমার! আমি

এসেছি দেখছ না? এখন অগ্রা কিছু করা সম্ভব কি!

মনে পড়ল, অমরবাবু অনেকদিন আগে একটা চিঠিতে

একটা দোয়েলের গানকে আমাদের অক্ষরে লেখবার চেষ্টা

করেছিলেন। কবিতায় সে চেষ্টা করলে কেমন হয়?

কান পেতে শুনে লাগলেন মন দিয়ে। তারপর ভেবে

ভেবে লিখলেন—ওরই গানের যথাসম্ভব অক্ষরকণ ক'রে

লিখলেন—

চিচাকি—চিচাকি—চিচিরবু

কিনি কিনি কিনি কিনি কুকিনি কোনিয়া

টুক্টি কুট্টি কিম কোনিয়া

কুক্ক কুচির চং

কুক্ক কুচির চং

জুচ্চি জুচ্চি কি রে কিচ্চিচ্ কোনিয়া।

মাহুকের কাছে এর কোন অর্থ নেই। কিন্তু দোয়েলের

কাছে আছে। দোয়েলটা উড়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে

উড়ে এসে বসল একটা ল্যাজ-ঝোলা পাখি। এ পাখিটি

তাঁর প্রিয় পাখি। লম্বাটে ধরনের বাদামী রঙের পাখি,

ল্যাজটি লম্বা, মাথাটি কালো; কিন্তু ওর রূপের জন্ত নয়, ওর

সাবলীল বেপরোয়া ভাব-ভঙ্গীর জন্ত ওকে কবির ভারি

ভাল লাগে। বুলিও ছাড়ে নানারকম। চ্যা—চ্যা—চ্যা

ডাকের জন্ত বেরসিক লোকেরা ওর নাম দিয়েছে হাঁড়ি-

চাঁচা। কিন্তু তারা বোধ হয় ওর ক-অক্রিং ডাকটা

শোনে নি। ওই ডাকটাই মাঝে মাঝে শোনার 'খুকু নেই'

'খুকু নেই'। এ ছাড়াও কখনও কখনও গঁয়-গঁয় গঁয়-গঁয়

ধরনের শব্দ করে পাখিটা। অদ্ভুত শোনায়। মনে হয়

কোনও ছোট ছেলে যেন গনগন ক'রে বায়না করছে।

ল্যাজ-ঝোলা যেন কবির মনের কথা টের পেয়ে তার সেরা

বুলিটা শুনিয়ে দিল।

ক-অক্রিং—ক-অক্রিং—ক-অক্রিং। বেশ তুলে তুলে

ডাকতে লাগল। যাকে উদ্দেশ্য ক'রে এই স্বরেলা সম্ভাষণ

সেই পক্ষী-প্রিয়াকেও দেখতে পেলেন কবি। আর একটা

গাছে বেশ সম্ভ্রান্তভাবে সে ব'সে আছে, যেন কেউ

তাকে ডাকছে না। কবি আর আশ্বসনধরণ করতে পারলেন

না। শুক করলেন কবিতা আবার। এবার পাখির ভাষায়

নয়, বাংলা ভাষায়।

যদিও পুরুষ পাখি তবু যেন কিশোরী

বাদামী গায়ের রঙ, কালো মাথাটি

পুচ্ছের পাখাটি জাপানী, না, মিশরী

(তোমরা তা ঠিক কর আমি জানি না)

আমি জানি চুরি ক'রে ধাবে আতাটি।

চুরি ক'রে ফল খায়, চুরি ক'রে ডিম খায়,

প্রেমদায়ী কাছেতেই শুধু হিমমিম খায়,

খোশামোদী স্বর জাগে গলাতে

মনে হয় যেন আমতলাতে

বৃন্দাবনের স্বর বাজল

বীশরীর স্বরে বুঝি শ্রীরামিকা মাজল।

ক-অক্রিং ক-অক্রিং ক-অক্রিং—

ল্যাজ-ঝোলা পাখিটাই তুলে তুলে ডাকছে

মাঝে মাঝে চূপ ক'রে থাকছে।

ভাবছে, প্রিয়ার কথা ভোল্ না

আবার তুলিয়ে দেহ দোল্ না

পুনরায় ক-অক্রিং, ক-অক্রিং,

ক-অক্রিং, ক-অক্রিং, ক-অক্রিং।

উচু ডাল থেকে পাখি নীচু ডালে নামছে

মাঝে মাঝে ডাকছে ও ধামছে।

গাছের সবুজে রোমন্থ জলছে

মদন-মহনে পাখি বলছে

ক-অক্লিং, ক-অক্লিং, ক-অক্লিং।

সহসা বেসুরা ডাক—চ্যা চ্যা চ্যা—

বিবেকই বলছে বুঝি-ছ্যা ছ্যা ছ্যা

আর কত খোশামোদ করবি

আর কত ডেকে ডেকে মরবি

বাড়িয়ে স্বরের হাত আর কত পায়ে তার ধরবি।

একটুও নেই তোর লাজ হার।

ল্যাজের বাহার দিয়ে উড়ে গিয়ে বসল

ফল-ভারে নত আমগাছটায়।

কণ পরে দেখি পুন ডাকছে

ক-অক্লিং, ক-অক্লিং, ক-অক্লিং।

কবিতাটা শেষ করে কবি অনেকক্ষণ বসে রইলেন

চুপ করে। হঠাৎ একটা কথা মনে হ'ল।

আর কেউ বুড়ো হয় না। গাছেরা পাখিরা প্রতি বছর

বার্ষিকের খোলস ফেলে দিয়ে যৌবনের সাজে সজ্জিত করে

নিজেদের। নবমুহুরে সজ্জিত বৃক্ষ আমগাছটার দিকে

চেয়ে রইলেন তিনি মুগ্ধ নেত্রে। ল্যাজ-বোলা পাখিটা

সুমনে ডেকে চলেছে। ওর বয়স কত সে প্রশ্নই মনে

জাগছে না, যৌবনস্থলভ আনন্দে ও মেতে উঠেছে—এইটেই

এই মুহূর্তে ওর শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। ডানার কথা মনে হ'ল।

ডানাও ফুরিয়ে যাচ্ছে, তার আবির্ভাব তাঁর কল্পলোকে বে

উৎসবের সাদা তুলেছিল তা দেখতে দেখতে শেষ হয়ে

যাচ্ছে তুবড়ির মত। ডানা আর তাঁর কবিতার ধোরাক

যোগাতে পারবে না ভেবে কষ্ট হতে লাগল।

এবার চলুন হজুর।

গাড়োয়ানের আগমনে সহসা নতুন জগতে নীত

হলেন তিনি।

[ক্রমশ]

ভালবাসা

শ্রীকৃতাশ্রয় বাগচী

আজকে যেন কেমন হাওয়া করছে ষাওয়া-আসা,

তোমার চোখে কে ফুটাল রাতছপূরের ভাষা।

ঘর ছেড়ে মন বেড়ায় ঘুরে,

গুনগুনিয়ে আপন স্বরে

কাদিয়ে তুলে অকারণে নতুন ফুলের হাসা।

আজকে যেন কেমন হাওয়া করছে ষাওয়া-আসা।

নেই পুরনো পথ যে গেল ঝরা-পাতায় ছেয়ে।

আলো-ছায়ায় আনাগোনা নাম-না-জানা মেয়ে।

একটি কথা বলার তরে

সকল জ্বলন্ত কাউলি ওরে

আনমনে রই সারা বেলা দূরের পানে চেয়ে।

আলো-ছায়ায় আনাগোনা নাম-না-জানা মেয়ে।

আমায় তুমি ডাক দিয়েছ নিখুঁত স্বপ্নঘোরে

বাঁধলে যেন ব্যাকুলতার বিষম মায়াদোরে।

এড়িয়ে যে ঘাই সাধ্য সে নাই,

মধু-মাতাল মৌমাছি হায়,

ছড়িয়ে দিলে এ কি আগুন জাগরণের ভোরে।

স্বপ্নঘোরে কখন তুমি করলে আপন মোরে।

পার্লল কে সে সর্বনেশে করছে ষাওয়া-আসা,

ফুলের ফাঙ্কন বুনল বুকে তুলের ভালবাসা।

২ নাম তার তোরাব আলি।

বরিশাল জেলে আমার খাবার জোগাত তোরাব। বিখ্যাতী লোক। জেলের বাবুবা, সাহেববা, আর বড় জমাদার সাহেব—এঁদের সকলেরই আস্থা আছে তোরাবের ওপর। কয়েদী যদি বেগড়ায় তোরাব তাকে বাগে আনতে পারবে; শুধু তাই নয়, সকলেই জানেন যে, তোরাব একটি অপাধিব শক্তির অধিকারী। এত বড় জেলে এতগুলো বন্দীর মধ্যে যদি একজনেরও মনের কোণে বিন্দুমাত্র স্বপ্ন জাগে শিকল কাটবার, তা হ'লে তৎক্ষণাত্ তোরাব তা জানতে পারে। তারপর সে সংবাদ যথাস্থানে পৌঁছে দিতে তোরাবের আর কতটুকু সময় লাগে।

সকলেই খাতির করে তোরাব মেটকে, আর সাধ্যমত এড়িয়ে চলে তাকে। তার চেয়ে পুরনো মেট যারা, তারাও সাবধানে থাকে। বলা তো যায় না, কখন ওর দিল তড়পে উঠবে! তা হ'লেই কেলেঙ্কারি। মুখে যা আসবে তাই ব'লে বসবে ছদ্মদের সামনে। তারপর দিকদারির শুরু। একজন থেকে আর একজন, তারপর আর একজন ধ'রে টান পড়বে। কার বরাত্তে কি ঘটবে কিছুই বলা যায় না। মার, ডাঙাবেড়ি, মাড়ভাত, মেট থেকে কালাপাগড়িতে নামানো, কালাপাগড়ি থেকে সাধারণ কয়েদী। তার উপর লে আও টিকিট—কাট পনেরো দিন, কাট এক মাস। লাহনার একশেষ।

সকলের চেয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে তোরাব মেট। চুল-দাড়ি কামায় আর প্রত্যেক দিন সাবান দেওয়া সাজ-পোশাক পরে। রঙ তার ফরসা—বেশ ফরসা, জু আর মাথার চুল কটা, চোখের তারা দুটিও কটা। আমার সেলের সামনে কোমরের তোয়ালেখানা পেতে হাঁটু গেড়ে ব'সে যখন নমাজ পড়ত তোরাব, তখন আমি একদৃষ্টে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকতাম গরাদের ভিতর থেকে। চোখ বুজে ও টোঁট নাড়ত।

বেলা দুটো-তিনটের সময় রোজই তোরাব এসে সেলের গরাদে ধ'রে দাঁড়াত। তা এক ঘণ্টা দু ঘণ্টা

কাটিয়ে দিত। সময়টা কাটত হিসাব করতে করতে। হিসাব সোজা নয়। চোন্ধ থেকে আট বাদ গেলে মাত্র ছয় থাকে বাকি, আর ছয় থেকে কত বাদ গেলে কিছুই থাকে না তখন?

হিসাব করত তোরাব—আজ্ঞে জানমু না ক্যা বাবু মশয়। এই ধরেন ছয় সন আর এড়া অইল গ্যা মহরমের মাস, তা অইল গ্যা ছয় সন আর নয়খান মাস। কাবার কইর্যা জালাম সাত সন। কি কন?

তাড়াতাড়ি উত্তর দিই আমি, বটেই তো। সাত বছরের আর বাকি কোথায় তোমার?

উত্তর শোনার অপেক্ষা রাখে না তোরাব, হিসাব চালিয়ে যায় আপন মনে, তার সাথে ধইর্যা রাহেন আরও ছয়খান মাস, ওই হাতখান মাসই গোনতি পারেন। ছার পাইমু না?—ব'লে এমনভাবে চেয়ে থাকে আমার দিকে যেন বছরে এক মাস হিসেবে ছাড় পাওয়া না-পাওয়াটা আমার মতামতের ওপরেই নির্ভর করছে।

বিস্ময় প্রকাশ করি, পাবে না মানে? না পাবার কি হয়েছে?

চকচকে দাঁতগুলি বার ক'রে তোরাব বলে, হক কথা কইছেন কর্তা। তারপর হঠাৎ যেন তার মনে প'ড়ে গেল, আরও ধরেন তিনডা মাস। হেবার মাইরডাকায় বর সাহেব মাক জালেন তিনডা মাস, একায়ে পাকা কইর্যা লেইখ্যা থুয়া গ্যাছেন মোর টিকিডখানার 'পর। অ্যাহন জোরেন হেসাবখান। জাহেন আটডা সন কাবার কইর্যা জালাম কি না কন?

তারপরই দু হাত মেলে আঙুল গুনতে থাকে। চোন্ধ থেকে আট বাদ গেলে থাকে মাত্র ছয়। মাত্র ওই ছটি বছরই আর বাকি আছে তার খালাস পেতে। এরই মধ্যে যদি আর দু-একবার দাখাহাকামা লাগে জেলে, তবে খোদার দোয়ার কি আরও অন্তত ছটা মাস মাক করিয়ে নিতে পারবে না সে? খুব পারবে।

সেবারের সেই হাকামার কাহিনী কমপক্ষে একশোবার আমার শুনতে হয়েছে তোরাবের মুখ থেকে। শুনতে

শুনতে এমনই দাঁড়িয়েছিল যেন সেই মাঝাক পালটি আগাগোড়া ঘ'টে গেছে আমার চোখের ওপর, চোখ বুজে হবহ আমি দেখতে পেতাম সে দিনের সেই কাণ্ড-কারখানা।

বেলা তখন এগারোটা। হঠাৎ হৈ-হৈ উঠল চারদিক থেকে। একসঙ্গে ফুঁসিয়ে উঠল সাড়ে সাতশো লোক। খোস্তা কোদাল যে যা পেলে হাতের কাছে তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াল। তিনশো ষাট দিন শুধু পুঁইশাকসহ খেতে আর কেউ রাজী নয়।

বড় সাহেব, জেলার সাহেব, ছোট হজুরেরা সকলেই আপিসের মধ্যে। সকলেরই মুখ চুন। পেট-মোটা জমাদার সাহেবরা ছুটে গিয়ে জড়ো হয়েছেন গেটের ওদারে আপিসের সামনে। ওয়ার্ডাররা কে কোথায় লুকিয়ে পড়েছে তার পাক্সা নেই। পাগলা-ঘটি বাজছে তো বেজে চলেছেই। সাড়ে সাতশো লোক মরিয়া হয়ে একটু একটু করে এগুচ্ছে গেটের দিকে।

তোরাবের তখন মাত্র তিন বছর। কয়েকদেবর ভেতরের সব খবরাখবর যথাস্থানে সরবরাহ ক'রে ক'রে সে তখন নতুন কালাপাগড়ি পেয়েছে। দিনে আপিসের মধ্যে কাজকর্ম করে, বাড়ে পৌছে, ফাইকরমাস ঘাটে। রাতে নিজের ওয়ার্ডে তাল চাবির মধ্যে। প্রকাণ্ড হলটার দু ধারে সারবন্দি ঘুমাচ্ছে কয়ল বিছিয়ে যে কয়জন লোক, তাদের মাঝখানে দিয়ে হলটার এ-ধার থেকে ও-ধার হাঁটা আর বিচিত্র স্বরে গান গেয়ে গেয়ে গোনা 'এক দো তিন চার সাতচলিশ উনপঁচাশ পঁচাশ—ঠিক হায় চার লম্বর।' আর মনে মনে হয়তো আলাদা ক'রে শুনতে থাকত তখন চোদ্দ থেকে তিন বাদ গেলে হাতে থাকে এগারো আর এগারো থেকে কত বাদ গেলে হাতে কিছুই থাকে না আর!

শনিবারের জোরে সেদিন তখন কালাপাগড়ী তোরাবালি আপিসের মধ্যেই আটক পড়েছিল হজুরদের সঙ্গে।

প্রতি মুহূর্তে অবস্থা ক্রমেই সঙ্কট হয়ে উঠছে। সরকারী ভাষায় যাকে বলে আয়ত্তের বাহিরে চ'লে যাওয়া, অবস্থাটা প্রায় সেই রকমেরই হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সাহেবরা পরামর্শ করছেন—গুলি চালাবার হুকুম এই মুহূর্তেই দেবেন, না, আরও কয়েকটা মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে দেখবেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে লোক ছুটেছে।

তোরাব গিয়ে দাঁড়াল সেলাম ঠুঁকে স্থপার সাহেবের সামনে, তখন তার কপালের উপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে নীল শিরশুলো।

তার চোখের দিকে চেয়ে সাহেব তাঁর পিস্তলটা হাতে তুলে নিলেন।

কেয়া মাংতা?

রফে তার তখন আঙুন ধ'রে গেছে। সাহেব শুনলেন তার আরজি, পিস্তল-সুদ্ধ হাত নামালেন না বা তোরাবের ওপর থেকে নজরও সরালেন না। কয়েকটা কথা-কাটাকাটি করলেন জেলের সাহেবের সঙ্গে। তারপর তোরাবের আরজি মঞ্জুর হ'ল। হাত পাঁচেক লম্বা একখানা পাকা লাঠি দেওয়া হ'ল তাকে। তারপর পিস্তল বাগিয়ে ধ'রে স্বয়ং বড় সাহেব চললেন তার পিছু পিছু ফটকের ছাতের ওপর। ভেতরের গেট তখন খুলবে কে? গেট খুলেই যদি লাফিয়ে পড়ে সাড়ে সাতশো লোক গেটের উপর। তারপর—

ব্যা ব্যা কইব্যা একডা চিকুর ছাইড়া ছালাম লাফ আর লামলাম গ্যা একারে হালাগোর মতি। তখন বুইঝা লন ব্যাপারখান। মুই তোরাবালি, মোর ওস্তাদের নাম আসমতালি ছায়েব। গরের মতি ছইয়া ছাশের মাহমু কাপে মোর ওস্তাদের নামে। চক্ষু পালডাতি না পালডাতি ছালাম এক কুড়ি খতম কইব্যা। ব্যাস, হালায় গুটি হটল। ফটক খুইল্যা ছুইটা আইয়া পড়ল প্যাটি-মোটা জমাদার ছায়েবরা। হালাগো সামাল ছাওয়া গ্যাল, তাল পড়ল, লোক গোনতি হল। বর সাহেব আপন হাতে আধস্তার লাল পানি ঢাইল্যা ছালেন মোর মগে। আর তিনখান মাস ব্যাহাই প্যালাম।

বলতে বলতে তোরাবের চোখ-মুখের চেহারা যেত বদলে। আর আমার বৃকের ভিতরটা কেমন যেন বঁপে উঠত ওর মুখের দিকে চেয়ে। তবু রফে যে দু ইঞ্চি মোটা লোহার গরাদগুলোর এক ধারে সে, আর অল্প ধারে আমি। গরাদের গায়ে আবার শক্ত লোহার জাল আঁটা। বাইরে থেকে হাত বাড়িয়ে গলা টিপে ধরবে, সে উপায় নেই।

জেলের মধ্যে জেল, তার মধ্যে সেল। বিচারকর্ডী

বাইরে থেকে লিখোঁদলেন, আমি বি ক্লাস। সি ক্লাস হ'লে সকলের সঙ্গেই থাকতে পেতাম। বি ক্লাসের জগ্রে বিশেষ ব্যবস্থা। আলাদা ক'রে রাখতে হবে তো! কাজেই ফাঁসির আসামীর সেল একটি ছেড়ে দেওয়া হ'ল আমার। দশ হাত লম্বা আর পাঁচ হাত চওড়া একটি ঘর, যার একমাত্র প্রবেশ ও নিগমন-পথে দুই ইঞ্চি মোটা লোহার গরাদের গায়ে শক্ত লোহার জাল। হাওয়া আলো বৃষ্টির ছাট এ সকলের জগ্রে অব্যাহত। ঘরের মধ্যে সি ক্লাসের মত কতকগুলি একখানি আর থালা মগ নিয়ে থাকতে পারলেও স্বাস্থ্য পেতাম। তা তো নয়। একরাশ অস্বাভাব সম্পত্তি বি ক্লাসের। চার হাত লম্বা দুই হাত চওড়া লোহার খাট। তার ওপর ছোবড়ার গদি, ছোবড়ার বালিশ। নারকেলের গা থেকে ছোবড়া ছাড়িয়ে নিয়ে সত্ত্ব সত্ত্ব একটা চটের থলৈয় পুরে দেওয়া হয়েছে। ছোবড়াগুলোকে পেটানো বা পের্জা হয় নি। তারপর মশারি, যার চার দিকের বুল চার রকমের। এক দিকের এক হাত, এক দিকের দুই হাত, এক দিকের তিন হাত আর এক দিকের চার হাত। একখানি টেবিল ও একটি চেয়ার। কি মহাপরাধের দরুন ওরা দুজন আমার সঙ্গে সেলে বন্দী হয়ে রইল ন-নটা মাস, তা বলতে পারব না। ওদের অবস্থা দেখে আমি ঘরের এক কোণে অতি সাবধানে একজনকে আর একজনের ওপর চাপিয়ে রেখে দিলাম। একেবারে বিকলাঙ্গ পঙ্খু কিনা বেচারারা।

আর একটি জিনিসও ছিল আমার অস্বাভাব সম্পত্তির মধ্যে। তাত্ত্বিক সাধকরা পূজায় বসতে হ'লে আসনের পিছনে হাত ধুয়ে জল-টল কেলবার জগ্রে একটি পাত্র রাখেন। ওটির নাম ক্ষেপণীপাত্র। আমার এই দশ হাত আর পাঁচ হাত ঘরের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টার জগ্রে দেওয়া হ'ত একটি ক্ষেপণীপাত্র। চার সের আলাদা জল ধরে এই রকমের গোল একটি আলকাতরা-মাখানো ঢাকনা-ওয়ালা জিনিস। বেহিসেবী হ'লে রক্ষে নেই। ঘর ভাঙতে থাকবে নিজের অন্তরের অন্তরতম মালমসলায়। তারই মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা কাটিয়ে পরদিন সকালে অকথ্য গালাগালি উপরিপাওনা।

প্রথম দিন জিনিসপত্র সমস্ত সময়ে দিয়ে ছোট জেলার-বাবু তোরাব আলির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন—

বড় বিশ্বাসী লোক এ, আর এ জানে কি ক'রে সম্মানী লোকের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়। তারপর থেকে ন মাস আমি রইলাম তোরাব আলির হেপাজতে।

ঠিক সকাল সাতটায় সেলের সামনে এসে দাঁড়াতে তোরাব। বলত, সালাম কর্ড। জমানার এসে সেলের তাল খুলে দিয়ে যেত।

সেলের মাপের সমান এক টুকরো উঠান সেলের সামনে। তিন-মাহুষ উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। উঠান থেকে বাইরে বেরুবার দরজাটি সেলের দরজার ঝুঁকুঝুঁ। দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলে পাওয়া যাবে তিন হাত চওড়া গলি। গলিটা সব কটা সেলের সামনে দিয়ে চলে গেছে। তারপরই হচ্ছে লাল ইটের ছ-মাহুষ উঁচু পাঁচিল। এই গলি দিয়েই দিবারাত্র ওয়ার্ডাররা রুল হাতে ক'রে এ-ধার থেকে ও-ধার আর ও-ধার থেকে এ-ধার খট খট মস মস ক'রে টহল দেয়। আর উঠানের দরজা দিয়ে নজর রাখে, সেলের মধ্যের জীবটি কিছু করছে কি না। করবার অবশ্য কিছুই ছিল না, ওদের শ্রীবপু কতবার উঠানের দরজা দিয়ে দেখা যায় তা গণনা করা ছাড়া।

সেল থেকে বেরিয়ে এসে তোরাবের সঙ্গে উঠানের দরজা পার হতাম। তারপর সেই তিন হাত চওড়া গলিটার এক প্রান্তে পৌঁছে কলের নীচে মাথা পেতে ব'সে থাকতাম। সকালের ছুটির পুরো আধ ঘণ্টাই ব'সে থাকতাম কলের নীচে। বি ক্লাসের ওইটুকুই বিশেষ সুবিধা। নয়তো সারারাত ক্ষেপণীপাত্রের সঙ্গে কাটিয়ে কার সাধ্য সকালে এক টৌক জল গেলে!

আমাকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়ে তোরাব নিয়ে আসত চা আর চায়ে সরঞ্জাম। সাড়ে-পনেরো-আনা-কলাই-ওঠা একখানি থালায় ক'রে আসত সে সমস্ত অপূর্ব খাদ্যসামগ্রী। সি ক্লাস তো নই, কাজেই বিলকুল অসাধারণ হওয়া চাই। থালার ওপর থাকত বড় বড় আরশোলা সৈঁকে দিলে যেমন দেখতে হয় ঠিক সেই রকম দেখতে দশ-বারো টুকরো পোড়া পাউরুটি। তার পাশে এক ধ্যাবড়া সাদা থকথকে পদার্থ। ওই পদার্থ দিয়ে আরশোলা-সৈঁকা খেতে হবে। খেলে বি ক্লাসের ব্রেকফাস্ট করার ফল মিলবে। তারপর খানিকটা মাথা তামাক। সেজে-খাবার জগ্রে নয়। চেটে খাবার জগ্রে।

জেলের আইনে বি ক্লাসকে গুড় দেবার নিয়ম লেখা আছে কিনা। আর থাকত সামান্য একটু চিনি।

তারপর একটা কলাই-করা মগের তলদেশে খানিকটা সাদা তরল পদার্থও থাকত, আর একটা পাঁচ সের গুজনের লোহার কেটলিতে গুচ্ছের খানেক চাপাতা ভিজানো এক কেটলি গরম জল। প্রথমেই ওই মগের মধ্যে খানিকটা চায়ের জল ঢেলে আমি তোরাবের হাতে তুলে দিতাম। ঝুটি মাখন গুড় সমস্ত তোরাবের সেবায় লাগত। প্রথমে তোরাব প্রবল আপত্তি তুলেছিল। তাকে বোঝালাম, আমি জন্ম-পেটরোগী, এ সমস্ত ভালমন্দ ভিনিস একদম পেটে সয় না। আমার নিজের এলুমিনিয়ামের গেলাসটির মধ্যে ওই চায়ের জল ঢালতাম আর চিনি মিশিয়ে খেতাম।

ওই চা-পর্বের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের প্রাত্যহিক আলাপ-আলোচনা শুরু হয়ে যেত।

বিষয়বস্তু যদিও সেই একই, তবু আলাপটি তোলবার কায়দার দরুন কোনও দিন একঘেয়ে মনে হ'ত না। প্রতিদিনই বেশ চমক লাগত তোরাবের ক্ষমতা দেখে। চায়ের মগে চুমুক দিয়ে হঠাৎ তোরাব জিজ্ঞাসা ক'রে বলত তার নিজস্ব ভাষায়, কর্তা, আপনার পোলাপান কটি?

হেসে ফেলতাম—নাও মিঞা সাহেব, যেমন তোমার কথা। আরে, বিয়ে করবারই তো ফুরসত মিলল না এখনও। পোলাপান কি ছপ্পর ফুটো হয়ে পড়বে নাকি?

জ্বকপই নেই আমার বসিকতায়। ততক্ষণে তোরাব তার মগের মধ্যে একদৃষ্টে কি দেখছে। একটু পরে যেন বহু দূর থেকে সে বলতে থাকত, সব কটা না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরেছে এতদিনে। আমার সাকিনার বয়স হ'ল এই বারো, হুফুর এই দশ, আর ছোটটার—তা আট তো বটেই। কি খাবে? ওদের মা নিজের পেট চালিয়ে আরও তিনটে পেট কি ক'রে চালাবে? মেয়েটাকে হয়তো কারও ঘরে কাজে দিয়েছে। ওরা দু'ভাইও হয়তো কারও গরু বাছুর রাখে। নাঃ, না খেয়ে শুকিয়ে মরবে না—কি বলেন কর্তা? আমার মুখের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চায়।

আশ্বাস দিতে হয়—দূর, না খেয়ে মরে নাকি কেউ কোথাও? তোমারও যেমন মাথা খারাপ। দেশে কি মাহুষ নেই নাকি, কেউ না কেউ ওদের দেখাশুনা করছেই।

সামান্য একটু সময় কি ভাবত তোরাব। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সেই আরশোলা-সেঁকা ঝুটি এক টুকরো মুখে ফেলে চিবুতে থাকত। তারপর আবার হঠাৎ—আচ্ছা কর্তা, আপনার ঘরে এ রকম হ'লে কি করত?

এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি—কি আবার করবে, কোনও আত্মীয়স্বজনের কাছে গিয়ে ছেলেপুলে নিয়ে আশ্রয় নিত।

তোরাব একেবারে ফেটে পড়ত—আর ওরা যদি কারও কাছে আশ্রয় পেয়েও থাকে, তার বদলে কি দিতে হয়েছে জানেন? দিতে হয়েছে ইজ্জত। কোথাও মাথা গোঁজবার ঠাই মিলবে না, যদি সে কারও সঙ্গে নিকে না ক'রে থাকে। নিজের বলতে যা কিছু তার সবটুকু ধুয়ে মুছে না ফেললে কারও দরজায় আশ্রয় নেই। আমার সাকিনা, আমার হুফু, আমার বাচ্চারা যতক্ষণ না আর একজনকে বাপজান ব'লে ডাকবে, যতক্ষণ না তাদের মা আর একজনের সন্তানকে তার পেটে ধরতে রাজী হবে, ততক্ষণ তাদের মুখে দানাপানি পড়বার কোনও আশা নেই।

আর কথা জোগায় না তোরাবের। তার সেই কটা চোখের চাহনি তখন বাকিটুকু ব'লে দেয়। কোনও পশুকে বেঁধে খাঁড়ার তলায় তার গলাটা টেনে ধরলে যে ভাষা তার চোখে ফুটে ওঠে, সেই একান্ত অসহায়তার ভাষা মুখর হয়ে ওঠে তোরাব আলির দুই চোখে।

আমার সাকিনা, আমার হুফু—হায় আল্লা, কে জানে আজ তারা কোথায়। আর কি কখনও আমি তাদের ফিরে পাব?

এই ভাবে সকালের আলাপটা যেত বন্ধ হয়ে। আমার মুখেও আর কিছু জোগাত না।

চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ফিরে যাবার সময় পিছন দিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি ফেলে একটু দোঁজাপাতা আমার হাতে স্তম্ভে দিত তোরাব। দেওয়ালের গা থেকে আঙুলের নখ দিয়ে চুন কুঁড়ে নিয়ে ওটুকুর সঙ্গে হাতের তেলোয় পিষে দাঁতের গোড়ায় টিপে রাখতে হবে। ছুঁধের সাধ বোলে মেটানো। প্রথম প্রথম বেয়াড়া রকমের মাথা ধরত। সদা-সর্বদা এক চিন্তা, কি ক'রে ক'বে একটা টান দেওয়া যায় একটা বিড়ি বা সিগারেটে। লক্ষ্য করল তোরাব।

তারপর শেখালে দাঁতের গোড়ায় দোস্তাপাতা টিপে রাখা। স্বস্তি পেলাম। কতবার প্রশ্ন করেছি, কি ক'রে আসে এ সব জিনিস জেলের মধ্যে? তোরাব শুধু দাঁত বের ক'রে হেসেছে। সকালে দুপুরে আর সন্ধ্যায় তিনবার সে ওই জিনিস পরিমাণমত দিয়ে গেছে আমার হাতে। এতটুকু বেশি কাছে রাখবার উপায় নেই। কখন যে ঝাড়া নেবে কে জানে। তখন যদি ওই সমস্ত কিছু বেরিয়ে পড়ে তবে একেবারে নাজেহাল ক'রে ছাড়বে।

জমাদার সাহেব এসে দরজায় তালা লাগাত। গরাদের পাশে ব'সে তখন আমি চেয়ে থাকতাম উঠানের পাঁচিলের ও-পারে বড় পাঁচিলটার মাথার ওপর এক ফালি আকাশের দিকে। ব'সে ব'সে গুনতাম কতবার পাক খেল দুটো শব্দ আমার সেই ছোট্ট আকাশখানির গায়ে। তারা চ'লে গেলে পর আসত এক টুকরো সাদা মেঘ। এসে চুপ ক'রে চেয়ে থাকত গরাদের মধ্য দিয়ে আমার দিকে। তারপর আস্তে আস্তে তার রূপ পালটাত। একটু একটু ক'রে চারটে ঠ্যাং গজাল, তারপর গজাল শুঁড়। দেখতে দেখতে বেশ স্পষ্ট একটা হাতি হয়ে উঠল। উঠে ধীরে ধীরে বড় পাঁচিলের ও-পারে কোথায় চ'লে গেল।

বেলা দশটা নাগাদ বড় পাঁচিলের ওপর এসে বসত এক শালিক-দম্পতি। কলহ-কচকচির সীমা নেই ওদের। আর কি ব্যস্ত। একটা কিছু কয়লা না ক'রেই আবার কুজনেই ফুড়ত।

শেষে বিরক্ত হয়ে নিজের ছোট্ট কুলায় নজর ফিরিয়ে আনতাম। রিক্ততা—একেবারে চরম নিঃস্বতা যেন দু হাত মেলে আঁকড়ে ধরতে আসত। কিছু নেই, দেওয়াল ছাড়া সমস্ত নিখুঁত সাদা—সাদা ধপধপ করছে। দেখতে দেখতে চোখ ঝলসে যেত। চোখ বুলতাম। চিত্ত হয়ে শুয়ে পড়তাম আমার সেই রাজ-শয্যায়। তারপর সব পালটে যেত।

আমার বন্ধ চোখের ওপর ভেসে উঠত আকাবীকা একটি সরু খাল। দু পাশের হোগলা আর নলবন হয়ে পড়েছে খালের ওপর। সেই খালের ভিতর দিয়ে একখানি শালতির মাঝখানে ব'সে চলেছি আমি। একটি লোক শালতির গিঁহনে ঠাঁড়িয়ে লগি যেরে শালতি-খানাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে মাথা হুইয়ে

নিতে হচ্ছে, নয়তো নলপাতায় মুখ মাখা কেটে ফালা ফালা হবে। চলেছি তো চলেছিই। অনেক দূর যেতে হবে যে আমাকে। ষাচ্ছি সেই নলবুনিয়া। উমেদালি মোল্লার ব্যাটা তোরাব আলির ঘর নলবুনিয়ায়।

শালতি গিয়ে লাগবে একেবারে তোরাবের বাড়ির ঘাটে। সেখানে উঠে পাব আমি সাকিনাকে, হুককে আর তোরাবের ছোট ব্যাটাকে—যাকে সে মাত্র এক বছরেরটি ফেলে এসেছে, আর ওদের মাকে। তাদের সকলকে মাত্র ব'লে আসতে হবে আমায় যে, চোন্দ থেকে আট বান দিলে থাকে মাত্র ছয়। আর ছয় তো কিছুই নয়। দেখতে দেখতে এই ছয়ও পার হয়ে যাবে। তখন আর কিছুই থাকবে না। তোরাব ফিরে আসবে। তখন আর কিসের ভাবনা।

বেশ ভাল ক'রে বুঝিয়ে ব'লে আসতে হবে যে, তোরাবের হিসেবে বিন্দুমাত্র ভুল হয় নি আর তারাও যেন হিসেবে ভুল না করে। যেন ভুলে না যায় যে, উমেদালি মোল্লার ছেলে তোরাব আলির রক্ত মাংস হাড় দিয়ে তারা তৈরী। কোনও ভেজাল যেন না মেশে সেই রক্তে, কারণ তাদের খুন হচ্ছে একদম আলাদা খুন। তাদের বাপজান তাদের ভোলে নি। নিমকহারাম নয় সে, তারাও যেন তাদের বাপজানের কথা না ভোলে।

সাকিনার মাকে আমি বুঝিয়ে আসতে চলেছি। আমাকে একটু নরম হয়ে মিনতি ক'রেই ব'লে আসতে হবে সাকিনার মাকে যে, তুমি তো জান, তোরাব তোমায় ভুলতে পারে না। এই আটটা বছর সে দিনে রাতে নিমেষের তরেও তোমার কথা আর তোমার ছেলেমেয়ের কথা ভুলতে পারে নি। তুমি কি ভুলতে পার তোরাবকে? কি সে না করেছে তোমার জন্তে! কোন আবদারটি সে রাখে নি তোমার? যখন বা চেয়েছ তাই—রূপোর মল বাড়িটি কোমরের বিছা আর গলার চিক, ধানগাছ রঙের বেশমী ডুরে, কোনও দিন তো তোমায় কোনও ছোট কাজ করতে দেয় নি তোরাব—মাঠে ষাওয়া বা ধান ভাঙা বা মাছ ধরা! তোমার ইজ্জত আবরু নিখুঁত বজায় রেখে গেছে তোরাব—এ কথাটি কি তুমি ভুলতে পার? নিজের কামাত তোরাব। তা যে ক'রেই কামিয়ে আয়ুক। এনে তোমার দু হাত ভ'রে উজাড় ক'রে দিত

সবই। আর মাত্র ছটা বছর। দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তারপর ফিরে এসে তোরাব তোমাদের—

তোরাব ফিরে এসে সন্তর্পণে ডাক দিত, কর্তা, ঘুমিয়েছেন নাকি? উঠে পড়তাম। হাসি মুখে তোরাব জানাত, ভাত খাবার বেলা হ'ল যে। এবার গিয়ে ভাত নিয়ে আসব।—ব'লে নিজের জামার তলা থেকে আধখানা কাগজ নেবু'বার ক'রে দিত। ব্যবস্থা ক'রে হাসপাতাল থেকে চুরি ক'রে আনিয়েছে আমার জন্তে।

বলতুম, আবার ওসবের খুঁকি কেন নিতে যাও তুমি? একটা ফ্যানাদ বাধতে কতক্ষণ!

গ্রাহ্য করত না তোরাব, শুধু মুখ টিপে হাসত। বলত, একবার হুকুম করুন না হুকুম, সব হাজির ক'রে দিচ্ছি। বোতল থেকে কালাচাঁদ পর্বস্ত। এখানকার সব মামুকেই চিনি কিনা। কে কি করে না-করে আমি চোখ বুজ টের পাই। হয় মামদোবাজি ছাড়, নয়তো আমার মুখ বন্ধ কর। ব্যাস্!

ঝন ঝন ঘটাং ঘট শব্দে পাশের সেলের দরজা খুলতে খুলতে জমাদার সাহেব এগিয়ে আসত। তোরাব চ'লে যেত। মিনিট দশেক পরে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসত আর একটা লোককে। উর্দু তার সম্পূর্ণ উলঙ্গ, টস টস ক'রে ঘাম বরছে। হাতে তার প্রকাণ্ড একখানা বারকোশের উপর ভাতের ধালা, ডালের মগ আর দুটো এলুমিনিয়ামের বাটি।

বারকোশ নামিয়ে দিয়ে লোকটি চ'লে গেলে পর তোরাব নামিয়ে দিত ছখানি গরম ধোঁয়া-বেফুনো আটার রুটি তার তোয়ালের মধ্যে থেকে। দিয়ে এমন মুখ ক'রে আমার দিকে চাইত যেন সে হচ্ছে এ বাড়ির কর্তা আর আমি হচ্ছি তার অতিথি। মরমে সে ম'রে যাচ্ছে আমার সামনে শুধু রুটি নামিয়ে দিতে।

তখন তাড়াহাড়ি সেই গরম রুটি কখানি লবণ-সহযোগে গোগ্রাসে গলাধঃকরণ করতাম। এ ভিন্ন অন্য উপায়ও ছিল না। বিক্লাসের জন্তে বিশেষভাবে প্রস্তুত সেই ভাত-তরকারি-ব্যাঞ্জন কোনও দিন স্পর্শও করি নি। করবার সাহসও ছিল না আমার। দর্শনেই পেটের ক্ষুধা মাথায় উঠে যেত। তখন তোরাবের লুকিয়ে আনা ওই রুটি কখানিই অগতির গতি। জেলের কয়েদীরা জাঁতায়

গম ভাঙে। সেই গমেরই আটায় বাঁনানো রুটি। জেলে মাত্র ওই একটি জিনিস তখন পাওয়া যেত, যার মধ্যে অন্য কিছু মেশানো হ'ত না। ও-জিনিসটি না থাকলে একটি লোকও বাঁচত না তখন জেলে গিয়ে।

খাওয়াদাওয়ার পাট চুকলে পর আবার দরজায় তালা পড়ত। তখন তোরাব নিজে যেত খেয়ে আসতে। তারপর বেলা দুটো নাগাদ ফিরে এসে দাঁড়াত গরাদে ধ'রে। তখন একটানা দু ঘণ্টা গল্প চলত আমাদের। কে আসছে দেখতে?

এই সময়ই তার মেজাজটা থাকত নরম-গরম কিছুই না হয়ে। আর ওই সময়ই আমি শুনেছিলাম তার সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন-কাহিনী। আজ প্রথম দিকের একটু, আর শেষের দিকের খানিকটা হয়তো শোনালে দশ দিন পরে। মাঝখানের সবটুকু হয়তো দশ-দশটা দিন ধ'রে আরও নানা কথার সঙ্গে মিলে-মিশে বেরুল তার মুখ দিয়ে। মোটের ওপর আগাগোড়া সবটা সাজিয়ে নিলে তোরাবালির জীবনী হচ্ছে এই।—

নলবুনিয়ার উমেদালি মোজার ছেলে সে। উমেদালির একমাত্র ছেলে। ঘরে ধান পান ছিল উমেদালির। হঠাৎ মাথায় কি খেয়াল চাপল! খয়রাত শুরু ক'রে দিল। হাল বলদ লাঙ্গল জমি বিলকুল খয়রাত হয়ে গেল। শেষে নিজে চ'লে গেল হজ্ব করতে। যাবার সময় ছেলের হাত ধ'রে ব'লে গেল, দেখিস বাপজান, বংশের মুখে যেন কালি না পড়ে।

তোরাবের মা অনেক কাল আগেই বেহেস্তে গিয়েছিলেন। হজ্ব থেকে তার বাপজানও আর ফিরে এলেন না। ঘরে রইল শুধু তোরাব, ষোল বছরের মরিয়ম আর ছোট সাকিনা। অনেক খুঁজে পেতে উমেদালিই ছেলের বিয়ে দিয়ে তেরো বছরের মরিয়মকে ঘরে এনেছিল। নাতনি সাকিনার মুখ দেখে তবে সে হজ্বের পথে পা বাড়াল।

বড় ধর্মপ্রাণ লোক ছিলেন উমেদালি মোজা সায়েব। ও-তল্লাটের সকলেই এক ডাকে চিনবে তাঁকে। নলবুনিয়ার উমেদালি মোজার ঘর বললে, যে কোনও নৌকো নিয়ে যাবে পিরোজপুর থেকে। কোনও কষ্ট হবে না।

বাপ চ'লে গেলে তোরাব নামল সংসার করতে.

বউ বেটা নিয়ে। কিন্তু করবে কি? বতদিন বাপ ছিল, একমাত্র ছেলেকে সে কুটোটি ভাঙতে দেয় নি। সর্ব্বশ্ব ধর্য্যাত ক'রে বাপ নিজের পথ দেখলে, তোরাবকেও পথ খুঁজতে হ'ল। অবশেষে পথের দেখা সে পেল। ওস্তাদ আসমতালি সায়েব তাকে নিজের সাকরেদ ক'রে নিলেন। এক ধারে বিষখালি, অপর ধারে বলেশ্বর। এই সমগ্র এলাকাটি জুড়ে ছিল ওস্তাদ আসমতালি সায়েবের কর্মক্ষেত্র। নিজের দল নিয়ে ঝোপ বুকে কোপ মারতেন তিনি। তারপর সকলকে ভাগ-বখরা দিয়ে যা থাকত তাই নিজের ব'লে নিতেন। ওস্তাদের মেহেরবানিতে অল্প দিনেই তোরাব লায়েক হয়ে উঠল। দু-একটা জেদের কাজে সবার আগে ওস্তাদের হুকুম পালন ক'রে প্রমাণ ক'রে দিল যে, কিছুতেই তার প্রাণ কাঁপে না।

একবার একটা বাড়িতে হানা দিয়ে তারা বাড়ির কর্তাকে বেঁধে ফেললে, লোকটা কিছুতেই বলবে না কোথায় টাকাকড়ি লুকিয়ে রেখেছে। বার বার জলন্ত মশাল চেপে ধরা হ'ল তার শরীরে, তবু তার মুখ ফুটল না। একটা মাস ছয়েকের ফুটফুটে বাচ্চাকে বুকে আঁকড়ে ধ'রে সেই লোকটার নাতবউ ধর্য্য ক'রে কাঁপছিল। শেষে ওস্তাদ হুকুম দিলেন, ছেলেটাকে কেড়ে নিয়ে পা ধ'রে একটা আছাড় মারতে। কেউ এগোয় না। সব সাকরেদেরই তখন মাথা হেঁট। তোরাব এগিয়ে গেল। এক হেঁচকায় ছেলেটাকে ছিনিয়ে নিয়ে তার পা দুটো ধ'রে ঘুরিয়ে মারলে এক আছাড়। ফটাস ক'রে মাথাটা ফেটে গিয়ে এক রাশ রক্ত ছিটকে গিয়ে লাগল সেই লোকটার মুখে। তখন সে বাগে এল। টাকাকড়ি যেখানে পুঁতে রেখেছিল সেই জায়গাটা দেখিয়ে দিলে।

ওস্তাদ আসমতালি খুশি হলেন। হয়ে বড় বড় কাজের ভার দিতে লাগলেন তোরাবকে। কিন্তু এভাবে বেশিদিন চলল না। ভুল ক'রে আধার রাতে নদীর বুকে পুলিশ সাহেবের নৌকায় চড়াও হয়ে গুলির মুখে জান দিলেন ওস্তাদ পাঁচজন সাকরেদ সহ। জলের তলেই তাঁর সমাধি হ'ল। দল ভেঙে গেল।

তোরাবও ইচ্ছে করলে দল বাঁধতে পারত। কিন্তু সে দেখলে, ও-কাজে বেজায় ঝুঁকি নিতে হয়। বড় বড় কাজে হাত দিতে হবে। দল রাখতে গেলে সকলেরই চলাচল।

তারপর যদি একজন ধরা পড়ে আর বেইমানি ক'রে বসে, তা হ'লেই সর্ব্বনাশ। তার ওপর দল নিয়ে মাসের পর মাস বউ-বেটা ঘরে ফেলে ঘুরে বেড়ানো।

ও-পথ ছেড়ে দিলে তোরাব। ছোটখাট ঠিকের কাজ চালাতে লাগল, যা একলা সামাল দেওয়া যায়। ফুরনের কাজ। মজুরি আগে দিয়ে দিতে হবে। সব কাজের মজুরিও সমান নয়। যেমন ঝুঁকি তেমনি মজুরি। রাতের আধারে ঘরের বেড়া কেটে ঢুকে রামদার এক কোপে কাজ শেষ ক'রে আসবার যা মজুরি তাতে নদীর বুকে নৌকার উপর হামলা ক'রে জলে ডুবিয়ে রেখে আসা হয় না। যেমন কাজ তেমনি মজুরি। সম্পূর্ণ টাকাটা হাতে পেলেই যজমানকে কথা দেওয়া হ'ত, এই এক মাস বা দু মাসের মধ্যে তার পুঞ্জো বলিদান সমস্ত হুস্পন্ন হয়ে যাবে।

বেশ চলছিল তোরাবের সংসার। মাঝে মাঝে মাসে দু-তিন দিন রাতে ঘর থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে যাওয়া আবার শেষ রাতে ঠিকের কাজ সেরে ঘরে ফিরে শান্তিতে বউ-ছেলে নিয়ে ঘুমনো। হুঝ তখন ঘরে এসেছে। তখন দু-একটা ছাড়া কাজে হাতই দিত না তোরাব এক মাসে। আহা, প্রাণ কি চায় চাঁদপানা ছেলে-মেয়ে ঘরে ফেলে আধার রাতে শিকারে বেরতে! কিন্তু পোড়া পেট যে মানে না। তার ওপর নিত্য নূতন বায়না সাকিনার মায়ের। সে বেচারা তো জানত না, তোরাবের কুজি-রোজগারের উপায়টি কি! সে জানত, তোরাব নৌকা বায়। গঞ্জে মাল বেচাকেনা করে।

হায় রে পোড়া নসিব, শুধু একগাছি রশি, হাতে পাকানো একগাছি সামান্য শনের দড়ি। তোরাবের এত বড় ভাগ্য-বিপর্যয়ের হেতু হ'ল শেষ পর্যন্ত ওই একগাছি সামান্য দড়ি।

জগতের অনেক নাম-করা কেতাবে রঞ্জুতে সর্পভ্রমের উল্লেখ পাওয়া যায়। তোরাবের জীবন-নাটকের সবচেয়ে জমজমাট দৃশ্যে একগাছি রজু কালসর্প হয়ে তার শিরে দংশন করল।

তাদের নলবুনিয়ার পাশের গ্রামের দুই মিঞা। দুই মিঞার পাঁচখান হাল, তিনটে মরাই, চার-চারজন বিবি, একপাল নৌকর বাদী। যাকে বলে খানদানী ঘর। সেই দুই মিঞা একদিন স্বয়ং তোরাবের ঘরে এসে তাঁর হাতে পাঁচ কুড়ি টাকা দিয়ে গেলেন। সামান্য কাজ। ব'লে গেলেন,

কাজ শেষ হ'লে আরও পাঁচ কুড়ি টাকা। তোরাব বলেছিল হুহু মিঞাকে যে, টাকা আর সে নেবে না। তার পোলাপান দুধ পায় না। মিঞা সাহেবের অনেক গরু-বাছুর। যদি তার কাজে মালিক খুশি হন, তা হ'লে যেন একটা দুধালো গাই আর বাছুর দেন। তার পোলাপান দুধ খেয়ে বাঁচবে। রাজী হয়ে মিঞা সাহেব ফিরে গেলেন।

খোঁজখবর নিতে লাগল তোরাব। নিতে গিয়ে দেখলে, ব্যাপারটা একটা মেয়েছেলে নিয়ে রেধারেধি। হুহু মিঞা ঠিক করেছেন যে, তাঁর মত সম্মানী লোকের অন্তত পাঁচটি বিবি থাকার একান্ত প্রয়োজন। বিবি অবশ্য পাঁচটা কেন, পচিশটারও অভাব হ'ত না তাঁর। কিন্তু কি যে মরজি তাঁর, একেবারে গোঁ ধ'রে বসেছেন যে ওকেই চাই—মানে আমিহুদ্দি শেখের চোদ্দ বছরের বউকে। এই আমিহুদ্দিকেই সরাতে হবে। তাই একশো টাকা দান দিয়ে গেলেন হুহু মিঞা তোরাবকে।

কিন্তু জুতমত পাওয়াই মুশকিল ছোকরাকে। ভয়ানক ছ'ধিয়ার। ইতিমধ্যে সে বউকে সরিয়ে দিয়েছে দু'গ্রামে এক আখীরবাড়ি। তাতেই আরও ফেপে উঠেছেন হুহু মিঞা। কিন্তু করতে পারছেন না কিছুই। আমিহুদ্দির বিধবা মা তার একমাত্র ছেলেকে বুক দিয়ে আগলে আছে। সন্ধ্যার আগেই আমিহুদ্দিকে ঘরে ফিরে মার পাশে পাশে থাকতে হয়। আর কার সাধ্য তখন এগোয় মায়ের বুক থেকে ছেলেকে টেনে আনতে!

অবশেষে একদিন আমিহুদ্দি এসে উপস্থিত হ'ল তার মাকে নিয়ে তোরাবের কাছে। লজ্জা শরম ত্যাগ ক'রে আকুল জননী তোরাবের দু'হাত চেপে ধরল। তার একমাত্র ছেলের প্রাণভিক্ষা চায়।

কি ক'রে কোথা থেকে যে হৃদিস পেল ওরা। তোরাব তো প্রথমে খুবই রেগে উঠল, এ সব কথা তাকে বলবার মানে কি? ওই সমস্ত কাজ সে করে নাকি? কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। মায়ের প্রাণ আপনা থেকে সমস্ত জানতে পেরেছে। তোরাবকে কথা দিতে হ'ল, হুহু মিঞার টাকা সে খাবে না।

ওরা মা বেটা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ফিরে গেল।

কিন্তু কথা দিয়ে কথা রাখতে পারলে না তোরাব। এর পর মাস দুই আর কোথাও থেকে ডাক এল না। একটা

পয়সা বায়না দিয়ে গেল না কেউ। জ্বাণ মাস, ঘরে ফুদটুকুও বাড়ন্ত হ'ল। তখন হুহু পয়ে আর একটি এক বছরের বাচ্চা মরিয়মের কোলে। বাচ্চা মায়ের বুক চুষছে। চুষবে কি, বুকেও দুধ নেই, পেটে যে দানা পড়ে না।

দিন আর কাটে না। তখন একদিন আঁচলে চোখের পানি মুছতে মুছতে মরিয়ম এসে দাঁড়াল তার সামনে। এ ভাবে আর চলতে পারে না। এবার ছেলেমেয়ের হাত ধরে সে উঠবে গিয়ে ওই রয়জুদ্দির ঘরে।

খুন চেপে গেল তোরাবের মাথায়। তার কলিজার মধ্যে আগুন ধ'রে গেল ওই বেইমান রয়জুদ্দির নাম শুনে। হারামীর বাচ্চা চাটগাঁ থেকে জাহাজে ক'রে সফর কেমিয়ে আসে। ন-মাসে ছ-মাসে ঘরে ফিরে দু-দশ দিন থাকে। তখন তার বাহার কত! গোলাপী রঙের রেশমী কুমালু গলায় জড়িয়ে ঘুরে বেড়ায় আর শিস দেয়। পরনে পাঙ্করা আর ফুলতোলা আঁদ্রির পাঞ্জাবি, চোখে চশমা। যেন কত বড় এক নবাবজাদা। গাঁয়ের সোমস্ত বউ-বুঁদের এটা ওটা দেয়। রয়জুদ্দি দু-একবার তোরাবের দাওয়াতেও উঠে বসেছিল। বাঁকা বাঁকা বোলচাল বাড়ত তোরাবের বিবিকে শুনিয়ে শুনিয়ে। অসহ্য লাগল তোরাবের, একদিন রামদা দেখিয়ে দিল। সেই থেকে তোরাবের ঘর এড়িয়ে চলত রয়জুদ্দি।

সেই রয়জুদ্দির নাম শুনে তোরাবের সমস্ত সংযমের বাঁধ ভেঙে পড়ল। সে চুপি চুপি গিয়ে আরও পঞ্চাশটা টাকা আর আধ মণ ধান নিয়ে এল হুহু মিঞার কাছ থেকে।

তারপর থেকে হুহু মিঞার চাপ বেড়েই চলল।—আগে টাকা খেয়েছ, এখন তো 'না' করলে চলবে না। এক নিযুতি রাতে বেরুতে হ'ল তোরাবকে ঠিকার কাজ সারতে।

সব ঠিকঠাক হয়ে গেল। বেড়া কেটে ঘরে ঢুকে কান পেতে শুনেল তোরাব ঘুমন্ত লোকের নিশ্বাস ওঠা-পড়ার শব্দ। অন্ধকারের মধ্যে চোখের ওপর ভেসে উঠল মাচার ওপর পাশ ফিরে শোয়া যুবক আমিহুদ্দির তাজা দেহটা। ওস্তাদের নাম নিয়ে মাচার পাশে দাঁড়িয়ে ঠিক ঠাহর ক'রে ঝাড়লে এক কোপ রামদা তুলে। সামান্য একবার একটু আওয়াজ বেরুল—বাঁপ! তারপর একেবারে নিস্তব্ধ। তখন যদি আর একটা কোপ দিয়ে আসতে পারত সে।

পাশের ঘরে লোকের জেগে ওঠবার শব্দ পেলে তোরাব। আর ফুরসৎ পেলে না। কাম যে ফতে—এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েই ঘরে ফিরল। ফিরে তার সাকিনা আর হুককে বৃকে জড়িয়ে ধরে নিশ্চিন্তে ঘুমাল।

কিন্তু সবই হচ্ছে বোদার মরজি। সবই তার পোড়া নসিবের ফল। একগাছা দড়ি টাঙানো ছিল সেই মাচার ওপর। তোরাবের কোপ সেই দড়ি কেটে তবে নামল লোকটার ওপর। ফলে শুধু কাটা গেল তার একখানা হাত। হাত কেটে তারপর পাঁজরায় বেটুকু চোট পেলে, তাতে তার কিছুই হ'ল না। লোকে তাকে নৌকায় তুলে মহকুমায় নিয়ে গেল। সেখানে সে হাকিমের কাছে তোরাবের নাম ক'রে দিল।

গেল সব ভেসে। ঘর সংসার ছেলে মেয়ে বউ সর্বস্ব রইল প'ড়ে। তোরাবকে চোদ্দ বছরের জন্তে ছেড়ে আসতে হ'ল তার সাকিনাকে আর তার হুককে আর সেই এক বছরের দুধের বাচ্চাটিকে। তাদের দুখ খাওয়ার জন্তে একটা গাই আর বাছুর জোড়াতে গিয়েই এই ফ্যাসাদ।

হায় খোদা, এই কি তোমার বিচার! কি অপরাধ করেছিল সেই দুধের বাচ্চারা তোমার দরবারে! কোন্ দোষে তারা তাদের বাপজানকে হারাল! কি পাপে আজ তারা পথের কুকুরের মত পরের দরজায় প'ড়ে আছে!

এই পর্যন্ত বলতে বলতে আর গলা দিয়ে আওয়াজ বেরত না তোরাবের।

বে হাতটা দিয়ে সে লোহার গরাদটা ধরে থাকত, সেই হাতখানা খরখর ক'রে কাঁপত। আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বহুদূরে আকাশের গায়ে কি পড়ত, তা সেই জানে।

আমার নয় থেকে খরচা হয়ে গেল আঁট। আর তোরাবের চোদ্দ থেকে নয় বাদ গিয়ে রইল মাত্র পাঁচ।

শেষের কটি দিন।

সকালে বিকেলে দুপুরে রোজ ত্রিশবার সুনতে লাগলাম, কোথা দিয়ে কেমন ক'রে কত কম খরচে নলবুনিয়া গিয়ে পৌছতে পারব আমি। একবার বে যাওয়া চাই-ই আমার সেখানে। তাদের যদি ভুল হয়ে গিয়ে থাকে! একবার শুধু তাদের মনে করিয়ে দিয়ে আসতে হবে যে,

আর বাকি আছে মাত্র পাঁচ। এই পাঁচ থেকেও ঠিক আরও এক বছর ছাড় পাওয়া যাবে। তার মানে মাত্র আর চারটে বছর। এ আর কতটুকু সময়! খুব সাবধানে থাকে যেন তারা। খুব সাবধানে, কোনও ছোয়াচ যেন না লাগে উমেদালি মোল্লার ছেলে তোরাবালির বংশে।

কোনও মতেই তোরাবকে বিশ্বাস করাতে পারতাম না যে, যাবই আমি সেখানে। যত খরচই লাগুক আর যতদিনই লাগুক। তোরাবের চুরি ক'রে আনা ঝুটি দোস্তা নেবু—এক কথায় তার অতিথি হয়েই কাটলাম আমি ন মাস। এ ঋণ আমি শোধ করবই।

কিন্তু ওখান থেকে তাদের দেখে এসে তোরাবকে সংবাদটা দেওয়া যাবে কি ক'রে?

তারও কোনও প্রয়োজন নেই। শুধু একবার সাকিনা, হুক আর হুকের ভাইকে মনে করিয়ে দিয়ে আসতে হবে যে, তাদের বাপজান এল ব'লে। এসে সে তাদের ভার কাঁধে তুলে নেবে, তখন আর চিন্তা কি!

আমার ছাড়া পাবার আগের দিন তোরাব আর নিজেকে সামলাতে পারল না। হ-হ ক'রে কেঁদে ফেললে। বললে, কত বাবুকেই ঠিক এই ভাবে সেবাস্বত্ব করলাম হুজুর। সকলেই কথা দিয়ে গেলেন। কে জানে, তাঁরা যেতে পেরেছেন কি না। যদি তাঁরা একবার যেতেনই সেখানে, তা হ'লে এই আট বছরের মধ্যে অন্তত একবারও কি সাকিনার মা ছেলে-মেয়ে নিয়ে দেখা করতে আসত না?

গরাদের ফাঁক দিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখি। কি জবাব দেওয়া যায়?

হঠাৎ দপ ক'রে জ্বলে উঠল তোরাব। একটা কাল-কেউটে যেন ফৌস ফৌস ক'রে উঠল।—ওই হারামজাদা রয়জুদ্দি। ওই ঠিক দখল করেছে সব। ওর গ্রামেই নিশ্চয়ই গেছে আমার সব। হেই খোদা, যেন পাঁচটা বছর আর পার করতে পারি আমি। যদি তাই হয়, যদি তাই হয়ে থাকে—

দাঁতগুলো সব কড়মড় ক'রে উঠল তোরাবের।

পরদিন সকাল সাতটায় আমার জেল-আফিসে পৌছে দিয়ে তোরাব মুখ বুজে ফিরে গেল। আমি সবার

অলঙ্কিতে শুধু একবার গুর কাঁধে ডান হাত দিয়ে একটা চাপ দিলাম।

জেলগেট পার হতেই মহা সমাদরে আমায় গ্রহণ করলেন বাইরের কর্তারা এবং মহাযত্নে সোজা স্ত্রীমারে নিয়ে তুললেন।

তারপর নলবুনিয়ার বদলে বীরভূমের নলহাটি পৌঁছে মাঠের মাঝে একখানা খড়ের ঘরে তিন বছরের জন্তে আশ্রয় পেলাম। নলবুনিয়া অনেক পিছনে পড়ে রইল।

আরও সাত বছর পরে। অস্ত্র এক জেল। এবার আমার ভাগ্যে সাংগর ডিভানোর ডাক এসেছে। জাহাজের আর কয়েকটা দিন ঘেরি। এক বোঝা অলঙ্কার পরিয়ে রাখা হয়েছে আমায়। তা প্রায় সবস্বত্ব সের পাঁচেক ওজন। দু'পায়ের গোছে দুটো লোহার বেড়ি। এক-একটা দু'হাত লম্বা লোহার ডাঙা আটকানো সেই বেড়ির সঙ্গে। ডাঙা দুটোর অস্ত্র প্রান্ত দুটো আবার আর একটা লোহার বালায় লাগানো। একেবারে পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত। একটা হাত দিয়ে সেই লোহার বালটা কোমরের কাছে ধরে তবে চলাফেরা করতে হবে। শব্দ হবে ঝড়ান্ ঝড়ান্ পা ফেললেই।

চালান হয়ে এলাম সেই গয়নাগাটি সূক্ষ্ম কলকাতায়। তোলা হ'ল এক সেলে। দিন চারেক পরেই তোলা হবে জাহাজের খোলে।

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেল। পাশের সেল থেকে কে গোড়াচ্ছে। তারপর সেই বরিশালিয়া ভাষায় ভেসে আসতে লাগল—সাকিনা রে, মুক রে, তোদের জন্তে কিছুই করে যেতে পারলাম না রে, কিছুই করে যেতে পারলাম না।

কান খাড়া করে শুনতে লাগলাম—কোথায় তোরা পড়ে রইলি রে, তাও জেনে যেতে পারলাম না। কিছুক্ষণ চুপচাপ, তারপর হঠাৎ উৎকট শব্দে হা-হা করে হাসি।—শেষ করে এসেছি হারামীর বাচ্চাদের। দুটোকেই জাহাজে পাঠিয়ে তবে এসেছি নিজে। সেখানেও কি তোরা শাস্তি পাবি মনে করেছিলি? দাঁড়া, আসি আমি। তারপর দেখাব তোদের। আবার সেই প্রেতের হাসি রাতের আধারকে খান খান করে ফেললে।

হঠাৎ আমিও চিংকার করে উঠলাম, তোরাব, তোরাবালি মের্ট।

হাসি ধামল। ভাঙা গলায় সাড়া দিলে, কে?

দু'হাতে সেলের গরাদে দুটো আঁকড়ে ধরে গরাদের ফাঁকে মুখটা চেপে চেঁচাতে থাকলাম, আমি—আমি তোরাব। সেই যে বরিশাল জেলে আমি সেলে ছিলাম আর তুমি আমায় কুটি খাইয়ে বাঁচিয়েছিলে ন' মাস। সেই যে—

একেবারে নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব এল, তা কি বলছেন বলুন।

আকুল হয়ে উঠলাম, এবার আমায় চিনতে পেরেছ তোরাব? সেই যে তুমি আমায় নলবুনিয়া যেতে বলেছিলে।

এবার গম্ভীর কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করলে, তা কর্তা, আবার এলেন কেন?

কি উত্তর দেব? বললুম, নসিব ভাই, সবই নসিব। এবার কালাপানি পেয়েছি। আর পাঁচ দিন পরেই জাহাজ ছাড়বে।

একটু থেমে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু তোমার তো এতদিনে খালাস পাবার কথা। সে সময় আমরা যেন হিসেব করেছিলাম যে, আর মাত্র পাঁচ বছর বাকি ছিল তখন তোমার।

আবার সেই প্রেতের হাসি শোনা গেল পাশের সেল থেকে। হাসি ধামলে শুনতে পেলাম, এবার একেবারে খালাস পাব কর্তা। সেবার হিসেবের ভুল হয় নি। চার বছর পরেই বাইরে বেরিয়েছিলাম সেবার। তারপর তাদের খুঁজে বার করতে লেগে গেল পুরো এক বছর। এই শহরেরই এক বস্তি। ওয়াটগঞ্জ, না, মুন্সিগঞ্জ কি নাম তার! সেইখানেই তাদের পাকড়াও করলাম শেষে। রয়জুদ্দি লাবেং আর তার বেগম মরিয়ম বিবিকে। কত তার পর্দা, কত আবদ, কত ইজ্জত! দরজায় চিক টাঙানো। পায়ে বাহারী চটি, গালে ঠোঁটে হাতে রঙ, চোখে সুরমা, আসমানী রঙের ফুল তোলা ফুফুরে শাড়ি। তা ওই সমস্ত বাহারস্বত্বই সে গেছে। একই সঙ্গে দুজনকে ঠিক জায়গায় আশনাই করতে পাঠিয়ে দিয়ে তবে আমি এখানে এসেছি। আমাকেও তাড়াতাড়ি যেতে হবে কিনা ওদের পিছু পিছু।

আবার সেই উৎকট হাসি।

ওয়ার্ডার তেড়ে এসে আমার সেলের দরজায় কলের
ঘা মারতে লাগল, এই হল্লা বন্ধ কর।

ওকে গ্রাহ্যই করলাম না। চিংকার ক'রে বললাম,
তোরাব ভাই, তোমাকে কথা দিয়ে কথা রাখতে পারি
নি আমি। তোমার ছেলেমেয়েকে দেখতে যাওয়া হয় নি
আমার। জেল-গেটেই আবার গ্রেপ্তার হয়ে—

এবার আমার সেই আগেকার তোরাবের গলা শুনতে
পেলাম। সেই একান্ত আত্মীয়ের গলা।—সে খবর আমিও
পেয়েছিলাম কত। আপনি আর মনে দুঃখ রাখবেন না।
গেলেও আপনি তাদের দেখা পেতেন না। আমিও কিরে

গিয়ে তাদের পাই নি। তাদের মা তাদের ফেলে রেখে
পালিয়ে যাবার পর তাদের কি দশা হয়েছিল কেউ তার
খোঁজ দিতে পারল না। ছেলে মেয়ে বউ ওসব শাঁখের
করাত—কর্তা, একেবারে শাঁখের করাত। আমতে কাটে,
ষেতেও কাটে।

ওয়ার্ডার তোরাবের দরজায় গিয়ে কল ঠুকতে লাগল।
তার পরদিন সকালে অল্প প্রাস্তুর সেলে আমাকে সরানো
হ'ল। আর জাহাজও ছাড়ল ঠিক পাঁচ দিন পরে।

আমি রওনা হলাম। আমার যাত্রার আজও শেষ
হয় নি। কিন্তু আমার বন্ধু তোরাব বোধ হয় ঠিক জায়গায়
পৌছে এতদিনে শান্তি পেয়েছে।

রোমান্স গান

শান্তিকুমার ঘোষ

চাঁদের আলোয় মেশে রাতের নিয়ন :
তারার প্রস্রের চিহ্ন পোলের ওপরে।
গ্রামীণ হৃদয়ে আনি নাগরিক মন,
তোমার পেলব হাত আমার মৃতিতে।

দিনের ক্লান্তির ভার দাউ দাউ শেষ,—
জাহাজ ভিড়েছে সব ঘূমের জেটতে।
রাংতায় মোড়া নদী অতল আবেগ ;
কাফেটেরিয়ায় আজ খুঁজব না-স্বাদ।

তুমি কাছে আছ তাই রক্তের ভিতরে
অনাগত শুনি কার দ্রুতপদধ্বনি,
পেশীতে তড়িৎ খেলে—হানে সেই বেগ
হিমশিলা ভেঙে কোন্ গর্জিত নদী।

পৃথিবী পায়ের নীচে, ওপরে আকাশ,
অগুণ্ণি দ্রুত চলে—নীল পটভূমি :
মখিত এ সম্ভার সৌরভসার
পাপড়িতে পাপড়িতে খুলে দাও তুমি।

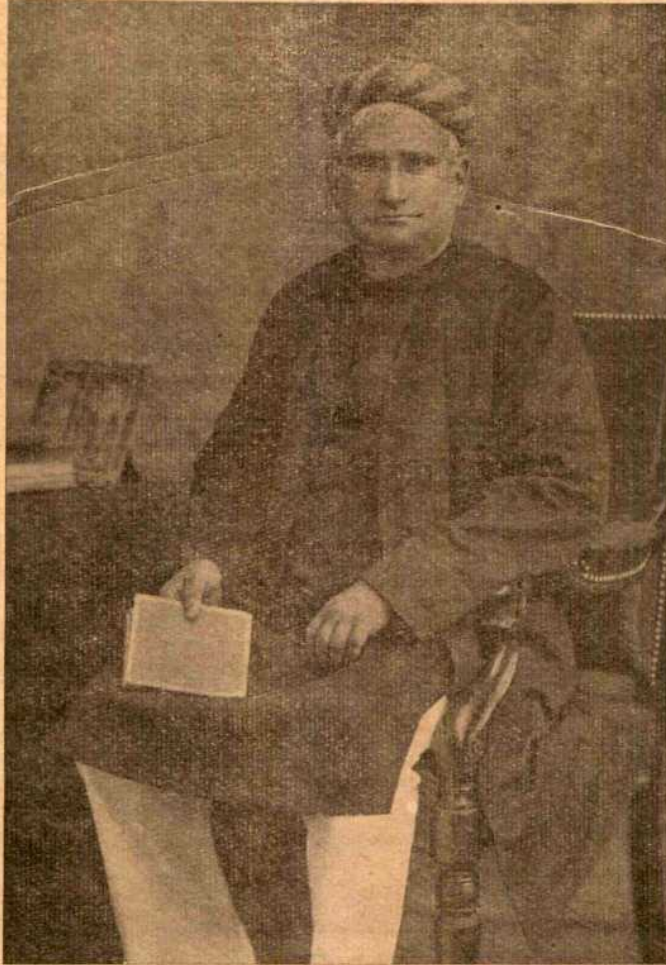
শ্রীঅরবিন্দের বন্ধিমচন্দ্র

অনু পশুপতি ভট্টাচার্য

[ইংরেজীতে এই প্রবন্ধগুলি শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছিলেন তাঁহার যৌবনকালে, যখন তিনি সবে ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বরোদায় চাকরিতে নিযুক্ত আছেন। বাংলা-সাহিত্য ভাল করিয়া পড়িতে এবং বুঝিতে তখনই তিনি প্রথম শিখিয়াছিলেন। সেই সময়ে এই প্রবন্ধগুলি বোম্বাইয়ের 'ইন্দুপ্রকাশ' নামক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল (১৮৯৪ সনে ১৬ই জুলাই হইতে ২৭শে আগষ্টের মধ্যে)। তখন নিজের নামটি তিনি প্রকাশ করেন নাই, "জনৈক বাঙালী" শিরোনামায় প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। ঠিক বাট বছর পরে তাঁহার নিজের নামে এগুলি প্রথম পুনঃপ্রকাশ করা হইয়াছে। 'শনিবারের চিঠি'র কয়েক সংখ্যায় প্রবন্ধগুলির অনুবাদ প্রকাশিত হইবে।]

বন্ধিমের বাল্যকাল ও পার্শ্বজীবন

এখনকার বাংলা-গদ্যসাহিত্যের জনক সাহিত্যসম্রাট বন্ধিম-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উচ্চ ব্রাহ্মণ-বংশের এক সম্ভ্রান্ত রাজকর্মচারীর পুত্র। তাঁর জন্ম-তারিখ ২৭শে জুন ১৮৩৮, মৃত্যুদিন ৮ই এপ্রিল ১৮৯৪। তাঁর এই ছাপ্পান্ন বছরের সংক্ষিপ্ত ও কর্মময় জীবন বাংলার ইতিহাসের এক বিশেষ যুগের অপরূপ নিদর্শন রেখে গেছে; সেই নব অভ্যুদয়ের যুগের আরও অনেক মহারথীর নাম এখানে উল্লেখ করা যায়, কিন্তু তার মধ্যে বন্ধিমের নামটাই সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। এর জীবনের



সম্বন্ধে বলতে গেলে তিনটি দিকের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—এর বিদ্যালয়ের অসাধারণ বিশেষত্ব, রাজকার্যের কৃতিত্ব আর সাহিত্যিক প্রতিভার বিকাশ; প্রত্যেকটি বিষয় নিয়েই আমি কিছু কিছু বলতে চেষ্টা করব।

বন্ধিমের বাল্যকালের খবর নিতে গিয়ে প্রথমেই দেখি

যে, বিদ্যালয়ে বই নিয়ে পড়তে ব'সে প্রথম বারেই তাঁর অক্ষর-পরিচয় সম্পূর্ণ হয়ে যায়, দ্বিতীয় বার কোনও অক্ষর তাঁকে চিনিতে দিতে হয় না; এমনি ব্যাপার কেবল ওই বর্ণ-পরিচয় সম্পর্কেই নয়, তাঁর জীবনের সকল বিষয়েই ঘটে এসেছে। শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে যে বিশেষত্ব স্বভাবতই দেখা যায়, অর্থাৎ রূপ দেহ আর কোমল স্বভাবের মধ্যে তীক্ষ্ণ-ধার বুদ্ধি ও ধীশক্তি, এটা যে তাঁর মধ্যে পুরামাত্রায় পরিষ্কৃত ছিল তা গোড়া থেকেই সকলে লক্ষ্য

করেছে। বন্ধিমকে বাঙালীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বললেই যথেষ্ট হয় না, তিনি ছিলেন বাঙালী বৈশিষ্ট্যেরই চূড়ান্ত নিদর্শন। মাহুষের মধ্যে কাউকে বাঙালী বলে পরিচয় দিলেই এ জাতের মাহুষের যা যা বিশেষ রকম সূক্ষ্ম গুণের কথা মনে পড়ে যাবে, বন্ধিম ছিলেন একাধারে তারই মূর্ত প্রতীক।

এর বাল্যকাল কেটেছিল মেদিনীপুরে। সেখানে সেই

অল্প বয়সেই তাঁর বুদ্ধির প্রাথমিক এত বিকাশ পেতে থাকল যে, ছাত্রমহলে তাঁর নামটা যেন এক প্রবাদবাক্যের মত দাঁড়িয়ে গেল; কোনও ছাত্রকে শিক্ষক যদি বলতেন, “তুমিও দেখছি একজন বঙ্কিম হবে,” তা হ’লে সেটা হ’ত তার পক্ষে চরম প্রশংসার কথা। স্থলে নিচু ক্লাস থেকে উচু ক্লাসে তিনি তরতর ক’রে উঠে যেতেন; এত তাড়াতাড়ি তাঁকে প্রমোশন দিতে হ’ত যে, মাস্টার মশায়রা মহা চিন্তায় প’ড়ে যেতেন। শিক্ষার সম্বন্ধে এমন ক্ষতগতি দেখে তাঁরা ভয় পেতেন যে, পাছে এই শিক্ষারই চাপে তাঁর ভিতরকার স্বাভাবিক মৌলিকতাটুকু হারিয়ে যায়, তাই সব দিক ভেবে চিন্তে এত তাড়াতাড়ি ক্লাসে ওঠা তাঁরা খামিয়ে দিলেন। এটা তাঁর পক্ষে সৌভাগ্যই হ’ল, বেশি বেশি শেখার হাত থেকে তিনি নিষ্কৃতি পেলেন। শিক্ষা বিষয়ে এমনি অহুকুল সৌভাগ্য তাঁর বরাবরই ছিল। আমরা যেমন আমাদের মেধাবী ছেলেদের উচ্চ শিক্ষার হাড়িকাঠে বলিদান দেবার জল্পে সর্বদাই উচিয়ে থাকি, বঙ্কিম স্থলে পড়বার সময়ও সেই বলিদান থেকে নিষ্কৃতি পেলেন, আবার হুগলী কলেজে পড়বার সময়ও পাঠ্যের দিকে নিজেরই খুব বেশি ঝোঁক না থাকায় তার থেকে নিষ্কৃতি পেলেন। অথচ মেদিনীপুরেও যেমন আশ্চর্য মেধাবী ব’লে তাঁর নাম রটেছিল, হুগলী কলেজেও তেমনই র’টে গেল। একবার মাত্র প’ড়েই তিনি এত সহজে তাঁর পাঠ্য বিষয়টিকে আয়ত্ত ক’রে নিতে পারতেন, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। ক্লাসের সকল প্রাইজ দখল ক’রে নিয়ে সকলকে ডিঙিয়ে পরীক্ষা পাস করতে তাঁর কিছুমাত্র বেগ পেতে হ’ত না। অত্বেরা প্রাণপণে খেটেও যা করতে না পারত, তিনি নিতান্ত হেলাভরে যেন দৈবযোগেই তা ক’রে ফেলতেন। কিন্তু নিজের পড়ার দিকে খুব বেশি মন না দিলেও যে জিনিসটা শেখবার তাঁর খেয়াল হ’ত সেদিকে অত্যন্ত বেশি মনোযোগ দিতেন। কলেজে পড়বার সময় তাঁর ঝোঁক হ’ল তিনি সংস্কৃত শিখবেন, তৎক্ষণাৎ একজন পণ্ডিতের টোলে ভর্তি হয়ে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে সংস্কৃত শিখতে শুরু করলেন। মাত্র এক বছরের মধ্যেই তিনি মুন্সিবোথ আয়ত্ত ক’রে তার পরে শেষ করলেন রঘুবংশ, ভট্টী আর মেঘদূত। এমনভাবে অগ্রসর হতে হতে চার বছরের মধ্যেই তিনি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের সমস্ত

রসটুকু ও মাধুর্য়টুকু ভাল ক’রে বুঝে নিলেন, ও পরে এই শিক্ষাটাই তাঁকে বাংলাতে নতুন গদ্য-সাহিত্য গ’ড়ে তোলবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করেছিল। তাই ব’লে যে তাঁর বাংলার মধ্যে সংস্কৃতের প্রভাব কিছু এসে পড়েছে এমন কথা একেবারেই নয়; বরং সেদিক থেকে দেখলে তিনি আর মধুসূদন দত্ত—এঁরা দুজনে মিলে সংস্কৃতের প্রভাবটা ভেঙেই দিয়েছিলেন। বরং এই ভেবেই আশ্চর্য হতে হয় যে, সংস্কৃত ভাষায় যতটা শিক্ষা পেয়ে সে শিক্ষাকে কতই অনায়াসে রূপান্তরিত ক’রে নিয়ে তিনি বাংলা-সাহিত্যের সমৃদ্ধির কাজে লাগাতে পেরেছিলেন।

সতের বছর বয়সেই তাঁর হুগলী কলেজে পড়া শেষ হ’ল। সেই অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানে তাঁর এমন খ্যাতি রটেছিল যে, পরে কেবল ঘরিকানাধ যিজ্ঞ ছাড়া অপর কারও পক্ষে ততটা পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হয় নি। অথচ এর জন্তে তাঁকে কোনও চেষ্টাই করতে হয় নি। অসাধারণ প্রতিভার সম্পর্কে যেমন প্রায়ই দেখা যায় যে, তাদের কাজের কোনও একটা বাধা নিয়ম থাকে না, বঙ্কিমের প্রকৃতিও অনেকটা সেইরকম ছিল। পাঠ্য বিষয়ের নির্দিষ্ট গভীর মধ্যেই আবদ্ধ থেকে জ্ঞানের বিস্তারকে তিনি সীমাবদ্ধ রাখতে চাইতেন না, তার চেয়েও ব্যাপক ক্ষেত্রে মুক্ত থাকা তাঁর প্রয়োজন ছিল। তাই প্রায়ই দেখা যেত যে, কলেজ-লাইব্রেরির এক কোণে চুপচাপ ব’সে তিনি বহু রকমের বই নিয়ে পড়ছেন, জ্ঞানপিপাসাকে তৃপ্ত করতে কোন বিষয়টাই তিনি বাদ দিচ্ছেন না, ক্রমাগতই যত বাইরের বই প’ড়ে যাচ্ছেন। পরীক্ষার সময়টা যখন নিতান্ত আসন্ন দেখতেন তখন তিনি শুরু করতেন নিজের বইগুলি পড়তে, যখন একবার ধরতেন তখন তার আত্মোপাস্ত শেষ ক’রে ছাড়তেন, আর সেই পড়াতেই কতকগুলি প্রাইজ তাঁর ভাগ্যে জুটে যেত। তার পরে আবার তখন শুরু করতেন বাইরের বই পড়া। বোধ করি সকল দেশের মেধাবী ছাত্রেরাই এমনই ধরনের হয়ে থাকে, এতে তারা গভীর শিক্ষার সংকীর্ণতাবোধ থেকে নিজের বাঁচিয়ে রাখতে পারে; অবশ্য যারা দীর্ঘজীবিত ততটা ধারাল নয়, তাদের পক্ষে এমন অভ্যাস করা নিরাপদ নয়। হুগলী কলেজ থেকে যখন প্রেসিডেন্সিতে গেলেন তখনও তিনি নিজের পাঠ্য-বিষয়ের উপরে অতিরিক্তভাবে আইন পড়তে শুরু করলেন।

মতলবটা ছিল এই যে, আইন শিখে নিয়ে পরে তিনি হাইকোর্টে ওকালতি করবেন; কিন্তু ভাগ্যক্রমে ওই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নতুন প্রতিষ্ঠিত হ'ল, তাতেই আইন পড়া ছেড়ে দিয়ে তিনি সাহিত্যচর্চায় দিকে ঝুঁকলেন। এতে দেশের আদালতগুলো হয়তো একজন উৎকৃষ্ট উকিল পাওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হ'ল, কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম এক মহাসাহিত্যরথিকে। তবু এই আইন শেখার দিকে টানটা তাঁর বরাবরই ছিল; চাকরিতে ঢোকার পরে যখন সাহিত্যরচনার দিকে মন দিয়েছেন, তখনও তারই মধ্যে সময় ক'রে নিয়ে আইন পড়ে বি. এল. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। আর সাধারণ বিচার তরফে চূড়ান্ত করার দিক দিয়ে এ কথাটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম গ্রাজুয়েট হয়েছিলেন তিনি আর যত্নাধ বহু—এঁরাই দুজন আমাদের দেশের যুবকদের গ্রাজুয়েট হবার প্রথম পথ দেখালেন। বি. এ. পাস ক'রেই তিনি চাকরি পেলেন। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তিনি যশোরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-রূপে নিযুক্ত হলেন।

বন্ধিমের পাঠ্যজীবন সম্বন্ধে এখানে এই সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্রটুকুই দেওয়া হ'ল। আমাদের দেশের একজন হিন্দু মনীষীর জীবনচরিতে এটুকু নীরস ইতিহাস থাকবেই; পড়ুয়া হয়েই আমাদের প্রথম জীবন শুরু করতে হয়, তাই পরীক্ষা পাস করা আর ডিগ্রী নেবার কথাতেই অর্ধেকটা স্থান জুড়ে যায়। অবশ্য মনের দিকের ইতিহাসের পক্ষে পরীক্ষা দেওয়া আর উপাধি নেওয়া খুবই অকিঞ্চিৎকর

ব্যাপার। ইউরোপের একজন লেখক খুব খাটি কথাই বলেছেন যে, 'বিদ্যালাত' ক'রে কখনও জ্ঞানলাভ হয় না। ডাক্তার ভাণ্ডারকর তাঁর কার্লাইল নিয়ে যতই আলোচনা করুন, এই কথাটা একবার চিন্তা ক'রে দেখবেন। কোন ব্যক্তি যতই লেখাপড়া শিখুক তাতেই তার জীবন গ'ড়ে উঠবে না, সে নিজেরই পর্ববেকণ ও অভিজ্ঞতার দ্বারা জীবন থেকে ও সাহিত্যাদি থেকে যেটুকু স্কয় করবে তার দ্বারাই সে নিজেকে গ'ড়ে তুলবে। তা ছাড়া শেষ পর্যন্ত সে কেমন মানুষ হয়ে দাঁড়াল, তা নির্ভর করবে গোড়া থেকে তার চারিদিকের সামাজিক পরিবেশটি কেমন ছিল তারই উপরে। যে সংস্কৃতির মধ্যে অবস্থান ক'রে মানুষের প্রাণ স্বাভাবিক ভাবে স্ফুরিত হয়ে ওঠে, তা ছাড়া জোর ক'রে আর যা-কিছু তাকে শেখানো হয় তা কাজে লাগার দিক দিয়ে একেবারেই অসার। পাঠ্যজীবনে পরীক্ষা পাস করা ও ডিগ্রী পাওয়া হ'ল বাহ্য অহুষ্ঠান, কিন্তু এইগুলোই হ'ল তার প্রাণসম্পদ। যেখানে তেমন উপযুক্ত পরিবেশ একেবারেই নেই, সেখানে দু-একজনের বেলায় বিচারজনের অসাধারণত্ব দেখা গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত বিত্তা ব্যর্থ হয়ে যায়। পাঠ্যাবস্থায় বন্ধিম কেমন ব্যক্তিদের সাহচর্য পেয়েছিলেন? সামাজিক কেমন পরিস্থিতির মধ্যে তাঁর কৈশোর ও যৌবনকাল কেটেছিল? কি কি পরীক্ষায় তিনি পাস করেছিলেন, তা জানার চেয়ে এই কথাগুলো জানাই বেশি দরকার। অতঃপর আমি এই প্রবন্ধেরই উত্তর দিতে চেষ্টা করব।

“তাহারা বলেন: যে, যাহা দৈবোক্তি—বেদই হউক, বাইবেলই হউক, কোরানই হউক,—

তাহাতে যাহা আছে, তাহাই ধর্ম—তাহার বাহিরে ধর্ম কিছুই নাই—তাহারা আজিও বড় বলবান।

তাঁহাদের মতে ধর্ম দৈবোক্তি-নির্দিষ্ট, অল্পমানের বিষয় নহে। এ কথা মুহূর্তজ্ঞাতির উন্নতির পথে বড়

দুষ্কর্তীর্ণ কণ্টক। আমাদের দেশের কথা দূরে থাকুক, ইউরোপেও আজিও এই মত উন্নতির পথ

রোধ করিতেছে। আমাদের দেশের অবনতির ইহা একটি প্রধান কারণ।”—বন্ধিমচন্দ্র

গ্রন্থ-পরিচয়

[**বি**জ্ঞানলাল লিখিয়াছিলেন, “বিয়ে হলেই পুত্র-কন্যা, আসে যেন প্রবল বজ্র।” দরিদ্রের সংসারে সেটা নিদারুণ দুঃখেরই কারণ। বাংলার সাহিত্য-সংসার-লব্ধ অভিজ্ঞতার আমরা অল্পরূপ একটা বচন রচনা করিয়াছি—

“কাগজ হ’লেই নতুন বই
আসতে থাকে উড়ো খই।”

প্রকাশকের পক্ষে ইহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোবিন্দায় নমঃ হইয়া দাঁড়াইলেও ইহা সাহিত্য-সংসারের স্তম্ভ ও সমৃদ্ধির সূচনা করে; পুস্তকের প্রবল বজ্রায় বিপদের ভয় নাই, সম্পদের আনন্দ আছে। গত কয়েক বৎসর হইতে দেখিতেছি, বাংলা ভাষায় নতুন বইয়ের যেন সাঁড়াসাঁড়ি বান ডাকিয়াছে। বেনো বই আমাদের আপিসেও অনেক ঢুকিয়াছে, আমরা নানা কারণে দীর্ঘকাল তাহার সময়োচিত সম্ভাবনার করিতে পারি নাই। লোভের বশে উদরসাৎ করিয়াছি, কিন্তু এখনও হজম হয় নাই; তাই খচখচ করিয়া বিম্বিতেছে। বিপদ হইয়াছে এই যে, আমাদের লাইব্রেরির নিজস্ব বইয়ের সঙ্গে সমালোচনার্থ-প্রাপ্ত নতুন বই এমনই গুলাইয়া গিয়াছে যে, এখন তাকাত করাই দুঃসাধ্য। স্থানান্তারের অজুহাতে এতদিন বাহাদের প্রবোধ দিয়া আসিয়াছি, আয়তন-বৃদ্ধির পরেও কাজেই সকলকে সম্বলিত করিবার উপায় নাই। বাহারা সহদয় তাঁহারা আমাদের অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ক্ষমা করিবেন। বাহারা এখনও নাছোড়বান্দা, তাঁহাদের নিকট অহরোধ একটি পোস্টকার্ড ব্যয় করিয়া তাঁহাদের দাবি যদি তাঁহারা পেশ করেন সেই স্তম্ভ ধরিয়া বই খুঁজিয়া বাহির করার এবং যথাসাধ্য সমালোচনা করার চেষ্টা আমরা করিতে পারি। নতুন আগত অর্থাৎ এই ১লা বৈশাখ হইতে আগত গ্রন্থ সম্বন্ধে এই অহরোধ প্রবোধ্য নয়। এই জবাবদিহির পর আমাদের দায়িত্ব একটি স্মারক-লিপির অপেক্ষায় থাকিল। তবে আমরাও নিশ্চেষ্ট থাকিব না, নূতনের সঙ্গে সন্ধান ও আবিষ্কার করিয়া কিছু কিছু পুরাতন গ্রন্থ-পরিচয় দিবার প্রয়াস এই বিভাগে করিব।—দ. শ. চি.]

পদ্মসংস্কার : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স। ২০০-১-১ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা-৬। মূল্য পাঁচ টাকা।

‘পদ্মসংস্কার’ শক্তিশালী কথা-সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিকতম উপন্যাস। এ উপন্যাসে ইতিহাস ও কল্পনাকাহিনী এক আধারে গ্রথিত হয়েছে। পোতুগীজ বণিকদের ভারতবর্ষে অল্পপ্রবেশের স্তম্ভ ধরে কেমন করে বাংলা দেশে ইউরোপীয় বাণিজ্যের স্বরূপাত হ’ল এবং তার ফলে কেমন করে ধীরে ধীরে বাংলা দেশের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল—এ গ্রন্থে তারই কাহিনী অতিথয় শিল্পহৃদয়ের মনোরম ভাষায় বিবৃত হয়েছে। কালিকটের আমোদিনের কাছ থেকে ভাঙ্কো-ডা-গামার পোতুগীজ বণিকদের অল্পকূলে বাণিজ্যের অল্পমতি লাভের কাহিনী থেকে শুরু করে এ দেশে পোতুগীজ প্রভাবের বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত এক

অনতিবিস্তৃত কালের ইতিহাস এই গ্রন্থের তথ্যনিষ্ঠ লেখনীতে সজীব হয়ে ধরা দিয়েছে। লেখকের এই ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠার উৎস ভাঙ্কো-ডা-গামার সহযোগী কবি ক্যামোয়েন্স-এর লুসিয়াদাস-এর বিবরণী ও অন্যান্য সমসাময়িক ইতিহাস-গ্রন্থ। লেখক উপন্যাসের ঐতিহাসিক ভিত্তি নির্ভরযোগ্য ও মজবুত করে তুলতে প্রয়োজনীয় মালমসলা সংগ্রহে চেষ্টার ক্রটি করেন নি, উপন্যাসটির পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে তার প্রমাণ মিলবে। আমাদের দেশের কথা-সাহিত্যিকদের ভিতর এই ধরনের অধ্যয়নশীলতা-বিজ্ঞাবস্তার পরিচয় পাই নে বলে আরও এ কাহিনী উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়।

তা বলে এমন মনে করবার কারণ নেই যে, ‘পদ্মসংস্কার’ ভারতে পোতুগীজ শক্তির পরদর্শন ও ক্রমিক প্রভাব-বিস্তারের একটি নীরস ঐতিহাসিক দলিল। অস্তিত্বের ইতিহাসমনস্ক লেখকের হাতে হয়তো উপন্যাসটির এ দশাই

ঘটত, কিন্তু লেখকের সহজাত লিখননৈপুণ্য ও সাহিত্যরসবুদ্ধি গ্রন্থটির ওই পরিণামসম্ভাবনা নিরাকৃত করেছে। কি করে ইতিহাসের নীরস তথ্যকে গল্পের রসায়নে রসায়িত করে হৃদয়ের করে পরিবেশন করতে হয়, এ কলাকৌশল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাল জানা আছে এবং এই দিক দিয়ে তাঁকে বঙ্কিমচন্দ্রের একজন সার্থক উত্তরসারক বললে অজ্ঞান হয় না। লেখকের মনটি রোমাণ্টিসিজম-এ ভরপুর। যদিও তিনি প্রগতিশীল চিন্তাধর্মে বিশ্বাসী তথাকথিত বামপন্থী একজন কথাকার, তা হ'লেও তাঁর জীবন ও অগংকে দেখার ভঙ্গির মধ্যে স্বপ্নিল একটি ধ্যানতন্ময়তা চোখে পড়ে। বইটি আগাগোড়া কাব্যের স্বরমায় মগ্নিত। লেখকের কবিত্বময় বারে বারেই কল্পনাপ্রসূত অতীতকে আঁকড়ে ধরে অপ্রতি-রোধ গৃহগত-প্রাণতার আবেগে বেপথুমান হয়ে উঠতে চেয়েছে। লেখকের প্রাকৃতিক বর্ণনাগুলি এ কথার উজ্জল সাক্ষ্য। উপন্যাসের কাহিনীর ধারাবাহিক ক্রম-অনুসরণের স্বাভাবিক ও কৌতূহল অঙ্গুর রেখে যারা গল্পের ভিতর কবিতার স্বাদ পেতে চান, তাঁদের বিশেষভাবেই 'পদসঞ্চার' উপন্যাসটির দ্বারস্থ হতে বলব।

গ্রন্থের গল্পাংশে আছে পোতুগীজ জলদস্যুদের ক্রুর নৃশংসতা, ছলনা, পরিণামচিন্তাবিহীন দুঃসাহসিকতার একাধিক লোমহর্ষক বৃত্তান্ত। পোতুগীজ বণিকদের সঙ্গে মুসলিম বণিকদের স্বার্থ-সংঘাত স্বভাবতই এ বৃত্তান্তের এক মুখ্যাংশ অধিকার করে আছে। এই বাণিজ্যিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সূত্রে হিন্দুশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার আদর্শবাদী কিন্তু নিষ্ফল উত্তমণ্ড কাহিনীর অন্ততম উপজীব্য বিষয়। শেষোক্ত অধ্যবসায়ী সোমদেব নামক চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। বেদমাতা ও ব্রহ্মপুত্রশক্তির উপাসক কঠিনহৃদয় সোমদেবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' উপন্যাসের রঘুপতি চরিত্রটির মিল আছে। তাঁদের উভয়ের কর্মকাণ্ড বিস্তারিত পদ্ধতি এবং পরিবেশটিও মূলত এক। খুব সম্ভব লেখকের অজ্ঞাতসারেই এই চরিত্রসাদৃশ্য ঘটেছে, কেননা বাংলার প্রাক-ব্রিটিশ অধ্যায়ের ইতিহাস-আলোড়নকারী এ জাতীয় গ্রন্থে শক্ত শক্তির প্রতীকী চরিত্রগুলিতে অল্পবিস্তর এ সাদৃশ্য না থেকে পারে না।

বঙ্গের দেশের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলগুলির প্রতি লেখকের মনে কোথায় যেন একটি প্রগাঢ় পক্ষপাত

বিদ্যমান। উত্তরবঙ্গের নিসর্গের বর্ণনা পাই তাঁর 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী', 'বৈতালিক', 'মহানন্দা' 'শিলালিপি', 'লালমাটি' 'সূর্যসারথি' প্রভৃতি উপন্যাসে ও একাধিক গল্পে; পক্ষান্তরে দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব বঙ্গের কাহিনী সব চাইতে সার্থকভাবে রূপায়িত হয়ে উঠেছে তাঁর 'উপনিবেশ' নামীয় ত্রিখণ্ডে সমাপ্ত প্রসিদ্ধ উপন্যাসটিতে। আঞ্চলিক ও পরিবেশ-গত সাদৃশ্যে 'পদসঞ্চার'কে 'উপনিবেশ'-এর অগোত্র বলা যায়। 'উপনিবেশ'-এও পোতুগীজ প্রসঙ্গ আছে, তবে তফাত এই যে সেখানে ফিরিদি শক্তির রূপ হতবীর্ষ, দমিত, নিষ্ক্রিয় ও পঙ্ক। হার্মাদ নামে কুখ্যাত পোতুগীজ জলদস্যুরা এক সময়ে জলে ও স্থলে নৃশংস অত্যাচার-পীড়নের দ্বারা প্রচণ্ড সম্রাসের সৃষ্টি করেছিল, সেই জলদস্যুর বংশধরদের ওই পরিণতি মেনে নিতে কেমন একটু বাধে। কিন্তু পোতুগীজ দস্যুদের দুর্ধর্ষ প্রতাপ যেমন ঐতিহাসিক সত্য, তেমনি ওই আপাত-অপরাজেয় শক্তির বিকৃত্রিত পরিণামটিও কিছু কম ঐতিহাসিক সত্য নয়। 'পদসঞ্চার' উপন্যাসে এই পরিণামের আভাস নিতান্ত অপরিষ্কৃত নয়।

লেখকের বর্ণনার কুশলতা প্রত্যক্ষ। এটি তাঁর মৌলিক কল্পনাপ্রসূতির জোতক। তবে এর সঙ্গে কিঞ্চিৎ চিন্তাশীলতার মিশ্রণ থাকলে ভাল হ'ত। আধুনিক উপন্যাসের লেখকদের নিকট আমরা কল্পনাপ্রসূতি ও চিন্তাশীলতা দুই-ই প্রত্যাশা করি। শেষোক্ত মানদণ্ডে লেখকের মানসিক গঠনের কথঞ্চিৎ অপূর্ণতা আছে বলে মনে হয়।

চরিত্রচিত্রণের দিক থেকে সব চাইতে ভাল লাগল "শম্পা" চরিত্রটিকে। শম্পা পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরে উৎসর্গীকৃত এক ভাগ্যলান্ধিতা দেবদাসী। তাঁর জীবনের বেদনা ও কারুণ্য, মানবীয়তা ও সংঘাত অপূর্ব সংঘমের সহিত চিত্রিত হয়েছে। অন্ত্যস্ত চরিত্রের মধ্যে সুপর্ণা (রাজর্ষির অপর্ণার সহিত নামসাদৃশ্য লক্ষণীয়), শঙ্করদত্ত, পোতুগীজ সেনানায়ক ডি. মেলো, কিশোর গঙ্গালো মনে রেখাপাত করে।

মোটের উপর 'পদসঞ্চার' সমকালীন বাংলা-সাহিত্যের একটি অন্ততম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই গ্রন্থ নিঃসন্দেহে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের হুনাম বৃদ্ধি করবে।

বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড—উপগ্রাস ব্যতীত সমগ্র বাংলা রচনা, বঙ্কিম সাহিত্যের পরিচয় সমন্বিত। সাহিত্য সংসদ, ৩২এ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য ১২৫।

বঙ্কিম-সাহিত্যের ছাত্র ও গবেষকদের কাছে ১৯৩৮ সনে বঙ্কিমজন্ম-শতবার্ষিক উপলক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত নানা পাঠভেদ-সম্বলিত বঙ্কিমের ইংরেজী-বাংলা রচনাবলীর প্রয়োজন বর্তাই অনিবার্য হউক, সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাহা হুমূল্য ও বৃহদায়তন। আবার বাজার-প্রচলিত অল্প বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীগুলিও যথোপযুক্ত নিষ্ঠার সহিত মুদ্রিত ও সম্পাদিত না হওয়াতে প্রায় অব্যবহার্য। সাহিত্য-সংসদ যত্ন ও নিষ্ঠার সহিত অল্প আয়তনের মধ্যে স্থল্লর করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত বঙ্কিম-রচনাবলীর লব্ধ পুনর্মুদ্রণ করিয়া এবং যথাসম্ভব অল্পমূল্যে প্রচার করিয়া সর্বসাধারণের মধ্যে পুনরায় বঙ্কিম-সাহিত্যের স্থায়িত্ববিধান করিলেন। বর্তমানের উন্নততর মুদ্রণ-পারিপাট্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াও যে তাঁহার মাত্র দুই খণ্ডে ১০ + ১২৫ = ১৩৫ টাকায় বঙ্কিমের সমস্ত বাংলা রচনা পরিবেশন করিতেছেন, ইহা প্রশংসার কথা। প্রথম খণ্ড অর্থাৎ সমগ্র উপগ্রাস ১৩৬০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে বাহির হইয়াছিল। দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হইয়াছে ১৩৬১ বৌদ্ধপূর্ণিমা দিने। “সাহিত্য-প্রসঙ্গে” এই খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলি সম্পর্কে বিবিধ তথ্য আহরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে ঐহারা বিন্দুমাত্র উৎসাহী তাঁহার এই দুই খণ্ড বঙ্কিম-রচনাবলী সর্বদা হাতের কাছে রাখিলে উপকৃত হইবেন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপঃ হরপ্রসাদ মিত্র। ইস্ট এণ্ড কোম্পানি, ৫২ কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ছ টাকা।

১৯২২ সনের ২৫ জুন কবি সত্যেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যু ঘটে, জুলাই মাসে রবীন্দ্রনাথ রামমোহন লাইব্রেরিতে অল্পদ্রুত স্থতিসভায় সত্যেন্দ্রনাথের উদ্দেশে রচিত কবিতাটি পাঠ করেন। সেই কবিতাটি সত্যেন্দ্রনাথকে আমাদের মনে সজীবিত রাখিতে যতখানি সাহায্য করিয়াছে তিনি প্রায় ততখানিই জীবিত আছেন, এ কথা বলিলে অস্ত্রায় বলা হয় না। ১৯২২, ২৫ জুন হইতে কিছুকাল তাঁহার কবি ও সাহিত্যিক বন্ধুরা বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রশস্তি-

কবিতা ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়া সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতিকে কিছু দিন আগ্রত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মাত্র তেত্রিশ বৎসরের কালপ্রধাতে সে চেষ্টা প্রায় নিখল হইয়াছে। ইহার কারণ সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য ও জীবন সম্পর্কে কোনও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ এতদিন রচিত হয় নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত “সাহিত্যসাধক-চরিতমালা”য় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত ক্ষুদ্র জীবনীটি মাত্র এতদিন আমাদের উপলব্ধি ছিল। শ্রীমান হরপ্রসাদ মিত্র এতদিন পরে বহু পরিশ্রমে সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন কালের উপকরণগুলি একত্র করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই গ্রন্থখানি প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা তাঁহার ডি. ফিল. উপাধি পরীক্ষার থীসিস, এবং তাঁহার এই থীসিস গ্রন্থ হইয়াছে।

থীসিসের যাহা দোষ এই গ্রন্থে তাহা আছে, নানা আত্মবৃত্তিক অথচ প্রায় অপ্রয়োজনীয় বহু তথ্য ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে শুধু পরীক্ষকদের তাক লাগাইয়া দিবার জন্ত, গবেষকের পরিশ্রমের বহর দেখানোটাও দরকার। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে স্থায়ী গ্রন্থের পক্ষে এই সকল আত্মবৃত্তিক বস্তু ছাঁটাই করিয়া দেওয়া উচিত ছিল, যেমন গ্রন্থান্তর্গত “রবি-রশ্মি” ও “অমৃতিস্তা” অধ্যায় এবং পরিশিষ্ট ক ও খ। তরুণ লেখক ভারের মায়া কাটাইতে পারেন নাই, ফলে ধারের দিক দিয়া কিঞ্চিৎ লাঘব ঘটিয়াছে। গবেষণার উপকরণগুলিকে আরও সংহত ও গাঢ়বদ্ধ রচনায় সম্মিষ্ট করিলে পুস্তকের স্থায়িত্ব ও মূল্য বর্ধিত হইত। প্রবীণতর হরপ্রসাদ পরবর্তী সংস্করণে নিশ্চয়ই তাহা করিবেন আশা করিতেছি। এত নাম, এত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, এত মুখ চাহিয়া মন্তব্যের সাময়িক প্রয়োজন থাকিলেও গ্রন্থের স্থায়ী মূল্য তাহাতে ব্যাহত হয়।

বয়োধর্মবশত এই আতিশয্যটুকুর কথা বাদ দিলে হরপ্রসাদ মন্ত কাক্স করিয়াছেন স্বীকার করিতেই হইবে। তিনি মৃত ও বিন্মৃত সত্যেন্দ্রনাথকে পাঠকদের হৃদয়লোকের দ্বার পর্যন্ত উত্তীর্ণ করিয়া দিতে পারিয়াছেন। যে সম্পদের ক্ষোরে সত্যেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ, যাহার মূল্য রবিরশ্মিতে আজ হারাইয়া গেলেও দূরভবিষ্যৎকালে নিশ্চয়ই স্বীকৃত হইবে, কবি সত্যেন্দ্রনাথের সেই কবিতাগুলিকে হরপ্রসাদ নূতন করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহাদের স্বকীয় মূল্যবিচার

করিয়াছেন, কবি ও কলাবিদ সত্যেন্দ্রনাথকে পৃথকভাবে পাঠকের সহিত পরিচয় করাইয়াছেন। সত্যেন্দ্র-কবিতার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতাও স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। “সত্যেন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ” অধ্যায়টি আলোচ্য গ্রন্থের প্রাণ, সত্যেন্দ্র-কাব্য পাঠে ইহা পাঠককে উদ্বুদ্ধ করিবে।

আর এক কথা, একটা নির্ঘট বা ইণ্ডেক্সের অভাবে বইখানি নিত্য ব্যবহারের পথে অন্তরায় হইবে। গবেষণা-মূলক গ্রন্থে নির্ঘট না থাকা দোষের।

শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্প : গোপালচন্দ্র রায়। সিগনেট প্রেস, কলিকাতা-২০। দাম আড়াই টাকা।

গল্প-উপন্যাসের বাহুর শরৎচন্দ্র বৈঠকী গল্পেও ওস্তাদ ছিলেন। আমাদের কালের অনেকের তাঁহার বৈঠকী গল্প শোনার হৃদয় সোভাগ্য হইয়াছে, কিন্তু ভাবী কালের শরৎ-ভক্তদের ক্ষম্ম দেখিলি একত্র সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করার কষ্ট কেহই স্বীকার করেন নাই। সাময়িক পত্রে বা ছই-একটি পুস্তকে বিচ্ছিন্নভাবে কেহ কেহ ছই-একটি গল্প ধরিয়া রাখিয়া আরও গল্প শুনিবার আগ্রহই বাড়াইয়া দিয়াছেন। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে একনিষ্ঠ গবেষক শ্রীমান গোপালচন্দ্র প্রভুত যত্নে ও পরিশ্রমে এতদিনে অনেকগুলি বৈঠকী গল্প সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলেন। সহস্রয় শরৎচন্দ্র, দরদী শরৎচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যে অনেকখানি বিধৃত হইয়া আছেন, কিন্তু হাস্তরসিক ও বৈঠকী-গল্পিক শরৎচন্দ্রকে তাঁহার রচনার মধ্যে খুব কমই পাই। অথচ তাঁহার এই দিকটা ভাল জানা না থাকিলে মানুষ শরৎচন্দ্রকে সম্পূর্ণ জানা সম্ভব নয়। গোপালচন্দ্র এই অভাব পূরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্য-রসিকদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইলেন। এখনও অনেক হয়তো বাকি রহিল, কিন্তু এই পুস্তকে যতটুকু পাইলাম তাহাতেই শরৎচন্দ্রকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে বুঝিবার ও জানিবার সুযোগ হইল। সংগ্রহ-কারের মত আমরাও মনে করি, “এই বৈঠকী গল্পগুলি থেকে শুধু মানুষ শরৎচন্দ্র নয়, সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রেরও অনেক পরিচয় পাওয়া যাবে।”

গল্পগুলি যে ভাষায় ও ভঙ্গিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে গোপালচন্দ্রের সাহিত্যিক মূল্যমানার পরিচয় পাইলাম। ছাপাই-বাঁধাই চমৎকার, কিন্তু মলাটের ছবিখানি সঙ্গত হয় নাই।

ভাস্করের শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ গল্প : “ভাস্কর”। বিহার সাহিত্য ভবন লিঃ, ২৫১২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা-৪। মূল্য পাঁচ টাকা।

বাংলা দেশ ভোবা পুকুর বিল নালা খাল নদী সাগরের দেশ। সাহিত্যেও গীতিকবিতার ও ভাবানুভূতির ধৈ-ধৈ জল, এই লবণাক্ত অমৃদ্ধির বুকে হাসি ও ব্যঙ্গের প্রবাল-দ্বীপ বড় বিরল। ঊনবিংশ শতাব্দীর হিসাব ধরিতে গেলে কবিতায় ঈশ্বর গুপ্ত বিজ্ঞেন্দ্রলাল এবং নবকুমার কবিরত্ন (সত্যেন্দ্রনাথ) এই তিনজন, প্রহসনে গভে মধুসূদন দীনবন্ধু হত্যোম বঙ্কিম ইন্দ্রনাথ জৈলোক্যনাথ রবীন্দ্রনাথ প্রভাত-কুমার। বিংশ শতাব্দীর তালিকাও খুব লম্বা নহে, বীরবল পরশুরাম রবীন্দ্র মৈত্র বনফুল শরদিন্দু বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় সমৃদ্ধ শিবরাম পরিমল প্র. না. বি. ও ভাস্কর। ভাস্করের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি পাকা গণিতবিদ—ওজন বজায় রাখিয়া অঙ্কের হিসাব মারফিক হাসান, এই দিক দিয়া তিনি বৈজ্ঞানিক পরশুরামের সমগোত্রজ।

ভাস্করের নির্বাচিত ৪৮টি ব্যঙ্গগল্প এই সঙ্কলনে স্থান পাইয়াছে। নির্বাচন করিয়াছেন তিনি নিজে। তাঁহার ভঙ্গহরিণ এই সঙ্কলনে আছে। ভাস্কর ওজন করিয়া কম লেখেন, স্মৃতির বলিতে গেলে তাঁহার প্রায় সব উল্লেখযোগ্য গল্পই এই গ্রন্থে আছে। বনফুলের মত তিনিও ছোট লেখায় বেশি আস্থাবান। এই গ্রন্থে মুদ্রিত গল্পগুলি যেন বাংলা-সাহিত্যের অশ্রুসমুদ্রে এক-একটি ভাসমান বয়া, জলে পড়িয়া যাহারা হাবুডুবু খাইতেছে তাহাদিগকে আশ্রয় দিতে পারিবে।

ভাস্করের ব্যঙ্গগল্পের অন্তরালে দেশের কল্যাণেরত কোনও উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন নাই, ঈর্ষানুষ্ক চিন্তে কাহাকেও আঘাত করিবার চেষ্টা নাই, এগুলি সম্পূর্ণ ব্যক্তি-নিরপেক্ষ।

ভাস্করের রচনা এতটা অঙ্ক-ঘেঁষা না হইয়া যদি আর একটু সাহিত্যরসসম্পৃক্ত হইত, তাহা হইলে তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের ব্যঙ্গ-বিভাগে উচ্চতর আসন দাবি করিতে পারিতেন। আর এক কথা, বাহিরে মানুষ যত বৈজ্ঞানিক হইউক, অন্তরে সে এখনও শিশু; অসম্ভবের বা অ্যাবসার্ডের প্রতি তাহার গোপন আকর্ষণ এখনও পুরা বজায় আছে। এই আজগুবির খেলায় ‘কঙ্কাবতী’ ‘ডমরু-চরিতে’র ত্রৈলোক্যনাথ ওস্তাদি দেখাইয়া গিয়াছেন। ভাস্কর মাঝে মাঝে তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিলে আমরা খুশি হইব।

সংবাদ-সাহিত্য

পাঠকেরা এবং আমরা উভয়ই এই প্রার্থনা দ্বারা আমাদের নূতন যাত্রা আরম্ভ করিতেছি : “ও মহানববত্ত, সহ নৌ ভুলন্তু, সহবীৰ্য্য করবাবহৈ। তেজস্বিনাবদীতমস্ত, মা বিধিষাবহৈ। অর্থাৎ [ব্রহ্ম] আমাদের উভয়কে সমভাবে রক্ষা করুন, উভয়কে তুল্যভাবে বিজ্ঞাফল দান করুন, আমরা যেন সমভাবে সামর্থ্য অর্জন করিতে পারি, আমাদের উভয়ের লব্ধ বিজ্ঞা সফল হউক, আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি।”—ভৈত্তিরীয় উপনিষৎ।

“পুন এল পঁচিশে বৈশাখ,...

চৈত্রের জড়তা শেষে এল শুদ্ধ পঁচিশে বৈশাখ।”

মহাভারতকারের উপর খোদকারি করিয়া ‘চিত্রাঙ্গদা’ নাটক রচনার কালে রবীন্দ্রনাথ যদি ঘৃণাক্ষরেও কল্পনা করিতে পারিতেন যে, ভবিষ্যতে কোনও চিত্রনির্মাতা-প্রতিষ্ঠান মহাভারতকারের প্রতি অন্তায় “প্রতিবিধিস্মিতে” তাঁহাকেও একহাত দেখিয়া লইবে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ২৮ ভাদ্র—১৩ই সেপ্টেম্বর ১৮৯১ রবিবারে কটকেই তাঁহার চটক ভাঙিত। ঠিক ৬৩ বৎসর ৬ মাস পরে সে ছুর্ভাগ্য তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল। তিনি লেখনীর প্রয়োগে মহাকাব্য বা এপিককে গীতিকাব্যে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন, ইহারা স্থূল লম্ভড়াঘাতে গীতিকাব্যকে “টকি” করিয়া ছাড়িয়াছেন। “অচেতন হয়ে গেল অসহ্য পুলকে”র সুইমিং-কস্টম-পর্যায় এমন অসহ্য হইতে পারে, ‘চিত্রাঙ্গদা’র মদন তাহা দেখিলে মহাদেবের নেত্রাগ্নি ব্যতিরেকেই ভস্ম হইয়া যাইতেন। বস্তুত, এই দানবীয় শক্তিসম্পন্ন চলচ্চিত্র-পরিচালকদের মজির হৃদিস পাওয়া আমাদের সাধ্যাতীত; ইহারা ইচ্ছা করিলেই গৌতম বুদ্ধকে বুদ্ধদেব বহু এবং যীশু খ্রীষ্টকে খ্রীষ্টকার কলঙ্কস বানাইয়া দিতে পারেন। আমাদের দুঃখ ও আপত্তি ইহাদের অমিতাচারের জন্ত নয়, সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত ব্যবসায় ব্যাপারে রবীন্দ্র-মর্যাদার রক্ষক বিশ্ব-রবীন্দ্রভারতীয় কর্তৃপক্ষের অতি-মিতাচারের

জন্ত। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে কোমল নি শুদ্ধ নি হইলে বাহার্য আকাশপাতাল ভোলপাড় করিয়া ফেলেন চলচ্চিত্রে রবীন্দ্র-নাথের শিবকে বাদর বানাইয়া দিলে তাঁহারাই যে কেমন করিয়া শাস্ত থাকেন বুঝিতে পারি না। পরস্পরায় শুনিলাম, এ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ শাস্ত থাকিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহাদের একজন আবার ছবিটিকে সম্পূর্ণ রবীন্দ্রাভূষণ বলিয়া সার্টিফিকেটও দিয়াছেন। অর্থাৎ আসলে রক্ষকেরাই ভক্ষক। এখনও চোদ্দ বৎসর অতিক্রান্ত হয় নাই। ইহার মধ্যেই যদি এই হয়, “জাজি হতে শত বর্ষ পরে” না জানি কি হইবে।

আবার শুনিলাম, রবীন্দ্রনাথের মাস্টারপীস হিসাবে এই ছবিখানির বারোটি কপি পৃথিবীর বারোটি বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের বালাই লইয়া ইহার পর কাহার না মরিতে ইচ্ছা হইবে।

নির্লিপিত পুরস্কারকে বিড়ম্বিত করিবার জন্ত ফ্রান্সের আনাতোল ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের জর্জ বার্নার্ড শ বাহা করিতে পারেন, সকলে তাহা পারেন না। পারিলে ভাল হইত।

কয়েকজন দুই লোকে প্রচার করিতেছে যে, অচিরাত্ৰীষ্মতুল্য জগৎকে রবীন্দ্র-পুরস্কার-নির্বাচনী সমিতির সদস্যপদচ্যুত করিয়া আগামী বৎসরে তাঁহার ‘নদীপথে’র জন্ত তাঁহাকে পুরস্কৃত করা হইবে। এই রটনা ছুরতিসন্ধি-পূর্ণ এবং আমরা জোর গলায় বলিব, বাহার্য ময়নাপাড়ার মাঠে বিভ্রান্ত রবীন্দ্রনাথের মত কৃষ্ণকলির প্রতি প্রছাষিত নহেন তাঁহারাই এই গুজব সৃষ্টি করিয়াছেন।

শ্রুত ওয়াকিবহাল ব্যক্তির নিকট শুনা গেল, প্রেস-কমিশনের তদন্তফলাভূয়া দৈনিকের সাময়িক পত্র-গুলিকে দৈনিক পর্ষায়ভুক্ত করিয়া সম্পাদক সহ-সম্পাদক প্রভৃতির বেতন দৈনিকপত্রের উচ্চহারে বাধিয়া দিতে ভারত সরকার মনস্থ করিয়াছেন। এই মতলব কার্যকরী হইলে সাময়িক পত্রগুলির সমূহ সর্বনাশ। দৈনিকগুলির

বিবিধ “বাসরী” উৎপাতের ফলে মাসিক-সাপ্তাহিক পত্র-গুলির এমনিতেই প্রভূত দুর্গতি হইয়াছে। ইহার পর যদি দৈনিক দ্যুতপত্রগুলির সহিত সাময়িক পত্রের মুৎকলস-গুলিকে একই স্রোতে ভাসিতে বাধ্য করা হয় তাহা হইলে তৌরভূমি মৃত খোলামকুচির দ্বারাই আকীর্ণ হইবে—একটি মুৎকলসকেও আর ভাসমান থাকিতে হইবে না। ইহা আমাদের জীবন-মরণ-সমস্তা, স্বতরাং সারা ভারতবর্ষ-ব্যাপী প্রতিবাদ-আন্দোলন সক্ষমভাবে না চালাইতে পারিলে আমরা বরবাদ হইয়া যাইব। এখনও সময় আছে, তাই সমব্যবসায়ীদের কাছে সতর্কতার এই সঙ্কেতধ্বনি করিতেছি।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনর নামে টাকা তুলিতে গিয়া দেশবাসীর চিত্ত রঞ্জনর যে সকল সাধু ও বাইবেল-সম্মত প্রক্রিয়ার আশ্রয় আমাদের মহামাতা লাট-বাহাদুর এতাবৎকাল গ্রহণ করিয়াছেন, কয়েকজন স্বাধিকারপ্রমত্ত চিত্তভারকা নাকি শাস্ত্রের অমর্যাদা করিয়া সেই বাবদ লাট-নাহবকে বিপন্ন করিয়াছিলেন। জানিয়া স্বধী হইলাম যে, সাধু যাহার উদ্দেশ্য ঈশ্বর তাহার সহায়—এই প্রবচন অল্পব্যয়ী অল্পেই বিপদ কাটিয়া গিয়াছে।

অধ্যাপক আলবার্ট আইনস্টাইনের মৃত্যুর পর তাঁহার শেষ ইচ্ছাপত্র হইতে জানা গিয়াছে, তিনি মাত্র তিন-চার লক্ষ ডলারের সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারিয়াছেন। জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের সম্পত্তির পরিমাণের স্বল্পতা একটি বাংলা দৈনিকের সম্পাদকীয় বিষয়ের কারণ হইয়াছে। আমরাও বিষ্ময় বোধ করিতাম যদি জানিতাম, আইনস্টাইন কতিপয় স্কুল ও কলেজ-পাঠ্য পুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন।

দেশিয়া ভাল লাগিল চৈত্রের ‘মৌচাকে’ ত্রিঅচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্ত নিজের ভ্রম সংশোধনের সংসাহস দেখাইয়াছেন। এখন হইতে তাঁহার ধারাবাহিক “বিলে”র নাম পরিবর্তন করিয়া “বীরেশ্বর বিবেকানন্দ” রাখিলেন। তাঁহুর তাঁহার কল্যাণ করুন।

আমরমর মুখ্যমন্ত্রী মেধী মহাশয় ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহার বঙ্গাল বিতাড়ন চাহেন, শুধু বাঙালী বিতাড়ন তাঁহাদের লক্ষ্য নহে। ‘বঙ্গাল’ অর্থে আগন্তুক—ফরেনার।

আসলে ইহা কথার মার-প্যাচ বা সাফাই জবাবদিহির ব্যাপারই নয়, শান্তিপূর্ণ সহবাস সহন্যতার দ্বারাই সম্ভব। বাংলা দেশে আসামী বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাতে বাবতীর আসামীদের ধরিয়া হাজতে চালান দিলেও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের অজুহাতের অভাব হইত না। তিনি তাহা করেন না, কারণ তিনি আসামের দেখাদেখি স্বয়ং আসামী হইতে চাহেন না। গোয়ালপাড়ায় আগুন লাগিলে গোঁ-হাটিও যে নিরাপদ নহে—এই বোধ থাকিলে তাঁহারা এই ব্রাহ্ম পথ অহুসরণ করিতেন না। “ন মেধয়ান বহনা শ্রুতেন”—কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন।

তত্ত্বান হওয়া ইস্তক তো বটেই, স্বাধীনতা-লাভের পর গত আট বৎসরের মধ্যে “চলবে না, চলবে না” অনেক দেখিলাম; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলই চলে তাহাও দেখিতেছি। ট্রামও চলিল, বাসও চলিল, স্কুল-কলেজও চলিতেছে। আসলে আমরা হজুগে জাত, হজুগে তুলিয়াই আমাদের আনন্দ। সঙ্কীৰ্ত্তনের ‘পালামো’য়ের সেই পাহাড়ী শিশুর মত হাত পাতিবার স্বখেই হাত পাতা, হাতে পয়সা দিলে তাহা ফেলিয়া দিতেও তাই বিলম্ব হয় না।

এতখানি গৌরচন্দ্রিকা কেন করিলাম, এইবার বলি। সেদিন এক সভায় হাজির থাকিতে হইয়াছিল—শিক্ষক ও অভিভাবকদের সম্মিলিত সভা। পরস্পরকে দোষারোপ ক্রমশ উচ্চগ্রামে চড়িতে চড়িতে শেষতক যে তথ্যগুলি প্রকট হইল তাহা ভয়াবহ।

প্রত্যেক উচ্চ বা নিম্ন বিদ্যালয়ে আজকাল নাকি শিক্ষকদের একমালী স্বত্বাধীনে বইয়ের দোকান আছে; ছাত্রদিগকে সেখান হইতেই বই খাতা ইত্যাদি কিনিতে হয়। বাজারে যে খাতার দাম চার আনা, তাহার দাম, তাঁহারা ছয় আনা লইয়া থাকেন। আরও একটা ব্যাপার আছে, পাঠানির্বাচনের জন্য যে সকল প্রকাশক পুস্তক দাখিল করেন, নির্বাচনের শর্ত এই যে, তাঁহাদিগকে প্রত্যেক বই পঞ্চাশখানি উপহারস্বরূপ দিতে হইবে। এই “বাধ্যতা-মূলক” উপহার বেচিয়া যাহা লব্ধ হয়, প্রধানতন হইতে নিম্নতন শিক্ষকেরা তাহার ভাগ পাইয়া থাকেন, কাজেই ফাঁস হয় না। চোরা-কারবার অবধে চলিতে থাকে।

দ্বিতীয় তথ্য যাহা সংগ্রহ করিলাম তাহা আরও

মারাত্মক। মধ্যশিক্ষা-পৰ্বৎ নিজের দায়িত্বে যে সকল পুস্তক বিভিন্ন প্রকাশকদের দিয়া ছাপাইয়া (পৃষ্ঠা-সংখ্যা, কাগজ, হরক, মূল্য ইত্যাদির নির্দেশ দিয়া) বাজারে ছাড়িতেছেন, প্রকাশকদের রূপায় সেগুলি ছাত্রদের নিকট পৌঁছিতেছে পাঁচ গুণ মূল্যবিনিময়ে। একখানি সংস্কৃত পাঠ্যের মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে দশ আনা। উত্তম। কিন্তু তাহা দশ আনায় পাইবার উপায় নাই। আড়াই-তিন টাকা মূল্যের একখানি অর্থপুস্তক খরিদ করিলে ছাত্র পাঠ্যপুস্তকখানি পাইবে, নচেৎ নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা-বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ‘কিশলয়’ লইয়া এই কেলেকারি অনেক হইয়াছে। অভিভাবকেরা হুড়হুড় করিয়া অর্থপুস্তকসম্মত পাঠ্যের অর্থমূল্য বাহির করিয়া দিয়াছেন—“চলবে না, চলবে না” ধনিমাত্র তোলেন নাই। দৈনিক সংবাদপত্রে একটা-আধটা চিঠি মাত্র বাহির হইতে দেখিয়াছি।

অথচ মাথাপিছু আট আনা বেতনবৃদ্ধির বেলায় দেখিলাম, ছাত্রেরা দল বাঁধিয়া “চলবে না চলবে না” ধনি তুলিতে তুলিতে পথে বাহির হইল। নিশ্চয়ই ইহার পিছনে অভিভাবকদের সমর্থন আছে। “বাধ্যতামূলক” মানে-বই কেনার বেলা তাঁহারা সচেতন নন কেন? কেন ছেলেদের প্রতিবাদ-শোভাযাত্রা এই ব্যাপারে বাহির হয় না?

আসলে আমাদের কিছুতেই কিছু যায়-আসে না।

আমাদের অর্থে, সাধারণ ভলমাহুয নিরীহ অভিভাবকদের কথা বলিতেছি। ছেলেরা হুট বা সাধু লোকের পাল্লায় পড়িয়া বাহা-খুশি করিতেছে, আমরা কড়ি জোগাইয়াই খালাস। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে যদি এইভাবে কালোবাজার এবং অরাজকতা চলিতে থাকে, তাহা হইলে যত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাই জওহরলাল-বিধানচন্দ্র করুন, আমাদের বাঁচিবার উপায় নাই। জাতির ভবিষ্যৎসন্তানদের শিক্ষার যেখানে মূত্রপাত সেখানেই ঘুন ধরিয়াছে, কাহারও অবহিত হইবার সময় নাই—না অভিভাবকদের, না শিক্ষকদের; তাঁহারা নিজের নিজের বায়েলা-ঝুড়ট ও উপরি পাওনা লইয়া ব্যস্ত আছেন, ছেলেমেয়েরা মরিল কি বাঁচিল তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার সময় কোথায়? অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের দৃষ্টি-যদি আমাদের কাল পর্যন্ত প্রসারিত হইত, তাহা হইলে তিনি জয়ের আশা না করিবার কারণস্বরূপ এই শিক্ষক-অভিভাবক-বিভ্রাটটাকেও ঢুকাইয়া দিতেন।

মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক মুক্তির উপায়-স্বরূপ পুরাতন চরকার পুনঃপ্রবর্তনপ্রয়াসী হইয়াছিলেন; কিন্তু হুংখের বিষয় বিষয়ী লোকের মালাজপার মত চরকার প্রভাব আঙুল এবং হাত পর্যন্তই পৌঁছিয়াছে, দেশের হ্রদয়ে পৌঁছে নাই। গান্ধীজীর তিরোভাবের পর তাঁহার মন্ত্রশিষ্য জওহরলাল সেই চরকা লইয়াই আছেন, কিন্তু পরের চরকা। পরের চরকায় তেল দিতে দিতে বেচারি হয়রান হইয়া গেলেন। তাঁহার কার্যকলাপ দেখিয়া মনে হইতেছে, “ফরেন পলিসি”র হুট বন্ধাবাদ হইতেছে “পরের চরকায় তেল দেওয়া।”

মানুং সম্মেলনের পরেই সংবাদ হইতেছে কুনমিং-এ চো-এন-লাই ও হো-চি-মিনের আসন্ন মিলন; আমাদের প্রাণ আনচান করিয়া উঠিতেছে। এক সময় পীতসঙ্কটের ভয়ে শ্বেতকায় জাতিরা অস্থির হইয়াছিলেন। মহামাত্র স্টালিন আর কিছু না করুন, শ্বেত পৃথিবীর সে ভয় ঘুচাইয়াছেন। পীতের সঙ্গে লাল মিশিয়া যে মনোরম কমলালেবুর রঙটি দাঁড়াইয়াছে, ভারতবর্ষের গৈরিকেরও আর তাহাতে মিশিতে বাধা নাই। এখন যত গলদ বাধাইতেছে এই চিন-মিনেরা। দিন-জুনিয়ার মালিক রূপা করিলে কালে কালে তাহাও সহিয়া যাইবে।

মাত্র এই সেদিন সেনেট হলে অহুষ্টিত এক সভায় অতুল্য জ্ঞান তুষার—তিন ঘোষকে পাশাপাশি সমাসীন দেখিয়া ভারি খুশি হইয়াছিলাম এবং ঘোষদের কাছে তাহা ঘোষণাও করিয়াছিলাম। কিন্তু কয়েক দিন যাইতে না যাইতে কোন্ পাড়ায় বে ঘুষ অথবা ঘুষাঘুষির লেনদেন হইয়া গেল আর আমাদের জ্ঞান ঘোষ দিল্লীতে ঘোষযাত্রা করিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাগ্যে সবে তিনি গিরিগোবর্ধন ধারণের মহড়া শুরু করিয়াছিলেন, হঠাৎ মথুরার আস্থানে ত্রস্ত হইয়া সরিয়া পড়িলেন। এখন কে যে গোবর্ধন ধারণ করিবেন, সেই সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষা করিতেছি। ঘোষ মহাশয়ের পক্ষে কড়ে আঙুলের সাহায্যে বাহা করা সম্ভব ছিল, আমাদের ভয়, অত্রে তাহা করিতে গিয়া নিজে না চাপা পড়েন এবং আমাদের গকেও না চাপিয়া মারেন। তবু ভরসা কলিকাতা-পৌর-প্রতিষ্ঠানের প্রধান

নাগরিক হইয়াও সতীশ ঘোষ মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল ছাড়েন নাই। আন্ততঃের রূপায় শ্রামাপ্রসাদাৎ, রমাপ্রসাদও আছেন। এখন দেখা যাক।

অক্ষকভ-আইসেনহাওয়ারের পরস্পর নাক-শৌক-
কির যে বহর দেখিতেছি তাহাতে ভয় হয়, আম-দুখের
মিশ্রণের মত সাদায় সাদায় শেষ পর্যন্ত বেমানম মিশিয়া
যাইবে। আঁটি এশিয়ার আফালন আঁজ প্রবল হইলেও
শেষতক আঁটির মতই তাহা আন্তাহুড় আশ্রয় করিবে।
সুতরাং এশিয়া যে বান্দুং-সম্মেলনে মিলিত হইয়াছে ইহাতে
ভালই হইবে। বর্তমানে এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক
শ্রীরাঙ্গাগোপালাচারীর সতর্কবাণী এই কারণেই প্রাধিকান-
যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, আমেরিকা যদি আণবিক
বোমার পরীক্ষা ক্রমাগত চালাইতে থাকে তাহা হইলে
উন্নয়ন-পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে তোমাদের যত
অভাবই হউক, আমেরিকার পাপ-ডলার খবরদার স্পর্শ
করিও না। আজ না শুনিলে এই কথা একদিন বাসি
হইলে মিষ্ট লাগিবে। রাশিয়া আমেরিকা কাহাকেও
লইয়া ঢলঢলি করিও না, হে ভারত, সময় থাকিতে
নিজের চরকায় তেল দাও।

অক্ষম মানুষকে কিঞ্চিৎ সুখ ও সাধুনা দিবার জন্য
এক-একটা বিশেষ স্বতই গজাইয়া উঠে এবং তাহারাই
মুখে মুখে সেটা প্রচার করিয়া পরস্পরের চিত্তবিনোদন
করিয়া থাকে। কোনও মানুষ যখন এই অক্ষমের দল
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাড়িয়া উঠে এবং নিজ স্বভাব ব্যবহার
ও প্রতিপত্তির দ্বারা জনপ্রিয় হয় তখন এই অক্ষমেরা একটা
চিরন্তন অস্ত্র ব্যবহার করে—লোকটা দুশ্চরিত্র। প্রমাণের
প্রয়োজন নাই, শুধু মুখে বলিলেই হইল। যেখানে কিছুতেই
কিছু করা যাইতেছে না, কোনও ফাঁক দিয়াই জল
গড়াইতেছে না, তখন আর কিছু করিতে হইবে না,
কথাটি একজনের কানে কানে বলিয়া দাও—লোকটি
দুশ্চরিত্র। বাস, আর দেখিতে হইবে না। লোকটা

সায়েন্স না হউক, অক্ষমেরা তৃপ্ত হইবে। দুশ্চরিত্র
বিশেষণটা সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে চালু আছে। সাময়িক-
ভাবে আর কয়েকটি বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দেশে
দেশে পরস্পর যুদ্ধের সময় এবং আমাদের দেশে স্বদেশী-
আন্দোলন ও সম্মানবাদী বিপ্লবের সময় “স্পাই” কথাটা
ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইত। যাহার সহিত তোমার
মনের মিল হইতেছে না, তাহাকে কোনও ক্রমে
একবার স্পাই বলিয়া দিতে পারিলেই কাজ
হাসিল হইত। এখন চলিতেছে সাম্রাজ্যবাদের দালাল
আর সাবোটারকারী বা অন্তর্ঘাতী বিশেষণ দুইটি। যেখানে
রাষ্ট্রনৈতিক মতের গরমিল, সেখানে অপর পক্ষকে অমুকের
দালাল বলিলেই হইল—এক নিমেষে সকল সমস্তা জল
হইয়া গেল। ট্রেনে ট্রেনে কলিশন হইল, এরোপ্লেন
কল বিগড়াইয়া ধ্বংস হইল, রটাইয়া দাও ইহা সাবোটার-
অম্মনই সকল প্রেমের মীমাংসা হইয়া গেল। কর্মচারীদের
মাহিনা বৃদ্ধি হইতেছে না, প্রতিষ্ঠান-পরিচালকেরা বোনাস
দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন, কোনও প্রতিষ্ঠানে লোক ছাটাই
হইয়াছে, স্কুলের মাহিনা বৃদ্ধি হইয়াছে—দল বাঁধিয়া রাস্তায়
বাহির হও আর যে-কোনও একটা বিশেষণ ধনি তুলিয়া
আওড়াইতে থাকো—কাজ না হউক, তোমার রাগ জল
হইয়া যাইবে। গত মে-মিবেসে লালঝাণ্ডাধারীদের এক
শোভাযাত্রা দেখিয়া ও ধনি শুনিয়া উপরোক্ত তত্ত্বচিন্তা
আমাদের মনে উদ্ভিত হইল। উপরে আলোচিত বাবতীয়
বিশেষণগুলি বেচারী কংগ্রেস, অওহরলাল ও বিধানচন্দ্রের
উপর প্রযুক্ত হইতে দেখিলাম। বাহারি বহু কষ্টে ভারতে
এবং ভারতের বাহিরে তিনরঙা জাতীয় পতাকার একটা
মর্ধাদা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, বিদেশী ঝাণ্ডা উড়াইয়া
তাহাদিগকে নস্ত্রাৎ করিবার চেষ্টা এই ভারতবর্ষেই
সম্ভব। বান্দুংগামী উড়ো-জাহাজের ধ্বংসের কথাটাও
শুনিলাম। এই আশাস লইয়া ফিরিলাম যে, অন্তরের
তুষারি আপাতত নির্বাপিত হইল এবং বাহারি “চলবে না
চলবে না” চিল্লাইয়া আকাশ কাটাইল তাহারাই কাল
আবার সব কিছুই চালাইবে। সত্য সেলুকাস, ইত্যাদি।

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্ড বিলাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা ৩৭ হইতে

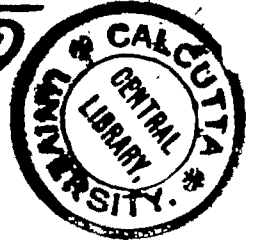
শ্রীমজুনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : বড়বাজার ২৮৩৮

আত্মস্মৃতি

চতুর্থ প্রবাহ—দ্বিতীয় তরঙ্গ

১৯৩৫

শ্রীসজনীকান্ত দাস



‘বঙ্গশ্রী’ বাহির হইবার তিন মাস পরেই অর্থাৎ ১৩৪০ বঙ্গাব্দের বৈশাখে আরও দুইটি মাসিক পত্রিকা কলিকাতায় জন্মলাভ করে—‘অভ্যুদয়’ ও ‘উদয়ন’। প্রধানত সাহিত্যই পত্রিকা দুইটির উপজীব্য ছিল; হয়তো ‘বঙ্গশ্রী’র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাও প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। মন্ত-‘উপাসনা’ওষ্ট সাবিত্রীপ্রসন্ন অনেক তোড়জোড় করিয়া ‘অভ্যুদয়ে’র অভ্যুদয় ঘটান। প্রায়শ্ছেই রবীন্দ্রনাথ প্রশস্তি-কবিতা ‘অভ্যুদয়ে’ এই ইঙ্গিত করেন—

শত শত লোক চলে শত শত পথে
তারি মাঝে কোথা কোন্ রথে
সে আসিছে বার আঁজি নব অভ্যুদয়।
বিকলমুখী গাহিল না ময়,
আজো রাজটীকা
মলাটে হ’ল না তার লিখা।
মাই অন্ন মাই সৈতল,
অশ্রুত তাহার বাণী, কণ্ঠে নাহি বল।
সে কি নিম্নে আসে
আসিছে সে কী লাগিল, আসে কোন্‌ধামে।
যুগের প্রচ্ছন্ন আশা করিছে রচনা
তার অভ্যর্থনা...”

আজ বাইশ বৎসর পরে মাত্র এক বৎসরের কণ্ঠস্বী
‘অভ্যুদয়ে’র স্মৃতি ও পাতা উন্টাইয়া কবির “সে আসিছে
বার আঁজি নব অভ্যুদয়” এই উক্তি একমাত্র তারাশঙ্করের
উপর আরোপ করিতে পারিতেছি। এক বৎসরে
‘অভ্যুদয়ে’ বাহারা লিখিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেককেই

তখনই লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ, গত বাইশ বৎসরে ইহাদের গৌরব
বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। দেখিতেছি, সেদিনকার অশ্রুটবাণী
ও দুর্বলকণ্ঠ তারাশঙ্করেরই অভ্যর্থনা রচনা করিয়াছে সে
যুগের প্রচ্ছন্ন আশা। এক বৎসর ধরিয়া তাঁহার অপরিপক
“বেনের বেসাতি” (বর্তমান নাম ‘প্রেম-ও প্রয়োজন’)
উপন্যাস ‘অভ্যুদয়ে’ প্রকাশিত হইয়াছিল; তারাশঙ্করের
সাহিত্য-জীবনের সেই পৈঠাটুকু রচনা করিয়াই ‘অভ্যুদয়ে’র
বিলম্ব ঘটয়াছিল। সাবিত্রীপ্রসন্ন তাঁহার শেষ “নিবেদনে”
লিখিয়াছিলেন—

“দেশের বর্তমান অবস্থায়, সাহিত্যিকের কোনও পত্রিকা চলিতে পারে
না এবং বর্তমান ক্ষেত্রে ‘অভ্যুদয়ে’র মত মাসিক পত্রিকা সম্পাদনের
কোন সার্থকতা দেখা যাইতেছে না।”

‘উদয়নের’ আয়ু ছিল কিঞ্চিৎ দীর্ঘতর অর্থাৎ মাত্র দুই
বৎসর; ১৩৪১এর চৈত্রে ‘উদয়ন’-কর্তৃপক্ষও ‘উদয়ন’-
সম্পাদনের কোনও সার্থকতা আর দেখিতে পান নাই,
যদিও দুই বৎসরে কাঞ্চনমূল্যে বহু খ্যাতিমান বঙ্গসাহিত্যিক
‘উদয়নে’ বাঁধা পড়িয়াছিলেন। ইহার সম্পাদক ও
পরিচালক অনিলকুমার দে ছিলেন ছাপাখানা-ব্যবসায়ী,
‘উদয়ন’ প্রকাশ করিয়াই ইনি “সাহিত্যবন্ধু” আখ্যা পান।

কিন্তু “সাহিত্যবন্ধু”র কোনও সাহিত্যিক বন্ধু ‘উদয়ন’-
সম্পাদনে একান্ত কর্তৃত্ব পান নাই বলিয়া বিচ্ছিন্ন বহু
মূল্যবান উপকরণ সবেও ‘উদয়ন’ দানা বাঁধিতে পারেন নাই।
সমবেতভাবে প্রচুর কলরব উঠিয়াছিল, কিন্তু ‘উদয়ন’-
উথিত কোন কলকণ্ঠই স্থায়ী হয় নাই।

সাবিজীৱনসমূহ নিরুৎসাহ হইয়া যে আক্ষেপোক্তি করিয়াছিলেন, সে যুগের পক্ষে তাহা মোটেই প্রযোজ্য নয়। 'প্রবাসী' 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি স্ব-চলমান পত্রিকার কথা বার দিলেও তখন শুধু 'বঙ্গলী' এবং 'শনিবারের চিঠি'তেই অনেক নৃতনের অভ্যাস ও উদয় ঘটয়াছিল। তন্মধ্যে সৃষ্টিমূলক সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ মৈত্র (নাটক), তারাকর (ছোটগল্প), বনফুল (ব্যঙ্গকবিতা), চন্দ্রহাস (ব্যঙ্গকবিতা), মনোজ বসু (ছোটগল্প), প্রমথনাথ বিশী (উপন্যাস), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (উপন্যাস), অমলা দেবী (ছোটগল্প) প্রভৃতি এবং সমালোচনা-গবেষণামূলক সাহিত্যে ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ সেন, অমূল্যচন্দ্র সেন, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, বটকৃষ্ণ ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইহাদের কীর্তি উদয়-অভ্যাসেই খণ্ডিত হয় নাই, উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়া বাংলা-সাহিত্যকেও গৌরবান্বিত করিয়াছে।

'বঙ্গলী'র দ্বিতীয় বৎসরের শেষার্ধ্বে আমি যখন "বিচিত্র জগতে"র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, "বিজ্ঞান-জগতে"র গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, "চতুষ্পাঠী"র নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, "বুদ্ধকথা"র* অমূল্যচন্দ্র সেন ও "বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে"র সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতিকে লইয়া পরিপাটিভাবে আসর জাঁকাইয়া বসিয়াছি, তখনই কোনও অজ্ঞাত ভূমিকম্পের ফলে আমার মনে বিপর্যয় ঘটয়া গেল। দুই মেরুর মধ্যে ক্ষতবিক্ষত মন ইঙ্গলোকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বজ্রাঘাতের প্রতীক্ষায় উত্তত ও উদ্ধত হইয়া রহিল।

ভিতরে ভিতরে আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া থাকিলে সমরানল জালিবার উপলক্ষ্যের যে অভাব হয় না, ১২১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ জুলাই তারিখে অগ্নিদ্বারা কর্তৃক তদানীন্তন সার্বিয়ার উপর যুদ্ধ-ঘোষণায় তাহাই প্রমাণিত হয়। এক মাস পূর্বে ২৮ জুন তারিখে সেব্রাজেভো (যুগোস্লাভিয়া) শহরে অগ্নিদ্বারা ভারী সন্ডাট আর্কডিউক ক্রাঙ্গিস ফাভিনাও আততায়ী কর্তৃক নিহত না হইলেও যে ভিন্ন অজুহাতে বিশ্বমহাযুদ্ধ সংঘটিত হইত, ইতিহাসের ছাত্রেরা তাহা অবগত আছেন। আমার ক্ষেত্রেও উপলক্ষ্য সামান্য, আমার অজ্ঞাতসারে খোদ কর্তা কর্তৃক একটি গল্পের নির্বাচন ও ছাপাখানায় প্রেরণ।

* সান্দ্রে ঘোষণা করিতেছি, 'বুদ্ধকথা' সম্বন্ধে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।—লেখক।

ব্যাপারটা আমার গোচরীভূত হওয়ামাত্র তেলে-বেগুনে জলিয়া উঠিলাম। টেলিফোন-যোগে সরাসরি কর্তাকে জানাইলাম, তিনি অনধিকারচর্চা করিয়াছেন। তাঁহার সম্মানরক্ষার্থ লেখাটি আমি ছাপিতেছি বটে, তবে ভবিষ্যতে এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়। ভট্টাচার্য মহাশয় প্রশান্ত-চিত্ততার অল্প প্রসিদ্ধ ছিলেন না। পাশ্চাত্য "ডিসিপ্রিন" এবং প্রাচ্য আচরণ-বাদ উভয় দিক দিয়াই আহত হইয়া তিনি উত্তপ্ত হইলেন। যন্ত্রযোগে কিছু তর্ক ও কথা-কাটাকাটি হইল, এবং আমার পক্ষের এই উক্তিভেদে পরিসমাপ্তি ঘটিল—“অল্পগ্রহপূর্বক আমাকে রেহাই দিন।”

ভট্টাচার্য মহাশয় সঙ্গে সঙ্গেই রেহাই দিলেন। তারিখটা বেশ মনে আছে, ১৫ই জানুয়ারি ১৯৩৫, ১লা মাঘ ১৩৪১। মাঘের অর্ধাৎ তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা 'বঙ্গলী' প্রকাশিত তখনও দুই-চারিদিন বিলম্ব ছিল। আমি টেলিফোন ছাড়িয়াই বাসব-লোক পোলোক স্ট্রীটে উপস্থিত হইয়া লিখিত ইস্তফাপত্র দাখিল করিলাম। সেই দিনই ছুটি হইয়া গেল।

আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাটি আকস্মিক হইলেও ইহা যে অবশ্যস্বাভাবী ছিল, কিঞ্চিদধিক তিন মাস কাল পূর্বে আমার কবিত্ত তাহা অনুভব করিয়া একটা বৈদান্তিক মনোভাব অবলম্বন করিয়াছিল, কাভিকের 'বঙ্গলী'তে প্রকাশিত "শেখভের ডার্লিং" কবিতায় তাহার আভাস আছে—

অসম্ভবের করি না সাধনা, চাহি না নিত্যপ্রেম,
ততটুকু মোরে ভালবাস তুমি, বতটুকু থাকি কাছে,
যত দূরে বাই ততখানি বাও ভুলে।
জানি, বিদায়ের কালে
তোমার চোখের ছলছল-করা জলের অন্তরালে
লুকাইয়া আছে, থাকিবে লুকায়ে, তুমি না জানিতে পার—
প্রেমের পীড়ন হইতে তোমার মুক্তির হাসিখানি।
উঠিবে শিহরি ভাবিতেও সেই কথা,
সেই হাসি তবু জানিবে সত্য হয়ে।

যুগে যুগে এই মাটির ধরণী সাবিয়াছে জনে জনে,
করিয়াছে পূজা লাগে মনস্তরে
লক্ষ মনুরে—মমু-সন্তান লাগে লাগে মানবেরে;
শ্রুতির বেদীতে অমর করিয়া পূজা করি বহুদিন
বিশ্বভিজলে শেষে কেলিয়াছে টানি।
শেখভের ডার্লিং—

পুষ্টিতে একের একের পুঞ্জাই ভেবেছে সত্য বলি,
 ফেরেছে তাহাই সত্য নিত্যকাল।
 এক চলে গেছে, অপরে আসিয়া লইয়াছে তার পুঞ্জা,
 একেরে ভুলিতে এক নিমেষেরও লাসে নি অধিক কাল,
 কারো পুঞ্জা তার মাটির জীবনে হয় নি বিখ্যা কল্প,
 কারো মৃত্যু তার হয় নি মনের ভার—
 প্রেমের এ ইতিহাস।

মাটির ধরার তুমিও ছুলালী মেয়ে
 তুমিও মাটির মেয়ে—
 এই ধরণীর মাটির রক্ত করিয়া অতিক্রম
 পার না হইতে পাবর-কল্পা শিবানী হৈমবতী।
 জীবনে যে স্বামী, মৃত্যুতে তার ছাই-মাখা কাঁধে চড়ি
 বিচ্ছিন্নে ধও খণ্ডে পড় নাই পীঠে পীঠে।
 এক হও নাই বহু—
 বহুরে মিলারে এক করিতেছ দেহ-শাসপীঠতলে।
 আমি সে বহুর এক—
 দেহবোদী পরে চাপিয়া বসেছি নিত্যদেবতারূপে,
 গুরুগুরু বুকে বিসর্জনের গুণিতেছি জয়-চাক,
 নৃতন দেবতা আসিতেছে পারে পারে,
 বিদায় আমার আসন্ন হ'ল দেবী।
 বিদায় আমার আসন্ন হ'ল, কোন্ মাছি করি তবু,
 কেনেছি সত্য-মাটির জগতে অপিকের ভালবাসা,
 তোমরা মাটির মেয়ে—
 এক বরষার প্রণয়-মাবনে গলি-পড়া বালুভটে
 কোটে বে কুহল, আর বরষায় ভেসে বার প্রোতোমুখে।
 নৃতন করিয়া গলি-পড়া বালুচরে
 কোটে বে নৃতন ফুল।...

নিঃশব্দ অবস্থায় বিদায় লইলাম। এবারে কিন্তু নিঃশব্দ
 ছিলাম না। বন্ধুবান্ধবের কাছে অকস্মাৎ এক মুহূর্তে 'হিরো'
 হইবার বিচিত্র গর্ভাশুভূতি উপভোগই করিতে পারিতাম না,
 যদি কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বান্ধব সেই একান্ত দুঃসময়ে আমাকে
 ঘিরিয়া না থাকিতেন। মৎপরিচ্যক্ত 'বঙ্গশ্রী'র তৃতীয়
 বৎসরের প্রথম তিন সংখ্যায় তাঁহাদের সজ্জদয়তার কাহিনী
 বিবৃত হইয়া আছে।

'বঙ্গশ্রী'র তৎকালীন লেখকদের কাহারও সহিত
 কর্তৃপক্ষের বিবাদ বাধে নাই। বাহা ঘটয়াছিল, তাহা
 একান্তই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু অনেকেই
 সাহিত্য-ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের অনধিকার-চর্চায় অপমান

বোধ করিলেন, তারাশঙ্কর এবং বিভূতিভূষণ গায়ে
 পড়িয়া ভট্টাচার্য মহাশয়ের সহিত ঝগড়াও করিয়া
 আসিলেন। বয়ং বিভূতিভূষণের সহিত আমার সম্পর্ক
 তখন বিবিধ বন্ধনে খুব ঘনিষ্ঠ, কিন্তু তারাশঙ্করের প্রতি
 সাহিত্যজ্ঞানিত সম্মত-প্রীতি জাগ্রত হইলেও তখনও দৃষ্টর
 হার্দিক ব্যবধান। তাঁহার 'আমার সাহিত্য-জীবনে'
 'চৈতালী ঘূর্ণ'র দপ্তরী-সংক্রান্ত যে সামান্য ঘটনার উল্লেখ
 করিয়া তিনি আমাকে লজ্জা দিয়াছেন, সেইটি ঘটয়াছিল
 আমার চাকুরি-ছাড়ার মাত্র এক মাস উনিশ দিন পূর্বে—
 ১৯৩৪ সনের ২৬ নবেম্বর তারিখে। স্বতরাং তিনি বাহা
 করিয়াছিলেন তাহা আমাকে বিশ্বাসে অভিজ্ঞত করিয়াছিল।
 তাঁহার নৃতন উপন্যাস 'জমিদারের মেয়ে'র প্রথম কিস্তি
 মাঘ মাসে সত্ত্ব বাহির হইয়াছে এবং ফাল্গুনের কিস্তিও
 ছাপা হইয়া গিয়াছে। উপন্যাসটি সম্পূর্ণ হইলে একটা মোটা
 অঙ্ক তাঁহার লাভ হইত, কিন্তু তিনি নীতিবোধের
 দিক দিয়া 'বঙ্গশ্রী'র সহিত যুক্ত থাকি সমীচীন বিবেচনা
 করেন নাই; 'জমিদারের মেয়ে' 'বঙ্গশ্রী'তে বন্ধ করিয়া 'ধাত্রী
 দেবতা' নামে 'শনিবারের চিঠি'তেই প্রকাশ করিয়াছিলেন।
 আর কাহাকেও এতখানি ত্যাগস্বীকার করিতে হয় নাই।

তবু বাহা ঘটয়াছিল, তাহা বিচিত্র বলিতে হইবে।
 ফাল্গুন মাস শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল—তারাশঙ্কর
 'জমিদারের মেয়ে' লইয়া সরিয়া পড়িয়াছেন, বিভূতিভূষণ
 তাঁহার 'বিচিত্র জগৎ' সহ অন্তর্ধান করিয়াছেন—নৃতন
 'বিচিত্র জগৎ' সৃষ্টি করিয়াছেন শিবরাম চক্রবর্তী,
 নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ 'চতুষ্পাঠী' হইতে পলাতক—নৃতন 'চতুষ্পাঠী'
 খুলিয়া বসিয়াছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের
 অবৈজ্ঞানিক হৃদয়াবেগে 'বিজ্ঞান-জগৎ'ও শুদ্ধ হইল—দুই
 মাস পরে কাজী মোতাহার হোসেন আবার তাহা চালু
 করিলেন। মৃত ও জীবিত আরও ধাঁহাদিগকে আমি
 সংগ্রহ করিয়াছিলাম—নিধিলনাথ রায়, সুনীতিকুমার
 চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিলী,
 মনোজ বসু প্রভৃতি, তাঁহারাও কেহ কেহ চিরতরে, কেহ
 কেহ সাময়িকভাবে সরিয়া গেলেন। একমাত্র বন্ধুবর
 অমূল্যচন্দ্র সেন স্বদূর জার্মানিতে ছিলেন, তিনি দেখান
 হইতে 'পরিস্থিতি' ঠিকমত ঠাহর করিতে না পারিয়া 'চীনা
 শ্রমণদের ভারতদর্শন' চালাইয়া বাইতে লাগিলেন।

মিষ্টান্নের দোকান হইতে এক ঝাঁক মাছিকে তাড়াইয়া দিলেও নতুন আর এক ঝাঁককে যেমন ঠেকাইয়া রাখা যায় না, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল; বিজয়রত্ন মজুমদার, শিশির-কুমার মিত্রের সঙ্গে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে আসিয়া জুটিলেন। কেবল চিরন্তন সাব-এডিটর কিরণকুমার রায় বৌটা-মহিমায় অবিচলিত-অব্যাহত রহিয়া গেলেন।

গোড়ার এই অমলবদল ও সোরগোল সত্ত্বেও “শেখরের ডালিং”-এ লিপিবদ্ধ আমার কাব্য-চিন্তা সফল হইতে বিলম্ব হইল না:

তার গর তুমি আবছা দেখিবে দাঁড়ারে নদীর পাড়ে
জলের তাড়নে একগাছি খড় দুরে চলে যায় ভেসে,
ভেসে চলে যায় পাগল চেষ্টারের মুখে;
বাড়াইয়া গলা দেখিবে, দেখিবে ক্রমে
জলের রেখায় খড়ের রেখাটি লীন,
দেখিতে পাবে না আর।

চাকরি ছাড়ার দিন বৈকালে সাহিত্যিক বন্ধুগোষ্ঠীর সান্নাধ্য আশাস ও প্রশংসাবাদের বিপুল উচ্ছ্বাস হইতে স্ট্যাণ্ডার্ড লিটারেচার কোম্পানির প্রসিদ্ধ দালাল বন্ধুবর শ্রীনিখিল দাস আমাকে একরূপ ছিনাইয়া লইয়া গেলেন। তাঁহার গাড়িতে তুলিয়া একেবারে উপস্থিত হইলেন গঙ্গাতীরে প্রিন্সেপ ঘাটে—নিম্নতে বসিয়া ভবিষ্যৎকর্মপন্থা নির্ধারণ করিতে হইবে। কি নির্ধারিত হইল, প্রথম খণ্ডের “সংগ্রাম” অধ্যায়ে তাহার আভাস দিয়াছি। পরিমল গোস্বামী আমার চাইতেও বিপন্ন, ছাপোষা লোক; তাহাকে স্থানচ্যুত করিয়া ‘শনিবারের চিঠি’র সম্পাদকীয় গদিতে বসানো উচিত বলিয়া মনে হইল না। স্বতরাং দুই দাসে মিলিয়া স্ট্যাণ্ডার্ড লিটারেচার কোম্পানির বই বেচিব—ইহাই স্থির হইল। চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউস্থিত “ভারত-ভবনে”র দোতলায় একটি ঘর ভাড়া লইয়া দাস অ্যাণ্ড কোং-এর আপিস ধোলা হইল।

সেই ১৫ই জানুয়ারির অপরাহ্নে ‘বন্ধু’ হইতে বিদায় লইয়া আসিলাম এবং সত্য সত্যই জলের তাড়নে একগাছি খড়ের মত দুরে ভাসিয়া গেলাম। পরবর্তী ২৩ জানুয়ারি তারিখে অধোদয়যোগেশ্বর স্নান-সমারোহ ছিল কলিকাতার গঙ্গার ঘাটে ঘাটে। নিখিল দাসের গাড়িতে আমি মুক্তি-

দান করিতে গিয়াছিলাম। ভিড় এড়াইবার জন্য হৃদয় তক্তা-ঘাটকেই বাহিয়া লইয়াছিলাম। তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। ঘাটের মুখেই অপ্রত্যাশিতভাবে ডট্টাচার্য মহাশয়ের সহিত মুখামুখি হইল। তিনি স্নান সারিয়া পট্টবাস পরিয়া ঋতুম পায়ের তাঁহার গাড়ির দিকে আসিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। আমি প্রশ্নাম সারিয়া মুখ তুলিতেই দেখি, তাঁহার চোখ ছলছল করিতেছে। অশ্রুগঙ্গাগদ কণ্ঠে বলিলেন, আপনি যে ভাল আছেন সে খবর পাই। তবু বলিতেছি, আপনি তুল করিলেন। ‘বন্ধু’কে কেন্দ্র করিয়া আমার মনে অনেক আশা ছিল, সে আশা আপনাকে দিয়াই সফল হইত। আমি জানি, একদিন আপনার তুল ভাঙিবে, সেদিন কিন্তু আমার নিকট ফিরিয়া আসিতে দেখা করিবেন না।

আমি অভিভূত হইয়াছিলাম, তথাপি বলিলাম, তুলটা যদি আপনার পক্ষেই ঘটিয়া থাকে এবং সেই তুল যদি আপনার ভাঙে—

—আমি আপনাকে মাথায় করিয়া লইয়া আসিব।

সেইরূপ কোনও ঘটনা ঘটে নাই বটে, তবে তিনি আমাকে বছবার তাঁহার বরাহনগরের আবাসে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। গভীর রাজি পর্যন্ত তাঁহার প্রাঙ্গণের বাধানো দীঘির চাতালে বসিয়া ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হইয়াছে; যে দৃষ্ট কল্প তেজ তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল তাহা অনেকখানি স্তিমিত ও স্নিগ্ধ হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু পুনঃসংযোগ আর সম্ভব হয় নাই।

কেতাজ্বরত আপিস, টেলিফোন, টাইপরাইটার এবং একখানা মোটরকার সত্ত্বেও দাস অ্যাণ্ড কোম্পানি দুই দাসের ধোরাকি জোগাইতে অক্ষম হইল। প্রধান নিখিল দাসেরই প্রয়োজন প্রচুর, স্বতরাং আমাকে ধীরে ধীরে আবার মুখিক হইয়া ২৫১২ মোহনবাগান রোয়ের গর্তে প্রবেশ করিতে হইল। মে মাস পর্যন্ত কোনও রকমে চলিল, আর চলে না।

ঠিক এই সময়ে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র দল নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের বিরুদ্ধে প্রচুর বিবোধগার করিতেছিলেন। স্বয়ং সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার নলিনীরঞ্জনের পক্ষে, কিন্তু কর্তৃপক্ষ সরকার-বিরুদ্ধ হওয়াতে তিনি নিরুপায়।

মাহুকের স্থখ-দুঃখ চাকার মতই আবর্তিত হয়, বাহা একবার ঘটে তাহার পুনরাবৃত্তিও হয়। সরকার মহাশয়ের চরিত্রগত অপবাদ কতকগুলি পত্র-পত্রিকার নিত্য-আন্দোলনের বিষয় হইতে দেখিয়া ‘শনিবারের চিঠি’তে পরিমলদা কোনও শুভমুহুর্তে এই সরকার-বিদ্রোহের তীব্র নিন্দা করিয়াছিলেন। ‘দৈনিক বঙ্গমতী’র “সাময়িক প্রসঙ্গে” একদা নিজে বঙ্কিম-প্রশস্তি লিখিয়া পরে যে পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন, পরিমলদার এই লেখাও আমার পক্ষে অল্পরূপ লাভজনক হইয়া বসিল। আসন্ন সপ্তকের মধ্যে বিমর্ষ হইয়া ২২রা জুন প্রাতে বসিয়া আছি হঠাৎ নলিনাক্ষ সান্ত্বালের মতই সত্যোক্তনাথ মজুমদারের আবির্ভাব ঘটিল। একথা-সেকথার পর বুদ্ধিমান তিনি আমার অনাক নিমজ্জমান অবস্থা ঠাহর করিয়া লইলেন। বলিলেন, তোমার তো দেখছি মেশিন নেই, কাগজ চালাতে হ’লে শুধু টাইপেই কাজ হয় না, মেশিন একটা সরকার।

আমি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলাম, সরকার তো, কিন্তু পাই কোথা? সত্যেন্দ্রদার মনে বাহা ছিল তাহা না ভাঙিয়া পরদিন প্রাতে তাহার বাসায় আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। তিনি তখন ‘রূপবানী’ সিনেমার ঠিক পিছনের একটা বৃহৎ ভবনের তেতলার একটা ফ্ল্যাটে অবস্থান করিতেন।

পরদিন ৩১ মে ১৯৩৫—নিদিষ্ট সময়ে গেলাম। বৈঠকখানা-ঘরে ঢুকিতেই মহামায়া নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের সহিত চোখাচোখি এবং নমস্কার-বিনিময় হইল। খাস ময়মনসিংহীয়া ভাষায় অনেক ধানাই-পানাই করিয়া সরকার মহাশয় যে প্রস্তাব করিলেন তাহা বিচিত্র। তিনি আমাকে অবিলম্বে একটা ফ্ল্যাট মেশিন খরিদ করিবার টাকা ধার দিবেন, আমি তাহার বীমা কোম্পানির বিজ্ঞাপন নিয়মিত লিখিয়া সে টাকা শোধ দিব। ইহাকেই বলে, ছগ্নর ফুঁড়িয়া ভাগ্যোদয়।

সেই দিনই বিপ্রহরে অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া হক-মার্কেটসম্মিহিত সমবায় ম্যান্ড্রাজ-এ হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেডের আপিসে দর্শন দিলাম। সরাসরি সরকার মহাশয়ের কক্ষে নীত হইয়া দেখিলাম, টাইপ-করা একটা নিয়োগ-পত্র আমার

জন্ত প্রস্তুত আছে, আমার মরজি ও অবসর মাসিক বিজ্ঞাপন লেখার কাজের জন্ত মাসিক বেতন দুই শত টাকা ধার্য হইয়াছে। কাজের লোক নলিনীবাবু, সই করিয়া নিয়োগ-পত্রটি আমার হাতে দিয়াই প্রস্থ করিলেন, একটা ভাল পুরাতন মূল্যায়ন খরিদ করিতে কত টাকা লাগিতে পারে? আমার পূর্ব-পরিচিত ইণ্ডো-স্ট্রাইস ট্রেডিং কোম্পানির শ্রীযতীন চইয়ের সহিত এখানে আসিবার পথেই কথা বলিয়া আসিয়াছিলাম—একটা পুরাতন চালু ডবল-ক্রাউন রেকর্ড মেশিন মোটরহুক বজ্রিশ শ টাকায় পাওয়া যাইবে। অন্ত্যন্ত আত্মযজ্ঞিক খরচা ও কিছু নতুন টাইপের মূল্য খরিদা বলিলাম, মোট সাড়ে চার হাজার টাকা হইলেই চলিবে। নলিনীরঞ্জন বিনাবাক্যব্যয়ে একটি তিন হাজার টাকার চেক লিখিয়া আমার হাতে দিলেন, বলিলেন, বাকি টাকা মেশিন ডেলিভারির পর দিবেন। এই প্রসঙ্গ চুকাইয়া ঘণ্টা টিপিতেই বিজ্ঞাপন-বিভাগের একজন কর্তব্যবক্তির আবির্ভাব হইল, তিনি আমাকে হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানির কিছু ইংরেজী বিজ্ঞাপনী-পুস্তিকা দিয়া তাহাই অবলম্বনে মাতৃভাষায় একটি পুস্তিকার মত উপকরণ প্রস্তুত করিতে বলিলেন। নিয়োগপত্র, চেক ও কাজের নির্দেশ লইয়া হর্ষোদ্বেল চিত্তে বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

কিন্তু মেশিন বসিবার মাসাধিক কালের মধ্যেই এই নিয়োগ-পত্রের স্বরূপ প্রকাশ পাইয়া আমাকে বিচলিত করিল। সরকার মহাশয়ের নির্দেশমত তখন একটা টেলিফোন লইয়াছি। তাহারই মাধ্যমে সরকার মহাশয়ের গোপনকক্ষে আহূত হইয়া প্রথম যেদিন বৃত্তিতে পারিলাম আমাকে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র বিরুদ্ধে লেখনী-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইবে, সেই দিনই আমার মাথায় আকাশ-ভাঙিয়া পড়িল। তিন হাজার এবং বাকি দেড় হাজারও তখন লওয়া হইয়া গিয়াছে। আমি বিনীতভাবে নিবেদন করিলাম, প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আমি লিখিতে পারি, কিন্তু কোনও ব্যক্তির পক্ষসমর্থনে লেখনী ধারণ করিতে আমি অক্ষম। নলিনীরঞ্জনের হতাশাব্যঞ্জক প্রাদেশিক উক্তি এখনও আমার কানে বাজিতেছে—তাহা হইলে আপনাকে লইয়া আমি কি করিব? আমি কোনও আশাপ্রদ জবাব দিতে পারিলাম না। স্বরেশচন্দ্র মজুমদার, প্রফুল্লকুমার

সরকার, মাখনলাল সেনকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া থাকি, তাঁহারাও আমাকে স্নেহ করেন। কুৎসার জ্বাবে তাঁহাদের বিরুদ্ধে কুৎসা করিতেই হইবে। আমি তাহা পারিব না।

নলিনীরঞ্জন ঠিক ছেলোমাহুয়ের মত বলিয়া উঠিলেন, তাহা হইলে আমার টাকাটার কি হইবে? বলিলাম, তাহা তো মেশিন জন্মেই ব্যয় হইয়া গিয়াছে, অবিলম্বে ক্ষেত্রত দেওয়া সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত নলিনীরঞ্জন-সহোদর পবিত্ররঞ্জন সরকার মহাশয় আমাকে অ্যাটর্নি হীরেন্দ্রনাথ দস্তের আপিসে লইয়া গেলেন, শত-করা নয় টাকা হুদে লাড়ে চারি হাজার টাকার ঋণ-পত্র প্রস্তুত হইল, ঋণদাতা হইলেন পবিত্ররঞ্জন সরকার মহাশয়। শোধ না হওয়া পর্যন্ত শনিরঞ্জন প্রেস তাঁহার নিকট বাধা থাকিবে। চারি বৎসরের মধ্যে সমুদয় ঋণ হুদসহ পরিশোধ করিতে হইবে। ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ চুক্তি-পত্রে স্বাক্ষর করিলাম।

কাকি দেওয়ার সুযোগ সত্ত্বেও আমি নির্বিবাদে এই কঠিন দায় স্বীকার করিয়া লইলাম বলিয়া সরকার মহাশয়ের সবিশেষ শ্রদ্ধা অর্জন করিলাম। তিনি আমাকে নিজেই একদিন টেলিফোনযোগে জানাইলেন, যদি কোনও দিন কোনও প্রয়োজন হয় তাঁহাকে জানাইতে যেন বিধা না করি। তাঁহার কথা তিনি রাখিয়াছিলেন। তিনি যখন দিল্লীতে, তখন একবার কাগজ-সংক্রান্ত বিপদে পড়িয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলাম। তিনি তৎপর হইয়া আমাকে বিপদ মুক্ত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম তাঁহার আপিসকেও তিনি নির্দেশ দিয়াছিলেন, ‘শনিবারের চিঠি’তে কোম্পানির বিজ্ঞাপন বরাবরই চলিতে থাকিবে। প্রসঙ্গত এখানে বলিতে পারি, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই ঋণমুক্ত হইয়া আমি সরকার মহাশয়ের আরও স্নেহের পাত্র হইয়াছিলাম।

অঘটনঘটনপটীয়ান ভাগ্যের খেলায় বেকার হওয়ার সাত মাসের অর্থাৎ ১৯৩৫ সনের ১৫ই আগস্টের মধ্যেই অবলীল্যক্রমে যখন একটি মেশিনসহ সম্পূর্ণ ছাপাখানার মালিক হইলাম তখন মাথায় ভাবনা চুকিল, মেশিন চলিবে কি করিয়া! ‘শনিবারের চিঠি’র কাজ তখন যৎসামান্য,

রঞ্জন পাবলিশিং হাউসের বই ছাপার কাজও কাগজ-কেনার অর্থাভাবে বন্ধ। মেশিনের জন্ত বেশি মাহিনায় এক জোড়া লোক নিযুক্ত করিয়াছি, কম্পোজিংয়ের লোকও বাড়াইতে হইয়াছে। অথচ দিনের পর দিন উপর নীচ করিবার সময় স-সাগরের ওস্তাদকে মেশিনের পাটাতনের উপর মলাটের কাগজ বিছাইয়া যখন নিশ্চিন্ত আয়ামে নিদ্রা যাইতে দেখি, তখন সেই দৃষ্ট নয়নে মধুবর্ষণ করে না।

তথাপি ঋণ করিয়া হইলেও স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবার একটা আনন্দ আছে। সম্পাদক পরিমল গোস্বামীর উপর সত্যকার পরিচালকত্বে প্রতিষ্ঠিত না হইলেও তাঁহার কল্যাণে ক্ষুদ্রকুঁড়া কিছু কিছু পাইতেছিলাম। শেষ পর্যন্ত তিনিই সাহিত্যিক ইঞ্জিনীয়ার কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্যকে জুটাইয়া আনিলেন। সে কাহিনী পরে বলিব।

গুরুতর সঙ্কটের মধ্যেও মন যে অনেকখানি হালকা হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ চুক্তিবদ্ধ ঋণভার মাথায় লইয়াই ১৬ই নবেম্বর তারিখে পাটনা প্রভাতী-সংঘের উদ্যোগে অহুষ্ঠিত প্রবাসী-বন্ধ-সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার জন্ত রওয়ানা হইলাম। প্রকৃতপক্ষে ইহাই সাহিত্য-সভায় আমার প্রথম পৌরোহিত্য-ক্রিয়া। পূর্বে ‘বঙ্গভূমি’তে থাকাকালীন তিনবার জীড়াচ্ছিলে সাহিত্যমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল; প্রথম, ঠাঁর-রঙ্গমঞ্চে ‘মানমণী গার্লস্ স্কুল’-অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পুরস্কার-বিতরণী সভায়; দ্বিতীয়, ডায়মণ্ডহারবার-সম্মিহিত সরিষা গ্রামের এক উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের হল-ঘরে অহুষ্ঠিত সভায়। ভট্টাচার্য মহাশয় বাল্যে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, তাঁহারই আদেশে আমাকে যাইতে হইয়াছিল। সঙ্গে ছিলেন উৎসবে বাসনে তো বটেই, বহুবিধ সঙ্কটে আমার একমাত্র সঙ্গী বন্ধুবর সুবলচন্দ্র। ইহার পর সহস্রাধিক সভায় সভাপতি বা প্রধান অতিথিরূপে যোগ দিয়াছি, কিন্তু সরিষার এই প্রথম সভায় উৎকট-অভিজ্ঞতা বিস্তৃত হইতে পারি নাই। স্বরণ আছে আমার কুমারী-ভাষিকায় (মেডেন স্পীচ) একটি বাক্যই বার বার আবৃত্তি করিতে করিতে সমস্ত মঞ্চটা পরিক্রমণ করিয়া কিরিয়া-ছিলাম। সুবলচন্দ্রের আশ্বাস-দৃষ্টি আমার উপর নিবন্ধ না থাকিলে সেই দিন বোধ হয় মুছিত হইয়া পড়িতাম। ঘামে

সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছিল, ধর ধর করিয়া কাঁপিতেছিলাম। সভাশেষে যে দক্ষিণী ব্যবহার ভাগ্যে জুটিয়াছিল তাহা স্মরণ করিলে আজও হৃৎকম্প হয়।

আমার তৃতীয় কীর্তি কলিকাতার অ্যালবার্ট হলে—স্বামী বিবেকানন্দের একটি স্মৃতিসভায়। মৌখিক ভাষণ দিতে আর সাহস হয় নাই, গুণ ভূমিকাসহ একটি কবিতা লিখিয়া পাঠ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাও কম্পিতকলেবরে।

পাটনার সভা (১৭ নবেম্বর) আমার জীবনে প্রথম উল্লেখযোগ্য সভা, স্মরণ্য প্রস্তুত হইয়া ভাষণ ছাপাইয়া লইয়া গিয়াছিলাম। যোগাযোগ ঘটাইয়াছিলেন রতীনদা—রতীন হালদার মহাশয়। সাহিত্য ব্যাপারে সেই আমার প্রথম মুক্তপক্ষবিহার। তারানন্দর ‘আমার সাহিত্য-জীবনে’ এই সভার কথা বিশদভাবে লিখিয়াছেন। আমিও তাঁহার সাহায্যই এখানে গ্রহণ করিতেছি—

“প্রভাতী-সন্ধ্যার প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠান। আমি আছি এখানে। আর ওরা নিমন্ত্রণ করেছে শ্রীমঙ্গলীকান্ত দাসকে, বনকুলকে এবং শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে। রতীনদা উৎসাহিত করেছেন। শচীমামা [পাটনার ব্যাধিষ্ঠার শচীন্দ্রনাথ বহ] বলেছেন, খুব ভাল, আন, আন। জমিরে তোলা আসর।...”

শ্রীযুক্ত মঙ্গলীকান্ত সভাপতি হিসেবে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। আমি ওখানে ছিলাম। আর নিমন্ত্রিত হলেন ভাগলপুরের বনকুল, বুলেরের শ্রীযুক্ত শরদিন্দুবাবু। বাঙালী-সমাজে বেশ সাড়া পড়ে গেল।...

মঙ্গলীকান্ত বনকুল এসে উঠলেন মণি সমাদ্দারের ওখানে। স্বর্গত বোগীন্দ্র সমাদ্দার মশায়ের প্রশস্ত লাইব্রেরি-ঘরে তাঁদের টাই হয়েছিল। মনে পড়েছে, বনকুল-সপ্তাহ তিনেকের মধ্যেই একখানি উপস্থাস—তাঁর প্রথম উপস্থাস ‘কৃষ্ণপদ্ম’ লিখে শেষ করেছিলেন। সকালবেলায় পেলাম, বনকুল গড়া শুরু করলেন। তাঁর প্রথম উপস্থাস, তার উপর রই সবলদেহ বলাইচাঁদ। সতেজকণ্ঠে আবেগের সঙ্গে পড়ে গেলেন।...

বই শেষ হতে বাজল ঘুটা।

বাড়ি এসে ষাওয়া-খাওয়া করছি, এমন সময় খবর এল, যে বেহার ক্রাশনাল কলেজ-হলে সম্মেলন হওয়ার কথা, সেখানকার কতৃপক্ষ খবর পাঠিয়েছেন—তারানন্দর বাবু রান্নানৈতিক অপরাধে কাবারগে দণ্ডিত ব্যক্তি, তাঁকে কলেজ-হলে বহুতা করতে দিলে কলেজের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে, স্মরণ্য তাঁকে বাদ দেওয়া হোক অথবা আই. বি. পুলিশের কাছে বখারীতি আত্মমতি দেওয়া হোক।

মঙ্গলীকান্ত, বনকুল, শরদিন্দু বললেন, তারানন্দকে যোগ দিতে না দিলে আমরা যোগ দিতে পারি না।

মণি সমাদ্দারের দলটি ব্যাকুল হয়ে উঠল—কি হবে?

রতীনদা একবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, এ হতে

পারে না। প্রিন্সিপ্যালের কাছে কেউ গিয়ে নানা ভুরো সংবাদ দিয়ে ভুল বুঝিয়ে এই কাণ্ড করেছে। এবং কে করেছে সে আমি জানি।

টেবিলটার ওপর তিনি এচও একটা মুঠামাফত করলেন।

বেশ গরম হয়ে উঠল বাঙালী-সমাজ। বিপদে পড়ল তরুণ ছেলে করটি। আমি নিজে হলাম বিব্রত। আমার বড়মামার রাগ সবচেয়ে বেশি। ওই শচীমামাই তখন হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললেন, আরে, এ নিয়ে এত রাগারাগি কর কেন? হৈ-চৈ কেন? চল, আমরা কখন বাই প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের কাছে। দেখি কি বলেন তিনি।

আসল প্রিন্সিপ্যাল স্বর্গীয় ললিতবাবু তখন অহুশে শয্যাশায়ী। তাঁর জায়গার কাজ চালাচ্ছেন ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল জনাব মৈতৃন্দিন সাহেব। ললিতবাবু, যতদূর মনে পড়ে, শচীমামাদেরও শিক্ষক ছিলেন। শচীমামা ও আর দু-তিন জন গেলেন এবং আশ ঘটায় মথোই সব গুণগোল মিটিয়ে দিলে এলেন। সেই বকীর ভক্তিতে খেমে খেমে ঝোঁক দিয়ে দিয়ে বললেন, নাও, এইবার কি বলে—আসর পাট। শুরু করে দাও গাওনা।

গাওনাই বটে। সে এক ভয়ঙ্কর আসর। আজ যত দূর মনে হচ্ছে তাতে হলধান ছিল মস্ত বড় এবং ঘরধানার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত লোকে ঠাসা। লোকগুলি প্রবাসী-সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং ছাত্র-সমাজের ভাল ছেলেব দল। সত্যিকারের তুলা নিয়ে এসেছে। আজকের দিনে বলাচাঁ বাহিনী হবে না যে, লোকের কাছে সেদিন সবচেয়ে বড় উৎসুক ছিল মঙ্গলীকান্ত সম্পর্কেই। ‘শনিবারের চিঠির’ তীব্র তীক্ষ্ণ সমালোচনার তখন আধুনিক সাহিত্য-ক্ষেত্র প্রায় হিন্নত্ম, তিনি তখন সম্ভ্রমজ্ঞানী বীরের মতই গৌরবান্বিত। তখন ‘কলোলে’ শুরুর আধুনিক সাহিত্যের অভিসান প্রায় ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। ‘কলোলে’, ‘কালিকলম’, ‘ধূপছায়া’ উঠে গেছে, এমন কি শনিবারে বের-হওয়ার চিঠির প্রসার রূপে রবিবারে যে লাঠি বেরিয়েছিল সে লাঠিতে ঘুণ ধরে ভেঙে গেছে। ওই সময়ের লেখকদের মধ্যে শৈলজ্ঞানন্দ এবং প্রবোধ সাম্রাণ ছাড়া সবলেই যেন সাময়িকভাবে কলম ধামিয়েছেন। মঙ্গলীকান্ত তখন সম্মুখবাহিনী ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে পিছনের রবীন্দ্রের আক্রমণোচ্চারণের আভাস দিয়েছেন।

সত্যি কথা হলতে কি, লোকে দুঃখও অনুভব করে, আবার ‘শনিবারের চিঠির’ মারের চাতুর্ষ দেখে তারিক করে না হেসেও থাকতে পারে না। সেই মঙ্গলীকান্ত কি বলবেন! এক দল তাঁকে বলে—কালপাহাড়, সব ভেঙে-চুরে দিলে, বিগ্রহজলোর নাক কেটে বিকৃত করে কেলেলে। বলে অবশ্য গোপনে। তবে মারের তারিক করে—হ্যাঁ, মার বটে।

আর একদল বলেন—হ্যাঁ, বলশালী সংস্কারক বটে।

বাই হোক, সে দিন মঙ্গলীকান্তের বক্তব্য শুনে লোক জিড় করে এসেছিল। প্রবীণ মধুরবাবু থেকে মণি-দলের গয়ের দল পর্যন্ত।

মঙ্গলীকান্ত আধুনিক সাহিত্যকে গাল দিয়ে শরৎচন্দ্র সম্পর্কেও হুকটোর মন্তব্য করে বললেন। তাঁর সেই সময়ের লেখা ‘পথের দাবি’ ‘শেষপ্রণ’ প্রভৃতি ওই বরনের লেখাগুলি সম্পর্কে বলেছিলেন—পল্লী-

সমাজের দানার্থীকর মুদ্রির দোকানে বসিয়া খেলো হ'কার তামাক খাইতে খাইতে পল্লীস্বাভাবের গল্পে আসর মাত করিয়াছেন, কিন্তু বেই তিনি খেলো হ'কা ছাড়িয়া ও মুদ্রির দোকান কেলিয়া বালিগঞ্জের ড্রয়িংরুমে দোকান-সেটিতে হেলান দিয়া পাইপ টানিতে টানিতে গল্প বলিতে গিয়াছেন অমনি হাড়াপাড়া হইয়াছেন, নাজেহাল হইয়াছেন, গল্প গল্প না হইয়াই মাঠে মায়া গিয়াছে।

কথাগুলি ঠিক এই কথাই নয়, আমার স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে দিলাম। স্মৃতির উপর বিশ্বাস আছে।

সঙ্গীকান্তের এই উক্তি সঙ্গ সে কি হাততালি। ঘরখালা যেম কেটে গেছিল। আশ্চর্যের কথা, কেউ তাঁকে এ নিয়ে প্রশ্ন করে নি। উল্লসিতই দেখেছিলাম সকলকে।...

আমি কিন্তু একটু আঘাত পেয়েছিলাম সঙ্গীকান্তের এই উক্তিতে। বিষয় হয়েছিল।

পাটনা হইতে অনেকখানি সাহস ও গর্ব লইয়া কিরিয়া আসিলাম। কলিকাতায় আসিয়াই দেখিলাম, 'বাতায়ন' সাপ্তাহিকে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল আমার বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ-বোষণা করিয়াছেন, শরৎচন্দ্রকেও তিনি কম তাড়াইয়া তোলেন নাই। ইহার ফলেই সেই বৎসর ডিসেম্বর মাসে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের চিত্র-প্রদর্শনীতে শ্রীঅতুল বসু-অঙ্কিত আমার তেলরঙা পোর্ট ট্রানি দেখিয়া শরৎচন্দ্র শ্রীঅতুল বসুকেই বলিয়াছিলেন, "দেখেছ, লোকটার চোখে পাগলের দৃষ্টি, একেবারে পাগল। হবে না, ওর মা যে পাগল ছিলেন।"

এই পাটনা-সফরে শুধু যে আত্মবিশ্বাসই অর্জন করিয়া কিরিয়াম তাহা নয়, পরিমলনা এবং পত্রিকা-সংক্রান্ত চিঠি-পত্রের মারফতে বনফুলের সহিত পূর্বলব্ধ পরিচয় যতটুকু ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল, দুই দিনের সহবাসে তাহা ঘনিষ্ঠতম বন্ধুত্বে পরিণত হইল। সেই পরিচয়ই ক্রমশ পারিবারিক আত্মীয়তার সহযোগে দুই সাহিত্যিক বন্ধুকে একাত্ম করিয়া তুলিয়াছে—১৯৩৫-এর পাটনা-সফর যে সার্থক হইয়াছে ১৯৫৫-এ তাহা বলিতে পারিয়া কৃতার্থ হইতেছি।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিতও এইখানেই সাক্ষাৎ-পরিচয় ঘটিল। মধ্যে 'বঙ্গভী'র আর্মলে তিনি একবার আমাকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। নিজের ভালুককে জাল "চন্দ্রহাস" সাজাইয়া 'বঙ্গভী'র আপিসে পাঠাইয়া পরিহাসবিজ্ঞানিত একটা নাটকের সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু আমার সাহিত্য-সংক্রান্ত কঠিন

জেরায় ধরা পড়িবার পূর্ব-মুহূর্তেই নকল শরদিন্দু এবং আসল শালা পলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া শরদিন্দুর সহিত আলাপ অচিরাত্ জমিয়া উঠিল। পাটনার সভায় পঠিত তাঁহার বিখ্যাত গল্প "তিমিঙ্গিলে"র পাণ্ডুলিপির সঙ্গে বিদগ্ধজনহুলত তাঁহার মার্জিত সরস বন্ধুত্বও অর্জন করিয়া আসিলাম।

১৯৩৫ সন সত্য সত্যই আমার সর্বপ্রকারে আত্মস্থ হইবার বৎসর। প্রথম মাসেই চাকরির ময়রপুচ্ছ ছাড়িয়া "ভারত-ভবনে" কিছুকাল ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত কাকল্পপেই কা-কা করিয়াছিলাম, বৎসরের শেষের দিকে শেষ পর্বস্ত মুষিকের মতই আপন গর্তে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল; নলিনীরঞ্জনর অযাচিত ঋণদাক্ষিণ্যে সে গর্ত ক্রমশ প্রশস্ততর অর্থাৎ হাত-পা ছড়াইয়া বাসের উপযুক্ত হইতেছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বৈষয়িক প্রত্যাবর্তন পারিবারিক এবং আধ্যাত্মিক প্রত্যাবর্তনের তুলনায় কিছুই নয়। সে প্রত্যাবর্তন সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইয়াছিল ৩১ ডিসেম্বর মধ্যরাত্রিতে ঘণ্টাবংশীধ্বনিযোগে বৎসরের শেষদিনের সমাপ্তি ঘোষিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে। চৌরঙ্গীর একটা হোটেলে আমরা কয়েকজন নানা বিচিত্র টুপি মাথায় নৈশাহার সমাপ্ত করিয়া নিকটবর্তী একটি সিনেমায় দক্ষিণ-সমুদ্র-দীপপুঞ্জের একটি কাহিনী-আশ্রিত 'টাবু' ছবিটি দেখিতেছিলাম। হঠাৎ মনে ও মেহে একটা বিচিত্র বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। নিবাতনিকম্প দীপশিখার মত বৃদ্ধ গ্রামপ্রধানের মুখের অবিচলিত দৃষ্টি আমাকে যেন বিদ্ধ করিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, নিয়তির অমোঘ দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ হইয়াছে। আর ছবি দেখিতে পারিলাম না। সঙ্গীদিগকে বিচলিত বিস্মিত করিয়া চিত্রগৃহ হইতে একাকী নিষ্কান্ত হইয়া একটা ট্যাক্সিযোগে বাড়ি আসিয়া পৌছিলাম। যদিও যথেষ্ট ক্লান্ত পরিশ্রান্ত বিপর্যস্ত ছিলাম, তথাপি ঘুম আসিল না। ভীত উৎকণ্ঠিত গৃহিণীকে আশ্বস্ত হইয়া ঘুমাইতে বলিলাম। বলিলাম, কবিতাদেবী স্বপ্নে ভর করিয়াছেন; তিনি ঘাড় হইতে না নানামিলে ঘুম আসিবে না। লিখিতে বলিলাম। লেখা যখন শেষ হইল, আশেপাশের মিলগুলি প্রলম্বিত বংশীধ্বনির দ্বারা পুরাতন বৎসরের সমাপ্তি এবং নববর্ষের শুভাগমন ঘোষণা করিল। 'রাজহংস'র সর্বশেষ কবিতা "আকাশ-

সাগর" রচনার ইহাই ইতিহাস। বাহা আমি প্রকাশ
করিয়া বলিতে পারিতেছি না—বাহা নিষিদ্ধ এবং অব্যক্ত,
তাহার পূর্ণ ইঙ্গিত এই কবিতাতেই। সহস্র পাঠক খুঁজিয়া
পাইবেন। এক সম্পূর্ণ নূতন বিচিত্র আধ্যাত্মিক অমৃত্যুতির
দ্বারা এই কবিতা ওতপ্রোত হইয়া আছে। আমার কাব্য-
জীবনপ্রবাহের উজ্জ্বলতম তরঙ্গের ইহা একটি—

অন্ধশবে দেবী, তোমারই চরণতলে
জঙ্ঘা-শেষের অর্ঘ্য আমিহু বহি;
বিপক্ষে ঘুরিয়া তোমাতে আমার সমাপ্ত পথচলা।
জননী-জঠরে আমার অতীত, নমো নমো নমঃ—স্মি আমি জননীকে,
নমো নমো নমঃ, তোমার গর্ভে আমার ভবিষ্যৎ।
দাঁড়িয়েছি করজোড়ে,
বুঝিতেছি, কেমন শিবশব্দ বন্ধ পাতিয়া বসিল শিবানীরে।
নীলকণ্ঠের বিবপান করি তুমি দেবী, তুমি কাণী সে ভয়ঙ্করী,
নমামি দ্বিগুণরী,
মহানাগরের আবরণ শুধু অসীম আকাশ আছে।

ভুল করে দেবী, সাগর-স্রগ দেখিয়াছি গোম্পে,
সাগর দেখেছি কুপ বাপী সরোবরে;
মিব রিষ্টের কুলুকুলু অলে কখনো দেখেছি ফেলিয়াছে কীপ ছায়া
অতি লম্বু মেঘ—মেঘ'সে চপল অতি।
আমার আকাশ ঢাকিয়া গিয়াছে অকারণ কালো মেঘে,
আকাশে সাগরে ঘটিয়াছে ব্যবধান।

ব্যবধান আজ ঘুচিয়াছে, দেবী, আমি আসিয়াছি মন্ত্রনে ভরে ভরে,
দাঁড়িয়েছি করজোড়ে—
ভবিষ্যতের তমসাতীর্থে প্রান্ত পথিকে দেবী,
তুমি লয়ে চল অসহায় হাত ধরি;
অনাগত সেই তিমিরে মিশাও অতীত অন্ধকার।
বত'মানের বিজলি-বলক মাঝে
ব্রাসে কেঁপে উঠি তুমি আর আমি কত বার বার দেবী,
ভুল করিয়াছি জড়াতে পরশরে,
বহু প্রান্তিতে উঠিয়াছে হলাহল—
সেই হলাহল একেলা করেছি পান।

আজ বেলাশবে বিবজ্জর আসিয়াছি আমি তব সন্ধিরধারে,
বত'মানের যুতদীপালোকে, হে দেবী, আমার হাতখামি তুমি ধর।

ভবিষ্যতের দীপ আলি দিয়া তুমি আর আমি নিঃশেষে যাব মরি,
পুড়ে ছাই হবে হতাশ বত'নাম;
অতীতে হইবে লীম।
সেই অতীতের আধারগর্ভ হতে
অন্ধনয়ন মেলিয়া দেখিব ভবিষ্যতের তমসাসিকুলে
সারি সারি সারি আলিছে বাসনাধীপ,
চলে আমাদের পূজারতি ঘেম মহাকাল-মন্দিরে।

হে দেবী, যে পথে নামিয়া এসেছি হিমাংস-চূড়া হতে
উপলব্ধের নিবন্ধ-কুলে-কুলে,
সেই পথ কবে হারায়ে গিয়াছে অরণ্যপ্রান্তরে।
তোমাতে আমাতে অপরিচয়ের বেধা হ'ল বার বার,
বার বার ছাড়াছাড়ি।
বেলাশবে আজ ছোট গ্রামখানি, তোমাতে পড়িল মনে।
অন্তরবির রঙ ঘরিয়াছে দূর বনানীর শিরে,
একা তালগাছ দাঁড়াইয়া আছে সীমাহীন প্রান্তরে।
ঘট কাঁধে তুমি চলিয়াছ একা সরোবরে বাঁধাবাটে,
সীমন্তে সিন্দূর—
চিতার আশ্রয় সন্ধ্যা-অন্ধকারে।
রৌদ্র-পীড়িত দিবস আমার, তপ্তপথের ধূলিধূসরিত আল।
সরোবর-নীরে যেন হুণীতল হ'ল;
তোমাতে প্রণাম করি
দেবতারে মোর কখনা করিলাম।

সন্ধ্যা নামিল, আমি শেব কর দেবী,
ভুলসীমকে আলিতে হইবে দীপ—
আমি রব' পিছে পিছে,
করজোড়ে শুধু রহিব দাঁড়ানে উঠানের এক ধারে।

প্রণাম সারিয়া উঠিবে বধন তুমি,
দেখিতে পাইবে আমার আকাশে সারি সারি দীপ আল,
তোমার সাগরে যুগ যুগ ধরি কাঁপিবে তাহারি ছায়া।

জন্মদিনে

শ্রীকালিদাস রায়

আজি মোর জন্মদিন—কেহ নাহি জানে।

এই দিনে স্মরি শুধু মোর ভগবানে,

যাঁর করুণায়

আরো এক জন্মদিন পেলাম ধরায়।

এর লাগি লাগে নাকো কোন অহুষ্ঠান,

কথা নয় করিবার কারেও আহ্বান।

নিভৃতে স্মরিতে হয় যারে

তাঁর নামে ডাকিব কাহারে ?

পূজা নয়, ঘটা নয়, নয় নিমন্ত্রণ,

কাহাকেও নাই প্রয়োজন।

আজি মোর জন্মদিন। পরিজনগণ

তাহারাও জানে নাকো। ভালে মোর কুসুম-চন্দন

কেহ তাই আঁকে নিকো। তাঁরে শুধু প্রণাম করিয়া

ধরার ধুলার ঢাকা এ ললাটে নিয়েছি পরিয়া।

একে একে যাত্রাপথে সাথীরা আমার

হইয়াছে ভবনদী পার,

বাঁচি-মরি করিয়াও আঁকো আমি আছি

যাহার বিধান, তাঁর রূপা শুধু যাঁচি

জন্মদিনে তাঁরই পানে হাতটি বাড়াই,

খেয়াঘাটে-ঘেতে যেন বনমাঝে পথ না হারাই।

মানে মানে ভালোয় ভালোয়

যেন পার হতে পারি আলোয় আলোয়।

মেঘ নেমেছিল

মহাজন্য নাইতি

এখানে শহরতলী। মেঘেদের অবাধ বিস্তার

ঢেকে দেয় বহু দূরে গ্রামের আঁধার

শিরীষ ও সুপারির বন।

কাল রাতে এখানে কখন

মেঘ নেমেছিল। আঁধার তার

সব চিহ্ন মুছে গেছে গাছের পাতার।

কাল রাতে মেঘ যদি ভেঙে ভেঙে ঝরে যেত ঘাসে

আমাদের জানালার পাশে

ঘরের চেয়ারে কিংবা পড়ার টেবিলে

বাতাবি-লেবুর বনে,

তা হ'লে অনেক খুশি জমা হ'ত ধূসর ক্ষেতের মনে।

মেঘ করেছিল কাল, বৃষ্টি হয় নাই

কেবল আকাশ জুড়ে বেজেছিল ঝড়ের সানাই।

শহরতলীর ধারে। কখন আকাশে

বিকেল ফুরিয়ে গেলে মেঘেদের শেষ খেয়া আসে,

ছায়া তার ঢেকে দেয় গ্রামের—চরের বন

তোমাদের আমাদের নিভৃত জীবন।

বৃষ্টি যদি নাও আসে তবুও মেঘের আনাগোনা

এখানে কি কোন স্মর কোন গান যাবে নাকি শোনা ;

একটি মেঘলা সন্ধ্যা থেমে গেলে সাগরের দীপে

জীবনের কোন আলো জ্বলবে না রাতের প্রদীপে।

তাই বোন দুজনেরই ভাস খেলায় দারুণ উৎসাহ। অমূল্য প্রায় নামকরা খেলোয়াড়—একবার ব্রিঙ্-টুর্নামেন্টে সেমি-ফাইনাল পর্যন্ত উঠেছিল। দাদার মত না হ'লেও নমিতাও কম যায় না—সে-ও বাহাদুরানা ভাসের হিসেব গড়গড়িয়ে ক'রে ফেলতে পারে।

মূলকিলে পড়েছে বাকি দুজন—অমূল্যের স্ত্রী রেখা আর নমিতার স্বামী অসিত।

রেখার বাবা বাড়ির ত্রিসীমানায় কোনদিন তাকে ঘেঁষতে দেন নি, ওই কর্মনাশা খেলাটাকে ছু চক্ষে দেখতে পারতেন না তিনি। তাই রেখারও ভাস দেখলে গায়ে জ্বর আসে। অমূল্য অবশ্য চেষ্টার ক্রটি করে নি—রেখাকে চলনসই রকমের খেলাও অন্তত শেখাবার জন্য লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিয়েছে, কি ভাবে কল 'ওপন' করতে হয় আর 'লীড' দেবার নিয়মই বা কি—চার ভাগে ভাস সাজিয়ে দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছে, এমন কি কালবার্টসনের বই পর্যন্ত পড়িয়েছে। কিন্তু রেখার বিশেষ উন্নতি হয় নি, এখনও সে হয়তন আর ইন্ডাবনের মধ্যে গোলমাল ক'রে ফেলে।

অমূল্য মধ্যে মধ্যে চ'টে ওঠে : এত ক'রে যে বলি, কিছুই শুনতে পাও না না কি? না, এক কান দিয়ে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়?

রেখা করুণ হয়ে বলে, কি করব, কিছুতেই মনে থাকে না। সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়।

গোলমাল হয়ে যায়? আরও চটে অমূল্য : এতটুকু ম্যাথামেটিক্যাল ব্রেনও যদি না থাকে, তা হলে বি. এস-সি. পাস করলে কি ক'রে?

ভাস খেলা বুঝতে পারে না তবু বি. এস-সি. পাস করেছে, নিজের কাছে অপরাধের মতই মনে হয় রেখার; কিন্তু কিছুতেই কিছু হবার নয়। একবার অনেক ভেবে চিন্তে যদিই বা খানিকটা বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে ফেলল, কিন্তু ঠিক পর-মুহূর্তেই হয়তো এমন একটা কাণ্ড ক'রে বসে যে, রেগে-মেগে শুধু নাচতে বাকি রাখে অমূল্য।

অসিতের অবস্থা আরও করুণ। ফিলসফিতে ফার্স্ট ক্লাস

পাওয়া স্বামী আই. এ. ফেল জীবর কাছে বার বার থিকার শোনে : আচ্ছা, তুমি কি! দেখছ নো ট্রান্স্প'সের খেলা—

মাথা চুলকে অসিত বলে, এর পরে আর ভুল হবে না—ঠিক বলছি।

পৌরুষে যা লাগে, মধ্যে মধ্যে অন্তত 'সিরিয়াস' ভাবে অসিত খেলাটাকে অহুধাবন করতে চেষ্টা করে। কিন্তু পোস্ট-গ্র্যাডুয়েটে পড়বার সময় সেই প্রথম সিগারেট খাওয়ার যুগে ভাস খেলা শিখতে গিয়ে যা ঘটত, আজও তারই পুনরাবৃত্তি চলে। খেলতে খেলতে কখন চোখ বাইরে চ'লে যায়, ইউনিভার্সিটিতে পড়ার দিনে যেমন জানলা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে শিরীষপাতায় রোদের ঝিলিমিলি দেখত—এখনও তেমনি তাকিয়ে দেখে নীল পাহাড়টার মাথায় পালে পালে সাদা মেঘ এসে কেমন করে জড়ো হচ্ছে।

চমক ভাঙে নমিতার চিংকারে।

এ কি করলে, কল ছেড়ে দিলে? আমাদের যে পাঁচটার খেলা হয়ে যেত।

অসিত দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আরও পুরো এক মাস এই যম-যন্ত্রণা সহিতে হবে তাকে। গরমের ছুটিতে দার্জিলিংয়ের এই চা-বাগানে বেড়াতে আসবার সময় অনেক কাব্য আর কল্পনা ছিল মনে। কিন্তু স্পেড যে এমন ক'রে কোদাল হয়ে তার মাথায় পড়বে আর হার্ট এমন হৃদয়হীনভাবে তার হৃদয় বিদীর্ণ ক'রে দেবে, সে ভয়াবহ সম্ভাবনার কথা কে ভেবেছিল তখন।

এক দিকে মংপুর সিন্ধুকোনা প্ল্যাটেশন, অল্প দিকে ঘন কুয়াশা আর নিবিড় জাপানী পাইনের অরণ্য দিয়ে ছাওয়া ছাউনি হিলস। এরই মাঝামাঝি জায়গায় একটা ইমোরোপীয়ান টী-এস্টেট। ঘন ছোটো টেউয়ের মাঝখানে খানিকটা সমতল জায়গা।

কিন্তু সমতল অর্থে দী-লেভেল নয়, চার হাজার ফিটের ওপরে অলটিচুড। দু-ধারের ঢাল বেয়ে চা-বাগানের গাছ সবুজ চেউ নেমেছে,—মাঝে মোঘের পিঠের মত

জায়গাটাতে কারখানা, অফিস-কোয়ার্টার আর ছোট একটুখানি গঙ্গা। এই চা-বাগানেরই ডাক্তার অমূল্য।

গরমের ছুটি। কলেজ বন্ধ। কলকাতার অসহ এক শো পাঁচ ডিগ্রীতে অসিত যখন ছটকট করছিল, তখন অমূল্যের চিঠি এল নমিতার কাছে।

গরমে কেন কষ্ট পাচ্ছিল ওখানে? অসিতকে নিয়ে চলে আস। ভয় নেই, দার্জিলিং এখান থেকে অনেক দূরে। অসিতের ভানই লাগবে।

দার্জিলিং অসিতের পছন্দ নয়। একবার বেড়াতে এসে যিনি তিনেক থেকেই পালিয়ে গিয়েছিল। তার ধারণা হয়েছিল শ্রামবাজার আর বাগবাজার—কালীঘাট আর বালিগঙ্গা ওভারকোট প'রে দার্জিলিঙে গিয়ে হাজির হয়েছে। সেই হাতীবাগানের পিসিমা, সেই ডবানীপুরের কুটুমামা, কলকাতার সেই অসহ বন্ধুবান্ধবের দল, সবাই যেন ভিড় ক'রে এসে জুড়ে হয়েছে দার্জিলিঙে। তা হ'লে থামোকা কনকনে ঠাণ্ডা আর শিরশিয়ে বৃষ্টির উৎপাত স'য়ে লাভ কি? তার চাইতে কলকাতায় ফিরে যাওয়াই ভাল।

অমূল্যের চিঠিটা লোভ জাগিয়ে দিলে। দার্জিলিঙে পাছাড় রয়েছে, তার সব কিছু সৌন্দর্য আছে, অথচ কলকাতার লোকের উৎপাত নেই—এমন জায়গায় মাস দেড়েক কাটিয়ে আসবার নিমন্ত্রণটা অসিত উপেক্ষা করতে পারল না। অতএব যথানিয়মে নমিতাকে নিয়ে সে অমূল্যের চা-বাগানে এসে উপস্থিত হ'ল।

প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল, খাসা জায়গা। 'স্বর্গ যদি কোথাও থাকে'—ইত্যাদি। শীত আছে বটে, কিন্তু দার্জিলিঙের মত তীব্র নয়, সারা শরীরে যেন গোলাপী আমেজ বুলিয়ে দেয়। টি-প্ল্যাণ্টেশনকে অতিকার ঘোচাকের মত দেখায়, যেন মাটির বুক থেকে শুষ্ক-নেওয়া সবুজ মধুতে টলটল করেছে। কুচি, শানাই ফুল আর গুচ্ছ গুচ্ছ হাইড্রেঞ্জিয়ার আলো হয়ে রয়েছে চারদিক। একটু দূরেই পুরানো একটা শালবন, নিবিড় নিবন্ধ পাতায় পাতায় যেন আত্মিকালের অঙ্ককার, গাছের ডালে ডালে ডাইনীর চুলের মত শ্রাওলা ঝুলছে। তার মধ্যে ঘুরে বেড়ায় কাক আর ময়নায় মেশানো এক রকম আশ্চর্য পাখি—ছুটো-চারটে মুহূর্তে বরণার সুরে সুর মেলায় শাস্ত-করণ সবুজ ঘুর ডাক।

এই শালবনে ঘুরে, শানাই ফুল আর হাইড্রেঞ্জিয়ার গুচ্ছ তুলে দিন কয়েক সতিই ভারি আরামে কেটেছিল অসিতের। কিন্তু এ স্থল বরাতে বেশিদিন সইল না। একদিন দুপুরের খাওয়ার পর কখন মুড়ি দিয়ে টেপের খাটিয়ায় লম্বা হতে থাকে, এমন সময় ফটাফট শব্দে হাতে এক প্যাকেট তাস ডাঁজতে ডাঁজতে অমূল্য হাজির।

আরে, এসব জায়গায় দুপুরে ঘুমলে শরীর ধারাপ করে, গা ভারি হয়ে যায়। তার চাইতে এস এক বাজি তাস খেলা যাক।

ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন। কি করা যায়—উঠে বসতেই হ'ল অসিতকে। সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহে লাফাতে লাফাতে নমিতার প্রবেশ : হ্যা দাদা, সেই ভাল।

অগত্যা অনিচ্ছুক রেখাকেও উল বোনা ফেলে এসে বোগ দিতে হ'ল তাসের আগরে। সেই বে শুরু হয়েছে, আর কামাই নেই তারপর থেকে। এখানে তাসের সঙ্গী না পেয়ে প্রায় দেড় বছর ধরে ক্ষুধিত হয়ে ছিল অমূল্য, এবার স্বদে-আসলে উত্তল করতে শুরু করল। কেবল ডিসপেন্সারির নিয়ম রক্ষা আর দুটো একটা কলে যাওয়ার সময়টুকু ছাড়া তাস আর তাস। রইল প'ড়ে সবুজ ঘুর মিষ্টি ডাকে-ছাওয়া পুরানো শালবন—শানাই ফুলগুলো শীতে আর শিশিরে কুঁকড়ে কুঁকড়ে টুপটাপ করে বরে যেতে লাগল, আর অসিতের হুকান ভরে বাজতে লাগল : নো ট্রাম্প্‌স্—ফাইভ ক্লাব্‌স্—রি-ডাব্ল্।

কলকাতায় পালাতে পারলে বাঁচা যায় এখন। প্রস্তাবটা তুলতেই প্রায় ভেড়ে এল নমিতা।

এখনও তো এক মাস ছুটি রয়েছে। কি এমন রাজকাষিটা কলকাতায় প'ড়ে রয়েছে, শুনি? ওই গরমের ভেতরে গিয়ে হাঁড়ি-কাবাবের মত সেদ্ধ হতে না পারলে বুঝি ভাল লাগছে না?

কিন্তু জেরবার হয়ে উঠেছে অসিত। শুধু মধ্যে মধ্যে আশাস পাওয়া যায় রেখার বিপরীত পীড়িত মুখের দিকে তাকিয়ে। তার হৃৎকের ভাগীদার অন্তত আরও একজন আছে—আপাতত এইটুকুই সাক্ষ্য।

শাল দিয়ে পা পর্বস্ত ঢেকে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল অসিত। অমূল্য ডিসপেন্সারিতে গেছে,

এই ফাঁকে একবার প্রকৃতি-পৰ্বতন ক'রে আসবে কি না সেই কথাটাই ভাবছিল। এমন সময় এক পেয়লা চা নিয়ে রেখা ঘরে ঢুকল।

জানলা দিয়ে বুঝি প্রকৃতির শোভা দেখছেন অসিতবাবু?

প্রকৃতির শোভা!—অসিত দীর্ঘশ্বাস ফেলল : পাহাড়টাকে এখন রুইতনের মত দেখাচ্ছে, আর আকাশের মেঘগুলো যেন ঝাঁকে ঝাঁকে চিড়েতনের মত উড়ে আসছে আমার দিকে।

রেখা খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। উজ্জল শ্রামলা চেহারার এই মেয়েটিকে হাসলে ভারি সুন্দর দেখায়। রেখার হাসিটা আশ্বাদন ক'রে প্রসন্নতায় প্রগল্ভ হয়ে উঠল অসিত।

মনে হচ্ছে যেন রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' বাস করছি। ওই গানটা জানেন—“ইন্সাবন চিড়েতন হরতন, অতি সনাতন হৃদে করতেছে নর্তন”?

আর একবার উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙে পড়ল রেখা। তারপর গম্ভীর হয়ে বললে, যা বলেছেন। আমার তো মধ্যে মধ্যে দস্তুরমত কান্না পায়। কিন্তু ওদের ভাই-বোনের কি যে তাসের নেশা—কিছুতেই বুঝবে না।

আর জোর ক'রে খেলতে বসাবে, একটু ভুল হ'লেই বাঁতা গালমন্দ করবে।—সমর্থন পেয়ে আরও উৎসাহিত হ'ল অসিত : খেলা, খেলা! এ তো আর ক্যালকুলাসের অঙ্ক নয় যে, একটুখানি ভুল হ'লেই মহাতারত একেবারে অশুদ্ধ হয়ে যাবে? অথচ এমন চেষ্টামেচি করে যে মনে হয় বুঝি লাখ টাকার জমিদারি নিলেমে উঠল।

যা বলেছেন।—রেখা বাড় নেড়ে সমর্থন করল। তারপর সামনের চেয়ারটা ব'সে পড়ল। অসিত চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, মধ্যে মধ্যে ভীষণ প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে হয়, জানেন?

প্রতিশোধ?—রেখা আশ্চর্য হ'ল : কিসের প্রতিশোধ? এই অপমানের। ইচ্ছে করে এমন খেলা দেখিয়ে দিই যে, ওরা দুজনই একেবারে জ্বল হয়ে যায়।

কিন্তু পারবেন কি ক'রে?—রেখা নিরাশ ভক্তিতে বললে, ওরা যে দুজনই পাকা খেলুড়ে। আপনার আমার সাধ্য কি ওদের জ্বল করি?

একটা চক্রান্ত করছি।—অসিত চায়ের পেয়লাটা নামিয়ে রাখল : আপনি দলে আসবেন আমার?

রেখা আবার হেসে উঠল : কেন আসব না? ওদের জ্বল করার ব্যাপারে আপনার আমার ইন্টারেস্ট সমান। সম্ভবপূর্বে একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে অসিত জিজ্ঞাসা করলে, নমিতা কোথায়?

জান করতে চুকেছে।

তা হ'লে সেদিক দিবে ঘটানাকের জন্তে নিশ্চিত। একখানা পুরো সাবান-খরচ ক'রে বেরবে। আর অমূল্যদ্রব্য দশটার আগে আসছেন না। আহুন, এই বেলা আমাদের প্র্যান-টিক ক'রে ফেলি।

কি প্র্যান?

অসিত গলা নামিয়ে কিসকিস ক'রে বললে, চুরি করব। চুরি! বলেন কি? রেখা হু চোখ কপালে তুলল : প্রোফেসার মাহুষ আপনি, ছাত্রদের মর্যাল গার্ডিয়ান। আপনি চুরি করবেন কি রকম?

রেখে দিন মর্যাল গার্ডিয়ান।—উত্তেজিত ভাবে সশব্দে সিগারেটে অগ্নি-সংযোগ করলে অসিত : তাসে চুরি করায় দোষ নেই। মস্তুর আমলে ভারতবর্ষে তাস খেলার রেওয়াজ ছিল না, নইলে তিনিও আমার সাপোর্ট ক'রে যেতেন। বুঝছেন না, নইলে কিছুতেই ওদের কার্যদা করা যাবে না।

বুঝলাম।—রেখা শ্রিত হাসিতে বললে, কিন্তু চুরিটা হবে কি ভাবে?

কয়েকটা হিট্ দিচ্ছি আপনাকে। ধরুন, আমি যদি বা হাত দিয়ে কান চুলকোই, তা হ'লে বুঝলেন আমার হাতে ইন্সাবন নেই। ডান হাত দিয়ে গাল চুলকালে হয়তো বুঝবেন, আমি আপনাকে স্পোডে লীড্ দিতে বলছি। কিংবা ধরুন, প্রথমে যে কল দিয়ে খেলা শুরু করলাম, আমার হাতে সেটা উইকেট, অর্থাৎ ওদের কল নষ্ট ক'রে দেবার মতলব—

কৌতুকে রেখার চোখ জলজল করতে লাগল : অত গড়গড় ক'রে বললে তো হবে না, আশ্বে আশ্বে বোঝাতে হবে আপনাকে। তা ছাড়া আমি তো আপনার অ্যাষ্টি-পার্টি—

অসিত বাধা দিয়ে বললে, আজ থেকে আমরা পার্টনার।

সেদিন দুপুরে খেলতে বাঁসেই অমূল্য স্তম্ভিত।

সে কি? অসিত আর রেখা পার্টনার। খেলবে কি হে! দুজনেই তো সমান।

অসিত মুখে টিপে হাসল : দেখাই যাক না একবার চেষ্টা করে। এতদিন ধরে তালিম দিচ্ছ, কিছুই কি আর উন্নতি হয় নি?

নমিতা খুশি হয়ে উঠল : বেশ তো দাদা, খেলুক না ওরা। কিন্তু স্টেকে খেলা হবে আজ। হাজারে দু আনা।

অসিত বললে, বাজী।

কিন্তু খানিক পরেই অস্বস্তিতে অমূল্য আর নমিতা ছুটফুট করে উঠল। ব্লাক কল আর এলোপাথাড়ি আক্রমণে ওদের দুজনের পাকা খেলোয়াড়ী বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়ে যেতে লাগল। চুরির নিষিদ্ধ আনন্দে অদ্ভুত উত্তেজনায় আশ্চর্য ভাল খেলতে লাগল অসিত, রেখাও ঘেঁষারকারমত এমন মারাত্মক লীড দিতে পারে সে কথাই বা কে ভেবেছিল।

খেলা শেষে হিসেব করে দেখা গেল, অসিত আর রেখার পরেটাই বেশি, মোট বারো আনা জিতে নিয়েছে ওরা।

অমূল্য মাথা চুলকে বললে, মির্যাকুলে বিশ্বাস করতে পারতাম না, এখন দেখছি তাও ঘটে!

নমিতা গজ গজ করতে লাগল : বা রে, অমন ভাবে ব্লাক মিলে কেউ খেলতে পারে নাকি?

এ ভারি অজ্ঞান।

অসিত বললে, অজ্ঞান আবার কি! তোমাদেরও বা খুশি কল দাও না, আমরা কি বারণ করেছি নাকি?

চাপা হাসিতে জলজল করতে লাগল রেখার চোখ।

পরদিন সকালে আবার যখন এক ঘণ্টার জুড়ে নমিতা বাথরুমে ঢুকেছে আর অমূল্য গেছে ডিসপেন্সারিতে, নিয়মমত চায়ের পেয়ালা নিয়ে ঢুকল রেখা।

এসেই উচ্ছ্বসিত হাসি : কি মজা হ'ল বলুন তো!

হাসিটা ভারি হাল্কা। মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল অসিত। তারপর পরিভূপ্ত মুখে বললে, মজার এখনি কি হয়েছে! দেখবেন না আজ কি করি! নতুন টেকনিকে নতুন আক্রমণ।

নতুন টেকনিক?

এক রকম হিট রোজ মিলে ওরা ধরে ফেলবে। তা ছাড়া দেখছিলেন তো, নমিতা কাল রীতিমত সন্দেহ করছিল দু-একবার। আমাকে তো ফস করে জিজ্ঞেস করেই বর্শল, বার বার নাক চুলকোচ্ছ কেন, নর্দি হয়েছে নাকি? আজকে নতুন কোড।

কি রকম?

বহুন, বুঝিয়ে বলি।

বাহামুখানা তাদের মধ্যে এত রোমাঞ্চ আর এমন উত্তেজনা আছে এর আগে কে জানত সে কথা? এতদিন পরে নেশা ধরেছে অসিতের, আর সে নেশা রেখার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে গেছে। এখন সকালবেলাতেই পাহাড়টাকে কইতনের মত মনে হয় না অসিতের। দুপুরে খেলতে বসবার আতঙ্ক বিভীষিকার মত তাড়না করে না তাকে। বরং একটা বিচিত্র আগ্রহ নিয়ে ঔৎসুক্যের সঙ্গে অসিত প্রতীক্ষা করতে থাকে—দুপুরবেলা অমূল্যের জরুরি ডাক পড়লে অসিতই দ্রুত হয় বেশি। বোঝা যায়, রেখারও প্রায় একই অবস্থা। কাজের ভেতরে ভেতরে সেও যেন ছুটফুট করে বেড়ায়। নমিতার চোখ এড়িয়ে মধ্যে মধ্যে এসে দাঁড়ায় অসিতের কাছে। ফিসফিস করে বলে, আজকের হিটগুলো কি বলুন তো? আর একবার মনে করিয়ে দিন, সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

একটা চমৎকার অন্তরঙ্গ জগৎ সৃষ্টি হয়েছে দুজনের মধ্যে। অমূল্য আর নমিতার প্রবেশ সেখানে নিষিদ্ধ কোঁতুকে আর আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে দুজনে।

কাল নমিতার মুখের অবস্থা দেখেছিলেন?

ঠাঁর অবস্থাও খুব করুণ। কি ভীষণ ঘাবড়ে গেছেন।

দাঁড়ান না, আরও অজ্ঞ আছে আমার ভূণে। এক-একটা করে বার করব।

আবার রেখার সেই উজ্জ্বল উচ্ছলিত হাসি। রেখার চিবুকের নীচের ভাঁজটা এত হাল্কা, দার্শনিক অধ্যাপক অসিত এর আগে সেটা লক্ষ্যই করে নি। হঠাৎ এক সময়ে অসিতের মনে হয়, এই মার্জিত দীপ্ত মেয়েটির পাশে অমূল্য যেন অনেকখানি স্থূল, কেমন যেন বেমানান!

আর রেখা বলে, নমিতা কেমন মোটা হয়ে যাচ্ছে দেখেছেন?

হবেই তো। তাজিলোর ভক্তিতে অসিত বল, আর কোনদিকে তো লক্ষ্য নেই। প'ড়ে প'ড়ে ঘুমোবে আর বাংলা সিনেমা দেখবে, এ ছাড়া তো কাজকর্ম নেই কিছু।
 —এখন হয়েছে কি, কিছুদিন পরে দেখবেন তেলের কুপোর মত গড়িয়ে গড়িয়ে হাঁটছে।

হাঃ, কি যে বলেন!—জোরে হেসে উঠতে গিয়েও সৌজন্যের খাতিরে হাসিটাকে সংযত করে রেখা। আর অসিত তাকিয়ে দেখে নাচের 'কিগারে'র মত ছিমছাম কমনীয় শরীর রেখার—সংস্কৃত কবির ভাষায় 'পল্লবিনী-লতাব'।

তাস, তাস আর তাস। কিন্তু এখন শুধু 'হিট্'ই নয়, ফার্ট-ক্লাস-পাওয়া ছাত্র তার সমস্ত মনোযোগ এখন তাসের ওপরেই উজাড় ক'রে দিয়েছে। খেলতে খেলতে এখন আর জানলা দিয়ে বাইরে তাকায় না, পুরোনো শালবনের আদিম অন্ধকারে সবুজ ঘুঘুর ডাক আর মনকে উদাস ক'রে দেয় না, পাহাড়ের নীল মাথার ওপর সাদা সাদা ঘুমন্ত মেঘগুলো অসিতকে আর শ্রান্তিতে অবসন্ন ক'রে আনে না। সমস্ত উৎসাহ আর বুদ্ধিকে সজাগ ক'রে রেখে তাসের নিভূল হিসেব করে অসিত, বুঝতে পারে খেলাটা কত সহজে তার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়ছে। রেখাও সজাগ আর সতর্ক হয়ে উঠেছে, দুজনকে দুজনের চেনা হয়ে গেছে সম্পূর্ণভাবে। চোখ তুললেই অসিত দেখতে পায়, রেখার উজ্জল চোখের গভীর বিশ্বাসভরা অন্তরক দৃষ্টি তারই মুখের ওপর এসে স্থির হয়ে রয়েছে।

সংসারে তাস খেলার মত ভাল জিনিস আর নেই, এ সম্বন্ধে অসিত নিঃসন্দেহ এখন। রেখাও একমত তার সঙ্গে।

সেদিন দুপুরে খেলাটা কিন্তু জমল না।

সবে তাস পেতে অমূল্য বসতে যাবে, এমন সময় ভয়দূত এল। অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কারখানায়। ওয়েদারিং হাউসের দোতলা থেকে একজন জমাদার সোজা প'ড়ে গেছে নীচে, গোটা দুই পাঁজর ভেঙে গেছে খুব সম্ভব। উদ্ধারসে ছুটল অমূল্য।

বিষম হয়ে অসিত বললে, তা হ'লে তিন হাতেই হোক।

রেখা বললে, তাই ভাল।

কিন্তু নমিতা রাজী নয়। কেমন নার্তাস হয়ে গেছে আজকাল, অমূল্য না থাকলে ভরসা পায় না। হাই তুলে বললে, না না, সে জমবে না। তার চেয়ে গিয়ে একটু গড়াই, একটা নতুন সিনেমার পত্রিকা এসেছে, একটু নেড়ে-চেড়ে দেখি গে।

রেখা ক্ষুব্ধ চিন্তে বললে, আজ তা হ'লে খেলাটা আর হ'ল না?

কই আর হ'ল?—অসিত হতাশ ভাবে সিগারেট ধরালঃ অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়েই লোকটা সব মাটি ক'রে দিলে।

কি করবেন তা হ'লে? ঘুমোবেন?

এখানে ঘুমতে ডাক্তারের বারণ, মাথা ভার হয়ে যাবে, গা ম্যাক্স ম্যাক্স করবে।—অসিত বললে, একটা বই-টাই দিন, পাড়।

বই বলতে তো সিনেমা-ম্যাগাজিন আর মেটরিয়াম মেডিকা।—আসন্ন হাসির স্বচনা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রেখার চোখে মুখেঃ চলবে?

তবে তো মুশকিল!

মুশকিল কেন?—রেখাই মুশকিল আসান ক'রে দিলেঃ চলুন না, একটু বেড়িয়ে আসি।

চমৎকার প্রস্তাব।—অসিত সোৎসাহে উঠে বসলঃ চলুন।

নমিতাকে ডাকব?

ক্ষেপেছেন? লেপ মুড়ি দিয়ে সিনেমার কাগজ নিয়ে শুয়েছে, এখন ওকে ওঠানো আর বিদ্যুৎপর্বতকে নড়ানো একই কথা। চলুন, আমরা দুজনেই বেরিয়ে পড়ি।

খুশিতে রেখার চোখ জলজল করতে লাগলঃ চুপি চুপি?

হ্যাঁ, চুপি চুপি।

তবে দাঁড়ান, স্কাফ'টা নিয়ে আসি।—প্রায় নিঃশব্দ পাখির মত উড়ে গেল রেখা।

কুচি ঝ'রে ঝ'রে পড়ছে পথের ওপর। মিষ্টি লালচে রোদে দুধের মত সাদা শানাই ফুল হেসে উঠেছে। হাইড্রেঞ্জিয়ার সবুজ মৌমাছি আর বিচিত্রবর্ণ প্রজাপতির আনাগোনা। টেলিগ্রাফের তারে মাঝড়শার জালে জড়ানো কুমারশার কণায় রোদ ঝিকমিক করছে—যেন মুক্তোর ঝালর

হুলিয়ে দিয়েছে কেউ। কলকণ্ঠে কথা বলে চলেছে রেখা।

কতদিন ইচ্ছে করে এমনি ঘুরে ঘুরে বেড়াই। কিন্তু ঠুকে তো জানেন। ওর এসব কাব্য-টায়্য করবার সময় নেই। বলেন, বেড়াতে হয় একাই যাও—আমার অত পাহাড় ঠ্যাঙাতে উৎসাহ হয় না। অথচ বলুন তো, একা একা কেউ বেড়াতে পারে এ ভাবে? আর সংসারের কাজ করতে করতে আমি এ সব প্রায় ভুলতেই বসেছি। জানলা দিয়ে একটু বাইরে তাকিয়ে থাকারও সময় পাই না—ভয় হয়, উঠুনে বসানো ডালটা বৃষ্টি পুড়ে গেল।

চলতে চলতে খুশিমত ফুল তুলল রেখা, গুনগুন ক'রে গান গাইল ছ-চায় কলি। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের মেয়েটিকে ঘেন পনেরো-ষোল বছরের কিশোরী মেয়ের মত দেখাচ্ছে—মনে মনে ভাবল অসিত।

তারপর সেই পুরনো শালবন। অনাদি কালের বিবল শীতল ছায়া দিয়ে ঘেরা। গাছের গুঁড়িতে ডালে ডালে ডাইনীর চুলের মত শ্রাওলা ঝুলছে। কাক আর ময়নায় মেশানো পাখির খুঁটে খুঁটে কি ঘেন খেয়ে চলেছে। ঝরনার মুহূ কল-ঝঙ্কার আসছে কোথা থেকে, ঘুম-ভরা গলায় সবুজ ঘুঘু ডেকে চলেছে অবিশ্রাম।

নির্জনতা। পৃথিবীর প্রাথমিক নির্জনতা। ঘেন ওরা আসবার আগে এখানে আর কোনও মানুষের পা কখনও পড়ে নি। রেখার মস্তন কোমল শরীরটাকে কেমন অপাখিব বলে মনে হ'ল অসিতের। শীতল নিস্তরু ছায়ার তার নিবিড় চোখ দুটো আশ্চর্য আলোর জ্বলতে লাগল।

হঠাৎ গভীর গলায় অসিত বললে, আসুন, এই পাখরটার ওপরে বসি ছুজনে।

রেখা বসল, অসিত বসল। ঝরনার শব্দ, পাখির ডাক। টুপটাপ ক'রে শিশির পড়বার আওয়াজ। ছুজনের পৃথিবী। আর কেউ নেই।

মুহু আবিষ্ট স্বরে রেখা বললে, আর কেউ নেই।

অসিত বললে, না, শুধু আমরা ছুজন। আমরা ছুজন পার্টনার।

শুধু আমরা ছাড়া আমাদের কথা কেউ জানে না, না? না, আর কেউ জানে না।—অসিতের গলা ভারী হয়ে এল : আর কেউ জানবে না।

কি ছিল কথাটার স্বরে? হঠাৎ শিউরে উঠল রেখা। হঠাৎ মনে হ'ল, ছুজনে বড় বেশি কাছাকাছি ব'সে আছে—অসিতের ঠাণ্ডা নিশ্বাস লাগছে ওর গায়ে। একটা সীমাহীন ভয়ে রেখার বুকের রক্ত ঘেন হিম হয়ে গেল। এ তো শুধু তাস নয়! এ ওরা কোথায় চলেছে? এই নিরালা আদ্যম শালবনের মধ্য দিয়ে কোন ভয়ঙ্কর পথ দেখা যাচ্ছে চোখের সামনে?

রেখা উঠে দাঁড়াল তড়িৎবেগে। সঙ্গে সঙ্গে অসিতও। সে কি বুঝতে পেরেছে কিছু? আভাস পেয়েছে অস্তুত?

কাক-টায় শীত আর বাগ মানছে না বেন। দাঁতে দাঁতে ঠক ঠক ক'রে আওয়াজ তুলে রেখা বললে, চলুন, ফেরা যাক।

অসিত জবাব দিলে না। তার আগেই সে হাঁটতে শুরু করেছে।

ঘর থেকে টেচিয়ে উঠল নমিতা।

এমন বিজ্ঞি গন্ধ বেরুচ্ছে কেন বউদি? কি পুড়ছে উঠুনে?

বউদির জবাব এল না। কিন্তু অসিত বুঝতে পেরেছিল, কি পুড়ছে। মোটা কয়লে মাখাটা পর্যন্ত ঢেকে খাটির ওপর প'ড়ে রইল অসিত। কয়লের আড়ালেই কি মুখ লুকনো যাবে চিরদিনের মত?

হু প্যাকেট তাস পুড়তে সময় লাগে। সেই সঙ্গে বুকের ভেতরটাও খিকিখিকি ক'রে পুড়ছে রেখার। ঝাপসা চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, প্রত্যেকখানা তাস, কি অস্তুতভাবে বেকে বেকে পুড়ে যাচ্ছে—মনে হচ্ছে, অসংখ্য কেউটে সাপের ফণা।

এই গ্রন্থের কন্দন

দীপক চৌধুরী

॥ চতুর্থ রাত্রি ॥

বন্ধু, আমার স্পষ্ট মনে আছে, সেদিন শ্রাশান থেকে ফিরে আসতে প্রায় তিনটে বেজে গিয়েছিল। বড় মামা ডক্টর যাদব মিত্র অবশ্য বেলা তিনটে পর্যন্ত সেখানে ছিলেন না। কি একটা জরুরী কাজ আছে বলে তিনি শ্রাশান থেকে চলে এসেছিলেন বারোটা নাগাদ। আসবার সময় তিনি শ্রাশানের যাবতীয় খরচপত্র সব ভবতোষের বাবার কাছে দিয়ে এসেছিলেন। তিনি জানতেন যে, তাঁদের সঙ্গেই আমি বাড়ি ফিরব।

মার মৃত্যুতে বড় মামা খুশি হন নি বটে, কিন্তু চুঃখিত হয়েছেন বলেও আমার মনে হ'ল না। তাঁর বোন যে স্বামীপরিভ্যক্তা—তেমন একটা তিক্ত বাস্তব মামার মত একজন ঐতিহাসিকের পক্ষে এতগুলো বছর ব'য়ে বেড়ানো সত্যিই খুব সহজ ছিল না। তিনি ঐতিহাসিক, সমাজ-সংস্কারক নন। রাজা রামমোহনের উপর তাঁর অপরিমিত শ্রদ্ধা, অগণিত প্রবন্ধ লিখেছেন রামমোহনের বৈপ্লবিক কীর্তিগুলোর কথা উল্লেখ ক'রে ক'রে। কিন্তু মার ডান পাটা একটু খোঁড়া ছিল বলে তিনি ভগবানের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন, তবুও তাঁর নিজের সমাজের বিরুদ্ধে আধখানা প্রবন্ধও লিখতে পারেন নি। বাবা যে মায়ের উপর একটানা বারোটা বছর অবিচার ক'রে গেলেন, তার ক্ষণে তিনি একটা দিনের ক্ষম্ভেও প্রতিবাদ করেন নি। অতএব, মার মৃত্যু বড় মামার কাছে খুব একটা নিদারুণ শোকেরই ব্যাপার বলে অহুত্ব হ'ল না, উপরন্তু তিনি একটা পুরনো মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেলেন।

বাড়ি ফিরলাম বেলা প্রায় তিনটের সময়। বাড়ির দরজার কাছে এসে ভবতোষ বললে, তুমি যাও, আমি কাপড় বদলে আসছি। হু-পা এগিয়ে গিয়ে ভবতোষ ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, বাড়িতে ঢুকতে তোমার ভয় করছে না কি জয়া?

ভয়? না, না—

তা হ'লে এখানে একটু দাঁড়াও, আমি এখনি আসছি। একা একা ভয় করবারই কথা বটে।

না ভবতোষ, এখন থেকে সবই আমার একা একা করতে হবে।

কথাটা ভবতোষের কাছে বোধ হয় ভাল লাগল না। পনেরো বছর বয়সেই ভবতোষ খুবই বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। মনের জোরও ছিল ওর বয়সের তুলনায় খুবই বেশি। স্বতরাং, তার মত একজন ছেলে কাছে থাকতে আমার কেন সব কাজই একা একা করতে হবে? সে কথা বুঝতে না পেরে ভবতোষ জিজ্ঞাসা করলে, কেন, আমি কি তোমার কাজ সব ক'রে দিতে পারব না?

আমি ভিজ্ঞে কাপড় প'রে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ফিরবার পথে নদীতে আমরা সবাই চান ক'রে ফিরেছি। প্রায় বছর খানেক আগে থেকে মা আমার শাড়ি পরতে বাধ্য করেছিলেন। এক বছর আগে হয়তো শাড়ি পরবার খুব কিছু দরকার ছিল না, কিন্তু বারো বছরের দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই ভবতোষের দৃষ্টির অর্থ গেল বদলে। নিজেকে গোপন করবার তাগিদ অহুত্ব করলাম স্বাভাবিক কারণে। অত অল্প বয়সেই, ভবতোষকে একজন গোটা পুরুষমানুষ বলে মনে হ'ত আমার। ভবতোষও যেন কি এক মন্ত্রবলে বারোটা মাসকে কেটে-ছেঁটে আমার বয়স বাড়াতে লাগল অতি দ্রুতগতিতে, যেন ছোটো মাসের ব্যবধানের মধ্যে বাকি দশটা মাস লুপ্ত হয়ে যেত অবলীলাক্রমে।

আমার দিকে চেয়ে ভবতোষ বললে, আমি কাপড় বদলাব পরে। চল, তোমার সঙ্গে আমি যাচ্ছি। আমি জানি, বাড়ির ভেতরে ঢুকতে তোমার ভয় করছে।

ভয় যে করছিল সে কথা সত্যি। তাই বললুম, মা যে নেই, আমি যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। ভবতোষ, তোমার কি মনে হয়, এমন একটা ভুতুড়ে ভাঙা বাড়ির মধ্যে মার আত্মা আবার ফিরে আসবে?

আমার কথা শুনে ভবতোষ ঐষ্টভক্তদের মত কপালে,

কাঁধে এবং বুকে আঙুল ঠেকিয়ে ক্রুশের চিহ্ন এঁকে বললে, ভগবান তোমার মার আত্মার কল্যাণ করুন। চল—

ভবতোষ আমার হাত ধরে এক রকম টানতে টানতেই দৌতলায় নিয়ে এল। এসে বললে, ওই ঘরে গিয়ে এবার কাপড় বদলে এসো। দরজা বন্ধ করে নিয়ো।

কেন ?

যদি লজ্জা পাও ? আমি যদি ঢুকে পড়ি ?—ভবতোষ যেন ইচ্ছে করেই আমার মধ্যে কি এক লজ্জার একটা অজ্ঞাত হেতু সৃষ্টি করবার চেষ্টা করতে লাগল।

তোমার কাছে আমার মত ছেলেমানুষের কোন লজ্জাই থাকতে পারে না। তুমি এখানেই দাঁড়াও, আমি আসছি।—এই বলে আমি ঘরের মধ্যে ঢলে পেলাম। আলনা থেকে একখানা শাড়ি টেনে নিয়ে ভেজা কাপড় বদলাতে আমার দু মিনিটও লাগল না। সামনের দিকে চাইতে গিয়ে দেখলুম, দেয়ালের গায়ে মায়ের একখানা ফোটা-রয়েছে। আমি কোটোখানার দিকে তন্নয় হয়ে চেয়ে রইলুম। মাথা থেকে পা পর্যন্ত মার প্রতিটি অঙ্গ আমি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলুম, কোথাও একটু খুঁত আমার চোখে পড়ল না। মা যে একটু খোঁড়া ছিলেন তা যেন মার মুখে না সুনলে আমি কোনদিনও জানতে পারতুম না, অথচ এমনি একটা তুচ্ছ কারণে বাবা কোনদিনও মাকে ভালবাসতে পারেন নি।

এরই মধ্যে ভবতোষ এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সেও চেয়ে ছিল মায়ের ফোটাখানার দিকে।

একটু পরেই আমি ওকে বললুম, কাল ছপুরের গাড়িতে আমরা কলকাতা চলে যাব। এ বাড়ির কোন জিনিষই আমরা সঙ্গে নেব না।

এই কোটোখানা নেবে না ?

মামার কাছে মার ছবি আছে, তাই তিনি নিতে ব্যরণ করেছেন। কিন্তু আমি ভাবছি, মার মত এমন মানুষকে বাবা কি ক'রে সারাটা জীবন কষ্ট দিয়েছেন।

হিন্দুসমাজের কোন মেয়েটা হুধে আছে ?

মিশনারিদের—ইস্কুলে ভবতোষ পড়ত বলে মাঝে মাঝেই সে হিন্দু এবং হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করত। আজকে ওর মুখে এমন একটা কথা শুনে খুবই বিস্মিত-বোধ করলাম। আমি বললুম, কোন মেয়েই

হুধে নেই—তুমি কি ক'রে জানলে ভবতোষ ? তোমার মা তো কত হুধে আছেন।

হুধ, না, হাতী।—ভবতোষ তার বা হাতের গোলাকৃতি মাংসখণ্ডটিকে ডান হাতের পাঞ্জা দিয়ে রগড়াতে রগড়াতে পুনরায় বললে, গায়ে আর একটু শক্তি বাড়লেই মেখে নিও, বাবার সঙ্গে কি রকম লড়ে যাই।

ছি ছি ভবতোষ, এমন কথা মুখে আনতে নেই। কেন, বাবা কি করেছেন ?

মার গায়ে তিনি হাত তুলেছেন অনেক দিন।

কেন ?

দু-একদিন বাবা নাকি ছপুরবেলা হঠাৎ আপিস থেকে এসে মাকে বাড়িতে দেখতে পান নি। হিন্দুসমাজের নোংরামির কথা কানে গেলেও পাশ হয়। সতীপ্রথার চেয়ে বাবার ব্যবহারটা ভাল নয় মোটেই।

সেই বয়সে অনেক কথাই আমি বুঝতে পারতাম না বটে, কিন্তু আমি তবু বলেছিলাম, তোমার বাবার ব্যবহারের জন্তে সমাজকে দায়ী করলে চলবে কেন ? মানুষ হিসেবে যদি তিনি ধারাপ হন, তা হ'লে সেই জন্তে তিনি নিজেই দায়ী। সাহেবদের সমাজে খারাপ লোক নেই—সে কথা কেউ স্বীকার করবে না। ভবতোষ, আমার মনে হয় তুমি সাহেবদের সব কথা ঠিকঠিক বুঝতে পার নি।

আমি যখন কথা বলছিলাম, ভবতোষ তখন জানলার ওপর উঠে মায়ের ফোটাখানা নামিয়ে নিয়ে এসেছে।

দেয়ালের গায়ে ফোটাখানা ঠেকিয়ে রেখে ভবতোষ বললে, ছবিটা আমি নিয়ে যাচ্ছি।—এই বলে ভবতোষ আমার ঘাড়ের ওপর হাত রেখে পুনরায় বললে, ছবিখানা নিয়ে যাওয়ার আগে তোমার মার কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, জীবনে তোমাকে ছাড়া আমি আর কাউকে বিয়ে করব না।

আমি কোন কিছু বলার আগে ভবতোষ যা ক'রে বলল তার ভুলে আমি রাগে এবং লজ্জায় কেঁদে ফেললাম। চোখের জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল টোটের ওপর। তাড়াতাড়ি ঠোট ছুঁতে গিয়ে ফেলবার জন্তে আমি ইচ্ছে ক'রেই চোখ দিয়ে সেদিন জল ফেলেছিলাম প্রচুর পরিমাণে। তারপর দীর্ঘ তিরিশটা বছর পার হয়ে গেল।...বহা,

আমি লজ্জার মাথা খেয়েই তোর কাছে স্বীকার করছি যে, সেদিনের সেই শৈথিল্যটুকু আমি নারীজীবনের সবিশেষ পুণ্য বলে আঙু ও বহন করে চলেছি। কেবল সবিশেষ নয়—সেই একমাত্র পুণ্যটুকুর মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়ে যেন গত তিরিশটা বছর তাকে আমার দেহ-সিংহাসনে বসিয়ে রাখতে হ'ল।

সন্ধ্যার একটু আগেই বড় মামা এলেন একটা মোটর গাড়ি চেপে। আমি ভবতোষদের বাড়িতে ছিলাম। বড় মামা এসে বললেন, জয়া, চল একটু য়েতে হবে। ছ-চারখানা শাড়ি জামা যা আছে সঙ্গে নিয়ে আয়। বাড়ির চাবিটা এখানেই থাক। তোর বাবা হরিদাস একদিন নিশ্চয়ই আসবে চাবি চাইতে।

ভবতোষের মাকে আমি মাসীমা বলে ডাকতাম। মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, রাজিবেলা ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

বড় মামা বললেন, আমার ছোট ভাই অপূর্ব যে এখানে কাজ করছে, আমি তা জানতুম না।

মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, কি কাজ করেন উনি?

এক স্তনে ডক্টর খাদব মিজ যেন কেমন একটু রহস্যজনক ভাবে হেসে উঠলেন। হাসিটা মিলিয়ে যেতে সময় লাগল। তারপর তিনি বললেন, চাকরিটা বেশ বড়ই—আই. সি. এস. কিনা।

মৃত্যুশয্যায় বোনকে যখন তিনি একবার দেখতে এলেন না, তখন অপূর্ববাবু যে বড় চাকরি করেন তাতে আর কেউ সন্দেহ করবে না। দেখুন, আপনারা সবাই হরিদাসবাবুর উপর খুবই বিরূপ আমি জানি। কিন্তু জয়ার মার ওপর কাউকেই তো স্ববিচার করতে দেখলুম না। ওই একটা ভূতুড়ে বাড়িতে বারোটা বছর মুখ বুজে তিনি দুঃখ ভোগ করে গেলেন—একটু খেমে মাসীমা দরজার আড়াল থেকেই বললেন, হরিদাসবাবুর চেয়ে ভাল এমন ছ-একজন আত্মীয়-স্বজন কেউ এসে একবারও তাঁর খোঁজ নেন নি। আমার কথা শুনে আপনি নিশ্চয়ই আশ্চর্য হচ্ছেন? হবারই কথা।

আপনার সঙ্গে এই আমার প্রথম ও শেষ দেখা। জয়ার আপনি মামা, আপনি ভারতবিখ্যাত ঐতিহাসিক, বোনের ওপর ছ-চার পাতার ইতিহাস কি আপনি লিখতে পারবেন না? সতীদাহের নিষ্ঠুরতা কেবল দেখলেন, আর ঘরের

পাশের নিষ্ঠুরতা—। মাসীমা হঠাৎ খেমে গেলেন। আমি বুঝলুম তিনি কাঁদছেন।

বড় মামা বললেন, থাক, অপূর্ব ওখানে জয়ার না যাওয়াই উচিত। কাল স্টেশনে যাওয়ার পথে আমি ওকে এসে নিয়ে যাব। হরিদাস এলে তাকে অল্পগ্রহ করে বাড়ির চাবিটা দিয়ে দেবেন।...আর ইতিহাসের কথা যা বললেন, তাতে আপনার একটু ভুল রয়েছে গেল। সতীদাহের ওপর আমার কোন কাজ নেই। আমার গবেষণা সব সুলতান-বাদশাহদের নিয়ে। নমস্কার।—বড় মামা চলে গেলেন।

মাসীমা আমাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন, জয়া, তুই একদিন প্রতিশোধ নিস। মুখোশ-পরা জন্তুগুলোকে কোনদিনও ক্ষমা করিস না।

পরের দিন সকালে ভবতোষকে সঙ্গে নিয়ে এলুম আমাদের বাড়িতে। এখানে আমি জন্মেছি। প্রায় এগারোটা বছর আমার এখানে কাটল। আর দু-এক মাস পরেই আমি বারো বছরে পা দেব। কিন্তু আজ দুপুরের পর থেকে এ বাড়ির সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক থাকবে না। ইস্কুলের পড়া বইগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে আছি দেখে ভবতোষ বললে, কলকাতার ইস্কুলে এ সব বই আর চলবে না। সেখানে আবার নতুন বই কিনতে হবে।

নতুন বই কিনতে হবে জানি। তবুও এই বইগুলো ফেলে যেতে ইচ্ছে করে না। মা কত কষ্ট করে বইগুলো সব কিনে দিয়েছিলেন। ছুটো মাসের জন্তে পরীক্ষাও দিতে পারলুম না।

ভবতোষ বললে, এই ছুটো মাস আমাদের এখানেই থেকে গেলে কেমন হয়?

মামাবাবুকে বলেছিলাম সে কথা, কিন্তু এখানে তিনি আমায় ফেলে যেতে রাজী হন নি। ভবতোষ, বইগুলো সব তোমার কাছে রেখে গেলুম। মা বলতেন—আমাদের পরিবারের মধ্যে বিধান লোকের অভাব নেই; অভাব কেবল মাহুষের। মায়ের কথা শুনে রাগে আমার গা জঁলে যেত। মাকে আমি অভয় দিয়ে বলেছিলাম, এই সব অমাহুষ বিধান লোকদের ওপর আমি একদিন প্রতিশোধ নেব। একটু হেসে মা আমার বইগুলো হাতে নিয়ে

বলেছিলেন—জয়া, ঠন্দের তুই কমা করিস, যারা কেবল বই মুখস্থ করে, তারা কমা করতে শেখে না।

মা ঠিক কথাই বলেছিলেন, জয়া।

ভবতোষ আমার বইগুলো সব গুছিয়ে নিতে লাগল। ভবতোষ আমার এক ক্লাস ওপরে পড়ত। আমার এবার অষ্টম শ্রেণীতে ওঠবার কথা। ভবতোষ অঙ্কে খুব কাঁচা ছিল বলে সে আমার কাছে অঙ্ক শিখতে আসত। মধ্যম শ্রেণীতে পড়বার সময়ই আমি নবম শ্রেণীর অঙ্ক প্রায় শেষ করে ফেলেছিলুম। আমার কৃতিত্বে মা খুব গর্ব বোধ করতেন বটে, কিন্তু আমার কৃতিত্বটুকু মূলধন করে মা বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারলেন না। বোধ হয় কেউ পারেও না। সম্ভানের কৃতিত্ব কখনও ভালবাসার অভাব মেটাতে পারে না। বাবার কাছ থেকে মা যে কেবল ভালবাসা পান নি তা নয়। ভালবাসা পান নি বলে মা বড় অপমানিত বোধ করতেন। আত্মসম্মান বাঁচল না বলে শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেও বাঁচলেন না।

একটা দিনের ট্রাকে আমার জামা কাপড় সব গুছিয়ে নিলুম। মায়ের জিনিসপত্র যেমন ছিল সবই পড়ে রইল ঠিক তেমনি ভাবেই। আলনার ওপরে মায়ের ব্যবহৃত ছুখানা শাড়ি ঝুলছিল। হঠাৎ আমার নজরে পড়ল যে, একটা শাড়ির আঁচলে মায়ের চাবির তাড়াটা বাঁধা রয়েছে। আমি চাবি নিয়ে মায়ের হাত-বাক্সটা খুললুম। কয়েক আনা খুচরো পয়সা পড়ে রয়েছে বাক্সটার মধ্যে। আমি ভিতরের দিকে হাত দিয়ে চোরা-খুপরিগুলো খুঁজে খুঁজে দেখতে লাগলুম। ডান দিকের একটা খুপরি থেকে পঞ্চাশটা টাকা বেরুল।

ভবতোষ বললে, টাকাগুলো কি করবে? এলাহাবাদে তোমার বাবার কাছে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়?

হ্যাঁ, মাসীমাকে দিয়ে দিও। তিনিই টাকার ব্যবস্থা করবেন। এ থেকে আমি কেবল দশটা টাকা রাখলুম।—এই বলে চল্লিশটা টাকা আমি ভবতোষকে দিয়ে দিলুম।

টাকার খুপরিটার পাশে আর একটা খুপরি ছিল। সেটার মধ্যে আরও কিছু আছে কি না দেখতে গিয়ে মায়ের গুপ্তধন আমি আবিষ্কার করলুম। সোনার ফ্রেমে বাঁধানো বাবার একখানা ছবি। মা হাতে শাঁখা ছাড়া আর কিছু পরতেন না। দাদামশায়ের দেওয়া কগাছা

সোনার চুড়ি ভেঙে মা এই সোনার ফ্রেমটি তৈরি করিয়েছিলেন। এই ছবিখানা ছাড়া বাবার আর কোন ছবি এ বাড়িতে ছিল না। খুপরি থেকে ছবিখানা বার করবার সময় দু-একটা ফুল আমার হাতে ঠেকল। খুব শুকনো ফুল নয়—মৃত্যুর তিন-চার দিন আগের ফুল বলে মনে হ'ল আমার। মা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না। তাই তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় নায়কের পায়ে গোপনে শেষ পূজা নিবেদন করে দিয়ে গেছেন সম্বিত হারাবার আগেই।

আমার আজ নতুন করে পুরনো একটা কথা মনে পড়ল। বছর চার আগে এই ছবিখানা ছিল এ বাড়ির ঠাকুর-ঘরে। বহু-পরিবারের অধিষ্ঠিত দেবতা ছিলেন নারায়ণশিলা। মা সকাল-সন্ধ্যাতে নিজেই পূজা করতেন। বাবার ছবিখানা ছিল নারায়ণশিলা থেকে একটু দূরে আলাদা একটা মঞ্চের ওপর। রাত্রিবেলা পূজা শেষ হওয়ার পরে নারায়ণশিলার জন্তে মা বিছানা পাততেন, ছোট একটা মশারি টাঙানো থাকত মাথার ওপরে, সেটা ফেলে দিয়ে বিছানার চারদিকে গুঁজে দিতেন, পায়ের তলায় থাকত ছ ইঞ্চি মাপের একটা লেপ। গ্রীষ্মকালেও লেপটা সরিয়ে নেওয়া হ'ত না। পুতুলের ঘরের মত মনে হ'ত নারায়ণশিলার ঘরখানা। বাবার ফোটোখানার জন্তেও মা ঠিক তেমনি ব্যবস্থাই করেছিলেন। একদিন সেখান থেকে ফোটোখানা উধাও হ'ল। আমি বড় হয়ে উঠেছি বলে কি তিনি লজ্জা পেয়েছিলেন? মা তাঁর নিজের শাড়ি থেকে কাপড় কেটে নিয়ে ফোটোর জন্তে বিছানার চারদর তৈরি করেছিলেন। ফোটোর স্থখ-স্থবিধার দিকে মায়ের নজর ছিল খুব। নিজের বালিশ থেকে একমুঠো তুলো বার করে ফোটোর জন্তে একটা লেপ তৈরি করেছিলেন মা। ঘরের বাইরে, দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি দু-একদিন লক্ষ্য করেছিলাম যে, রাত্রিতে তিনি তখনই হয়ে আট ইঞ্চি মঞ্চের ওপর বাবার জন্তে শয্যা রচনা করছেন। দু-মিনিটের কাজটা তাঁর শেষ করতে আধ ঘণ্টা লাগত। ফোটোখানাকে শুইয়ে দিয়ে তিনি লেপ দিয়ে ঢেকে দিতেন। তারপর মশারিটা ফেলে দিয়ে তিনি দু-চার মিনিট চেয়ে থাকতেন সেই দিকে। ঘরে যে নারায়ণশিলা

আছে সে কথা যেন মার মনেই থাকত না। ফুঁ দিয়ে
প্রদীপটা নিবিয়ে দিয়ে ঠাকুর-ঘর থেকে বেরিয়ে
আসতেন তিনি।

প্রায় চার বছর হ'ল মা আর পূজা করতেন না।
তাকে আর ঠাকুর-ঘরে ঢুকতে আমি কখনও দেখি নি।
একদিন আমি নিজের গিয়ে ঠাকুর-ঘরে ঢুকে পড়লুম।
বাবার ফোটোখানা দেখতে পেলুম না। বহু-পরিবারের
দেবতা দেখলুম মশারির নীচে শুয়ে আছেন। ফুল-
বেলপাতা শুকিয়ে সব চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ঘরে
ধূলা এবং আবর্জনার পরিমাণও কম নয়। আজ মনে
হচ্ছে, আমার কাছে লক্ষা পাওয়ার জন্তে নয়, তিনি
নিশ্চয়ই দেবতার ওপর বিশ্বাস হারিয়েছিলেন বলেই জীবনে
আর কোনরকম পূজার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন নি।
বহু-পরিবারের দেবতা যখন আগ্রহ অবস্থায়ও কিছুই
দেখতে পান না, তখন তাঁকে ঘুম থেকে তুলে ফুল-বেলপাতা
দিয়ে পূজা করবার দরকার কি? দেবতার ওপর অভিমান
ক'রে মা বাবার ফোটো পূজা করাও যুক্তিহীন বলে
বিবেচনা করেছিলেন। শীতকালে কার না লেপের তলায়
গিয়ে শুতে ইচ্ছে করে? কিন্তু ছবিটাকে লেপের তলায়
শুইয়ে রেখে তিনি কার ইচ্ছা পূরণ করছিলেন? বাবার
নিশ্চয়ই নয়।

ভবতোষকে বললুম, বাবার ফোটোখানা আমি নিয়ে
যাচ্ছি।

হ্যাঁ, পাকা সোনার ক্রেম।—বললে ভবতোষ।

সোনার ওপর আমার লোভ নেই।—আমি খেয়ে
গেলুম।

তবে নিচ্ছ কেন?—জিজ্ঞাসা করল ভবতোষ।

বাবার একটা চিহ্ন আমার কাছে থাকা উচিত। বাবার
অভাব তো মায়া পূরণ করতে পারবেন না। তা ছাড়া
বাবার পরিচয় দিয়েই তো আমার পরিচয়...বাবার বহু
উপাধিটা আমার নিজের উপাধি হয়ে থাকবে চিরদিন।

চিরদিন কেন?—একটু হেসে ভবতোষই তার জবাব
দিল নিজে, একদিন তো তোমার উপাধি বদলে যাবে,
বহুর পরিবর্তে—

কথাটা ওকে শেষ করতে না দিয়ে আমি বললুম, নাও,
ট্রান্সটা এবার তোমাদের বাড়ি নিয়ে চল। ইস্কুলের

হেডমিস্ট্রেস হরমাদির সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে।
চল।

ভবতোষ আমার ট্রান্সের ওপরে বইয়ের প্যাকেটটা
রেখে ট্রান্সটা মাথায় তুলে ফেলল। বিছানাটা ওদের
বাড়িতেই রয়েছে। আমি জানলা-দরজা সব বন্ধ ক'রে
এনে দাঁড়ালুম ভবতোষের পাশে। বললুম, তুমি চল,
আমি একবার ঠাকুর-ঘরটা দেখে আসি।

বলিষ্ঠ ভবতোষ ট্রান্সে মাথাটা আমার দিকে ঘুরিয়ে
খানিকটা বিরক্তির সুরেই বললে, আর ছ'বছর পরে তুমি
ম্যাট্রিক দেবে, তুমি রীতিমত শিক্ষিত হয়ে উঠেছ, তোমার
কেন এসব কুসংস্কার থাকবে জমা?

গত দশ পুরুষের মধ্যে বহু-পরিবারের কেউ তো
তোমার মত শিক্ষিত ছিলেন না। তা ছাড়া তাঁরা কেউ
ফানার ছবোয়ার মত হেডমাষ্টারের কাছে পড়বার
সুযোগও পান নি। তাই কুসংস্কারটা আজও আঠার মত
বহু-পরিবারের শেষ সন্তানের মনেও আটকে রইল।

বহু-পরিবারের তুমি শেষ সন্তান নও। বাবা খবর
পেয়েছেন যে, এলাহাবাদে তোমার আরও একটি বোন
আছে। তোমার সংসার মেয়ে।

তা হোক, আজ তো সে এখানে উপস্থিত নেই।—
এই বলে আমি ঠাকুর-ঘরের দরজা খুলে ভেতরে গেলাম।
লম্বা বারান্দার এক কোণায় ভবতোষ ট্রান্সটা মাথায় নিয়ে
দাঁড়িয়ে রইল।

নারায়ণশিলার মাথার ওপরে মশারি টাঙানো ছিল।
কয়েক বছর থেকে মা মশারিটা আর তোলেন নি।
সেই যে তিনি নারায়ণশিলাকে লেপ দিয়ে মুড়ে শুইয়ে
দিয়েছিলেন, আজও তিনি ঠিক তেমনি ভাবে শুয়ে
আছেন। আমি ধূলা ও আবর্জনা সব নিমেষের মধ্যে
পরিষ্কার ক'রে ফেললুম। বিছানা থেকে নারায়ণশিলাকে
তুলে এনে বসিয়ে রাখলুম তাঁর সিংহাসনে। ফুল
বেলপাতা সংগ্রহ ক'রে আনবার আর সময় ছিল না।
মনে মনেই আমি বহু-পরিবারের হয়ে দেবতার কাছে
ক্ষমা ভিক্ষা করলুম। তখন বুঝতে পারি নি বটে, কিন্তু
আজ এই দীর্ঘ তিরিশ বছর পরে মনে হচ্ছে, ক্ষমা তিনি
আমাদের করেছিলেন। নিশ্চয়ই করেছিলেন।

ভবতোষ এই সময় কর্কশ গলায় চৈচিয়ে উঠল, কি, হচ্ছে

কি জয়া? তোমার এই ট্রাক মাথায় নিয়ে আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না।

বাইয়ে এসে বললুম, সামান্য একটা ট্রাক বইতে বৈধ হারিয়ে ফেললে, আর আমার মত—

মুচকি হেসে ভবতোষ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, তোমার বোকা বইতে আমার একটুও কষ্ট হবে না জয়া। ভারি তো ওজন তোমার!

তবে সত্য রেগে উঠলে কেন?

তোমাদের ওসব ঠাকুর-ঘর-টার আমার ভাল লাগে না।

ভবতোষ, বহু-পরিবারের কেউ তো আর এখানে রইল না, কিন্তু বাস্তব তাঁদের রইল। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি একটা কথা বলে আসি।

আমার কথা শুনে ভবতোষ রাগ করে সিঁড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। আমি ঠাকুর-ঘরে তালি লাগিয়ে দিয়ে বাইরে থেকেই বহু-পরিবারের দেবতার কাছে বলে এলুম, আজ থেকে কেউ তোমায় ঘুম পাড়াতে আসবে না। এখানকার সব কিছু তোমায় যে দেখতে হবে ঠাকুর।

ভবতোষ তাদের বাড়িতে এসে ট্রাকটা নামিয়ে রেখেছে। একটু পরেই আমিও এসে উপস্থিত হলুম। মাসীমা সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর হাতে চাবির তোড়াটা দিয়ে বললুম, ভবতোষকে নিয়ে আমি একটু হুরমাদির বাড়ি যাচ্ছি। তোমার কোন আপত্তি নেই তো মাসীমা?

না মা। ভবতোষ সঙ্গে থাকলে, আমার কোন ভাবনাই থাকে না।

মাসীমার কথা শুনে ভবতোষ একটু হাসল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সে ডান হাত দিয়ে দেওয়ালে একটা ঘুমিয়ে বসল। দেওয়াল থেকে কতগুলো চুন হুরকি খসে পড়ল মেঝেতে।

মাসীমা বললেন, নে, খুব হয়েছে। তোরা সবাই মারাপট করতেই আনিস। বয়সে তুই জয়ার চেয়ে তিন বছরের বড়, অথচ লেখাপড়ায় ওর সঙ্গে তোর তুলনাই হয় না।

না না মাসীমা, এমন কথা বলো না, ভবতোষ আজ-কাল লেখাপড়ায় খুব উন্নতি করেছে। চল, এবার আমরা

যাই। আমার তো সব গোছানো হয়ে গেছে, মাঝাবাবু এলেই রওনা হতে পারব।

ভবতোষকে নিয়ে আমি চলে এলুম হেডমিস্ট্রেস হুরমাদির বাড়িতে।

হুরমাদি তাঁর বাচ্চাকে চান করাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার জয়া?

বললুম, কাল আমার মা-মারা গেছেন। আজ দুপুরের গাড়িতে আমার সঙ্গে কলকাতা চলে যাচ্ছি।

আমার কথা শুনে তিনি তাঁর বাচ্চাকে খির হাতে দিয়ে উঠে এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে। খুবই অস্বাভাবিক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মার যে এত বড় অস্বাভাবিক, কোনদিন তো বল নি?

অস্বাভাবিক যে মার কি ছিল, তাই তো আমি জানতুম না।

কিন্তু— হুরমাদি একটু ভেবে নিয়ে বললেন, তোমাকে দিয়ে আমরা কত বড় আশা করছিলাম জান? ম্যাট্রিক পরীক্ষায় তুমি প্রথম স্থান অধিকার করতে পার আমাদের বিশ্বাস। সেই ক্ষেত্রে অষ্টম শ্রেণী থেকেই আমরা তোমার প্রাইভেট কোচিংয়ের ব্যবস্থা করে রেখেছি। জয়া, তোমার মামা যদি সামান্য কিছু টাকা দেন, তা হলে তুমি অনায়াসেই ইন্সুলের বোর্ডিংয়ে থাকতে পার।

আচ্ছা, মামাকে আমি জিজ্ঞাসা করে দেখব।

কিন্তু বার্ষিক পরীক্ষার আর দু মাস বাকি, এখন কলকাতা গেলে কি তোমার একটা বছর নষ্ট হবে না?

নাও হতে পারে। মামার ওপর সব নির্ভর করছে।— এই বলে আমি হুরমাদির পায়ের ধুলো নিলুম। তিনি এক রকম মরিয়া হয়েই আমার জিজ্ঞাসা করলেন, কেউনগড়ে তোমার কি কোন আত্মীয়স্বজনও নেই?

ছোট মামার কথা মনে পড়ল আমার। কিন্তু তাঁর পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলুম না আমি। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ভবতোষ একটা পেয়ারা চিবচ্ছিল। হুরমাদি শেষ প্রশ্নটা শুনে পেয়ে সে কস করে বলে ফেললে, কেউনগরের ছোট ম্যাডিস্ট্রেট সাহেব তো জয়ার আপন মামা।

আমি আর দেরি করতে পারলুম না। ভবতোষের

দিকে হাঁটতে হাঁটতে পেছন ফিরে বললুম, আমি চললুম
স্বপ্নমাদি।

ভবতোষকে নিয়ে আমি বেরিয়ে এলুম। ভবতোষের
আগেই রাস্তাটা পার হয়ে এলুম আমি। সদর-রাস্তা
দিয়ে হাঁটতে আমার লজ্জা করছিল। বিষম লজ্জা।
লজ্জা আমার নিজের জন্তে নয়, লজ্জা হচ্ছিল ছোট
মামার জন্তে। জর্নেকা স্বামী-পরিত্যক্তা নারীর এক
কজা তাঁর ডায়ী, তেমন খবর লোকের কানে গেলে
ছোট মামা মুখ দেখাবেন কি করে? পচা-গলা হিন্দু-
সমাজকে শক্তি এবং সমুদ্বিগলী করবার জন্তে এঁরা বিলেত
থেকে পাস করে এসেছেন। তাঁদের মুখে আমি চুনকালি
মাখাই কি করে? সদর-রাস্তা দিয়ে আমি আর হাঁটতে
সাহস পেলুম না। ডান দিকের একটা মস্ত বাগান-বাড়ির
মধ্যে ঢুকে পড়লুম। চোখ ফেটে আমার জল আসছিল।
কোথায় কার জন্তে যেন আমি এই মাত্র ব্যথা পেয়ে এলুম—
তীব্র ব্যথা। আর একটু ব্যথা বাড়লে বুঝি আমার
পাঁজরাগুলো ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে। আমি একটা লিচু-
গাছের তলায় এসে দাঁড়িয়ে গেলুম। গাছের গুঁড়িতে
হেলান দিয়ে উল্টো দিকে মুখ করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে
কান্ডাতে লাগলুম আমি।

ভবতোষ এসে পৌঁছে গেল একটু পরে। আমাকে
কান্ডাতে দেখে সে খুবই অবাক হয়ে গেছে। কায়ার
কারগটা সে বুঝতে পারে নি। সারাটা জীবন ধরেই
কান্ডালুম। এই গ্রন্থটাও কান্ডাছে, কিন্তু ভবতোষ তার
আওয়াজ শুনতে পার নি। গত তিরিশ বছরের মধ্যে সে
আর দ্বিতীয়বার আমার চোখে এক ফোঁটা জল দেখে নি।
দেখতে পায় নি বহুসংখ্যক স্বপ্নের ওপর দিয়ে কোটি কোটি
হতভাগ্যের চোখের জল প্লাবনের মত বয়ে চলেছে।
এ জল চোখ দিয়ে দেখা যায় না বলেই ভবতোষ দেখতে
পায় নি। কেবল চোখ দিয়ে সংসারের কতটুকু দেখা
যায়? কোন্ মহাত্মাশ্রীর অঙ্গিগোলকে জীবনের কোন্
সত্য ধরা পড়ল? হৃদয় যেখানে হৃদয়ের সঙ্গে মিশে যেতে
পারিল না, সৃষ্টি সেখানে ইলিউশন ছাড়া আর কিছু নয়।
গত তিরিশ বছরে কেউ আমার মুখে এমন কথা শোনে
নি। ‘নিছক অস্তিত্বের বাইরে আমি তখন কোন সত্য
খুঁজতে বাই নি। যে সত্য স্পষ্ট আমার অভিজ্ঞতায় ধরা

পড়ে নি, তাকে কোনদিনও আমি সত্য বলে স্বীকার করি
নি। ‘নিছক অস্তিত্ববাদ’ই ছিল আমার জীবনদর্শন।
তাকে কেন্দ্র করে কি বিরাট কাহিনীই না রচিত হয়েছে।
সে কাহিনী আমি তোমার কাছে ক্রমে ক্রমে উদ্ঘাটিত
করব। এখন আমি আবার ফিরে যাচ্ছি সেই তিরিশ বছর
আগে, লিচুগাছের তলায়।

ভবতোষ এসে আমার জিজ্ঞাসা করলে, কান্ডাছ কেন?

চোখের জল মুছে বললুম, এমনি। বোধ হয় কেউনগর
থেকে বিদায় নিচ্ছি বলে। বড্ড দেহরি হয়ে গেছে, চল,
এ দিক দিয়ে চলে যাই।

এর চেয়ে আরও একটা শর্ট-কাট রাস্তা আছে।—এই
বলে ভবতোষ পূর্বদিকে হাঁটতে লাগল। আম আর লিচু
গাছের মস্ত বড় বাগান এটা। ভবতোষের সঙ্গে হাঁটতে
হাঁটতে এসে উপস্থিত হলুম একটা ছোট্ট দরজার বাইরে।
খিড়কি বলেই মনে হ’ল। ভবতোষ ধাক্কা দিয়ে দরজা
খুলে বললে, এস। ঢুকতে আমি একটু ইতস্তত করছি
দেখে ভবতোষ আমার হাতে মুহূর্তে টান দিয়ে ভেতরে
নিয়ে এল। সামনেই একটা একতলা ছোট্ট বাড়ি।
নতুন বাড়ি। বাড়িটার উঠানে ফুলের বাগান। সিঁড়ির
ধার ঘেঁষে প্রায় চল্লিশটা ফুলের টব সাজানো রয়েছে।
টবের মধ্যে তিন-চার রকমের গোলাপ ফুল—তাদের ভিন্ন
ভিন্ন রঙ। ডান দিকে দেখলুম, পাথর দিয়ে একটা
নকল পাহাড় তৈরি করা হয়েছে। লতাপাতা দিয়ে
পাহাড়ের ওপরটা ঢাকা। ভবতোষ বললে, পাহাড়টার
ভেতরে একটা হুড়ঙ্গ আছে, দেখবে? সে ওইদিকে এগুতে
লাগল। আমিও চললুম ওর পেছনে পেছনে। হুড়ঙ্গটার
মুখের কাছে এসে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, এ কোথায় নিয়ে
এলে আমার?

ভবতোষ অতি সংক্ষেপে জবাব দিল, গোটো।

ভেতরে ঢুকে আমি বুঝতে পারলুম, এটা মিশনারিদের
গির্জার মত কিছু একটা হবে। হুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে
ভবতোষ আমায় নিয়ে এল একটা ঘরের সামনে। ঘরে
পর্দা ঝুলছিল। ভবতোষ বললে, আমাদের হেডমাস্টার
ফাদার জুবোয়ার অফিস এটা। তোমার কথা তিনি
জানেন।

কি করে জানলেন?—আমি ওঁকে জিজ্ঞাসা করলুম।

আমিই বলেছি। তা ছাড়া তুমি যে লেখাপড়ায় এই শহরের সবচেয়ে সেরা ছাত্রী, সে খবর হেডমাস্টারদের কারও অজানা নেই।

আমায় এখানে নিয়ে এলে কেন ?

ফাদার ছুবোয়ার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব। আর হয়তো তুমি কেউনগরে আসবে না।

আসব, আসব ভবতোষ। বড় ঘেরি হয়ে যাচ্ছে—মামা হয়তো এতক্ষণে এসে গেছেন।

ফাদার ছুবোয়া অফিসে ছিলেন না। তাঁর বেয়ারা খবর দিল, এফুনি তিনি এসে যাবেন। ভবতোষ বললে, ততক্ষণ এস, দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলো আমরা দেখি।

যীশুখ্রীষ্টের বিভিন্ন অবস্থার ছবি। ভবতোষ প্রায় সবগুলো ছবিরই নাম জানে দেখলুম। ঘটনাগুলোও সে মোটামুটি জানে। প্রত্যেকটা ছবির কাছে দাঁড়িয়ে সংক্ষেপে সে ঘটনাগুলো বলতে লাগল। শেষ ছবিটার কাছে এসে ভবতোষ বললে, এই জায়গাটার নাম কালভারি। দুপুরের আগেই ইহুদীরা যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল। ওরা দুজন চোরকেও ধরে এনেছিল সঙ্গে। সেই চোর দুজনকে যীশুর ডান দিকে ও বাঁ দিকে ক্রুশবিদ্ধ করা হ'ল। যীশু তখন বললেন—হে পিতা, এদের তুমি ক্ষমা কর; এরা জানে না এরা কি করছে।

এই সময় ফাদার ছুবোয়া এলেন। ভবতোষকে দেখতে পেয়ে তিনি বাংলায় বললেন, কি খবর ভবতোষ ?

জ্যা আজ কলকাতা চলে যাচ্ছে ফাদার। আমি তাই ওকে এখানে নিয়ে এলুম।

ফাদার ছুবোয়ার অফিস-ঘরে এসে বসলুম আমরা। আমাদের পরিবারের দু-চারটে খবর তিনি জানতে চাইলেন। সব শুনে তিনি বললেন, মাত্র দুটো মাসের জন্তে পরীক্ষাটা বন্ধ করা উচিত নয়। একটা বছর নষ্ট হওয়া কি সোজা কথা? ভবতোষদের বাড়িতে থাকতে পারা যায় না ?

আমার দিক থেকে কোন অসুবিধে ছিল না, কিন্তু মামার হয়তো আপত্তি হবে। এখন চলি, বড় ঘেরি হয়ে গেছে। আবাব যখন কেউনগর আসব, তখন আপনার সঙ্গে এসে দেখা করব।

বড় খুশি হয়েছি তোমাকে দেখে। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।—ফাদার ছুবোয়া চোখ বুজে মিনিটখানেক সময় মনে মনে মন্ত্র উচ্চারণ করলেন।

বাড়ি ফিরে শুনেতে পেলুম, মামাবাবু একটু আগেই এসে গিয়েছেন। তিনি সঙ্গে করে একজন ব্রাহ্মণ-পুরোহিত নিয়ে এসেছিলেন। বন্ধু-পরিবারের প্রতিষ্ঠিত নারায়ণশিলা তিনি এখানে ফেলে যেতে পারেন না।

মামার কথা শুনে মাসীমা মস্তব্য করেছিলেন, নারায়ণশিলাও তো আপনার সঙ্গে কলকাতা যেতে পারেন।

পারতেন, কিন্তু সেখানে স্থানের বড় অভাব।

জমার যদি স্থানের অভাব না হয়, তা হ'লে তিন পোয়া ওজনের পাথরটুকুর জন্তে স্থানের অভাব হবে কেন ?

আপনি ব্যস্ত হবেন না, ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের বাড়িতে প্রতিদিন তিনি পূজা পাবেন। আমি কলকাতা থেকে ব্রাহ্মণটিকে মাসে মাসে পাঁচ টাকা করে পাঠাব।

মাসীমার কাছ থেকে চাষি নিয়ে তিনি ঠাকুর-ঘর খুলে ব্রাহ্মণটিকে নারায়ণশিলা দিয়ে ব'লে দিয়েছেন যে, বাবা যদি কোনদিন এখানে এসে তাঁর নারায়ণশিলা ফিরে চান তো তাঁকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

মামা যখন ও-বাড়ি থেকে ফিরে এলেন আমার তখন খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। মাসীমা বললেন, এক মাস মাছ মাংস খাস নে জ্যা। কলকাতায় কিন্তু শিক্ষিত লোকেরা ধর্ম মানে না। আমাদের কথা কি তাঁর মনে থাকবে ?

থাকবে মাসীমা। ভবতোষ ম্যাটিক পাস করলে ওকে কলকাতা পাঠিয়ে দিও।

মামাকে দেখতে পেয়ে মাসীমা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে গেলেন। মামাকে অসুবিধের জ্বরেই তিনি বললেন, জ্যাকে দুটো মাসের জন্তে আমার এখানে রেখে গেলে ভাল হ'ত। নইলে ওর তো আর পরীক্ষা দেওয়া হবে না। একটা বছর শুধু শুধু নষ্ট হবে।

মামা বললেন, পরীক্ষার জন্তে মেয়েদের এত ঝগড়া করে লাভ কি ? তা ছাড়া বছর তিন-চার পরে ওর বিয়ে আমি দিয়ে দেব। টেঁশনে যাওয়ার সময় হ'ল। ধারে-কাছে কোথাও ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া যাবে না ?

মাসীমা বললেন, ভবতোষ ডাকতে গেছে। এখনি সে পৌছে যাবে। আপনি কিছু খাবেন না? আপিসে যাওয়ার আগে উনি বার বার ক'রে—

বাধা দিয়ে মাসীমা বললেন, না না, আমি অপূর্বর ওখান থেকেই খেয়ে এসেছি।

এই সময় ভবতোষ এসে বললে, গাড়ি এসেছে। জন্মার ট্রাক আর বিছানাটা তুলে দেব কি?

মাসীমা ভেতর থেকে বললেন, খোকা, মামাবাবুর বাক্সটাও তুলে দিস।

মাসীমার পায়ে ধুলো নিয়ে আমি মামার পেছনে পেছনে এসে গাড়িতে উঠলুম। ভবতোষ আমার ট্রাক আর বিছানাটা মাথায় নিয়েছে, আর মামাবাবুর স্টকেসটা নিয়েছে হাতে ঝুলিয়ে। গাড়োয়ান ওপর থেকে মালগুলো

সব টেনে তুলে নিল। মামাবাবু আমার বললেন, ওকে বল না ওপরে উঠে বসতে। ভবতোষকে কিছু বলবার আগেই সে গাড়োয়ানের পাশে বসে পড়েছে।

স্টেশনে এসে পৌছবার একটু আগেই বড় মামা জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ রে, তোর মাসীমার কথা মনে পড়ে?

না, ছেলেবেলায় একবার দেখেছিলুম, কিন্তু এখন আর মনে নেই।

তোকে গেলে তাঁর খুব সুবিধেই হবে। শরীরটা ভাল নেই তাঁর। কোলের বাচ্চাটা দিনরাত চেষ্টায়। এই যে স্টেশনে এসে গেছি।

গাড়ি থামতেই মামা নেমে গেলেন। আমিও নামলুম। ছোটো কুলী এসে দাঁড়াল মামার সামনে। তিনি বললেন, আমার স্টকেসটা আমিই নিতে পারব।

ভবতোষ বললে, না না, আপনি বরং টিকিট কাটতে যান, আমিই সব মাল নিয়ে আসছি।

বেশ, বেশ।—কুলী-ভাড়াটা বেঁচে গেল ব'লে মামা জুতপদে ছুটে গেলেন টিকিট-ঘরের দিকে। কুলী ছোটো অবাক হয়ে চেয়ে ছিল ভবতোষের দিকে। ভুল্ললোক স্তম্ভলীকিত্তে এরা মাথায় ক'রে কোনদিনও মোট বইতে দেখে নি। আমি কিন্তু ভবতোষের দিকে চাইতে পারছিলাম না। গায়ের জোর বেশি ব'লে যদি ভবতোষ মোট বইত, আমার তাতে কোন আপত্তিই হ'ত না। আপত্তির কথা উঠেছে এই জন্তে যে, বড় মামা কুলী-ভাড়াটা বাঁচাবার জন্তে

ভবতোষের মাথায় মোট চাপিয়ে দিতে দ্বিধা করলেন না।

ওয়েটিং-রুমে এসে বসলুম আমি। ভবতোষ মাথায় মোট নামিয়ে রাখল আমার সামনে। ওয়েটিং-রুমে আরও অনেক লোক ছিল। তারা সব অবাক হয়ে ভবতোষের দিকে চেয়ে ছিল। ভবতোষ যেন সাবেক বাংলার বিজ্ঞানাগরকেও হার মানিয়ে দিয়েছে।

মামার আসতে দেয়ি হচ্ছে দেখে আমি আঁচল থেকে সেই দশ টাকার নোটখানা খুলে ভবতোষকে দিয়ে দিলুম। ভবতোষ জিজ্ঞাসা করলে, মোট বইবার মজুরী না কি?

না, তুমি টাকাটা পকেটে রেখে দাও। না, ফিরিয়ে আমি নেব না। পকেটে রেখে দাও, ওই মামা এসে গেছেন।

ভবতোষ নোটখানা পকেটে রেখে দিল।

মামা এসে বললেন, ইনটার ক্লাসে উঠব। ভবতোষ, ট্রেন আসতে আর দশ মিনিট বাকি, কোথায় যাচ্ছ?

না, যাচ্ছি না, এখানেই আছি।

দশ মিনিট পরে ট্রেন এল। ভবতোষের মাথায় মোট তুলে দিতে মামা সাহায্য করলেন। গাড়িতে উঠে তিনিই ওর মাথায় ওপর থেকে বিছানাটা টেনে নিলেন। বাকি মাল ছোটো ভবতোষ গুছিয়ে রেখে দিল বেকের তলায়। গার্ড সাহেবের বাঁশি বেজে উঠতেই ভবতোষ লাফিয়ে নেমে গেল নীচে। আমি জানলা ঘেঁষে বসে ছিলাম। ভবতোষের কানের কাছে মুখ এগিয়ে বললুম, ম্যাটি ক পাস ক'রে কলকাতায় এসো কিন্তু। চিঠি লিখো, ডাক-টিকিটের জন্তে তোমায় আমি দশটা টাকা দিয়ে গেলুম।

ট্রেন বেরিয়ে গেল। প্রায়টফর্মের শেষ সীমা থেকে দেখলুম, ভবতোষ তখনও চূপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। দৃষ্টি তার আর গাড়ির দিকে নেই, মাথা নীচু ক'রে সে কি যেন ভাবছে। আমার কিন্তু মনে হ'ল, ভবতোষ ভাবছে না, ভবতোষ কাঁদছে।

এতটা লেখবার পরে মিস জন্মা বহু পরিশ্রান্ত বোধ করতে লাগলেন। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন, প্রভাত্য সমাগত। বেড়-সুইচটা টিপে দিতেই বাতি নিবে গেল। চতুর্থ রাত্রি শেষ হয়ে যাচ্ছে। কি এক অজ্ঞাত কারণে

জয়া বহু ক্রমশই স্বস্থ বোধ করছেন। এষাবৎকাল তিনি ভেবে এসেছেন যে, মাহুষের স্বাস্থ্য থাকলেই তবে সে স্বস্থ বোধ করে। কিন্তু জয়া বহু তাঁর স্বাস্থ্য হারিয়েও কাশিয়ন্ত্রের উচুতে উঠে স্বস্থ বোধ করছেন কি করে ?

বিছানা থেকে উঠলেন তিনি। পূর্বদিকের জানলাটা ও খুলে দিলেন। প্রত্যুষের হাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ভাল। ও-পাশের ঝাউগাছটার পাতাগুলো জানলার কাঁচ ছুঁয়ে থাকে। জয়া বহু জানলা খুলে এবার ঝাউপাতাগুলো হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে খেলা করতে লাগলেন। শিশির-ভেজা পাতাগুলো মাঝে মাঝে তিনি ঠোঁট পৃষ্ঠ টেনে এনে হঠাৎ কি রকম অন্তরমনক হয়ে পড়ছিলেন...। না, থাক, পাতার মধ্যে কত আবর্জনা জমে আছে তা কে জানে। মিস জয়া বহু দেখলেন, পূর্ব আকাশ একটু একটু ক'রে সাদা হয়ে আসছে। দিনের বেলায় ঝাউপাতা কেবল ঝাউপাতাই, রাত্রির মাদকতা সে দিনের আলোয় ধ'রে রাখতে পারে না।

জয়া বহু কি মনে ক'রে একবার নীচের দিকে দৃষ্টি ফেললেন। টুপ টুপ ক'রে বৃষ্টিবিন্দুর মত হিম পড়ছে। হিম তিনি চোখে দেখতে পেলেন না বটে, কিন্তু একটা মাহুষের ছায়া যেন এসে থেমে গেল ঝাউগাছের গুঁড়িটার সঙ্গে হেলান দিয়ে। চমকে উঠলেন জয়া বহু। ছায়াটার সঙ্গে অমিতাভ সেনের কি অভূত সাদৃশ্য। বাঁ হাতের বঙ্গলের নীচে 'ক্রাচ' রেখে সে হাঁটে। বাঁ পাটা ওর কেটে ফেলতে হয়েছিল—প্রায় সবটাই কেটে ফেলতে হয়েছিল। ছুনিয়া-স্বচ্ছ লোক জানে, পা-টা কাটবার আগেই ওর শারীরিক ক্ষতি বা হয়েছিল তাতে আর অমিতাভ সেনকে 'পুরুষ' না বললেও চলে। হাত-বোমাটা এসে লেগেছিল ওর জ্ঞানহীন ওপরে, কতটা ওপরে ছুনিয়া-স্বচ্ছ লোক সবাই তা জানে। বাঁ চোখটা ওর পাখর দিয়ে তৈরি। তবে একটা চোখ দিয়েই অমিতাভ বা দেখে, তা বোধ হয় খণ্ডিত বাংলায় আড়াই কোটি লোক এক সঙ্গেও তা দেখতে পায় না। অমিতাভ সেন শিল্পী। উচুদরের শিল্পী। ফরাসী সেনাবাহিনী বেলজিয়াম শীমান্ত থেকে হ'টে বাবার সময় ম'সিউ. অমিতাভ সেন ভীষণভাবে আহত হন। হাত-বোমার টুকরো-টাকরা এসে লুটিয়ে পড়ে ডান হাতের ওপর। ফরাসী সার্জেন দ্বিতীয় বার চিন্তা না ক'রে ওর

ডান হাতটা কেটে কোথায় যে ফেলে দিল অমিতাভ তা জানতে পারল না। তবু বাঁ হাত দিয়েই অমিতাভ বা ছবি আঁকে, তেমন ছবি ঠাকুর-বাড়ির অগণিত হাতও আঁকতে পারে নি। এ মস্তব্যটা জয়া বহুর নিজের।

অমিতাভ সেনের ঠাকুরদা থাকতেন চন্দননগরে। এটা ছিল ওদের বংশ-পরিচয়ের পাকা ঠিকানা। বাবা ছেলেবেলায় প্যারিসে গিয়েছিলেন পড়তে। সেখানেই তিনি জীবন কাটিয়েছেন। চন্দননগরে আর তিনি কোন-দিনই আসেন নি। অমিতাভ জন্মগ্রহণ করে প্যারিসে, প্রতিপালিত হয় ফরাসী মায়ের কাছে। বাবার কাছে বাংলা শিখেছে বাঙালীর মত, মায়ের কাছে ফরাসী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার বছর দুই আগে অমিতাভ এসেছিল দেশে দেখতে। চন্দননগরের বাড়িটা সে দেখল নিল দেশ ছাড়বার আগেই। নীচের তলায় ভাড়াটে বসিয়ে গেল, দোতলাটা সে রেখে গেল নিজের জন্তে। পরের বছর মাকে নিয়ে সে এখানে এসে থাকবে ব'লে মার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে এসেছিল। তখন বাবা ওর বেঁচে ছিলেন না। প্যারিসে ফিরে গিয়ে সব গোছগাছ করতে প্রায় একটা বছর কেটে গেল। ফরাসীরা তখন নাৎসীদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে। ইংরেজ বণিক মিস্টার চেম্বার-লেনের উদ্দেশ্য বুঝতেও এদের কষ্ট হ'ল না। অমিতাভর ফরাসী মা বললেন, যে ছেলে মাহুত্মিয় জন্তে লড়তে চায় না, তাকে তার রক্ত-মাংসের মাও সম্মান ব'লে স্বীকার করে-না।

যুদ্ধবিগ্রহের প্রতি অমিতাভর ছিল অপরিণীম ঘৃণা। ভারতীয় রক্ত, বিশেষ ক'রে বাঙালী রক্তের প্রভাব খুব বেশি ছিল ব'লেই অমিতাভ বিনা যুদ্ধেই ভূমি ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী। দু-এক বিধে ভূমি না হয়ে যদি নারা ভারতবর্ষের আয়তনও হয়, তাও-সে বিনা যুদ্ধে ছেড়ে দেওয়ার জন্তে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু ফরাসী মায়ের প্রভাবও কম ছিল না। অমিতাভকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে যোগ দিতে হ'ল। ওর ভাগ্য খুব ভাল ছিল ব'লেই যুদ্ধের প্রথম দিকেই সে আহত হয়। এত বেশি ভাবে আহত হওয়াও ভাগ্যের খুব বেশি জোর না থাকলে হ'ত না। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে অমিতাভ সোজা চ'লে এল মার কাছে। রোমান কাথলিক মা। কিছুতেই তিনি

দরজা খুলতে চান না। একবার দরজা খুলে তিনি চেহারাটা দেখেই ফস ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। মা-গো, মাহুঘের আবার এমন বীভৎস চেহারাও হতে পারে। এমন কি মাও অমিতাভকে চিনতে পারেন নি। প্রায় আধ ঘণ্টা সংগ্রামের পর সে দরজা খোলাতে পারল। সম্ভানের পরিচয় পেয়ে মা তো কেঁদে অস্থির। ঘরে ঢুকে সোফার উপর ব'সে পড়ল অমিতাভ। ডান পা-টা ছড়িয়ে দিল একেবারে টান ক'রে। কাদতে কাদতে মা ওর ডান পায়ে হাত দিলেন না, দিলেন বা পায়ে। কিন্তু বা পা কই? তিনি জাহুর ওপর পর্যন্ত তাঁর অহুসঙ্কিত হাতের পাঞ্জা তুলতে লাগলেন অভ্যস্ত ধীরে ধীরে। জাহুর নীমা প্রায় শেষ হয়ে এল। আতঙ্কে মায়ের বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কতটা পর্যন্ত গেছে রে? কথা শেষ না হতেই সাইরেন বেজে উঠল। মা সহসা হাতটা নামিয়ে নিয়ে বললেন, শিগগির চ'লে আয়।

কোথায়?—জিজ্ঞাসা করল অমিতাভ।

এয়ার-রেড-শেল্টারে।

নিজেকে রক্ষা করবার আজ আর তাড়া নেই অমিতাভর। যেটুকু নিয়ে সে আজ এখানে ফিরে এসেছে, তার অন্তে এত ছোট্টাছুটির দরকার কি? যুদ্ধ শেষ হতে হতে কতটুকু গিয়ে কতটুকু থাকবে, সে সম্বন্ধে কেউ তো কিছু বলতে পারে না। সাইরেন বেজে বেজে ধেমে গেল।

নাৎসীদের উড়োজাহাজে আর বোমা নেই। সবগুলো ফেলে দিয়ে তারা দেশে ফিরে গেল। মা এয়ার-রেড-শেল্টারে যান নি, সম্ভানকে যখন তিনি চিনতেই পেরেছেন তখন নিজের জীবন রক্ষা করবার জন্তে তিনি সেখান থেকে উঠলেন না। ব'সে বইলেন অমিতাভর পায়ের কাছে। তিনি অমিতাভর মধ্যে একটা অদ্ভুত ধরনের গাঙ্গীর্থ লক্ষ্য করলেন। পাথরের চোখটা স্থির হয়ে আছে, অস্ত্র-চোখটার মধ্যে রয়েছে একটা শূন্যতা। শূন্যতা এখনও ঠিক জেঁকে বসতে পারে নি, হালকা মেঘের মত ছুটে বেড়াচ্ছে। তিনি যেন ওর দৃষ্টির মধ্যে দেখতে পেলেন সংগ্রামের তুফান উঠেছে। এ সংগ্রাম ওর সেই শূন্যতার সঙ্গেই। অমিতাভর মধ্যে জন্ম নিচ্ছে নতুন দর্শন।

দশ দিনের মধ্যে অমিতাভ অনেক চেষ্টা ক'রে চ'লে এল ভারতবর্ষে। কটা মাস সে কাটিয়ে এল দার্জিলিংয়ের

জলাপাহাড়ে। সঙ্গে মা ছিলেন। আর যার ওর সঙ্গে থাকবার কথা ছিল, সে আসে নি। কোনদিন আসবেও না। অমিতাভকে জ্বাব দেবার সুযোগ না দিয়ে মারীয়া ব'লে গেল, তুমি তো আর পুরুষমাহুষ নও, আমি কেন আসব ভালবাসতে? অমিতাভ জানে না, মারীয়া আজ কোথায় আছে। হয়তো নার্স হয়ে চ'লে গেছে উত্তর-আফ্রিকায়, হয়তো অন্য কাউকে বিয়ে ক'রে ঘর-সংসার পেতেছে।

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে জন্ম বহু প্রায় দশ বছর আগেকার কথা ভাবছিলেন। অমিতাভকে তিনি চেনেন। কেবল চেনেন বললে সত্য বলা হবে না, অমিতাভকে তিনি গভীরভাবে জানেন। অমিতাভর সঙ্গে দেখা না হ'লে তিনি হয়তো তাঁর জীবনদর্শন খুঁজে পেতেন না। অমিতাভ ভাই চেনা জ্বনের চেয়ে অনেক বড়। একটু আগেই তিনি যেন দেখতে পেয়েছিলেন, ঝাউগাছের গুঁড়িতে একটা লোক তার ক্রাচটা ঠেকিয়ে রেখে নিজে হেলান দিয়ে দাঁড়াল সেইখানে। মনে হ'ল, অমিতাভ সেন এসে দাঁড়াল। পকেট থেকে সিগারেট বার ক'রে এক হাতেই দেশলাই জালাবার চেষ্টা করতে লাগল সে। জন্ম বহুর বাড়িতে তাকে কখনও দেশলাই জালাতে হয় নি। তিনি নিজেই তার সিগারেট ধরিয়ে দিতেন।

কিন্তু অমিতাভই বা এত ভোয়ে এখানে আসবে কি ক'রে? তার সঙ্গে তো জন্ম বহুর দেখা হয় না অনেক দিন, প্রায় এক বছর হবে। তিনি নিজেই তো ওকে একদিন বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সে কেন তবে কাশ্মির পর্যন্ত ছুটে আসবে?

গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে লোকটা সিগারেট খেতে লাগল। সিগারেটের আলোর জন্ম বহু দেখলেন, লোকটা সত্যিই অমিতাভ সেন। অসম্ভব নয়, অবিশ্বাস্য নয়, অমিতাভ সেন ওখানে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে।

জন্ম বহু উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠলেন। আলনার ওপর থেকে একটা গরম কাপড় নিয়ে তড়াতাড়ি গায়ে জড়িয়ে কেললেন তিনি। হঠাৎ তাঁর পায়ে জ্বোর বেড়ে গেল। তিনি কেবল জ্বু বোধ করছেন না, স্বাভাবিক বোধ করছেন। দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন করিডোরে। বেশ লজ্জা করিডোর। পেছন দিকের সিঁড়ি দিয়ে নীচে

নামতে গিয়ে তিনি দেখলেন, নিশীথ দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির মুখে।

এ কি সর্বনাশ করছ দিদিমনি? কোথায় যাচ্ছ?

নিশীথ, অমিতাভ এসেছে। স'রে যানিশীথ।

আমায় বল, আমি ডেকে নিয়ে আসছি।

না, নিশীথ, একদিন আমিই তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম, আজ তাই ওকে অভিনন্দন ক'রে নিয়ে আসতে হবে আমাকেই। রাত্তা ছেড়ে দে নিশীথ।

জয়া বহু কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন নীচে। সত্যিই অমিতাভ ঝাউগাছে হেলান দিয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। অবিরাম করবার আর কিছু নেই।

জয়া বহু জাচটা নিজের হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, অমিতাভ, তুমি এখানে কি ক'রে এলে?

হেঁটে হেঁটে এলুম তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

এত ভোরে, এমন উচু-নীচু রাস্তায় একা একা কেন এলে? কোথায় আছ?

ওই যে বাড়িটা দেখছ, ওখানে ফাদার দুবোয়া আছেন। তাঁদের গেস্ট হাউসে এসে উঠেছি। তুমি তো ফাদার দুবোয়াকে একদিন চিনতে জয়া?

সে তো প্রায় তিরিশ বছর আগে। চেহারাটা আমার মনে নেই। চল এখানে আর নয়—ঘরে চল।

একটু হেসে অমিতাভ সেন জিজ্ঞাসা করল, তাড়িয়ে দেবে না তো?

জয়া বহু কোন উত্তর দিলেন না, কেবল বললেন, এবার আমার কাঁধে ভর দিয়ে চল। কাশ্মিরে যেতদিন থাকবে, আমিই তোমার জাচ হয়ে রইলুম।

বসবার ঘরে এসে বসল ওরা। জয়া বহু অমিতাভর পকেট থেকে সিগারেটের টিন বার ক'রে একটা সিগারেট তার মুখে দিলেন শুঁজে। তারপরে দেশলাই জালিয়েও দিলেন তিনি। দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, লেক প্লেসের কথা মনে পড়ে অমিতাভ?

পড়ে। কিন্তু তোমার বয়স কত হ'ল জয়া?

বোধ হয় চল্লিশ।

আমি বিয়াল্লিশ পার হচ্ছি।—এই ব'লে অমিতাভ সেন চেয়ে রইল জয়া বহুর দিকে। একটু পরে জয়া বহুর

মনে হ'ল, অমিতাভর চোখের শূন্যতা যেন গত এক বছরের মধ্যে ভরাট হয়ে গেছে।

চল্লিশ বছর বয়সে মিস জয়া বহু নতুন রোমান্সের স্বাদ পেলেন। বোধ হয় পেলেনই। খুবই আশ্চর্য বোধ করছিলেন জয়া বহু। জীবনের শেষ দিনটা তিনি দেখতে পেয়েছিলেন ব'লে হিসেব ক'রে হাতের সময়টুকু খরচ করছিলেন তিনি। বেহিসেবী হ'লে সময়ের ক্ষতি আর এ জীবনে পূরণ হ'ত না। কিন্তু চতুর্থ রাত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হিসেবে যেন ভুল ধরা পড়ল। মনে হ'ল, শেষ দিনটা আর সন্নিগটে নেই। জীবনের মেয়াদ বাড়ছে, কারণ স্বাস্থ্য তাঁর নতুন ক'রে দানা বাঁধছে। আজ তিনি কেবল হুঁশ নন, স্বাস্থ্যবতীও।

অমিতাভ জিজ্ঞাসা করলে, নিশীথকে সঙ্গে আন নি? এনেছি। একুনি তোমার জন্তে কফি নিয়ে আসবে। কথাটা শেষ হতে হতেই নিশীথ ট্রেতে সাজিয়ে কফির সরঞ্জাম নিয়ে এল। অমিতাভ জিজ্ঞাসা করলে, কেমন আছ নিশীথ?

ভাল আছি। আপনি ভাল তো?

ভগবানের দয়ায় ভালই আছি।

কার দয়ায়?—কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন জয়া বহু। নিশীথ ছ দিকের দুটো জানলা খুলে দিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পূর্বের আকাশ সাদা হয়ে গেছে। সোফার ওপর ব'সেই অমিতাভ ও জয়া বহু গির্জার চূড়াটা দেখতে পাচ্ছিল। দুজনে ব'সে ছিল পাশাপাশি। কিন্তু এক মুহূর্তের মধ্যেই হঠাৎ যেন এক বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হ'ল—নৈঃশব্দের ব্যবধান। মিনিট পাঁচেক পরে বাইরের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে এসে অমিতাভ বললে, তোমার লেক প্লেসের বাড়ি থেকে তাড়া খেয়ে আসবার পরে আমি আর ছবি আঁকি নি।

এতদিন তবে কি করলে?—কথা বলার অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এমন একটা প্রশ্ন করতে বাধ্য হলেন মিস জয়া বহু।

কি যেন একটা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।

বিয়াল্লিশ বছরে যখন পৌঁছেই গেছ, তখন খুঁজেই বা লাভ কি?

কেন?

খোঁজার সাধনায় হয়তো আরও বিশটা বছর যাবে

কেটে। তখন পেন্সেও ধ'রে রাখতে পারবে না। মানে, ধ'রে রাখতে ইচ্ছে করবে না।

জয়া বহুর কথাটা উড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে উপস্থিত আলোচনার উল্লেখ না ক'রে অমিতাভ বললে, আজকাল আমি কার লেখা পড়ছি জান ?

না তো, কেমন ক'রে জানব ? তোমার সঙ্গে তো আজই এই প্রথম দেখা। তা ছাড়া বিয়াল্লিশ বছরে কাউকে তুমি নতুন ক'রে খুঁজতে পার, কাউকে—মানে, নতুন লেখককে, তা আমি সত্যিই বিশ্বাস করতে ভয় পাচ্ছি। শোনাও তোমার নতুন লেখকের নাম। সেই সঙ্গে দু-চার লাইন নমুনা।

তুমি কি জার্মান ভাষা শিখেছিলে জয়া ?

না।

তা হ'লে বাংলায় অহুবাদ ক'রে বলছি।—অমিতাভ তার কোটের পকেট থেকে একটা বই বার ক'রে বললে, বইটার নাম Das Marien Leben, রাইনার মারীয়া রিলুক-এর লেখা। তোমাকে আমি 'পিয়েতা' কবিতাটা প্রথম শোনাচ্ছি। পিয়েতা কথাটার অর্থ হচ্ছে, স্নেহ-মমতা।—এই ব'লে অমিতাভ বইটার পাতা ওলটাতে লাগল। এক জায়গায় এসে থেমে গেল সে, বললে, কবিতাটির পাশে আমি বাংলা অহুবাদ ক'রে রেখেছিলাম। রিলুক-এর সবটুকু হয়তো বোঝাতে পারছি না, কিন্তু মূল বক্তব্যটি প্রকাশ করতে পেরেছি—

এতদিনে দুঃখ আমার হ'ল পরিপূর্ণ আর অনির্বচনীয়, তা যে দিচ্ছে ভরে আমাকে।

এক দৃষ্টিতে আমি তাকিয়ে আছি এখানে যেমন ক'রে পাষণের সত্তা তাকিয়ে থাকে।

পাষণী হয়েও একটা কথা বুঝি :

তুমি বড় হয়ে পড়েছিলে

...আর বড় হয়েছিলে

যাতে, বড় বেশি ব্যথা হয়ে

আর আমার এই হৃদয়টার নাগালের নেহাতই

বাইরে গিয়ে

তুমি যাতে এগিয়ে দাঁড়াতে পার।

আজ তুমি সোজা আমার কোল জুড়ে শুয়ে আছ,

আজ আর আমি তোমার

ভার সহিতে পারছি না।

জয়া বহু এক দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন অমিতাভের চোখের দিকে। কবিতা শেষ হওয়ার পর জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি পাথরের চোখ দিয়ে আজকাল দেখতে পাও ?

কেন ?

মনে হ'ল, কবিতা পড়বার সময় পাথরের চোখটা তোমার জীবন্ত হয়ে উঠেছে। রহস্তটা কি, অমিতাভ ?

হাসতে হাসতে সে বললে, কফি ঠাণ্ডা হয়ে গেল জয়া।

মিস জয়া বহু পেয়ালায় কফি ঢালতে লাগলেন।

[ক্রমশ]

বিচিত্র

পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়

কতু আমি কর্মবীর :

কাজ শুধু কাজ আর কাজ—

মুহূর্ত বিশ্রাম নিতে নাই বুঝি মোর অবসর।

শুধু নিজে ব্যস্ত নই, ক'রে তুলি বিব্রত অপরে,

তাহার বিশ্রাম-স্থল কেড়ে নিই নির্মম হইয়া।

জানি না গড়ি কি ভাঙি,

ভাল মন্দ তাও বুঝি নাকো;

কাজ ক'রে যাই শুধু অবিরাম কাজের নেশায়।

আত্মপ্রসাদের স্বপ্ন মনে মনে উপভোগ করি।

থেমে যাই কখনো বা :

আরাম বিরাম চাই বিশ্রামের স্বপ্ন।

মনে হয় বুধা পরিশ্রম,

বুধা ছুটে মরা বাজে কাজের খেয়ালে !

জীবনের মূল লক্ষ্য মনে হয় স'রে গেছে দূরে।

এক নয়, দুই-ই চাই অবশেষে ভাবি ধীর মনে।

আলো ও আশার চাই,

ভাঙা চাই, গড়া চাই,

আর চাই স্বপ্ন ও বিবাদ ;

দূরে মিলে এক আর একের ভিতরে একাধিক !

বিচিত্র এ জগতের মাঝে যেন আছে একতান।

দুটি স্মৃতি

জুদিরাম দাশ

ব্যান্ডেল ইন্সটেশনে চাঁদ

রাজপথপাশে মাহুঘের অভিশাপ—
আলোয়া-আগুনে জঠরের জ্বালা কাঁদে
নিশ্বাসে নিশা মরণে মরিয়া যায়,
পল্লু লৌহ শিহরে আর্দ্রনাদে।

তুমি ক্ষুধাতুরা, ঘোড়ারূপী চাঁদ।
তুমিও ক্ষয় অমা-মানিমার রাতে ?
মাহুঘের ঋণ হবে কি কখনো শোধ,
নিফল জ্বালা তাপিত বক্ষ-পাতে ?

তার চেয়ে এম আজ ছুজনায় মরি,
পরিতাপহীন এ পরমা নিবৃত্তি ;
কণ্টকক্লত বসন্ত নহে ক্ষতি,
মনোগলা যে বন্ধন-হত ধারা।
শিবা-অশিবার উল্লাসে হুর্দিন
অপিছে জরতী বহ্মা বহুধরা।

তিস্তার উপর সজ্জা

এ কি তুমি সেই, আমারি সে বিরহিণী,
কত যে খুঁজেছি এতদিনে দিলে দেখা।
ললিত-হাস্ত সংগীত-রঞ্জিনী
এখন বিবশা মৌনবিষাদ-রেখা।

অনিমেঘ আঁধি বিকীর্ণ কেশপাশ
অস্তাক্ষরে আনমনা উদাসিনী,
দৈবের রোষ স্মরি তবু আশা-আশে
উপলব্ধে চলেছ কি দিন গুনি ?

ভীকু ছায়া নামে সেগুনের ঘন বনে,
নেবুর কুঞ্জে মোমাছি গেল ফিরে,
চকিত বলাকা সহসা ফিরিল নীড়ে,
বনবেণু-শিরে কোথায় মিলাল রবি।
সত্যি, তিস্তা, বিশ্বাস কর তুমি,
তোমাকে দেখেছি হারানো স্বপনছবি।

কি আলো নিয়ে ?

অসিতকুমার

কি আলো নিয়ে তোমার চোখে তাকাব নিরুপমা ?
ক্লাস্ত আমি, ক্লাস্ত বড়, আমাকে কর ক্ষমা।
অনেক পথ হয়েছি পার, সারাটা মেহে ধুলো,
কাঁটার মত এখনও বেঁধে অবুর দিনগুলো,
হিসেবে দেখি শূন্যতাই হয়েছে শুধু জমা ;—
কি আলো নিয়ে তোমার চোখে তাকার নিরুপমা ?

হৃদের মত ঘনগভীর শাস্ত গাঢ় চোখে
পড়েছে দূর মেঘের ছায়া। তীরের ছায়ালোকে,
নিবিড় হ'ল নিকট নীমা। মোহিত ঘনতায়—
মাটির মত মমতা তার প্রসাদ পাওয়া যায়।
কি আলো নিয়ে সে চোখে আমি তাকাই নিরুপমা ?
ক্লাস্ত আমি, ক্লাস্ত বড়, আমাকে কর ক্ষমা।

রাতের পরে এসেছে রাত, দিনের পরে দিন,
সৌর-মোহে পৃথিবী বোরে, জীবন গতিহীন।
কি কথা যেন বলার ছিল, হয় নি আজও বলা—
সহসা মনে প্রশ্ন জাগে, কেন এ পথ চলা ?
দম্ভদেহ বৈশাখের তপ্ত নিশ্বাসে,
নিরুদ্দেশ ঘোবনের বেদনা ভ'রে আসে।
কি আলো নিয়ে তোমার চোখে তাকাব নিরুপমা
ক্লাস্ত আমি, ক্লাস্ত বড়, আমাকে কর ক্ষমা।

রাজি আসে নতনীরব, অসীমাকাশময়
পৃথিবী হ'ল মৌন শুধু বাতাস কথা কয়
রাতের বুকে পাতারা কাঁপে, মাটির বুকে ঘাস
আমার বুক কাঁপে কেবল আমার নিশ্বাস।
কি আলো নিয়ে তোমার চোখে তাকাব নিরুপমা ?
ক্লাস্ত আমি, ক্লাস্ত বড়, আমাকে কর ক্ষমা।

ব্রহ্মাণি ব্রাহ্ম্য

শ্রীনিবাসকুমার চক্রবর্তী

৪

চাওয়ালা চিংকারে যখন ঘুম ভাঙল, গাড়ি তখন পলাসায় দাঁড়িয়ে। মৈত্র মশাই এক ভাঁড় চা সংগ্রহ করে বললেন, গাড়ির যা অবস্থা, রাতে ছ'চোখের পাতা এক করা গেল না।

দীর্ঘদিন কলকাতায় কাটিয়ে শ্রীনিবাসলু বাংলা ভাষা রপ্ত করেছেন বাঙালীর মত। স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলতেন—শুধু বলা বা লেখা নয়, চিন্তা করা বা স্বপ্ন দেখা সম্ভব হবে যখন বিদেশীর ভাষায়, তখনই স্বীকার করা চলে যে, সে ভাষা আয়ত্ত হয়েছে। আমি তত গোড়া নই। তাই ভাবি, অন্তের ভাষায় রহস্ত বোকা ও রহস্ত করতে পারাই সে ভাষা আয়ত্তের যথেষ্ট পরিচয়। শ্রীনিবাসলুর বাংলা রহস্তটুকু তাই ভাল লাগল। বললেন, আপনার চোখের পাতা এক না হতেই আমরা চোখ ফেঁড়ে জেগে রইলাম, এক হ'লে হয়তো চোখ দুটোই বেরিয়ে আসত।

আমার হাসিতে মৈত্র মশাই অপ্রস্তুত হলেন। আলাপের বিষয় পালটে বললেন, আমরা কি নতুন অঙ্করাজ্যে প্রবেশ করেছি?

শ্রীনিবাসলু খুশি হলেন মনে হ'ল। ভাঁড়ের চায়ে গোটা কয়েক চুমুক দিয়ে ভাঁড়টা বাইরে ছুঁড়ে ফেললেন। বললেন, বহরমপুর গঙ্গামের পর দুটো স্টেশন পেরিয়েই অঙ্কদেশ শুরু হয়েছে।

এক নিশান্দেই যোগ করলেন, খড়্গপুরের মাইল বত্রিশ দূরে ডানতনে ছেড়েছি বাংলার মেদিনীপুর জেলা, উড়িষ্যার বালাসোর জেলা শেষ হ'ল বৈতরণী রোডে, কটক জেলা চলল ভুবনেশ্বর পৌছবার দু স্টেশন আগ পর্যন্ত। পুরী জেলার শেষ চিহ্নার আগেই, চিহ্না পড়েছে গঙ্গাম জেলায়।

মৈত্র মশাই শ্রীনিবাসলুর ভৌগোলিক পাণ্ডিত্যে হাকিয়ে উঠছিলেন; বললেন, ছেলেবেলায় ভূগোলকে দ্বিবি হজম করেছিলেন দেখছি।

শ্রীনিবাসলু হেসে বললেন, ছেলেবেলায় নয়, চাকরির খাতিরে বড়ো বয়সে শিখতে হয়েছে নতুন করে।

মৈত্র মশাই রেল ল অফিসের কেরানী। কোন্ চাকরিতে ভূগোল পড়তে হয় বুঝতে না পেয়ে তাকিয়ে রইলেন। শ্রীনিবাসলু বুঝতে পেয়েও এই নির্বাক প্রশ্নটি এড়িয়ে গেলেন।

গাড়ি চলছে। দু'ধারে কক্ষ প্রান্তর, মাঝে মাঝে তাল আর নারকেল গাছ ঘেঁষাঘেঁষি ঘনিয়ে আছে। তাল গাছই বেশি, খেজুরও হয়তো আছে। সকালের সূর্য-কিরণ পড়েছে তাদের মাথায় মাথায়।

এই অঙ্ক।

আমার দৃষ্টি অহসরণ করে শ্রীনিবাসলু বললেন, অঙ্ক আজকের দেশ নয় গোপালবাবু।

আমার নামটি স্বাতির ডাকে আবিষ্কার করেছেন বোধ হয়। আমি ফিরে তাকালুম।

ভদ্রলোক বললেন, এ অতি প্রাচীন দেশ। আঙ্ক থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে আর্য সভ্যতার প্রথম বিস্তারের যুগেও অঙ্ক দেশের নাম শুনতে পাওয়া যায়। আর এই উপকূল প্রদেশের নাম ছিল তখন কলিঙ্গ। প্রাচীন ইতিহাসে উত্তর-ভারতে আমরা পনরটি প্রজাতন্ত্রের নাম পাই। আর দাক্ষিণাত্যের মধ্য ও পূর্ব অংশে অঙ্ক ও কলিঙ্গ রাজ্য। মৌর্যযুগে অঙ্ক রাজ্য ছিল মৌর্য-সাম্রাজ্যের অধীনে একটি করদ রাজ্য, তারপরেই এল অঙ্কে স্বর্ণযুগ। সে আঙ্ক খ্রীষ্টপূর্ব দু শো কুড়ি থেকে দু শো তিরিশ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ভারতবর্ষে অঙ্ক তখন সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য। পশ্চিমে আরব সাগর থেকে পূর্বে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত সমগ্র দাক্ষিণাত্য এল এই সাম্রাজ্যের অধীনে।

অশোকের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই অঙ্কে র সাতবাহন রাজারা গোদাবরীর উপত্যকায় এই স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। সাড়ে চার শো বছর ধরে তাঁদের তিরিশ জন রাজা রাজত্ব করেছেন বলে শোনা যায়। কিন্তু ইতিহাসে

আমরা এই বংশের সম্পূর্ণ পরিচয় পাই না। শিলালিপি প্রভৃতি নানা উপকরণ থেকে আজ আমরা সাতবাহন রাজ্যের ইতিহাস রচনা করছি। প্রথম রাজা সিমুকের পর তাঁর ভাই কৃষ্ণ। তৃতীয় রাজা শ্রীসাতকর্ণি অমর হয়ে আছেন তাঁর দানশীলা রাণী নয়নিকার অজস্র উন্মুক্ত দানের অপার মহিমায়। নানা ঘাট অঞ্চলে এই সব কীর্তির কথা আজ উদ্ঘাটিত হচ্ছে। এর পর এলেন নাবালক রাজা বেন্দ্রী ও তাঁর ভাই শক্তিশ্রী সাতকর্ণি। এর দীর্ঘদিন পরে সপ্তদশ রাজা হালের নাম পাই তাঁর আদিশাক্তিত প্রাকৃত কাব্য 'সপ্তশতকে'। যদি মানতে হয় যে, কুশান উজ্জয়িনী আর শক রাজ্যের চাপে সাতবাহন বংশ দীর্ঘকাল নিস্তেজ হয়ে ছিল, তবে এ কথাও মানতে হবে যে, এই বংশের পুনরুদ্ধার করেন গোঁড়মীপুত্র সাতকর্ণি। নিঃসংশয়ে তাঁকে সে যুগের শ্রেষ্ঠ বীর বলব। নিজের লেখা নাসিক-প্রশস্তিতে তাঁর শৌর্ধের বিবরণ গোঁথে গেছেন। তাঁর উত্তরাধিকারী বশিষ্ঠপুত্র শ্রীপুলুমায়ী ও পরবর্তী সম্রাট যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণিও সাতবাহন বংশকে সমুজ্জ্বল রাখেন।

শক রাজাদের সঙ্গে বহুস্থ স্থাপনের উদ্দেশ্যে পুলুমায়ী শকরাজ ক্রন্দামনের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু তাতেও এই দুই রাজবংশের অনেক দিনের বিরোধ মেটে নি। এই রাজারা জাতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ দুই সম্প্রদায়েরই পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন।

এঁরা উত্তর-ভারতেও অভিযান করেছেন অনেকবার। এবং এ কথাও অনেকে মানেন যে, কিছুদিনের জন্তে এঁরা মালব ও মগধ অধিকার করেন। বাণিজ্যে উজ্জল উজ্জয়িনী তখন মালবের কেন্দ্র। দেশ-দেশান্তরের বাণিজ্যপথ এসে মিলেছে এই উজ্জয়িনীতে। উজ্জয়িনীকে বাদ দিয়ে কি সাম্রাজ্য বিস্তার হয়।

'পেরি প্লাস অব দি ইরিথিয়ন সী' গ্রন্থে ভারতের তদানীন্তন বহির্বাণিজ্যের একটা সম্পূর্ণ ইতিহাস পাওয়া যায়। সাতবাহন যুগেই এই বাণিজ্যের প্রভূত বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধি হয়েছিল। ভারতীয় জাহাজে করে হীরা মুক্তা পদ্মরাগ ও হাতীর দাঁত, মসলিন সুতি ও রেশমি কাপড়, নানাবিধ মসলাপাতি চালান হ'ত রোম ও আফ্রিকার বন্দরগুলিতে, আর বাইরে থেকে আসত নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য, প্রবাল ও স্বর্ণমুদ্রা। ভারতীয় কারি-

গরদের যৌথ সমবায় ছিল, দাক্ষিণাত্যের সার্ববাহ ও শ্রেণীদের চেণ্টায় দেশের সামাজিক উন্নতি হয়েছিল বিদেশের পয়সায়। গ্রিনিও এই কথা সমর্থন করেন। রোমকরা বিলাস-ব্যসনে যে অপব্যয় করেছে সে যুগে, ভারত তার স্বযোগ নিয়েছিল পুরোপুরি ভাবে। দক্ষিণ-ভারতের মাটি খুঁড়ে আমরা সে সত্য প্রমাণ করেছি তাদের প্রাচীন দিনেরিয়ন স্বর্ণমুদ্রা উদ্ধার করে।

একটু থেমে বললেন, কিন্তু কলিঙ্গ ছিল না অম্বু সাম্রাজ্যের অধীনে। বর্তমান উড়িষ্যা আর গোদাবরী পর্যন্ত এই উপকূল প্রদেশ কলিঙ্গ নামেই স্বাধীন ছিল সাতবাহন যুগে। তারপর—

ভদ্রলোক ঢোক গিললেন।

অম্বু নাম মুছে গেল ভারতের মানচিত্র থেকে। কলিঙ্গ বেঁচে ছিল অনেকদিন। শুণ্ড সাম্রাজ্য গেল, হর্ষের সাম্রাজ্যও গেল। উড়িষ্যা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও কলিঙ্গ বেঁচে ছিল। কলিঙ্গ নাম লোপ পেলে ভারতে মুসলমান-বিজয়ের প্রথম যুগে। মুসলমান-সাম্রাজ্যের পতনের সময় দেখি, কলিঙ্গের নতুন নাম হয়েছে তেলিঙ্গানা। আমাদের এ নাম তো নতুন, পাঁচ শো বছরের বেশি হয়তো হবে না। মোগল যুগে গোলকুণ্ডা রাজ্য বিস্তৃত হ'ল এই প্রদেশের ওপর। তারপর ভারতে ব্রিটিশ এল, এল পর্তুগীজ ওলন্দাজ ও ফরাসী। আমরা তখন নিজামের অধীনে নাম নিয়েছি উত্তর সরকার প্রদেশ। এ নামের বয়স কি দু শো আড়াই শো বছরের বেশি হবে? ১৭৮৮ সনে তো ব্রিটিশের অধীনেই এল গোটা মূলুকটা। তারপর সিপাহী-বিদ্রোহের পর যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব গিয়ে হ'ল মহারাণীর শাসন, আমরা সবাই এলাম মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির বিরাট ছত্রতলে।

মৈত্র মশাই দু চোখ বড় বড় করে দেখছিলেন শ্রীনিবাসলুকে। এ ভদ্রলোক কি ইতিহাসও মুখস্থ করেছেন ভূগোলের মতন।

মৈত্র মশাইয়ের মুখ দেখে শ্রীনিবাসলু হাসলেন, বললেন, আশ্চর্য হচ্ছেন আমাদের দেশের ইতিহাস শুনে?

মৈত্র মশাই সত্য কথাই বললেন, আপনার চাকরিতে কি ইতিহাসও মুখস্থ করতে হয়?

হা-হা করে হাসলেন এবার শ্রীনিবাসলু। মনে পড়ছে,

বাবার আগে ব'লে গিয়েছিলেন, তিনি একজন শিক্ষক।
ক্লাস সেভেনে ভূগোল পড়ান, আর এইটে ইতিহাস।

এক সময় আমি স্বর্গত শ্রীরামলুর প্রসঙ্গের অবতারণা করলুম, ভক্তলোক যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বললেন, মহাত্মা পুরুষ মশাই, সত্যিকারের মহাত্মা। নেতাজীর মত জীবনটাই দিয়ে গেলেন দেশের জন্তে, রাজাজী পণ্ডিতজীদের মত ভোগ করতে পারলেন না।

ও-ধারে একজন মাঝবয়সী ভক্তলোক তাকিয়েছিলেন আমাদের দিকে। গলাবন্ধ কোটের ওপর পাট-করা চাদর। ক্লশ, গায়ের রঙ শ্রামবর্ণ, কপালের তিলক উঠে গিয়েও কিছু আছে। পরনে ধুতির লুঙ্গি, পায়ে চামড়ার চটি। পরে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন—ভেঙ্কটাইয়ার, কুম্ভকোনামের ব্রাহ্মণ। মনে হ'ল, তাঁর চোখ দুটো ঘেন জ্বলছে।

শ্রীনিবাসলু বললেন, গভর্নেন্ট যদি তার প্রতিশ্রুতি রাখত, তা হ'লে এ অমূল্য প্রাণ অকালে হারাত না।

ভেঙ্কটাইয়ার কঠিন স্বরে তার প্রতিবাদ জানালেন ইংরাজীতে। বললেন, গভর্নেন্টের দুর্বলতা যে তাঁরা অস্ত্রায় প্রতিশ্রুতি দেন, এবং চাপে প'ড়ে সেই প্রতিশ্রুতি রাখতে আরও অস্ত্রায় করেন।

কড়া ক'রে ছাঁটা শ্রীনিবাসলুর শব্দ গোঁফ তুতিনবার ন'ড়ে উঠল, বললেন, আপনি কি মনে করেন, যে গভর্নেন্ট দেশের দাবি মানে সে দুর্বল গভর্নেন্ট?

ভেঙ্কটাইয়ার দৃঢ়স্বরে জবাব দিলেন, সে গভর্নেন্ট স্থায়ী হতে পারে না। দেশের কথায় তো গভর্নেন্ট চলে না, গভর্নেন্টের কথায় দেশকে চলতে হবে।

শ্রীনিবাসলু চ'টে উঠলেন, বললেন, আপনি দেখছি, পুরনো যুগ এখনও আঁকড়ে আছেন। গভর্নেন্ট কি আজকাল নিজের দেশের লোকই গড়ছে না?

ভেঙ্কটাইয়ারের কণ্ঠে উষ্ণা প্রকাশ পেল না, বললেন, দেশের লোক গভর্নেন্ট গড়ছে সত্যি, কিন্তু তারপর সে গভর্নেন্টের একচ্ছত্র অধিকার। সেখানে দেশের লোক যত কম থাকবে, তত মজল। শাসন শক্তি দিয়ে হয়, দুর্বলতার স্থান সেখানে নেই।

শ্রীনিবাসলু বললেন, হিটলার আর মূসোলিনির গভর্নেন্টই তা হ'লে আদর্শ গভর্নেন্ট ছিল বলুন।

ভেঙ্কটাইয়ার হেসে বললেন, একটু ভুল হ'ল। গোলমালের ভেতর গায়ের জোরে তাঁরা অধিকার গ্রহণ করেছিলেন। দেশের লোকের স্বাধীন ইচ্ছায় নয়। রাশিয়ার কথা ভেবে দেখুন। প্রতিদিন তার শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছে নাকি?

আমি বাধা দিলুম। বললুম, তর্কে আমরা আমাদের আলোচনা থেকে দূরে চ'লে যাচ্ছি। ভাবার ভিত্তিতে রাজ্য গঠনের দাবি মেনেছেন গভর্নেন্ট, তাকে আপনি দুর্বলতা কেন বলছেন বুঝতে পারা গেল না। জনসাধারণের দাবি মানেন যারা, তাঁদের আমরা উদার বলব না কি?

ভেঙ্কটাইয়ার বললেন, এই কি জনসাধারণের দাবি, না অস্ত্রের মুষ্টিমেয় ক্ষমতালোভী স্বার্থপরের দাবি? আজ অন্ধ মাত্রাজ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিল। বাংলা ও উড়িষ্যা চাইছে বিহারের কতকাংশ, বিহার ও আসাম চাইছে উত্তর-বাংলা। এই দুর্ঘোষের দিনে আমাদের আদর্শ কি বিধার, না, একতার? সাম্প্রদায়িকতায় ভারত বিভক্ত হয়েছে। প্রাদেশিকতা আজ যে পর্যায়ে উঠেছে তাতে শিক্ষিত ভারতবাসীর লজ্জা করা উচিত। এর ওপর ভাবার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন হ'লে সর্বত্র যে ছেঁড়া-ছিঁড়ি শুরু হয়ে যাবে।

শ্রীনিবাসলু কোনও উত্তর দেবার আগেই আবার বললেন, আজকের গভর্নেন্ট কি এ কথা জানে না, না, বোঝে না। রেল-সংস্থাকে পুনর্বিজ্ঞান ক'রে তো এ সত্য জানিয়ে দিয়েছে। কত অসন্তোষ কত মন-কষাকষি ঘনিয়ে উঠছে একটি মাত্র জ্ঞান বাড়ানো নিয়ে, ছটি থেকে সাতটি। কই, তাতে তো তাঁরা রাজী হচ্ছেন না? প্রদেশের বেলাতেও কি এমনি হতে পারে না? উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম ও মধ্য প্রদেশ। আসাম বাংলা বিহার ও উড়িষ্যা মিলে এক হয়ে যাক। মিটে যাক তাদের কাড়াকাড়ির পালা। যে দেশের লোক হাড়ে হাড়ে স্বার্থপর, লোক ঠকানোর চেষ্টা যাদের রক্তে মজ্জায়, তাদের স্বার্থ আর দেশের স্বার্থ কখনও এক হতে পারে না। যে গভর্নেন্ট এই দেশের লোকের দাবিকে মানে, সে স্বার্থপরতাকেই প্রশ্রয় দেয়, দেশের বৃহত্তর কল্যাণকে উপেক্ষা ক'রে গভীর অস্ত্রায় করে।

মৈত্র মশাই অভিভূত হয়েছিলেন ভেঙ্কটাইয়ারের

যুক্তিতে, তা তাঁকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। শ্রীনিবাসলু ধৈর্য হারিয়ে বার কয়েক তাঁর খাটো গৌফ চোমড়ালেন অস্থিরভাবে। মনে হ'ল, ভেতরটাইয়ারের মত খণ্ডন করার মতো কোন অকাটা যুক্তি হাতের কাছে খুঁজে পাচ্ছেন না। শেষটায় ওই বর্বর লোকটাকে যেন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আমায় বললেন, এ বছরের পয়লা অক্টোবর একটা স্বরণীয় দিন হয়ে রইল ভারতবর্ষের ইতিহাসে।

বিজয়নগরমে গাড়ির ভেতরটা অনেক হালকা হয়ে গেল। বেলা তখন নটা হবে। হাত-পা ছড়াবার জায়গা পেয়ে উৎসাহ পেলুম প্রচুর। প্ল্যাটফর্মে লাফিয়ে নেমে দেখতে গেলুম মামাবাবুদের।

তাঁদের তখন প্রাতঃকৃত্য ও প্রাতঃরাশ দুইই সারা হয়ে গেছে। দরজার হাতল ধরে মামাবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাকে এগিয়ে আসতে দেখে যেন বড় আশ্চর্য হলেন। বললেন, সকাল থেকে তোমায় না দেখে আমি ভয় পাচ্ছিলুম গোপাল।

মামী বললেন, এ কি চেহারা হয়েছে তোমার? রাতে বুঝি ঘুমতে পাও নি একেবারে?

কষ্টের কথা শুনেই কি সকলে ভালবাসে? আর দাম্ভই বা কখন দিতে জানে? বললুম, মুখ-হাত দুই নি কিনা এখনও, তাই এমন দেখাচ্ছে।

মামী সাবান তোয়ালে মাখন চিরুনি সব তৈরি করেই রেখেছিলেন। গরাদের ফাঁক দিয়ে সেগুলো বাড়িয়ে দিলেন।

মামাবাবু বললেন, না না, বাইরে কেন। এ গাড়িতেই সেরে নাও না, কিছু খেতেও তো হবে।

আমি বললুম, সেজ্ঞে আপনি ভাববেন না মামাবাবু, আমার কোন কষ্ট হবে না।—বলে পেছন ফিরলুম।

মামাবাবু বললেন, এই তোমাদের বড় বদ অভ্যাস গোপাল; বুড়োদের কথা একেবারেই মানতে চাও না।

৫

ওয়ালটেনার পৌছবার কিছু আগেই মৈত্র মশাই ছটফট করতে লাগলেন। দু ধারের পাহাড় দেখেছেন, কিছু আবিষ্কারের সংকল্প নিয়ে।

বললুম, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন মৈত্র মশাই?

মৈত্র মশাই বললেন, শুনেছি কাছেই কোন পাহাড়ে নৃসিংহক্ষেত্র।

শ্রীনিবাসলু হেসে বললেন, কাছে নয়। এই সীমাচলম্—

স্টেশন থেকে মাইল তিনেক দূরে পাহাড়ের ওপর। নৃসিংহক্ষেত্রের কথা কেউ জানেন ছেনে মৈত্র মশাই বড় তৃপ্তি পেলেন। ছেলেমানুষের মত জিজ্ঞেস করলেন, কি আছে সেখানে?

উত্তর দেবার সময় শ্রীনিবাসলু হাসলেন, বললেন, দেখবার যদি শখ থাকে, তা হ'লে ওয়ালটেনারে নেমেও যেতে পারেন, সোজা রাস্তায় মাইল সাতেকের পথ।

মৈত্র মশাই করুণ ভাবে বললেন, বারো দিনের ছুটি আমার।

বুঝেছি।—বলে শ্রীনিবাসলু গল্প ফাঁদলেন।—

পুরাণে ভক্ত প্রহ্লাদের কাহিনী পড়েছেন? এই সীমাচলমে নৃসিংহদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করে ভক্ত প্রহ্লাদ তাঁর শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। দীর্ঘ দিন পরে চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরুষোত্তম স্বপ্নে এই বিগ্রহের সন্ধান পেয়ে এক বৈশাখের অক্ষয় তৃতীয়ায় এই মূর্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান মন্দির যে কোন উড়িষ্যার রাজার কীর্তি, তাতে সন্দেহ নেই। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত রাজা প্রথম নরসিংহদেবের কীর্তি কোণারকের সূর্যমন্দির দেখেছেন কি? সাহেবরা যাকে কোণারকের স্নাতক প্যাগোডা বলেন?

উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললেন, সীমাচলমের মন্দির সেই আদর্শে তৈরি। স্থানীয় লোকেরা বলে, উড়িষ্যার রাজা লান্জুলিয়া এ মন্দির নির্মাণ করিয়েছেন। এই মন্দিরে উঠতে এক হাজার সিঁড়ি ভাঙতে হয়। ধম্ম রাণী অহল্যাবাদী, এই হাজার সিঁড়ি বাঁধিয়ে দিয়ে তিনি হাজার যাত্রীর আশীর্বাদ পাচ্ছেন প্রতিদিন।

মৈত্র মশাই শ্রীনিবাসলুর দিকে ফিরে বললেন। এমন প্রোতাই চান শ্রীনিবাসলু। বললেন, মন্দিরের কাছে কাছিকি একটি ঝরনা আছে, গ্র্যানাইট পাথরে তার ওপর নীচ বাঁধানো। লোকে বলে, ত্রিধারা-সঙ্গম স্থানের পুণ্য হয় এর জলে। নানা দেশের নানা যাত্রী মাথা মোড়ানো স্থানের আগে। আর এই চুল বিক্রি করে নাকি

মন্দিরের আয় হয় বছরে হাজার তিনেক টাকা। এমন অপূর্ব দক্ষিণার কথা শুনেছেন কখনও? আরও অপূর্ব জিনিস আছে এখানে। মন্দির-প্রাঙ্গণে একটি পাথরের স্তম্ভ আছে। হিরণ্যকশিপু লাথি মেরে যে ক্ষুটিক স্তম্ভ ভেঙেছিলেন, তারই প্রতীক এটি। যাত্রীরা ‘কোল দেবে’ বলে কিউ করে দাঁড়িয়ে থাকে। স্নেহের পাত্র ছুঁলে স্তম্ভটিকে মাঝে রেখে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানত করে। এই ‘কোল দেওয়া’ মানত নাকি কখনও বিফল হয় না।

গাড়ির গতি মন্থর হয়ে আসছিল। ঐনিবাসলু নীচু হয়ে একবার বেঞ্চির নীচে তাঁর টিনের বাক্স আর শতরঞ্জিতে জড়ানো বিছানাটা দেখে নিলেন। বললেন, এখানকার ফুলের মালা কখনও দেখেছেন কি?

উত্তর দেবার প্রয়োজন ছিল না, তবু মৈত্র মশাই তাড়াতাড়ি ঘাড় নেড়ে বললেন, না।

ঐনিবাসলু বললেন, এও অপূর্ব! স্বতোর গঁজে দেখেছি মাড়গয়ারীর ট্যাঁকে। এ হ’ল জরির গঁজে, তার ভেতরে টাকার বদলে নানান রকমের ফুল।

গাড়ির গতি আরও মন্থর হ’ল। ঐনিবাসলু ক্রমাল দিয়ে নিজের কাঁধ ও মুখটা পরিষ্কার করতে করতে বললেন, মন্দির থেকে খানিকটা দূরে একটা প্রাচীন দুর্গ দেখতে পাওয়া যায়। কবে কোন্ প্রয়োজনে কে তৈরি করেছিলেন, তা আজ আর জানবার উপায় নেই।

মৈত্র মশাইকে বড় বিমর্ষ দেখাল। বললেন, আপনি কি এখানেই নামবেন?

ঐনিবাসলু বললেন, আমার বাড়ি এইখানে।

ওয়ালটেয়ারে গাড়ি দাঁড়াতেই হাতে বাক্স আর বিছানাটা নিয়ে ঐনিবাসলু নমস্কার করে নেমে গেলেন। বললেন, কপাল ভাল হ’লে ফেরার পথে আবার দেখা হবে। আমার ছুটি বারো দিন।

ভেঙ্কটাইয়ার দরজা দিয়ে বেরচ্ছিলেন, নামবার আগে মুখ নীচু করে বললেন, এরা সাংঘাতিক জাত মশাই, ক্ষুধা আর ব্যবহার এমন মিষ্টি যে সাপকেও বশ করতে পারে। কিন্তু নিজের স্বার্থে বজুর গলায় ছুরি চালাতে বিন্দুমাত্র ষিধা করে না।

ভেঙ্কটাইয়ারের অক্ষু বিরাগ আমি আগেই জেনেছি, তাই মস্তব্যটুকু হজম করতে পারলুম না।

মৈত্র মশাই বললেন, খাবার কথা ভেবেছেন গোপাল-বাবু, না—। ব’লে কোতুহলী দৃষ্টি প্রসারিত করলেন।

ভেঙ্কটাইয়ার বাংলা বোঝেন, কিন্তু বলেন ইংরাজীতে। জবাবটা তিনিই দিলেন, এই তো প্ল্যাটফর্মের বাইরে বিস্তৃত ব্রাহ্মণ-হোটেল।

মৈত্র মশাই গলা নামিয়ে প্রশ্ন করলেন, মাত্রাজী খাবার বুঝি?

ভেঙ্কটাইয়ার শুনে পেয়েছিলেন। হেসে বললেন, আখ-দক্ষিণী। মানে দক্ষিণী রান্নার চেঁচা করে পারে না।

বললুম, আপনারা এগোন, আমি একবার মামা-মামীকে দেখে যাই।

মামাবাবু তখন খাবারের টিকিট কেটে পয়সা দিচ্ছিলেন। টুনিতে টিফিন ক্যারিয়ারে করে খাবার দেবে। আমাকে দেখে বললেন, তুমি এইখানেই থেয়ে নাও না গোপাল, সকাল থেকে তো না খেয়েই রইলে!

খানকয়েক নোট বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এই নাও, কিছু টাকা রাখো তোমার কাছে।

শুক্লজন। ‘দস্তবাদ’ বলে ফেরানো চলে না। বললুম, এখন রাধুন আপনার কাছে, দরকার হ’লেই চেনে নেব।

মামাবাবু একটু ক্ষুধা হলেন বলে মনে হ’ল।

৬

যে মুখে স্টেশনে ঢুকেছিলুম, সেই মুখেই বেরিয়ে এলুম। ঐনিবাসলুর অভাবে গাড়িটা ফাঁকা বোধ হচ্ছিল। রহস্ত্রে ও আলাপে সময়টা কাটছিল বেশ। এখনও প্রায় কুড়ি ঘণ্টার পথ বাকি। আজ রাতের ভাবনা নেই। পা ছড়িয়ে বারা রাতে ঘুমিয়েছে, তারা বিজয়নগরমে নেমে গেছে। আমরা দখল করেছি তাদের ওপরের জায়গাগুলো।

ঐনিবাসলুর ফাঁকা আসনটি অধিকার করেছেন এক ছিপছিপে ছোকরা ভদ্রলোক। ওয়ালটেয়ার থেকেই উঠলেন। আর খানিকটা দূরে একদল আধ-শহুরে মেয়ে-পুরুষ উঠে অবধি কোলাহল করছে বেপরোয়া ভাবে। তাদের সঙ্গে গোটা কয়েক বড় বড় টিনের তোরঙ্গ।

মৈত্র মশাই গভীর মনোবোগে মুখের পান ছুটো সামলাচ্ছিলেন। চুনের মাপটা ঠিক হবার পর অতিরিক্ত

চুনটা বাইরে ফেললেন। আর ফেললেন একগাল পিক—
চুন ধরেন আর জরায় মেশা লাল টকটকে নির্ধাস
খানিকটা। মুখটা একটু হাল্কা হতেই বললেন, বারো
আনা পরসায় দিবি খাওয়াল ভাই গোপালবাবু।
কলকাতায় বারো আনার জলখাবার খেলে কিছু খেয়েছি
ব'লে মনে হয় না।

আমারও মন্দ লাগে নি। খুশি হলেন কিন্তু ভেঙটাইয়ার।
বললেন, দক্ষিণ-ভারতে এর চেয়ে ভাল খাবার আট
আনার পাবেন। আজকাল কোন কোন জায়গায় ন-দশ
আনাও নিচ্ছে শুনতে পাই।

মৈত্র মশাই জিজ্ঞাস করলেন, কিন্তু সর্বত্রই কি
নিরামিষ খেতে হবে?

ভেঙটাইয়ার বললেন, তা কেন থাকেন। নন-ভ্যান্ডিন
হোটেল গেলো ন আনার মাছ-মাংসও পাবেন।
স্টেশনেও আছে ছ রকমের হোটেল। তবে নিরামিষ
খেয়েই তৃপ্তি বেশি।

মৈত্র মশাই আশ্চর্যে বললেন, নারকেল তেল
খেলু' ব'লে তো বুঝতে পারলুম না। আপনি টের
পেয়েছিলেন কি?

ভেঙটাইয়ারের কান বড় পরিষ্কার। বললেন, আজকাল
সর্বত্র তিলের তেল আর ডালডা চলছে। জিবাকুরেই
কেবল খাঁটি নারকেল তেল পাবেন। তাও সর্বত্র নয়,
সেখানেও ডালডা চুকছে।

মৈত্র মশাই পান চিবোতে চিবোতে বললেন, ডালে
লজ্জি আর টক-ঝালে রীঁধা সম্বরটা বেশ লাগল। উগরা
পাচড়ি কুটু—এগুলোও মন্দ নয়।

ভক্তলোক খাবার সময় সব কিছুই নাম জেনে
নিচ্ছিলেন। বললুম, আপনার তেঁতুল লঙ্কা দেওয়া
কড়ায়ের ডালের ঝোলটা কিন্তু অখাদ্য। একটু মুখে
দিয়ে দম আটকাবার উপক্রম হয়েছিল আমার।

মৈত্র মশাই বললেন, রসমটা? ওটা যেহেতু খাবে
চেটে-পুটে।

ধানিকক্ষণ নীরবে কাটল। মৈত্র মশাই আবার বললেন,
শ্রীনিবাসলু থাকলে ওয়ালটেয়ারের গল্প শোনা যেত বেশ।

বললুম, ভাব করুন না!—ব'লে ইশারায় তাঁর
পাশের ভক্তলোককে দেখিয়ে দিলুম।

মৈত্র মশাই সারারাত যত বিমিয়েছেন, এখন তেরনি
তৎপর হয়ে উঠেছেন। পাশের ভক্তলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ
ক'রে বললেন, অনেক দূর যাবেন বুঝি?

ভক্তলোক বাংলা বোঝেন না, ফ্যালফ্যাল ক'রে
তাকিয়ে রইলেন। আমি ইংরাজীতে প্রশ্নটা জানালুম।

ভক্তলোক অপ্রতিভ ভাবটা কাটিয়ে উঠে বললেন,
না, বেশি দূর নয়, ককুরে নামব। সেখানে আমাদের
একটা সাংস্কৃতিক সম্মেলন হচ্ছে।

ধীরে ধীরে পরিচয় হ'ল। ছেলেটির নাম রাজলু।
ইতিহাস ও সাহিত্য নিয়ে সম্ভ্রতি বি. এ. পাস করেছে।
পরসায় জন্তে একটা স্কুলে শিক্ষকতা করছে, তবে যথাসময়ে
সাহিত্যে এম. এ. দেবার সংকল্প রাখে।

ওয়ালটেয়ারে কি দেখবার আছে, জানতে চাইলেন
মৈত্র মশাই।

রাজলু হেসে বললে, কিছুই নেই, আবার অনেক কিছু।
কোনও দুটো শহর তো কখনও এক রকমের হয় না।
তাই বলছি অনেক কিছু। আর ষাঁরা দেশ দেখতে
বেরিয়েছেন, তাঁরা কিছুই নেই দেখে হতাশ হবেন।

মৈত্র মশাই এটি ভূমিকা মনে ক'রে আসল গল্পের
জন্তে প্রস্তুত হলেন। রাজলু তা লক্ষ্য ক'রে বললে,
সাহেব ও সাহেব-বোঁদারা ওয়ালটেয়ারকে ইণ্ডিয়ান ব্রাইটন
বলেন। ব্রাইটন আমি দেখি নি। তবে মনে হয়,
এর সমুদ্রসৈকত, মনোরম দৃশ্য আর চমৎকার আবহাওয়া
জন্তেই এই নামকরণ হয়েছে। শহরের দুটি বিশিষ্ট ভাগ
আছে। উচ্চ ভাগটাতে শৌখিন লোক আর রাজ-
অমাত্যদের বাস। বিশ্ববিদ্যালয়টিও এইখানে। সাধারণ
গৃহস্থের জন্তে নীচ জায়গা, যার নাম ভিজাগাপটম বা
বিশাখাপত্তন। বিশাখ দেবসেনাপতি কার্তিকের নাম।
কোনও এক সময়ে নাকি এখানে বিশাখস্বামীর মন্দির
ছিল। এখন তা সমুদ্রগর্ভে। শহরের মাঝখান দিয়ে
নিমগিরি পাহাড়, পূর্বঘাটের একটা শ্রেণী, আর তারই
নীচে দিয়ে খাল কেটে সমুদ্রকে ভেতরে আনা হয়েছে—
বন্দর খালের ওপরে, আর তার পাশে জাহাজ-মেরামতের
কারখানা। শহরের পূর্বদিক বেঁটন ক'রে আছে উদ্যম
জলরাশি। নিতান্ত বাস্তববাদী মনও কল্পনাবিলাসী
হয়ে ওঠে।

ইংরিজীতে আলোচনা মৈত্র মশায়ের তেমন ভাল লাগছিল না বলেই মনে হয়। ওধাবের কোলাহল-কারীদের দিকে বারে বারে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছিল। এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন একটি অপূর্ব দৃশ্য দেখবার পর। সেই টিনের তোরঙ্গ থেকে এক ব্যক্তি একটি বিরাটকায় পুতুল বার করে তার নীচের একটি কাঠের হাতল ধরে আফালন করার মত শূন্নে হাত নেড়ে নেড়ে কি সব বলছিল। গাড়ির সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে সেদিকে।

রাজলু আমাদের কোতূহল লক্ষ্য করে বললে, আপনারা সত্যিই এ জিনিস দেখেন নি। অন্ধ্র ও সমগ্র দক্ষিণ-ভারতে দরিদ্র গ্রামবাসীদের মধ্যে এই ছায়ানাটক আজও প্রচুর আনন্দ দিচ্ছে। জাভা ও বলিছীপের ছায়ানাটকের নাম শুনেছেন। কিন্তু সে দেশের ধনীদেব মত আমাদের দেশের ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায় এই প্রাচীন ছায়ানাটকের ত্রাণ মর্ষাদা দিতে বেশ সঙ্কোচ বোধ করেন।

মনে পড়ল, অনেকদিন পূর্বে এ বিষয়ে অশোক শাস্ত্রী মশায়ের একটা নিবন্ধ পড়েছিলুম। তাতে তিনি ছায়ানাটকের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেছেন। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের যে মহাভাষ লিখেছেন পতঞ্জলি, তাতে তিন শ্রেণীর শিল্পীর উল্লেখ পাওয়া যায়—শৌভিক, গ্রন্থিক ও চিত্রকর। শৌভিক কথাটির মানে নানান জনে নানান রকম করেছেন। যেমন, অভিনেতা, মুকাভিনেতা বা নেপথ্য থেকে মুকাভিনেতার ক্রিয়াকলাপ ধারা ভাষায় বর্ণনা করেন তাঁরা, অথবা ধারা ছায়াচিত্র দেখান তাঁরা। মধ্যযুগে ছায়ানাট্য নামে এক রকমের দৃশ্যকাব্য দেখানো হ'ত, একখানি বড় নাটকের দুটি অঙ্কের মাঝখানে 'এন্ট্রাঙ্ক্ট'-এর মত। দক্ষিণ-ভারতের ছায়ানাট্য মহা-ভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠের 'রূপোপজীবনে'র অর্থের সঙ্গে মেলে। 'জলমগ্নপিকা' নামে প্রচলিত দক্ষিণের এই ছায়ানাট্যের ইতিহাস যে তিন শো বছরের কম নয়, তা মানতে হবে।

পুতুলটি তখন রাজীদের হাতে হাতে ক্রিচ্ছে। আমাদের দিকে এলে দেখা গেল, পুতুলটি পাতলা হরিণের চামড়ায় তৈরি। বিভিন্ন রঙ দিয়ে সাজ-পোশাক-অলঙ্কারাদি

আঁকা হয়েছে। শূন্য ছুটো করে নানান নকশা করা হয়েছে পুতুলের গায়ে। পায়ের দিকটায় খানিকটা কাঠ বেরিয়ে আছে, এটি ধরেই নাকি খেলোয়াড়েরা খেলা দেখায়।

বললুম, উত্তরপ্রদেশে আমি পুতুলের নাচ দেখেছি। তারা বলে—কাঠপুতলির নাচ। হুতোয় সাহায্যে খেলোয়াড়েরা নাচ দেখায়।

রাজলু বললে, এখানেও হুতো আছে।—বলে হাত দুটো দেখালেন। সে দুটো আলাদা। হুতো দিয়ে নাড়াবার ব্যবস্থা আছে।

রাজলু বললে, কাঠপুতলি নাচের সঙ্গে এর আসল তফাত হ'ল এইরকম। সেখানে পুতুলের পেছনে পর্দা, সামনে দর্শক। খেলোয়াড়েরা ওপর থেকে হুতো নেড়ে খেলা দেখায়। ছায়ানাট্যে পুতুলের সামনে সাদা পর্দা, পেছনে আলো। খেলোয়াড়েরা নীচে থেকে পুতুলের হাতল ধরে খেলা দেখায়। দর্শকরা পুতুল দেখেন না, দেখেন পুতুলের ছায়া। অসাবধান হ'লে খেলোয়াড়ের হাতও পর্দায় দেখা যায়।

ততক্ষণে অনেকগুলি পুতুল লোকের হাতে হাতে ঘুরছে। নানা আকারের নানা রঙের পুতুল। রাজলু বললে, এই সব পুতুল চরিত্রের মর্ষাদা অহুসারে এক থেকে সাত ছুট অবধি হয়। গায়ের রঙও আলাদা। যেমন সীতার সোনার বর্ণ আর রামের ঘন নীল। আমরা এই ছায়ানাটককে বলি 'বোম্বলাত'। গ্রামাঞ্চলে এই বোম্বলাতের সংস্কারগত একটা বিশিষ্ট কদর আছে। এর অভিনয় দেখলে নাকি দেশ রক্ষা পায় অনারুষ্টি ও দুর্ভিক্ষের হাত থেকে। তাই অনেক অল্প পরিবারের একমাত্র পেশা এই বোম্বলাত। তারা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বোম্বলাত দেখিয়ে বেড়ায়। দক্ষিণ-ভারতের অত্যাশ্চর্য স্থানের সঙ্গে তুলনায় একটা আধুনিকতা লক্ষ্য করা যায় অন্ধ্রের ছায়ানাট্যে। এখানে পুরুষ শুধু পুরুষ-পুতুলের অভিনয় করে, মেয়ে-চরিত্রের অভিনয় করে মেয়েরা নিজে। নিজেদের কথ্য ভাষাই ব্যবহার করে এই অভিনেতার। মালাবারের মত এরা কোন বিশেষ মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত নয়। ইচ্ছেমত সর্বত্র অভিনয় করে বেড়ায় এবং স্বাম্যায় ছাড়া মহা-ভারতের কাহিনী নিয়েও এরা অভিনয় করছে আজকাল।

মৈত্র মশাই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই সব ছায়া-

নাটক পাকা স্টেজে নিয়মিত অভিনয় হয় কি না? সঠিক উত্তর জানা না থাকলেও বুঝতে পাচ্ছি, এরা ঘুরে ঘুরে অভিনয় দেখিয়ে বেড়ায়। রাজলুকে এ বিষয় জানাতেই আমার অহুমান সমর্থিত হ'ল। বললে, কোচিনের গ্রামাঞ্চলে শুনেছি ভদ্রকালী ও ভগবতীর মন্দিরে বাধা স্টেজ আছে। বসন্তকালে নিয়মিত অভিনয় হয়। এ দেশে এরা নিজেরা স্টেজ বাঁধে। আয়োজনটা খুবই সাধাসিধে। চারদিকে চারটি বাঁশের খুঁটি পুঁতে দুটো পাশ ও পেছনে কালো কাপড় বাঁধে। সামনে মাটি থেকে খানিকটা উচু বেড়া, তারপর একথানা সাদা পর্দা। ওপরে তালপাতার চাল। সাদা পর্দার ফুট পাঁচেক তফাতে এক সারি মাটির প্রদীপ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তারপর খেলোয়াড়েরা এই ঘরের ভেতর ঢুকে পুতুল নাচিয়ে এক-একটি সম্পূর্ণ কাহিনীর অভিনয় করে। দর্শকেরা বাইরে থেকে পর্দার ওপর ছায়া দেখছেন, আর নেপথ্যে অভিনয় শুনছেন। এদেরও বিদ্যুৎ আছে, ভাঁড় আছে। গম্ভীর দৃশ্যের মাঝে মাঝে হালকা রসের ভাঁড়ামিশ্রণও অনেক সময় বেশ উপভোগ্য মনে হয়।

আর একটি পুতুল এল আমাদের হাতে। রাজলু বললে, এটি স্ত্রী পুরুষ, ভাঁড়ের ভূমিকার জুড়ে। বীরের মতন বেশ দেখছেন বটে, কিন্তু মধ্যে স্ত্রী এলেই ইনি বাঁশপাতার মত কাঁপতে শুরু করবেন। এই দেখুন তার ব্যবস্থা।

মৈত্র মশাই বললেন, একটা অভিনয় দেখতে পেলে মন্দ হ'ত না, কি বলেন গোপালবাবু?

ডেক্টাইয়ার বাক্সে ওঠবার আয়োজন করছিলেন। বললেন, আপনারা কতকুমারী যাচ্ছেন তো, একটু খোঁজ-খবর নিলেই জানতে পারবেন, কোথাও না কোথাও এর অভিনয় হচ্ছে।

মৈত্র মশাই এই নির্দেশটুকু তাঁর নোটবুকে টুকে নিলেন।

আমরা অনেকটা পথ পেরিয়েছি, থেমেছিলুমও দু-একবার। এইবারে আবার গাড়ির গতি মন্দ হতেই সেই দলটি একটু বেশি মাত্রায় তৎপর হয়ে উঠল। কাড়াকাড়ি করে পুতুলগুলো বাক্সে ভরে ফেলল। নিজেদের ভাষায় কি বললে বুঝতে পারলুম না। রাজলু আমাদের বুঝিয়ে

দিলে, এরা পিঠাপুরমে নামবে, আজ রাতে এদের একটা বায়না আছে।

অনেক বছর আগে কাগজে পড়েছিলুম, এই পিঠাপুরমের রাজকন্ডের সঙ্গে কুচবিহারের রাজপুত্রের বিয়ে হয়েছিল মাত্রাজে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ সুপুরুষ রাজকুমার ইন্দ্রজিৎ-নারায়ণ তখন হায়দ্রাবাদের বোলারামে সেনা-বিভাগের শিক্ষানবিসি করছিলেন। সে যুবক আজ বেঁচে নেই। বছর কয়েক আগে তাঁর দাঙ্গিলিঙের বাড়িতে আশ্বনে পুড়ে অকালে মারা গেছেন। সকল ঘটনার উপ সিক্রেট খবর দেয় যে কাগজ, তারা বললে, এর ভেতরেও কোন রহস্য আছে। সেই রহস্যের ইঙ্গিত নাকি দিয়ে গেছে এক বিদেশী কত্কা।

গাড়ি স্টেশনে দাঁড়াতেই মোটরবার্ট নিয়ে সেই মেয়ে-পুরুষ ও শিশুর বিরাট দলটি নেমে গেল। মৈত্র মশাই বললেন, এই সেই পাদগয়া, নয়?

আমি গয়া জানি। পাদগয়ার সংবাদ রাখি না। মৈত্র মশাই বললেন, গয়া জানেন না? গয়া ছটি, উর্দু জিগয়া হিমালয়ে, অধস্তিগয়া শিরোগয়া বেহারে, নাভিগয়া উড়িষ্যার ঝাড়পুরে আর পাদগয়া এই পিঠাপুরমে। কারও মতে অবশ্য পাদগয়া চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ তীর্থের কাছে। বায়ুপুতানে গয়া-মাহাত্ম্য পড়েন নি?

আমার জ্ঞানের গণ্ডি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস সীমায়িত করেছে। পড়ি নি স্বীকার করতে লজ্জা পেলুম না।

মৈত্র মশাই বললেন, গয়াসুর ছিলেন অমিতপরাক্রম বিষ্ণুভক্ত দানব, তাঁর দেহের উচ্চতা এক শো পঁচিশ যোজন। বহু সহস্র বছর তপস্শ্রা করে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের কাছে এই বর পান যে, তাঁর দেহ হবে পবিত্রতম স্থান। তাঁকে স্পর্শ করে সকল জীবের উদ্ধার হয়ে গেল, লোকালয় ও ষমপুরী হ'ল শূন্য। শেষে বিষ্ণুর উপদেশে ব্রহ্মা বসন্তের জুড়ে তাঁর দেহ প্রার্থনা করলেন। তখন 'শিরঃ কৃষ্ণোত্তরে দৈত্যঃ পাদৌ কৃষ্ণাত্ত্ব দক্ষিণে'—উত্তরে মাথা আর দক্ষিণে পা করে শুলেন। সেই পাদগয়া এই পিঠাপুরম।

গাড়ি এক জায়গায় বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না। আমাদের আলোচনারও বিরাম নেই। একটু ঝিমুনি এসেছিল একপেট ভাত খাবার খানিকক্ষণ পরে। দেটাও অনেকক্ষণ কেটে গেছে। বললুম, আমাদের কলকাতার লোকের দক্ষিণ-

ভারত সম্বন্ধে জ্ঞান বড়ই সীমাবদ্ধ। মাদ্রাজ বলতে আমরা বুঝি একটা ছোট জায়গা, সেখানকার সকল অধিবাসীই একরকম। তাদের ভাষা ধর্ম আচার ও ব্যবহারে পার্থক্য নেই কোনখানে।

রাজলু বললে, শুনেছি, আপনাদের বাংলা দেশে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার কথা ভাষায় প্রভেদ আছে অনেকখানি। কিন্তু বাংলা ভাষা একই, সাহিত্যেও প্রভেদ নেই কোনও। অথচ দক্ষিণ-ভারতে চারটি স্থলপট ভাষা ও সাহিত্য। আমরা একে অস্ত্রের ভাষা বুঝি না।

বললুম, আপনাদের ভাষা তো তেলেগু ?

রাজলু বললে, ঠিক তাই, আর আমাদের মধ্যে তামিল জানে এমন লোক আপনি খুঁজে পাবেন না।

আমার বিশ্বয় লক্ষ্য করে রাজলু বললে, তামিল কর্ম-মণ্ডল উপকূলের ভাষা। ত্রিবাঙ্গুর কোচিন ও মালাবার জেলায় হ'ল মালয়ালম্। আর মহীশূরে প্রচলিত ভাষা কানাড়া। এ ছাড়াও আছে অনেক ভাষা, তার ভেতর তুলুকে অস্বীকার করবার উপায় নেই।

তেলেগু সাহিত্য সম্বন্ধে আমি কিছুই পড়ি নি। শুনেছিলুম, রম্যাপ্রলু স্বব্বা রাও নামে অন্ধ্রের এক যুবক শান্তিনিকেতনে ছাত্র ছিলেন ও রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে এসে রবীন্দ্র-ভাবধারায় পুষ্ট এক নতুন ভঙ্গী তেলেগু সাহিত্যে সঞ্চারিত করেন। আরেক জনের নাম পড়েছিলুম কোনও একটা নিবন্ধে—কান্তকুরি বীরেন্দ্রলিঙ্গম্ পাস্তলু। রামমোহনের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সাহিত্যের এই দিকপালের নাম। শুনেছি 'অন্ধ্রের অন্ধ্র কবির' কথা; অম্ববাদ পড়েছি জীরঙ্গমের 'জগন্নাথুনি রথ চক্রলু' কবিতায় রথচক্রে নিষ্পিষ্ট জনগণের অত্যাচারের আহ্বান। আরেকটি নাম নতুন শিখেছি। পালাওন্নি পদ্মরাজু। বিশ্ব ছোট-গল্প প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়ে বাংলার অনেক দিনের অহংকারকে চোখের জলে ডুবিয়েছেন। ইচ্ছে হ'ল, এ সম্বন্ধে আরও কিছু জানি। রাজলুকে কথটা বললুম।

রাজলু বললে, একটা কথা ভেবে আমার বিশ্বয় জেগেছে চিরকাল। অন্ধ্রের সঙ্গে বাংলার কোনও রকম যোগ ছিল না কোনও কালে, মাঝখানে উড়িষ্যা ব্যবধান রচনা করে আছে ইতিহাসের গোড়া থেকে। কিন্তু এই

ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক বাধা ডিঙিয়ে এই দুই প্রদেশের সাংস্কৃতিক মিলন হ'ল কি করে? শুধু সমাজ-জীবনে নয়, সাহিত্যেও বাংলার প্রভাব এমন স্পষ্ট যে তাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই আজ। উনবিংশ শতকে বাংলায় সংস্কারের যে ঢেউ উঠেছিল রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের যুগে, তারই নোনা জলে স্নান করে গৌড়া ব্রাহ্মণ বীরেন্দ্রলিঙ্গম্ হলেন ব্রাহ্ম। সমাজসংস্কারের নেশা নিয়ে যে কলম ধরলেন একদিন, তা থেকেই বেরল সাহিত্যের সর্বতোমুখী ধারা। সংস্কারক বীরেন্দ্রলিঙ্গম্ ডুবে গেলেন তাঁর নিজের কবিতা নাটক উপন্যাস ও নানা প্রবন্ধ ও অম্ববাদ সাহিত্যের নীচে। অন্ধ্রের অন্ধ্র কবির কথা শুনেছেন নিশ্চয়ই। সেই চিলকামার্তি লক্ষ্মীনারসিংহম্ একই সময় দেশকে উত্তুদ্ধ করলেন জাতীয়তাবোধে। শুধু কবিতায় নয়, নাটক ও উপন্যাসের মাধ্যমেও। অন্ধ্র তখন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিই অনুদিত হচ্ছে। প্রথম মৌলিক উপন্যাস লিখলেন লক্ষ্মীনারসিংহম্। আজও আমরা এঁর উপন্যাস ও নাটক পড়ছি শ্রদ্ধার সঙ্গে।

রাজলু পকেট থেকে কয়েকটা লবঙ্গ বার করলে। হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিতে আমি একটা নিলুম, নিজে গোটা কয়েক মুখে পুরে বললে, অন্ধ্র জাতীয় জীবনের নতুন জাগরণ হয় প্রথম মহাত্মার বছর দুই আগে। দেশে স্বতন্ত্র অন্ধ্র রাজ্য গঠন ও পৃথক বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপনের দাবি উঠেছে। গিড়ুগু রামমূর্তি পাস্তলু তাঁর অল্পম গুণে তেলেগু ভাষাকে স্বীকার করবার দাবি জানালেন কঠিনভাবে। স্বতন্ত্র অন্ধ্র রাজ্য হ'ল না, কিন্তু সেই দেশব্যাপী সাড়ায় যথার্থ মর্যাদা পেল দেশের সাহিত্য।

দাঁতের ভেতর লবঙ্গে একটা চাপ দিয়ে বললে, তেলেগুতে রবীন্দ্রনাথকে আমদানি করেন রম্যাপ্রলু স্বব্বা রাও। এবং এইখান থেকেই সাহিত্যে আধুনিক যুগের আরম্ভ।

আমার এক তেলেগু ছাত্র-বন্ধুর কথায় এক সময় বিশ্বাস হয়েছিল, যুদ্ধোত্তর কালে সাহিত্য-সমিতি নামে যে সাহিত্যিক দল গঠিত হয়েছিল, বাংলার 'কালিকলম' বা 'কল্লোল' গোষ্ঠীর সঙ্গে তার তুলনা করা যেতে পারে। শুনেছিলুম, খ্যাতনামা কবি তাল্লাভাজুলা শিবশঙ্কর শাস্ত্রীর নেতৃত্বে সে সময়ের শক্তিশ্বর তরুণেরা নতুন স্বপ্নের নেশায়

একত্র হয়েছিলেন। সাহিত্য, ভাষাতী প্রভৃতি নানা সাময়িক পত্রে তাঁদের সৃষ্টির উন্মাদনা প্রকাশ পেয়েছে অজস্রভাবে।

এ কথা জিজ্ঞাসা করাতে রাজলু বললে, আমি আপনাদের 'কল্লোল' বা 'কালিকলম' জানি নে। তবে এটুকু বলতে পারি যে, এই গোষ্ঠীর দ্বারা শক্তিশালী লেখক, তাঁদের লেখা সংস্কারমুক্ত হ'লেও ঐতিহ্যবাদী। বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণকে আমরা কবিসম্রাট বলি। ঋগদী রূপরীতি বাদ দিয়ে তাঁর 'কিষোর মনী পাভুলু' ও অন্তান্ত রচনা এ যুগের ভাবসমৃদ্ধ। দেবলা পল্লীর 'উর্বশী' কবিতার তুলনা নেই। এ ছাড়া কৃষ্ণশাস্ত্রী, নরী নরসিংহ শাস্ত্রী ও নয়ানী হুকা রাওয়ের কবিতাও রসসমৃদ্ধ। এঁদের থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নাম করা উচিত স্রীরঙ্গম ও অরুদার। সমসাময়িক বিদেশী সাহিত্যের প্রভাবে এঁরা আধুনিকদের মধ্যেও একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আধুনিক গণসাহিত্যের সূচনা কিন্তু নান্দুরী ভেঙ্কট হুকা রাওয়ের কবিতায়। জনগণের ভাষায় আশ্রয় নিয়ে বেশ একটু আলোড়ন এনেছিলেন জনগণের মধ্যে।

রাজলু ভাল লাগছে বলতে, কবিতা ও নাটক নিয়েই সকল দেশে সাহিত্যের আগরণ হয়েছে। এর ব্যতিক্রম হয় নি ভারতে বা অঙ্গে। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী অবলম্বন ক'রেই প্রথম যুগের সমস্ত নাটক রচনা হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্বে প্রথম মৌলিক নাটক প্রকাশিত হয় 'কস্তা শুদ্ধম'। বাল্যবিবাহের ফলাফল নিয়ে গুরুজাড়া আশ্রায়াও সহজ ভাষায় এই সামাজিক নাটক রচনা করেন। পরবর্তী কালে অনেক নাটক লিখে নাম করেছেন। এন্. ভি. রাও মঞ্চ তাঁর দাম না পেলেও সাহিত্য-রসিকের কাছে পুরো দাম পেয়েছেন সন্দেহ নেই।

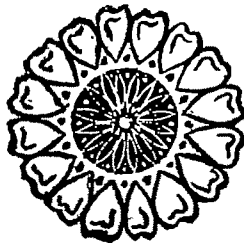
কথা-সাহিত্য পরিণত জীবনের রচনা। সাহিত্যে এ সত্যের সমর্থন পাওয়া যায় প্রায় সকল দেশে। অঙ্কে র অঙ্ক কবিকে আমরা উপভাসের জনক বললেও তাঁকে ঔপন্যাসিক বলব না। কবিসম্রাট বিশ্বনাথের উপভাস 'একবীরা'র তুলনা নেই তেলেগু সাহিত্যে। উদ্ভাভা লক্ষ্মীনারায়ণ তবু বেঁচে থাকবেন আধুনিক উপভাসের স্রষ্টা নামে। কর্মী লক্ষ্মীনারায়ণ জীবনকে দেখেছেন, নিজের চারপাশে, কুখ-দারিদ্র্য আশা-নিরাশায় পূর্ণ সমস্তাকীর্ণ সমসাময়িক সমাজ-জীবন। এই সত্য ধরা পড়েছে তাঁর রচনায়।

এক বুচ্চিবাবুর নাম শুনেছিলুম, মনে পড়ল। তাঁর কথা জিজ্ঞেস না ক'রে পারলুম না। রাজলু বললে, এঁকে আমরা অনেক সময় অঙ্কের 'জেমস্ জয়েন্স' বলি। মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানে তাঁর জুড়ি নেই এ দেশে। সব সময় একটা জটিল আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রে রাখার জন্তেই জনপ্রিয় হলেন তিনি সাধারণ্যে।

রাজলু জিব দিয়ে সরিয়ে একটা লবঙ্গ ফেললে বাইরে। বললে, শরৎচন্দ্রের লেখা অহুবার ক'রে নাম করেছেন শিবরাম শাস্ত্রী। ছোটগল্পেও তাঁর হাত আছে। স্বল্প কথায় আর কবির ভাষায় গল্প লেখার জন্তে আমরা গুড়িপতি ভেঙ্কটচলমকে মৌপীসা বলি। কুটুম্বারাও পরিচিত তাঁর ব্যঙ্গরচনা ও রেখাচিত্রের জন্তে। গোপীচাঁদেরও নাম আছে ছোটগল্পে।

পদ্মনাথুর নাম করাতে রাজলু বেশ গর্বিত বোধ করলে। বললে, ইনি কবি, তবে এঁদের লেখার সমালোচনা করবার সময় এখনও আসে নি। এ বিষয়ে আমি ম্যাথু আর্নল্ডের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। পাহাড়ের নীচে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের ভূধারমণ্ডিত চূড়া দেখা যায় না। তা দেখতে হ'লে দূরে যেতেই হবে। আজকের সাহিত্যের সঠিক সমালোচনা করবে আগামী কালের সমালোচক।

[ক্রমশ]



জহুর রাজার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় বোম্বাইয়ের মহালক্ষ্মী রেস-ময়দানে।

আমি তখন ঘোড়ার জ্যোতিষী অর্থাৎ সংবাদপত্রের রেস-রিপোর্টার। গোটা সপ্তাহ ধরে ঘোড়ার পেছনে ঘুরে বেড়াই। তাদের জন্ম-জন্মান্তরের ইতিহাস সংগ্রহ করি, কোন্ ঘোড়া তেজী, কোন্টা দুর্বল—এগুলি সংগ্রহ করে শনিবার প্রভাতে ফলাও করে লিখি। আমার এই ভবিষ্যদ্বাণীর উপর নির্ভর করে কেউবা হন রাজা, কেউবা পথের ভিখারী। তাই শনিবার খেলার শেষে কাউকে যখন রিক্ত হস্তে বাড়ি ফিরতে দেখি, তখন আমার মনে খেদ আসে না, কারণ আমি জানি—লক্ষ্মী চঞ্চলা।

কিন্তু এই চঞ্চলাকে নির্ভর করেই জহুর রাজা রেস-ময়দানে একচ্ছত্র অধিপতি হয়েছিলেন। রেস-ময়দানে ভাগ্যকে পরিহাস করা সহজ, কিন্তু রেসের উপর জহুর রাজার কোন উক্তি তুচ্ছ করা সম্ভব নয়। তার কথায় ঘোড়া প্রথম হয় কিংবা বাজি হারে। কি করে এটা সম্ভব হয়, এর জবাব দিতে পারতেন শুধু মাত্র ভাগ্যলক্ষ্মী আর জহুর রাজা।

জহুর রাজার সঙ্গে আমার আলাপ হ'ল রেযারেষির মধ্য দিয়েই। প্রথম যেদিন সে আমার দপ্তরে এল, সেদিন তাকে আমি বিশেষ আমল দিই নি। কেন যে তাকে অবহেলা করেছিলাম তার সঠিক কারণ আমার মনে নেই, তবে যত দূর মনে হয়, নিতান্ত দস্ত ক'রেই তাকে বিদায় দিয়েছিলাম, কারণ আমি রিপোর্টার মাহুষ, অল্প কাল মতবাদ সহ্য করা আমার ধাতে নেই। ববাবরই মনে করে এসেছি যে, রিপোর্টারেরা যা লিখে তা ঠিক সত্য। কিন্তু জহুর রাজার সঙ্গে এই ছব্যবহার করার ধারণা আমার শাস্তি পেতে হয়েছিল।

আমার স্পষ্ট মনে আছে, সেদিন ছিল শুক্রবার। রেসের অ্যাক্সেস্ট্যান্স বেরিয়ে গেছে অর্থাৎ শনিবার দিন কোন্ কোন্ ঘোড়া দৌড়বে তারই ফিরিস্তি। সারাটা সকাল আমার কেটেছে মাঠে ময়দানে। ট্রেনার-স্কিকদের সঙ্গে আলাপ করেছি। তাদের জিজ্ঞেস করেছি ঘোড়ার

স্বক্কে খুঁটিনাটি বিবরণ। ঘোড়ার মালিকদের কাছ থেকে গোপন তথ্য সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেছি। তারপর দপ্তরে এসে লিখেছি তারই বিস্তৃত বিবরণী। প্রতি প্যারাগ্রাফে জুড়ে দিয়েছি নিজের মতবাদ। তারপর আধ কলাম জুড়ে লিখেছি সিয়োর-সাকসেস ঘোড়াদের নাম।

কাজটা শেষ করে বেশ ক্লান্তি অনুভব করছিলাম, এমনি সময় দরজা ঠেলে জহুর রাজা উপস্থিত হ'ল। জিজ্ঞেস করলে, আপনিই এই কাগজের রেস-রিপোর্টার?

হ্যাঁ। বলুন, কি চাই?

আমার নাম জহুর রাজা। হুইট গার্ল, ফরগেট মি নট ঘোড়ার মালিক।

জানি। কে কোন্ ঘোড়ার মালিক তার ফিরিস্তি আমার শোনাতে হবে না। কিন্তু আপনার প্রয়োজনটা জানতে পারলে সুবিধে হ'ত।

আমার কণ্ঠস্বরে একটু রুদ্ধতার আভাস থাকে। কারণ প্রতিদিনই আমার কাছে এ ধরনের বহু অতিথি এসে থাকেন, যাদের কাছ থেকে এই রকমের বহু কথা শুনতে হয়।

আমার কথা শুনে জহুর রাজা হাসলে। তারপর একটা চেয়ার দেখিয়ে বললে, বসতে পারি কি? লোকটার ব্যবহার দেখে আমার বিরক্তি ক্রমশই বাড়ছিল, তবু 'না' করতে পারলাম না, বললাম, নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনার আগমনের হেতুটা জানবার সৌভাগ্য আমার হবে কি?

আবার হাসে জহুর রাজা। সোনা-বাঁধানো দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ে। বললে, সেইটে বলতেই তো এসেছি। তারপর সিগ্রেট—

একটা সিগারেটের কেস সে আমার দিকে এগিয়ে দিলে। আমার সেই মুহূর্তে কি ছর্মতি হয়েছিল জানি না, সোজা ভাষায় বললাম, না। তারপর ড্রয়ার খুলে পাইপ ও টোবাকো বের করলাম। দেশলাইয়ের সন্ধানে এদিক ওদিক হাতড়াতে লাগলাম। কি মুশকিল, দেশলাইটা খুঁজে পাচ্ছি না যে!

আমার কাণ্ড দেখে জহর রাজা হাসতে থাকে। নিজের পকেট থেকে একটা দেশলাই বের করে দিয়ে বললে, হেল্ল ইয়োরসেল্ফ্। এবার সাহায্য না নিয়ে উপায় নেই। একটা নয়, পর পর তিনটে কাঠি জ্বালিয়ে পাইপটা ধরলাম। মুখ দিয়ে একরাশ ধোঁয়া বের করে বললাম, থ্যাঙ্কস্।

এবার জহর রাজা তার বক্তব্য শুরু করে। বলে, একটু সাহায্যের জন্ত এসেছি।

পরোপকার করি বা না করি, কেউ যদি এসে সাহায্য কামনা করে তবে নিজেকে বেশ বড় ব'লেই মনে করি, একটা গর্ব হয়। অজ্ঞাতসারেই নিজের মুখ দিয়ে সহানুভূতির বাক্য বেরিয়ে আসে, বলি, বলুন। যদি কিছু করতে পারি, তবে একবার চেষ্টা করে দেখব'খন।

কালকের কোন্ ঘোড়া বাজি মারবে সেইটের টিপস লেখা আপনার হয়েছে কি?

হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

তৃতীয় রেসে কোন্ ঘোড়া বাজি জিতবে বলুন না।—জহর রাজা বেশ উৎকণ্ঠিত হয়েই এ কথা বলে।

কালকের কাগজ পড়লেই দেখতে পাবেন।

তা জানি। কিন্তু বাসী খবর দিয়ে আমার প্রয়োজন নেই। আমি জানতে চাই এ খবরটা আজ এখুনিই।

লোকটার কোঁতুহল দেখে আমি আনন্দ অহুভব করলাম। তাই বললাম, বেশ, বলছি। কিন্তু একদিন আগে আপনার একা এ খবর জেনে কি হবে, কারণ কাল তো দেশ শুদ্ধ সবাই জানতে পারবে।

জানবার আগ্রহ কেন সেটা পরে বলছি।—জহর রাজা নীরস কণ্ঠেই উত্তর দেয়।

সুইট সিক্সটিন ইজ্ মাই ফেভারিট।—আমি বলি।

হ্যাঁ, আমি জানি। কাল সুইট সিক্সটিন জিতবে। কিন্তু আপনার ওই নামটা একটু পালটে দিতে হবে।

তার মানে?—আমার কণ্ঠে থাকে বিশ্বস্তের স্বর।—আপনি বলছেন কি?

অতি সত্যি কথা। সুইট সিক্সটিনকে আপনি যদি ফেভারিট বলেন তা হ'লে কাল সবাই এ ঘোড়ার পেছনে বাজি রাখবে—এ আমি হলপ করে বলতে পারি। এই ঘোড়া এর পরে বাজি জিতলে অনেক কম টাকা পাওয়া

যাবে। সেই জন্তই তো আপনাকে অহরোধ করছি যে, আপনার ফেভারিটের নাম পালটে দিন, যাতে সুইট সিক্সটিন আপদেট হয় এবং বাজি জিতলে পর বেশ মোটা টাকা পাওয়া যায়।

মানে, আপনি আমার জোচ্চুরি করতে বলছেন।

আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে জহর রাজার মুখের হাসি উধাও হয়েছে। সে গম্ভীর কণ্ঠে বললে, ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলাটাই হচ্ছে জোচ্চুরির ব্যাপার বিক্রমাদিত্য। আমি চাই, যেন কাল সুইট সিক্সটিন মোটা টাকা ডিভিডেণ্ড পায়। এ টাকা পেতে সাহায্য করতে পারেন শুধু মাত্র আপনি। ফেভারিটের নাম পালটে দিন। কালকের খেলায় বেশ একটা মোটা রকমের দাঁও মারা যাবে।

লোকটার প্রস্তাব শুনে আমি হতভম্ব। এমনি সহজ সরল ভাবে এ ধরনের প্রস্তাব আমি কারও কাছ থেকেই কোনদিন শুনি নি। আমি দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলাম, না। এ অসম্ভব। ফেভারিটের নাম আমি কখনই পালটাব না।

জহর রাজা বলে, শুধুন, নাম পালটালে আপনার লাভ আছে। এর জন্তে যদি দু-চার পয়সা দিতে—

আমি প্রায় গর্জন করেই উঠি। বলি, আপনি আমার ঘুষ দিতে এসেছেন। যাক, অল্প কেউ হ'লে তাকে আরদালী দিয়ে বের করে দিতাম। কিন্তু আপনাকে সে কথা বলব না, কারণ আমি বিলক্ষণ জানি যে এর পরে আপনি আমার আর অথবা সময় নষ্ট করবেন না।

তা হ'লে আপনি আমার প্রস্তাবে রাজী নন?

না।

এই আপনার শেষ কথা?

পাকা কথা।

আমার জবাব শুনে জহর রাজা আর এক মুহূর্ত ব'সে রইল না। চ'লে গেল। যাবার সময় দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিয়ে গেল। আমি ব'সে রইলাম।

একটু বাবে আমার সহকর্মী মালকানি এসে উপস্থিত। বললে, জহর রাজা এসেছিল তোমার কাছে? কি ব্যাপার?

আমি উদাস কণ্ঠে উত্তর দিই, হ্যাঁ, একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল।

বল কি হে? জহর রাজা প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল তোমার কাছে! ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো মনে হচ্ছে। আচ্ছা, শুনি ওর প্রস্তাব।

বলে কিনা, যে কালকের কাগজে আমি যেন স্কাইট সিক্সটিন ঘোড়াটাকে রেকমেণ্ড না করি। স্কাইট সিক্সটিনকে ও কাল আপসেট করাতে চায়। মোটা টাকা কামাতে চায় আর কি।

তুমি কি জবাব দিলে?

বললাম, হবে না। আমার জবাব শুনে ব্যাটা বলে কি জান? বললে, ফেভারিটের নামটা পালটে দিন, এর বদলে আপনাকে বেশ কিছু পাইয়ে দোব।

তুমি রাজী হ'লে না ওর প্রস্তাবে?

পাগল হয়েছে। নিজের ইন্টিগ্রিটি ব'লে তো একটা জিনিস আছে।

হেসে মালকানি জবাব দিলে, না হে বিক্রমাদিত্য, তোমার আর রেস-ময়দানে রিপোর্টারি ক'রে লাভ নেই। আমি বলি কি, তুমি এর চাইতে ওয়ার্ধা-আশ্রমে চ'লে যাও।

* * *

পরদিন রেস-ময়দানে।

খেলা শুরু হবার খানিকটা আগেই আমি নিজের জায়গায় বেশ জাঁকিয়ে ব'সে ছিলাম।

চারদিক লোকে লোকারণ্য। দেখলে মনে হয়, অর্ধেক বোম্বাই শহরই যেন রেস-ময়দানে এসে হাজির হয়েছে। ছেলে বুড়ো মেয়ে সবাই হাতেই একটা বেসেব বই। ঝাঁদের সময় ও আগ্রহ আছে কিন্তু পয়সা নেই, তাঁরা সমস্ত লাল নীল পেন্সিল দিয়ে ঘোড়ার নামগুলি দাগাচ্ছেন। ঝাঁদের হাতে আছে পয়সা তাঁরা বুকির নামনে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন।

রেস শুরু হ'ল। প্রথম রেসটা নির্বিঘ্নেই কেটে গেল। কাগজে যে ঘোড়ার নাম দিয়েছিলাম সেইটেই প্রথম হ'ল। দ্বিতীয় রেসও তথৈবচ।

এবার শুরু হ'ল তৃতীয় নম্বর রেস। কিন্তুগাসের মধ্য দিয়ে আমি ঘোড়াগুলি দেখতে লাগলাম।

...এ কি! কি ব্যাপার! স্কাইট সিক্সটিনের জকিটা নতুন দেখছি যে, কি অবাক কাণ্ড! নিজের চোখকে বিশ্বাস

করতে পারলাম না। বোর্ডের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ই্যা, ঠিকই বটে, স্কাইট সিক্সটিনের জকি পালটে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তবু স্কাইট সিক্সটিনের কি তেজ! ই্যা, তারপর...ওই যে আমার ফেভারিট দেখি পেছিয়ে পড়ছে। এগিয়ে গেল অগ্র একটা ঘোড়া।

স্কাইট সিক্সটিন রেসটা হেরে গেল। বাজি জিতলে যেড ক্লাওয়ার ব'লে আর একটা ঘোড়া। সম্পূর্ণ আপসেট।

কি ক'রে এই ওলট-পালট হয়ে গেল সেটা নিয়ে আমার যেটুকু সন্দেহ ছিল, তা পর-মুহূর্তেই স্বচ্ছ হয়ে গেল। জহর রাজা এসে উপস্থিত হ'ল।

এই যে বিক্রমাদিত্য, দেখলেন একদম নয়া ঘোড়া বাজি মারলে।

আমি চূপ ক'রে রইলাম। ভাবলাম জহর রাজার কথার জবাব দিয়ে লাভ নেই। কিন্তু জহর রাজা আমায় নিষ্কৃতি দিলে না। সে বললে, কাম অন বিক্রমাদিত্য। লেট আস সেলিব্রেট দি ভিক্টরি। লেট আস গো অ্যাণ্ড হ্যাভ এ ড্রিক।

না।—আমি জবাব দিই।

কিন্তু জহর রাজা নাছোড়বান্দা। বললে, যেতে আপনাকে হবেই বিক্রমাদিত্য। আপনার কোন আপত্তিই শুনব না।

প্রায় এক রকম জোর ক'রেই জহর রাজা আমায় 'বারে' নিয়ে গেল।

তখনও বোম্বাই শহরে ড্রিক করাটা নিষিদ্ধ নয়। অতএব 'বার' বেশ সরগরম হয়েই আছে বলতে হবে।

বিয়ারের ছিপি খুলতে খুলতে জহর রাজা বললে, আমার উপর রাগ করেছেন?

আমি আন্তে আন্তে জবাব দিই, না না, 'রাগ করার কি আছে?'

ভাবটা এমন দেখলাম যেন সত্যিই জহর রাজার উপর কোন রাগ নেই।

আমার জবাব শুনে জহর রাজা হো-হো ক'রে হেসে উঠল। তারপর গ্লাস দুটোতে বিয়ার ঢেলে দিয়ে বললে, এই তো বাহাদুরের মত কথা বলেছেন বিক্রমাদিত্য। সত্যি, আপনি কি ছেলেমানুষ। কাল আমার কথাবায়ী

যদি কাজটা করতেন, তা হ'লে আজ বেশ ছুপয়সা বাগিয়ে নিতে পারতেন।

আমি এর কোন জবাব দিলাম না। জহর ওর গ্লাসটা তুলে ধরে বললে, টু আওয়ার নিউ ফ্রেণ্ডশিপ।

গ্লাসটা তুলে ধরতে আমার হাতটা যেন কেঁপে উঠল। তারপর জহর রাজার গ্লাসটায় ঠেকালাম।

একটা লম্বা চুমুক দিয়ে জহর রাজা বললে, তা হ'লে বিক্রমাদিত্য, তুমি আর আমি আজ থেকে বন্ধু, কি বল? জহর রাজা আমায় 'তুমি' বলেই সম্বোধন করলে। লোকটার কাণ্ড দেখে না হেসে পারলাম না। বললাম, ইয়েস, উই আর ফ্রেন্ডস।

প্রায় একটা ছকর দিয়েই জহর রাজা বয়কে ডাকলে, ব্যোয়, আউর এক লে আও।

* * *

জহর রাজার সঙ্গে আমার পরিচয়ের এই হ'ল সংক্ষিপ্ত কাহিনী। কিংবা বলতে পারি, আমার এই গল্পের এই হ'ল গৌরচন্দ্রিকা। কারণ আমাদের ছুজনের মধ্যে এই হস্ততা এর পরে একটা নিবিড় সম্পর্কে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমি দেখতে পেয়েছিলাম, জহর রাজা দিলদরিয়া মানুষ, জীবনকে ভোগ করতে জানে আর পারে ভাগ্যকে নিয়ে পরিহাস করতে। বিপদকে সে পরোয়া করে না, তাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে যেন তার আনন্দ। তার সাহস দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম।

কিন্তু জহর রাজার একটা প্রবল দুর্বলতা ছিল। সেটা হ'ল নারীঘটিত ব্যাপারে। আর এই দুর্বলতার দরুনই একদিন তাকে দণ্ড পেতে হয়েছিল।

আজকের আমার এই কাহিনী সে ব্যাপার নিয়েই।

* * *

প্রায় ছ বছর আগে।

জহর রাজা ও আমি তখন পরম বন্ধু। তার কাছ থেকে আমি বহু ঘোড়ার টিপ্‌স্‌ পাই এবং সেগুলিকে বড় করে নিজের রিপোর্টে লিখি। আমার অধিকাংশ খবরই আজকাল সত্যি হয়। আমার কাজ দেখে সম্পাদক খুশি। পাঠকেরা আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

সেবার সন্ধানের প্রথম দিক থেকেই আমাদের বরাত ভাল থাকছিল। একটা টিপ্‌স্‌ও মিথ্যে হয় নি। জহর

রাজাও বেশ মোটা টাকা গুছিয়ে নিয়েছে। আমিও যে ছ-চার পয়সা করি নি—এমন কথা বলব না।

একদিন একটা ট্রিবল্‌ টোটের খেলা হচ্ছিল। প্রথম দুটো রেসে আমাদের ঘোড়াই জিতেছে এবং তৃতীয় ঘোড়াটা জিতলে পর লাখপতি হবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না, কারণ এর আগের শনিবারের ট্রিবল্‌ টোটের খেলায় কেউ বাজি জেতে নি। তাই ঠিক হয়েছে যে, আজকে দুটো দিনের টাকা একই সঙ্গে দেওয়া হবে।

এতগুলি টাকা পাব এ কথা ভাবতেও বেশ আনন্দ হচ্ছিল। জহর রাজার মনটাও বেশ ঢাকা দেখতে পেলাম। গুনগুন করে গান গাইছে।

ইন্টারভ্যালের একটু বাদে জহর রাজা এসে বললে, বিক্রমাদিত্য, শোন, আমাদের রেস শুরু হবার এখনও বেশ খানিকটা সময় আছে। চল, একটু 'বারে' গিয়ে বস। আজকের 'বার'টা বেশ নির্জন। কারণ দর্শকেরা সবাই ময়দানে খেলা দেখছে।

জহর রাজা বয়কে দুটো বিচার আনতে বললে।

বিষার ঘাসে ঢালতে ঢালতে জহর রাজা বলে, বিক্রম, আজ কেমনাফতে। উক্। এইবার শেষ রক্ষা হ'লেই হ'ল। উই জাল বি দি আগা খান অব বখে, কি বল হে।

বা বলেছ।—আমি সায় দিই।

তারপর শেষ রেসে আমাদের ঘোড়ার জয় কামনা করে আমরা ছুজনে গ্লাস তুললাম। আমি চুমুক দিলাম, কিন্তু জহর রাজার হাতটা যেন মুখের কাছে এসে থেমে গেল। ব্যাপার কি?

আমি জিজ্ঞাসু নেত্রে জহরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। একটু বাদে ওর যেন ধ্যান ভাঙল। আমায় বললে, বিক্রম, ওই দিকে তাকিয়ে দেখ। ঠিক তোমার পেছনের টেবিলে।

আমি তাকিয়ে দেখলাম, একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে। আমি সাহিত্যিক নই, নইলে এই মেয়েটিকে নিয়ে রূপকথা সৃষ্টি করতে পারতাম; দার্শনিক নই, নইলে তার রূপ নিয়ে ফিলসফি আওড়াতে পারতাম; কবি নই, নইলে কাব্য রচনা করাও মুশকিল হ'ত না। আমি হচ্ছি চারণ অর্বাং ইংরেজী ভাবায় থাকে বলে, প্রেস-রিপোর্টার। তাই সংক্ষেপেই বলব যে, মেয়েটি তিলোত্তমা। লক্ষ্য

করলাম, জহুর রাজা যেন বেশ চকল হয়ে উঠেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার ?

বিক্রমাদিত্য, ওই মেয়েটির সঙ্গে আলাপ আমার করতেই হবে।

তুমি কি বলছ জহুর ? অপরিচিততার সঙ্গে কি ক'রে তুমি গায়ে পড়ে আলাপ করবে ?—আমি বলি।

একটা কন্দি বাতলাও বিক্রম। এ ফ্রেণ্ড ইন নীড ইজ এ ফ্রেণ্ড ইণ্ডিড।

আমি স্তম্ভিত। আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। আমি কিছু বলবার আগেই জহুর রাজা বলে ওঠে, মি গ্র্যাণ্ড আইডিয়া! দেখ, মেয়েটিও নিশ্চয় রেস খেলতে এসেছে।

আলবার্ট, রেস-ময়দানে ভগবানের আরাধনা করতে আসে নি, এ আমি হলপ ক'রেই বলতে পারি।—আমি জবাব দিই।

তা হ'লে শি মাস্ট বি ইণ্টারেস্টেড ইন হর্স।—বলতে বলতে জহুর রাজা মেয়েটির টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল।

আমি দূর থেকে ওর কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করতে লাগলাম।

মেয়েটির কাছে গিয়ে জহুর রাজা বলে, মাদাম, যদি কিছু মনে না করেন তা হ'লে এই সীটটায় বসতে পারি।

মেয়েটি যেন একটু অপ্রস্তুত বোধ করে। তারপর বলে, ইয়েস, মেক ইওরসেল্ফ কম্ফোর্টেবল।

এবার জহুর রাজা আলাপ জমাবার চেষ্টা করে। একটা সিগারেটের প্যাকেট বের ক'রে বলে, ক্যান আই স্মোক ?

নিশ্চয়।—জবাব দেয় মেয়েটি।

আপনি—। জহুর রাজা প্যাকেটটি এগিয়ে দেয়।

নো থ্যাঙ্ক্‌স্—বেশ স্পষ্ট জবাবই আসে।

কথার মোড়টা ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টা করে জহুর রাজা।

বলে, কোন্ ঘোড়ায় খেললেন ?

প্রথম দুটো রেস খেলছিলাম, কিন্তু হেরে গেছি।

তাই নাকি ?—বিশ্বস্তের ভান ক'রে জহুর রাজা জবাব দেয়।

হ্যাঁ।

এর পরে কোন্ রেস খেলছেন ?

শেষ রেস, লিটল্ কুইন ঘোড়ায় টিকিট কিনেছি।

লিটল্ কুইন! বলেন কি ?

জহুর রাজার কণ্ঠস্বর যেন করুণ শোনায়। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে ডাক দিলে। বললে, বিক্রমাদিত্য, শোন।

আমি এগিয়ে যাই।

কি ব্যাপার ?

আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে জহুর রাজা বলে, আমার বন্ধু বিক্রমাদিত্য। রেসকোর্সের প্রেস-রিপোর্টার। আর ইনি হলেন—ইয়ে—

জহুর রাজার জবাবটা মেয়েটিই সমাপ্ত ক'রে দেয়। বলে, মিস প্রমীলা জোহার।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মিস জোহার। জান বিক্রমাদিত্য, মিস জোহার শেষ রেসে লিটল্ কুইনের ওপর টাকা স্টেক করছেন।

বলেন কি ?—আমিও একটু বিস্মিত হয়েই বললাম। কারণ আমি জানতাম যে, লিটল্ কুইনের জেতবার কোন আশাই নেই। লিটল্ কুইন ঘোড়া ধারাপ নয়, কিন্তু ওই ঘোড়ার জকির বিশেষ স্মনাম নেই।

এবার জহুর রাজার বলবার পালা। বলে, মিস জোহার, লিটল্ কুইন বাজি জিতবে না। তার চাইতে মাই কিং ঘোড়াটার টাকা ঢালুন, বাজি জিতবেন।

আপনি সত্যি বলছেন ?—করুণ কণ্ঠে মেয়েটি জিজ্ঞেস করে।

ঘোড়ার ব্যাপারে জহুর রাজা কখনও মিথ্যে বলে না। আমি হলপ ক'রেই বলতে পারি, লিটল্ কুইনের জেতবার কোন আশাই নেই। ওর জকির সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে।

তা হ'লে কি হবে ?—মিস জোহার হতাশার স্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

মাই কিংএ খেলুন। একদম সিয়োর ঘোড়া।

কিন্তু আমার টিকিট তো কেনা হয়ে গিয়েছে।

তার মানে আপনি বলতে চাইছেন যে, আপনি আপনার সমস্ত টাকা লিটল্ কুইনের উপর ঢেলেছেন।

হ্যাঁ। সমস্ত, প্রায় হাজার ধানেক টাকা।—ব'লেই একটু চুপ ক'রে রইলেন মিস জোহার। তারপর বলতে

লাগলেন, এই একটা মাস ধরে খালি হারছি। একটা বাজিও এ সিজননে জিততে পারি নি। আজকে যদি জিততে না পারি তা হ'লে যে কি হবে বলতে পারি না। নিজের যা পুঁজি ছিল তা সমস্তই নিঃশেষ হয়ে গেছে।

আচ্ছা, টিকিটটা কি কোন প্রকারেই বদলানো যায় না?—আমি বলি। একটু স্নান হাসি হেসে মিস জোহার বললেন, রেস খেলার ময়দান। টিকিট কাটা হয়ে গেলে পর কি আর টিকিট বদলানো যায় বিক্রমাদিত্য?

হঠাৎ জহর রাজার কি হ'ল বলতে পারি না। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বললে, তোমরা দুজনে বসে একটু গল্প কর বিক্রম, আমি আসছি। আপনি চিন্তা করবেন না মিস জোহার। উপায় একটা হবেই।

দমকা হাওয়ায় মত জহর রাজা চলে গেল। তারপর প্রায় মিনিট দশেক বাদে এসে উপস্থিত। বললে, চলুন, রেসের টাইম হয়েছে। লেট আস গো।

আমবা যে ঘর জায়গায় বসলাম। শেষ রেস, কাজেই লোকের চাঞ্চল্য একটু বেশি। তার উপর টি.বল টোটের খেলা। ঘোড়াগুলো সব সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। আমি ফিল্ডমাস নিয়ে দেখতে লাগলাম। জহর রাজা নিস্তব্ধ। 'বার' থেকে ফিরে আসা অবধি সে বেশ গম্ভীর হয়ে আছে।

হঠাৎ আমি প্রায় চিংকার করেই বলে উঠলাম, জহর, দেখতে পাচ্ছ, মাই কিং দৌড়চ্ছে না?

আমার কথায় জহরের কোন চাঞ্চল্যই হ'ল না। সে চুপ করে বসে রইল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কি হ'ল বল তো? একদম নিঃস্বুম মেবে গেলে দেখছি।

জহর রাজা হাসলে। বললে, বিক্রমাদিত্য, ফিল্ডমাস দিয়ে ঘোড়া দেখে লাভ নেই। এ বাজি আমরা হেরেছি। বাজি জিতবে লিটল কুইন, নতুন জকি ওই ঘোড়ায় চড়ে।

জহর রাজার কথা শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। রেস তখন শুরু হয়ে গেছে। সত্যিই ষটে লিটল কুইনের জকিটা নতুন। মাই কিং এর জকি লিটল কুইনে চড়েছে। কি করে যে এটা সম্ভব হ'ল আমার বুঝতে অসম্ভব হ'ল না।

এর পরে আর বাকি সময়টা আমাদের মধ্যে কোন কথা হ'ল না। আমি চুপ করে বসে রইলাম। খেলার শেষে মিস জোহার এক রাশ টাকা নিয়ে এলেন। আমি দেখতে পেলাম, জহর রাজা ও মিস জোহার বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছে। জহর রাজা নিজের গাড়ি করেই মিস জোহারকে বাড়ি অবধি পৌছে দিলে। উনি থাকেন পেডার রোডের কাছাকাছি। কম্পদ কর্নারের কাছে নেমে গেলেন।

গাড়ি ফাঁকা হয়ে গেলে পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি করলে জহর রাজা? এতগুলি টাকা মাঠে মারা গেল!

আমার কথা শুনে জহর রাজা হাসে। বলে, বিক্রমাদিত্য, তুমি মাত্র সামান্য কয়েকটা টাকার কথা ভাবছ। আমি তো এর চাইতে অনেক বড় জুয়া খেলছি হে।

এর পরে প্রায় গোটা সিজনটাই আপসেট হতে লাগল।

জহর রাজার কাছ থেকে আমিও অনেকটা আলগা হয়ে পড়েছিলাম। কারণ জহর রাজা আজকাল প্রায়ই মিস জোহারকে নিয়ে যোরে। আমার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয় কম।

প্রতি শনিবারেই মিস জোহার অদ্ভুত অদ্ভুত ঘোড়ার নাম নিয়ে আসেন। ঘর বাজি জেতার সম্ভাবনা কখনো কালেও থাকে না। কিন্তু শেষ মুহুর্তে কি হয় জানি না, ওই সব অপরিচিত ঘোড়াই বাজি জেতে।

রেস খেলায় এই রকম গুলট-পালট সচরাচর হয় না। ভাই রেস-মহলে বেশ হৈ-চৈ পড়ে গেল। নানা জনে নানা কথা বলতে লাগল। এমন কি টার্ক বোর্ডের কর্তাদেরও টনক নড়ল। কিন্তু একমাত্র ধীর স্থির রইল জহর রাজা। সকাল-সন্ধ্যায় আমি তাকে দেখতে পাই মিস জোহারের সঙ্গে। কখনও বা এরোজ, রিগ্যালকু সিনেমায়, কখনও বা জুহর সৈকতে। ওদের বন্ধুত্ব যেন গাঢ় হয়ে উঠেছে।

তারপর এল একদিন সিজননের শেষ খেলা। আজকের

ঘোড়ার নাম নিয়ে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। আমিও নিজের মনগড়া অনেক কথা কাগজে লিখছি। মনগড়া এই জন্তে বলছি, কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে শেষ-মুহুর্তে একটা বিপরীত কিছু ঘটবেই। এবং ঘোড়া আপসেট হবে। সেদিন রেস-ময়দানে আমি একটু সকাল সকাল গেলাম। মনটা উৎকর্ষায় ভরা। ভাবছি, আজকের টিপস্ও যদি সত্য না হয়, তা হ'লে আর রিপোর্টার-মহলে মুখ দেখানো যাবে না।

রেস খেলার একটু আগে জহুর রাজা এসে উপস্থিত। তার বেশভূষা দেখে তো আমি অবাক।

জহুর রাজাকে এ রকম সাজগোজ করতে আমি কখনও দেখি নি। একদম নিখুঁত সাহেব। বটন-হোলে রয়েছে একটা লাল গোলাপ ফুল।

এ কি ব্যাপার জহুর? তোমার এই সাজগোজ!— আমি জিজ্ঞেস করি।

আজ যে সিঙ্কনের শেষ খেলা বিক্রমাদিত্য। তাই তো একটু সেজেগুজে এলাম।

কোন্ ঘোড়া খেলছ?—আমি জিজ্ঞেস করি।

ওয়েল, আমার ঘোড়া তো বাঁধা হে!—হেসেই জহুর রাজা জবাব দেয়।

আমি বাধা দিই। বলি, না না, আমি জিজ্ঞেস করছি, রেসে কোন্ ঘোড়াকে ব্যাক করছ?

ফরগেট মী নট।

ঠিক বলছ তো? না, শেষ মুহুর্তে ঘোড়া পালটে যাবে?—আমি বলি।

না হে, না। আজকের ঘোড়া ঠিকই আছে।

তারপর জহুর আমার এক কোণে ডেকে নিয়ে বললে, বিক্রমাদিত্য, একদিন ট্রিব্লু টোটের খেলায় আমার পরাজয় হয়েছিল, কিন্তু দেখবে আজ আমি বাজি জিতবই।

কি ব্যাপার?

মিস জোহারকে আজ জিতব।

তার মানে?

সে অনেক কথা ভায়া। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আজকে আমি মিস জোহারের কাছে প্রোপোজ করব।

তোমার ধারণা মিস জোহার রাজী হবেন?

হবেন না। বল কি হে। কাল আমার ব্যাক থেকে

তুলে সমস্ত টাকা ওর অ্যাকাউন্টে দিয়েছি। আজকে রেসের শেষে ভাবছি, রাতের ট্রেনেই আমরা দুজনে কাশ্মীর যাব।

জহুর রাজার কথায় আমি বিশেষ বিস্মিত হলাম না। কারণ ও যে এই ধরনের একটা ফন্দী বহুদিন ধরে আঁটছিল, সেটা আমার পক্ষে আঁচ করা মুশকিল হয় নি।

এর পরে খেলা শুরু হ'ল। পর পর দুটো রেস হয়ে গেল, মিস জোহারের তবু দেখা নেই। তৃতীয় রেস শুরু হবার একটু বাদেই রূপের বলকানি দিয়ে মিস জোহার এসে উপস্থিত হলেন। একটু অনুরোধের কর্তেই জহুর রাজা বললে, সত্যি, প্রমী, তোমার জন্তে এতক্ষণ ধরে বসে আছি। তোমার কি হয়েছিল বল তো?

একটু মধুর হাসি ছড়িয়ে দিয়ে মিস জোহার বললেন, আই অ্যাম সো সরি জহুর। ভয়ানক একটা কাজে আটকা পড়েছিলাম। জিনিসপত্তর অনেক গোছাতে হয়েছে কিনা।

মিস জোহারের কথা শুনে জহুর রাজা হাসে। বলে, আজ সকালে আমি তোমায় টেলিফোন করেছিলাম। চাকর বললে—তুমি নাকি খুব সকালেই বেরিয়ে গেছ।

হ্যাঁ, একটু সন্ধ্যা করতে বেরিয়েছিলাম। তা এর পরের রেসে কোন্ ঘোড়া বাজি জিতবে?

ফরগেট মী নট।

আমি চুপ ক'রে ওদের আলাপচারী শুনতে লাগলাম।

একটু বাদে চার নম্বর রেস শুরু হ'ল। জহুর রাজার ঘোড়া ফরগেট মী নট এবার দৌড়ছে। কাজেই বেশ উদগ্রীব হয়ে রইলাম। জহুরের সেদিকে কিন্তু খেয়াল নেই। ও মিস জোহারের সঙ্গে আলাপে মগ্ন।

এমনি সময় এই বাক্যালাপে বিঘ্ন ঘটাল এক সুদর্শন যুবক। একটু ব্যস্ততার ভাব নিয়েই সে মিস জোহারের পাশের খালি সীটটার এসে বসে। তারপর বলে, সত্যি প্রমী, আমি কতক্ষণ ধরে তোমায় খুঁজে বেড়াছি।

ছেলেটিকে দেখে জহুর রাজা যেন একটু অসন্তুষ্ট হ'ল। কিন্তু কিছু বলবার জো নেই। মিস জোহারের কোন বন্ধুকে সে চর্চাতে পারে না। কাজেই চুপ ক'রে বসে রইল।

হেসে জবাব দিলে মিস জোহার। বললে, বা: রে, কতক্ষণ ধরে তো আমি এখানে বসে আছি।

তারপর হঠাৎ জহর রাজার দিকে তাকিয়ে বললে,
জহর, তুমি একে চেন?

কি করে চিনব? পরিচয় তো করিয়ে দাও নি।

এই দেখ আমার ভুলো মন। আলাপ করিয়ে দিতে
ভুলেই গিয়েছিলাম। কুন্দন, মিট দি কিং অফ রেসকোর্স—
জহর রাজা। আর ইনি হলেন গিয়ে আমার হাঙ্গব্যাণ্ড
কুন্দন শর্মা।

কি বললে?—প্রায় চিংকার করেই জহর বলে উঠে।
পাশের লোকগুলির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এসে পড়ে জহর রাজার
প্রতি।

আমার স্বামী কুন্দন শর্মা। ওঃ লর্ড! তোমায়
আসল কথাটা যে এখনও বলি নি জহর। আজকে
ভোরে আমাদের রেজেন্সি করে বিয়ে হয়েছে।

ও, আই সি।—উত্তর দিলে জহর রাজা।

তারপর শরীরটা হেলিয়ে দিলে চেয়ারে। চোখ দুটো
বুজে রাখলে।

চার নম্বর রেস শেষ হয়ে গিয়েছে। জহর রাজার
ঘোড়া করগেট মি নট প্রথম হয়েছে। প্রমীলা জোহার
ধনুবাণ আনায় জহরকে। বলে, জহর, সত্যি তোমায়
লাকটা কি চমৎকার! তোমায় দেখলে আমার হিংসে
হয়।

তারপর ওরা দুজনে উঠে দাঁড়াল—প্রমীলা ও কুন্দন।
একটু মধুর হাসি ছড়িয়ে দিয়ে প্রমীলা বললে, আচ্ছা,
আজ বাই। আমরা আবার রাতের ট্রেনেই দিল্লী যাচ্ছি

কিনা—কয়েক দিন ওখানে থেকে কাশ্মীরে যাব। তা হ'লে
আবার নেক্সট সিজনে দেখা হচ্ছে জহর, কি বল?
বাই বাই।

ওরা দুজনে চলে যায়।

আমরা ব'সে রইলাম। জহর রাজা কি যেন ভাবছে।

আমি বললাম, মেয়েটা জোচ্চোর। এমনি ভাবে
তোমায় ঠকিয়ে গেল।

আমার কথায় জহর রাজার যেন তজ্রা ভাঙে। বলে,
কি বলছিলে—মেয়েটা ঠক?

হ্যাঁ, একেবারে বাহু জোচ্চোর। নইলে তোমায় কি
নাকালটাই না করে গেল।

আমার কথায় কোন জবাব দিলে না জহর রাজা, শুধু
সিগারেট-কেস বের করে একটা সিগারেট ধরালে।

আমি আবার বললাম, মেয়েটাকে শায়েস্তা কর
জহর।

কি করে?—জিজ্ঞেস করে জহর রাজা।

একটা উপায় বাতলাও।—আমি বলি।

আমার পিঠ চাপড়ে জহর রাজা হো-হো করে হেসে
উঠল। বললে, বিক্রমাদিত্য, তুমি ছেলেমানুষ। উপায়
বাতলে কোন লাভই নেই। আসল কথা কি জান, জীবনের
ভাগ্যখেলায় ইউ ক্যান অলওয়েজ ব্যাক এ হর্স, বাট
নেভার এ উওম্যান। তাই বলি, বাজি যদি কখনও রাখতে
চাও, তবে ঘোড়ার উপরই রেখো, কিন্তু মেয়েদের ওপর
কখনও নয়।



ডানা

“বনফুল”

১৯

সে দিন মোটরে ভাস্করের সঙ্গে ডানার আর কোনও কথা হয় নি। ছুজনেরই মন নানা কথায় পরিপূর্ণ, কিন্তু ছুজনেই ইতস্তত করছিল। শীতকালে জলের ঘটিটা মাথায় ঢালার আগে অনেকে যেমন ইতস্তত করে, অনেকটা তেমনি। ছুজনেই বুঝতে পেরেছিল, কথাটা যখন আরম্ভ হয়ে গেছে তখন শেষ করতেই হবে। কোথায় শেষ হবে এই অনিশ্চয়তাটাই ছুজনকে আশা-আকাঙ্ক্ষার দোলায় দোলাচ্ছিল। ছুজনেরই মনে হচ্ছিল, অসাবধানে বেকাস কিছু ব'লে ফেললে স্বরটা কেটে যাবে হয়তো। তাই কেউ কিছু বলছিল না। তা ছাড়া চাপরাসীটা পিছনে ব'লে ছিল।

নিজের বাংলোর কাছাকাছি এসে ভাস্কর বললেন, এখানেই নামবে, না, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব?

পৌঁছেই যাও। আমার কাজ আছে একটু।

এত রাজে আবার কি কাজ?

পাখিগুলোর খবর নিতে হবে একটু। আজকের ডাকটাও দেখা হয় নি। অমরেশবাবুর বা রত্নামির চিঠি আসতে পারে।

চল, তা হ'লে পৌঁছে দিই। আলোচ্য বিষয়টার আলোচনা কখন করবে?

করলেই হবে একদিন। ব্যস্ত কি।

আমার কিন্তু একটু তাড়া আছে।

কিসের তাড়া?

এক মিনিটের জন্ত নেমে এস। দেখাচ্ছি, তা হ'লেই বুঝতে পারবে।

বাংলোর ভিতর ঢুকেই ডানা বুঝতে পারল, বাড়িতে স্ত্রীলোক নেই কেউ। জিনিসপত্র সবই আছে, কিন্তু সেগুলো সাজিয়ে শুছিয়ে রাখা নেই। ড্রয়িং-রুমের মাঝখানে একটা বিদ্যুৎ কালো টেবিলের উপর আধ-খোলা স্টেকেস একটা। ভাস্কর সেইটেই হাটকাত্তে লাগলেন এসে। কাগজপত্র, ক্রমাগত, টাই ছড়িয়ে পড়ল মেঝের উপর। স্টেকেস থেকে একগোছা খাম বার করলেন ভাস্কর বস্তু।

এই দেখ। একটা খুলে দেখ, তা হ'লেই বুঝতে পারবে।

খুলতেই একটা স্ত্রী মেয়ের ফোটো বেরিয়ে পড়ল।

প্রত্যেক খামেই একটা ক'রে ফোটো আছে। আরও আসবার সম্ভাবনা আছে। কোথাও কোনও জবাব দিই নি। কিন্তু কত দিন আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে?

আচ্ছা, পরে কথা হবে এ বিষয়। আজ আর নয়।

মুচকি হেসে ডানা বেরিয়ে গেল। বাইরে সে যতটা সপ্রতিভতা দেখাল, মনে মনে কিন্তু ঠিক ততটা সপ্রতিভ সে থাকতে পারল না। হঠাৎ কেমন যেন ভীত হয়ে পড়ল, আর সেজন্য লজ্জিতও হ'ল মনে মনে।

ভাস্কর তাকে বাড়িতে নামিয়ে রেখে চ'লে গেলেন। ডানা চুপচাপ একা দাঁড়িয়ে রইল। কোথাও কেউ নেই। চাকরটাও নেই। মনে হ'ল, যেন অসীম নির্জনতার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে তাকে আবার। আবার নতুন ক'রে নবলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করতে হবে বুঝি। পুরাতন পরিবেশেই কিন্তু ক্ষিরে আসতে হ'ল পর-মুহুর্তে। চাকরটা এল। সে কেরোসিন তেল আনতে গিয়েছিল।

মুন্সী এসেছিল কি?

এসেছিল।

কিছু ব'লে গেছে?

আরও দু-একটা পাখি ম'রে গেছে বললে।

চুপ ক'রে রইল ডানা। সে যদি ভাস্করের সঙ্গে না গিয়ে পক্ষীনিবাস পরিদর্শন করতে যেত তা হ'লে যে ওরা বাঁচত তা নয়, কিন্তু তবু ডানা নিজেকে অপরাধী মনে করতে লাগল। তার মনে হতে লাগল, এমন একটা ব্যাপারের সঙ্গে তার জীবন জড়িয়ে গেছে যার উপর তার কোনও হাত নেই। বন্দী পাখিদের স্বাস্থ্য-নিয়ন্ত্রণ করার সাধ্য তার নেই, অথচ ওই তার চাকরি।

চা খাবেন মা?

কর একটু। পিওন এসেছিল?

এসেছিল। একটা চিঠি আছে।

ডানা ঘরের ভিতর ঢুকে অনেকটা যেন আরাম বোধ করল। এতক্ষণ যেন সে রাস্তা হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

চিঠি লিখেছিলেন অমরেশবাবু। ডানা খামখানা উলটে-পালটে দেখলে। মনে হ'ল, কাস্মীর থেকে লিখেছেন। ভাবলে, স্নান সেরে ভাল ক'রে পড়া যাবে।

স্নান শেষ ক'রে চা খেতে খেতে সে এমন অন্তমনস্ক হয়ে পড়ল যে, অমরেশবাবুর চিঠিখানার কথা মনেই রইল না তার আর। কেন সে অন্তমনস্ক হয়েছে তা নিজেও সে বলতে পারত না। সম্মানে সে কিছুই ভাবছিল না, ভাস্করের কথাও নয়। তার মনটা যেন অন্ধকার ঘরের মত হয়েছিল, সচেতন ভাবে কিছুই পরিস্ফুট হয়ে ছিল না তাতে। অন্তমনস্ক হয়ে সে কেবল চায়ের পেয়ালায় ছোট ছোট চুমুক দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ অন্ধকার ঘরে আলো জ্বলে উঠল, সম্মাসীর কথা মনে পড়ল। ভাস্কর আমাদের পর থেকে কয়েকদিন তাঁর খোঁজ নেওয়া হয় নি। তাঁর সম্বন্ধে যে সব বিস্ময়কর খবর সে সংগ্রহ করেছে, তা মনে পড়তেই সে উঠে দাঁড়াল। মনে হ'ল, মস্ত বড় একটা কর্তব্য যেন অপরাধ রয়েছে। সম্মাসীর ছদ্মবেশের তলায় যে বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য আত্মগোপন ক'রে আছেন, তার রহস্যটা আবিষ্কার করতেই হবে। প্রাক্তন জমিদার মহারাম ভট্টাচার্যের সঙ্গে এঁর কোন সম্পর্ক আছে কি না, সেটা জানাও যেন দরকারী মনে হ'ল তার। টর্চ নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। চাকরটাকে ব'লে গেল, সে একটু বেড়াতে বেরুচ্ছে, খুব জরুরী দরকারে কেউ যদি আসে, সে যেন অপেক্ষা করে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সে ফিরে আসবে।

সম্মাসীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সে ডাকলে, বিশ্বনাথ-বাবু বাড়ি আছেন? কোনও উত্তর এল না। বুকের ভিতরটা হঠাৎ কঁপে উঠল ডানার। চলে গেছেন না কি ভদ্রলোক! আর একবার ডাকলে, কোনও সাড়া নেই। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলে, কপাটটা খোলা রয়েছে, ঘরের ভিতর কেউ নেই। টর্চের আলোয় শাবলের ডগাটা চক্‌চক্‌ ক'রে উঠল। সেটা একটা কোণে ঠেসানো ছিল। কয়েক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর মনে হ'ল, হয়তো চরে কোথাও গেছেন। তিনি সাধারণত কোথায় গিয়ে বসেন তা ডানার জানা ছিল। চরের উপর পান্নে-চলা পথও হয়েছে আজকাল। একটু খুঁজে দেখলে ক্ষতি কি! চরের দিকে এগিয়ে গেল সে।

চরে ভীষণ অন্ধকার। নিঃশব্দ নয়, বাতায়। অসংখ্য বিল্লী ডাকছে। বিল্লীও বোধ হয় এক রকম নয়, নানা রকম শব্দ হচ্ছে। তার সঙ্গে মিশছে ভেকের ডাক, পেচকের কর্কশ চিংকার, টিটিভ পাখিদের 'ডিড্-হি-ডু-ইট্' (Did-he-do-it) 'ডিড্-হি-ডু-ইট্' আর্তরব। 'চোখ গেল' পাখিও ডাকছে একটা। গাংচিলদের কলরব শোনা যাচ্ছে। আর একটা কি পাখি মাঝে মাঝে ডাকছে আর খামছে। মনে হচ্ছে সাপে বৃষি ব্যাঙ ধরছে—কুক্ কুক্ কুক্, তিন-চারবার ভেকেই থেমে যাচ্ছে। কোন রকম প্যাঁচা কি? ডানার মনে হচ্ছিল, বিরাট অন্ধকারই যেন নানা ভাবে কথা কইছে। দিনে আলোর নানা লীলায় প্রকৃতি যে বার্তা আমাদের মনের মধ্যে পৌঁছে দিতে চায়, অন্ধকারে ধ্বনি-বৈচিত্র্যের মাধ্যমে প্রতিপথে কি সেই বার্তাই পাঠাচ্ছে প্রকৃতি? না, এ অস্ত্র কিছু? অন্ধকারকে মাঝে মাঝে টর্চের আলো ফেলে চমকে দেবার চেষ্টা করছিল ডানা। অন্ধকার কিন্তু চমকাচ্ছিল না। তার বিরাট অতিকার রূপের নিকষে এতটুকু দাগ পড়ছিল না। ক্ষুদ্র আলোর রেখাটাই যেন অপ্রতিভ নিপ্রভ হয়ে পড়ছিল তার সীমাহীন বিশালতার কাছে। হঠাৎ ডানার মনে হ'ল, যা আমরা অসীম বা অনন্ত ব'লে কল্পনা করি তা কি আলোহীন? আলোর আমাদের বুদ্ধি দৃষ্টিসীমায় আটকে যায়, আদি এবং অন্ত আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই। অন্ধকারে তা পাই না, অন্ধকারই আমাদের মনে অসীমের আভাস জাগিয়ে তোলে। টর্চের বোতামটা টিপতে টিপতে নানা রকম এলোমেলো ভাবনার ঘাত-প্রতিঘাতে অন্তমনস্ক হয়ে ডানা এগিয়ে চলেছিল অন্ধকারে। তার ভয় করছিল না, সে জানতে পারছিল না যে, তার মনের নেপথ্যে এক শক্তিমান পুরুষ অমোঘ আকর্ষণে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন, সে আকর্ষণকে উপেক্ষা করবার শক্তি তার ছিল না। চলতে চলতে হঠাৎ সে থেমে গেল। গায়ে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগল, নদীর মুহূ কলধ্বনি শোনা গেল। সে বুঝতে পারল যে, চরের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছে গেছে। সামনেই নদী। নদীর জলে টর্চ ফেলতেই একদল হাঁস কলরব ক'রে উড়ে গেল। ডানার মনে হ'ল, হাঁসেরা এখনও কেরে নি নাকি নিজেদের দেশে? ডাক শুনে মনে হ'ল চখা। মনে পড়ল, চখারা অনেক দিন পর্যন্ত এ দেশে থাকে।

ভারপর মনে হ'ল, হাঁসদের স্বদেশ ব'লে কিছু আছে কি ! সমস্ত পৃথিবীটাই তো তাদের দেশ, যখন যেখানে ভাল লাগে তখন সেখানে থাকে। হিমালয়, রাশিয়া, উত্তরমেরু, ভারতবর্ষ, ইয়োরোপ, আমেরিকা ওদের কাছে যেন এ-পাড়া ও-পাড়া। আরবাই কেবল একটা সর্কার পরিধির মধ্যে বাস ক'রে এটা স্বদেশ ওটা বিদেশ, এ আত্মীয় ও পর—এই সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে অশান্তির সৃষ্টি করি। টর্চের আলোটা এদিকে ওদিকে ফেলে নদীর ধারে ধারে এগিয়ে যেতে লাগল সে। ছোট বড় বালির টিপি, ঝাউগাছ, মাঝে মাঝে দু-একটা শেয়াল দেখা যাচ্ছে। একটা শেয়াল তার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর চ'লে গেল। সম্যাসী যেখানটার সাধারণত বসেন সেখানে উপস্থিত হ'ল সে অবশেষে। কেউ কোথাও নেই। হঠাৎ উৎকর্ষ হয়ে উঠল সে। মনে হ'ল, দূরে অনেক দূরে, কে যেন গান গাইছে। সম্যাসী কি ? উনি একা ব'লে অনেক সময় গান করেন। এগিয়ে চলল ডানা সেই দিকে। বালি ভেঙে ভেঙে অনেক দূর যেতে হ'ল। গিয়েও কিন্তু সম্যাসীর দেখা পাওয়া গেল না। ডানা টর্চ ফেলে ফেলে নির্ণয় করবার চেষ্টা করতে লাগল, গানটা গাইছে কে, আর কোথায় ব'লেই বা গাইছে। হঠাৎ দেখতে পেল, নদীতে একটা নৌকো ভেসে চলেছে। নৌকো থেকেই গানটা ভেসে আসছে। গানের লাইনগুলো স্বন্দর। এ গান আর কোথাও শুনেছে ব'লে মনে পড়ল না।

স্রোতে তরী ভাসিয়েছি ভাই

নাইক আমার পথের চিনা রে,

ভরসা আছে স্রোতই আমার

নিম্নে যাবে সাগর-কিনারে।

সম্যাসী আছেন নাকি ওই নৌকোতে ? চ'লে যাচ্ছেন এখান থেকে ?—এই প্রশ্ন মনে জাগবামাত্র একটা অপ্রত্যাশিত সত্যের সম্মুখীন হ'ল সে। সম্যাসী যে তার মনে কতখানি স্থান জুড়ে ব'লে আছেন তা সে বুঝতে পারল।

“বিশ্বনাথবাবু—ও সম্যাসী ঠাকুর—”

চিংকার ক'রে ডাকল সে একবার। কিন্তু সেই বিরাট পরিপ্রেক্ষিতে তার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর তার নিজের কানেই হাস্তকর শোনাল। নদীর বাকে নৌকো অদৃশ

হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, টর্চ ফেলে ফেলে এইটেই দেখতে লাগল সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। গান ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল, তারপর আর শোনা গেল না। নৌকোও মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। ডানার পা দুটো ব্যথা করছিল, সে ব'লে পড়ল বালির ওপর। অনেকক্ষণ ব'লে রইল চুপ ক'রে। অসীম অন্ধকারের মধ্যে ব'লে ব'লে তার মনে হতে লাগল, নবজন্মের প্রতীক্ষায় সে যেন ব'লে আছে, মাতৃজন্মের অন্ধকারের জগৎ যেমন থাকে। লক্ষ লক্ষ বিদ্যুতের কণ্ঠে অন্ধকারে ভাষা শুনেতে লাগল। মনে পড়ল, সম্যাসী অনেক দিন আগে বলেছিলেন—তুমি মানুষ, ওই বিদ্যুতের গানের যে কোনও অর্থ করবার শক্তি এবং স্বাধীনতা আছে তোমার। ডানার মনে হ'ল, অর্থ করবার শক্তি এবং স্বাধীনতা হয়তো আছে, কিন্তু সেই অর্থটাই যে ঠিক অর্থ তা কে ব'লে দেবে! তা নির্ণয় করবার মানদণ্ড কি ? হঠাৎ একটা শব্দ হ'ল—বুম্-ও-বুম্। চমকে উঠল ডানা। মনে হ'ল, কে যেন কথা কইল। টর্চ ফেলেই কিন্তু দেখতে পেলো ছতোয় প্যাঁচাটাকে। নদীর উপর বৃষ্টি-পড়া একটা গাছের ডালে ব'লে ছিল, টর্চের আলো পড়তেই উড়ে গেল। নদীর উপর দিয়ে, প্রায় নদীর জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে, গাংচিলের মত উড়তে উড়তে অদৃশ হয়ে গেল। প্যাঁচাটাকে দেখে হঠাৎ অমরেশবাবুর কথা মনে পড়ে গেল। তাঁর কাঁধে উঠে সে একবার একটা প্যাঁচার বাসা দেখেছিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, অমরেশবাবুর যে চিঠিটা এসেছে সেটা খোলা হয় নি এখনও। আর ব'লে থাকতে পারল না, উঠে বাসার দিকে ফিরতে লাগল। ফিরতে ফিরতে একটা কথাই বার বার মনে হতে লাগল, সে সম্যাসীর খোঁজে এসেছিল কেন! শুধু কি নিছক কৌতূহল ? নিছক কৌতূহল কি তাকে এই অন্ধকারের চরের মধ্যে ঘোরতে পারত ? কেন এই আকর্ষণ ?

ডানা যখন ফিরল তখন প্রায় এগারোটা বাজে। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, চাকরটা ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে উঠিয়ে খাওয়ানোও সেরে অমরেশবাবুর চিঠিখানা নিয়ে বসল সে। চাকরটা বললে, খানিকক্ষণ আগে রূপচাঁদবাবুর ঠাকুর এসেছিল, পাখির খাঁচাটা রেখে গেছে।

খালি খাঁচা ?

না, পাখিটাও আছে।

কোথায় রেবেছ?

আপনার শোবার ঘরে।

ডানা অমরেশবাবুর চিঠিটা পড়তে শুরু করল এবার। —
কল্যাণীয়া ডানা,

এখন ভূষর্গে এসেছি, স্ততরাং লৌকিকতার ছদ্মবেশ খুলে ফেললাম। তোমাকে আর ‘আপনি’ বলব না, ‘তুমি’ বলব। এ ব্যাপারে রক্তা অনেক আগেই সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আজ থেকে আমিও হল্যাম। কান্সীরকে যে কেন ভূষর্গ বলে তা ব’লে বোঝাবার সাধ্য আমার নেই। আনন্দবাবু একটা কবিতাতেই যা পারতেন, পাতার পর পাতা লিখে গেলেও আমি তা পারব না। স্ততরাং সে চেষ্টাও করব না। ছোট্ট একটি ইংরেজী কথায় কেবল বলব, লাভলি! আমাদের এ কান্সীর ভ্রমণে মহত্ব বা রোমাঞ্চকর কিছু নেই। সার্ ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যাণ্ডের মত চূর্ণম গিরি-কান্সার পার হয়েও আমরা কান্সীরে প্রবেশ করি নি। সার্ ফ্রান্সিস পিকিং থেকে হাটাপথে ১২০০০ হাজার মাইল উচ্চ তুষারচ্ছন্ন ‘মৃত্তা-পাস’ অতিক্রম ক’রে বালুটিস্থানে এসে পৌছেছিলেন। পথ চলতে চলতে তাঁকে বিছানা কেতলি প্রভৃতি সব ফেলে দিতে হয়েছিল। তাঁর তাঁবু ছিল না। আকাশের নীচে মাটির উপর শুয়ে থাকতেন তিনি হিমালয়ের বৃক্কের উপর। নিঃশব্দ হয়ে পড়েছিলেন, জুতো পর্যন্ত ছিঁড়ে গিয়েছিল। এ ধরনের ভ্রমণ-কাহিনী লেখবার মালমসলা ভাগ্যবানদের ভাগ্যেই জোটে। আমার সে রকম ভাগ্য নয়। আমি রেল গাড়ি, মোটর গাড়ি, টোপা এবং হাউসবোটের সহায়তায় আরামেই বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি। তুমি এবং আনন্দবাবু যদি সঙ্গে থাকতে তা হ’লে ভ্রমণটা আরও মনোরম হ’ত। রক্তা বড় বেশি গম্ভীর লোক তো, মুখে বেশি কিছু বলে না। মনে যখন খুব বেশি কথা জ’মে ওঠে, তখন চোখের দৃষ্টি দিয়ে তা উপচে পড়ে। ভ্রমণকালে ওর চেয়ে আর একটু কম নীরব সঙ্গী থাকলে বেশি জমত। রক্তাও সে কথা কাল বলছিল। রক্তার মুখে তোমার বিপদের কথা শুনে কোতুক অল্পভব করলাম। আশা করি, বিপদ এতদিনে কেটে গেছে। এখন আমরা শ্রীনগরে একটা বোর্টহাউসে আছি। যখন সিমলায় ছিলাম তখন দেখানকার ছ-চারটে পাখির খবর

আনন্দবাবুকে লিখেছিলাম। এখানেও সে সব পাখি আছে। তবে কাল সন্ধ্যার দিকে ‘চাক্ চাক্ চাক্ চাওয়া’ এই শব্দ শুনে উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম। ঠিক এ ধরনের পাখির ডাক আগে শুনেছি ব’লে মনে পড়ল না। বেরিয়ে এলাম। দেখি খাঁচা নিয়ে একটা লোক ব’সে আছে। কি পাখি আছে খাঁচায় জিজ্ঞাসা করাতে সে বললে ‘চুকর’। দেখলাম পাখিটি এক রকম পাহাড়ী তিতির। চমৎকার দেখতে। সালেম আলির বইয়ে ছবি আছে দেখো। ও-দেশে অনেকে যেমন শব্দ ক’রে তিতির পোষে, ও-দেশে যেমন তিতিরের লড়াই হয়, এ দেশেও শুনলাম চুকরকে নিয়ে ঠিক একই কাণ্ড। চুকরকে কেজ্জ ক’রে অনেক টাকা হাত বদল করে এখানে। আমি ভাবছি, এই চুকর আমাদের কাব্যের চকোর নয় তো! চাঁদ বা জ্যোৎস্না সঙ্গ্রে এর কোনও যোগাযোগ আছে কি না জানি না। খোঁজ করব। তুমি আনন্দবাবুকেও জিজ্ঞাসা ক’রে, কাব্যের চকোরের কোনও বর্ণনা কোথাও তিনি পেয়েছেন কি না! আমার লাইব্রেরিতে গিয়ে অভিধানখানা একবার উলটে দেখো। যদি কোন খবর পাও জানিও। এখানে আর এক রকম পাখি দেখছি। লালমাথা লাকিং খাশ। সিমলায় যে লাকিং খাশ দেখেছি তা অন্তরকম। তার নাম স্ট্রায়েটেড্ লাকিং খাশ। এখানকার পাখিদের পুরো পরিচয় এখনও পাই নি তেমন। এই গরমের সময়টা হিমালয়ভ্রমণের পক্ষে অল্পকূল নয়, তবু যখন এসে পড়েছি যতটা পারি দেখে যাব। তবে এখানে কতদিন থাকব তার স্থিরতা নেই। কিছু টাকার যোগাড় হ’লে বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছে আছে। রক্তার মুখে শুনলাম তুমি আর আনন্দবাবু খুব মন দিয়ে কাজ করছ। আমারও তোমাদের মত কাজ করতে খুব ইচ্ছে করে, কিন্তু এক জায়গায় বেশিদিন ভাল লাগে না। মনটা ছটফট করে অল্প কোথাও যাবার জগ্গে। হয়তো সব জায়গা দেখা হয়ে গেলে কোথাও মন স্থির ক’রে বসতে পারব। কিন্তু পারব কি? অত টাকা আর সময় কোথা পাব। ডাকের সময় বেশি নেই স্ততরাং এইখানেই শেষ করি। তুমি আর আনন্দবাবু আমার শ্রীতি ও নমস্কার নিও। ইতি

তোমাদের অমরেশ।

চিঠিটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বারে টোকা দিয়ে

কপাটটা ঠেলে রূপচাঁদ প্রবেশ করলেন। মুখে মুহু হাসি, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

সিগারেটটা ফেলেই দিয়ে আসি—

বেরিয়ে গিয়েই ফিরে এলেন সঙ্গে সঙ্গে।

কপাটটা বন্ধ ক'রে দেব?

কেন, খোলাই থাক না।

ভেজানো থাকু তা হ'লে। চাকরটা বাইরে নেই।

তাকে সিগারেট আনতে পাঠিয়েছি।

ডানা উঠে দাঁড়াল।

এত রাতে কি দরকার আপনার?

তার কণ্ঠস্বরে যেন ধহুকের টকার ধ্বনিত হ'ল।

রূপচাঁদ ক্ষণকাল তার মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে

বললে, বলছি। ভয় পাবার মত কিছু নয়। ছ-চার

দিনের মধ্যেই চ'লে যাব, তাই বিদায় নিতে এসেছি।

তোমার কাছে এটা হয়তো সামান্য ব্যাপার, কিন্তু আমার

কাছে এটা অসামান্য। তুমি আমার জীবনের কতখানি—

না, থাকু, সস্তা কবিত্ব করব না। তোমার সঙ্গে আমার যা

সম্পর্ক, তাতে দশজনের সামনে মেকি হাসি হেসে ছোট

নমস্কার ক'রে তোমার কাছে বিদায় নেওয়া চলে না।

এর জন্তে খানিকটা নির্জন নিবিড় সময় চাই। সেই

জন্তেই এখন এসেছি। একটু আগেও এসেছিলাম।

তুমি তখন ছিলে না। ভয় পেয়ো না, ব'স।

এর পর না-বসাটা একটু অশোভন। ডানাকে

বসতে হ'ল।

আপনি যে এখন এখানে আসবেন—এ কথা আপনার

জ্ঞী জানেন?

না। সে জানে আমি এখানে নেই, আপিসের

কাঞ্জে বাইরে গেছি। তাকে ব'লে গিয়েছিলাম, হলদে

পাখিটা আজ সন্ধ্যাবেলা যেন ক্ষেত্রত পাঠানো হয়।

পাঠিয়েছে কি?

পাঠিয়েছে। রত্নাদি আপনার জীকে উপহার দিয়েছেন

পাখিটা। ওটা ক্ষেত্রত দিচ্ছেন কেন?

আমার জীব সঙ্গে আপনার রত্নাদির চাক্ষুষ পরিচয়

পর্বস্ত নেই। তিনি হঠাৎ উপহার দিতে গেলেন কেন, তা

আমার মাথায় ঢুকছে না। এই হ'ল প্রথম কথা। আর

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, তাঁরই ষড়যন্ত্রের ফলে আমাকে এখন

থেকে বদলি হতে হ'ল। তিনি গুপ্ত সাহেবের কাছে

আমার বিরুদ্ধে কি যেন ব'লে গেছেন। বদলির অবশ্য

সময় হয়েছে আমার, কিন্তু গুপ্ত সাহেব ইচ্ছে করলে

আমাকে এখানে আরও কিছুদিন রাখতে পারতেন। কিন্তু

আপনার রত্নাদির জন্তে সেটা আর হ'ল না। আই হেট

ফ্যাটি ওয়ান। উপহার দেওয়ার ছলে অপমান করেছেন

আমাকে তিনি। এসব টাকার গরম, আর কিছু নয়।...

সত্য কথাটা প্রকাশ করবার উপায় ছিল না ডানার।

বকুলবালা মানা ক'রে গিয়েছিলেন, তাই চুপ ক'রে থাকতে

হ'ল। রূপচাঁদের নাসারন্ধ্র বিক্ষারিত হয়ে গিয়েছিল,

চোখ দিয়ে আগুনের বলক বেরুচ্ছিল।

এর সমুচিত প্রত্যুত্তর দেওয়া উচিত একটা। খাঁচাটা

কোথায়?

ওই খাটের নীচে আছে।

রূপচাঁদ খাঁচাটা বার করলেন।

কি করবেন ওটা নিয়ে এখন? পাখিটা পাঠিয়েই দেব

তাকে।

পাখির গলাটা মুচড়ে দেব। রক্তাক্ত মরা পাখিটা

পাঠিয়ে দিও। ব'লে দিও, আমি স্বহস্তে ওর গলা মুচড়ে

ক্ষেত্রত পাঠিয়ে দিয়েছি। আই উইশ আই কুড রিং হার

নেক।

রূপচাঁদ সত্যিই খাঁচাটা খুলে খাঁচার ভেতর হাত

টোকাতে বাচ্ছিলেন। ডানা বাধা দিল, তাঁর হাতটা ধ'রে

বললে, হি হি, কি করছেন আপনি! মাথা ধারাপ হয়ে

গেল নাকি আপনার?

ডানার হাতের স্পর্শে সহসা অভিভূত হয়ে পড়লেন

রূপচাঁদ। খাঁচার ভিতর থেকে হাতটা বার ক'রে খাঁচাটা

বন্ধ ক'রে দিলেন।

মাথাই ধারাপ হয়ে গেছে আমার। তুমিই আমার

মাথা ধারাপ ক'রে দিয়েছ।

ডানা একটু সঙ্কুচিত হয়ে হাতটা সরিয়ে নিলে।

তারপর নিজের অজান্তসারে চোখ নীচু ক'রে কোলের উপর

হাত দুটি রেখে এমন একটা মোহিনী ভঙ্গীতে ব'সে রইল

যে, রূপচাঁদ আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না, আবার

তার হাত দুটো ধরতে গেলেন। ধ'রেই ফেললেন।

উজ্জ্বলিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, আমার উপর রাগ

ক'রো না, লক্ষীটি। জীবনে আর হয়তো দেখা হবে না তোমার সঙ্গে। আমার বিদায়-মুহূর্তটা সম্ভবত মধুর ক'রে দাও, সেইটুকুই সম্ভবত যথেষ্ট মনে করব আমি। তারই স্মৃতি শাশ্বত অমৃতের উৎস হয়ে থাকবে আমার জীবনে। রাগ ক'রো না, স'রে এস।

ডান্না হাতটা ছাড়িয়ে নিলে বটে, কিন্তু আর কিছু করলে না। উঠে দাঁড়াল না, বাইরে চ'লে গেল না, চাকরটাকেও ডাকল না। সেও কেমন যেন একটু সম্মোহিত হয়ে পড়েছিল। একটা সমর্থ পুরুষের এই আত্মনিবেদন সে যেন উপভোগই করছিল। সে আনন্দ-চক্ষে ব'সেই রইল।

রূপচাঁদ বলতে লাগলেন, তুমি যখন নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পথের ধারে বসেছিলে, তখন আমিই তোমাকে নিয়ে এসেছিলাম এখানে। কিন্তু আমার দিকে তুমি একবার ফিরে চাও নি। তুমি আনন্দমোহনের কবিতার খোরাক জুগিয়েছ, অমরেশবাবুর চাকরি করেছ, ওই লোফার সম্মানীটাকে পর্যন্ত আমল দিয়েছ,—বঞ্চিত করেছ কেবল আমাকে। বঞ্চিত হয়েই কি চ'লে যেতে হবে আমাকে? একটুও দয়া করবে না? লোকে ভিক্ষুককেও একটা পয়সা দেয়। আমাকে কিছুই করতে দেবে না তুমি?

ডান্না এইবার যেন হঠাৎ সচেতন হ'ল। বিপদ আসন্ন বুঝে দাঁড়িয়ে উঠল সে।

আপনাকে তো অনেকবার বলেছি, আপনি যা চাইছেন তা দিতে পারব না। আমি ভদ্রবংশের মেয়ে, ওসব নোংরামির মধ্যে যাওয়া অসম্ভব আমার পক্ষে। আপনি বাড়ি যান।

অনেকবার হতাশ হয়ে ফিরেছি, আজ আর ফিরব না। তুমি স্বৈচ্ছায় যদি না দাও, জোর ক'রে কেড়ে নেবার শক্তি আমার আছে।

পর-মুহূর্তেই বাঘের মত কাঁপিয়ে ডান্নাকে আলিঙ্গন-বদ্ধ করলেন তিনি। কি হ'ত বলা যায় না, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আর একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটল। বল্লম হস্তে বকুলবালা প্রবেশ করলেন।

ডান্না চিৎকার করছিল—ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন আমাকে, ছেড়ে দিন।

রূপচাঁদ ছাড়তে চাইছিলেন না, কিন্তু মাথায় দাক্ষ

আঘাত পেয়ে ছাড়তে হ'ল; শুধু তাই নয়, প'ড়ে গেলেন তিনি। বল্লমের ক্ষত থেকে রক্ত প'ড়ে আমাকাপড় রক্তাক্ত হয়ে গেল তাঁর।

বকুলবালার এই আকস্মিক আবির্ভাবের কারণ ওই হলদে পাখিটি। তিনি জানতেন, রূপচাঁদ বাইরে গেছেন, রাগে ফিরবেন না। রূপচাঁদের হুকুম অনুসারে পাখিটা তিনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু পাখিটার স্মৃতি এত মন কেমন করতে লাগল যে, বল্লম আর লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন তিনি শেষ পর্যন্ত। বল্লমটা এনেছিলেন আত্মরক্ষার্থে, কিন্তু সেটা আত্মরক্ষার্থে কাজে লাগল। রূপচাঁদকে দেখে ক্ষেপে গেলেন বকুলবালা। ঈর্ষায় যে নারী একদিন বাঁচি দিয়ে এক ছাগশিশুকে হত্যা করেছিল, সে-ই যেন বহুদিন পরে আবার আবির্ভূত হ'ল তাঁর মধ্যে।

তুমি! তুমি এখানে কেন? তুমি সদরে গিয়েছিলে না? রূপচাঁদ নিরুত্তর। বকুলবালা ডান্নার দিকে সপ্রশ্ন জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বললেন, ব্যাপার কি?

ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন। রাত দুপুরে হঠাৎ এসে উনি যে এ কাণ্ড করবেন, তা আমি ভাবতেই পারি নি। ওঁকে বাড়ি নিয়ে যান, ছি-ছি-ছি-ছি।

ডান্না আর ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, বেরিয়ে গেল। চাকরটাকে ডাকল একবার, কিন্তু তার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সম্ভবত রূপচাঁদ কোনও কৌশল ক'রে আগে থাকতেই সরিয়ে দিয়েছিল তাকে। ডান্না বাইরে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর এগিয়ে গেল খানিকটা, ঘরের ভিতর আর ঢুকতে ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু আবার দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল। ঘরের ভিতর থেকে একটা আতর্জন শোনা গেল। ক্ষতপথে ফিরে এসে আবার ঘরে ঢুকল সে। যা দেখল, তা ভয়াবহ। বকুলবালা স্বামীর বুকের উপর ব'সে বাঁ হাতে তাঁর চুলের মুঠি ধ'রে ডান হাত দিয়ে ক্রমাগত ঘূষি মেয়ে চলেছে। আতর্জন করছেন রূপচাঁদ, প্রতিরোধ বা প্রতিকার করবার শক্তি নেই।

উঠুন, উঠুন, ওঁকে নিয়ে বাড়ি যান আপনি। ছি-ছি, কি করছেন?

বকুলবালা কর্ণপাত করলেন না তার কথায়।

আমি খান্নার খবর দিতে যাচ্ছি তা হ'লে।

টর্চ এবং হাত-বাগাটি নিয়ে বেরিয়ে এল ডানা। আবার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। সত্যি সত্যি থানায় খবর দেবার জন্তে সে বেরোয় নি, থানা যে কোথায় তাই সে জানত না, সে ভয় দেখিয়ে বকুলবালাকে নিরস্ত করতে চেয়েছিল। হয়তো এতেই বকুলবালা নিরস্ত হবেন। কিন্তু হলেন কি-না তা দেখবার ধৈর্য তার আর ছিল না, সে কোথাও ছুটে পালাতে চাইছিল, কিন্তু কোথায় বাবে? সম্যাসী কি ফিরেছেন? টর্চের বোতামটা টিপতে টিপতে সে সম্যাসীর ঘরের দিকেই চলতে লাগল। গিয়ে দেখল, সম্যাসী নেই। ঘরের দ্বার খোলা। হু-হু করে হাওয়া একটা বইছে চর থেকে। ডানা নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মনে পড়ল ভাস্করের কথা। রাত একটার পর সদরে যাওয়ার একটা ট্রেন আছে, সে শুনেছিল। স্টেশনের দিকেই চ'লে গেল সে। মিনিট কুড়ি পরে গাড়িও পেয়ে গেল। গাড়ি যখন ছাড়ছে তখন হঠাৎ নজরে পড়ল, সম্যাসী একটা তোরঙ্গ ঘাড়ে ক'রে ওভারব্রিজে উঠছেন। এখনই সদরের দিক থেকে যে গাড়িটা এল, তাতেই এলেন না কি? সদরে কি জন্তে গিয়েছিলেন? কিন্তু জিজ্ঞাসা করবার উপায় ছিল না। ডানার একবার ইচ্ছে হ'ল, নেমে পড়ে। কিন্তু তারও উপায় ছিল না। ট্রেন চলতে শুরু করেছিল। যে কোনও অবস্থাতেই মাছুষের মন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। বর্মার জন্তলে ডাকাতের হাতে প'ড়েও নিতে হয়েছিল। আজকের এই অপ্রত্যাশিত ঘটনাটার সঙ্গেও তার মন আপোস ক'রে ফেললে ক্রমশঃ ট্রেনের কামরায় এক কোণে ব'সে ব'সে ক্রমশঃ বরং তার মনে হ'ল যে, ঘটনাটা মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়। রূপচাঁদবাবুর কাছ থেকে অল্প রকম আচরণই বরং অপ্রত্যাশিত হ'ত। তাঁর রক্তাক্ত বিধবস্ত চেহারাটা চোখের উপর ভেসে উঠল। একটু দুঃখই হ'ল ভদ্রলোকের জন্তে। বকুলবালার কাণ্ড দেখে সে কিন্তু মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

কোন নারীর মধ্যে এ রকম বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সে আর দেখে নি। হঠাৎ মনে হ'ল, জোয়ান অব আর্ক হয়তো অনেকটা এই রকম ছিল। আর একটা কথা হঠাৎ মনে হ'ল তার। এই ঘটনাটা যদি না ঘটত, তা হ'লে এত শীঘ্র সে কি ভাস্করের কাছে যেত? যেত না। তার সঙ্গে যে সম্পর্ক

স্থাপন করবার জন্তে সে মনে মনে উদ্গ্রীব, তার শোভনতা বজায় রাখবার জন্তেই তাকে আরও কিছুদিন দেরি করতে হ'ত। অশোভন আগ্রহ দেখিয়ে এর শালীনতা ক্ষুণ্ণ করবার প্রবৃত্তি তার হ'ত না। সে প্রবৃত্তি থাকলে ওই ডাকবাংলোয় ব'সেই তো সে কথা শেষ ক'রে দিতে পারত। তার নিজের কোনও অভিভাবক নেই, ভাস্করেরও নেই, ভাস্করের আগ্রহ যে অটুট আছে তা-ও সে বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু তবু সে শেষ কথা দেয় নি হয়তো শালীনতার জন্তে, কিংবা হয়তো ভাস্করকে আর একটু ভাল ক'রে চেনবার জন্তে, কিংবা —(এ কথাটা মনে হওয়াতে নিজের কাছেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল সে) —কিংবা হয়তো তার গোপন নারী-সত্তা কামনা করছিল, ও আর একটু খোশামোদ করুক, অত সহজে ধরা দেব কেন! কিন্তু আজকের এই ঘটনাটা ঘটাতে ব্যবধানের প্রাচীরটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, শালীনতার সূক্ষ্ম ওড়নাটা উড়ে গেল, তার নিরাশ্রয় মন যে আশ্রয় পাবার জন্তে উন্মূখ হয়েছিল সেইদিকেই অতি দ্রুতবেগে ছুটে হ'ল তাকে। সম্যাসী যদি বাসায় থাকতেন তা হ'লে হয়তো আজই এমন ভাবে ছুটে হ'ত না, কিন্তু তিনিও বাসায় ছিলেন না। এটা বিধাতার ইচ্ছিত, না, আকস্মিক যোগাযোগ একটা। তোরঙ্গ-কাঁধে সম্যাসীর ছবিটা ভেসে উঠল মনে। সদরে কেন গিয়েছিলেন উনি? তোরঙ্গ এনেছেন কেন? উল্লেখ্যবিশীর্ণ তোরঙ্গের দরকার কি! ফিরে এসে খোঁজ করতে হবে। চ'লে যাওয়ার আয়োজন করছেন না কি? সহায়রাম ভট্টাচার্যের সঙ্গে গুর সম্পর্ক আছে কি না সেটাও জানতে হবে।...ট্রেন হু-হু করে চলেছে, গাড়ির কামরায় কেউ নেই, হু-হু করে হাওয়া ঢুকছে জানলা দিয়ে, বাইরে গাঢ় অন্ধকার, আকাশে অসংখ্য তারা, নিজের মনকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়ে ব'সে রইল ডানা...হঠাৎ আর একটা কথা মনে হ'ল তার। বিপদে প'ড়ে কবির কাছে তো সে যেতে পারত। গেল না কেন? যাবার কথা মনেই হয় নি। এর কারণ সম্ভবত মন্মাকিনী। এই রাত্রে সেখানে গিয়ে সব কথা খুলে বলা যেত না, বললে কেলেঙ্কারির ভয় ছিল। রূপচাঁদ আনন্দমোহনের বন্ধু একজন। আর একটা কারণও ছিল বোধ হয়। কবি বলেছিলেন, যে জোয়ারটা এসেছিল সেটা নেবে যাচ্ছে। যে কবিতাটা দিয়েছিলেন তাতেও ওই ধরনের কথা ছিল। তাঁর কাছে সে এখন অলৌক স্বপ্নমাত্র। এ লোকের কাছে বাস্তবের সমস্তা নিয়ে যাওয়া অর্থহীন। নানা রকম ভাবতে ভাবতে চলেছিল ডানা। মনে হচ্ছিল সে যেন নূতন কোনও দেশে চলেছে, পুরাতন বন্ধু ভাস্করের কাছে ন

[আগামী বারে সমাপ্য]

পরিণাম

শ্রীকৃষ্ণদে

“মদিরেক্ষণে, আজি বৈশাখে চম্পা-স্বরভি রাতি,
নর্মমাতীয়ে নর্ম-বিহারে হবে তুমি মোর সাথী ?
খুলে ফেল সখি, মণিকুণ্ডল-হার
পর কুরুবক-মল্লী-কর্ণিকার,
কনকাত্তকে ঢেকো নাক’ বুক, কিবা হবে আবরণ ?
ঘোবন-চূড়া বক্ষের আভরণ ।

নারী-ঘোবন-সিল্কমথনে সুধার কুন্ত বহি
নব উর্বশীরূপে তুমি আজ দেখা দাও, রূপময়ি ।
চাক-কচ্ছল-রেখায় বিলোল আঁখি
বাহু-হিম্মোলে আমারে ঢলাবে নাকি ?
মধুগুঞ্জে গাঢ় চুঘনে লাজ দিও রতি-স্বরে
—তুধু আজি নিশাতরে ।”

প্রবধনের ধরি দুটি কর কহে মদালসা হাসি—
“নিতি অভিসারে দেহ-ঘোবন তোমারে বোঁগাই আসি ।
তবু হে রাজন, মিটে না তোমার আশা ?
বার বার চাহি আক্লেষ ভালবাসা ?
মুক্তা-প্রতিম তহু-লাবণ্য ঘোবন অভিরাম,
কোথা শেষ তার, জান নাকি পরিণাম ?”

“তবু আমি চাই তোমারে তম্বি, নবঘোবনে অঙ্গি,
লাস্তচপলা হান্ততরলা কামকোঁতুকময়ী ।
আহরিয়া রেণু শিরীষ-লোজ-নীপে
রতির আরতি সাজাও ও দেহ-দীপে,
অঙ্কুর-স্বরভি কর কুন্তল, কচ্ছলে আঁখি
—সার্থক হোক অভিসার বৈশাখী ।”

কহে মদালসা, “অভিসার তবে হবে কাল অভিনব,
নির্জনতটে আবরিত-দেহা আমি একা শুয়ে রব ।
তুমি হে রাজন, আসিও আমার পাশে,
জানায়ো প্রশ্নয় লাজহীন পরিহাসে,
ক্ষণেকের পরে গুণন খুলি বাঁধিও বক্ষে মোরে,
—চুঘন দিও জড়াবে বাহুর ডোরে ।”

আসি পরদিন শুক্লানিশীথে রাজা কোঁতুকভরে
মেথেন শায়িতা আবরিত-দেহা মদালসা তট’পরে ।
শুভ্র উপলে চক্কিরণ বলে,
নাচে নর্মদা তরঙ্গ-কলকলে,
বন-বৃধিকার সৌরভ ভাসে মধুর সমীরণে,
ডাকেন নৃপতি—“জাগ মদিরেক্ষণে ।”

সাড়া নাহি পেয়ে খোলেন স্বরিৎ নারীদেহ-আবরণ,
হেরিয়া দৃষ্ট ভয়ে-অপলক নৃপতির হৃ নয়ন ।
কঙ্কাল এক রয়েছে বস্ত্র-ঢাকা
সন্ত-আহত শ্মশান-ভস্মমাখা,
কোথা মদালসা ? বিশ্বয়ে রাজা স’রে ধান এক পাশে,
—উষ্মে আকাশে পূর্ণচন্দ্র হাসে ।

পরদিন হতে জানে নাক’ কেহ কি হ’ল রাজার দশা,
অসহ ব্যথায় ভূমিতে লুটায় শুধু হায়, মদালসা ।
পরিহাস ছলে এ কি হ’ল পরিণতি ?
কাদিছে রাজ্য কোথা গেল নৃপতি ?
কেহ বলে, তাঁরে শেষ দেখা গেছে সম্যাসীবেশ-ধারী
কোন দুর্গম অরণ্য পথচারী ।

বন্ধিমের যুগের বাংলা

অনুবাদ—পদ্মপতি ভট্টাচার্য

যে সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে এসে বন্ধিম মাহুস হয়ে উঠলেন, সে হ'ল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের নব জাগ্রত বাংলার নবযৌবনের অবস্থা, নতুন ভাবে উদ্দীপিত, নতুন প্রেরণায় উচ্ছ্বসিত; এমন একটা উৎসাহ-পূর্ণ যুগ ভারতে বোধ করি আর কখনও আসে নি। তখনকার ভারতে বাংলাই ছিল জাগরণ-বিকাশের প্রধান রক্তভূমি, পুনরুত্থানের ক্রিয়া এখানেই প্রথম স্বল্পপরিধির মধ্যে তখন সবে শুরু হয়েছে। বাঙালী জাতি স্বভাবতই কিছুকৌতূহলী ও কল্পনাপ্রবণ, বহুকাল পর্যন্ত নিজেকে একটিমাত্র ঐতিহ্য নিয়ে গণ্যবদ্ধ হয়ে গতানুগতিক ভাবে দিন কাটাচ্ছিল, হঠাৎ ভিন্ন দেশের নতুন রকম শিক্ষা ও শিল্পাদির সংস্পর্শে এসে পেয়ে গেল এক অভূতপূর্ব চেতনা-রাজ্যে প্রবেশ করবার অপূর্ণ চাবিকাঠি। এদের উন্মুখ প্রকৃতির সঙ্গে এসে মিশল স্বতন্ত্র-জাতীয় প্রকৃতির মাহুসদের গড়া এক নতুনতর সভ্যতা ও শিল্প-সাহিত্যের প্রভাব, তার ফলে যা হবার তাই হ'ল, এদের মধ্যে গড়ে উঠল এমন এক সম্পূর্ণ নতুন রকমের সভ্যতা ও শিল্প ও সাহিত্য, যা একেবারেই মৌলিক। মৌলিকত্ব জিনিসটা বাইরের সকল প্রভাবকে তফাতে রেখে ভূইকোড় হয়ে গজায় না, বরং সকল প্রভাবকে মেনে নিয়ে নিজেকে বৈশিষ্ট্যের ছাঁচে তাকে ঢালাই করে নিতে পারলে তাতেই সেটা জন্মায়। বাংলা দেশে ঠিক সেই জিনিসই তখন ঘটেছিল এবং ভবিষ্যতে আরও তা ঘটতে পারে। এর প্রথম ফল যা হ'ল তা অতি আশ্চর্য, কারণ কল্পনাতীত মৌলিকতা নিয়ে মহা মহা গুণী ব্যক্তিদের এখানে উপস্থাপিত বিকাশ পেতে দেখা গেল। প্রথমে রামমোহন রায় আবির্ভূত হলেন তাঁর নতুন ধরনের ধর্মবার্তা নিয়ে, তার পরে সেই বার্তা আরও সুবস্তুর ভাবে প্রচারিত হতে থাকল এমন সব ব্যক্তির দ্বারা, যারা তাঁর চেয়ে কোন অংশে ছোট নন, যেমন রাজনারায়ণ বসু ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভাষার দিক দিয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত ও মধুসূদন দত্ত, আরো দুজনে দুই দিক থেকে নতুন ধরনের গম্ভীর পদ্য রচনা করতে শুরু করলেন। তখন এলেন

বিজ্ঞানাগর, বিজ্ঞান বুদ্ধিতে ও প্রজ্ঞায় যাকে বলতে হয় বাংলার ছত্রপতি, বাংলা ভাষাকে-ও বাঙালী জাতিকে আবার নতুন করে গড়বার ক্ষেত্রে যেন অহুরের মত তিনি অমাহুষিক পরিশ্রম করলেন। এদিকে রাজেন্দ্রলাল মিত্র শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে এমন বিরাট হয়ে উঠলেন যে, কোন তুলনাই তার দেওয়া যায় না। এঁদের সঙ্গে সঙ্গে আরও এমন অসামান্য রসজ্ঞ ও রসিক ব্যক্তিদের একটা দল গড়ে উঠল, যাদের প্রত্যেককেই বলা যেতে পারে প্রতিভার প্রতিমূর্তি, তাঁরা যেমন গুণী তেমনই সমজ্ঞার, বহুবিধ শিল্পে ও সম্মুখীতে সমান পারদর্শী, রীতিমত মার্জিতকৃতি, সংস্কৃতির দিক দিয়ে তাঁদের মৌলিকতা কিছু কম নয়। এর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে মধুসূদনের বন্ধুদের কথা, যেমন গৌরদাস বসাক, বিজ্ঞানসাহী রাজা ষতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। ওই সময়টিতে আরও দেখা গেল যে, ভারতের অন্ত্যস্ত প্রদেশের সঙ্গে সঙ্গে এখানেও এক নব ভাবের সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা অঙ্কুরিত হচ্ছে, যদিও তা অনেকটা ইংরেজদেরই নকলে। নবশক্তি ক্ষুরগের এই সব নানা শাখার মধ্যে বাঙালীর মন বিশেষ করে প্রবল বেগে ধাবিত হ'ল সাহিত্যের খাতে। এটা তাদের পক্ষে স্বাভাবিকই হয়েছিল; কারণ বাঙালী যদিও বহু শতাব্দী থেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মবাদের অবলম্বন করে এক এক ধরনের ধর্মচর্চা নিয়েই ব্যস্ত থাকত, তা ছাড়া যদিও বিজ্ঞানচর্চা ও আইনচর্চার দিকে তাদের বিশেষ ঝোঁক ছিল, কিন্তু ভাষার দিকে ছিল তাদের একটা প্রকৃতিগত প্রাণের টান। এ ছাড়া আরও একটা কথা এখানে ভুলে গেলে চলবে না। আমাদের দেশে যে পুনরুত্থান দেখা গেল, তা এসেছিল ইউরোপের ইতিহাসের পুনরুত্থানের আদর্শে, আগেকার যুগের যত গতানুগতিক নীতিকে নাকচ করে দিয়ে। এখানকার বেলাতেও আগেকার সেই নিরীহ, নির্বিরোধ, ভক্তিবাদী ও কর্তব্যবোধ হিন্দু আদর্শকে রেড়ে ফেলে দিয়ে বাঙালী যেন তার অনেক কালের মরচে-পড়া লৌহনিগড় থেকে পরিত্রাণ পেয়ে গেল, তার বহুকালের বরফ-জমা রক্তধারা যেন আবার আপন স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবাহিত হতে শুরু

করল, মুক্ত জগতের মুক্ত বায়ু সেবন ক'রে তাই যেন সে নতুন ক'রে নিজের প্রাণের স্বাভাবিক ক্ষতি ফিরে পেল। আগেকার হিন্দুরা জীবনকে অসারবোধে মনে মনে গভীর একটা নেতিবাদ নিয়ে থাকতেন; কিন্তু সেদিন তরুণ দলের বাঙালীরা দেখলে যে, জীবনকে আনন্দ দেবারও অনেক জিনিস আছে, বস্তুত জীবন হ'ল এক পরম সৌভাগ্য। তখন নতুন যুগের তাই হ'ল নীতিবাদ, জীবনকে উপভোগ করার প্রতি এক প্রবল অনুরাগ, মানুষের জীবন সৌন্দর্যে ও স্বপ্নময় উজ্জলিত নবোচ্চা বহুটির মত অতীব উপভোগ্য। এ হ'ল ষোড়শ শতাব্দীর মনোভাব, যা গ্রীসে পৌত্তলিকতার যুগে একবার দেখা গিয়েছিল, আবার ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে নতুন ক'রে এসেছিল; সেই ভাবটাই অপেক্ষাকৃত স্বল্প ও সংক্ষিপ্ত সংস্করণে দেখা দিল নব্য বাংলায়। তখনকার দিনের শিক্ষিত ব্যক্তির ও যুবকেরা যা কিছুই করতে যেত, তার মধ্যেই ফুটে উঠত তাদের প্রাণের সেই উপছে-পড়া ক্ষুধা ও উৎসাহ। তাই বিজ্ঞা অর্জন করতে তারা প্রবল আগ্রহে, শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকত প্রভূত পরিমাণে, এই গ্রহণযোগ্যতা সাধারণের গণ্ডীকে ছাড়িয়ে যেত। মধ্যযুগের মত ইংরেজী, বাংলা এবং সংস্কৃত ছাড়াও শিখে ফেললেন গ্রীক, ল্যাটিন, ইটালীয় ও ফরাসী ভাষা; এই ফরাসী ভাষাতে তিনি অনর্গল লিখে যেতে পারতেন। অসাধারণ এক তারুণ্যের প্রতিভা নিয়ে জন্মালেন তরু দত্ত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিদেশী ভাষার উপর দিয়েই সে প্রতিভার অম্বা অপব্যয় ক'রে অকালে তিনি অল্পবয়সেই মারা গেলেন। তিনিও শিখেছিলেন গ্রীক ভাষা। ইংরেজী ভাষাতে তিনি খুবই চমৎকার লিখতেন, কিন্তু ফরাসীতেও তাঁর কম দক্ষতা ছিল না। তাঁর লেখা ফরাসী নভেল ওই দেশের লোকেরা খুব আদরের সঙ্গে পড়ত, আর তাঁর লেখা অপূর্ব ফরাসী সঙ্গীত তখন জামানির বিরুদ্ধে ফরাসী জাতির মনে উদ্দীপনা জোগাত। এঁদের প্রত্যেকেরই প্রচুর পড়া-শোনার বিষয়ে যেমন একটা অসাধারণ ছিল, এঁদের জীবনব্যাপার সম্বন্ধেও ছিল তাই। যাকে বলে মস্ত বহরের মানুষ, এঁরা ছিলেন ঠিক তাই,—যা কিছু করতেন সবই বেশি বেশি মাত্রায়। এঁরা শিখেছেনও যত বেশি, লিখেছেনও তত বেশি; আবার চিন্তাক্রিয়াও যত বেশি চালিয়ে গেছেন, পানক্রিয়াও তত বেশি চালিয়ে গেছেন।

ছাত্রাবস্থাতে বঙ্কিম এই সব আশ্চর্য প্রতিভাবানদের দলের মধ্যে এসে জুটতে পারেন নি; তিনি এসেছিলেন পুনরুত্থানের প্রথম জোয়ারটা কেটে যাবার পরে এই সব মহারথীর যুগ ও এখনকার দুর্বল অসুকারকারীদের যুগের মাঝামাঝি সময়টাতে। তাঁর সমসাময়িক ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র ও দ্বারিকানাথ মিত্র, যথেষ্ট কৃতি হ'লেও তবু এঁদের দ্বিতীয়ের পর্যায়েই স্থান দিতে হবে। বঙ্কিমই ছিলেন সেই যুগের শেষ মৌলিক প্রতিভা। তাঁর পর থেকেই জোয়ারটা একেবারে থেমে গেল, অতঃপর ডাঁটা শুষ্ক হ'ল। বঙ্কিমের পরে এলেন হেমচন্দ্র, নবীন সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এঁদের প্রতিভা অতি আশ্চর্য হ'লেও একেবারে মৌলিক নয়, শেলি এবং অন্তান্ত ইংরেজ কবিদের প্রভাব যথেষ্টই ছিল এঁদের মধ্যে। অবশেষে এল কেশবচন্দ্র সেন ও কৃষ্ণদাস পালের যুগ; এঁদের ধর্মপ্রচারের গণ্ডীও খুব বেশি বিরাট নয় এবং সাহিত্যিক প্রতিভাও খুব বেশি উজ্জল নয়, আর এঁরা শেষে সমাজসংস্কার নিয়ে মেতে উঠলেন। এটা অবশ্য ইংরেজেরই অসুকারণে, এঁদের না-জেনে রাজনীতিজ্ঞ হওয়া আর না-শিখে পণ্ডিত হওয়ার মধ্যে তেমন কিছু মৌলিকতা ছিল না। এঁদের আগেই নতুন উর্বরা জমির উৎকৃষ্ট ফসল ফলাবার প্রথম মরশুমটা কেটে গেছে, বাংলা তখন আবার ভবিষ্যতের উৎকৃষ্ট ফসল ফলাবার জন্যে অনাবাদী হয়ে পড়ে আছে। তখন এসে দেখা দেবে যাদের দল, তারা আবার এখানকার শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে দেখবে যে, নতুনের প্রেরণা নিয়ে আর কোনও নতুন জিনিস দেশকে তারা দিতে পারে কি না। অস্তুত দু'বছর আগে পর্যন্ত আমাদের এই কথাই মনে হয়েছে যে, ইংলণ্ডের ষোড়শ শতাব্দীর ব্যাপারের মত এ দেশেরও এই মহাজাগরণ অতঃপর ধর্মচর্চা ও মধ্যপন্থী রাজনীতির মধ্যেই বিলুপ্ত হতে চলেছে।

কিন্তু বঙ্কিমের ছাত্রাবস্থাতে হিন্দু কলেজের পূর্বকার নামডাক তখনও পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। ঐ হিন্দু কলেজ থেকেই যত নতুন নতুন প্রতিভার সৃষ্টি হয়েছে, নতুন যুগের মস্তিষ্ক এখান থেকেই প্রথম কাজ করতে শুরু করেছে, দেশের যুগনায়কদের নবীন হৃদয় এখান থেকেই প্রথম স্পন্দিত হতে আরম্ভ করেছে। বঙ্কিমের আমলে যারা এসে জুটলেন, তাঁরা অনেকটা দীর্ঘ সংযত শাস্ত ভাব

নিষে এসেছেন; কিন্তু তখনও তাঁরা আগের দলের আদর্শ নিয়ে আগেকার রীতিকেই অহুসরণ করে চলেছেন। তাঁদের মতই চিন্তাক্রিয়া ও পানক্রিয়ার দিকে বঙ্কিমও যে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তা কেবল তাঁদের অহুসরণ করবার জন্তে নয়, যদিও অজ্ঞাত অনেকে ঠিক তাই করেছেন বটে,—কিন্তু প্রকৃতির দিক দিয়েও তাঁদের সঙ্গে বঙ্কিমের বিশেষ একটা মিল ছিল। খাঁটি ঔপন্যাসিকের যেমন হওয়া উচিত তেমনি তাঁর রচনা ছিল খুব উদার আর জীবনকে উপভোগ করার প্রতিও ছিল একটা তীব্র অহুসরণ; খাঁটি শিল্পী ছিলেন বলেই খুঁতখুঁতে মিথ্যাবাদী গভীরগতিক নিরীহ জীবন তিনি পছন্দ করতেন না। এমন কি দেশের প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের দিকে তাঁর যখন মন টানল তখনও তিনি তাঁর আপন প্রকৃতি বজায় রেখেছিলেন, ধর্ম করতে হবে বলে যে বৈরাগ্যকেও স্বীকার করতে হবে—এ কথা তিনি কখনই মানেন নি। তবে দ্বিতীয় পর্যায়ের মনীষীরা অনেকে যেমন পানাদির বাড়াবাড়ি করে নিজেদের প্রতিভাকে নষ্ট করে ফেলেছিলেন, বঙ্কিম তেমন বাড়াবাড়ি কখনও করেন নি, যদিও “কোন মতে গণ্ডী ছাড়িয়ে যাব না” এমন সতর্ক মন নিয়েও তিনি চলতেন না। কেউ কেউ এমন মন্তব্য করে থাকেন যে, অতিরিক্ত রকমের ভোগবিলাসই তাঁর অকালমৃত্যুর কারণ। হতেও পারে সে কথা; কিন্তু নিরপেক্ষভাবে সঠিক সন্দান না নিয়ে এ বিষয়ে কোনো নিশ্চিত অভিমত দেওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে আমরা যা কিছুই অহুমান করব তার মধ্যে পক্ষপাতিস্থের দোষ এসেই পড়বে। ডাক্তার ভাণ্ডারকরের মত গোঁড়া সমাজসংস্কারক হয়তো সকল দোষটা এখনকার হিন্দু সমাজের উপরেই আরোপ করবেন; রাণাডের মত গোঁড়া সংখ্যাবাদী হ’লে তিনি এ বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করতে আপন গাণিতিক পদ্ধতিতে পরিসংখ্যানের সমুদ্রমহন করতে বসবেন; আবার যারা পাশ্চাত্য সভ্যতার গোঁড়া বিরোধী তাঁরা জোর গলায় বলবেন যে, এই সব অকালমৃত্যুর একমাত্র কারণ হ’ল এখনকার আমলের ভোগ-লালসা ও মত্তপান। এক দিকে ডাক্তার ভাণ্ডারকর তাঁর মতের স্বপক্ষে অনেক বড় বড় নীতিবাদ আওড়াতে থাকবেন, অজ্ঞ দিকে রাণাড়ে ঐক্য ক’ষে দেখিয়ে দেবেন তাঁর নিভুল গণনা ও

নিখুঁত যুক্তি, আবার ধর্মান্ধমানার দল এই স্বত্রে আওড়াতে থাকবেন তাঁদের সংস্কারগত শুদ্ধ উপদেশবাণী। পরস্পরের মধ্যে মতামতের অনেক তফাত হয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে যে, একটা জায়গাতে কিন্তু সকলেরই মিল আছে, প্রকৃত সত্য কথাটা তাঁরা কেউ বলছেন না; কেবল সকলে আপন আপন মতের দিকের কথাই বিচার করছেন। যে ব্যাপারটাকে বৈজ্ঞানিকভাবে বিচার করে দেখতে হয়, তাই নিয়ে এই ভাবে তর্ক করতে বসলে তাতে সত্যটা কখনই প্রকাশ পায় না, বরং আরও বিভ্রান্তিই জন্মায়। আসলে আমাদের এই বাঙালী জাতির রক্তের মধ্যে রয়েছে ঐ ধরনের দুর্বলতা, তাই আমরা সেটাকে চাপা দেবার জন্তে উৎকট ধার্মিকতা ও গুরুগম্ভীর নীতিবাদের বচন যত পারি আওড়াতে থাকি; বঙ্কিমের মধ্যে যে দোষটুকু ছিল, তাকে অতিরিক্ত করে দেখাতে গিয়ে আসলে আমরা আমাদের নিজেদেরই ভিতরকার দুর্বলতার বিরুদ্ধে নিজেদের সতর্ক করতে চাইছি; কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে সে কোশল খাটবে না। এটাও ভেবে দেখতে হবে যে, এখনকার উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালীর শরীরের ভাবগতিক এমনতেই থাকে যথেষ্ট ভঙ্গুর, অত্যাচার তাদের সহ্য হয় না। আর যারা সাহিত্য নিয়ে মাথা ঘামায়, তাদের ধাতের মধ্যে প্রায়ই এসে পড়ে মেয়েদের মত স্নায়ুদৌর্বল্য। কাঁচা অবস্থায় কারও মনকে যখন খুবই স্বল্পে রক্ষা করা দরকার, তখন যদি তার উপরে নির্দয়ভাবে অনেক রকম চাপ দিতে থাকা হয়, আর একটা বিজাতীয় শিক্ষার নিগড়ে তাকে পীড়ন করা হয়; তার উপরে যদি আবার সেই শিক্ষার পদ্ধতিটাও বিকৃত হয়; সেই শিক্ষা গ্রহণ করতে প্রাণান্ত পরিশ্রমের পরেই যদি তাকে চাকরি নিতে বাধ্য হয়ে অস্বাস্থ্যকর জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়াতে হয় আর জটিল মানসিক শ্রমে দিনরাত নিযুক্ত হতে হয়; এবং এর উপরেও যদি তাকে সাহিত্যরচনার জন্তে মস্তিষ্কচালনার দ্বারা আপন স্নায়বিক শক্তিটুকুকে ক্ষয় করে ফেলতে হয়; তা হ’লে সেই ব্যক্তির ভগ্নস্বাস্থ্য ও অকালমৃত্যুর কারণ দেখাতে গিয়ে কখন যে সে মাঝে মাঝে একটু আধটু অত্যাচার করত তারই উপরে সমস্ত দোষটা চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব হতে পারে না। সেখানে বরং আশ্চর্যের কথা এই হবে যে, লোকটি আরও আগেই

যারা না গিয়ে এতকাল বেঁচে রইল কেমন করে। বয়সেই কথা নিয়েই তখন বিবেচনা করে দেখার দরকার হবে।

তবে এ কথা ঠিক যে বঙ্কিম তাঁর যৌবনকালের পারিপার্শ্বিক প্রভাবের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত যতই কেন হয়ে থাকুন, এদিকে ভাবসম্পদ ও মানসিক উৎকর্ষের ক্ষেত্রে অনেক বেশি লাভবান হয়েছিলেন—বস্তুত জীবনের প্রথম প্রেরণা তিনি ওর ভিতর থেকেই পেয়েছিলেন। বঙ্কিমের প্রতিভা ছিল সর্বমুখী, অনেকটা তেলাঙের মত কিংবা তার চেয়েও বেশি। যাতেই তিনি হাত দিতেন, তাই তাঁর হাতে অপূর্ব রূপ নিয়ে গড়ে উঠত। কিন্তু নিজের উপযোগী কাজের বদলে ভুল কাজেও তিনি মন লাগাতে পারতেন; আপন প্রতিভার উপযোগী প্রয়াসের দিকে না গিয়ে তিনি ইংলণ্ডে গিয়ে অল্প কিছু কাজের দিকে ঝুঁকে নিজের ঐ প্রতিভাটিকে একেবারে নষ্ট করেও ফেলতে পারতেন; তা হলে আজ আর তাঁর কোন কীর্তিই থাকত

না। কে তাঁকে এই ভুল পথে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করে রেখেছিল? সে তাঁর সমসাময়িক ঐ উচ্চশিক্ষিত বাঙালীদের পরিবেশ এবং তাদের থেকে পাওয়া প্রেরণা; এমন মানুষদের সংস্রবের মধ্যে তিনি ছিলেন যারা প্রতিভা দেখলে তার কদর করতে জানে, সমুচিত উৎসাহ দিয়ে তাকে সেইভাবে উদ্বীপিত করতে জানে। মানুষের মত গণ্ডীবদ্ধ প্রাণীর পক্ষে তার চারিপাশের প্রভাবটাই সব চেয়ে বেশি কাজ করে। প্রতিভা জ্বিনিসটা অবশ্য কারও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে না, আপন ভেত্রে তা আপনিই বেরিয়ে পড়ে; কিন্তু পরিস্থিতির আবহুলায় সেটাকে আরও অনেকখানি সহজ করে দেয়, তার মধ্যে একটা নৈমিত্তিক প্রবর্তনা এনে দেয়। তরুণ-মনের প্রথম উৎকর্ষের পক্ষে সেইখানেই হ'ল অল্পকূল পরিবেশের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা—কেবল ইউনিভার্সিটির শিক্ষা এদিক দিয়ে বিশেষ কিছু সাহায্য করে না।

দ্বৈত

শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য

আত্ম-নিবেদন-বালি-উঠা ওই ছুটি
বিশাল-আরত আধিপদে
কি বার্তা দেখি নাই বেগে চলিয়াছি ছুটি
স্বন্দরী অগ্নি অনবচে।
পরিচয়হীন দেশে প্রচণ্ড ক্ষমতায়
চলিয়াছি মহা-অভিযাত্রী,
পঙ্খ-গহন টানে অন্তিম সমতায়—
পথ-সম্মুখে কালোরাত্রি।
জীবন-ব্যবচ্ছেদ যবে হয় পলে পলে
অস্তরে হুরাশা-দাবায়ি
অলক্ষ্য বাক্সনী টেনে নেয় ভীমবলে
মিটাতে কঠোর জঠরায়ি।

ওগো মহাবাহিনী, কোন্ কথা রূপ পায়
বাসনা-বিলম্বিত চক্ষে,

যৌবন-নিপীড়িত উজ্জল পেয়ালায়
কি আসব ঢাকা বেহ-কক্ষে,
সম্বিত মন্দিরে রজনীর সহচরী
শয্যার সঙ্গিনী নব্যা,
উন্মুখ কামনা-বিকম্পিত দেহতরী
হে স্থলভে! হে সহজলভ্যা!
জানিতে চাহি নি তব অন্তরদীপে জলে
কোন্ কামনার মহাবাহি
অপাদ-আধিকোপে কি বার্তা উঠে বাঁলে
ওগো মহাবাহিনী—তবী!

কিরিবার নাহি পথ পশ্চাতে চাওয়া মিছে—
মিথ্যা এ প্রলুব্ধ-দৃষ্টি।
তোমার তরুণদেহ কামনার বিরচিছে
আনন্দ-ঘন অনাস্থি।

রতি-হুনিপুণে, তব সজ্জা-বিলাসে রটে
মকরকেতুর জয়যাত্রা;
আমার পথের দিশা হারায় ও দেহতটে
স্থব-বিস্মৃত বোধ যাত্রা।
রাত্রির অবসানে তোমারে হেরিব জানি
ভূতাবশেষ-দেহ—বিস্ত,
যাত্রাপথেতে মোর একতারা লব টানি,—
আধি-পল্লব তব সিন্ধু।

নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত গমনমুখর মোর
পথ বুঝি হয় অবরুদ্ধ
পিছনে ধাইছে তব দৃষ্টি চপল-চোর
চকিত-চাহনি-রেখা হৃদয়।
উদ্দেশহীন পথ অলক্ষ্য নাগপাশে
লইতেছে আমারে আকর্ষি,—
সজ্জা ও ছুটি চোখ আমারে ঘিরিয়া হাসে
কল্যাণ-অমৃত বর্ষি।

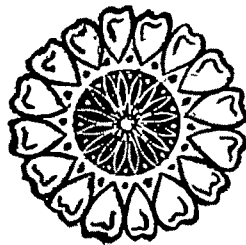
ভূপতির লেশহীন হৃদয়ের তলদেশ,—
অল্পভব করি মহাসত্যে,
মনে হয় সব যদি হয় হোক নিঃশেষ—
কি লাভ হইবে লভি তথ্যে?

আজ ভাবিতেছি আমি ধামি কি এইখানে,—
শেষহীন পিপাসা-অভূতি।
স্বর্গের পথ হতে নামিলে ধরার পানে
পাব তো তোমার দেহ-দৃষ্টি।
নাই বা হইল মোর যাত্রাপথের শেষ
কি লাভ হইবে লভি তথ্যে,

কি হইবে জানি যাহা না জেনেও চলে বেশ,—
কি হইবে শাস্ত সত্যে?
তার চেয়ে এইখানে লুক্ক হতেছে মন
রচিবারে দুজন্য স্বর্গ
তোমাতে হারাক মোর হৃদয়ের স্পন্দন
শেষ হোক চলা উপসর্গ।

একটু দাঁড়াও ধামি ভেবে দেখি এ কিসের ছলনা
বিদ্যা-কলা ধায় বিক্রপ-শানিত ও হাসিতে,
একটু দাঁড়াও—দাঁও ভাবিবার অবসর ললনা,—
প্রলয় টানিছে জোরে বেহুস বাজিছে মোর বাঁশিতে।
বাহিরে রয়েছে প্রিয়া—ঘরে আছে স্ত্রীর হাতে পুষ্টি,
বাহিরে অসন্তোষ, ঘরে ব'সে পোষা প্রাণ-ভুষ্টি,
বাহির হইতে আসে হাঁড়িত-আহ্বান-লিপিকা—
বাহিরে ডাকিছে মোরে ধরণীর ভরা জনারণ্য,
স্তিমিত জলিছে ঘরে সন্ধ্যার নিস্তেজ নীপিকা
আর আছ তুমি ব'সে সাজায়ে তোমার দেহপণ্য।

তোমার এ ছোট নীড়ে অশান্ত আমারে কি কুলাবে?
দ্রবন্ত প্রাণ-ঝড়ে মুহূর্তে নিবে না কি উড়ায়ে।
ধ্বংসের ছত্যাশন কোন্‌ যাহ্নমন্ত্র দি' ভূলাবে,
লেগিহ রসনা দিবে স্নেহ-হৃদয়তল ছায়া পুড়ায়ে।
মহাশূন্তের বৃকে ছুটি আমি উদ্ধা জলন্ত
কক্ষচ্যুত আমি—গতি আছে নাই মোর পথ,
বাহুল্য আছে মোর ক্ষতিপূরণের নাই ভাবনা
নিজেরে পুড়ায়ে দিয়ে নিজের মাঝারে লভি শাস্তি,
জানি আমি যারে চাই হয়তো তাহারে আমি পাব না
আলোয়-স্বপন হাসে—নাচে হৃদয়ের হেমকান্তি।



বাহির্বিশ্ব

স্টেফান ৎসভাইক

চিন্তনগুন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিভাবান ব্যক্তিদের জীবন ৎসভাইকের (Stefan Zweig) উপরে মোহ বিস্তার করত। মহৎ প্রতিভার আকর্ষণ থেকে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মুক্ত হতে পারেন নি। এই আকর্ষণ ৎসভাইকের পক্ষে অবিস্মিত মঙ্গলের কারণ হয় নি। ৎসভাইকের রচনাবলী আলোচনা করলেই বোঝা যাবে যে, চিরজীবন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের প্রতিভার ছায়ায় বাস করবার ফলে তাঁর নিজের মৌলিক সাহিত্য-প্রতিভার বিকাশ অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। গল্প বলবার যে অসামান্য দক্ষতা ৎসভাইকের ছিল, তিনি তার সদ্যবহার করেন নি। সাহিত্যিক, দার্শনিক, রাজনীতিজ্ঞ এবং আবিষ্কারকদের জীবনের গল্প তাঁকে মুগ্ধ করেছে। তাই বার বার তিনি সৃষ্টির পথ ত্যাগ করে এঁদের প্রতিভার পরিচয় দেবার জন্য কলম ধরেছেন। দীর্ঘকালের সাহিত্য-সাধনায় ৎসভাইক পূর্ণ-বৈর্য উপন্যাস লিখেছেন মাত্র একটি, কিন্তু বড় জীবনী রচনা করেছেন অনেকগুলি। রোমা রোলীও জীবনী লিখেছেন; মহৎ জীবনের সন্ধানে তিনি ভারতবর্ষ পর্যন্ত এসেছেন। কিন্তু তাই বলে মৌলিক সৃষ্টি রোলী উপেক্ষা করেন নি। জীবনীকার হিসাবে রোলীর ভূমিকা গোণ; কিন্তু ৎসভাইক মুখ্যত চরিত্রকার। তিনি যুরোপের প্রতিভাবানদের ভক্ত; যুরোপীয় প্রতিভার পূজা ছিল তাঁর কাছে 'প্যাশান'। ৎসভাইকের রচনা এই বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত।

তাঁর প্রথম জীবনের পরিবেশ আলোচনা করলেই এর কারণটা পাওয়া যাবে। ১৮৮১ সনের ২৮শে নভেম্বর ভিয়েনা নগরীতে ৎসভাইক জন্মগ্রহণ করেন। ভিয়েনা ছিল তখন যুরোপের আন্তর্জাতিক শহর। যুরোপের নানা দেশ থেকে শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, ভ্রমণকারী ও ছাত্র-ছাত্রী এসে ভিড় করত ভিয়েনায়। এখানে এলে তারা তুলে বেত—কে ইংরেজ, কে ফরাসী, কে

জার্মান। আমরা সবাই যুরোপীয়, আমাদের মধ্যে আছে আত্মার যোগাযোগ; ভাষা ও আচারের প্রভেদটা তুচ্ছ। ভিয়েনার সমাজে সকলের মনে এমনি একটি ভাব জেগে উঠত। অনেক বছর পরে ৎসভাইক তাঁর আত্মচরিতে বলেছেন, এই ঐক্যবোধের মূল কারণ ছিল ভিয়েনার সঙ্গীত। যুরোপের বড় বড় শিল্পীরা আসতেন ভিয়েনায়। তাঁদের সঙ্গীত জাগ্রিত ছোটখাটো পার্শ্বক্য দূর করে ঐক্যাত্মক জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করত।

ৎসভাইক সম্পন্ন পরিবারের ছেলে। তাঁর বাবা ছিলেন কাপড়ের কলের মালিক। কোনও অভাব-বোধ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। স্কুলে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যয়ন ও সাহিত্যচর্চা নিয়ে নিরুদ্ভিগ জীবন যাপন করবার সুযোগ পেয়েছেন। সহপাঠী হিসাবে তিনি পেয়েছিলেন যুরোপের বিভিন্ন দেশের তরুণদের। তাদের কাছ থেকে শুনেছেন যুরোপের প্রতিভাবান ব্যক্তিদের কাহিনী। কৌতূহল জেগেছে; বই পড়ে প্রতিভাধর ব্যক্তিদের পরিচয় সম্পূর্ণ করতে চেষ্টা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ হবার পর যুরোপের সর্বত্র তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন, যুরোপ ও তাঁর সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছে। অস্ট্রিয়া তাঁর জন্মভূমি—সে কথা তুলে গেলেন, যুরোপ হ'ল মাতৃভূমি। ৎসভাইকের যুরোপ এক ও অখণ্ড; ভাষার ব্যবধান ও আঞ্চলিক সীমানাচিহ্ন তাঁর যুরোপকে ধণ্ডিত করতে পারে নি।

স্কুলে পড়বার সময় থেকেই ৎসভাইকের শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে প্রবল ঔৎসুক্য ছিল। কোন কাগজে নতুন লেখা বা ছবি বেরুল, কোথায় কার বক্তৃতা আছে—এ সব সংবাদ ছিল তাঁর নখাগ্রে। শুধু সংবাদ রার্থতেন না, পড়তেনও। যুরোপের সকল প্রধান কবিদের কাব্যের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। ভিয়েনার একটি অখ্যাত সাহিত্যপত্রে পল ভ্যালেরির প্রথম পর্বের যে

একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, তা তিনি নিজেই ভুলে গিয়েছিলেন। বহু বৎসর পরে ১৯৩৮ইক তাঁকে সে সংবাদ দিয়ে বিস্মিত করেছিলেন।

গেটে বলতেন, জনসাধারণের হাতে শিল্পী ও সাহিত্যিক তাঁদের যে রচনা তুলে দেন তা সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে হ'লে আরও পেছনে খুঁজতে হবে। দেখতে হবে খসড়া পর্যায় থেকে কোন্ পথ অতিক্রম ক'রে রচনা পূর্ণতা লাভ করেছে। ১৯৩৮ইক এ কথা বিশ্বাস করতেন। তাই লেখকদের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা ছিল তাঁর বাস্তবিক। ১৯৩৮ইকের সংগ্রহশালায় রোলান্দ, রিল্ফ, ক্লডেল, গোর্কি, ফ্রয়েড প্রভৃতি লেখকদের বিখ্যাত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ছিল।

ভুলে পড়বার সময় থেকেই ১৯৩৮ইক লিখতে আরম্ভ করেন। উনিশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম কবিতার বই 'রূপালী স্ত্রী' বের হয়। আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতা ছাড়া এই কবিতাগুলির মধ্যে আর কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। ১৯৩৮ইক নিজেও এদের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। নিজের ক্ষমতার উপর দীর্ঘকাল তাঁর সন্দেহ ছিল। তাই তাঁর অনেক রচনা Stephen Branch ছদ্মনামে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। জার্মান ভাষায় ১৯৩৮ইকের অর্থ শাখা।

নিজের ক্ষমতায় সন্দিহান, অথচ অন্তরে আছে সৃষ্টির তাগিদ; তাই ১৯৩৮ইক প্রথম অহুবাদের সহজ পথ ধরলেন। ক্রমে এই অহুবাদ তাঁর নেশা হয়ে দাঁড়াল। বিভিন্ন সাহিত্যের যে সব রচনায় প্রতিভার স্বাক্ষর পড়েছে তাদের অহুবাদ ক'রে জার্মানভাষীদের হাতে তুলে দেওয়া তিনি কর্তব্য ব'লে মনে করলেন। অহুবাদ মনের দিগন্তকে প্রসারিত করতে সাহায্য করে। অথচ যুরোপীয় সংস্কৃতির যে আদর্শ ১৯৩৮ইকের এত প্রিয়, অহুবাদ তার সহায়ক। সুতরাং অহুবাদের মধ্যে ডুবে গেলেন; প্রতি বৎসর একটি ক'রে অহুবাদ বেরতে লাগল। শুধু যে নিজে আরম্ভ করলেন তাই নয়, অন্ত লেখকদেরও অহুবাদ করতে উৎসাহ দিতেন। বেলজিয়ামের কবি ভ্যারাবেনের কাব্যের অহুবাদ তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি; বন্দেলার, ভায়লেন, উইলিয়ম ব্লেক, কীটস, বেন জনসন প্রভৃতি বহু লেখকের রচনা ১৯৩৮ইক অহুবাদ করেছেন। অহুবাদ-গ্রন্থগুলি

পৃথিবীর ভ্রাম্যমাণ শিক্ষক। সুতরাং তাদের সংখ্যা বাড়ার দ্রুত তাঁর স্বপ্নের ক্রটি ছিল না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জার্মানি কিংবা অন্ত দেশের নবীন সাহিত্যিকদের মধ্যে কোন প্রতিভার লক্ষণ দেখতে পেলেন পাঠক-মহলে সে কথা ১৯৩৮ইক বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে প্রচার করতেন। অনেক লেখকের পাণ্ডুলিপি তিনি প্রকাশের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন আনন্দের সঙ্গে। এতটা উৎসাহের ফলে কখনও কখনও বিপদেও পড়তে হয়েছে। কিন্তু তার জন্য তিনি ভয় পান নি। স্বযোগ এলেই নবীন লেখকদের প্রতিভাদীপ্ত রচনা পাঠকদের নিকট সুপারিশ করেছেন।

অহুবাদের সাহায্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর বন্ধ হয়ে গেল। কিছুদিন ভিয়েনার যুদ্ধদণ্ডের কাজ করেছিলেন ১৯৩৮ইক। যুদ্ধের নির্মম মূর্তি প্রত্যক্ষ করবার পর তিনি যুদ্ধ-বিরোধী হয়ে পড়লেন। যুরোপীয় ঐক্যের স্বপ্ন দেখে এসেছেন এতদিন; যুদ্ধ সেই ঐক্যের আদর্শ মিথ্যা প্রমাণ ক'রে দিল। ১৯৩৮ইক দেখলেন, তাঁর অথচ যুরোপ আত্মকলহে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে। আদর্শ-ভঙ্গের বেদনা গভীরভাবে আঘাত করল; কিন্তু এই বেদনাই তাঁকে দিল মৌলিক সৃষ্টির প্রেরণা। যুদ্ধ তাঁর মনে যে সব চিন্তা জাগিয়েছিল তাদের তিনি প্রকাশ করলেন Jeremiah নাটকে। ব্যক্তি অথবা জাতি শত্রুর হাতে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হ'লেও তাদের আত্মা থাকে অপরাজিত। যত বড় শক্তিমানই হোক না কেন, পরাজিতের আত্মাকে জয় করতে পারে না। সুতরাং সকল সংগ্রামে বিজয়ী অপেক্ষা বিজিতের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহুদী-শত্রু জেরেমিয়ার কাহিনীর মধ্য দিয়ে ১৯৩৮ইক এই তত্ত্ব বলতে চেয়েছেন। জেরেমিয়া ও তাঁর অহুগামীরা যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন; ক্যালভিনার বিজয়ী সেনাপতি বিবেকেব দংশন অহুভব করছেন যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে। তাঁর মনে হ'ল, আমার জয় বাইরের জয়। আমি শত্রুদৈন্ত হত্যা করতে পারি; কিন্তু তার অন্তরে যে ভগবান ব'লে আছেন তাঁকে স্পর্শ করবার ক্ষমতাও নেই। একটা জাতির স্বাধীনতা হরণ করতে পারি, কিন্তু জাতির আত্মাকে বন্দী করবার ক্ষমতা কই? সুতরাং জয়ী হয়েও হেরে গেলাম।

যুদ্ধক্লিষ্ট যুরোপ ংস্ভাইকের এই আশার বাণীতে আশ্চর্যভাবে সাড়া দিল। অভিনীত না হলে নাটকের বাণী মূর্ত হয়ে ওঠবার সুযোগ পায় না। তখন ১৯১৭ সন। যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধবিরোধী নাটক অভিনয় করা নিষিদ্ধ। কিন্তু প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই বক্তৃতা-প্রধান নাটকটির বিশ হাজার কপি বিক্রি হয়ে গেল। নিরপেক্ষ দেশ সুইজার-ল্যান্ডে কিছুদিন 'জেরেমিয়া'র অভিনয় হয়েছিল।

জীবনে যে সংকট দেখা দিলে যুদ্ধ অবশ্যস্তাবী হয়ে পড়ে তার হাত থেকে মুক্তির উপায় কি? সঙ্কট-জ্ঞাপের পথ খুঁজে না পেলে যুদ্ধ বার বার এসে মানুষের জীবন ও সংস্কৃতিকে বিপর্যস্ত করে যাবে। দূর হবে বিশ্বশৈশবীর স্বপ্ন, রুদ্ধ হবে মানব-কল্যাণের সকল পথ। প্রথম মহাযুদ্ধের বেদনাময়ক অভিজ্ঞতা থেকে ংস্ভাইক এই সিদ্ধান্তে পৌছলেন যে, প্রতিভাবান ব্যক্তিদের জীবনী ও চরিত্র আলোচনার মধ্যেই সঙ্কটমুক্তির উপায় আছে। যারা ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্কট জয় করে প্রতিভার জ্যোতির্লোকে পৌঁছেছেন, সমাজ ও জাতির সমস্ত সমাধানের পথ তাঁরাই দেখাতে পারেন। ংস্ভাইক নিজে সংকটকালে শক্তি ও সাহসনা পেয়েছেন এদের জীবন থেকে। প্রথম মহাযুদ্ধে জেরেমিয়ার আদর্শ তাঁকে শান্তি দিয়েছে। ১৯৩৪ সনে হিটলারের দমননীতি যখন চরম অবস্থায় পৌঁছেছে, তখন তিনি তরুণ হয়ে লিখেছেন ইর্যাস্মাসের জীবনী। স্বার্থ-পরতা, দর্প ও ঘেঁষ দূর হয়ে একদিন গায় ও যুক্তি জয়লাভ করবে—ইর্যাস্মাসের এই দৃঢ় বিশ্বাস তাঁকে সঙ্কটজ্ঞাপের শক্তি দিয়েছে। শেষ জীবনে তাঁর সঙ্গী ছিলেন মর্তে। যে রাজিতে ংস্ভাইক পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন সেই রাজিতেও তাঁর টেবিলের উপর সাজানো ছিল মর্তের জীবনী ও রচনাবলী।

গণতন্ত্রের যুগে ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে; জাহ সাধারণ মানুষের জীবনী আজকাল সমাদৃত হয়। কিন্তু চরিত্রকার হিসেবে ংস্ভাইক ছিলেন অভিজ্ঞাত শ্রেণীর। তিনি শুধুই প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জীবনী নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর জীবনী রচনার উদ্দেশ্য সকল কববার জ্ঞাত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের নির্বাচন করবার প্রয়োজন ছিল।

ংস্ভাইক গল্প উপভাস রচনা করেছেন সৃষ্টির আনন্দে। কিন্তু যুরোপের প্রতি কর্তব্যবোধ তাঁকে জীবনী রচনার উদ্বুদ্ধ করেছে। সঙ্কটে যাদের চরিত্র-অধ্যয়ন শক্তি দিতে পারবে, ংস্ভাইক সাধারণত তাঁদের জীবনই নির্বাচন করেছেন। আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যারা সাফল্য অর্জন করেছেন তাঁদের বাদ দিয়ে তিনি নিয়েছেন নৈতিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জীবনী। কিন্তু কখনও কখনও তিনি হয়তো একটি জীবন-কাহিনীর বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছেন। আমেরিগো ও ম্যাগেলানের জীবনের বিচিত্র গল্প তাঁকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করেছে বলেই লিখেছেন তাঁদের চরিত্রকথা। এঁরা ষাটক্রমে আমেরিকা ও ফিলিপাইন দ্বীপ আবিষ্কার করেছিলেন। Healers through the Spiritএ ংস্ভাইক আলোচনা করেছেন মেস্মার, বেকার-এন্ডি এবং ফ্রয়েডের কার্যকলাপ। মনকে প্রভাষিত করে রোগ নিরাময়ের যে পদ্ধতি নিয়ে এঁরা কাজ করেছিলেন তার আলোচনার প্রয়োজন ছিল। The Tide of Fortuneএ ংস্ভাইক এক-একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে যে-সব ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে তাদের ছবি এঁকেছেন। এগুলি পূর্ণাঙ্গ ছবি নয়, কিন্তু প্রত্যেকটি নাটকীয়তায় পূর্ণ। সিসারোর মৃত্যু, গেটের শেষ প্রেম, স্বর্গের দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার ইত্যাদি এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

ংস্ভাইকের জীবনী নৈব্যক্তিক এবং ইতিহাসাত্মক নয়। একটি জীবনের যে দিকটা তাঁর কাছে ভাল লেগেছে, সে দিকটাই তিনি বড় করে ফুটিয়ে তুলেছেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ধারাবাহিক জীবনী রচনায় উৎসাহ ছিল না তাঁর। তিনি কীর্তি-আলোচনায় প্রাধান্য না দিয়ে জীবনের ছবি এঁকেছেন। কীর্তি তো সকলের কাছেই উন্মুক্ত; যে কেউ তা নিয়ে আলোচনা করতে পারে। কিন্তু কীর্তির শিখরে পৌঁছতে যে সাধনার প্রয়োজন হয়েছিল তার খবর কখন রাখে? ংস্ভাইক আবিষ্কারকের কৌতূহল নিয়ে প্রতিভাবানদের জীবনের সেই অপরিজ্ঞাত দিকটা আলোচনা করেছেন।

ংস্ভাইক দীর্ঘ দশ বৎসর ধরে বালজাকের জীবনী লিখেছেন। কিন্তু পাণ্ডুলিপি পরিমার্জিত করে যাবার সময় পান নি। তাঁর মৃত্যুর পরে অপরিমার্জিত পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করা হয়েছে। বালজাকের ব্যক্তিগত জীবনের

ক্রেটি-বিচ্যুতি, তাঁর প্রেমের আভ্যন্তরীণ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে; কিন্তু সাহিত্য আলোচনার উপর একটুও জোর দেওয়া হয় নি। ডিকেন্স, ডস্টয়ভেস্কি, নীটশে, হল্ডারলিন, ক্যাসানোভা, স্তান্দল, টলস্টয়, জোসেফ ফুশে (নেপোলিয়নের মন্ত্রী) প্রভৃতি বহু প্রতিভাধর ব্যক্তির জীবনী ংস্ভাইকে আকৃষ্ট করেছে। একবার ভাবলেন, জীবনী তো অনেক লেখা হয়েছে, আর লিখব না। কিন্তু সংকল্প রইল না বেশিদিন। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গিয়েছেন পড়তে। হাতে-লেখা পুরনো কাগজপত্রের উপর তাঁর বরাবরই গভীর আকর্ষণ। চোখে পড়ল মেরী স্টুয়ার্টের প্রাণদণ্ডের রিপোর্ট। তখনই তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল, মেরী কি সত্যি তাঁর দ্বিতীয় স্বামীকে হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিলেন? প্রকৃত তথ্য নির্ধারণের জন্ম ডিটেকটিভের ঔৎসুক্য জাগল তাঁর মনে। মেরী স্টুয়ার্ট নৃশঙ্কে পড়াশুনা আরম্ভ করলেন; আর শেষ পর্যন্ত লেখা হয়ে গেল মেরী স্টুয়ার্টের জীবনী।

যদিও ংস্ভাইক পূর্ণাঙ্গ এবং তথ্য-কণ্টকিত জীবনী লেখেন নি, তথাপি প্রত্যেকটি তথ্য নিয়ে তাঁকে আলোচনা করতে হয়েছে। অনেক লেখক আছেন, তাঁরা যা জানেন সবটাই লেখার মধ্যে প্রকাশ করেন; কিন্তু ংস্ভাইক সব জেনে নিয়ে ব্যবহার করেন শুধু অত্যাশ্চর্য অংশটুকু। মেরী আতোয়ানেৎ-এর জীবনী লেখবার সময় তিনি রাগীর ব্যক্তিগত হাত-ধরচার প্রত্যেকটি বিল পরীক্ষা করেছেন, সমকালীন প্রত্যেকটি সংবাদপত্রের ফাইল এবং আদালতের নথিপত্র খুঁটিয়ে দেখেছেন। কিন্তু তাঁর বইয়ের মধ্যে এ সব সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের আভাস পর্যন্ত নেই।

ংশ্ভাইকের জীবনী-সাহিত্য স্বথপাঠ্য। অনেকগুলি উপন্যাসের আঙ্গিকে লেখা। এক-একটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য পাঠকের মনে গভীর ছাপ রেখে যায়। তাঁর জীবনী-সাহিত্যে এবং অল্পজন মানবতা ও নীতি-বোধের শ্রেষ্ঠ প্রাধান্য লাভ করেছে। ংস্ভাইকের আত্মচরিত The World of Yesterdayও এসব বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ। পৃথিবীর আত্মচরিত-সাহিত্যে এটি একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ভূমিকায় লেখক বলছেন, আমি নিজেই এত বড় ব'লে মনে করি না যে, অল্পকালের আমার জীবনের কাহিনী শোনাও। যুরোপের ইতিহাসের এক সঙ্কটময়

অধ্যায় প্রত্যক্ষ করেছি; তার কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য। ছায়াচিত্র-বক্তৃতায় বক্তার যে ভূমিকা, এই গ্রন্থে আমার ব্যক্তিগত জীবনের ভূমিকাও ততটুকু।

যুরোপের বাইরে ংস্ভাইকের গল্পের সমাধরই বেশি। অথচ ক্রোভের সঙ্গে মনে হয় যে, জীবনী-সাহিত্যের তুলনায় তিনি কথ্য-সাহিত্যকে উপেক্ষা করেছেন। ভিয়েনার জীবনের ছুটি বিশিষ্ট ধারা তাঁর গল্প-উপন্যাসকে প্রভাবান্বিত করেছে। এক দিকে কাব্য, সঙ্গীত ও রঙ্গমঞ্চের ভাবাবেগ-প্রবণতা; অন্য দিকে বিজ্ঞানের পরিমিতিবোধ ও যুক্তিবাদ। বিশেষ করে ক্রয়েড ও ব্রোইয়ারের মনোবিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি ংস্ভাইক যে-ভাবে হৃদয়ঙ্গম করে গল্পের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন তার তুলনা পাওয়া ভার। ংস্ভাইকের গল্পে গীতিকবিতার ভাবাবেগ এবং মনো-বিজ্ঞানের শেষতম আবিষ্কারের চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে।

ংশ্ভাইকের প্রথম গল্প 'এরিকা এভাল্ডের প্রেম'। এর পরে বেরলিন গল্প-সংগ্রহ 'প্রথম অভিজ্ঞতা' (১৯১১)। কিন্তু ১৯২২ সনে Amok (উন্মত্ত) প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় নি। জাভার এক দুর্গম অঞ্চলে চাকুরি নিয়ে গেছে এক জার্মান ডাক্তার,। দিনের পর দিন একঘেয়ে নিঃসঙ্গ জীবন। হঠাৎ একদিন একটি খেতকায়া রমণী এল তাকে লজ্জার হাত থেকে মুক্তি দেবার প্রার্থনা নিয়ে। সেই নিঃসঙ্গ পরিবেশে একটি যুরোপীয় রমণীকে দেখে ডাক্তারের বহুদিনের নিরুদ্বিগ্ন বোনবাসনা জেগে উঠল। উন্মাদের মত সে মহিলার অঙ্গস্বরণ করল সকল বিপদ তুচ্ছ করে। কিন্তু তাকে পেল না। অথচ অবস্থার আবর্তে পড়ে মহিলার কলঙ্ক এবং অস্বাভাবিক মৃত্যুর দায়িত্ব তাকেই নিতে হ'ল।

Twenty-four Hours in the Life of a Woman আর একটি আশ্চর্য গল্প। এক বিধবা ভদ্র-মহিলা নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়ান। তিনি সচ্চরিত্রা এবং উন্নতমনা। হঠাৎ একদিন এক তরুণ জুয়াড়ী তাঁকে কাঁচপোকায় মত আকৃষ্ট করল। মহিলার হৃদয় মমতায় পূর্ণ হয়ে গেল; এই সর্বনাশা নেশা থেকে গুকে বাঁচাতে হবে। বাঁচাতে গিয়ে দেহ দান করলেন, লোকলজ্জা ভুলে তার পেছনে ছুটলেন; তবু বাঁচাতে পারলেন না, শুধু নিজের জীবনটা নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ছিনিমিনি খেললেন।

ফ্রেডের মতে এই গল্পটি ‘স্ভাইকের ‘মাস্টারপীস’। ফ্রেড এই গল্পের প্রত্যেকটি লাইন বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে এর চরিত্রচিত্রণ ত্রুটিহীন। ফ্রেড বিজ্ঞানের যে তথ্য আবিষ্কার করেছেন, স্ভাইক তাকেই সাহিত্যে দিয়েছেন কাব্যময় রূপ।

তার শেষ বয়সের রচনা Royal Game আর একটি আশ্চর্য গল্প। দুজন ‘মনোমানিয়াক’ (একটি বিষয়ে যাদের মন নিবিষ্ট) দাবাখেলা আরম্ভ করেছে। একজন দাবাখেলায় পেয়েছে চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি। আর একজনের পরিচয় কারও জানা নেই। এদের দুজনের দেখা হ’ল সমুদ্রগামী-এক জাহাজে। দুই প্রতিদ্বন্দী খেলতে বসেছে; যাকীরা চার দিকে এসে দাঁড়িয়েছে খেলা দেখতে। প্রত্যেকের মনে উৎকর্ষ—কে জিতবে? দাবাখেলা না জানলেও পাঠকের মনও উৎকর্ষিত হয়ে ওঠে।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠকের মন আকৃষ্ট করে রাখবার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাবে স্ভাইকের প্রত্যেকটি গল্পে। তার একটি মাত্র বড় উপন্যাস Beware of Pity-(১৯৩৯)-তেও এই গুণটি আছে। একটি পঙ্খ তরুণী যাকে প্রেম নিবেদন করল, সে স্বস্থ সবল তরুণ। যুবক তার জন্ত ছুখ অহুভব করে, মমতা বোধ করে, কিন্তু ভালবাসে না। মাঝে মাঝে করুণাকেই ভালবাসা বলে ভুল হয়। শুধু করুণার বশবর্তী হয়ে যুবক যদি তরুণীকে গ্রহণ করে তা হ’লে তার জীবন হবে দুঃখময়; আবার অসহায় পঙ্খ তরুণীর প্রেম প্রত্যাখ্যাত হ’লে সে যে কত বড় বেদনা পাবে তা কল্পনাও করা যায় না। এই দুই স্বন্দর আবর্তে প’ড়ে পাঠকের মন ঘুরপাক খায়, পরিণতি সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত কৌতূহল অক্ষুণ্ণ থাকে।

যারা তাদের জীবন, সময়, অর্থ, স্বাস্থ্য এবং সুনাম পরম অবহেলায় ছ’হাতে উড়িয়ে দেয়, তারা স্ভাইককে আকৃষ্ট করে। বর্তমান যুগের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় তাদের জীবনে। তার গল্প-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের স্ভাইক খুঁজে পেয়েছেন ভিয়েনার রেষ্টোরাঁয়, যুরোপের প্রমোদকেন্দ্র ও জুয়ার আড্ডায়, এবং প্রাচ্যভ্রমণের দীর্ঘ পথের দু পাশে। গল্পকার স্ভাইকের বৈশিষ্ট্য রোল’ন ‘অ্যামক’ ও অন্তান্ত ছোট উপন্যাসের ফরাসী সংস্করণের

ভূমিকায় স্ফূর্তি করে বলেছেন : “The characteristic trait in (Zweig’s) artistic make-up is the passionate desire to recognise the unflagging, insatiable curiosity, the demonic urge to see, to know, to live every life himself. It has made of him a veritable ‘Flying Dutchman’, a passionate pilgrim. He is the impudent yet devout admirer of genius, whose mystery he has plucked out only to love it more deeply, the poet who has made Freud’s dangerous key his own—the soul-snatcher.”

স্ভাইক প্রাচ্যভ্রমণের পথে ভারতে এসেছিলেন। ভারতবাসীর রোগক্লিষ্ট দেহ এবং নিরানন্দ পরিবেশ তাঁকে ভারতের প্রতি বিমুগ্ধ করেছিল। ঠিক এমনি হয়েছিল হেরমান হেসের বেলায়। বর্তমান ভারত তাঁদের দুজনকেই হত্যা করেছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতের আকর্ষণ কেউ এড়াতে পারেন নি। স্ভাইকের Virata or The Eyes of the Undying Brother প্রাচীন ভারতের পটভূমিকায় রচিত একটি কাহিনী। লেখক একে লোক-কাহিনী বলে আখ্যা দিয়েছেন। কোন শাস্ত্রগ্রন্থে, বীরগাথায় এর সন্ধান পাওয়া যাবে না। এতদিনের পুরনো কথা লোকেও ভুলে গেছে।

বৃদ্ধের জন্মের পূর্বে রাজপুতানা অঞ্চলে বিরাট নামে একজন গ্রামপরায়ণ, সংযমী ও উদারচেতা লোক বাস করতেন। বোকা হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। একবার হ’ল কি, রাজার দৈত্যরা বিদ্রোহ করে রাজ্য আক্রমণ করল। রাজ্য যায় যায়। রাজা নিরুপায় হয়ে বিরাটের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। বিরাট কিছু লোকজন সংগ্রহ করে রাজ্যের অন্ধকারে অকস্মাৎ শত্রু-শিবির আক্রমণ করে বিদ্রোহীদের সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করতে সক্ষম হলেন। পরদিন ভোরবেলা শত্রু-শিবিরে যুদ্ধদেহের স্তূপ দেখে বিরাট শিউরে উঠলেন। হঠাৎ আবিষ্কার করলেন তাঁর অগ্রজের মৃতদেহ। বড় ভাই যে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে সে কথা তাঁর জানা ছিল না। মৃত ভ্রাতার বিস্ফারিত চোখ দুটি যেন তাঁকে তিরস্কার করেছে। বিরাটের মনে হ’ল ভগবান তাঁকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, যে কোনো

মাহুষকে হত্যা করাই ভাড়াহত্যার মত পাপ। অজ্ঞশত্রু নদীর জলে বিসর্জন দিয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন বিরাট। রাজা খুব সন্তুষ্ট তাঁর উপরে। তাঁকে প্রধান সেনাপতির পদ দিতে চাইলেন। কিন্তু বিরাট সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান ক'রে বললেন, মহারাজ, জীবনে আর যুদ্ধ করব না।

রাজা বিস্মিত হলেন। একটু থেমে বললেন, বেশ, তুমি তা হ'লে বিচারপতির পদ গ্রহণ কর। তুমি ত্রায়নিষ্ঠ, প্রজারা তোমার কাছ থেকে স্ববিচার পাবে।

বিরাট এ পদ গ্রহণ করলেন। দিনের পর দিন নানা বিচিত্র মামলার বিচার ক'রে চলেছেন। তাঁর স্ববিচারের যশ রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি কাউকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন না। একদিন সীমাস্ত অঞ্চল থেকে এক জোয়ান উদ্ধত স্লেচ্ছ যুবককে বেঁধে আনা হ'ল বিচারালয়ে। সীমাস্ত পার হয়ে সে অত্যাচার করত ভ্রমপল্লীতে। ভ্রমপল্লীর একটি মেয়েকে সে বিয়ে করতে চেয়েছিল, তাতে বাধা দেওয়ায় দশ-বারো জন লোক খুন করেছে।

বিরাট বিচার ক'রে যত জন লোক খুন করেছে তত বছর ভূগর্ভস্থ কারাগারবাস এবং চাবুক মারবার আদেশ দিলেন। খুন করেছে, তবু প্রাণদণ্ড দেওয়া হ'ল না। বন্দী যুবক উদ্ধতভাবে বললে, হে বিচারক, তুমি বিচার করছ অস্ত্রের কথা শুনে; তুমি আমাকে যে দণ্ড দিলে, সে দণ্ড যে কি তা তুমি জান না। তোমাকে কখনও চাবুকের মার খেতে হয় নি, মাটির নীচে বন্দী হয়ে থাকতে হয় নি। আমি রাগের মাথায় জ্ঞানশূন্য হয়ে খুন করেছি। আর তুমি বিচারের নাম ক'রে স্বস্থ মস্তিষ্কে আমাকে মাটির নীচে বন্দী ক'রে তিলে তিলে হত্যা করবার আদেশ দিলে। এই কি বিচার? বন্দীকে কি কষ্টভোগ করতে হয় তার অভিজ্ঞতা যে বিচারকের নেই, তার কাছ থেকে কখনও স্ববিচার আশা করা যায় না।

বিরাট দেখলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে যত অগ্রজের চোখে যে অভিযোগপূর্ণ দৃষ্টি ছিল এই বন্দীর চোখেও ঠিক তেমনি চাউনি ফুটে উঠেছে। বিরাট রাজার কাছ থেকে এক মাসের ছুটি নিয়ে সেই রাত্রিতে কারাগারে গেলেন। বন্দী যুবকের হাতে একটি চিঠি দিয়ে বললেন, তুমি

আমার পোশাক প'রে বেরিয়ে যাও। এক মাস পরে রাজার কাছে এই চিঠি পৌঁছে দিও।

এক মাস ধ'রে বাবুহীন সন্দীহীন অন্ধকার ভূগর্ভে থেকে বিরাট অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন। তাঁকে চাবুক মারা হয়েছে, নানা রকম উৎপীড়ন সহ্যে হয়েছে। এক মাস পরে কারাগারের দরজা খুলে গেল; রাজা এসেছেন তাঁকে নিয়ে যেতে। বিরাট নতজান্ন হয়ে প্রার্থনা করলেন, মহারাজ, আমাকে বিচারকের কর্তব্য থেকে মুক্তি দিন। আমি এখন উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, কেউ কারও বিচার করতে পারে না। বিচার ভগবানের হাতে। তাঁর অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে যাওয়া পাপ।

বিচারপতির পরিবর্তে রাজা তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করতে চাইলেন। কিন্তু বিরাট সম্মত হলেন না। কারণ প্রত্যেকটি কথা কার্বে পরিণত হবে। এক-একটি কথার সুদূরপ্রসারী পরিণামটা আগে থাকতে জানা যায় না। সকল কর্ম থেকে বিরত হয়ে একাকী জীবন যাপন করাই পাপের হাত থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায়। রাজকার্য ত্যাগ ক'রে নিভৃত গৃহকোণে বাস করতে লাগলেন বিরাট। তাঁর পরামর্শ চাইতে মাঝে মাঝে লোক আসে। বিরাট দেখলেন, আদেশের চেয়ে উপদেশ ভাল, বিচারের চেয়ে ভাল সালিসী।

কয়েক বছর কেটে গেল। একদিন এক ক্রীতদাসকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর আদর্শের সঙ্গে ছেলেদের আদর্শের সংঘাত বাধল। বিরাট জোর ক'রে নিষেধ ইচ্ছাকে ছেলেদের উপর চাপাতে চাইলেন না। শাস্তি ও সত্যের সন্ধানে গৃহ ত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন বনে। বছরের পর বছর কঠোর তপস্বী ক'রে চলেছেন বিরাট। বনের পশুপাখিরা তাঁকে নিজেদের একজন ব'লে গ্রহণ করেছে, মাহুষ ব'লে একটুও ভয় করে না। লোকালয়ের সঙ্গে তাঁর সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। হঠাৎ একজন শিকারী একদিন পথ ভুলে ঘুরতে ঘুরতে সেখানে এসে উপস্থিত। সে লোকালয়ে ফিরে গিয়ে এই আশ্চর্য স্ববির কথা প্রচার করল। রাজা নিজে এলেন বিরাটকে ফিরিয়ে নিতে। বিরাট আর ফিরে যাবেন না। এখানে মাহুষের সঙ্গ নেই, কাউকে উপদেশ দিতে হয় না, শিক্ষা দেবার প্রয়োজন নেই, স্বতরাং পাপ থেকে তিনি মুক্ত।

অনেক লোক প্রত্যহ বিরাটকে দূর থেকে প্রণাম করে চলে যায়। তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে দূর-দূরান্তরে। একদিন বিশেষ জরুরী কাজে বিরাটকে যেতে হ'ল নিকটবর্তী গ্রামে। গ্রামের প্রান্তে জীর্ণ কুটিরের বাস করে এক যমণী। তার চোখে ভৎসনার দৃষ্টি দেখে বিরাট ধাক্কা দিলেন। ঠিক যেন মৃত অগ্রজের স্থির চোখের চাউনির মত। এগিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মা, আমি কি তোমার কাছে কোনও অপরাধ করেছি?

নারী জলে উঠল: জান না তুমি আমার কি করেছ? আমার স্বামী ছিল এ অঞ্চলের সেরা তাঁতা। তোমার আদর্শে মুগ্ধ হয়ে সে সংসার ত্যাগ করেছে। উপার্জন করবার কেউ নেই। আমার তিনটি সন্তান পর পর না খেতে পেয়ে মারা গেছে। এর জন্য তুমি দায়ী।

বিরাট ব্যথিত হলেন। এতদিনে উপলব্ধি করলেন পৃথিবীতে থাকতে হ'লে সংসারকে অগ্রাহ্য করা চলে না। কর্মবিরতিও কথা এবং কাজের মত অস্ত্রের উপরে প্রভাব বিস্তার করে। নিজেকে ভুলে সেবা করবার মধ্যেই আছে মুক্তি, শুধু সংসার ত্যাগ করলে কিছু হয় না। কামনা থেকে মুক্ত হতে হবে, সে কামনা জাগতিক বা আত্মিক হতে পারে। কামনা সৃষ্টি করে বিভ্রম, সেবা দেয় জ্ঞান।

বিরাট রাজধানীতে ফিরে রাজ্যের কাছ থেকে চেয়ে নিলেন কুকুরশালার অধ্যক্ষের পদ। বাকি দিনগুলি তাঁর কার্টল পরম শান্তিতে কুকুরের সেবা করে।

এই কাব্যমণ্ডিত, তত্ত্বপ্রধান কাহিনীটি ৯৯তাইকের অপূর্ব সৃষ্টি।

হিটলারের ইহুদী-বিদ্বেষের ফলে অনেক প্রতিভাবান শিল্পী, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিককে যুরোপ ত্যাগ করতে হয়েছে। জার্মানিতে ৯৯তাইকের গ্রন্থের বহুসংস্করণ হ'ত, কিন্তু তিনি অস্ট্রিয়ার নাগরিক বলে তাঁর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিটলারের স্বেচ্ছাদৃষ্টি পড়ল অস্ট্রিয়ার উপর। ৯৯তাইককে দেশ-ত্যাগ করতে হ'ল। ১৯৪০ সনে তিনি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছে। লগুনে তিনি বিয়ে করলেন তাঁর

সেক্রেটারি শ্রীমতী এলিজাবেথকে। ইংল্যান্ড তাঁর ভাল লাগে নি। ইংরেজরা বড় পরিমিত কথা বলে, আচার-ব্যবহারেও বড় রুঢ় সংযম। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কিছু দিন বক্তৃতা দিয়ে বেড়াবার পর ৯৯তাইক ব্রেজিলের পেট্রোপলিস শহরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করলেন।

ব্রেজিল হৃন্দর দেশ। প্রথম এসে মনে হ'ল, এখানে শান্তিতে থাকতে পারবেন। ব্রেজিলের উপর তিনি একখানি বইও লিখলেন—Brazil: Land of the Future। কিন্তু কিছুদিন পরেই তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠল। জলের মাছ ডাঙায় তুললে যেমন ছটফট করে, ৯৯তাইকও তেমনি অস্থির হয়ে উঠলেন যুরোপের জন্ত। পরিচিত কোন লোকের সঙ্গে দেখা হ'লেই ছেলেমানুষের মত উৎসাহ হয়ে প্রশ্ন করেন, আবার কবে যুরোপ যাব? যুরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতির একনিষ্ঠ পূজারীর পক্ষে অল্প দেশের পরিবেশ সহজে স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব ছিল না। রোলান্দ, গোর্কি, ভ্যারারেন, ভ্যালেরি, তোমসকানিনি, হেরৎসাল, স্তাইৎসার, বাক, মালার, ফ্রেড প্রভৃতি মনীষীদের সঙ্গে বক্তৃত্বের স্বতি মনে পড়ে। কত বই চিঠিপত্র পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ ফেলে আসতে হয়েছে। তাদের অভাবে বাড়ি শূন্য মনে হয়। ৯৯তাইকের ধারণা হয়েছে, এখন যা-কিছু লিখছেন তাতে প্রাণ নেই। প্রাণ থাকবে কি করে? এখানে মাতৃভাষা জার্মান কারও মুখে শোনা যায় না। হয়তো একদিন ভুলেই যেতে হবে।

৯৯তাইক ছিলেন প্রবল আশাবাদী। মাহুষের প্রতি গভীর প্রেম তাঁকে আশাবাদী করেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ তাঁর অঞ্চল যুরোপের আদর্শ ক্ষুণ্ণ করলেও তিনি নিরাশ হন নি। তিনি বলতেন, যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক পের নীচে মাহুষের আত্মা বেঁচে থাকবে। সাময়িকভাবে আমাদের আত্মিক শক্তি নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে। কিন্তু তার মুক্তা নেই, আবার সক্রিয় হয়ে সে মাহুষের কল্যাণ করবে।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলারের নির্মম পীড়ন প্রত্যক্ষ করে ৯৯তাইক নিরাশাবাদী হয়ে উঠলেন। যুরোপ থেকে পালিয়েও বৃষ্টি রক্ষা পাওয়া যাবে না। হিটলারের বিজয়-অভিযান যে রূপ অব্যাহত চলেছে তাতে নাৎসীদের পক্ষে আমেরিকা জয় করা অসম্ভব নয়। ওদিকে জাপান।

সিদ্ধাপুরের পতন হ'ল। সিদ্ধাপুরের পতন নয়, ওটা যুরোপেরই পরাজয়। মানবমৈত্রীর আদর্শ নিয়ে বাস করবার মত একটু স্থান পৃথিবীর কোথাও বৃষ্টি পাওয়া যাবে না।

পেট্রোপলিসের এক সভায় বিখ্যাত কবি গাব্রিয়াল মিস্ট্রাল-এর সঙ্গে প্রথম আলাপ হ'ল। সভায় ব'লেই ংস্ভাইক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, নাৎসীরা কি দক্ষিণ-আফ্রিকাও আক্রমণ করবে? আপনার কি মনে হয়?

মিস্ট্রাল বিশেষ কিছু না ভেবেই উত্তর দিলেন, অসম্ভব কি? আসতেও পারে।

উত্তর শুনে ংস্ভাইকের মুখ মুহূর্তের মধ্যে বিবর্ণ হয়ে গেল।

এর পর থেকে তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত একটা অস্বস্তিকর আতঙ্কে পূর্ণ হয়ে উঠল। বেঁচে থেকে নিরুপায় ভাবে প্রতিদিন মাহুয়ের লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ করবার বেদনা আর সহ্য করা যায় না। সংবাদপত্রে যুদ্ধের খবর পড়বার পর থেকে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা, মানি ও হতাশার মধ্য দিয়ে দিনটা কেটে যেত। লেখা পড়া অসম্ভব হয়ে উঠল। এ ভাবে বেঁচে থেকে লাভ কি?

বাঁচলেন না বেশিদিন। ১৯৪২ সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারি স্টোকান ংস্ভাইক ও এলিজাবেথ শার্লট ংস্ভাইকের আলিঙ্গনাবদ্ধ মৃতদেহ তাঁদের শোবার ঘরে পাওয়া গেল। শয়্যার পাশে ছোট টেবিলের উপর দুটি কাচের শূন্য বিষভাণ্ড। ংস্ভাইকের বয়স] ষাট, এলিজাবেথের ত্রিশ। ওই টেবিলের উপরই একটি ছোট চিঠি ছিল :...আমার মাতৃভাষার জগৎ এবং আত্মার গৃহ যুরোপ থেকে বিতাড়িত হয়ে ঘাঘাবরের মত দেশে দেশে ঘুরেছি।

বয়স হ'ল ষাট; এমনি ক'রে ঘোরবার আর শক্তি নেই। আজকের কালো রাত শেষ হয়ে নতুন প্রভাত আসবে। আমার বন্ধুরা তা দেখে যাবেন। কিন্তু আমি বড় অধৈর্য হয়ে পড়েছি। আমি যাত্রা করলাম একা।...

ইংরেজী অনুবাদের গ্রন্থপঞ্জী

লণ্ডনের ক্যামেল কোম্পানি ংস্ভাইকের গ্রন্থাবলার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করছেন। ক্যামেলের হালায় সংস্করণে এ পর্যন্ত এই খণ্ডগুলি বেরিয়েছে—

1. The Queen of Scots, 10/6
2. Kaleidoscope one, 8/6,
3. Kaleidoscope two, 8/6.
4. Erasmus and the Right to Heresy, 8/6.
5. Beware of Pity, 10/6.
6. Adepts in Self-Portraiture, 10/6.
7. Marie Antoinette, 12/6.
8. The World of Yesterday, 10/6.
9. Stories and Legends, 10/6.
10. The Tide of Fortune, 9/6.

উপরি-উক্ত ২নং ও ৩নং গ্রন্থে 'অ্যামক' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গল্পগুলি পাওয়া যাবে।

এ ছাড়া নিম্নলিখিত অনুবাদগুলিও পাওয়া যায় :

1. Joseph Fouche, British Publishers' Guild, 1/6.
2. Tolstoi, Cassell, 5/-.
3. Balzac, Viking, \$ 3.75.
4. Amerigo : a Comedy of Errors in History, Viking, \$ 2.00.

ংস্ভাইকের একটিমাত্র জীবনী লিখেছেন তাঁর প্রথম স্ত্রী মারীয়া। গত বৎসর আমেরিকায় এর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। যত দূর জানি, এখন পর্যন্ত এই জীবনী ভারতে এসে পৌঁছায় নি।



ভারতীয় দৃষ্টিতে আইনস্টাইনের জীবনদর্শন

ত্রিভূপুত্র শঙ্কর সেন

আইনস্টাইনের জন্ম ক্ষণকাল পূর্বের আবির্ভাব পৃথিবীতে কচিং ঘটনা থাকে। তিনি মানুষের চিন্তা-জগতে যে অভাবনীয় বিপ্লব আনয়ন করিয়াছেন, তাহার ফল কতখানি সুদূরপ্রসারী হইবে, সে সম্পর্কে কিছু বলিবার অধিকার আমাদের নাই। আমরা শুধু বিশ্ববিশুদ্ধ চিন্তে তাঁহার স্বর্গত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে পারি।

কিন্তু আইনস্টাইন শুধু একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী নহেন, তিনি পৃথিবীর অস্তিত্ব মনস্বী হিসাবেও চিরকাল আমাদের স্মরণীয় ও বরণীয়। তাঁহার দার্শনিক চিন্তাধারায় দুইজন মনীষীর প্রভাব অনস্বীকার্য—স্পিনোজা ও সোপেনহাওয়ার। স্পিনোজার সিদ্ধান্তের সঙ্গে আচার্য শঙ্করের সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য খুব স্পষ্ট, আবার সোপেনহাওয়ারের ‘মতবাদে’ উপনিষদসমূহ ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়। ঈশ্বর ও জগৎ সম্পর্কে আইনস্টাইনের ধারণাও যে অনেকটা আচার্য শঙ্করের অনুরাগী, তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা যায়।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সেন ‘শনিবারের চিঠি’র বৈশাখ সংখ্যায় ‘আইনস্টাইনের জীবনদর্শন’ বিবৃত করিয়াছেন। জীবন, জগৎ, ঈশ্বর প্রভৃতি সম্পর্কে আইনস্টাইনের ধারণা কিরূপ ছিল, এই প্রবন্ধ পাঠে তাহা জানা যায়। মহামনস্বী আইনস্টাইনের চিন্তাধারার স্বাভাব্য ও তাঁহার প্রকাশভঙ্গির সুস্পষ্টতা আমাদের মুগ্ধ করে, কিন্তু তাঁহার সকল সিদ্ধান্ত নির্বিচারে গ্রহণ করা চলে কি না সন্দেহ। আমি ভারতীয় দৃষ্টিকোণ হইতে ‘আইনস্টাইনের জীবনদর্শন’ আলোচনা করিব এবং প্রয়োজনমত শ্রীযুক্ত সেনের প্রবন্ধ হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিব।

* * *

প্রতীচ্য মনীষীদের মধ্যে অনেকেই মানুষের ধর্মবোধের উৎস সন্ধান করিয়াছেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই এক-বাক্যে বলিয়াছেন—ভয় হইতেই মানুষের মনে প্রথম ধর্মবুদ্ধির সঞ্চার হইয়াছে। বাহ্যিক সেমেটিক ধর্মসমূহের

সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত এবং ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ, তাঁহাদের পক্ষে এরূপ সিদ্ধান্তে আসাই স্বাভাবিক। মহামনস্বী আইনস্টাইনের মত ‘কুশাগ্রীষবী’ ব্যক্তিও এইরূপ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—“একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে, ধর্মমত ও ধর্মের অভিজ্ঞতা বিবিধ পরিবর্তনীয় ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভয়—সুখ, হিংসা জীবজন্তুর, নানাপ্রকার ব্যাধি ও মৃত্যুর ভয়—হইতেই আদিম মানবের ধর্মমতের উৎপত্তি।”

পৃথিবীতে সকল ধর্মের উৎপত্তি যে একই ভাবে হইয়াছে, এরূপ মনে করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। পৃথিবীর বহু মনীষী নানা ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু নানা ধর্মের মধ্যে বৈসাদৃশ্য বা বিরোধও বড় অল্প নয়। জীবন, জগৎ ও জগৎকর্তা সম্পর্কে ইহদীগণের যে ধারণা ছিল, আর্থ-জাতির ধারণা তাহা হইতে স্বতন্ত্র; আবার ভারতীয় আর্থ ও ইরানীয় আর্থের চিন্তাধারায় যে পার্থক্য রহিয়াছে, বেদ ও জেন্ড আবেস্তার তুলনা করিলেই তাহা বুঝা যায়। আমাদের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ-সংহিতা। এই ঋগ্বেদ-সংহিতায় আমরা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের নিকট প্রকাশিত যে সমস্ত ‘ঋকে’র বা ‘মন্ত্রে’র সন্ধান পাই, তাহাতে বলিষ্ঠ প্রতিষ্ঠিত আর্থমন্দের বিশ্বাসের প্রকাশ আছে, আনন্দের প্রকাশও আছে, জীবনের ও যৌবনের জয়গান আছে, অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা বা তত্ত্বদৃষ্টিও আছে, আবার অপূর্ব কবিত্ব-শক্তিরও নিদর্শন আছে, কিন্তু কোথাও নৈরাশ্র বা ভয়ের স্বর ধ্বনিত হয় নাই। পরবর্তী কালে বাহ্যিক উত্তত বজ্রের জ্বালা মহাভয় বলা হইয়াছে, বাহ্যিক সম্পর্কে উপনিষদ বলিয়াছেন—

‘ভয়াদ্ভ্যাস্মিকপতি ভয়ান্তপতি সূর্যঃ।’

ভয়াদিস্রুত বশন্ত মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥

মহানির্বাণতন্ত্র বাহ্যিক বলিয়াছেন ‘ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং’, সেই রূপ দেবতাকে ঋগ্বেদ-সংহিতায় কোথাও দেখা যায় না। ঋগ্বেদ-সংহিতা যদি আমাদের

প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ হয়, তবে এ কথা কিছুতেই বলা চলে না যে, ভয় হইতে আর্থাভ্যাসের মনে ধর্ম-বোধ জন্মলাভ করিয়াছে।

আইনস্টাইন যে ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন, সে ধর্ম অবশ্য প্রচলিত ইহুদীধর্ম বা খ্রীষ্টধর্ম হইতে স্বতন্ত্র। নিখিল জগতের নিয়ন্তা ও শাস্তা কোন জগদীশ্বরের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন নাই। ভারতীয় দর্শনে যাহাকে সগুণ বা সর্বিশেষ ব্রহ্ম অথবা ঈশ্বর বলা হয়, পাশ্চাত্য দর্শনে যাহাকে Personal God বলে, তিনি সেরূপ কোন ব্যক্তিবিশেষকে মানিয়া লন নাই। জগৎ যে কার্যকারণ-মূর্ত্তে প্রধিত অথচ মাহুষের মন ও বুদ্ধি জগতের রহস্য ভেদ করিতে পারে না—ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাঁহার মতে জগতের রহস্যবোধ এক দিকে শিল্প ও বিজ্ঞানের ও অপর দিকে যথার্থ ধর্মের উৎস। তাই যথার্থ ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নাই। তবে একরূপ যথার্থ ধর্মের অল্পভূতি পৃথিবীতে অতি অল্প লোকেই লাভ করিতে পারেন। প্রচলিত অর্থে ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর বিরোধী, ইহাদের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করা যায় না।

এখানে আইনস্টাইনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে আচার্য শঙ্করের সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য আবিষ্কার করা যায়। আইনস্টাইন সগুণ বা সর্বিশেষ ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, আচার্য শঙ্করের মতেও ঈশ্বর ‘মায়োপহিত চৈতন্য’। উপনিষদে ব্রহ্ম সম্পর্কে বলিয়াছেন—

‘যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ’।

বাক্য যাহাকে না পাইয়া মনের সহিত ফিরিয়া আসে, অথবা—

‘অস্তীতি ক্রবতোহন্তত্র কথং বহুপলভ্যতে।’

তিনি আছেন—শুধু এইটুকু বলা ভিন্ন কিরূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায় ?

—সে ব্রহ্মকে মানিতে আইনস্টাইনের কোন আপত্তি নাই। কারণ, আইনস্টাইনও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সেই সত্তার কথাই বলিয়াছেন, মাহুষের বুদ্ধি যাহার রহস্য ভেদ করিতে পারে না। অবশ্য, শঙ্করের মতবাদের সঙ্গে আইনস্টাইনের মতের বিভিন্নতাও কম নয়। শঙ্কর যে যুক্তির বলে মায়াবাদ স্থাপন করিয়াছেন অথবা জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহার সহিত

আইনস্টাইনের চিন্তাধারার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু স্পিনোজার Substance, আচার্য শঙ্করের ব্রহ্ম ও আইনস্টাইনের রহস্যময় সত্তা—হয়তো স্বরূপত অভিন্ন।

বিজ্ঞান ও ধর্মের বিরোধ সম্পর্কে আইনস্টাইন বলেন, “বৈজ্ঞানিক সমগ্র জগতে নিয়মের লীলা দর্শন করেন; তিনি বিশ্বাস করেন যে, জগৎ নিয়ম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ; কোন সত্তা যে নিজশক্তি দ্বারা ঘটনা পরস্পরকে...পরিবর্তন করিতে পারে—বৈজ্ঞানিক একরূপ ধারণাই করিতে পারেন না;...ভগবান পাপ-পুণ্য অনুসারে মাহুষকে পুরস্কৃত করেন, অথবা শাস্তি দেন—এ ধারণা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।”

আইনস্টাইন সেমিটিক ধর্মের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন, ভারতীয় ধর্মের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল না। এই সেমিটিক ধর্মের ত্রিধারা ইহুদী ধর্ম, ঈশাহী ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম। এই সকল ধর্মের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় সাধন করা চলে কি না বলা কঠিন, কিন্তু ভগবানকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া শুধু কার্যকারণের ভিত্তির উপরও যে ধর্মের সৌধ নির্মাণ করা যায়, একমাত্র ভারতবর্ষই তাহা দেখাইয়াছে। আমরা এখানে বৌদ্ধধর্মের কথা বলিতেছি। আবার শঙ্করাচার্য যে ‘অদ্বৈতবাদ’ স্থাপন করিয়াছেন উহা শুধু দার্শনিক মতমাত্র নহে; উহা একটি বিশিষ্ট সাধন-পদ্ধতি, আর এ সাধনার দ্বারা এখনও সম্প্রদায়, বিশেষের মধ্যে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়কে যদি আমরা একটি বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায় বলিয়া মনে করি তবে আমরা বলিতে পারি, ইহাদের সিদ্ধান্তের সঙ্গেও বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নাই।

সেমিটিক ধর্মে ধর্মচর্চার মূল প্রেরণা—দেহান্তে চিরন্তন স্বর্গ-প্রাপ্তির লোভ। আইনস্টাইনের মতে ধর্ম মাহুষকে পরকালে নরকের ভয় অথবা স্বর্গের লোভ দেখাইয়া মাহুষ-হিসাবে তাহার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে। ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হইলে মহামনস্বী আইনস্টাইন দেখিতেন, ভারতীয় মহাকাব্য ও পুরাণে স্বর্গ ও নরকের বর্ণনা থাকিলেও ঋষিগণ স্বর্গের লোভ দেখাইয়া মাহুষকে ধর্মে প্রবৃত্ত করিতে চাহেন নাই। ভারতবর্ষে এবং একমাত্র ভারতেই নিকাম কর্মের আদর্শ প্রচারিত হইয়াছে, ভারতের ঋষিগণ এই অভূত কথা দ্বিধাহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়াছেন

অদ্ভুত একটা বিদ্যুটে চিন্তা। ঘূটঘূটে অন্ধকারের মত কেবলই আনাগোনা করছে। নূপেন কিছুতেই চোখ বুজতে পারছে না। তার ভয় করছে রীতিমত। কিন্তু চোখ দুটো মেলে রাখারও উপায় নেই। সে বড্ড পরিশ্রান্ত।

আজ একটা জাতীয় পর্ব। ব্যাক কাছারি আপিস বন্ধ। সন্ধ্যাবেলাও ট্রামে ভিড় নেই। কিন্তু নূপেনকে ঠিকই বার হতে হয়েছে দৈনন্দিন চিন্তায়।

ট্রামের জানলায় মাথাটা কাত করা নূপেনের। হ-হ শব্দে ট্রাম বেরিয়ে আসছে গড়ের মাঠের পাশ দিয়ে চৌরঙ্গীর এদিকটায়। স্টপেঞ্জে স্টপেঞ্জে তেমন প্যাসেঞ্জার নেই।

ড্রাইভার স্পীডের ওপর স্পীড বাড়িয়ে চলছে। শব্দ হচ্ছে খট খট খট।

একজন কন্ডাক্টর আর একজনকে বলে, ফুটির চোটে আবার না অ্যাক্সিডেন্ট করে বেটা।

এসব দিকে খেয়াল নেই নূপেনের। সে যতবার চোখ বুজতে চাইছে, ততবারই তার চোখ খুলে যাচ্ছে বিদ্যুটে ভাবনায়।

সাঁ-সাঁ করে ট্রামটা এগিয়ে চলছে।

এক পাশে প্রাচীন গাছগুলোর ভিতর সামান্য আলো-ছায়া। অল্প পাশে পিচের ময়ূষ পথে বিদ্যুতালোকের বহা। তাতে দক্ষিণা বাতাস। সব ওড়না ফিরিয়ে ফিরিয়ে চলছে। ভ্রমণবিলাসীরা নেমে পড়েছে গড়ের মাঠে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের স্রমুখে একদল লোক ভেঙে পড়েছে। কি যেন তারা দেখছে সকৌতুকে।

যে, পাপের ভ্রায় পুণ্যও বন্ধনমাত্র, যেমন লৌহশৃঙ্খলের ভ্রায় স্বর্ণশৃঙ্খলও শৃঙ্খলমাত্র। বেদান্তে বলা হইয়াছে— যিনি ইহলোকে ভোগহুখের কামনা ও পরকালে স্বর্গ-প্রাপ্তির কামনা হইতে মুক্ত, তিনিই বোদ্ধান্ত পাঠের অধিকারী হইবেন।

আইনস্টাইনের ভ্রায় লোকোত্তর পুরুষ যদি ভারতের সংস্কৃতি ও ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হইতেন, তাহা হইলে তিনি স্পিনোজা ও সোপেনহাওয়ারের মত ভারতীয় চিন্তার দ্বারাও প্রভাবিত হইতেন, সন্দেহ নাই। তাহা হইলে

কিন্তু নূপেন এদিকেও চোখ ফেরাতে পারে না। তার কেবলই মনে পড়ছে, একখানা দৈনিক কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভ। বাংলা দেশে নাকি দৈনিক বন্দারোগের বলি আটটি ক'রে মাহুষ।

কি সাংঘাতিক তথ্য!

আজ সারাদিনে তেমন কিছু পেটে পড়ে নি তার। কালীঘাট থেকে বরানগর হাজ্রে হয়ে সে ঘুরেছে। তবু একটিও শিকার জোটে নি। ছপুয়ের একটু আগে মাঝ-কলকাতায় এক আত্মীয়-বাড়ি গিয়ে উঠেছিল। তারাই শুধু দৈত্যো হাসি হেসে বিদায় করেছে। তবু সে মরিয়া হয়ে আর এক বাড়ি ঢুকেছিল, কারণ পকেটে তেমন বাড়তি পয়সা নেই। এ বেলাটা এ ভাবেই চালিয়ে যেতে হবে।

একটি মহিলা বেরিয়ে এসেছিল ঘর থেকে। বাসাটার মতই শ্রীহীন তার বেশবাস।

যদি একটু আগে আসতে ভাই ঠাকুরপো! এখন কি দিয়ে কি করি বল, উলুনে তো আঁচ নেই। তা ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে এসে ব'ল।

নূপেন বলেছে, না না, আমি খেয়ে এসেছি। অনেক দিন বাদে এ পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম, খবরটা নিয়ে যাই—দাদার কি চাকরি-বাকরি হ'ল?

আর চাকরি। সে তো জরে ভুগছে আজ প্রায় দু সপ্তাহ।

ভিতর থেকে একটা যেন কাশির শব্দ পাওয়া গেল। নূপেন আর দাঁড়াল না। তার মাথাটা উঠল যেন টনটন করে। মনে হ'ল, এ বাসাটার সমস্ত জিনিসপত্র দেয়ালগুলো

ধর্ম সম্পর্কে তাঁহার ধারণার পরিবর্তন ঘটত এবং তিনি যাহাকে 'ঐশ্বর্য্য ধর্ম' বলিয়া মনে করেন তাহার উদ্ভবও যে ভারতবর্ষে সম্ভব হইয়াছিল, এই সত্য আবিষ্কার করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন। আইনস্টাইনের উদ্দেশ্যে অন্তরের গভীরতম প্রজ্ঞা নিবেদন করিয়াও আজ ঐশ্বর্য্যহীন কর্তৃক বলিব—অলোকসামান্য প্রতিভার অধিকারী এই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত যদি ভারত-আত্মার বাণীর সঙ্গে পরিচিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবনদর্শনের দ্বারা পৃথিবী অধিকতর লাভবান হইতে পারিত।

পৰ্বন্ত দৃষিত। সে সংক্ষিপ্ত কটি কথা বলে, নিতান্ত অভ্যন্তর মতই নেমে এল।

সিঁড়ির পাশেই উঠুন। নামার পথে সে দেখে এল, ঝাঁচ নেবে নি—আদৌ ঝাঁচ দেওয়া হয়েছে কি না সন্দেহ।

আর দেরি করা মোটেই উচিত নয়। পকেটে যে পয়সাই থাক, ট্রাম ভাড়া তাতে কুলাক কি না কুলাক—তাকে কিছু কিনে খেতেই হবে। শরীরটাকে এ ভাবে আর নষ্ট করা উচিত হবে না। আনা দুয়েকের মধ্যে সে এমন কি পুষ্টিকর জিনিস খেতে পারে যে, সারা দিনের ক্রম পূর্ণ হবে শরীরের?

চিন্তার কথা। রীতিমত বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন।

আলুর চপ, আলমুট, চিনাবাদামে হবে না। দু'আনার ততো আঙুর বেহানা আপেলের খোসা ছাড়া কিছু পাওয়া যাবে না। যদি একজন ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে যেত, যার কাছে অসংকোচে জিজ্ঞাসা করা যেত—এ অবস্থায় ভাই উপায় কি বলে দিতে পার?

বেলা তিনটাও বাজে নি। রোদে পুড়ে যাচ্ছে শহর। এ সময় কে দেবে উপদেশ? শোনা যাচ্ছে, ডাক্তারদের মধ্যেও বেকারির বিষ নাকি ঢুকেছে। নূপেন মনে মনেই জবাব দেয়, ছাই ঢুকেছে। ও সব শব্দের বেকার। তার মত ব্যাকশাল কোর্টের মোক্তারের মুহুরী হ'লে টের পেত। একটা ছুটো নয়, সে প্রায় দশটা মক্কেলের বাড়ি ঘুরে এসেছে। সকলের মুখে এক কথা, কোর্ট খুলুক আগে।

কেউ কেউ বলেছে, আপনার দেখি আমার চাইতেও বেশি মাথাব্যথা!

নূপেন বলেছে, তা নয় স্ত্রীর, তবে কিনা—

সে কোর্ট খোলার আগে কিছু হবে না। এ পয়সার গাছ নয়।

বেলা শেষ হয়ে গেছে, তবু কিছু পাওয়া হয় নি নূপেনের। ট্রামে উঠে সে হাতের নাড়ীটা টিপে দেখে, জ্বর এল না কি? বিকেলের দিকেই তো ও কালজ্বর আসে। হাড় মাংস কুরিয়ে কুরিয়ে খায়।

সে চোখ বুজতে পারে না। শিউরে শিউরে ওঠে। ভাগ্যিস বউদির ঘরে কিছু মুখে দেয় নি।

ট্রামটা প্রায় ভবানীপুর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে।

দ্বাদা, টিকিট?

ক্লান্ত পুষ্টিহীন করণ কঠে নূপেন জবাব দেয়, এই যে। একখানা কালীঘাট। জবাব দিয়েই নূপেন কেমন যেন আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে থাকে। যন্ত্রারোগীর এমনই তো স্বরভঙ্গ হয়।

কন্ডাক্টর বলে, কই, পয়সা বার করুন।

একে মুহুরীর পকেট—কাগজে পত্রে যেন ছোট একখানা পোস্টাফিস, তাতে মনের ঐ অবস্থা। নূপেন যেন দিশা পায় না : একটু দাঁড়ান মশাই, হয়তো পকেটমার হয়েছে।

ভাল ক'রে নূপেনের মুখখানা দেখে নিয়ে ব্যঙ্গকণ্ঠে কন্ডাক্টর জবাব দেয়, হবে না? আপনিও তো প্রায় কোম্পানির পকেট মারতে চেয়েছিলেন।

কি ক'রে?—একটু তিরিকি মেজাজে নূপেন জিজ্ঞাসা করে, কি ক'রে তা বুঝলেন?

একুনি নেমে পড়লে কে আপনাকে ধরত?

আপনিই বা আড্ডা মারছিলেন কেন ডিউটি দিতে দিতে? সেও তো এক বকম পকেট মার।

তর্ক না ক'রে এখন পয়সা দিন।

কিন্তু পয়সাই—তো পাওয়া যাচ্ছে না। পকেট-পোস্টাফিসের কাগজের স্তূপে যেন হারিয়ে গেছে। মুশকিলে পড়ে নূপেন : দাঁড়ান একটু।

খুঁজতে খুঁজতে অকস্মাৎ একখানা নোট বেরিয়ে পড়ে। সমুদ্র থেকে যেন একখণ্ড রত্ন উঠেছে : এই নিন। ভাঙানি দিন।

আজ ছুটো ডিম কিনে নিয়ে বাড়ি ঢুকতে হবে। ওর চেয়ে পুষ্টিকর কোনও খাদ্য নেই। শরীরটাকে বাঁচাতে হবেই। জীর হাতে খুঁচরো পয়সা পড়লে আর কিছু হবে না। শৈলর মোটে হিসেব নেই।

এখন রাত হয়েছে। জোড়া ডিমের অমলেট হজম হবে না। খেতে হবে হাফবয়েল। এমনি ক'রে আজকের দিনের ক্রমক্ষতি পূর্ণ ক'রে নিতে পারলে কাল থেকে রেগুলার একটা ক'রে চালিয়ে যেতে হবে। এ ভাঙানিগুলো শৈলর হাতে না পড়লে বেশ কটা দিন চ'লে যাবে।

ডাক্তার মোক্তার জঙ্গ ব্যারিস্টার বড় ছোট সব ঘরেই একমাত্র প্রতিপক্ষ শৈল। কখনও সে গয়না নিয়ে, কখনও সে কমলা নিয়ে কুরুক্ষেত্র ক'রে ছাড়ে। মুহুরী নূপেনও সেই অর্ধাঙ্গিনী শয্যাসজিনীর সঙ্গে বচসা ক'রে চলে।

সময় সময় ব্রিৎস্ক্রিগ, সময় সময় কোন্ডওয়ার—তবু কি সে পারে।

এমনি করতে করতে সে শহরে বস্তিপথে ডিমের দোকানটা পেরিয়ে আসে। গ্যাসের টিম্যানো আলো, ক্লান্ত শরীর, গাছকোমর-বাধা শৈলর সঙ্গে যেন ঐতিহাসিক সংগ্রাম—বেচারী নূপেনকে আর কি বলা যায়। সে ক্লান্ত দিলেও শৈল কথাই অ্যাটম চার্জ করতে ছাড়ে না। সারা দিন বাড়ি বসে অভাব-অভিযোগের যে বারুদখানা সে সৃষ্টি করেছে তাতে যেন নূপেন দেশলাই ছুইয়েছে।

অনেকটা এগিয়ে এসে নূপেন ভাবে, হায় রে, ডিম তো আনা হ'ল না।

তার আর কিরে যেতে ইচ্ছা করে না। কাল না হয় এবেলা ওবেলা ক'রে চারটে ডিমই খাওয়া যাবে।

কিন্তু শৈলীর ধ্বংস থেকে এড়াবার পথ কি? কি যেন কি কারণে এবার শৈল নামটার সঙ্গে একটা দ্বৈ-কার যোগ ক'রে দেয় নূপেন। অনেক বিরক্ত হ'লে আর উপায় কি? — কোনও একটা পথ উদ্ভাবন করার আগে সে মনেতে পায়, কে যেন একা একাই বলছে, না না, আমি আপিসের কাজ ছাড়তে পারি না। আপিস আমার লক্ষ্মী।

লোকটা পাগল নাকি? কে ওকে আপিসের কাজ ছাড়তে বলছে?

মাথায় একটা দেয়-হুড়ি বোঝা। হাতেও অমনি ওজনদার একটা রেশন ব্যাগ। লম্বা লোকটা যেন ধহুকের মত বেঁকে চলেছে। এ তো পাগল নয়। তবে নিশ্চয়ই ওর ঘরেও শৈলী আছে।

দেখুন মশাই, আমার আপিস লক্ষ্মী—কোনও কথাটি নেই। কেউ রাগ-কাল করে না। মনিব চমৎকার লোক। শুধু ডিউটি একটু বেশি। ঠিক নটায় হাজির হতে হয়, আর কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ছটায় ছুটি। কিন্তু মনিবের মুখখানা কি মিষ্টি!

এর গলায়ও একটা স্বরভঙ্গের আবেদন। শিউরে ওঠে নূপেন। লোকটা ভেঙে পড়বে নাকি? নূপেন ডিমের কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলে এগিয়ে যায়: হাতের বোঝাটা ধরব নাকি?

না মশাই, তা লাগবে না। নিত্য আমি এমনি নিয়ে যাই। একটা কুলীকে রোজ আট আনা দিলে

মাসে পনের টাকা লাগত। বলুন তো আমি ক টাকা পাই? তারপর রাত বারোটা পর্যন্ত বাসন মাজা, বাসায়র ধোয়া—কাজের অন্ত নেই। আবার সকাল পাঁচটায় উঠে আঁচ দিতে, দোকান খুলতে একটু এদিক ওদিক হয়ে যায়। তাই দোকানদার মশাইয়ের কেবল শ্যাচ খ্যাচ। তিনি ছটার ভিতর সব-কিট চান। বলুন তো আমি কি মাহুষ নই?

এতগুলো কথা এক সঙ্গে ব'লে লোকটা হাঁপিয়ে গেছে। সে হাতের বোঝাটা নামিয়ে, মাথার বোঝাটা একটু এদিক ওদিক ক'রে ফের বলতে থাকে, দোকানদার মশাই আপিসের কাজ ছেড়ে দিতে বলেন। আমি বলি, সেটি হবে না। মুখে রাটি নেই, অমন মনিব আমি আর পাব না। শুধু আমার একটু কষ্ট নটায় হাজিরে, আর মায়ে যাতায়াত খরচ এই দশ টাকা। আপনি কি বলেন? আমি কি আপিসের কাজ ছেড়ে দেব?

পরামর্শ দিতে হ'লে বিষয়টা একটু তালিয়ে বোঝা দরকার। নূপেন জিজ্ঞাসা করে, তুমি আপিসে কি পাও?

পঁচিশ টাকা?

সেখানে থাকো খাও?

সেখানে-খাওয়া থাকা ছাড়া আর কি দেবে, অষ্টরঙা। এই যে যাব, পাঁচটা মিনিট দোকানদার মশাই জিরুতে দেবেন না। কেবল খিচখিচ।

কিসের দোকান?

ভেবেছেন কি জুয়েলারি? চায়ের দোকান।

আপিস?

ওনেছি, ওরা নাকি বিলেত থেকে মাল আমদানি করেন। তবে কখনও কিছু চোখে দেখি নি। কিন্তু বেশ ভব্য সভ্য কিটফাট।

বাড়িটা এগিয়ে এসেছে। নূপেন ভিতরে ঢুকে হাঁক ছেড়ে বাঁচে। সৌভাগ্যের বিষয় কোনও পরামর্শ দিতে হয় নি। কিন্তু লোকটার সকাতর প্রশ্ন এখনও যেন কানে বাজছে।

অঙ্ককার একটু উঠান। ভাঙা পিচ্ছিল কলতলা। নূপেন হিসেব ক'রে পা ফেলে। মাথাটা নোয়ায় কাধঘিনী-দির ভাঙা খোলার চালের কাছে এসে।

কাধঘনীদি জিজ্ঞাসা করেন, কে?

আমি নূপেন।

এত দেরি যে ?

আর বলেন কেন। আমরা যে বেকলে ফিরে আসি

এই যথেষ্ট।

ও-কথা বলতে নেই ভাই, বলতে নেই। ঘাট, তোমরাই তো আশা।—কাদম্বিনীদি বলেন, বড় আধার, একটু সাবধান হয়ে যেয়ো।

নূপেন সাবধান হয়েই সোজা গিয়ে নিজের ঘরে ওঠে। উঠেই বিপদে পড়ে।

বারান্দায় একজন লোক বসে। বেশ ভদ্রগোছের চেহারা।

উনি কে শৈল ?

আমাকে হু হাত ধরে এমন জায়গায় শৈল টেনে নিয়ে যায় যে, বাইরের লোকটির দৃষ্টি না পড়ে, ওদের কথা-বার্তাও তার কানে না ঢোকে।

শৈল বলে, একটা অস্ত্রায় করেছি। বড় কাকুতি মিনতি করলেন কিংনা তাই—

কি অস্ত্রায় ?

তুমি জামা কাপড় বদলে সুস্থ হও। বলছি।

নূপেন মনে মনে বললে, সে হচ্ছে না। জামা সে কিছুতেই খুলবে না। কাপড় সে একবার কেন একশোবার ছাড়তে রাজী। কিন্তু এমনি করেই নিত্য নাটক শুরু হয়। শেষে থামে পঞ্চম অঙ্কে গিয়ে।

চুড়ি কিনেছ বুঝি ?

না গো না। এই দেখ হাত দুখানা।

ঠিক পূর্বের মতই খালি। নূপেন আশস্ত হয়। কিন্তু বুকটা টনটন করে ওঠে। নেই বলতে যে দুগাছা শাঁখাও ঠিকমত নেই। কবে যেন ডান হাতের গাছা ভেঙে গেছে।

উনি কে ?

চিনাবাদাম ফেরি করেন। রোজ আমাদের বাড়ি আসেন।

কেন ? বাড়ির ভিতর আসবে কেন ?

অন্ত দিন হলে শৈল একুনি একটা হাইড্রোজেন না

হ'লেও অ্যাটম বোমা ছেড়ে দিত। আজ বলে, দুশো বড় বড় ঘুঁটে কিনেছি। একুনি ওকে চোন্দ আনা পয়সা দিতে হবে।

তুমি কি জান না ঘরে চাল বাড়ন্ত ?

জানি গো, জানি। জেনে শুনেও সময় সময় মাহুঘের উপায় থাকে না।

আচ্ছা, আমিই উপায় বাতলে দিচ্ছি। যত সব—

আর রাগ চাপতে পারে না নূপেন। বেরিয়ে আসে শৈলর হাত ছাড়িয়ে : তুমি কি বাপু জ্বোজোরির জায়গা প্রাণ্ড না। ঘরে চাল নেই, ঘুঁটে গছিয়েছ মেয়ে-লোক পেয়ে।

না বাবু, বড় ঠেকা। নইলে কি কাঠের শুঁড়ো দিয়ে অমন পুর ঘুঁটে তৈরি করেছিলাম বেচতে। যদি একান্তই না রাধেন, বউদিকে কিছু বলবেন না।

এখানেও সেই স্বরভঙ্গের আকৃতি, স্তম্ভের দাঁত ছুটা ভাঙা। চোখের কোটরে গভীর কালি। নূপেন যেন একটা ধাক্কা খেয়ে থামে। পকেটে হাত দিয়ে সময় ভাঙানি বার করে দেয়।

চিনাবাদামওয়াল চলে যায় সহস্র কৃতজ্ঞতা জানিয়ে। বর্ষাকালের জ্বালানি সে নিতান্ত দায় ঠেকেই না সস্তা দামে বেচল গ্রীষ্মকালে।

সকালবেলা ঘুঁটে পুড়ছে। নূপেন আতঙ্ক কাটিয়ে উঠেছে।

জ্বর দিকে চেয়ে যুহু যুহু হাসছে। ডিমের অমলেট নয়, এমনি শৈল ঘরে আছে বলেই সে হয়তো আজও বৈচে আছে।

কিন্তু একটু বাদেই সে আবার গম্ভীর হয়ে যায়। বিগত দিনের স্মৃতি একটি একটি করে তার চোখের সমুখে ফুটে ওঠে। শৈলর মূল্যমান অনস্বীকার্য হ'লেও হঠাৎ যেন তার কাছে ফিকে হয়ে আসে। কারণ এ সর্বগ্রাসী স্বরভঙ্গের একমাত্র অমোঘ ঔষধ শৈল নয়। মুহুরী নূপেনের মনে পর্যন্ত নূতনতর প্রতিবেশকের দাবি পৌছেছে।

প্রসঙ্গ কথা

সাহিত্য ও সমাজচেতনা

নারায়ণ চৌধুরী

সাহিত্যের সহিত সমাজচেতনার যোগ অতি নিগূঢ়। সাহিত্য সমাজমনের দর্পণ, সেই কারণে সাহিত্যের উপর সমাজভাবনার প্রতিফলন অবশ্যস্বাভাবিক ও বাহ্যনীয়। সাহিত্যের বাজারে 'বিশুদ্ধ সাহিত্য' বলে যে একটি কথার প্রচলন আছে, তার বাস্তব ভিত্তি কিছু আছে কিনা প্রশ্নেহ। কেন না, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কোনও কালে সমাজ-নিরপেক্ষ ছিল না, আজও নেই, আর ভবিষ্যতেও যে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না সে কথা বলাই বাহুল্য। মহাকাবি বাঙ্গালী বা কবি কালিদাসের কাব্য-নাট্যাঙ্গী আপাতবিচারে নিছক সৌন্দর্য্যবর্ণন বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তাদের ভাষায় গভীর সমাজভাবনার স্রোত প্রচ্ছন্ন ধারায় প্রবাহিত। প্রাচীন কবিদের এই বৈশিষ্ট্য স্কুলদৃষ্টি পাঠকের চোখে ধরা না পড়তে পারে, কিন্তু ধীরেই রচনার বাহু অক্ষরসজ্জা ভেদ করে গভীরে দৃষ্টিসঞ্চালনের ক্ষমতা আছে, তাঁরাই এ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাবেন। অমর মহাকাব্য মহাভারতের কথা এখানে উল্লেখ করব না, কেন না, মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনী, কল্পনা ও চিন্তার মধ্যে যে তৎকালীন সমাজভাবনা ওতপ্রোত হয়ে আছে—এ কথা সাহিত্যের প্রাথমিক ছাত্রও জানেন। মহাভারত প্রাচীন ভারতের একটি বিশেষ যুগের প্রবর্তমান সমাজচৈতন্তের বহিঃপ্রতিচ্ছবি—এটি একাধারে কাব্য, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র। মহাভারতকে যদি মহাকাব্যের উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে গণ্য করা যায়, সাহিত্যে সমাজচৈতন্তের অবতারণার সার্থকতা সন্দেহ আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

মধ্য এবং আধুনিক যুগের সাহিত্য থেকেও সমাজ-চেতনাসম্পৃক্ত সাহিত্যের ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যায়। কবিকুলচূড়ামণি দাস্তুর 'ডিভিনা কমেডিয়া' মূলত প্রেম-কাব্য, কিন্তু এ কাব্যের অন্তরালে আছে সম্প্রতি সমাজ-চৈতন্তের ছোতনা। দাস্তুর তাঁর দেশের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের পুরোধায় ছিলেন, শুধু তাই নয়, অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক জিম্মাকলাপের জন্ত তাঁকে স্বদেশ থেকে

নির্বাসন বরণ করে নিতে হয়েছিল। এ হেন কবির কাব্য বিশুদ্ধ সাহিত্যে স্থিতমতি হলেও শেষ পর্যন্ত তা সমাজ-ভাবনার দ্বারা অল্পপ্রাণিত হতে বাধ্য, বস্তুত দাস্তুর বেলায় তাই হয়েছিল। শেক্সপীয়ারের সাহিত্যের উপর এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডের সমাজচিন্তার ছাপ অতি স্পষ্ট। ইংরেজ জাতির বাণিজ্যিক ও সাম্রাজ্যবাদী প্রসারের মুখে শেক্সপীয়ারের উদ্ভব। তৎকালীন ইংলণ্ডের ভাবের পরিমণ্ডল অমিত আশাবাদে পূর্ণ। এই আশাবাদ আর উৎসাহ স্বতই শেক্সপীয়ারের সাহিত্যের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ বিষয়ে অধিক কিছু বলবার অবকাশ এখানে নেই; তবে অহুসঙ্কিত পাঠকের পক্ষে বিষয়টি চমৎকারিত্ব-পূর্ণ ও বিশেষ অহুধাবনযোগ্য। একটা যুগের ভাবধারা, ধ্যানধারণা, আদর্শ কি ভাবে সেই যুগান্তিত সাহিত্যকে প্রভাবিত করে, উনিশ শতকীয় ইংরেজ সমালোচক সারু ওয়াল্টার র্যাগে এলিজাবেথীয় সাহিত্যের উপর তৎকালীন নাবিক পর্যটকদের প্রভাব-বর্ণন প্রসঙ্গে সে কথা অতি বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করে বুঝিয়েছেন। কৌতূহলী পাঠককে তাঁর সেই প্রতীতিমূলক নিবন্ধটি পড়ে দেখতে অহুরোধ করি।

অন্তপক্ষে, কবিশুদ্ধ গ্যোটে সংগ্রামবিক্ষুব্ধ সমাজভাবনার তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে শেষ অবধি চিন্তাস্বৈর্য ও শাস্তির উপকূল-রেখার সন্ধান পেয়েছিলেন। আটকেই তিনি জীবনের চূড়ান্ত আশ্রয় জ্ঞান করেছিলেন। রোমান্টিক আন্দোলনের শীর্ষাধিপতি হিসাবে গ্যোটের সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ; তখনও ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয় নি, কিন্তু ওই অশান্ত ঝটিকার পূর্বাভাস ইউরোপের সর্বত্র পরিষ্কৃত। সাহিত্যের মাধ্যমে এই অশান্ততারই নায়কত্ব করেছিলেন গ্যোটে তাঁর প্রথম জীবনের রচনায়। কিন্তু গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গ্যোটে এ জাতীয় সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আলোড়নের সার্থকতার সন্ধান হতে পড়েন এবং ক্রমশ তাঁর মন রোমান্টিসিজমের

উদ্ভাস উজ্জ্বলতা থেকে প্রত্যাহত হয়ে ক্লাসিকাল আদর্শের অন্তর্নিহিত সংঘম, স্থিতি ও স্থৈর্যের সংস্কারটিকেই গভীরতর নিষ্ঠায় আঁকড়ে ধরবার জন্ত উন্মুখ হয়েছিল। বিদ্রোহী ভাবুকমূলত বঙ্গাধীন আবেগাকুলতা থেকে ধ্বংসলভ আত্মসমাহিত প্রশান্তির স্তরে উত্তরণ গ্যেটের জীবনে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আত্মজিজ্ঞাসা, সমাজবীক্ষণের মধ্য দিয়ে সংসাধিত হয়। এ জন্তে তাঁকে যে মানসিক যন্ত্রণা সহিতে হয়েছিল শিল্পীর ব্যক্তিবিকাশের ইতিহাসে তার বুঝি তুলনা নেই। গ্যেটের জীবনে এই যে গভীর বিক্ষোভ ও প্রকোভ, যার দরুন তিনি এক শিল্পাদর্শ থেকে আর এক শিল্পাদর্শে উত্তীর্ণ ও আশ্রয়প্রাপ্ত হয়েছিলেন—এ শুধু সম্ভব হয়েছিল গ্যেটের তীব্র সমাজচেতনার জন্ত। তাৎকালিক সমাজজীবনের গতি ও প্রকৃতি গ্যেটে নিবিড় অভিনিবেশের সহিত লক্ষ্য করেছিলেন বলেই তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে বিষয়বস্তুর মহিমার সঙ্গে সঙ্গে মননের এমন প্রগাঢ়তা, অহুভূতির এমন প্রাবল্য পরিদৃষ্ট হয়।

দূরের দৃষ্টান্তে কি প্রয়োজন, হাতের কাছে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত বিচরমান। ওই নজীরের সাহায্যেও একই প্রতিপাত্তে উপনীত হতে পারা যায়। কবি বাংলা দেশের প্রবহমান সমাজভাবনার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। ভারত-বর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন-আলোড়নের ছন্দের সঙ্গে তাল রেখে রবীন্দ্রমানসও অহরূপ ঢঙে বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যজীবনের মধ্যবর্তী স্তরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিলেন। স্বদেশী যুগের রবীন্দ্রনাথ পূরাপূরি স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু দেখা গেল, জাতীয়তাবাদী সংস্কার রবীন্দ্রকল্পনাকে স্বীয় গভীর ভিতর বেশিদিন ধরে রাখতে পারল না, কবির উদার বিশাল ভাবনা জাতীয়তাবাদের সঙ্কীর্ণ বন্ধন অতিক্রম করে আন্তর্জাতিকতায় মুক্তি পেল। শুধু তাই নয়, সনাতন ভারতের ব্রহ্মণ্য আদর্শের প্রতি গভীর অনুরাগ দিয়ে যে কবিজীবনের শুরু, সেই কবিজীবন সমসাময়িক কালের প্রবহমান সমাজভাবনার চেউয়ে চেউয়ে তুলতে তুলতে সমাজতত্ত্ববাদে এসে নির্ভরযোগ্য মানসিক আশ্রয় পেল। কবির মন ছিল অতিশয় সচল, কোথাও তাঁর ভাবনা স্থির হয়ে থাকে নি, ক্রমাগত নিজে থেকে রূপান্তরিত করতে করতে

জীবনের শেষ ধাপে এসে তিনি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর জীবনভঙ্গির গুরুতর মৌলিক ভেদ সাধিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের মানসিকতা আর শেষ বয়সের মানসিকতায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য। প্রথম বয়সে কবি রক্ষণশীল, শেষ বয়সে সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত। কবির মানসিকতায় এই যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন, এ পরিবর্তন গ্যেটের মানসিক জীবনের রূপান্তর অপেক্ষা কোন কম অংশে দূরপ্রসারী নয়। গ্যেটে রোমান্টিক আদর্শ থেকে ক্লাসিকাল আদর্শে সমুত্তীর্ণ হয়েছিলেন; রবীন্দ্রনাথ সংস্কারবদ্ধতা থেকে সংস্কারমুক্তিতে সমাপীন হয়েছিলেন। ঋতিয়ে দেখতে গেলে এই দুই মহাকবির মানসিক রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে বিপরীতমুখী প্রক্রিয়া বলতে হয়, তবে দুইয়ের বেলাতেই যে পরিবর্তনের মূলে গভীর সমাজচেতনার পোষকতা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। কবিরা স্বভাবত কল্পনাবিলাসী বটে; কিন্তু অব্যাহতি-বাদের গজদন্ত-মিনারে আত্মগোপন করে কল্পনায় শান দিলে সে কল্পনায় ধার ওঠে না—এ একটি পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা। সমসাময়িক সামাজিক-রাষ্ট্রিক আলোড়ন-বিলোড়নের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থেকে অনেক জিজ্ঞাসা অনেক সংশয় অনেক বেধনার লবণাক্ত সমুদ্র সাঁতারে পার হ'লে তবেই শুধু কবিকল্পনা যথার্থ শিল্পরশোভী হয়ে উঠতে পারে। বৃহত্তর জীবনের অভিজ্ঞতার রঙে যে কল্পনা ছোপানো নয়, সে কল্পনা শিকড়বিহীন স্তবরাং অসাড়। কল্পনার রঙ পাকা করতে হ'লে জীবনের গভীরে ডুব দিতেই হবে।

২

আমাদের স্থানিকিত অভিমত এই, আজকের দিনের প্রতিটি শিল্পী সাহিত্যিক ভাবুকের পক্ষে গভীরভাবে সমাজ-সচেতন হওয়া দরকার। নইলে এ কালের পরিপ্রেক্ষিতে বাস করে শিল্পচর্চার অধিকার দৃশ্যত কারও জন্মায় না। বর্তমান যুগ দ্বিধা সংশয় জিজ্ঞাসা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব-সমাজ্য যুগ, বহু বিচিত্র পরস্পরবিরোধী ভাবাদর্শের সংঘাতে আধুনিক মানুষের মন আলোড়িত। এই আলোড়ন-বিলোড়ন দ্বারা যে মন স্পন্দিত হয় না, সে মন শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে অন্তত প্রবেশাধিকার লাভের অহুপযুক্ত। এ কালে বাস করব অথচ এ কালের দাবি মানব না—শিল্প-সাহিত্যের অহুশীলনে নিযুক্ত থেকে অন্তত এ প্রকার জেদ

শোভা পায় না। শিল্পী সাহিত্যিক ভাবুক শ্রেণীর মানুষের পক্ষে সমাজচেতনার দ্বারা লালিত হওয়ার আবশ্যকতা বরাবর ছিল, বর্তমানে সে প্রয়োজন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। যুগ-প্রভাবের জড়ই এ রকম হয়েছে। তাই যদি হয়, তবে কোন যুক্তিতে আমরা বৃহত্তর রাষ্ট্রিক-সামাজিক উপপ্রবণতায় পরিস্থিতি সম্পর্কে অচেতন থাকব, এবং সেই অচেতনত্বের অহঙ্কারকে প্রকাশ করব 'বিশুদ্ধ সাহিত্য'রূপ অবাস্তব এক বস্তুর ততোধিক অবাস্তব জয়ঘোষণার দ্বারা? সাহিত্য কি শুধুই (কাব্যে) আত্মকেন্দ্রিক প্রেমের বিঘোষণা, (কথা-সাহিত্যে) পদীপিসি আর নকুড়মামার তুচ্ছাতিতুচ্ছ দিনগত পাপক্ষয়ের কাহিনী, (নাটকে) তরুণ-তরুণীর দেখা-মাত্র-প্রেম-উপজ্বলিত গোছের ঘটনার নাট্যরূপায়ণ, (প্রবন্ধে) সমাজভাবনানিরপেক্ষ আত্মজিজ্ঞাসাহীন তথাকথিত রম্যরচনা বা সাহিত্য-সমর্ভ সংরচন, এবং (সমালোচনায়) রাজনীতি ও সমাজনীতি-অচেতন প্রগতিবিমূখ নিছক সাহিত্য-সমালোচনা? এ রকম খণ্ডিত ধারণা বাংলা-সাহিত্যে বারে বারেই প্রদর্শন পেয়েছে বলে বাংলা-সাহিত্য বন্ধিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের নিরলস সেবা সত্ত্বে আজও পর্যন্ত মূলত কুপমগ্নক রয়েছে, দেশের ও মহাদেশগুলির বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে আজও অবধি তার জীবন্ত যোগ সাধিত হতে পারল না। বাংলা কথা-সাহিত্যের বিস্তৃত পরিসরের ভিতর এক ধরনের রচনা আছে, যা পড়লেই অন্তরাঙ্গী বৃহত্তর সঙ্গে মহত্তর সঙ্গে যোগ হারিয়ে ক্ষুদ্র সংস্পর্শ-প্রভাবাৎ সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। বৃহত্তর জীবনের ছন্দের উত্থানপতনের সঙ্গে যে মন ওঠানামা করে তেমনি মনের অধিকারী নায়ক-চরিত্রের (যেমন গোরা) জীবনে ভালবাসার মাহাত্ম্য বুঝি, কিন্তু যে নায়ক বহির্বিষয়ের যোগ-সংস্পর্শহীন পরগাছা-সমাজের একজন প্রতিনিধি মাত্র, কিংবা বৈচিত্র্যহীন নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের সম্ভ্রান তার প্রেম কত আর মহত্ত্বমণ্ডিত হতে পারে? আধুনিক কথা-সাহিত্য পারিবারিক বা ব্যক্তি-জীবনের নিখুঁত বাস্তবনিষ্ঠ প্রতিরূপ হওয়াই যথেষ্ট নয়, তার মধ্যে বৃহৎ জীবনের বেগ সঞ্চারিত হওয়া দরকার। রাষ্ট্রিক ও সামাজিক স্তরে চিন্তার যে সকল স্রোত ও প্রতিস্রোত গণমনকে আলোড়িত করে বহমান, তার অন্তত একটা স্পষ্ট আভাস রচনায় উদ্ভাসিত হওয়া দরকার। তা নয়তো স্বীকৃত লিপিকুশলতা সত্ত্বে সাহিত্যরচনা তুচ্ছতার পাকে জড়িয়ে পড়ে এবং তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

আজকাল একটা কথা উঠেছে, সাহিত্য রাজনীতির বাহর দ্বারা গ্রস্ত হবার উপক্রম হয়েছে, সাহিত্যকে রাজনীতির কলুষস্পর্শ থেকে বাঁচানো দরকার। এ জাতীয় ভীতিগ্রস্ত রব তাঁরাই উত্থাপন করেন যাদের মনের উপর বৃহত্তর সমাজজীবনের আলোড়ন-বিলোড়নের ছন্দ দাগ কাটে না, এবং যারা স্বীয় মনোমত ব্যাখ্যা অমুযায়ী সাহিত্যকে একটি বিশেষ কলাকুশল শ্রেণীর ক্ষুদ্র গণ্ডিবদ্ধ বিহারক্ষেত্র বলে মনে করেন। এঁদের চোখে দৃশ্যত সাহিত্য হ'ল ক্রমাগত অভ্যাসের দ্বারা লিপনক্ষমতা পরিমার্জন ও শাণিতকরণের একটি সংরক্ষিত এলাকা, এই এলাকায় সমাজভাবনা তথা রাজনীতিমনস্তত্ত্বের অনুপ্রবেশ যত কম ঘটে তত সাহিত্যের স্ফুটতারক্ষার পথ প্রশস্ততর হয়। এটিও এক ধরনের অদার আত্মবিলাস। তৈলতণ্ডূলবস্ত্রেন্দ্রচিন্তালাবিত দৈনন্দিন রাজনীতি তুচ্ছ প্রাত্যহিকতার আবশ্য দ্বারা শিল্পীমানসকে নিম্নগামী করে সে কথা মানব, কিন্তু রাজনীতির একটি উদারতর দিকও আছে। সেই দিক দিয়ে রাজনীতি আধ্যাত্মিক অভীর্ষাযুক্ত এবং মহত্তর সমাজকল্যাণ-ভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত। গূঢ় অর্থে রাজনীতি শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদেরই একটি অংশ মাত্র। রাজনীতির এই তাৎপর্য সম্পর্কে শিল্পী-সাহিত্যিকদের অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। রাজনীতির যেটি হাতে-কলমে পরীক্ষণের দিক, সেই প্রায়কটিকাল সমাজদেবামূলক তৎপরতায় সাহিত্যিকের উত্তম ক্ষরিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয় (অবশ্য যার সৈদিক সহজ প্রবণতা আছে তাঁকে বাধা দেবারও কোন যুক্তি দেখি না), তবে রাজনীতির জাতীয়, আন্তর্জাতিক, সামাজিক তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত থাকা একালীন আবহাওয়ায় নিখাসগ্রহণকারী শিল্পী-সাহিত্যিকের কোন মতেই শোভা পায় না। শিল্পী যে পরিমাণে নিজেকে বৃহত্তর জীবনের স্রোতোধারা থেকে বিমুক্ত রাখবে, সে পরিমাণে তার কল্পনা ও মনন দ্রবিত্বতর হবে। তৎসৃষ্ট শিল্পকর্মও তদনুপাতে শূন্যগর্ভ থেকে যাবে। রাজনীতিক ভাবনাকে বাদ দিয়ে যেমন জীবনে চলা যায় না, তেমনি সাহিত্যেও চলা সম্ভব নয়।

রাজনৈতিক তৎপরতায় শিল্পী-সাহিত্যিক সংস্কৃতি-কর্মীর প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের কতকগুলি বাস্তব অসুবিধা

আছে। এতে লেখক-মন বিক্ষিপ্ত হয়, বাধাগ্রস্ত হয়। শিল্পীর একনিবিষ্ট চিন্তন-মনন-অধ্যয়নের জন্ম যে শাস্ত্র অনাহত পরিবেশ দরকার, দৈনন্দিন রাজনীতির সঙ্গে কাঁধ-বোঁধাঘেঁষির ফলে তা প্রায়শ অনায়ত্ত থেকে যায়। চিন্তা-কল্পনাকে সংহত করবার জন্মেই শিল্পীর পক্ষে দৈনন্দিন রাজনীতি থেকে কিয়ৎ পরিমাণে দূরে থাকা দরকার। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, প্রবহমান রাজনৈতিক ভাবাদর্শ ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি অধ্যয়নের ক্রেশ স্বীকার না করে শিল্পী স্বয়ংরচিত আত্মকেন্দ্রিক বিবরের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থাকবেন। আমাদের কথা হ'ল—শিল্পী, তুমি রাজনৈতিক মিছিলের ভিড়ের মধ্যে মিশে যেয়ো না, কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়িয়ে মিছিলের প্রকৃতি, গতিবেগ, চলার চন্দ্র পর্যবেক্ষণ কর। তোমার হাতে ঝাণ্ডা বিলম্বিত না থাকলেও ক্ষতি নেই, কাঁধে হাতিয়ার উত্তত না হয় নাই রইল; তোমার লেখনীই তোমার হাতিয়ার, আর সেই হাতিয়ারেরই অত্মনিরপেক্ষ ব্যবহার তোমার কাছে আমরা প্রত্যাশা করব। কিন্তু সে লেখনী যেন মসীজীবী কেরানীর হস্তধৃত কলম না হয়, স্থলর অথচ বোধবুদ্ধিহীন হাতের লেখাতেই যেন তার সমস্ত কৃতিত্ব নিঃশেষিত না হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিক-ভাবুকের দল কয়জন এ কথা স্মরণ রাখেন? বাক্যটি কিঞ্চিৎ রুচ হ'লেও যোগ না ক'রে পারছি না যে, এখনও পর্যন্ত আমাদের অধিকাংশ শিল্পীর চেতনা ক্ষীণবল মধ্যবিন্ত মানসিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন, ব্যক্তি ও পরিবার-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির উৎসর্গ তাঁদের কল্পনা প্রসারিত হতে দেখা যায় না।

আমাদের কম্যুনিষ্ট শিল্পীবন্ধুদের রচনারীতি সম্পর্কে দুই-একটি কথা এই স্থলে বলা আবশ্যক। কম্যুনিষ্ট শিল্পীদের রচনাদর্শের প্রায়ই যে আমরা সমালোচনা করি সে একজন্মে নয় যে, তাঁরা রাজনীতিসচেতন, সে একজন্মে যে তাঁদের রচনায় শিল্পের স্বকীয় সৌন্দর্যোৎকর্ষের দাবি প্রায়শ অপরিপূরিত থাকে। শিল্পের একটা নিজস্ব ধর্ম আছে, রাজনৈতিক প্রয়োজনসিদ্ধির উগ্র তাড়নায় তাকে বিস্মৃত হওয়ার যুক্তি নেই। ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে আমাদের বিভেদ আছে। কিন্তু কথাটার পাছে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় সে জন্মে বলি, রাজনৈতিক

মতাদর্শের ভালমন্দের ক্ষেত্রেই এ বিভিন্নতা সীমাবদ্ধ, খোদ রাজনীতি বস্তুটির সঙ্গে আমাদের কোন বিবাদ নেই। বরং এই বললেই আমাদের মনোভাব পরিষ্কার ক'রে বলা হবে যে, রাজনৈতিক সচেতনতাকে আমরা মনের সচলতার প্রমাণ ব'লে মনে করি, এবং তার গতিকে কতিপয় শর্তসাপেক্ষে প্রগতিমুখী গতি জ্ঞান করি। দেশের নির্ধারিত শোষিত অবস্থানিত শ্রেণীর মাহুষের স্বাধ-দুঃখ বেদনা-ব্যথা আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ সাহিত্যের মাধ্যমে যত বেশি নিষ্পন্ন হবে, তত সাহিত্যের বিষয়বস্তুর পরিধির সম্প্রসারণ ঘটবে এবং তত সাহিত্যের কল্যাণ। শুধু দেখা দরকার, এই রূপায়ণ যেন শিল্পের স্বধর্মনির্দেশিত সৌন্দর্যোৎকর্ষের মানদণ্ড-উত্তীর্ণ হয়। রচনা শিল্পরসোত্তীর্ণ না হ'লে কিছুই কিছু নয়।

এইখানে একটি আপাত-অদ্ভুত কথার অবতারণা করব, কিন্তু কথাটির যৌক্তিকতার আমি মনে প্রাণে বিশ্বাসী। সেটি এই যে, শিল্পীর ভিত্তর প্রগতিশীলতা ও ঐতিহ্যনিষ্ঠ সংরক্ষণশীলতার পাশাপাশি অস্তিত্ব সম্ভব, এবং একমাত্র এই সহ-অস্তিত্বের ভিত্তিতেই বোধ হয় শিল্পীর শিল্পকর্ম স্বার্থ সার্থকতামণ্ডিত হয়ে ওঠার শক্তি রাখে। মন্তব্যটির আরও ব্যাখ্যা দরকার। সমাজভাবনার ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক মতবাদের দিক দিয়ে আমরা প্রগতিশীল আদর্শের সমর্থক, কিন্তু ওই আদর্শের হুঁ শিল্পসম্মত রূপদানের প্রক্ষেপে আমরা ঐতিহ্যচর্চার পক্ষপাতী। শিল্পের সার্থক প্রকাশক্ষমতা সশ্রদ্ধ ঐতিহ্যচেতনা ব্যতিরেকে অধিগম্য হবার নয়। প্রগতিশীল ভাবাদর্শ অন্তরে পোষণ ও লালন করাটাই শিল্পীর পক্ষে যথেষ্ট নয়, তাকে উপযুক্ত শিল্পরূপদানের কলা-কৌশলটিও আয়ত্তের মধ্যে থাকা চাই। পূর্বসূরীদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা ভাবপ্রকাশের উপযোগী যে ভাষাভঙ্গি ও শিল্পবোধ আয়ত্ত করেছি, তাকে বিধিমতে অহুশীলন না করলে অতি বড় বিপ্লবাত্মক প্রগতিশীলতাও দুর্বল প্রকাশরীতির চড়ায় ঠেকে বানচাল হয়ে যেতে বাধ্য। হয়েছে থাকে।

এইখানেই কম্যুনিষ্ট শিল্পীবন্ধুদের যত গেরো। তাঁরা ঐতিহ্যচর্চা না ক'রেই রাজনীতি নিয়ে দাপাদাপি শুরু করেন। পুনরায় বলি, তাঁদের রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে আমাদের প্রত্যয়গত বিভিন্নতা আছে, কিন্তু তাঁদের

রাজনৈতিক চেতনারূপ মানসিক বৈশিষ্ট্যটিকে আমরা দোষাবহ মনে করি না। বরং হেজি-পেজি মধ্যবিত্ত লেখকদের সমাজভাবনানিরপেক্ষ পরিবারকেন্দ্রিক দৃষ্টি-ভঙ্গির তুলনায় তাঁদের এই বৈশিষ্ট্যটিকে আমরা আশার লক্ষণ ব'লে মনে করি। মেয়েরা যেমন শাড়ি-গয়না পেলেই খুশি, আর কিছুতে তাঁদের মন ওঠে না, তেমনই আমাদের সাহিত্যে কিছু সংখ্যক প্রবীণ ও নবীনবয়সী লেখক আছেন যারা বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের এই তুচ্ছ বস্তু-প্রীতির অস্বাভাবিক মানসিকতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। আটপোরে পরিবার-জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনার চিত্রণে শক্তিকর্ম করা ছাড়া তাঁরা তাঁদের সাহিত্যিক উচ্চম নিঃশেষিত করার আর কোন পথ খুঁজে পান না। হতে পারে তাঁদের রচনা ভাষায় ও প্রকাশভঙ্গিতে শিল্পরসায়িত, কিন্তু নারীগাজলোভিত গহনার মতই তা উজ্জ্বল, অথচ প্রকৃত বিচারে মূল্যহীন। সহ্যাসির ছেলের অন্নপ্রাশনের গুচ্ছগুচ্ছ বর্ণনা কিংবা সেজঠাকুরপোর বিয়ে পাঠানো তথ্যের দীর্ঘ ফিরিস্তি দাখিল বাংলা গল্প-উপন্যাসে ঢের হয়েছে, আধুনিক বাঙালী পাঠক এ-জাতীয় অকিকিৎ-করত্বের অত্যাচার থেকে মুক্তিলাভ ক'রে বাঁচতে চায়।

সেই দিক দিয়ে কম্যুনিষ্ট লেখকদের সংস্কারমুক্তির প্রয়াস অভিনন্দনের যোগ্য। কিন্তু প্রথমেই ব'লে নিয়েছি, একটা বড় রকমের মূল্যের বিনিময়ে তাঁরা এই প্রগতি-শীলতার বোধ অর্জন করেন। তাঁদের ঐতিহ্য-চেতনা দুর্বল। তাঁদের শিল্পবোধ খণ্ডিত। তাঁরা আদর্শের ক্ষেত্রে পরনির্ভর। তাঁরা জাতির পরস্পরাগত শিল্প ও সাহিত্যের পুরাতন সংস্কারটিকে ভাল ক'রে আত্মস্থ না ক'রেই প্রগতিশীলতার ধ্বজা বহনের আকুলতা প্রকাশ করেন। পূর্বোক্ত লেখকদের যেখানে শক্তি, সেখানে এঁদের অপূর্ণতা। প্রথমোক্তদের শিল্পবুদ্ধি পাকা, দ্বিতীয় দলের শিল্পবোধ পল্কা। অল্প পক্ষে প্রথম দল ভাবজীবনের ক্ষেত্রে কুপমগ্ন, গৃহবদ্ধ, নিতান্ত মধ্যবিত্ত; দ্বিতীয় দল তুলনায় অনেক বেশি সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির গৌরব লাভি করতে পারেন। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এ দুই দৃষ্টিকোণের কোনটিতেই সম্পূর্ণতা নেই, আংশিক বিচ্যুতির দোষে দুই-ই সমান দুষ্ট। উভয় দৃষ্টিভঙ্গির সার্থক সমন্বয়ের মধ্যোই একমাত্র শিল্পকর্মের

প্রকৃত উৎকর্ষ নিহিত। প্রগতিশীল সমাজভাবনার সঙ্গে ঐতিহ্যচেতনাকে যুক্ত করতে পারলে শিল্পদৃষ্টির আর মার নেই।

৩

প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজভাবনা দুর্বল ছিল, সেটি তাঁর সাহিত্যের এক মস্ত বড় অপূর্ণতা। তিনি সহজাত কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন এবং সে কবিত্বশক্তি ছিল অতি উচ্চস্তরের। স্বর্গস্থলিত দেবশিশুর ছায় নিষ্পাপ নিষ্কলুষ শিল্পীমনের প্রকাশ দ্বারা তিনি তাঁর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ক'রে গেছেন। সমাজের শত-করা নিরেনবুই জন মানুষের অনায়াস এক ধরনের সরল মৌলিক সৌন্দর্যবোধ তাঁর মানসিক গঠনের ভিতর সহজাত ছিল এবং এই সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে যথার্থ মানবপ্রীতি যুক্ত হয়ে তাঁর রচনাকে রসিকসুজনদের প্রকৃত উপভোগের বস্তুতে পরিণত ক'রে তুলেছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে এক কথা বিস্মৃত হলে চলবে না, বিভূতিভূষণের শিল্পীমানসের সঙ্গে একালীন ধ্যান-ধারণার যোগ ছিল না। তাঁর শিল্পদৃষ্টির ভিতর এক ধরনের পাপবোধশূন্য কিশোরস্বলভ naivete ছিল, যা তাঁর সাহিত্য-জীবনে শিল্পকৃতিত্বের বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। কি এক ছনিরীক্ষা লীলায়, যা তাঁর শিল্পীমানসের সব চাইতে বড় বিচ্যুতি, তাই তাঁর শ্রেষ্ঠ শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইংরেজীতে একটি ধরতাই কথা আছে, ignorance is bliss। এই মহাজনবাক্যের সত্যতা প্রমাণ ক'রে বিভূতিভূষণ তাঁর সহজাত মানসিক অপূর্ণতাকে আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ বর্মে পরিণত ক'রে তুলেছিলেন। অপরে যেখানে আধুনিক-যুগোচিত বিধা-বন্দ-সংশয়-জিজ্ঞাসার দ্বারা পীড়িত হয়ে শিল্পের ক্ষেত্রে কেবলই পথ হাতড়ে ফিরছে, সেখানে এই দেবকল্প শিল্পী কোন্ এক মায়াময় বলে সমস্ত বিধা-প্রশ্নতা আর অনিশ্চিত্য আর হতাশা ছ-হাতে দূরে সরিয়ে দিয়ে আত্মমগ্ন সৌন্দর্য্যপূর্ণ নেশায় বুঁদ হয়ে ছিলেন। বিভূতিভূষণ দুর্লভ কবিত্বশক্তির অধিকারী। কিন্তু কাব্যের মানদণ্ডে কথা-সাহিত্যকে পরিমাপ করলে সংশ্লিষ্ট শিল্পের মূল্যায়নে সাস্তিকবলিত হবার সম্ভাবনা থাকে। আধুনিক উপন্যাস জীবনবেদনরূপ। তা সমাজভাবনার দ্বারা, যুগোচিত বৈশিষ্ট্যলক্ষণের চেতনার দ্বারা মণ্ডিত হলে

তবেই শুধু তাঁর আধুনিক মহাভারত নামের সার্থকতা প্রতিপাদিত হয়। কিন্তু শেথোক্ত দিক দিয়ে বিদ্রুতিভূষণ দৈবের পরম আশীর্বাদস্বরূপ আশ্চর্যরূপে নিশ্চেতন। সমাজভাবনা তথা রাজনৈতিক চিন্তাধর্মের সংঘাত বিদ্রুতিভূষণের রচনায় বিন্দুমাত্র রেখাপাত করতে পারে নি, এ বিশ শতকের কথা-সাহিত্যের ইতিহাসে এক অত্যশ্চর্য সংঘটন। বিদ্রুতিভূষণ যেন একালের পরিবেশে বাস করেও ঠিক একালের মাহুয ছিলেন না। কোন্ দূর দেশে দূর কালে যেন তাঁর শিল্পকল্পনা বিসর্পিত। এই দৈবশক্তির স্বভাবশিল্পীর সকল চিন্তাভাবনার স্রোত উচ্ছিন্ন হয়েছিল কোন্ এক অদূরবর্তী অদৃষ্ট কল্পলোকের উৎস থেকে। বিদ্রুতিভূষণের রচনার যেটি সব চাইতে বড় বৈশিষ্ট্য, সেটি একই কালে তাঁর সব চাইতে বড় দুর্বলতাও বটে।

বরং সেই দিক দিয়ে জীবিত শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক বেশি সমাজ-সচেতন, অনেক বেশি পরিমাণে আধুনিক যুগের দাবি পূরণে সচেষ্ট। বাংলার সমাজের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত কতকগুলি অবহেলিত শ্রেণী—যথা হাড়ী, বাগদী, কাহার, বাউরী, সাঁওতাল, বেদে, সাপুড়ে সম্প্রদায়ের মাহুযের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তিনি সাহিত্যে যুগোচিত মর্যাদা দান করেছেন। সাহিত্যের গণতান্ত্রিক পংক্তিসজ্জায় এদের তিনি পাংক্ত্য করছেন। তারাশঙ্করের শিল্পী-মানস সমাজ-সচেতন বলেই অভিজ্ঞাত এবং মধ্যবিত্ত জীবনের গম্ভীর অতিক্রম করে তাঁর পক্ষে কল্পনাকে সমাজের নিম্নতম স্তরে সম্প্রসারিত করা সম্ভব হয়েছে। এই যে তথাকথিত নিম্নবর্ণের মাহুযের প্রতি দরদ ও সচেতন মনোভাব, এটি যুগের প্রত্যাশার পরিপূরক।

সমাজচেতনার প্রসঙ্গে আর দু-একটি কথা বলে আমরা আমাদের বক্তব্য শেষ করব। প্রাচীনপন্থী কোন কোন সমালোচক কথা-সাহিত্যে ও কাব্যে বুদ্ধিবাদের সংস্কারকে আরো গুরুত্ব দিতে চান না। তাঁদের এই রক্ষণশীল মনোভাব সমর্থনের কারণ দেখি না। বুদ্ধিবাদের সংস্কারের সহিত সমাজচেতনার যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। বোধ হয় সেটি একটি হেতু, যার জন্তে পুরাতন ধারার সমালোচকগণ বুদ্ধিবাদকে কথঞ্চিৎ সন্দেহের চক্ষে দেখে

থাকেন। কিন্তু বুদ্ধিবাদ বস্তুটি সুপ্রযুক্ত হ'লে তার বিরুদ্ধে আপত্তির যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। রচনায় বুদ্ধিবাদের আমেজ থাকা কিছু দোষের নয়, বরং আধুনিক পাঠকের পক্ষে তা সমধিক কঠিন। খোদ বুদ্ধিবাদ বস্তুটি একটি গুণ, তার কম-বেশিতেই যা শিল্পকর্মের উৎকর্ষাপকর্ষের ধারণায় তারতম্য হয়ে থাকে। রচনা শিল্পের নিজস্ব উৎকর্ষের দাবিপূরণে তৎপর হবে তাতে সন্দেহ কি, কিন্তু উপরন্তু হিসাবে তাতে যদি কিঞ্চিৎ বুদ্ধিবাদের মিশাল দেওয়া যায়, মননশীলতার দীপ্তির দ্বারা রচনাদেহকে প্রোজ্জ্বল করে তোলা যায়, তবে এমন কি মহাভারত অন্তর্ভুক্ত হয় বুঝি না। চটচটে আবেগের কাদা দিয়ে কাব্যোপভাসকে ক্লেশাক্ত করে তোলায় চাইতে বুদ্ধিবাদের পালিশ কিয়ৎপরিমাণে থাকা ভাল। সেটি আরও বাঞ্ছনীয় এই কারণে যে, ওই বুদ্ধিবাদের হাত ধরেই সচরাচর সমাজভাবনামূলক শিল্প-পরিকল্পনা শিল্পীর চিন্তায় আত্মপ্রকাশ করে।

আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যের শক্তিমান নতুন সারির লেখকদের মধ্যে বুদ্ধিবাদ ও সমাজচেতনা সব চাইতে যার রচনায় পরিলক্ষণীয়, তিনি—দীপক চৌধুরী। এই শক্তিম্বর লেখকের কলম আশ্চর্য রকম বুদ্ধিদীপ্ত। সমাজভাবনা তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে অহুসাত। দীপক চৌধুরীর সমাজভাবনামূলক সকল মতামত আমি স্বীকার করি না, এবং শিল্পবুদ্ধির ক্ষেত্রে তাঁর যে আরও অধিক পরিমাণে ঐতিহ্যনিষ্ঠ হওয়া দরকার তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ওই সীমাবদ্ধতার মধ্যেই এই নবীন লেখক বিশ্বয়কররূপে সজাগ। তাঁর গল্পোপন্যাসের প্রতিটি তাৎপর্যপূর্ণ অংশ থেকে চিন্তাশীলতার দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। অথচ একই কালে এই লেখক কুণলী গল্প-বলিয়ে। বুদ্ধির প্রাধর্য ও গল্পকথননৈপুণ্যের এমন যোগাযোগ সচরাচর দৃষ্ট হয় না। শুধু তাঁর ভাবারীতিটি আরও ঐতিহ্যমোদিত, আরও একটু সংস্কৃতশব্দস্বলভ ধ্বনিময় হ'লে ভাল হয়। তাঁর প্রকাশভঙ্গির পাশ্চাত্যবোধ যা চণ্ডটুকে নিরাকৃত করবার জন্তেই এটি দরকার। দীপক চৌধুরী প্রভূত শক্তির প্রতিশ্রুতি নিয়ে বাংলা-সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁর আত্মপ্রকাশ চিহ্নিত ও অগ্রগতি ব্যাপক মনোযোগের বিষয়ীভূত হোক।

গ্রন্থ-পরিচয়

বুদ্ধকথা : ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেন। ইণ্ডিয়ান পাব্লিসিটি সোসাইটি, ২১ বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৪। তিন টাকা।

পরমহংসদেবের আবির্ভাব-তিরোভাব এইমাত্র সেদিনের কথা। তাঁহাকে দেখিয়াছেন এমন লোক এখনও জীবিত আছেন। অথচ ইহারই মধ্যে অলৌকিকতার আবরণে তাঁহার মানবীয় জীবন ঢাকা পড়িতে বসিয়াছে। চৈতন্যদেবের জন্মের পর এখনও পাঁচ শত বৎসর পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার তিরোভাবের পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বৃন্দাবন দাস যে ‘মঙ্গল’ রচনা করেন (‘চৈতন্যভাগবত’) তাহা দেবতারই লীলাগান, মানুষের নহে। তারপর গত সাড়ে চার শত বৎসরের মধ্যে অনেক পণ্ডিত চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু মানুষকে দেবতার অলৌকিক মহিমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন নাই, তিনি শ্রীকৃষ্ণলীলার নব অবতাররূপেই প্রতিভাত হইয়াছেন। প্রায় দুই সহস্র বৎসর হইতে চলিল যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাব-তিরোভাবের রহস্য আজিও উদ্ঘাটিত হইল না; বহু অবিদ্বান, বহু বৈজ্ঞানিকদৃষ্টিসম্পন্ন ঐতিহাসিক পণ্ডিত বুদ্ধির শাণিত ঞ্জগাধাতে যীশুখ্রীষ্টের রহস্যাবরণ ছিন্নভিন্ন করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু দৈবরপ্ত্রের মহিমা কেহই খণ্ডিত করিতে পারেন নাই। হুতরাং, আড়াই হাজার বছরের পুরাতন মানুষ বুদ্ধদেবকে খুঁজিয়া পাওয়া দুর্ঘট, তাহা বলাই বাহুল্য। হীনযান ও মহাযান দুই বিভাগের অসংখ্য শাখাএই—সুতপিতক, বিনয়পিতক, অভিষমপিতক, হীনযানের এই ত্রিপিটকে ও তাহাদের টীকায়; এবং মহাযানের অষ্টসাহস্রিকাগ্রন্থপারমিতা, সঙ্ঘপুণ্ডরীক ও লঙ্কাবতার প্রভৃতি গ্রন্থে; ললিতবিস্তরে, অখণ্ডোষের বুদ্ধচরিতে, জাতকনিধানকথায়, সিংহলের দীপবংস ও মহাবংসে যে অলৌকিক বুদ্ধদেব সাধ্বিসহস্র বর্ষের ভক্তি ও শ্রদ্ধায় নির্মিত হইয়াছেন সেই যোজন-বিস্তারী অসংখ্য নামালসম্বিত বটবৃক্ষের মূল কাণ্ডটির সন্ধান আজ অসম্ভবের পর্বায়ে। ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেন দীর্ঘকাল এই সকল মৌলিক উপাদান এবং বুদ্ধ ও মহাবীরের সমসাময়িক কালের ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া নানা যুক্তিবিচারের দ্বারা তাঁহার ‘বুদ্ধকথা’র মানুষ

বুদ্ধদেবকে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার কথান্তেই বলি, “আমরা শাস্ত্রীয় অতিপ্রাকৃত বর্ণনাবলীর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন বাস্তব ও মানব বুদ্ধকেই বুদ্ধিবার যথাসম্ভব চেষ্টা করিব।” স্বপ্নের বিষয়, তাঁহার চেষ্টা বিগ্রহভঙ্গের কালাপাহাড়ী চেষ্টা নয়। তাঁহার দীর্ঘকালের বুদ্ধিবিচারসম্পন্ন অধ্যবসায়ের ফলে যে বুদ্ধের কথা আমরা পড়িতে পাইতেছি তিনি অলৌকিক বুদ্ধ অপেক্ষা কম মহিমান্বিত, কম শ্রীতি-শ্রদ্ধার পাত্র নন। ইতিহাস সর্বাংশে রক্ষিত হইয়াছে কি না, তাহা বিচারের অধিকারী আমরা নহি; শুধু এই কথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, ডক্টর সেন যে বুদ্ধের কথা বলিয়াছেন তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষ। তাঁহার রচনার এমনই কৌশল যে, বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসরচনার চেষ্টাই শিল্পসম্মত কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। আমরা মাতৃভাষায় একটি অপূর্ব গ্রন্থ পাইয়াছি। ১৩৩২-৪১ নালে ইহা যখন ধারাবাহিকভাবে ‘বঙ্গশ্রী’তে প্রকাশিত হয়, তখনই বিদ্বজ্জনসমাজ উল্লসিত হইয়াছিলেন, পুস্তকাকারে ইহা পাইবার জন্ম সকলেই উদ্গ্রীব ছিলেন। ইণ্ডিয়ান পাব্লিসিটি সোসাইটি দীর্ঘ কুড়ি বৎসর পরে সুমুদ্রিত ভদ্র আকারে তাহা যে পরিবেশন করিলেন, তজ্জন্ম তাঁহাদিগকে সাধুবার দিতেছি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত : শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীহরীবোধ্য মজুমদার সম্পাদিত। দেব সাহিত্য কুটির, ২২৫বি, বামাপুতুর লেন, কলিকাতা-২। বারো টাকা।

আচার্য রাধাগোবিন্দ নাথ তিন খণ্ডে যে সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সম্পাদন বিষয়ে তাহাই শেষ কথা। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ কিছু বিপুলায়তন ও দুর্মূল্য—সর্বসাধারণের আয়ত্তের মধ্যে নহে। বাস্তবচলিত সস্তা সংস্করণগুলির দোষ এই যে, পাঠে অনেক ভুল আছে। বর্তমান পুস্তকের সম্পাদকদ্বয় আগাগোড়া নাথ মহাশয়ের পাঠ অবলম্বন করিয়া সে বিপদ উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মত বৈষ্ণব-পণ্ডিতের সহায়তায় দ্রুত শব্দাদির টীকা এবং পরিশিষ্টে কবিরাজ গোস্বামীর জীবনচরিত, পাত্র-পরিচয়, স্থান-

পরিচয়, শ্রোতাবলীর স্মৃতি, গৌরগণপরিচয়, রচনার ইতিবৃত্ত ও কাহিনীর সারাংশ বোঝিত হওয়াতে গ্রন্থ শুধু সাধারণের নয়, পণ্ডিতজনেরও ব্যবহার্য হইয়াছে।

চরিতমাধুরী (শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহারাজের পুত্র জীবন-চরিত), ১ম খণ্ড : শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্রী সঙ্কলিত। শ্রীপাঠবাড়ি আশ্রম, বরাহনগর, কলিকাতা-৩৫। তিন টাকা।

এই দুস্তর সংসারার্গবে মহতের জীবনালেখ্য দ্বীপগৃহের মত সাধারণ বাজীর পথনির্দেশ এবং পথভ্রাস্তের বিমূঢ় চিত্তে আশার সঞ্চার করে। এই দিক দিয়াই ইহাদের সার্থকতা। শ্রীরামদাস বাবাজীর মত পুত্রচরিত্র সাধকের একখানি স্মৃতি জীবনচরিতের এই কারণে অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। উত্তোত্তারা এই কাজে হস্তক্ষেপ করিয়া প্রথম খণ্ডে গৃহত্যাগ পর্যন্ত তাঁহার বাল্য ও কৈশোর জীবন সঙ্কলন করিয়াছেন। অজস্র কাহিনী ও কথোপকথন দিয়া যে পদ্ধতিতে এই জীবনীটি রচিত হইয়াছে, সম্পূর্ণ হইলে ইহা বাংলা ভাষায় একটি সুখপাঠ্য অপূর্ব চরিত্রগ্রন্থ হইয়া দাঁড়াইবে। সকল শ্রেণীর পাঠকই এই চরিত্র-মাধুরী অবলোকন করিয়া সজীবিত হইবেন।

পঞ্জিকা : সৌর-গণিতে ভারতবর্ষ এককালে বিশেষ অগ্রণী ছিল; আমাদের পঞ্জিকাগুলিই তাহার প্রমাণ। ইউরোপীয় নাবিকপঞ্জিকা (Nautical Almanac) বর্তমানে এই বিষয়ে অগ্রণী। আমাদের দেশে বহু প্রাচীন কাল হইতেই আকাশপর্ববেক্ষণাদি দ্বারা সৌরতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। প্রচলিত পঞ্জিকাগুলি সেই সকল গ্রন্থ, বিশেষত রাঘবানন্দের 'সিদ্ধান্তরহস্য' নামক সারগীগ্রন্থের উপর নির্ভরশীল। প্রাচীন সৌরগণিত আলোচনা করিলে দেখা যায়, বিভিন্ন সময়ে পর্ববেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা দ্বারা সৌর-গণিতের সূত্রাদি সংশোধিত হইত। কিন্তু পরবর্তী কালে আর সংশোধন না হওয়ায় প্রচলিত পঞ্জিকাগ্রন্থ গ্রন্থফুট অমুসারে গণিত গ্রহণ, গ্রহযুতি, সূর্য চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহের উদয়-অস্তাদি সংঘটিত হইতেছে না, নির্দিষ্ট সময়ের আগে বা পরে ঘটিতেছে। পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্বে সংস্কারপন্থী একদল পণ্ডিতের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয়। 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা' তাহারই ফল। পরবর্তী কালে শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় আধুনিক

বিজ্ঞানসম্মত সৌর-গণিতের প্রধান-গণকরূপে সংস্কার-পন্থী সকল পঞ্জিকা অসম্বন্ধভাবে চালনা করেন। তিনি নিজে 'জগজ্জ্যোতি পঞ্জিকা ও ডাইরেক্টরী' সম্পাদন করেন। আমরা উভয় পঞ্জিকাই পাইয়াছি। 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা'য় কলিকাতার স্থানীয় সময় অমুসারী উদয়-অস্ত ও তিথি-নক্ষত্রাদি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু 'জগজ্জ্যোতি পঞ্জিকা'য় বর্তমান-প্রচলিত স্ট্যান্ডার্ড সময় দেওয়া হইয়াছে। বর্তমান ভারত সরকারও বিজ্ঞানসম্মত পঞ্জিকা প্রণয়নে উদ্যোগী হইয়াছেন।

দা. চ. শ.

নববর্ষ (বাংলা বার্ষিকী ১৩৬২) : শ্রী শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত ॥ ১২ নূর মহম্মদ লেন, কলিকাতা। দুই টাকা।

বাংলা-সাহিত্য-সংকলন-বার্ষিকী হিসাবে শ্রী শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'নববর্ষ' বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। মূদ্রণের পারিপাট্য, গ্রন্থসজ্জার সুদৃশ্যতা, সম্পাদনার নৈপুণ্য ও সংকলিত রচনার বৈশিষ্ট্য এই পঞ্জিকাটি গত কয়েক বৎসর বাবৎ যে একটি উন্নত মানের প্রবর্তনা করিয়াছে, বাংলা-সাময়িক-সাহিত্যপত্র-সংকলন-কারীদের পক্ষে তাহা অমুকরণের যোগ্য। বর্তমান বৎসরের আয়োজন পূর্বাৎসর্য ও পূর্ণতর বলিয়া মনে হইল। সংকলনটিকে সর্বদ্বন্দ্বমুক্ত করিয়া তুলিতে সম্পাদক চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। সমকালীন বাংলা-সাহিত্যের বিভিন্ন দিকের উপর লিখিত বিশেষজ্ঞোচিত রচনা কমটি পঞ্জিকাটির একটি বিশেষ আকর্ষণ। লেখকদের মধ্যে আছেন—(প্রবন্ধে) শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ডাঃ কালিদাস নাগ, বিভাস রায় চৌধুরী, নরেন্দ্র দেব, মনোজ বসু, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোপাল ভৌমিক; (কবিতায়) শ্রীমতী রাধারাণী দেবী, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, কৃষ্ণধর, আর্ষপুত্র সুপ্রিয় ইত্যাদি; (গল্পে) শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী, শ্রীমতী বাণী রায়, সরোজকুমার রায় চৌধুরী, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, অজিতকৃষ্ণ বসু; এবং (উপন্যাসে) শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক। দুইটি স্তম্ভের ত্রিবর্ষ চিত্র ও অনেকগুলি আলোকচিত্র সংকলনটির আকর্ষণযোগ্যতা আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। 'নববর্ষ' সাহিত্যমোদী মহলে বিশেষ আদৃত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

ন. চ.

সংবাদ-সাহিত্য

নবকলেবরায়িত বৈশাখ সংখ্যা সম্বন্ধে কয়েকজন সহৃদয় পাঠকের সমর্থন অভিনন্দন, এবং কয়েকজনের আরও সংস্কারের নির্দেশসম্বলিত সমালোচনা আমাদের হৃদয়গত হইয়াছে। আমরা ভবিষ্যতে কাহারও কাহারও সমীচীন প্রস্তাব কার্যকরী করিবার চেষ্টা করিব।

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আদর্শে রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সে রচিত সঙ্গীতগুলির বিচার করিতে গিয়া (“প্রবন্ধ কথা : রবীন্দ্রসঙ্গীত”, চৈত্র ১৩৬১) শ্রীনারায়ণ চৌধুরী বহু রবীন্দ্র-ভক্তের মানসিক ক্লেশের কারণ হইয়াছেন। রূঢ় সত্যকে গোপন করিয়া চলিতে হয়—মুহুরের বর্তমান মুখোশ-পর্য্য সত্যতার ইহাই ভদ্র রীতি; নারায়ণবাবু সে রীতি মানিয়া চলেন নাই, হৃদয় আধুনিক সত্যতার বিচারে অপরাধী হইয়াছেন। অপরাধের শাস্তি তাঁহার প্রাপ্য। কয়েকটি পত্রাঘাতে তিনি তাহা পাইয়াছেন। বর্তমানে ইন্দ্রলোকসম্মত রবীন্দ্রসঙ্গীতের কচিং দিক্‌পাল মর্মান্বত, কচিং ধুরন্ধরী জুগুপ্সা-কুপিত হইয়াছেন; শ্রীমুক্তা হেমন্তবালা দেবী ইহার মধ্যে ‘শনিবারের চিঠি’র পুরাতন রবীন্দ্র-বিদ্‌বৎ-কান্দন্দি-ঘাটিবার লক্ষণ দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছেন; শ্রীমতী জ্যোৎস্না ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন—

মিজের দেশের গৌরবস্বল সেই ধ্বনিকে, সাধককে, মহাকবিকে লেখক বাঙালী হয়ে এতবড় অপমান করলেন? আধীন্য-সংগ্রামের যুগে, আর বেশের দারুণ-হুম্মিমে পশে পশে কার হরের কোন্‌ গান পেয়ে আপনারা মনের জোরে লড়তে পেরেছিলেন? আজ কার হরের কোন্‌ গানকে আত্মীয়সঙ্গীত বলে জগতের কাছে প্রচার করে আপনারা ভারতবাসী হয়ে রৌরব বোধ করছেন? সেই মিজের দেশের-গৌরব রবীন্দ্রসঙ্গীতকে মিজেরাই এমনি অপমান করলেন?...লেখক কি মিজের কখনও রবীন্দ্রসঙ্গীত পেয়েছেন? নিশ্চয়ই কখনও গান নি বা গাইতে জানেন না,—কারণ মিজের গাইলে বুঝতে পারতেন কোথায় ওর হুম্ম সৌন্দর্য। অবশ্য ভারতের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বা কালোয়াতি সঙ্গীত বলতে বা বোকার, অর্থাৎ বাজুবজু খুলে খুলে বাজে এইটুকু কথাকেই বায়ে বায়ে বুঝভঙ্গীসহকারে আবৃত্তি করে তিমি দণ্ডী বাক্য তান-লয়-সিটকিরি-গমকের কসরৎ দেখানো।—যে আসর থেকে জনসাধারণ পালাতে পারলে ষাঁচে, সেই আসরে গাইবার মত গান রবীন্দ্রসঙ্গীত নয়। রবীন্দ্রসঙ্গীত হল সাধারণের জন্ত, সকলের জন্ত।...সব চেয়ে বেশি সংখ্যক লোককে

সবচেয়ে বেশিমানার আদর্শ যে গান দিতে পারবে, আপনি তাকেই সব চেয়ে ভাল গান বলবেন কি না?

বোলপুর হইতে শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার অধিকারী লিখিয়াছেন—

রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে আমার নিবেদন, রবীন্দ্রনাথ হরের একটি সাধারণ ও সর্বজনবোধ্য বর্ণনামাত্র। তৈরী করতে চেয়েছেন। কিন্তু যিনি ঐগদ ও খেরালে বহু বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞের কাছে শিক্ষা পেয়েছেন এবং যেখা গেছে হরহৃদয়ে প্রথম জীবনে যিনি সেই শিক্ষার বোধ্য পরিচয় দিয়েছেন, তিনি যে কেমন এই সহজিয়া পন্থার সঙ্গীত রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, সেটা আরও গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার।

শ্রীধ্রুপদ শর্মা বলিয়াছেন, নারায়ণবাবু অনধিকার চর্চা করিয়াছেন। শ্রীঅক্ষয় সিংহ রায় উক্ত “প্রবন্ধ পাঠে” অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছেন। মোটের উপর বুঝিতে পারিতেছি, নারায়ণবাবুর উক্ত আলোচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নানা জনে নানা মত পোষণ করিতেছেন।—আমরা নারায়ণবাবুর মোক্ষা কথাটা যাহা বুঝিয়াছি তাহা হইতেছে এই যে, ভারতীয় সঙ্গীতের রীতি ও ব্যাকরণসম্মত সাধনা-অনুশীলন ব্যতিরেকে বর্তমানে শুধু কানে শুনিয়া অথবা স্বরলিপি সম্মুখে রাখিয়া সহজিয়া পদ্ধতিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে রেওয়াজ চলিতেছে তাহা নিম্ননীয়। রবীন্দ্রনাথ এক সময় বলিয়াছিলেন, ছন্দোবদ্ধ কবিতা-রচনায় পারদর্শম ব্যক্তিই শুধু গল্প-কবিতা রচনার অধিকারী; রবীন্দ্রসঙ্গীতের বেলাতেও তেমনই বলা যায়, সঙ্গীতশাস্ত্রে যথোচিত জ্ঞানার্জন করার পর রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়ার অধিকার জন্মে। এইরূপ ঘটনা বলিয়াই দেখিতে পাই, রবীন্দ্রসঙ্গীত-গায়ক কিছুকাল চমক লাগাইয়া বিশ্বস্তির অতলে তলাইয়া যায়। যতদিন তাঁহাদের কণ্ঠের যৌবন থাকে ততদিনই তাঁহাদের আশু। আবহুল করিয় খাঁ প্রভৃতি সর্বভারতীয় ওস্তাদদের বাদ দিলেও বাংলা দেশের জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী বা ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় যে স্থায়িত্ব অর্জন করিয়াছেন, কোনও রবীন্দ্রসঙ্গীত-গায়ক সে স্থায়িত্ব লাভ করেন নাই। চিত্রলেখা-অরুণকান্তী-সাহানা-কণক-রমা-অমিতার স্থলে হুচিঞ্জা-কণিকারা আসিয়া সাময়িকভাবে শ্রোতাদের চিত্ত-

বিনোদন করিয়াছেন, কিন্তু চিরস্থায়ী মহিমায় মহিমাবিত হইতে পারেন নাই। বরঞ্চ মার্গ-সঙ্গীতের পথে যাহারা রবীন্দ্রসঙ্গীত অহুশীলন করিয়াছেন, যেমন রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁহারা ই অধিকতর স্মরণীয় হইয়াছেন। সাময়িকভাবে বেশি সংখ্যক লোককে সব চাইতে আনন্দ দিতে পারাই যদি শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হয় তাহা হইলে “আবেগ-আবেগ”র স্থান রবীন্দ্রসঙ্গীতেরও অনেক উপরে বলিতে হইবে।

(শ্রীমতী জ্যোৎস্না ভট্টাচার্যের বক্তব্যের শেবাংশ স্মৃত্য।) সত্যকার সঙ্গীতের বিচার মোহগ্রস্তের সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভর করে না—যেমন করে না সত্যকার কাব্য এবং সত্যকার শিল্পকলা। এই বিচারে শিল্পী ও রসিক উভয় পক্ষেরই অহুশীলন আবশ্যক। অহুশীলনহীন-সুরেলা-কণ্ঠাশ্রিত হইয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত বাহাতে অযোগ্য নাই হয় নারায়ণবাবু সেই আশঙ্কা করিয়াই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীত-প্রসঙ্গে হেমন্তবালা দেবীর এই কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য—

“রবীন্দ্রসঙ্গীত” বলা যায় সেইগুলিকেই, যাহা কোনো বিশেষ হৃদয়বেগে অথবা স্বপ্নত ভাবের সুরে কতোখসারিত হইয়াছে, যাহা নিব্বরের মত আপনা আপনি ঝরিয়া আসিয়াছে, যাহাকে তিনি রচনা করেন নাই, আপনা-আপনিই বাহা রচিত হইয়া আবির্ভূত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় আনন্দজাত এই সমস্ত সঙ্গীত দেশকালপাত্রের মনোরঞ্জনের জন্য আসে নাই। ইহা তাঁহার নিজের স্বত্বই আসিয়াছিল। যাহারা রবীন্দ্রনাথের অহুত্বকে স্বকীয় অহুত্বের সহিত মিলাইয়া লইতে পারেন, এ সঙ্গীত মাত্র তাঁহাদেরই জন্য।

যে শিক্ষার দ্বারা এই অহুত্ব জাগ্রত হইতে পারে, নারায়ণবাবু তাহারই কথা বলিতে চাহিয়াছিলেন।

অহুত্বরূপ আর একটি গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছেন শ্রীঅমল হোম। রবীন্দ্র-স্মরণ-তিথিগুলিকে কেন্দ্র করিয়া সর্বত্র যে বহুসংখ্যক ও শেষে লঘুক্রিয়া (গোড়ায় গলদ এবং শেষবন্ধা নয়) অহুত্বিত হয়, তজ্জন্ত তিনি সিংহবিবরে প্রবিষ্ট হইয়া সিংহের দাড়ি ধরিয়াই তীব্র নিন্দা ও গভীর চুংখ নিবেদন করিয়াছেন। ফলে গর্জন ও হুকাহুকা শুনা যাইতেছে। বুদ্ধদেব যেমন দীতে বাঁচিয়া আছেন, রবীন্দ্রনাথ তেমনই নাচে বাঁচিবেন—ইহাতে কাহারও

আপত্তি করিবার অধিকার নাই। প্রতিবাদকারীদের ইহাই বক্তব্য। আর সভ্যই তো, নূতন যুগে পুরাতন কাব্যমহিমায় রবীন্দ্রনাথকে তো টিকাইয়া রাখা যাইতেছে না; স্বকান্ত ভট্টাচার্য এবং কাজী নজরুল ইসলাম থাকিতে সৈনিক দিয়া ভদ্রলোকের কোনও ভরসাই নাই। আমরা অমল হোমের সাহসের প্রশংসা করিতেছি, কিন্তু বুদ্ধির তারিফ করিতে পারিতেছি না।

শ্রীঅমল হোমের দৃষ্টান্তে আমরাও বোকার মত অন্তরের একটি গুঢ় কথা প্রকাশ করিতে উন্মত্ত হইয়াছি। তোমাদের এই তারার আবছায়া এবং কটুগন্ধ অন্ধকারের কবিতা আমরা বুঝি না বাপু। কোনও প্রেরণা উত্তেজনা পাই না। মর্ম হৃদয়দ্রব করিতে না পারিলে তাহা পাইবই বা কেমন করিয়া! কি যে তোমরা বল, আর কি যে তোমরা ভাব, অনেক মাথা ঝুঁড়িয়া পাঁচ-দশখানা অভিধানে নাক ঘষিয়াও ঠাহর করিতে পারি না। একই কবিতা পড়িতে পড়িতে, কখনও মনে হয় মস্তোত্তে গিয়া ভড়কা খাইতে বলিতেছ, কখনও মনে হয় নিউইয়র্কে স্বচ্ছ হইছি। মনে কেমন জড়জড়ি দিতে থাকে, অথচ পূর্ণাপূর্ণি বুঝিতে না পারিয়া ক্লান্ত হতভম্ব হইয়া পড়ি। মোদা কথা, কি যে বল প্রণিধান হয় না। সবাই জয়ধ্বনি দেয়, তাই আমরাও হাত তুলিয়া উদ্যম হইয়া নাচি। আজ গোপন কথাটা বলিয়া ফেলি, তোমাদের কবিতা কিছুই বুঝিতে পারি না বাপু।

সত্য কথাটা শুনিলে তোমাদের ভাল লাগিবে না কিন্তু আজ না বলিয়াও পারি না যে, তোমরা ছাড়া আরও যাহারা জীবন্তে মরিয়া আছেন তাঁহাদের কথা শুনিতে বুঝিতে পারি। বুঝিতে যে পারি তাহার প্রমাণ আমাদের স্বাধীনতা-যুদ্ধের দিনে ইহাদের কবিতা পড়িয়া গান গাহিয়া মনে সাহস আসিয়াছে, হৃদয়ে বল সঞ্চার করিয়াছি। বুঝিয়াছি কি না। নাম জানিতে চাহিতেছ? কেন, আমাদের কুমুদরঞ্জন, কালিদাস রায়, নরেন্দ্র দেব, দ্বিজীপ্রসন্ন, নজরুল ইসলাম, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, প্রভাত বহু প্রভৃতি। “উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদলে”র যদিও মানে হয় না, তবু তাহা গাহিয়া ইন্সপারার্ড হইয়াছি, বৈদেশিক শাসনের

প্রতি স্রণায় যেমন উদ্ভেজিত হইয়াছি, দেশের মাহুষকে তেমনি ভাল লাগিয়াছে, পরিত্যক্ত পল্লীর পথঘাটের প্রতি মমতা আগিয়াছে, বব্‌চুল আর ভ্যানিটি ব্যাগের মোহে যে মেঘবরণ চুল ও কঁকন-পরা হাতের অমর্যাদা করিয়াছি, ইহাদের কবিতা পড়িয়া তাহাদের আবার নতন করিয়া ভাল লাগিয়াছে। মোটের উপর ইহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার অনেক সুযোগ ইহারাই দিয়াছেন।

আর তোমরা? আজ পর্যন্ত তোমাদের একটা ইচ্ছিত স্পষ্ট বৃত্তিতে পারিলাম না। অনেক অনেক পড়িলাম। চাঁদ কাণ্ডে দুই-ই দেখিলাম, কাঠের ঘোড়ার সওয়ার হইয়া ছুটিতে চাহিতেছি অহুমান সেটুকুও বুঝিলাম, ধানসিঁড়ি জলসিঁড়ি ফড়িং ডিমের খোলা শূকরের চামড়া সিঁদুরশূন্য বাঘের কপিশ চোখ জাপানী লঠন অনেক কিছুই আবর্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইলাম, কিন্তু একটাও অর্থপূর্ণ সম্পূর্ণ বাক্য শুনিতে পাইলাম না। তোমরা আজ পর্যন্ত অনেক কেরামতি দেখাইলে, বহুবিধ মূর্ত্তা প্রদর্শন করিলে, অনেক হৈয়ালি রচনা করিলে, কিন্তু একটাও কথা বলিলে না। টীকার সাহায্যে চর্চাপদ পর্যন্ত বৃত্তিতে পারিলাম, কিন্তু তোমাদিগকে বৃত্তিতে পারিলাম না।

তোমরা বলিবে, তুমি না পার, অনেকে তো পারে; নহিলে আমাদের এত খাতির কেন? সেই কথাটাই তো আজ বলিতে চাই বন্ধু। তোমাদের ও-খাতির ফাশনের খাতির! শুক্লম্বের অলৌকিক মহিমা যেমন শিশুদের মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়ে, যাহারা ঠকে তাহারও স্বীকার না করিয়া প্রচারে সাহায্য করে—ইহাও তাহাই। তোমরা কাপড় বোনার ভান করিয়া কৌশলে প্রচার করিয়া দিয়াছ, সতী মাতার সন্তান যাহারা তাহারাই কেবল তোমাদের বোনা কাপড় দেখিতে পাইবে। কেহই দেখিতেছে না, কিন্তু লজ্জায় ভয়ে সকলেই তারিফ করিতেছে—চমৎকার, অপূর্ব, অসাধারণ! অসাধারণ বটে, কিন্তু জনসাধারণ যে ঠকিয়া ঠকিয়া ঘায়েল হইয়া গেল। তাই বলিতেছি, ওগো বাহুকররা, তোমাদের বাছ খামাও, কলসি নাড়ানাড়ি করিয়া মুখে শুধু “ওয়াটার অব ইণ্ডিয়া” না বলিয়া ভূষণার্থে সত্য সত্যই কিছু পানীয় দান কর। কিছু কথা বল। এমন কথা বল, যাহা আমরা বৃত্তিতে পারি এবং বুঝিয়া অল্পপ্রাণিত হই। মোহাই তোমাদের। চালাকির দ্বারা আর ‘মহৎ কবিতা’র সৃষ্টি করিও না।

গোপালদা একটি গান স্বরলিপির লব্ধ আমাদের কাছে পাঠাইয়াছেন। গানটি একটি নামের তালিকামাত্র। কোনও গুট তাৎপৰ্য ইহার আছে কি না জানি না। কোনও বসিক পাঠক যদি তাৎপৰ্য আবিষ্কার করিতে পারেন, সেই আশায় নিম্নে মুদ্রিত করিলাম—

জয় এশিয়ার জয়, জয় বান্ধুং,
সবার উপরে যার মাও সে ভুং।
চৌ এন লাই জয়, জয় বাওদাই জয়,
হো চিন মিন জয় তেরে নানা তুম।
জয় এশিয়ার জয়, জয় বান্ধুং।
জয় কৃষ্ণ মেনন তিনি মোটে যে-সে নন,
জয় নেহরুর জয়, নাসের ও হু’র জয়
মহম্মদালির জয় খেয়ে দুই চুম।
জয় এশিয়ার জয়, জয় বান্ধুং।

নেহরুর উল্লেখ মনে পড়িল, তিনি সেদিন এক মহিলাদের সভায় পকেটমারদের সম্বন্ধে রেল-কামরার ভাষা সাধুদের সম্পর্কেও প্রয়োগ করিয়াছেন, বলিয়াছেন—সাধু হইতে সাবধান আর তাহারা আপনার নিকটেই আছে। ভারতবর্ষের সাধুরা একতাল শাস্ত্রের নির্দেশ মানিয়া নারীদের সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়া আসিয়াছিলেন। ইহানী শাস্ত্র অমাস্ত করিয়া তাহারা একটু বেশি নারীসংসর্গ করিতেছেন বলিয়াই ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বিচলিত হইয়াছেন। বিবাহ-বিচ্ছেদ-আইন পাস হইবার পরেই তাহার ভয় বেশ একটু বাড়িয়াছে। আর তিনি জানেন, কলিকালে চোরারা যদিও বা শোনে, সাধু না শোনে ধর্মের কাহিনী। কাজেই তিনি নারীদেরই সতর্ক হইতে বলিয়াছেন। ভালই করিয়াছেন।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৬২) শনিবারের ‘দেশ’ পত্রিকার আলোচনা-বিভাগে ডক্টর হুমুয়ার সেনের একখানি পত্র দেখিলাম। কিছুকাল পূর্বে (‘দেশ’, ২২ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা) শ্রীযুক্ত হুমুয়ার দাশগুপ্ত মধুসূদনের *The Anglo-Saxon and the Hindu* পুস্তিকাটি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। তাহার অপরাধ হইয়াছিল তিনি উক্ত পুস্তিকার “Faithless Seeta had deserted the

arms of her exiled husband"—এই উক্তিটি সম্বন্ধে

মধুসূদনের অজ্ঞতার সাফাই গাহিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কোনও প্রয়োজন ছিল না। স্বদেশ, স্বজাতি, দেশের সম্মানিত মানুষ এবং মহাকাব্য-পুরাণের অনেক সর্বজন-পূজিত নায়ক-নায়িকা সম্বন্ধে অমন চিন্তাশেষহীন অসম্মানজনক উক্তি তিনি অনেক করিয়াছেন। বিপরীত পাল্লায় ইহাদের প্রশস্তিও পরবর্তী কালে তিনি অনেক চাপাইয়াছেন। তিনি প্রধানত ভাবাবেগ-পরিচালিত কবি ছিলেন, যখন বাহ্য মনে হইয়াছে অসকোচে বলিয়া গিয়াছেন। ১৮৪১ সন হইতে ১৮৫৬ সনের গোড়ায় মাদ্রাজ হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত রচিত বহু ইংরেজী গল্প-পত্র লেখার স্বদেশ ও স্বজাতি সম্বন্ধে মধুসূদনের বহু হীন উক্তি আমরা দেখিতে পাই। দৃষ্টান্ত দিতেছি—

(১) ১৮৪১। I sigh for Albion's strand
As if she were my native land ;

(২) ১৮৪২। In India, I may say in all the oriental countries, women are looked upon as created merely to contribute to the gratification of the animal appetites of men. This brutal misconception of the design of the Almighty is the source of much misery to the fair sex, because it not only makes them appear as of inferior mental endowments—but no better than a sort of speaking brutes. The people of this country do not know the pleasure of domestic life, and indeed they cannot know, until civilization shows them the way to attain to it,

মধুসূদন ইহার কয়েক মাস পরেই ২ই ফেব্রুয়ারি ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে অবলম্বন করেন। সেই দিনই লেখেন—

(৩) ১৮৪০। Long sunk in superstition's night,
By sin and satan driven,—
I saw not,—cared not for the light,
That leads the Blind to Heaven :
I sat in darkness,—Reason's eye
was shut.....

I despise Ram and his rabble তাঁহারই কথা।

সুতরাং "faithless Seeta" বলিতে সেকালের বিজাতীয় মধুসূদনের আটকায় নাই। আবার শেষ বয়সে (১৮৬৫-৬৬) বিদেশে বসিয়া এই সীতা সম্বন্ধে তিনিই বলিয়াছেন—

অনুকণ মনে নোর পড়ে তব কথা,
বৈদেহি। কখন দেখি, মুদিত নয়নে,
একাকিনী তরি সঙ্গি অশোক-ভায়রে

চারি দিকে চেড়ীরূপ, চন্দ্রকলা যথা
আচ্ছন্ন মেঘের মাঝে।

এই সকল যুক্তির কোনও প্রয়োজন নাই, কারণ বইখানি যে মধুসূদনেরই লেখা, পুস্তকখানির আঠেপৃষ্ঠে তাহার অকাটা প্রমাণ আছে।

দেখিতেছি, সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্ত চমকপ্রদ নূতন আপত্তিক্য ছাড়িবার প্রবৃত্তি এতদিন পরেও সুকুমারবাবু ছাড়েন নাই। জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (বঙ্কিমলাতুপুত্র, সঙ্কীৰ্ণপুত্র) বাল্যকালের রচনাকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনা বলিয়া চালাইবার হাঙ্গামার চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন এবং বিরুদ্ধে অকাটা যুক্তি সত্ত্বেও ভুল্ললোকের এক কথা ছাড়েন নাই। বিজ্ঞেন্দ্রলালের 'হাসির গানে'র একটা নূতন কিছু করার দলে তিনি যে এখনও রহিয়া গিয়াছেন তাহাতেই প্রমাণ হয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-বিভাগে সুনীতিকুমারের অন্তর্ধান সত্ত্বেও কুমারতন্ত্র এখনও চলিতেছে। মাথার উপরে হরেন্দ্রকুমার আছেন, আর নিম্নে উতলা ধরণীতলে শ্রীকুমার আর সুকুমার। ভয় হইতেছে মধুসূদনের বেলাতেও সুকুমার faithless হইবেন না।

শ্রীলঙ্কায়ের একটি স্থানে এই কারণে সেদিন বিশ্ব-যমজ সম্মেলন হইয়া গেল যে, উক্ত স্থানে পৃথিবীর মধ্যে যমজের সংখ্যা সর্বাধিক। এই দৃষ্টান্তে বাংলা দেশের কলিকাতা শহরে অচিরাতঃ একটি আত্মঘাতীদের সম্মেলন আস্থান করা যাইতে পারে। নিজের আহাৰ্থে ভেজাল মিশাইয়া আত্মঘাতী হইবার, নিজের জাতীয় সম্পত্তিতে আগুন লাগাইয়া আত্মধ্বংস করিবার, নিজের কিশোর ও যুবকদের উদ্ধাইয়া স্কুলকলেজ ছাড়িয়া সারবন্দি হইয়া পথে পথে মিছিল বাহির করিয়া জাতির শিক্ষাব্যবস্থার সর্বনাশ সাধন করিবার, দলাদলি করিয়া সকল কর্মযজ্ঞ পণ্ড করিবার, পূজা ও সংস্কৃতির নামে অশোভন নর্তনকূর্দনে বীভৎসতা সৃষ্টি করিবার এমন প্রবৃত্তি পৃথিবীর আর কোথাপি নাই। এই সম্মেলন যথার্থ আহুত ও অহুষ্ঠিত হইলে অন্তত এই বিষয়ে যে আমরা বিশ্বাগ্রগণ্য তাহা উপলব্ধি করিয়া গবিত ও নিজের অভিনন্দিতও করিবার সুযোগ পাইব।

স্বাভাবিকভাবে মৈনিকের সাময়িক পত্রগুলি যে ঘোরতর বিপদের সম্মুখীন হইতে চলিয়াছে, সে সম্বন্ধে আমরা গতবারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলাম। দেখিলাম, নিখিল-ভারত-সংবাদপত্র-মালিক-সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীনির্মলচন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে নিখিল-বঙ্গ-সাময়িক-পত্র-সঙ্ঘের এক সভায় সাময়িক পত্রের মালিক ও কর্মীরা মিলিত হইয়া আত্মবিপদ নিবারণে চেষ্টিত হইয়াছেন। উৎপাদন-শৈথিল্যে মিলের সারা কাগজ দুস্তাপ্য ও দুর্মূল্য হইয়াছে, ইহার উপর সরকারী চক্রান্তে নিউজ প্রিন্ট ও মেকানিক্যাল কাগজ ব্যবহারও প্রায় নিষিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। এক্ষণ অবস্থায় সজ্ঞশক্তি প্রয়োগে সরকারকে সদয় হইতে বাধ্য না করিলে মৃত্যু অনিবার্য। এতদিন সাময়িকপত্র-জগতের আর যে শক্তিই থাকে, সজ্ঞশক্তি মোটেই ছিল না; সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া বাঁচিবার প্রয়াসী ছিলেন। সে পথ রুদ্ধ হইতে চলিয়াছে, এখন সকলে মিলিয়া কাঁধ দিয়া রুদ্ধ দ্বার খুলিতে হইবে।

তৈশাখ সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে “কুড়ানো মানিক” শিরোনামায় রবীন্দ্রনাথের যে পত্রগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, স্বর্ধের বিষয় তাঁহার মালিক স্বয়ং পত্রযোগে আমাদের কাছে ধরা দিয়াছেন। তিনি শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও প্রাক্তন শিক্ষক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—আমাদের ধী-মু-দা। তিনি বর্তমানে মেদিনীপুরের রঘুনাথবাড়ি আর. টি. এইচ. স্কুলের হেডমাস্টার। সব শেষেরটি বাদে বাকিগুলির মালিক তিনি এবং মূল চিঠিগুলি এখনও তাঁহার কাছেই আছে। শেষের চিঠিটি কাকে লেখা তিনি জানেন না। তিনি এই পত্রেই লিখিয়াছেন—

একটু ইতিহাস দিলে বোধ হয় অগ্রাসঙ্গিক হইবে না। তখন আমি শান্তিনিকেতনের ছাত্র। মিথ্যা কথা বলা পাপ—কেমন না বার বার মিছে কথা বলে একজনের পাশে একবার সত্যিই বায় পড়ল—দুতরায় মিছে কথা বলা ভাল নয়—এ যুক্তিটা সম্বন্ধে মনে কেমন খটকা লাগত। সংস্করের যুগ—খানিকটা সমস্তা মেটাবার আগ্রহ আর খানিকটা থাকত পূর্বনীর রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখবার বাসনা। পূজোর ছুটিতে হৃদয় বরিশাল থেকে চিঠি লিখি এবং খুব শীগগিরই তাঁর ১৩১৭ সালের ১২ই কার্তিক লেখা উত্তর পেয়ে বসত হই। তখন শান্তিনিকেতনে অল্প ছাত্র—প্রায় সকলকেই

তিনি চিনতেন এবং অসীম স্নেহ দিয়ে ঘিরে রাখতেন। ১৩১৮ সালের ২৩এ আশ্বিনের তারিখ দেওয়া চিঠিখানি ঠিক চিঠি নয়। পূজোর ছুটিতে বিলেত যাবেন—জোড়াসাঁকোতে গিয়ে বরলাম, আপনাকে কিছু লিখে দিতে হবে। নামা কাজের মধ্যে, অসীম ধৈর্যের সঙ্গে এক পৃষ্ঠায় এইটি আর এক পৃষ্ঠায় “বদি এ আমার হৃদয়হুয়ার” এই গানটির কয়েকটি লাইন লিখে দিয়েছিলেন। এখানি শুধু আমাদেরই লেখা নয়—আমার মারকতে যেন শান্তিনিকেতনের সকল প্রাক্তন ছাত্রকেই বিদেশ বাতীর পূর্বে ঘেহাশীর্বাৎ। একেবারে শেষে প্রকাশিত চিঠিখানির মালিকের নাম, উচ্চারণ করতে পারলে পরে জানাব।

তৈশাখের প্রথম প্রবন্ধের “পাঁচফুলের সাজি” অংশে দুইটি সম্পাদকীয় ও একটি মুদ্রাকর প্রমাদের সংশোধন আবশ্যক। শ্রীযুক্তা অরুণমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স এখন পঁচাত্তর, সত্তর নয়। তাঁহার পিতা মতিলাল মুখোপাধ্যায় কাশীপুরে অবস্থানকালে পরমহংসদেবের শিষ্যদের চিকিৎসা করিয়াছিলেন, পরমহংসদেবের নয়। অরুণমা দেবীর স্বস্তুর অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায়—মুখোপাধ্যায় নয়।

কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার ‘স্ট্রাশনাল লাইব্রেরি’-কর্তৃপক্ষ উইলিয়ম কেরীর স্মরণে গত ২৬ মে যে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়া পৃথিবীর তথা ভারতের মুদ্রণশিল্পের গোড়ার দিককার নমুনাগুলি জনসাধারণের গোচরে আনিয়াছেন, একমুখে তাহার প্রশংসা করা যায় না। ওই সঙ্গে মুদ্রণশিল্পের উৎকর্ষব্যঙ্গক নমুনাগুলিও তাঁহারা উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই উপলক্ষে যে মনোহর-সুচিহ্নিত পুস্তিকাটি তাঁহারা প্রথম দিনের নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের উপহার দিয়াছেন, তাহার জন্তও তাঁহাদের নিষ্ঠা, অমুসন্ধিৎসা ও পরিশ্রমের প্রশংসা করিতেছি। সর্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে বাংলা দেশ, ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে বর্তমান গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রী বি. এস. কেশবনের অনাবিল প্রীতির প্রকাশ দেখিয়া। একটা কথা এখানে না বলিলে অন্তায় হইবে। যে দুইজন ইংরেজ মহাপুরুষের চেষ্টায় বাংলা দেশের মুদ্রণশিল্পের দ্বার উন্মোচিত হয় সেই ওয়ারেন হেস্টিংস ও চার্লস উইলকিন্স এই প্রদর্শনীতে ঘণোচিত সম্মান পান নাই। গীতার প্রথম ইংরেজী অনুবাদের বেলায় যেমন বাংলা হরফ প্রস্তুতের বেলাতেও তেমনই—ওয়ারেন হেস্টিংসই আদি প্রবর্তক, উইলকিন্স দ্বিতীয়।

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্ডাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা ৩৭ হইতে

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। কোন : বড়বাজার ২৮০৮

আত্মস্মৃতি

চতুর্থ প্রবাহ—তৃতীয় তরঙ্গ

‘রাজহংস’

শ্রীসজ্জনীকান্ত দাস



‘ভারত-ভবনে’র দাসাশ্রম অচিরাৎ কপিলপ্রসাদে পরিণত হইল। তুই দাস বিচ্ছিন্ন হইয়া স্ব-স্ব ভাগ্যাধেষণে প্রবৃত্ত হইতেই আপিস-ঘরে তালা পড়িল। তালা খুলিলেন সজ্জ-কাল-প্রত্যাগত ইঞ্জিনিয়ার শ্রীকপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য। দাসেরা ছিল আমার ব্যাপারী, ইনি হইয়া আসিলেন জাহাজের কারবারী। ক্ষীণ যোগস্বত্র ছিল সাহিত্যের। ছোটগল্প লেখায় কপিলপ্রসাদ তৎপূর্বেই নাম করিয়াছেন। মৎসম্পাদিত ‘বঙ্গশ্রী’তেও তাঁহার কালক্রমণ-বৃত্তান্ত ও একটি ছোটগল্প প্রকাশিত হইয়াছে। ভাগলপুরের সহিত দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকতে ইনি ‘বনফুলে’র বিশেষ পরিচিত ছিলেন, শ্রীপরিমল গোস্বামীর সহিত সেখানেই তাঁহার আলাপ; পরিমলদাই আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। কপিলপ্রসাদ ‘ভারত-ভবনে’র মাসিক ঘর-ভাড়া ও টেলিকোনের বিলের দায়মুক্ত করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। ‘শনিবারের চিঠি’র সম্পাদক পরিমল গোস্বামী হইলেন জাহাজের কারবারের বৈকালিক পরিচালক, কপিলপ্রসাদের ‘পার্টটাইম’ কর্মসচিব।

সাহিত্যের প্রতি প্রীতি অভ্যস্তকাল মধ্যে কপিলপ্রসাদের জাহাজডুবি ঘটাইয়া সাহিত্যের ঘাটে তাঁহাকে উত্তীর্ণ করিয়া দিল। ‘বনফুলে’র সজ্জ-রচিত বিচিত্র উপন্যাস ‘তৃণখণ্ড’ এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া বিভিন্ন সাময়িক পত্রে লিখিত ‘বনফুলের কবিতা’ প্রকাশে উজ্জ্বল হইয়া তিনি

রঞ্জন পাবলিশিং হাউসের সহিত যুক্ত হইলেন; তাঁহার স্ব-রচিত গল্পগুলির সংগ্রহ ‘ঘসেটিমলের তাঁবেদারী ও অন্ত্যাত্ম গল্পে’র পাণ্ডুলিপিও প্রস্তুত হইল। ১৯৬৬ সনের জাহাজি মাসের প্রথম সপ্তাহেই (পৌষ ১৩৪২) ‘তৃণখণ্ড’ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে বাহির হইল; ইহাই ‘বনফুলে’র প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। ‘বনফুলের কবিতা’ ও ‘ঘসেটিমলের তাঁবেদারী’ও ছাপা হইতে লাগিল। কপিলপ্রসাদের উৎসাহে রঞ্জন পাবলিশিং হাউস আর একটি গুরুতর সাহিত্যকর্মে প্রবৃত্ত হইল—সচিত্র সাপ্তাহিক ‘নূতন পত্রিকা’র প্রকাশ। এই পত্রিকাটি যদিও মাত্র পাঁচ সপ্তাহ বাহির হইয়াছিল, কিন্তু তৎকালীন বিদগ্ধজনের মনে ইহা যে পরিমাণ আশা ও আগ্রহের সঞ্চার করিয়াছিল তেমনটি আর কোনও সাপ্তাহিক পত্রিকা করে নাই। করিবেই বা না কেন? মাত্র বত্রিশ পৃষ্ঠার এই চটি সাপ্তাহিকটির পাঁচ সংখ্যায় প্রবন্ধ জোগান দিয়াছিলেন আচার্য যত্ননাথ, পণ্ডিত সুনীতিকুমার, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অমল হোম, অনাথনাথ বসু, গোপাল ভট্টাচার্য, হিরণকুমার সান্যাল, নির্মলকুমার বসু, স্বকুমার বসু প্রভৃতি; গল্প জোগাইয়াছিলেন বাংলা দেশের সেকালের শ্রেষ্ঠ কথাসিঙ্গী-পঞ্চক—বিক্রান্তিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারানন্দর, বনফুল, মনোজ ও শরদিন্দু; রস-রচনার দ্বারা রসায়িত করিয়াছিলেন প্র. না. বি., পরিমল গোস্বামী প্রভৃতি; এবং আলোক-চিত্রের সাহায্যে বাংলার শ্রী ফুটাইয়া

তুলিয়াছিলেন পরিমল গোস্বামী ও শঙ্কু সাহা। স্বয়ং সম্পাদক শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী স্বনামে ও বেনামে প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় টিপ্পনী এবং সাহিত্য ও শিল্প সমালোচনার বান ডাকাইয়া সাময়িক সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে উচ্চ আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহার তুলনা মেলা ভার। বস্তুত এই সাপ্তাহিকটি যদি দীর্ঘস্থায়ী হইত, তাহা হইলে নীরদচন্দ্র নিজেকে অজ্ঞাত ভারতীয় (Unknown Indian) আখ্যা দিয়া বিজাতীয় ভাষায় আত্মজীবনী লিখিবার ছলে স্বদেশদূষণ করিবার অবকাশই পাইতেন না। যে অসাধারণ কৃতিত্বের সূচনা নীরদচন্দ্র পাঁচ সপ্তাহে দেখাইয়াছিলেন, তাহা সম্যক স্মৃতি লাভ করিতে পারিলে বাংলার সাময়িকপত্র-জগৎ নূতনতর শ্রী লাভ করিত।

পত্রিকল্পনার কালেই আমার ভূমিকা ছিল পরিচালকের ও ব্যবস্থাপকের। প্রথম কাজ হইল সম্পাদক-নির্বাচন। বেগু পাইতে হইল না। নীরদচন্দ্র তখন 'প্রবাসী'-মডার্ন রিভিউ'র সহ-সম্পাদকের কাজে ইন্তফা দিয়া বেকার বসিয়া ছিলেন। কষ্টেই ছিলেন, অপেক্ষাকৃত অল্পবেতনে তাঁহার মূল্যবান সহায়তা সংগ্রহ করিতে পারিলাম।

১৯৩৫ সনের শেষের দিকে প্রস্তাব পেশ করামাত্রই নীরদচন্দ্র সানন্দে সম্মত হইয়া কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেলেন। আমি পরিচালক, তিনি সম্পাদক; প্রফ দেখার জন্য একজন ও হিসাবপত্র বিজ্ঞাপন ইত্যাদির জন্য আর একজন কর্মচারী নিযুক্ত হইলেন। নীরদচন্দ্র তখন ছেঁড়া চাটাইয়ের হুখ মাহুটি হইলে কি হইবে, তাঁহার ছিল বাদশাহী মেজাজ এবং নভোচুঘী কল্পনা। সেই কল্পনাকে রূপ দিতে গিয়া রঞ্জন পাবলিশিং হাউস চক্ষে সরিষাফুল দেখিল। ক্রাস-ফেরত সিমেন্ট-কংক্রীট-পারদর্শী কপিলপ্রসাদের দরাজ দিলেও ফাটল ধরিল। চক্ৰিশে জাহ্নুয়ারি (১৯৩৬) শুক্রবার প্রথম সংখ্যা বাহির হইল। উৎকৃষ্ট কাগজ, সর্বোত্তম ছবি এবং তত্ত্বপুষ্ট ছাপাই না হইলে সম্পাদকের মন উঠে না, কাজেই পরিমল গোস্বামী ও শঙ্কু সাহা'র পূর্ণপৃষ্ঠাব্যাপী ছবির তলব হইল; দেশী ব্রকপ্রস্তুতকারী কারখানার উপর তাঁহার বিশ্বাস নাই, সুতরাং 'স্টেটসম্যান'-আপিসের ব্রক নির্মাণ কারখানার সাহায্য প্রয়োজন হইল। দুই সপ্তাহ বাইতে না বাইতেই স্বপ্নজাল ছুঁতেই হইয়া উঠিল, পঞ্চম সপ্তাহের সঙ্গে সঙ্গে

কপিলপ্রসাদ হাওয়া হইয়া গেলেন, আমি তাঁহার পশ্চাদ্ভাবন করিয়া ভাগলপুর-কাটিহার করিতে লাগিলাম। পাঁচ সপ্তাহের শিশু 'নূতন পত্রিকা' ধূমকেতুর চমক লাগাইয়া মরিয়া গেল।

অকালে মরিয়া গেলেও এই পত্রিকাটি একটা আদর্শ রাখিয়া গিয়াছে, পরবর্তীঘেরা তাহা গ্রহণ করিলে উপকৃত হইবেন। প্রথম সংখ্যার প্রথম নিবন্ধে ('নূতন পত্রিকা') সম্পাদক মহাশয় সর্বিনয়েই বলিয়াছিলেন—

"নিজদের দুর্বলতা, কামনা বা খেয়ালকে ভবিষ্যতের কাঁখে চাপাইয়া আমাদের পত্রিকাকে অনাগত যুগের অগ্রদূত বলিয়া ঘোষণা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। 'নূতন পত্রিকা'র বিষয়বস্তু ও অবলম্বন বর্তমান। এই বর্তমানকে ধ্বংসাত্মক বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিলেই আমাদের কতব্য সমাপন হইল মনে করিব।"

'নূতন পত্রিকা'র নূতন ও পুরাতনের একটা সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা হইয়াছিল। এ দেশে সাময়িক পত্রের পুরাতন পদ্ধতি ছিল, পত্রিকার পক্ষে একদল লেখক ক্রমাগত কথা বলিয়া যাইতেন এবং স্কুল-কলেজের ক্লাসের প্রাণহীন ছাত্রের মত অপর পক্ষকে তাহা শুনিয়া যাইতে হইত। 'নূতন পত্রিকা' বলিলেন—

"আমাদের দেশে সাময়িক পত্রে অনেক সময়ে জীবন্ত ভাবের যে অভাব দেখা যায়, তাহার কারণ লেখক ও পাঠকদের মধ্যে ঘোঁরের অভাব।... যে যেনের পাঠকবর্গ বত প্রাপ্তবান, সে দেশের সাহিত্য দর্শন রাজনৈতিক চিন্তাও ততই সতেজ। দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের মধ্যে সমতা না থাকিলে শিক্ষাবৃত্তি চলে, সৃষ্টি চলে না। সেজন্য আমরা আমাদের পাঠকসমিিকে নিজস্বের বক্তব্য বলিতে ও আমাদের বক্তব্য সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত জানাইতে সাগ্রহে আহ্বান করিতেছি।"

ইহাই হইল নূতনের প্রবর্তন। মহত্তর আদর্শের বেলায় 'নূতন পত্রিকা' পুরাতনকেই প্রাধান্য দিতে গিয়া বলিলেন—

"বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য দেশে অনেকে সাময়িক পত্রকে লোকনিকা বা স্বাধীন চিন্তার বাহন বলিয়া আর মানিতে চান না। তাঁহারা উহার নিকট হইতে প্রত্যাশা করেন শুধু মনোরঞ্জন বা আনন্দ। এই চেতনা আমাদের দেশেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে, কিন্তু সংবাদপত্রের কতব্য অতি মহান এইরূপ একটা চিরপ্রচলিত ধারণা থাকতে এখনও পুরাতন সংস্কারকে ছাপাইয়া উঠিতে পারে নাই। ফলে আমাদের সাময়িক পত্রের পরিচালনার একটা আভ্যন্তরীণ বন্দ, কথায় ও কাজে একটা বিরোধ দেখা দিয়াছে। সেজন্য দেখি, অনেকে সাময়িক পত্রের উচ্চ কতব্য আছে স্বীকার করিলেও কার্যক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা ও আর্থিক সাফল্যকেই প্রাধান্য দিয়া থাকেন। আমরা কিন্তু সাময়িক পত্রের কতব্য ও জনপ্রিয়তার মধ্যে একটা মূলগত বিরোধ আছে, এ কথা মানি না।

সাধারণ মানুষ শুধু কণ্ঠস্বর আন্দোল চায়, আর কিছু চায় না—ইহাকেই চরম সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলে গণতান্ত্রিক সমাজে আত্মা রাখা সম্ভব নয়। যে দিন সাময়িকপত্রসবো গণমনোরঞ্জনকেই তাঁহার একমাত্র বৃত্তি বলিয়া মানিয়া লইবেন, সে দিন হইতে আর কোন চিন্তামূল আদর্শবাদের সংবাদপত্র-জগতে স্থান হইবে না।”

বাংলা সাময়িকপত্র-জগতের সেই ঘোর সঙ্কটকাল আজ উপস্থিত হইতে দেখিয়া ‘নূতন পত্রিকা’র “নিবেদন” এমনভাবে স্বরূপ করিতেছি। যে দুই-চারিখানি সাময়িক পত্র আজ সাক্ষাৎলাভ করিয়াছে, তাহাদের চিন্তালেশহীন গণমনোরঞ্জন-প্রয়াসই প্রতিদিন উৎকটরূপে প্রকট হইয়া উঠিতেছে। ভাষার শৈথিল্যে ধর্ম-সমাজনীতি-দর্শনও রম্যায়িত হইয়া “মছল মছল যাই”তেছে, সেত্বের স্বড়স্বড়ি সর্বদা মাখিয়া কথা-সাহিত্য মননানন্দমোদকে পরিণত হইতেছে এবং কবিতার নামে যাহা পরিবেশিত হইতেছে তাহা উচ্চকোটির পাগল বা মাতালের প্রলাপোক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

“উচ্চকোটি” বলিতে ভাষাতত্ত্ব-ধূস্কর সুনীতিকুমারকে মনে পড়িল। ‘নূতন পত্রিকা’র দ্বিতীয় সংখ্যায় (৩১ জ্যৈষ্ঠবার, ১৯৩৬) “আজি হতে কুড়ি বর্ষ আগে” তিনি “রাষ্ট্রভাষা” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তখন ভারতের স্বাধীনতার সম্ভাবনা স্বদূরপর্যন্ত ছিল। খিলাফত-খেয়ালী মহাত্মা গান্ধীর “হিন্দুস্থানী”র অঙ্গুরোধামাত্র হইয়াছে। সুনীতিকুমার সেদিন যাহা বলিয়াছিলেন, কালের গতিকে আজ তাহাই অবশ্যস্বাবী হইয়া উঠিয়াছে। ভবিষ্যৎ সমস্তা ও সঙ্কটের আভাস পাইয়া তিনি সেদিন সমাধানের যে সহজ রাস্তা নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা অরুণ হইলে অহিন্দীভাষাভাষীদের আজ রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের ধমক খাইতে হইত না। সুনীতিকুমারের প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতে পারিলেই খুশি হইতাম, স্থানাভাবে তাঁহার মূল বক্তব্যটি মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি—

“ভারতের রাষ্ট্রভাষা, অর্থাৎ ‘এক রাজ্যপাশে বাঁধা’ সমগ্র ভারতবর্ষের একতার প্রতীক-স্বরূপ ভাষা, কি হওয়া উচিত, সে-বিষয়ে ভারতের বৈশ্বীরাগ লোক একরকম স্থির করিয়া লইয়াছেন, এবং এই স্থিরকরণের কলে অনেক (বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতে তেলুগু আর কন্নড়ভাষীদের মধ্যে) সেই ভাষা শিখিতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গিয়াছেন। অল্পসংখ্যক লোকে ইংরেজীর পক্ষে; বাঙ্গালা দেশের আরও অল্পসংখ্যক লোক বাঙ্গালা ভাষাকে ভারতের এক-বিধায়ক ভাষারূপে সেবিবার স্বপ্ন দেখেন। দু-

চারজন সংস্কৃতকেও ভারতের রাষ্ট্রভাষা করিবার আকাঙ্ক্ষা গোপন করেন। এখন বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের কথা গুণ্য নয়—দুইটির একটীরও আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্যতা নাই। বাকী থাকে ইংরেজী আর হিন্দুস্থানী। ইংরেজী অবশ্য আমরা কিছুতেই ছাড়িতে পারিব না। এদেশ হইতে ইংরেজের শাসন অন্তর্হিত হইলেও ইংরেজী ভাষা থাকিবে, কারণ ইংরেজী ভাষা আধুনিক সভ্যতার মূখ্য বাহন, আধুনিক জগতের সঙ্গে যোগ রাখিতে হইলে ইংরেজী না হইলে চলিবে না। কিন্তু সকলের ইংরেজী না শিখিলেও চলিবে। বাহারা ইংরেজী শিখিবে না, এমন সব ভারতবাসীর, জন্ত আপসে-কথা কহিতে একটি ভাষার দরকার হইবে; এবং জাতীয় ঐক্যের নির্দর্শন হিসাবে নিখিল ভারতীয় ব্যাপারে ভারতের আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা হিসাবে এই ভাষা ব্যবহার করিয়া আমরা খুশি হইব। সে ভাষা কোন ভাষা হইবে? মহাত্মা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই বলিয়াছেন ও বলিতেছেন, সে ভাষা হইবে ‘হিন্দুস্থানী’।

এখন এই হিন্দুস্থানী ভাষার স্বরূপ লইয়া একটু গোলমালে পড়িতে হইতেছে। মোটামুটি বলা চলে, হিন্দুস্থানী ভাষার চারিটি রূপ আছে—দুইটি সাহিত্যিক রূপ, দুইটি কথ্য রূপ। সাহিত্যিক রূপ দুইটি হইতেছে, (১) সাধু হিন্দী, (২) উর্দু। হিন্দী ও উর্দুর ব্যাকরণ একেবারে এক। সাধারণ শব্দ, চলিত বিশেষণ, ক্রিয়া, সংখ্যাবাচক শব্দ, অসার শব্দ এক। প্রভেদ—বর্ণমালা ও উচ্চকোটির সংস্কৃতিমূলক শব্দ লইয়া।... মুখে হিন্দু মুসলমান উভয়েই বলিবেন—“হুঁ সড়ক-পর ঘুমতে থে,” কিন্তু লিখিবার কালে ঐ একই কথা হিন্দু লিখিবেন নাগরী অক্ষরে, মুসলমান লিখিবেন ফারসী হরকে; আবার হিন্দু একটু পণ্ডিতী করিয়া লিখিবেন—“হুঁ রাজপথ পর বিচরণ করতে থে,” মুসলমানও একটু মুন্সীয়াশা ফলাইয়া লিখিবেন—“হুঁ রাহপার সৈর করতে থে”—হুঁ, হিন্দী ও উর্দু পৃথক পৃথক ভাষা হইয়া গেল। এই দুইটি হইল সাহিত্যিক রূপ।...

হিন্দুস্থানীর এই সাহিত্যিক রূপ ছাড়া, ইহার দুই প্রকার কথ্য রূপ আছে। (৩) হিন্দুস্থানী ভাষা ভারতের বহু স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িলেও, মূল্যতঃ ইহাকে পূর্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিম সংযুক্ত-প্রদেশের হিন্দু-মুসলমান মিশ্রিপক্ষে জন-সাধারণের যেরো ভাষা বলা বাইতে পারে।...

হিন্দুস্থানীর আর একটি কথ্য রূপের সৃষ্টি হইয়াছে; এই কথ্য রূপকে (৪) ‘চালু হিন্দুস্থানী’ বা ‘বজার (অর্থাৎ বাজারিয়া) হিন্দুস্থানী’ বলা বাইতে পারে। পাঞ্জাব, রাজস্থান, কাশ্মীর, সিন্ধ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্য ও পূর্ব সংযুক্ত-প্রদেশ, কুমায়ুন, গাড়োয়াগ, মেগাল, বিহার, বাঙ্গালা, আসাম, উড়িষ্যা—এই সমগ্র ভূখণ্ডের আর্থ ভাষা ও উপভাষা বলে বহু লোক তাহাদের সকলে সাধারণ ভাবে (কষ্ট করিয়া ব্যাকরণ ও বই পড়িয়া সাধু হিন্দী বা উর্দু না শিখিলে) যে হিন্দুস্থানী বলে তাহা ‘চালু বা বজার হিন্দুস্থানী’—তাহা মোটেই শুদ্ধ হিন্দুস্থানী (কথ্য, কেতাবী উর্দু বা হিন্দী) নহে। কষ্ট করিয়া বা স্বল্প করিয়া কখনও হিন্দী বা উর্দু শেখে নাই, এমন বাঙ্গালী শিক্ষিত ভ্রমলোক ব্যবসার উপলক্ষে (ধরন কোনও

বঙ্গদেশজাত শিল্প বা অস্ত্র দ্রব্য বিক্রয় কারতে) অথবা ভীষণাশ্রী বা ভয়ংকরিতে পাটনা, কানী, গোরকপুর, এলাহাবাদ, লখনৌ, আগ্রা, মথুরা, দিল্লী লাহোর, অরপুর, ইত্যক আনন্দাবাদ, সুরাট, বোম্বাই পর্যন্ত ঘুরিয়া আসিলেন। ১০০০খাহারা ইংরেজী জানে না এমন লোকের সঙ্গে কলিকাতায় বিনা আয়াসে যে চলতি হিন্দুস্থানী তিনি শিখিয়াছেন তাহাই প্রয়োগ করিয়া আসিলেন। রেলের কুলী, দোকানদার, হোটেলের লোকজন, পাণ্ডা, রেলের কেরানী বা গার্ড, রাস্তার পাহারাওয়াল, গাড়োয়ান, মোটর চালক, সকলের সঙ্গে এই ভাষাতেই কথাবার্তা চলিল। এই চলতি হিন্দুস্থানী লইয়া বোম্বাইয়ের লোক কলিকাতা পর্যন্ত আসিয়া থাকে, কচুয়ী কচুয়ীর, শিখ মিট্রী, কলিকাতার উড়িয়া মিট্রী, মাদোয়ারী ব্যবসায়ী, পশ্চিমা মিঠাইওয়াল, কলিকাতার উপনিবিষ্ট চীনাখ্যাম বা বোম্বাইয়ী ইহুদী বা আর্মীনী, ফিরঙ্গী, ইংরেজ—সকলেই এই চলতি হিন্দুস্থানী বলে, এবং পরস্পরের কথা বোঝে, কাজ চালাইয়া লয়, ঠাঠা বন্দরগও করে ১০০০ভারতবাসী (চলতি হিন্দুস্থানীর) ঠাট্টা এক। এই ঠাট্টা অতি সরল, সহজ, এবং শুদ্ধ হিন্দুস্থানীর (হিন্দীর, উর্দুর) তুলনায় স্নগদ তরল, অথচ ইহা ভাবপ্রকাশের খুবই উপযোগী। এই চলতি, চালু বা বজার হিন্দুস্থানীই হইতেছে ভারতের সীমান্ত রাষ্ট্রভাষা, ইহার ব্যাকরণগত সারল্য, ইহার এক বিশেষ সম্পদ। ইহার আধারের উপর— শুদ্ধ হিন্দুস্থানীর ব্যাকরণগত সঠিকতার উপর নহে, ভারতের শক্তিশালী সত্যকার ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রভাষা নিহিত। ১০০

বাহারী পঁছাহের বা পাঞ্জাবের বা মধ্যভারতের লোক, জন্মগত অধিকারে মৌখিক শুদ্ধ হিন্দুস্থানী বলেন, অথবা বাহারী চেষ্টা করিয়া শুদ্ধ কেতাবী হিন্দী বা উর্দু শিখিয়াছেন বা শিখিতেছেন তাহারা শুদ্ধ হিন্দী বা উর্দু লিখিবেন, তাহাতে সাহিত্য সৃষ্টি করিবেন। বাজে লোক, বাহারী সাধু হিন্দী বা উর্দু আয়ত্ত করা কঠিন মনে করে, তাহাদের জন্মই, সভ্যসমিতিতে নিজের মনোভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা, এখন তাহারা গণে ঘাটে লোকসনে গুপ্তে যে ভাবে চালু হিন্দুস্থানীতে কাজ চালাইয়া লইতেছে সেইরূপ করিতে দেওয়া হউক, এক সেইরূপ করিবার ক্ষমতা কোনও সুযোগ্য প্রতিষ্ঠান হইতে বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা চালু হিন্দুস্থানীর একটা সর্বজনমান্য রূপ ঠিক করিয়া দেওয়া হউক। ইহাতে হিন্দুস্থানীর প্রসার বাড়িবে, ভাষার সারসংক্ষেপ রাষ্ট্রীয় এক্যবোধ আরও স্বত্ব হইবে।"

৮ই ফাল্গুন (১৩৪২) পঞ্চমবারের ক্ষুদ্র আত্মপ্রকাশ করিয়া 'নূতন পত্রিকা' পঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিলেন। কপিলপ্রসাদের সঙ্কলিত 'বনকুলের কবিতা' ফাল্গুনের মাঝামাঝি প্রকাশিত হইল। কিন্তু সঙ্কলক স্বয়ং তখন অন্তর্ধান করিয়াছেন। আমি ঋণজালে খুবই জড়াইয়া পড়িয়াছি। সন্ত-কীর্ত মুদ্রায়ত্তে 'নূতন পত্রিকা' ও তিনখানি পুস্তকের দৌলতে বেশ কাজ হইতেছিল, আবার তাহা বেকার হইয়া পড়িল। রাজহংস-সিরিজের

প্রায় সবগুলি কবিতাই তখন লেখা হইয়া গিয়াছে। আমার অবসাদগ্রস্ত মন এবং হঠাৎ-স্বত্ব মুদ্রায়ত্তকে চাঞ্চা করিবার ক্ষুদ্র শুভাঙ্কন্যায়ী বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন 'রাজহংস' নাম দিয়া কবিতাগুলি পুস্তকাকারে ছাপিতে। কাগজের টাকাও ভোঁ যোগাড় করিতে হইবে, স্তবরাং খুব উৎসাহিত হইলাম না। শেষ পর্যন্ত বোনামোনা করিয়া ধারে ব্রীম করে কাকগজ কিনিয়া ফেলিলাম। কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া সাজাইয়া লইতে বিলম্ব হইল না। 'রাজহংস' ছাপা আরম্ভ হইল ফাল্গুনেই, চৈত্রের মাঝামাঝি ছাপা শেষ হইয়া গেল। 'রাজহংস' পুস্তকের আকাশে উড়িবার অধিকার লাভ করিল।

বিপন্ন সঙ্কনীকাস্তকে ঘিরিয়া তখন শুভাঙ্কন্যায়ীর সংখ্যা অনেক। 'বঙ্গভী'তে বাহারী ছিলেন তাঁহাদের তালিকা কবি প্রমথনাথ বিষ্ণী তাঁহার স্বাভাবিক সরসভঙ্গিতে "পুৰাতন পঞ্জিকা" ও "পুৰাতন পঞ্জিকা : এক শত বৎসর পরে" শীর্ষক দুইটি কবিতায় ছন্দোবদ্ধ করিয়াছেন। ভবিষ্যতে ইহাদের পরিচয়-দান-প্রসঙ্গে প্রমথনাথের অপূর্ব বর্ণনার সাহায্য আমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। আপাতত এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, 'বঙ্গভী'র আশ্রয়চ্যুত হইলেও ইহাদের অধিকাংশেরই সৌহার্দ্যে বঞ্চিত হই নাই। সুনীতি-কুমার, ব্রজেননাথ, তারাকর, নীরদ, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ, নৃপেন্দ্র, সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ, পরিমল, প্রমথনাথ তো ছিলেনই—পলাতক স্বলচন্দ্র আবার ফিরিয়া আসিয়াছিলেন ব্রজশৈলাহত হইয়া অর্ধাৎ বার্মাশেলের চাকরি ছাড়িয়া। আরও দুইজন নূতন কবিবন্ধু জুটিয়াছিলেন—একজন বয়সে প্রবীণ, শ্রীশান্তি পাল; অল্পজন অতি তরুণ, শ্রীমান জগদীশ ভট্টাচার্য। 'বঙ্গভী'র আমলেই ইহাদের সহিত পরিচয়ের স্বত্রপাত হয়। 'রাজহংস' প্রকাশ সম্বন্ধে এই দুই জনের আগ্রহ ছিল সর্বাধিক।

'রাজহংস'র কবিতাগুলি প্রায় আড়াই বৎসর ধরিয়া বিচ্ছিন্ন কালে ও স্থানে রচিত হইলেও ভাবে সুরে ও ছন্দে ইহা একটি অখণ্ড কাব্যগ্রন্থ হইতে পারিয়াছে। সর্বশেষ কবিতা "আকাশ-সাগর" সর্বশেষে রচিত হয়, সে কাহিনী গতবারে বলিয়াছি। গ্রন্থমধ্যেই ইহা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ মুদ্রিত হইবার পর গোড়ায় মায়ের নামে উৎসর্গ-কবিতাটি রচিত ও সংযোজিত হয়। মাতৃবন্দনায়

গ্রন্থের আরম্ভ, সহধর্মিণীবন্দনায় শেষ। মাঝখানে চারিটি বিভাগ—হিমালয়, নিঝরিণী, অরণ্য-প্রান্তর ও আকাশ-সাগর। শেষ বিভাগে একটিমাত্র কবিতা। হিমালয় হইতে উদ্ধৃত নিঝরিণী অরণ্য-প্রান্তর অতিক্রম করিয়া সাগরে বিলীন হইতেছে—সমস্ত কাব্যের ইহাই স্বর। “নিঝরিণী” অংশের “তমসা-জাহ্নবী” কবিতা সাময়িকপক্ষে সবশেষে প্রকাশিত হয়—১৩৪১ সালের অগ্রহায়ণের ‘প্রবাসী’তে।

চপল “নিঝরিণী”র অংশভুক্ত হইলেও “তমসা-জাহ্নবী”তে নৈরাশ্র ও অবগাদের স্বর স্পষ্ট। বর্তমানে কবির আস্থা নাই, ভবিষ্যতের ভরসায় সে বসিয়া আছে—

বহুধা আলোকের কান্ত আমি রূপ দেখে দেখে,
মিরাবাস অন্ধকারে ছু দণ্ড বসিব মিলনসাহে—
তুমি ব'শ কাছে মোর হাতে তব হাতখানি রেখে।
মনে কর হৃৎ দাই, নাই শশী, নাই তারাবল ;
পথ ভুলি এ আঁধারে পশে না পথিক ধ্বংসেতু ;
ধসে না জলন্ত উষ্ণ, প্রান্তরের আলোর মত
খেলে না বিদ্যুৎ-বিত্ত আকাশের প্রোঙ্গন চিরিয়া।
আলোরগ্নি-স্পর্শহীন অনন্ত আদিত অন্ধকারে
ব'সে আছি ছই জনে, এইটুকু শুধু জানিয়াছি—
আলোকের সজাবনা কলসে যোজন কোটি দূরে।
সেখা হতে নিরন্তর রসিমুখে আসিছে ছুটিরা,
অন্ধ মুক অন্ধকারে আসিছে সরল রেখা টানি,
প'হরিবে হেথা আসি হরতো বা কোটি জগদন্তরে,
পরশ করিবে স্নেহে আমাদের প্রান্তর-পশুর,
ভবিষ্য আলোর সূত পাঁহিবে মোদের জয়গান,
তমসা-তীর্থে কবি খ্যাত হবে আলোকের যুগে।

গ্রন্থপ্রকাশকালেও এই অবসাদ কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই, তাই দীর্ঘ ছয় বৎসর পরে স্বরচিত কাব্যগ্রন্থ এবং সর্বপ্রথম জীবনদর্শনমূলকিত গ্রন্থ বাহির করিয়াও তেমন উৎসাহিত হইয়া উঠি নাই, যদিও অন্তরের গহন গভীরে তখনও বিশ্বাস ছিল এবং এখনও আছে

তমসা-তীর্থে কবি খ্যাত হবে আলোকের যুগে।

‘রাজহংস’ প্রকাশিত হওয়ার পর কবিবন্ধু প্রমথনাথ বিলীর উল্লাসের কথা স্মরণ আছে। বন্ধুজনকে স্বহস্তে লিখিয়া বই উপহার দিতেছি, আমার আনন্দের ভাগ সেইটুকু। হঠাৎ প্রমথনাথ প্রত্যাব করিলেন, রবীন্দ্রনাথকে

একখানা ‘রাজহংস’ পাঠাইতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমার মনোভাব তখন

হিমালয়-শিরে তুষার গলিয়া গেছে,
সবুজ মাটির পেতেছি আভাস যেন

হইলেও বহু দিনের ব্যবধানহেতু যথেষ্ট সঙ্কোচ ছিল। প্রমথনাথ সে সঙ্কোচ জোর করিয়া ভাঙিয়া দিলেন। বই একখানা পাঠাইতে হইল। প্রমথনাথ কবির অভিমত চাহিয়া পত্রাঘাত নিশ্চয়ই করিয়াছিলেন, পুস্তকপ্রেরণের সপ্তাহকাল মধ্যে তিনি তাঁহাকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত পত্রটি আমার নাকের উপর ধরিয়া প্রনাবিক হাসি হাসিলেন। বৈরাগ্যের পঞ্চমস্তরে উত্তীর্ণ হইলেও কম্পিত চিত্তে পড়িলাম—

ও

“Uttarayan”

Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়েষু,

অভিমত দিতে আমি একান্ত নারাজ—
ভালোই বলি আর মন্দই বলি এতে দেশের
ছর্ম্মুখকে জাগিয়ে তোলা হয়। বড়ো অশাস্তি,
আমার বয়সে এই ছুর্বিপাক থেকে নিষ্কৃতি দাবী
করতে পারি। তোকে গোপনে বলি, রাজহংস
বইখানি ভালো হয়েছে। আমার মতে কবিতার
ছই জাত আছে ভালো এবং মন্দ। মাঝখানে
যে সঙ্কর বর্ণের আবির্ভাব দেখা যায় তাদের জাতি
নির্ণয় করতে বুধা পরিশ্রম না করাই শ্রেয়। এই
ইসারাটুকু দিয়েই ক্ষান্ত হলাম, এ নিয়ে হট্টগোল
করিস নে।

ছন্দ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে গদ্য এবং
পদ্য—কাব্যের এই দুই ছন্দ আছে। রাজহংসের
ছন্দ স্পষ্টতই পদ্য ছন্দ; তাকে তোর চিঠিতে
গদ্য ছন্দ কেন আখ্যা দিয়েছিলি বুঝতে পারলুম না।
আমি আজকাল অনেক সময়ে গদ্য ছন্দে কবিতা
লিখি—আর কোনো ছন্দে ঠিক এই সকল ভাব

বলা আমার পক্ষে সাধ্য নয় বলেই আমার এই
অধ্যবসায়। কাজটা কিছুমাত্র সহজ নয় একথা
জানিয়ে রাখলুম। সহজ মনে করে যদি প্রবৃত্ত
হোস তবে হঠাৎ ঘাটের থেকে পড়বি পাঁকের
মধ্যে। ইতি ২৯ এপ্রেল ১৯৩৬

শুভানুধ্যায়ী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথমনাথের রূপায় সেই দিনই মূল চিঠিখানি হস্তগত
হইল বটে, কিন্তু কবির মর্যাদা স্বাক্ষর করা বিন্দুমাত্র
“হট্টগোল” করিলাম না, গোপন কথা গোপনেই রাখিলাম।
দেশের দুর্ভাগ্যকে জাগাইয়া তোলা হইল না দেখিয়া স্বয়ং
রবীন্দ্রনাথও হয়তো খুশি হইলেন। আজ পর্যন্ত কথাটা
চাপিয়াই রাখিয়াছিলাম; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আশ্বিনবিশ্বত
হইয়া অস্বস্তি আর একজনের কাছেও যে ‘রাজহংস’র
প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহার খবর পাওয়া গেল; তিনি
তাহা গোপন রাখেন নাই, ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করিয়া
দিয়াছেন। সুতরাং আজ বন্ধু প্রথমনাথের মর্যাদাহানির
প্রশ্ন নাই।

রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন মূলী শ্রীহরীচন্দ্র কর সেই
অপরাধ করিয়াছেন। তিনি “রবীন্দ্র-আলোকে রবীন্দ্র-
জীবন” (‘যুগান্তর’ শারদীয়া সংখ্যা ১৩৫৫) শীর্ষক নিবন্ধে
সেই দিনের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যেদিন ভাকযোগে
‘রাজহংস’ রবীন্দ্রনাথের হস্তগত হয়। তাঁহার কথাই
উদ্ধৃত করিতেছি—

“স্মৃতিস্মৃতি টান প’ড়ে এই প্রসঙ্গে মনে
আসছে আর এক দিনের কথা। ১৩৪৩ সনের
বৈশাখ। চলছে কবির ‘পত্রপুট’ কাব্যের পালা।
তার তের নম্বরের কবিতাটি সেই দিনই কি তার
আগের দু-একদিনের মধ্যেই লেখা হয়েছে। কপি
ক’রে এনে দেওয়া গেল কবির হাতে। কবি
তখন “কোনর্ক”—বাসী। “কোনর্ক” গৃহের বারান্দার
সামনে যে শিমুল গাছটি আছে, তার তলায়
বসেছেন কবি সকাল বেলায় কাজে। লেখার
টেবিল পাঁতা রয়েছে সামনে। সন্ধ্যা রচিত

উপরোক্ত কবিতার কথাই চলছিল। খ্যাতনামা
সাহিত্যিকের কাব্যোপহার [‘রাজহংস’] এসে
পৌঁছেছে হাতে, সেই ডাকেই। প্যাকেট থেকে
বই খুলে উন্টেপাণ্টে দেখলেন। হঠাৎ বললেন,
‘আমি পারি নি, কিন্তু এ পেরেছে, যা বলতে
চেয়েছি—এর মধ্যে দেখছি কত সবল সুন্দর তার
প্রকাশ।’ বিশ্বকে সর্ব অনুরূপে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা
থেকে লেখা কবির ‘পত্রপুট’র সেই তের নম্বরের
কবিতাটি। সে বেদনা তাঁকে এমন পেয়ে বসেছে,
দিনরাত্তি ঐ ভাবছেন আর লিখছেন, কাটিছেন,
যোগ করছেন; কবিতা লিখেও মনের ভার
কমে নি, একটার পর আর একটা লিখছেন।
বারো নম্বরের কবিতাটিতে তার আগে মর্মান্তিক
বেদনা জানিয়েছেন। বিশ্ব-জীবনের বিশেষ বিশেষ
বাস্তব অভিজ্ঞতার অক্ষমতা নিয়ে। তাতে শেষটায়
লিখেছেন—

‘মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে

যে উদ্ধার করে জীবনকে

সেই রুজমানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত

ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি

অপরিষ্কৃততার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছি চ’লে।

... ..

বৃহ ভেদ ক’রে

স্থান নিইনি যুদ্ধামান দেবলোকের সংগ্রাম-

সহকারিতায়।

কেবল স্বপ্নে শুনেছি ডমরুর গুরু গুরু,

কেবল সমরযাত্রীর পদপাতকম্পন

মিলেছে হৃৎস্পন্দনে বাহিরের পথ থেকে।

যুগে যুগে যে মানুষের সৃষ্টি প্রলয়ের ক্ষেত্রে,

সেই শ্মশানচারী ভৈরবের পরিচয়জ্যোতি

জ্ঞান হয়ে রইল আমার সন্ধ্যায়,

শুধু রেখে গেলেম নত মস্তকের প্রশ্রাম

মানবের হৃদয়ামীন সেই বীরের উদ্দেশে,
মর্ত্যের অমরাবতী ধীর সৃষ্টি

মৃত্যুর মূল্যে, চুৎখের দৌণ্ডিতে।

এতেও হয় নি, আরো সুনির্দিষ্ট যথাযথ
সতেজরূপ দেওয়ার কথাই মনে ঘুরছে, ব্যোমকনিষ্ঠ
কবির মধ্যে স্বীয় অন্তঃকরের সার্থকতার সাড়া
পেয়ে নিজের শিল্পক্ষুণ্ণ রচনার বেদনাকে ছাপিয়ে
উঠেছিল সেই অপরের প্রশস্তিবাদ অকুণ্ঠ
উৎসাহে।”

একটি বিষয়ে আজ আমার কোনই সংশয় নাই যে,
রবীন্দ্রনাথ সেই দিন ‘রাজহংসে’র “কালকূট” কবিতাটিতে
নিজ বক্তব্যের স্মৃতিস্তর প্রকাশ দেখিয়েছিলেন, যেখানে
আমি বলিয়াছিলাম—

সে মৃত্যু আমার মৃত্যু নয়—

বিগলিত ছাইরা উড়ে আমার শিবের জটাজাল,
আকাশ আঁধার করে অঙ্গের বিহুতি।

ভূমিকম্প নহে তাহা, নহে গির্জা-বিদারণ-রূপ—

সে তো পলকের লীলা, নটেশের এক পথপাত,
দিকে দিকে ঝেঁঝে মৃত্যুর তান্তব।

তারই মাঝে জীবন-অঙ্কুর

শাখা-পত্র-পুষ্প মেলে আলোকের পানে,
এলয়ে করে না ভয়, ঝড়োরে মৃত্যুর মুখাধি
আপনি বাড়িয়া চলে আপন গৌরবে।

আমার মৃত্যুর মাঝে রবীচির মিল অস্বিদান,
রাজা শিবি দেহ-মাংস অকাতরে করে নিবেদন
কপোত-শরাপত লাগি।

কুশ-কাঠে বিদ্ধ মোর সে-মৃত্যু মহান—

অদ্বিগত বীরাজনা-রূপ।

মৃত্যুতীর্থ-স্থানে ধীর বীরদল উত্তর মেরুতে—

হিসে শাপদের মুখে অরুণে গহন,

হুমিচ্চিত সজল-সমাধি।

জীবের কল্যাণ লাগি মোর মৃত্যু করে আধিকার
নব জীবনদায়ন।

অপরাধ ঘর-উদ্ভাবনা মৃত্যুর স্পর্শ হাসিমুখে—

হাসিমুখে ঝাঁপ দেয় ঘোরতর সমর-অঙ্গলে
আত পীড়িতের সেবা-কাজে।

বন্দীর বন্দন

মুক্তিকামী মৃত্যু মোর আপনার গলে গর জুলি—

সে মৃত্যুরে করি নমস্কার।

রবীন্দ্রনাথের সেই প্রশংসা-দিয়া-কাড়িয়া-লওয়ার
ব্যবস্থায় মনে কিঞ্চিৎ বেদনামিশ্রিত মানি অনুভব
করিয়াছিলাম, ফলে ‘রাজহংসে’র কোনও প্রশংসাপত্রই
বাজারে দাখিল করি নাই। প্রথম চৌধুরী ঘটিত মামলার
বিপক্ষদের অন্ততম প্রধান শ্রীধুর্জিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ‘প্রবাসী’র পৃষ্ঠায় “তেজীমান দত্ত” ও
“মর্দানা আওয়াজের” জন্ত ‘রাজহংসে’র কবির প্রভূত
প্রশংসা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিয়াছিলেন—পত্রারের
পরে যেমন মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর, অমিত্রাক্ষরের পরে
যেমন রবীন্দ্রনাথের ‘বলাকা’র অসম ছন্দ, ‘রাজহংসে’র
ছয় মাত্রার অমিল ছন্দ তেমনি ‘বলাকা’-ছন্দেরও এক ধাপ
উপরে। কিন্তু এই সকল প্রশংসার কোনটিই রবীন্দ্রনাথের
সেই “তোকে গোপনে বলি, রাজহংস বইখানি ভালো
হয়েছে”র বর্ম ভেদ করিয়া আমার মর্মে প্রবেশ করিতে
পারে নাই। আমার এই সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানটিকে আমি
প্রচায়ের দিক দিয়া বরাবরই অবহেলা করিয়া আসিয়াছি।

পিতার অবহেলা সম্পূর্ণ নিরাকৃত করিয়াছিলেন পিতৃব্য
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্ট; যোগ্যতর কণ্ঠে প্রচারের ভার লইয়া
তিনিই ‘রাজহংস’কে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছেন। বহু সভা
সমিতি জলসা আসর বৈঠকে ‘রাজহংসে’র কবিতা আবৃত্তি
করিয়া তিনি শ্রোতাদের মত্তমুগ্ধ করিয়াছেন, ফলে ইহার
চাহিদা বাড়িয়াছে। শুধু সভা-সমিতিই নয়, অল ইন্ডিয়া
রেডিওর কলিকাতা-কেন্দ্র হইতে তিনি বহুবার আমার
কবিতার আকাশ-বিস্তার ঘটাইয়াছেন, গ্রামোফোন-রেকর্ডে
তাহার “কে জাগে”র অপরূপ আবৃত্তিকে দীর্ঘস্থায়িত্ব দান
করিয়াছেন; এক কথায় আমি যেমন ‘রাজহংসে’র জনক,
তিনি তেমনই ইহার পালক।

‘রাজহংস’ প্রকাশের মাসাধিক কালের মধ্যেই
গভীর আত্মদর্শন-সমন্বিত দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘আলো-আধারি’
বাহির করিলাম। ‘রাজহংস’ উৎসর্গ করিয়াছিলাম মৃত্যু
মাতাকে, ‘আলো-আধারি’ উৎসর্গ করিলাম জীবিত
পিতাকে। মোহিতলাল ‘আলো-আধারি’কেই অভিনন্দন
জ্ঞাপন করিলেন।

এতদিন ব্যঙ্গ হাস্ত ও হালকা কবিতার কবি ছিলাম,

এই দুইখানি কাব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিক কবির
স্তরে উত্তীর্ণ হইলাম; কিন্তু সাধারণের দরবারে তাহাতে যে
লাভ বিশেষ হইল তাহা মনে হয় না; ‘শনিবারের চিঠি’র
“সংবাদ-সাহিত্যে”র লেখক সজনীকান্তকে কবি সজনীকান্ত
অতিক্রম করিতে পারিল না। আমার সাহিত্য-জীবনের
ইহাই সর্বাধিক ট্র্যাজেডি।

ট্র্যাজেডি হইলেও ইহাতেই আমার মুক্তি হইয়াছে—
পূর্বতন সজনীকান্তের ভক্তেরা বলেন, মৃত্যু। কিন্তু আমি
জানি, ‘রাজহংসে’ই আমি নিজেকে ফিরিয়া পাইয়াছি।
বিকৃত এবং লঘু—বহু বিচিত্র পথে পরিক্রমণ করিয়া শেষ
পর্যন্ত যে আত্মস্থ হইতে পারিয়াছি, তদ্ব্যতীত আমার সরস্বতীর
প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অবধি নাই। “সরস্বতী” কবিতায়
এই সত্যটাই প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। জীবন-
সাধনার দিক দিয়া “আকাশ-মাগর”- ‘রাজহংসে’র শেষ
কবিতা বটে, কিন্তু কাব্যসাধনার দিক দিয়া “সরস্বতী”ই
“রাজহংসে”র শেষ কবিতা। কেন শেষ, তাহার জবাব
কবিতার মধ্যেই আছে—

খুঁজিয়া পেছ হারানো আপনারে—

কবে কখন করেছিলাম চলা আমার গুহ
ভিন্ গাঁয়েতে পেরিয়ে নদীবন—
বীথানো কড়, কখনো মেঠো পথ,
কখনো চর, কখনো ভাঙা, কখনো জলাভূমি।
নায়ের কোলে রূপকথাতে শোনা—
তেপান্তর মাঠের মাঝে দেউল একখানি—
দেউল, তবু কমলবন-মাঝে
হসারুচা আমার সরস্বতী
বালান একা হাতের বীণাটিরে।

নায়ের কোল কখন কবে জেড়
মেমেছিলাম কালো কটন ভূয়ে,
উবর ভাঙা, অগস বাগুনদী,

একটি হুটি কাঁটাখেজুর, দীর্ঘমেহ তাল,
গহন বন, সুরের ধারা নদী,
কাঁকর দিয়ে সাজানো রাজপথ;
বাউরীপাড়া—মুর্গি-পাতিহাঁস,
কুমোরবাড়ি—আগ্নিশাতে মাচার বোলে লাউ,
চপল লোকালয়,
ঘুমুখে আর গিহনে মেঘি পথিক চলে নানা।

পথের জনতার
হারিয়ে কেলে কখনো আপনারে
আশম মনে চলিয়া এমু সারাটা পথ বরি—
কলহ-কোলাহলে,
কখনো মনে জমেছে বিব, কখনো বুলিঝালে
হয়েছে কালো আমার দশ দিশি।
বিপদপথে অনেক ঘুরে ঘুরে—
অসেক বাট, অনেক বাট দিয়ে
পেরিয়ে কত শহর লোকালয়
হাজার লাখ তেপান্তর মাঠ—
কোথাও নাই রূপকথাতে শোনা
হসারুচা আমার সরস্বতী।

খুঁজিতে তাঁরে দিখিদিকে চলিছে ছুটাছুটি,
বাগ্মিপুঞ্জার ছলে
পৃথিবী জুড়ে গাঁয়ের হাটে হাটে
বেচাকেনার বসেছে জোর মেলা।
সাক্ষিয়ে তুলে নকল সরস্বতী
কমলা-কুশা মাগিতে নবে ফিকির ধোঁজে নানা।

ক্লান্তমেহে ফিরিখু আমি দীর্ঘপথ ধরি,
শান্তমনে বসিখু এসে ঘরের বাতায়নে,
হুমায়ে পড়িলাম।

ভাগিয়া আজ খুঁজিয়া পেছ হারানো আপনারে,
আমারি মন জুড়ে
বসিয়া আছে আমার সরস্বতী।

সম্পাদক মহাশয়

মাননীয়েষু,

সবিনয় নিবেদন, মাস কয়েক হ'ল ডাকযোগে একটি গল্প পাঠিয়েছিলুম। সেটি মনোনীত হয়েছে ব'লে খবরও দিয়েছিলেন। তারপর অনেক দিন কেটে গেল, লেখাটি এ সংখ্যাত্তেও ছাপা হয় নি দেখলুম।

যাই হোক, আমার তাগারা সেজ্ঞে নয়। ছাপা হয় নি, সেটা বরং শাপে বর। গল্পটি যদি ছাপাখানায় না পাঠিয়ে থাকেন তবে আমাকে ফেরত পাঠালে বাধিত হব। কেননা শেষের দিকটা ফিরে লিখতে হবে। ছাপা হয়ে গিয়ে থাকলে ফর্মার শেষ পৃষ্ঠাটা নষ্ট ক'রে ফেলুন।

এই অসম্মত আবহাৱে আপনি, অহুমান করি, বিব্রত বোধ করছেন। আমার কথা রাখতে গেলে কিছু আর্থিক লোকসান তো হবেই, কাগজপ্রকাশের দিনটিও পিছিয়ে যেতে পারে। বিশ্বাস করুন, নেহাত দায়ে না ঠেকলে এমন অসম্মত প্রস্তাব করতুম না।

গল্পটি আগাগোড়া বানানো হ'লে কোন কথা ছিল না। ঠেকে গেছি সত্য ঘটনাকে সাহিত্য করতে গিয়ে। এ কাজে আমার বন্ধু কল্যাণবাবু নিপুণ, চেনা লোককে নিয়ে লেখার অভ্যাস তাঁকে সুনাম দুর্নাম দুই-ই দিয়েছে। জ্ঞানভানু বার কর্ম তারে সাজে, তাই মাঝে মাঝে লোভ হ'লেও কখনও তাঁর পথ ধরি নি।

কিন্তু দেখুন তো, নীতিবাক্যটি ভুলে গিয়ে কি বিপদেই পড়েছি। আর ভুলেছিলুম তো ভুলেছিলুম, হতভাগা লোকটার সঙ্গে ফের দেখা হতে গেল কেন। লেখাটা একবার ছাপা হয়ে গেলে আর চারা ছিল না। ওকে বোঝাতে পারতুম, হাতের ডিল একবার ফসকে গেলে, ইত্যাদি।

ঠিক ক'রে বলুন তো, লেখাটা আপনি পড়েছিলেন কি না। চেনা লেখক, আমার ধারণা, নাম দেখেই ওটা মনোনীত মার্কী ফাইলে তুলে রেখেছেন, সুবিধামত ছাপবেন ভাবছেন। কোথায় অসুবিধে ঘটেছে আপনাকে খুলে বলি। ফাইল থেকে রচনাটি যদি বের ক'রে সামনে নিয়ে বসতেন, সব চেয়ে ভাল হ'ত। যাই হোক, গল্পটি

ফের সংক্ষেপে লিখে দিচ্ছি, চোখ বুলিয়ে গেলেই বুঝবেন, কোনখানটা বদলাতে চাই এবং কেন।

আগেই কবুল করেছি, এটা আমার দেখা গল্প। অধুনা যেখানে আছি সেটা যদিও প্রবাস, তবু এর পাত্রপাত্রী বাঙালী, কারণ আমার বাসা আসলে একটা বাঙালী ব্যারাকে। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, বাঙালী লেখক প্রবাসেও স্বজন নিয়ে কাহিনী বোনে।

এই প্রবাসে চমকপ্রদ কিছু ঘটে না, বা ঘটলেও আমার চোখে পড়ে না। খোঁড়া পা'র মত দিনগুলোকে কোন মতে টেনে টেনে চলি। তাই প্রতিবেশী স্বধীরবাবুর বদলি হয়ে যাওয়ার মত সামান্য ব্যাপার নিয়েও এখানে কম আলোচনা হয় নি। প্রথমে আলোচনা, পরে কানাকানি হাসাহাসি। আমার গল্পের গোড়ার দিকে এ সবের সবিস্তার বর্ণনা আছে। কোতূহল হ'লে অংশটুকু প'ড়ে নেবেন।

কিন্তু অত কষ্ট কেনই বা করবেন? গল্পটির মোটামুটি কাঠামো ফের তো লিখতেই বসেছি। স্বধীরবাবু মধ্যবয়সী, জীবনে দু' ছুড়ির ওপর কোন না ছ-সাতটি বসন্ত দেখেছেন। কিন্তু স্বদর্শন। বিশেষগণটি মনে রাখবেন। দীর্ঘ পাতলা দেহ, পাক-ধরা চুল এখনও রীতিমত ঘন, টেরিযোগ্য, বেশবাসে অসামান্য কচি। খুব কম প্রৌঢ়ের চোখে মুখে এতটা শ্রী দেখেছি। সাহিত্য সঙ্গীত ইত্যাদিতেও অহুবাগ আছে। তরুণবয়সে কিঞ্চৎ কাব্যচর্চাও করতেন মনে হয়।

গল্পের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখবেন, স্বধীরবাবুর জীকে মাত্র রূপবতী বলেছি। সংসমের কারণ নেহাত ব্যক্তিগত। বলা যায় না, ছাপা হ'লে আমার গৃহিণী লেখাটা পড়তেও পারতেন। পরজী নিয়ে সাত কাহন লিখতে ভরসা পাই নি। এ চিঠি গোপনে আপনাকে লিখছি, তাই জানাতে বাধা নেই, উল্লিখিত মহিলা গৌরাঙ্গী, স্বকেশা, তিলফুল-নাসা। দেহের গড়নও ভাল, তবে কোঁক ঈষৎ পৃথুলতার দিকে। এবার আপনি যা জানতে চাইবেন জানি,—ভদ্র-মহিলার বয়স। স্বধীরবাবুর বয়সটা অনায়াসে লিখতে পেরেছি, তাঁর জীৱটা পারব না। মেয়েদের ও-বস্তুটি,

জানেন তো, অনেক প্রলেপের লেপমুড়ি দিয়ে থাকে। প্রথম দেখে আমার মনে হয়েছিল, শী ইজ থার্টী ইফ এ ডে; আমার স্ত্রী বলেছিলেন চল্লিশ; সুতরাং গড়পড়তার অঙ্কে কেলে ধ'রে নিতে পারেন পয়ত্রিশ। তা ছাড়া পরে জেনেছি, ঠ'র বড় মেয়েটি কিশোরী; আরও পরে, ঠ'র এক পাটি দাঁত বাঁধানো। অবশ্য বয়সের বিচারে এসব কিছুই প্রমাণ করে না। ধ'রে নিতে পারেন, এটা সেই ভাটা-লাগার কাল, যখন গ্রাম্যার হয়তো কিছুটা থাকে, কিন্তু নবীনতা আরো না। পুরুষের এ বয়সে দরকার হয় চশমা এবং হজমী গুলির, মেয়েদের ঘড়ি ঘড়ি প্রসাধনের বুলির।

বাজে কথা ঢের হ'ল, এবার আসল গল্পে ফিরে আসি।

বদলি হয়ে স্থায়ী বাবু বিশেষ অসুবিধায় পড়েছিলেন। যেখানে ঠেকে পাঠানো হ'ল, সেখানে সম্ভায় বাসাভাড়া পাওয়া যায় না। ছেলেমেয়েরা এখানে পড়ছে, সেশনের মাঝামাঝি, লটবহর তুলে পালানো কি সোজা। অগত্যা ঠিক হ'ল, স্থায়ী বাবু নতুন জায়গায় একাই যাবেন, হোটেল থেকে চাকরি করবেন। সমস্তা তাতেও কম নয়, কেন না, আয় সামান্য, ছু জায়গার খরচ পোষানো এক রকম অসম্ভব। তবু যেতে হ'ল। আমাদের উপর অসুবিধা রইল, অভিভাবকহীন পরিবারটির দিকে যেন নজর রাখি।

মুশকিলে পড়লুম এই নজর রাখতে গিয়ে। নইলে অজ্ঞাতকুলশীল কে এক পরিমলবাবু কোথায় এসে উঠেছেন, কী করছেন, এত খবর আমার জ্ঞানবার কথা নয়।

আমার স্ত্রী একদিন বললেন, মুণালদির ভাবনা শুচল।

গল্পটি পড়া থাকলে আপনাকে—ব'লে দিতে হ'ত না, মুণাল স্থায়ী বাবুর জীর্ণ নাম। সুনলুম, স্থায়ী বাবুর বাসায় অতিথি এসেছেন। ঠ'দেরই পুরনো বন্ধু, বড় চাকুরে, পরিমলবাবু নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এখানে এসে পড়েছেন। পরিমলবাবুর মা এবং গৃহিণীও কাছাকাছি কোন এক তীর্থে আছেন, তাঁরাও এসে পড়লেন ব'লে। তারপর সবাই মিলে একসঙ্গে কলকাতা যাবেন।

জিজ্ঞাসা করলুম, সবাই বাবে কেন?

বারে, পরিমলবাবুকে মুণালদি ঠ'দের অসুবিধার কথা সব খুলে বলেছেন যে। স্থায়ী বাবুর যা আয় তাতে ছু জায়গার খরচ কুলোয় না শুনে পরিমলবাবু বলেছেন, কলকাতায় ঠ'র একটা বাসা একরকম খালি পড়ে আছে,

সেখানে বিনা ভাড়ায় এরা থাকতে পারবে। মিড সেশনে ছেলেমেয়েদের ট্রান্সফারেরও কোন অসুবিধা হবে না, সে ব্যবস্থা পরিমলবাবুই করবেন। সম্পাদক মহাশয়, এক দিনে আমার স্ত্রী কত খবর সংগ্রহ করেছেন দেখুন, সাথে কি ইন্টেলিজেন্স শার্ভিসে মেয়েদের এত কদর। সব শুনে পরিমলবাবুকে বিধিপ্রেরিত পুরুষ ব'লে মনে হয়েছিল।

জিজ্ঞাসা করলুম, ঠ'রা কবে যাবেন?

মুণালদি বলেছেন, সম্ভা হখানেক। কলকাতার খালি বাসাটার কলি ফেরাতে হবে। এর মধ্যে ঠ'রা সকলে একবার স্থায়ী বাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে আসবেন। স্থায়ী বাবুর ছুটি নেই, নিজে আসতে পারবেন না।

স্ত্রী বললেন, তোমার কি মনে হয়।

সম্ভাট মহাহুভব।

স্ত্রী বললেন, এতদিনে মুণালদির মুখে হাসি ফুটেছে। জান, এ কদিন উনি শুধু লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছেন?

বললুম, কী ক'রে জ্ঞানব? জানলেও তোমার কাছে সে কথা কি কবুল করতে ভরসা পেতুম?

স্ত্রী কটাক্ষ হেনে (এখনও মাঝে মাঝে হানেন) বললেন, তোমার সবটাকেই ইয়ার্কি। ঠ'রা সত্যি খুব বেঁচে গেলেন, না? এই দুদিনে বাসা ভাড়া বেঁচে যাওয়া, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার বন্দোবস্ত—

ক্রমে ক্রমে পরিমলবাবুর আরও নানা গুণের কথা কানো এল। আমার স্ত্রী অবশ্য ওই একটিই। সুনলুম, সম্ভাট শুধু মহাহুভব নন, সম্ভাট কবিও। মুখে মুখে ছড়া তৈরি করেন। প্রসন্ন করেছিলুম, যথা?

মুণালদি ঠ'র বউদি তো, ঠাট্টার সম্পর্ক। এই তো সেদিন সুনলুম, ঠ'কে ডাকছেন 'যেমন আছ তেমনি এসো আর ক'রো না সাজ...বেণী না হয় এলিয়ে রবে, সিঁধি না হয় বাঁকা হবে...' আরও কত কী!

চমকে বললুম, এ তো রবীন্দ্রনাথের কবিতা।

স্ত্রীও কিছু অপ্রতিভ হলেন।—তাই নাকি? তবু যে মুণালদি বললেন, উনি নিজেই কবিতা বানান।

বললুম, আমার কোন ভাই বানিয়েও তোমাকে এ ভাষায় ডাকলে আমি কিন্তু খুশি হতুম না।

চ'টে গিয়ে স্ত্রী বললেন, যাচ্ছেতাই সব লিখে লিখে

তোমার মনটাই খারাপ হয়ে গেছে। কবি না হোন ভদ্রলোক খুব রসিক। তোমার মত সব সময় মুখ হাঁড়ি করে বসে থাকেন না। মুণালদি যখন রান্না করেন, উনি তখন পাশে মোড়া নিয়ে বসে মজার মজার সব গল্প বলেন, জান ?

জানি, সম্পাদক মহাশয়, এই অবধি পড়ে আপনি মুখ টিপে হাসছেন, মনে মনে বলছেন, বুঝছি। আসল মুশকিল কোথায় জানেন ? গল্প-উপন্যাসে একটা জিনিস যত সহজে বোঝা যায়, প্রকৃত জীবনে যায় না। ভিটেকটিভ বইয়ের গোয়েন্দা কত সহজে খুনীকে ধরে ফেলেন, অথচ সত্যিকার পুলিশ সামান্য একটা চুরির কিনারা করতে হিমসিম খেয়ে যায়। - অনেক গল্প-বাহাই-করা আপনার অভিজ্ঞ চোখ, অনেক গল্প-পড়া আমার পাঠকের মন যত চট করে ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে, আমরা প্রত্যক্ষদর্শীরা কিন্তু তত তাড়াতাড়ি পারি নি। এমন কি পরিমলবাবু আর মুণাল দেবীকে একদিন সিনেমাতে একসঙ্গে দেখেও নয়।

ইন্টারভ্যালের সময় আমার জীই আঙুল দিয়ে দেখালেন, ওই দেখ।

ঘাড় কিরিয়ে দেখলুম, আমাদের কয়েক সারি পিছনে, কিছু বেশী দামের আসনে, ওরা হুজনে। পরিমলবাবু আর মুণাল। কী ভুল দেখুন, পরিমলবাবুর বর্ণনা দিতেই মনে নেই। অবশ্য মূল গল্পের দশম পৃষ্ঠায় এ নিয়ে পুরো একটি প্যারা আছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে লোকটি ময়লা, মোটাসোটা, মজবুত ধরনের।

জীকে বললুম, বাও, আলাপ করে এস গিয়ে।

ও জোরে জোরে মাথা ঝাঁকুনি দিলে—না, ছি-ছি, লজ্জাও করে না। খান্না বিদেশে হোটেল খেয়ে না-খেয়ে ওদের জন্তে খেটে মরছে, আর উনি সিনেমা দেখতে এসেছেন।

একটু পরে পরিমলবাবুকে দেখতে পেলুম না। সিগারেট খেতে বাইরে গিয়ে থাকবেন। মুণাল আমার জীকে হাতছানি দিয়ে একবার ডাকলে। আমার জী বেন দেখেও দেখলে না। আরি ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে বললুম, ছিছি, না হয় ওরা একটু বেশী দামের সীটেই এসেছে। তাইতে এত চটে গেলে ?

জী আরও চটে গিয়ে বললেন, তাইতে বুঝি ? ওদের রকম দেখে। পাঁচজনে পাঁচ রকম কথা বলতে শুরু করেছে, জান ?

বললুম, অন্তত এক জনেরটা তো জানছি।

রাগ করে আমার জী ছবিতে মন দিলেন।

আরও একচোট নিলেন বাড়ি ফেরার পথে।—তোমাকে এতদিন বলি নি। কী বেহায়া জান, লোকটা ওকে একটা শাড়ি কিনে দিয়েছে, আমাদের দেখাতে এসেছিল।

শুধু ওকে ?

না, ছেলেমেয়েদেরও অবিভ্রি একসেট করে নতুন জামাকাপড় দিয়েছে। ওটা লোক-দেখানো। রোজ ডিম আসছে, ফল আসছে, মাংস দিয়ে দশ রকমের রান্না হচ্ছে। মুখেও রোচে! ওদিকে সেই বেচারী বিদেশের হোটেলের উপোস দিচ্ছে কি-না ঠিক নেই।

বললুম, সাবিত্রী, সকলের পাতিব্রতের আদর্শ হয়তো তোমার মত উচু নয়।

জী বললে, যেহা। ওর মাজগোজের ঘটা আজকাল কত বেড়ে গেছে দেখতে পাও না ?

নিরীহ গলায় জবাব দিলুম, কী করে পাব। তোমার ভয়ে ভাল করে তাকাই না তো।

পরদিন সকালে হঠাৎ ও-বাড়ি থেকে সহর্ষ আবুস্তি শুনেতে পেলুম,...কোন দেব আজি আনিলে দিবা। তোমার পরশ অমৃতসরস, নয়নে তোমার দিবা বিভা—

জী বললে, শুনলে ?

ব্যাপার কী ?

ঘুম ভাঙিয়ে মুণালদি চা খাওয়াতে গেছে যে। তাই কবিশ্বের বান ছুটেছে।

হেসে বললুম, এ কবিতাটাও কিন্তু ওর রচনা নয়।

না হোক। পরের বউকে পরের লেখা কবিতাই বা শোনাতো যাবে কেন শুনি ?

বললুম, ঠিক। এই তো তোমার ঠোঁটের তিলটি দেখে কতদিন বলেছি—খারানিবন্ধেব কলঙ্করেখা, সেও অস্তুর রচনা, কিন্তু পরের লেখা নিজের বউকে শোনানোতে বোধ হয় দোষ নেই, না ?

জী রসিকতাটায় কর্ণপাতও করলেন না। নিজের

বৌকেই বলে গেলেন, মরি মরি কচি। অমন দেবতুল্য
সুন্দর যার স্বামী, সে কিনা কদাকার একটা লোকের
সঙ্গে—ছিঃ।

অর্থাৎ লোকটা কন্দর্পকাস্তি হ'লে তোমার আপত্তি
হ'ত না?

তারি তাকিক হয়েছ। আসল কথা, সব কিছুই
বয়স আছে। বড় বড় ছেলে, দুদিন বাদে মেয়ের বিয়ে
দিতে হবে, তার কি এসব সাঙ্গে।

এসব যে খুব উচুদরের নীতিকথা নয়, স্ত্রীমতীকে সেটা
বলতে ভরসা হ'ল না।

মূল গল্পে, সম্পাদক মশায়, এই পর্যন্ত পৌছতে আমার
বিশ পৃষ্ঠা লেগেছে। অতঃপর আমার সঙ্গে পরিমলবাবুর
পরিচয়ও হয়েছিল, তখনকার আলাপ-আলোচনা, এখানকার
ক্রমোচ্চ কানাকানি, আরও সব ছোটখাটো খুঁটিনাটি
চিঠিতে বাহুল্যবোধে বর্জন করলুম।

এখানে কেউ কেউ, মহিলারাই বেশী, বলতে শুরু
করেছিলেন, লোকটার মা, আর জীও এখানে আসবার
কথা ছিল, তাদের কী হ'ল? পুরুষেরা ভাবছিলেন,
লোকটার ছুটি আর ফুরোর না নাকি। কলেজের এমন কি
হাইকোর্টের ছুটিরও তো শেষ আছে।

শেষ পর্যন্ত একদিন শোনা গেল ওদের যাবার দিন ঠিক
হয়ে গেছে। আগামী কাল ওরা সবাই গিয়ে স্বধীরবাবুর
সঙ্গে দেখা ক'রে আসবে। কিরে এসে কলকাতা।

ওরা যেদিন গেল, তার পরদিনই যদি স্বধীরবাবু এখানে
হঠাৎ চ'লে না আসতেন তবে হয়তো ব্যাপারটা এমন
হাটে-হাড়ি হয়ে যেত না। অফিসে কি কাজ পড়েছিল,
স্বধীরবাবু তাই এক দিনের জন্যে এখানে এসেছিলেন।
আমরা পরে অল্পমান করেছিলাম, ওটা ছুতো। ওর কানেও
কিছু কানায়ুযো, পৌছে থাকবে। এসে জিজ্ঞাসা করলেন,
ওরা কই? শুনলেন, সে কি, ওরা যে আপনার ওখানে।

কবে গেল?

কেন, কাল।

স্বধীরবাবু ওখানেই, মাটির উপরেই বসে পড়লেন।
কেউ কেউ বললে, সে কি মশায়, শুনলাম আপনার অনেক
দিনের বন্ধু।

কে বললে বন্ধু। উনি এখন যেখানে থাকেন,
লোকটার সঙ্গে আলাপ সেখানেই। দু দিনেই অবস্থা
খাতির জমেছিল। এখানে বেড়াতে আসবে শুনে
স্বধীরবাবু নিজেই ওকে ওর বাসার ঠিকানা দিয়েছিলেন—
ওর মারফৎ জীকেও একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন,
লোকটার আপ্যায়নের যেন জট না হয়।

স্বধীরবাবু পরের গাড়িতে ফিরে গেলেন। সোম
প্রোঢ় ভ্রমলোকটিকে সেদিন অত্যন্ত করুণ দেখাচ্ছিল।

মৃণালরা কিন্তু ফিরে এসেছিল। ঠিক সাত দিন
পরে। মেয়েরা গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, একেবারে
ভালমাহুয়ের মত পলায়, স্বধীরবাবু কেমন আছেন,
মৃণালদি?

ভাল না ভাই। খুব রোগা হয়ে গেছেন। ছুটি নেই
নইলে নিজেই আসতেন।

কেউ চোখ টিপল, ঠোট বেকিয়ে হাসল কেউ।—এ
কদিন ওখানেই ছিলেন বুঝি?

মৃণালদি নাকি ঘাড় নেড়ে সাই দিয়েছিলেন। ফস
ক'রে কে তখন জিজ্ঞাসা ক'রে বলল, তবে যে শুনলুম
আপনারা নৈনিতালে গিয়েছিলেন। এখানকার নিতাইও
বুরে এল কিনা, সে বললে আপনারাদের ওখানে দেখেছে।

এটা আন্দাজী টিল, কিন্তু লেগেছিল ঠিক। আমার
জীও কাছে শুনেছি, মৃণালের মুখ পলকে সাদা হয়ে
গিয়েছিল। কোন রকমে নিজেকে সামলে বলেছিল, আরি—
এখন একবার গা ধুতে বাব ভাই, সারারাত ছেনে এসে
মাথা ঘুরছে।

বেশী লোক জানাজানির ভয়ে লোকটাকে আর
মারধোর করলুম না। পাড়ার মুফক্কীরা ওকে আড়ালে
ডেকে ধমকালেন। সেদিন দুপুরেই পরিমল চম্পট
দিলে। স্বধীরবাবুকে তার ক'রে দেওয়া হ'ল, পরদিনই
ভোরে এসে যেন ওদের এখান থেকে নিয়ে যান।

সন্ধ্যার দিকে ও-বাড়ি থেকে মুহূঁ কাদার আভাস
পেলুম।

জীকে জিজ্ঞাসা করলাম, আবার কী হ'ল।

তিনি মুখ ঘুরিয়ে বললেন, থিয়েটার। মৃণালদি খালি
কাঁদছে আর মুছা যাচ্ছে।

সে কি, কেন? পরিমলের শোকে নাকি?

শুনলুম, পরিমলের শোকে নয়, গমনার। লোকটা নাকি যাবার আগে বাক্স ভেঙে সব নিয়ে গেছে।

কপট সহানুভূতির স্বরে বললুম, আহা, তবে তো শোক হতেই পারে। গমনার চেয়ে মেয়েদের কাছে বড় কী আছে। গহনাং পরতরং নহি।

নয়নে অগ্নিবাণ হেনে স্ত্রী বললেন, চুপ কর। মেয়েদের তো সব কিছু স্নেহে বঁসে আছি। ওর গমনা চুরি গেছে না ছাই! নিজেকে থেকে সব একখানা একখানা করে তুলে দিয়েছে, নইলে এত সিনেমা আর হিল ইষ্টিসনের খরচ এল কোথা থেকে। আর-সব গমনা যাই হোক, অন্তত একটা বে চুরি যায় নি আমি দিবা গলে বলতে পারি। বলতে বলতে স্ত্রী চাপা গলায় বললেন, জানি, মুণালের হাতের আংটিটা নেই?

সভয়ে বললুম, ওরে বাবা, এত দূর?

নৈনিতালে সাত দিন কাটিয়ে এল, আরও কতদূর গড়িয়েছে কে জানে?

বোকার মত বললুম, এখন কীদে কেন?

এটুকুও বোঝ না, কি বুদ্ধিতে তবে গল্প লেখ! কীদে ভয়ে। একজন তো পালিয়েছে, আর একজনের কাছে মুখ দেখাতে হবে না? বাকি জীবনটা যাকে নিয়ে ঘর করতে হবে, তাকে বোঝাবে কি দিয়ে? তাই এখন নিজে-সাপু সেজে লোকটাকে চোর অপবাদ দিচ্ছে।

আমার আসল গল্প, সম্পাদক-মশাই, এইটুকু। যে লেখাটা পাঠিয়েছি তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবেন, ঘটনা প্রায় সবটাই মেলে। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বুঝবেন, গরমিলও অনেকখানি। সে তফাত স্বরের। আমবা, একালের কথাকারেরা, শুধু গল্প বলে তো খুশি নই, সবজাস্তাও হতে চাই। মনোবিকলনের দিকে ঝুঁকে পড়ি। আমাদের নিজেদের লিঙ্কাস্ত চরিত্রের উপর আরোপ করি। মন দিয়ে পড়ুন, দেখবেন, এ ভুল আমি এ গল্পেও করেছি। মুণালের সঙ্গে পরিমলের ঘনিষ্ঠতা ঘটেছিল, শুধু এটুকু লিখেই কাস্ত হই নি, সেই সঙ্গে বলতে গেছি, কেন। মুণাল, অমন স্বরূপ শাস্ত সৌম্য বার স্বামী, পরিমলের মধ্যে কী দেখে ভুলেছিল। উত্তরের খোঁজে তাকিয়েছি পরিমলের কমবয়সী মজবুত শরীরটার

দিকে, সবচেয়ে সোজা এবং স্থূল যে সমাধান মনে এসেছে, সেটাই বিনা বিচারে লিখে দিয়েছি। বলতে চেয়েছি, পুরুষের প্রতি অন্ধ আদিম আকর্ষণ ছাড়া মুণালের ক্ষণিক বিজ্ঞের আর কোন হেতু নেই।

গোটা গল্পটাই ওখানে মিথ্যা হয়ে গেছে।

সেদিন কাছাকাছি একটা শহরে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ পরিমলের মুখোমুখি পড়ে গেলুম। দেখামাত্র চিনলুম, সেও আমাকে চিনল, আর আশ্চর্য, সে পালাতে চেষ্টাও করলে না। বললুম, ভয় নেই, আমি পুলিশে খবর দেব না। সে বললে, জানি। এবং আমাকে অবাধ করে বললে, চা খাবেন? বিনা বাক্যে ওকে অহুসরণ করলুম।

ছোট বোকান, কোন মতে এক ধারে দুজনের মত জায়গা পাওয়া গেল।

ভূমিকা না বাড়িয়ে প্রথমেই বললুম, পরিমলবাবু, আমার গোটা কয়েক কথা জিজ্ঞাসা করার ছিল।

দেবতা যেমন বর দেন সেই স্বরে সে বললে, কখন।

বললুম, আমি একটা ব্যাপার ভাল বুঝতে পারি নি।

তাজিলোর ভঙ্গিতে হাত ঘুরিয়ে পরিমল বললে, দু দিনের ব্যাপার, ও-সব যেতে দিন।

গম্ভীর গলায় বললুম, দু দিনের ব্যাপার জানি। কিন্তু সেটাই বা কেন ঘটেছিল তাই বুঝতে পারি নি। মুণালের তো কিছু অভাব ছিল না।

পরিমল লঘু গলায় হেসে উঠল।—অর্থাৎ আদর্শ উদার স্বামী ইত্যাদি ছিল বলবেন তো? তার পাশে আমি নিছক একটা পশু, না?

বললুম, শুধু উদার নন, স্বধীরবাবু ওকে ভালও বাসতেন।

ওখানেই আপনার একটু ভুল হ'ল। পনেরো-কুড়ি বছরের বিবাহিত জীবনের পর কতটুকু প্রেম বাঁচে বলুন তো? কজন স্বামীর চোখে প্রথম দিনের সেই মোহ থাকে?

বাধা দিয়ে বললুম, তবে তো আমি যা ভেবেছি তাই। এ নিতান্ত জৈব ব্যাপার। আপনি বয়সে তরুণ বলেই জ্বিতেছিলেন।

পরিমল আবার হাসল।—কের ভুল হ'ল। জ্বিতেছিলুম আমি নিজে তরুণ বলে নয়, ওকে তরুণী ভেবেছিলুম বলে।

ভারতের গ্রন্থস্বত্ব

সোমেন্দ্রচন্দ্র বসু

শুধু রসস্বষ্টি অথবা আত্মতৃপ্তির জন্ত নয়, সংসার-নির্বাহের মূল উপজীবিকা হিসাবেও ভারতের বহু ব্যক্তি সাহিত্যকে গ্রহণ করিয়াছেন। আপনার রচনা হইতে ইহারা আধ্যাত্মিক জীবনের রস এবং ব্যবহারিক জীবনের রস উভয়ই আহরণ করেন। আবার ব্যাপক-ভাবে সেই রচনার উৎকর্ষ দেশের সাংস্কৃতিক জীবনকে উন্নত ও বলিষ্ঠ করে এবং দেশের গৌরব বর্ধন করে। তাই সেই রচনাকে সর্বপ্রকার বিপদ আপদ হইতে সযত্নে রক্ষা করা শুধু লেখকের নিজের স্বার্থের জন্ত বা লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞতা-নিদর্শনের জন্ত নয়, সমগ্র জাতির মঙ্গলের জন্তও পরম প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। আজ পৃথিবীর প্রায় প্রতি দেশেই গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ করিবার কোনও না কোনও আইন বিद्यমান আছে।

ভারতবর্ষে গ্রন্থস্বত্ব বা কপিরাইট সম্বন্ধে প্রথম আইন প্রণয়ন হয় ১৮৪৭ সনে। তবে ১৮৪৭ সনের গ্রন্থস্বত্ব আইনের সহিত বর্তমানে আমাদের কোনও সম্পর্ক নাই। জীর্ণবাসের মত সে আইন প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল পরিত্যক্ত হইয়াছে। ১৯০৮ সনে বার্লিনে একটি কনফারেন্স এবং কনভেনশনে সারা বিশ্বের জন্ত একটি মাত্র গ্রন্থস্বত্ব-নিয়ম গঠনের উদ্দেশ্যে গ্রেটব্রিটেন প্রমুখ বহু রাষ্ট্র মিলিত হন। সেইখানে কতকগুলি প্রস্তাব সর্ববাদীসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অতঃপর ১৯১০ সনে একটি ইম্পিরিয়াল কপিরাইট কনফারেন্সে সেই প্রস্তাবগুলি ভারত এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের

অন্যান্য ডোমিনিয়ন ও উপনিবেশের প্রতিনিধিগণের মধ্যে আলোচিত হয় এবং সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্ত একটি গ্রন্থস্বত্ব আইন প্রণয়ন হইবে বলিয়া স্থির হয়। এই আলোচনার ফলে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের পার্লামেন্ট ইম্পিরিয়াল কপিরাইট আইন প্রণয়ন করেন। ১৯১২ সনের ৩১শে অক্টোবর ওই আইন ভারতবর্ষে প্রযোজ্য হয়। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই ওই আইনের কিছু সংশোধন এবং পরিবর্তন করা ভারতের আইন-প্রণেতাগণ প্রয়োজন বোধ করেন। ফলে ১৯১৪ সনের তিন আইন অমুযায়ী ওই ইম্পিরিয়াল কপিরাইট আইনকে দৈবৎ অদলবদল করিয়া ভারতীয় গ্রন্থস্বত্ব আইন প্রণীত হয়। ইহাই আজ চল্লিশ বৎসর হইল ভারতে গ্রন্থস্বত্ব নিরূপণ করিয়া আসিতেছে।

গ্রন্থস্বত্ব বলিতে ঠিক কি বুঝায়, এক কথায় উহার সংজ্ঞা নিরূপণ বড় কঠিন। বলা যাইতে পারে, ইহা হইতেছে যে কোনও রচনা পূর্ণ বা আংশিক ভাবে দান, বিক্রয় অথবা সাধারণের কাছে প্রচার করিবার একটা নিবৃত্তি স্বত্ব। এই স্বত্বটি ওই রচনার অত্মবাদ করা, নাট্যরূপ ধারণা, ভাষার দৈবৎ হেরফের করিয়া পুনঃপ্রকাশ করা, রঙ্গমঞ্চে পর্দায় বা অন্য কোনও ভাবে-প্রদর্শন করা বিষয়েও ব্যাপ্ত থাকিবে।

ভারতের গ্রন্থস্বত্ব আইন সকল "original literary, dramatic, musical and artistic work"-কে

শুভ চোখে চেয়ে বললুম, বুঝতে পারলুম না।

পারলেন না? পরিমল গলা নামিয়ে বললে, মুণালের বয়স কত জানেন? জানলে পারতেন।

বললুম, কত আর? ত্রিশ? পঁয়ত্রিশ?

চল্লিশের একদিন কম নয়। প্রোটো কোন রমণীকে গদগদ গলায় কবিতা প'ড়ে শুনিয়েছেন কোনদিন? বলেছেন, তার চোখের অতল কালোয় আপনার মৃত্যু? ব'লে দেখবেন। তার মুখ-চোখের রঙ-বদল হয় কি না লক্ষ্য করবেন।

বলতে বলতে পরিমল উঠে দাঁড়াল। চেয়ে দেখলুম, ওর হাতে জলজল করছে সেই আংটি।

সেই থেকে আমিও কেবল এই ভাবছি। পরিমলের কথা ঠিক হ'লে এ গল্পের আসল আসামী বয়স। অন্ততঃ একজনের চোখে এখনও সে তরুণী, এইটুকু যাচাই করতে গিয়েই কি তবে মুণাল মরল? বিশেষ একটা বয়সকে বেঁধে রাখার পাগলামি কি এই বয়সে আসে? তার জন্তে কি কেউ এত দাম দেয়, এমন ক'রে ঠকে? কী জানি। মুণাল তো ব্যতিক্রমও হতে পারে।

তাই ঠিক করেছি, সম্পাদক মশাই, গল্পটা ফিরেই লিখব। যদি সময় থাকে, তবে লেখাটা পত্রপাঠ ফেরত পাঠিয়ে দিন।

সংরক্ষিত করে। অতএব ইহার দ্বারা কেবল লেখক নন, স্বরকার এবং শিল্পীও তাঁহাদের সৃষ্টিকে নিরাপদে রাখিতে পারেন। এইখানে বলিয়া রাখি যে, গ্রন্থস্বত্ব আইন কোনও মৌলিক ভাবধারাকে সংরক্ষণ করে না, ইহা রক্ষা করে একমাত্র যে কোনও ভাবধারার মৌলিক প্রকাশকে। আইন-প্রণেতাগণের মনে সম্ভবত এই ছিল যে, মহৎ ব্যক্তির একই ভাবে চিন্তা করিতে পারেন, কিন্তু সে চিন্তা প্রকাশ করেন ভিন্নভাবে। গ্রন্থস্বত্বের সহিত রচনার মূল্যের কোনও সম্পর্ক নাই। সেই জন্য অপ্রকাশিত রচনাও গ্রন্থস্বত্ব আইন দ্বারা সংরক্ষিত। ১৮৪৭ সনের কপিরাইট আইন অনুযায়ী গ্রন্থস্বত্ব পাইতে হইলে প্রত্যেক রচনাকে একটি বিশেষ নিয়মে রেজিস্ট্রী করিতে হইত। সে নিয়ম এখন আর নাই। এখন যে কোন ভাবধারাকে ভাষায় রূপ দেওয়া হইলে অমনি উহার লেখক ওই রচনাটিতে গ্রন্থস্বত্ব অর্জন করিলেন।

সাধারণভাবে যে কোন রচনার গ্রন্থস্বত্ব লেখকের মৃত্যুর পরবর্তী পঞ্চাশ বৎসর কাল পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। সাধারণভাবে বলিলাম এই জন্য যে, এই নিয়মের কতকগুলি ব্যতিক্রম আছে। উহার কতিপয় নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল—

ক। লেখকের মৃত্যুর পর কোনও রচনা প্রকাশিত হইলে প্রথম প্রকাশের পরবর্তী পঞ্চাশ বৎসর কাল পর্যন্ত গ্রন্থস্বত্ব থাকিবে।

খ। কোনও সরকারী প্রচারপত্র প্রকাশিত হইবার পরবর্তী পঞ্চাশ বৎসর কাল পর্যন্ত।

গ। কোনও যৌথ রচনা সম্বন্ধে গ্রন্থস্বত্ব হইতেছে এই যে, যে লেখকের প্রথম মৃত্যু হইবে তাঁহার মৃত্যুর পরবর্তী পঞ্চাশ বৎসর কাল পর্যন্ত অথবা যে লেখকের সর্বশেষে মৃত্যু হইবে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত, ইহার মধ্যে যে সময়টা অধিক।

ঘ। অনুবাদ করিবার গ্রন্থস্বত্ব রচনাটি প্রথম প্রকাশের পরবর্তী দশ বৎসর কাল পর্যন্ত।

অনুবাদ সম্বন্ধে নিম্নে আরও বিশদভাবে আলোচনা করিব। পূর্বেই বলিয়াছি যে, অন্তান্ত সম্পত্তির মত গ্রন্থস্বত্ব দান বিক্রয় বা উইল করিয়া হস্তান্তর করা যাইতে পারে। ইহার ফলে যিনি নূতন স্বত্বাধিকারী হইবেন, তিনি গ্রন্থকারের সকল সুবিধা লাভ করিবেন। তবে

একমাত্র উইল ব্যতীত অন্য কোনও ভাবে যদি গ্রন্থস্বত্ব হস্তান্তর করা হয়, তাহা হইলে গ্রন্থস্বত্বের নূতন অধিকারী লেখকের মৃত্যুর পর পঁচিশ বৎসর কাল পর্যন্ত ওই গ্রন্থস্বত্ব রাখিতে পারিবেন। পরবর্তী পঁচিশ বৎসরের গ্রন্থস্বত্ব লেখকের উত্তরাধিকারীর নিকট ফিরিয়া আসিবে।

অনুবাদ সম্বন্ধে ভারতের গ্রন্থস্বত্ব আইন অভিনব, পৃথিবীর প্রায় কোনও দেশের সহিত ইহার মিল নাই। (পাকিস্তানে ভারতীয় গ্রন্থস্বত্ব আইন এখনও বলবৎ আছে।) ১৮৪৭ সনের ভারতীয় গ্রন্থস্বত্ব আইনে অনুবাদ সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ ছিল না। বিলাতী আইনে সাধারণ রচনার মত অনুবাদের গ্রন্থস্বত্ব লেখকের মৃত্যুর পরবর্তী পঞ্চাশ বৎসর কাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে। তাই ভারতবর্ষ যখন ১৯১২ সনে ইম্পিরিয়াল কপিরাইট আইন গ্রহণ করে, তখন ভারতের লেখকেরা তাঁহাদের রচনার অনুবাদে গ্রন্থস্বত্বও মৃত্যুর পরবর্তী পঞ্চাশ বৎসর কাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিবার অধিকারী হন। ১৯১৪ সনের ভারতীয় কপিরাইট আইনে অনুবাদের গ্রন্থস্বত্বের সময় সংক্ষেপ করিয়া রচনা ভারতে প্রথম প্রকাশের পরবর্তী দশ বৎসর কাল পর্যন্ত ধার্য করা হয়। তবে এই সময়ের মধ্যে যদি লেখক নিজে কিংবা অন্তের দ্বারা ওই রচনা অন্তান্ত ভাষায় অনুবাদ করিয়া সে অনুবাদ প্রকাশিত করেন, তাহা হইলে লেখকের রচনাটি সেই সেই ভাষায় সাধারণ গ্রন্থস্বত্ব অর্জন করিবে, অর্থাৎ লেখকের (অনুবাদের নয়) মৃত্যুর পরবর্তী পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত সেই সেই ভাষায় আর কেহই সেই রচনাটির অনুবাদ প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

ভারতের গ্রন্থস্বত্ব আইনে অনুবাদ সম্বন্ধে এইরূপ বিশেষ নিয়ম কেন করা হইল তাহা আলোচনা করিয়া ১৯১৪ সনের কপিরাইট আইনের বিল প্রস্তাব করিবার সময় বলা হয়—

“The special linguistic conditions of India render desirable a substantial relaxation of the above provisions. The languages spoken in India are so numerous and differ so widely that the conditions which prevail cannot be compared with those in most European countries, and vernacular translations from English and from one vernacular

to another are not only common but serve the useful purpose of disseminating knowledge." (Statement of Objects and Reasons. Clause 4 of the Indian Copyright Act, 1914)

ইহা প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বের কথা। অবস্থার পরিবর্তনে প্রায় সকল আইনেরই সমন্বয়যোগ্য সংশোধন হওয়া উচিত। আজকাল অমূল্য-সাহিত্য আমাদের দেশে এতটা প্রসার লাভ করিয়াছে যে, এ বিষয়ে স্বাধীনতার মাত্রা বিশেষ আইন করিয়া সংরক্ষণ করিবার আর তেমন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। বরঞ্চ এখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষেও অমূল্যের গ্রন্থস্বত্ব লেখকের মৃত্যুর পরবর্তী পঞ্চাশ বৎসর কাল পর্যন্ত বলবৎ রাখা সর্ব বিষয়ে অমূল্য। অন্তত এ নিয়ম করা যাইতে পারে, অমূল্য-পুস্তকের বেলায় অনুদিত প্রতি সংখ্যার বিক্রয়মূল্যের এক নির্দিষ্টাংশ মূল রচনার লেখককে যেন দেওয়া হয়। এই নিয়মে "the useful purpose of disseminating

knowledge" উদ্দেশ্যটিও সিদ্ধ হয়, আর মূল রচনার লেখকের সাংসারিক ব্যয়ভারও কিঞ্চিৎ লাঘব হয়।

গ্রন্থস্বত্ব সম্বন্ধে কোনও নতুন আইন প্রণয়ন করা যদি আশু প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে উহা ভারতের রাষ্ট্রীয় আইন সভার সদস্যদের কাছে পেশ করিতে হইবে। কারণ গ্রন্থস্বত্ব সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন বা সংশোধন করিবার অধিকার এক মাত্র রাষ্ট্রীয় আইন সভাকে দেওয়া হইয়াছে। উহা পশ্চিমবঙ্গ অথবা অন্য কোনও রাজ্যের আইন সভার ক্ষমতা-বহির্ভূত।

সারা বিশ্বের গ্রন্থস্বত্ব বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট আইন না থাকিলেও মাঝে মাঝে কনফারেন্স ও কনভেনশনের বৈঠকে প্রায় প্রতি রাষ্ট্রই পরস্পরের সহিত গ্রন্থস্বত্ব বিষয়ে কোন না কোনরূপ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। আর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সেই শর্তগুলি রাষ্ট্রীয় গ্রন্থস্বত্ব আইনে প্রবর্তিত হয়। এইভাবে অপর অপর রাষ্ট্রের গ্রন্থস্বত্ব আইন সেই সমস্ত রাষ্ট্রে সম্মানিত এবং প্রচলিত হয়।

বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শিবসমুদ্র পালা

সে ছিল ব্যাকুল চোখে প্রতীক্ষার দৃষ্টিদীপ জ্বলে
কত দিন কত রাত। কে এসে সাজাবে আশরীর
ইন্দ্রধনু-চিহ্নলেখা এঁকে দিয়ে, মুগ্ধ চোখ মেলে
কে দেবে পরিষে তাকে রত্নমালাখানি? শবরীর
প্রতীক্ষায় আবুলিত সে ছিল তাপসী অনিমিষ :
ফাস্তন এখনো কত বাকি আছে? হাওয়ায় হাওয়ায়
কবে তার গন্ধরেশ উন্মথর ক'রে দশ দিক
চেটে দেবে ফরমের অফুরন্ত আকাশগঙ্গায়?

সাদা দিলে তার ডাকে। তারপর এলে অবশেষে
পুষ্পিত বসন্ত সাজে, দৃষ্টপ্রাণ, তিমিরহনন—
স্বর্ষোপম তুমি তার কামনার বিকচ উন্মেষে—
সে তো মূর্ত্ত বাংলাই : আয়োজন শ্রামল বরণ।

রূপরাগে শাবিরেছ। খুচিয়েছ প্রতীক্ষার পালা।
কঠে তার, রাজপুত্র, পরালে তোমার মণিমালা।

ব্রহ্মাণি বীক্ষ্য

শ্রীস্ববোধকুমার চক্রবর্তী

৭

বিকলে রাজ্যমুণ্ডীতে চা এল বেয়ারার হাতে। আমি আশ্চর্য হলুম, কার জন্তে এসব। বেয়ারা একবার পেছনে চেয়ে পরম নিশ্চিন্তে আমার কোলে গছিয়ে দিয়ে গেল। অস্ত্রহাণ্ড থেকে যে দেখিয়ে দিয়ে গেছে, তাকে দেখতে না পেলেও বুঝতে পেরেছি। মৈত্র মশায়ের দৃষ্টিতে কৌতুকের আভাস পেলুম। সঙ্গে খাবারও ছিল। রাজলুকে এগিয়ে দিতে শুধু ধন্যবাদ জানাল, বললে, একটু পরেই সে নামবে, কাজেই গাড়ির ভেতর আর কিছু খেতে চায় না।

দক্ষিণ-ভারতের গোঁড়ামি জানি। কাজেই পীড়াপীড়ি করবার সাহস পেলুম না। মৈত্র মশাই নিলেন আগ্রহ করে। একথা শুনি মিষ্টি মুখে পুরে বললেন, ঘরের খাবারও আছে দেখছি।

চায়ের পেয়ালা ছিল একটা। বললুম, আর একটা এখন কোথা থেকে যোগাড় করি ?

মৈত্র মশাই তাঁর বোলা থেকে একটা কলাই-করা মগ বার করলেন। এক রকমের অদ্ভুত হাসি হেসে বললেন, এ আমার মুসলমানের বদনার মত খাওয়া থেকে—

ব'লে আবার হাসতে লাগলেন নিজের রসিকতায়।

চা ঢালা হ'লে খেতে খেতে গল্প হ'ল রাজলুর সঙ্গে।

রাজমহেন্দ্রী শহর পত্তন করেছেন, চালুকাবাদের কোন রাজা না-উৎকলের রাজা, তা জানা নেই। তবে গোবিন্দ-দাসের কড়চায় জানা যায় যে, মহাপ্রভুর সময় এ অঞ্চল উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রের অধীনে ছিল আর এর শাসন-কর্তা ছিলেন ভক্ত রামানন্দ রায়। ১৭৪১-এ এ স্থান মুসলমান অধিকারে আসে, কিছুদিন পর কৃষ্ণরায় আবার একে উদ্ধার করেন, এবং পরবর্তী ষাট বছর হিন্দু রাজ্যের অধিকারে থাকে। কবাসী নায়ক বুসির সম্বর-কাছারি ছিল এইখানে। ১৮২৩ পর্যন্ত ইংরেজরা নবাবদের কর

দিংয়েছে এই স্থানটির জন্তে। একটুখানি এগিয়ে গোদাবরী। এর তীরে কত যুদ্ধ হয়েছে এই অঞ্চলের অধিকার নিয়ে, আজ তার হিসেব নেই। হিসেব যার আছে, তা বড়ের। ১৮৩২ আর ১৮৩৯-এর বড়ের কাহিনী চ'লে আসছে লোকের মুখে মুখে, তার ভীষণতার ভীষণতা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে।

চা খাওয়া শেষ হয়েছে, কিন্তু গাড়ি তখনও ছাড়ে নি। অনেকক্ষণ দাঁড়ায়। বেয়ারা এসে ট্রে নিয়ে গেল।

মৈত্র মশাইকে লক্ষ্য করে বললুম, মামাবাবু আমাকে ভোলেন নি। বাই, একবার তাঁর খোঁজ নিয়ে আসি।

মৈত্র মশাই সতর্ক করে বললেন, দেখবেন, গাড়ি ছাড়তে কিন্তু আর দেরি নেই।

বললুম, ওঁরা এগিয়ে আছেন, আমরা পেছনে। ছেড়ে দিলেও হাতল ধ'রে বুলে উঠব নিজের গাড়িতে।

স্বাতি তখন লোকালুফি করে আতা কিনছে। বড় বড় পাকা আতা, অল্পশ্রম অপরিপাণ্ড। স্বাতি উচ্ছ্বসিত ভাবে বললে, কি জন্মের আতা দেখেছেন গোপালদা। বায়ো আনা ডজন চেয়েছিল। এখন বলছে আট আনাতেই দেবে।

আমার ভাল লাগল তার ছেলেমাছবিটুকু। মায়ীমা জানলা দিয়ে হাত গলিয়ে বললেন, এই নাও বাবা, আতা খাও।

ব'লে দুটো আতা দিলেন হাতে। গার্ডের বাঁশি শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল, নিশান নাড়াও-দেখতে পেয়েছি। পিছিয়ে নিজের গাড়িতে ফিরে এলুম।

গোদাবরী স্টেশনে পৌঁছতে লাগল ব্রিনিট পাঁচেক। মৈত্র মশাইকে একটা আতা দিয়েছিলুম। ভদ্রলোক খেতে খেতে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিলেন, এমন আতা নাকি তিনি জীবনে খান নি। গোদাবরীতেও এই আতাওয়ালা দেখতে পেয়ে কিনলেন গোটা ছয়েক। বললেন, আজ রাতে এই আতা খেয়েই থাকব ভাবছি।

রাজলু বললেন, এ অঞ্চলের কমলালেবুও এমনি সুন্দর।

এক ভদ্রলোক উঠলেন গাড়িতে। মাঝবয়সী বলা যায় না, বয়সটা বার্ধক্যের দিকেই হেলেছে। বাঙালী বলেই মনে হ'ল হাবে-ভাবে।

আমি রাজলুকে বললুম, আপনার এখানে নামবার কথা ছিল না?

রাজলু বললেন, গোদাবরীর এপারে নয়, ওপারে। ভারতের দ্বিতীয় প্রশস্ত পুল এটি। এপারে নামলে এপারেই র'য়ে যাব।

ভদ্রলোক 'ককরুর' নাম করেছিলেন মনে পড়ল। তারই সঙ্গে মনে পড়ল, অনেক দিন আগে এখানে একটা সাংস্কৃতিক অর্থঠান হয়েছিল, তার খবর গড়েছিলুম কাগজে। নানা দেশ থেকে অনেক পণ্ডিত এসেছিলেন এখানে, দু-একজন বাঙালীও নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন শুনেছি।

রাজলুকে একটু আভাস দিতেই ভদ্রলোক প্রচুর খুশি হয়ে উঠলেন, বললেন, আপনি ১৯৫১ সালের অখিল-ভারত-সংস্কৃতি-সংযোগ-পরিষদের কথা বলছেন বুঝতে পারছি।

গাড়ি তখন গোদাবরীর পুলে উঠছে। রাজলু একটু দুঃখিত স্বরে বললেন, বেশি বলার সময় তো আর নেই, সংক্ষেপেই আপনাকে আমাদের শ্রমিক-ধর্মরাজ্য-সভার কথা বলি। লোকমাত্র তিলকের সহকর্মী শ্রীমণ্ডেশ্বর শর্মা অঙ্কু রাজ্যে শ্রমিক-ধর্মসভার পত্তন করেন। পশ্চিম গোদাবরী জেলার এই ককরুরে বীর মন্দিরে এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকেন্দ্র। এক সময়ের এই অজ্ঞাত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটি আজ সমগ্র ভারতে সাংস্কৃতিক মর্যাদা পেয়েছে। আমাদের আদর্শ রাজনীতি নয়, দলীয় কোন মতবাদও আমরা মানি না। আমরা বিশ্বাস করি, সেবাস্বার্থের মাধ্যমে গণসংযোগ স্থাপন করা যায়, সকল অঞ্চলের শ্রমিক সম্প্রদায়ের কল্যাণ ও উন্নয়ন আমাদের আদর্শ। আমরা সাম্প্রদায়িকতা ঘৃণা করি, তাই আমাদের সভায় হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সমানভাবে আকৃষ্ট হয়েছে।

ককরুরে গাড়ি দাঁড়াতেই ভদ্রলোক তাঁর ক্যানভাসের ব্যাগটা হাতে করে উঠে দাঁড়ালেন। ছেলোটিকে ভাল

লেগেছিল, বেশ দুঃখ হচ্ছিল তাঁকে বিদায় দিতে। রাজলু বললেন, আবার দেখা হবে কিনা জানি না, কিন্তু দেখা হ'লে সত্যিই খুশি হব। আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে স্বার্থ আনন্দ পেয়েছি।

আমি তাঁর নমস্কারের উত্তর দিতে গিয়ে নিঃশব্দে সে কথার সমর্থন করলুম। মনে হ'ল, কথায় হয়তো মনের সবটুকু বোঝাতে পারতুম না।

মৈত্র মশাই ততক্ষণে আগন্তুক বাঙালী ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলেছেন। রাজলু নেমে যেতে বললেন, অঙ্কে র লোকেরা দেখছি ভারি পণ্ডিত হয়।

ভেঙটাইয়ার বাসের উপর শুয়ে সারা দুপুর ঘুমিয়েছেন। এবারে তাঁর ধূতির নুদিটি সামলে তড়াক ক'রে নেমে এলেন। মৈত্র মশায়ের পাশের জায়গাটি দখল ক'রে বললেন, ওরা যত জানে, তার চেয়ে বেশি বলে।

কালীঘাটের হালদার তখন গোদাবরীর গল্ল ফেঁদেছেন। বললেন, এই যে গোদাবরীর জন্মকাহিনী আপনাকে শোনালুম, ত্রক্ষবৈবর্ত পুরাণে এই গল্ল পাবেন। গোদাবরীর অপর নাম গৌতমী বা গৌতমী গঙ্গা। ত্রক্ষাও পুরাণে এর উৎপত্তির গল্ল আছে। লোকে বলে, গোদাবরীর পশ্চিম-পারে ককরুর গ্রামে ছিল গৌতমের আশ্রম। তাঁটা পড়লে নদীকূলে নাকি এখনও গোক্ষুরের চিহ্ন দেখা যায়।

গল্লটি আমি শুনি নি। গোক্ষুরের ইতিবৃত্তটুকু তাই ধরতে পারলুম না।

হালদার বললেন, মাইল তিনেক পূবে খবলেশ্বরের কাছে গোদাবরী সাত শাখায় বিভক্ত হয়ে সমুদ্রে পড়েছেন। এখানে গোদাবরী অশুভ।

মৈত্র মশাই বললেন, আপনি কি এখানেই বসবাস করেন?

হা-হা ক'রে হাসলেন হালদার। বললেন, মাথা খায়াপ আপনার।

মৈত্র মশাই বড় অপ্রস্তুত বোধ করলেন।

হালদার বললেন, আপনার মতই তীর্থ করতে বেরিয়েছি। গোদাবরীতে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানের রীতি আছে। তাই কাল বিকেলে এসে নেমেছিলুম।

তারপর আবার হাসলেন হা-হা ক'রে। বললেন,

এদিকে পিণ্ডি দেয় কিসে জানেন? চাল-কলা দিয়ে নয়। ছাত্তা বা ময়দা দিয়ে পিণ্ডি তৈরি হয়। এরা বলে, গোখুম ছিগুম।—ব'লে আবার হাসতে লাগলেন হা-হা ক'রে।

ভক্তলোক হাসতে বোধ হয় ভালবাসেন।

তারপর আবার হাসতে শুরু করলেন নতুন ক'রে। মনে হ'ল, এবারে নতুন কোন কথা মনে পড়েছে।

ভেকটাইয়ার একখানা তামিল পত্রিকা পড়ছিলেন। বেশ একটু বিবর্তিত ফুটে উঠল তাঁর কপাল ও নাকের ডাঁড়ে।

মৈত্র মশাই জিজ্ঞাসু চোখে চাইলেন হালদারের দিকে। ভক্তলোক বললেন, এ দেশে বিয়ে হয় হেগো লগ্নে।—ব'লে নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে লাগলেন।

ভেকটাইয়ার এবারে উঠে গেলেন অল্প ধারে। তারপর মৈত্র মশাইকে একা পেয়ে শুরু করলেন নিজের গল্প, কাল একটা বিয়ে দেখলুম ছোটলোকদের।

মৈত্র মশাই এতক্ষণে রস সংগ্রহ করতে পেরেছেন। বললেন, আশ্বিন মাসেও কি বিয়ে হয় এ দেশে?

হালদার একটু বিব্রত হলেন, তারপর সামলে নিয়ে বললেন, ছোটজাতের কি না হয়? তাদের সুবিধে হ'লেই পণ্ডিতকে মত দিতে হবে। আমাদের দেশেও কি এমন হয় না ছোটজাতের ভেতর? তার ওপর অরক্ষণীয় মেয়ের বিয়ে—

মৈত্র মশাই মাথা নাড়লেন সমঝদারের মত। হালদার বললেন, সন্ধ্যাবেলায় প্রচুর হৈ-হল্লা শুনে গেলুম দেখতে। ছেলের বাড়িতে বিয়ে হচ্ছে, মেয়েপক্ষ উঠে এসেছে পাশেই। সুনলুম এদের রীতিই এমন। মেয়েপক্ষ হয় ছেলের বাড়িতে, নয় ভাড়া বাড়িতে এসে উঠবে। অনেক বাড়িওলা নাকি আছেন, ধারা বিয়ের জন্তে বাড়ি তৈরি ক'রে রাখেন। ধর্মশালায় মত বিনে ভাড়ায় বা যৎসামান্য ভাড়াতেও এই রকমের বাড়ি পাওয়া যায়। শুধু পুণ্যার্জনের জন্তেই এমন বাড়ি তৈরি করিয়ে রাখেন অনেকে। অনেক মন্দির-সমিতিরও এই রকম বাড়ি আছে। নামনেটায় একটা সামিয়ানা পাটানো হয়েছে। তার ঝলমলে ঝালরের ধারে ঝুলছে সারি সারি বাতি। সামিয়ানার খুঁটিগুলো নারকেলপাতায় মোড়া, আর তার সামনে পাঁচটা কাঁচাকলা হুঙ্ক কলাগাছ পোতা হয়েছে যত্ন ক'রে।

শোনা গেল, ছেলের বাড়ির মেয়েরা গেছে কনে আনতে—কলা নারকেল পান সুপুরি ফুলের মালার তত্ব-তালাশ নিয়ে। সঙ্গে গেছে বাছকরেরা—ড্রাম ব্যাগপাইপ বাঁশ সানাই কিছুই বাদ নেই। দেখতে পেলুম, কনেকে একটা গাড়িতে তোলা হ'ল, তারপর দু বাড়ির মেয়েরাই হেঁটে হেঁটে এল বিয়ে-বাড়িতে। কনে যারা বরণ ক'রে তুলল, সুনলুম তারা বরের বিবাহিত বোন ও মা। একটা নারকেল ভাড়া হ'ল পথের ওপরে। একটা বড় ঘরের ভেতর বরের আসন। কনে আনা হ'ল সেইখানে। এবারে অনেকে ম'রে পড়তে লাগল। জানা গেল, এরা এখন গান বাজনা হাসি তামাসা ক'রে সারারাত্রি কাটাবে। বিয়ে হবে ভোরবেলায়।

মৈত্র মশাই কৌতূহল প্রকাশ ক'রে বললেন, তারপর? হালদার হেসে বললেন, তারপর ধর্মশালায় ফিরে এলুম।

মৈত্র মশাই ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, ফিরে এলেন?

হালদার ভেমনি হেসে বললেন, ফিরে আসব না তো কি সারারাত দাঁড়িয়ে কাটাও?

মৈত্র মশাই চিন্তিতভাবে বললেন, তাও বটে।

হালদার রসিক লোক। বললেন, রাত্রে ভাল ঘুম হ'ল না। একটা কাকের ডাক শুনেই বেরিয়ে পড়লাম। তখনও অন্ধকার আছে, পূর্বের আকাশটাই শুধু একটু হালকা হয়েছে মাত্র। বিয়ে-বাড়িতে কোলাহল কিন্তু ভেমনি হচ্ছে। এবারে উঠোনে আসতে হ'ল, বিয়ের মণ্ডপ বাঁধা হয়েছে উঠোনে। চার হাত অন্তর বাঁশ পুঁতে নারকেলপাতা আর ফুলের মালা দিয়ে তৈরি হয়েছে এই মণ্ডপটি। এক সময় বর-কনেকে নিয়ে এসে একখানা তক্তার ওপর নারায়ণশিলার সামনে বসানো হ'ল। দু ধারে দুটো পঞ্চপ্রদীপ। পুরুত সামনে ব'সে মন্ত্র পড়লেন ও পড়ালেন। এই সময় বরের বাড়ি থেকে এল মেয়ের কাপড়-জামা আর মেয়ের বাড়ি থেকে বরের। তারা স্নান ক'রে নতুন কাপড় প'রে আবার এসে বসল। আমাদের দেশের সিঁচুর পরানোর মত এদের 'তালি' পরানো একটা বিশেষ অন্তর্ধান দেখলাম। বরের বাড়ি থেকে একটা মোটা হলধে সূতোয় বাঁধা সোনার লকেট এসেছিল। সূতোটির নামই বোধ হয় 'তালি'। বর

সেটি কনের গলায় পরিয়ে দিতেই মেয়ের বাপ-মা এসে গেরোটোর ওপর কুমকুম আর হলুদ মাখিয়ে গেল। তারপর কনের নাকের দু'দিকে ছুটো ছুটো করল একজন, আর পায়ের আঙুলে রূপোর আংটি পরাল আর একজন। প্রচুর বাজনা-বাজির মাঝে এই অল্পটানটি সম্পন্ন হ'ল। শুনেতে পেলাম, পরবর্তী জীবনে এই হলদে স্নতোটা যখনই বদলাবার প্রয়োজন হয়, সেই দিনটিতে তারা উৎসব করে। এর পর আশীর্বাদ শুরু হ'ল। পুরুতের হাত দিয়ে সবাই টাকা দিতে লাগল। শুনলাম, জিনিসপত্রের চেয়ে টাকাটাই এরা পছন্দ করে বেশি। একজনে একটা রূপোর বাটিও দিল দেখলাম। এইখানেই বিয়ের শেষ। এবারে নাকি খাওয়ানোর পালা। তেমন হালদা নেই। নিয়ামিষ রান্না হবে। রোজকার খাবার পাতে একটু মিষ্টি দিলেই বিয়ের খাওয়া হয়ে গেল।

হালদার আবার হাসতে লাগলেন হা-হা ক'রে। আবার কিছু একটা রহস্য করবেন ভেবে আমরা প্রস্তুত হলাম। হালদার বললেন, একটা লোক এল এক ইংরিজীনবিসকে মুখপাত্র ক'রে। খাবার নেমস্তন্ন করলে আর বললে, সন্ধ্যায় জলসা বসবে গানের।

হালদার টেনে টেনে হেসে বললেন, কি বুদ্ধি দেখুন এদের! তীর্থ করতে এসে ছোটজাতের অন্ন ছৌব।

সত্যিই তো! ভদ্রতার দায় নেই ভদ্রলোকের কাছে। জানলা দিয়ে বাইরে তাকালাম। সূর্য অস্ত গেছে অনেকক্ষণ। অন্ধকার অনেকটা ঘিরে ফেলেছে পৃথিবীকে।

হালদার বললেন, মামা-ভাগ্নীতে বিয়ে হয় শুনেছেন কখনও? ভাই-বোনে বিয়ের কথা শুনেছেন নিশ্চয়ই।

মৈত্র মশাই বললেন, মুসলমানদের হয় শুনেছি, কিন্তু আপন ভাই-বোনে হয় না।

হালদার আশ্চর্য হয়ে বললেন, মামা-ভাগ্নীর বিয়ে শুনেছেন আপনি?

মৈত্র মশাই ভয় পেয়ে বললেন, না না, মামা-ভাগ্নীর নয়, আমি বলছিলাম ভাই-বোনের কথা।

হালদার আশ্চর্য হয়ে বললেন, তাই বলুন।

মৈত্র মশাই সাহস পেয়ে বললেন, ছেলেবেলায় আমাদের মনটু প্রেমে পড়েছিল তার ভাগ্নীর সঙ্গে। সেও আপন

নয়, সম্পর্কের। তার পর দাদাদের ঠাণ্ডানি খেয়ে ভদ্রলোকের মত ভদ্রলোকের মেয়ে বিয়ে করল।

হালদার বললেন, শুধু ভাই-বোনের নয়, মামা-ভাগ্নীতেও বিয়ে হয় এদিকে। মামাতো পিসতুতো ভাই-বোনে খুব উপাদেয় সম্বন্ধ। না পেলে মামা-ভাগ্নী। যেমন দেশ—! ব'লে তেমনি বর্বর হাসি হাসতে লাগলেন।

বিয়েটা তাই এদের খাওয়া-শোওয়ার মত সরল জিনিস। বর-কনে জন্মে অবধি ঠিক হয়েই আছে। একটা তিথি-লগ্ন বেখে দিলেই হ'ল, আমাদের দেশের মেয়ের বাপের মত ভিটেমাটি বিক্রি করবার দরকারই হয় না তাদের। এক দিকে মন্দ নয়, কি বলেন?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মৈত্র মশাই বললেন, সত্যি কথা।

৮

ঘণ্টা তিনেক ক্রমাগত বকবক ক'রে হালদার হঠাৎ চোখ বুজলেন। গাড়ির সকলেই তখন একটু দম পেলাম। হালদারের হাঙ্গা কথার তোড়ে প'ড়ে মৈত্র মশায়ের হাঁফ ধরেছিল, একটু ঝিমুতে লাগলেন। চোখ মেললেই নতুন গল্প শুরু করবেন ভেবে ভদ্রলোক ভয়ে মটকা মেরে আছেন মনে হ'ল।

ভেঙ্কটাইয়ার রোগা পাতলা মানুষ, পা টিপে টিপে উঠে এলেন আমার পাশে। আস্তে আস্তে বললেন, গোদাবরীতে বাস ক'রে ভদ্রলোক কথা বলা শিখেছেন বটে তেলেকীদের কাছে। ওরা যখন গ্রামোফোনের মত বকতে শুরু করে, তখন সঙ্গীদের অবস্থার কথা ভাবে না।

বললাম, বেশি নিশ্চিত হবেন না, নতুন উত্তমে শুরু করলেন ব'লে।

ভেঙ্কটাইয়ার বললেন, একটু দেরি হবে আশা করি। দেখছেন না, চামরের ভেতর হাত ঘোরাচ্ছেন। ভগবানের বাপের ভাগ্যি!

বিজয়ওয়াডা পৌছতে আর দেরি নেই। বিজয়-ওয়াডার কথায় মনে পড়ল বৌদ্ধদের কথা। প্রত্নতাত্ত্বিকরা নাকি এক সময় এই শহর খুঁড়ে অনেক শিলালিপি পেয়েছেন। তাতে জানা যায়, এই জায়গার নাম ছিল শ্রীবিজয়বাড়পুর। এক রেড্ডি সর্দার ছিল এই অঞ্চলের মালিক। ঐতিহাসিক প্রমাণে বৌদ্ধসংস্কৃতি ভারতের

সর্বপ্রাচীন সংস্কৃতি। বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের জন্য অশোক কলিঙ্গযুদ্ধ করেন। এবং এই অঞ্চলে যে এক সময় যথেষ্ট বৌদ্ধ প্রভাব ও অনেক বৌদ্ধ বিহার ছিল, তা শুধু

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ-কাহিনীতে নয়, গোবিন্দদাসের কড়চাতেও পেয়েছি। দক্ষিণ দেশে জৈন সভ্যতাও যে এক সময় বিস্তার লাভ করেছিল, শ্রবণ-বেলগোলার সাতান্ন ফুট উঁচু গোসতার প্রস্তরমূর্তি আজও তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। শুনেছি মালাবার উপকূলে ম্যাঙ্গালোরে এখনও অনেক জৈন মন্দির ও স্তম্ভ রাজীদের নয়নরঞ্জন করছে। বৌদ্ধ ও জৈন সংস্কৃতির ওপর লেখা কোনও ভাল বই আজও পড়ি নি। একটু সন্কোচের সঙ্গে ভেঙ্কটাইয়ারকে সেই কথা বললুম।

ভেঙ্কটাইয়ার নিজেও এ বিষয়ে ভাল জানেন না স্বীকার করলেন। বললেন, ইতিহাস আমি বাল্যকালে পড়েছিলুম, তখন শেখবার আগ্রহে পড়ি নি বলে এখন আপসোস করি। সেদিন কাগজে একটা নিবন্ধ দেখলুম। উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা মুকুন্দদেব বৌদ্ধধর্মে অহুসাগী ছিলেন। উড়িষ্যার গঙ্গাম প্রভৃতি অঞ্চলে এরই আমলে বৌদ্ধধর্ম প্রথম শাখা বিস্তার করে।

একটু ভেবে বললেন, খ্রীমৎ রামানুজাচার্যের জীবনীতে পড়েছি, তিনি যখন শৈব রাজা কুমিকঠের ভয়ে নানা দেশে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, তখন বৌদ্ধ রাজা বিট্টল-দেবের দেশে উপনীত হন। এ দেশ কোথায় তা জানি নে। তবে সে দেশের রাজা ও অনেক বৌদ্ধচার্যকে বৈষ্ণবধর্মে তিনি দীক্ষিত করেন। এই রাজাই পরে বিষ্ণুবর্ধন নামে খ্যাত হন। এ ঘটনা বোধ হয় একাদশ শতাব্দীতে ঘটে।

ভেঙ্কটাইয়ার শঙ্করাচার্যের কথাও বললেন, আচার্য শঙ্কর যখন হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রচারে বার হন, দেশ তখন বৌদ্ধদের সর্বশৃঙ্খলাদে ছেয়ে গেছে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রাণি থেকেই যে তিনি হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার করেন তাই নয়, যে বৌদ্ধধর্ম আজও ভারতের বাইরে স্বীয় মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত, তাকে তার জন্মস্থান ভারত থেকে চিরদিনের মত নির্বাসিত করেন।

গাড়ির গতি মন্থর হয়ে আসছিল। হালদার হাতের আঙুলগুলো আরও জোরে ঘোরাতে লাগলেন।

ভেঙ্কটাইয়ার বললেন, এখন এদিকে বৌদ্ধ প্রভাব

একেবারেই নেই বললে হয়, তবে কোনো কোনো স্থানে নাকি বৌদ্ধ বিহার ও মঠের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়।

একটু হেসে লুঙ্গির মত ক'রে পরা নিজের ধুতির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, হেসে বললেন, লোকে বলে, কাপড় পরার এই প্রথাটি নাকি আমরা বৌদ্ধদের কাছে পেয়েছি।

হালদারের গলা আবার শোনা গেল। যুক্তকর কপালে ঠেকিয়েই মৈত্র মশাইয়ের কাঁধে একটা ধাক্কা দিলেন, বললেন, কি মশাই, দক্ষিণ হাতের ব্যবস্থা কি করবেন?

মৈত্র মশাই চমকে উঠে চাইলেন ক্যালক্যাল ক'রে।

গাড়ি এসে প্র্যাটফর্ম টুকছে। বাইরে যাত্রী ও কুলির কোলাহল ছাপিয়ে খাবারওয়ালার চিংকার শোনা যাচ্ছে।

ভেঙ্কটাইয়ার একটা লোককে ধ'রে ছ আনার দুটো কাগজের প্যাকেট কিনলেন, বললেন, মন্থর-ভাত আর কার্ড-ভাত।

খুলে দেখলুম, কলাপাতায় মোড়া ডাল-ভাত আর দই-ভাত। নিজের জায়গাটি ছেড়ে দিয়ে বললুম, আপনি আমার জায়গাটি দখল ক'রে খেয়ে নিন। আমি ততক্ষণে মামাবাবুদের দেখে আসি।

তার গাড়ির কাছে গিয়ে দেখলুম, তিনিও এমন কতকগুলো প্যাকেট নিয়ে নানান রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। স্পেশারের বেয়ারা ভাঙা হিন্দীতে বোঝাবার চেষ্টা করছে যে, বাসি জিনিস নয়। একটু আগে এই বিরিয়ানি রাঁধা হয়েছে তাজা মাংসে। এখনও গরম আছে প্যাকেটগুলো।

জিনিসটা ভাল হবে বলেই স্বাতির বিশ্বাস। আমাকে দেখতে পেয়ে মামাবাবু বললেন, দেখ তো বাবা গোপাল, এ সব খেলে অস্থখ করবে না তো?

বললুম, লোকে খাচ্ছে যখন, তখন অস্থখ করবে কেন।

মামাবাবু বললেন, এ তোমার অস্থখ যুক্তি। আরে, সকলের পেটে যদি সব খাবার সহিত, তবে আর ভাবনা ছিল কি!

স্বাতি বললে, এ তোমার ভাবি অন্তায় বাবা। নতুন দেশে এসে যদি নতুন খাবারই না খেলাম, তো নতুন দেশ দেখা হ'ল কি রকম।

কোঁরা অতশত বোঝে না। বিক্রি হবে না ভেবে প্যাকেটগুলো গুটিয়ে কেটে পড়বার পথ দেখছিল। মামাবাবু ওপর থেকে চারটে প্যাকেট তুলে নিয়ে বললেন, আচ্ছা দাও, খেয়েই দেখি।

নানা ক'রে ছুটাকা চার আনা দাম লাগল। ব্যাগ থেকে পয়সা বার করবার সময় মামাবাবু বললেন, এখন বুঝতে পারছি, সেই মাদ্রাজী ভদ্রলোক কলকাতায় খেয়ে এত চটেছিলেন কেন।

আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বললেন, কাগজে পড় নি বুঝি সে কথা?

পড়ি নি স্বীকার করলুম।

পয়সা মিটিয়ে দিয়ে মামাবাবু বললেন, এক মাদ্রাজী ভদ্রলোক নতুন এসেছিলেন কলকাতায়। হোটেলওয়াল একটা মীলের দাম চেয়েছিল সাড়ে তিন টাকা। ভদ্রলোক ক্ষেপে লাল। বললেন—এর চেয়ে ভাল খাবার আমাদের দেশে দশ আনায় পাবে। তখন আমরা হেসেছিলুম এ খবর প'ড়ে; এখন দেখছি, সে ভদ্রলোক সত্যি কথাই বলেছিলেন।

গাড়ি এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়ায়। নিশ্চিন্তে খেয়ে দেয়ে নিজের কামরার দিকে পা বাড়ানোর সময় স্বাতি বললে, একখানা বই নিয়ে যাবেন গোপালদা?

বললুম, বই আমার চাই নে।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বললে, তা হ'লে সময় কাটাচ্ছেন কি ক'রে?

সংক্ষেপে বললুম, রেডিও শুনে।

স্বাতি আশ্চর্য হ'ল, বললে, রেলের গাড়িতে রেডিও বাজাচ্ছেন আপনারা?

বললুম, আমরা বাজালে অনেকক্ষণই বন্ধ ক'রে দিতুম। বাজাচ্ছেন এক ভদ্রলোক, যার জুফেপ নেই কোনদিকে।

স্বাতি বললে, বারণ করতে পাচ্ছেন না তাঁকে!

বললুম, বারণ করলেই বা শুনেবে কে! রেল-কোম্পানি সরকারী নোটিশ মেয়েছেন কামরার দেয়ালে—জানলা দিয়ে হাত-পা বার ক'রো না, অথবা শেকল টানলে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা লাগবে, বিড়ির টুকরো বাইরে ফেলো, এমন কি সহযাত্রীর অসুস্থতা নিয়েই সিগারেট ধরাতে পার পর্যন্ত। কিন্তু—

পেঁহনে গার্ড সাহেবের সবুজ আলো দেখে বললুম, গোদাবরী থেকে ভদ্রলোক উঠেছেন গাড়িতে, কালীঘাটের হালদার। আশ্বিন মাসে বিশ্বের গল্প নিয়ে আসর জমিয়েছেন, থামবেন না কিছুতেই।

স্বাতির হাসি ছাপিয়ে গেল মামার অট্টহাসি।

ভেঙ্কটাইয়ার তখন এঁটো কলার পাতা দুটো বাইরে ফেলে দিয়ে রুমাল দিয়ে মুছে দিচ্ছিলেন আমার জায়গাটা। ধন্যবাদ জানিয়ে বসলুম।

কলা-পাতার মোড়ক থেকে পান বার ক'রে মুখে পুরবার আগে মৈত্র মশাই বললেন, দই-ভাতটা বড় স্নাপসেপে ছিল।

হালদার কৌচার খুঁটে মুখ মুছছিলেন। বললেন, এরা দই পাততে শেখে নি এখনও। একটু যে চিনি দেবে সে বুদ্ধিও নেই ঘটে।

মৈত্র মশাই আঙুলে চুন নিয়ে দাঁতে লাগিয়ে লাগিয়ে মাপ ঠিক করছিলেন। হালদার পকেট থেকে বিড়ি-দেশলাই বার করলেন। দাঁতে বিড়ির একটা কোণা কেটে বললেন, প্রাতঃকৃত্যের আগে ও খাবার পরে গোটাকয়েক বিড়ি আমার চাই।

মৈত্র মশায়ের দিকে ফিরে বললেন, চলবে নাকি একটা?

মৈত্র মশাই মুখ বুজে রসদগ্ধ করছেন। ঘাড় নেড়ে আপত্তি জানালেন।

গাড়ি তখন কৃষ্ণানদীর পুলের ওপর উঠেছে। ভেঙ্কটাইয়ার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন পেছনের দিকে। বিজয়ওয়াড়ার অপূর্ব দৃশ্য দেখলুম। নদীর ধারে পাহাড়ের ওপর অসংখ্য আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়েছে একটি মন্দির।

ভেঙ্কটাইয়ার বললেন, কনকজুর্গার মন্দির। ছ শো সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে হয়। আর ওপর থেকে নীচের শহরের দৃশ্যও অপূর্ব। পাহাড় আর নদী বিজয়ওয়াড়াকে বিজয়িনী করেছে।

একটু গলা নামিয়ে বললেন, কিন্তু আমি এদের বিষয়-বুদ্ধি দেখে বিস্ময় মানি। বিশাখাপত্তন বিজয়ওয়াড়ার মত শহর থাকতে এরা রাজধানী করল করণ্ডে। ভারতবর্ষের কটা লোকে জানে করণ্ডের নাম?

হালদারের হুকুর ছাপিয়ে উঠল সব কিছু, পঞ্চগঙ্গার নাম শোনেন নি এ বয়সেও ?

মৈত্র মশাই শিশুর মত মাথা নাড়লেন।

হালদার এক নিখাসে পঞ্চগঙ্গার নাম করলেন, ভাগীরথী গোদাবরী কৃষ্ণ কাবেরী ও তুঙ্গভদ্রা। রামায়ণের যুগে এই তুঙ্গভদ্রার নাম ছিল পম্পা।

মৈত্র মশাই উঠি উঠি করছিলেন, ডেকটাইয়ারের অহুমতি নিয়ে আমি উঠেই পড়লুম বাকের ওপর। কনক-দুর্গা মন্দিরের আলোকমালা চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেছে, তার ছায়া পড়ে আছে মনের ওপর। হালদারের কচকচানি তাই আর ভাল লাগল না।

মৈত্র মশাই কাতরভাবে বললেন, আপনি উঠলেন তা হ'লে গোপালবাবু!

চান্দরখানা ঝাড়তে ঝাড়তে বললুম, আপনিও উঠে আসুন না। কাল রাতে তো চোখের পাতা এক করেন নি।

মৈত্র মশাই বড় তৃপ্তি পেয়ে বললেন, সেই ভাল, আমিও উঠি।

হালদার মৈত্র মশায়ের হাতখানা টেনে আবার বসিয়ে দিলেন। বললেন, আপনি উঠবেন কেন সাত সকালে? আপনিও ছেলেমানুষ নাকি ?

আমার মন তখন বিজয়ওয়াটার পাহাড় ডিঙিয়ে দুয়ন্ত অতীতকে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। কেন জানি না, ভগবান তথাগতের মূর্তি চোখের সামনে ভেসে এল। সেই দীর্ঘ স্থির সমাধিস্থ মূর্তি। ডিম্বুরা তাঁর উপদেশ বিলিয়ে বেড়াচ্ছে কৃষ্ণার তীরে তীরে, পূর্ববাট পর্বতে, প্রান্তরে, সমুদ্র-সৈকতে,—প্রাণী হত্যা ক'রো না, চুরি ক'রো না, মিথ্যা ব'লো না, পিঙ্গন বাক্য প্রয়োগ ক'রো না, কর্কশ কথা ব'লো না, বৃথা গল্প ক'রো না, রাগ ক'রো না, কর্মফলে বিশ্বাস ক'রো। তার পর স্বকর্মের দশটি নির্দেশ—যোগ্য ব্যক্তিকে দান ক'রো, নৈতিক বিধান মেনো, স্বেচ্ছায় উন্নয়ন ক'রো, অপরের কাছে লাগো ও সেবা ক'রো। পিতা মাতা

শ্রদ্ধাভাজনের সম্মান এবং শুভ্রাধা ক'রো, নিজের গুণের ভাগ অপরকে দাও, অপরের গুণের ভাগ গ্রহণ ক'রো, সত্যবাদ শুনো, সত্যবাদ প্রচার ক'রো, আত্মবিশ্বাস শোধন ক'রো নাও।

এই তো ভগবান তথাগতের ধর্ম। নিজের জীবন দিয়ে

যে সত্য উপলব্ধি করেছেন ভগবান, সে যে অনাদিকালের সত্য, শত শতাব্দীর বিস্তৃতির জলে কি এ সত্যের মরণ হতে পারে? মহাত্মা গান্ধীও কি বৌদ্ধ ছিলেন?

সহস্র বৎসর পূর্বে আচার্য শঙ্কর তবে কেন এই ধর্মকে ঘৃণা করেছিলেন! কেন একে নির্বাসিত করলেন ভারতের মাটি থেকে! আমাদের ধর্ম তো অহিংসা, আমাদের আদর্শ তো ত্যাগ! তবে কোথায় আমাদের সংঘাত বেধেছিল বুদ্ধের বাণীর সঙ্গে।

হিংসায় আজকের জগৎ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। বুঝ কি আজ মারা গেছেন?

বাইরে থেকে চাকার শব্দ আসছে অবিশ্রাম, হালদারের গলাও তলিয়ে যাচ্ছে এক এক সময়। আমার দুই কান ভরে গেল সেই সঞ্জীবনী মন্ত্রে, বুদ্ধ শরণং গচ্ছামি—ধর্ম শরণং গচ্ছামি—সজ্ঞ শরণং গচ্ছামি।

৯

হালদারের গলা যে অত্যন্ত কর্কশ তা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। গাড়িতে ডাকাত পড়েছে, এমনি একটা আতঙ্ক নিয়ে সকলের ঘুম ভাঙল। চোখ দুটো যগড়ে নিয়ে দেখলুম, দুর্ঘটনা কিছু ঘটে নি। প্রবল উত্তমের সঙ্গে হালদার দেশাচারের নিন্দা করছেন। ওপর থেকে নেমে দেখলুম, একটা ছোট স্টেশনে দাঁড়িয়েছে গাড়ি। আর সকালের স্বল্প আলোয় একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে যাত্রীরা ভিড় ক'রে চা খাচ্ছে। পরে জানলুম, তা কফি। একটা পেতলের বাটির মধ্যে পেতলের গ্লাসে কফি দিচ্ছে। তাতেই ঢালাঢালি ক'রে কেউ গেলাসে, কেউ বাটিতে কফি খাচ্ছে—ঘর যাতে খুশি। হালদার বলছিলেন, চা খেতেও শেষে নি লক্ষীছাড়ারা। আর দেবারই বা কি ছব্বা! পেয়ালা প্রেট নেই তো কাচের গেলামেই দে। তা নয়, পেতলের গেলাস বাটি! নিজের মুখ তো অনেকদিন আগেই পুড়িয়েছে। এবারে আমাদেরও পুড়িয়ে ছাড়বে।

আমাকে নামতে দেখে মৈত্র মশাই বললেন, খেয়ে নিন না এক গ্লাস কফি। মন্দ লাগবে না। ভাঁড়ে ক'রে গাড়িতে দেবার রেওয়াজ নেই এ দিকে।

হালদার জুতুটি ক'রে বললেন, গাড়ি কি সারাদিন এইখানেই থাকবে ভেবেছেন?

সত্যিই গাড়ি ছাড়বার সময় হয়েছিল। আমি নামব কি নামব না স্থির করবার আগেই ঘণ্টা বেজে গেল।

গাড়ি ছাড়বার পরে ভেঙ্কটাইয়ার গাড়িতে উঠলেন। বসলেন আমার পাশে।

মৈত্র মশাই বললেন, ডালের বড়গুলো ভেজেছিল বেশ।

হালদার তীব্র গলায় প্রতিবাদ করলেন, বললেন, জিভের মাথাটি খেয়ে ব'সে আছেন মৈত্রির মশাই। ওই আপনার 'বেশ' হ'ল। খেতেন ঐ সাদা পিঠে আর সর-চাকুলিগুলো। আপনার অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসত। চাল হয় প্রচুর কিনা। এদের নবায় লেগেই আছে।

মৈত্র মশাই তবু সাহস ক'রে বললেন, আপনি তো দেখলুম তেঁতুলগোলা দিয়ে দিব্বি রসিয়ে রসিয়ে খেলেন ইটলি আর ডোসাগুলো।

মুখ ভেঙে হালদার বললেন, খেয়েছি কি সাধ ক'রে? পয়সা দিয়ে কিনে পাপ করেছিলুম, তার প্রায়শ্চিত্ত করলুম সেগুলো গিলে।

যুক্তি বেশ, কিন্তু আমি লজ্জায় সংকুচিত হয়ে উঠছিলুম। ভেঙ্কটাইয়ার বাংলা বোঝেন বেশ, কি ভাববেন আমাদের বর্বরতা দেখে। অল্প দিকে তাঁর মনোযোগ ফেরাবার জন্তে বললুম, আর তো দেবি নেই মাদ্রাজ পৌছতে। অনেক কিছু দেখবার আছে নিশ্চয়ই সেখানে।

ভেঙ্কটাইয়ার বুঝলেন আমার ইঙ্গিত। বললেন, দেখবার চোখ থাকলে সত্যিই অনেক কিছু দেখবার আছে। এই ক্রম-পরিবর্তনের যুগে মাদ্রাজ তার পুরাতন আকর্ষণ আজও অনেকটা ধ'রে রাখতে পেরেছে।

বাইরে প্রকৃতির উদার বিস্তৃতি চোখে পড়ল। পূর্বদিকের প্রান্তর গিয়ে আকাশে মিশেছে। মাঝখানে সমুদ্রের নোনা জলের ওপর সকালের রোদ চু'রে চু'রে সোনা গ'লে পড়ছে।

মামাবাবু এতকাল জমিদারি চালিয়েছেন। ইদানীং সম্পত্তি বেদখল হবে জেনে অবধি বাণিজ্যে হাত দিয়েছেন। বিচক্ষণ লোক, তাই নিজের বিষয়বুদ্ধির ওপর নির্ভর না ক'রে ব্যবসাদার বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগে ব্যবসা চালাচ্ছেন। তাতে লাভ কম হোক, লোকসানের ভয় কম। স্বাতি এখনও কলেজে পড়ে। তত্ত্বজ্ঞানী প্রাচীনদের কথা মানতে হ'লে তার জ্ঞান আমার চেয়ে কম ব'লে

মানতেই হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান তথা জ্ঞানার্জনের পরিমাণ নাকি দিন দিন ক'মে আসছে। ভাবনা হ'ল এইখানে। কিছুপরে মাদ্রাজে পৌঁছে আমাকেই গাইডের কাজ করতে হবে, এবং প্রাচীন ইতিহাস থেকে আধুনিক মতবাদ পর্যন্ত সব কিছুর তালিকা আমাকেই পেশ করতে হবে। রামখেলাওনের কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করতে না পারার পরে এটুকুও যদি না পারি তো আমাকে বহন করার সার্থকতা কোথায়। বিষয়ী লোক মামাবাবু, তাঁর দাঁড়িপাল্লায় ওজন একটু বেশিই চাইবেন।

ভেঙ্কটাইয়ারকে তাই প্রশ্নে প্রশ্নে বিধ্বস্ত ক'রে দিলুম। ভ্রমলোক বিরক্ত হলেন না। শ্রীমন্তও হলেন না। হাসিমুখে সকল প্রশ্নের জবাব দিলেন। আরও বললেন অনেক কিছু, যা জিজ্ঞেস করি নি। মাদ্রাজে নামবার আগে ভ্রমলোক তাঁর কলকাতার ঠিকানা দিলেন। একটা পত্রিকার অফিসে দাব-এডিটরি করেন। থাকেন চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের কাছে একটা দক্ষিণী হোটেলে। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্তে বার বার অহরোধ জ্ঞানালেন। আমিও এমন একটা চাকরির চেষ্টা বহুদিন করেছিলুম, যেখানে পড়বার ও লেখবার প্রচুর সময় ও সুযোগ পাওয়া যায়। মনের সে ইচ্ছের কথাটা আজ চেপে গেলুম। কলকাতায় বরং একদিন বলব।

প্ল্যাটফর্মে নেমে মনে হ'ল, মাদ্রাজ শহর যেন আমার অনেক দিনের চেনা। মনে হ'ল, এ স্টেশন দেখেছি। অনেকবার, দেখেছি ছোট লাইনের এগমোর স্টেশন। ভবঘুরের মত ঘুরেছি মাদ্রাজের পথে পথে আর দক্ষিণ ভায়তের শহরে শহরে। মনে হ'ল ধুসরোটির পথে দেখেছি রামচন্দ্রের সেতুবন্ধ, কস্তাকুমারীতে তিন সমুদ্রের মিলন। মহাবল্লীপুরমের সপ্তরথ আমার দেখা। উঠেছি ত্রিচির শৈলমন্দিরে, মাদুরার মীণাক্ষী মন্দিরের আলোকমালা পাগল করেছে কত রাতে। আর রামেশ্বরের শয়নারতি দেখে ফেরার কথা ভুলেছি কতবার। বিদায় দেবার আগে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালুম ভেঙ্কটাইয়ারকে।

মৈত্র মশাই বললেন, আমরা কাঙ্ক্ষী হয়ে পক্ষীতীরে ধাব। বললুম, মামাবাবুর ইটিনেরারিতে নেই ও ছোটো জায়গা। এক বকমের হাসি দিয়ে হালদার তাঁর ব্যঙ্গ জানালেন।

[ক্রমশ]

কবি করুণানিধান

শ্রীকালিদাস রায়

নেমে এসেছিলে আনন্দলোক থেকে,
তারি স্মৃতিধন স্বপ্নচিত্র তব মনে একে একে
জাগিয়া উঠিল,—সে দিব্যধন লভি
তুমি হয়েছিলে কবি।
চারিদিকে তব চুঃখ-দৈন্ত্য তাপ জ্বালা রোগ শোক,
তারি মাঝে তুমি গড়িলে স্বপনে পরমানন্দলোক,
যাপিলে জীবন সেই আনন্দলোকে
ছিন্ন কাঁথায় সোনার স্বপ্ন চোখে
গেয়ে গেলে তুমি স্মৃতিস্বপ্নের গান,
ছিলে যৌবনে তায় তন্ময় বিভোর মুহূর্ত্তমান।

এই ইহলোকে তোমার পাশ্চাৎ
উৎসবময় প্রেমমদিরায় ছিল নাক' তায় জ্বালা।
এসেছিলে তুমি কণ্ঠে পরিয়া যেই মন্মথরমালা
দেহের জ্বার দাহেও তা, কবি, হয় নি কখনো ম্লান,
অস্তরে তব চির তারুণ্য ছিল যে বিরাজমান।
পাইয়াছ তুমি প্রাক্‌জন্মের দিব্যানন্দলোক,
তোমা লাগি, কবি, করিব না মোরা শোক।

আপন মনের মাধুরী মিশায়ে প্রেমের স্বপ্ন দিয়া
গড়েছিলে যারে নূতন করি' সে-চিরসজ্জিনী প্রিয়া
কবিস্বর্গের তোরণে দাঁড়ায়ে হস্তে বরণডালা
তোমার কণ্ঠে পরাইল কবি নব পরিণয় মালা।

ছিলে না জীবনে ঐহিক সুখভোগী,
তব স্বরচিত আনন্দলোকে ছিলে তুমি প্রেমভোগী।
রসসাধনায় পেয়েছিলে রসব্রহ্মের সন্ধান,
সেই সন্ধানই করিল তোমায় দিব্যশক্তি দান।
তাই শিশুসম অকপট ছিলে, জ্বিনিলে অনুরা গোভ,
জ্বিনিলে চুঃখ দৈন্ত্য বেদনা ক্ষোভ।
জীবনের বিষ কণ্ঠে তোমার হয়ে হয়ে হ'ল স্খা,
হরিল সে স্খা অহরেবো তৃষাদ্ধা।
জ্বিনিলে তরুরে সহিষ্ণুতায় বিনয়ে জ্বিনিলে তৃণে,
অগাধ রসের হৃদসন্ধারে জ্বিনিলে রোহিত-মীনে।
সত্যে জ্বিনিলে অসত্য তুমি অকোষে জ্বিনি ক্রোধে
শাখতলোকে মহাপ্রয়াণে কে তোমার পথ রোধে ?
হে তাপস কবি, কবিদের কবি, আজিকে বারংবার
তব উদ্দেশে জানাই নমস্কার।



এই গ্রন্থের কলন

দীপক চৌধুরী

পঞ্চম রাজি

বন্ধু, অমিতাভ এসেছে জানিস? আজ সমস্তটা দিন সে আমার এখানেই কাটিয়ে গেছে। সন্ধ্যার একটু আগে আমিই ওকে যেতে বললুম। নইলে ওর একেবারেই ইচ্ছে ছিল না কাব্যের ছবোয়ার গেস্ট হাউসে কিরে যাওয়ার। কিন্তু আমি ওকে উৎসাহ দিতে পারলুম না... মানে, এখানে থাকবার জন্তে ওকে যে অনুরোধ করব তেমন সাহস আমার আর নেই। হাসছিল? ভাবছিল, লেক প্লেসের ক্ল্যাটে যে-লোকটাকে তিন চার মাসের জন্তে তাঁর ফেলতে দিয়েছিলুম, তাকে আজ কেন আমি এখানে থাকবার জন্তে অনুরোধ করতে পারলুম না? প্রশ্ন করবি, হঠাৎ আমার সাহসের অভাব ঘটল কি করে? হয়তো জানতে চাইবি, আমার চারিত্রিক শুচিতা হঠাৎ কেন কাশিয়ংয়ের পাহাড়ে এসে অবৈজ্ঞানিক হয়ে উঠল? কেবল অবৈজ্ঞানিকতার জন্তে নয়, প্রতিক্রিয়াশীলতার অপরাধে আমাকে তোরা অভিযুক্ত করতে দিখা করবি না। কিন্তু আমি কি করে তোদের বোঝাব রহস্য যে, লেক প্লেসের ক্ল্যাট থেকে কাশিয়ংয়ের পাহাড় পর্যন্ত আমি কেবল কয়েক শত মাইলের ব্যবধানই দেখছি না, দেখছি গোটা দুই-তিন শতাব্দীর দীর্ঘতম দূরত্ব। এ দূরত্বের দৃষ্টান্ত অমিতাভ আজ দেখতে পেয়েছে। দেখতে পেয়েছে যে, কুমারী জয়া বহু কোন কারণেই আজ আর লেক প্লেসের ক্ল্যাটে কিরে যেতে পারে না। আঃ কুমারী!! কুমারী নামের প্রতিধ্বনি যেন আমার সারা দেহে পুলকের তরঙ্গ তুলেছে। তুই তো জানিস, কুমারী-জীবনের প্রতি আমার কী রকম লোভ ছিল। সারা পৃথিবীর বিনিয়মে আজও আমি পারি না এতবড় ঐশ্বর্য ত্যাগ করে আসতে। আজ সকালে অমিতাভ যখন রিলুক-এর 'পিয়েতা' কবিতাটা পড়ছিল, তখন আমার চোখের সামনে বার বার করে কি একটা ছবি যেন ভেসে উঠছিল। কার ছবি ওটা? শেষের তিনটে লাইন থেকে কি একটা ছবি ফুটে উঠছে না, রহস্য?

আজ তুমি সোজা আমার কোল জুড়ে শুয়ে আছ;
আজ আর আমি তোমার
ভার সহিতে পারছি না।

এ ভার কি কুমারী-জীবনের? তা তো নয়। Das Marien Leben-এ কবি রিলুক-এর ছবি আঁকা সম্পূর্ণ হয়েছে। কুমারী মারীয়ার কোল জুড়ে শুয়ে আছে কে? রহস্য, অমিতাভ চ'লে যাওয়ার পরে আমি যেন এই ছবিটা থেকে কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারছি না। আমার ঘরের সবগুলো দেওয়াল জুড়ে যেন ছবি আঁকা রয়েছে। কুমারী মায়ের কোলে শুয়ে বাচ্চাটা কি তার শাখত সন্তানদের বাণী প্রচার করছে? বাণী কি সন্তানের, না, তার সৃষ্টিকর্তার? আমার মনে হচ্ছে, অমিতাভ রিলুক-এর অন্তরের কথা বুঝতে পেরেছে। কবি রাইনর মারীয়া রিলুক যে 'লগসের' শাখত স্বল্প উদ্ঘাটিত করবার চেষ্টা করেছেন তাঁর কবিতার পংক্তি-গুলোতে, তা আমিও বুঝতে পেরেছিলাম। না বুঝতে পারলে কুমারীত্বের গর্ব নিয়ে আজও আমি তোকে চিঠি লিখছি কি করে? ভাবছিল আমার কোল জুড়ে কে আসবে? কে আসবে আমি নিজেও তা জানি না। তবুও মনে হয়, কেউ না কেউ একজন আসবে। না এলে চলবে কেন? আমার কুমারীত্বের মধ্যে কেবল প্রতীক্ষা নেই, তপস্যা রয়েছে, চম্পিশটা বছরের গভীর তপস্যা! রহস্য, এ তপস্যায় যদি সিদ্ধি না আসে, তা হ'লে আমি কাশিয়ংয়ে পাগিয়ে এলুম কেন? কি দরকার ছিল একগাদা জন্তুর ভিড় থেকে নিজেকে রক্ষা করবার? কাশিয়ংয়ে যদি কখনও আসিস, তা হ'লে এসে দেখে যাস যে, আমার কুমারীত্বের গায়ে কলকাতার জন্তুগুলো একটাও দাগ বসাতে পারে নি।

মিস জয়া বহু কলমটা ফেলে রাখলেন কাগজের ওপর। শেষ লাইনটা লেখবার পরে তিনি মুখটা সরিয়ে নিয়ে এলেন ডান দিকে। চোখ দিয়ে জল পড়ছে তাঁর।

জলের আঘাতে কালির অক্ষরগুলো ভেঙে গেলে রহস্য হয়তো কত আজ্ঞাবাজে কথাই না ভাববে। কিন্তু রহস্যর কাছে কোন কিছু গোপন রাখবেন না বলেই তো তিনি
✱ আজ তাঁর জীবনের সব কাহিনী লিখতে বসেছেন।

মিস জয়া বহু তাঁর কুমারীত্বের নিঃসঙ্গ নিরাপত্তায় মুহূর্তপূর্বেও গর্ব বোধ করছিলেন। উপস্থিত তিনি তাঁর হাত ছুটো ছড়িয়ে দিলেন ডবল খাটের চণ্ডা বিছানার ওপর। স্পর্শহীনতার আলোড়ন রয়েছে আঙুলগুলোতে। কি যেন ধরতে চাইছিলেন তিনি। কেউ একজন কাছে থাকলে আঙুলগুলোতে শক্তি আসত তাঁর। অমিতাভর কথা ভাবতে ভাবতে জয়া বহু বিছানা থেকে উঠে এসে দাঁড়ালেন জানলার কাছে। ফান্ডার ছবোয়ার পেস্ট হাউস এখান থেকে কতদূর?

দূরত্বটা সঠিক অনুমান করতে গিয়ে লজ্জা পেলেন জয়া বহু। মনে পড়ল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কথা। অমিতাভ সেই যুদ্ধে বোগ দিয়েছিল। ভীষণভাবে আহত হয়েছিল সে। বা পাটা ওর পোড়া থেকে কাটা। কেবল বা পাটা নেই বলে মিস জয়া বহু লজ্জা পান নি। আরও কিছু যেন কেটে ফেলতে হয়েছিল অমিতাভর দেহ থেকে—

কে?—মিস জয়া বহু পেছন ফিরে প্রশ্ন করলেন।

আমি।—দরজা খুলে ঘরে এল নিশীথ।—তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এলুম, দিদিমণি।

জয়া বহু কথা শোনবার জন্যে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখালেন না। নিশীথের কথায় যে কোন মজল-সমাচার থাকবে না, তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, অমিতাভর আকস্মিক আগমন, নিশীথ একেবারেই পছন্দ করে নি। ভবতোষের প্রতি ওর ছিল অস্বাভাবিক আস্থা, হাওয়ারাতে দরজা খুলে সে লোক প্লেনের স্ট্যাটে ভবতোষকে বসতে দিয়েছে, কিন্তু অমিতাভর বোলায় নিশীথ কোনদিনই তেমন খাতির দেখায় নি।
✱ কেন দেখায় নি, সে কথা জিজ্ঞাসা করলে নিশীথ তার জবাব দেয় না। মিস জয়া বহু জানলার কাছ থেকে সরে এসে বললেন, তোর কথাটা এবার আমি শুনতে চাই নিশীথ। বলে ফেল।

অমিতাভবাবু তোমার ঠিকানা জানলেন কি ক'রে?

তা তো বলতে পারব না। নিশীথ, অমিতাভর প্রতি তুই এত বিরূপ কেন রে?

নিশীথ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসে শেষ পর্যন্ত কোন কথাই আর জিজ্ঞাসা করা হ'ল না। ঘর থেকে সে নিঃশব্দে বেরিয়ে যাচ্ছিল। জয়া বহু বললেন, আর ভয় নেই নিশীথ। এত উচুতে উঠে কেউ আর আসবে না তোর দিদিমণির নামে ফুংসা রটাতে। তা ছাড়া... তা ছাড়া অমিতাভর শারীরিক দুর্ঘটনার খবর তো সবাই জানে।

সেই জন্তেই অমিতাভবাবুকে আমার পছন্দ হয় না।—কস ক'রে কথাটা বলে ফেলল নিশীথ। বলে ফেলে দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল সে। কি করবে ভাবছিল। দিদিমণির মুখ থেকে একটা উত্তর শোনবার জন্যে নিশীথ অপেক্ষা করতে লাগল। নিশীথের বিশ্বাস, জয়া বহুর স্বাস্থ্য আবার ফিরে আসবে। বিয়ে হবে দিদিমণির। সংসার পাতবার সুযোগ তাঁর আসবে, আসবেই। কার্শিয়ংয়ের ডাক্তার প্রধানের সঙ্গে ওর এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক আলোচনা। ময় কিংবা মাহুলীর সাহায্যে যে জয়া বহু সংসার পাততে পারবেন না, সে সম্বন্ধে নিরক্ষর নিশীথ এক রকম নিশ্চিত হয়েছে। ডাক্তার প্রধানকে ও নেমস্তম্ব করে এসেছে দিদিমণির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে বলে। হয়তো কাল সকালেই তিনি আসবেন। আসা দরকার। কেবল লিভারটাই প'চে গেছে বলে গোটা দেহটাকে অকেজো ক'রে তোলার অর্থ কি? ডাক্তার প্রধান বলেছেন, কোন অর্থই নেই। তিনি দিদিমণির পচা লিভার আরোগ্য ক'রে তুলবেন বলে নিশীথকে কথা দিয়েছেন। ডাক্তার প্রধানের কথা অবিশ্বাস করার মত মুখতা ওর নেই। বিলম্ব থেকে এক গাদা ডিগ্রী এনেছেন তিনি। চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর মত পণ্ডিত বাংলা দেশে ছ' চারজনকে বেশী নেই বলেই নিশীথ শুনছে। খুব বড় পণ্ডিত বলেই তিনি এখনও বিয়ে করেন নি। এমন একটা সুন্দর পরিস্থিতির মধ্যে অমিতাভবাবু হঠাৎ কি ক'রে এসে উপস্থিত হলেন? নিশীথ প্রশ্ন করল—দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়েই সে প্রশ্নাদ গণছিল। এমন সময় মিস জয়া বহু জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু বলবি?

কাল সকালে ডাক্তার প্রধান তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।

• আমার অস্থখ তো এমনিতেই সেয়ে যাচ্ছে, ডাক্তারকে আবার ডাকতে গেলি কেন? তা ছাড়া কাল সকালে অমিতাভকে আমি চা খেতে বলেছি।

ডাক্তার প্রধান আসবেন বেলা এগারোটার সময়। তখন বোধ হয় অমিতাভবাবু থাকবেন না।—এই বলে নিশীথ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মিস জয়া বহু কি যেন ভাবছিলেন। সামনের দিকে হঠাৎ তিনি দৃষ্টি ফেলাতেই দেখলেন যে, নিশীথ সেখানে নেই। তিনি বেশ একটু জোরেই ডাকলেন, নিশীথ, নিশীথ—

করিডোর থেকেই নিশীথ জিজ্ঞাসা করলে, আমায় ডাকছ দিদিমণি?—

হ্যাঁ। কাল দুপুরে অমিতাভবাবু এখানেই খাবেন।

জয়া বহুর কথা শুনে নিশীথ পুনরায় ফিরে এল করিডোর থেকে। নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল দরজার কাছে। জয়া বহু জিজ্ঞাসা করলেন, আর কিছু বলবি?

না।

তবে আবার ফিরে এলি কেন?

মনে হ'ল তুমি আরও কি যেন বলতে চাইছ আমাকে।

না, এ তোমার ভুল ধারণা। অমিতাভকে তুই পছন্দ করিস না ব'লে তোমার মন আজ চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

কিন্তু নিশীথ কি যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথাটা না ব'লেই সে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পেছন থেকে জয়া বহু বললেন, এখন থেকে অমিতাভ প্রত্যেক দিন এখানেই খাবে। নব্বো পর্যন্ত এ বাড়ির দরজা খোলা থাকবে ওর জন্তে। নিশীথ—

নিশীথের ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পেলেন ব'লে মিস জয়া বহু শেষের কথাটা আর শেষ করলেন না। একটু পরেই তিনি এসে আবার রত্নার কাছে চিঠি লিখতে শুরু করলেন।

খানিকটা সময় নিশীথ নষ্ট ক'রে দিয়ে গেল। তা হোক, আমার কাছে নিশীথের সাতখুনও মাপ।

রত্না, গতকাল যে তোমার কাছে চিঠি দিয়েছি, তাতে আমার কলকাতা আসার কথা লেখা ছিল। প্রায় তিরিশ

বছর আগে আমি বড়মামা ডক্টর বাদব মিত্রের সঙ্গে কলকাতা এলুম। ট্রেনের কামরায় ব'সে মামা আমার সঙ্গে আর কথা বলেন নি। কোর্টের পকেট থেকে একখানা ইংরেজী বই বার ক'রে তিনি তন্ময় হয়ে বইখানা পড়তে লাগলেন। প্রাচীন ভারতবর্ষের কোন এক বিশেষ যুগ সম্বন্ধে তিনি তখন গুরুতর গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। আমার পক্ষে ট্রেনযাত্রাটা সেই জন্তে খুবই আরামদায়ক হয়ে উঠল। কামরায় ব'সে নিশ্চিন্ত মনে কেটনগরের কথা ভাবতে লাগলুম। গতকাল ভোরবেলাতেও মা বেঁচে ছিলেন। আজ তিনি নেই। পৃথিবীর কোথাও তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। মৃত্যুর এক মুহূর্ত পূর্বেও এমন একটা বাস্তব-সত্য হৃদয়ঙ্গম করা সহজ ছিল না, অথচ মা নেই ব'লে আজকে আমার জীবনের সব কিছু বদলে গেল চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই! কেটনগরকে পেছনে ফেলে যেতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না। ভবভোষকে মনে রাখতে হবে ব'লেই আমি আজও কেটনগরের কথা ভুলি নি। নইলে—

শেয়ালদা এসে গেছি।—এই বলে বইটা বন্ধ ক'রে মামা বেকির তলা থেকে আমার ট্রান্সটা টেনে বার করলেন। গাড়িটা থামতেই একজন কুলি এসে উঠে পড়ল কামরায়। শেয়ালদা টেশনে ভবভোষ নেই—কুলির পরমা বীচাতে পারলেন না ব'লে মামা মনে মনে যারপরনাই বিরক্তি বোধ করতে লাগলেন। তিনি তাঁর গলার স্বরে বিরক্তির কঁাজ মিশিয়ে বললেন, এত কি হাতীঘোড়া নিয়ে এলি কেটনগর থেকে?

কেন মামা, খুব বেশী ওজন নাকি? দু-চারখানা কাপড় জামা ছাড়া আর কিছু নেই।

বলিস কি! তবে এত ওজন কেন?—কুলির মাথায় ট্রান্সটা তুলে দিতে দিতে প্রশ্ন করলেন মামা।

কি জবাব দেব ঠিক করতে না পেরে আমি বললুম, ও, ঠিক মনে পড়েছে। বাবার একটা ফোটা আছে ওতে।

কথাটায় কান দিলেন না মামা। কুলির গা ঘেঁষে ঘেঁষে তিনি হাঁটতে লাগলেন। মাঝে মাঝে বলতে লাগলেন, এই কুলি, উধার না, ইধার আও। আমার দিকে পেছন ফিরে দু-তিনবার তিনি সাবধান ক'রে বললেন, জয়া, ব্যাটার দিকে চোখ রাখিস, মাল নিয়ে স'রে না পড়ে!

টিকিট-কালেক্টরের হাতে টিকিট ছোটো গুঁজে দিয়ে
মামা বেরিয়ে এলেন প্র্যাটফর্মের বাইরে। আমি তাঁর
পেছনেই ছিলাম। মামাকে ডেকে বললুম, একটু দাঁড়াও
মামা।

কি হ'ল? ব'সে পড়লি কেন?

আগেলের চামড়া ছিঁড়ে গেছে।

আগেল?—মামা মুখ ভেংচে জিজ্ঞাসা করলেন,
আগেল আবার কোথেকে নিয়ে এলি?

কেটনগর থেকে।

কই, আমি তো দেখি নি!—মামার চোখে মুখে
বিস্ময়ের আভাস।

আগেলটা হাতে নিয়ে মামার পেছনে পেছনে আমি
হাঁটতে লাগলুম। তিনি একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া
করলেন। যেতে হবে হরিশ মুখার্জি রোডে।

গাড়িতে উঠে তিনি বললেন, তোর মামীমা কিন্তু
সারাটা দিন ধর্মকর্মে ব্যস্ত থাকেন।

পূজো করেন বুঝি?

হ্যাঁ। তাঁর সংসারে চামড়ার চল নেই। তিনি
জুতো-টুতো পরেন না। বুঝলি?

বুঝছি মামা। হাত থেকে ছু পাটি আগেল ফেলে
দিলুম রাস্তায়। বউবাজারের মোড়টা পার হয়ে যাওয়ার
পরে হঠাৎ মামা আমার জিজ্ঞাসা করলেন, আগেলটা

কাগজ দিয়ে মুড়ে নিলেই চলবে। বুঝলি জয়া?

বুঝছি। কিন্তু আগেল তো আর নেই।

নেই?—মামা ঘেন আকাশ থেকে পড়লেন।

নেই। শেখালদা থেকে বেরিয়ে আসবার সময় ফেলে
দিয়েছি।

ফেলে দিলি কেন? ছোটো পয়সা খরচ করলেই রাস্তার
যে-কোন একজন মূচি সেলাই করে দিত। বোকা
মেয়ে! কলকাতায় কি মূচির অভাব আছে?

না মামা, মামীমার সামনে জুতো পায় দিয়ে কি আমি
হাঁটতে পারি? তিনি জুতো পরেন না, আমি কেন
পরব? আমার কথা শুনে মামা খুব খুশি হলেন। কচুয়ানকে
বললেন, জলদি চলো। কলকাতার ঘোড়া ক্রমাগত চাবুক
না খেলে ছুটতে চায় না, বুঝলি?

বুঝছি। হরিশ মুখার্জি রোড আর কত দূর মামা?

রাস্তাটা স্টেশনের কাছে হ'লে কত সুবিধে হ'ত। ভাড়া
লাগত কত কম।

মামা আলোচনা বন্ধ করলেন।

বাড়ির কাছে এসে তিনি বললেন, মামার বাড়িতে এলি
বটে, কিন্তু মনে রাখিস, আমার অবস্থা তেমন ভাল নয়।
সংসার চলে কষ্ট করে। তার ওপর তোর মামীমার আবার
শরীর ভাল নেই। এক গেলাস জল খেলে পর্যন্ত হজম হতে
চায় না। কোলের বাচ্চাটা সারাদিন চোঁচায়। মামীমাকে
সাহায্য খানিকটা করতেই হবে।—যামিনী! এই যামিনী!

যামিনী কে মামা?

চাকর। এই যে। মালগুলো সব গুনে গুনে ভেতরে
নিয়ে যা। দোতলায় তুলিস নে, নীচের ঘরটা সাক
ক'রে রেখেছিস তো?

আমার বিছানাটা মাথায় তুলে যামিনী ঘাড় নেড়ে
সম্মতি জানাল।

বাড়িটা দোতলা। নীচের তলায় চারখানা ঘর।
তিনখানা ঘর শোবার জন্তে ব্যবহার করা হয়। মামীমা
তাঁর ছেলেপেলে নিয়ে নীচেই থাকেন। চতুর্থ ঘরখানা
সবচেয়ে ছোট—সেখানে তিনি লক্ষ্মীর ছবি রেখেছেন।
পূজো করেন তিনি নিজেই। পূজোর জন্তে যা খরচ হয়,
তার জন্তে মামা কখনই কার্পণ করেন না। কিন্তু মামাকে
একদিনও পূজো করতে দেখি নি। পূজো করার সময়ও
তিনি পেতেন না। দোতলার ছাদ জুড়ে মস্ত বড় একটা
হলঘর আছে। এটা মামার লাইব্রেরি। কলেজে পড়াতে
যাওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এখানেই থাকেন।
বিভাচর্চার প্রতি তাঁর যে কী ভীষণ তন্ময়তা, এখানে না
এলে তা কেউ বুঝতেই পারত না। দোতলার মামার
সঙ্গে একতলার মামার ছিল আকাশপাতাল ভ্রাতৃত্ব।

গাড়ি ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে মামা আমার ভেতরে নিয়ে
এলেন। মামীমা সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। কোলে
তাঁর বাচ্চাটা ছিল। একটু আগেই বোধ হয় ছেলেটা
চোঁচানি বন্ধ করেছে। চোখের নীচে জলের ফোঁটা
দেখলুম তখনও শুকোয় নি। ওর সারা গায়ে অসংখ্য
ঘামাচি—একটা মস্ত বড় ফোঁড়া ঘাড়ের ওপর উঠে
উঠেছে। কাঁচা ফোঁড়া ব'লেই হয়তো ও এখনও ব্যথার
প্রকোপ বুঝতে পারছে না।

মামীমার পায়ের ধূলা নেবার জন্তে মাথা নীচু করতে বাচ্ছিলাম, কিন্তু মামীমা বাঁ হাত দিয়ে আমার কপে দিয়ে বললেন, থাক, থাক—বাচ্চাটাকে একটু কোলে নে তো জয়া। তিনি এক রকম জোর করেই ওকে আমার কোলে তুলে দিলেন। ছ মাসের শিশু সেই যে আমার কোলে উঠল, আর সে এক বছর পর্যন্ত আমার কোল থেকে নামে নি। যখন নামল তখন মামীমার কোলে আবার নতুন শিশু এসে গেছে।

মামার বড় ছেলে নন্দ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে আই. এস-সি. পড়ছিল। নন্দের পরে একটি বোন রমা। বয়স বোধ হয় বছর দশ হবে। ওদের মারখানে একটি ভাই ছিল, ছ মাস বয়সেই সে মারা গেছে। রমার পরে আরও দুটি ভাই আছে। একটি কোলের, আর একটির বয়স হবে তিন কি চার। ওরা সবাই এসে দাঁড়িয়েছিল মামীমার পাশে। আমি ভেতরে আসবার পরে নন্দ নিশ্চক্ষে সঁরে পড়ল ওখান থেকে। আমার চেহারা দেখে ওর একটুও ভাল লাগে নি। রমাও দেখলুম, একটুও কথা না বলে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছিল। মামীমাকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, ওর নাম কি মামীমা?

রমা। সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে জবাব দিল রমা নিজেই।

আমার নাম জয়া।

তুমি আমার জয়াদি?

হ্যাঁ।

মামীমা এবার বললেন, খোকাকে নিয়ে ও-ঘরে যা তো জয়া।—ঠিক কোন্ ঘরে যে যেতে হবে বুঝতে না পেরে আমি বললুম, রমাও চলুক না আমার সঙ্গে।

একটু পরেই একতলার স্থাপত্য-শিল্প বুকে ফেললুম আমি। উঠানের পূর্বদিক ঘেঁষে চারখানা ঘর পাশাপাশি সাজানো রয়েছে, অনেকটা ব্যারাক-বাড়ির মত দেখতে। পশ্চিম দিকে ব্রাহ্মণর, তার পাশে কলতলা। মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, তারপরে ভাঁড়ারঘরের মত ছোট্ট একখানা ঘর। রমা আমার এখানে নিয়ে এসে বললে, আজ থেকে তুমি এখানেই শোবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তোমাদের খুব অসুবিধে হ'ল, না রমা?

কেন?

তোমাদের একখানা ঘর আমি নিয়ে নিলুম।

ও মা, এখানে তো নানীনাথ শুভ। এটা তো আমাদের ঘর নয় জয়াদি।

নানীনাথ কে?

আমাদের বামুন ঠাকুর।

খোকাকে রমার কোলে দিয়ে আমার বিছানাটা পেতে ফেললুম চৌকির ওপর। কাল রাত পর্যন্ত নানীনাথ এই চৌকিটা ব্যবহার করেছে। আজ থেকে ব্যবহার করব আমি। নানীনাথকে স্থানচ্যুত করলুম বলে আমার মনটা বড় খারাপ লাগতে লাগল। বিছানা পাতা শেষ হওয়ার পরে আমি রমাকে জিজ্ঞাসা করলুম, নানীনাথ এবার শোবে কোথায়?

রমা বললে, ওদের কি কিছু ঠিক আছে জয়াদি, ওরা তো রাস্তায় শোয়।

রাস্তায়?

আমার বিশ্বাসের চেয়ে রমার বিশ্বাসের মাত্রা বাড়ল অনেক বেশী। সে আমাকে বললে, উড়ে আর হিন্দুস্থানীরা তো রাস্তায় শুতে ভালবাসে। আমাদের হরিশ মুখার্জি রোডে গিয়ে তুমি দেখে এস।

রাত্রে খাওয়া শেষ হতে সেদিন প্রায় রাত এগারোটা বাজল। মামার খাওয়া শেষ না হ'লে এ বাড়ির কেউ খেতে বসত না।

নন্দ কিংবা রমার কথা আলাদা। ওরা তো ছেলেমানুষ, তাই ওদের আগেই খাইয়ে দিই আমি। নন্দ যদিও আই. এস-সি. পড়ছে, তবুও ওকে ছেলেমানুষই বলতে হয়। তা ছাড়া, তাড়াতাড়ি শুতে না গেলে নন্দ ভোরবেলা উঠে কলেজের পড়া তৈরি করতে পারবে না। জয়া, কেউনপরে ভোদের কটার সময় খাওয়া হ'ত রে?—জিজ্ঞাসা করলেন মামীমা।

বললুম, রাত এগারোটোর আগে তো নয়ই। প্রত্যেক দিনই সাড়ে দশটা পর্যন্ত আমি লেখাপড়া করতুম।

ও মা, তুমি আবার কি লেখাপড়া করতিস? অবাক হওয়ার মত মুখের ভঙ্গি করে প্রশ্ন করলেন মামীমা।

ইত্যবসরে নানীনাথ আমার ধানায় বেশ বড় বড় ছ টুকরো পোনামাছ ভাজা দিয়ে দিয়েছে। মামীমা সেই

দিকে দৃষ্টি ফেলে বললেন, ভাজা জিনিস আমার পেটে
একরকম হজম হয় না। সিকি ইঞ্চি মাছ কোনরকমে
চিবতে পারি—

বাধা দিয়ে আমি তাড়াতাড়ি নামীনাথের দিকে চেয়ে
বললাম, এতগুলো মাছ খাওয়ার অভ্যাস আমার
নেই। নামীনাথ, ওকে বলুন না মাছ ছোটো তুলে নিয়ে
যেতে। আমি তো এঁটো করি নি।

কেন রে? মাত্র ছোটো মাছ, খেতে পারবি না? খা,
খা, খেয়ে নে।

না, এক মাস আমার মাছ খেতে নেই।

ও, তাই তো! নামীনাথ।—ডাকলেন নামীনাথ।

নামীনাথ সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি ঠাকুরকে
বললেন, মাছ ছোটো তুলে নিয়ে যাও। নামীনাথ, নমস্কার
কি আজ মাছ খায় নি?

খেয়েছে যা।—জবাব দিল নামীনাথ।

কথানা খেয়েছে?

চারখানা।—আমার খালা থেকে মাছ তুলতে তুলতে
জবাব দিল বামুন ঠাকুর।

নামীনাথ জবাব শুনে বললেন, মাছ যখন বেশী আনা
হয়েছে, তখন ওকে ছাণা দিলেই তো পারতে। বুঝি
জমা, ছেলেদের এই তো খাবার বয়স। সতেরো বছর
বয়সে ছাণা পোনামাছের টুকরো খাওয়া এমন আর
বেশী কি হ'ল, বল?

আমি কিছুই আর বললাম না। নিঃশব্দে বাকি
সময়টুকু তরকারি দিয়ে ভাত মেখে খেতে লাগলাম। মনে
হ'ল, নামীনাথ যেন একদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে।
চেয়ে চেয়ে সে দেখছিল কি? আমার ভবিষ্যৎ? কিংবা
সে হয়তো চেয়ে চেয়ে দেখছিল, মাছের সঙ্গে মাছের
কত তফাত!

ঘরে ঢুকে আমি যেন দরজা বন্ধ করতে ভুল না করি
সেজন্তে নামীনাথ আমায় বার বার ক'রে সাবধান ক'রে
দিলেন। হরিশ মুখার্জি রোডে চোর-ডাকাতের অভাব
নেই। দরজা বন্ধ করতে আমার অবিজ্ঞি ভুল হ'ল না।
চোর-ডাকাতের ভয় আমার ছিল না। ভয় ছিল লাগু ও
শিক্ষিত মানুষদের জন্তে। বয়স আমার বারো বছর।
কিন্তু ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করার পর আমার মনে হ'ল,

যেন বত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতার ওজন আমার ঘাড়ের ওপর
চেপে বসেছে, আমি আর বুঝি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।

বিছানার ওপর ব'সে পড়লাম আমি। রাত্তার দিকের
জানলাটা খোলা ছিল। সন্ধ্যাবেলা থেকে টিপ টিপ ক'রে
বৃষ্টি পড়ছিল। কি মনে ক'রে জানলার কাছে এগিয়ে
বসলাম। বোধ হয় ঠাণ্ডা বাতাসটা গায়ে লাগাতে ভাল
লাগছিল আমার। কিংবা নতুন দেশের নতুন হাওয়া
আমায় আকর্ষণ করছিল অমিতবিক্রমে। কলকাতার
আকর্ষণ উপেক্ষা করবার মত সংসাহস গত তিরিশ বছরের
মধ্যে আমি অর্জন করতে পারি নি, রত্ন। সেদিন সেই
অন্ধকূপের মত ছোট ঘরখানাতে ব'সে আমি কলকাতার
জগৎটাকে দেখতে পেয়েছিলুম পরিষ্কারভাবে। ঘিরে
বাওয়ার উপায় আমার ছিল না। তাই সেই জগৎটার
অন্ধকার আমায় গ্রাস করতে লাগল প্রতি পলে পলে।
আমি ঘুমিয়ে পড়লাম জানলার পাশে, প্রাচীরের গায়ে
হেলান দিয়ে।

বোধ হয় স্বপ্ন দেখছিলুম। রমা বলেছে, উড়ে আর
হিন্দুস্থানীরা রাত্তার শুতে ভালবাসে। স্বপ্নের মধ্যেই আমি
ওর ধারণাটা ভেঙে দেবার চেষ্টা করছিলুম। তর্ক
করছিলুম কলকাতার প্রতিটি শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে যে,
উড়িয়া কিংবা হিন্দুস্থানীরা রাত্তার শুতে ভালবাসে না।
ওরা অসহায় ব'লেই ওদের আশ্রয়ের অভাব ঘটেছে।
মানুষ নরদমার জল খেতে ভালবাসে না, উপায় না থাকলেই
খায়। মনে হ'ল, আমার কথা কেউ স্বীকার ক'রে নিচ্ছে
না। বড় অসহায় বোধ করছিলুম আমি। আমার
দিকে কেউ নেই, একটা শিক্ষিত জানোয়ার পর্বস্ত আমার
কথায় সাব দিচ্ছে না। ঘুমের মধ্যেই কেঁদে উঠলাম আমি।

মহা ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে থেকে জানালা দিয়ে
হাত বাড়িয়ে কে যেন আমার থাকা দিয়ে বলছে, দিদিমণি,
জানলা বন্ধ ক'রে দাও। বৃষ্টির জলে বিছানা তোমার
ভিজ্জে গেল যে।

কে? কে?—চোখ বগড়ে চেয়ে দেখি, নামীনাথ
জানলার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টির জলে দাঁড়িয়ে
দাঁড়িয়ে ভিজ্জে হিন্দুস্থানী নামীনাথ। বোধ হয় আমি
ঘুমিয়ে পড়বার পরেই খুব জোরে বৃষ্টি নেমেছে। জানালা
দিয়ে চেয়ে দেখলাম, রাত্তার জল জমেছে অনেক।

নামীনাথকে বললুম, জলে দাঁড়িয়ে ভিজ্জছ কেন, ভেতর চলে এস।

না দিদিমণি। জল একুনি খেমে যাবে।

শোবে কোথায় নামীনাথ?

ওই তো ওখানে একটা বেঞ্চি পড়ে আছে।—এই ব'লে সে ওখান থেকে স'রে যাচ্ছিল। রাস্তার উণ্টো দিকে উড়িয়াদের একটা পান-সিগারেটের দোকান ছিল। আমি দেখলুম, দোকানটার সামনে একটা বেঞ্চি রয়েছে। দোকানের গা থেকে একটা টিনের ছাউনি এসে ঝুঁকে পড়েছে রাস্তার ওপর। বেঞ্চিটা পাতা ছিল সেই ছাউনিটারই তলায়। যাওয়ার সময় নামীনাথ আমার বললে, কোনও ভয় নেই দিদিমণি। আমি তো সামনেই রইলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে চোর-ডাকাত আসে না কি?

না, রাজিবেলা তোমার ঘরে ইয়া বড় বড় ইঁদুর আসে—বড় বেশি ছোট্টাছুটি করে।

ঘরে তো কিছুই নেই, ছোট্টাছুটি করে কেন নামীনাথ?

তোমার চৌকির তলায় মা তরকারি রাখেন। বর্ষাকালে আলুর দাম চড়ে যায় ব'লে বাবু কলেজ থেকে ফেরবার মুখে কদিন আগে ছু-মণ আলু কিনে এনেছিলেন। বালির সমুদ্রে আলুগুলো সব ডুবে আছে দিদি। জল খেমে গেছে, আমি চলি। দরকার হ'লে ডাক দিয়ে।

খোলা জানলা দিয়ে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম নামীনাথকে। কোমর থেকে গামছাটা খুলে নিয়ে সে শুয়ে পড়ল বেঞ্চিটার ওপর। গামছাটাকে মুড়ে নিয়ে দু'ধার তলায় রাখল বালিশের মত করে। পান-সিগারেটের দোকানে দেখলুম বেশ ভিড় জমেছে। হারিকেন লঠনের আলোর প্রত্যেকটি মুখ আমি পরিষ্কার ভাবে দেখতে

পাচ্ছিলুম। এরা কেউ বাঙালী নয়। উড়িয়া এবং বিহারের অধিবাসী এরা। এসেছে বাঙালীবাদের বাড়িতে কাজ করতে। কিন্তু কাজ করতে এসেছে ব'লে ওরা কেন যে রাস্তায় শুতে ভালবাসে আমি তা বুঝতে পারলুম না। রমা বোধ হয় ওদের সম্বন্ধে কথাটা ঠিক বলে নি।

রমার কথাটাই ভাবছিলুম। ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম তা আর মনে নেই। ভোর-রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। মুখলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। মনে পড়ল নামীনাথের কথা। জানলা দিয়ে চেয়ে দেখলুম, সে ওখানে নেই। বেঞ্চিটাও উধাও হয়েছে। আমার বাড়িতে এসে প্রথম দিনেই নিজেকে আমি অপরাধী মনে করতে লাগলাম। আমার জন্তে একজন মানুষ রাস্তার ধারে ব'লে হয়তো রাত জাগছে। আমার জন্তে হিন্দুস্থানী নামীনাথ আশ্রয়চ্যুত হয়েছে।

যাকি রাতটুকু আর ঘুম এল না। আলো জ্বালাতেই দেখি, বেড়াল-বাচ্চার মত বড় বড় ছুটে ইঁদুর নর্দমা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। দরজা বন্ধ করতে মায়ীমা আমার বার বার ক'রে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু নর্দমার মুখ তো বন্ধ করতে বলেন নি। কি জানি, ছু মণ আলুর হিসেব করতে গিয়ে কোনদিন যদি ওজনে কিংবা সংখ্যায় কম পড়ে তা হ'লে আমাকেই হয়তো তার জবাবদিহি করতে হবে। কেউনগরেই বুঝতে পেরেছিলাম যে, বড় মামা টাকাপয়সা সম্বন্ধে খুবই সতর্ক—সংখ্যাধিক সাত্রাজ্য পতনে তিনি বিচলিত হন না, কিন্তু ইঁদুরের পেটে আলুর অস্তর্ধান হ'লে তিনি উবেলিত হয়ে ওঠেন।

বিছানায় ব'লে মনে মনে আমি শক্তিত হয়ে উঠলাম। ঐতিহাসিক ডক্টর বাদব মিত্রের ভাঁড়ারঘরে সম্ভবত নতুন ইতিহাস তৈরি হচ্ছে।

[ক্রমশঃ]

সাহিত্যে সত্য, নীতি ও প্রেরণা

শিবনারায়ণ রায়

১ প্রেটো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র হতে কবিকুলকে নির্বাসিত করেছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল যে, কবিরা চরিত্রহীন, অসংযমী এবং সত্যভ্রষ্ট। চরিত্রহীন, তার প্রমাণ তাঁরা পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন চরিত্র কল্পনা করে তাদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন। অসংযমী, তার কারণ তাঁরা প্রেরণার দ্বারা পরিচালিত, এবং প্রেরণার ওপরে যে কোন সংযম চলে না এ তো সকলেরই জানা। আর যেহেতু ইঙ্গিতপ্রদান জগতের অহংকরণের মধ্যে কবি-কল্পনা ক্ষুতি-লাভ করে, সেই কারণে সত্য কখনও কাব্যের ধ্যেয় হতে পারে না। সত্য অজ্ঞর অমর অতীন্দ্রিয়। শুধু দার্শনিকের একাগ্র সাধনার মধ্যেই সত্যের প্রতিফলন সম্ভব। স্মৃতরাং জ্ঞান, জ্ঞাননিষ্ঠা এবং চারিত্রের ওপরে ভিত্তি করে কোন আদর্শ রাষ্ট্র যদি গড়ে তুলতে হয় তবে সে রাষ্ট্র থেকে, যত ব্যথিত মনেই হোক, কবিদের বিদায় দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

প্রেটোর অগ্রান্ত চিন্তার মত কাব্য সম্বন্ধে এ যুক্তি পরবর্তী কালের পশ্চিমী ভাবুকদের মন আলোড়িত করেছে। এঁদের মধ্যে যারা কাব্যের সপক্ষে নানা কথা বলেছেন, তাঁদের অধিকাংশই প্রেটোর অভিযোগের মারাত্মক মর্মার্থ অস্বীকার করতে পারেন নি। সম্ভবত এক আক্সিটেলই বুঝতে পেরেছিলেন যে, প্রেটোর দার্শনিক প্রত্যয়গুলিকে খণ্ডন করতে না পারলে কাব্য বিষয়ে তাঁর অভিযোগের কোন যথার্থ সত্ত্বের সম্ভব নয়। এমন কি সিডনির মত সুরসিক কাব্যাহ্বারাগী এবং শেলীর মত খাস কবির পর্বস্ত মনে হয়েছিল, প্রেটোর অগ্রান্ত প্রস্তাব মেনে নিয়েও কাব্য সম্বন্ধে তাঁর রায়কে বৃষ্টি অগ্রাহ্য করা চলে। প্রেটোর মত কবিপ্রাণ দার্শনিক যদি শেষ পর্বস্ত কবিতার দাবি দর্শনের নামে খারিজ করে থাকেন তবে তা যে অনেক ভেবেই করেছিলেন, এঁদের মত প্রেটোভক্তরাও সে কথা বুঝতে পারেন নি ভাবতে তাক্সব লাগে।

প্রেটোর সিদ্ধান্তে কোন খাঁটি সাহিত্যরসিক স্বভাবতই সায় দিতে পারবেন না। কিন্তু সায় না দেওয়া এক কথা, আর এ সিদ্ধান্ত বেঠিক বলে খারিজ করা আর এক কথা। মনে রাখা দরকার, প্রেটো মূলত সাহিত্যসমালোচক

ছিলেন না; তিনি দার্শনিক, পৃথিবীর সেবা দার্শনিকদের মধ্যে সর্বস্বীকৃতভাবে তিনি একজন। স্মৃতরাং তাঁর বক্তব্যের সুবিচার করতে হলে যে-দর্শনের কষ্টিপাথরে তিনি সাহিত্যকে ঝাটাই করেছেন তার সঙ্গে নির্ভরযোগ্য পরিচয় থাকা দরকার। চারিত্র, সত্য ও প্রেরণা বলতে প্রেটো বা বুঝেছেন তা যদি আমরা মেনে নিই, তবে সাহিত্য বিষয়ে প্রেটোর অভিযোগ খণ্ডন করা শুধু কঠিন নয়, বোধ হয় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

প্রেটোর মতে আদর্শ সমাজে প্রতি ব্যক্তির একটি নির্দিষ্ট দায়িত্ব এবং কর্মবিধি থাকা দরকার। তার জীবন এই দায়িত্ব এবং কর্মবিধির দ্বারা নিরূপিত হবে। যেমন, যে যোদ্ধা, তার জীবন ক্ষাত্র আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; আবার যে দাস, তার সার্বিকতা আদর্শ দাস হিসাবে গড়ে ওঠায়। সমাজে নিজের নির্দিষ্ট স্থানটি মেনে নিয়ে সেই স্থানের উপযোগী হয়ে ওঠার নাম চারিত্র। নিজের স্থানাহুয়াদী কাজ করার নাম জ্ঞায়, আর সে স্থানের অহুপযোগী কাজ করার নাম অজ্ঞায়। প্রজ্ঞা প্রজ্ঞার মত থাকবে, রাজা রাজার মত। অর্থাৎ ব্যক্তি তার নিজের খেয়ালখুশিমত জীবনযাপন করতে চাইবে না। তার জীবন কর্তব্যের সরলরেখায় চালিত হবে এবং সে রেখা নির্দিষ্ট হবে সমাজসংগঠনের প্রয়োজন বিচার করে। ব্যক্তিচরিত্রে কোন অস্পষ্টতা, জটিলতা, বিরোধ কি বহুমুখীনতা থাকবে না। আধুনিক জীবন থেকে উপমা নিলে যদি দোষ না হয় তবে বলা যায়, তার চরিত্র হবে কারখানায় তৈরী যন্ত্রের এক-একটি অংশের মত। যে বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্তে সে তৈরী, সে উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে তার চরিত্র কতটা উপযোগী শুধু এটুকু বিচার করে ব্যক্তির মূল্য নির্ধারিত হবে। ব্যক্তির নিজস্ব কোন মূল্য নেই; সমাজযন্ত্রের অংশ হিসাবেই তার দাম। এ চিন্তার সঙ্গে হিন্দুসমাজের বর্ণভেদ এবং মার্কসবাদী সমাজপরিকল্পনার সাদৃশ্য হয়তো অস্পষ্ট নয়।

চারিত্রের উপরোক্ত ব্যাখ্যা যদি আমরা মেনে নিই, তবে সাহিত্যিক যে চরিত্রবান অথবা চারিত্রের প্রতি খুব

প্রাঙ্গণী—এ কথা বলা চলে না। কেন না, সাহিত্যিকের কৌতুহল কোন বিশেষ কর্তব্য বা কর্মবিধির মধ্যে আবদ্ধ নয়। সমাজে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করে সেই স্থানের উপযোগী হয়ে ওঠাতেই ব্যক্তির পরমার্থ, কোন সংসাহিত্যিক এ তত্ত্ব মেনে নিতে গরবাক্ষী। সাহিত্যিকের কারবার সেই মানুষকে নিয়ে, যে মানুষ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিঃশেষিত নয়, যে মানুষের মন কোন পূর্বনির্দিষ্ট সয়ল-রোধায় ধরা যায় না, যে মানুষ জটিল, বহুমুখী, আত্মবিশক্ত, যে মানুষ বহু সহস্র শতাব্দীর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মহত্বের বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেছে। সে মানুষের দেহমনের পরতে পরতে কত যুগের কত রূপান্তরের আঁকর প্রচ্ছন্ন; সে মানুষের অস্তিত্বে একই সঙ্গে আদিম অরণ্যের অন্ধকার স্থিতি আর ভবিষ্যৎ সভ্যতার উজ্জ্বল পূর্বকল্পনা মিশে আছে। এই জটিল, জঙ্গম, অসম্পূর্ণ অথচ সমগ্র ব্যক্তিমানুষকে সমাজ-পরিকল্পনার ছকে ফেলে তাকে চরিত্রবান করায় এক ধরনের দার্শনিক মন হয়তো তৃপ্তিলাভ করতে পারে, কিন্তু খাঁটি সাহিত্যিকের চোখে সে চেষ্টা মূঢ়তা ছাড়া কিছু নয়। এ মূঢ়তা যতক্ষণ পর্যন্ত দর্শনের পাতার মধ্যে আবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তা শুধু কৌতুকাবহ। কিন্তু যখন তা দর্শন ছেড়ে সামাজিক জীবনে প্রয়োগের আকার নেয়, তখন সে কৌতুক বড় মর্যাদাসিক হয়ে ওঠে।

সাহিত্যিক মানুষের সমগ্র অথচ অসম্পূর্ণ রূপটিকে তাঁর রচনায় ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। আগে হতেই যদি তাঁর মন কোন এক নির্দিষ্ট চারিত্রের ছকে বাঁধা পড়ে তবে তিনি এ চেষ্টা করবেন কি করে? তাঁর সেই উন্মুক্ত, উন্মুখ সহানুভূতিশীলতা থাকা দরকার, যার গুণে তিনি বিচিত্রপ্রকৃতির জীপুস্বের সঙ্গে প্রকৃত আত্মীয়তা অর্জন করতে পারেন। একই সঙ্গে ওখেলো এবং ইয়োগের অন্তরঙ্গ হতে পারেন বলেই না শেক্সপীয়ার বড় সাহিত্যিক; বুড়ো লীয়ার এবং কিশোরী ওফেলিয়া উভয়েই তাঁর সহানুভূতিতে সমান অংশীদার। গ্যারটে বহি ফাউন্ট, মেকিটোকেলেস এবং মার্গারেটা তিনজনের সঙ্গেই একাত্ম না হতে পারতেন, তবে কে তাঁকে মহাকবি বলে স্বীকার করত? সাহিত্যিক শাস্ত্রপ্রণেতা নন, তিনি মানবস্ত্রী।

অতঃপর সত্য সম্বন্ধে প্লেটোর ধারণার কথা ধরা যাক। প্লেটোর দর্শনে সত্য 'বিমূর্ত' (abstract) কল্পনা। এ

কল্পনা নিত্য, অক্ষর, অতীত। ইন্ডিয়গ্রাহ জগতে আমরা যা কিছু দেখতে পাই, তাদের প্রত্যেকটিরই নাকি একটি আদি শাস্ত্র রূপ আছে। এ রূপ অতীতময়, এর নিবাস পরিবর্তনশীল ভৌতিক জগতের বাইরে। পৃথিবীতে নানা জাতের পশুপাখী, গাছপালা, মানুষ ইত্যাদি চোখে পড়ে। প্লেটোর মতে আসলে এরা সত্য নয়। প্রতি জাতের পশুর (যেমন ঘোড়া কি গরু) একটি আদর্শ রূপ আছে। জগতে আমরা যে সেই জাতের নানা পশু দেখি তারা এই আদর্শের অম্লকরণ বা ছায়ামাত্র। অম্লকরণে শুধু যে নানা ক্রটি থাকে তাই নয়, অম্লকরণ মাত্রই অস্থায়ী। শুধু আদর্শ রূপটিই চিরস্থায়ী এবং ক্রটিহীন। মানুষের ক্ষেত্রেও তেমনি কতকগুলি মূল আদর্শ রূপ আছে। পার্থিব ব্যক্তি-মানুষেরা এই সব রূপের ভঙ্গুর বিকৃত অম্লকরণ মাত্র। শিল্পী সাহিত্যিকেরা আবার এই অম্লকরণের অম্লকরণ করে তাঁদের শিল্পসাহিত্য সৃষ্টি করেন। শিল্পসাহিত্যের সৃষ্টি তাই আদি সত্যের শুধু বিকার নয়, বিকারেরও বিকার। সত্যসন্ধিৎসু দার্শনিকের কাছে সাহিত্য নিত্যসত্যই মূল্যহীন। অথবা শুধু মূল্যহীন নয়, মারাত্মক ভ্রমের আঁকর হিসাবে বিষয়ং পরিত্যাজ্য।

সত্য সম্বন্ধে প্লেটোর এই ধারণা কতখানি সত্য? ছ হাজার বছর আগে পাইলেট "সত্য কি?" প্রশ্ন করেছিলেন। আজ পর্যন্ত সে প্রশ্নের এমন কোন জবাব মেলে নি, যার বাথার্থ্য অন্তত দার্শনিকের কাছে সন্দেহাতীত। কিন্তু এই জবাব না মেলার মধ্যেই কি প্লেটোনিক ভাস্কির হদিস মেলে না? সত্য জ্ঞানের উপাদান, এবং শেষ পর্যন্ত সব জ্ঞানই ইন্ডিয়নির্ভর। ইন্ডিয়লক অভিজ্ঞতার ওপরে বুদ্ধির প্রয়োগ ঘটলে তবেই জ্ঞানের উদ্ভব সম্ভবপর হয়। নিজের এবং পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে তবেই না প্লেটো আদর্শ রূপের কল্পনা করেছিলেন। ইন্ডিয়গ্রাহ জগতে যদি একটিও ঘোড়া না থাকত, তা হ'লে কেউ কি আদর্শ ঘোড়া কল্পনা করতে পারত? যদি বলা হয়, এমন অনেক কল্পনা আছে যার ইন্ডিয়গ্রাহ প্রতিক্রিয়া জগতে দেখা যায় না, তবে সে ক্ষেত্রেও বিশ্লেষণ করলে চোখে পড়বে এ সব কল্পনার উপাদান ইন্ডিয়গ্রাহ জগৎ হতে সংগৃহীত। পাখী এবং ঘোড়া দুই-ই আছে বলে তবেই না আমরা পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা

ভাবতে পেরেছি। এমন কি জ্যামিতি বা গণিতের আপাতদৃষ্টিতে বিস্তৃত কল্পনাও পরোক্ষভাবে ইঞ্জিনিয়ার অভিজ্ঞতা হতে উদ্ভূত।

আমাদের জ্ঞান ইঞ্জিনিয়ারিং ব'লে সে জ্ঞানে কখনো সম্পূর্ণতা আসতে পারে না। আমরা বহু স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতার তুলনা বিশ্লেষণ ক'রে তবে একটি ধারণায় পৌঁছই। এবং এ জগৎ বাস্তবিকই অনন্ত হোক বা না হোক, আমাদের মানসিক সামর্থ্যের হিসেবে তার অন্ত অকল্পনীয়। তা যে শুধু ব্যাপ্তিতে বিশাল তাই নয়, সময়ের দিক হতে বিচার করলে অতীত ঘটনার আমরা কতটুকুই বা জানি এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রায় কিছুই তো জানি না। তা ছাড়া প্রতি বস্তু, ব্যক্তি বা ঘটনার অগণিত দিক আছে। ফলে অভিজ্ঞতার 'পরে নির্ভর ক'রে আমরা যে সব ধারণা গ'ড়ে তুলি, তাদের অসম্পূর্ণতা অবশ্যস্বাভাবী। অথচ অভিজ্ঞতা ছাড়া অন্য কোন পথে ধারণা গ'ড়ে ওঠা সম্ভব নয়। কেননা যে সব ধারণা আমরা উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভ করি, সেগুলিও আসলে আমাদের পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন ক'রে একদা গ'ড়ে উঠেছিল। তবে জ্ঞান অভিজ্ঞতানির্ভর ব'লে এ সিদ্ধান্ত করা চলে না যে, ধারণা মাত্রই সত্য বা মিথ্যা। ব্রহ্মজ্ঞান মানুষের অনায়ত্ত, কেননা ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব কল্পনা। কিন্তু আপেক্ষিক সত্য মানুষের আয়ত্তাধীন। এক দিকে ব্যাপ্তি এবং বিস্তৃতির দিক হতে মানুষের অভিজ্ঞতা যত সমৃদ্ধি অর্জন করে এবং অন্য দিকে সে অভিজ্ঞতার তুলনা বিশ্লেষণের উপায়পদ্ধতি যত সুন্দর এবং নিপুণতর হয়, ততই জগৎ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা এবং সিদ্ধান্তে অধিকতর যথার্থ্য এবং নির্ভরযোগ্যতা আসে। মানুষের জ্ঞান নিত্য নয়, তা বিকাশধর্মী।

এখন সাহিত্যিক প্রোটোনিক অর্থে সত্যসত্ত্ব নন। পূর্বকল্পিত কোন আদর্শ মানুষের কাহিনী রচনায় তাঁর কল্পনা স্ফূর্তি পায় না। স্থলদেহবিশিষ্ট ব্যক্তিমানুষের মধ্যেই তিনি মানবীয় সত্যের অন্বেষণ করেন। প্রতি মানুষই তাঁর কাছে অফুরন্ত রহস্যের আধার। তিনি ব্যক্তির চেতন, প্রাক্চেতন এবং অপরিষ্কৃতচেতন সমগ্র রূপটি বোঝবার চেষ্টা করেন। তাঁর কাছে প্রতি ব্যক্তি এক ধারে অনন্ত, অন্য ধারে সব মানুষের প্রতীক। অন্য সব সত্যসন্ধানীদের মত তাঁর অন্বেষণও অসম্পূর্ণ। সব দেশের

সব কালের সব মানুষের খবর রাখা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আর কোন একটি মানুষের সবখানি খবর কেই বা কবে জেনেছে। তবু এখানেও জ্ঞানের কম-বেশি আছে। যে সাহিত্যিক মানুষ সম্বন্ধে যত বেশী অন্বেষণ-তৎপর, তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি তত বেশী মূল্যবান হবার সম্ভাবনা। চন্দার তাই ওয়র্ডসওয়ার্থের চাইতে অনেক বড় কবি; টলস্টয়ের পাশে উগোর উপন্যাস তাই জোলো ঠেকে। এই অর্থে সাহিত্যের সাধনাও সত্যের সাধনা। এ সত্য প্রোটোনিক দর্শনের অবাস্তব ব্রহ্মসত্য নয়। এ সত্য অভিজ্ঞতানির্ভর বিবর্তনশীল আপেক্ষিক সত্য।

দুই

পূর্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এটুকু স্পষ্ট হয়ে থাকবে যে, আদর্শ-রাষ্ট্রে সাহিত্যের স্থান বিষয়ে প্রোটোর সিদ্ধান্ত শুধু সাহিত্য-বিশ্লেষণের দ্বারা নিরূপিত হয় নি; সে সিদ্ধান্ত মুখ্যত দার্শনিক প্রত্যয়ের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়েছে। তাঁর দর্শনে সত্য, জ্ঞান বা চারিত্রের যে ব্যাখ্যা, তা মনে নিলে সাহিত্যিককে সত্যসত্ত্ব, জ্ঞাননিষ্ঠ কি চরিত্রবান বলা চলে না। প্রোটোর সিদ্ধান্তে যদি আমরা সায় দিতে না পারি তবে তার কারণ, প্রোটোর দার্শনিক প্রত্যয়গুলি আমাদের কাছে যথার্থ ঠেকে না। উটে আমাদের মনে হয়, প্রোটোর এই প্রত্যয়গুলি ভ্রান্ত এবং এ-জাতীয় প্রত্যয়ের দ্বারা পরিচালিত চিন্তা এবং ব্যবহার মানুষের পক্ষে সমূহ ক্ষতিকর। কোন সং সাহিত্যিকের মনে যে এ-জাতীয় প্রত্যয়ে আরাম পায় না—সাহিত্য সম্বন্ধে এটা মস্ত বড় ভরসার কথা, এবং আমাদের ধারণা, সাহিত্যিকেরা প্রোটোনিক অর্থে চরিত্রবান, জ্ঞাননিষ্ঠ কি সত্যসত্ত্ব নন ব'লেই মানুষের কাছে সাহিত্যের দাম এত বেশী।

কথাটা প্রথম নজরে ধূঁটতার মত মনে হতে পারে; হুতরাং এ বিষয়ে হয়তো আর একটু বিশদ হবার প্রয়োজন আছে। জানবার ইচ্ছা যেমন মানুষের একটা মূল সহজাত বৃত্তি, মানবার প্রবণতা তেমনি মানুষের একটা সামান্য লক্ষণ। এ দুয়ের মধ্যে বিরোধ স্পষ্ট; কিন্তু জীবদেহে স্থিতি-স্থাপকতার সামর্থ্য অনেকখানি ব'লে মানবপ্রকৃতিতে অল্প পাঁচটা বিরোধের মত এ বিরোধও সব সময়ে আত্মঘাতী সংঘাতরূপে দেখা দেয় না। প্রাগৈতিহাসিক

যুগে এ বিরোধ মানুষের চিন্তায় এবং জীবনে কি ভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল আমরা জানি না। যখন থেকে মানুষের ভাবনা উত্তরকালের মানুষদের বোধ্য রূপ নিতে শুরু করেছে, তখন থেকে আমরা সভ্যতার ইতিহাসে এই মৌল বিরোধের বিচিত্র প্রকাশ দেখতে পাই। সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতাসমষ্টির মধ্যে সময়ের ঘটিয়ে কিছু বুদ্ধিমান কল্পনাশীল মানুষ কতগুলো ধারণা এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছয়; তারপর সেই সব ধারণা-সিদ্ধান্তের ওপরে নির্ভর করে জীবন-পরিচালনার প্রয়োজনে তারা সেই আংশিক জ্ঞানে পূর্ণতা আরোপ করে। তাদের তারা নিত্যসত্য বলে মানে এবং নানা প্রকরণপদ্ধতির সাহায্যে আপন আপন গোষ্ঠীর বাকী মানুষদের মানায়। মানুষী বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতাই যে এসব প্রত্যয়ের একমাত্র উৎস, একথা জ্ঞানে পারলে পাছে অল্প মানুষেরা তাদের বাধ্য নয় সন্দেহ প্রায় তোলে, তাই তারা সেসব প্রত্যয়কে কোন অতিপ্রাকৃত শক্তির নির্দেশ বলে চালাবার চেষ্টা করে। অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণার ওপরে মেকী ব্রহ্মজ্ঞানের তক্মা চাপিয়ে আরোহী বুদ্ধির মনে সম্মান জাগাবার চেষ্টা সভ্যতার ইতিহাসে অতি প্রাচীন ও পৌনঃপুনিক ঘটনা। এই তক্মা যার প্রতীক, তার সম্বন্ধে বেশী প্রশ্ন করলে খেঁড় হতে মুতুটি খসে পড়তে পারে—প্রাচীন ভারতের এক তথাকথিত ব্রহ্মজ্ঞানী একদিন এ-জাতীয় ভয় দেখাতে কুণ্ঠিত হন নি। মুশা হতে মহম্মদ, বাস্কবন্দ্য হতে বীণ্ড, শ্রেক মানুষ হিসেবে মানুষের কাছে এঁরা কেউই নিজেদের বক্তব্য উপস্থিত করেন নি। এঁরা কেউ বা ব্রহ্মজ্ঞানী, কেউ বা ঈশ্বরাত্ম-গৃহীত পুরুষ, আবার কেউবা খোদ ঈশ্বরের সম্ভান।

কিন্তু আংশিক জ্ঞানকে আপ্তবাক্য বলে মেনে নেওয়াই যদি মানুষের একমাত্র বৃত্তি হ'ত, তা হ'লে দর্শন-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সমাজপ্রতিষ্ঠান, এক কথায় মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের কোন বিকাশ সম্ভব হ'ত না। মানুষ যেমন আংশিক ধারণাকে ব্রহ্মসত্য বলে মেনেছে এবং মানিয়েছে, তেমনি তারই সঙ্গে সে ধারণার বাথার্থ্য সম্বন্ধে সংশয়ী হয়েছে; সে ধারণাকে নিত্য-নূতন অভিজ্ঞতা এবং চিন্তার কষ্টিপাথরে ঘাচাই করতে চেয়েছে। তার জগৎ তাকে দায় দিতে হয়েছে বিস্তার—বিশ্বাসের বাড়ী শাস্তি নেই, আর

অবিশ্বাসের বাড়ী অশাস্তি নেই,—তবু দায় দিতে সে গরবাজী হয় নি বলেই মানুষের জ্ঞান পারমেনিদেস, কুংফুৎসে কি মনুতে এসে স্তব্ধ হয়ে যায় নি। মানুষের জিজ্ঞাসা বুদ্ধি তাকে বার বার স্বনির্মিত সংস্কারের শৃঙ্খল হতে মুক্ত করেছে। শুধু যে প্রোটোগোরাস, চুয়াঙংস, চার্বাক কি এরাসমুসের মত মুক্তবুদ্ধি দার্শনিকেরাই সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন তা নয়, সংস্কারবদ্ধ সাধারণ মানুষের মনেও তাদের সহজাত যুক্তিবৃত্তি নতুন নতুন অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনের তাড়নায় সক্রিয় হয়ে উঠে অভ্যস্ত ভাবনা-ধারণা সম্বন্ধে তাদের সংশয়ী করে তুলেছে। বস্তুত সত্যসন্ধিসংসা মানবপ্রকৃতির অন্ততম মূলবৃত্তি, এবং এ বৃত্তি যে-মানুষদের সাধনার মধ্যে সব চাইতে সার্থকতা লাভ করে সাহিত্যিক তাঁদেরই একজন। প্রচলিত সংস্কারের ঐতিহ্যে আর পাঁচটা মানুষের মত সাহিত্যিকেরও বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটে, কিন্তু তাঁর সাহিত্যিক মন তাঁকে এ ঐতিহ্যের গভীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে দেয় না। ধারণার চাইতে অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে বেশী মূল্যবান, বিমূর্ত আদর্শের চাইতে বাস্তব বিষয়ে তিনি অধিকতর কৌতূহলী। প্রচলিত ধারণা যে কত অসম্পূর্ণ, তার নিত্যতার দাবি যে কত ভিত্তিহীন, জীবন সম্বন্ধে তাঁর তীব্র অহুত্বাশীলতা সে বিষয়ে তাঁকে ক্রমেই সজাগ করে তোলে। দার্শনিকের মত সূচনভাবে তিনি হয়তো এসব ধারণার বিচার করতে বসেন না; কিন্তু তাঁর শাপিত জীবনবোধের স্পর্শে এদের মেকী ব্রহ্মত্ব সহজেই খসে পড়ে। বোকাচিও, রাবলে, শেক্সপীয়ার, সার্ত্রেজেন্স, গ্যায়টে, ইবসেনের মত সত্যসন্ধ পুরুষ ইয়োরোপের ইতিহাসে কজন চোখে পড়ে! এঁরা আমাদের কোন নিটোল, নীরস্ত ব্রহ্মত্বের হদিস দিয়ে দান নি; কিন্তু আমাদের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করেছেন, বোধকে হৃদয়তর করেছেন, চলতি ধারণার ঝুলি খুসিয়ে মানুষের জটিল বিচিত্র রহস্যময় অস্তিত্বের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছেন। একাজ এঁরা করতে পেরেছেন তার কারণ, প্রোটোনিক আদর্শরূপের ধ্যান এঁদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে নি। পার্থিবকে অপার্থিব, পরিবর্তনশীলকে নিত্য, জটিলকে সরল, বহুকে এক, উন্মুক্তকে গভীরবদ্ধ কল্পনা করে নিজেদের ব্রহ্মজ্ঞান বলে আহ্বির করতে এঁদের বেধেছে। এঁদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ, আপেক্ষিক, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই

সত্যবিমুখ নয়। মানুষের আত্মজিজ্ঞাসার ইতিহাসে তাই শব্দ কি টমাস অকুইনাসের চাইতে শেক্সপীয়র ও টমাস মানদের দান অনেক বেশী।

যেমন জ্ঞানের ক্ষেত্রে তেমনি জ্ঞার এবং চারিত্রের ক্ষেত্রেও সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গী সমানভাবেই সত্যসন্ধ, সংস্কারমুক্ত এবং ফলপ্রসূ। সাহিত্যিকের কাছে সমাজ বা শাস্ত্র-নির্দেশের চাইতে ব্যক্তি-মানুষ বেশি মূল্যবান। এখানে প্লেটোনিক প্রত্যয়ের সঙ্গে সাহিত্যিক মনোভাবের বিরোধ অতি সুস্পষ্ট। মানুষ একধারে যেমন মানুষ, অন্যধারে তেমনি প্রতি মানুষই অপর মানুষ হতে স্বতন্ত্র। তার প্রাতিষিক সমগ্রতায় সে অনন্ত; সেখানে সে সকল সমীকরণের উদ্দেশ্যে। কিন্তু মানুষ সমাজে বাস করে, আর ব্যক্তির অনন্ততার ওপরে ভিত্তি ক'রে সমাজ গড়া শুধু কঠিন নয়, বোধ হয় একেবারেই অসম্ভব। পাঁচজন শুধু একত্র হ'লেই সমাজ হয় না; পাঁচজনের আচার-ব্যবহার, ভাবনা-চিন্তা একই বিধিবি্যবস্থা, একই নীতিনির্দেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'লে তবেই সমাজ সম্ভব। অর্থাৎ ব্যক্তি তার অনন্ততার দাবিকে কিছু পরিমাণে ধ্বংস না করা পর্যন্ত সমাজ-প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠতে পারে না। সেই সমাজই আদর্শ সমাজ যেখানে সামাজিকতার প্রয়োজনে ব্যক্তিত্বের সঙ্কোচন সব চাইতে কম, যেখানে সহযোগিতার ফলে প্রতিটি জীব-পুরুষের স্বকীয় ব্যক্তিত্ব বিবর্তমান। কিন্তু এতাবৎ অধিকাংশ সমাজেই ব্যক্তির অনন্ততাকে যতদূর সম্ভব ধ্বংস ক'রে সামাজিক সামান্যতাকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা চোখে পড়ে। এতে অবাক হবার কিছু নেই, কেননা সংখ্যার গুরুত্বে সমাজ ব্যক্তির চাইতে প্রবল। ফলে ক্রমে এমন অবস্থার উদ্ভব হয়, যেখানে সমাজ ব্যক্তির আত্ম-বিকাশের মাধ্যম না হয়ে তার আত্মবিলোপের যন্ত্র হয়ে ওঠে। ব্যক্তি তার নিজের স্বভাবে অস্বীকার ক'রে সমাজনির্দিষ্ট ছাঁচে নিজেকে ঢালাই করার মধ্যে পরমার্থ খোঁজে। তার আচার-ব্যবহার, ভাবনা-চিন্তা, প্রত্যয়-প্রচেষ্টা, এমন কি আবেগ-অনুভূতি পর্যন্ত সামাজিক বিধিনিষেধের দ্বারা নিরূপিত হতে থাকে। সে তখন আর ব্যক্তি নয়, সে তখন সমষ্টির অংশমাত্র। তার মধ্যে যেটুকু অনন্ততাবোধ এ অবস্থাতেও টিকে থাকে, তা নিয়ে তার মহালজ্জা। গডলবুর্গিই তখন তার বিবেকের মুখ্য

অবলম্বন, সামাজিক বিধির অমূল্যতন তখন তার জীবনের মূল নীতি। এ অবস্থায় কি ব্যক্তি কি সমাজ দুয়ের মধ্যেই যে বিকাশের সম্ভাবনা দ্রুত ক্ষীণ হয়ে আসবে—এ আর বিচিৎ্র কি। মধ্যযুগের ইয়োরোপীয় সমাজে মানুষের বিকাশ একদিন এই ভাবেই ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। দূর দেশের কথা দূরে থাক, এ দেশের হিন্দু এবং মুসলমান সমাজেও কি দীর্ঘদিন ধ'রে আমরা এই মৃততার আত্মঘাতী প্রভাব দেখে আসছি না?

এ মৃততা হতে সাহিত্য বার বার মানুষকে উদ্ধার ক'রে এসেছে। কেননা যদিচ ভাষা ছাড়া সাহিত্য সম্ভব নয় এবং ভাষা সমাজেরই সৃষ্টি, তবু ব্যক্তিমানুষের অনন্ততাকে অবলম্বন ক'রেই চিরদিন সাহিত্যকল্পনা স্ফূর্তি লাভ করে। সমাজের প্রভাবে আমরা বার বার প্রতি মানুষের অনন্ত সমগ্র রূপটিকে ভুলতে বসি, এবং সাহিত্যিক বার বার সেই রূপটি স্মরণে আমাদের বোধকে জাগ্রত করেন। মানুষ যে শুধু সামাজিক জীব নয়, কোন পূর্বকল্পিত আদর্শের ছাঁচে যে তার সবখানি অস্তিত্বকে ধরানো যায় না, সে যে অনন্ত, তার মধ্যে যে অগণিত সম্ভাবনা বিকাশের ক্ষেত্রে অপেক্ষমান—এই চেতনা সব সংসাহিত্যের কেন্দ্রে সক্রিয়। ব্যক্তির অনন্ততার স্বাদ না দিতে পারা পর্যন্ত ভাষা সাহিত্যের ব্যঙ্গনা অর্জন করে না। লিরিক কবিতা, গাথাকাহিনী, মহাকাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, এমন কি সাহিত্যপদবাচ্য প্রবন্ধের মধ্যেও অনন্ত ব্যক্তিমানসের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। সামাজিক লঙ্ঘনকরণের অন্তরালে ব্যক্তির যে জটিল, রহস্যময়, অমেয় অস্তিত্ব বর্তমান, সাহিত্যিকের মানবতাবোধ এবং সত্যসন্ধিৎসা তাকে বুঝতে এবং ভাষার মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে চায়। ইলিয়ড-অডিসি কি রামায়ণ-মহাভারতের মানুষ-মানুষী, দেব-দেবী, রাক্ষস-বানর, মায়াবিনী-কুহকিনীরা সমাজকল্পিত টাইপ নয়। তা যদি হ'ত, ওসব বই পণ্ডিতদের গবেষণার বিষয় হয়েই থাকত, সাধারণ মানুষদের মনে যুগ যুগ ধ'রে সাড়া তুলত না। মহাকাব্যের এইসব চরিত্র বিচিৎ্র ব্যক্তিমানুষের স্বাদে সরস ব'লেই তারা আজও আমাদের মনে সংবেদনার সঞ্চার করে। তারা প্রত্যেকেই জটিল, অনন্ত, রহস্যময়—কোনো ঐচ্ছিক্যের ছাঁচে তাদের গড়া হয় নি। দাস্তের মহাকাব্য এক ভক্ত ক্যাথলিকেরা ছাড়া কেই-বা পড়ত, যদি না

তার নরকের স্তরে স্তরে অসংখ্য ব্যক্তিমাছের বিচিত্র মুখ উঁকি মারত। আর কি জীবন্ত, কি বহুস্তময়, কি ইন্দ্রিতপূর্ণ সে সব মুখ। এক লেগুনাদাঁড়ের স্কেচের মধ্যে ছাড়া কোথায় তার তুলনা আছে? ওই একই স্তরে সমুদ্র না হ'লে 'ক্যান্টারবেরী টেলস্' কি অমর সাহিত্যের কোঠায় পড়ত? লিরিক-কবিদের রচনায় অবশ্য বহু চরিত্রের স্বাদ থাকে না; তাঁরা মুখ্যত নিজেদের কথাই লিখে থাকেন। কিন্তু সেখানেও তাঁরা যা ফুটিয়ে তোলেন তা কোন শাস্ত্রনির্দেশের ছাঁচে-ঢালা ব্যক্তিচরিত্র নয়; তাঁদের নিজেদের মধ্যে যে জটিল বহুমুখীনতা আছে, নানাভাবে তারই নানা দিক নির্মোহ সত্যতায় ফুটিয়ে তুলতে পারলে তবেই তাঁরা যথার্থ লিরিক-কবি। কাটুলুস কি লিপো কি ডন কি হাইনে কি বাদলেয়র কি রীবোর কবিতায় ওই ওই কবির অনন্ত ব্যক্তিত্বের বিচিত্র দিক প্রকাশিত, উদ্ঘাটিত হয়েছে ব'লেই না তাঁরা দেশকালের ব্যবধান পেরিয়ে সব দেশের রসিকদের আত্মীয়তা অর্জন করেছেন।

ব্যক্তিবিশয়ে এই অনন্তচিত্ত কোতুলক নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্পের ক্ষেত্রে আরও স্পষ্ট—এখানে তার প্রকাশ আরও বিচিত্র। ইউরিপিডিস্, শেক্সপীয়র, ইবসেন্ কি ও'নীল-এর চরিত্রেরা সামাজিক টাইপ নয়, তারা প্রত্যেকেই অনন্ত ব্যক্তি। শুধু তাই নয়; ছায় বা ঔচিত্যের সংস্কারাজিত গজকাঠি দিয়ে তাদের মাপতে গেলে শুরু-শেষের হাঙ্গামে মেলেনা। সামাজিক রীতিনীতি, আচারব্যবহারে অভ্যস্ত আমাদের মন বার বার একথা ভুলে যায় যে, ব্যক্তি মাত্রই মূল্যবান এবং অনন্ত, প্রতি মানুষের মধ্যে এমন সব গুঢ় সম্ভাবনা বর্তমান যা অনির্দেশ্য, যাকে কোন হিসেবের ছকে ফেলা যায় না। শুধু ভুলি না, ব্যবহারিক জীবনে এই অনন্ততার আভাস পেলে আমরা শঙ্কিত হয়ে উঠি; হয় তাকে এড়াতে চাই, নয় তার শাস্তিবিধান করি। অথচ ওই গুঢ় অনির্দেশ্যতা আছে ব'লেই মানুষের ইতিহাস অস্ত্র সব জীবজন্তুর ইতিহাসের তুলনায় এত সমৃদ্ধ, এত বিচিত্র। সমাজ শুধু মানুষে মানুষে ব্যবহারিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে। সাহিত্য তার ব্যক্তিকেন্দ্রিক

মানবতাবোধের সামর্থ্যে মানুষকে মানুষের অন্তরঙ্গ ক'রে তোলে। সাহিত্যপাঠের ফলে মানুষ সম্বন্ধে আমাদের বোধ সূক্ষ্মতর হয়; এক ধারে আমাদের নিজেদের মন যেমন সরস সজাগ এবং সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, অন্য ধারে তেমনি অপরের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা সহজতর হয়। টলস্টয় কি ডস্টয়েভস্কির উপন্যাস, ক্যাথারিন ম্যানস্ফিল্ড কি প্রেমেন্স মিজের গল্প পড়ার পর মানুষকে আমরা নতুন ক'রে বুঝতে শিখি। ব্যক্তি যে কোন উদ্দেশ্য সাধনের উপায়মাত্র নয় (তা সে উদ্দেশ্য যত মহৎই হোক না কেন), সে যে স্বয়ংসিদ্ধ এবং সে কারণে মূল্যবান—সব মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির কেন্দ্রে এই মানবতাজী প্রত্যয় সক্রিয়। মানুষের যেটা পরিবেশনিক্রিপিত বাইরের রূপ, যার চরম উৎকর্ষের নাম চরিত্র—সমাজ আমাদের শুধু তারই হৃদয় দিতে পারে। কিন্তু যাকে আমরা ব্যক্তি বলি, ব্যক্তির চেতন, অচেতন, অবচেতন, জ্ঞান-অজ্ঞান, পরিবর্তনশীল অস্তিত্বের বিচিত্র সেই যে প্রাতিষিক সমগ্রতা—সে বিষয়ে জানতে হ'লে সাহিত্যিকের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া আমাদের উপায় নেই। আর এই জানাই হ'ল যথার্থ নীতিবোধের মূল উৎস। যে ছায় মানুষকে শুধু খণ্ডিত ধর্মিত করতেই জানে, যে বিবেক শুধু নিগ্রহেই পরিতৃপ্তি পায়, যে নীতিতত্ত্ব মানুষের বাহ্যিক ব্যবহারিক রূপের আড়ালে তার জটিল পরিবর্তনশীল সমগ্র অস্তিত্বের স্বীকারে পরানুষ্ঠ, তা শুধু অল্পপোষা নয়, মহুগ্ধের বিকাশে তা একটা মস্তবড় বাধা। এ বাধা অপসারণে সাহিত্যের দান অবিস্মরণীয়। সাহিত্যিকের কাছ হতে আমরা আপনাকে এবং অপরকে ব্যক্তিহিসেবে মূল্য দিতে শিখি, শিখি যে ব্যক্তির বিকাশই সব নৈতিক মূল্যায়নের উৎস এবং মানদণ্ড, শিখি যে ব্যক্তি তার কর্মের চাইতে বড়, আর তাই শুধু বাইরের ব্যবহার দিয়ে কোন মানুষের বিচার করা মূঢ়তা মাত্র। সাহিত্যিক অবশ্য কোন নীতিকথার মাধ্যমে এ শিক্ষা দেন না; সাহিত্যপাঠজাত কোতুলক এবং সংবেদনা পাঠককে নিগূঢ়ভাবে এই শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে তোলে। জ্ঞানের দিক হতে যেমন মহুগ্ধ বিকাশের দিক হতে তেমনি, সাহিত্যিকদের দান তাই শাস্ত্রকারদের চাইতে বেশী মূল্যবান।

তিন

এভাবে কাব্য তথা সাহিত্য বিষয়ে প্লেটোর তৃতীয় দফা অভিযোগের আমরা আলোচনা করি নি। কাব্যের উৎস প্রেরণা এবং প্লেটোর মতে কোন ব্যক্তির মনে যতক্ষণ পর্যন্ত এতটুকু যুক্তিসম্মত সক্রিয় থাকে ততক্ষণ তার পক্ষে অল্পপ্রেরিত হওয়া অসম্ভব। সত্য এবং জ্ঞান-নিষ্ঠার মত প্রেরণা কথাটিরও প্লেটোনিক দর্শনে একটি বিশেষ অর্থ আছে। এ অর্থ তাঁর স্বকপোলকল্পিত নয়, তৎকাল-প্রচলিত হেলেনীয় সংস্কার হতে পাওয়া। গ্রীকভাষায় প্রেরণার যেটি প্রতিশব্দ—*enthoeos*, যা হতে ইংরেজী *এনথুজিয়াস্‌ম্‌*-এর উদ্ভব—তার সোজা মানে হ'ল দেবতায় পাওয়া। আমরা যেমন বলি—অমুকের ভয় হয়েছে, গ্রীকরাও তেমনি বিশ্বাস করত বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ মাহুয়দের ওপরে দেবতার ভয় হয়। তখন তারা আর নিজেদের বশে থাকে না; যুক্তিবহির্ভূত অলৌকিক শক্তির হাতের যন্ত্রে পর্যবসিত হয়। তাদের বুদ্ধিবিবেক তখন একেবারে মোহগ্রস্ত, সত্যমিথ্যা-ভালমন্দ বিভেদ করার শক্তি তখন সাময়িকভাবে লুপ্ত, তখন তারা কি যে বলছে কি যে করছে তা তারা নিজেবাই জানে না। আজকের দিনের অশিক্ষিত, অর্ধাশিক্ষিত নরনারীর মত সেদিনের গ্রীক জনসাধারণও এ-জাতীয় প্রেরণাকে দৈবাহুগ্রহ মনে ক'রে এইসব দেবতায়-পাওয়া মাহুয়দের কাছে আপ্তবাণীর ধোঁজ করত। সে বাণীর কোন মাথামুণ্ড থাকে বা নাই থাকে, তবু তা স্বতঃসিদ্ধ, কেননা তার উৎস জাতিশীল মাহুয় নয়, তার উৎস স্বয়ং দেব-গোষ্ঠী।

প্লেটোর মতে পূর্বোক্ত অর্থে কবিরা অল্পপ্রেরিত জীব। প্লেটোর পূর্বে কবি পিণ্ডারও কাব্যপ্রেরণা সম্বন্ধে এ ধরনের উক্তি করেছিলেন। প্লেটো আরও বিশদভাবে এ তত্ত্ব তাঁর নানা রচনায় গুরু সজ্জেক্টসের জবানীতে ব্যাখ্যা করেছেন। 'আয়ন' গ্রন্থে তিনি বলেছেন, মহৎ কাব্যের রচয়িতারা যে কোন যুক্তিসম্মত বিধি-নিয়মের বা আর্টের চর্চা ক'রে তাঁদের কল্পনায় মহৎ অর্জন করেন তা নয়; তাঁদের সে মহৎ দৈবহুত্রে পাওয়া; কাব্যরচনার সময় তাঁরা অলৌকিক শক্তির মাধ্যম হিসেবে কাজ করেন। পরে তিনি আরও বলেছেন যে, বুদ্ধিবৃত্তির সম্পূর্ণ লোপ না ঘটলে,

দেবমন্দিরের নর্তকদের মত বাহুজ্ঞান সম্পূর্ণ না হারাতে পারলে, এক কথায় একেবারে উন্মাদের দশায় না পৌঁছতে পারলে, যথার্থ কবি হওয়া অসম্ভব। শুধু তাই নয়, কাব্য-প্রেরণার প্রভাব চুষকের মত; তিনিই সার্থক কবি যার কাব্য স্থানকালিনির্বিণ্ণে আবৃত্তিকারের পর আবৃত্তিকারকে, শ্রোতার পর শ্রোতাকে, মূল প্রেরণার চৌধক প্রভাবে আত্মবোধহীন উন্মাদে পর্যবসিত করতে পারে। সুতরাং কাব্য হতে আমরা যা পেতে পারি তা জ্ঞান নয়, তা উন্মাদনা; কেননা, জ্ঞান যুক্তিনির্ভর, অপরপক্ষে যুক্তির লেশমাত্র বজায় থাকা পর্যন্ত না সম্ভব কাব্যসৃষ্টি, না কাব্য-সম্ভোগ।

এই যদি কাব্যপ্রেরণার চরিত্র হয় তবে নিয়মনিয়ন্ত্রিত জ্ঞানরাষ্ট্রে কবিদের কি ক'রে স্থান হতে পারে? কবিরা কি দার্শনিক কি ব্যবহারিক কোন জ্ঞান দিতেই অক্ষম; তাঁরা ঔচিত্যের নির্দেশ মানতে অনিচ্ছুক; আর সবচেয়ে সাংঘাতিক কথা যে-ক্ষমতার ক্ষেত্রে তাঁরা কবি, সে ক্ষমতা অনতিক্রমণীয় ভাবে যুক্তিবিরোধী এবং সে কারণে তার নিয়ন্ত্রণ একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং আদর্শ রাষ্ট্রে থেকে কবিদের নির্বাসিত করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। প্লেটোর প্রথম যুগের রচনায় কাব্যপ্রেরণা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা বিরোধ চোখে পড়ে। কবিরা জ্ঞানমার্গের সাধক নন; তাঁদের ভাবনা ব্যবহার জ্ঞাননিষ্ঠার দ্বারা সংযুক্ত নয়; তবু অল্পপ্রেরিত অবস্থায় তাঁরা দৈবশক্তির অধিকারী। প্রেরণার বলে তাঁরা অলৌকিক জগতের অপরোক্ষাহুত্ব লাভ করেন। এ কারণে প্রেরণাকে যুক্তিবিরোধী এবং অনিয়ন্ত্রণীয় বলা সত্ত্বেও প্লেটো গোড়ার দিকে ব্যতিক্রম হিসেবে তার যে একটা বিশেষ মূল্য আছে তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু পরবর্তী কালে কাব্যপ্রেরণার এই বিশেষ মূল্যকে তিনি তাঁর দর্শনচিন্তায় তেমন আমল দেন নি। ব্রহ্মসত্যের অপরোক্ষাহুত্ব তখনও তাঁর কাছে মূল্যবান ছিল; কিন্তু সে তুলত অভিজ্ঞতা অর্জনের পথ তখন আর প্রেরণা নয়, ক্ষুধার ডায়ালেক্টিকের স্কটিন সংঘর্ষেই তার প্রস্তুতি। বস্তুত আত্মনৈমিত্তিক গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতা ক্রমেই প্লেটোর মনে এ প্রত্যয় দৃঢ়মূল করেছিল যে, প্রতিটি জীপুরুষের চিন্তা, ব্যবহার, এক কথায় চরিত্র, যতক্ষণ না কর্তব্যবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, ততক্ষণ

মানবসমাজের ভবিষ্যৎ অঙ্ককার। স্তূতবাং বা কিছু এই নিয়ন্ত্রণের প্রতিবন্ধক তার সমূল উৎপাটন অবশ্যকর্তব্য। প্লেটোর পরিণতকালের চিন্তাধারায় তাই এ যুগের সার্বিক (totalitarian) সমাজাদর্শ এবং শাসনপদ্ধতির পূর্বাভাস চোখে পড়ে। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রে প্রতি ব্যক্তির চরিত্র ও আচার-ব্যবহার পূর্বপরিকল্পিত এবং নীতিনির্দেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু ষাঁরা প্রেরণার দাস, আদর্শ রাষ্ট্রের দার্শনিক শাসনকর্তারা তাঁদের চরিত্র এবং ব্যবহার কি ক'রে নির্দিষ্ট করবেন? 'রিপব্লিকে'র গোড়ার দিকে সফ্রেটাসের মুখ দিয়ে প্লেটো অবশ্য বলেছেন যে, কবিরা রাষ্ট্রপরিচালকদের নির্দেশ অনুযায়ী শুধু নীতিসঙ্গত কথা লিখবেন—এ প্রতিশ্রুতি দিলে রাষ্ট্র তাঁদের পোষণ এবং সমর্থন করবে। কিন্তু কবিরা এ প্রতিশ্রুতি দিলেও তা পালন করার সামর্থ্য তো তাঁদের নেই। কেননা, প্রেরণার বশে তাঁরা যে কি লিখবেন কি বলবেন তা তো আগে হতে তাঁরা নিজেরাও জানেন না। ফলে 'রিপব্লিকে'র শেষ অধ্যায়ে প্লেটো রায় দিলেন যে, আদর্শ রাষ্ট্রের চৌহদ্দী হতে কবিদের খেদানো ছাড়া উপায় নেই। "কেননা, প্রিয় মৌকন, যদিও জনসাধারণ সে কথা পুরো বোঝে না, তবু মানুষের সং হওয়া কি অসং হওয়ার ওপরে অনেক কিছুই নির্ভর করছে এবং সে কারণে কি ধ্যান্তি, কি বিস্ত, কি পদমর্দাদা, কি কাব্য কোন কিছুই সম্মোহনেই জার এবং অজ্ঞাত নৈতিক আদর্শকে কিছুতে অবহেলা করা চলবে না।" অতএব দার্শনিকের রাষ্ট্র থেকে কাব্যলক্ষীকে, যত বিষয়চিন্তেই হোক, শেষ পর্যন্ত বিদায় দিতে হ'ল।

কিছদস্তী অল্পসারে প্লেটো প্রথম ঘোষনে কবি ছিলেন। গুরু সফ্রেটাসের সঙ্গে সাক্ষাতের পর সে সব কবিতা নাকি তিনি পুড়িয়ে ফেলেন। গ্রীক কাব্যসঙ্কলনে তাঁর লেখা ব'লে প্রচলিত কিছু কিছু টুকরো কবিতাও পাওয়া যায়। এ কিছদস্তী সত্য কি না, এসব কবিতা স্বার্থই প্লেটোর রচনা কি না, তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। এ বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত বাই হোক না কেন, তাঁর নানা দার্শনিক রচনা হতে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে, এই ঘোর কাব্যবিরোধী দার্শনিক প্রকৃতির দিক থেকে অনেকখানিই কবিদের সমর্থনী ছিলেন। ফলে কাব্যপ্রেরণা বিষয়ে তাঁর বিবরণে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্পর্শ পাওয়া যায়।

দেবভায়-পাওয়া ইত্যাদি আদিম ধারণা-কল্পনা বাদ দিলে এ কথা বোধ হয় সব সাহিত্যিক এবং সাহিত্যরসিক স্বীকার করবেন যে, সাহিত্যসৃষ্টির মূলে এমন এক শক্তি সক্রিয়, যার ওপরে কোন ছকুম পাটে না। এই শক্তিরই নামকরণ করা হয়েছে প্রেরণা। আধুনিক কালে মনোবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের এ শক্তিকে পর্যন্ত নিজেদের তাঁবেদার করার চেষ্টা করেছে। ফলে সে সব দেশে বছরে বছরে কেতাব ছাপা হয়েছে বিস্তর, কিন্তু সাহিত্যপ্রেরণা গেছে শুকিয়ে। ষাঁরা জ্ঞাতসাহিত্যিক, তাঁরা হয় দেশ ছেড়েছেন (যেমন টমাস মান কি ইভান বুনিন), নয় আত্মহত্যা করেছেন (যেমন মায়াকোভস্কী), নয় কারাগারে, দাসশিবিরে কি গ্যাসচেম্বারে প্রাণ দিয়েছেন। তবু অসীম ক্ষমতা সত্ত্বেও রাষ্ট্রশক্তি শিল্পী-সাহিত্যিকের প্রেরণাকে পুরোপুরি আপন মঠায় আনতে সমর্থ হয় নি। এসব অভিজ্ঞতা প্রেরণা বিষয়ে প্লেটোর বিশ্লেষণকে স্পষ্টতই সমর্থন করে।

প্রেরণার উৎস যে কি তা আমরা আজও জানি না; তবে এটুকু আমরা জানি যে, তা শুধু সমাজ কি রাষ্ট্রের আয়ত্তের বাইরে নয়, শিল্পীসাহিত্যিকের নিজেরও তার ওপরে বিশেষ কোন হাত নেই। এই হাত-না-থাকা দু' অর্থে সত্য। অত্যন্ত সংঘর্ষী লেখকও যখন ভেতরকার তাগিদে লিখতে বসেন, তখন সে লেখা শেষ পর্যন্ত কি রূপ নিয়ে গ'ড়ে উঠবে আগে হতে সেটা তাঁর পক্ষে নিশ্চিত ক'রে জানা অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, সৃষ্টিপ্রেরণা যতক্ষণ সক্রিয় ততক্ষণ তার দাবি স্বীকার করার সামর্থ্য সে প্রেরণার অধিকারীর নেই। এ দিক হতে শিল্পীসাহিত্যিক প্রেরণার অধিকারী হয়েও প্রেরণার দাস। লেখকের মনে যখন লেখার প্রেরণা আসে তখন তাকে লিখতেই হবে, কাগজ-কলম না পেলে অন্তত মনে মনে, অন্তত মূখের ভাষায় তার সে প্রেরণাকে প্রকাশ করতে হবে। অস্ত্র শ্রোতা কি পাঠক না থাকে, সে রূপ নিজের কানে শুনতে হবে, নিজের চোখে দেখতে হবে। এ না হওয়া পর্যন্ত তার শাস্তি নেই, অস্ত্র কাছে মন নেই, অস্ত্র চিন্তার অবসর নেই।

কিন্তু প্রেরণাই তো সাহিত্যের একমাত্র স্রষ্টা নয়। সার্থক সাহিত্যসৃষ্টির জন্মে স্বকণ্ঠিত সংঘর্ষেরও একান্ত প্রয়োজন আছে। প্লেটো এ দিকটা একেবারে অবহেলা

করেছেন। শিল্পকর্মের (Art) অহুশীলন যে সাহিত্যিকের পক্ষে প্রেরণার (ingenium) চাইতে কম আবশ্যিক নয়, পরবর্তী কালে বৈজ্ঞানীয় এবং রোমান আল্‌কারিকেরা এ সত্য বিশদ বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা প্রমাণিত করেন। প্রেরণার ওপরে সাহিত্যিকের হাত নেই, কিন্তু আত্মপ্রস্তুতির ওপরে অল্প মাহুযদের মত তাঁরও পূরাপূরি হাত আছে। আত্ম-প্রস্তুতি সচেতনপ্রয়াস-সাপেক্ষ। তার নানা দিক আছে—সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার দুটি দিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সব শিল্পই মাধ্যমনির্ভর, এবং মাধ্যমকে বশে না আনতে পারা পর্যন্ত সে মাধ্যমে শিল্পস্থিতি অসম্ভব। বশে আনার অর্থ সে মাধ্যমের বিচিত্র সম্ভাবনা বিষয়ে সচেতন হওয়া এবং সে সব সম্ভাবনাকে প্রকাশের উপায়রূপে ব্যবহার করার সামর্থ্য অর্জন করা। সাহিত্যের মাধ্যম ভাষা। ভাষা তো সকলেই ব্যবহার করে, কিন্তু ভাষার মধ্যে কতখানি প্রকাশের শক্তি নিহিত আছে তার খোঁজ শুধু সাহিত্যশিল্পী রাখেন। সে খোঁজ পাবার জন্তে তাঁকে গভীর অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। ধ্বনিতে ধ্বনিতে ছন্দোব্যঞ্জনার কত যে পার্থক্য, শব্দচয়ন এবং বাক্যগঠনের বিচিত্র কৌশলে অল্প কথার মধ্যে কত বেশী অর্থ যে ধরানো যায়, ঠিক কোন্‌ শব্দটি কি ভাবে প্রয়োগ করলে একটি উদ্দিষ্ট ভাব বা অভিজ্ঞতা তার যথার্থ প্রকাশ লাভ করে, এ সব বিষয়ে সূক্ষ্মজ্ঞান এবং সে জ্ঞান প্রয়োগে নিপুণতা বড় সহজে অর্জন করা যায় না। সাহিত্যিকের আত্মপ্রস্তুতির জন্তে তাই মাধ্যমচর্চা একান্ত প্রয়োজন; স্তব্ধতা মননশীলতা সাহিত্যসাধনার অপরিহার্য অঙ্গ।

দ্বিতীয়ত, সাহিত্যস্থিতির জন্তে লেখকের অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধি থাকা দরকার। অভিজ্ঞতা ছাড়া কল্পনার বিস্তার এবং বৈচিত্র্য সম্ভবপর নয়। অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ পরোক্ষ উভয়সূত্রেই অর্জিত হতে পারে। কিন্তু যে সূত্রেই লব্ধ হোক, সে অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের বিষয়বস্তু করতে হ'লে তাকে মননের দ্বারা জারিত ক'রে নিতে হয়। শুধু অভিজ্ঞতা থাকলেই সাহিত্যিক হওয়া যায় না; সাহিত্যের উপাদান হ'ল তাৎপর্যের দ্বারা অধিত অভিজ্ঞতা। এ কাজও সাধনা-সাপেক্ষ। এক ধারে মাধ্যমের সাধনা এবং অল্প ধারে অভিজ্ঞতার সাধনা, এ দুয়ের সমাবেশ ঘটলে তবে সাহিত্য-

প্রেরণা সাহিত্যরূপে কলপ্রসূ হতে পারে। এতখানি মননশীলতার সংযম দ্বারা যেচ্ছায় স্বীকার ক'রে থাকেন, তাঁদের অসংযমী কি অস্থিরবুদ্ধি ব'লে অভিযুক্ত করা নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত নয়।

প্লেটোর যুক্তিতে এ ছাড়া আরও একটি মারাত্মক ভুল বর্তমান। বৌদ্ধিকতা এবং মুক্তিপ্ৰহাের মধ্যে প্রবণতার দিক হতে বিরোধ আপাতদৃষ্টিতে অনতিক্রমণীয় মনে হ'লেও, প্রকৃতপক্ষে এ দুয়ের মধ্যে গূঢ় সহযোগিতার ফলেই মাহুযের বিকাশ সম্ভবপর হয়। এ কথা ঠিক যে, মুক্তিপ্ৰহাের প্রবণতা সমস্ত নিয়মশৃঙ্খলা ভেঙে ফেলার দিকে; অল্প ধারে যুক্তি শুধু যে নিয়মালগ তাই নয়, যা আপাতদৃষ্টিতে শৃঙ্খলাহীন তার মধ্যে নিয়মের সন্ধান করাই তার কাজ। তবু যুক্তি যদি শুধু নগ্নর্ক না হয়, তবে জ্ঞানের সহযোগ ছাড়া তার উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না। এবং সংসারে নিয়মের রাজত্ব আবিষ্কার করা নিরর্থক, যদি না সে জ্ঞানের সাহায্যে মাহুয পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ ঘটিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠার পথ সূচয় করতে পারে। বিকাশের এ ডায়ালেক্টিক দ্বারা স্বয়ম্বলম্ব করতে পারেন না তাঁদের দর্শনে হয় যুক্তিবুদ্ধি নয় মুক্তিপ্ৰহা অবহেলিত হয়। প্রথমটির উদাহরণ রুশো, দ্বিতীয়টির উদাহরণ প্লেটো। এবং এদের মধ্যে একটিকে অবহেলা করলে অল্পটির রূপও যে বিকৃত হয়, এই দুই অসামান্য প্রভাবশালী দার্শনিকের রচনা তারই প্রমাণ। মুক্তিপ্ৰহাকে অবহেলা করার ফলে প্লেটোর চিন্তায় যুক্তিবুদ্ধি স্বমার্গ ত্যাগ ক'রে অতিপ্রাকৃত সাধনায় নিয়োজিত হয়েছে। অল্প ধারে যুক্তিকে পরিহার করার ফলে রুশোর দর্শনে মুক্তিপ্ৰহা শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হয়েছে যুথবন্ধ গডডলবৃত্তিতে।

এখন প্রেরণা এই মুক্তিপ্ৰহারই একটি বিশেষ প্রকাশ। সাহিত্য প্রেরণাসম্ভাত বলে সাহিত্যের মধ্যে মুক্তির এক অতি গূঢ় তুলিত স্বাদ পাওয়া যায়। প্লেটো সম্ভবত তা জানতেন এবং হয়তো সে কারণেই তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে প্রেরণার জন্তে কোন স্থান রাখেন নি। তাঁর আশঙ্কা ছিল সাহিত্যের মারকং মাহুয যদি মুক্তির স্বাদ পায়, তবে তারা আর তাঁর নিয়মনিয়ন্ত্রিত দার্শনিক রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা মানতে চাইবে না। তাঁর আশঙ্কা যে ভিত্তিহীন এ কথা বলতে পারি না; কিন্তু সে আশঙ্কাই কি প্রমাণ করে না যে, তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের

বনিয়াদ অত্যন্ত দুর্বল, যে তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের আদর্শটাই অত্যন্ত মারাত্মকভাবে ভ্রান্ত? ব্যক্তির মুক্তিপূহাকে অবমিত করতে চায় যে রাষ্ট্র, তাকে কোন্ অর্থে আদর্শ বলতে পারি? সাধারণভাবে মুক্তিপূহাকে, বিশেষভাবে প্রেরণাকে আত্মপ্রস্তুতির দ্বারা মার্জিত, শীলিত করার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে পূহা ও প্রেরণাকে সমূলে উৎপাটিত করা যে প্রস্তুতির উদ্দেশ্য, তাকে আত্মঘাতী ছাড়া আর কি বলা যায়? বাস্তবিক পক্ষে মানুষের জীবনে সাহিত্য যে এত মূল্যবান, এই প্রেরণাশূণ্য কি তার অন্ততম প্রধান হেতু নয়? কেননা, প্রেরণা শুধু সাহিত্য-স্রষ্টাকেই মুক্তির স্বাদ দেয় না, সাহিত্যভোক্তাকেও সে স্বাদে সমৃদ্ধ করে থাকে। মানুষের জীবনে এ স্বাদের কোন তুলনা নেই। প্লেটো নিজে এ স্বাদে অনভিজ্ঞ ছিলেন না, কিন্তু তিনি তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের নাগরিকদের এ স্বাদে বঞ্চিত করতে চেয়েছিলেন।

সৌভাগ্যবশত প্লেটোর সে চাওয়া বাস্তবজীবনে কার্যকরী হয় নি। কাহিনী আছে যে, তাঁর শিষ্য ডিওনিসিয়স যখন সিরাকুসের শাসনকর্তা, তখন তিনি শিষ্যের মারফৎ সে দেশকে নিজের আদর্শ অস্থায়ী গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন। ফলে সে দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব দেখা দেয় এবং

প্লেটোকে আত্মরক্ষার জন্তে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়। তাঁর প্রৌঢ় বয়সের রচনা 'Laws' গ্রন্থে তিনি যে দর্শনের চাইতে ধর্মের ওপরে বেশী জোর দিয়েছিলেন, অনেক পণ্ডিতের মতে এটা আসলে ঐ রূঢ় অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া। সে যাই হোক, প্রত্যক্ষভাবে তাঁর জীবন-দর্শনকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে রূপ দিতে না পারলেও, পরোক্ষভাবে সে দর্শন যে পরবর্তী প্রায় আড়াই হাজার বছরের পশ্চিমী চিন্তা এবং জীবনযাত্রার পরে প্রবল প্রভাব ফেলেছে তাতে সন্দেহ নেই। হোয়াইটহেড তো বলেছেন যে, পশ্চিমী চিন্তার ইতিহাস প্লেটোর পাদটীকা মাত্র। এটা হয়তো অতিশয়োক্তি; কিন্তু আজও যে ইয়োবোপীয় মানস প্লেটোনিক জীবনদর্শনের মারাত্মক প্রভাব অতিক্রম করতে পারে নি, তার হাজারো প্রমাণ চোখে পড়ে। অধুনা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যে সব সার্বিক জীবনদর্শন এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে, তাদের সঙ্গে প্লেটোনিক চিন্তার আত্মীয়তা অত্যন্ত স্পষ্ট। এবং অন্ত কোন মুক্তি-প্রমাণ যদি নাও দেখানো হয়, শুধু এই সব রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা হতেই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, প্লেটোনিক জীবনদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে কি শিল্পসাহিত্য কি মানুষের মুক্তিসাধনা উভয়ের ভবিষ্যৎই গাঢ় তমসাক্ষর।

অন্ত

সন্তোষকুমার অধিকারী

পাড়ি দিয়ে সমুদ্র অতলে
মনে ভাবি এই সীমা তার,
অরণ্যের হৃদয়-গহনে
খুঁজি স্বর নিখিলসত্তার;
আকাশের ছায়াপথ ধরে
চলে যাই আকাশসীমায়,

তবু এক রাজিশেষ ভোরে
এ জীবন কোথায় হারায়?
জীবনকে জেনেছি অমৃত,
প্রতিহত আশা তবু তার,
চেয়ে দেখি আমার আকাশে
যরে শুধু নীল অন্ধকার।

প্রসঙ্গ কথা

পল্লীকেন্দ্রিক সাহিত্য

নারায়ণ চৌধুরী

১

সম্প্রতি একজন চিন্তাশীল লেখক 'ক্রান্তি' পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩৬২) "নাগরিকতার প্রসার ও ভারতবর্ষ" এই শিরোনামায় ভারতবর্ষে নাগরিক মনোভাবের প্রসারের সমস্যাটি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। লেখক তাঁর প্রতিপাত্ত বিষয়টিকে সাধারণ প্রবন্ধকারদের অভ্যস্ত রীতি অহুযায়ী কেবলমাত্র মত বা মন্তব্য প্রকাশে সীমাবদ্ধ রাখেন নি, তাকে তথ্যের ভিত্তিতেও সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রবন্ধের বক্তব্যের সমর্থনে লেখক অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব-ঘটিত বহু পরিসংখ্যান (statistics) উদ্ধৃত করেছেন। সমালোচনাচ্ছলে তিনি বাংলা-সাহিত্যের প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন এবং সেই সূত্রে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, বাংলা-কথাসাহিত্যে নাগরিকতার লক্ষণ এখন পর্যন্ত আশাহুঙ্কর প্রকট হয় নি। তিনি এটিকে বাংলা-সাহিত্যের অনগ্রসরতার একটি নিদর্শন বলতে চান।

লেখকের বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত। লেখক তাঁর নিবন্ধে নাগরিকতা বনাম গ্রামীণতার সমস্যা সম্পর্কে সাধারণভাবে যে সকল অভিমত প্রকাশ করেছেন সে সকল বিষয়ে কিছু বলতে চাই না, শুধুমাত্র বাংলা-সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত অংশটির উপরই আপাতত আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করব। লেখক বিষয়টিকে সূত্র আকারে উপস্থাপিত করেই ক্ষান্ত হয়েছেন, এখানে তাকে আরও বিস্তারিত করা যেতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের আমল থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলা গল্প-উপন্যাসের যদি একটি হিসাব লওয়া যায় তা হ'লে দেখা যাবে যে, বাংলা গল্প-উপন্যাসাদিতে পল্লীর পটভূমিরই প্রাধান্য। পল্লীচিত্র, পল্লীচরিত্র এবং পল্লী-কেন্দ্রিক ঘটনা এই তিন লক্ষণ বাংলা-কথাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করছে। আমাদের সাহিত্যের সব চাইতে জনপ্রিয় ও সফল উপন্যাস বেগুনি, সেগুলির প্রায় পনেরো আনা পল্লীগদ্য রচনা। 'জনপ্রিয়' ও 'সফল' কথা দুটি

এখানে শর্তাধীন। অনেক সময় রচনার পল্লীগদ্যতার সত্ত্বেই জনপ্রিয়তা সহজলভ্য হয়। 'সফল' বিশেষণটিও ওই সূত্র ধরে আসে। তথাকথিত জনপ্রিয়তাই হ'ল অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাফল্যের মাপকাঠি। পাছে এ কথায় ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় সেজন্তে বলি, রচনা পল্লীধর্মী হ'লেই যে তা শিল্পাপকর্ষের লক্ষণমণ্ডিত হবে এমন কোন কথা নেই। রচনার বিষয়বস্তু নগরকেন্দ্রিক হোক আর পল্লীকেন্দ্রিক হোক, রচনার উৎকর্ষ রচয়িতার শিল্পদৃষ্টি ও লিখনক্ষমতার উপরে নির্ভর করে। রচয়িতার দৃষ্টিভঙ্গির অনন্ততা ও অহুত্বের প্রগাঢ়তা যে ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হোক, তাকেই শিল্পগুণে ভূষিত করে তোলে। তবু যে নগরকেন্দ্রিক রচনার তুলনায় পল্লীকেন্দ্রিক রচনা বাংলা দেশের সাধারণ পাঠকপাঠিকার চিত্ত সমধিক আকর্ষণ করে তার কারণ, পল্লীর সংস্কার আমাদের চিত্তে অতিশয় বদ্ধমূল। নাগরিক মনোভাব আমাদের জীবনের বহিরঙ্গমাত্র স্পর্শ করেছে, আমাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হয় নি। এ দেশে গল্পোপন্যাসের ক্ষেত্রে ঝাঁঝই নাগরিক বিষয়কে রচনার উপজীব্য করবার প্রয়াস করেছেন, তাঁরাই প্রাথমিক একটি অহুবিধা নিয়ে সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত করেছেন। পল্লীপ্রাণ লেখকদের সাহিত্য-অনুশীলনের সমুহ স্ববিধা। তাঁদের মন গোড়া থেকেই বাংলা দেশের শত-করা আশিজন পাঠকের মনের সুরের সঙ্গে বাঁধা। শিক্ষায় সংস্কৃতিতে রুচিতে বিশিষ্ট হওয়ার সাধনাই হ'ল শিল্পীর সাধনা। বাংলা-কথাসাহিত্যে ঠিক তার উল্টো। যে লেখক শিক্ষায় ও রুচিতে গড়পরতা সাধারণ বাঙালী পাঠকের মানসিকতার কাছাকাছি আছেন, তাঁর সাহিত্যের সমাদর তত অবধারিত। কোন কোন মহলে পাঠক ও লেখকের এই মানসিক সমীকরণের দৃষ্টান্তকে পাঠকের সঙ্গে লেখকের আত্মীয়তাবোধের নিদর্শন মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে যে, এই আত্মীয়তার যুক্তিটি বিভ্রান্তিকর। পাঠকের সঙ্গে আত্মীয়তার অহুশীলন

বাহুনিয় বলে শিক্ষায় ও রুচিতে পাঠকের মানসিকতার সমস্তরে নেমে আসতে হবে—এমন দিব্য বাংলা দেশের লেখকদের কেউ দেখে নি। অথচ বাংলা দেশের পল্লীপ্রাণ লেখকমাত্রই ওই বাধ্যবাধকতার চেতনার অধীন। তাঁরা নাগরিকতারূপ গুণকে সন্মোহের চক্ষে দেখেন এবং মনের সবটুকু ঝাঁক নিয়ে ফেলেন গ্রামীণতার উপর। যেন গ্রামীণতা গ্রামীণতার জন্তেই বন্দনীয়, আচরণীয়। পাঠক যেহেতু অনগ্রসরতার স্তরে আবদ্ধ হয়ে আছে সে-কারণ পাঠকের মন পাওয়ার জন্তে লেখককেও অনগ্রসর থাকতে হবে। নাগরিকতার চর্চা, মনঃপ্রকর্ষের চর্চা লেখকের পক্ষে দুঃখ। হেতু কী? না, তার ফলে বাংলা দেশের শত-করা আশিটি পাঠকের সঙ্গে আত্মীয়তার যোগ বিচ্ছিন্ন হবে। বলাই বাহুল্য, এর চাইতে আত্মপ্রবঞ্চনাকর মনোভাব আর কিছু হতে পারে না।

বাংলা-কথাসাহিত্যের অতিমাত্রিক পল্লীগন্ধিতাকে আমরা বাংলা দেশের সমাজব্যবস্থার অনগ্রসরতার প্রমাণ বলে মনে করি। সে-কারণ সাহিত্যেরও।

২

মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, ভারতবর্ষের প্রাণ তার গ্রামে নিহিত। এ কথার অর্থ এই যে, ভারতবর্ষের অধিবাসী-সংখ্যার গরিষ্ঠ অংশ গ্রামাঞ্চলে বাস করে। ভারতবাসীর সুখ-দুঃখ ভারতবর্ষের পল্লীবাসী জনসাধারণের সুখ-দুঃখের প্রায় সমার্থক। কিন্তু এটি হ'ল বাস্তব অবস্থার চিত্রণ। আদর্শ অবস্থার চিত্রণ এ থেকে স্বতঃই ভিন্নতর হওয়া উচিত। ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ গঠনের পরিকল্পনার কাজে যারা নিয়োজিত আছেন তাঁরা সকলেই বিচক্ষণ ব্যক্তি। ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থার কৃষিকেন্দ্রিক তথা পল্লীকেন্দ্রিক কাঠামো স্বীকার করে নিয়েও তাঁরা সকলেই গ্রামাঞ্চলের উত্তরোত্তর নাগরিকীকরণের পক্ষপাতী (progressive urbanisation of the countryside)। এই উদ্দেশ্যের চেতনা থেকেই পয়লা দফা পাঁচ-সাতা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের (The Community Projects) উদ্ভব। বড় বড় বাঁধ, সেচ, জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনাগুলির মূলও আছে এই লক্ষ্য। ভারতবাসীর পল্লীবাসী সাধারণ মানুষের জীবনে নাগরিক স্বযোগ-সুবিধা বত বেশী পরিমাণে অধিগম্য ক'রে তোলা হবে, তত

ভারতের উন্নতি বাহিত পথ ধ'রে অগ্রসর হচ্ছে বলে মনে করা হবে। আমরা আমাদের পাঁচ লক্ষাধিক গ্রামকে পূর্বাভাসে ফেলে রাখতে চাই না, গ্রামকে বতদূর সম্ভব নগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্করণে পরিণত ক'রে তুলতে চাই। ভারতবর্ষ যদিও মূলত কৃষিকেন্দ্রিক দেশ, তা সত্ত্বেও এ কথা আজকের দিনে কেউ বলবেন না যে, শিল্পায়িতকরণের আদর্শ ভারতের পক্ষে অগ্রহণীয়। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ ভারতবর্ষের বিশেষ অবস্থার কথা মনে রেখে এ দেশের জন্তে মিশ্র শিল্পনীতির সুপারিশ করেছেন। বড় বহরের শিল্প ও কুটিরশিল্প এতদুভয়কেই ভারতবর্ষে পাশাপাশি চলতে দিতে হবে। গান্ধীজীর স্বপ্ন অমুদায়ী গ্রামগুলিকে যতদূর সম্ভব স্বয়ংনির্ভর ক'রে তুলতে হবে, কিন্তু এই স্বয়ংনির্ভরতার অর্থ পুরাতন সমাজব্যবস্থার পোষকতা নয়। গান্ধী-সমর্থিত বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনীতির (decentralised economy) সীমার মধ্যেই গ্রামগুলিতে নগরের সুযোগ সুবিধাদি পৌঁছে দিতে হবে। নবীন ভারতবর্ষ শিক্ষা ও কুসংস্কার-সমাক্ষয় পুরাতন গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার আমূল রূপান্তর কামনা করে। ইতিমধ্যেই এই রূপান্তরের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। পল্লীর চেহারা আমূল রূপান্তর সাধিত না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে।

৩

এই যদি আদর্শ পল্লীর রূপ সম্বন্ধে ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মনোভাব হয় এবং সে মনোভাব সমাজের চিন্তাশীল মাহুষদের সমর্থন পেয়ে থাকে, তবে কেন আমরা অতাবধি সনাতন পল্লীগন্ধিতার সংস্কার আঁকড়ে থাকব? কেন সাহিত্যে আর-সব বিষয়বস্তুকে পরিবর্তন ক'রে পল্লীকেন্দ্রিক বিষয়কেই প্রাধান্য দেওয়া হবে? বাংলা গল্প-উপন্যাসে ঘেঁটুফুলের বর্ণনা আর 'মা শেতলার খানের' অলৌকিক মাহাত্ম্যের কীর্তন যথেষ্ট হয়েছে, এখন থেকে এ সব বিষয়ের উপর হতে মনোযোগ প্রত্যাহার ক'রে তাকে অন্তর স্থাপন করতে হবে। জ্যোতীর নিবন্ধে ("সাহিত্য ও সমাজচেতনা") আমি বলেছি, বাংলা গল্প-উপন্যাসে বৃহত্তর বেগ সঞ্চারিত হওয়া দরকার। বর্তমান প্রসঙ্গে সে কথার পুনরাবৃত্তি করি। আমরা যে চিন্তা ও কল্পনার দিক দিয়ে বিধবাসীর অগ্রসর পদক্ষেপের সঙ্গে সমতালে পা ফেলে চলতে জানি, আমাদের বাংলা-ভাষার গল্পোপন্যাসের

ভিতর তার প্রমাণ দিতে হবে। গ্রামেতর নূতন নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করে দেখাতে হবে, সনাতন চণ্ডীমণ্ডপ আর বুড়ী বটতলাই আমাদের মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য অহুতবের একমাত্র স্থান নয়, নাগরিক আবহাওয়াতেও আমরা সমান ক্ষুতি অহুতব করতে পারি। বাংলা-সাহিত্যে যতদিন না বিষয়ের পরিধির সম্প্রসারণ হচ্ছে, ততদিন আমাদের মানসিক মুক্তি বিশেষ ভাবে পরাহত হয়ে থাকবে।

কেউ কেউ বলবেন, রচনার বিষয়নির্বাচনে লেখকের অভিজ্ঞতা একটি বড় জিনিস। লেখক তাঁর স্বকীয় অভিজ্ঞতার গভীর মধ্যে তাঁর রচনার উপজীব্য বিষয়ের নিরূপণক্রিয়া সীমাবদ্ধ রাখবেন, এইটাই প্রত্যাশিত। যিনি যা দেখেছেন তাকে রূপায়িত করে তুলতে চাওয়াই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। কোন লেখক যদি মূলত পল্লীর চিত্র চরিত্র এবং ঘটনাবলীর অভিজ্ঞতার শরিক হয়ে থাকেন তবে নিতান্ত সঙ্গতভাবেই তিনি পল্লীর অভ্যন্তর এবং পরিচিত পরিবেশটিকেই তাঁর রচনার পটভূমি হিসাবে ব্যবহার করার দাবি করতে পারেন। শুধু তাই নয়, তাঁর পক্ষে নাগরিকতার চর্চা সে ক্ষেত্রে বোরতর অনধিকার চর্চা বলে গণ্য হবে। স্বধর্ম সংস্থিত থেকে বরং অপবশ হুড়নো ভাল তবু পরধর্ম ভয়াবহ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পল্লীধর্মী সাহিত্যিক মাত্রই আঞ্চলিক সাহিত্যিক। ইংরেজী সাহিত্যে এর উজ্জ্বল উদাহরণ টমাস হার্ডি ও আর্নল্ড বেনেট; বাংলা-সাহিত্যে বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্র পল্লীপ্রাণ সাহিত্যিক হ'লেও আঞ্চলিক সাহিত্যিক নন। তবে তাঁর মানসিক পক্ষপাত যে মুখ্যত পল্লীর উপরেই ক্রান্ত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। বাংলা-সাহিত্যের নূতন-পুরাতন অস্ত্রাস্ত্র উপভাস-লেখকগণের অধিকাংশ হলেন পল্লীর ধারাক্ষরী লেখক। খোদ বঙ্কিমচন্দ্রে নামতালিকার শুরু; তারপর বহু বহু লেখক এই ধারাটিকে পুষ্ট করেছেন। 'স্বর্ণলতা'র লেখক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সামাজিক উপভাসের প্রণেতা রমেশচন্দ্র দত্ত, পণ্ডিত দামোদর মুখোপাধ্যায়, 'রায় পরিবারের' লেখক সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, গার্হস্থ্য উপভাসাবলীর লেখক হরেন্দ্রমোহন ও নারায়ণ ভট্টাচার্য, 'মেজ-বউয়ের' শিবনাথ শাস্ত্রী, অহরুপা দেবী, শরৎচন্দ্র, জলধর সেন, এবং এ যুগের বিভূতিভূষণ,

তারাশঙ্কর, মনোজ বসু, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—সবাই প্রধানত পল্লীধর্মী লেখক। এর ব্যতিক্রম হলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, প্রমথ চৌধুরী, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, পরশুরাম, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমাসুর আতর্ষী, বনফুল, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, হুবোধ ঘোষ প্রভৃতি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দুই ক্ষেত্রেই সঙ্করণের অভ্যাস আছে। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির পটভূমি পল্লী, তবে উপভাসশিল্পে তিনি তাঁর দৃষ্টি প্রধানত শহরের উপরই অর্পণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ—সম্ভবত বাংলা সাহিত্যেরও শ্রেষ্ঠ—উপভাস 'গোরা' নাগরিক উপভাস।

উল্লিখিত নামতালিকার ভিতরের কথাটা হ'ল এই যে, পটভূমি এবং পরিবেশ-নির্বাচন লেখকের ব্যক্তিকীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। যিনি যে অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ অংশভাক নন তাঁর পক্ষে সেই অভিজ্ঞতা চিত্রিত করতে যাওয়া সঙ্গত নয়, শোভনও নয়। অবশ্য কল্পনা ও মৌলিক উদ্ভাবনী শক্তি এক্ষেত্রে কথাকারকে কিছু পরিমাণে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা যে-কল্পনার ভিত্তি নয় তার জোর খুব বেশী নয়। রূপকথা-উপকথারও একটা বাস্তব ভিত্তি থাকে। এখানে কথা তা নয়। কথা হচ্ছে, বাঙালী নগরকেন্দ্রিক এবং পল্লীকেন্দ্রিক কথাকারের অত্র সব দিক দিয়ে ক্ষমতা যদি সমান সমান থাকে, তা হ'লে দুইয়ের তুলনামূলক বিচারে পল্লীকেন্দ্রিক সাহিত্যিকেরই জিত। তিনি সমধিক জনপ্রিয় হন। সাধারণ বাঙালী পাঠকের সহজাত মানসিক গঠনের ক্ষেত্রেই পল্লীকেন্দ্রিক সাহিত্যিকের এই বিশেষ সুবিধাভোগ। তিনি নগরকেন্দ্রিক ঔপন্যাসিকের মাথা ভিড়িয়ে অহুতিত এবং অর্থোক্তিক ভাবে এই সুবিধা ভোগ করেন। নগরকেন্দ্রিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সাংস্কৃতিক উদারতা বেশী, চিন্তের সচলতা বেশী, তাঁদের বুদ্ধিও তদহুপাতে প্রখর। নূতন নূতন ভাবধারা স্বীকরণে তাঁদের গ্রহিণ্যতার ক্ষমতা প্রত্যক্ষ। তাঁদের সমাজ-সচেতন মনোবৃত্তি রচনার ভিতর স্পষ্টতর রেখায় চিহ্নিত, যদিও এক্ষেত্রে স্বল্প-কঠিন একটি নিয়ম বেঁধে দেওয়ার বিপদ আছে। প্রায় সব নগরকেন্দ্রিক লেখকই সংস্কৃতিবান লেখক, বিদগ্ধ লেখক। কিন্তু

এইখানেই যত বিপত্তি। যে-হেতু তাঁরা বিবন্ধ লেখক সেই হেতুই তাঁরা দম্ভভাগ্য। পোড়া বাংলা দেশের পাঠক-সম্প্রদায়ের নিকট তাঁরা তাঁদের প্রাপ্য সমাদর পান না।

কথাটা অপ্রীতিকর হ'লেও বলা প্রয়োজন, আমাদের গড়পরতা সাধারণ পাঠকের চিন্তা অপরিণত, রুচি অমার্জিত। তাঁদের একটি অংশ শহরে বাস করেন সত্য, কিন্তু মনের দিক দিয়ে তাঁরা এখনও তাবিচ কবচ-মাতুলি রক্ষাকালী মা-শেভলা ওলাবিবির যুগে বাস করেন। বাবা-তারকেশ্বরের কাছে 'হত্যে' দেওয়া আর গ্রামের জাগ্রত দেবীর নিকট জোড়া পাঠা মান্ত করার কুঅভ্যাস অধিকাংশ মাত্রের অস্তিত্বের সঙ্গে লেপ্টে আছে। আমাদের দেশের শত-করা পঁচানব্বইটি মাত্রের মনোজীবনের উপর আঁচড় কাটলে দেখা যাবে, পল্লীর সংস্কার দ্বারা তাঁরা অতিমাত্রায় আচ্ছন্ন। এ কথা কি পল্লীবাসী কি শহরবাসী সকলের সম্বন্ধেই সমান প্রযোজ্য। আমরা যারা শহরে বাস করি তাদের দেহটা শুধু শহরের সীমায় আবদ্ধ, আমাদের মন প'ড়ে আছে পল্লীর বহুকালের পুঞ্জীভূত জ্ঞানলব্ধূপের মধ্যে। এ দেশের বিশেষ কৃত্তিকেন্দ্রিক গঠনের জন্তে নাগরিকতা আজও আমাদের মনের ভিতর শিকড় গেড়ে বসতে পারে নি। ইংরেজী শিক্ষার যেটি উদার সাংস্কারক দিক, তা ভারতের সাকুল্য অধিবাসী-সংখ্যার এক ভগ্নাংশকে মাত্র স্পর্শ করেছে এবং তাও ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ভাবে। জমিদার পাইক পেয়াদা নায়েব তহশীলদার মুছরি গমস্তা ইত্যাদি নিয়ে যে গ্রাম্যজগৎ, তার প্রতি এখনও আমাদের মনে এক ধরনের রোমান্টিক আকর্ষণ আছে, যাকে 'মোহ' আখ্যা দেওয়াই উচিত এবং যার নিরাকরণের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকতে পারে না। আমরা সত্যি সত্যি পল্লীর উন্নয়ন চাই না, পল্লীকে আজও ঘনসংবদ্ধ বীশবনের অন্ধকারে আর এঁদো ডোবার পচা জলে নিমজ্জিত রেখে পুণ্য ভিটামাটির কোলিক মহিমা সংরক্ষণের বিষয় আনন্দ অলুভব করতে চাই। শিক্ষাহীনতা আর কুসংস্কারের প্রতি আমাদের প্রাণের মমতা গভীর এবং হুরতিজন্ম।

এই যেখানে অবস্থা সেখানে পল্লীকেন্দ্রিক কথা-সাহিত্যিক বাঙালী পাঠকসমাজের নিকট সমধিক কষ্ট পাবেন তাতে আর আশ্চর্য কী। এবং সেই সঙ্গে নগর-

কেন্দ্রিক কথাকারের আপেক্ষিক অনাদরের কারণ বোঝাও হুঃসাধ্য নয়। পাঠকের রুচি যদি আশাহরুপ মার্জিত হ'ত, বৃহৎ এবং মহত্তর ধারণার দ্বারা যদি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অল্পপ্রাণিত হ'ত, তা হ'লে নাগরিক সাহিত্যের স্বরের সঙ্গে তাঁদের নিঃস্বাদের স্বর বাঁধা কঠিন হ'ত না। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই দেখি, পাঠকের অনগ্রসরতার দোষ, রুচিহীনতার দোষ ভুল ক'রে লেখকের উপর চাপানো হয়। যেন গড়পরতা পাঠকের মানসিক মাপের চাইতে অনেকখানি বড় হয়ে উঠতে চেয়ে সংশ্লিষ্ট লেখক মহাপাতক করেছেন, যেন পাঠকসম্প্রদায়কে বাধিত করবার জন্তে তাঁদের মানসিক স্তরে থেকে যাওয়াই লেখকের উচিত ছিল। জনপ্রিয়তার মাপকাঠি এ সমাজে বড় সস্তা আর নড়বড়ে। সফল উপন্যাস তাকেই আমরা বলি, যার বিষয়বস্তু গড়পরতা সাধারণ পাঠকের মনোজীবনের স্তরে সংস্থিত এবং সেই স্বরে বাঁধা। সমালোচকের নিরপেক্ষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া কিছু নয়, রসিকের অহমোদন লাভ কিছু নয়, পাঠকসমাজ কর্তৃক আদৃত হওয়া নিয়ে কথা। এই শেষোক্ত পরীক্ষায় যে বই পাসমার্কা পেল, তার শিল্পগত উৎকর্ষাপকর্ষ নিয়ে আর সংশয় প্রকাশের কারণ ঘটে না। পুস্তকের সংস্করণসংখ্যার কমি-বেশি প্রচণ্ড একটা কুসংস্কারের মত বাঙালী সাহিত্যসমাজকে আধিষ্ট ক'রে রেখেছে। প্রকাশকদের এ বাবদে আত্মপ্রসাদ তবু মার্জনীয়, গ্রন্থকারদের আত্মপ্রসাদ মোটেই মার্জনীয় নয়। পাঠকসমাজের অনগ্রসরতার উপর এ আত্মপ্রসাদের নির্ভর, সুতরাং তা অপ্রত্যাশ্য। যে সাহিত্যপ্রয়াসের আসল জোব পাঠক-সম্প্রদায়ের রুচিহীনতার মধ্যে নিহিত, তার উৎকর্ষ বাচাইয়ের বেলায় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।

আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের কোনও একজন সমালোচক শরৎচন্দ্রের আলোচনা-প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "Popularity is malodorous." অর্থাৎ কিনা জনপ্রিয়তা বস্তুটি দুর্গন্ধযুক্ত। তৎকালে এই মন্তব্যটি নিয়ে সাহিত্যমহলে বিশেষ সোরগোল উঠেছিল। কিন্তু সমালোচক এই মন্তব্যটি উচ্চারণ ক'রে এমন কী মহাপাতক করেছিলেন বোঝা যায় না। সত্যিই তো জনপ্রিয়তা বস্তুটি সন্দেহজনক। কুচি আর কুসংস্কারের রূঢ় হস্তাবেলপের দ্বারা এতদেপীয় জনপ্রিয়তার আপাদমস্তক অবলিষ্ট। সমাজ ও রাষ্ট্র-

জীবনের ক্ষেত্রে আমরা গণতন্ত্রের আদর্শের অব্যভিচারী সমর্থক হ'লেও সাহিত্যোপভোগের ক্ষেত্রে আমরা মাথা-গুনতির নীতিতে বিশ্বাসী নই। সেখানে আভিজাত্য এবং রসকৌলীন্তের আদর্শটিই মান্য। সত্যিকারের উৎকৃষ্ট সাহিত্যের মর্ম উপলব্ধি করতে হ'লে বিশেষ শিক্ষা, রুচিবোধ ও গ্রহিষ্ণুতা থাকা চাই। সকলের সে মানসিক প্রস্তুতি থাকে না। রসবোধ বস্তুটি অমূল্যমানসাপেক্ষ, সেটি অনায়াস-লভ্য নয়। কাজেই সাহিত্যের মূল্যবিচারে জনতার 'ভাল-লাগা মন্দ-লাগা' দিয়ে লেখকের সাফল্য-অসাফল্য নিরূপণের মত বিলাস্তিকর মানদণ্ড আর কিছু নেই। অথচ দেখতে পাই, বাংলা গল্প-উপন্যাসের মূল্যায়নে এই মানদণ্ডটিরই সমধিক প্রয়োগ হয়ে থাকে। পাঠকের মানসিক প্রস্তুতির অভাব এতদৈশ্বর্য কথাসাহিত্যিকের প্রতিষ্ঠা-লাভের সব চাইতে বড় সহায়ক।

৪

বাংলা-সাহিত্যে সত্যিকার নাগরিকতার স্বরূপাত হয়েছিল ব্রিটিশ অভ্যুদয়ের পরবর্তী কালে। বাংলা-সাহিত্যের প্রাক-ব্রিটিশ যুগ পল্লীগন্ধিতার দ্বারা সমাচ্ছন্ন। কেবল এর ব্যতিক্রম ছিলেন কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র, রামনিধি গুপ্ত ও ঈশ্বর গুপ্ত। ইংরেজী সভ্যতার সংস্পর্শ ও সংঘাতের ফলেই এ দেশে প্রথম যথার্থ নাগরিকতার উদ্ভব হয়। নাগরিকতার, স্বতরাং আধুনিকতারও। ইংরেজী সভ্যতার সঙ্গে বাঙালীর নিজস্ব সংস্কৃতির সংঘাত ও সমন্বয়ের শ্রেষ্ঠ সূক্ষল হলেন রাজা রাম-মোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, হুভাষচন্দ্র। এঁদের মধ্যে যদিও সকলে সাহিত্য-ত্রস্তী নন, তা হ'লেও লক্ষ করবার বিষয় এই যে, পল্লীগন্ধিতা এঁদের কাকুরই মনোজীবনের বৈশিষ্ট্য নয়। এঁরা সকলেই নাগরিক সংস্কৃতির মানসসন্ধান। এঁদের প্রত্যেকেই পল্লীর উন্নতিকামী ছিলেন, তাই ব'লে পল্লীবাসীর সন্তা-আত্মীয়তা অর্জনের জন্তে নিজেদের মনোজীবনকে পল্লী-বাসীর স্তরে 'নামিয়ে' আনেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র পল্লীকেন্দ্রিক উপন্যাস লিখেছেন, কিন্তু সমগ্র বঙ্কিম-সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তার ভিতর নাগরিকতার স্বরূপটিই প্রধান। বস্তুত বাংলা-সাহিত্যে সার্থক নাগরিক সংস্কৃতির

আবহাওয়া সঞ্চারে বঙ্কিমচন্দ্রের দান সর্বস্বীকৃত ও বিশাল। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন প্রথর মনসী ও সুপণ্ডিত, স্বতরাং স্বভাবতই তাঁর পল্লীগন্ধী হওয়ার ধোঁ ছিল না। গ্রামীণতার অমূল্যলনে তাঁর না ছিল উৎসাহ, না ছিল ইচ্ছা। রবীন্দ্র-নাথ সম্পর্কেও এই মন্তব্য সর্বাংশে প্রযোজ্য। আরও বেশী প্রযোজ্য এই জন্তে যে, তাঁর জীবনদর্শনের ভিতর বাঙালীর স্বকীয় ঐতিহ্যনিষ্ঠার সঙ্গে দুটি বাহিরের ধারার মিলন ঘটেছিল। শেখোক্ত দুটি ধারাই নগরমুখী। এক ইংরেজী শিক্ষা, দুই নাগরিকতাগর্ভ মুসলিম সংস্কৃতি। আমীরজমশ্বলভ মুঘল আভিজাত্যের সংস্কারের প্রতি ঠাকুরবাড়ির সহজ পক্ষপাত ছিল। কবির এই সহজ নাগরিকতার ধারার সার্থক প্রতিকলন ঘটেছিল তাঁরই লাভুস্পূত্র শিল্পিগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে এবং আত্মীয়গ্রগণ্য বিশিষ্ট প্রবন্ধকার প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে।

শরৎচন্দ্র বিষয়বস্তুর নির্বাচনে পল্লীর প্রতি পক্ষপাতযুক্ত, কিন্তু তাঁর ভাষাশিল্প, গল্পকথনরীতি বৈদম্ব্যের চেতনার পরিচায়ক। তিনি অতিশয় সজ্ঞান শিল্পী, ভাষার সৌন্দর্য-বিধানে তাঁর তুল্য সচেতনতা খুব কম লেখকের মধ্যেই দেখা যায়। শরৎচন্দ্রের এই মানসিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্টতঃই তাঁকে অচেতন পল্লীকেন্দ্রিক সাহিত্যিকদের থেকে কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট ক'রে রেখেছে।

মোদ্দা কথা, সাহিত্যে নাগরিকতা মোঘ নয়, একটি গুণ। এই গুণের যত বেশী অমূল্যলন হবে ততই চিন্তের মুক্তির ক্ষেত্র প্রশস্ততর হবে। বাংলা-সাহিত্যে অনগ্রসর পল্লীর চিত্র-চরিত্র নিয়ে যথেষ্ট ঘাঁটাঘাটি হয়েছে, সেই প্রক্রিয়া কিয়ৎ পরিমাণে অবরুদ্ধ হওয়া দরকার। যেমন শিল্পায়িত-করণ কৃষিব্যবস্থার পরবর্তী উন্নত ধাপ, তেমনি নাগরিকতা গ্রামীণতার তুলনায় নিঃসন্দেহে উন্নততর অবস্থা। প্রকৃত প্রস্তাবে, এই দুই ছোঁড়া প্রক্রিয়ার মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে। নাগরিকতার চর্চায় বাংলা-সাহিত্যের লাভ বই ক্ষতি হবে না।

বিগত সংখ্যায় প্রকাশিত "সাহিত্য ও সমাজচেতনা" প্রবন্ধটি পড়ে করিমগঞ্জ থেকে শ্রীহৃদ্বিজ চৌধুরী সম্পাদক মহাশয়কে এক প্রত্নাবাত করেন। তাতে তিনি আমার বক্তব্যের কোন কোন অংশের প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

পত্রলেখকের মতে ওই প্রবন্ধে আমি আমার নিজের বক্তব্য খণ্ডন করেছি। পত্রলেখকের ভাবাই এখানে তুলে দিচ্ছি—

“প্রবন্ধটির মূল স্রবের সঙ্গে আমরাও একমত—আধুনিক সাহিত্যকে যে সমাজ-সচেতন হতে হবে এ কথা আজকের যুগে অস্বীকার করাটাই বাতুলতা। কিন্তু এ কথা প্রমাণ করতে গিয়ে লেখক এমন কতকগুলো মন্তব্য করেছেন যেগুলির যৌক্তিকতা সন্দেহে আমরা সন্দেহ কারণেই সন্নিহান। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, ‘যে নায়ক বহির্বিশ্বের যোগস্পর্শহীন পরগাছা-সমাজের একজন প্রতিনিধি মাত্র কিংবা বৈচিত্র্যহীন নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের সম্মান, তাঁর প্রেম কত আর মহত্বমণ্ডিত হতে পারে? আধুনিক কথাসাহিত্য পারিবারিক বা ব্যক্তি-জীবনের নিখুঁত বাস্তবনিষ্ঠ প্রতিকল্প হওয়াই যথেষ্ট নয়, তার মধ্যে বৃহৎ জীবনের বেগ সঞ্চালিত হওয়া দরকার।’ লেখকের দ্বিতীয় উক্তিটি আমরা মানি; কিন্তু প্রথমটি সন্দেহে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, ওটা একটা মস্ত বড় অসত্য উক্তি। মহৎ সাহিত্যের নায়ক মাত্রকেই যদি আলোকপ্রাপ্ত অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত হতে হয় তবে বিশ্বসাহিত্যের বিরাট একটা অংশকেই ওয়েস্ট পেপারের বাক্সে ফেলে দিতে হয়।”

আমার মনে হয়, পত্রলেখক আমার বক্তব্যটি ঠিক ঠিক ধরতে পারেন নি। আসলে অভিজাত সমাজ, মধ্য বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজ, শ্রমিক বা কৃষক সমাজ—এর কোনটির সম্পর্কেই আমার মনে কোনরূপ কুসংস্কার নেই। যে কোন সমাজের চিত্রচরিত্রই সাহিত্যের উপজীব্য হতে পারে, শুধু যেখা দরকার সেই রূপায়ণ যেন বৃহৎ এবং মহৎ ভাবনার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়। শিল্পী তাঁর শিল্পের উপকরণ যে কোন সম্প্রদায় থেকে আহরণ করতে পারেন, শুধু শিল্পীর মনটি বৃহৎ ভাবনার বেগের দ্বারা আন্দোলিত হওয়া দরকার। ইচ্ছন নানা স্বত্র থেকেই সংগ্রহ করা চলে, কিন্তু তাতে অগ্নিসংযোগ করতে হ’লে চাই আলো। শিল্পীর মন হচ্ছে সেই আলো। শিল্পরূপ যে উজ্জলতা অথবা স্নানতা প্রাপ্ত হয় সে শুধু শিল্পীমনের এই বহুমুখী দীপ্তির তারতম্যে। এইখানেই সমাজচেতনার প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সমাজচেতনার মশাল থেকে আগুন ধরিয়ে নিলে শিল্পের প্রভা কখনও ত্রিযমাপ হয় না।

সহজ কথায় আসি। নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের চরিত্র

বা ঘটনা বর্ণনায় আমার আপত্তি নেই। আমার আপত্তি শুধু সেই সমাজের খুঁটিনাটি বৃত্তান্তের উদ্দেশ্যহীন বর্ণনায়। লেখকের মন যদি যথার্থ শিল্পবোধযুক্ত এবং গভীর-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয় তা হ’লে আপনা থেকেই এই খুঁটিনাটি বর্ণনার ক্লাস্তিকর আতিশয্য অবরুদ্ধ হয়ে আসে। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের রূপায়ণে বিষয়ের ভূমিকা অপ্রধান, কে কী ভাবে সেই বিষয়টির বিচার করছেন সেইটিই হ’ল আসল কথা। নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের প্রচণ্ড অবক্ষয় আর ব্যর্থতার মধ্যেও যে কী গভীর আত্মমর্যাদাবোধ, কী অপরাজেয় সংগ্রামস্পৃহা পুঞ্জীভূত রয়েছে, সেই অকাট্য বাস্তব সত্যকে যদি কোন লেখক নিজের লেখায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন তবে সহস্রবার তাঁর সে রচনাকে সাধুবাদ জানাব। অন্ত্যায় খুঁটিনাটির বর্ণনায় লেখক যতই নিপুণ পর্যবেক্ষণশক্তির পরিচয় দিন না কেন, তাঁর সে প্রয়াসের বিশেষ সার্থকতা নেই।

“মহৎ সাহিত্যের নায়কমাত্রকেই যদি আলোকপ্রাপ্ত অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত হতে হয়”—কোথায় আমি এ কথা বলেছি? পত্রলেখককে পুনরায় প্রবন্ধটি পংক্তিভেদপূর্বক পাঠ করতে অনুরোধ করব। ‘পরগাছা’ সমাজ বলতে একালীন সমাজতাত্ত্বিক-অর্থনৈতিক পরিভাষায় তথাকথিত অভিজাত বা বুর্জোয়া সমাজকেই বোঝায়। এ সমাজের মানুষেরা জীবনধারণের জন্তে পরের শ্রমের উপর নির্ভরশীল ব’লে এদের বলা হয় পরগাছা (parasite)। পত্রলেখক তাঁর পত্রের উদ্ধৃত অংশটি অবধান করলেই দেখতে পাবেন। এই সমাজের মানুষের অসার এবং একঘেয়ে প্রেমের কাহিনী যে সাহিত্যের মূল আশ্রয়, তেমন সাহিত্যের প্রতি আমার বিশেষ আস্থা নেই। ‘বহির্বিশ্বের যোগস্পর্শহীন পরগাছা সমাজের নায়ক’ একটি অশ্রদ্ধেয় জীব। ‘এ-জাতীয় ব্যক্তির যেকোনও হীন তথাকথিত মন-দেওয়া-নেওয়ার কাহিনী শোনবার মত আমাদের না আছে ধৈর্য, না আছে অবসর।

আমি যা বলতে চাই নি পত্রলেখক আমার উপর তা আরোপ ক’রে কিঞ্চিৎ বিভ্রমের সৃষ্টি করেছেন। তবু তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি যে প্রবন্ধটি যত্নপূর্বক পাঠ ক’রে সময় ক’রে তার একটি নাতিদীর্ঘ প্রতিবাদ পাঠাবার ক্রেশ স্বীকার করেছেন, সেটি প্রকারান্তরে প্রবন্ধলেখকের প্রতি সচেতনতারই পরিচায়ক। পত্রটিতে সদয় বাক্যও কিছু কিছু আছে। তজ্জন্য প্রবন্ধলেখক পত্রলেখকের নিকট কৃতজ্ঞ।

“वनसूक्त”

শোনা গেল রাস্তার ধারের একটা ঘর থেকে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ডানা। মনে হ'ল, মুরগীটা যেন তাকে আর অগ্রসর হতে মানা করছে, সে যেন অনধিকার প্রবেশ করেছে কোথাও। মনে পড়ল, অনেক দিন আগে রাজি দশটার পর সে একবার পথ ভুলে একটা ব্যাক্সের সামনে এসে পড়েছিল। ব্যাক্সের গ্রহরী চিংকার ক'রে উঠেছিল—হুকুম দার! (who comes there)। এই মুরগীও যেন বলছে—হুকুম দার। ডানা সত্যিই ইতস্তত করতে লাগল, আর অগ্রসর হওয়া উচিত কি না। পর-মুহূর্তেই একযোগে অনেকগুলো পাখি একসঙ্গে ডেকে উঠল, তার এই ইতস্তত ভাব দেখে একযোগে হেসে উঠল যেন একদল তরুণী অন্ধকার যবনিকার আড়াল থেকে। ডানার চোখে পড়ল পূর্বাকাশে উষার অরুণিমা আভাসিত হয়েছে। আর বেশি দূর অগ্রসর হওয়া সমীচীন মনে হ'ল না তার। সে ফিরতে লাগল। আবার যখন ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোর কাছে ফিরে এল, তখন বেশ আলো হয়েছে। গেট কিন্তু তখনও খোলে নি। যে বারান্দার উপর প্রথমে বসে ছিল, সেখানে গিয়েই বসল আবার। অনেকক্ষণ বসেই রইল। মনে হতে লাগল, এভাবে কোনও খবর না দিয়ে চ'লে আসাটা ঠিক হয় নি। এও হতে পারে যে, ভাস্কর এখানে নেই, কোনও জরুরী দরকারে আবার বেরুতে হয়েছে তাকে রাজে। এই সব ভাবছে, এমন সময় এক কাণ্ড হ'ল। একটি অল্প-বয়সী কালো মেয়ে ভাস্করের গেট খুলে বেরিয়ে এল। মেয়েটি কালো, কিন্তু সুন্দরী। পিঠের উপর লম্বা বেগী ছলছে, ডানার হঠাৎ একটা উপমা মনে হ'ল—‘কাল-ভুজঙ্গিনী’। মেয়েটি তার দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল। পরনে একটা ছাপা শাড়ি, গায়ের জামাও ছাপা শিল্পের। খুব ডগমগে রঙ। চোখে মুখে একটা ক্লাস্তির ছাপ, যেন সমস্ত রাত ঘুমোয় নি। আরও যখন কাছে এল, তখন ডানাকে উঠে দাঁড়াতে হ'ল। ওর বাড়ির বারান্দাতেই সে বসে আছে না কি! দেখা গেল সত্যিই তাই। মেয়েটি কাছে এসে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ডানার দিকে চাইতেই ডানা হেসে হাত ভুলে নমস্কার করলে।

মেয়েটি উত্তর দিলে ইংরেজীতে। ইংরেজীতেই আলাপ হ'ল।

শুভ মর্নিং। কোন দরকার আছে কি?

আমি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আপনার পরিচয় জানতে পারি কি?

মেয়েটি মুচকি হেসে বললে, আমি নার্স। এইখানেই থাকি।

এ বাড়ি আপনার?

হ্যাঁ। ভাড়া। আমি বিদেশিনী, এখানে প্র্যাকটিস করবার জন্তে এসেছি।

ও! আপনাকে ওই বাড়ির গেট থেকে বেরুতে দেখলাম। মিস্টার বস্ কি অসুস্থ নাকি?

আবার মুচকি হাসল মেয়েটি।

অসুস্থ হয়েছেই কাল রাতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে। কিন্তু গিয়ে দেখলাম, বিশেষ কিছু নয়। একটু বেশি 'ড্রিংক' করেছিলেন। কথাটা বলা হয়তো উচিত হ'ল না। কথাটা অসুগ্রহ করে গোপন রাখবেন। আপনি কেন এসেছেন জানতে পারি কি?

আমি ওর পুরাতন বান্ধবী। দেখা করতে এসেছি।

আই সি। উনি খুশ্ছেন এখন। আপনি ভিতরে গিয়ে ড্রইং-রুমে অপেক্ষা করতে পারেন। এর আগে এসেছিলেন কখনও?

একবার এসেছিলাম।

আচ্ছা, একসকিউজ মি।

আর কোন কথা না ব'লে মেয়েটি ভিতরে চ'লে গেল। মনে হ'ল, কথার ধরনে এবার যেন একটু উষ্ণতা প্রকাশ পেল।

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডানা। যে ভেলাটি অবলম্বন করে সে ডাসছিল, সেটাও ডুবে গেল নাকি।

ড্রইং-রুমে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় নি ডানাকে। চাপরাসীর মারফৎ নামটা পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ভাস্কর বস্তু বেরিয়ে এলেন।

এ কি! ডানা! এ যে অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য! এখন কি করে এলে?

ট্রেনে।

এর পর কি বলবে ডানা ভেবে পেল না, চুপ করে গেল। এমন অসময়ে কোনও ধরনের দিলে চ'লে আসার সত্য হেতুটা অকপটে বিবৃত করা সমীচীন হবে ব'লে তার মনে হল না। কিন্তু কি বলবে তাও তো সে ভেবে আসে নি। চুপ করেই রইল তাই।

ট্রেনে? তার মানে রাত আড়াইটার সময় এখানে পৌছেছে। ব্যাপার কি?

কিছুই নয়, এমন। ইচ্ছে হ'ল, চ'লে এলাম।

বেশ করেছ। চল, চা খাওয়া যাক। আমাকে আবার এখনি বেরুতে হবে। একটা গ্রামে দাঙ্গা হয়ে গেছে।

এবার ডানা যেন একটু আত্মসচেতন হ'ল। কেতাব-দুয়ন্ত ভাবায় বললে, আমি আপাত্তে তোমার কর্তব্যে কোন বাধা সৃষ্টি হবে না আশা করি।

বাধা হবে কেন? তুমিও সঙ্গে থাকবে আমার। আমার নীরস কর্তব্য সরস হয়ে উঠবে তা হ'লে। আর কালকের যে আলোচনাটা মূলতুবি আছে, সেটাও হয়তো সেয়ে ফেলা যাবে। আমার কাজ খুব বেশি নেই, শুধু একবার যাওয়া দরকার। পুলিশ বা করবার করে কেলেছে এতক্ষণ। এস, চা-পর্বটি সেয়ে ফেলা যাক। চান করবে নাকি?

কাপড়চোপড় তো জানি নি। একটু হাত মুখ ধুয়ে নিলেই চলবে।

এস তা হ'লে। আমিও কামিয়ে নি।

প্রায় ঘণ্টা চারেক পরে ডাকবাংলোর প্রশস্ত বারান্দায় একটা ক্যাম্প-চেয়ারে আনত নয়নে বসে ছিল ডানা। ভাস্কর বস্তু পাশেই আর একটা ক্যাম্প-চেয়ারে ঠেস দিয়ে কথা ব'লে চলেছিলেন। তাঁর কথার ধরনে যে সরল আন্তরিকতা ফুটে উঠছিল, তা ডানার হৃদয়কে স্পর্শ করছিল কি না তা তিনি ঠিক বুঝতে পারছিলেন না। ডানা নির্বাক হয়ে আনত নয়নে চুপ করে বসে ছিল। বুঝতে পারছিলেন না ব'লে ভাস্করের বক্তব্য যেন আরও আবগম্য হয়ে উঠছিল।

ভাস্কর বলছিলেন, তোমাকে বিয়ে করব ব'লেই আমি এতকাল প্রতীক্ষা করে আছি। কেন জানি না, আমার বিশ্বাস ছিল তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবেই। বিয়ে

করবার অনেক সুযোগ পেয়েছি, এখনও পাচ্ছি; কিন্তু তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব—এ কল্পনা কখনও করি নি। তুমি কোনও কথা বলছ না যে? যদি কিছু জানতে চাও আমার বিষয়ে, বল সেটা।

ডানা হেসে বললে, যা জানতে ইচ্ছে করছে তা জিজ্ঞাসা করতে সঙ্কোচও হচ্ছে যে! যাদের বিয়ে করবার সুযোগ তুমি পেয়েছ বা পাচ্ছ, তাদের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কি রকম?

ভাস্করের চোখের দৃষ্টিতে কোঁতকের ছটা লাগল।

তোমার কাছে কিছুই গোপন করব না। বার্মা থেকে চ'লে আসার পর অনেক ঘাটের জল খেতে হয়েছে আমাকে। বার্মা থেকে পালিয়ে এসে আমি মিলিটারিতে যোগ দিয়ে নানা দেশে ঘুরেছি। তারপর বিলেতে পড়াশোনা করেছি। তারপর এই চাকরি। আমি সমর্থ যুবক, দৈহিক ক্ষুধার দাবি আছে, সে দাবি মেটাতে আমি ইতস্ততও করি নি কখনও। হাটে বাজারে হোটেলে রেস্তোরাঁয় যখন যেখানে যেমন জুটেছে। তবে ওগুলো নিতান্ত দৈহিক, সাময়িক ব্যাপার, মনের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। কোনও অসুখও আমার হয় নি।

ডানার মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। অল্প দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে চুপ করে বসে রইল-সে। ভাস্কর আবার বললেন, ওসব বিষয়ে আমার কুসংস্কারও নেই। মানে, তোমারও জীবনে যদি ওসব ঘটে থাকে সেটাকে নিতান্ত স্বাভাবিক ঘটনা বলেই আমি মেনে নেব। শুচিবায়ুগ্রস্ত লোক আমি নই।

ডানা তবু নীরবে বসে রইল। একটা কথাই তার মনে হতে লাগল, রূপচাঁদই নবরূপে দেখা দিয়েছে আবার।

একেবারে চুপ করে গেলে যে? কোনও কথাই বলছ না?

মুহূ হেসে ডানা বললে, বলবার আর কি আছে! চল, এবার ওঠা দাক।

আমার প্রস্তাবটা তা হ'লে—

পরে জানাব। এখন চল। এখনি ট্রেন আছে একটা, আমি চ'লে যাই। তুমি আমাকে টেশনে পৌঁছে দাও।

ডানার মুখের দিকে চেয়ে ভাস্কর আর কিছু বলতে সাহস করলেন না।

২১

ডানা একা একটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় বসে ছিল। ভাবছিল, যা সে এতদিন কামনা করছিল তার সবই হ'ল, রূপচাঁদ শাস্তি পেয়ে তার জীবন থেকে ন'রে যাচ্ছেন, কবির কল্পনা-স্রোত অগ্র খাতে বইছে, তাকে নিয়ে তিনি আর কবিতা লিখবেন না, তার কলেজের বন্ধু ভাস্কর ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে ফিরে এসে তাকে বিয়ে করবার জন্তে সাধাসাধি করছে—কিন্তু সে যেমন ছিল তেমনি র'য়ে গেল, তার জীবনের সমস্তার সমাধান হ'ল কই? কিছুই তো হ'ল না। নিজেই নিতান্ত রিক্ত নিঃস্ব মনে হতে লাগল। হঠাৎ মনে হ'ল, আর কেউ না থাক, সন্ন্যাসী ঠাকুর আছেন। সন্ন্যাসীর নানা কথাই ঘুরে ফিরে আগতে লাগল মনের ভিতর। মেঘের মত প্রসারিত হতে লাগল নানা আকারে।

বাড়ি এসে যখন পৌঁছল, তখন বেলা প্রায় তিনটে। দেখল, চাকরটা বারান্দায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে। তার ডাকে তাড়াতাড়ি উঠে বসল সে।

রূপচাঁদবাবু আর তাঁর স্ত্রী কতক্ষণ ছিলেন কাল?

তা তো জানি না মা। আমি এসে দেখলাম, কেউ নেই। পাখিটাও নিয়ে গেছেন।

আজ কেউ এসেছিল?

একটু আগে ওই গঙ্গার ধারের বাবাজী এসেছিলেন। তিনি একটা বাক্স আর চিঠি রেখে গেছেন।

কি বাক্স?

ওই যে ঘরে রেখে দিয়েছি। খুব ভারী। নতুন তোরঙ্গ একটা।—একটি খামের চিঠি সে ডানার হাতে দিল। চিঠিটা হাতে করে ডানা ঘরের ভিতর ঢুকেই দেখতে পেল তোরঙ্গটি। এইটেই তো কাঁধে করে কাল আসছিলেন তিনি। চিঠিটা খুলে পড়তে লাগল সে।

শ্রীমতী ডানা,

আমি এবার চললাম। আর সম্ভবত তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। আমার কিছু সম্পত্তি এখানে ছিল, তারই ব্যবস্থা করতে এসেছিলাম। কিন্তু কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ হয়ে গেল সব। তুমি বিপন্ন মুখে বার বার আমার কাছে আসতে সাহায্যের জন্য, উপদেশের জন্য। কিন্তু আমি সামান্য মানুষ, নিজেই অসহায়,

২২

তোমাকে কি সাহায্য করব তা ভেবেই পেতাম না। অথচ কিছু করবার জন্তও মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠত। তুমি একদিন বলেছিলে যে, কিছু টাকা পেলে নাকি তোমার সমস্তার সমাধান হয়ে যায়। সেই দিনই আমি ভেবেছিলাম যে, এখানে আমার যা কিছু আছে তা তোমাকেই দিয়ে যাব। কিন্তু দেব বললেই চট করে দেওয়া যায় না। অনেক দিন ধরে এর জন্ত আয়োজন করতে হয়েছে। একটা সামান্য শাবল যোগাড় করতেই বেশ কয়েক দিন লেগে গেল। যে ঘরটায় তুমি আছ, আর এই ভাড়া ঘরটা যেখানে আমি আছি এ দুটোই আমার সম্পত্তি। এর সংলগ্ন কিছু জমিও। ঠিক কত জমি আমার জানা নেই, তুমি পুরাতন দলিল খোঁজ করলেই জানতে পারবে। আমি সদরে গিয়ে আমার এখানকার সমস্ত সম্পত্তি তোমার নামে দানপত্র করে দিয়ে এলাম। পোস্ট-আপিসের টাকাগুলোও তুমি পাবে। এই তোরজের ভিত্তর সমস্ত দলিল আছে। আমি সদরের উকিল হরনাথ মল্লিককে আমার 'পাওয়ার অব এটর্নি' দিয়ে এসেছি। তিনি রেজিস্ট্রি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার করে দেবেন। এ ছাড়াও আরও কিছু টাকা তোমাকে দিয়ে পেলাম। মায়ের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছিলাম তাতে লেখা ছিল যে, গঙ্গার ধারের এই প'ড়ো বাড়িটার মেঝেতে এক ঘড়া মোহর আছে। আমাদের কোনও পূর্বপুরুষ নাকি এটা সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। মোহর আছে কি না দেখবার জন্তেই শাবল সংগ্রহ করতে হ'ল আমাদের। চিঠির নির্দেশ অনুসারে খুঁড়ে দেখলাম, সত্যিই আছে। একটা প্রকাণ্ড তামার ঘড়ায় দু হাজার মোহর। মোহরগুলো তোমাকে দেবার জন্তে একটা মজবুত তোরজ কিনতে হ'ল। ওর ভিত্তর সমস্ত মোহরগুলো, আমার পোস্ট-আপিসের পাস-বই এবং প্রয়োজনীয় দলিল ও চিঠিপত্র সব রইল। এখন আমি সম্পূর্ণ নিঃশ্ব। সমস্ত মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সর্বাঙ্গতঃ করণে তোমার মঙ্গল কামনা করে আমি বিদায় নিলাম। ভগবান তোমাকে স্বীকৃতি করুন। ইতি

শ্রীবিখনাথ ভট্টাচার্য

ডানা স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল।

তিন মাস কেটে গেছে। ঘনঘোর হয়ে নেমেছে বর্ষা। শ্রাবণের নিবিড় সমারোহে আকাশ বাতাস ধ্বংসময় করছে। নদী কুলে-কুলে ভরা, সবুজের বান ডেকেছে বনে বনে। চাতক পাখি ডাকছে একটা। সমস্ত সকাল ধরে ঘুরে ফিরে ডাকছে, কখনও এ গাছে কখনও ও গাছে, কখনও কাছে কখনও দূরে। বিদেশী পাখি, বর্ষার সময় এ দেশে আসে। কবি পাখিটাকে নিয়েই মেতে আছেন সারা সকাল। দূরবীন দিয়ে দেখে দেখে তাঁর সাধ যেন আর মিটেছে না। কালো পাখি, মাথায় খুঁটি, ল্যাজটি লম্বা, ল্যাজের ডগায় সাদা সাদা বিন্দু, বুকটি সাদা—এক কথায় অপক্লপ। পাখিটা যখন দূরবীনের সীমা ছাড়িয়ে চ'লে গেল তখন কবি কবিতা লিখতে বসলেন। অনেক ভেবে ভেবে আরম্ভ করলেন—

নব জলধর হ'তে আসিলে কি নামিয়া

ওগো ও চাতক পাখি, ওগো মেঘবরণি,

ছায়া-মেঘনার স্রোতে ভাসাইয়া তরণী

একটু না থামিয়া

গাঢ় সবুজের স্রোতে খুঁজিতেছ সরণী

কিছুই না মানিয়া

গাছে গাছে দূরে কাছে কার অভিসারে গো

বল না বাথানিয়া

হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ—পিয়ো, পিয়ো, পিয়ো, পিয়ো

ডাকিছ কাহারে বারে বারে গো।

বাধা পড়ল। পিওন এসে দেখা দিল। একটা ধামের উপর অমরেশবাবুর হস্তাক্ষর দেখে উল্লসিত হয়ে উঠলেন কবি। তিনি কান্দীর থেকে ইয়োরোপ চ'লে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে কোনও চিঠিই লেখেন নি ভদ্রলোক। তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুললেন। ছোট চিঠি।

প্রীতিভাজনেষু,

অনেক কিছু দেখে দেশে ফিরেছি। এখন আছি লছমনঝোলায় একটা ধরমশালায়। বর্ষার সময় এ জায়গা মনোরম নয়। আমি এখানে এসেছি ভারতাইটার ফ্লাইক্যাচারের (Verditer Flycatcher) বাসার

সন্ধান। আর একটু আগে এসে পৌছতে পারলে ভাল হ'ত। মে-জুনেই ওদের বাসা পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। লগুনে একজন পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'ল। পাহাড়ী পাখির বিষয়ে সে গবেষণা করছে। তারই অহুরোধে ভারডাইটার ফ্লাইক্যাচারের বাসা আর ডিমের সন্ধান করছি এখানে। যদি পাঠাতে পারি, খুব খুশি হবেন তিনি। আমাদের সঙ্গে তিনি যে রকম ভ্রম ব্যবহার করেছেন তা অবর্ণনীয়। তিনি সাহায্য না করলে আমরা সমুদ্রের নানা রকম পাখি দেখতেই পেতাম না। অনেক নোট্‌স্ আর ফোটো এনেছি। সব দেখাব। একটা আশ্চর্য ব্যাপার হয়েছে কাল। পাহাড়ে কিছু দূর উঠে একটা ঝরনার ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ ডানাকে দেখতে পেলাম। ময়লা একটা গেরুয়া রঙের কাপড় প'রে ঝরনা থেকে জল তুলছে। আমার চোখকে বিশ্বাসই করতে পারি নি আমি প্রথমে। এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, ইয়া, ডানাই। জিজ্ঞাসা করলাম, এ কি, তুমি এখানে? সে মুহূ হেসে বললে, আমি আর চাকরি করতে পারলাম না। আনন্দবাবুকে সব বুঝিয়ে দিয়ে চ'লে এসেছি। জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে কি করছ? বললে, এমনিই আছি। বেশ আনন্দেই আছি। নমস্কার। আমাকে আর কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে জলের ছোট কলসীটি তুলে পাহাড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। ফিরে এসে খবরটা রত্নাকে বললাম। লোকজন পাঠিয়ে খোঁজও করলাম। কিন্তু আর তাকে ধরতে পারি নি। আমরা দুজনেই খুব বিস্মিত হয়েছি। ব্যাপারটা কি হয়েছে জানাবেন। আমরা বোধ হয় মাস-খানেক পরে ফিরব। নমস্কার জানবেন। ঠিকানা আলাদা একটা কাগজে লিখে দিলাম। পত্রপাঠমাত্র উত্তর দেবেন। ইতি

আপনাদের

অমরেশ

কবি পত্রপাঠমাত্রই উত্তর লিখতে ব'সে গেলেন।—

শ্রীতিভাজনেন্দু,

আপনার চিঠিখানা পেয়ে অনেকটা নিশ্চিত হলাম। আপনাদের কোনও খবর না পেয়ে খুব ভাবছিলাম। শ্রীমতী ডানার আচরণ সম্বন্ধেই খুব বিস্ময়কর। সে-কিছু-

দিন আগে হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। যাওয়ার আগে আপনার পক্ষী-নিবাসের সমস্ত পাখিগুলোকেও ছেড়ে দিয়ে গেছে। সে চ'লে যাওয়ার পরদিন তার চাকরটা এসে খবর দিলে যে, মাইজি কাল রাত্রে ফেরেন নি, এখনও পর্যন্ত তাঁর দেখা নেই। রাত্রে তাঁর জুড়ে রান্না ক'রে রেখেছিলাম, সে খাবারটা নষ্ট হয়েছে, আবার রান্না কি? আমি গিয়ে টেবিলের উপর ছোট একটা চিঠি পেলাম। সেটা হুবহু নকল ক'রে দিচ্ছি।—

শ্রদ্ধাস্পদেষু, এখানে প'ড়ো বাড়িতে যে সন্ন্যাসী থাকতেন, তাঁর চিঠিটা প'ড়ে দেখলে তোরঙ্গ-রহস্ত বুঝতে পারবেন। আমি আর চাকরি করব না, আমিও চললুম এখান থেকে। যাওয়ার আগে পক্ষী-নিবাসের পাখিগুলোকে মুক্তি দিয়ে যাচ্ছি, এ অধিকার রত্নাদি আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। সন্ন্যাসী যে অর্থ আমাকে দিয়ে গেছেন, তা আমি নিলাম না। আমার অহুরোধ আপনি, অমরেশবাবু আর রূপচাঁদবাবু টাকাটা ভাগ ক'রে নিয়ে নেবেন। আপনাদের তিনজনেরই মুখে একাধিক বার শুনেছি যে, টাকা পেলে আপনারা প্রত্যেকেই নিজেরদের আকাশে নাকি আরও ভালভাবে ডানা মেলতে পারবেন। আমারও আগে তাই ধারণা ছিল, এখন আর নেই। তাই টাকাগুলো আপনাদের তিনজনকেই দিয়ে গেলাম। বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য যে সহায়রাম ভট্টাচার্যের উত্তরাধিকারী, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। তাঁর বাড়ি আর জমির যে কোনও ব্যবস্থা করবার অধিকার আমি অমরেশবাবুকে দিয়ে গেলাম। আর আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই। আপনারা আমার জন্তে যা করেছেন তার স্বতি চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে আমার মনে। আপনি ও বউদিদি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন। একটি অহুরোধ, আমাকে খোঁজবার চেষ্টা করবেন না, কিংবা পুলিশে খবর দেবেন না। ঘরের চাষি চাকরটার কাছেই রইল। টাকা-কড়ির ব্যাপার তার কাছে থেকে গোপন রেখেছি। আবার প্রণাম জানাচ্ছি। ইতি আপনাদের ডানা।

ডানার চিঠির সঙ্গে সন্ন্যাসীর চিঠিও ছিল। সেটা না টুকে এমনিই পাঠিয়ে দিচ্ছি। কারণ ডাকের বেশি সময় নেই। টুকতে গেলে ডাক পাব না। ওটা হারাবেন না যেন। তোরঙ্গটা তুলে নিজের কাছে

আজি দক্ষিণ দুয়ার খোলা

কুমারেশ ঘোষ

দুপুরে খাইবার পর আরাম করিয়া খবরের কাগজটা পড়িতে গিয়াই মনটা খিঁচড়াইয়া গেল।

আসামীরা গোয়ালপাড়ায় বাঙালীদের গরু-খেদানো খেদাইতেছে। 'বঙ্গাল খেদা' রব তুলিয়াছে।

এ রব নূতন নয়।

বিহারীরা বলিয়াছে, ভাগো বাঙালী। উড়িষ্যাদেরও ওই ইচ্ছা, ভাগো বাঙালী। আসামীরা আবার শুরু করিয়াছে, ভাগো বাঙালী।

যে যার নিজের দেশ হইতে বাঙালীকে ভাগাইতে ব্যস্ত।

ব্যস্ত হইবারই কথা। নিজের মায়ের কোলে অল্প কাউকে বসিতে দেখিলে তৈলিয়া দিবার প্রবৃত্তিটাই তো আদিম ও অকৃত্রিম। স্বাভাবিকও।

স্মৃতিতেছিলাম। হঠাৎ চমক ভাঙিল যেন।

দেখি, বাঙালী চিন্তরঞ্জনর অ্যাভিনিউতে বিরাট বাড়িগুলি চোখ রাঙাইয়া বলিতেছে, ভাগো বাঙালী।

বাজারের বাজার বড়বাজারের গদিগুলি বলিতেছে, ভাগো বাঙালী।

আগিসপাড়ার কেরানী চেয়ারগুলি খটাখট শব্দ করিয়া ওই ভাল রাখিয়া বলিতেছে, ভাগো বাঙালী।

সকালে পাড়ায় পাড়ায় খবর কাগজের সাইকেলগুলো বলিতেছে, ভাগো বাঙালী।

পাড়ার মোড়ে মোড়ে পানের দোকানগুলো বলিতেছে, ভাগো বাঙালী।

ফুটপাথে চানচুরগুলোও গরম হইয়া ফুটকাট করিতেছে, ভাগো বাঙালী।

রাস্তায় প্রাইভেট বাসগুলি প্যাক প্যাক করিতেছে, ভাগো বাঙালী।

দক্ষিণপাড়ায় বাড়ির ডাড়াটিয়ারাও চিংকার করিতেছে, ভাগো বাঙালী।

সারা শহরের বাঙালী ছবিঘরগুলিও বলিতেছে, ভাগো বাঙালী।

সবাই যখন সমস্তর এই বাংলা দেশেই শুরু করিয়াছে— ভাগো বাঙালী, তখন বাঙালীরা সব নিশ্চয়ই ভাগিয়াছে। কিন্তু তাহারা গেল কোথায় ?

খুঁজিতে লাগিলাম।

এনেছি। মোহরগুলো বড় আয়রন সেক্রে রেখেছি। আপনি এলে তারপর যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে। আপনারা তাড়াতাড় চলে আসুন। প্রধানকার অন্তান্ত খবর সব ভাল। খাজনা ভালই আদায় হয়েছে। গ্রামসংস্কারের কাজে লেগেছি। সেটাও ভাল চলেছে। আপনারা উভয়ে আমার নমস্কার জানবেন। ইতি

প্রীতিবদ্ধ

শ্রীমানন্দমোহন

চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন তিনি। তারপর কবিতা লিখলেন—

কুঞ্চুড়ার চুড়ায় চুড়ায়
বহ্নিশান উড়িয়েছিল যে
আজকে দেখি শ্রাবণ মেঘে
বৃষ্টি ঝরায় সে।

বৈশাখেতে দোয়েল শ্রামা

বনে বনে যে স্বর সেধেছিল

চুনচুনি আর বুলবুলিরা

যে নীড় বেধেছিল

চাতক পাখির কণ্ঠে ওগো

তাই কি আজি জল-তরঙ্গে বাজে

ছায়ায় ঢাকা মেঘলা দিনের

নিবিড়তার মাঝে।

একই বাণী, ওগো রসিক,

বলছ তুমি নানান স্বরে স্বরে,

সামনে যখন বৃষ্টি ঝরে, দেখি

রোদ উঠেছে দূরে।

[সমাপ্ত]

হঠাৎ একটা পার্কে ভিড় দেখিয়া দাঁড়াইলাম। একটা লাল সালু টাঙানো। তাহাতে লেখা : সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্মেলন।

চুকিলাম সেই পার্কের ঘেরা বেড়ার মধ্যে। বেশি বিরাট রঙ্গমঞ্চ। তাহাতে একটি মেয়ে পেলব নাচ নাচিতেছে। নেপথ্যে গান হইতেছে : এসো হে, এসো হে, এসো হে! কয়েকজন বাস্ত লইয়া ব্যস্ত, তাহার মধ্যে তবলাবাদকটি ঘাড় ঝাঁকাইয়া খুব তবলা পিটিতেছে।

দর্শক ভরতি। দর্শকের দিকে আলো নিবানো। কাজেই তাহাদের স্পষ্ট দেখা গেল না। তবে রঙ্গমঞ্চের আলোয় দর্শকদের ঝাপসা মুখ আর আবছা পোশাক দেখিয়া বুঝিলাম, তাহারা বাঙালী, এবং তালে তালে ঘাড় নাড়া দেখিয়া বুঝিলাম, ভাবাবেগে তাহারা তরল।

বাহির হইয়া আসিলাম।

পার্কের গেটের কাছে দাঁড়াইতে হইল। কারণ রাস্তায় অন্তস্ত ভিড়। একদল পাগড়ী-মাথায় লোক রাস্তা দিয়া মিছিল করিয়া যাইতেছে। কাঁধে প্রাকার্ডে স্লোগান লেখা—ভাগো বাঙালী। তাদের মুখেও বুলি, ভাগো বাঙালী।

কিন্তু রঙ্গমঞ্চের গান অ্যাম্প্লিফায়ারে তখনও শোনা যাইতে লাগিল—এসো হে, এসো হে, এসো হে।

আমার দুই কানে দুই রকম রবই আসিয়া লাগিল। আমি হতভম্ব হইলাম।

এবার ভীত হইলাম।

কারণ হঠাৎ মিছিল ভাঙিয়া গেল। জনতা একসঙ্গে পার্কের মধ্যে আসিল। হয়তো ওই এসো হে, এসো হে গান শুনিয়া।

আমি অস্থকারে গা ঢাকা দিলাম।

জনতা হৈ-চৈ-শুরু করিল। সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য মার্কা লাল সালু ছিঁড়িয়া ফেলিল। চুকিল রঙ্গমঞ্চপে। ভিতরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পেলব-নাচ থামিয়া গেল, দর্শকরা রঙ্গমঞ্চ ভেদ করিয়া ও-ধার দিয়া পলাইতে লাগিল।

কোন দিকে গেল উহারা?

সবার অলক্ষ্যে উহাদের পিছু লইলাম।

উহারা ডায়মণ্ড হারবার রোড ধরিল। দক্ষিণে চলিয়াছে।

কিন্তু এ কি। সঙ্গীতপাগল নাকি সব?

তনি, গান করিতেছে—আজি দখিন দুয়ার খোলা।

পিছনের একটি পলায়মান, বাঙালীর কাছা ধরিয়া টানিয়া বলিলাম, ভাই, তোমাদের মুখে এ গান কেন? সে হাসিল, বলিল, আজ তো আমাদের দখিন দুয়ারই শুধু খোলা।

বলিলাম, কিসের? বঙ্গপুত্রীর?

বলিল, সে তো আছেই। এখন পশ্চিমবঙ্গের। কাটা বঙ্গের উত্তর, পূর্ব, পশ্চিমে কোথাও ঘাইবার পথ নাই। তাড়া খাইয়াছি। এখন বঙ্গজননীর কোলেও আর স্থান নাই। আমরা তাই ছুটিয়াছি বঙ্গোপসাগরের কোলে। আমাদের আজি দখিন দুয়ার খোলা।

সামনে বঙ্গোপসাগরের ঢেউ।

উত্তাল, উদ্দাম। কর্ণবিদারক গর্জন।

পিছন হইতে কানে ভাসিয়া আসিল, ভাগো বাঙালী। বাঙালী ছুটিল সামনের সেই ঢেউ লক্ষ্য করিয়া। ঝাঁপাইয়া পড়িল সেই ঢেউয়ে। কিন্তু ঢেউ ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া দিল তাহাদের বক্তৃৎস্নে।

গর্জন করিয়া উঠিল :

ভাগো বাঙালী!

রাগো বাঙালী!

লাগো বাঙালী!

বাঙালীর পেছনের আমি-বাঙালীও দিবাস্বপ্নে ঢেউয়ের ধাক্কায় পড়িয়া গিয়া জাগিয়া দেখি, খাট হইতে পড়িয়া গিয়াছি। কেহ পাছে দেখিতে পায়, তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

হৃদয়কৃষ্ণ ব্যানার্জি লেনের একটা বৈশিষ্ট্য আছে।

শুধু হৃদয়কৃষ্ণ ব্যানার্জি লেন নয়, হাওড়ার এই অঞ্চলটাই কেমন নতুন ধরনের। এ নতুন ধরনের সবার চোখে ধরা পড়বে না। ধরা পড়বে কেবল তাদেরই চোখে, যারা আসে এখানে বেড়াতে শ্রামবাজার কিংবা ভবানীপুর থেকে। যারা এখানকার বাসিন্দে, তারা এই ব্যতিক্রমের রসাতলে বঞ্চিত।

কীরোরদতলা থেকে চণ্ডা পিচঢালা রাস্তা এক দিকে গেছে হাওড়া স্টেশনের পানে আর এক দিক কদমতলায়। উল্লসাসে বাস দৌড়াদৌড়ি করে। প্রাইভেট গাড়িও ছোট্টে। হুং ঠাং করে যায় বিক্ষা। রাজপথের দু পাশে বড় বড় বাড়ি যেন মাথা পেতে নিয়েছে ধনীর অভিজাত্যের অহংকার।

কিন্তু এই কীরোরদতলা থেকে ভেতরে ঢুকে গেছে আর একটা পথ—গুলির পর গুলি শাখা ছড়িয়ে। এখানে যায় না কোন যান, বাজে না মোটরের হর্ন—কচিং হুং ঠাং করে সাবধানে অগোচর দু-একটা বিক্ষা।

উঁচু-নিচু পথ। ইট বেরিয়ে আছে। পথের পাশে এঁদের পুকুর। সবুজ তার জল। আর আছে মাঝে মধ্যে সবুজ এক-এক টুকরো জমি। কোথাও নারিকোলগাছের ভিড়। কোথাও গরু চরে।

এমনি এক রাস্তার নাম হৃদয়কৃষ্ণ ব্যানার্জি লেন।

হৃদয়কৃষ্ণ ব্যানার্জি লেনের শুরু রাস্তার বর্ষার দিনে কাদা বাঁচিয়ে লোকেরা যাতায়াত করে। পুকুর-পাড় থেকে ব্যাঙ ভাকে। বিকেলবেলায় রাস্তার মোড়ে টিউবওয়েলতলায় মেয়েদের ভিড় জমে। মাথায় কেরোসিনের টিন নিয়ে ছোকরা লছমন-ভেল বেচতে আসে,—কেরোসিন লিবে মাইজী।

ওমনি আসে ঘুটেওয়ালী, আসে ধোপা। নীলমণি দস্ত লেন থেকে এক বুড়ী আসে কাকালে মুড়ির টিন নিয়ে মুড়ি বেচতে।

সারা দুপুর হাঁক দিয়ে ঘুরে বেড়ায় ফলওয়ালী, কাচের ঢাকনা বেগুনা খাবার-ভরতি বাস্ক মাথায় ধোরে জগন্নাথ উড়িয়া। আর ধোরে বায়োঙ্কোপওয়ালী-ঘন্টা বাজিয়ে

—খিলা খিলা বাইস্কোপ খিলা। রাজারাগীর ছবি দেখো; দিল্লীকা দরবার দেখো, সীতাকীকা চরণ দেখো, রাবণরাজার যুদ্ধ দেখো—ও—।

সারা দুপুর হৃদয়কৃষ্ণ ব্যানার্জি লেন যেন উন্মুখ হয়ে থাকে এমনি এক-এক আগন্তকের অভ্যর্থনায়।

বাড়ির পুরুষেরা চলে যায় বাইরে যে যার কাজে। এ-বাড়ির মেয়েরা ও বাড়ি বেড়াতে যায়। শুয়ে বসে পান খেয়ে গল্প করে। বায়োঙ্কোপওয়ালী এলে ছেলেদের দু-একটা পয়সা দিয়ে পাঠিয়ে দেয় দেখতে; বাঁদরখেলা এলে নিজেরাই চাঁদা তুলে বাড়ির কাছে খেলা দেখে। খেলা দেখে আর কানাকানি হাসাহাসি করে। শান্তী বউ কি কেউ সে আনন্দে বাদ যায় না।

সম্প্রতি এ পাড়ায় এসেছে আর একটি আগন্তক—‘রকমারি’। সর্বদেই ভুলছে নানারকমের খেলনা—ঝুমঝুমি, বেলুন, পুতুল, প্লাষ্টিকের বোতাম, চুড়ি, সিঁদুর, কাঁটা, লাল সবুজ ফিতে, খোঁপার জাল, পুঁতির মালা।

হঠাৎ দেখলে মনে হয়, যেন একটা জীবন্ত মনিহারীর দোকান এগিয়ে আসছে। মাথায় একটা সাধা টুপি। তাঁর সামনে আর পেছনে বড় বড় করে লেখা—‘রকমারি’।

কেমন এক রকম টান দিয়ে লোকটা হাঁকে—চুড়ি, আলতা, স্নো, পাউডার, খেলনা—

স্বর বিকৃত হয় না, চিংকারও করে না; তবু সেই স্বর এক মুহূর্তে কতদূর থেকে যেন ছুটে আসে। অমনি জানলা-দরজা ফাঁক করে মেয়েরা উকি দেয়। ওই আসছে ‘রকমারি’। ওই সাধা টুপি,—তারই নোচে ছুটি টানা চোখ আর রোদে-পোড়া কান্ড একটা মুখ।

সুতীই বড় ভাল লোকটি। অল্প বয়েস। লজ্জা-লজ্জা ভাব। তরুণী মেয়েদের পানে মুখ তুলে কথা কহিতে পারে না। বর্ষীয়সীদের কাছে পেলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। দর-দস্তুর প্রায় তাদেরই সঙ্গে।

রকমারির মালিক নবীনকিশোর। এদেশ-ওদেশ করে নানা জায়গা ঘুরে পাঁচ বছর পর এসেছিল কলকাতায়।

কলকাতা থেকে এখন এসে ডেরা বেঁধেছে হাওড়ায়, কদমতলার কাছেই কি একটা গলিতে।

সারা দিন নিখাস ফেলবার সময় নেই। গোটা দোকানটা কাঁধে ক'রে তাকে ঘুরতে হয় পথে পথে অগিতে গলিতে। একদিন না বেরুনো মানেই এক দিনের উপায় বন্ধ। সেদিন হয়তো উপবাস। তাই শরীরের ক্লান্তি মনের গ্লানি উপেক্ষা ক'রেও রোজ তাকে ঘুরতে হয়। রোজ হাঁকতে হয় একই সুরে—চুড়ি-আলতা-স্নো-পাউডার-খেলনা—

সকালের দিকে ঘোরে বাজারে। তারপর দুপুরের দিকে ফিরে এসে কোন রকমে দুটো ভাত মুখে দিয়েই বেরিয়ে পড়ে। বেলাবেলিই বেরুতে হয়। কারণ হাওড়ার এক-একটা পল্লী এক-একদিনে ঘুরে আসতেই হবে। তাও অত্যন্ত অল্প সময়। বেলা একটা থেকে চারটে। চারটে বাজলেই আর গিন্নীমাদের মন মিলবে না। তখন তাঁরা রান্নাঘর আর কলতলা শুরু করেন। উঠুনে আঁচ পড়ে। পাঁচটার পরই-কর্তারা ফিরবেন, তার আগেই ইস্কুল থেকে ফিরবে ছেলেমেয়ে।

নবীনকিশোর দ্রুতপায়ে হাঁটে। বড় রাস্তা পার হয়েই ঢুকে পড়ে লেন-বাইলেনের মধ্যে। দু-একটা কুকুর ঘেউ-ঘেউ ক'রে আসে। নবীনকিশোর সুর ক'রে হাঁকে—চুড়ি-আলতা-স্নো-পাউডার-খেলনা—

এ-বাড়ি ও-বাড়ি প্রায় সব বাড়ি থেকেই ডাক আসে। ডাক আসে 'রাধাকৃষ্ণ' থেকেও।

টালির-ছাত ছোট্ট একটি বাড়ির কালো রঙের জানলার ভেতর থেকে ছুটি লুক চোখের দৃষ্টি ওই ডাকে চঞ্চল হয়ে ওঠে। কোন রকমে হাতের ইশারা ক'রেই বধু অদৃষ্ট হয়ে যায়।

নবীনকিশোর এসে দাঁড়ায় রাধাকৃষ্ণের দ্বারে।

ভেতর থেকে চঞ্চল হাতে কে যেন খিল খুলে দিয়েই ন'রে দাঁড়ায়। নবীনকিশোর দেখে, সামনে বর্ষায়সী একজন। কোলে তাঁর শিশুপুত্র।

কি এনেছ গো আজ? কই তোমার মেই কার্ঠের রেলগাড়ি?

নবীনকিশোর ইতস্তত ক'রে বলে, সেটা বিক্রি হয়ে গেছে মা।

তবে আর কি নেব বাছা? ই্যা দাছভাই, তোমার গাড়ি তো নেই। কি নেবে তা হ'লে? বেলুন নেবে? তাই দাও বাছা।

নবীনকিশোর একটা বেলুন স্ততোয় বেঁধে এগিয়ে দেয়।

ও বউমা, কোথায় গেলো?

কাছেই একটা খর দিনরিন ক'রে উঠল : এই যে মা।

আলতা রাখবে নাকি?

বধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

দেখ তা হ'লে।

বেলুন হাতে পেয়ে ছরস্ত শিশু কখন নেমে পড়েছে কোল থেকে।

ও মা! ছেলে কোথা গেল। ও দাছভাই—

গিন্নীমা ছোট্ট শিশুর পিছু পিছু।

মাথার কাপড় সংযত ক'রে বধু এক-পা এক-পা ক'রে এগিয়ে আসে। একবার বুঝি তাকায়ও নবীনকিশোরের পানে।

নিচু গলায় বলে, সেদিন যে কুম্‌কুম আনতে বলেছিলাম?

এনেছি।

নবীনকিশোর ছোট্ট একটা কুম্‌কুমের শিশি কাঁধের ঝুলি থেকে বার ক'রে দেয়।

হাতে নিয়েই বধু খপ করে শিশিটা লুকিয়ে ফেলে। একটু লাজুক হাসি হেসে বলে, এটার দাম কিন্তু আজ দেব না। কাল পরশু নিও।

নবীনকিশোর রাজী হয়।

নাতিকে প্রেস্তার করে শাশুড়ী ফিরে আসেন।

আলতা নিলে বউমা?

ই্যা মা, দেখুন কী স্নমর! আলতা নিয়ে বধু ঢুকে পড়ে। গিন্নীমা আঁচল থেকে পরস্রা বের করেন।

'রাধাকৃষ্ণ' থেকে বেরিয়ে নবীনকিশোর এগিয়ে চলে। হৃদয়ক্লক ব্যানার্জি লেনের অনেক বাড়িতে এখনও অনেক অশান্ত হৃদয় অপেক্ষা করছে।

নবীনকিশোর হাঁকে—চুড়ি-আলতা-স্নো-পাউডার-খেলনা—

সারা দিনের পর সন্ধ্যাবেলা নবীনকিশোর ক্লান্ত

অবসন্ন দেহে ফিরে আসে। বতটা পরিশ্রম ততটা উপায় নয়। সব ঘরেই তার ডাক। সবাই তার সব জিনিসই নেড়ে-চেড়ে দেখে, কিন্তু কেনে আর কজন? যা কেনে তা তো ওই চুড়ি আলতা আর খোঁপার জাল, নয়তো ছোটো বেলুন একটা ঝুমঝুমি।

শ্রী মনোরমা তাড়াতাড়ি পাখা হাতে নিয়ে কাছে এসে বসে। কত কি বিক্রি হ'ল আগ্রহভরে শোনে। শোনে কত বাড়ির কত বউ-ঝি়ের গল্প।

মনোরমা কোনদিনই ঘরের বাইরে যেতে পারে না। তবু স্বামীর মুখে গল্প শুনে শুনে অল্প অল্প অঞ্চলের চেয়ে হৃদয়ক্লমক ব্যানার্জি লেনের প্রতীতি বাড়ি—প্রতীতি জন যেন তার চোখের সামনে ভাসে। হৃদতো রাধাকৃষ্ণের সেই বধু, সেই গিন্নীমা, সেই হ্রস্ব শিশুটিও কল্পনায় মনোরমার হৃদয় অধিকার করে বসে।

নবীনকিশোরের বেরোবার কোনও বাঁধাধরা ছক নেই। ছক মোটামুটি হৃদতো একটা আছে। কিন্তু যেখানেই যাক, একবার হৃদয়ক্লমক ব্যানার্জি লেন হয়ে তাকে যেতেই হয়। বিশেষ ওই রাধাকৃষ্ণ। ওই কালো জ্ঞানলাটির ধারে বসে বধু যেন ঠিক একই সময়ে রোজ তারই প্রতীক্ষা করে।

কই মাথার কাঁটা?

নবীনকিশোর সেই দিনই সকালবেলায় কলকাতা থেকে ভাল কাঁটা আনিয়েছিল। কাঁটা হাতে পেয়ে বধু খুশিতে উচ্ছল হয়ে ওঠে। বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে দ্রুত পায়ে চ'লে যায় গিন্নীমার কাছে।

বাইরে দাঁড়িয়ে নবীনকিশোর শোনে বধুর মিহি গলা—দেখুন মা, কি সুন্দর কাঁটা!

একটু পরেই ফিরে আসে, খোঁপায় গোঁজা নতুন ঝুমকো কাঁটা। সম্ভবপূর্ণে খেলনা ফিতে চিক্রনি হাতে করে সরিয়ে সরিয়ে দেখে। হু চোখে খুশির নেশা—লুক্ক দৃষ্টি চক্‌চক্ করে। ইচ্ছে করে, যেন সবই নিয়ে নেয়। কিন্তু তার তো উপায় নেই।

চুড়ি আছে? ভাল চুড়ি?

হ্যাঁ।—এক গাধা লাল নীল হলদে কাঁচের চুড়ি নবীনকিশোর এগিয়ে দেয়।

বধু মাথা নাড়ে।—থাকগে, অল্প দিন নেব।

ঝুমকো-কাঁটার দায় নিয়ে নবীনকিশোর খেলনা কাঁখে তুলে বেরিয়ে আসে। মনে মনে ভাবে, আরও নতুন নতুন জিনিস আনবে। নতুন ভাল চুড়ি এক জোড়া।

আবার তার সেই কণ্ঠস্বর বেজে ওঠে নিবিবিলি—
গলি-পথে—চুড়ি-আলতা-স্নো-পাউডার-খে-লু-না—

দু-তিনটে দিন খেলনাগুলার আর ওরিকে যাওয়া হ'ল না। দু-তিনটে দিন, মনোরমা লক্ষ্য করল, বিক্রিটাও কেমন প'ড়ে গিয়েছে। ভাবলে, একদিন স্বামীকে জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু জিজ্ঞেস করবার দরকার হ'ল না, পরের দিন হঠাৎ অসময়ে নবীনকিশোর এক রাশ নতুন খেলনা-পতর নিয়ে বাড়ি ঢুকল।

মনোরমা প্রথমে আশ্চর্য হয়ে গেল। তারপর খুশিতে চোখে নেচে উঠল।—এত খেলনা!

নবীনকিশোর বললে, হ্যাঁ, আর পুরনো খেলনার খদ্দেরের মন ওঠে না। এখনকার বাচ্চা ছেলেদেরও রুচি বদলে গেছে। তাই একদিন ধরে কিছু টাকা যোগাড় করে কিছু পুরনো খেলনার বদলে এই সব নিয়ে এলাম।

মনোরমা এটা ওটা নাড়তে নাড়তে হঠাৎ সেই খেলনার ভেতর থেকে আবিষ্কার করলে সুন্দর এক জোড়া চুড়ি। লাল টুকটুকে চুড়ি। গায়ে তার সোনালী রঙের কত নকশা! সচরাচর এ ধরনের চুড়ি চোখে পড়ে না।

মনোরমা চুড়ি-জোড়া হাতে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

নবীনকিশোর তখন একমনে নতুন খেলনার লিস্ট তৈরি করছিল, মনোরমা আবদার করে বললে, এই চুড়িটা কিন্তু আমি নেব।

চমক ভাঙল। হঠাৎই যেন চমক ভাঙল নবীনকিশোরের। মনোরমা আবদার করছে। এই বোধ হয় তার প্রথম চাপুয়া—তাদের পাঁচ বছরের দারিদ্র্যকটকিত দাম্পত্যজীবনে বোধ হয় এই প্রথম মনোরমার সাধ!

তবুও—

ইতস্তত করে বললে, ওটা যে বিক্রি হয়ে গেছে। আগে থেকে বায়না ছিল কিনা।

মনোরমা আর কিছু বললে না। আস্তে আস্তে হাত থেকে চুড়িগাছটা খুলে রেখে দিলে।

পরের দিন দ্বিপ্রহরে আবার নবীনকিশোরের স্বর
বেঞ্জে উঠল, স্নো-পাউডার-খেলনা-চুড়ি—

কিন্তু আজ যেন তেমন ভাবে স্বর ফুটছে না। কোথায়
যেন ভাল কেটে যাচ্ছে।

অথচ উৎসাহ তো তার কম ছিল না। গত কালও
সে কি এক দুর্বল প্রেরণায় দোকানে দোকানে ঘুরেছে,
খেলনা কিনেছে, মাথার কাঁটা কিনেছে, জলছবি কিনেছে,
আর কিনেছে ওই লাল চুড়ি-জোড়াটা।

কিন্তু সে উৎসাহ আজ কোথায় গেল? হঠাৎ এ কি
হ'ল তার?

রাধাকৃষ্ণ। ওই রাধাকৃষ্ণ দেখা যায়। অল্প দিন
দূর থেকেই বুকটা কেমন করে। আজও করছে। কিন্তু
সুস্থানেও ছন্দপতন। কেবলই যেন মনে হচ্ছে, আজ
যেন তার মস্ত বড় পরাজয়।

কিন্তু কার কাছে?

মনোরমা! মনোরমাকে আজ বড় বেশী মনে
পড়ছে ক্ষণে ক্ষণে। মনোরমা এই চুড়ি-জোড়াটা
চেয়েছিল। মনোরমা খুলে দিল নিজের হাত থেকে।
মনোরমাকে আজ ও মিথ্যা বলেছে, 'আগে থেকে বায়না
ছিল কিনা।'

নবীনকিশোর এবার জোর করে মন থেকে ঝেড়ে
ফেলে দুর্বলতা। প্রবলতর দুর্বলতা যে তাকে টানছে।

স্নো—পাউডার—খেলনা—চুড়ি—

আবার নবীনকিশোরের কণ্ঠ কেঁপে ওঠে।

বধু আজও ছিল সেই জানলায়। খেলনাওয়ালাকে
দেখে তেমনই ক'রেই ছুটে এল।

মা, রকমারি এসেছে।—ব'লেই বধু ফিরে তাকাল
নবীনকিশোরের পানে।

এ কদিন আস নি যে?

নবীনকিশোরের কণ্ঠ থেকে আজ আর স্বর বেরুল
না।

বধু খেলনা বাছতে লাগল, নকল মুক্তোর হার-ছড়াটা
নিরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল, মীনা-করা পেতলের
আংটিগুলো পরতে লাগল। কিন্তু কোনটা রেখে কোনটা
নেবে?

এত নতুন জিনিস এনেছ?

চমকে উঠল নবীনকিশোর। ঠিক এমনি সুরে কালই
যেন মনোরমাও জিজ্ঞেস করেছিল, এত খেলনা!

কিন্তু কার জন্তে এত খেলনা? কে তাকে বলেছিল
আনতে? কে বলেছিল তাকে একদিন হাওড়া ছেড়ে
কলকাতার বড় বড় দোকানে ঘুরে মরতে? কার নথ
রঙিন করার জন্তে সে কিনে এনেছে দামী কুম্ভুম?

হঠাৎ কেমন ক'রে বধুর চোখে পড়ল লাল চুড়ি-
জোড়াটা, অমনি উৎফুল্ল হয়ে উঠল।—ওমা কি সুন্দর
চুড়ি!

সত্যিই বড় সুন্দর চুড়ি-জোড়াটা। লাল টুকটুকে রঙ,
তার ওপর সোনার রঙের কত নকশা! অনেক কষ্টে
নিজের মনের মত পছন্দ ক'রে নবীনকিশোর যোগাড়
ক'রে এনেছিল মাত্র এই এক জোড়া চুড়ি। এর জন্তে যে
দাম সে দিয়েছে, পরিভ্রমের মূল্য বাদ দিয়েও সে দামে
কোন সাধারণ গৃহস্থবধু শখ করে সে চুড়ি কিনবে না।

তবু নবীনকিশোর প্রস্তুত ছিল। লোকমান দিয়েও
সে তৃপ্তি আনায় করবে। এমনি দারুণ আশা!

কিন্তু—

বধু বললে, দেখি দেখি চুড়িটা। ওমা এতক্ষণ বল নি
যে?

কেমন একটু সংকুচিত হয়ে পড়ল নবীনকিশোর।
সুদূর কদমতলার কোন এক অখ্যাত গলির প্রায়াক্ষকার
কক্ষ থেকে কেমন ক'রে আবার ভেসে এল একখানা মুখ।
বড় স্নিগ্ধ।

নবীনকিশোর হান হান। বললে, ওটা বিক্রির জন্তে
নয়।

দারুণ বিষয়ে বধুর কালো জু বঁকে উঠল।—তবে?

তেমনই হানল খেলনাওয়ালা। বললে, এমনিই আছে
ওটা।

এমনি! বধুর ফরসা মুখে একটা বাঁকা হাসি টোল
খেয়ে উঠল। বল, অত্ন কারও জন্তে?

বধু দাঁড়াল না। চ'লে গেল।

আজ বড় বেলাবেলি নবীনকিশোর বাড়ি ফিরল।
তেমন কিছুই পরিভ্রম হয় নি, তবু মনে হচ্ছে যেন বড়ো
ক্লান্ত।

কাঁধ থেকে বাঁশের খুঁটোটা দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে
নামিয়ে রেখে নবীনকিশোর কেমন এক রকম উদাস দৃষ্টিতে
তাকিয়ে রইল।

মনোরমা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, এ কি, এত
ভাড়াভাড়ি কিরলে যে?

নবীনকিশোর বললে, আর এখানে তেমন বিক্রি নেই।
কাল থেকে হাওড়া ছেড়ে অন্ত কোথাও চলে যাব ভাবছি।

মনোরমা কিছুক্ষণ নিঃশব্দে নবীনকিশোরের পানে
তাকিয়ে রইল। তারপর অল্প দিনের মত আঙ্গু
খেলনার লিস্ট নিয়ে মেলাতে লাগল।

না, সত্যিই আজ একেবারে কিছু বিক্রি হয় নি। সেই
লাল চুড়ি-জোড়াটাও না।

পরের দিন হাওড়া ছাড়ার সময়ে ট্রেনে বসে নবীন-
কিশোর খোলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে
অনেক কিছুই ভাবছিল।

বড় আশ্চর্য যুক্তিহীন মানুষের জীবনের এক-একটা
অতি সাধারণ ঘটনা। কিন্তু—

কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্যের কথা, মনোরমা সেই
কাচের চুড়ি-জোড়াটা ফিরে আসতে যেখেনে কিছু জিজ্ঞেস
করে নি। নবীনকিশোর নিজেও বলে নি সে চুড়ি পরতে।

মেয়েটা

আবু জাকর ওবায়দুল্লাহ

মেয়েটার বর মরেছে

আর বছর,

মেয়েটার ঘর পুড়েছে,

তার খবর

এ গাঁয়ের জানে সবাই

পাঁচজনে,

মেয়েটার মা মরেছে

সেই সনে।

মেয়েটা কাঁদতো শুধু,

হাসত না,

মেয়েটার নাম তোমাদের

বলব না।

মেয়েটার বলতে আছে

এক ছেলে,

হামা দেয়, চলতে গেলে

যায় হেলে,

একদিন খামল তাও—

তাই শুনে

কঁদেছে পাড়ার লোকে

পাঁচজনে।

মেয়েটা হাসল শুধু,

কাঁদলো না,

মেয়েটার নাম তোমাদের

বলব না।

শ্রীঅন্নবিন্দনের বন্ধিমল্ল

৩

বন্ধিমের চাকরি-জীবন

অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

পূর্বোক্তভাবে অনেক রকম শিক্ষা ও কর্মদীক্ষা নিয়ে বন্ধিম জীবনের পথে পা দিলেন। তাঁর সেই পথ-যাত্রা যদিও শুরু হ'ল জীবনের অনেক আশা ও আনন্দ ও দুর্লভ প্রতিভার দীপ্তি নিয়ে, কিন্তু সে যাত্রা সমাপ্ত হ'ল দারুণ কষ্ট ও পীড়ার মধ্যে। জীবনধারণের প্রয়োজনে চাকরি করার দুর্দান্ত খাটুনি শুরু হয়ে গেল যখন তিনি সবেমাত্র ঘোঁষনে পা দিয়েছেন। মাত্র একুশ বছর বয়সে প্রথম তিনি যশোরে গিয়ে সেই চাকরির একঘেয়ে পরিশ্রমে লাগলেন, আর সারা জীবন তাতেই লেগে থেকে ভিগ্না বহর বয়সে পৌঁছে একেবারে তার থেকে ছুটি পেলেন। তবে এই চাকরির ক্ষেত্রেও তাঁর স্বভাবগত আশ্চর্য সাফল্য তিনি বরাবরই অর্জন ক'রে গেছেন। বাইরের দিক থেকে দেখলে তাঁর ছাত্রজীবনের চেয়েও এই কর্মজীবনের ইতিহাস আরও বেশি উজ্জ্বল, কিন্তু তবুও যে তিনি এমিকের পদগৌরবে শীর্ষস্থানে উঠতে পারেন নি তার কারণ, ভারতীয়দের পক্ষে সে পথ একেবারে রুদ্ধ ছিল। কিন্তু এই চাকরিস্থানে তাঁর কর্মদক্ষতা ও বিচক্ষণতা ও বিচারবুদ্ধি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্তই অসাধারণ ব'লে স্বীকৃত হয়েছিল; আর এ কথাও সবাই জানে যে, সাধারণতই বাঙালী সিভিলিয়ানদের মত পারদর্শী ও চতুর কর্মচারী সহজে মেলে না।

যশোরে থাকতে তাঁর জীবনে একটি বিশেষ লাভও হয়েছিল, আর একটি বিশেষ ক্ষতিও হয়েছিল। লাভ এই যে, সেখানে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের মত একজন অকৃত্রিম বন্ধু জুটে গেল, এ বন্ধুই তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত সমান অটুট ছিল। আর ক্ষতি এই যে, এখানে তাঁর প্রথম জীবন মৃত্যু হ'ল। যশোর থেকে কাঁধিতে বদলি হয়ে গিয়ে আবার তিনি বিবাহ করলেন, সেই বিবাহ স্থগেরই হয়েছিল। তৃতীয় স্থান খুলনায় গিয়ে তিনি তাঁর অসাধারণ কর্মপটুতা দেখাবার উপযুক্ত সুযোগ পেলেন। সুন্দরবনের অস্বাস্থ্যকর জলাভূমি ও জঙ্গল এই জেলার মধ্যে পড়ে; সেখানকার অধিবাসীরা দুই দিক থেকে দু রকম

মারাত্মক উৎপীড়নের ফলে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিল, কেউ কিছু তার প্রতিকার করতে পারছিল না। এক দিকে চলেছিল স্থানীয় জলদস্যুদের উৎপাত, আর এক দিকে নীলকরদের অত্যাচার। নৃশংস ও পাশবিক উৎপীড়নে এরা দুই তরফ থেকে যেন পাল্লা দিয়ে চলেছিল, তবে লুণ্ঠতরাজের বিতায় জাতি হিসাবে ইউরোপীয়দের দলটাই ছিল বেশী দক্ষ; তাই মনে হচ্ছিল যে, এর জন্তে যদি পুরস্কার দিতে হয় তা হ'লে এদের দলেরই প্রথম পুরস্কার পাবার কথা। কিন্তু গুদের দুর্ভাগ্যবশত ঠিক সেই সময়ে প্রজাদের রক্ষক-রূপে বন্ধিম সেখানে গিয়ে দুই দলেরই লাভের কারবার ফাঁস ক'রে দিলেন। এই নিরীহ প্রকৃতির চিন্তাবিলাসী বাঙালী যুবক সেখানে গিয়ে অকস্মাৎ যেন আত্মরিক বিক্রম প্রকাশ ক'রে দস্যুর দলকে একধার থেকে বেঁধে ফেলতে লাগলেন, ছুনিবার জঞ্জালগুলোকে ঝেঁটিয়ে সাফ ক'রে সেই সব রক্তবীজের বাড়কে নিমূল করতে লাগলেন। তাঁর অমোঘ অস্ত্রপ্রয়োগে নীলকর দস্যুদেরও কোমর ভেঙে গেল। উৎপীড়কের দলের মধ্যে কেউবা পালাল আনাম রাজ্যে, কেউ বা বৃন্দাবনে। কিন্তু তাতেও তারা নিষ্ফল পেল না, বন্ধিম ওয়ারেন্ট বের ক'রে তাদের ধরিয়ে আনালেন। তখন নির্মম হস্তে কাউকে গুরুতর জরিমানা করলেন, কাউকে বা কারাদণ্ড দিলেন; এতে তাদের উঁচু মাথা হেঁট হয়ে গেল, অত্যাচার উৎপীড়ন করা জন্মের মত ঘুচে গেল। আর জলদস্যুরাও যে সুন্দরবনের শতাধিক নদীপথের আশেপাশে ওৎ পেতে থেকে নিরীহ যাত্রীসাধারণের দারুণ ভীতির কারণ হয়ে উঠেছিল, তাদের দলে দলে ধরপাকড় করতে থাকায় ও দলের মাথাগুলোকে জেলে সরিয়ে দিতে থাকায় এ ব্যবসা চালিয়ে যাবার কোনও সুযোগই আর রইল না। এই ভাবে জেলে দস্যুর ভয় আর ভাঙায় নীলকরের ভয় ঐ দেশ থেকে তিনি একেবারে দূর ক'রে দিলেন; খুলনা জেলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সর্বত্রই লোকে অবাধে গতিবিধি করতে থাকল। অস্ববিধার মধ্যে র'য়ে গেল কেবল সেখানকার

ম্যালেরিয়া। দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কাজ ক'রে তিনি দেখিয়ে দিলেন যে, রাজশক্তিকে যদি প্রজার মঙ্গলের জন্তে আন্তরিকভাবে কাজে লাগানো যায়, তা হ'লে তার দ্বারা কতটা সফল হতে পারে।

এর পরে বাকুইপুরে তিনি বদলি হয়ে গেলেন। এইখানে থাকতেই সাহিত্যের সেবায় রীতিমত আত্মনিয়োগ করা তাঁর শুরু হ'ল। এখানে থাকার পরে বিচারপতি প্রিন্সেপের স্থানে বেতন-কমিশনের অধ্যক্ষরূপে তিনি নিযুক্ত হলেন। গভর্নেন্ট মনে করলে যে, এতেই তাঁকে খুব একটা চরম পদমর্যাদা দেওয়া হ'ল। কিন্তু একজন ইংরেজ কর্মচারীর চেয়ে তাঁর কার্যপ্রতিভা এমনিতেই অনেক বেশী ছিল। অতঃপর তিনি গেলেন বহরমপুর, সেখান থেকে মালদহ, সেখান থেকে হুগলি জেলায়। ইতিমধ্যে তাঁর স্বপ্ন অনেক বেড়ে গেছে, কিন্তু তাঁর চাকরি-জীবন যদিও এতকাল পর্যন্ত নির্বিঘ্নেই কেটেছিল, তথাপি এর পর থেকে নানা রকম অপ্রত্যাশিত ঝড়-ঝাপটা দেখা দিতে শুরু করল। বন্ধিমের অসাধারণ কর্মনৈপুণ্য দেখে তাঁকে বিশেষ পুরস্কৃত করা হিসাবে জেলার কাজ থেকে সরিয়ে এনে সেক্রেটারিয়েটের খাস দপ্তরে নিয়োগ করা হ'ল। কিন্তু এখানে এসেই তখনকার প্রচলিত আমলতন্ত্রের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বেধে গেল। মেকলে নামে এক ইংরেজপুঞ্জব ছিল তাঁর উপরওয়াল—সে হ'ল একজন আপাদমস্তক অফিসার, কেবল অফিসারী কাজ ছাড়া তার মগজের মধ্যে আর কিছুই ঢুকত না। মনে মনে সদাই জাগ্রত ছিল ছোটলাটের গদিতে গিয়ে বসবার ক্ষীণ বাসনা, তাই অফিসের ছুটি হয়ে যাবার পরেও সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিজের অফিসে ব'সে কাজ করত। কিন্তু বন্ধিমের তেমন কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না, তাই ছুটি হয়ে যাবার পরে এক মিনিটও তিনি বিলম্ব করতেন না, তৎক্ষণাৎ কাজ বন্ধ ক'রে চ'লে যেতেন। এই কারণে মেকলে তাঁকে ডেকে একদিন ভৎসনা করে। কিন্তু বন্ধিম অবিচলচিত্তে বললেন, তুমি তো অতিরিক্ত সময়ের জন্তে এখানে ব'সে কাজ করবেই, যেহেতু তুমি হ'লে রাজার জাত, এর পরে হয়তো একদিন ছোটলাট হবে। কিন্তু আমি কেন তোমার মত অত বেশি খাটতে যাব? আমার যতটা পর্যন্ত যা হবার তা হয়েই গেছে, এর চেয়ে আর বেশী কিছু হবার নেই।

স্বতরাং নিয়মিত যা করি তাই যথেষ্ট, এর চেয়ে বেশী কিছু করতে আমি রাজী নই।

চাকরির মধ্যে স্বাধীন মনোভাব প্রকাশ করলে তার শাস্তি ভোগ করতেই হয়। বন্ধিমকে তখনই আবার হাকিমের কাজে ফিরে পাঠানো হ'ল, এবার তিনি গেলেন আলিপুর। কিন্তু এখানেও দুর্ভাগ্য তাঁর পিছু ছাড়ল না, হঠাৎ এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান প্রভুর ঔদ্ধত্যের সঙ্গে আবার তাঁর বিরোধ বেধে গেল। মনরো নামে ছিল এক জ্বরদস্ত প্রেসিডেন্সি কমিশনার, বাইরের চালচলন ইংরেজেরই মত কিন্তু চরিত্রটি বুনো নেকড়েগুলোর মত। ইডেন বাগানে বেড়াতে বেড়াতে তার সঙ্গে বন্ধিমের একবার চোখোচোখি হয়ে যায়। বন্ধিম তার দিকে চেয়ে দেখলেন, তবু তাকে সেলাম করলেন না। এই হ'ল দোষ। দেশী মানুষ মাত্রই সাহেব দেখলে সেলাম ক'রে থাকে, আর একজন ডেপুটির পক্ষে সাহেব দেখে সেলাম করা তো অবশ্যই কর্তব্য; কিন্তু বন্ধিম হয়তো এতটা জানতেন না। কিন্তু দোষ ক'রে ফেললে তার শাস্তি নিতেই হবে; কমিশনার প্রভু তৎক্ষণাৎ গভর্নেন্টে গিয়ে এস্তেলা করলেন, কাজেই বন্ধিমকে অকস্মাৎ ওখান থেকে উড়িয়ে আঁকপুয়ে বদলি ক'রে দেওয়া হ'ল। বিস্ত্রিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি চীফ সেক্রেটারিকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি কোনো মারাত্মক অপরাধ করেছি, অথবা আমার ভাল কাজের জন্তে এমনভাবে আমাকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে? স্পষ্ট ক'রে আমাকে আসল কথাটি জানিয়ে দিন, নইলে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তখনই রহস্তটা তাঁর কাছে প্রকাশ পেল।

উড়িয়ে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই আবার তিনি হুগলিতে বদলি হয়ে ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে মনরো মহাপ্রভুই বদলি হয়ে গেলেন, সম্ভবত বীণ্ড্রীষ্টের সঙ্গে নিজেকে সমান মনে ক'রে এখানকার অন্ধ পৌত্তলিকদের আলোক দিয়ে উদ্ধার করার জন্তেই তিনি অন্ত্র অভিয়ান করলেন—তাই কিছুকাল পরে বন্ধিমকে পুনরায় আলিপুরে ফিরিয়ে আনা হ'ল। কিন্তু এবার তাঁর কর্মভোগ শেষ হয়ে এসেছিল, চাকরির মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছিল। অনর্থক বিস্তর খেটে খেটে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন; তাই জীবনের বাকি সময়টা তিনি সাহিত্যসেবায় নিযুক্ত থাকবেন ব'লে মনে মনে স্থির করলেন। কিন্তু তখন পরমাণুটিও তাঁর ফুরিয়ে এসেছে। এর পরে মাত্র দুই এক বছর যাবৎ রোগে ভুগে বিস্তর যত্নগা পেয়ে তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হ'ল।

প্রিয়তমাসু

রঞ্জিতকুমার সেন

মন কথাকবি অনেক করেছি জীবন ভ'রে,
দর কিছু তাতে বেড়েছে কি, কই, মনে তো নেই।
এবার এসেছি প্রার্থীর বেশে, কিরিয়ো নাকো,
তোমার শ্রীতির ক্ষীণ কণাটিরও দাম যে অনেক :
কিনে নেব তারও সাধ্য নেই।

লুকোচুরি ক'রে মন চুরি করা জহরী নই,
কথা-ছলে তাই সূত্র খুঁজেছি ঝগড়াটারই ;
মাঝে মাঝে তুমি কিরে গেছ চূপে স্থগায় রাগে,
বুঝি নি : ভেবেছি—হেঁসেলেই বুঝি রাঁধতে গেলে !
এমনই চলেছে প্রতিবারই।

সন্ধ্যা এসেছে অবশুর্গনে লজ্জা নিয়ে,
বসেছি ছজনে বাতাবীর বনে মুখোমুখি :
তুমি আর আমি। সে কথা কি এত অল্পে ভুলি !
হঠাৎ আকাশে কালো মেঘ এল কালি হয়ে ;
জানি না হ'লে কি সত্যি স্থখী ?

তোমার 'ভূমি'রে নিঙড়ে নিতে কি দ্বিধা ছিল ?
ছিল কি কঠিন আরও বেশি ক'রে কাছে পাওয়ার !
হয়তো স্বপ্ন, দুঃশায় রাঙা ছেলেমি শুধুই,
না আছে অর্থ, বার বার তবু কি যেন খুঁজি !
মানে হয় এই দাবি-দাওয়ার ?

যুগ-যুগান্ত হয়তো মানুষ এমনই ধায়
তোমাকে কখনও হঠাৎ পাওয়ার চকিত লোভে !
স্মৃতি-তীর্থের পাশপাশে তারা আমারই মতো
তোমাকে পেয়েও তোমার শ্রীতির আশায় মরে।
একা আমি শুধু মরি না ক্ষোভে।

আজও তো সন্ধ্যা তেমনিই নিবিড়, চেয়ে দেখ :
বাতাবীর বন তেমনিই ঝোড়ুল দখিনা-বায় ;
কাছ ফেলে নয়, মুখোমুখি আজও বসলে খানিক,
এতটুকু হাসি শ্রীতির পরশে, কম কি তাও !
মন যে কেবলই তোমারে চায়।

অনন্দের

শান্তিকুমার ঘোষ

ওপারের পাহাড় যেন বোরোবুড়ের মন্দির।
গাঢ় ভূঁতরভের কুয়াশার পর্দা টানা।
নীচে গভীর শান্ত বেয়ে কান্নার মত টলটলে জল।

নীল জ'মে আছে বনের মাধায়—
তুষার পড়েছে গাছে,
শিশু-হরিণের মত মেয়েটি এগিয়ে যায় খন্দের ধারে
হরিণেরই মত হরিৎ আভা মুখে নিয়ে।

সমস্ত প্রাণ নিঃশেষ ক'রে
একটি আলো জ্বলে রাখে
শেষ কিনারে।

হৃদয় শহরে হয়তো একতরুণে
প্রেক্ষাগৃহে নেমেছে বিবর্ণ অন্ধকার ;
গোলাপী সন্ধ্যায় বোড়দোড়ের মাঠে
জকির প্রতীক্ষা ক'রে আছে ভাগ্যের জন্ত।

বাতি শেষ হয়ে আসে—
মেয়েটির গালে লাল আভা
আর একটি অশ্রুর বিন্দু।

বিষকন্যা

প্রণব মিত্র

১

কতদূর থেকে ভেসে আসে যেন একটি বিষের নদী
আর তারি ধারে বিষকন্টার ঘর ;
তহুর তনিমা অমিত লাবণি ঝরায় রাত্রিদিন
রক্তলালিম গুট-অধরে অপরূপ মধুরিমা
মেখে মেখে মন উন্নত হয়ে যায়,
ছুটে চ'লে যায় অবশ পাখায়
কোথা ভেসে আসে একটি বিষের নদী
আর তারি তীরে বিষকন্টার ঘর ।

রাতের বাতালে এলোমেলো কোন অশিব আর্তনাদ
আকাশে ছড়াল—নেমে এল কোন অতি ক্ষীণ প্রতিবাদ,
কান্না, কান্না, তারপর শুধু কান্নারা পড়ে বা'রে,
তবু হুঁকার নিয়তির মত অবারণ পথে চলা ।
অন্ধ ছু চোখ—বিকারের ঘোরে স্বপ্ন পরিক্রমা—
কায় যেন সেই ঘন নীল চোখ অন্ধকারেও জ্বলে,
সে যেন অতল পাতালপুরীর সাপের মাখায় মণি,
ছু চোখে করুণ সে কি মিনতির কামনানিবিড় ভাষা
অতি সযতনে সঞ্চিত যেন কত কালোরাতে ধরে ।
বল বিদেশিনী, আজো নাকি তুমি আমারই প্রতীকার ।
ঘন হয় রাত যেন সে কাদের অশিব আর্তনাদ
আকাশে ছড়াল—নেমে এল কোন অতি ক্ষীণ প্রতিবাদ,

নিঃশীর্ণ মন তবু অবারণ উন্নত হয়ে যায়—
ভেসে চ'লে যায় অবশ পাখায়
কোথা প্রবাহিত একটি বিষের নদী
আর তারি তীরে বিষকন্টার ঘর ॥

২

আহা অপরূপ ললিত তোমার গ্রীবা,
নাগবেণীধরা তুমি কি গো নিরুপমা !
স্তন্যগ্রচূড়ে পঞ্চশরের হাসি
মর্যরকচি অরুপণ উদারতা,
ঘন জঘনের উপত্যকার তীরে
পথ ভুলে এসে দাঁড়ালাম এইবার—
এস তবে এস অন্ধকারের মত
বিষ অগ্নির দহনে এবার দগ্ধ কর এ বুক ;
আরো আরো ক্রমে অন্ধকারের স্রোতে
এ মন হৃদয় ধীরে বিলয়ের অবকাশ খুঁজে নিক ।

আহা অপরূপ ললিত তোমার গ্রীবা
নাগবেণীধরা তুমি কি গো নিরুপমা !
আমি দেবদূত এলাম তোমার দেশে—
হে বিষকন্টা, বনদেবী তুমি নও,
রক্তে তোমার তরল বিষের রাশি,
স্তন্যগ্রচূড়ে পঞ্চশরের হাসি,
ঘন জঘনের উপত্যকার তীরে
রেখে যেতে হ'ল মৃত্যু-অভিজ্ঞান ॥

জাল

সাধনা চট্টোপাধ্যায়

মন-সাগরে জাল-ফেলেছি ডেউরা নামে ওঠে,
মন-সাগরে জাল ফেলেছি দেখব কি বা জোটে !
ঠোঁটের কোণে মিষ্টি হাসি চোখের তারা নাচে,
দেখব আমি দেখব এখার ও মনে কি আছে ।
রঙিন বিহুক শঙ্খমালা আরো কত কি যে,
ওঠেই যদি আমার জালে তুমিই নিও নিজে,
মনের সাগর মখন ক'রে একটি যদি প্রিয়,
ভালবাসার মুক্তো ওঠে তাই আমারে দিও ।

আজকে আমি জাল ফেলেছি বুঝতে তোমার ভাষা,
ঠোঁটের কোণে হাসির ছিটে সেই কি ভালবাসা ?
দু হাত দিয়ে টানছি তবু পাহাড়-প্রমাণ ভারী,
একলা আমি এ জালখানি তুলতে কি গো পারি ?
ছিঁড়ল যে জাল, হারিয়ে গেল মনের অতল তলে,
ছোট আমার এ জাল দিয়ে মন কি বাঁধা চলে ?
চোখের তারা নাচছে দেখি চোখেতে সেই হাসি,
আজো আমার বললে না তো 'তোমায় ভালোবাসি ।

কালো পিচের রাস্তাটার ওপর এক সঙ্গে 'স্বেত-রক্ত-নীল-পীত' অনেক রঙের আভা এসে পড়ল। উত্তর এবং পূর্ব দিকের দেওয়ালগুলোতে বিভিন্ন রঙের আলো উঠল জ্বলে। সবুজ সঙ্কেত না পেয়ে বে মোটরগুলো জমা হচ্ছিল রাস্তার মোড়ে, তাদের রঙও বিচিত্র হয়ে উঠল এই আলোয়।

আলো ঠিক নয়, আলোকিত বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞাপনগুলো নিজেরাই শুধু জ্বলল না, সন্ধ্যার এসপ্লানেডকেও দিল নানা রঙে রাঙিয়ে। সেই রঙের প্রতিফলনে এখানকার লোকগুলোর পায়ের রঙটাই গেল বদলে। অন্ধকারের পটে যেন রঙিন ছায়াপথ হয়ে ফুটে উঠল সন্ধ্যার এসপ্লানেড।

শ্রামবাজারের ট্রাম না পেয়ে বাসবেজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলোর খেলা দেখছিল। এই মাত্র অনেক অন্ধকার পার হয়ে সে এসে দাঁড়িয়েছে আলোকের এই স্বর্নাধারার নীচে। পোর্ট অর্ডিট শেষ ক'রে ভাউচারগুলো অ্যাকাউন্টের জন্তে গুছিয়ে রেখে সে যখন আপিস থেকে বেরুল, রাজভবনের পশ্চিম দিকের অন্ধকার রাস্তাটা দিয়ে তখন আর একটা লোকও চলছিল না—অবশ্য তাকে একা একা পথ চলতে হয় নি। এতক্ষণ তার একজন সঙ্গী ছিল। রাস্তার আলো-অন্ধকারের মধ্যে নিজের অস্পষ্ট ছায়াটা এসপ্লানেড পর্যন্ত তার সঙ্গে সঙ্গেই এসেছিল। কিন্তু এখানকার এই অজস্র আলোর অব্যবহৃত ঐশ্বর্যের মধ্যে সে কোথায় হারিয়ে গেল। বাসবেজ চারিদিকে তাকিয়েও আর খুঁজে পেল না তাকে।

সেই আলোক-তীর্থে দাঁড়িয়ে সে ভাবল, এত আলো আর এত রঙ। অথচ আলোয়ার মত কি মিথ্যে! এখান থেকে এক কথা আলো আর এক রসি রঙও মনের মধ্যে ধরে নিয়ে যাওয়া যাবে না বলাকদীষি লেনের অন্ধকার বাড়িতে।

বাড়িতে ঢোকবার আগে গলির মুখে এসে আবার তার ছায়াটাকে ফিরে পেল বাসবেজ। হারানো সঙ্গীকে ফিরে পেয়ে আনন্দ হ'ল তার। মনে হ'ল, জীবনের সব হারানো জিনিসগুলোই এমন ভাবে ফিরে আসবে।

বাড়ি ঢুকতেই মাথবাবু ভুরু কপালে তুলে তাকালেন ওর দিকে। বললেন, আজ পড়াতে গেলি না বাবু? নাঃ।

মাথবাবু চ'টে গিয়ে বললেন, কাল যাঁস নি, আবার আজও গেলি না? মাসান্তে চল্লিশ টাকা ওরা তোয় মুখ দেখে দেবে নাকি?

বাসবের ইচ্ছে হ'ল বলে, তার মুখ ওরা আর দেখবে না কোনদিন। টুইশনিটা গেছে।

কিন্তু সে কথা না ব'লে সে নির্জলা মিথ্যে বললে, আজও শরীরটা ভাল নেই। কাল থেকে ঘাব।

টুইশনিটা আসলে সে পাড়ার নীলকমলকে দিয়েছে। দু বছর আগে বি. এ. পাস ক'রে নীলকমল এখনও বেকার হয়ে রয়েছে। ওকে একটু সাহায্য করা দরকার।

মা এসে ধরলেন সিঁড়ির মুখে, আমার 'লক্ষ্মীর পাঁচালী' এনেছিস খোকা? না, আজও ভুলে গেছিস।

এনেছি মা, এই নাও।

ঘরে গিয়ে বসবার একটু পরে চা নিয়ে এল অতসী। টেবিলের ওপর রেখে দরজার ধারে দাঁড়িয়ে শাড়ির আঁচল আঙুলে জড়াতে লাগল। বাসব ভিজ্জেন করলে, কি রে, বলবি কিছু?

একটু ইতস্তত ক'রে অতসী বললে, দাদা, তোমার হাতে এখন টাকা নেই জানি। কিন্তু মটু বলছিল, ওর পরীক্ষা নাকি সামনের বুধবার থেকে। বাকি মাইনে চুকিয়ে না দিলে পরীক্ষা দিতে দেবে না।

তাই নাকি? আচ্ছা, পরশুদিন দেব।

অতসী চ'লে গেল। ওর এখন উনিশ বছর বয়স। নানা কারণে এখনও বিয়ে দেওয়া গেল না। সংসারের ভাবনার ওরও চেহারা শুকিয়ে যাচ্ছে দিন দিন। একটা রুদ্ধ নিশ্বাস ফেলে বাসব আবার বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

রাস্তায় লোকের ভিড় বড় বেশি। নিজেকে একটু নির্জনতার মধ্যে পেতে চাইল সে। বাড়িতে ভিড় নেই বটে, কিন্তু নিজেকে সেখানে একা পাওয়া যায় না। তুচ্ছ প্রাত্যহিকতা তার মনটাকেও দরিত্র ক'রে ফেলে।

কিন্তু কত আর হাঁটবে সে? এই পথ তাকে কোথায়

নিয়মে যাবে? বৈতে থাকার আনন্দ নেই যে জীবনে, সেই জীবন থেকে কি মুক্তি দেবে এই পথ? এ পথে চলতে চলতে সে কি পারবে বলতে যে, এই পথ চলাতেই তার আনন্দ? না কি তার বর্ণহীন বিলুপ্ত দিনগুলোর মত এই পথ তাকেও টেনে নিয়ে চলেছে ধূসর মৃত্যুর দিকে— দি ওয়ে টু ডাঙ্কি ডেথ?

রাস্তাটা পার হয়ে সে সামনের পার্কের মধ্যে ঢুকল। একটা খালি বেঞ্চিতে বসবার পর সে যেন দেখল, শোভনা এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে।

তার নিরাশ্রয় জীবনে শোভনা তুলে ধরেছে প্রেমের অমৃত। ছ হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করবার আকুলতায় মন অস্থির হয়ে উঠেছে বার বার। কিন্তু বসাকদ্বীপির অন্ধকার তার দৃষ্টিকে দিয়েছে অন্ধ ক'রে। সেই অন্ধকার পিছনে কেলে সে না পারছে এগিয়ে যেতে, না পারছে শোভনাকে সেই অন্ধকারের মধ্যে টেনে নামাতে। যুধ্যমান ক্ষুধিত নগরের পথে পথেই তাদের দিন তাই কেটেছে। কিন্তু পথের শেষ কোথায় তা আজও বুঝতে পারল না। শুধু এইটুকু বুঝেছে যে, এ পথে পান্থনিবাস মিলবে না কোথাও। বিশ্রাম করতে হ'লে কনকটাপার কুঞ্জ নিজেদেরই তৈরি ক'রে নিতে হবে।

হঠাৎ বাসবেঙ্গ সচকিত হয়ে উঠল। এতক্ষণ মনে হয় নি যে, বৈশাখ মাস শেষ হবে কাল। শোভনার আরও এক বছরের প্রত্যাশার অবসান ঘটবে। গোধুলির রঙ গায়ে মেখে আলো এবং অন্ধকারের মধ্যবর্তী লগ্নে শোভনা এসে দাঁড়াবে জুনিপার স্ট্রিটের ওপর। কি বলবে সে শোভনাকে? যে উচ্ছলিত মাধুরীতে শোভনা তার জীবন পরিপূর্ণ ক'রে দিতে চেয়েছে, তার মূল্যের পরিমাণ বাসবেঙ্গ জানে। কিন্তু মূল্যের মর্যাদা সে দিতে পারছে না কেন?

ভীত চোখে আকাশের দিকে তাকালে সে। যেন উত্তরটা ওখান থেকেই আসবে।

পরের দিন অনেক কথাই ভাবতে ভাবতে বাসবেঙ্গ জুনিপার স্ট্রিটের মোড়ে এসে দাঁড়াল। শোভনা আসবে নাড়ে পাঁচটায়। অথচ সে এসে পড়েছে পাঁচটার আগেই। এর জন্তে আপিস থেকে আধ ঘণ্টা আগে

বেকতে হয়েছে। এত আগে এখানে চ'লে আসবার কথা সে নিজেও ভাবে নি; কিন্তু তবু এসে পড়ল। বৈশাখের শেষ অপরাহ্ন। সামনের কুঞ্চুড়া গাছটা থেকে অজস্র ফুল ঝরে পড়ছে পথের ওপর। লাল হয়ে উঠছে পথটা।

শোভনাকে আজ কি বলবে সে? নিজের মনে প্রশ্নটা তুলে কোনও উত্তরই পেল না। ওই কুঞ্চুড়া ফুলগুলোর মত রক্তিম বাসনা-কুহুম হৃদয়ের বস্তু থেকে তুলে এনে তার সামনে এগিয়ে ধরেছে শোভনা। অঞ্জলি ভ'রে কিছুতেই তা গ্রহণ করতে পারলে না বাসবেঙ্গ। আজ পাঁচ বছর ধ'রে একটি মেয়েকে সে শুধু মিথ্যা আশ্বাসই দিয়ে আসছে।

অথচ কি-ই বা এমন চেয়েছিল শোভনা তার কাছে? সরকারী কর্মশালার অতি সাধারণ কেরানী বাসবেঙ্গ নিজের কাছে কোনও চূর্ণত বস্তু প্রার্থনা করে নি শোভনা। একটু নিশ্চিন্ত আশ্রয় চেয়েছিল মাত্র।

হাতঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখল বাসবেঙ্গ। এখনও যথেষ্ট সময় রয়েছে। অন্তরমনস্কভাবে পাশের লাউডন স্ট্রিটের মধ্যে ঢুকে পড়ল সে। পথে একটি লোকও নেই। ছ ধারের প্রাসাদতুল্য বাড়িগুলো দুর্গের মত গম্ভীর। গাছের শাখায় একটা পাখিও ডাকছে না। হাঁটতে হাঁটতে আরও ছ-একটা রাস্তা সে অতিক্রম করল। কদাচিৎ একটি মোটরগাড়ি এসে পথের স্তব্ধতা দূর ক'রে দিচ্ছে। কিন্তু পথচারী সে ছাড়া আর কেউ নেই।

প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে মন থেকে চিন্তার জট খুলতে লাগল। প্রেমের পরিপূর্ণ স্বীকৃতি বিবাহে। শোভনার প্রেমকে বিবাহ-বন্ধনের মধ্যে স্বীকার ক'রে নেওয়ার পথে যে-অক্ষমতা রয়েছে তার জন্তে নিজেকে যেন ক্লীব মনে হতে লাগল বাসবের। মনের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করবার চেষ্টা করল সে। বৈশাখের এই বিদায়-গোধুলিতে শোভনাকে রিক্ত হাতে ফিরিয়ে দেবে না কিছুতেই।

একটু বসবার জন্তে সে পাশের মোড়ন কোয়ার্টারের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সমস্ত পার্কে মাত্র দুটি বেঞ্চি। আর দুটিতে কয়েকজন বুড়ী মেম ব'সে রয়েছে। পার্কটা জুড়ে রয়েছে একটা নোংরা পুকুর। শ্রাওলা আর ঝাঁজিতে

ভরতি। পুকুরটার দিকে চেয়ে তার মন আবার নৈরাশ্রে ভরে গেল। নিজের জীবনটাকেও এই রকম বন্ধ নিস্তরঙ্গ মনে হ'ল। বসাকদীঘি লেনের বাড়িটার কথা ভেবে ঘুণায় শিউরে উঠল সে। ওই আলো-বাতাসশূন্য চুনবাগি-খসা ঘরে প্রেমের অভিক্ষেপ কেমন ক'রে হবে? হাতঘড়িতে পাঁচটা কুড়ি হয়েছে দেখে সে জুনিপার স্ট্রিটের দিকে হাঁটতে লাগল। দেরি না হয়! শোভনা এসে এক্সিমো ক্যাফেতে তাকে দেখতে না পেলে হয়তো চ'লে যাবে।

পাঁচটায় আপিস ছুটি হতেই শোভনা বেরিয়ে পড়ল। কাল সারারাত মনের ওপর অনেক উৎপীড়ন গেছে। দাদা এবার নাছোড় হয়ে ধরছে। এতগুলো বছর অনেক গুজর-আপত্তি দেখিয়ে কাটিয়েছে শোভনা। কিন্তু এবার দাদার মনোনীত পাত্রের গলায় মালা দেওয়া ছাড়া পথ নেই।

পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে ড্রাম থেকে নেমে দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগল শোভনা। এ রাস্তা দিয়ে যেন মোটরের শোভাযাত্রা চলছে। শোভনা ভাবলে, ওই রকম একটা গাড়িতে ক'রে যেতে পারলে খুব তাড়াতাড়ি এক্সিমো ক্যাফেতে পৌঁছনো যেত। বাসব হয়তো তাঁর জন্তে অনেককণ অপেক্ষা করছে।

এক্সিমো ক্যাফেটা বাসবেরই আবিষ্কার। কলকাতার এই অগণিত পথের গোলক-ধাঁধার ভেতর থেকে জুনিপার স্ট্রিটকে খুঁজে বার করার মধ্যে বাহাহুরি আছে বটে। সেই ছোট রাস্তাটার মাঝামাঝি ফুটপাথের ধার ঘেঁষে একটা বকুলগাছ তার ঝরাফুলের গন্ধে এখন সমস্ত পাড়াটাকে সৌরভ-মগ্ন ক'রে রেখেছে। সেই গাছটার সামনে এক্সিমো ক্যাফে।

চা থেকে আরম্ভ ক'রে সব রকমের পানীয় আছে এখানে। মাহুষও তাই ভিন্ন রুচি নিয়ে আসে। তবে

ভিড় ক'রে নয়, কখনও-সখনও। হলঘরের মত বড় ঘরটায় তাই ছোট ছোট বিশটা টেবিল এবং তার সঙ্গে গদি-আটা চল্লিশটা চেয়ার থাকা সঙ্গেও অস্তুত বারোটা টেবিল সব সময় ফাঁকা থাকে। চায়ের দামও কম নয় নেহাত। প্রাত পেয়াল বারো আনা। পুটে ক'রে 'টী ফর টু' নিয়ে

এলে তার দাম দাঁড়ায় পাঁচ সিকে। বাসব বলত, শুধু চা খাবার জন্তেই তো আমরা এখানে আসি নে। হু কাপ চা নিয়ে তিন ঘণ্টা এখানে ব'সে গল্প করলেও কারও কিছু আসে-যাবে না। সময়ের হৃদয়হরণ করতে এর চেয়ে ভ্রম জায়গা আমার জানা নেই, শোভা।

তাই তারা শুধু গল্পই করেছে। কিন্তু এই পাঁচ বছর ধ'রে কি গল্প করল তারা? শোভনা ভেবে দেখল, কখনও প্রেমের গল্প করা হয় নি। এত দিন ধ'রে বাসবকে দেখে এবং তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে শোভনার এখন ধারণা হয়েছে যে, এই জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে বাসবের মনে আর বোধ হয় কোনও মোহ নেই। শোভনাকে সে যে ভালবাসে, তাতে শোভনার মনে কোনও সন্দেহ নেই। তবে সে ভালবাসা বোধ হয় একটু অগ্র ধরনের। বাসবের লেখা ধানকয়েক চিঠি আজও তার ব্যস্ত সময়ে রয়েছে; কিন্তু শোভনা সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন প্রকাশ পায় এমন কোনও লাইন তাতে নেই।

এক্সিমো ক্যাফের একই টেবিলে মুখোমুখি ব'সে শোভনার মনে হ'ত, বাসব ঠিক তার কাছে ব'সে নেই—তার মন অগ্র কোনও চিন্তায় আচ্ছন্ন। তাই হুবার একই প্রশ্ন ক'রে তবে বাসবের কাছে উত্তর পাওয়া যেত। আর সে কথাও যেন টেলিফোনের কথার মত ভেসে আসত বহু দূর থেকে। বছর দুয়েক আগে ওদের একান্তবর্তী পরিবারটা যখন ভেঙে গেল এবং দায়িত্বের একটা বড় বোঝা ওর মাড়ে এসে পড়ল, তখন ছোট বোনের কথা তুলে বাসব বলেছিল, অতদী বড় হয়ে উঠেছে। ওর বিয়েটা না দিতে পারলে আর চলছে না। অবশ্য তুমি যদি বল, তবে তার আগেই আমি নিজের ব্যবস্থাটা ক'রে নিতে পারি। চল না, লাক্সাম কি লাহেরিয়া-সরাইতে পালিয়ে যাই। তারপর দিনকতক পরে একখানা প্রজাপতি-মার্কা পোস্টকার্ড বাড়িতে ছেড়ে দিলেই ল্যাঠা চুক যাবে।

শোভনা এসব মন দিয়ে শোনে নি। কারণ সে জানত আসল কথাটা এর পরেই আসছে। আর এলও।

আমাকে আর একটা বছর সময় দাও শোভা!—প্রার্থনার মত ব'লে উঠল বাসব। হয়তো সে ভাবলে, এই এক বছরে আশ্চর্য প্রদীপের কিছুটা ভগ্নাংশ সে সংগ্রহ

ক'রে নেবে। তারপর সেই আলোয় আজকের এই
কুৎসিত মধ্যবিস্তৃত জীবনের কদম্ব অঙ্ককার আলোকিত
ক'রে তুলবে। তাদের প্রেমের আরতিও সম্পূর্ণ হবে
সেই প্রদীপশিখায়।

কিন্তু এসব শুধুই কল্পনা। সাত ঘণ্টা আপিসের
খাটুনির পর জুনিপার স্লিট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শোভনার
কান্না পেতে লাগল। বাসবের সেই এক বছর আজও
শেষ হ'ল না। প্রতি বৈশাখে তার মেয়াদ আরও এক
বছর ক'রে বেড়ে যায়। আজও শেষ হবে একটি বছর।

জুনিপার স্লিটের মোড়ে এসে নিজেকে অত্যন্ত অসহায়
ব'লে মনে হ'ল শোভনার। দীর্ঘনিশ্বাসের মত বাতাসের
সাঁই-সাঁই শব্দ জুনিপার স্লিটের ওপর দিয়ে দূরে চ'লে
যাচ্ছে। ওদিকের শালগাছটা থেকে দু-একটা পাতা পড়ছে
ধ'সে। কৃষ্ণচূড়ার ঝরাফুলে পথটা গিয়েছে লাল হয়ে।

সেদিকে চেয়ে শোভনার মনে হ'ল, বাসবের হৃদয়টাও
বুঝি ওই রকম রক্তাক্ত। প্রতিমুহুর্তে সেখান থেকে বিন্দু
বিন্দু রক্ত ক্ষরিত হচ্ছে। প্রেমের সাধ্য কি সে হৃদয়
স্বাধায় পূর্ণ করে। শোভনা আজও সেই হৃদয় আপন
হাতে দোলাবার অধিকার পায় নি।

এক্সিমো কাকের সামনে এসে শোভনা দেখল, বাসব
দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। ওকে দেখে বাসব একটু হাসল।
বললে, বাঃ! একেবারে ঘড়ি ধ'রে তোমার আসা-যাওয়া,
এতটুকু অতিরিক্ত হবার উপায় নেই।

এতটুকু অতিরিক্ত নয়।—ক্লান্ত হয়ে বললে শোভনা,
নিজেকে তো সম্পূর্ণ রিক্ত ক'রেই দিতে চেয়েছিলাম
তোমাকে। নিতে পারলে কই?

বাসবেজের নিরুত্তর মুখের দিকে চেয়ে শোভনা বললে
আবার, জান, রাতে আত্মমিষ্টারে আমার ঘুম আসে না
চোখে। ভাবি, আমার প্রেম তোমার গলার মালা না
হয়ে বান্ধন হ'ল।

সেই নির্জন পথের ওপর দাঁড়িয়ে শোভনার হাত
ছুটি নিজের মুঠির মধ্যে তুলে নিলে বাসব। অল্পভব
করল ঈষৎ কাঁপন। বুঝল, মনের কতখানি জ্বালা জোর
ক'রে চেপে রাখছে শোভনা।

শোভনা বোধ হয় ঠিক করেছে যে, আজ আর সে

কিছুতেই চূপ করবে না। তাই বলতে লাগল, বৈশাখের
শেষ দিন আজ। আরও এক বছর শেষ হ'ল। তুমি
আমার কাছে আর একটা বছর সময় নেবে না?

বাসবের ভয়ানক দৃষ্টি লক ক'রে শোভনা হাসল একটু।
বললে, আচ্ছা হয়েছে। চল, চা খাই। আজ আর কেউ
কারও ওপর রাগ করব না।

দুজনে ভেতরে ঢুকে একেবারে শেষপ্রান্তে দেওয়াল
ঘেঁষে বসল। সমস্ত দেওয়াল জুড়ে বিলিতি ফুলের
ছাপমারা ওয়াল-পেপার লাগানো। বয় চায়ের সরঞ্জাম
এনে রাখল টেবিলে। শোভনা পট থেকে চা ঢালতে
লাগল পেয়ালায়। দুধ-চিনি মিশিয়ে বাসবের দিকে
এগিয়ে দিয়ে বললে, খাও।

বাসব অসহায় চোখে শোভনার মুখের দিকে তাকালে।
মুহূ হাসল শোভনা। ওর মুখের চেহারা দেখে বাসবের
বুকের মধ্যে একটা আবেগের সমুদ্র যেন প্রলয়ের ঢেউয়ের
মত উত্তত হয়ে উঠল। মনে হ'ল, এখনই বুঝি বিপুল
উজ্জ্বল ভেঙে পড়বে শোভনার সামনে।

শোভনা তার হাতের ক্রমাল এগিয়ে দিয়ে বললে, বড্ড
ঘেমেছ। কপালটা মুছে ফেল।

পাথরের মত অনড় হয়ে ব'সে রইল বাসব। একটা
বোবা স্বপ্নায় সমস্ত মনটা যেন মুচড়ে উঠছে। চোখের
বাম্পে চশমার কাচ ছুটো আসছে ঝাপসা হয়ে। কিছুই
ভাল ক'রে দেখা যাচ্ছে না। এখানকার মুহূ আলাপও
আর আসছে না কানে। অতীত এবং ভবিষ্যৎকে যেন
গ্রাস ক'রে ফেলেছে বর্তমান মুহূর্তটা।

শোভনা হাত বাড়িয়ে ওর চশমাটা খুলে নিলে।
কাচ ছুটো মুহূতে মুহূতে বললে, কি হয়েছে বল তো?
তোমার শরীর কি আজ ভাল নেই? এয়ার-কন্ডিশনও
ঘরে এত ঘামছ কেন?

বাসব আবার নিজের মধ্যে ফিরে এল। তাড়াতাড়ি
ক্রমাল দিয়ে মুখটা মুছে ফেললে। একটা পাণ্ডুর অস্থূ
হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। বললে, চা খাও শোভনা,
ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

শোভনা আর কিছু বললে না। চায়ের পেয়ালায়
টোট ছুটো নামিয়ে দিল। দুজনের কেউই পরস্পরকে আজ
ঠিক বুঝল না।

কাকের কোণের দিকে একটা পিয়ানো আছে।
রোজই একটা দুটো গত বাজিয়ে শোনানো হয়। আজ
পিয়ানো বন্ধ। আজ গীটার আর ভায়োলিন বাজছে।
স্বর শুনে বাসব ধরতে পারলে যে, রেকর্ডে “ওভার দি
ওয়েভ্‌স্” সে শুনেছে। শোভনার দিকে চাইলে একবার।
শোভনা নির্বাক হয়ে বসে রয়েছে। কি ভাবছে বাসব
তা জানে না। আজ এতদিনের পরিচয় যেন মিথ্যা হয়ে
গেল। প্রত্যাশার পর হতাশা। হতাশার পরে নৈরাশ্র।
এদের জীবন আজ এই তিনটি অস্থিতির যন্ত্রণায় মুগ্ধমান।
নৈরাশ্রের ঘন অন্ধকার এদের চক্ষুনের মাঝখানে এসে জমা
হয়েছে। সে অন্ধকারে মুখ দেখা যায়—মন দেখা যায় না।

চুপ করে বসে থাকা ভিন্ন উপায় নেই। একটা
কথা বলবার উৎসাহ পর্যন্ত মন থেকে লোপ পেয়েছে।
গীটার আর ভায়োলিনের স্বরবন্ধারে বাসব তাই সমুদ্র-
তরঙ্গের আক্কেপ শুনতে লাগল। মনের মধ্যেও লাগল
চেউয়ের দোলা। আজ পাঁচ বছর ধরে তারাও তো
লক্ষ্যহীনভাবে “ওভার দি ওয়েভ্‌স্” ভেসে চলেছে।
কি সম্বল নিয়ে বেদনার নীল সমুদ্র পার হবার চেষ্টা করছে
সে? কতটুকু এগোতে পারল? ফলে নিজের সামর্থ্যের
ওপরেই যে শুধু অবিশ্বাস এল তা নয়, প্রিয়তমারও
লাঞ্ছনার রইল না শেষ।

বাসবেজ টেবিলের ওপর মাথাটা নামিয়ে শোভনার
কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল মনে মনে।

এক্সিমো কাকের ভেতরে বসে বোঝা যায় নি যে,
সারা আকাশ জুড়ে মেঘ জমেছে। বাইরে এসে মনে
হ’ল, মেঘের ভারে আকাশটা যেন নীচু হয়ে মাথার
ওপর এসেছে নেমে। রাত আটটা বাজে। জুনিয়ার
স্লিট একেবারে ফাঁকা। মোটর বা ফিটন কিছুই চলছে
না এ পথ দিয়ে। নিজেদের পায়ের আওয়াজ তাই
নিজেদের কানেই বড় জোরে আঘাত করছে। কেউ
কোনও কথা বললে না। দশ মিনিট নীরবে হেঁটে ওরা
চৌরঙ্গীতে এসে পড়ল। রাত্তার ওপারে কুটিল অন্ধকার
জমাট বেঁধে আছে ময়দানে। পথে মাছঘের আনাপোনা
বড় কম। শুধু দেওয়ালে দেওয়ালে বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞাপনগুলো
প্রহরীর সতর্ক চোখের মত দপদপ করে জ্বলছে।

গ্র্যাণ্ড হোটেলের তলায় এসে শোভনাই প্রথম কথা
বললে, আজকে একটু যাবে আমার সঙ্গে?
নিশ্চয়ই।

বাড়ি পর্যন্ত?

বাড়ি পর্যন্তই যাব শোভা।

দমদম স্টেশন থেকে শোভনাদের বাড়ি নেহাত
কাছে নয়। স্টেশন থেকে নববিধান কলোনির দূরত্ব
কমাবার জন্তে এখানকার বাসিন্দারা বনজঙ্গল কেটে
একটা কোণাকূর্ণি পথ তৈরি করেছিল। কাঁচামাটির
পথ। পথের দু ধারে গাছের সারি। প্রথম দিন মেখে
বাসব বলেছিল, বাঃ, বেশ সুন্দর পথ তো! এর নাম
দেওয়া যাক ‘লাভার্স লেন’।

সেদিন নামটা শুনে ভালই লেগেছিল শোভনার।
সারা মন একটা রোমান্টিক বাস্পে পরিপূর্ণ হয়ে
আকাশটাকেই ছুঁতে গিয়েছিল যেন। এ পথ দিয়ে চলতে
চলতে প্রত্যহ মনে হ’ত, এই বিবর্ণ দিনগুলির পিছনে
একটি উজ্জ্বল দিন অপেক্ষা করে আছে।

মাত্র একটি দিন।

সেই দিনটিকে আজ পাঁচ বছর ধরে ধরবার চেষ্টা
করছে শোভনা। কিন্তু বার বার তার উৎস্রক মুঠি এড়িয়ে
লঘুপক্ষ প্রজাপতির মত স’রে স’রে যাচ্ছে সেই দিনটি।
আগিল যাওয়া আর বাড়ি ফেরার পথে আজকাল তাই
লাভার্স লেনকে সামান্য একটা কাঁচামাটির পথ ছাড়া আর
কিছুই মনে হয় না শোভনার।

সে বললে, তুমি পাথরের চেয়েও কঠিন। তোমার
কাছে চাইবার মত আমার কিছুই আর নেই।

বাসবেজ কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল শোভনার দিকে।
এক বছর আগের একটি ঘটনা মনে পড়ল তার। দোল-
পূর্ণিমার রাত। শোভনাকে পৌঁছে দিতে গিয়েছিল সে।
লাভার্স লেন অরুণ জ্যোৎস্নায় পুলকিত। দু ধারের গাছে
মৃদু মর্মর।

পথটার বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে শোভনা বলেছিল,
আজ তোমার জন্মদিন। আজকের দিনটিকে স্মরণীয় করে
রাখতে চাই এই কলমটা দিয়ে।

হাতের ব্যাগ খুলে সুন্দর একটি কলম বাসবের হাতে
দিলে সে।

কলমটা হাতে নিয়ে মুখ চোখে দেখল বাসবেঙ্গ, তারপর হঠাৎ শোভনার কানের কাছে মুখ নামিয়ে একটু দিবাঙ্কড়িত স্বরে বলেছিল, আমার একটা প্রার্থনা আছে শোভা।

চাঁদের আলোয় সে দেখল, শোভনার চোখে লজ্জার ছায়া নেমে এল।

আমাকে কাল পঞ্চাশটা টাকা দিও। খুব দরকার।

শোভনা বোধ হয় মনে মনে মা ধরণীকে দ্বিধা হতে বলেছিল। মুখে বললে, কালই পাবে।

আজ এক বছর পরে বিজ্ঞ চৌরদীতে হাঁটতে হাঁটতে সেই কথা মনে পড়ল বাসবের। আলো-ছায়ার যড়যন্ত্র তাদের জীবনে সেদিন ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। সেদিনের সেই এক ফুঁয়ে নিবে যাওয়া শোভনার সঙ্গে আজকের শোভনার অনেক পার্থক্য। আজ অনেক যা খেয়েই শোভনা বুঝেছে, বাসবেঙ্গ একধণ্ড পাথর ছাড়া আর কিছুই নয়। সে বললে, আমি পাথর নই শোভা, আমি পোড়া মাটি। সত্যিই যদি পাথর হতুম, দুর্ভোগের রাতে আমার আড়ালে আশ্রয় দিতে পারতুম তোমাকে।

এসপ্লানেড থেকে শেরালদা-গামী একটা ট্রামে উঠল দুজনে। ট্রামটা ওয়েলিংটন স্কোয়ার পার হবার পর শোভনা বললে, দাদা-বউদির গলায় আড় 'হয়ে' বিঁধে থাকতে আর পারছি না। আমার পরে আর এক বোন রয়েছে। আমারই জন্তে তার বিয়ের কথাবার্তা সব বন্ধ। ওরা যে আমাকে ষা-তা বলে, তার জন্তে ওদের দোষ দেওয়া বৃথা।

বাসবের মুখের দিকে এক পলক চেয়ে সে শেষ করল তার বক্তব্য,—তাই অনেক ভেবে দাদার কথায় রাজী হয়ে এ বিয়েতে মত দিয়েছি।

বাসবের মুখ ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। কিন্তু কিছুই বলতে পারলে না সে। ট্রামের উজ্জল আলো হঠাৎ যেন নিবে গেল। এক মুহূর্তের জন্তে গাঢ় অন্ধকারে শোভনার মুখ লুপ্ত হয়ে গেল বাসবের দৃষ্টি থেকে।

শোভনা জিজ্ঞেস করলে, তুমি কি আমাকে আরও এক বছর অপেক্ষা করতে বলবে?

বাসব শোভনার চোখের দিকে চাইলে। ওর মনে হ'ল, শোভনার চোখের দীপ্তি নিবে গেছে অনিশ্চিত

প্রতীক্ষার মান সংশয়ে। একটা নিখাস কেলে সে বললে, আমার আর সে সাহস নেই শোভা। বার বার প্রতিশ্রুতি ভাঙবার মত মনের ধোঁরও হারিয়ে ফেলেছি আমি।

শোভনা আর কিছু বললে না। স্টেশনে এসে একটা লোকাল ট্রেনে উঠে বসল দুজনে। গাড়ি ছাড়তে তখনও দশ মিনিট বাকি। পাশাপাশি বসেও নীরবে এই দশ মিনিট কাটিয়ে দিলে ওরা। দুজনের মাঝখানকার এই বিরস ব্যবধান আজ কেউই অতিক্রম করতে পারলে না।

বসদম এল। বাসবেঙ্গের লাভার্স লেনও এল। মেঘ স'রে গেছে। এক রকম মরা জ্যোৎস্না পাণ্ডুর চাঁদের গা থেকে গ'লে পড়ছে পৃথিবীতে। আশেপাশে সব বাড়ির জানলা দরজা বন্ধ। গাছের পাতায় এতটুকু কাঁপন নেই। এই অসীম স্তব্ধতার মধ্যে সকলের অগোচরে তাদের প্রেম আজ পথেই শেষ হবে। শোভনাকে ভালবাসে বলেই শোভনার কতি সে করবে না। নিজের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে আর জড়াবে না শোভনার ভাগ্যকে। তাকে সে আজ মুক্তি দেবে। এই বিদায়-মুহূর্তটিকে অক্ষয় ক'রে রাখবার মত ভাষা সে মনে মনে শুদ্ধিয়ে তুলছিল, এমন সময় শোভনা বললে, কাল তোমার সময় হবে? যদি হয়, কাল একবার এসো।

বাসব শুধু শোভনার মুখের দিকে তাকালে একবার। শোভনা বললে, বাড়ির কাছে চ'লে এসেছি, আর নাই বা গেলে। কাল বিকেলে আমার আপিসে একবার ধোঁয়ো।

পরদিন পাঁচটার সময় বাসবের সঙ্গে আপিস থেকে বেরিয়ে এল শোভনা। আজ তার বিচিত্র সাজ। প্রতিদিনের মত সাদা শাড়ি নয়, মলমলের ওপর ঢাকাই ছাপ দেওয়া খয়েরী রঙের শাড়ি পরনে। গলায় ঝকঝক করছে নতুন নেকলেস। হাতের চূড় এবং কানের রিংও নতুন ব'লে মনে হ'ল বাসবের। শোভনার সারাদেহে আজ খুশির প্রাবন বইছে। নিজের অজ্ঞাতসারেই বাসবের বুকের মধ্যে যন্ত্রণা স্তব্ধ হ'ল। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে শোভনা হেসে বললে, আজ তোমাকে আসতে বলেছি তার কারণ, এখন অনেক বাজার করতে হবে। এই তিনশোটা টাকা রাখ। আজ তুমি হ'লে আমার বাজার-সরকার। চল, আগে ওই ককিধানা থেকে একটু কফি খেয়ে নিই।

কক্ষির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে শোভনা বললে, বাড়ি থেকে কি সহজে বেরনো যায়। যা ধুম লেগেছে। আজ আসতে দেবে না কেউ আপিসে।

বাসবের অন্তরমনস্কতা লক্ষ্য করে সে বললে আবার, বা রে, তুমি তো বেশ লোক। এতদিনে তোমার ঘাড়ের পেছন নামছে, অথচ তোমার মুখে হাসি নেই। এই জন্তে তোমাকে মাঝে মাঝে আমার বড্ড অজুত লাগে।

বাসব বললে, কফিটা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খেয়ে নাও। নইলে আরও ভেতনো লাগবে।

রাস্তায় বেরিয়ে শোভনা বললে, সব চাইতে আগে একটা স্ট্রটকেন্স দরকার।

ধর্মতলা থেকে কেনা হ'ল স্ট্রটকেন্স।

শোভনা বললে, খানকয়েক কাপড় কিনতে হবে। ভাল কাপড় দাদাই কিনবে। মার্কেটে গয়রামের কাছে যাবার দরকার নেই। চল, খানকয়েক পছন্দসই তাঁতের শাড়ি কিনি গে খুনীলালের দোকান থেকে।

শাড়ি কেনা হ'লে সে বললে, হাতে যদি বেশি সময় থাকত, তবে তোমাকে নিয়ে দেশপ্রিয় পার্কে চলে যেতুম মনের মত ব্লাউজ কিনতে। সময় যখন নেই, তখন এখান থেকেই কেনা যাক।

তারপর একে একে তেল-সাবান-চিরুনি-টুথব্রাস-পেস্ট-প্রভৃতি সব কিছুই কেনা হ'ল। দু-একখানা বইও। স্ট্রটকেন্সটা বেশ ভারী হয়ে উঠল। বাসব একটু অপ্রসন্নভাবে বললে, এবার রেহাই দাও। আর যদি কিছু কেনবার থাকে, অন্য কাউকে দিয়ে কাল কিনো।

বাসবের দিকে চেয়ে শোভনা একটু হাসল—খুব জঙ্গ করেছে এই রকম একটা ভাব ফুটে উঠল সেই হাসিতে। বললে, মাত্র আজকের দিনটা একটু কষ্ট কর। আর দু-একটা টুকটাকি জিনিস হ'লেই আমার কেনা-কাটা শেষ হবে।

ট্রাম-স্টপেজে এসে বাসব বললে, চল, ট্রামে উঠি। বাড়ি কিরতে দেবি হ'লে সবাই ভাববে তোমার জন্তে।

চল, ওই ফুটপাথ থেকে উঠি।

কেন? ও-ফুটপাথ থেকে কেন? যাবে কোথায়?

শোভনা বললে, সেদি যখন হ'লই, চল না নেমস্তম্ভটা সেয়ে আসি। শুষ্ক মুক্তি করবী মাখবী ছায়া মায়া সেবা রেবা—সবাই থাকে হাওড়ায়।

বাসব বোকার মত কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল শোভনার দিকে। শোভনার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কিন্তু বাসব ভেবে পেল না যে, কেন শোভনা তাকে ভিল ভিল করে এই ঘষণা দিচ্ছে। বাসবের হৃদয়ের ত্বারে নিকরূপ আঘাত হেনে শোভনা কেন চাইছে তার নিজের জীবনে আনন্দের অম্লরূপন তুলতে।

হাওড়ার ট্রামে ভিড় ছিল না বিশেষ। ট্রামে উঠে বাসব সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ পাশাবির কোণে দ্বিধা টান পড়ল। পিছন ফিরে দেখল, শোভনা লেডিজ সীটে বসে তার দিকে সর্কোতুক চোখে চেয়ে রয়েছে। বাসব গিয়ে বসল তার পাশে।

শোভনা হাসি চেপে জিজ্ঞেস করলে, এগিয়ে যাচ্ছিলে যে বড়। আমার পাশে কোনদিন বসো নি নাকি?

বাসব বললে, তখন ভাবি নি যে, তোমার পাশ থেকে আমাকে একদিন স'রে যেতে হবে।

শোভনার প্রগল্ভতা বেড়ে চলল। বললে, তখন কি ভাবতে বল না?

বাসব চুপ করে রইল। শোভনা বললে, আমি কিন্তু জানি কি ভাবতে। বলব?

বাসব বিস্মিত হ'ল। শোভনা চিরকালই একটু গম্ভীরপ্রকৃতির। এ ধরনের চপলতা তার মধ্যে কোনদিন প্রকাশ পায় নি। আজ হ'ল কি তার? ট্রামের উজ্জ্বল আলোয় কানের রিং জুটো চিকমিক করছে। কৌতুকের হাসি ছড়িয়ে রয়েছে সারামুখে। বাসব দেখলে, একটা প্রসন্ন প্রভায় উজ্জ্বল সে মুখ।

কিছু না ব'লে সে জানলার বাইরে চেয়ে রইল। শোভনাও আর কিছু বললে না। ট্রামটা যখন হাওড়া ব্রিজের তলায় এসে দাঁড়াল, তখন সে বললে, চল না, ব্রিজটা হেঁটে পার হই।

বাসব বললে, স্ট্রটকেন্সটা না থাকলে আপত্তি করতুম না। কিন্তু যা ভারী হয়েছে, তাতে ব্রিজের ও-প্রান্ত পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে আমার প্রাণান্ত হবে।

শোভনা মধুরভাবে হাসল।—আপত্তি করে লাভ হবে না। তোমাকে কষ্ট দেব ব'লেই তো আজ আসতে বসেছি।

তাই যদি তোমার ইচ্ছে, তবে চল।

ব্রিজের মাঝামাঝি এসে রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল ছুজনে। তারায় তারায় আকাশ দীপ্ত। একটা স্ত্রীমার দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। মনে হ'ল, বড়ের মত হাওয়ার তাদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

কপালের ওপর থেকে উড়ে-পড়া চুলগুলো সরাতে সরাতে শোভনা বললে, বেশ লাগছে, না ?

হঁ।

শোভনা আবার তার স্বাভাবিক সত্তার ফিরে এসেছে। গম্ভীর, আত্মসচেতন। চূপ ক'রে হৃদয় আকাশের দিকে চেয়ে রইল সে। বাসবও চূপ ক'রে দেখতে লাগল, বাতাসের তাড়নায় চেউগুলো কি ভাবে ফুলে ফুলে উঠছে।

একটু পরে শোভনা আবার বললে, অত কি ভাবছ বল তো ? কিছু বল।

ব্যথায় সব কথা ভুবে গেছে, শোভা। আমারও মনে হচ্ছে যে, আই অ্যাম দি ভয়েস অব ওয়ান ক্রাইং ইন্ দি উইন্ডারনেস।

শোভনা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চূপ ক'রে রইল। কিছুক্ষণ পরে গুনগুন ক'রে নিজের মনেই গাইতে লাগল—মধুর তোমার শেষ ঘে না পাই, গ্রহর হ'ল শেষ।

গানটা মাঝপথেই শেষ ক'রে আবার চূপ ক'রে রইল সে। একটু পরে বললে, তোমাকে সেবার 'ব্রোকেন রিব' প্যাটার্নের যে সোয়েটারটা বুন দিয়েছিলাম, সেটা কি ছোট হয়ে গেছে, না, এবারও গায়ে দিতে পারবে ?

না, ছোট হয় নি।

চল, এবার যাই।

হাঁটতে হাঁটতে ব্রিজটা অতিক্রম করল তারা। শোভনা বললে, একবার স্টেশনে যেতে হবে। একটু কান্না আছে।

স্টেশনের ঘড়িতে রাত প্রায় সাড়ে আটটা। বাসব বললে, অনেক রাত হয়ে গেছে। এত রাতে কোথায় যাবে নেমস্তম্ভ করতে ?

শোভনা হাসল—রাত হ'লেই বা। তুমি তো পুরুষমানুষ সঙ্গে রয়েছ।

খোঁচা খেয়ে বাসব চূপ ক'রে রইল।

স্টেশনের ভিড় এবং বাত্মীদের কলরবে শোভনা

অন্তমনস্ত হয়ে গেল। বাসব কয়েকবার ডেকেও সাড়া পেল না। কিছুটা সময় কেটে গেল ওই অন্তমনস্ততার মধ্যেই। সহসা শোভনার যেন চমক ভাঙল। তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলে একটা খাম বের ক'রে বললে, এই চিঠিটা পোস্ট করতে ভুলে গেছি। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি ওই ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে আসি।

চিঠিটা পোস্ট ক'রে শোভনা হেসে বললে, আমার ওপর নিশ্চয়ই রাগ হচ্ছে খুব। আচ্ছা লোক তুমি। একটা দিনও পুরোপুরি সহ্য করতে পারছ না আমাকে। তোমার সঙ্গে বিয়ে হ'লে নিশ্চয়ই ঘর ভাঙত।

একটা ফুল এসে হাজির হ'ল। শোভনা বললে, অনেকক্ষণ বইয়েছি তোমাকে দিয়ে। এবার ওকে দাও।

কেন, ও নিয়ে কি করবে ?

ফ্রেনের কামরায় তুলে দেবে।

বাসব অবাক হয়ে বললে, কি যা-তা বলছ। মাথা ধরাপ হ'ল নাকি তোমার ? এর মধ্যে ফ্রেন এল কোথা থেকে ? শিবপুরের দিকে নেমস্তম্ভ করতে যাবে বললে না ?

মান হেসে শোভনা বললে, ও-সব বাক্সে কথা।

তার মানে ?

তার মানে কাল সারারাত ভেবে ভেবে ঠিক করেছি, এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া পথ নেই আমার। দ্বাদশ কথামত তার পরিচিত একজন কণ্ঠীস্বরকে বিয়ে ক'রে কেলতে পারলে সবাই সুখী হ'ত। কিন্তু আমি— সুখী হতুম কি ? আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যে ছান্নানুটি সর্বক্ষণ আমাদের আড়াল ক'রে রাখবে, তাকে সরাব কি ক'রে ? আমাদের সংসার-পথের ওপর জুনিপার ট্রীট এসে দাঁড়িয়ে একটা বাতিল চিহ্নের সৃষ্টি করবে। কায়মনোবাক্যে স্বামীকে যদি গ্রহণ করতে না পারি, আমার ছেলেমেয়েদের মনের গঠনও যে যাবে শিথিল হয়ে।

বাসবের বিস্ত্রিত চোখের সামনে উপত্যাসের নান্দিকার মত একনিশ্বাসে এত কথা ব'লে গেল শোভনা। বাসব কিছু বলবার আগেই আবার আরম্ভ করলে সে, তাই তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চাই। ভয় নেই, পথ হারিয়ে মরব না। যে পথে চলছি, সে পথে কোনো প্রত্যাশা নেই ব'লেই সাহস ক'রে ঘরের বাইরে পা বাড়াতে পেরেছি।

স্টেশন-ভরতি লোকের কথা ভুলে বাসব চেপে ধরল শোভনার হাত। বললে, দেখি, কি ক'রে যাও তুমি আমার হাত ছাড়িয়ে?

১. যেতেই হবে।

হ্যাঁ, যেতেই হবে। চল, বাড়ি ফিরে বাই।

বাড়ি?

হ্যাঁ, আমিও যাব তোমার সঙ্গে। কোনো কষ্টান্তিরের সাধ্য নেই আমার কাছ থেকে তোমাকে নিয়ে যায়।

শোভনা হাসতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল পড়ল গড়িয়ে। বললে, আমার তুচ্ছ একটা কথায় এতখানি উত্তেজিত হয়ে উঠলে! আজ পাঁচ বছর ধরে চেষ্টা ক'রেও বা পারলে না, তোমার এই এক মুহূর্তের উচ্ছ্বাসে কি তা সত্য হয়ে উঠবে?

বাসবকে কোনও কথা বলবার অবসর না দিয়ে শোভনা বলতে লাগল, আমাদের ছুজনের সামনে কোনো মোহই আর নেই। আমার এ পথ যদি তোমার পথের থেকে বেকে গিয়েই থাকে, তা হ'লেই বা হুঃখ করবার কি আছে?

একটা ট্রেন এসে পৌঁছল। বোধ হয় কিউল প্যাসেঞ্জার। ঘড়িতে আটটা পঁয়ত্রিশ বাজে। লোকের ভিড়ে শোভনার কথা চাপা পড়ে গেল। ভিড় কমলে শোভনা বললে, আর তো সময় নেই। পোনে নটায় শ'দুই এক্সপ্রেস ছাড়বে। তুমি আমাকে বেরিসির একটা টিকিট কেটে দাও।

বেরিসি?

হ্যাঁ। একটা আস্তানা আছে ওখানে। আমার সঙ্গে পড়ত নন্দিনী ঘোষ, সে ওখানকার সোঁতাল ওয়েলফেয়ার সেন্টারে কাজ করছে এখন। ওর ওখানেই উঠবে।

আর কোনও কথা বলতে পারলে না বাসব। বাধাও দিতে পারলে না। নীরবে গিয়ে একখানা টিকিট কেটে নিয়ে এসে শোভনার হাতে দিলে।

শোভনা বললে, তুলে দিয়ে আসবে না?

চল।

ট্রেনে উঠে জানলার ধারে বসল শোভনা। বাসব প্র্যাটিকের দাঁড়িয়ে রইল। অতীত ভবিষ্যতের কোনও

চিন্তাই আর নেই। বর্তমান মুহূর্তগুলি প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টির মত ওর হৃৎপিণ্ডের ওপর আঘাত করতে লাগল।

জানলায় একটা হাত রেখে শোভনা বললে, আমার অন্ত্রে মিছে দুশ্চিন্তা ক'রো না। ডিপ্লোমাগুলো সব এনেছি সঙ্গে ক'রে। চাকরি জুটিয়ে নিতে খুব অসুবিধে হবে না। আমার এই দুঃসাহসিক কাজের জন্তে দাদার কাছেও ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি। সেই চিঠিটাই পোস্ট করতে গিয়েছিলাম তখন।

বাসবেল্ল ওর মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিলে। প্র্যাটিকের শেষ প্রান্তে লাল আলোটা এখনও জ্বলছে। একটু পরেই ওটা নিবে যাবে। ভীষণ অসহায় চোখে সে সবুজ আলোর প্রতীক্ষা করতে লাগল। কিন্তু লাল আলোটা যেন ঠিক করেছে, আজ আর নিববে না। সে দিকে চেয়ে চেয়ে কেমন নেশাগ্রস্ত মনে হ'ল নিজে। মাথার মধ্যে রিম্‌রিম্ করতে লাগল। লাল আলোটা ক্রমশ বড় হয়ে উঠতে লাগল। যেন একটা বিশাল রক্তসমুদ্র। বাসবের মনে হ'ল, তার নিখাস বন্ধ হয়ে আসছে।

অবশেষে সবুজ আলোটা জ্বলে উঠল। শারীরিক আক্ষেপের মত একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেনের চাকা উঠল নড়ে। শোভনার দিকে তাকাতে গিয়ে সে দেখল যে, শোভনা তার দিকেই চেয়ে রয়েছে।

ট্রেন চলতে শুরু করল। শোভনার হাত এখনও জানলার ওপরে। বাসবের মনে হ'ল যে, তার সারাদেহ যেন অসাড় হয়ে গিয়েছে। এমন শক্তি নেই যে, দুই সবল বাহর আকর্ষণে শোভনাকে ট্রেন থেকে নামিয়ে নিয়ে আসে। প্রেম তাকে সন্মতি করে নি, প্রেম তাকে হত্যাও হতে দিল না। ব্যর্থ প্রাণের তামসিক অন্ধকারে আবার তার মন তলিয়ে গেল। হাওড়া স্টেশনের সমস্ত কোলাহল গেল শুদ্ধ হয়ে। চোখ মেলে সে শুধু দেখতে লাগল, ট্রেনের লাল আলোটা দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। তার আর কোনও অস্বস্তি রইল না। মনে হ'ল, একটা বিজ্ঞান দীপকও সে নির্বাসিত। চারিদিকে সমুদ্রের নীল জল বিবাস্ত হয়ে গেছে, এখান থেকে পালাবার কোনও পথ নেই।

বাহির্বিশ্ব

টি. এস. এলিঅটের কাব্য ও দর্শন

মুখ্যলিপি মুখোপাধ্যায়

আধুনিক ইংরেজী কাব্যে টি. এস. এলিঅটের বৈশিষ্ট্য কোথায়—এ কথা জানতে হ'লে প্রথমেই জানা প্রয়োজন যে, সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাবের আগে কি ছিল এবং পরে কি হয়েছে। ভিক্টোরীয় যুগের কাব্য, সমাজ, সাহিত্য ও জীবনদর্শন আধুনিক যুগের দৃষ্টিভঙ্গী ও ধ্যানধারণা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এ ছুটি পৃথিবী পরম্পরবিরোধী। টেনিসন ও ব্রাউনিং যে দৃষ্টিতে তাঁর সমসাময়িক সমাজ ও পৃথিবীকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, এলিঅট বা ইয়েটসের মধ্যে সে দর্শন নেই। এলিঅটের দর্শন স্বতন্ত্র, কাজেই তাঁর কাব্যও স্বতন্ত্র। সবচেয়ে বড় কথা হ'ল যে, তাঁর কাব্যপাঠের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র পাঠকসমাজ সৃষ্টি করতে হয়েছে। প্রায় ত্রিশ বছরেরও আগে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁর সেই *Waste Land* প্রকাশিত হওয়ার পরে যে কচি বা taste তিনি গ'ড়ে তুললেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজকের পৃথিবী তাঁকে জানছে ও বুঝে।

সাধারণত সাহিত্যের রাজ্যে দু'ধরনের সমালোচনা আছে। দুটোই বহুলপ্রচারিত। প্রথম ধরন হচ্ছে কোলরিজ (Coleridge) বা অধ্যাপক রিচার্ডসের মত, যেখানে সমালোচকের নিজস্ব ধিয়োরি বা কাব্য-সমালোচনার দর্শন আছে, যা দিয়ে কবিদের বিচার করা হয়। এলিঅটের নিজস্ব সমালোচনা এই ধরনের। তাঁর traditionalism বা বিশেষ ধরনের Christian classicism জ্যাকোবিয়ান কবি ও নাট্যকার, সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মবেত্তা, দাস্তে, বদলেয়ার, ব্রালার্মে এবং আরও বহুজনের ওপর এক নতুন আলোকসম্পাতে লক্ষ্য হয়েছে, এবং এরই ফলে তিনি নতুন কচির জন্ম দিয়েছেন ও একটি সমগ্র যুগের ও জীবনের গতিধারা নিয়ন্ত্রিত করেছেন। প্রথমে এই দৃষ্টিকে বাধা দেওয়া হয়েছিল, পরে অবশ্য জনসাধারণ এর থেকে আবিষ্কারের আনন্দ অন্বেষণ করে। এলিঅটের সমালোচনার যে বিশেষ ধরন, বিশিষ্ট সূক্ষ্মতা ও বিশিষ্ট বর্ণনামূলকতা তা প্রথম পাঠকসমাজ ঠিক বুঝতে পারে নি।

তিনি প্রথমে মিলটনের কবিতাকে প্রচলিত মূল্য দেন নি, কিন্তু তাঁর সমসাময়িক ধর্মীয় কবিদের মূল্য স্বীকার করেছিলেন। এলিঅটের এই দৃষ্টিভঙ্গী আজকে সকলের কাছেই পরিচিত। বর্তমান যুগের বিশিষ্ট সমালোচক হয়েও জনসন বা পোপের মত তিনি কাব্য সম্পর্কে কোন শেষকথা বলেননি এবং এইক্ষেত্রেই মিস হেলেন গার্ডনার তাঁর *The Art of T. S. Eliot* গ্রন্থে বলেছেন যে, তাঁর সমালোচনার সবচেয়ে বড় কাজই হ'ল পাঠক-মনে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করা, যাতে তাঁর নিজের কাব্য জীবন্ত ও সক্রিয় হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় ধরনের সমালোচনা হচ্ছে, আলোচ্য কবির মূল্যকে গ্রহণ এবং তিনি কি করতে চেয়েছেন তা নয়, তিনি কি করেছেন তারই বিচার। সমালোচনা মাহুঘের অন্ত্যস্ত কাজের মতই সমবেদনা ছাড়া অর্থহীন। ধারা কবির কাব্য ভালবাসেন এবং কাব্যের যাহুকরী শক্তিকে অহুভব করতে চান, তাঁরাই কবির কাব্যকে সহায়ত্বের সঙ্গে বিশ্লেষণ করেন। এইক্ষেত্রেই আমাদের উচিত প্রত্যেক বিশিষ্ট কবিকেই এইভাবে বিচার করে দেখা। দেখতে হবে এলিঅট দাস্তে বা বদলেয়ারকে (যাদের তিনি ভালবাসেন) কি ভাবে দেখেছেন, আবার হার্ডি বা মিলটন (যাদের তিনি পছন্দ করেন না) তাঁদেরই বা কোন্ দৃষ্টিতে বিচার করেছেন। আবার কোলরিজ বা ব্লেক মিলটনকে যে ভাবে বুঝেছেন এলিঅট বা ডাঃ জনসন তাঁকে সে ভাবে দেখেন নি। স্বভাবতই এক্ষেত্রে কোন সাধারণ ধিয়োরি বা দর্শন আবিষ্কার করা কঠিন, যাতে ক'রে ব্লেক বা পোপ উভয়কেই সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করা যায় কিংবা এলিঅট এবং হার্ডি অথবা এলিঅট ও ইয়েটস উভয়েই তাঁদের সম্পূর্ণ মূল্য পান। হার্ডি যেমনভাবে তাঁর কাব্যে sublime জিনিসের আনন্দানি করেছেন, এলিঅট ঠিক তেমনিভাবে তাঁর কাব্য থেকে সে জিনিস আবিষ্কার করে দিয়েছেন। ইয়েটস কোনরকমেই দার্শনিকতাকে

এলিঅটের মূল বঁলে মানতে রাজী নন, কিন্তু কাব্যের মাধ্যম হিসাবে যেখানে খ্রীষ্টীয় মতবাদ ও ক্লাসিক্যাল বিদ্যা গৃহীত হয়েছে, সেখানে ইয়েট্‌ন্‌ এলিঅটকে অনেকটা মেনে নিয়েছেন।

প্রত্যেক কবিকেই বুঝতে হবে তাঁর নিজের মূল্যবোধে। এ কথা সত্যি যে, যাঁর কাব্য আমরা পড়ছি তাঁর মূল্য প্রথমেই আমাদের স্বীকার ক'রে নিতে হবে। কোন দেশ দেখার আগে সেখানে বাস করব কি করব না সে কথা যেমন বড় নয়, এক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি। এলিঅটের কাব্যরাজ্যের সীমানা বহুবিস্তৃত এবং তাঁর *Waste Land*-এর উধর-ক্ষেত্রে বহু মরুত্বান বিচুমান। তাঁর কাব্যের ক্রমবর্ধমান বুদ্ধিজীবী পাঠকসমাজ ক্রমশই এলিঅটের কাব্য থেকে দেহ ও আত্মার প্রচুর খাণ্ড সংগ্রহ করেছেন। পাঠকসমাজের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ যাঁরা প্রথমে নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন তাঁরা এখন এলিঅটের কাছে দাবি তুলেছেন যে, কাব্যজীবনের প্রথমেই সাফল্যের সঙ্গে যেভাবে তিনি তাঁর কাজ সমাধা করেছেন ঠিক সেই ভাবেই অজ্ঞান অসমাপ্ত প্রব্লে সম্মুখীন হওয়া তাঁর দরকার। যাঁরা তাঁর *Four Quartets* পাঠ করবেন, তাঁদের কাব্যপাঠ সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ও উচ্চস্তরের কটিকবোধের প্রয়োজন। কবি হিসাবে এলিঅটের সাফল্যের কারণ তাঁর “auditory imagination”। তাঁর শিথিল অথচ স্থনিয়ন্ত্রিত “ফ্রী ভার্স” আধুনিক কথ্য ইংরেজী ভাষার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। যেমন, ষোড়শ শতাব্দীর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হ'ল স্পেনসারের *Shepherd's Calendar*-এ ব্যবহৃত Heroic line, এই পরিশুদ্ধিকরণ পূর্বযুগে প্রায় এক শতাব্দী ধ'রে চলে। ভাষা অতি ধীরে প্রায় অদৃশ্য-ভাবেই পরিবর্তিত হয়। এলিঅটের কান এমন তৈরি যে প্রচলিত কথাবার্তার শুঠানামা অতি সহজেই তাঁর কাছে ধরা দেয়। এ কথার সবচেয়ে বড় প্রমাণ তার *Prufrock* এবং *Sweeney Agonistes* থেকে *Quartets* পর্যন্ত কাব্যধারার সম্পূর্ণ নতুন ও জীবন্ত বিবর্তন।

মিস গার্ডনারের মতে, এলিঅটের এ ক্রমোন্নতি মিলটনের কাব্যজীবনের প্রগতির মত। মিলটন যেমন *Comus* এবং *Lycidas*-এর দ্বিতীয়মত থেকে *Paradise*

Lost-এর অভূত উচ্চাশ্রয়ে উপনীত হয়েছিলেন এবং সর্বশেষে *Samson Agonistes*-এ স্থনিয়ন্ত্রিত শিথিলতার চরমোন্নতি করেছিলেন, ঠিক তেমনি এলিঅটও তাঁর কাব্যজীবনে এই ধরনের সৌসাদৃশ্য দেখিয়েছেন। মিস গার্ডনার বহু বিষয়ে এলিঅট ও মিলটনের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন, অথচ এলিঅট মিলটনকে ভীষণভাবে আক্রমণ করেছিলেন। এলিঅট ও মিলটন উভয়েই তাঁদের auditory imagination-এর জগ্রে বিখ্যাত। উভয়েরই কাব্যের বনিয়াদ ঐতিহ্য ও ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের বহু ‘learned allusion,’ উভয়েরই মধ্যে গবিত পিউরিটান মনোভাব, উপদেষ্টার কড়া স্বর মাঝে মাঝে তাঁদের স্বাধীন দৃষ্টিকে ব্যাহত করেছে।

যাই হোক, এই ধরনের ভাষার ওপর দখল এলিঅটের নাট্যরচনার আর একটি উৎসমুখ। জ্যাকোবিয়ান নাট্যকারদের সময় থেকে এই প্রথম কোন Verse Drama-র অলঙ্করণ-পদ্ধতি শেক্সপীয়রের দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয়েও সম্ভব হয়েছে। এলিঅট অবশ্য তাঁর নাট্যকাব্য-রচনায় সাফল্যের পথে বহুদূর অগ্রসর হয়ে গেছেন এবং সম্ভবত তাঁর *The Cocktail Party*-র সম্বন্ধে যে রায় শোনা যায় তা হচ্ছে এই যে, অনেকেই তার মধ্যে কাব্য দেখতে পান না। শ্রোতা তার অজ্ঞাতেই সাধারণ মানুষের সাধারণ কথাবার্তা থেকে কাব্যের স্তরে উন্নীত হয়ে চলতি নাটকের সম্পূর্ণ বিরোধী এক অভিনব জগতে প্রবেশ করেছে।

এলিঅটের কাব্যসাধনার সবচেয়ে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর শব্দচয়ন। উদাহরণস্বরূপ, খ্রীষ্টীয় annunciation শব্দটির উল্লেখ করা যেতে পারে। বহুজননের মুখে আলোচিত হয়ে এই শব্দটি অর্থহীন হয়ে পড়েছে। এলিঅট এই ধরনের শব্দকে অত্যন্ত চাতুর্ঘ্যের সঙ্গে এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যাতে এই শব্দগুলি সম্পূর্ণ নতুন অর্থপ্রাপ্ত হয়েছে।

খ্রীষ্টান ধর্মশাস্ত্রের বহু অর্থাস্তরিত শব্দকে এলিঅট তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন, তাতে তার অর্থ পালটে গিয়ে আরও গভীর হয়েছে। পুরানো যুগের জ্ঞান ও ধ্যান-ধারণা এবং গত যুগের প্রতীক ও শব্দাবলীকে ধর্মীয় পটভূমিতে ব্যবহার করার দিক থেকে তাঁকে ঐতিহাসিক বলা যায় না। গত যুগের প্রতি এ যেন অনেকটা নকল

শ্রদ্ধা, এবং আধুনিক যুগে খ্রীষ্টীয় পুরাণকে এভাবে ব্যবহার করা একেবারেই অসম্ভব। এলিঅটের কাব্যে পুরানো যুগের এই ঐতিহ্য রক্ষা পায় নি, কিন্তু তাঁর কাব্য কতকগুলি শব্দ ও প্রতীককে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছে, অথচ এইসব শব্দই অত্যাশ্চর্য কবিদের কাছে কোন মূল্য পায় নি। এরই পরবর্তী কাজ হচ্ছে নতুন প্রতীক ও শব্দাবলী সৃষ্টি করা, যেমন জ্যেৎস ও ইয়েট্‌স্ করেছিলেন, কিন্তু এলিঅট নানা কারণে পুরানো শব্দগুলিকে অবিকৃত রাখাই উপযুক্ত বিবেচনা করেছেন। কারণ বহুজনের মুখে প্রচলিত হয়ে সাধারণত পুরানো শব্দগুলির একটা পরিচিত অর্থ দাঁড়িয়ে যায়। নতুন শব্দের এবং বিশেষ করে ব্যক্তিগত প্রতীক ও শব্দাবলীর (যা জনগণের মধ্যে বহুলপরিচিত নয়) চেয়ে ওই পুরানো শব্দগুলির উপযোগিতা আরও বেশী।

এ কথাও আজকের যুগে উল্লেখযোগ্য যে, বিংশ শতাব্দীর ইংরেজী কবিদের মধ্যে চারজন সর্বশ্রেষ্ঠ কবি: এলিঅট, ইয়েট্‌স্, জ্যেৎস (*Finnegan's Wake*-কেও আমরা 'এপিক' বলে অভিহিত করব) ও এঞ্জরা পাউণ্ড—এঁরা সকলেই ইতিহাসের এক অতি বিরাট অধ্যায়ের সর্বশেষ পরিচ্ছদের সঙ্গে সংযুক্ত। এই সর্বশেষ অধ্যায় হচ্ছে ইউরোপীয় সভ্যতার বর্তমান কাল। এমন একটি অধ্যায়ের সম্পূর্ণ পরিষ্কার সমাপ্তি এই সমস্ত কবিকে এক বিশেষ উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই চারজনের মধ্যে দুজন—জ্যেৎস এবং পাউণ্ড—মহাকাব্য লিখেছেন। এ কথাতে এই প্রমাণিত হচ্ছে যে, তাঁরা বর্তমান কালের ঐতিহাসিক মুহূর্তের মহত্বকে উপলব্ধি করেছেন। চারজনের মধ্যে দুজন আইরিশ কবি মহাযুদ্ধের সমাপ্তিকে সম্পূর্ণ গাভীর ও নিরাসক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যে, ইতিহাসের শেষ অধ্যায় সম্পূর্ণ হয়েছে—হেরাক্লিটাসের আশ্বনে যেন পুরানো কাঠখণ্ড গুঁজে দেওয়া হয়েছে। পাউণ্ড ও এলিঅট দুজনেই আমেরিকান, এঁদের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ অল্প ধরনের। আমেরিকার দেশপ্রেমিক কবি এঞ্জরা পাউণ্ড ভাগ্যের এক অদৃশ্য টানে মহাযুদ্ধসময়ের মহাকাব্যিক উপকরণে তাঁর আগ্রহ দেখাতে গিয়ে শোচনীয় মূল্য দিয়েছেন। তিনি পুরানোকে লুণ্ঠন করেছেন ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলার জন্তে। তাঁর কাব্য সম্বন্ধে জর্নৈক বিশিষ্ট সমালোচক বলেন,

“His verse is a magpie's nest full of the junk of dismantled civilizations, China and Provence, Greek gods, and all kinds of European cultural bric-a-brac, some of it almost new, bundled pell-mell overseas to adorn a brand-new American poetic tradition.”

এলিঅটের আদর্শ এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি তাঁর স্বকীয় পছন্দ অনুসারে নিজেকে পুরানো পৃথিবী ও প্রাচীন যুগের সঙ্গে একাত্ম করেছেন, কিন্তু মহাযুদ্ধের সমাপ্তি সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি ইয়েট্‌স্ বা জ্যেৎস থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কারণ গৌরবময় অতীতকে তিনি অগ্রাহ্য করেন নি। তিনি অনুভব করেন যে, এখনও একটি ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎ আছে, যেমন ইয়েট্‌স্ বা জ্যেৎস মনে করেন, প্রাচীনই সব কিছু, ভবিষ্যৎ অর্থহীন। প্রকৃতপক্ষে এদিক থেকে এলিঅট পাউণ্ডেরই নিকটবর্তী।

পাউণ্ডের মত তিনি পরিচিত দেবমন্দিরকে লুণ্ঠন করেন নি। তিনি যা করেছেন তা হ'ল ধর্মীয় জ্যোতিকে অগ্নির রাখা। যদিও তাঁকে দেখে মনে হয় যে, তিনি বোধ হয় ইউরোপীয় প্রাচীন যুগের শেষ বংশধর এবং একই সঙ্গে আমেরিকান ভবিষ্যতের পূর্বপুরুষ। তাঁর প্রতিভা নিঃসন্দেহেই এক ভবিষ্যতের স্রোতক। এই জগ্রেই তিনি এ কথা চিন্তা করা সমীচীন মনে করেছেন যে, জাতির ভাষার পরিশোধন প্রয়োজন। তিনি যে নিজের প্রয়োজনেই কবি-হিসাবে প্রচলিত প্রতীককে ব্যবহার করেছেন তাই নয়, প্রচলিত ভাষার কাব্যিক সৌন্দর্যকেও শুদ্ধ করে নিয়েছেন। তাঁর কাব্যে অলঙ্করণ কখনই ব্যক্তিগত নয়। এমন একটি শব্দসম্ভার তিনি তৈরী করেছেন যা আগামী একশো বছরের কবিদের অনুপ্রেরণা দেবে যতদিন না বর্তমান ভাষার বড় রকম কোন পরিবর্তন ঘটে।

এলিঅট গত বিশ বছরে পৃথিবীর ইতিহাসে যত রকমের ভাব ও অভিজ্ঞতার সমাবেশ ঘটেছে তার একটি সমীকরণ করেছেন। কিন্তু এ কথাও এ অর্থ নয় যে, তিনি সমস্ত কিছুকেই গ্রহণ করেছেন। তিনি সমাজের সেই বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মুখপাত্র, ধার্মিক ক্লাসিক্যাল, ইউরোপীয় ও ইংরেজী সাহিত্যের মানবীয় ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। খ্রীষ্টীয় প্রতীক ও ধর্মশাস্ত্র এবং আধুনিক ইউরোপের সেই সব শহর

ষাদের মূল প্রাচীন যুগের মধ্যে নিহিত এবং ভবিষ্যতের প্রবাহ যা ইতিমধ্যেই তাদের ভিত্তিমূল পর্যন্ত ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের তরফ থেকেও তিনি কথা বলেছেন। যা তিনি গভীরভাবে গ্রহণ করেন নি তেমন অনেক কিছুই মধ্যে আছে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান অদ্ভুত বিশ্ব, যার শেষ বিন্দু আমাদের বাস্তব পৃথিবীকে ক্রমশই লুপ্ত করতে উদ্ভূত। আধুনিক মনস্তত্ত্বের ক্রমবর্ধমান সীমায় দেবতা ও দানব রাতারাতি আমাদের স্বপ্নে তাদের আধিপত্য বিস্তার করছে। ইয়েটস, কিছু পরিমাণে অভ্যন্তর, এবং সবার ওপরে জয়েস এই ধরনের প্রভাব এলিঅটের চেয়ে বেশী গ্রহণ

করেছেন। যারা নব্যবিজ্ঞানের প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন, তাঁরা এলিঅটের মধ্যে এসব জিনিসের অভাব লক্ষ্য করবেন—বিশেষ করে জয়েসের তুলনায়। কিন্তু যদিও এলিঅটের রাজস্ব জয়েসের তুলনায় সংকীর্ণ ও প্রাদেশিক, তবুও যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাঁর কাব্যের ভিত্তি তার সঙ্গে অনেকটা আমাদের অন্তরের মিল আছে। এই কারণেই তিনি বাস্তব ও কাল্পনিক বিশ্বকে আঙ্গকের যুগের অধিকাংশ সমাজ ও কল্পনা-প্রবণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এইজন্মেই বোধ হয় তিনি আঙ্গকের বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী জীবিত কবি হিসাবে আখ্যাত হতে পেরেছেন।

শিশু তরু

কল্যাণী প্রামাণিক

বাগান-তরু কত গাছই ছিল,
ছিল নাকো একটি বকুলতরু,
তারি তরে সারা বাগান মোর
হয়েছিল শুধু নীরস মরু।
প্রাণ-সাঁঝে বন্ধু দিলে আনি
একটি ছোট শিশু বকুলচারী,
নিজের হাতে রোপণ করে দিহু
বাগানে মোর, নামে শাওনধারা।
ঝিঁঝি-ডাকা জোনাক-জলা রাতে
ফুল-না-কোটা ছোট তরু হতে
কেমন করে গন্ধ এল ভাসি,
হৃদয় হল আকুল স্বপ্নস্রোতে।
দিনের বেলা ওড়ে যত পাখি,
স্বর্ধমাখী, রৌদ্রে ডানা রাখা,
বকুলচারীর ব্যগ্র কচি ডালে
তাহাদেরি নীড়ের স্বপ্ন মাখা।

কোমল কচি কিশলয়ের ফাঁকে
ঘুঘুপাখির নাহি-গাওয়া গান,
মেঠো পথে পখিক যত চলে,
বকুলতরু গন্ধ করে দান।
সারাদিনের কাজের অবসরে
ছপ্পুরবেলা ফুল-ছড়ানো ছায়া
বকুলতলে কাব্য নিয়ে হাতে
জড়িয়ে আসে চোখে কিসের মায়া।

বন্ধু, তোমার ছোট চারটিতে
বিশ বছরের পরের ছবি গাঁথা,
সেই স্থখে আজ ধারামুখর রাতে
এক হল না দুটি চোখের পাতা ॥

গ্রন্থ-পরিচয়

কবিতা

মিতার জন্ম রোমান্টিক কবিতা : শান্তিকুমার ঘোষ। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭ ইন্ড বিলাস রোড, কলিকাতা-৩৭। দেড় টাকা।

কাব্যটির নামকরণ থেকেই কবিতাগুলির মূলপ্রকৃতি উদ্ঘাটিত হয়েছে। প্রকৃতি এবং প্রেমই কাব্যগ্রন্থটির উপজীব্য। দেশ-বিদেশের স্বপ্নসঙ্ঘনে এক রোমান্টিক রূপছায়া গড়ে উঠেছে। কবি এই স্বপ্নের প্রতিমাকে নিটোল ছন্দের মধ্য দিয়ে আরতি করেছেন। এক রোমান্টিক পরিবেশ কবির সেই শিখরচারিণীকে ফুটিয়ে তুলেছে—বিশ্বপ্রকৃতির এই রোমান্স ছাড়া বোধ হয় সেই “অতলান্তিক মায়া”র ছবি ফুটত না :

“মন্দির হয়ে ঝাউগুলি ওঠে যেখানে নিধর ছায়া—

চিকণ জলে পা ছুটি ভুঁবিয়ে বসেছে একলা মেয়ে,

ধনুকের মত আয়ত চক্ষে অতলান্তিক মায়া,—

সৃষ্টির সেই প্রথম প্রতিমা দেখেছি অবাক চেয়ে।”

কবির রোমান্টিক কল্পনা অতীতমুখী স্বতিচারণায় আবিষ্ট : “সর্পিল পথে ধাপে ধাপে ওঠে প্রাক-পুরাণিক ছায়া।”—এই প্রাক-পুরাণিক ছায়া প্রতিটি কবিতায় রূপকথার আবেশ বয়ে নিয়ে আসে। আধুনিক যুগের কবি হয়েও “মিশরের মরুতান” ও “মোনালিসা”র স্বপ্নঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেন নি কবি—পৃথিবী ছাড়িয়ে এক ছায়া-গোধূলির রোমাঞ্চ কবিকে বার বার মুগ্ধ করেছে।

প্রকৃতির একটি কোমল-পেলব আত্মদান কবিতাটির সর্বদেহে বিজড়িত। “এখানে নির্জন দ্বীপ”—কবিতাটি জীবনানন্দের কবিতার আত্মদানবাহী—দীর্ঘ-মহুর ছন্দে এক অপরূপ দ্বীপের উপকথার আমন্ত্রণ :

“দ্বীপময় এ জগতে আদম-ইভের চোখে দেখেছি হৃদয়

স্বর্ষমুখী দিন গেলে চন্দ্রমল্লী রাত আসে উৎসবেতে সারা।

প্রান্তরে প্রবাল-রোদ, শিখরের শেষ ছায়া, দূর বালুচর,

ভিতরের উপত্যকা উজ্জল রেখেছে একা কোহিনূর তারা।”

কবি উপমার ভাষা অতি সহজেই আয়ত্ত করেছেন—অনেক ক্ষেত্রে উপমার কারুকরণেই ভাষা সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতির বর্ণনায় কবি ইন্দ্রিয়-সচেতন—তাই বর্ণ-গন্ধে তাঁর

প্রতিটি চিত্র দূর-সৌন্দর্যের বার্তাবহ। বিংশ শতাব্দীর কবির চোখে আজও আদমের বিশ্বয়-মুগ্ধ স্বপ্ন—কবি তাঁর সেই স্বপ্নসাধকে, বহু অজানা দিগন্তে প্রসারিত করেছেন। দু-একটি রূপকল্প সৃষ্টিতে কবির মৌলিকত্ব আছে—অবশ্য রোমান্সই তার উৎসমুখ :

“স্বপ্নচালিত জানোয়ারগুলো তিনবার কঁদে ওঠে—

গহ্বরে বাজে প্রতিধ্বনি যে গুণে গুণে ছয়বার :

বেবুন-শিশুর কল্পিতমুখ স্তন থেকে খসে পড়ে।”

প্রকৃতির এই স্বভাবাচ্ছন্ন চিত্র জীবন্ত। গ্রন্থটির প্রায় প্রত্যেকটি কবিতা এমন চিত্ররস-সমৃদ্ধ।

গ্রন্থটির মধ্যে এক অরূপ রোমান্টিক মন থাকলেও গাঢ়তার অভাব আছে—শব্দ অর্থ ও বর্ণের অন্তরালে কোন গভীর ভাবসত্য নেই। এর অধিকাংশ কবিতাই Fancy-র, ঠিক imagination-এর নয়। গ্রন্থটির সবচেয়ে দুর্বল অংশ সনেটগুলি—সনেটের বড় কথা কেন্দ্রবদ্ধতা ও গাঢ় সংহতি গুণ। কিন্তু এখানকার সনেট অথবা সনেট-ধর্মী কবিতায় এই গুণটির একান্ত অভাব।

র. না. রা,

গবেষণা-সাহিত্য

ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা : ত্রিহুঙ্গর বন্দ্যোপাধ্যায়। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স লিমিটেড, ১৪ বক্স চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা-১২। সাড়ে চার টাকা।

বাংলা-সাহিত্যে গত দুশো বছরের মধ্যে এমন অনেক কবিতা রচিত হয়েছে যার মধ্যে সমসাময়িক কালের ইতিহাসের নানা উপকরণাদির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। গ্রন্থকার এ-জাতীয় রচনাকে ‘ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা’ আখ্যা দিয়েছেন এবং মুখ্যত ১৭৫১-১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দ এই অনতিপুর্নাতন কিঞ্চিদধিক এক শত বৎসর কালের উপর চোখ রেখে তথ্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিকের মন নিয়ে কবিতায় ইতিহাসের উপাদান সন্ধান করেছেন। এমন সব উপাদান, যার দ্বারা বাঙালীর ইতিহাসের একাধিক ছিন্ন সূত্র গ্রথিত হতে পারে, একাধিক অবজ্ঞাত কোণের উপর নতুন আলোকপাত হতে পারে। বাংলা দেশের এবং বাঙালী

জাতির ইতিহাস-প্রণয়নে ইতিহাসকারগণ এতাবৎ বহির্ঘটনার উপরই তাঁদের সবটুকু দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। সম্প্রতি ইতিহাসরচনার এই গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে; বাংলার কাব্য, সাহিত্য, রূপকথা, লোকগাথা, কিংবদন্তী, ছড়া, প্রবাদ ইত্যাদির মধ্যে ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত নানা স্ফুটের সাহায্যে বাংলার ইতিহাস নতুন ক'রে গ'ড়ে তোলার চেষ্টা চলেছে। বিশেষ, কাহিনী-কবিতা-জাতীয় রচনা ইতিহাসের একটি নির্ভরযোগ্য দিগ্-নির্দেশক। এ জাতীয় রচনার বিশ্লেষণ ইতিহাসেরই বিশ্লেষণ। সেই দিক দিয়ে বর্তমান গ্রন্থখানির মূল্য আছে, এবং তা বাংলার ইতিহাসের ছাত্র ও গবেষণাকারীদের সহায়ক হতে পারে। এ ধরনের বিষয়ের উপর এই বোধ করি বাংলায় প্রথম কাজ। প্রাথমিক কাজে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক, তবে লেখক অগ্নায়াদে বৃহৎ উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টা কোথাও করেন নি; গ্রন্থটির ভিতর গবেষকমূলক তথ্যাগ্রহ ও অধ্যবসায়ের ছাপ সুস্পষ্ট।

লেখক তাঁর উদ্দেশ্যের পরিপূরক কবিতা সংকলনের ক্ষেত্রে ঈশ্বর গুপ্তে এসে থেমেছেন। লেখকের মতে ঈশ্বর গুপ্ত এক যুগের শেষ; রঙ্গলালে নতুন যুগের শুরু। রঙ্গলাল-হেম-নবীনের কাব্য সমসাময়িক ইতিহাসের বহু মূল্যবান সংকেত ও ইঙ্গিতবাহী হ'লেও কালের সীমাবদ্ধতার জন্তেই লেখককে তাঁদের আলোচনায় নিবৃত্ত থাকতে হয়েছে। তবে গ্রন্থটির প্রারম্ভিক আলোচনায় লেখক বাংলা-কাব্যের অনেক দূর কাল পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি সঞ্চালিত করেছেন। সেই হিসাবে ভূমিকাটি বিশেষ মূল্যবান হয়েছে। মোটের উপর, বইখানি বাংলা-সাহিত্যের গবেষণামূলক রচনা-তৎপরতার দ্বারা একটি নতুন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংযোজন। উপযুক্ত মহলে এই গ্রন্থের সমাদর হবে ব'লে বিশ্বাস করি।

ন. চ.

উপগ্ৰাস

ত্রিবেণী : অমরুপা দেবী। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ১০ হারিসন রোড, কলিকাতা-৭। মাড়ে পাঁচ টাকা।

শোভন প্রচ্ছদপট এবং স্ক্রুচিসম্পন্ন মূদ্রণের বৈশিষ্ট্য নিয়ে শ্রীযুক্তা অমরুপা দেবীর বিখ্যাত উপগ্ৰাস 'ত্রিবেণী'র নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ঘটনাটি নানা দিক থেকেই

তাৎপর্যপূর্ণ। 'ত্রিবেণী' কেবল অমরুপা দেবীর অত্যন্ত মার্খক রচনাই নয়—সমগ্র বাংলা-সাহিত্যেই একটি মহান সাহিত্য-কীর্তি।

বাংলার ইতিহাসের এক বিচিত্র অধ্যায় অবলম্বন ক'রে 'ত্রিবেণী' রচিত হয়েছে। গোঁড়ের সিংহাসনে আসীন দ্বিতীয় মহীপালদেব যেদিন স্বেচ্ছাচারের বশায় বাংলা দেশকে প্রাবিত ক'রে দিয়েছিলেন, সেদিন সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাহিষ্-নামস্ত দিব্যোক এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমের নেতৃত্বে গণশক্তির বিপুল অভ্যুত্থান ঘটেছিল। মহীপালদেব পরাজিত ও নিহত হন—পৌণ্ড্রবর্ধনের রাজপদে বৃত্ত হন প্রথমে দিব্যোক, তার পরে ভীম। পরিশেষে মহীপালদেবের অমরুপা স্বনামধন্য মহারাজ রামপালদেব যুদ্ধে ভীমকে পরাজিত ক'রে অপহৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন।

ইতিহাসের এই বিস্তৃত পটভূমিকায় 'ত্রিবেণী' রচিত হয়েছে। গভীর ঐতিহাসিক জ্ঞান, চরিত্রচিত্রণে স্বভাবসিদ্ধ নৈপুণ্য এবং গল্প-গ্রন্থনের মার্খক কলাকৌশলে সমগ্র কাহিনীটি উচ্চাঙ্গের শিল্পসিদ্ধি লাভ করেছে। বইটি পড়তে পড়তে অতীতের বাংলা দেশ আমাদের চোখের সামনে প্রত্যক্ষবৎ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে—ইতিহাস এবং ব্যক্তি-জীবনের অপর সমন্বয়ে এই বিরাট গ্রন্থটি মনকে উদ্দীপ্ত ও আলোড়িত ক'রে তোলে। ভাষার ঐশ্বর্যময় কারুকার্যের গুণে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যেন অবিচ্ছিন্ন একটি স্রবের প্রবাহ অমরুপা করা যায়।

পট্টমহাদেবী লজ্জা, রামপালবধু সন্ধ্যা, ভীমের স্ত্রী উজ্জ্বলা প্রভৃতি নারীচরিত্র অবিশ্মরণীয় কৃতিত্বের সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। তেমনি মার্খকতা লাভ করেছেন ভীম, মহামাতা, রামপাল এবং কুমার রুদ্রদমন প্রভৃতি। একটি উদার গম্ভীর মহিমায় উপগ্রাসটি দীপ্তিমণ্ডিত, এবং নিঃসন্দেহে বইখানিকে 'ক্লাসিক সাহিত্যের' পর্যায়ে স্থান দেওয়া চলে।

চিন্তা, মনীষা এবং কল্পনার দৈব যুগে বাংলা-সাহিত্যে সব চাইতে প্রকট হয়ে উঠেছে—লঘুচিত্ততাকে তৃপ্ত করবার জন্তেই যে-কালে লেখকের সমগ্র প্রয়াস নিয়োজিত, সেই যুগে 'ত্রিবেণী'র এই নবতম প্রকাশ বিবিধ কারণেই অভিনন্দনযোগ্য।

না. গ.

ছোটগল্প

ধূপকাঠি : নরেন্দ্রনাথ মিত্র। সত্যজিত লাইব্রেরি, ১২৭ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা-৬। সাড়ে তিন টাকা।

ছোটগল্প রচনায় শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র সিদ্ধহস্ত। আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের সমকালীন সেবা গল্প-লিখিয়েদের তিনি একজন। শহুরে মধ্য ও নিম্নমধ্যবিত্ত সংসারের চিত্রচরিত্রের রূপায়ণে তাঁর তুল্য কুশলী শিল্পী বোধ হয় আর নেই। লেখকের ভাবার ভৌলটিও বড় মধুর। গল্পের প্রবাহের মধ্য দিয়ে একটি মিহি মোলায়েম ভাবশ্রোত অবিচ্ছিন্ন ধারায় ব'য়ে চলেছে। ভাবার বলিষ্ঠতার অভাবের পূরণ হয়েছে ভাবার মাধুর্যের দ্বারা। আরও একটি গুণে লেখকের ছোটগল্প সকলের মনোগ্রাহী হয়। সেটি তাঁর সহজ রসরসিকতা। কখনও শব্দ-যোজনার নৈপুণ্যে কখনও সংলাপের বিজ্ঞানে তাঁর এই স্বাভাবিক রসবোধ গল্পের ভিতর পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। চরিত্রগুলিও আমাদের নিত্যন্ত চেনা, পরিচিত জন। তবে চরিত্রগুলির বয়স নির্বাচনে তারুণ্যের প্রতিই লেখকের সমবিক পক্ষপাত। এতে লেখকের এক ধরনের শ্রেণী-সচেতনতার প্রমাণ পাওয়া যায়, যা প্রবীণ বয়সী পাঠকের সম্পূর্ণ কটিকর মনে নাও হতে পারে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের লিখনরীতির এই সব কটি বৈশিষ্ট্যই তাঁর সাম্প্রতিকতম গল্পসংকলন গ্রন্থ ‘ধূপকাঠি’তে সংবদ্ধ রয়েছে। সবচেয়ে এগারোটি গল্প বইটিতে আছে। তার সব কয়টিরই আকার মোটামুটি বড়। লেখক আজকাল আটোলো সংক্ষিপ্ত-পরিসর নিটোল ছোটগল্প লেখা ছেড়েই দিয়েছেন ব'লে মনে হয়। ‘হলদে বাড়ী’, ‘অসমতল’ ও ‘পতাকা’ বইতে যে ধরনের ঠাসবুনন ছোট-গল্পের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল, এখন আর তেমন গল্পে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি: কোন উৎসাহ নেই। পরিবর্তনটি উন্নতির অভিযুক্তি হয়েছে বলতে পারি নে। যদিও আশঙ্ক্য হয়ে লক্ষ্য করেছি, লেখকের পূর্বাভাস দেহবাদ ইদানীংকার রচনায় অনেক পরিমাণে সংকুচিত হয়েছে। এটিকে সুস্পষ্ট অগ্রগতি ব'লে মানব। গল্পের আয়তন বাড়ানোর ব্যাপারে লেখকের অশেষ ধৈর্যের প্রশংসা করব, কিন্তু পরিমিত-জ্ঞানের প্রশংসা করতে পারি নে। “পূর্ণ” গল্পটির মাত্রাতিরিক্ত দৈর্ঘ্য নিরতিশয় ক্লান্তিকর। এই দিক থেকে

“বেহরো” গল্পটিও পাঠক-মনে কম বেহর জাগায় না। বরং সেই তুলনায় স্বল্পপরিসরে সীমিত “ধূপকাঠি” গল্পটি কত হাল্কা। একটি ভাগ্যহতা অনাথা তরুণীর দীর্ঘকালে ধূপকাঠির স্বগন্ধ বেপথুমান ও ময়ূর হয়ে আছে। নিঃসন্দেহে এই বইয়ের শ্রেষ্ঠ গল্প “নাকুটমণি”। একটি নিয়মিত হিন্দুস্থানী দম্পতির দাম্পত্য-ভালবাসার কাহিনী। এই গল্পটিতেই প্রমাণ, লেখক তাঁর অভ্যস্ত মধ্যবিত্ত পরিবেশ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে মাঝে মাঝে যদি তাকে অন্তর্য স্থাপন করেন, তা হ'লে তিনি উপকৃত বই অপকৃত হবেন না। “রস” গল্পে একবার এ কথার প্রমাণ পেয়েছিলাম, “নাকুটমণি”তে পুনরায় তা মিলল।

অগ্রান্ত গল্পের মধ্যে ভাল লাগল “এ্যাজমা,” “চাকরি,” “অমনোনীতা” ও “চিঠি”। এ্যাজমা গল্পের চাতুর্ঘ ও কোতুক চেখে চেখে ভোগ করবার মত। চিঠি গল্পের শেষটুকু অনবদ্য। “সহযাত্রীণী” গল্পের অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব গানিকর। এ বইয়ের সব চাইতে দুর্বল গল্প হ'ল “শেফালী”।

পরিশেষে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের দৃষ্টিভঙ্গি ও গল্পগ্রন্থনরীতি সম্পর্কে সাধারণভাবে দু-এক কথা বলব। ‘ধূপকাঠি’ গল্পসংগ্রহপাঠে বিশেষভাবে সমালোচকের মনে এ বক্তব্যের উদ্রেক হয়েছে। লেখকের কাহিনীবিশ্বাসের ধারার মধ্যে অপরিণীত শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু সেই সন্দেহ এও লক্ষ্য না করে পারা যায় না যে, লেখক অতিরিক্ত মাত্রায় মধ্যবিত্ত মানসিকতার দ্বারা আবিষ্ট। গল্পগুলির ভিতর মধ্যবিত্তজনোচিত যে সংসারজ্ঞান ও বৈষয়িকতার চেতনার পরিচয় মেলে তা মোটেই আশ্চর্যজনক শিল্পবুদ্ধির সঙ্গে স্থাপন হয় না। লেখকের কল্পনায় বলিষ্ঠতারও অভাব। সেটির মূল ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠতার অভাবের ভিতর বিধৃত থাকা আশ্চর্য নয়। শিল্পীর অতশত সংসারচেতনা সঙ্গুণ নয়।

তবু বলব, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পরচনার হাত অতিশয় পাকা। বেশ বিদেশের সেবা গল্প-লিখিয়েদের সঙ্গে তাঁকে এক কোটায় ফেলা চলে। এমন একজন পাকা লিখিয়ে আজীবন শহুরে নিম্নমধ্যবিত্ত সংসারের গল্প লিখে লিখে আপনাকে ক্ষয় করবেন ভাবতেও কষ্ট হয়। লেখক তাঁর বিষয়ের পরিধি সম্প্রসারিত করুন, রচনার সুরে সমধিক বলিষ্ঠতার অবতারণা করুন, তা হ'লে তাঁর শিল্পরচনার আর মার নেই।

সংবাদ-সাহিত্য

এই চল্লিশ বৎসর হইতে চলিল, ভবিষ্যৎপ্রভা কবি কাজী নজরুল ইসলাম একটি বাংলা-কবিতায় লিখিয়াছিলেন—

“নীল সিয়া আসমান লালে লাল ছুনিয়া
আম্মা লাল তেরী খুন কিয়া খুনিয়া।”

কবি যে এই ভবিষ্যৎপ্রভা ভারত-মাতার লাল বা ছাল জওহরলালকে উপলক্ষ্য করিয়াই লিখিয়াছিলেন, তাহাতে আমাদের সংশয় নাই। কবি বলিয়াছিলেন, আমাদের মামুলি আকাশ যদিচ নীলই আছে, কিন্তু ছুনিয়া লালে লাল হইয়াছে। হে জননী (ভারতবর্ষ) তোমার লাল পৃথিবীর) খুনেরে খুন করিল, অর্থাৎ পৃথিবীতে শাস্তি স্থাপন করিল। এই ছই পংক্তির শেষে বাংলা “আমেন” শব্দটি যোগ করিতে কবি বিব্রত হইয়াছিলেন, আমরা তাই বলিতেছি, আমেন, শাস্তি, শাস্তি, শাস্তি।

নেহরুজী রুশিয়া সফর শেষ করিয়া অত্র বলিয়াছেন, তিনি রুশিয়াতে লৌহ-যবনিকা দেখেন নাই। রুশিয়া-সফরান্তে আমাদের সত্যেন্দ্রনাথ ঠিক এই কথাই বলিয়া-ছিলেন। কিন্তু তাহার পরেই স্তালিনাত্মজেরা ও বেরিয়া অ্যাও কোং কোথায় গেলেন? শব্দসহ বা সাউণ্ড-প্রকৃষ্ট লৌহ-যবনিকায় ঠেকিয়া এই প্রশ্ন প্রতিধ্বনিও তুলে না। না তুলিলেও আমাদের সন্দেহমাত্র নাই, ঐচ্ছিক মতন ছই দিনের ভুড়ভুড়ি কাটিয়া ইহারা শাস্তির মহাপারাবারে বিলীন হইয়াছেন।

পণ্ডিতজী পাতি দিয়াছেন, আগামী আগস্ট মাসের পাঁচ তারিখে হিরোশিমায় প্রথম আণবিক বোমা পতনের দশম বার্ষিক-স্মৃতি-সম্মেলন করিতে হইবে। হিরোশিমার ধ্বংসলীলা লৌহ-যবনিকার মত তিনি স্বচক্ষে দেখেন নাই, কিন্তু তাহার কথা শুনিয়াছেন। মহামতি স্তালিনের উদ্বোধনকালে একদা নিম্নোক্ত রাজির নিঃসঙ্গ অন্ধকারে তাঁহার ব্যাপক ষাটহাজারী শুদ্ধিযজ্ঞের (পার্জ) কথাও কি নেহরুজী শুনে নাই? সেই ঐতিহাসিক রাজির স্মৃতি-সম্মেলনের নির্দেশই বা তিনি দিলেন না কেন? সম্ভবত সোমনাথ-ধ্বংসের পাপ তিনি ঔরংজেবের স্বর্গে চাপাইবার

পক্ষপাতী নহেন। আমরাও নহি। তবে এ কথাও পণ্ডিত নেহরুকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, অত্রায়কে ঘটাইয়া স্মরণ করিলেই জায়ের আমদানি হয় না। ছক্কতকে লক্ষ্য দিবার ক্ষমতা যেখানে পৃথিবাব্যাপী ছই মিনিটের নীরবতাই যথেষ্ট হইত, সেখানে বাকবর্ষী সভা করিতে গেলেই হিংসার উজ্জ্বল প্রতিশোধস্পৃহার প্রবৃত্তি জাগ্রত হইবে, কল্যাণ আসিবে না।

সেনিন-স্তালিনের স্মৃতিপুত্র জেমলিনে বুলগানিন ইন্ডিয়ায় প্রাইম-মিনিষ্টার ও ইন্দিরা গান্ধীকে যখন আতিথ্যের বস্ত্রায় সিন্চিত করিতেছিলেন, যেনন তখন মহাচীনের কারাগারের রক্তপথে বন্দী ইয়াঅনু কি বৈমানিকদের সন্ধানে বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছিলেন। পশ্চিমের কুট-কৌশলী রাজনীতিজ্ঞেরা ইন্-ভাগান্ত ও অন-ভাগান্ত শব্দের দ্বন্দ্ব-দ্বন্দ্ব অসম্বদ্ধ মাহুষদের সচেতন করিতে চাহিতেছেন। তাঁহাদের নিন্দিত কন্দীতে কেহ যেন ধরা না পড়েন।

এই তো মাত্র সেদিনের কথা, রবীন্দ্রনাথ মহাহুঃখেই “জাগ্রত ভগবান”কে সন্মোদন করিয়া “দেশ দেশ নমিত করি” লিখিয়াছিলেন। জাগ্রত ভগবান তৎপর হইয়া তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিয়াছেন। আজ আমরা ভারত-মাতাকেই সন্মোদন করিয়া বলিবার অধিকারী হইয়াছি—

দেশ দেশ নমিত করি মমিত তব ভেরী,
ছুটিল তব বীরপুত্র রুশ-চীন-যুগো-‘মেরি’।*

দিন আগত ঐ তুমি হাঁকো মা-মার্টে:

ছিলে এতদিন গুপ্ত মাতা সবজন পশ্চাতে
লইলে বিশ্বকর্মভার আশুসরি নিঃহ হাতে।

প্রেরণ কর ভারতী, তব ‘পঞ্চ’পর আহ্বান হে,
জাগ্রত হিন্দুস্থান হে, জাগ্রত হিন্দুস্থান।

সত্যি, সর্বত্র আজ ভারতের জয়জয়কার। সংবাদপত্রে দেখিলাম, ভারতের শাড়ি পরিবার জন্ত পাশ্চাত্যের নারীরা কাড়াকাড়ি লাগাইয়া দিয়াছে; আবার চঞ্চল কর্মজীবনের

* যুগো-যুগোনাতিয়া, ‘মেরি’=আমেরিকা, + পঞ্চ=পঞ্চশীল

অন্তে ভারতীয় মতে আশ্রম স্থাপন করিয়া শাস্ত্র বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিবার জন্য আমেরিকায় প্রভূত আগ্রহ দেখা যাইতেছে; সর্বোপরি ভারতের পঞ্চশীল—পণ্ডিত জগদ্বলালের ভাষায় ওই সকলের শিলশিলায় প্রগারলাভ করিতেছে। সত্যই তিনি ভাগ্যবান। মহামুনি বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের তেইশ-চব্বিশ শতাব্দী পরে জার্মানির সোপেনহর্ন, আমেরিকার এয়ার্সন ও রুশিয়ার টলস্টয়ের রূপায় (ফাউ টি. এস. এলিয়ট, আলডুস হাক্সলি, সমারসেট মম ও হার্মান হেস) বৌদ্ধ “নির্বাণ” শব্দটি চালু হইয়াছে; কিন্তু জগদ্বলালের “পঞ্চশীল” পরিকল্পিত হওয়া মাত্র দ্বিবিজয় করিল। “নির্বাণ” শব্দটির মত “পঞ্চশীল”ও যে দার্শনিক কেতাব ও উপস্তাসের পৃষ্ঠায় স্থায়ীকলাভ করিবে, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহমাত্র নাই।

ভারত স্বাধীন হইবার দুই বৎসর পরে ১৯৪২ সনে দিল্লীর কনস্টিটিউশন হাউসে ভারতের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা বিষয়ক একটি সর্বভারতীয় সম্মেলন হয়। স্থির হয়, সেদিন হইতে পনের বৎসরের মধ্যে ইংরেজীর স্থান হিন্দী ধীরে ধীরে গ্রহণ করিবে। এই শঠন: শঠন: গতির প্রাথমিক পদক্ষেপ হওয়া উচিত ছিল উপযুক্ত পরিভাষা স্বজন। বহু বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে নাগপুরের ডক্টর রঘুবীরকে দিয়া যে পরিভাষা গঠিত হইয়াছে, তাহাকে পৃথিবীর অগ্রতম শ্রেষ্ঠ ভাষা-তত্ত্ববিদ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন, “ভয়াবহ,” ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জগদ্বলাল বলিয়াছেন, “নৈরাশ্রজনক”। অথচ ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসাবে ঘোষণা করিয়াছেন, ১৯৪২ সনের সংকল্প কার্যে পরিণত করিতেই হইবে, অর্থাৎ ইংরেজী আর থাকিবে না। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি নাগপুরের এক সভায় তাঁহার স্ফুটন্ত ও সূদৃঢ় অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতের রাষ্ট্রভাষা-রূপে ইংরেজীকেও রাখিতে হইবে, কারণ ইহা হইল সমগ্র পৃথিবীর আন্তর্জাতিক ভাব-আদানপ্রদানের ভাষা, ব্যবসাবাণিজ্য-পরিচালনের ভাষাও বটে। এই মত তাঁহার আজিকার নয়। বর্তমান সংখ্যায় “আত্মস্বত্ব”তে উদ্ধৃত তাঁহার একটি কুড়ি বছরের (৩১ জানুয়ারি, ১৯০৬)

পুরাতন প্রবন্ধে তিনি হিন্দুস্থানীর পাশাপাশি ইংরেজীও স্থায়িত্ব দাবি করিয়াছিলেন। ভারত-উন্নয়ন-পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে হইলে আজ সর্বাধিক প্রয়োজন বিজ্ঞান (আণবিক শক্তি, স্থাপত্য ও পুর্ন, চিকিৎসা, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান ও উচ্চগণিত বিষয়ক) ও কারিগরী শিক্ষার। ইংরেজীর সাহায্য ব্যতীত এই সকল শাস্ত্র অধিগত করিবার এখনও কোনও উপায় নাই। তবু বাংলা ভাষায় ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের কয়েকটি উচ্চকোটির গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, হিন্দী বা হিন্দুস্থানীতে তো কিছুই নাই। এই সকল অতিপ্রয়োজনীয় বিষয়ের শিক্ষা ব্যাপারে ইংরেজীকে আরও দীর্ঘকাল, যদি রাখিতেই হয়—সরকারী কার্য-পরিচালনের জন্য ইংরেজী বর্জন করিয়া লাভ কি? ইতিমধ্যেই ইংরেজী বর্জনের প্রস্তাবে বহু অহিন্দী প্রমোদে অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। সর্বজাগতিক বৃহত্তর বৃত্তকে পরিহার করিয়া ক্ষুদ্রতর বৃত্ত বা গণ্ডিতে বদ্ধ হইতে কোনও বুদ্ধিমান মানুষই চাহিবে না। সভায় সম্মতিতে অর্থাৎ রাজনৈতিক প্র্যাটিকর্মে রাজ্যক হিন্দী যত ইচ্ছা চলিতে থাকুক, সরকারী দপ্তরের ইয়েন-নো-ভেরিগুড হিন্দীতেই চলুক; কিন্তু সর্বভারতীয় গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্যে ইংরেজীর ব্যবহার বজায় রাখা হউক। ১৯৪২ সনের মত আবার একটি সর্বভারতীয় সভা দিল্লীতে আহ্বান করিয়া পাকাপাকি রকম এই বিষয়ে ভবিষ্যৎ-পন্থা নির্ধারিত হউক।

সাদারণ ব্রাহ্মসমাজের সরকারী মুখপত্র ‘তত্ত্ব-কোমুদী’ পত্রিকার গত ১৬ই আষাঢ়ের সংখ্যায় সম্পাদকীয় “নানাকথা”য় লিখিত হইয়াছে—

[ভারতের] দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাঠামো তৈয়ার করিবার ভায় পড়ে শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উপর। শ্রীযুক্ত মহলানবিশ অভ্যন্তর যোগ্যতার সহিত এই কাঠামো প্রস্তুত করিয়া এক অভিনব পথে ভারতের আর্থিক বুনায়কে উন্নতির অভিমুখে লইয়া যাইবার পন্থা নির্দেশ করিয়া দিয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত মহলানবিশের এই সাক্ষ্যে আমরা গবিত। আমাদের গর্ব এই যে তিন আমাদের এই ব্রাহ্মসমাজেরই সম্মান। আর একজন ব্রাহ্মসমাজ ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অভ্যন্তর যোগ্যতার সহিত রাষ্ট্রপরিচালনার রত আছেন। ...অথবা পরাজিত বোধ যে ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতেছে সেই সর্বনাশ আত্মঘাতী মনোভাব এই সমস্ত দৃষ্টান্ত যদি কিছুটা দূর করিতে পারে। ”

দুঃখের বিষয়, এই সমীচীন সম্পাদকীয় সতর্কতা সত্ত্বেও বিত্তীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা লইয়াই গৃহবিবাদ বাধিয়া গিয়াছে—ব্রাহ্মে ব্রাহ্মে লড়াই। ‘তত্ত্ব-কৌমুদী’ দুইজন মহান ব্রাহ্মের নাম উল্লেখ করিয়াছেন (ভগবান শিবনাথ-কৃষ্ণকুমার-হেরা-প্রাণকৃষ্ণের শাস্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন।), আরও দুইজনের নাম প্রাত্যহিক দর্শনের অতি-পরিচয়ে করিতে তুলিয়াছেন—‘প্রবাসী’র স্বযোগ্য সম্পাদক শ্রীকেশবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ‘যুগবাণী’র শ্রীদেবজ্যোতি বর্মণ। এখন এই চারিজন ব্রাহ্ম স্বসন্তানের মধ্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা লইয়া যে চতুষ্কোণিক ‘সর্বনাশা আত্মঘাতী মনোভাব’ প্রকট হইয়াছে, ‘তত্ত্ব-কৌমুদী’ তাহার তত্ত্ব জানিলে মরমে মরিয়া যাইবেন। শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের পরিকল্পনার স্ত্রী প্রতিনিধিতে ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় যুক্তিপ্ৰয়োগে বহু নির্দেশকে ব্রাহ্ম প্রতাপ করিয়া নূতন নূতন নির্দেশ দান করিয়াছেন; তৎসম্পর্কে মহলানবিশ মহাশয় স্বভাবস্বলভ উদ্যমিকতা দেখাইয়া বলিয়াছেন, “বিত্তীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা সম্পর্কে ডাঃ রায় যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা দুই বায় পাঠ করিয়াও তিনি উহার মর্মোদ্ধার করিতে পারেন নাই।” মহলানবিশ মহাশয়কে স্বভাবস্বলভ টাটি মারিবার ভক্তিতে কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন (‘প্রবাসী’, আবার, “বিবিধ প্রসঙ্গ”) “শ্রীপ্রশান্ত মহলানবিশ মহাশয় বিত্তীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ব্যাপারে যে প্রস্তাব দিয়াছেন তাহা কল্পনার দিক হইতে অনবদ্য—অর্থনৈতিক কল্পনা যেন অলীক কল্পনার রূপান্তর মাত্র।... অধ্যাপক মহলানবিশ হয়ত বলিবেন যে, চিনির কারখানা বন্ধ করিয়া দিয়া গুড় খাওয়া হউক, মিলে কাগজ উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিয়া ঘরোয়া শিল্পে উৎপাদিত তুলট কাগজ ব্যবহার করিতে হইবে। সিমেন্টের কারখানা বন্ধ করিয়া বাড়িতে বাড়িতে ঘাঁটিং পোড়াইয়া চূণ তৈয়ার করিয়া স্থরকির সঙ্গে মিশাইয়া বাড়ি তৈয়ার করিতে হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ভারতবর্ষে কাগজ কিংবা চিনির উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম এবং ইহার উপর যদি আবার মিলগুলির উৎপাদন হ্রাস করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে ত আর কথাই নাই। অধ্যাপক মহলানবিশের প্রস্তাব যেন ইঞ্জিনের বদলে গরু দিয়া রেলগাড়ি টানানোর ব্যবস্থা করা। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন যে,

বৃহদায়তন কারখানাগুলির উৎপাদনক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার হওয়া উচিত এবং ইহাতে অধ্যাপক মহলানবিশ উদ্য প্রকাশ করিয়াছেন।” ওদিকে দেবজ্যোতি বর্মণ মহাশয় এই পঞ্চবার্ষিকীর ব্যাপারে ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় গরীব বাঙালীদের মারিয়া ধনী মড়োয়ারীদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। মোটের উপর “সর্বনাশা আত্মঘাতী মনোভাব” একটি সামান্য ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া সমাজে বড়ই উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। বাহাদুর লইয়া ‘তত্ত্ব-কৌমুদী’র গৌরব, তাঁহারাই যদি এইরূপ হীন পরস্পর ‘খেয়োখেয়ী’ মনোবৃত্তির পরিচয় দিতে থাকেন তাহা হইলেই বা ‘তত্ত্ব-কৌমুদী’ লিখিবেন কেমন করিয়া—“সদ্য ব্রাহ্মগণ প্রতি দায়িত্বশীল পদে যে যোগ্যতা, কর্তব্যকর্মে নিষ্ঠা, সদাচরণ ও নৈতিক উচ্চমানের পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন...” ইত্যাদি ?

এ যুগেও যে কোনও মানুষ সমুদ্রের চেউ বিশ্লেষণ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে, ইহা দেখিয়া আমরা কৌতুক বোধ করিতেছি।

এইরূপ একটি আত্মকলহ গত কিছুকাল যাবৎ সহযোগী ‘পরিচয়’র পৃষ্ঠাকেও কলুষিত করিতেছিল। হেথিয়া আনন্দিত হইলাম ‘পরিচয়’র সম্পাদকীয় কর্তৃপক্ষ বিচারের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া মামলা নিষ্পত্তি করিয়াছেন। রায় ‘পরিচয়’র অন্ততম স্তম্ভ নীরেন্দ্রনাথ রায়ের বিরুদ্ধে গিয়াছে। এই জন্তই আত্মকলহ বলিতেছি। ১৩৬০ বঙ্গাব্দের বৈশাখের ‘পরিচয়’ শেখরীয়ার-নিবৃদন নীরেন্দ্রনাথ “মেঘনাদবধ কাব্যে সমাজ-বাস্তবতা” শীর্ষক একটি প্রবন্ধে মহাকবি বাম্পীকিকেও বধ করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ‘ঘরে-বাইরে’র ডিক্টেটর সন্দীপ বলিয়াছিল, একটা কাঁচা স্কোচ ছিল বলিয়াই রাবণ সীতাকে হাতে পাইয়াও ছাড়িয়া দিয়াছিল। কিন্তু এ যুগের কমিউনিস্ট সন্দীপ মার্জার দূরবীক্ষণ চক্ষে লাগাইয়া স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছেন, রাবণ সীতাকে দণ্ডকারণ্যের পাট ক্ষেতে ফেলিয়া—। মহাকবি বাম্পীকি তৎসম্বন্ধেও সত্যিই অগ্নিপরীক্ষায় সীতাকে হাই সেকেণ্ড ক্লাস নম্বর দিয়াছেন বলিয়া নীরেন্দ্রনাথ তাঁহার সমাজ-বাস্তবতায় প্রীত

হইয়া খুব খানিকটা পিঠ চাপড়াইয়া দিয়াছেন। শক্তিমানের সেই সাদর আপ্যায়নে বান্ধীকি প্রায় মরিয়া গিয়াছিলেন আর কি, হঠাৎ ‘পরিচয়ে’র অন্ততম স্তম্ভ শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য উদ্বোধনে ছুটিয়া আসিয়া নীরেন্দ্রনাথের কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, তুমি তো আচ্ছা পণ্ডিত অধ্যাপক। স্বেচ্ছা লাহুনা ও নির্ধাতনকে যৌন বলাৎকার বলিয়া চালাইতে চাও, বলিহারি তোমার রুচিকে! গিরিজাপতি-বাবুর ভাষাতেই বলি—

“নীরেনবাবু যে অর্থ গ্রহণ করেছেন তা একেবারে তাঁর স্বকীয় মৌলিক আবিষ্কার।...সে কেমন বাস্তবতা-বিচার যা এত সাক্ষ্য প্রমাণের বিরুদ্ধে সীতার বলাৎকার অনির্ধার্য বলে দাঁড় করায়? ছ’হাজার বছর ধরে কি রামায়ণের পাঠকবৃন্দ প্রতারিত হয়ে এসেছেন, না নীরেনবাবু যা ভেবেছেন তা ভুল?”

অধ্যাপকও কম বান না, ছফার দিয়া বলিলেন, আরে বাপু, চ্যাচামিচি কর কেন। সীতাকে রাবণ ফিজিকালি ভায়োলেট বা যৌনধর্ষণ না করিলে রামায়ণের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। ধর্ষণ করাইয়া পুনরায় গ্রহণ ইহাই তো বান্ধীকির বাস্তবতাবোধ। তুমি বলিতেছ, বান্ধীকি স্পষ্ট-বক্তা, যৌনধর্ষণ হইয়া থাকিলে তাহারও বিশদ বর্ণনা বান্ধীকি দিতেন। “আমার বক্তব্য, নারীর রূপবর্ণনার বা রত্নসম্ভোগ বর্ণনার স্থান সাহিত্যে আছে, কিন্তু ধর্ষণের বর্ণনার নাই। সংসাহিত্যে ধর্ষণের উল্লেখই যথেষ্ট। বান্ধীকি স্পষ্টবক্তা হইলেও ‘পর্নোগ্রাফার’ ছিলেন না।” আর মতি-পরিবর্তনের কথা বলিতেছ? “অনিচ্ছায় ধর্ষিতা নারীর সামাজিক প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে এই মতি পরিবর্তন বর্তমান যুগে আমাদের অভিজ্ঞতার বাহিরে নহে। নোয়াখালির সাংবাদিক তাগুবের পরে অগণিত হিন্দু নারীর বলপূর্বক ধর্ষণের সংবাদ দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তখন কালীধাম হইতে শাজ্জল পণ্ডিতেরা বিধান দেন যে বর্ণিত অবস্থায় ধর্ষণের জন্ত নারীত্বের অবমাননা হইলেও সামাজিক বা পারিবারিক প্রতিষ্ঠার হানি হয় না। দেশের সমস্ত প্রগতিশীল অংশ এই বিধানকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিল। এই বিধান দ্বারা কি প্রমাণিত হয় না বান্ধীকির প্রগাঢ় সমাজবাস্তবতাবোধ?”

অধ্যাপকের যেমন সমাজবাস্তবতা-বোধ, তেমনি

সত্যের ও ইতিহাসের প্রতি নিষ্ঠা! এই বিধান দ্বারা প্রমাণিত হয় এই মাত্র যে, “দেশের সমস্ত প্রগতিশীল অংশ” এখনও পণ্ডিতী বিধানের দাস। নীরঞ্জ রায়কে আমরা লজ্জা দিবার বৃথা প্রয়াস করিব না। ‘পরিচয়ে’র সম্পাদকমণ্ডলীকে ধন্যবাদ, তাঁহারা জ্যৈষ্ঠের (১৩৬২) পত্রিকায় পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়া নিম্নলিখিত রায় দিয়া আমাদের কাছে আশস্ত করিয়াছেন—

“[তাঁহারা] সকলেই একমত যে, তিনি [নীরেন্দ্রনাথ] যে শুধু বৈজ্ঞানিক রীতিতে এ আলোচনা করেন নি তা নয়, সরাসরি বিচার ও মনগড়া মতামতের উপর নির্ভর করে তিনি একটি গুরুতর বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি একটি মাত্র ঘটনাকে তার সমগ্র পরিবেশ ও পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে রামায়ণের মতো মহাকাব্যের বাস্তবতা বিচারের চেষ্টা করেছেন। তৃতীয়ত, নীরেন্দ্রনাথ রায়ে উল্লিখিত তথ্যগুলিও ভিত্তিহীন। নীরেন্দ্রনাথের লেখায় বিশেষ আক্ষেপের বিষয় নোয়াখালি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য। প্রথমত তা অ-তথ্য, দ্বিতীয়ত অবাস্তব।” Q.E.D.

—

আরও একটি মামলা বাধাইয়া বলিয়াছেন ‘পরিচয়ে’র ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রীহিরণকুমার সান্যাল মহাশয়। বিগত অগ্রহায়ণের ‘পরিচয়ে’ কাছী নজরুল ইসলাম সম্পর্কিত একটি গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়া বলিয়াছেন—

“সত্যিকারের মাটির কবি হবার সম্ভাবনা নিশ্চয়ই ছিল নজরুলের মধ্যে। কিন্তু তা সকল হল না, কেননা শিকার ও সাধনার অভাবে নজরুল সহ করতে পারলেন না তাঁর গ্রাম্য মনের ওপর শহরের সংঘাত। তাই এই ধাক্কায় তিনি আকাশে উড়লেন উষ্ণার মতন। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম তাঁর বহিদীপ্ত রূপ। তারপর অন্ধকার!”

বেচারী জীবন্মূর্তের সময় এখন ভাল বাইতেছে না। পরম্পরায় তুনিলাম, তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর পুঁতি উপলক্ষে যিনি একদিন ঘটা করিয়া স্বীয় পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা বাহির করিয়াছিলেন তিনিও নাকি সম্প্রতি বলিয়াছেন, নজরুলের কবিতা কিছু নয়, তবে কিছু ভাল গান তিনি রচনা করিয়াছেন বটে। স্বপ্নের বিষয়, গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ‘পরিচয়ে’ সম্পাদকীয় বিজ্ঞপ্তি বাহির হইয়াছে যে, আগামী

সংখ্যায় নজরুল-হিরণকুমার মামলায় কাজী আবদুল ওহুদ সাহেব নজরুলের পক্ষে সওয়াল জবাব দিবেন। আমরা উদ্গ্রীব হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছি।

—

না, গোপালদাকে লইয়া আর পারা যায় না। অস্বীকার করিব না যে, বহুদিন অদর্শন হইলেও আমাদের উপর তাঁহার মোহময় প্রভাব আমরা কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। তাই তিনি অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া যখন বাহা হকুম করেন, ইচ্ছা বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহা করিতে হয়। আমাদের বিশ্বাস ছিল, তিনি উরাল পর্বতের একটি গুহা আশ্রয় করিয়া হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের পরীক্ষার ফলাফল গোপনে পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। হঠাৎ সংবাদ পাইলাম তিনি নেহরুজীর তলুপিবাহক হইয়া মস্কো গিয়াছেন। কিন্তু আমাদের সকল ধারণা যে ভ্রান্ত তাহা প্রমাণ করিয়া হেলসিন্কি হইতে তিনি মৃত্যু মৃত্যু একটি পত্রাঘাত করিয়াছেন, তন্মধ্যে “নিজস্ব প্রতিনিধিপ্রদত্ত সংবাদ” নামক একটা অংশ আছে। “সংবাদ” আখ্যা দিয়াছেন বটে কিন্তু দেখিতেছি, ইহার গোড়াটা একটি জটিল হৈয়ালি—তথাপি গোপালদার হৈয়ালি বলিয়া ছাপিতে বাধ্য হইতেছি। গোপালদা লিখিতেছেন—

“মুখিষ্টিরাবির মহাপ্রস্থানের পর সেদিন জনমেজয় মহাসমারোহে সর্পসত্ত্ব করিয়াছিলেন। মন্ত্রবলে সর্পেরা সকলেই সমবেত হইয়াছিলেন। যে পরিমাণ হিস্ হিস্ শব্দ উঠিয়াছিল তাহাতে তো আমাদের জনমেজয়ের জন্ত ভয়ই হইয়াছিল। কিন্তু একজন গুণী ব্যক্তি বলিলেন, এপক্ষে ওপক্ষে কোন পক্ষেই ভয়ের কারণ নাই। তক্ষককে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আকর্ষণের হোতা চণ্ডভার্গবও প্রস্তুত, আবার মাতুলকুলকে রক্ষার জন্ত মহামুনি আত্মীকও সমুপস্থিত। এখন লাঠিও ভাঙিবে না অথচ সাপও বশীভূত হইবে—এমন মন্ত্র আত্মীকই জনমেজয়কে শিখাইয়া দিয়াছেন, যথা—

সর্পাপসর্প ভ্রূং তে গচ্ছ সর্প মহাবিশ্ব।

জনমেজয়স্ত যজ্ঞাস্তে আত্মীকবচনং শ্রব ॥

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলে মহাবিশ্বের সর্পেরাও নির্বিঘ্ন হইবে এবং আত্মীক মহামুনি আখ্যা লাভ করিয়া জগতে পুঞ্জিত হইবেন।”

আমাদের চিন্তাধারা এখন পর্যন্ত চক্রনেমির নিরিখ ধরিয়াই চলে। তাই ভাবিতেছি, আন্তিক নাস্তিক বর্তমান পৃথিবীর এই দুই বিশিষ্ট মতবাদ লইয়া গোপালদা কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করেন নাই তো।

* * *

গোপালদার দ্বিতীয় সংবাদ—

“গৌড়ের তরুণেরা গৌরনামের নামাবলী পরাইয়া ব্যবসায় ও রাজনীতিকে যে মোহনানন্দময় রূপ দিতেছেন একদা তাহাই সমগ্র পৃথিবীর আদর্শ পন্থারূপে পরিগৃহীত হইবে। যাহারা ইতিমধ্যেই পথে বসিয়াছে তাহারা তরুণদের পথে পথে নামসঙ্কীর্ণনের মোহে পড়িয়া পথকেই স্বর্গ বলিয়া ভ্রম করিবে এবং ওদিকে কীর্তনীয়াদের গায়ের নামাবলী ধীরে ধীরে বাধিপোতার মোটা স্ফুটি হইতে ঢাকাই মিহি মসলিনে উদ্ভীত হইবে। পথিক ভক্তজন-মণ্ডলীকে তাঁহারা যতই শুনাইবেন “মা কুরু...” ইত্যাদি, ততই তাঁহাদের নলাটের গদ্যমুক্তিকা হীরকভঙ্গ হইতে থাকিবে। জয় গৌর।

“এই গেল কৌরবপক্ষে। পাণ্ডবপক্ষে ইন্দ্রপ্রস্থে ময়দানব মহাসমারোহে প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। অনেকে মনে করিতেছেন, এই প্রাসাদনির্মাণে বাবনাবতীয় ধূর্ত যবন পুরোচনের হাত আছে। আমরা জানি, এ সন্দেহ অমূলক। জতুগৃহ বহুকাল পূর্বেই অভাগা ভিক্ষুদের লইয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। পাণ্ডবেরা স্বড়ঙ্গপথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, ইন্দ্রপ্রস্থও পিছনে পড়িয়া থাকিবে।”

* * *

গোপালদার তৃতীয় সংবাদ—

“জীচৈতন্যদেব কলির জীবদেব তরাইবার জন্ত দুইটি পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিলেন—জীবে দয়া আর নামে রুচি। তখন পৃথিবী ছিল “সেক্রেড” বা পরমার্থ-কেন্দ্রিক। এখনকার কর্তারা পরমার্থকে বাদ দিয়া সেতুলার বা অর্থ-কেন্দ্রিক হইয়াছেন। সুতরাং চৈতন্যদেবের ধর্মোশ্রিত ফরমূলা আর চলিতেছে না। এ যুগের চৈতন্যদেবেরা অনেক মাথা ঘামাইয়া নূতন যুগের নূতন জীবদেব জ্ঞান করিবার জন্ত দুইটি নূতন ফরমূলা আবিষ্কার করিয়াছেন, একটির নাম “স্ট্যাটিস্টিক্স”, অঙ্কটির নাম “কালচারাল

ডেলিগেশন"—বাংলা কথায়, পরিসংখ্যান আর সামাজিক অভিযান। যে কোনও সমস্তার উদ্ভব হউক, এই দুই পথে তাহার সমাধান হইবেই। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, বেকারের দল প্রবল হইয়াছে, কোনও ভয় নাই; বড় বড় টেবিল পাতিয়া দিত্তা দিত্তা কাগজে অঙ্ক করিতে থাকো, অন্ন আসিবে, বস্ত্র আসিবে, বেকারের দল কাজ পাইবে। জাতিতে জাতিতে মন-কষাকষি চলিতেছে, পাঠাও কালচারাল ডেলিগেশন—দোভায়ীর মধ্যস্থতায় পরস্পর দুর্বোধ্য ভাষার বিনিময় হউক, কিছু নাচ কিছু অভিনয় কিছু ছবি দেখাদেখি কর, একটা হাতি আর একটি শেতভল্লকের বিনিময় হউক—বাস, আর ভয় নাই। আমাদের ভারতবর্ষে এই দুই বস্তুর প্রয়োগ বর্তমানে সর্বাধিক চলিতেছে। শুধু অঙ্ক করিয়া এবং ছুটাছুটি করিয়া আমরা সমগ্র পৃথিবীকে পথ দেখাইতেছি। দৈন্যসামন্ত অস্ত্রশস্ত্র নৌবহর বিমানবহর আণবিক বোমা হাইড্রোজেন বোমা—কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া যে সকল বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া ভবিষ্যতের জন্ত তাকে তোলা থাকিতেছে, আমরা বোধ হয় সেই সমস্তকেই “ক্ল্যাপ” বা বাতিল করিয়া দিতে পারিব। স্তম্ভাং “স্ট্যাটিষ্টিক্স” ও “কালচারাল ডেলিগেশন”—সকলে মিলিয়া ইহাদের জয়ধ্বনি করিতে থাকো, আমাদের মারে কে?”

—

প্রতিবারিক পরিকল্পনার দৌলতে বাংলা দেশের রক্ষণশীল চাহারা দ্রুত পাণ্টাইতেছে। কালিন্দী মা আমাদের অল্প পাড়াগাঁয়েও বিশ্বদ্রষ্ট বিকশিত করিতেছেন। আগে স্বার্থপর লোকে পথে ঘাটে বনে বাগানে মরিয়া পড়িয়া থাকিয়া শূণ্য-শব্দীয় আহাৰ্য জোগাইয়াই তৃপ্তিলাভ করিত, আজকাল তাহারা অপেক্ষাকৃত পরার্থপর হইয়া পাকাপোক্ত হাসপাতালে মরিয়া মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের শবব্যবচ্ছেদবিভাগ শিক্ষার উপকরণ জোগাইতেছে; আগে সিনেমার ছবি দেখিতে হইলে চালচিঁড়া বাঁধিয়া শহরে ধাওয়া করিতে হইত, এখন গাঁয়ের চাটাই-শয্যায় শুইয়াও লাউডস্পীকারযোগে লতা মুন্ডেসকর ও গীতা রায়কে উপভোগ করিয়া তাহাদের উল্লাসের অবধি নাই;

আমাদের শহরের বাবুদের পল্লীতে মোটরভ্রমণের কোনই সুবিধা ছিল না, এখন মন খারাপ হইলেই ছট করিয়া তাহারা রক্তিয়া বা মশানজোড়ের ইন্সপেকশন বাংলোর রাজিবাস করিয়া চান্দা হইয়া আসিতেছে—এমন বহুবিধ সুবিধা বিধান-সরকার আমাদের করিয়া দিয়াছেন। পাড়াগাঁয়ের নাম শুনিয়া যে আতঙ্কে আমরা কাঁপিতাম, এখন কমিউনিটি প্রজেক্ট ও অন্তান্ত নানাবিধ পরিকল্পনার কল্যাণে সে আতঙ্ক আমাদের কাটিয়াছে; পল্লীবাংলার কল্যাণী মৃতি দিনে দিনে প্রকট হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু নেচার অ্যান্ডার্স ভ্যাকুয়াম—প্রকৃতির এই অমোঘ নিয়মের বিরুদ্ধে বিধান-সরকার কি করিবেন? পল্লীগ্রাম ও পল্লীপথের জঞ্জাল সাফ হইতেছে বটে; কিন্তু সে জঞ্জালকে তো অন্তর্জ স্থান দিতে হইবে! সেই স্থান হইতেছে শহর কলিকাতা। যে অল্পপাতে পল্লীজননী হামিতেছেন, ঠিক সেই অল্পপাতেই কলিকাতা শহরের কেন্দ্রস্থলে ও উপাস্তে মা কামিতেছেন। যে কোনও পথিকের পথ চলিবার কালে সন্দেহ হইবে যে, সে শহরের রাজপথে পরিভ্রমণ করিতেছে, না, গো-সহিষ্যদির খাটাল পরিদর্শনে বাহির হইয়াছে। যদি কাহারও নিশাভ্রমণের বাতিক থাকিয়া থাকে—পদে পদে রাস্তার খোলা মোটর-গ্যারেজে অর্থাৎ লরি ও গাড়ির ধাক্কায় তাহাকে বাধাগ্রস্ত হইতে হইবে। কলিকাতার কোনও রাস্তাই আর রাস্তা নাই—হকার্ণ কর্নার, জুতাবুকাশ, ফেরিওয়াল, গুরু মহিষ ও লরি মোটরের আন্তানায় সেগুলি রূপান্তরিত হইয়াছে। অথচ গাঁটকাটার মত পুলিশেরাও আশেপাশেই আছেন, গদাইলস্করী চালে চলা স্তম্ভিত এই জীবনের প্রায়ই এখানে ওখানে কল্যাণ বা বরাদ্দহস্ত প্রদারণ করিতে দেখিতে পাই। তাঁহারাও থাকেন, গুরুও থাকে, মোটরও থাকে; পরস্পর পরস্পরকে সম্বন্ধ করিয়া কলিকাতার রাস্তাতেই ইহারা ক্লারিশ করিতে থাকেন। এই ত্রয়ীশক্তি ত্রিশ্রুপে প্রপঞ্চপ্রকটদের মধ্যে পড়িয়া মোটরকার-বিহারীদের যে কি লাঞ্ছনা হয় তাহা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব না, কারণ এই জঞ্জালের রাজ্যে মোটরকার রাখাই একটা পাপ। সারা শহরটিকে ডাস্টবিনে পরিণত করিবার যে সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা সিটিফাদারদের দপ্তর, লালবাজার ও রাইটার্স বিল্ডিংয়ের আওতায় চলিতেছে, তাহাতে আমাদের সন্দেহমাত্র নাই যে, অদূর-

ভবিষ্যতে এখানকার মানুষদের গো-মহিষ হইবার তপস্তা না করিলে আর নিষ্কৃতি নাই। আমরা সেই তপস্তাই করিতেছি।

ইহার উপর পথে পথে পাড়ার ছেলেদের ফুটবল-ক্রিকেট খেলার দাবি আছে, সরস্বতীপূজা-দুর্গাপূজার দাবি আছে, ঝাণ্ডা-বিবাহ-চলবে না প্রসেশনের দাবি আছে। অবশ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পথের গতি রোধ করিবার অধিকার ইহাদের সকলেরই আছে। পাড়াগাঁ হইতে আর একটি বস্ত্র কলিকাতার খেলার মাঠে আমদানি হইয়াছে; সেখানে ডাকাতি রাহাজানি গুণ্ডামি বন্ধ হইয়া গড়ের মাঠে আসিয়া জমা হইয়াছে; কলিকাতার পুরপ্রধানেরা পুরাকালের রৌমক স্তম্ভরীদের মত সিংহের হাতে গ্যাডিয়েটরদের লাঞ্ছনা উপভোগ করিতেছেন।

তথাপি আমরা হতাশ হই নাই। বৃহৎ একখানা প্রাসাদোপম বাড়ি, দীর্ঘকাল পরে চুনকাম করিতে হইলে হলঘরে সমস্ত মাল ও জঞ্জাল স্তুপীকৃত করিয়া অস্ত্র ঘর-গুলিতে কাজ করিতে হয়। বিধান-সরকার নিশ্চয়ই তাহাই করিতেছেন। মক্ষ্মল সাক হইলেই তাহারা সদরে হাত দিবেন, ততদিন আমাদের গরুছাগলের উৎপাত সহিতেই হইবে।

অতিশয় বিষয় ও আখ্যায়িক কথ্য এই যে, পশ্চিমে হিন্দী এবং পূর্বে উর্দুর চাপে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বধন “মরিবন্ধ” অবস্থা হওয়ার কথা, তখনই ইহা বস্ত্রার জলস্রোতের মত উদ্‌গমপ্রবাহে প্রবাহিত হইতেছে। বাংলা-সাহিত্যের এমন বহুমুখী বিচিত্র রূপ আর দেখা যায় নাই। মাত্র এক ঋতুর ফসল হইতে যাহা আমাদের গোলায় উঠিয়াছে তাহাতেই ষষ্ঠে গর্ব বোধ করিতেছি। এলোমেলোভাবে একটা তালিকা দিতেছি, দেখুন।

১। নব্যযুগের বাংলা—বিপিনচন্দ্র পাল, যুগযাত্রী, ৬।

২। বেদের দেবতা ও কৃষ্ণকাল—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিভূষিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ৫। ৩। পৌরাণিক উপাখ্যান—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিভূষিত, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, ৩০। ৪। প্রাচীন রাজ্যশাসন-পদ্ধতি—শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক, জেনারেল প্রিন্টার্স, গ্যাণ্ড পাব্লিশার্স,

২০। ৫। বিজ্ঞাপতি-শতক—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, রেনেসাঁ প্রিন্টার্স, ৩। ৬। মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, ১ম—শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু, জেনারেল প্রিন্টার্স গ্যাণ্ড পাব্লিশার্স, ৬। ৭। আমরা বাঙালী—শিশুসাহিত্য সংসদ, ১০। ৮। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (১৮৫২-১৯৫২)—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং, ১৫। ৯। ভগ্নকথা—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, বিশ্ববিজ্ঞান-সংগ্রহ, ১০। ১০। রথমান, ১১। মেদিনীপুর, ১২। মালদহ—তিনখানিই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩। শিল্পনীতি ও পরিকল্পনা—পাবলিকেশন ডিভিশন, মিনিষ্ট্রি অব ইনফরমেশন অ্যান্ড ব্রডকাস্টিং, গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়া, ১০। ১৪। বাংলা সাহিত্য—মনোমোহন ঘোষ, ইণ্ডিয়ান পাবলিসিটি সোসাইটি, ১০। ১৫। গান্ধীজীর জীবন—শ্রীহৃদেন্দুকুমার রায়, এম. কে. লাহিড়ী এণ্ড কোং, ১, এবং ১৬। বিজ্ঞানের ইতিহাস—শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স, ১০। ১০।

ইহা ছাড়া কবিতা-উপন্যাস-ছোটগল্প-রম্যরচনা-স্রমণকাহিনী বিভাগে বহু গ্রন্থ এই ঋতুতে প্রকাশিত হইয়াছে; প্রবন্ধ ও গুরুগম্ভীর সাহিত্যও আরও অনেক আছে। এই হারে যদি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার হইতে থাকে তাহা হইলে উচ্চ শিক্ষার পাঠ্য-পুস্তকের জন্ত আর আমাদের গালাগালি ভাবিতে হইবে না। অনেক ভাল বইয়ের পুনর্মুদ্রণও (যেমন রাজশেখর বসুর ‘মহাভারত : সারাহুবাদ’, আশুতোষ ভট্টাচার্যের ‘মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাস’ প্রভৃতি) দ্রুতগতিতে হইতেছে। অর্থাৎ নানাবিধ ঝড়ঝাপটা সত্ত্বেও বর্তমান বাংলা দেশে জ্ঞানের বর্ধিকা প্রতিদিন উজ্জলতর হইতেছে। জাতির প্রাণ যে পূর্ণ হইয়া শুকায় যায় নাই, এই ঘটনাগুলি তাহারই সূচনা করিতেছে।

ছুংখের বিষয়, বাঙালী জাতির চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত আলোচনা হয় নাই। ডক্টর নীহার-রঞ্জন রায় বিশেষ মতবাদের পটভূমিকায় ‘বাঙালীর ইতিহাস’ লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু সমগ্রভাবে বাঙালীর সাহিত্য ও চিন্তাধারাকে ভিত্তি করিয়া জাতির ক্রমাগত-সরণের ইতিহাস এখনও রচিত হইবার অপেক্ষার আছে।

তুইখানি আদর্শ গ্রন্থ আমরা দেখিবার স্বযোগ পাইয়াছি; ভার্নন লুই প্যারিংটন লিখিত ‘আমেরিকান চিন্তাধারার মৌলিক প্রবাহসমূহ—প্রারম্ভকাল হইতে ১৯২০ পর্যন্ত (১৯২৩ সনের ১৬ই জুন প্যারিংটনের মৃত্যু হয়) আমেরিকার সাহিত্যের বিশ্লেষণ’। এই মহাগ্রন্থের জন্ম প্যারিংটন ১৯২৮ সনে ইতিহাসে পুলিটজার পুরস্কার পান। দ্বিতীয় গ্রন্থটি হইতেছে মার্ল কার্টি (Merle Curti) ‘আমেরিকান চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ’; এই গ্রন্থটিও ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ইতিহাসে পুলিটজার পুরস্কারের গৌরব অর্জন করে। ইউরোপের বিভিন্ন জাতি বিগত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়া কেমন করিয়া ধীরে ধীরে এক অশুভ জাতিতে পরিণত হইল, কয়েকজন মহতের চিন্তাধারা কেমন করিয়া সমগ্র জাতির চিন্তাধারাকে গড়িয়া তুলিল, সাহিত্য কেমন করিয়া স্বাধীনতার প্রতীক হইয়া উঠিল, সেই কাহিনী এই তুইখানি গ্রন্থে অপরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আমেরিকার মত বাংলা দেশও বহু বিচিক্রে মের্টিংপট বা ভিয়ানের হাঁড়ি। উচ্চকোটির এবং নিম্নকোটির বহু ভাবধারার সম্মেলনে বাঙালীরা ধীরে ধীরে রূপপরিগ্রহ করিয়াছে; ব্রহ্মণ্য ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এবং স্থানীয় তথাকথিত আদিম ধর্মের সংমিশ্রণে বাঙালী জাতির পরবর্তী দৈহিক ও মানসিক গঠনের বিষয়ে বিচ্ছিন্নভাবে অনেকেই আলোচনা

করিয়াছেন, ডক্টর নীহারবরুণ বায় একটা ধারাবাহিক চিত্রও দিয়াছেন; কিন্তু বাংলা দেশের সাহিত্য কেমন করিয়া বাংলা দেশের মানুষের মনকে রূপায়িত করিয়াছে এতদসম্পর্কে কোনও গবেষণামূলক ইতিহাস রচিত হয় নাই। বর্তমানে বহু বাঙালী রসিক ও পণ্ডিত বহু দিকে মানসিকতার উত্তরুদৃষ্টি ও গহনগভীরে উপাদান সংগ্রহে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহাদের পরিশ্রমের ফলাফলও আমাদের গোচর হইতেছে। তাই আশা করিতেছি, সত্য ইতিহাস ও সমগ্র সাহিত্যের ভিত্তিতে শীঘ্রই কেহ বাঙালী জাতির চিন্তাধারার ইতিহাস রচনা করিবেন।

উপরে যে সকল সজ্ঞাপ্রকাশিত বাংলা গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছি, আমাদের “গ্রন্থ-পরিচয়” বিভাগে ক্রমশ সেগুলির বিস্তৃততর পরিচয় দিবার ইচ্ছা রহিল। এখানে শুধু সর্বশেষ গ্রন্থ ‘বিজ্ঞানের ইতিহাস’ সম্বন্ধে চিন্তাশীল বাঙালীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। এই জাতীয় গ্রন্থ যে এতদিনে মাতৃভাষায় রচিত হইয়াছে, তাহাতেই গৌরববোধ করিতেছি। শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন সমগ্র জাতির ধন্যবাদার্থ হইলেন। সুব চাইতে উল্লেখযোগ্য এই যে, ইতিহাস অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্সের মত প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে উৎসাহী হইয়াছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকার অর্থসাহায্যের দ্বারা পুস্তকখানির মূল্য সাধারণের আয়ত্তের মধ্যে রাখিয়াছেন।

বিকেন্দ্রীকরণের তাৎপর্য

ঐবিমলচন্দ্র সিংহ

ভারতবর্ষকে নতুন করে গড়বার সমস্তা বড় বাস্তব ও ব্যাপক হয়ে উঠছে, ভবিষ্যৎ সমাজের কাঠামো নিয়ে চিন্তাও ততই প্রবল হয়ে উঠছে। গান্ধীজি বহুদিন হতেই বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলে আসছিলেন। তাই নিয়ে গঠনমূলক কর্মীরা কিছু কাজ করবার চেষ্টাও, করে এসেছেন। পক্ষান্তরে আজ কার্যক্ষেত্রে দিকে দিকে কেন্দ্রীকরণের লক্ষণই দেখা যাচ্ছে। কিছু কিছু রাষ্ট্রীয়করণই এর একমাত্র লক্ষণ নয়। স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকার ও কার্যক্ষেত্র ক্রমশঃই সংকুচিত হচ্ছে; দ্বিতীয় ক্ষমতা প্রসারিত হয়ে প্রদেশগুলির ক্ষমতাকে ক্রমেই খর্ব করছে। সেইজন্য কেন্দ্রীকরণ অথবা বিকেন্দ্রীকরণ, এই প্রশ্ন ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে। এটা যে শুধু এই দেশের সমস্তা তাই নয়। শিল্পে অগ্রসর দেশগুলিতে—এমন কি ইংলণ্ডেও—এই বিকেন্দ্রীকরণের প্রশ্ন উঠছে এবং তাই নিয়ে নানা কমিটি কমিশন চিন্তা করছেন। ভারতবর্ষের পক্ষে এই প্রশ্ন আরও গুরুত্বপূর্ণ। যে সব দেশ আয়তনে ছোট, শাসনযন্ত্র উন্নত, জনসাধারণ শিক্ষিত ও জাগ্রত সে সব দেশে কেন্দ্রীকৃত শাসনব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থা সফল হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। বড় বড় দেশেও এ ব্যবস্থা সফল হয়, তবে তার জন্য খুব কড়া নিয়ন্ত্রণ দরকার—যা আমরা এদেশে চালু করতে রাজী নই। কিন্তু ভারতবর্ষের আয়তন বৃহৎ, শাসনযন্ত্রের চাকা এখানে নিভুল ও মন্থগভাবে ঘোরে না, দেশের জনসাধারণও শিক্ষিত ও জাগ্রত নয়। সুতরাং এখানে কেন্দ্রীকরণ চলবে কি না সে প্রশ্ন স্বভাবতঃই ওঠে। কিন্তু তার চেয়েও বড় প্রশ্ন হ'ল, যদি কেন্দ্রীকরণ চলা সম্ভবও হয় তা হ'লেও তা চলতে দেওয়া উচিত কি না। ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে আমরা যে সম-সমাজের স্বপ্ন দেখি কেন্দ্রীকরণ হতে থাকলে সে

স্বপ্ন সফল হবে কি না, কারণ সাধারণতঃ দেখা যায় যে পুঞ্জির পুঞ্জীভবনই হ'ল কেন্দ্রীকরণের প্রধানতম তাগিদ।

এই প্রশ্নে অনেকগুলি প্রশ্ন উঠে পড়ে। আজকের সমাজ বস্তুবত্তল স্খন্দক্ষানী (Pleasure-hunting) সমাজ—মাহুষ এই সমাজে নিজের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের দুর্বল ভারে যেমন একদিকে দুর্বল ও দাস হয়ে পড়ে, অন্যদিকে তেমনি সমাজে সম্পদের পুঞ্জীভবন চলতে থাকে। এই অবস্থার অবসান ঘটাবার জন্য গান্ধীবাদীরা বিকেন্দ্রীকরণ ও কুটিরশিল্পের কথা বলে থাকেন। কমিউনিস্টরা এর উলটো পথে সমাধান খোঁজেন। তাঁদের সমাধান হ'ল রাষ্ট্রীয়করণের পথে অর্থাতঃ মূলধনী প্রথার অন্ত ঘটিয়ে। ধারা মূলধনী প্রথার অন্তকারক হিসেবে অথচ কমিউনিস্ট সমাধানকে ঘায়েল করবার পদ্ধতি হিসেবে এই বিকেন্দ্রীকরণের প্রস্তাব করেন, তাঁদের কয়েকটি প্রশ্ন ভাবতে হবে। বিকেন্দ্রীকরণ কি সত্যিই কমিউনিস্টদের ঘায়েল করছে? আসলে বিকেন্দ্রীকরণের প্রধান ও প্রথম শত্রু হ'ল ধনতন্ত্রে মূলধনের স্বাভাবিক কেন্দ্রীকরণ। বিকেন্দ্রীকরণ করছে কে? কোনও রাষ্ট্র, কোনও সমাজ, না কোনও অর্থনীতি?... Concentration of capital এবং accumulation of profit যে সামাজিক শক্তির প্রভাবে ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে তার বিরুদ্ধেই তো তবে বিকেন্দ্রীকরণের লড়াইটা লেগে যায়। এবং সে তো একটা বিরাট সামাজিক লড়াই। কমিউনিস্টদের শ্রেণীসংগ্রামের চেয়ে কিছু কম ভয়াবহ নয় এবং লড়াইটাও কতকটা সেই-জাতীয়ও বটে বরং তা আরও অন্তহীন ও বিরাটহীন। কেন না কমিউনিস্টরা মূলধনী প্রথার অন্ত করে দিয়ে সংগ্রাম শেষ করতে চায়। কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণকারী মূলধনও রাখছে

অথচ তাকে কেন্দ্রীভূত হতে দেবে না—অর্থাৎ লাভ করতে দেবে না অথবা দেবে সাতপাক খাইয়ে। শিল্প বাণিজ্য বাজার সম্পত্তি সবই থাকবে, অথচ তাকে কেন্দ্রীভূত হতে দেবে না। কিন্তু কি দিয়ে তাকে বন্ধ করা যাবে? রাষ্ট্র দিয়ে? সংগ্রাম চানু রাখতে হবে অথচ শেষ করা হবে না? এ কেমন কথা? বিকেন্দ্রীভূত মূলধন কেন আপন নৈতিক সীমানার মধ্যে সংযত থাকবে? কেবল মাত্র রাষ্ট্রের ডয়ে? তবে সে রাষ্ট্র ভয়ানক একটা monster-এর রূপ নিতে, বাধ্য হবে—নৈতিক পুরুষের নয়। বিকেন্দ্রীকরণের অর্থনৈতিক নিয়ামক কি কিছু নেই? ধনতন্ত্রের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ আছে বাজারে, লাভে, লোকসানে, সঞ্চয়ে, মূলধন ইত্যাদিতে। সমাজতন্ত্রের নিয়ামক হচ্ছে কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা। বিকেন্দ্রীভূত কর্মাবলীর নিয়ামক কি?

প্রশ্নগুলি অত্যন্ত গভীর এবং একেবারে গোড়ার কথাগুলির পুনর্বিচার দাবী করে। এ বিষয়ে আমার যা মনে হয়েছে সেই কথা বলি।

২

মূল প্রশ্নটির বিচার করবার আগে দুই-একটা আনুমানিক কথা আলোচনার দরকার আছে। প্রথম কথা, বিকেন্দ্রীকরণ কথাটা কমিউনিস্টদের রাষ্ট্রীয়করণের প্রতিবাদে অনেক সময় ব্যবহৃত হতে দেখি। কিন্তু গান্ধীজির লেখা আমি যতটুকু পড়েছি তাতে তিনি বিকেন্দ্রীকরণের অস্ত্র ও-ভাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন ব'লে মনে হয় না। কমিউনিস্টদের ঘায়েল করবার অস্ত্র হিসাবেই ওটার দরকার—এ কথা বললে জিনিসটাকে শুধু ছোট করা হয় না, গোড়ার কথাটাই একেবারে বদলে দেওয়া হয়। এই কথার স্বপক্ষে দুটি যুক্তি আছে; প্রথমতঃ, গান্ধীজি কমিউনিজমের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু শুধু রাষ্ট্রীয়করণের জন্ত ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর মনে মনে আদর্শ রাষ্ট্রের একটা চেহারা ছিল। সেই রাষ্ট্রের চেহারার সঙ্গে কেন্দ্রীভবন খাপ খায় না। কিন্তু এই কেন্দ্রীভবন শুধু কমিউনিস্টদের কথা নয়, ধনতন্ত্রেরও কথা। একটিতে কেন্দ্রীভবন রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং জনকল্যাণে নিয়োজিত। অস্ত্রটিতে কেন্দ্রীভবন খনিকগোষ্ঠী দ্বারা

নিয়ন্ত্রিত এবং নিজেদের স্বার্থসাধনে নিয়োজিত। এক ব্যবস্থায় অস্ত্রটির ব্যবহার হচ্ছে আত্মরক্ষার জন্ত, অস্ত্রটিতে অন্যগণদের গ্রহণের জন্ত। কমিউনিস্টদের আপত্তি অস্ত্রটির ব্যবহারের উদ্দেশ্য নিয়ে, কাজেই যে মুষ্টি সেই অস্ত্র ধরে আছে সেই মুষ্টিই তাঁরা বদলে দিতে চান। গান্ধীজির আপত্তি ছিল অস্ত্রটিরই বিরুদ্ধে। সেই জন্ত সেখানে শুধু মুষ্টিবদলের কথাই নয়, অস্ত্রবদলের কথাটাও সমান দরকারী। এই কথাটার আরও একটু বিস্তারিত আলোচনা পরে করবার দরকার হবে, কিন্তু তবু এই প্রসঙ্গে এই কথাটার উল্লেখ করতে হ'ল এই কারণে যে এই গোড়ার তফাতটা না বুঝলে বিকেন্দ্রীকরণের আসল কথাটাই বোঝা যাবে না। গান্ধীজির রচনায় এ রকম কথা ভূরি ভূরি আছে। দু-একটা উদ্ধৃত করছি। গান্ধীজি কেন কমিউনিজমের বিরোধী ছিলেন সে সম্বন্ধে তিনি বলছেন :

Class war is foreign to the essential genius of India, which is capable of evolving communism on the fundamental rights of all on equal justice....Socialism and communism of the West are based on certain conceptions which are fundamentally different from ours. One such conception is their belief in essential selfishness of human nature. I do not subscribe to it, for I know that the essential difference between man and the brute is that the former can respond to the call of the spirit in him, can rise superior to the passions that he owns in common with the brute and, therefore, superior to selfishness and violence, which belong to the brute nature and not to the immortal spirit of man. (Bose : Selections from Gandhi, pp. 89-90)

গান্ধীজির চোখে রাষ্ট্রের আদর্শ কি ছিল তা সংক্ষেপে বলা সম্ভব নয়। তবু দু-একটা কথার উল্লেখ করি। ব্যক্তির উপর গান্ধীজি ভয়ানক জোর দিতেন।—

The individual is the one supreme consideration...I look upon an increase of the power of the state with the greatest fear, because, although while apparently doing good by minimizing exploitation, it does the greatest harm to mankind by destroying individuality which is at the root of all progress. (Ibid, p 27)

সেইজন্য তাঁর মতে

Swaraj of a people means the sum total of the swaraj (self-rule) of individuals.

এইজন্যই তিনি বিশ্বাস করতেন যে আদর্শ রাষ্ট্রের শাসন-পরিধি হবে ন্যূনতম।^১ কিন্তু এই রকম আদর্শ রাষ্ট্রে ব্যাপক

১। স্বাধীনতা এবং বিষয়ে যে মতামত পোষণ করতেন তা গান্ধীজির মতবাদ হতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক মতামত সম্পূর্ণ অস্ত্রভরী ছিল। কিন্তু ব্যক্তিক সত্তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার বিরুদ্ধে তাঁর মতও খুব দৃঢ় ছিল। 'মরে-বাইরে' হতে কয়েকটা লাইন তুলে দিচ্ছি :—'জয়ের শাসনসীমা কোন্ পর্বন্ত সেইটের দ্বারাই সেনের মানুষ

আত্মবিকাশের সুযোগ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য অন্ততঃ কয়েকটি জিনিস দরকার। পুঁজি যদি কয়েকজনের হাতে পুঞ্জীভূত হয় তা হ'লে তা শোষণ ছাড়া আর কিছুই নয়, তাতে ব্যক্তির প্রকৃত বিকাশ বাধা পেতে বাধ্য। সেইজন্য বিকেন্দ্রীকরণের দরকার—

What India needs is not the concentration of capital in a few hands, but its distribution so as to be within easy reach of the 7½ lakhs of villages...we want to organize our national power not by adopting the best methods of production only but by the best method of both the production and distribution (*Ibid.* p. 69)

এর অর্থ নৈতিক যুক্তি হিসেবে তিনি বলেছেন,

India became impoverished when our cities became foreign markets and began to drain the villages dry by dumping cheap and shoddy goods from foreign lands. (*Ibid.* p. 68)

এই রকম নতুন ধরনের গ্রামীণ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হ'লে তাতে হিংসা অর্থাৎ শোষণ থাকবে না।

Rural economy as I have conceived it eschews exploitation altogether, and exploitation is the essence of violence. (*Ibid.* p. 88)

তার মানে এ নয় যে, আমাদের গরুর গাড়ির যুগে কিরে যেতে হবে। আসল কথা হ'ল, মেশিন থাকবে, কিন্তু মানুষের কল্যাণের উপর তার দাবী বড় হয়ে উঠবে না।

Machinery has its place, it has come to stay...[But] I refuse to be dazzled by the securing triumph of machinery. ...That use of machinery is lawful which subserves the interest of all. (*Ibid.* pp. 66-67)

এই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে কেবলমাত্র বিকেন্দ্রীভূত সমাজে। কাজেই কথাটা শুধু রাষ্ট্রীয়করণের প্রতিবাদ হিসেবে ব্যবহৃত নয়। একটা বৃহত্তর আদর্শের আনুযায়িক বা উপায় হিসেবেই কথাটা এসেছে। রাষ্ট্রীয়করণ সে আদর্শকে ব্যাহত করে, সেইজন্য গান্ধীজি তার বিরোধী। বিকেন্দ্রীকরণ সেই আদর্শকে সকল করে, সেইজন্য তিনি তার পক্ষপাতী। এইজন্যই তিনি এক জায়গায় রাষ্ট্রীয়করণের এমন এক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যার অর্থ আমি আজও বুঝতে পারি নি। তাঁর কথা হ'ল—

কতটা স্বাধীন জানা যায়। ভয়ের শাসন যদি চুরি ডাকাতি এবং পদের প্রতি অস্ত্রের উপরেই চালাইয়া যায় তাহলে বোঝা যায় যে, প্রত্যেক মানুষকে অস্ত্র মানুষের আক্রমণ থেকে স্বাধীন রাখবার জন্যই এই শাসন। কিন্তু মানুষ নিজে কী কাপড় পরবে, কোন্ দোকান থেকে কিনবে, কী খাবে, কায় সঙ্গে-বসে থাকবে, এও যদি ভয়ের শাসনে বাধা হয় তাহলে মানুষের ইচ্ছাকে একেবারে গোড়া বেঁধে অস্বীকার করা হয়। সেইটেই হ'ল মানুষকে মানুষত্ব থেকে বঞ্চিত করা।”

Jawaharlal does indeed talk of nationalization of property but it need not frighten you. The nation cannot own property except by vesting it in individuals. It simply ensures its just and equitable use, and prevents all possible misuse; and I do not think you can have any possible objection to holding your property for the benefit of the ryots. (*Ibid.* p. 90)

আমরা রাষ্ট্রীয়করণ বলতে সাধারণতঃ যা বুঝি, গান্ধীজি সে অর্থে কথাটা মোটেই ব্যবহার করছেন না। তাঁর বোধ হয় ধারণা যে, রাষ্ট্রীয়করণ মানে স্বয়ং থাকবে ব্যক্তিরই, তার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করবে রাষ্ট্র। বলা বাহুল্য, আমরা এ অর্থে কথাটা ব্যবহার করি না। কিন্তু ব্যক্তির উপর গান্ধীজির ঝোঁক এখানেও লক্ষ্য করা যায়। এর থেকে আর একটু এগোলেই বলা যায় যে, যদি সেই ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে অহিংস হন, অর্থাৎ শোষণবর্জিত হন, তা হ'লে তিনি নিজেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবেন, রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের আর দরকার হবে না, এবং তখন minimum Government ছাড়া আর কিছুই দরকার হবে না। এর জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির সভ্যতারের enlightened হওয়া দরকার। সে অবস্থায় রাষ্ট্রও প্রায় থাকবেই না। এরই নাম enlightened anarchy, যা গান্ধীজির কাম্য ছিল।

৩

এ হতে বোঝা যায় যে, এই লড়াইটা সত্যিই বিরাট সামাজিক লড়াই। বস্তুতঃ গান্ধীজি জেনে শুনে খুব সম্ভাবনাই সে কথা বলেছিলেন। শ্রেণীসংগ্রাম সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন না তা নয়; বরং খুব বেশী সচেতন ছিলেন। তাঁর সমাধান কিন্তু বিভিন্ন রকমের। কমিউনিস্টরা বিশ্বাস করেন যে, মানব-চরিত্র বদল হয় না, তাই জোর ক'রে পূর্বকার রাষ্ট্রবন্ত্র ভেঙে দিতে হবে। এবং তারপর রাষ্ট্র অর্থাৎ প্রোলেটারিয়াট—খুব কড়া হাতে ডিক্টেটরি চালাবে। এ বিষয়ে তাঁদের মতামত খুব স্পষ্ট। লেনিনের মত উদ্ধৃত করে স্টালিন বলেছেন—

The dictatorship of the proletariat cannot be “complete” democracy for all, for the rich as well as for the poor; the dictatorship of the proletariat must be a state that is democratic in a new way for the proletarians and the partyless in general—and dictatorial in a new way against the bourgeoisie. (Lenin: *Selected Works*, vol. vii. p. 34—quoted by Stalin in *Leninism*, p. 43)

গান্ধীজির প্রস্থানভূমিটা গোড়া থেকেই একেবারে অন্য। মানুষের উপর তাঁর অবিচল বিশ্বাস। সেইজন্যই বল-প্রয়োগের বদলে ক্ষম-বদলে তিনি ভরসা রাখেন। সেই

কারণেই তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব "Ramrajya of my dream ensures rights alike of prince and pauper. (Bose, p. 89) এই জন্তই তিনি বলতে পারেন—

By the non-violent method, we seek not to destroy the capitalist, we seek to destroy capitalism. We invite the capitalist to regard himself as a trustee. (Bose, p. 86)

এখন সব চেয়ে বড় তর্ক থেকে যায় এ মতের সম্ভাব্যতা অসম্ভাব্যতা নিয়ে। সমাজ থেকে সক্ষম তুলে দিলাম না, অথচ তাকে একটা সীমা ছাড়াতে দেব না, এই নিয়ম করবে কে? ক্যাপিটালিস্টকে রেখে ক্যাপিটালিজম ধ্বংসের চেষ্টা কেমনতর? তা হ'লে মনে হয়, সত্যই তো সংগ্রাম চালু রাখতে হবে অথচ শেষ করা হবে না। রাষ্ট্রের ভয়েই কি বিকেন্দ্রীকৃত মূলধন নৈতিক সীমানার মধ্যে সংযত থাকবে? তা হ'লে কি রাষ্ট্র একটা বিকট মূর্তি ধরবে না?

এই প্রশ্নের জবাব দেবার আগে একটা পাল্টা প্রশ্ন আছে। গান্ধীবাদের কথা ছেড়ে দিচ্ছি আপাততঃ। ধরেই নিলাম যে ডাঙা মেরে ঠাণ্ডা না করলে লোভ যায় না—স্বৈচ্ছায় সম্পত্তিভাগ, ছদ্ম-বদল, ট্রেন্ডিশিপ এ সব আকাশ-বুহম মাত্র। সে হিসেবে বলপ্রয়োগ, ছাড়া গতি নেই এবং সে বলপ্রয়োগ যদি পূর্ণতম না হয় তা হ'লে বুর্জোয়ার জের মিটবে না এবং হয়তো একুশবার নিবুর্জোয়া করবার অবসর কলিযুগে মিলবেই না—সচকিত বুর্জোয়ারা একজোট হয়ে প্রতিবিপ্লবের ধাক্কায় বিপ্লবকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেবে। স্বতরাং গুস্তাদের মার প্রথম বেলাতেই হওয়া উচিত এবং সে মার একেবারে মোক্ষম হওয়া উচিত। কিন্তু মানবপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত মহত্ত্ব ও স্বার্থত্যাগের প্রবৃত্তিতে যারা বিশ্বাস করতে পারছেন না এবং সেই কারণেই বলপ্রয়োগের দরকার অস্বীকার করছেন, তাঁরাও শেষ পর্যন্ত কি বলছেন? কথাটা ভেবে দেখা দরকার। সকলেই জানেন, সোশ্যালিজম আর কমিউনিজম এক নয়। সমাজতন্ত্রবাদ হ'ল সাম্যবাদে যাবার প্রথম ধাপ মাত্র। এ দুয়ের তফাত আজ সকলেই জানেন, সেজন্য এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা নিপ্রয়োজন। এঙ্গেলস্ বলেছিলেন, পূর্ব সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হ'লে রাষ্ট্র স্তব্ধ হয়ে যাবে। অর্থাৎ তখন সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের আর কোনও

প্রয়োজন থাকবে না। কিন্তু এ অবস্থা সহজে আসে না। প্রথমে বুর্জোয়া সমাজের ধ্বংস চাই। এমন কি বুর্জোয়া সমাজের পুরো ধ্বংস না হ'লে যে শ্রমিকেরা কমতাগ্রহণ করবে না তা নয়। অন্ততঃ লেনিনের শিক্ষা তা নয়। কাজেই শ্রমিকেরা যদি স্বযোগ পেয়ে কমতা গ্রহণ করে, ঠিক সেই মুহূর্তেই যে বুর্জোয়া সমাজ পুরোপুরি চলে গেল এমন কথাও ভাবা যায় না। সেইজন্য পরাজিত বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে জোর গড়াই চালাবার দরকার বহুদিন থাকে। লেনিনের কথা হ'ল :

The dictatorship of the proletariat is a most determined and most ruthless war waged by the new class against a more powerful enemy, the bourgeoisie, whose resistance is increased tenfold by its overthrow. (quoted by Stalin in Leninism, p. 41)

স্বতরাং একদিকে যেমন এই নির্মম সংগ্রাম চলবে, অন্যদিকে চালাতে হবে নিজেদের পরিবর্তনের চেষ্টা। মাস্ক কর্মীদের বলেছিলেন—

You will have to go through fifteen, twenty, fifty years of civil wars and international conflicts, not only to change existing conditions, but also to change yourselves. (Ibid, p. 41)

লেনিন আরও স্পষ্ট করে বলেন—

It will be necessary under the dictatorship of the proletariat to re-educate "millions of peasants and small masters, hundreds of thousands of office-employees, officials and bourgeois intellectuals" to subordinate all these to the proletarian state and to proletarian leadership, to overcome "their bourgeois habits and traditions..."...just as we must "in a protracted struggle waged on the basis of the dictatorship of the proletariat—re-educate the proletarians themselves, who do not abandon their petty-bourgeois prejudices at one stroke, by a miracle, at the behest of the Virgin Mary, at the behest of a slogan, revolution or decree, but only in the course of a long and difficult mass struggle against mass petty-bourgeois influences. (Ibid, p. 42).

এই কথাগুলির তাৎপর্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিপ্লব হবার আগেই শুধু চিন্তাক্ষেত্রের প্রস্তুতি হ'লে চলবে না। বিপ্লব হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মনের সংস্কার যায় না। সেইজন্য বিপ্লবের পরেও দীর্ঘকাল ধরে প্রোলিটারিয়েটকে শেখাতে হবে—অর্থাৎ তাদের নতুন মানুষ করে তুলতে হবে। এই শিক্ষার প্রয়োজন এত দীর্ঘকালের যে যখন সমাজতন্ত্রবাদ থেকে সাম্যবাদে যাবার উপক্রম হয়েছে—অর্থাৎ পুরো একটা যুগ হাতেকলমে লোকে সমাজতন্ত্রবাদকে সফল করে পরবর্তী যুগে যাবার উপযুক্ততা অর্জন করেছে—তখনও এই শিক্ষার প্রয়োজন কমে না। মানুষের মন সত্য সত্যই বদলে দেওয়া তো সহজ নয়।

রাষ্ট্রের এই শুকিয়ে ঝ'রে যাওয়া সম্বন্ধে লেনিন তাঁর 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' নামক গ্রন্থে খুব পরিস্কার আলোচনা করেছেন। তাঁর প্রথম কথা হ'ল, নৈরাজ্যবাদীদের মতে রাষ্ট্রকে উৎখাত ক'রে দেওয়া এবং মার্ক্সীয় মতে রাষ্ট্রের ঝ'রে-পড়া সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। দ্বিতীয়তঃ, ধনতন্ত্রকে উচ্ছেদ করার সময় রাষ্ট্র ঝ'রে পড়ে না। পুরোপুরি সাম্যবাদ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর রাষ্ট্র ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়। কিন্তু মধ্যে এলেকট্রিসিটির ডিস্ট্রিবিউশন বৈশিষ্ট্য কিছুকাল থাকবেই। কেবলমাত্র সম্পূর্ণ কমিউনিস্ট রাষ্ট্রেই রাষ্ট্রবন্দের কোনও প্রয়োজন থাকে না, কেননা শ্রেণীগতভাবে কাউকে অত্যাচার করার বা দাবিয়ে রাখবার প্রয়োজন থাকে না।

Only Communism makes the State absolutely unnecessary, for there is nobody to be suppressed—"nobody" in the sense of a class, in the sense of a systematic struggle against a definite section of the population. (Lenin: *The State and Revolution*)

কিন্তু এ জিনিস সহজে হয় না। কমিউনিজমের প্রথম অবস্থায়—যাকে সোভিয়েট অবস্থা আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে—পুরোপুরি কমিউনিজম স্থাপনা করা সম্ভব হয় না। বর্জ্যের সমাজের জের তখনও কিছু কিছু চলে। সেইটেকে সজোরে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার জন্য সে অবস্থায় খুব জোরালো রাষ্ট্রবল চাই। একদিকে এই চাপ, অন্যদিকে জনসাধারণের অভ্যাস বদল—এইভাবে পুরো কমিউনিজমের স্থাপনা হবে।

স্টালিনও তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ *Economic Problems of Socialism in USSR*-তে বলেছেন, সমাজতন্ত্রবাদ থেকে পুরো সাম্যবাদে যেতে হ'লে অন্ততঃ তিনটি শর্ত পূর্ণ হওয়া চাই। প্রথমটি হ'ল, সমস্ত সামাজিক উৎপাদনের অবিরাম প্রসার। দ্বিতীয়তঃ, যৌথ কৃষি-ব্যবস্থা এখন আছে group property হিসেবে—সেটা সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয়করণ চাই। তৃতীয়তঃ, সমাজের মতিগতির সম্পূর্ণ বদল চাই। স্টালিনের কথাই তুলে দিচ্ছি—

It is necessary, in the third place, to ensure such a cultural advancement of society as will secure for all members of society the all-round development of their physical and mental abilities, so that the members of society may be in a position to receive an education sufficient to enable them to be active agents of social development, and in a position to freely choose their occupations and not be tied all their lives, owing to the existing division of labour, to some one occupation. (p. 78)

যতক্ষণ বড় বড় জটিল মেশিন থাকবে ততক্ষণ সেসব মেশিন চালাবার জন্য বিশেষ শিক্ষারও দরকার হবে এবং ততক্ষণ শ্রমবিভাগের হাতও এড়ানো যাবে না। প্রত্যেকেই পলিটেকনিকে সমান শিক্ষা পেয়ে প্রত্যেকেই সব মেশিন চালাতে সমান দক্ষতা অর্জন করবে—এ না হ'লে শ্রমবিভাগের হাত সম্পূর্ণ এড়ানো বোধ হয় সম্ভব নয়। কিন্তু বড় বড় জটিল মেশিনে যদি তা সম্ভব না হয় তা হ'লে কি প্রশ্ন করা চলে যে, অপেক্ষাকৃত সহজ এবং ছোট ছোট মেশিনের রাজস্ব ছাড়া পুরো কমিউনিজম সম্ভব নয়?

যাক, এই আহুযজিক প্রশ্ন ছেড়ে দিলাম। যে কথাটা বলছিলাম। দেখা যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত নতুন মানুষ গড়তেই হবে। তারই জন্য অবিরাম চেষ্টা। প্রথম বিপ্লবের পূর্ব হতে একেবারে পুরো সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত এই চেষ্টা চলবে। দশ বিশ পঞ্চাশ বছরও তা চলতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষ social development-এর active agent হয়ে না উঠবে ততক্ষণ পুরো কমিউনিস্ট সমাজের প্রতিষ্ঠাও হবে না। কিন্তু যখন মানুষ ওই বকম বদলে যাবে তখন পুরো কমিউনিস্ট সমাজের প্রতিষ্ঠাও হবে আর রাষ্ট্রও ক্রমে ক্রমে শুকিয়ে ঝ'রে যাবে।

সুতরাং আমার পাণ্ডা প্রশ্ন হ'ল, উপায় বতই পৃথক হোক না কেন, (প্রসঙ্গতঃ ব'লে রাখা ভাল যে উপায় ভয়ঙ্কর-রকম পৃথক; সেই জন্যই গান্ধী আর লেনিনের সমীকরণের চেষ্টা অত্যন্ত অন্তায় ব'লে আমি মনে করি।) শেষ পর্যন্ত এ কথা কি কেউ অস্বীকার করতে পারেন যে, কেবল যান্ত্রিক উপায়ে শেষ পর্যন্ত কোনও মানবিক সমাজ চলতে পারে না? এ কথাও তো সহজেই বোঝা যায় যে-সময় প্রত্যেকটা মানুষ রাষ্ট্রের আদর্শ সফল করার জন্য সম্মানে চেষ্টা করছে সেখানে তাদের উপর জোর করার দরকার হয় না এবং রাষ্ট্রের কর্মসীমা স্বতঃই কমতে কমতে প্রায় অদৃশ্য হয়ে যায়। রাষ্ট্রের আদর্শ লেনিনের ও গান্ধীর এক নয়। দুজনের উপায়ও পৃথক। কিন্তু যখন লেনিনের পথেই লেনিনের আদর্শে মানুষ পৌঁছে যাবে এবং প্রত্যেকেই সমাজবিকাশের active agent হিসাবে চলার মত রাষ্ট্র শুকিয়ে যাবে, তখন জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি ও সমাজের নিয়ামক থাকবে কে? মানুষের হিতবুদ্ধি নয় কি? যান্ত্রিক উপায়টা গোড়ায় দরকার যদি বা হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নতুন মনোবৃত্তি ছাড়া উপায় আছে কি?

গান্ধীজি সম্পূর্ণ নতুন উপায়ে গোড়া থেকেই এই হিতবুদ্ধি জাগ্রত করতে চাওয়া ছাড়া অন্য কিছু চেয়েছিলেন কি? স্বতঃস্ফূর্তির তত্ত্বের লেনিন অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। গান্ধীজিও স্বতঃস্ফূর্তির তত্ত্ব বিশ্বাস করেন নি। আপনা-আপনি এ-রকম বদল হয় না। তার জন্ত অবিরাম চেষ্টা চাই। শ্রেণীসংগ্রামের চেয়ে এ সংগ্রাম কিছুই ছোট নয়, বরং আরও বড়। বস্তুতঃ এটা যে কঠিনতর শ্রেণীসংগ্রামই—এ কথা গান্ধীজী বলতে কখনও কসুর করেন নি। কঠিনতর এই কারণে যে, এ যারের ভয় দেখিয়ে মন বদলানো নয়, গোড়া থেকেই সত্যকারের মন বদলানো। যা কমিউনিস্টদের মতে অসম্ভব। তাঁদের মতে প্রথমটায় বল-প্রয়োগ চাই-ই—প্রোলেটারিয়েটের ডিক্টেটরশিপ প্রথমটায় না হ'লে চলবে না।

এখানে প্রশ্ন ওঠে বিকেন্দ্রীকরণের জন্ত প্রতি পদে নিয়ন্ত্রণ চালাতে গেলে রাষ্ট্র monster-রূপ নেবে কি না? আমার মনে হয় এ প্রশ্ন ঠিক লাগছে না। পূর্বেই বলেছি, কমিউনিস্ট শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, বুর্জোয়া সমাজের পতনের পরও প্রোলেটারিয়ান রাষ্ট্রকে বহুকাল ধরে সংগ্রাম চালাতে হবে, কেননা বুর্জোয়া সমাজের শিকড় সহজে মরে না। লেনিনের কথায় সে সংগ্রাম হবে “a most determined and ruthless war,...bloody and bloodless, violent and peaceful, military and economic, educational and administrative.—অন্যদিকে, নতুন রাষ্ট্রকে শক্ত বুনিয়ে দাঁড় করাবার জন্ত যে নিদারুণ নিয়ন্ত্রণ দরকার তার কথা সকলেই জানেন। সুতরাং সে রাষ্ট্র যদি monster-রূপ না নেয়, তা হ'লে বিকেন্দ্রীকরণের জন্ত যতটুকু নিয়ন্ত্রণ দরকার সেটুকু নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্র monster হয়ে উঠবে কেন? গান্ধীজি তো গোড়া থেকেই চেয়েছিলেন মানুষের সম্মান সহযোগিতা, স্বচ্ছ স্বার্থ-ত্যাগ। এটা কাজে সম্ভব হোক আর নাই হোক, সে কথা অন্য। সে কথাও কার্যক্ষেত্রে আমাদের ভাবতে হবে, কিন্তু শুধু থিয়োরির দিক থেকে অস্বস্তি: এতে গোড়ার দিকে নিয়ন্ত্রণ দরকার হ'লেও তা তুলনায় কমই হবে। প্রয়োজনমত সে রকম নিয়ন্ত্রণ চাই, কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাই না—এ কথা গান্ধীজি নিজেই বলেছেন।

The violence of private ownership is less injurious than the violence of the State...the State represents violence in a concentrated and organized form...However, if it is unavoidable, I would support a minimum of State-ownership, (Bose, p. 42)

মানুষের স্বচ্ছ স্বার্থ নৈতিক সীমানার মধ্যে যদি সংঘত না হয়, অথবা গোড়ায় তার সেই নীতিবোধ জাগ্রিত হতে যদি দেরি হয়, তা হ'লে নিয়ন্ত্রণ কিছুটা দরকার হবে বই কি। কিন্তু অন্তঃপন্থায় withering away of the state হবার আগে পর্যন্ত যে কঠিন সর্বগ্রাসী নিয়ন্ত্রণের দরকার হয় তার চেয়ে স্বভাবতঃই কম। সেই জন্ত গান্ধীজি বলতেন যে, ব্যক্তিগত সঞ্চয় হিংসার ফল, কিন্তু রাষ্ট্রগত সঞ্চয় অহিংসারই ফল।—

Accumulation by private persons was impossible except through violent means, but accumulation by the State in a non-violent Society was not only possible, it was desirable and inevitable. (Bose, p. 279)

এর তাৎপৰ্য্য খুব স্পষ্ট।

সেই সঙ্গে আরও একটা কথা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। সেটা হ'ল, প্রমাণ ও প্রমেয় এক নয়। প্রমেয় থাকলে তার প্রমাণ থাকে, কিন্তু একটা প্রমাণ দেখলেই তৎক্ষণাৎ প্রমেয় বস্তুর সম্পূর্ণ স্বরূপ বোঝা যায় না; কেননা তারও প্রমাণ থাকতে পারে। জর হয়েছে দেখেই বলা চলে না, রোগী সান্নিধ্যপাতিকে ভুগছে, কারণ মরি হ'লেও জর হয়। সমস্ত লক্ষণ মিলিয়ে তা বুঝতে হবে। পুঞ্জির পুঞ্জীভবন এখন একটা টেকনিকের মত। পূর্বে একটা বিশেষ সামাজিক প্রক্রিয়ারই লক্ষণ ছিল পুঞ্জির পুঞ্জীভবন। সে সমাজ হ'ল ধনতান্ত্রিক সমাজ। তার যত বিকাশ হবে, অর্থাৎ ধনতন্ত্র যত বাড়বে, পুঞ্জি ততই পুঞ্জীভূত হবে। এখন এই অবস্থার বদল হয়েছে। একটা বিশেষ সমাজের বিশেষ অবস্থার সঙ্গে পুঞ্জির পুঞ্জীভবনের অবিচ্ছেদ্য যোগ ঘুচে গিয়েছে। অন্য রকম সমাজেও পুঞ্জির পুঞ্জীভবন হতে পারে। তফাতটা টেকনিকের তত নয় যতটা উদ্দেশ্যের। কেন্দ্রীভূত কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে পুঞ্জির চরম পুঞ্জীভবন হয়, আমেরিকাতেও পুঞ্জির পুঞ্জীভবন হয়,—কিন্তু দুয়ের চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা। এক জায়গায় তা পুঞ্জীভূত হচ্ছে রাষ্ট্রের হাতে, অন্য জায়গায় তা ব্যবহৃত হচ্ছে ব্যক্তিস্বার্থের জন্ত। অর্থাৎ ক্যাপিটালিজমের জন্ত যেসব টেকনিক আবিষ্কৃত হয়েছে, কমিউনিজম সে টেকনিক ব্যবহার করতে দ্বিধা বোধ করে নি। বড় বড় ক্যাস্ট্রি, এরোপেন, অ্যাটম বোমা তৈয়ারির কারখানা এসব একই ধরনের দু জায়গায়।

লোহা-নিষ্কাশনের টেকনিক কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে কিছু নতুন নয়। শুধু এই বা কেন? এমন কি, লেন-দেন ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারেও সেই সমস্ত টেকনিক অনেক দূর পর্যন্ত ব্যবহার করতে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের কোনও দ্বিধা নেই। স্টালিন তাঁর শেষতম গ্রন্থে বলছেন যে, রুশিয়াতে তো জিনিস তৈরি করে বেচবার সময় দামের হিসেবেই কেনাবেচা হয়, জিনিসের বদলে জিনিস বিনিময়ের প্রথা নেই। কিন্তু ধনতাত্ত্বিক রাষ্ট্রে এর তাৎপর্য যে-রকম সমাজবাদী রাষ্ট্রে তা নয়, কারণ সেখানে সমাজসংগঠনটাই অস্ত্র। তাঁর কথা হ'ল :

Commodity-production leads to capitalism only if there is private ownership of the means of production, if labour power appears in the market as a commodity which can be bought by the capitalist and exploited in the process of production, and if, consequently, the system of exploitation of wageworkers by capitalists exists in the country.

সমাজতাত্ত্বিক দেশে এ সব নেই। সেই জন্য দামের হিসেব প্রচলিত থাকলেও তার ফলাফল সেখানে সম্পূর্ণ রকম তফাত। সেখানে উৎপাদনের উদ্দেশ্য হ'ল চরম লাভের লোভ নয়, সমাজের চরম উন্নতি। পক্ষান্তরে বিকেন্দ্রীকরণ হ'লেই যে সেই সমাজ ধনতাত্ত্বিক সমাজ হতে পারে না এমন কোনও কথা নেই। জাপানের বিকেন্দ্রীকৃত শিল্প-ব্যবস্থার কথা আমরা প্রায়ই বলে থাকি। এই দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের পর এমন কি ইংলণ্ডেও সেই ধরনের চেষ্টা কিছুটা দেখা যাচ্ছে। তা ব'লে কেউই বলবেন না যে, জাপান বা ইংলণ্ড ধনতাত্ত্বিক রাজত্ব নয়। আসল কথা হ'ল, একটা বিশেষ পারিপার্শ্বিকে পুঁজির পুঞ্জীভবন ধনতন্ত্রের বিকাশের নামান্তরমাত্র। একথাও সত্য যে ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক ঝোঁকই হ'ল পুঁজির পুঞ্জীভবনের দিকে। কিন্তু তা হতে উল্টো জিনিসটাও স্বতঃসিদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় না। অবস্থা বা পারিপার্শ্বিকের বদল ঘটলে দেখা যায় যে, পুঞ্জীভবন ছাড়াও ধনতন্ত্র চলতে পারে, অন্ততঃ অনেককাল চলতে পারে। আবার, পুঞ্জীভবন হ'লেও ধনতন্ত্রের আবির্ভাব একেবারেই না হতে পারে যদি পারিপার্শ্বিক বদলে দেওয়া হয় এবং সমাজব্যবস্থাটাই সম্পূর্ণ অস্ত্র রকমের থাকে। তখন অস্ত্রের টানে সৈনিককে চলতে হয় না, সৈনিকের ইচ্ছামতই অস্ত্র চলে এবং সে অস্ত্র সম্পূর্ণ নতুন উদ্দেশ্যে চালিত হয়। সূত্রবাং কেন্দ্রীভবনের অগ্নিবাণকে কাবু করার জন্য বিকেন্দ্রীকরণের বরুণবাণ ছোঁড়া হ'ল, ব্যাপারটা এ রকম

নয়। ব্যাপারটা বস্তুতঃ টেকনিকের ঠোকাঠুকির প্রশ্ন নয়ই। আসল কথাটা হ'ল সমাজবিজ্ঞানকে বদলে দেবার প্রশ্ন, যে কথাটা স্টালিন খুব গভীরভাবে বলেছেন। কমিউনিস্টরা সেই চেষ্টা করছেন আরও বেশি কেন্দ্রীকরণের মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ একেবারে সব রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করে। বিকেন্দ্রীকরণের প্রশ্ন যদি আলোচনা করতেই হয়, তা হ'লে সেটাকে এই পরিপ্রেক্ষিতেই দেখতে হবে,—বুঝতে হবে সেটা সমাজবিজ্ঞান এমন করে বদলাতে পারছে কি না যাতে 'ধনতন্ত্রের হাত হতে উদ্ধার পেতে পারা যায়। তা না হ'লে শুধু বিকেন্দ্রীকরণ হিসেবেই বিকেন্দ্রীকরণের মূল্য কিছু নেই। গান্ধীজি যে এটাকে গভীরতর অর্থে প্রয়োগ করার কথাই বলেছেন, এমন প্রমাণ তাঁর রচনায় ভুরি ভুরি আছে। সেটা সফল হবে কি না তা নির্ভর করে দুটি জিনিসের উপর। প্রথমতঃ, যদি কোনও মহাশক্তির পুরুষ আসেন যিনি মাহুঘের নৈতিক সীমানার মধ্যে সংযত থাকার মনোবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারেন, তা হ'লে তা হতে পারে। কিন্তু গান্ধীজি স্বয়ং এ রকম দৈবে বিশ্বাস করতেন না, কারণ একজন লোকের নৈতিক প্রভাবের উপরই যদি সমাজব্যবস্থার বদল নির্ভর করে তা হ'লে সে লোকটি মহাপুরুষ হয়ে যেতে পারেন বটে, কিন্তু তাতে সমাজব্যবস্থার আসলে কোনও বদল হয় না। সেই জন্য চাই সমাজব্যবস্থারই বদল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে, বিকেন্দ্রীকরণের লড়াইটাই হ'ল সেই সামাজিক শক্তির বিরুদ্ধে, যে শক্তির ফলে কেন্দ্রীভবন হয়। অতএব দেখতে হবে আজ সমাজে যে ঘাত-প্রতিঘাত চলছে তাতে এই লড়াইয়ের সাক্ষ্যের সম্ভাবনা কতখানি।

8

পূর্বেই বলেছি, এই লড়াইয়ের সাক্ষ্যের জন্য গান্ধীজি দুটি জিনিসের উপর নির্ভর করতেন। প্রথম হ'ল, মাহুঘের উপর দুর্মর বিশ্বাস। ডাকের মত ডাক দিতে পারলে তার হৃদয় বদল হবেই। দ্বিতীয়তঃ, যতদিন তা সম্ভব না হচ্ছে ততদিন নেহাত প্রয়োজন হ'লে কিছুটা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ। এইজন্যই গান্ধীজি নিজেকে প্র্যাক্টিক্যাল আইডিয়ালিস্ট বলতেন। তাঁর কল্পনা শুধু অলস কল্পনা ছিল না; কাজের খাতিরে তিনি অস্ত্র অস্ত্র ব্যবহার করতে রাজী ছিলেন,

যদি সে অল্প ক্রমে ক্রমে তাঁর আদর্শকে কাজে পরিণত করবার সহায়ক হয়। নচেৎ অবশ্য নয়।

কিন্তু গান্ধীবাদ মাক্সবাদের ইত্যাদি সব রকম 'বাদে'র নৈতিক টীকাটিপনৌ ছেড়ে দিয়ে সাধারণ বুদ্ধিতে জগতের বর্তমান অবস্থা বিচার করে আমার অনেক সময়ই দুটো কথা মনে হয়েছে। এ বিষয়ে খুব দৃঢ় সিদ্ধান্ত হিসেবে আমি কথা দুটি উপস্থিত করছি না, জাঁটি থাকলে সংশোধন মেনে নিতে রাজী আছি। তবু কথা দুটি বলি। প্রথম কথাটা হ'ল, আজ সংকটে পড়ে ধনতন্ত্র আবার এক নতুন রূপ নিচ্ছে। দ্বিতীয় কথাটা হ'ল, ভারতবর্ষের সামাজিক কাঠামোয় কেন্দ্রীকরণ-বিকেন্দ্রীকরণ-তন্ত্রের বিশেষ কতকগুলি সমস্যা আছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের পুনর্বিবেচনার দরকার আছে।

মাক্স ও লেনিনের কথাটা মূলতঃ এক হ'লেও পারিপার্শ্বিকের তারতম্য অনুসারে লেনিন তত্ত্ব ও কর্মকৌশলের কিছু কিছু বদল করেছিলেন এ কথা সকলেই জানেন। মাক্সিজম কোনও dogma নয়, লেনিন এ কথাটা খুব জোরের সঙ্গে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন এই কারণেই। বাস্তব অবস্থাকে উপেক্ষা করে কোনও বিপ্লবী তত্ত্ব হতে পারে না। মাক্স যে সময় তাঁর তত্ত্ব রচনা করেছিলেন তখন ধনতন্ত্রের রূপ এক রকম ছিল। লেনিনের সময় তার চেহারা বদল হয়ে গিয়েছে। মাক্সের সময় ধনতান্ত্রিক বিকাশ প্রধানতঃ জাতীয় সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, লেনিনের যুগের মত তার আন্তর্জাতিক ফিনান্স-ক্যাপিটালের চেহারা ততখানি প্রবল হয় নি। সেইজন্মই মাক্স বলেছিলেন, কোনও দেশে বুর্জোয়া সমাজের বিকাশ পরিণতিতে পৌঁছলে তবে শ্রমিকবিপ্লবের পথ প্রশস্ত হয়। সেই জন্ম শ্রমিকবিপ্লব হবার সম্ভাবনা সেই সব দেশেই ঘটে, যেখানে ধনিকসমাজ এ রকম পরিণতি লাভ করেছে বা করতে চলেছে। লেনিন বললেন, জগতের অবস্থা এমন বদলেছে যে, এ কথা আর সত্য নয়। মূলধন তার বিকাশের চরম পর্যায়ে পৌঁছে আন্তর্জাতিক ফিনান্স-ক্যাপিটালের রূপ নিয়েছে, সাম্রাজ্যবাদের জাল আজ জগৎজোড়া। সুতরাং সেই জাল যেখানে দুর্বলতম সেইখানেই তাকে ছিঁড়তে হবে। সেই দুর্বলতম স্থান থেকেই বিপ্লবের জয়যাত্রা শুরু হবে। সে দেশ শিল্পে অগ্রসর না-ও হতে পারে, কিন্তু

তাতে কিছু ঝাম-আদে না। লেনিনের এই বিশিষ্টতার কথা স্টালিন তাঁর 'লেনিনিজম' নামক গ্রন্থে খুব স্পষ্টরূপে দেখিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হ'ল, লেনিন ধনতন্ত্রের যে অবস্থা দেখেছিলেন বর্তমানে কি সেই অবস্থা আছে? সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই বলবেন, তা নেই। এই বদল নানা দিকে ঘটেছে। তার অনেকগুলি স্কলেরই চোখে পড়ে। প্রথমতঃ, আন্তর্জাতিক মূলধনের জাল এক জায়গায় ছিঁড়লেও এখনও জগৎবিপ্লব হয় নি। সেইজন্ম থিয়োরির দিক থেকে এক দেশে বিপ্লবের যুক্তি এখন তাত্ত্বিকদের তো জোগাতে হচ্ছেই; উপরন্তু ম্যালেনকভ স্বয়ং কিছুদিন আগে বলেছেন যে, ক্যাপিটালিস্ট ও কমিউনিস্ট দুটি পদ্ধতি জগতে পাশাপাশি থাকতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর শুধু রুশিয়া নয়, পরন্তু পূর্ব-জার্মানি হতে শুরু করে চীন পর্যন্ত এক অতি বিরাট ভূখণ্ড ধনতান্ত্রিক বাজারের বাইরে চলে গিয়েছে—যে কথাটা স্টালিন তাঁর নবতম গ্রন্থে খুব জোরের সঙ্গে বলেছেন। তৃতীয়তঃ, যে সব দেশ কমিউনিস্ট বাজারের বাইরেও আছে, তার মধ্যে অনেক দেশই মাথা নাড়া দিতে শুরু করেছে। বিশেষতঃ এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে পূর্বকার মত শোষণ চলবে না। চতুর্থতঃ, এ পর্যন্ত পশ্চাত্তম দেশগুলিতেও মূলধন দেখা দিচ্ছে, বিদেশী মূলধনের তার সঙ্গে রফা না করে উপায় নেই। আজ আমেরিকা যতই চেষ্টা করুক না কেন, পূর্বকার ইংলণ্ডের মত আন্তর্জাতিক ফিনান্স-ক্যাপিটালের জাল সে রকম ভাবে আর কোন্‌ও কালেই ছড়াবে না। তার জাল গুলোতে হয়েছে। একেই স্টালিন বলেছেন, ক্যাপিটালিজম-এর ক্রমবর্ধমান অন্তর্দ্বন্দ্ব। কিন্তু যদি কেউ বলেন, এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ধনতন্ত্র এখনই ভেঙে পড়বে তা হ'লে ভুল কথা বলা হবে। একদিকে যেমন এই সব অন্তর্দ্বন্দ্ব বাড়ছে, অন্যদিকে ধনতন্ত্রও বিপদ বুঝে ঠিক তেমনই আত্মরক্ষার জন্ত নিজের রূপ বদলাচ্ছে। আমেরিকার অতি-সাম্প্রতিক চেষ্টার কথা ছেড়ে দিলে বলা যায়, ধনতন্ত্রের আত্মরক্ষার জন্ত রূপবদলের প্রধান লক্ষণ হ'ল গ'প বা দল বাঁধা। একটা দেশ বা দু-তিনটি দেশ মিলে যখন সারা জগৎকে শোষণ করা আর সম্ভব হচ্ছে না, তখন স্বতঃই চেষ্টা হয় অন্ততঃ কয়েকটা দেশ একত্র মিলে

পারস্পরিক কিছু সুবিধা দিয়ে বাইরের সংকটের হাত এড়াবার। এ হ'ল সর্বনাশ উপস্থিত হ'লে অর্ধেক ভ্যাগ ক'রে আত্মরক্ষার সেই সনাতন চাণক্য-নীতি। এই রকম দল বাঁধার খুব বড় রকম চেষ্টা প্রথম দেখা গিয়েছিল বিশ্বব্যাপী সন্দার সময় অটোমো-চুক্তি বা ইম্পেরিয়াল প্রেক্ষারস্তের মধ্য দিয়ে। তারপর জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই চেষ্টা প্রসারিত হয়েছে—যার ফলে স্টালিং ব্লক, ডলার ব্লক, hard currency countries, soft currency countries ইত্যাদির উৎপত্তি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এর ছের মেটে নি, বরং বেড়েছে। পূর্বে আমরা যেখানে দেখতাম আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান ও অগংজোড়া অবাধ বহুমুখী বাণিজ্য, আজ তার বদলে সেইজন্মই দেখি নিয়ন্ত্রিত ও কণ্ট্রোল-কন্টাক্ত জাতীয় মূল্যমান এবং চুক্তিবদ্ধ দ্বিমুখী অর্থাৎ bilateral trade-এর ক্রমপ্রসার। এর মানে এ নয় যে, কোনও দেশেই ধনতন্ত্রের বিকাশ হচ্ছে না। বরং প্রাচ্যের যে সব পশ্চাৎপদ দেশ এখন শিল্পে বাণিজ্যে অগ্রসর হতে শুরু করেছে সে সব দেশে পুরনো ভঙ্গীতে ধনতন্ত্রের বিকাশ হচ্ছে এবং পুঁজির পুঞ্জীভবন হচ্ছে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, অবস্থার চাপে আন্তর্জাতিক কিনাশ-ক্যাপিটাল যেমন বিকলাঙ্গ হয়ে দল বেঁধে আপন প্রাণ বাঁচাবার নীতি অহুসরণ করছে, বাইরের মূলধনের চাপে এবং ভিতরের গণ-আন্দোলনে দেশী মূলধনও জর্য হতেই বিকলাঙ্গ। গত শতকে জাতীয় মূলধন যে নিদারুণ তেজে বেড়ে উঠেছিল এখন সে তেজ নেই, হতেও পারে না। স্তব্ধতা মাস্কের কর্মকাণ্ড যেমন লেনিন বদল করেছিলেন এখন এই অবস্থা-পরিবর্তনের ফলে কর্মকাণ্ডের পুনরায় বদল প্রয়োজন কি না সে কথা ভাবা দরকার। বিকেন্দ্রীকরণ কি সেই নতুন কর্মকাণ্ড হতে পারে?

কিন্তু এ বিষয়ে আলোচনা করবার আগে আরও একটা কথা বলা দরকার। সেটা হ'ল ভারতবর্ষের বিশেষ অবস্থা। পুঞ্জীভবন ক্রটিতেও হয়, বর্তমান ভারতবর্ষে তা হচ্ছেও। কিন্তু তবু এ কথা সত্য যে, শিল্পে যে রকম আকারে এবং বস্তুটা তীব্রভাবে পুঞ্জীভবন হয়, ক্রটিতে ততখানি হয় না। সেইজন্ম মাস্ক যখন ধনতন্ত্রের বিকাশের কথা বলেছিলেন তখন মূখ্যতঃ শিল্পের কথাই বলেছিলেন। এমন কি, সাম্যবাদীর ঘোষণাপত্রিকায় যে দ্বন্দ্বের কথা বলা হয়েছে, তা

কেবলমাত্র বুর্জোয়া ও প্রলেটারিয়াটের দ্বন্দ্ব—অর্থাৎ যারা মজুরি দিয়ে লোক খাটায় এবং যারা মজুরি অর্জন করে এই দুই দলের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব কৃষকসমাজের ভূমিকা কি, সে সম্বন্ধে একবার মাত্র একটি কথা আছে। মাস্কের সাধারণ অভিমত হ'ল, কৃষক সম্প্রদায় অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল, তারা ইতিহাসের ধারাকে পিছন দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে চায় এবং যদি কৃষক সমাজের কোনও এক ছোট অংশ কোনও সময় বিপ্লবের সহযোগিতা করেও, সেটাও প্রকারান্তরে স্বার্থের খাতিরেই।^২ সেইজন্ম মাস্কের তত্ত্ব ছিল কৃষকদের খামিয়ে রাখতে হবে। লেনিন অবশ্য বিপ্লবের শক্তি হিসেবে কৃষকদের কথা ভোলেন নি। কিন্তু তাঁর তত্ত্বও কৃষকেরা বিপ্লবের স্ট্রীমুখ নয়। এমন কি বিপ্লবের পরও তাদের সঙ্গে শ্রমিকদের সহযোগিতা ও সৌহার্দ্য থাকে, কিন্তু তবু পার্থক্যের ধারা সুস্পষ্ট। মধ্যে মধ্যে সংঘাতও হয়েছে, লেনিনকে তা সামলাতে হয়েছে। স্টালিনকেও সময় সময় তা সামলাতে হয়েছে। এই দ্বন্দ্বের ধারা এখন পর্বস্ত চলছে। স্টালিন তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থেও বলেছেন যে, শিল্পের ক্ষেত্রে যেমন রাষ্ট্রীয়করণ হয়েছে কৃষির ক্ষেত্রে তেমন হয় নি। যৌথ কৃষিক্ষেত্রগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় বটে, কিন্তু তারা পুরো State propertyও নয়,—তারা হ'ল Group property। এই তফাত ঘুচে না গেলে পুরো কমিউনিজম আসবে না। আপাততঃ এই দুইটির অস্ত্বদ্বন্দ্বের নিরাকরণ হবে বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক

২। মাস্কের কথা হ'ল, The lower middle class, the small manufacturer, the shopkeeper, the artisan, the peasant, all these fight against the bourgeoisie, to save from extinction their existence as fractions of the middle class. They are therefore not revolutionary, but conservative. Nay, more—they are reactionary, for they try to roll back the wheels of history. If by chance they are revolutionary, they are so only in view of their impending transfer into the proletariat. লেনিন স্পষ্ট করে বলেছেন, It may be said that the whole of Marx's *Capital* is devoted to explaining the truth that the basic forces of capitalist society are, and can only be, the bourgeoisie and the proletariat. (Lenin: *Work in the Rural Districts; Report Delivered at the Eighth Congress of the Russian Communist Party, Bolshevik, March 28, 1919*) লেনিন কিন্তু বললেন, However it by no means follows from this—it would be a profound mistake to think it does—that in the future work of building communism, now that the bourgeoisie has been overthrown and political power is already in the hands of the proletariat, we can continue to carry on without the assistance of the middle and intermediary elements....Now we must devote our attention to the question of the middle peasantry in its full magnitude. (Ibid)

সাহায্যের মধ্য দিয়ে।* কিন্তু পার্থক্য যে আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিপ্লবে কৃষক সমাজের স্থান কি—এই নিয়ে বিরাট একটি বই রচিত হতে পারে, তার বিস্তৃত আলোচনা এখানে একেবারেই সম্ভব নয়। যে কথাটা এখানে বলবার উদ্দেশ্য সেটা হ'ল এই যে, কৃষি আর শিল্পের চেহারা এক নয়, তাদের বিবর্তনধারাও এক নয়। কেন্দ্রীভবনের সমস্তা এবং তার প্রতিষেধক হিসেবে আরও কেন্দ্রীকরণ অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়করণের ব্যবস্থা শিল্পের ক্ষেত্রে সহজে প্রযোজ্য। কৃষিতে আজও কৃষি পুরো রাষ্ট্রায়ত্ত্ব হতে পারে নি। বস্তুতঃ কৃষির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যই সেদিকে বেশি নয়। কৃষিয়ার এই রাষ্ট্রায়ত্ত্ব কেন্দ্রীকরণের প্রভাব কৃষির উপর কি হয়েছে তাও এই প্রসঙ্গে চিন্তনীয়। সংক্ষেপে বলা যায়, কৃষিয়ার সমস্ত পরিকল্পনার ঝোঁক হ'ল শিল্পের দিকে, —কৃষি তার পিছনে পিছনে এসেছে। স্টালিন যে হিসেব সম্পদশ পাঠি কংগ্রেসে দাখিল করেছিলেন তা হতে দেখি যে, ১৯১৩ সনে মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৪২'১ ভাগ আসত বড় শিল্প হতে, কৃষি থেকে আসত ২৭'২ ভাগ। ১৯৩৩ সনে তা বদলে গিয়ে অবস্থা দাঁড়াল অন্তরকম; শিল্প হতে এল ৭০'৪%, কৃষি থেকে ২৯'৬%। এর মধ্যে আবার Producer Goods Industryর উপরই ঝোঁক পড়েছিল বেশি। কৃষির মধ্যেও শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের যত প্রসার হয়েছিল (সাড়ে সাত লক্ষ হেক্টারে বৃদ্ধি) খাদ্যদ্রব্যের তত হয় নি (সাত লক্ষ হেক্টারে বৃদ্ধি)। অর্থাৎ প্রধানতম ঝোঁক ছিল দেশকে শিল্পে অগ্রসর করা—তারই রথচক্রে অস্ত্র সমস্ত কিছু বাঁধা থাকবে। এই ধারা এখন পর্যন্ত প্রবহমান।

এ হতে একটা জিনিস মনে হয়। রাষ্ট্রীয়করণের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীভবনের প্রতিকার হতে গেলে সারা দেশটারই গতিপ্রকৃতি কেন্দ্রীভবনের দিকে ঝোঁক দরকার। অর্থাৎ, যে দেশটা কেন্দ্রীভবনের দিকে ঝুঁকেছে সেইখানেই ঐ চিকিৎসা সহজে এবং খুব সহুভাবে চলতে পারে। যে দেশটা আগাগোড়া শিল্পায়িত হয়ে ওঠে নি এবং আর সমস্ত কিছুই তার রথচক্রে বাঁধা নয় সেখানে ঐ চিকিৎসা

ব্যাহত হয় না কি? পূর্বেই বলেছি, কৃষিতেও কৃষির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়করণ সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব হয় নি। যে দেশ সর্বপ্রথম একমাত্র শিল্পায়নকেই সর্বপ্রধান স্থান দিয়ে আর সব কিছুই সেই অহুসারে গুঁড়ে তুলতে চায় না, সে সব দেশে তা হ'লে কি পুরো রাষ্ট্রীয়করণ ছাড়া অস্ত্র কোনও উপায়ের সম্ভাবন প্রয়োজন নয়? প্রশ্ন উঠতে পারে, ভারতবর্ষকেও পুরোপুরি শিল্পপ্রধান দেশ করবার আদর্শ-ই আমরা গ্রহণ করছি না কেন? এ প্রশ্নের আলোচনা বর্তমান পরিসরে সম্ভব নয়। তবু সংক্ষেপে বলা যায়, সে আদর্শ গ্রহণ করলেও তা কাজে পরিণত করা সহজে সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, আজ বাইরের জগতে যে অবস্থা তাতে আমরা জিনিস উৎপাদন করলেই তা আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করতে পারব তা নয়। এমন কি নিজেদের দেশে প্রচুর পরিমাণে বিক্রি করার পথেও বাধা আছে। প্রধানতম বাধা হ'ল ক্রয়ক্ষমতার অভাব। সে বাধা রয়েছে কেন, তা কেন দূর করা যাচ্ছে না এসব অনেক তর্কের বিষয়। আপাততঃ যদি ধরে নেওয়া যায় যে, আমরা রাতারাতি শিল্পভূমি দেশ হচ্ছি না এবং কৃষিই কিছুকাল পর্যন্ত সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জীবিকা থাকবে, তা হ'লে আমাদের দেশের এই বিশেষ অবস্থায় কোন কৌশল সবচেয়ে কার্যকরী হবে?

এ বিষয়ে আমি নিজে এমন কোনও দৃঢ় সিদ্ধান্ত করতে পারি নি, যার ফলে খুব জোর ক'রে কোনও শেষ কথা বলবার সাহস রাখি। কিন্তু তবু না ব'লে পারছি না যে, এ যত ভেবেছি ততই মনে হয়েছে যে বর্তমান কালে এই সব অবস্থাবৈশিষ্ট্যের ফলে জগতে—বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষে—এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যাতে আমাদের নতুন কর্মকৌশলের কথা ভাবতে হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে ছোট ছোট শিল্পের উপর জোর পড়ছে, কৃষিও সমবায়ী করবার চেষ্টা হয়েছে। হয়তো বিকেন্দ্রীকরণের বর্তমান সরকারী রূপ এই-ই। এতে আমাদের এখনো-জোরালো ধনতান্ত্রিক কাঠামোর অন্তর্দ্বন্দ্ব মিটবে কি? সমাজবাদী টেকনিকের পুরো নিয়ন্ত্রণের দরকার হবে না? অর্থাৎ আমরা উভয় দিক পরিচালনা ক'রে একটা সত্যিকারের নতুন মধ্যম নিকায় তৈরী করতে পারব—যে নিকায় সফল হবে? এ বিষয়ে সমাজশাস্ত্রীরা ভাবুন, আমার বক্তব্য এই।

৩। স্টালিনের কথা হ'ল, Of course, the workers and the collective-farm peasantry do represent two classes differing from one another in status. But this difference does not weaken their friendship in any way. (Economic Problems of Socialism in the USSR, p 80.)

বট-বিটপী

শ্রীকৃষ্ণদরশন মল্লিক

৩
রাঙা বতুল মাঝে কণা বীজ
কোথা ছিল সখল ?
রচেছ বিরাট পরিমণ্ডল,—
শ্রামল স্থনির্মল ।
আহা, কত প্রাণী বাসা বাঁধিয়াছে,
লভিয়াছে আশ্রয়,
বিহগগণের কাকলী তোমারে
করিয়াছে গীতিময় ।
তুলিয়া বিশাল শাখা-বাহু—তব
স্ববহু পরিবার,
স্বর্ণ আলোর পরিবেশে করে
স্বর্ষে নমস্কার ।
পুষ্পাকাঙ্ক্ষা তব—
সমীরে ধ্বনিছে নব গায়ত্রী
বহু হব, বহু হব ।

২

এই নিখিলের রসধারা তুমি
করিতে চাহিছ পান,
আঁচল ভরিয়া বিলাইছ নিতি
শ্রাম মমতার দান ।
মানসনয়নরঞ্জন তুমি,
আখি ভরে হেরি জাঁক—
পুষ্পে পুষ্পে মধুপ শুভ্রে
শাখে শাখে বাঁধে চাক ।
চাক চিকণ প্রতি পত্রটি
এড়ায় না মোর দিটি,
কোন রাজহুয় যজ্ঞের ঘেন
নিমজ্ঞণের চিঠি ।
বাড়াতে তোমার মান—
তোমার পঙ্কে প্রায় প্রাবনে
ভেসেছেন ভগবান ।

৩
বিপুল মহিমা মণ্ডিত তুমি
হয়েছ আরাধ্য—
তোমারে বেরিয়া বিরাজ করিছে
তীর্থ-মাহাত্ম্য ।
আসে ভৈরব ভৈরবী জন
আসে শঙ্কর তারা,
করে তরুণ দূর বনজুল
গন্ধেতে মাতোয়ারা,
কত নৈমিষারণ্য তোমার
গুপ্ত করেছে মন,
কতই হোমের গন্ধ বহিয়া
আনিয়াছে সমীরণ ।
মনে যে আমার হয়—
সকল বটই অক্ষয় বট
হয়ে রবে অক্ষয় ।

৪

কুত্র হইতে বহু মহৎ
করেন বিদ্যহারী,
হে বনম্পতি, তুমি অমৃতের
হয়ে রও অধিকারী ।
শত ভক্তের চরণধূলায়
হোক তব অভিষেক,
করুক শাস্তিবারি বরিষণ
শত আঘাতের মেঘ ।
শত শরভের আলোক তোমাকে
করুক ধ্বজি দান,
শত বসন্ত জোয়ারে তোমার
ভয়পূর হোক প্রাণ ।
প্রসারিয়া কলেবর—
একই জীবনে দিব্য জীবন
লভ জন্মান্তর ।

আত্মস্মৃতি

চতুর্থ প্রবাহ—চতুর্থ তরঙ্গ

অথ পরিচয়-কথা (১)

শ্রীসজনীকান্ত দাস

এখন পর্যন্ত আমার পঁয়ত্রিশ বৎসরের সাহিত্য-জীবনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাহা করিতে গিয়া স্বরচিত কবিতা-উদ্ধৃতির আধিক্য ঘটয়াছে বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি জানাইয়াছেন। তাঁহারা লক্ষ্য করেন নাই এই কাহিনীর ভূমিকায় আমি লিখিয়াছিলাম,

মৌভাগ্যক্রমে কাব্যসম্বন্ধী জীবনের বিভিন্ন পর্বাণে আমার স্মৃতি ভর করিয়াছেন। হৃদের বন্ধনে অগোচর ও অধরা ক্ষণে ক্ষণে বাধা পড়িয়াছেন—স্বাভাবিক-জলতরঙ্গে আমার নগ্ন জীবনও ডেউরের দীর্ঘে টটরা উদ্ভাসিত হইয়াছে। সেই তরঙ্গমালার কথা সকলকে শুনাইবার উপকরণ আমার রচনায় আছে।

বিগত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া প্রত্যহ দিন-লিপি লেখার অভ্যাস থাকিলেও আমি প্রধানত সেই কাব্য-উপকরণকেই উপজীব্য করিয়াছি।

আগামী ২ই ডায় জীবনের পঞ্চম বৎসর অতিক্রম করিব। ছত্রিশ হইতে পঞ্চাশ এই শেষের কুড়ি বৎসরের কাহিনী রচনা দুরুহতম কর্ম। মৌভাগ্যক্রমে এই কালের পথ চলার সঙ্গীরা প্রায় সকলেই প্রত্যক্ষভাবে বিরাজ করিতেছেন। পরোক্ষে নৈবেদ্য-নিবেদন নিরাপন্ন; সাক্ষাতে তাহা করিতে গেলেই পদে পদে বিপদ। কাজেই অতঃপর যতদূর সম্ভব সাবধান ও সতর্ক হইয়াই অগ্রসর হইতে হইবে।

‘রাজহংস’-প্রকাশ প্রসঙ্গে দুই নূতন কবি-বন্ধুর উল্লেখ করিয়াছি—শ্রীশান্তি পাল ও শ্রীমান জগদীশ ভট্টাচার্য। তাঁহাদের দিয়াই “পরিচয়-কথা” শুরু করিতেছি। বর্তমানে আমার অন্তরঙ্গদের মধ্যে ইহারা দুইজন। পরিচয়ের সূত্রপাতে শান্তি পাল ছিলেন দক্ষ্য রত্নাকর, এখন নিঃসংশয়ে কবি বাব্বাকি; তবে মূল বাব্বাকির রামনাম-সাধনার জোর ছিল, বঙ্গীক-আবরণ তিনি ভেদ করিয়াছিলেন। এ যুগের বাব্বাকি ব্যাধি ও বার্ধক্যের

বন্দীকে ক্রমেই জড়ীভূত হইতেছেন। আর সেদিনের “কলেজ-বয়” জগদীশ ছিলেন তরুণ প্রেমিক—একাধারে গম্ভীর ও চটুল ছন্দের কবি। আজ তিনি প্রবীণ অধ্যাপক ও সাহিত্য-সমালোচক, এক কথায় সাহিত্যের মুকুটী হইয়া বসিয়াছেন। বেপথুমান হস্তে শাস্তি পাল আজিও স্রষ্টা, জগদীশ স্রষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অপরের সৃষ্টি-লীলা পর্যবেক্ষণেই সন্তুষ্ট।

শান্তি পালের সহিত পরিচয়-প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে মনোজ বসুর কথা বলা প্রয়োজন। পরে, বয়সের হিসাব খতাইতে গিয়া যদিও ধরা পড়িয়াছে, মনোজ আমার চাইতে মাত্র এক বছরের ছোট। কিন্তু কেন জানি না গোড়ায় তাঁহাকে ছোট্ট-খাট্ট শ্রীমান মনোজরূপেই অর্থাৎ রীতিমত পিঠ-চাপড়ানোর ভঙ্গিতেই গ্রহণ ও আলিঙ্গন করিয়াছিলাম। দিনটা স্পষ্ট মনে আছে—১৩৩৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসের ৭ তারিখ, ২১ মার্চ ১৯৩১, শনিবার। বর্তমান ‘প্রবাসী’-আপিসের প্রেস-ম্যানেজারের ক্ষুদ্র ঘরখানি লোকে লোকারণ্য, ঘোঁয়ায় অন্ধকার। শনিবারের বার-বেলার আড্ডা জমিয়া উঠিয়াছে; সুনীতিকুমার, কালিদাস, বিভূতিভূষণ (বন্দ্যো), বিবিকিবিলাস, পবিত্র এই অধমের টেবিলের চারিপাশে স্ব স্ব কচি ও স্বাচ্ছন্দ্য মত বসিয়া মুড়ি-সহযোগে তেলেভাজা খাইতেছেন। ব্রজেননাথ ও নীরদচন্দ্র উপরের সম্পাদকীয় কাজ সারিয়া প্রবেশ-পথে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই দুই চারিটি সরস বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিতেছেন। এমন সময় তাঁহাদের উভয়ের পাশ কাটাইয়া তৈল-চিকণ একটি তরুণের আবির্ভাব ঘটিল। কথায়-বার্তায় তো বটেই, গায়েও তখন তাঁহার বস্তুরে গন্ধ ছিল, অথচ বেশ সপ্রতিভ ভাব। আমাকে লক্ষ্য করিয়াই প্রথম কথা বলিলেন, একটা গল্প আনিয়াছি, শুনাইতে চাই।

অল্পভবে বুঝিলাম, উপস্থিত সকলেই কোতুক বোধ করিলেন; ব্রজেননাথ ও নীরদচন্দ্র বিপর্যয় গণিয়া নিঃশব্দে কাটিয়া পড়িলেন। বিভূতি ও আমি একটু তটস্থ হইয়া বসিলাম। সোৎসাহে বলিলাম, নিশ্চয়ই শুনিব, তবে আপাতত কিঞ্চিৎ মুড়ি ও তেলভাজা ভক্ষণ করিয়া এই আড্ডায় দীক্ষা গ্রহণ করুন। দ্বিতীয় বার বলিতে হইল না। মনোজ অচিরে আসিয়া গেলেন। পরশুরাম চা দিয়া গেল। জলযোগ-পর্ব সমাপনান্তে সবাই উন্মুখ হইয়া গল্প শুনিতে বসিলাম। গল্পটি নামে “বাব” হইলেও আসলে যশোহরের অজ্ঞ পল্লীগামে একটি চোঙ-ওয়াল গ্রামোক্তাদের প্রথম আবির্ভাব কাহিনী; সরস হাস্য-সহযোগে খুব মৃগিয়ানার সঙ্গে লেখা। পাঠ সাজ হইলে আমি লেখককে সম্মুখে আলিঙ্গন করিলাম, বিভূতিভূষণ তৈলসিক্ত হস্তেই তাঁহার করমর্দন করিলেন, যশোহরের যশ-গৌরবে তাঁহার মুখখানা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এক নিমেষে মনোজ বহু আমাদের গোষ্ঠীভুক্ত হইলেন। বলা বাহুল্য, পরবর্তী বৈশাখেই (১৩৩৮) গল্পটিও ‘প্রবাসী’-ভুক্ত হইল।

‘প্রবাসী’র সেই পরিচয় ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইল, ‘বঙ্গলী’র আয়লে মনোজ বহু অন্তরঙ্গদের একজন। তখন ইংরেজী ছায়া-ছবি দেখা আমার একটা বাতিকে দাঁড়াইয়াছিল। “বনফুলের” সহিত পরিচয়-প্রসঙ্গে এই বাতিকে কথা বিস্তারিতভাবে বলিব। ‘বঙ্গলী’র আড্ডায় একদিন ছবি দেখার কথা হইতেছিল—ভায়েরির তারিখ হইতেছে ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯০৪, মঙ্গলবার। আড্ডাধারীরা অনেকেই ছিলেন, স-“কার” নিখিল দাসও। মনোজ বলিলেন, ‘ছবিঘরে’ আমাদের শাস্তিদা থাকিতে পয়সা দিয়া ছবি দেখেন কেন? তাঁহার কাছে একবার হাজির হওয়া লইয়া কথা, তাহার পর যত ইচ্ছা ছবি দেখুন। আমি রহস্য করিয়া বলিলাম, দ্বিতীয়ালিটা না হয় তুমিই কর। অদম্য মনোজ ‘বঙ্গলী’র চিঠির প্যাড টানিয়া লইয়া ধস্ ধস্ করিয়া একটা পরিচয়-পত্র লিখিয়া দিলেন। উহা লইয়া নিখিল দাসের গাড়ীতে চাপিয়া ছই দাসে তৎক্ষণাত শিয়ালদহ সম্মিলিত “ছবিঘরে” হাজির হইয়া দেশবিখ্যাত সীতারূপ শাস্তি পালের সাহিত্য সাক্ষাৎ করিলাম। ঘোষ লেন অর্থাৎ শুড়িপাড়ায় অবস্থানকালে সিমুলিয়া পল্লীর

দুর্দান্ত শাস্তি পালের কীর্তিকাহিনী কিছু কিছু কানে আসিয়াছিল। গুণ্ডামি ইত্যাদিতে ওই পাড়ার জনৈক ঘোষ এবং জনৈক গোঁস্বামীর সমপর্যায়ের খ্যাতি ছিল তাঁহার। প্রকৃত্ত ঘোষ প্রমুখ শিল্পীদের লইয়া হেঁচুয়া অঞ্চল তিনি একাই সরগরম রাখিতেন। কিন্তু দৃষ্ট রসিকদের পাষণ্ড-হর্দয়ের ভলদেশে যে অন্তঃসলিলা গীতিকবিতার ক্ষমতা কলকল করিয়া প্রবাহিত হইত, নারদের তাহা জানিবার কথা নয়। ইহারই একটি প্রেমসীমারূপ প্রেমের কবিতা যে মৎসম্পাদিত ‘বঙ্গলী’তেই ঠিক নয় মাস পূর্বে বাহির হইয়াছিল, সে খেলাধুলার আমার ছিল না। স্মরণ্য সেই প্রথম আলাপেই মনোজের লিপি-দূত টেবিলে গড়াগড়ি বাইতে লাগিল, আমি কবিতার করাল দংশনায় বাধা পড়িলাম। সেই দিনই রাত্রি নয়টার “শো”য়ে ছই দাসগিন্নীসহ ছই দাসে “ছবিঘরে” ছবি দেখিয়াছিল সে-কথার উল্লেখ আর না করিলেও চলিবে।

শাস্তি পাল বয়সে আমার বড় এবং খেলাধুলার ক্ষেত্রে তাঁহার দেশজোড়া খ্যাতি সত্ত্বেও কবিকর্মে সন্নিহনে আমার শিল্পত্ব গ্রহণ করিয়া আমাকে গোড়া হইতেই গুরুত্ব মর্মান দিয়াছেন; সেই সম্পর্ক আজও অটুট আছে। আমার গৃহীণীকেও দ্বিধিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি অবলীলাক্রমে আমাদের পরিবারভুক্ত হইয়াছেন। সভাসমিতি এবং বায়ুপরিবর্তন ব্যপদেশে তিনি সর্বত্রই আমার সহগামী হইয়াছেন, প্রায় প্রত্যহ সত্ত্ব-রচিত কবিতা শুনাইয়া আমার চিত্তকে সরস রাখিয়াছেন। তাঁহার কবিতার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। বাংলার মাটির খাঁটি পদ্য তাহাতে পাওয়া যায়। তিনি চিরকাল শহরে বাস করিয়াও প্রধানতঃ পল্লীপ্রকৃতির কবি; প্রেরণা, অভিজ্ঞতা ও শব্দসম্পদ সংগ্রহের জন্য তিনি প্রায়শঃই দুর্ভাগ্য হর্গম পল্লীপথে উধাও হইয়া যান। এখন কবিতাই তাঁহার ধ্যানজ্ঞান, কবিতাই তাঁহার প্রাণ। প্রাচীন বাংলার বীরত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসও তাঁহার অন্ততম সাধনা। এই অশিক্ষিতপটু কবিয়ারুখটি নিজের অদম্য চেষ্টায় কাব্যলক্ষীর আশীর্বাদ অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার চিত্তের মৌলিক কাব্যপ্রেরণা যে বঙ্গাধীন “দস্তিপনা”তেও বিনষ্ট হয় নাই তাহার প্রধান কারণ হেঁচুয়া গুফরিগীর খেলাধুলা ধোড়-কাপের মধ্যেই কবি সত্যেন্দ্রনাথের স্নেহসম্পর্ক।

পরবর্তী কালে আমি কোন্ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলাম কবি শান্তি পাল স্বয়ং এইভাবে তাহার পরিচয় দিয়াছেন ‘বহুমতী’তে প্রকাশিত আমার চতুঃপৃষ্ঠাংশ (১৯৫৪) জন্মদিনের প্রশস্তি-কবিতায়—

“বিশটি বছর কোথায় দিয়ে কেমন ক’রে কাটল ভাই,
আজকে তোমার জন্মদিনে সেই কথাটি ভাবছি তাই।
বিশটি বছর হয়তো মোরা বিশটা দিনও তকাত নেই,
একটি দিনের অদর্শনে হারিয়ে কেলি মনের খেঁই।
কী সে বাহুমন্ত্রণে রত্নাকরে মানিয়ে পোষ,
চোখের কালো পর্দা খুলে, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দোব—
তুললে টেনে পঙ্ক থেকে, ভালবাসায় করলে মাং,
সাহিত্যিকের হাতে তুমি মিলিয়ে দিলে আমার হাত।
বন্ধু, আমি ভুলি নি তঁা শোধ করা কি যায় সে ধণ,
তোমার তালিম না পেলে ভাই কে বাজাত কাব্য-বীণা?
নিজের কথা কও মি কভু, পরের কথা শুনেই যাও,
আপনাকে তাই গোপন রেখে হ’হাত দিয়ে সব বিলাও।
কোথায় এমন ঘরদ্বী হার, বাঁক থেকে কে জানবে তায়?
যে এসেছে তোমার কাছে সেই পড়েছে প্রেমের দায়।
পুরাতনে জ্বা দিয়ে পঞ্চ-ভোলাঘের ফিরিয়ে বোড়,
বাণীর কুঞ্জে পদ্ম ফুটাও, ছুটাও বেঁটুর স্বপ্নঘোর...”

কবি শান্তি পাল নিজস্ব যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে অত্যাধিক থাকিলেও তাঁহার স্বীকৃতিতে সত্য আছে।

শ্রীমান জগদীশ শ্রীভূমির সম্ভান। গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পরিবারে তাঁহার জন্ম। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইলেও রাজনৈতিক অপরাধে সরকারী বৃত্তি-বঞ্চিত জগদীশ কলিকাতার বঙ্গবাসী কলেজে ভরতি হন এবং পরে সিটি কলেজে বি-এ পড়িতে পড়িতে সহপাঠিনীকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার জীবনের একমাত্র প্রেমের উদ্ভব হয়। সহপাঠিনী সহধর্মিণী না হইয়া উঠা পর্যন্ত যে গুরুতর অনিশ্চিত ও সংশয়বিশিত সঙ্কটকাল পল্লীগ্রামের একজন অনভিজ্ঞ গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পরিবারের সংস্কারবদ্ধ তরুণের জীবনে অনিবার্যভাবে আসিতে বাধ্য—সেই নিদারুণ অবস্থার মধ্যেই তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয়। ডায়েরিতে দেখিতেছি তারিখটা ১৮ই নবেম্বর ১৯৩৪—২রা অগ্রহায়ণ ১৩৪১, রবিবার। কয়দিন পূর্বেই ১৩৪১ কা্তিক ‘শনিবারের চিঠি’তে “কলেজ বয়” বেনামীতে রচিত তাঁহার “কলেজ গার্ল” কবিতার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। হালকা চটুল ছন্দে রচিত

ওই কবিতাটিতেই বেশ একটু চমকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন “কলেজ বয়”।

“রোজ	বিকেল বেলা	এই জানালাধানির
	ঠিক	সাম্নে দিয়ে,
ওই	ঘড়ির কাটার	সোয়া পাঁচটা হ’লে
এই	হাতা বেয়ে	ধীরে যায় সে চ’লে,
	তুমি	চিনবে ওকে
	তার	কল্পণ চোখে
খুব	ক্লান্ত বিষণ্ণতা	ফুটবে তাতে,
খান	তিনেক পুখিও	আর থাকবে হাতে।
যাবে	আপন মনেই	তার মেয়েলি বাঁটের
	ছাতা	ধী হাতে নিয়ে,
রোজ	বিকেল বেলা	এই জানালাধানির
	ঠিক	সাম্নে দিয়ে।”

এই অকাট্য প্রশংসাপত্রের জোরে শ্রীমানকে কবি হিসাবে কোল দিতে বিধা করিলাম না, প্রথম দর্শনেই একখানি ‘অজয়’ উপহার দিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলাম। তিনি তখনও প্রায় বালক বলিলেও চলে, একটা ঘোর নীল রঙের শার্ট পরিধানের থাকাতে তাঁহাকে ঠিক ব্রতী বালকের মত মনে হইতেছিল। সময় অপরাহ্ন, স্থান ‘বঙ্গশ্রী’-আপিস। রবিবার ছুটির দিন হইলেও আপিসেই ছিলাম। শ্রীবিজয়সিং নাহারের পিতা স্বর্গীয় পূরণচাঁদ নাহার মহাশয় আসিয়াছিলেন প্রথম বৎসরের প্রথম সংখ্যা ‘বঙ্গশ্রী’ এক খণ্ড সংগ্রহ করিতে। যাবতীয় সাময়িক-পত্রের মলাট সংগ্রহের বিচিত্র বাতক ছিল তাঁহার। ধীরে ধীরে তাঁহার এই খেয়াল-খেলা এক বিপুল ঐতিহাসিক সংগ্রহে পরিণত হইয়াছিল। আমাদের ‘শনিবারের চিঠি’ই যে কতবার মলাট বদলাইয়াছে সে জ্ঞান আমারই ছিল না। একদিন নাহার মহাশয়ের ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীটস্থ ভবনে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া তাক্তব বনিয়া গিয়াছিলাম। ডক্টর সুনীলকুমার দেবও অল্পরূপ একটা বাতক ছিল, দেশলাইয়ের বাজের মলাট সংগ্রহের। অনেক হাত সাফাইয়ের কসরৎ করিয়া তিনি নিঃশব্দে বন্ধুবান্ধবদের অজ্ঞাতসারে নূতন ছাপওয়ালা দেশলাইয়ের বাক্স দেখিলেই সংগ্রহ করিতেন। নাহার মহাশয়ের ও ডক্টর দেব সংগ্রহ জাতীয় বাহুঘরে সংরক্ষিত হইবার বৈচিত্র্য অর্জন করিয়াছিল।

যাহা হউক, নাহার মহাশয় মলাট সংগ্রহ করিয়া চলিয়া গেলেন, আসিয়া জুটিলেন বন্ধুবর দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিলেও কিশোর-কবিকে হঠাৎ বিদায় করিয়া দিতে পারিলাম না। দেবীদাস নৃপেন পাশের কামরায় বিশ্রান্তলাপে রত হইল। আমি জগদীশের সহিত কাব্য ও জীবনদর্শন বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণেই বিষয়ে অভিভূত হইতে হইল। দেখিলাম এই যুবক দূরে থাকিয়া আমার কাব্য ও বাস্তব জীবনের নানা সমস্তার সম্ভান রাখিয়াছে, আমার চলার পথের “পাদ-পাদপ”দের সম্বন্ধে তাহার কৌতূহলের অন্ত নাই। কথায় কথায় অন্তর্ক যুবক তাহার নিজের ব্যক্তিগত জীবনের জটিল সমস্তাগুলিও আমার কাছে উদ্ঘাটিত করিয়া ফেলিল। প্রধান সমস্তা অল্পলোম বিবাহের। প্রথম দিনের পরিচয়েই সঙ্কটত্রাণের ভূমিকায় আমাকে অবতীর্ণ হইতে হইল। কাজেই জগদীশের সহিত আমার সম্পর্ক কেবল সাহিত্যগত নয়, জীবনগত। নিকৃদ্দেশ পথের সহযাত্রী হিসাবে আমাদের পরিচয় ও পরস্পর নির্ভরতা। বাস্তব জীবনের প্রচণ্ড চাপে তাঁহার কবিজীবন ধ্বংস ও খণ্ডিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার জীবন ব্যর্থ হয় নাই। নব নৃতনের প্রাণে নব সৃষ্টির প্রেরণা জোগাইবার যে গুরু-ভূমিকায় জগদীশ অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাই তাঁহার সাধনাকে সার্থকতা দান করিতেছে।

তবু কবি জগদীশ ভট্টাচার্যের জন্ত আমার দুঃখ হয়। “পাদ-পাদপ”র কবিকে তিনি চিনিয়াছিলেন এবং “পাদ-পাদপ”র জের টানিয়া “মরীচিকা” কবিতায় (‘শনিবারের চিঠি’, ফাল্গুন, ১৩৪১) তাহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন—

“আবার বাজা শুরু :

মরু-বান্দুকার নাই সখী জল, মাই শ্রাম প্রান্তব,
নাই নীপহারা, দক্ষিণ সমীরণ,
নাই ফুলার বারি।

আছে অসহ যুগতৃষ্ণিকা-আলা,

আর ওই ঘরে—কত ঘরে জানি নাকো—

আছে মরুপথ—দিগ্‌দেবতার বিপলের আবহান,

চলার সঙ্গী আছে মরুভূমি আর আছে মহাকাল।

বরহারা আমি চলি আর চলি, এ চলা হবে না শেষ,

সব হারানোছি, তবু তো আজিও হই নি সর্বহার,

তুমি যে রয়েছ অদূরচারীর মানসলোকের মিতা,
তোমারি পরশে রাঙিরা উঠিছে চক্রবালের রেখা
তোমারি ভাবাতে মুগ্ধ হয়েছ অম-রজনীর বাঁধ,
আমি যে তোমার—তুমি যে আমার না-পাওয়া পথের বঁধ
তুমি আছ—তুমি আছ,
তুমি আছ তাই আমার পথের হবে না কখনো শেষ।
গুরু ধূলার বন্ধুর পথে তুমি আগে চূপে চূপে,—
তোমার মায়ায় পাহ-পাদপ লাগে—
লাগে ক্ষণিকের শ্রামল মরুভান।”

কিন্তু ‘ক্ষণ-শান্তী’র কবির ভাগ্যে “ক্ষণিকের শ্রামল মরুভান”ই শাস্ত হইয়া রহিল।

‘বঙ্গশ্রী’র আমলে ১৯৩৪ সনের গোড়ায় বাংলা দেশের দুই জন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পীর সান্নিধ্যে আসিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল, যাহার ফলে দুই অকৃত্রিম হিতৈষী স্বস্থদের স্নেহাশ্রিত বন্ধুত্ব আমার চিরজীবনের সম্পদ হইয়াছে। শ্রীঅতুল বহু ও শ্রীখামিনী রায়ের কথা বলিতেছি। ‘প্রবাসী’তে থাকিতে শিল্পী দেবীপ্রসাদ, প্রমোদকুমার ও চৈতন্যদেবের বন্ধুত্ব অর্জন করিয়াছিলাম। নন্দলাল বহুর সহিত পরিচয় ঘটে বারম্বার শান্তিনিকেতন যাতায়াতের ফলে, পরে গণেশনাথ ব্রহ্মচারীর কৃপায় ঘনিষ্ঠতা জন্মে। খামিনী রায়ের সহিত পূর্বেই পরিচয়মাত্র হইয়াছিল।

‘প্রবাসী’তে শিল্পী মুকুল দে এবং ‘বঙ্গশ্রী’র প্রথম বৎসরে দেবীপ্রসাদ ও চৈতন্যদেব সম্বন্ধে গুরু-গম্ভীর সচিত্র প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, শিল্পীরাই সাহায্য করিয়াছিলেন। আমার চিত্রশিল্প বিষয়ক কেরামতি ওইটুকু। অবশ্য ‘শনিবারের চিঠি’তে সুযোগ পাইলেই চিত্র ও চিত্রকরদের খোঁচা দিতে কখনও কসর করি নাই। শিল্পে ত্রাকামি ও মেয়েলিপনার বিরোধী ছিলাম। সেকালের ফ্যাশান লতানে পেলব মেকদণ্ডহীন চিত্রকলার বিরুদ্ধে আমার তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বাণ অতুল বহুর সহায়তায় পছন্দমায়িক হইয়াছিল। তিনি হঠাৎ জাহ্নুয়ারি মাসের (১৯৩৪) ৪ঠা তারিখে টেলিফোন-যোগে আমাকে সারদা আহ্বান জানাইলেন তাঁহারই উত্তোগে কলিকাতার বাছঘরে অল্পক্ষণ অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর চিত্র-প্রদর্শনীতে। ইহাই অ্যাকাডেমির প্রথম বাৎসরিক প্রদর্শনী, ১৯৩৩ সনের ২৩ ডিসেম্বর আরম্ভ হইয়া ১৯৩৪-এর ৭ই জাহ্নুয়ারি শেষ হয়। ৬ জাহ্নুয়ারি শনিবার অপরাহ্নে সেখানে উপস্থিত

হইতেই সর্বাত্মে অতুল বহু ও যামিনী রায়ের সঙ্গে আলাপ হইল। তিন জনেরই রাশিচক্রে নিশ্চয়ই অঙ্কুল গ্রহের সমাবেশ ঘটিয়াছিল, মৌখিক পরিচয় আন্তরিক সৌহার্দ্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হইল না। আমি মাসাধিক কালের মধ্যেই অতুল বহুর শিল্প-প্রতিভা সম্পর্কে 'বঙ্গদ্রী'তে (ফাল্গুন, ১৩৪০) সচিত্র প্রবন্ধ লিখিলাম এবং তিনিও তেলরঙে আমার পোর্ট্রেট আঁকিয়া ফেলিলেন। যামিনী রায়ও অচিরাতঃ 'যামিনীদা' হইয়া স্নেহালিঙ্গনে চিরতরে বদ্ধ করিলেন।

এই পরিচয়ের ফলে ভারতীয় কলাশিল্প বিষয়ে যে ভাবনা আমার চিত্তকে সেদিন অধিকার করিয়াছিল, তাহার পুনরাবৃত্তি এখানে দোষাবহ হইবে না।—

বাংলা চিত্রশিল্পের রঙ্গমঞ্চে আচার্য অবনীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হইতেই নবীন প্রাণের স্তর, অনুরের উল্গাম।

অবনীন্দ্রনাথ অসাধারণ প্রতিভা লইয়া জন্মিয়াছেন। তাঁহার অপরূপ কল্পনা এবং লেখনী ও তুলিকার তাহাকে রূপ দিবার অসাধারণ ক্ষমতা যে কোন বড় কবির কাম্য হইতে পারে। এতখানি কবিকৃতি ছিল বলিয়া তিনি খেয়ালী শিল্পী হইয়া রহিলেন। উপবৃত্ত শিল্প নন্দলাল বসু গুরু পুত্রীভূত হুই-খেয়ালের মধ্যে শিল্পসাধনার নূতন পথ আবিষ্কার করিলেন, নূতন ভারতীয় শিল্পকলাপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হইল।

ভারপর, অত্যন্তকাল মধ্যে বহু সাধক আসিয়া জুটিলেন; নৃত্যের আঘাতে জনসাধারণ সন্দেহাকুল, বিস্মিত ও বিস্মিত হইবার পূর্বেই জাভেল সাহেব, ভগিনী নিবেদিতা, আচার্য জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, স্টিফেন অ্যানি বেসান্ট, কামিনী সাহেব এবং 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকা এমনই জরনিদার তুলিয়া গিলেন যে, প্রকাশ্য সভার বাচাই হইবার পূর্বেই ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতির প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। ইহার মূলে আবেশিকতার চরমমীর বেগও হাল, নৃত্যের মোহও ছিল।

কিন্তু এই হঠাতের হুমোড়ে একটা গোল হইল এই যে, অবনীন্দ্র, নন্দলাল প্রমুখ শতসমর্থ তেজীমান সাধকের প্রাপ্য সম্মান ভিড়ের মধ্যে অক্ষম ক্রীষ অস্বকরণকারীদের মাধ্যমও বর্নিত হইতে লাগিল; মাথা-ভারী, দেহ-সরু নূতন শিল্পপদ্ধতি এতখানি গোষ্ঠাই সহ্য করিতে পারিল না। অবনীন্দ্রনাথ তখন শিল্প-গুরু, তিনি গুরুমূল্যে স্নেহে আশীর্বাদ করিতে শুরু করিলেন। রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে যে ক্রোধ, পঙ্কুতা ও অক্ষমতা দেখা গিল, অবনীন্দ্র-নন্দলাল-পরবর্তী শিল্পকলাপদ্ধতিতেও তাহা প্রকট হইয়া উঠিল। 'মনবী টলটয়ের কথার—

Both were quite lacking in naivete, sincerity, and simplicity and both overflowed with artificiality, forced originality and self-assurance.

কিন্তু সে বিস্মৃত ও স্বতন্ত্র ইতিহাস, এই প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখমাত্র

প্রয়োজন। এ কথা সানন্দে স্বীকার করিতেই হইবে যে, বহু প্রতিভাশালী শিল্পী এই পদ্ধতিতে শিল্প-সাধনার আত্মনিয়োগ করিয়াছেন ও আত্মিক করিতেছেন এবং নিতান্ত দুঃখের বিষয়ও এই যে, অত্যন্তকাল মধ্যে বিস্মৃতিও দেখা দিয়াছে।

এই নূতন পদ্ধতির বহন সূত্রপাত হয় তখনই এক পক্ষের প্রতিবাদ ছিল। তাঁহার ইতিপূর্বেই পৃথক হইয়া আর্ট স্কুলের সমুদয়ের নয়দানে শিল্পচর্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সংখ্যার বেশী ছিলেন না, মোট পাঁচ-ছয় জন এবং তাঁহাদের নেতা ছিলেন তদানীন্তন আর্ট স্কুলের বিদ্রোহী মাষ্টার রণদা গুপ্ত মহাশয়।

বাঁহারা ভারতীয় চিত্রকলার গুণগান করিতে বসিয়া পশ্চিমের যুগযুগব্যাপী সাধনাকে অবজ্ঞা করিতেন, রণদাবাবু তাঁহাদের প্রতিবাদ করিতেন। বলিতেন, শিল্পের পূর্বপশ্চিম নাই, শিল্পের বিচার প্রাণ লইয়া, পদ্ধতি লইয়া নয়। ইতালীর পদ্ধতিতে অথবা জাপানী পদ্ধতিতে বাংলা দেশে বসিয়া যদি কেহ সত্যকার সজীব ছবি আঁকিতে পারে সেই চিত্রশিল্পকে সম্মান করিল। রণদাবাবু প্রাণবান পুরুষ ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতির বিকারে যে ধরনের পুরুষ ও স্ত্রী সৃষ্টির প্রচার হইতেছে তাহাতে জাতির প্রাণশক্তির অভাব সূচিত হইতেছে এবং এই ধরনের স্ত্রী ছবি দেখিতে দেখিতে জাতিও অধিকতর স্ত্রীত্ব বরণ করিবে। এই বিশ্বাস তাঁহাকে ক্ষুব্ধ করিত। শোনা যায়, একবার বালীগঞ্জের কোনও বাড়ির গৃহিণী তাঁহাকে ভারতীয় চিত্রশোভিত তাঁহার ঘরগুলি দেখিবাবু জন্ত আমন্ত্রণ করিয়া বিদায়কালে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কেমন দেখিলেন? রণদাবাবু বলিয়াছিলেন, চিত্রশিল্পের ইতিহাসে পড়িয়াছি, পূর্বে রোমের অধিবাসীরা দেখিতে কদাকার ও দুর্বল ছিল। দেখিয়া শুনিয়া তদানীন্তন চিত্তাঙ্গীল কয়েকজন প্রসিদ্ধ শিল্পী চিত্রে আদর্শ পুরুষ ও স্ত্রী অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করেন। সেই সকল চিত্র অনুধান করার কালে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে দেশে স্ত্রীপুরুষের চেহারা ফিরিয়া যায়। এই পদ্ধতি বলিয়া পরিশেষে তিনি বলেন, তাই ভাবিতেছি, এ বাড়ির ছেলেমেয়েদের চেহারা ভবিষ্যতে কেমন হইবে। মাস কয়েক পরে পুনরায় সেই বাড়িতে আমন্ত্রিত হইয়া রণদাবাবু দেখিতে পান, ভারতীয় চিত্রগুলি সমুদয় অন্তর্ধান করিয়াছে।

এই রণদা গুপ্তের স্কুলের নাম ছিল জুবিলি আর্ট অ্যাকাডেমি। অতুল বহুর শিল্প-শিক্ষার গোড়াপত্তন এইখানে, পরে তিনি তিন বৎসর (১৯১৬-১৮) কলিকাতা গবর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া ১৯১৮ সনে শেষ পরীক্ষায় সকল বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর কৃতিত্ব অর্জন করিয়া শীর্ষস্থান অধিকার করেন। যামিনী রায় তাঁহার উচ্চ শ্রেণীতে পড়িতেন এবং ইউরোপীয় পদ্ধতির চিত্রকলায়, বিশেষ করিয়া পোর্ট্রেট অঙ্কনে, পারদম্ব ছিলেন। অতুল বহু আর্ট স্কুল ত্যাগ করিয়া শিল্পী হেমন মজুমদারের

বীডন স্ট্রীটস্থ গৃহে প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান আকাদেমি অব আর্ট প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি হন। যামিনী রায়ের সহিত এইখানেই তাঁহার পরিচয়। যামিনী রায় তখন হইতেই আর্টে বর্ণসঙ্করের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ভারতীয় নামে অভিহিত চিত্রশিল্পে দেশী বিদেশী নানা চঙ ও রঙের জগাখিচুড়ি দেখিয়া তিনি ক্ষুব্ধ হইতেন। এই বিক্ষোভই শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে দেশীয় প্রতিমা ও পটশিল্পের আদর্শে নিজস্ব বিশেষ চিত্রাঙ্কণ-পদ্ধতিতে প্রবৃত্ত করাইয়াছে। আজ যামিনী রায় কোনও প্রচলিত বা গতানুগতিক পদ্ধতির সাধক নন, তিনি নিজেই একটি পদ্ধতি, নিজেই একটি স্কুল। তাঁহার মূল আদর্শ ভারতীয় পৌরাণিক, তবে পাশ্চাত্য অঙ্কনপদ্ধতির সকল ধাপ অতিক্রম করিয়া, বিশ্বের শিল্প-গোলোকধারার সকল জটিলতা ভেদ করিয়া তিনি সহজ পথের পথিক হইয়াছেন, তাঁহার ‘বোধোদয়’ ‘কথামালা’ প্রবীণ প্রাক্তের পূর্ব অভিজ্ঞতাপ্রসূত।

৭ই জানুয়ারি প্রদর্শনী প্রকাশ্যতঃ বন্ধ হইয়া গেলেও আমি নূতন পরিচয়ের আকর্ষণে প্রত্যহ বৈকালে সেখানে যাইতে লাগিলাম এবং যামিনী রায় ও অতুল বসুর নিকট শিল্পবিষয়ে নানা নূতন কথা শুনিয়া লাভবান হইলাম। প্রদর্শনী সম্পর্কে ‘বঙ্গভী’তে প্রবন্ধ লিখিবার জন্তও এই-শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। পরবর্তী বৈশাখে (১৩৪১) সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল।

২২ জানুয়ারি যামিনী রায়ের বাগবাগানের বাড়িতে রামধনুর কীর্তন শুনিতে আমন্ত্রিত হইয়া শিল্পীকে তাঁহার নিজস্ব পরিবেশে দেখিলাম। ধূপধূনাগুগুন্ডলের গন্ধময় বাতাস এবং চন্দ্রাতপবেষ্টিত প্রাক্তনের স্তিমিত আলোক, সর্বোপরি বেদনাবিধুর মাধুর্যকীর্তনের সুরের মাদকতা প্রাচীর-শোভিত যামিনী রায়ের নিজস্ব পদ্ধতির চিত্রকলাকে আমার চোখে অপরূপ মহিমায় মণ্ডিত করিয়া দিল। সেই স্বপ্নালোকের মাঝখানে বসিয়া মনে হইল, শিল্পীর ভাষা যেন কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছি। তিনি যেন বলিতে চাহিতেছেন, আমার এই শিল্পের মধ্যে রাজসিক দম্ব নাই, তামসিক জড়তা নাই, ইহার প্রথম ও প্রধান উপাদান নাস্তিক প্রেম। শক্তিমদমত্ত অহঙ্কারী দাস্তিক মানুষ, অত্যাচারী নির্মম কঠোর মানুষ, হিংসাদেবদুষ্টি স্বার্থপর মানুষ—সকলেই এই প্রেমের মহাশ্মশানে আসিয়া এক হয়, এখানেই মানুষের চিরন্তন শাস্ত শিল্পের জন্ম হয়, যে শিল্প দেশভেদে কালভেদে সর্বত্র ও সর্বকালে এক। নানা সংস্কারের জটিলতায় মানুষ এখানে পৌছিতে পারিতেছে না, অথচ সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের ভারে প্রপীড়িত মানুষ এই সহজের গঙ্গাজলে স্নান করিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়াছে।

যামিনীদায় সঙ্গে পরে শিল্প সম্বন্ধে বহুবার আলাপ হইয়াছে, তাঁহার অনেক কথাই শুনিয়াছি; কিন্তু সেই প্রথম দিন তাঁহার শিল্পসৃষ্টি দৃষ্টে যে অল্পভূতি আমার মনে

জাগিয়াছিল, তাহার প্রভাব এড়াইতে পারি নাই। সমগ্র বিশ্বের শিল্পধারায় বাঙালী প্রতিভার বিশিষ্ট দান সম্বন্ধে তিনি সচেতন। সে বিষয়ে তিনি স্পষ্ট মত পোষণ করেন। এ জাতি রাজা নয়, বীর নয়, দিগ্বিজয়ী নয়; তাই বৃহৎ বিরাট শিল্প এখানে গড়িয়া উঠে নাই, উঠিবেও না। আমরা দীনহীন, ভালবাসিয়া সকলকে স্বাগত জানাই। উলু শঙ্করবির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া আমাদের প্রাক্তনে আলপনা আঁকিয়া সকলকে আহ্বান করি, আমাদের মেটেঘরের ভোরণদ্বারে স্বস্তিকচিহ্নশোভিত মঙ্গলঘণ্টেই আমাদের শিল্পপ্রতিভা স্ফূর্তি পায়। বাংলার নিজস্ব শিল্পের সেই সহজ রূপটি পুনরাবিষ্কারে শিল্পী যামিনী রায় ব্রতী হইয়াছেন। তিনি যে কিছু খুঁজিয়া পাইয়াছেন, তাহা তাঁহার মুখ দেখিলে এবং কথা শুনিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না। তবু তাঁহার অস্থিরতার এখনও অবসান হয় নাই। রাষ্ট্র সমাজ শিল্প ও সাহিত্যের সামঞ্জস্য যতদিন না ঘটতেছে, শিল্প ও সাহিত্যকে নিজস্ব আশ্রয় ও ভিত্তিভূমি রাষ্ট্র ও সমাজ-নিরপেক্ষ ভাবে যতদিন নিজেদেরই রচনা করিয়া লইতে হইতেছে, ততদিন শিল্পীর ও সাহিত্যিকের অশান্তি অনিবার্যভাবে থাকিবেই। শিল্প ও সাহিত্য যদি সমাজের কল্যাণে না লাগিল, তাহা হইলে তাহাদের সার্থকতা কোথায়? শিল্পী যামিনী রায় মানুষের মহত্তর সত্য বিশ্বাসী, তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন, সহজতর পথ আবিষ্কারে নিত্য-নূতন পরীক্ষা করিতেছেন এবং মাঝে মাঝে নিজের সহিত কঠিন বোঝাপড়ার দ্বন্দ্ব পীড়িত হইতেছেন।

সাহিত্য ও শিল্পের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। সাহিত্যে যেভাবে জটিলতার মধ্যে আমরা ঘুরপাক খাইতেছি, কর্ণম্ এবং টেকনিকের অরণ্যে দিশাহারা হইয়া নূতন হইবার প্রবল আগ্রহে যে ভাবে কিছুতকিমাকার হইয়া পড়িতেছি তাহাতে মনে হয়, বাংলা-সাহিত্যেও একজন যামিনী রায়ের আবর্তন প্রয়োজন হইয়াছে। শিল্পেও জট পাকাইয়া গিয়াছিল, সে জট যামিনী রায় যখন ছাড়াইতে পারিয়াছেন, অহরূপ নিষ্ঠা ও সাধনা লইয়া সাহিত্যের জটও নিশ্চয়ই কোনও সাহিত্যশিল্পী মোচন করিতে সক্ষম হইবেন। যামিনী রায়কে দেখিলেই তাই আমি আশাব্যস্ত হইয়া উঠি। মহৎ হইবার জন্ত বৃহৎ উপাদানের যে প্রয়োজন নাই, যামিনী রায় সেই মন্ত্র আমাদের শিখাইতেছেন।

‘বঙ্গভী’র আমলে আরও তিনজন মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে, যাহাদের স্নেহ প্রীতি ও বন্ধুত্ব আমার ভাণ্ডারে জমা হইয়া আছে; সাহিত্য যদিচ এই তিনজনের কাহারও জীবনের প্রধান অবলম্বন নয়, তবু ইহারা সাহিত্যসেবক, সাহিত্যরসিক। এই তিনজন: অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু, ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য ও ডাক্তার রামচন্দ্র অধিকারী। ইহাদের সহিত পরিচয়-কাহিনী আগামী বারে বলিব।

পারিরা। খেওড়া থেকে ন মাইল দূরে পশ্চিম-পাহাড়ের লবণ-পর্বতের পূর্বদিকে চারদিকে নেড়া পাহাড় দিয়ে ঘেরাও করা গ্রাম। উটের পিঠে সোয়ারী হয়ে এখানে এসে পৌঁছলাম সন্ধ্যার ঠিক আগে।

দিনের শেষ আলো তখন পাহাড়ের চূড়োগুলোকে রাঙিয়ে দিয়েছে—হলধে থেকে কমলা রঙ, তারপর টকটকে লাল। উপত্যকার মধ্যে ‘সানহেজা’ ও ‘বিহিকুরের’ ঝোপ চোখে পড়ল। রক্তাভ ধূসরবর্ণের মধ্যে কিছুটা সবুজ। তা ছাড়া যতদূর দৃষ্টি যায় তৃণহীন মরুপর্বত। নগ্ন শিলা-স্তূপের চোখ-ধাঁধানো নিরাবরণ সৌন্দর্য।

তাঁবু ফেললুম গাঁয়ের প্রান্তে। লম্বা-চওড়া পাঠানের দল এল তত্ত্ব-তালাশ করতে। বাজখাঁই তাদের গলার স্বর, চোখে সন্দেহ। কুলিদের হারফত বুঝিয়ে দিলুম তাদের যে, আমি এখানকার পাহাড়গুলো পরীক্ষা করতে এসেছি—কোনও ছুরভিসন্ধি নেই আমার মনে। সহজেই বুঝল তারা, কারণ ইতিপূর্বে আমার মত বহু ভূতাত্ত্বিক এখানে অস্বাভাবিক উদ্দেশ্য নিয়ে পদার্পণ করেছেন। আমিও তাঁদেরই একজন ভেনে তাঁরা নিশ্চিত হ’ল।

এই দলের মধ্যেই ছিল আলতাফ। বলিষ্ঠ গড়নের যুবকটি। দেহটি যেন একটি লালচে পাথর কঁদে তৈরী। শক্ত পেশল দেহের কোথাও লেশমাত্র কমনীয়তা নেই। অথচ চোখ দুটো আশ্চর্য নরম, ঠিক বাঙালী মেয়েদের মত।

আর সবাই সেলাম ঠুঁকে বিদায় নিল একে একে, ও কিছু দাঁড়িয়েই রইল। কোঁতুলী দৃষ্টি মেলে আমার দিকে চেয়ে থাকে ইঁা ক’রে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কী চাই তোমার?

মাথা নীচু ক’রে ঢোক গিলে সে বললে, নৌকরি। গরিব আদমি—একঠো নৌকরি।

তার বিশাল দেহের দিকে চেয়ে ভাবলুম, কুশলী না হোক, অন্ততঃ গতরে খাটতে পারবে। এই পাহাড়-ঘেরা দুর্গম অঞ্চলে তার আবশ্যকতা। নেহাত ফেলনা নয়—বিশেষ করে আমার চাকর সহদেব যখন একটি রিকিটি বাঙালী! অত্যন্ত ভীতু প্রকৃতির মানুষ। পাহাড়ের পর পাহাড় দেখে বেচারী ভীষণ ঘাবড়ে গেছে।

আলতাফের আবেদন মঞ্জুর করলাম। আহ্লাদে আটখানা হয়ে একটা সেলাম ঠুঁকে তৎক্ষণাত্ সে কাজে লেগে গেল। আমি একটু অবাক হয়ে বললুম, এফুনি কাজে লাগলে কেন? বাড়িতে খবর দিয়ে এসো আগে।

একগাল হেসে পুষ্ট-উর্ধ্ব মেশানো দো-আশলা ভাষায় আলতাফ বললে, খবর পরে দিলেও চলবে। ছজুরের থানা বানানো তার চেয়ে ঢের বেশী জরুরী।

ওকে দেখে সহদেবের হৃৎকম্প শুরু হয়েছিল। তার পাঠানাতক ঘোচাতে কম বেগ পেতে হয় নি আমার।

পরদিন সকালে আলতাফের বানানো নাস্তা খেয়ে কাজে বের হলাম। পারিরার চারদিকে পাহাড়গুলোতে জিপসাম ও চুনাপাথরের খোঁজ করতে হবে আমাকে। আলতাফ আমার বন্দুক, স্পেসিমেন-ব্যাগ, হাভারস্কা, ইত্যাদি ঘাড়ে ক’রে নিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলল।

পারিরার কাছাকাছি এসে চোখ জুড়িয়ে গেল। উপত্যকা জুড়ে স্নিগ্ধ সবুজ, চারদিকে নগ্ন পাহাড় দিয়ে ঘেরা গমের ক্ষেত—প্রকৃতিরাগী যেন এই একটুখানি রস চতুর্দিকের মরুগ্রাস থেকে বাঁচিয়ে লুকিয়ে রেখেছেন। উপত্যকার কোলে। লবণের পাহাড় ও চুনাপাথরের রক্তাভ জুকুটির সামনে দামাল ছেলের ছুরস্তপনার মত এই সবুজটুকু। ক্ষেতে স্ত্রী-পুরুষ মিলে কাজ করছে। গম তখনও পুরোপুরি পাকে নি। একটানা সবুজের হিল্লোলের মধ্যে সোনালী ছোপ ফুটি-ফুটি করছে মাত্র।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। ছোট্ট একটা দীর্ঘখাস ফেলে আলতাফ বললে, আমাদের বেঁচে থাকবার সম্বল মাত্র ওইটুকু।

পারিরা ডাইনে রেখে দাগওয়ালের দিকে হাঁটতে শুরু করি। পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হ’ল পারিরা। শুকনো উপত্যকা, শুকনো নগ্ন পাহাড়ের গায়ে চুনা ও কাদা পাথর হাড়-পাঁজরের মত বেরিয়ে আছে। কাদা-পাথরের গায়ে উজ্জল কমলা ও ত্রাতাভ লাল রঙের সমারোহ। সানহেজা ও বিহিকুরের ছোট্ট ছোট্ট ঝোপ চুনা-পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করে রয়েছে।

কয়েকটা নালা পেরিয়ে গেলাম। স্থানীয় ভাষায়

নালাগুলি কুদেরা নামে পরিচিত। কোনটিতেই জল নেই এক ফোঁটাও। নির্জলা সাদা বালি রোদে ধারালো তলোয়ারের মত ঝকঝক করছে।

পাহাড়ের গা থেকে ঠিকরে আসছে স্বর্ষের আলো—গায়ে এসে লাগছে আগুনের হৃদার মত। একটু হাটতেই মনে হ'ল, তেঁটায় গলা যেন একেবারে শুকিয়ে গেছে। অনেকখানি জল খেয়ে মুখ মুহুলাম।

অত জল একসঙ্গে খাবেন না হুজুর।—ওয়াটার-বটলের ছিপি ঝাঁটতে ঝাঁটতে আলতাব বললে, ফুরিয়ে গেলে জল পাওয়া যাবে না।

এমন সময় মেটে ঘড়া কাঁধে একদল মেয়ে-পুরুষের শোভাযাত্রা চোখে পড়ল। তাদের নীল চোখে বৈশাখের মাস, তামাটে মুখ রোদে বলমানো।

মিরায় যাচ্ছে এরা জল আনতে।—আলতাব বললে, এরা সব পারিয়ার লোক।

মিরা পারিয়া থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে। আমি সবিস্ময়ে ব'লে উঠলুম, এত দূর থেকে জল আনতে হয়!

তা ছাড়া উপায় কি? মিরায় নালায় বালি খুঁড়লে কিছু জল মেলে। এখানকার নালাগুলো একেবারে শুকনো। হু-একটা কুয়ো আছে সেগুলোও শুকিয়ে গেছে।

তারপর আমার মুখের পানে চেয়ে আমাকে অভয় দেবার জন্য বললে আলতাব, ঘাবড়াবেন না সাহেব, আপনার স্বাভাবিক ও বাঁধবার যাবতীয় জল আমিই নিয়ে আসব মিরা থেকে। আজকে আমার বাপজান দিয়ে যাবে জল, কাল থেকে আমি নেব জলের ডার। তারপর আমার মুখের ওপর কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে সে বললে, আপনি তো গোসল করেন, তাই না সাহেব?

করি বইকি।—অবাক হয়ে বললুম, কিন্তু তাতে কি? না, মানে এই—আমার বাপজান বলছিলেন, আপনি করেন না। আমি বললুম, নিশ্চয়ই করেন। আপনার মত সাদেবদের আমি সপ্তাহে হু-একবার ক'রে গোসল করতে দেখছি খেঁওড়াতে। ঠিকই ধরেছি, কি বলেন সাহেব?

বলতে বলতে আত্মপ্রসাদের হাসিতে ভ'রে উঠল তার মুখ, যেন মস্ত বড় একটা কিছু আবিষ্কার ক'রে ফেলেছে সে।

ধরেছ ঠিকই।—হেসে বললুম, তবে সপ্তাহে দু'দিন নয়, রোজই আমি স্নান করি।

রোজ!—আলতাবের চোখ দুটি কপালে ওঠবার উপক্রম হ'ল। প্রচণ্ড ভূমিকম্পে তাম্রায় লবণ-পর্বত চোখের সামনে বিলুপ্ত হয়ে গেলেও বৃষ্টি এত অবাক হ'ত না সে।

আলতাব সত্যিই পরিশ্রমী। জল আনার অমাহুষিক কাজ অনায়াসেই করে সে। রান্নার, খাওয়ার তা ছাড়া আমার স্নানের যাবতীয় জল সে একাই ব'য়ে নিয়ে আসে আধ মাইল দূরগম রাস্তা বেয়ে।

মিরায় যে 'কুদেরা' বা নালা থেকে জল আনতে যায় পারিয়ার লোকেরা, তার ভূমিকের শিলাস্তরে জিপসামের খোঁজে গিয়েছিলাম একদিন। নালায় বালিতে জলের চিহ্নমাত্রও চোখে পড়ে না—জলাধারীরা ইতস্ততঃ গর্ত খুঁড়ে জল সংগ্রহ ক'রছে দেখলাম। প্রায় দু'তিন হাত গর্ত করার পর জল পাওয়া যাচ্ছে।

নালাটির একটি বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে জলাধারের ভিড়। তাদের কোলাহল ভূমিকের উচু শিলায় শিলায় প্রতিহত হয়ে চতুর্দশ হয়ে উঠছে। কার গর্তে জল পাওয়া গেল সেদিকে সকলেরই শ্রেন দৃষ্টি। বালির ভেতর জলের আভাস পাওয়ামাত্র চক্ষের পলকে গর্তটির চারদিকে ভিড় জ'মে যাচ্ছে। জলটুকু নিঃশেষ হতে কয়েক সেকেন্ডও লাগছে না—যে বেচারী গর্তটা খুঁড়েছে তার বরাতে হয়তো জুটছে না এক ফোঁটাও।

অনেক মারামারি কাড়াকড়ি ক'রে তবে জল মেলে। যাদের সে হিম্মত নেই তাদের মুখ চুন ক'রে শুষ্ক কলসী নিয়ে 'কুদেরা'র ধারে পাড়িয়ে থাকতে হয়। বিনা স্বপ্নে এক কণা বালিও স্পর্শ করতে পারে না কেউ।

ভিড়ের মধ্যে দেখলাম, আলতাব বিরাট একটা গর্ত খুঁড়ে তার জ্বালাপ্রমাণ কলসীটি পাশে এনে বসিয়েছে। তার গর্তের ধারে-কাছেও কেউ নেই। বিনা স্বপ্নে পুরো একটা গর্তের সম্পূর্ণ জল আলতাবের দখলে এসেছে দেখে একটু অবাক হলাম বইকি! এমন সময় কানে এল, আলতাব বলছে, সাহেবের অনেক জল দরকার। আমার গর্তের ধারে-কাছেও এসো না কেউ।

ভিড়ের মধ্যে অনেকেই সমস্তই চেয়ে দেখছিল আলতাব ও আলতাবের বিপুলায়তন কলসীটিকে। আলতাবের কথার ওপর কেউ কিছু বললে না। বুকলুম, এরা আমার দাবিকে মর্যাদা দিচ্ছে বিনা প্রতিবাদে।

আনিস ?—আলতাফ বুক ফুলিয়ে বললে, আমার সাহেব রোজ গোসল করেন ?

উপস্থিত অনেকেই আঁতকে উঠল। নির্বাক বিশ্বয়ে তারা চেয়ে রইল আলতাফের মুখের পানে।

হঠাৎ ভিড় থেকে বেরিয়ে এল আলতাফেরই সমবয়সী একটি যুবক। আশ্চর্য নীল তার চোখ দুটি থেকে আগুনের হুঁকা যেন ছিটকে বেরিয়ে আসছে। মুখ ভেঙেচো ব'লে ওঠে যুবকটি, রোজ গোসল করেন! খাবার জল যোগাড় করতে আমাদের হয় প্রাণশঙ্ক, আর গুঁর সাহেব করেন গোসল!

খবরদার রহমান!—ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মত উঠে দাঁড়িয়ে গর্জে ওঠে আলতাফ।

চোখ রাঙাস নে আলতাফ!—আলতাফের গর্জনকে ছাড়িয়ে যায় রহমানের বজ্রনির্ধোষ স্বর; তোর মত হা-ভাতের চোখ-রাঙানো আর বেই সঙ্ক করুক, আমি করব না।

আলতাফ নির্বাক। অবরুদ্ধ রোষে তার নাসারন্ধ্র দুটি ফুলে ওঠে। হাপরের মত নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে দু হাতের আঙুলগুলো মুষ্টিবদ্ধ ক'রে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। রহমান তার চারদিকে উপেক্ষাপূর্ণ দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, তোমরা সব কি ভেড়া ব'নে গেছ যে, ওই কুত্তার বাচ্চাটাকে প্রশ্রয় দিচ্ছ? এখন না হয় দুটো পয়সার মুখ দেখছে, কিন্তু দু দিন আগেও ওর বাপটা দোরে দোরে ধম্মা দিয়ে ভিখ মেগে বেড়াত! লাখি মেরে ভেঙে ফেলতে পার না ওর কলসীটা?

চক্ষের পলকে রহমানের মুখের ওপর আলতাফের মুষ্টিবদ্ধ হাতের প্রচণ্ড একটি ঘুষি এসে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে ধরাশায়ী হয় রহমানের বিশাল দেহটা।

মাটির ওপর শুয়ে হিংস্র বীভৎস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রহমান। তারপর কোমর থেকে বিরাট একটা ছোরা বের ক'রে আনে। রোদে ঝলসায় ছোরার ফলাটা।

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎগতিতে রহমানের বকের ওপর চেপে ব'সে আলতাফ ছোরাটা কেড়ে নিল তার হাতের মুঠি থেকে। তারপর বাঁ হাত দিয়ে রহমানের টুটি চেপে ধ'রে ছোরাহস্ত ডান হাত শূন্যে তুলে ধরল।

সমবেত জনতা চোঁচামেচি শুরু ক'রে দেয়। ভিড়ের ভেতর থেকে কয়েক জন বেরিয়ে এসে আলতাফকে জোর

ক'রে টেনে তুলল। মুক্তি পেয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে পালিয়ে গেল রহমান।

কোলাহল ক'মে আসে। আলতাফ আবার মন দেয় তার জল ভরায। কুদেরাটি ছেড়ে একটি নেড়া জিপসামের পাহাড়ের মাথায় উঠে আসি আমি। তারপর একটি অতি শীর্ণ গিরিখাতের মধ্যে ঢুকে আমার কাজ শুরু করি।

খানিক বাদে ক্যাম্পে ফেরবার পথে একটি ঢিবির আড়ালে নারীকণ্ঠের স্মিষ্ট হাসি শুনে থমকে দাঁড়ালুম। পথের ধারেই ঢিবিটা। দু-এক পা এগিয়ে যেতেই দেখলুম, আলতাফ একটি মেয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার কলসীতে জল ঢেলে দিচ্ছে। গড়িয়ে পড়া স্বচ্ছ জলের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে মেয়েটি বলছিল, সত্যি আলতাফ, রহমানকে পালাতে দেবে আমার বা হাসি পাচ্ছিল! লম্বা-লম্বা পা ফেলে সেই দৌড়ানো!—বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে হেসে ওঠে সে। উচ্ছল ঝরনার তরল আবেগ যেন সে হাসির পরতে পরতে জড়ানো।

সত্যি বাহাদুর বটে তুমি!—কয়েক সেকেণ্ড রুদ্ধশ্বাস হাসির পর বললে মেয়েটি, কেমন এক ঘুষিতে চিত্ত ক'রে ফেললে ওর বিশাল দেহটাকে!

আলতাফের হাস্তোজ্জ্বল মুখের ওপর হঠাৎ যেন মেঘের সঞ্চার হ'ল। স্থির দৃষ্টিতে মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে থেকে সে বললে, ওই শয়তানের বাচ্চাটাকে যদি খুন করতে পারতুম—

কী বলছ!—ভীত আতঙ্কে ব'লে ওঠে নূরজাহান।

তা হ'লে আমার পথের কাঁটা দূর হ'ত। তোমাকে পেতে আর কোন বাধা থাকত না।

মাথা নীচু ক'রে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে নূরজাহান। নতমুখী মেয়েটার মুখের ঘেঁটুকু দেখা যাচ্ছিল তাতেই বুঝলুম, তার তুলনা নেই। এত লাভণ্য এই রুক্ষ পার্বত্য পরিবেশের মধ্যে কি ক'রে সম্ভব হ'ল ভেবে পেলাম না।

নির্বাক নূরজাহানের চিবুক হাত রেখে আলতাফ বললে, তোমার বাবা শুধু টাকা চেনেন। ওই নরকের কুকুর রহমানটার অনেক টাকা আছে ব'লে ওর সঙ্গে তোমায় দিতে চান। অথচ সেই তোমার জন্মের সময় আমার বাবাকে তোমার বাবা এক রকম কথা দিয়েছিলেন যে, আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবেন।—আলতাফের বুক চিরে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

নূরজাহান তার চোখ ছুটি তুলে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় আলতাকের মুখের পানে। তার দু চোখে দু ফোঁটা জল মুক্তার মত লেগে থাকে। নয়ম ঠোঁট ছুটি কাঁপতে থাকে ছরস্বত্বে।

আলতাক!—কামায় জড়ানো স্বরে বলে নূরজাহান, আমার বাবা হয়তো টাকা চিনেছেন; কিন্তু আমি তো টাকা চাই নে—আমি তোমাকে চাই, শুধু তোমাকে।

নূরজাহানের কাছে ঘন হয়ে দাঁড়ায় আলতাক। তার ছুটি হাত চেপে ধরে আবেশপূর্ণ নিম্ন স্বরে কী সব ব'লে গেল তা শুনতে পেলো না। গা-ঢাকা দিয়ে এর পরবর্তী ঘটনাগুলোর সাক্ষী থাকার ইচ্ছে ছিল না। অতএব সম্ভরণে হাঁটতে শুরু করি, যাতে ওরা টের না পায়।

জীবুতে ফিরে আসবার আধ ঘণ্টাটাক বাদে শুনতে পেলুম সহদেব বলছে, কলসীতে জল এত কম কেন আলতাক? সাথে কী তোমাকে বুকু বলি! কলসীটা পুরোপুরি ভরে জল আন না ব'লেই তো এমনি বার বার ক'রে যেতে হয় তোমাকে মিরাতে।

কী করি বল!—আলতাক বললে, একজনকে দিতে হ'ল খানিকটা। বেচারী ভিড়ের মধ্যে ছড়োছড়ি ক'রে জল যোগাড় করতে পারে না।

কে শুনি? ওহো, বুঝছি, বুঝছি! সেই মেয়েটা! মানে ওই আবদুল্লাহর মেয়ে নূরজাহান! তা বেশ। মোহকম্বরের ব্যাপার—

চুপ।—সতর্কনে ব'লে ওঠে আলতাক, সাহেব শুনতে পাবেন।

আমার প্রাত্যহিক জ্ঞানপর্ব আলতাকের চোখে প্রচণ্ড রকম বিস্ময়কর ছিল। আমার জ্ঞানের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি সে এমনি চোখ বড় বড় ক'রে দেখত, যেন বাঘ-সিংহের লড়াই দেখছে। একদিন সাহসে ভর ক'রে আলতাক বললে, কি ক'রে যে রোজ গোসল করেন সাহেব, ভেবে পাই নে। এমনি করলে আমি দু দিনেই মারা পড়তুম।

তোমরা গোসল কর না বুঝি?

কখনও না। মৌলনা বা খান-সাহেবরা মাসে এক-আধবার গোসল করেন অবশ্য, তা তাঁরা হলেন গিয়ে খানদানী বড়লোক, পানি যোগাড় করবার হিম্মত তাঁদের

আছে। কিন্তু আমরা গরিব মানুষ, পিয়াস মেটাবার জলই যোগাড় করতে পারি না, কুদেরা থেকে মারামারি ক'রে কত কষ্টে যে জল যোগাড় করি তা আপনি নিজের চোখেই দেখেছেন—গোসল করবার বাবুয়ানা কি আমাদের সাজে।—ব'লে আলতাক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

কিছুক্ষণ বাদে আমার খাবারের টেবিলের অদূরে দু হাত দিয়ে হাঁটু দুটি বেঁধে ক'রে আলতাক বললে, গোসল অবশ্য একদিন আমাদের প্রত্যেককে করতে হয়। শাদির আগের দিন গোসল করাটা দস্তুর কিনা।

তাই নাকি?—মাংস থেকে আলাদা করা হাড় চুষতে চুষতে আমি বললুম, তা, কবে তুমি গোসল করছ?

এক মাহিনা বাদে আমার শাদি, তার আগের দিন।—বলতে বলতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার মুখখানা।

আজকেই শাদির পাকা কথাবার্তা হয়ে গেছে।—বানিক বাদে আবার বললে আলতাক।

রহমানের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাধা অতিক্রম করল সে কি উপায়ে, জানতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু পাছে আমার প্রশ্নে তাদের সেদিনকার গোপন সাক্ষাতের যে আমি সাক্ষী ছিলাম সে তথ্য ফাঁস হয়ে যায়, এই ভয়ে কৌতূহলটা চেপে রাখলাম।

মার্চের শেষ। রোদের দাহ ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে, সারা দিনমান অদৃশ্য আগুনের লক্ষ লক্ষ জিহ্বা সর্বত্র লেহন করছে ব'লে বোধ হয়। রোদে-বলমানো পাহাড়গুলোর দিকে চেয়ে মস্তিষ্কে যেন আগুন ছোটো। চূনাপাথরের আড়ালে 'বিহিকুর' ও 'সানহেতার' ঝোপগুলি বলসে একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল। গমের ক্ষেতের সবুজও ফিকে হয়ে আসে—ফসল পাকবার আশা নেই বুঝি!

ওদিকে মিরার 'কুদেরা'ও শুকিয়ে এল। ওখানে আর ক'দিন জল মিলবে কে জানে? এর পর কি বুনহার নদী থেকে জল আনতে হবে?—পারিবার ভীত নর-নারীদের কানাকানি আমার কানেও আসে।

মৌলনা ও মোল্লাদের সহি করা একটি ছকুমনামা পেলাম—আলতাক মারকুত। উদ্বৃত্ত লেখা। অতঃপর মিরার 'কুদেরা'র জল জ্ঞানের জ্ঞাত ব্যবহার করা চলবে না—ওতে নাকি তাই লেখা আছে।

ও আদেশপত্রের লক্ষ্য যে আমি তা বুঝতে অস্বীকার
হ'ল না। স্নানটা এ তল্লাটে আমি ছাড়া আর কেউ
করে না। প্রচণ্ড গরমে পুরোপুরি স্নানাত থাকতে হবে
ভেবে শিউরে উঠলুম। কয়েক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে
ব'সে থেকে মুখ তুলে চেয়ে দেখলুম, আমার চেয়েও ত্রিযমাণ
হয়ে উঠেছে আলতাকের তামাটে মুখখানা।

আমি মুখ তুলে তাকাতেই আলতাক বললে, বড়
মুশকিল হ'ল সাহেব!

মুশকিল আর তোমাদের কী?—আমি বললুম, স্নান
তো কর না—আমারই হুজুগ।

আপনি বুঝতে পারছেন না সাহেব, মুশকিল আমারও।
এই হুকুমনারা জন্তু আমার শাদি পিছিয়ে দেবার কথা
হচ্ছে!—বড় করুণ শোনাল আলতাকের গলার স্বর।

কেন?

শাদির আগের দিন গোসল করবার পানি যে মিলবে
না! আর গোসল না করলে শাদি হয় না—এখানকার
মোস্তা-মোলনারা বড় গোঁড়া কিনা!

তাই তো!—সহায়ত্বপূর্ণ স্বরে বললুম, বড় আফ-
সোসের কথা।

খুদা মালুম সাহেব!—কাতরস্বরে বলে আলতাক, এ
শাদি পিছিয়ে গেলে আর হবে কি না। কত কষ্টে যে
এ শাদির এক্ষেপ্তার করেছি তা বলবার নয়। নূরজাহানের
বাবার একদম মৃত ছিল না এ শাদিতে। তার নজর
চিরকালই রহমানের ওপর। আমি গরিব ব'লে আমাকে
জামাই করবার ইচ্ছে তার কোনদিনই ছিল না। নেহাত
নূরজাহানের জন্মের সময় বাবাকে কথা দিয়েছিল তাই
রাজী করানো গেছে তাকে। কিন্তু এখন শাদি যদি পিছিয়ে
যায় তা হ'লে বড়ো বেশ ভাল মোওকা পেয়ে গিয়ে
ওই রহমানের সঙ্গেই নূরজাহানের শাদি দিয়ে দেবে।

তা হ'লে কি করবে? যে কড়া পরোয়ানা জারি
হয়েছে! বিয়ে করতে হ'লে তো তোমাদের একেবারে
বুনহার নদীর ধারে গিয়ে হাজির হতে হবে!

গম্ভীর মুখে কয়েক মুহূর্ত ভাবল আলতাক। তারপর
সে বললে, দরকার হ'লে তাই করব সাহেব। প্রাণ
থাকতেও শাদির দিন পিছুতে দেব না। আল্লাহ, কসম—
আসছে পূর্ণিমার দিনই শাদি করব নূরজাহানকে।

আলতাকের সঙ্কল্পকঠিন মুখের পানে চেয়ে প্রমাদ
গণলাম। নূরজাহানকে বিয়ে করতে গিয়ে হয়তো জোর-
জবরদস্তিতেও পেছপা হবে না। খুন-বাহাদুরিও হতে
পারে। মন শকাবুল হয়ে ওঠে। তবু চূপ ক'রে রইলাম।
পাঠানের শরীরের তাগদের মতই তার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা।
সেখানে দস্তখত করি সে শাহস নেই আমার।

দিন কয়েক বাদে আলতাক প্রকৃত বদনে আমার হুমুখে
এসে দাঁড়িয়ে বললে, আমার শাদির দিন পিছুবে না
সাহেব—পরশু দিনই হচ্ছে।

খুশী-হয়ে বললুম, খুব ভাল কথা। মোলনারা একটু
আলগা দিয়েছে তা হ'লে? মানে গোসল করবার
অম্মতি মিলেছে?

তা নয়, পানির এক্ষেপ্তার করেছি।—চারদিকে সতর্ক
দৃষ্টিপাত ক'রে চাপা গলায় আলতাক বললে, কাল রাতে
মিরার নালা থেকে চুরি ক'রে পানি নিয়ে এসেছি।
সবাই অবশ্য জানে, জল এসেছে বুনহার থেকে।

ভাল। কিন্তু এ জল দিয়ে নূরজাহান ও তোমার
হুজুরেরই স্নান হবে কি?

না সাহেব, ও জল শুধু নূরজাহানের জন্তে। ওদের
বাড়িতে পৌছে দিয়েছি আজ সকালে। আমি কাল
বুনহার নদীতে গিয়ে স্নান ক'রে আসব।

বুনহার নদী!—সে তো পাক্কা আট মাইলের রাস্তা।

তার চেয়েও বেশী সাহেব। তা ছাড়া রাস্তাও খুব
খারাপ, অশুভপতি পাহাড় ও 'কুদেরা' পেরিয়ে যেতে হয়।
কিন্তু তার জন্তে ঘাবড়াই নে। কাল খুব ভোরে বওনা
হব, গোসল সেরে রাত্রির মধ্যেই ফিরে আসতে পারব।

তার চেয়ে আজ রাতেও ফের মিরার নালা থেকে
লুকিয়ে আরও কিছু জল নিয়ে এসো না।

সে হাঙ্গামার মধ্যে আর যেতে চাই নে সাহেব।
নূরজাহান মেয়েমানুষ—সে তো আর বুনহার থেকে স্নান
ক'রে আসতে পারবে না! তার জন্তে না হয় ব্যক্তিটা
পোয়ানো গেল। কিন্তু জোয়ান মরদ আমি, বুনহার থেকে
অন্যদিকে আমি স্নান ক'রে আসতে পারব।

পরদিন ভোরবেলা পাহাড়ের বুক-চেরা গিরিখাতের
মধ্য দিয়ে বুনহারের উদ্দেশে বওনা হ'ল আলতাক।

টাবুর বাইরে দাঁড়িয়ে দেখলুম, লম্বা লম্বা পা কেলে-

এগিয়ে যাচ্ছে সে। সংকীর্ণ গিরিখাতের আড়ালে অনতি-বিলম্বে অদৃশ্য হ'ল তার দীর্ঘ দেহটি। গিরিখাতটা যেখানে পাহাড়ের গায়ে একেবৈকে ওঠা শুড়িপথে এসে শেষ হয়েছে, সেখানে কয়েক মুহূর্তের জন্তু আর একবার তাকে দেখতে পেলুম, তারপর আর দেখা গেল না।

সেদিন কাজে বের হবার মত উৎসাহ বোধ করছিলাম না। - বারান্দায় ডেক-চেয়ারে আলস্তে বুঁদ হয়ে ব'সে থাকি। বোদে ঝলসানো পাহাড়গুলোর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নেশার মত একটা অস্বস্তি মস্তিষ্কে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। অদূরে বিবর্ণ গুমের ক্ষেত। বিপুল মরুগ্রামে টিকতে পারে নি ওই এক ফোঁটা সবুজ।

একটা জমি-বাঁধা নৈশক্য কঠিন পাথরের মতই লবণ ও বেল-পাথরের শৃঙ্খলকে জড়িয়ে থাকে। আকাশ ও দৃষ্টি গিরিপর্বত-জোড়া এক স্বচ্ছ প্রতীক্ষা যেন এই নৈশক্যের অতলে নিহিত। সূর্যের জ্বলন্ত বিবর্ণ মাটির বুকে যেন মৃত্যুবাণ হানে। বিনা প্রতিবাদে ফুটকাটা হয়ে প'ড়ে থাকে পোড়ামাটি নয়শিলার আশেপাশে সবুজের স্বাক্ষরটুকু মুছে ফেলে। আকাশ জোড়া বোম্ব। মৃত্তিকার নীরব কান্না কঠিন শিলার পরতে পরতে জড়ানো। কান পাতলে যেন শোনা যায়।

হঠাৎ আকাশমাটি-জোড়া নৈশক্যকে চুরমার ক'রে ধেয়ে আসে ধুলোর ঝড়। নিমেষে আকাশ হয় ধোঁয়াটে, সূর্যের জ্বলন্ত দান। কঠিন মাটির বন্ধন ভেঙে বোরয়ে আসে উষ্মমুখী প্রতিবাদ।

ধুলোর আবরণে লুপ্ত পারিরা। সূমুখে চোয়া-সমন-শাহ গিরিখাত ও বুনহার যাওয়ার শুড়িপথ হৃদয় সমস্ত দৃষ্টমান বস্তুই অদৃশ্য। তাঁবু পড়ো পড়ো। তাঁবুর খুঁটি দুটো প্রাণপণে আকড়ে ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকি আমি ও সহদেব।

বিকালের দিকে ধামল এ ঝড়। বালির পুরু স্তর এসে জমেছে তাঁবুর মেঝে, খাট ও অন্যান্য আসবাবপত্রের ওপর।

ধুলোর আবরণের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে পশ্চিম আকাশে চ'লে পড়া সূর্য, টকটকে লাল। আবার চলে নৈশক্যের রাজত্ব। শান্ত মাটি বালির ওড়নার আড়ালে প'ড়ে থাকে। গুমের ক্ষেতের পাতা মিলল না।

সন্ধ্যার পর সহদেব এসে খবর দিয়ে গেল, বুনহার থেকে আলতাক ফেরে নি।

বালির ঝড়ে পথ হারাল কি?—আমি বললুম।

গায়ে সবাই তাই বলছে বটে।—সহদেব জবাব দিল।

খোঁজ চলল পর পর কদিন। কিন্তু কোনও সন্ধান নেই।

মৌলানা তোয়াফজল খাঁ সাহেবের কাছে শুনলুম, বুনহার যাওয়ার পথে অশ্বনতি সব পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে হাজার হাজার কুদেয়া জটিল জালের মত ছড়িয়ে আছে। আঁধারে এই সব কুদেরার ফাঁদে প'ড়ে পথ হারানো নাকি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। বহু অসতর্ক পথিক কুদেরা-গুলোর গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে দিশেহারা হয়ে নাকি প্রাণ দিয়েছে। মৌলানা সাহেবের অহুমান, আলতাকও বোধ হয় পথ হারিয়ে ওই হতভাগ্যদের মত চরম পরিণামের সম্মুখীন হয়েছে।

দিনের পর দিন উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষার পর হাল ছেড়ে দেয় আলতাকের বাবা আহাদ। একমাত্র ছেলেকে হারাবার শোক যতটা আমরা কল্পনা করতে পারি, তার চেয়েও হাজারগুণ তীব্র মর্মবেদনা প্রকাশ পেতে দেখলাম এই কাঠখোঁটী পাঠানের মধ্যে। প্রাকৃতিক বহুবিধ দুর্ভাগ্য উপেক্ষা ক'রে অনমনীয় দৃঢ়তায় দাঁড়িয়ে থাকে শক্ত পাথরে-গড়া পাহাড়গুলি। সহজে ভাঙে না, কিন্তু ভূত্বকের ভেতরকার আলোড়নে যখন ভাঙন ধরে, প্রচণ্ড তার শক্তি। তেমনি হাজার রকম আঘাত সহ্যেতে সমর্থ স্বভাবকঠিন পাঠানের মন যখন বিদীর্ণ হয়, তার বিপুল শোকোচ্ছ্বাস বর্ণনাতীত। তার মত আবেগ সহ্য করি, এ হেন সাধ্য নেই আমার মত ভেত্রে বাঙালীর।

আলতাক নিরুদ্দেশ হওয়ার কয়েক দিন পরেই শুনলাম, মিরার কুদেরার জল নিশেষ হতে দেখি নেই। ইদানীং রোজই আহাদের সঙ্গে আমার দেখা হ'ত। লক্ষ্য করলুম, খবরটা তাঁর শোকাভূত মনে ওষুধের মত কাজ করেছে। পুত্রশোকে জীবনের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা জলের অভাবে যত্নর স্বনিশ্চিত সম্ভাবনার সামনে এসে মুহূর্তে আত্মরক্ষার আদিম প্রবৃত্তিতে রূপান্তরিত হ'ল। আলতাকের অভাবের চেয়েও জলকষ্টের ভাবনায় অধিকতর উতলা হয় আহাদের মন। গ্রাম ছেড়ে পালাবার জল্পনা সে-ও করে আর পাঁচজনের মত।

দেখতে দেখতে পালাবার বুম প'ড়ে গেল। প্রথমে

পালালেন মোজা-মৌলনার দল। উটের পিঠে সওয়ারী হয়ে তাঁরা খেওড়া বা পিণ্ড-দানখী যাত্রা করলেন।

প্রধানরা বিদেশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ের লোকেরা প্রচণ্ড রকম আতঙ্কিত হয়ে উঠে পালাবার তোড়জোড় শুরু করল। নেতৃত্বহীন জনতা ইতস্ততঃ ছুটল আশুপিছু না ভেবে।

আহাদ স্থির করল যে, সে খেওড়া যাবে। আলতাকের বাগঁদস্তা নূরজাহানের বাবা আবদুল্লা সপরিবারে সেখানে যাচ্ছে। আহাদ তাদের সঙ্গে নেবে মনস্থ করেছে। খেওড়াতে গেলেই নাকি সেখানকার লবণের খনিতে চাকরি পাওয়া যায়, অন্ততঃ আবদুল্লার তাই-ধারণা।

যাত্রার দিন সকালে আহাদ আমার কাছে বিদায় নিতে এল। আহাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে, সূর্যাস্তের পরই তারা রওনা হবে। দিনের বেলা প্রচণ্ড রোদে পথ চলা অসম্ভব। কাল্লেই নৈশ অভিযানের ব্যবস্থা।

সেদিন ঠিক সূর্যাস্তের পর আমি তাঁর অনতিদূরে একটি টিলার চারপাশে পায়চারী করছিলাম। তপ্ত দিনের শেষে শীতল সন্ধ্যা। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে প্রখর তাপের অবসান। তারপর রীতিমত ঠাণ্ডা শরীর জুড়ায় না, কাঁপে। দিনের ভ্রুকুটির ওপর নামে সন্ধ্যার আবেশ।

পারিবারিক দিক থেকে কোলাহল ভেসে আসছে। গাঁ ছেড়ে যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত বোধ হয় আজকের যাত্রীর দল। আহাদরা এতক্ষণে বোধ হয় প্রস্তুত হয়েছে, হয়তো খানিক বাদেই তারা রওনা হবে।

বিষয়মানে পাহাড়গুলির দিকে চেয়ে ছিলাম। অদূরে বুনহারি যাওয়ার শুঁড়িপথ একেবৈকে পাহাড়গুলির মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে। এই পথে গিয়েছিল আলতাক।

হঠাৎ মেয়েলী কণ্ঠের মুহূ কান্নার শব্দে চমকে উঠলাম। কালো কষ্টিপাথরে সোনার দাগের মত স্তব্ধ সন্ধ্যার বুকে আঁচড় কাটে এ কান্না।

শব্দ অল্পসংর ক'রে অদূরে একটি পাথরের আড়ালে ঘোঁল-সতেরো বছরের একটি যুবতীকে বসে থাকতে দেখলুম। দেখেই চিনতে পারলুম,—নূরজাহান। রঙিন ওড়নটিকে মুখের ওপর চেপে ধরে সে কাঁদছে। মনে হ'ল, বছরদিনের অবরুদ্ধ কান্না সমস্ত বাধা ঠেলে বেরিয়ে আসছে। সর্বাঙ্গ স্পন্দিত হচ্ছিল কান্নার আবেগে।

খানিকক্ষণ বাদে কান্না থামিয়ে মেয়েটা মুখ তুলে

তাকাল। তাঁর অশ্রু-আকুল দৃষ্টি বুনহারি যাওয়ার শুঁড়িপথের ওপর নিবদ্ধ হয়ে থাকে অনেকক্ষণ।

হঠাৎ হস্তদস্ত হয়ে ছুটে আসে ওই মেয়েটির সমবয়সী আর একটি মেয়ে—হাঁকাতে হাঁকাতে সে বললে, জানতুম তুই এখানেই আছিস। ওদিকে সবাই নূরজাহান কোথায় গেল ব'লে হেঁচ বাধিয়েছে। নে, ওঠ, সবাই তৈরী হয়ে অপেক্ষা করছে তোর জন্যে। তুই গেলেই-রওনা হবে ওরা।

আমি যাব না মরিয়ম।

যাবি না মানে!

গাঁ ছেড়ে এক পাও আমি নড়ব না। আলতাক ফিরে আসবে—তার জন্যে আমি অপেক্ষা করব।

আলতাক ফিরে আসবে! তুই কি পাগল হ'লি?

পাগল হয়েছি বইকি। তোরা ভেবেছিস আলতাক ম'রে গেছে, না? হুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে নূরজাহান।

কাঁদিস নি নূরজাহান, শোন?

তুই যা মরিয়ম!—নূরজাহান বললে, আমি যাব না। বুনহারি থেকে এ পথে ফিরবে আলতাক। তার জন্যে আমি বসে থাকব এখানে।

মরিয়ম খপ ক'রে নূরজাহানের একটি হাত ধরে ফেলে টেনে তাকে দাঁড় করাল। তারপর সে বললে, পাগলামি করিস নে। চল আমার সঙ্গে।

না, যাব না—চিৎকার করে বসে ওঠে নূরজাহান।

মরিয়ম চোঁচাতে থাকে, আবদুল্লা চাচা, নূরজাহান এই টিলার তলায় আছে। যেতে চাইছে না কিছুতেই।

যাচ্ছি।—জবাব এল প্রবল পুরুষকণ্ঠে।

মরিয়মের মুখের ওপর অগ্নিবর্ষা দৃষ্টি হানে নূরজাহান।

আমাকে জোর ক'রে ধরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছিস, তাই না! দেখি, কেমন পারিস!—বলে হঠাৎ বুনহারির পথ ধরে ছুটতে শুরু করে। চক্ষের পলকে চোম্বা-সদন-শাহ গিরিখাতের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মরিয়ম।

ঠিক এই সময় ছুটতে ছুটতে এল আবদুল্লা। মরিয়মের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে সে বললে, কই, নূরজাহান কই?

এ পথে ছুটে পালাল।—বলে মরিয়ম।

পালাল মানে! ধরে রাখতে পারলি নি?—বলে সে-ও ছুটতে শুরু করে বুনহারির রাস্তা দিয়ে। চারদিকের পাহাড়গুলোতে প্রতিহত হ'ল তার কাতর কণ্ঠের আহ্বান, নূরজাহান! নূরজাহান!

অনেক রাতে ফিরে এল আবদুল্লা। নূরজাহানকে খুঁজে পায় নি সে।

বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

১০

বড় লাইনের মাদ্রাজ স্টেশন থেকে ছোট লাইনের এগমোর স্টেশন মাইল খানেক দূরে। ট্যাক্সিতে মিনিট দশেক সময় লাগল। মামা কোন হোটেলে উঠবেন স্থির করেছিলেন। আমিই পরামর্শ দিয়ে তাঁকে এগমোরের রিটার্নিং রুমে এনে ওঠালুম। ওপর-তলায় পাশাপাশি দুখানা ঘর পাওয়া গেল। মামীই খুশি হলেন সবচেয়ে বেশি। বাইরের বড় বাথরুমটাতে একটা বড় চৌবাচ্চা-ভর্তি ঠাণ্ডা জল দেখেছেন। বললেন, কাল নাইতে পারি নি গাড়িতে। আজ এই জলে ডুবে থাকতে ইচ্ছে করছে।

স্বাতি ছাদের ওপরটা ঘুরে এল। বললে, ভারি সুন্দর আজকের আবহাওয়াটি! শীতের মনস্থান নেমেছে এ দেশে—কাল কাগজে দেখ নি বাবা? আজ বৃষ্টি, নেই, রোদও নেই—বেশ লাগবে বেড়াতে।

মাদ্রাজের উপকূল প্রদেশে হবার বর্ষা হয়। বর্ষার বর্ষণ শেষ হয়ে গেছে। এবারে শীতের বর্ষণ শুরু হয়েছে দিন কতক থেকে। বাংলা দেশের বর্ষার মত বেরাড়া না হ'লেই বাঁচি।

নীচে থেকে স্পেন্সার কোম্পানির বেয়ারা চা নিয়ে এল ট্রেতে ক'রে। মামা তখন আরাম-চৌকিতে দেহটা এলিয়ে তাঁর পাইপ ধরিয়েছেন। আর মামী তাঁর বাক্স-পেটরা হাতড়ে কাপড়-গামছা বার করছেন। স্বাতি বললে, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও মা, আমাদের এখনি বেরতে হবে।—ব'লে চা তৈরি করতে লেগে গেল।

মামা বললেন, অত তাড়া কিসের! আমরা তো আর আজ যাচ্ছি নে, যাচ্ছি কাল। দু দিনে সারা শহরটা চ'বে কেলা যায়।

আমিও একখানা চেয়ার দখল ক'রে ব'সে ছিলুম, বললুম, কাজটা সহজ নয় মামাবাবু, পঞ্চাশ স্কোয়ার মাইল জুড়ে এই শহর।

মামা সোজা হয়ে বসলেন, বললেন, বল কি গোপাল, পঞ্চাশ স্কোয়ার মাইল।

বললুম, লোক কিন্তু সে তুলনায় ভারি কম। মাত্র পনের লাখ।

মামী কাঁধে তোয়ালে-গামছা ফেলে বাইরের স্নানের ঘরটায় যাচ্ছিলেন, ব'লে গেলেন, তোমরা খেয়ে নাও, আমি ততক্ষণ স্নানটা সেয়ে তাড়াতাড়ি হাতটা ঘুরিয়ে নিই।

স্বাতি বললে, একটা বইয়ে পড়লাম, এক সময় এই শহরের নাম নাকি চেনাপত্তন ছিল। নায়ক সর্দার চেনাপ্পা এই শহর পত্তন করেন।

স্বাতি মামাকে এক পেয়ালা চা এগিয়ে দিল। আমাকেও দিল এক পেয়ালা, তার সঙ্গে পাউরুটি মাখন। বললে, এ কবেকার ঘটনা বলতে পারেন?

চায়ে একটা চুমুক দিয়ে বললুম, চেনাপ্পার কথা জানি নে। তবে মাদ্রাজের ইতিহাস আজকের নয়। খ্রীষ্টের জন্মের দু হাজার বছর আগে যখন ভারতে আর্যরা নতুন বসতি স্থাপন করেছেন, তখন এ অঞ্চল চোল-রাজাদের অধীনে ছিল, নাম ছিল চোলামগুল। এখন এই উপকূলের নাম হয়েছে করমগুল। কাবেরী নদীর তীরে তাদের রাজধানী ছিল উরেকুয়ে। আর এই মাদ্রাজ ছিল কতকগুলি গ্রামের সমষ্টি। এই গ্রামগুলির মধ্যেই কতকগুলি দিনে দিনে সমৃদ্ধ হয়ে এক-একটি স্বাধীন শহর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রাচীন ইতিহাসে আমরা কয়েকটি জায়গার নাম পাই। আজও সে নামগুলি শহরের ভেতর অপরিবর্তিত অবস্থায় বেঁচে আছে, কেমন মায়লাপুর। তামিল সাহিত্যের একখানি অমূল্য রত্ন কুরল-রচয়িতা তাঁতি মুনি তিরুভাল্লাভের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই মায়লাপুর নাম। আরও জড়িয়ে আছে তামিল মুনি থিরুগুনানা স্বম্ভবর ও বৈষ্ণব মুনি পেইয়ালবারের নাম। তারপর টিপ্পিকেন, পুরনো নাম তিরু-আল্লিকেনি। মানে স্বর্গীয়-পদ্মের জলাশয়। আচার্য রামানুজের

জন্মের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন এই নাম। দশম শতাব্দীতে খ্রীঃ ২
আহুরি সর্বজনকৃৎ কেশব দীক্ষিত নামে একজন নিষ্ঠাবান যাজ্ঞিক
ব্রাহ্মণ এই টেম্পিকেনের পার্শ্বসারথি মন্দির সংলগ্ন কুমুদ
সরোবর-তীরে পুত্রকামনায় বসন্ত করেন। এর এক বৎসর
পর ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর যে পুত্রসন্তান জন্মে, তিনিই
বিশ্ববিখ্যাত রামায়জ। উত্তরের তিরুভন্তিয়ুরও কম
প্রাচীন নয়।

মুখের পাউরুটি একটু সামলে নিয়ে বললুম, স্তানটোম
গির্জার ইতিহাসও ছ'হাজার বছরের। শোনা যায়,
সেন্ট টমাস নামে খ্রীষ্টীয়ের এক শিষ্য প্রথম শতাব্দীতে
ভারতবর্ষে এসেছিলেন প্রভুর মৃত্যুর পরে তাঁর ধর্ম প্রচারের
জন্তে। তিনি এই মায়লাপুরে ছোট্ট একটি গির্জা তৈরি
ক'রে ধর্ম প্রচার করতেন আর আশ্চর্য ক্ষমতা দেখাতেন।
মাদ্রাজের বর্তমান মীনাধকম বিমানঘাটির কাছে সেন্ট টমাস
মাউন্টে তাঁকে হত্যা করা হয়। প্রথমে তাঁকে তাঁর
সেন্ট টোম গির্জায় কবর দেওয়া হয়েছিল, এখন তাঁর
সমাধি সেন্ট টমাস মাউন্টে।

মুখে আর এক খণ্ড টোকা নিয়ে প্রথমে সামলে নিলুম।
তারপর বললুম, ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে পত্তুগীজেরা ভারতে
বাণিজ্য করতে এসে এই গির্জাটি অধিকার ক'রে তার
সংস্কার করে। এই শহরের তখন দ্রুত উন্নতি হচ্ছে।
তাদের দলের ম্যাড্রার নামে এই জায়গার নাম দেওয়া
হ'ল ম্যাডরাস-পত্তন। ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ এল এ দেশে।
ধানিকটা উত্তরে চেনাপত্তনে ষ্ট্রট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম
দুর্গ স্থাপন হ'ল ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে সেন্ট জর্জ ডেতে। এই
জমিটুকু ফ্রান্সিস ডে পেয়েছিলেন বিজয়নগরের শেষ রাজা
চন্দ্রগিরির কাছ থেকে। চোদ্দ বছর ধ'রে তাদের সেন্ট
জর্জ দুর্গ তৈরি হয়ে ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তা সম্পূর্ণ হ'ল। এর পর
এই শহর বেড়েছে ইংরেজের দুর্গের দু'ধারে।

ধানিকক্ষণ দম নিয়ে কুটি আর চা শেষ করলুম।
স্বাতিও চা খাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলে, ইংরেজ আর ওলন্দাজ
এল মাদ্রাজে, কিন্তু মাদ্রাজের মালিক ছিলেন কে?

স্বাতি আর একটু লিকার ঢালল আমার পেয়ালায়,
আর একটুকু দুধ আর চিনি মেশাল তাতে। আমার
পাইপ থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে, তাঁকেও দেখলুম
উত্তর শোনবার জন্তে অপেক্ষা করতে। চামচে দিয়ে

চা ঘাঁটতে ঘাঁটতে বললুম, মাদ্রাজের ওপর অধিকার
নিয়ে যে লড়াই হয়েছে এই সময়ে, তার ইতিহাসও
ছোট্ট নয়। ওলন্দাজ এসেছিল বাণিজ্য করতে। তাদের
নজর ছিল পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ওপর, ভারতে
মাদ্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন তারা দেখে নি। সে স্বপ্ন দেখতেন
ফরাসী অধিনায়ক দুপ্পে। তারা এসেছিল সকলের পরে।
কিন্তু অল্পদিনেই টেকা দিল সকলের ওপরে। ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে
পণ্ডিচেরীতে এসে বছর কয়েকের মধ্যেই একটা দুর্গ তৈরি
ক'রে নেয়। তারপর ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে দুপ্পে এলেন চন্দ্রনগর
থেকে পণ্ডিচেরীর শাসনকর্তা হয়ে। দুপ্পে তীক্ষ্ণদর্শী।
অল্পদিনেই বুঝতে পারলেন, ভারতে মাদ্রাজ্য স্থাপন
কঠিন কাজ হবে না। এখানে কোন রাজবংশই স্থায়ী
হয় না, উত্তরাধিকার নিয়ে গোলমাল লেগেই আছে।
নিজেদের পদ্ধতিতে অল্প কিছু সৈন্য তৈরি ক'রে নিতে
পারলেই এ দেশের একটা বড় সৈন্যদলকেও ঘায়েল করা
যেতে পারে নিতান্ত সহজে। সিংহাসনের দাবিদারদের
কোন একজনের পক্ষ নিলেই হ'ল। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে
ইউরোপে ইংরেজ আর ফরাসীতে যুদ্ধ বাধল। ভারতেও
যুদ্ধ হ'ল এদের বিবাদ। দু'বছর পর দুপ্পের সাহায্যে
এলেন ফরাসী নৌ-সেনাপতি লা বুর্দনেস। সমুদ্র থেকে
মাদ্রাজের ওপর গোলাবর্ষণ করলেন। মাদ্রাজ বুর্দনেসের
কাছে আত্মসমর্পণ করল এই শর্তে যে, প্রতিশ্রুত অর্থ পেলেই
এ শহর ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু দুপ্পে এ চুক্তি
মানলেন না। কর্ণাটের নবাব তখন আনওয়ার-উদ্-দীন।
নবাব নিজে চাইলেন মাদ্রাজের অধিকার, আর দশ হাজার
সৈন্য পাঠালেন মাদ্রাজ দখলের জন্তে। দুপ্পের যুদ্ধনীতির
এই প্রথম পরীক্ষা হ'ল। মাত্র পাঁচ শো শিক্ত সৈন্য নিয়েই
তিনি নবাবকে পরাস্ত করলেন। এর পর মাদ্রাজের একশো
মাইল দক্ষিণে ইংরেজের সেন্ট ডেভিড দুর্গ আক্রমণ ক'রে
দুপ্পে ব্যর্থ হলেন। স্বযোগ পেয়ে ইংরেজের রণতরী
পণ্ডিচেরী অবরোধ করল। বাতাসে তখন ঝড় উঠেছে,
আকাশে বর্ষার আফালন। পঞ্চাশ দিন অবরোধের
পর ইংরেজকে ফিরে যেতে হ'ল। ফরাসীর হ'ল জয়-জয়-
কার। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে ইংরেজ-ফরাসীর সন্ধি
হ'য়ে গেল। লুইস দুর্গের পরিবর্তে ইংরেজ ফিরে পেল
মাদ্রাজ।

মামীর বহুনিতে আমরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারলুম। মামী বললেন, এখনও সব চা নিয়ে গল্প করছ, বেলা কৃত হ'ল খেয়াল আছে?

মামা সোজা হয়ে ব'সে বললেন, তুমি আটকে রাখলে বাথরুম, দোষ হ'ল আমাদের?

মামী বললেন, আর কি বাথরুম নেই নাকি?

মামা বললেন, কাপড়-জামা?

আমি নিজের দিকে তাকাবার অবসর যেন এই প্রথম পেলুম। ধন্দর নোংরা হয় তাড়াতাড়ি—এ কথার প্রতিবাদ করে না কেউ। মনে হ'ল, আমি যেন সেই সত্যের প্রমাণ দিচ্ছি নিজের জামা-কাপড় দেখিয়ে। বললুম, তা হ'লে আপনি তৈরি হয়ে নিন মামাবাবু। আমি চট্ ক'রে সেরে নিচ্ছি।

উত্তরের প্রতীক্ষা না ক'রে আমি বাসে চেপে সোজা চ'লে এলুম চীনা বাজারে। এক জোড়া ধুতি জামা পেজি আর প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিস কিনে একটা নতুন ব্যাগে ভরে ফেললুম। চুল কাটার সেলুনে ঢুকে দাড়িটাও চেঁচে নিলুম। বাসে উঠতে যাচ্ছি, মনে পড়ল ছোটো বড় তালা কিনে নেবার কথা। বিয়েশে-হোটেল-ধর্মশালার নিজেদের তালা ব্যবহার করাই নিরাপদ। ভেতরাইয়ার এ উপদেশটুকু দিতে দিখা করেন নি।

স্টেশনে ফিরে যখন তৈরি হয়ে বের হলুম, তখন সবাই আমার অপেক্ষাই করছেন। স্বাতি আমার পরিচ্ছন্ন পরিবর্তন দেখে বললে, গোপালদাকে যে আর চেনাই যাচ্ছে না এখন।

মামী বললেন, ও মা, তুমি এরই মধ্যে বাজার-হাট সব সেরে এলে?

মামা চিন্তিতভাবে বললেন, কই, টাকা পরস্যা তো নিলে না গোপাল।

একসঙ্গে এতগুলো মস্তব্যের উত্তর দিতে হবে। বললুম, আমরা লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, সংসার আমাদের থেকেটে। যতক্ষণ খালি না হচ্ছে, ততক্ষণই বাহাছুরি।

মামী ঘরে তালা দিচ্ছিলেন। বললুম, ও-তালা দেবেন না মামীমা, নিজেদের জিনিসপত্র রেখে যাচ্ছি, পরের তালায় বিশ্বাস না করলে দোষ হবে না।

মামী বললেন, এত বড় তালা তো আমাদের সঙ্গে নেই।

আমি আমার ব্যাগ থেকে বড় তালা ছোটো বার ক'রে বললুম, তালা নিয়ে নিশ্চয়ই বেরোন নি জেনে এ ছোটো কিনে আনলুম।

মামা সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালেন তালায় দিকে।

১১

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মামা বললেন, এখন যাওয়া যায় কোথায়?

স্বাতি চট্ ক'রে বললে, একটা ট্যাক্সি ঠিক ক'রে নেওয়া যাক।

বললুম, -বেড়ানোই যদি উদ্দেশ্য হয় তো তার চেয়ে একটা ভাল কনি আছে। কলকাতায় ইলেক্ট্রিক ট্রেন কবে চলবে জানি নে, পায়তারাি শুধু কথা হচ্ছে। মাদ্রাজের ছোট লাইনে আছে ইলেক্ট্রিক ট্রেন। বীচ স্টেশন থেকে টাঘরম পর্যন্ত উনিশ মাইল। দক্ষিণে কোডাধকম কিংবা মাঞ্চলম গেলে বাঙালীর দুর্গোৎসব দেখা যাবে। উত্তরে বীচে গেলে শহর।

মামী বললেন, এখানেও বাঙালীর দুর্গোৎসব আছে?

হেসে বললুম, বাঙালী তার অহংকারটুকু ঘরে রেখে বেরুলে বিশ্ব জয় করতে পারত তার বুদ্ধিতে। কবি অনেক জুখে বলেছেন—সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।

শহর দেখাই স্থির হ'ল এবং চারখানা টিকিট কেটে আমরা ইলেক্ট্রিক ট্রেনেই চেপে বসলুম। এগমোর থেকে বীচ শহরের স্তম্ভের দ্বিগুণে তিন মাইলের পথ। মাঝে পার্ক আর কোর্ট স্টেশন। স্বাতি বসেই ইলেক্ট্রিক ট্রেনে চড়ে নি। খুশি হয়ে বললে, আমাদের ড্রামেরই মতন, অনেকটা বড় আর বেশ জোরে চলে।

মামা দু ধারের রাস্তাঘাট আর বাড়িঘর দেখে মস্তব্য করলেন; আমাদের কলকাতা হ'লে ছুড়িটা রাস্তার মোড়ে ছুশোখানা মোটর আটকে যেত। বীচ স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে সমস্তা হ'ল হারবার দেখা হবে, না, শহর!

মামা বললেন, কী দেখবার আছে হারবারে?

আমি যেন মাদ্রাজের পেশাদার গাইড! মনে মনে ভেতরাইয়ারকে ধস্তবাস্ত দিয়ে বললুম, কোম্পানির আমলের বন্দর, ক্রাজিস ডের চেটার তৈরি। কৃত্রিম উপায়ে এর নির্মাণ, দু শো একর জলে বিদ্যুত। আটখানা জাহাজ

নোঙর করতে পারে একসঙ্গে। সিংহল, অস্ট্রেলিয়া ও প্রাচ্যের দূর দূর দেশের সঙ্গে এর বাণিজ্য।

মামা বললেন, ঢুকতে দেবে কি আমাদের ?

বললুম, অল্পমতি নিতে হবে পোর্ট ট্রাস্টের কাছে।

তবে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে বলতে পারি নে।

স্বাতি বললে, তার চেয়ে মেরিনায় গিয়ে সমুদ্র দেখা যাক। একটা বইয়ে দেখলাম, এখানকার মেরিনা এশিয়ায় প্রথম আর পৃথিবীতে দ্বিতীয়।

আমার দিকে চেয়ে বললে, কোন্টা প্রথম বলতে পারেন ?

বললুম, মুশকিলে ফেললে। ভারতবর্ষটাই ভাল ক'রে দেখতে পাই নি আজও, আমি বলব পৃথিবীর খবর! তবে শুনেছি, ক্যালিফোর্নিয়ায় আছে নাকি অতুলনীয় মেরিনা।

আমরা দক্ষিণের পথ ধরেছিলুম। মামা একটা ট্যাক্সি ধরলেন। মোটা মানুষ, হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল বুঝতে পেরেছি। বললেন, এমনি ক'রে হাঁটলেই মাদ্রাজ দেখা হবে দু দিনে!

আমি ড্রাইভারের সঙ্গে বললুম। প্যারীজ কর্নার দেখিয়ে ফোর্টে যাবার নির্দেশ দিলুম।

পেছনে ফিরে স্বাতিকে বললুম, প্যারীর চকোলেট টিফি এখনও খাও তো ?

মাগী হাসলেন। বললুম, এই সেই বিখ্যাত প্যারীর দোকান। মাদ্রাজের মেয়েরা প্যারীর চকোলেট খেতে এত ভালবাসে যে, এমন চমৎকার জায়গার নাম দিয়েছে 'প্যারীজ কর্নার'।

তারপর আঙুল দিয়ে দেখালুম হাইকোর্ট। স্বাতি চ'টে উঠল। বললে, আমি কি বাঙাল যে, আমাকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছেন!

বললুম, দেখবার জিনিস হ'লে দেখতে হবে বই কি। ইণ্ডো সেরাশেনিক স্টাইলে তৈরি এই বাড়িখানা কি খারাপ ?

ততক্ষণে ট্যাক্সির ড্রাইভার বুঝতে পেরেছে। আমরা শহর দেখতে এসেছি বাইরে থেকে। তাই লাইট-হাউসের মাধ্যম চড়ব কি-না জিজ্ঞেস করল। এক শো ষাট ফুট উঁচু এই লাইট-হাউসে চড়ার নাম শুনে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হ'ল। বললেন, না না, অত সময় নেই আমাদের।

স্বাতি ছুঁখ ক'রে বললে, ওপর থেকে ভারি সুন্দর দেখা যেত কিন্তু সব।

বললুম, এ দিকের সবই সুন্দর স্বাতি, ছুঁখ থাকবে না কিছ্র।

ড্রাইভার ল-কলেজের বাড়িটা বাতলে হাইকোর্টের দক্ষিণে নিয়ে এল দুর্গের ভেতরে। ওপর থেকে ঢালু রাস্তায় যেন গড়িয়ে নেমে এলুম। গাড়ি থেকে নেমে আমরা সেন্ট মেরীর গির্জার দিকে এগোলুম। দুর্গ আজ আর দুর্গ নেই, মাদ্রাজ গভর্নমেন্টের সেক্রেটারিয়েট আর আইন-সভা ব'সে সেখানে।

স্বাতি বললে, দুর্গের ইতিহাস শুনেছি আপনার মুখে, কিন্তু এই গির্জার কথা তো বলেন নি।

বললুম, ১৬৮০ সালে এই গির্জা তৈরি হয়। শুরু ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র এশিয়ায় এই প্রথম প্রটেস্ট্যান্ট চার্চ। এডওয়ার্ড ফাউল নামে এক সাহেব এর ডিজাইন করেছিলেন, আর মোটা টাকা দিয়েছিলেন এলিছ ইয়েল, যার নামে আমেরিকায় ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়। একটি অপূর্ব জিনিস আছে ভেতরে। কমানিয়ান টেবলের ওপর টাঙানো আছে একখানা র‍্যাফেলের ছবি—'লাস্ট সাপার'। অনেক লোকের বিশ্বাস যে, সেই অদ্বিতীয় শিল্পীর তুলির স্পর্শ আছে এই ছবিতে। নিজের স্টুডিওতে ব'সে র‍্যাফেল এই ছবির কতক কতক জায়গা নিজে এঁকেছিলেন। বাকিটা আঁকে তাঁর এক শিষ্য।

খানিকটা এগিয়ে মামী দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। বললেন, এইখান থেকেই যথেষ্ট দেখা হয়েছে, আর কিছু দেখবার থাকে তো সেই দিকে চল।

গির্জা আর মামীর সংস্কারে আছে দ্বন্দ্ব। সে কথা বুঝতে পেরে বললুম, তা হ'লে চলুন ফোর্টের মিউজিয়মে। সেখানেও আছে কোম্পানির আমলের নানান জিনিস। সে যুগের বন্দুক বারুদ জামাকাপড় মুদ্রা আর মেডেল।

স্বাত্তির দিকে ফিরে বললুম, তোমার ভাল লাগত এই সেন্ট মেরী গির্জার একখানা খাতা। তাতে বিস্ময়কর কথা আছে এলিছ ইয়েল আর রবার্ট ক্লাইভের। আঠারো বছরের যুবক রবার্ট ক্লাইভ কোম্পানির সামান্য কেরানী হয়ে মাদ্রাজে আসেন। ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় সৈনিক হবার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। আর প্রথম যুদ্ধ

করেছিলেন একটি ছোট সেনাদলের নামক হয়ে। এই রবার্ট ক্লাইভ সেনা এক ফোঁটা লাল রঙ ফেলেছিলেন ভারতের মানচিত্রে, একদিন সমস্ত দেশটা ছেয়ে গিয়েছিল লাল রঙে। আজ স্বাধীন হয়েও আমরা সিঁচুরে মেঘ দেখে ভরাই।

সব বেধে শুনে আমরা নেপিয়ার ব্রীজ পেরিয়ে মেরিনায় এলুম। সমুদ্রের ধারে ধারে এই প্রশস্ত পথের বিস্তৃতি চার মাইল ধরে। এক দিকে আপন আপন বৈচিত্র্যে ও স্বাতন্ত্র্যে উজ্জল বাড়িগুলি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। অন্য দিকে ঘোড়ার খুরের রাস্তা ও মাহুয়ের চলার পথের পার্শ্বের সজীব ফুল-পাতার বাগান পেরিয়ে বিস্তীর্ণ বালির মরুভূমি, দূরে উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ এসে পাড়ে আছড়ে পড়ছে। শুভ্র ফোয়ার আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে পরিচ্ছন্ন বেলাভূমি।

কার ভাল লাগল না জানি না, স্বাতি চঞ্চল হয়ে উঠল সমুদ্রের কাছে বাবার জন্তে। বললুম, নামবার জায়গা হচ্ছে ট্রিমিকেন।

ড্রাইভারকে বললুম সেখানে থামতে। সে লোকটা বাড়িগুলি চিনিয়ে দিচ্ছিল। ইউনিভার্সিটি-লাইব্রেরির ঘড়ি দেখাল, দেখাল ইণ্ডো-সেরাসেনিক স্টাইলে তৈরি সিনেট হাউস। তারপর দেখলুম চীপক প্যালেস, ম্যুরারিশ পদ্ধতিতে তৈরী। এক সময় কর্ণাটের নবাবদের ছিল, এখন অধিকার করেছে বোর্ড অব রেভিনিউ আর পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট, এমন জ্বল্লর আর একখানি বাড়ি দেখি নি সারা শহরে। এই প্রাসাদের পেছনেই বিশ্বাত চীপক গ্রাউন্ডস, যেখানে ক্রিকেটের টেস্টম্যাচে বিদেশীদের হারাবার ধারা কতকটা অব্যাহত আছে। এই বাড়ির লাগোয়া দেখলুম পুরনো প্রেসিডেন্সি কলেজ—ষোড়শ শতকের ইটালিয়ান রেনেসাঁ স্টাইলে তৈরী। মাঝখানের গম্বুজটি যোগ হয়েছে অল্পদিন। কলেজের সামনে মেরিনা জুইমিং পুল দেখে স্বাতির আনের শব্দ হ'ল। বললুম, আট গণ্ডা পরসা দিলে সকলকেই নাইতে দেয় বটে, কিন্তু তা শনি রবি আর সোমবার। আজ তো দেবে না।

আমরা ট্রিমিকেনের সমুদ্রবেলায় নামলুম। মেঘে আকাশ চুলে পড়েছে, বাতাস শুষ্ক হয়ে আছে। আজ লোকের মেলা বসে নি এই সময়। শুনেছি, সন্ধ্যাবেলায় রঙে রঙে মাতাল হয়ে যায় এই জায়গাটা। কত দেশের

কত রকমের লোক! কত গল্প! কত গোলমাল! ছেলেদের খেলবার জায়গাগুলো ফাঁকা। ফুল আর ফলের কেঁরিওয়ালারা প্রলুব্ধ করছে না ছোট বড় ছেলেমেয়েদের। মল্লিষয়ের মালা পরা চুলের গঞ্জে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে নি এখনও। গানও শুরু হবে বুঝি ও-বেলায়।

বালিতে ভরে যাচ্ছে পা ছাণা। কিন্তু স্বাতির স্মৃতির অস্ত নেই। তার ভাল লেগেছে এই উদার স্বাধীনতা। মামী অহুযোগ করে বললেন, দক্ষিণে এত মন্দির, মন্দির দেখালে না বাবা গোপাল! বেলা যে অনেক হ'ল!

বেলায় কথায় খেয়াল হ'ল, আকাশে সূর্যদেব থাকলে এতক্ষণ তিনি মাথার ওপরেই উঠতেন। মামার বোধ হয় ক্রোধে পেয়েছিল। বললেন, এ বেলায় মত ক্ষান্ত দিলে হয় না?

মামী বললেন, মন্দির সকালবেলাতেই দেখতে হয়।

ড্রাইভারের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির হ'ল ট্রিমিকেনের পার্শ্বদারথি মন্দির দেখিয়ে স্তানটোমের সামনে দিয়ে যাব মায়ালাপুর। সেখানে কপালীশ্বর শিব দর্শন করে একটা ব্রাহ্মণ হোটেলে ঘাওয়া যাবে। এতে ঘণ্টা ধানেকের বেশি সময় লাগবে না।

১২

পার্শ্বদারথি মন্দিরটি বড় প্রাচীন। শোনা যায়, অষ্টম শতকের এক পল্লব রাজা এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পরে বিজয়নগরের এক রাজা এর সংস্কার করেন ষোড়শ শতকে। তখন আমাদের তাত্ত্ব লেগেছে, মন্দির-সংলগ্ন সরোবর না দেখেই বেরিয়ে এলুম।

মেরিনায় একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে রোমান ক্যাথলিকদের সেই স্তানটোম গির্জা। তার উন্নত চূড়া দেখে স্বাতি বললে, সাড়ে চার শো বছর আগে ওলন্দাজরা এর সংস্কার করে, বলেছিলেন না গোপালদা? কিন্তু একেবারে নতুন মত দেখাচ্ছে না-কি!

বললুম, ঠিক ধরেছ। গত শতাব্দীতে পুরনো গির্জাটা ভেঙে এই নতুন গির্জা তৈরি হয়েছে আধুনিক গথিক স্টাইলে। নতুন দেখাবে বই কি।

মায়ালাপুরের মন্দির এখান থেকে দূরে নয়, একটা উঁচু গোপুরের সামনে এসে গাড়িটা দাঁড় করাল ড্রাইভার।

তোষণকে এরা গোপূরম বলে। কিন্তু আমাদের দেশের নহবৎখানার মত সাদা-সাপটা ইটের তৈরি ফটক নয়। অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি-ক্ষোদিত কয়েকতলার সমান উঁচু পাথরের চতুষ্কোণ তোরণ। বৈষ্ণবনাথের মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে তার উচ্চতার। শীর্ষদেশ কোন বিন্দুতে মেলে না, নীচের চেয়ে লম্বায় কিছু কম, পুরু প্যারাপেটের মত দৈর্ঘ্য আছে, প্রস্থ নেই। তার মানে সামনের দিকে উচ্চতার অল্পপাতে পাশে কমে নি, আর দু পাশে উচ্চতার সঙ্গে পাশেও কমেছে এমন ভাবে যে আর হাত কয়েক উঁচু করলেই শীর্ষদেশ একটা সরল রেখায় শেষ হ'ত। দ্রাবিড় স্থাপত্যের একটি খাঁটি নিদর্শন।

স্বাতি বড় আশ্চর্য হয়ে দেখছিল এই গোপূরটি। একজন ব্রাহ্মণ তার পাশে দাঁড়িয়ে গল্প শুরু করল ভাড়া ইংরিজীতে। পরনে ধুতি, একখানা চাদর ফেলেছে তার অনাবৃত কাঁধে, কপালে ফোঁটা তিলক। মামীও স্তন্যে পান এমনি স্বরে বললেন, গোপূরমের এই সমস্ত মূর্তি সম্মিলিতভাবে রামায়ণ আর পুরাণের গল্প বর্ণনা করছে।

একটা ধার দেখিয়ে বললে, এই দেখুন, সমুদ্রময়নের দৃশ্য।

স্বাতি ক্যামেরা বার ক'রে বললে, একটা ছবি নেওয়া থাক, কী বল মা?

স্বাতি বেপরোয়াভাবে ছবি তুলেছে সমুদ্রের। আলো নেই ভাল, তার জন্তে আপোস করেছে, বার বার, কিন্তু ছবি নিতে কার্পণ্য করে নি এতটুকু।

ব্রাহ্মণ বললে, এখান থেকে তো ভাল ভিউ পাবেন না, এদিকে আসতে হবে।

ব'লে ঘুরিয়ে একটা গলির ভেতর নিয়ে গেল। বললে, এইখান থেকে এই নারকেলগাছটা পাশে রেখে ছবি নিন।

স্বাতি ফোকাস ক'রে আশ্চর্য হ'ল। বললে, সত্যিই তো, জায়গাটা যেন ছবি নেবার জন্তেই তৈরি হয়েছে।

ব্রাহ্মণ একগাল হেসে আমাকে বললে, আজ সকালেই একজন আমেরিকান সাহেব ছবি নিলেন এখান থেকে। সামনে থেকে পুরো ভিউটা পাওয়া যায় না।

আমরা গাড়িতেই জুতো খুলে নেমেছিলুম। সোজা ভেতরে চ'লে গেলুম। মামা অনেকটা দূরে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

মন্দিরকে মন্দির ব'লে মনে হ'ল না। গোল গোল থামওয়ালা একটা চারকোণা অঙ্ককার ঘর। একতলা বাড়ির মত তার সমতল ছাদ। চেয়ে থাকবার মত কারুকার্য দেখলুম না কোনখানে। দক্ষিণের এও একটা রীতি।—মূল মন্দিরের চেয়ে গোপূরই হয় বেশি উঁচু, আর স্থাপত্যের যত কিছু উৎকর্ষ, তা মূল মন্দিরের বাইরে, যেখানে-যাত্রীরা ঘুরে ঘুরে দেখে দেখে চোখ জুড়াবে। দেবতা থাকেন অঙ্ককার ঘরে, নিতান্ত সাধাসিধে সঁয়াতসঁতে পরিবেশের ভেতর। যাত্রীদের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। এ কেমন পরিহাস বৃষ্টি নে।

মায়লাপুর মানে ময়ূরের বাসস্থান। আজ এই বিংশ শতকে ময়ূরের চিহ্নও দেখা যায় না মায়লাপুরের ধারে কাছে। তবে ব্রাহ্মণ বললে, পার্বতী নাকি ময়ূরের রূপ ধারণ ক'রে মুক্তির জন্তে শিবের তপস্বী করেছিলেন। স্থপতির এই গল্প নিখুঁতভাবে উৎকর্ষ ক'রে রেখেছে মন্দিরের ভেতর। ব্রাহ্মণ দেখিয়ে দিল। শিব এখানে কপালীশ্বর নামে পূজিত হচ্ছেন।

এর একটু এগিয়ে মন্দিরের পেছনে দেখা গেল বিরাট পুকুর। তার চারিধারে বাধানো সিঁড়ি। যাত্রীরা জলে দাঁড়িয়ে কেউ হাত-পা ধুচ্ছে, কেউ স্নান করছে। যাত্রী একেবারে নেই, এমন সময় নাকি মন্দিরে আসে না। ব্রাহ্মণ বললে, বছরের প্রথমে প্রতি বৎসর এই পুকুরে ফোটিং ফেষ্টিভাল হয়। তার তামিল প্রতিশব্দটি মনে রাখতে পারি নি, বাংলায় কী প্রতিশব্দ ব্যবহার করব জানি না। সন্ধ্যার সময় একটা বড় চারকোণা নৌকোর ওপর দেবতার মূর্তি স্থাপন ক'রে নানা বর্ণের আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়। তারপর অসংখ্য যাত্রীর আনন্দধ্বনির মাঝে দেবতা শতবার এই পুকুর প্রদক্ষিণ করেন। এদিন বড় উৎসবের দিন, ছোটখাটো একটা মেলা বসে মন্দির-প্রাঙ্গণে।

দক্ষিণ-ভারতের প্রায় সকল মন্দিরে আরও ছোটো উৎসব হয়—রথযাত্রা আর পাকীযাত্রা। প্রতিবছর কোনো এক বিশেষ দিনে নানা দেশ থেকে অসংখ্য যাত্রীসমাগম হয়। সে দিন মন্দিরের রথ বার করা হয় ঢালা থেকে, তাকে বেড়ে পুঁছে ফুল আর আলোয় সাজিয়ে দেবতার উৎসব-মূর্তিকে স্থাপন করা হয় রথে। যাত্রীরা ছোট বড় ধনী দরিদ্র হাজারে হাজারে সেই রথ টেনে মন্দির প্রদক্ষিণ

করবে। স্বপ্নচক্রে স্বপ্ন শব্দে আর স্বপ্নীদের আনন্দ-ধ্বনিতে সমস্ত আকাশ বাতাস মথিত হতে থাকবে।

পাকী-উৎসবের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। আয়নার টুকরোর সাজানো কয়েকটি বিরাট পাকী থাকে মন্দিরে। সেগুলো ফুলে ফুলে মনের মত করে সাজিয়ে মন্দিরের দেবতাদের বসানো হয় পাকীর ভেতরে। তারপর ব্রাহ্মণেরা সেই পাকী কাঁধে শোভাযাত্রা করে আশেপাশের কয়েকখানা গ্রাম ঘুরিয়ে আনে।

মামী শিবের মাথায় একটু ফুল-বেলপাতা চড়া ছিলেন। মামীও ছিলেন নব্বো। খালি পায়ে মেয়ে-পুরুষেরা আসছে আর যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে কেউ জটলা করছে না, পাগু ধরছে না, মন্দিরের ভেতর ভিড়ও করছে না। নিঃশব্দে শিবের মাথায় ফুল-জল চড়িয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। মনে হ'ল, তারা রোজই আসে। "দেবতাকে ভালবাসে, তাই দেব-দর্শন না হ'লে দিনের কাজে তাদের মন বসে না। এক দক্ষিণদেশীয় বন্ধুর মুখে শুনেছিলুম, তারা সিনেমা থিয়েটার না দেখে থাকতে পারে, ক্লাবের প্রয়োজন তারা স্বীকার করে না। যা তাদের রক্তমজ্জার সঙ্গে জড়ানো, সে হচ্ছে মন্দির। সারাদিনের কর্মরাস্ত্র দেহমনের মালিঙ্গ দূর করার জন্তে কোন দেবমন্দির তাদের চাই। দক্ষিণের গ্রামে গ্রামে তাই মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সন্ধ্যার সময় গ্রামের লোক ধলে ধলে এসে মিলিত হবে সেই মন্দিরে, দেবতার নামগানে মুগ্ধ করে তুলবে মন্দির-প্রাঙ্গণ।

দেবতায় কী অসীম বিশ্বাস! এদের, ভেবে আশ্চর্য হই। গাড়িতে ভেঙটাইয়ার বলছিলেন, ভদ্রাচলের শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরের কথা। সীতার অধেষণে বেরিয়ে রামচন্দ্র পঞ্চবটী বন থেকে নানা দেশ ঘুরে ভদ্রাচলে আসেন। তারপর গোলাবরী পেরিয়ে যান দক্ষিণ দেশে। রামদাস নামে নিজামের এক কর্মচারী তহবিল তস্করক করে ভদ্রাচলের মন্দিরটি নির্মাণ করেন এবং পরে এই অপরাধের জন্তে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। শোনা যায়, এক ব্রাহ্মণ রামদাসের ভৃত্য ব'লে পরিচয় দিয়ে নিজামকে সেই অর্থ ফেরত দিয়ে আসেন। দক্ষিণের সমস্ত লোক এই ঘটনাটিকে ভগবানের লীলা ব'লে পরম নিষ্ঠাভরে সমস্ত অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে। ভেঙটাইয়ার এ যুগের শিক্ষিত লোক, খবরের কাগজে পুরোপুরি যাচাই করা খবর ছাপে। তবুও এ গল্পটি

বলবার সময়ে তার উদ্দেশ্য হৃদয়ের আকুলতাটুকু গোপন করতে পারে নি। দক্ষিণের লোক সম্বন্ধে এই বিশ্বাসকে লালন করে আসছে। দারিদ্র্যকে তারা ভয় পায় না। সে তো স্বগন্ধ বিতরণের জন্তে ধূপকে শোড়ানো। তারা ভয় পায় এ যুগের কলের সভ্যতাকে, যা তাদের অনেক দিনের বিশ্বাস কেড়ে নিচ্ছে দিনে দিনে, যে বিশ্বাস তাদের বর্ষার দিনে বন্ধুর স্বপ্ন এনেছে বৃকের দরজায়।

পূজা শেষ করে মামী-মামী যখন বেরিয়ে এলেন, পেটে তখন হতাশন জ্বলছে। সেই ব্রাহ্মণ এসে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিল। মামার কাছে একটা টাকা দক্ষিণা পেতেই আশীর্বাদ করল প্রাণ ভরে।

১০

কাছেই একটা হোটেলের আমরা খেয়ে নিলুম। খাটি দক্ষিণী খাওয়া। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ডান ধারে কাউন্টার। ন'আনা পয়সায় পেতলের চাকতি পাওয়া যায় একখানা, অতিরিক্ত তিন আনার আর একখানা টিনের চাকতি। কোথাও বা টিকিটের ব্যবস্থা। সকলে ছু-ছুখানা করে চাকতি নিয়ে টেবিলে বসলুম। সরু পাথরের টেবিল, ছোট ছোট চেয়ার সামনে। একজন কলাশাতা বিছিয়ে চাকতিগুলো নিয়ে গেল। তারপর ব্রাহ্মণ এল ভাল-তরকারি নিয়ে। একটা পেতলের হাতলে ঝোলানো চার-পাঁচটা পরিবেশনের বাটি বা হাতে, ডান হাতে হাতা— হাতে জমা ভাল, নারকেলের কুচি মেশানো লাউয়ের তরকারি, টক আর কাল মেশানো বাঁধাকপি, টোকো নইয়ে কুঁচোনো সজ্জি মেশানো রায়তা, লেবুর আচার। গরম ভাত দিলে একজন, আর একজন ছু-তিন চামচে ঘি দিয়ে গেল। একজন সম্বর দিল, আর একজন দিল রসম। একটা চিনেমাটির ভাঁড়ে দই পাওয়া গিয়েছিল, চিনি নিতে হ'ল চেয়ে। অনেকে এই দইটা পেল না। জানা গেল, সেই টিনের চাকতিওয়ালাদের জন্তে এটা বিশেষ আইটেম। মধুরেণ সমাপরেত্তের রীতি এ দেশে নেই। মিষ্টি খেয়ে মুখের টোকো আবাদটুকু খোয়াতে এরা রাজী নয়। মামার মিষ্টি খেতে ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু পাওয়া গেল না। বললে, মিষ্টির চল নেই একেবারে, তাই অল্প জায়গা থেকে আনিতে দিতে হবে।

আমাদেরও সময় নেই অপেক্ষা করার।

পার্শ্বের একটা ঘরে গোড়া ব্রাহ্মণেরা মাটিতে কলাপাতা বিছিয়ে থাকছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে বেধে স্বাতির হাসি পাচ্ছিল। তাঁদের মাথার চারপাশটুকু কামানো, মাঝখানের চুলগুলো টেনে ঝুঁটি বেঁধেছেন মেয়েদের মত। কপালে ফোঁটা তিলক। স্বাতি বললে, পুরীতে একবার অনেক উড়িয়া দেখেছিলাম এই রকম, উড়িয়া কি এ দেশেও আছে?

বুঝতে পারছিলাম যে ভদ্রলোকরা দক্ষিণদেশীয়, কিন্তু এরা কোন সম্প্রদায়ের তা জানি নে।

মামী ফিসফিস করে বললেন, শুনেছিলাম এরা নাকি নোংরা হয় বড়, নোংরামি তো দেখছি নে কিছু।

মামা বললেন, বেকার সময় সবাই ভয় দেখিয়েছিল যে, এ দেশে খেতে না পেয়ে ভুঁড়ি চুপসে যাবে। এখন মনে হচ্ছে, এ দেশের খাবার তারা কখনও খায় নি।

স্বাতি বললে, তাই বলে রোজ এ খাবার রুচবে না মুখে।

বেরবার সময় সেই কাউটারে দেখি একটা পেতলের থালায় পান সাজিয়ে রেখেছে। বেশ একটু নতুন ধরনের পান। টর্চের গোল ব্যাটারির মত, তবে নীচ, ওপরে রঙিন নারকেলের কুচি আর তানসেনগুলির চেয়ে বড় লজ্জেশ্বর গুলি। এক আনা করে এই পান কিনে কিনে মুখে পুরলেন সবাই। আমি এক পয়সার এক প্যাকেট জুপুরি মুখে ফেললাম।

গাড়িতে ওঠবার আগেই সে পান থু-থু করে ফেলল স্বাতি। বললে, একেবারে ঘাস, কোনও আশ্বাদ নেই পানের।

মামা-মামীও ফেললেন পরে, তবে খানিকটা এগোবার পর মোটর থামিয়ে।

ট্যাক্সি ড্রাইভার জিজ্ঞেস করেছিল, আমরা গভর্নেন্ট মিউজিয়াম আর আর্ট গ্যালারি দেখব কি না! মামা আমার দিকে তাকালেন উত্তরের জন্তে। বললুম, মিউজিয়মে দেখবার জিনিস নেই এ কথা বলি কী করে? একশো বছরের পুরনো এই মিউজিয়াম। আর যা দেখবার জিনিস তা ঘন অগ্র যুগের। আমরাবতীর বৌদ্ধস্তুপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বৌদ্ধযুগের নানা নিদর্শন।

প্রাচীন জাবিড় যুগের, চোল পাণ্ডা আর পল্লব রাজাদের সময়কারও অনেক কিছু রক্ষা করা হয়েছে এই মিউজিয়মে। এদের সাজাবার ধরনটিও ভারি সুন্দর। তবে আর্ট গ্যালারি এই সেদিনের। বছর দুই আগে পণ্ডিত নেহেরু এর উদ্বোধন করেছেন। কিছু প্রাচীন ছবি আর ব্রোঞ্জ আছে দেখবার মত। তবে এ সব তো কেরার পথে।

ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে সোজা অ্যাড্ভিসার ঘাবার নির্দেশ দিলুম।

স্বাতি বললে, পণ্ডিত জগদ্বলালের আত্মজীবনীতে পড়েছি যে, তিনি তেরো বছর বয়সে থিওসফিক্যাল সোসাইটির মেম্বর হন এবং তাঁর বাবা মতিলালও থিওসফিস্ট ছিলেন। বতরুর মনে পড়ছে, থিওসফি তাঁর ভাল লাগে নি।

মামা বললেন, ছেলে অল্পবয়সেই একটু বেশি পেকেছিলেন।

স্বাতি বললে, থিওসফি সযত্নে এর বেশি ধবর আমি রাখি নি। দু-একজনকে জিজ্ঞেস করেও বেশি কিছু জানতে পারি নি।

বললুম, এর ইতিহাসটুকু ভারি ভাল লাগবে শুনতে। হেলেনা পেট্রোভনা ব্র্যাভটস্কি রাশিয়ার মেয়ে, জীবনদর্শনে তাঁর অগাধ জ্ঞান। শোনা যায়, ১৮৭৫ খ্রীস্টের জুন মাসে তিনি সমাহিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখেন যে হিমালয়ের সাধু-সংঘ তাঁকে ধর্ম ও দর্শনের আলোচনা ও প্রশ্নাবের জন্তে একটি সমিতি গঠন করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। এ কাজে তাঁকে সাহায্য করবে আমেরিকার ধীমান কর্নেল হেনরি অলকট। অলকট তখন মধ্যাহ্নের সূর্যের মত জ্যোতির্ময়, উনিশ বছর বয়সে প্রেততত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেছেন, তেইশ বছর বয়সে স্থাপন করেছেন কৃষি-বিজ্ঞান, আর প্রাপ্ত বয়সে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদের মোহ তাঁকে বিচ্যুত করতে পারে নি নিজের সংকল্প থেকে। এই বছরই সত্তরই নভেম্বর এই দুই মহাত্মা নিউ ইয়র্কে থিওসফিক্যাল সোসাইটি স্থাপন করেন। এঁরা ভারতবর্ষে আসেন বছর চারেক পরে। এবং শ্রুত আশ্চর্য মনে হবে যে, ওই থিওসফিক্যাল সোসাইটির মূল কেন্দ্র স্থাপিত হয় মাদ্রাজের এই অ্যাড্ভিসারে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে। পৃথিবীতে

আছে এত দেশ বেখানে, এই সোসাইটির মূল কেন্দ্র স্থাপিত হতে পারত। কিন্তু পৃথিবীর দুই গোলাধের দুটি মানুষ, একজন পুরুষ ও আর একজন নারী, একমত হয়ে ভারতকে এই মর্দালা দিলেন। এ কথা ভাবতে আশ্চর্য লাগে না কি! এর খানিকটা উত্তর পাওয়া যায় ডক্টর অ্যানি বেসান্টের জীবনালোচনায়। ম্যাডাম ব্র্যান্ডাইফি তাঁর 'সিক্রেট ডক্টরিনে' সকল ধর্মের সূক্ষ্মতম দর্শন নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। আর এই বই পড়েই বেসান্টের ধারণা হ'ল যে, ভারতই হ'ল সত্যিকার আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির দেশ, আর এই ভারতের আকাশেই হবে নতুন যুগের সূর্যোদয়। সত্যিই, এ কথা তিনি তাঁর সমস্ত হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করেছিলেন। তাই ভারতে এসে ভারতকে ভালবাসলেন ভারতীয়ের মত। যে ভারত তার ঐতিহ্য ভুলে পাশ্চাত্যের অহঙ্করণে অন্ধ হতে চলেছিল, সেই ভারতকে শোনালেন তার ঐশ্বর্ষের কথা। তিন শো তিরিশ খানা বই লিখেছেন তিনি। হিন্দুর ধর্ম মন্ত্রতন্ত্র মূর্তিপূজা সাকার-নিরাকারবাদ কর্ম ও জ্ঞানান্তরবাদ সহজ ভাষায় শোনালেন সাধারণ লোককে। বিদেশীর কাছে যা ছিল রহস্যের মত নিরর্থক, খ্রিস্টানের রঞ্জন-রশ্মিপাতে তা অচ্ছন্ন মনোরম হয়ে উঠল। আজ রাশিয়ার মাদাম ও আমেরিকার কর্নেল গত হয়েছেন। এ দুটো দেশের দূরত্বও বেড়ে গেছে অকস্মাৎ অভাবনীয়রূপে। সংঘাত বেধেছে তাদের আদর্শে। কিন্তু ভারতের ঐতিহ্য জ্ঞান হয় নি, সারা বিশ্ব আজ ভারতের মুখ চেয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখছে।

আমাদের গাড়ি চলেছিল স্তানটোম হাই রোড ধরে। মামা জিজ্ঞেস করলেন, খ্রিস্টানি সম্বন্ধে আমি কিছু পড়া-শুনো করেছি কি না? বললুম, পড়াশুনো করি নি, তবে আলাপ-আলোচনা করবার সুযোগ পেয়েছিলুম। আমার এক মহারাজী বন্ধু ও তাঁর স্ত্রী এই সোসাইটির মেম্বার ছিলেন।

স্বাতি বললে, খ্রিস্টানি কি একটা স্বতন্ত্র ধর্ম?

আমি বললুম, খ্রিস্টানিটার কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম নেই। সকল দেশের সকল জাতের সকল ধর্ম ও বর্ণের স্ত্রীপুরুষ এক সর্বজনীন উদার মনোভাব নিয়ে সকল ধর্মের আলোচনা করেন। দেশ কাল পাত্র ও ধর্ম এখানে-বড়

নয়, বড় হ'ল তাদের পক্ষপাতশূন্য ভ্রাতৃত্ববোধ। নির্ভর সঙ্গে সকল দেশের ধর্ম ও দর্শনের বৈজ্ঞানিক আলোচনায় আপন আপন ঐতিহ্যের প্রতি শুধু শ্রদ্ধাই বাড়ে না, নিজের অজনিহিত শক্তির ওপর আস্থাও আসে। ব্রহ্মজ্ঞান বড় কথা; কিন্তু আমরা সকলেই অহুভব করি যে, আমাদের প্রতিদিনের জ্ঞানের বাইরে আরও কিছু জ্ঞানবার জিনিস আছে, যা জ্ঞানতে পারলে জীবনমৃত্যুর রহস্য সরল হয়ে যেত, একটা পরিপূর্ণ জ্যোতির্ময় অস্তিত্বের উপলব্ধি হ'ত। এই তত্ত্বজ্ঞানের সংজ্ঞা নানা দেশে নানা রকম। কেউ বলি রহস্যবাদ, কেউ বলি সূক্ষ্মবাদ, আবার কেউ বলি ভিত্তিহীন উইজডম। খ্রিস্টানিতে এই সনাতন জ্ঞানেরই অবেষণ, যে কোন ধর্মের মাধ্যমে যে কোন দর্শনের ভিত্তিতে যে কোনো বিজ্ঞানের সাহায্যে এই পরম সত্যের সন্ধান। জি. এস. অকনডেল একে সংক্ষেপে বলেছেন, 'God's knowledge of himself.' মানব-আত্মার সেই শাস্ত প্রার্থনা,

অসতো মা সদ্ গময়

তমসো মা জ্যোতির্গময়

মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

আবিরাবীর্ম এধি।

রুদ্র যন্তে দক্ষিণং মুখং

তেন মাং পাহি নিত্যম্।

"অসত্য থেকে আমার সত্য নিয়ে যাও, অধার থেকে জ্যোতিতে নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃত নিয়ে যাও। হে প্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মূর্তি, তারই দ্বারা আমার সর্বদা রক্ষা কর।"

অ্যাডিম্বার নদীর ওপর এলকিনস্টোন ব্রিজ পার হয়ে আমরা অ্যাডিম্বারে প্রবেশ করলুম। খানিকটা এগিয়েই সোসাইটির ফটক। অনেকখানি জমির ওপর ছড়ানো এই সমিতির বাড়িগুলো। ফটক পেরিয়ে দু ধারের বাগান দেখতে দেখতে এগিয়ে গেলুম। এদিকে ক্ষুদ্র নদীটি মধুর গতিতে বয়ে যাচ্ছে, ওধারে দিগন্তবিস্তৃত সাগরের অবিশ্রাম কলোচ্ছাস। ভেতরে গাছে ও ছায়ার, মেঘে ও মায়ায় জাহ্নু ঘনিয়ে আছে। এমন যেন আর কোথাও দেখি নি।

কর্তৃপক্ষের অসুস্থমতি নিয়ে আমরা সব দেখতে লাগলুম। একজন ভদ্রলোক ইংরিজীতে আমাদের সব বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। বললেন, ভারতে স্বাধীনতার জন্তে প্রথম লড়াইয়ের যুগে ডক্টর অ্যানি বেসান্টের চেষ্টায়—ভারতে এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয়। ভারত তখন বিদেশীদের অঙ্ক অঙ্ককরণ করে নিজের ঐতিহ্য তুলতে শুরু করেছে। যে সব দেশ মাটি চায়, সোনা চায়, প্রভুত্ব চায়, এমন লোলুপভাবে এমন ভীষণভাবে চায় যে সত্য আলোক ও অমৃতের জন্তে মানবের যে চিরন্তন প্রার্থনা তা ক্রমেই প্রচ্ছন্ন হয়ে তাদের উদ্ধাম করে তুলছে। এই তো মৃত্যু! এই প্রলোভনের দিনে, এই ক্ষমতার মোহের দিনে ধারা অঙ্কত্বকে ‘বিনিপাত’ বলে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তাঁরাই এই থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। সত্যকে আমরা সকলের বড় ধর্ম বলে মানি আর বিশ্বাস করি বিশ্বমানবতায়। “Theosophy is the Order of Life, the Law of Life, the Purpose of Life, and Theosophy is the Science of Freedom, the Science of Friendship.” আমরা সকল দেশের সকল ধর্মের লোক এসে জড়ো হয়েছি এই সোসাইটির পতাকা-তলে। আমাদের মতান্তর আছে, কিন্তু মনান্তর নেই।

আমরা তাদের মেডিটেশন হল দেখলুম, দেখলুম সকল ধর্মের সিম্বল উৎকীর্ণ করা আছে দেওয়ালের গায়ে। তাদের লাইব্রেরি দেখলুম পাশেই। দেখলুম কত হাজার বছরের পুরনো বই আর তালপাতার পুঁথির অমূল্য সংগ্রহ। তালপাতা আর ভূর্জপাতার পুঁথিই সুনলুম আঠারো হাজার। দেখলুম তাদের গার্ডেন অব রিমেম্ব্র্যান্স, বেসান্ট স্কুল, অভিযিশালা, আর দেখলুম হুশো বছরের প্রাচীন

বটগাছ। ভদ্রলোক বললেন, চল্লিশ হাজার ফুট ছায়া বিস্তার করে আছে এই বটগাছ, ভারতের তিনটি বিরাট বৃক্ষের এটি অন্যতম। কী অনাবিল প্রশান্তি তার নীচে, যুক প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার কী অপরিণীম আশাস!

গাছের নীচে অনেকে বিশ্রাম করছেন, অনেকে বই পড়ছেন। নিবিষ্ট মনে। আমরাও বললুম খানিকক্ষণের জন্তে। ভদ্রলোক বললেন, পৃথিবীর ছাপ্পান্নটি দেশে এই সোসাইটির শাখা আছে, আর এর সদস্যসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার। জন্মাবধি এই থিওসফিক্যাল সোসাইটি ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে আর তার সাংস্কৃতিক জীবনে কী প্রেরণা এনেছিল, আজ এই সোসাইটি কী উপায়ে সেই আলোটুকু প্রজ্বলিত রেখেছে, কী পড়ানো হয়, আর উৎসব হয় কোন্ কোন্ দিনে, তার একটা বিরাট তালিকা দিতে বললেন আমার কাছে।

আমি ভাবছিলুম ম্যাডাম ব্ল্যাভাটস্কির ‘সিক্রেট ডক্ট্রিনের’ কথা। ভারতের সঙ্গে কোথায় যেন তাঁর নাড়ীর যোগ ছিল। তিনি কি জাতিস্মর? আমাদের নিত্যকালের ধ্যানের বীজ ছিল কি তাঁর ভাবনার ধারায়? ও ভূত্বক: স্ব: তৎসবিতুর্বরেণ্যঃ ভর্গোদেবস্ত ধীমহি ধियोয়োনো: প্রচোদয়াৎ।

“বিশ্বসবিতা এই সমস্ত ভুলোক ভুবলোক স্বর্লোককে যেমন প্রত্যেক নিমেষেই প্রকাশের মধ্যে প্রেরণ করছেন, তেমনি তিনি আমার বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রতি নিমেষে প্রেরণ করছেন—তাঁর প্রেরিত এই জগৎ দিয়ে সেই জগদীশ্বরকে উপলব্ধি করি, তাঁর প্রেরিত এই বুদ্ধি দিয়ে সেই চেতন স্বরূপকে ধ্যান করি।”

ও একমেবাদ্বিতীয়ম্

[ক্রমশ]



খার্ড ক্লাস কামরায় যতই ভিড় থাকুক, জগদীশ ওরই মধ্যে নিজের বসবার একটু জায়গা করে নেবেই। কোন রকমে একবার দেহটা গলাতে পারলে হ'ল, তার পর আর তাকে ধরে রাখে কে! যেন যাতুমন্ত্র জানে। এর পিছন দিয়ে, ওর বগলের তলা গ'লে, মালপত্রের জুপ সরিয়ে, মাড়িয়ে, ভিড়িয়ে, কেমন করে যে একটা স্থান দখল করে বসে তা সত্যিই ধারণার অতীত। এ বিষয়ে ওর কৃতিত্ব অসাধারণ তাতে সন্দেহ নেই। সবাই ওকে বাহবা দেয়।

তবে এই সাক্ষ্যের মূলে ওর দৈর্ঘ্যবস্তু চেহারাটা যে অনেকখানি কাজ করে, একবার যে তাকে চোখে দেখেছে কিছুতেই সে স্বীকার না করে পারবে না। শুধু করুণা রঙ ব'লে নয়, ওর লম্বা-চওড়া চেহারার সঙ্গে এমন একটা আভিজাত্যের দৃষ্টি চোখে মুখে যে, কোন তৃতীয় জৈগীর যাত্রী কল্পনাই করতে পারে না সে ব'লে যাবে আর তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে জগদীশ—ধবধবে প্যাণ্টের ওপর যার ক্রিমকলার রঙ ব্লুশার্ট, মুখে একটা জলন্ত সিগারেট এবং হাতে সিগারেট-ভর্তি চকচকে হৃদয় একটি টিন।

বিশেষজ্ঞদের সময় জগদীশ একটা নিয়ম বিশেষভাবে মেনে চলে। সাহেবী পোশাক না প'রে কখনও বেরায় না। তার ধারণা, দেশ স্বাধীন হয়েছে বটে, কিন্তু এককালের গৈলিগামি করার অভ্যাসটা এখনও লোকের রক্তে মিশে আছে, তাই যাদের দাসত্ব দীর্ঘদিন ধরে করেছে তাদের পরিত্যক্ত পোশাকটা দেখলেও আপনি মাথা হেঁট হয়ে যায়। জগদীশের এই ধিওরি যে বর্ষে বর্ষে সত্য, তার প্রমাণ সে হাতে হাতে পেয়েছে—একবার নয়, বহুবার।

কিন্তু সেদিন কি হ'ল কে জানে! একদল দেহাতী একেবারে বৈকে বসল, কিছুতেই তাকে জায়গা ছাড়তে রাজী হ'ল না। তারা কালো রঙের হাঁড়িকুড়ি, ছেঁড়া মাদুর, ময়লা কাঁথা, টোল-খাওয়া টিনের হুটকেশ, -হুড়িহুড়ানো শিশি-বোতল, ভাঙা হারিকেন লঠন প্রভৃতি নিয়ে ছড়িয়ে বেগিয়ে এমনভাবে কোণের দুখানা লম্বা বেঞ্চি ও তার ওপরের দু'টো মাল রাখবার তাক বোকাই করে নিয়ে বসেছিল যেন সেদিকটা তাদের রিজার্ভ-করা—অন্ত কোন প্রবেশের প্রবেশ নিষিদ্ধ। তারা যে দরিত্র তা

তাদের চেহারায় প্রকাশ। ছেঁড়া ময়লা গেঞ্জি কারও গায়ে আছে, কারও তাও নেই। কান্নার পরনে খাটো ধুতি, কান্নার বা একখানা গামছা মাত্র সঞ্চল। পানের বটুয়া খুলে চুন-খয়েরের সঙ্গে গুণ্ডি দিয়ে পান সাজতে সাজতে তারা নিজেরের ভাবায় হ্রস্ব করে আপোনে কি সব আলাপ-আলোচনা করছিল।

জগদীশের হুটকেশ ও বিছানাটা জোর করে হিন্দুস্থানী কুলিটি বাকের ওপর এক জায়গায় গুঁজে দিয়ে ব'লে উঠল, আরে, ঠিকসে বইঠো ভেইয়া, বাবুকা জেরা জায়গা তো ছোড় দেও।

যেন তার কথা ওরা কেউ শুনতেই পায় নি, এমনভাবে তখনও পান সাজছিল। এবার কুলিটি এক পর্দা গলা চড়িয়ে দিলে, ই লোক এইনা বেয়াবু—আরে, হট্ট যাও না জেরাসে—

এ কথায় চ'টে উঠল একজন। তারপর বিড়বিড় করে যা বললে তার অর্থ হচ্ছে, আমরা কি টিকিট কাটি নি, না বিনা পয়সায় যাচ্ছি?

এর জবাব দিলে জগদীশ গম্ভীর কণ্ঠে। এতবড় অপমান তাকে কেউ কোনদিন করতে সাহস করে নি। তাই বললে, টিকিট তোমার মত সকলেই কেটেছে, ভুলে যেয়ো না। সকলের বসবার জায়গাও সরকার এর মধ্যে করে দিয়েছে। স'রে ব'স ঠিক হয়ে।

সাজা পানটা গালের মধ্যে পুরে, বটুয়াটার দাড় টেনে কোমরে গুঁজতে গুঁজতে সে বললে, কিন্তু জায়গা কোথায় বাবু যে বসতে দেব?

ধেখবে জায়গা কোথায়? দেখিয়ে দেব?—জগদীশ যেই ব'লে উঠল অমনি তার মুখের কথাটা যেন কেড়ে নিয়ে সেই দেহাতীটি বললে, তা আপনি এত চটছেন কেন? আপনি ভদ্রলোক—

বলতে বলতে সহসা তার গলার স্বর যেন খাদে নেমে এল এবং নিজেকে এমনভাবে সঙ্কুচিত করে নিলে যে, তার পাশেই জগদীশের বেশ একটা বসবার জায়গা হয়ে গেল।

জগদীশ বসল বটে, কিন্তু সারাক্ষণ তার মনটা সিঁটিয়ে

রইল। এই লোকগুলোর মধ্যে ব'সে এতটা পথ কি ক'রে যাবে ভাবতে না পেয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে আগাখা ফ্রিটির একখানা নভেল খুলে পড়তে শুরু ক'রে দিলে। নিমেষে তার মন চ'লে গেল ইঞ্জিন্টের এক অজ্ঞাত মকদ্দমিতে। রক্ত নিশ্বাসে পাতার পর পাতা সে উন্টে যায়। কাহিনীর জটিলতা যত বাড়ে, রহস্যও যেন তত ঘনীভূত হতে থাকে।

হঠাৎ একটা গুণ্ডাগোল শুনে মুখ তুলতেই জগদীশ দেখে, ঝগড়া লেগেছে সেই দেহাতীটির সঙ্গে এক ফেরিওলার। সে বেচারী গাড়ির মধ্যে পাকা কলা বেচতে এসেছিল। তার কাছ থেকে দরদাম ক'রে কলা নিয়ে তারপর পয়সা দেবার সময় কম দিতে গেলে সে তার হাত থেকে কলাগুলো কেড়ে নিয়ে তাকে যাচ্ছেতাই ক'রে গালাগাল দিচ্ছে; জন্ত-জানোয়ার থেকে শুরু ক'রে যত বকমের বাজা বাছা শব্দ হিন্দী ও বাংলায় প্রচলিত আছে তার কোনটাই যখন বলতে বাকি রাখলে না তখন সে শুধু প্রতিবাদ করলে এই ব'সে—এত গালাগাল দিচ্ছ কেন?

দেব না! তোকে না আগে বললুম যে পাঁচ আনার কম ভজন হবে না! তবে ভাঙবার পর এখন আবার চার আনা দিচ্ছি যে?

এত ছোট ছোট কলা, আর এত দাম—!

ছোট কলারই তো দাম হয়েছিল, বড় কলা তো আমার নেই। জ্বলী ভূত কোথাকার!—বলতে বলতে বুড়িটা কাঁধে তুলে নিয়ে সে হাঁকতে শুরু করলে, এই ব'বু চন্দননগরের চিনিটাপা—পাঁচ আনায় ভজন—ফুরিয়ে গেলে আর পাবেন না।

পরের স্টেশনে গাড়ি থামতে ফেরিওলাটি নেমে গেলে সেই লোকটি এমন মুখের ভাব ক'রে সকলের দিকে তাকাতে লাগল যেন কিছুই হয় নি, কেউ তাকে কোনদিন কোন অপমান করে নি। ওদিকে বাংলা নাটকে করুণ দৃশ্যের পরই যেমন অবাস্তব হলেও হাস্যরসের কিছু চুটকিচাটকা থাকবেই, তেমনই ঘুঙুর পায়ে, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠল আর একজন ফেরিওলা। এই যে বাবু হরিদাসের বুলবুল ভাজা, যে বয়েসে থাকেন, সেই বয়েসে থাকবেন। এক প্যাকেট এক আনা, তিন প্যাকেট দশ পয়সা।

অমনি একজন দেহাতী তিনটে প্যাকেটের সঙ্গে

আরও একটা তার হাত থেকে তুলে নিয়ে বললে, এই চারটে দশ পয়সায় দেবে?

বাবু, এ তোরা খেতে পারবি না। দাঁত প'ড়ে যাবে।—ব'লে অবজ্ঞার সঙ্গে প্যাকেটগুলো তার হাত থেকে টান মেয়ে কেড়ে নিয়ে আবার স্বর ধরলে, 'আমার এ হরিদাসের বুলবুল-বুলবুল-বুলবুল ভাজা'।

এই স্বরকে ছিন্নভিন্ন ক'রে পরের স্টেশনে উঠল যেন একজন জল্লাদ। তার মুখে কালো দাড়ি, কালো রঙের একটা আলখালা গায়ে, হাতে উন্মুক্তমূলক কতকগুলো ছুরি ও কাঁচি। 'এই যে আসল কাকুননগরের ছুরি কাঁচি বাবু!—ব'লে প্যাসেঞ্জারদের মুখের সামনে তুলে ধরলে।

আশ্চর্য! এ খাবার জিনিস নয়, তবু একে ডাকলে ওদের একজন। তারপর শুরু হ'ল আবার দরদস্তুর। হাতে ক'রে এটা ওটা মেটা নাড়াচাড়া ক'রে এক টাকার কাঁচিটার দাম পাঁচ আনা এবং দশ আনার ছুরিটার দাম সাড়ে তিন আনায় অনেক টানাটানি কষাকষির পর যখন ফেরিওলাটা দিতে রাজী হ'ল তখন সে পিছিয়ে গেল। দেশওয়ালী ভাইদের মুখের দিকে এমনভাবে তাকালে যেন অজ্ঞানভাবে তাকে ঠকিয়ে নিচ্ছে গাঁইয়া পেয়ে।

আরে স্টেশন এসে গেল, আমি এখনি নেমে যাব, পয়সা বার কর।—ব'লে সেই কাঁচি ও ছুরিটা যেমন তার দিকে এগিয়ে দিলে অমনি সে ঘাড় নেড়ে জবাব দিলে, এ নেব না, এ ভাল জিনিস নয়।

যদি ভাল নয় তো, এতক্ষণ ধ'রে দিল্লাগি করছিল কেন? সাড়ে তিন আনার ছুরি আর পাঁচ আনার কাঁচি কি সোনা দিয়ে তৈরি হবে, না, তা দিয়ে তোর মত লোকের গলাকাটা যাবে!—ব'লে শুধু তার নয়, তার উল্লসিত চতুর্দশ পুরুষের মুণ্ডপাত করতে করতে নেমে গেল।

এ অপমান কার বুকে কতখানি আগুন জ্বালান্নে জানে! তবে কিছুক্ষণের জন্তে তাদের কারও মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরুল না। সারা কামরাটা যেন থমথম করতে লাগল। সহসা সে নিস্তব্ধতা ভঙ হ'ল আর একজন ফেরিওলার কর্ণধরে।—এই যে প্রলোপ দিন আপনাদের জালা যন্ত্রণা ব্যথায়, যার যা আছে সব ভাল হয়ে যাবে আমার এই 'সর্বহরি মলমে', বুকে ব্যথা, গাঁটে ব্যথা, আধকপালে ব্যথা, দাঁতে ব্যথা, মাথা ব্যথা—যাবতীয় ব্যথায় এ বন্ধু।

পয়সা লাগে না, বিনামূল্যে নমুনা নিয়ে এখনি গাড়ির মধ্যে পরীক্ষা ক'রে দেখুন। তা ছাড়াও কুকুর বেড়াল ছাগল গরুরও যদি পায়ে চোট লেগে ব্যথা হয় বা ফোলে—লাগাবামাত্র পনেরো মিনিটের মধ্যে ভাল না হ'লে দাম ফেরত দেব।

দেহাতীদের কাছে এগিয়ে যেতেই প্রথমে একজন, তারপর আর একজন তাদের মাথাটা দেখিয়ে বললে, খুব দরদ' হয়েছে। একটু নমুনা দেখি। ফেরিওলাটি সঙ্গে সঙ্গে আঙুলে ক'রে মলম নিয়ে তাদের কপালে ঘ'ষে দিতে দিতে বললে, এক শিশি পাঁচ আনা। তবে বেশি প্রচারের জন্তে কোম্পানি স্ট্রাম্পেল ফাইল বার করেছেন মাত্র দু' আনা। কার চাই বলবেন—আমি পরের স্টেশনে নেমে যাব।

এমনি ক'রে তিনজনের কপালে মলম ঘষা শেষ হতেই আরও দুজন ঘেঁই চাইলে এমনি মুখটা বিকৃত ক'রে সে ব'লে উঠল, বিনা পয়সায় পেলে তোরা বিষ খেতেও রাজী—অত সস্তা নয় আমার মলম। তোরা তো জন্মে এ কিনবি না। বা ভাগ, আর হবে না!

গুলি—গুলি খান, সকালে গুলি, দুপুরে গুলি, বিকেলে গুলি, রাতে গুলি—সব সময় কেবল এই গুলি খান। এই যে দাড়, আমার কাছে আছে পল্লবের তানসেন গুলি। কার চাই বলবেন। তেঁটা পেয়েছে, দুটো গুলি মুখে রাখুন পিপাসা আপনায় সঙ্গে সঙ্গে দূর হয়ে যাবে। এ ছাড়া বদহজম, গলাজ্বালা, বুকজ্বালা, ক্ধিখে নেই, পেট মোচড় দিচ্ছে—দুটি বড়ি খেয়ে নিন, দেখবেন আগুনে ঘেন জল পড়ল। বেশি বলার প্রয়োজন নেই। আজ পনেরো বছর ধ'রে এই গাড়িতে সন্মান গৌরবে এই তানসেন গুলি চলছে। এ গুলি খায় নি এমন লোক দেশে বোধ হয় খুব কম আছে। যারা এখনও খান নি, তাঁরা খেয়ে দেখুন, আমার কথা সত্যি কিনা।

গাড়ির অন্তরাত্ত বাত্মীদের হাতে সেধে সেধে বড়ি দিতে গেলে সেই লোকগুলি সবই একসঙ্গে হাত বাড়াল। প্রত্যেকের হাতে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একটা দুটো দিয়ে সে বললে, এ খেলে তোদের পেট কামড়াবে।—ব'লে এগিয়ে যেতেই তিন-চারজন কিনলেন পয়সা বার ক'রে—কেউ বড় শিশি, কেউ ছোট।

এর পর উঠল বেরিলির সুরমা বেচতে এক পশ্চিমী মুলমান। কাঠিতে ক'রে সুরমা লাগিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্তে বাত্মীদের দিকে অগ্রসর হতেই এগিয়ে এল সেই দেহাতীরা। চোখে সুরমা লাগিয়ে দিয়ে তার গুণাগুণ অনেককক্ষ ধ'রে বর্ণনা ক'রেও তাদের কাছে এক শিশিও বিক্রি করতে না পেরে সে হতাশ হয়ে নেমে গেল বটে, কিন্তু অনেককক্ষ অবধি তাদের সুরমা-পর্য্য চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল—বোধহয় জ্বালা করছিল। চোখের ভিতরটা ঈষৎ রক্তাক্ত হয়ে উঠেছিল, তাই হাত দিয়ে রগড়ানো মাত্র জল গড়িয়ে পড়ছিল দু' গাল বেয়ে।

বেশ হয়েছে। বিনা পয়সায় সুরমা পরার স্বপ্ন এখন বোকা!—ব'লে গাড়ির এক কোণ থেকে কে একজন ঘেন মন্তব্য ক'রে উঠল।

কিন্তু ব'লে কি হবে! এতগুলো লোকের সামনে বারে বারে অপমানিত হওয়ার পরও কি কেউ আবার ফেরিওলাদের ডাকে, না, তাদের জিনিসে হাত দেয়, ওরা সর্বভূক, না, দুনিয়ার তাবৎ জিনিসে এদের কৌতূহল! বুঝতে না পেরে বারে বারে জগদীশ তাদের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল কটমট ক'রে। তাকে যে প্রথমে ওরা অপমান করেছিল সে কথাটা সে তখনও ভুলতে পারেনি, তাই ফেরিওলারা এমনই ক'রে যখন তাদের অপমান ক'রে যাচ্ছিল ঘেন তখন সে মনে মনে একপ্রকার প্রতিশোধের আনন্দ উপভোগ করছিল। পড়ায় ব্যাঘাত ঘটলেও জগদীশ মধ্যে মধ্যে আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছিল সেই জীবগুলির মুখের দিকে।

গাড়ি যত এগোয়, ফেরিওলার সংখ্যাও ঘেন তত বৃদ্ধি পায়। এক এক কামরায় তিন-চারজনও একসঙ্গে ওঠে। এ ঘেন অক্ষরন্ত ভাঙার। কি না পাওয়া যায় গাড়ির মধ্যে!

বই পড়তে পড়তে বিরক্তি ধরে জগদীশের। যখনই গোয়েন্দার হাতে আসারী ধরা পড়োপড়ো, অমনি নতুন ফেরিওলায় উৎপাত! মনে হয়, সারা বড়বাজারের ফুটপাথটা ঘেন একজোটে ফেউ লাগার মত খার্ড ক্লাসের বাত্মীদের পিছনে তাড়া করেছে। কম ভাড়া দেবে, আবার মনের শান্তিতে ভ্রমণ করবে—এটা যে রেল কোম্পানি চায় না তার প্রমাণ এই ফেরিওলারাই যথেষ্ট। ছারপোকায় দংশন বোধ হয় এর চেয়ে সহস্রগুণ ভাল।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এর ওপর যখন উঠল একজন নীলামণ্ডালা, তখন জগদীশের সর্বাঙ্গ জ্বালা ক'রে উঠল। গায়ের জামা, টর্টলাইট, তালচাবি, আয়না, ফাউনটেনপেন, চশমা প্রভৃতি হরেক জিনিস সে নীলাম ক'রে বিক্রি করতে লাগল। তবে তার এই নীলামের একটু বিশেষত্ব ছিল।

ডাক উঠলেই কিন্তু সে জিনিস দিতে বাধ্য থাকবে না। ডাক যদি জিনিসের ভায়া মূল্য, মানে—কেনা দামে পৌছয় তবেই দেবে। নচেৎ যারা সর্বোচ্চ ডাক তুলবে তাদের ক্ষতিপূরণস্বরূপ সে বিনামূল্যে কোন কিছু উপহার দেবে। প্রথমেই একটা সাদা কাপড়ের প্রমাণ পাঞ্জাবি সে ডাক তুললে। এতেও কিন্তু সেই দেহাতীদের কেউ কেউ অংশ গ্রহণ করলে। তবে দাম দু'টাকার বেশি আর উঠল না। দেখে ক্ষতিপূরণস্বরূপ সে কাউকে একখানা চার পয়সার খাতা, কাউকে বা একটা চার পয়সার আয়না উপহার দিলে। লোকটি কিন্তু এখানেই ক্ষান্ত হ'ল না। আবার সেই পাঞ্জাবির সঙ্গে একটা ছোট টর্চ, একটা পিতলের হার আর একটা চশমা একসঙ্গে নীলামে তুললে। বলা বাহুল্য ডাকটা দেখতে দেখতে একেবারে উঠে গেল পাঁচ টাকায়। পাঁচ এক—পাঁচ দুই—পাঁচ তিন—ক'রে সেই জিনিসগুলি তখন নীলামণ্ডালা একটু দেহাতীর গায়ের ওপর কেলে দিয়ে বললে, দাও, টাকা দাও।

এটি একটি অল্প বয়সের ছোকরা। বাজের ওপর মালপত্রের সঙ্গে ব'সে ছিল খালি গায়ে। সে তার গৌজ খুলে আনি, দুয়ানি ও পয়সায় মিলিয়ে চার টাকা চার আনা গুনে গুনে দিলে তার হাতে, তারপর তার দলের অপর একজনের কাছ থেকে আরও বারো আনা ধার ক'রে বাকিটা চুকিয়ে দিলে।

পরের স্টেশনে লোকটি নেমে যেতে অপর যাত্রীরা অনেকেই বিক্রার দিলে সেই ছোকরাটিকে। বললে, একেবারে তোকে সোঁজা পেয়ে ঠকিয়ে গেল। কি আছে এই জিনিসগুলোয়। কলকাতায় রাস্তার ধারে এই টর্চ, চশমা, আর পিতলের হারগুলো চার চার আনা ক'রে বিক্রি হয়। আর এই পাঞ্জাবিটার দামও খুব বেশি হ'লে তিন টাকা। বড়বাজারের রাস্তায় হরদর বিক্রি হচ্ছে!

সেই দলের সকলেই তখন এক-একবার ক'রে সেই জিনিসগুলো হাতে নিয়ে বিজ্ঞের মত পরীক্ষা ক'রে দেখে আবার ফিরিয়ে দিলে যার জিনিস তাকে। জগদীশবারু মনে মনে অত্যন্ত খুশি হলেন। বেশ হয়েছে। উপযুক্ত শাস্তি, যেমন সব জিনিস ডেকে দাম করতে যাওয়া। সত্যি, এ একেবারে দিনে ডাকাতি থাকে বলে। জিনিসগুলো এত খেলো যে সব মিলিয়ে সাড়ে তিন টাকাও দাম হবে কি না সম্ভেহ।

কিন্তু সবচেয়ে বিশ্বাসের কথা এই, যে কিনলে সে একেবারে নির্বিকার, তার মুখের কোথাও একটি রেখারও পরিবর্তন ঘটল না। টিনের তোবড়ানো একটা স্ট্রাকেস খুলে তার মধ্যে জামা-টর্চটা সে ভরে রেখে ছোট্ট একটা আয়না বার ক'রে সকলের চোখের ওপর টেরি কাটতে লাগল।

জগদীশ এই পর্যন্ত দেখে নিজের রহস্যরোমাঞ্চ কাহিনীতে আবার মন দিলে।

এ ট্রেনটা বর্ধমানের পর থেকে মেল হয়ে যায়। সব স্টেশনে থামে না। ছুটে চলে হু-হু ক'রে দিগ্বিদিক কাপিয়ে।

দুপুরের দিকে গাড়ির একটানা শব্দে যখন সকলের চোখে বেশ একটা ঘুমের আমেজ লেগেছে তখন হঠাৎ গানের সুর কানে আসতে জগদীশ বই থেকে মুখ তুলে দেখে, সেই ছোকরাটি চোখে সেই চশমাটা লাগিয়ে, পেতলের সেই হারটা গলায় প'রে, ছোট্ট আয়নাটা মুখের কাছে তুলে ধ'রে গুনগুন ক'রে গান গাইছে আর নিজেকে নিরীক্ষণ করছে।

অ্যাস্চর্য, লজ্জার বালাই কি নেই এদের! এখনও এক ঘন্টা হয় নি, এতগুলো পয়সা যার গালে বলতে গেলে চড় মেরে ঠকিয়ে নিয়ে গেল, তার মনে এ উল্লাস আসে কোথা থেকে! যুবকটিকে অনেকক্ষণ তেমনি তন্ময় হয়ে থাকতে দেখে জগদীশ মনে মনে ঝ'লে ওঠে, এত অপমানও যাদের চৈতন্ত হয় না, তাঁরা কি মাছ! ঠিক হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আবার দ্বিগুণ প্রতীহিংসার আনন্দে তার মন পূর্ণ হয়ে যায়।

পাহাড় স্টেশনে গাড়ি এসে থামতেই জগদীশ নেমে

পড়ল বটে, কিন্তু তার ঠিক পেছনে হৈ-চৈ চৌচামেচি ও গোলমাল করতে করতে সেই দেহাতীর দলটি মালপত্রের বোঝা নামাতে লাগল। তারা যে ওইখানেরই কোন পাথরের কোয়েরিতে কাজ করে, ছুটি নিয়ে দেশে ধান কাটতে গিয়েছিল, তা জগদীশ জানত না।

জগদীশের ওখানে এই প্রথম আসা। তার এক বন্ধু পাথরের ব্যবসা করে অল্প দিনের মধ্যেই বেশ শুছিয়ে নিয়েছিল। পাহাড়ের কোলে বাংলো, ফুলবাগান, মোটর গাড়ি, মুরগীর পাল। তারই আমন্ত্রণে কয়েকটা দিন সে বিশ্রাম নিতে এসেছিল।

পরদিন বন্ধুর সঙ্গে কোয়েরিটার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে সহসা একটি কুলি-যুবতীকে দেখে সে থমকে দাঁড়াল। মাথায় পাথরের কুড়ি নিয়ে সে নেমে আসছিল পাহাড়ের ঘোরানো পথ দিয়ে একেবেকে। বোধ হয় হো কি মুণ্ডা জাতীয়া হবে। কিন্তু অপূর্ব লাবণ্যময়ী, যেন কষ্টপাথরে খোদাই করা ভেনাস্ মূর্তি।

সিগারেটের ধোঁয়া ঠোঁটের কোণে ঝাঁকিয়ে ছাড়তে ছাড়তে জগদীশ বললে, তোদের কোন বিউটির সেন্স নেই—নইলে এই দুর্লভ রত্নকে কেউ এইভাবে নষ্ট হতে দেয়।

তুই কি মীন করছিস, জানি। কিন্তু সাবধান ভাই, ওদিকে নজর দিতে যেন যাস নি। ও একেবারে সাক্ষাৎ কালনাগিনী। ওর কাছে যেসে কার সাধ্য। বলে চুপি চুপি যা বললে, তার অর্থ হচ্ছে এই যে অনেক খুনোখুনি, মারামারি, পুলিশকেন্স হয়ে গিয়েছে ওকে নিয়ে। পরসার লোভ দেখিয়ে বা অস্ত্র কিছু দিয়েই কেউ আজ পর্যন্ত ওর মনোহরণ করতে পারে নি। তা ছাড়া কোন কোন ধনী মহাজনের শিক্ষিত শালা, ভাইপো মোটরে করে কলকাতা থেকে এসে ওর ওপর লোভ দিতে গিয়ে কি ভাবে অপমানিত

হয়ে ফিরে গেছে সে-সব কাহিনী বলতে বলতে জগদীশকে নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এল বন্ধুটি। কিন্তু তবু জগদীশ ভুলতে পারে না সেই মেয়েটিকে। সব সময় তার চোখের ওপর যেন ভাসে সেই মূর্তিটি! বিশেষ করে বিকেলে বেড়াতে বেরবার সময় বন্ধুর দেওয়াল-জোড়া আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঝাঁচড়াতে ঝাঁচড়াতে নিজের জগতিত স্বন্দর চেহারাটার দিকে তাকিয়ে সহসা যেন ক্ষুধার্ত সিংহের মত জলে ওঠে তার চোখ দুটো।

বেড়াবার ছল করে জগদীশ খোঁজে সেই দুর্লভ রত্নটিকে। কোন পাহাড়ের বুকে কোথায় তার ঘর অহুসন্ধান করে গোপনে। ভোর হতে তর সময় না, ও ভাল পোশাক এঁটে প্রাতঃস্নানপের নাম করে বেরিয়ে পড়ে। ওদিকে তেমনি সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যাবার অনেক পরে বাড়ি ফেরে।

সেদিন তখনও ভাল করে করসা হয় নি, জগদীশ শাল-বনের মধ্যে দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে অনেক দূরে গিয়ে পড়েছিল। ক্লান্ত হয়ে একটা পাথরের ওপর বসে বিশ্রাম নিচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ একটা হাসির তরঙ্গে সে সচকিত হয়ে উঠল। পিছনে ছিল একটা মহম্মার জল, তাড়াতাড়ি সেদিকে তাকাতেই তার চোখ দুটো যেন জ্বালা করে উঠল। দেখে, ছোট্ট একটা কুঁড়েঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সেই দেহাতা যুবকটি, তার গায়ে সেই নীলামে কেনা পাঞ্জাবি, চোখে সেই চশমা, হাতে সেই টর্নলাইটটি—আর তার কাঁধের ওপর হাত রেখে হাসছে সেই কষ্টপাথরে খোদিত ভেনাস্ মূর্তি—তার গলায় সেই পিতলের হার।

জগদীশ সে দৃশ্য আর সহ্য করতে পারলে না। চোখটা বুজে ফেললে। তার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত যেন তখন জ্বলছে, কালনাগিনীর বিষে, না, অপমানে, সেই জানে।



পাখি এক ঝাঁক

কুমুদ ভট্টাচার্য

এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেল।

ছোট ছোট কালো কালো পাখি এক ঝাঁক।

কী নাম ও-পাখিদের নেই মোর জানা।

নাম যা-ই হোক—

নাম কিছু থাক না-ই থাক,

এক ঝাঁক ছোট ছোট পাখি কালো কালো

উড়ে উড়ে চলে গেল আকাশের পথে—

ঘরের সমুখ-পথে মোর।

কোথা হতে এল যে পাখিরা।

উড়ে উড়ে ভেসে ভেসে গেল-যে কোথায়।

তবুও যাবার পথে

গেল ওরা মোর ঘর ছুঁয়ে,

একটি মুহূর্ত 'পরে

ফেলি ছায়া চলমানতার।

তবু গেল মোরে ছুঁয়ে ছুঁয়ে

অসীম আকাশ-পথে বিচরণশীল

একটি পাখির ঝাঁক শুধু।

সব কটি পাখি মিলে একটি সে ঝাঁক

একটি পাখির মত হয়ে

উড়ে উড়ে চলে গেল

ছোট ছোট পাখা ঝাপটিয়া।

পাখিদের পক্ষ-বিধুননে

কেন যে পড়িল মনে

তোমারেই—হে বিধু-আননা।

তুমিও তো আমার জীবনে

একটি পাখির মত

এসেছিলে অতিথি কণিকা

গৃহকোণে দণ্ড দুই কাটাবার ছলে।

বঁসে ছিলে উজ্জলিয়া বাতায়নতল,

মেতেছিলে কুঞ্জে গুঞ্জে,

ভা'রে দিয়েছিলে ঘর

কলহাস্তে স্বর-সুধমায়।

একটি সে পাখি তুমি—

তুমি সেই দিন

একা হয়েছিলে এক ঝাঁক।

একটি পাখির মত উড়ে এসে ঘরে

উড়ে ফের গেলে যে কোথায়।

সেদিন যাবার মুখে শুধু মনে পড়ে

সিয়েছিলে ডেকে ডেকে হাওয়ার পাখায়—

আয়, সাথে আয়।

আজ্ঞো এই পাখিদের পক্ষ-সঞ্চালনে

গুঢ় কি সঙ্কেত ছিল কোনো।

তারাও কি আনবার ডেকে গেল মোরে—

আয় আয় আয়,

ভানার ভাষায়।

তারা কি তোমারি দূতী

সন্ধান কি চেয়েছিল দিতে

বাঁধিয়াছ কোথায় কুলায়।

সেদিন তোমার ডাক কেঁদে গেল ফিরে,

আজ্ঞো ব্যর্থ হয়ে রয় পাখিদের ডাক,

আমি আজ্ঞো তেমনি নির্বাক।

এই গ্রন্থের কলন

দীপক চৌধুরী

ষষ্ঠ বার্তা

কাল তোকে লিখেছিলাম যে, আমার বাড়ির ভাড়া-ঘরে ইতিহাস তৈরি হচ্ছে। আশা করি, হালকা রসিকতা ভেবে কথাটাকে উড়িয়ে দিস নি। উড়িয়ে দেবার মত কথা এটা নয়। কেবল ভাড়া-ঘরে কেন, এ বাড়ির সর্বত্রই বুরি প্রতি মুহূর্তে ইতিহাসের তথ্য পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে! এ ইতিহাস পতনের, উত্থানের নয়। ভারতবিশ্বাত্মক ঐতিহাসিক ভক্তের যাদব মিত্রের সাম্রাজ্যে সবাই মৃত। দোতলার লাইব্রেরি-ঘরে বসে তিনি বিগত দিনের রাজ্য-বাদশাদের কাহিনী লেখেন। মৃত-দেহের কাহিনী। কাহিনীর মধ্যে কোথাও একটি ভুল নেই। তারিখ এবং তথ্যের তালিকায় অধ্যাপক যাদব মিত্রের নিভুল-গবেষণা নিরক্ষর ভারতবাসীর কাছে ছিল গর্বের বিষয়। কলকাতায় আসবার কদিনের মধ্যেই আমি বুঝতে পারলুম যে, তিনি সম্রাট ও সম্রাটের দরিদ্র দিন-রাত ভেঙ্গে বেড়াচ্ছেন। সাহিত্য-সভা থেকে শুরু করে লাট সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত তাঁকে ছুঁটাছুঁটি করতে হয়। তিনি ব্যস্ত, চব্বিশ ঘণ্টাই তিনি কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই তিনি নেমে আসেন নীচে। আমার ঘরের কাছে এসে অত্যন্ত যত্ন গলায় ডাকেন, জয়া, জয়া, ঘুমচ্ছিস. নাকি ?

না, মামা। আসছি।

জগদ্বাবুর বাজারে গিয়ে পৌঁছতে আমাদের মাত্র পাঁচ মিনিট লাগে। কিছু তরকারি আর আধ সের মাছ কিনতে আমার সময় লাগে প্রায় এক ঘণ্টা। প্রত্যেকটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি দাম নিয়ে মেছোদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করেন। অর্থশাস্ত্রের 'চাহিদা ও আয়দানী' আইনটি আমার মুখস্থ ছিল বলে তিনি বাজারে এসে মেছোদের সঙ্গে তর্ক করে জেতবার চেষ্টা করতেন। প্রায় প্রত্যেক দিনই হয়তো তাঁরই জিত হ'ত, কিন্তু মাছের দাম তাতে এক পয়সাও কমত না।

আমি আসবার আগে মামা নিজেরই বাজার করে নিয়ে আসতেন। বাড়িতে তাঁর চাকর ছিল না। ঝি ছিল একজন সারাদিনের জন্তে। মাঝে মাঝে তিনি নামীনাথকে বাজারে পাঠাতেন। কিন্তু তিনি ওর ওপর নির্ভর করতে পারতেন না। মামার ধারণা ছিল যে, নিরক্ষর লোকেরা সংসারের সর্বত্রই ঠকে। জগদ্বাবুর বাজারের মত একটা সাংঘাতিক জায়গায় নামীনাথ যে ঠকে এসেছে, সে সম্বন্ধ মামার কোন সন্দেহই থাকত না। তা ছাড়া নামীনাথ তো ইকনমিক্সের কোন আইন জানে না, অতএব সে তো ঠকবেই।

মামা আমার বাজারে নিয়ে যেতেন। সওদা যা কিনতেন, আমরা দুজনে তা ভাগ করে বাড়ি পর্যন্ত বয়ে নিয়ে আসতুম। বাজারে যাওয়ার পথে মামা প্রত্যেক দিনই আমার বলতেন, নিজেকে খাবার নিজেরা বয়ে নিয়ে আসব, তাতে লজ্জার কি আছে ?

লজ্জা ? লজ্জা কেন মামা ?

ওই তো আত্মকালকার ছেলেরা সব বাজারে যেতে লজ্জা পায়। ভাড়াটে লোক দিয়ে কখনো বাজার করানো চলে ?

না, তা চলে না। কিন্তু কোন্ ছেলেরা বাজার করতে চায় না মামা ?

আরে, ওই তো তোর নন্দদার কথা বলছি। ছেলেটা বেলা আটটা পর্যন্ত ঘুমোয়, অথচ বাজারে যাওয়ার নাম করলেই আত্মসম্মান নাকি সব তার গলে যায়! জয়া, তুই মেয়ে না হয়ে যদি ছেলে হতিস ?

মেয়ে হয়েছি বলে তোমাদের কোন অসুবিধে হচ্ছে নাকি ?

না না, তোর মত এমন কাজের মেয়ে বাংলা দেশে বোধ হয় আর একটিও নেই।

নেই ? হয়তো এক গাধা আছে, তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি।

আমার মুখের দিকে চেয়ে ডক্টর যাদব মিত্র সহসা হেসে ফেললেন।

ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে একদিন পাঁজি দেখছিলুম। সব চেয়ে কম দাম দিয়ে পাঁজিখানা মামা কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথ থেকে কিনে এনেছিলেন। তিনি একদিন আমায় বললেন, জয়া, আজ আর আমরা মাছ কিনব না।

কেন মামা?

বাজারে আজ মাছের দাম বাড়বে। চাহিদার চেয়ে আমদানি হবে কম। বিয়ের তারিখ কিনা। পাঁজিটা এবার থেকে তোর কাছেই থাকবে। বিয়ের তারিখগুলো আমায় অরপণ করিয়ে দিস। বুঝলি?

বুঝেছি।

সেই থেকে সকালবেলা উঠে প্রতিদিন আমায় পাঁজি দেখতে হয়। একদিন ভুল ক'রে পাঁজি দেখতে পারি নি। কিন্তু বাজারে পা দিয়েই মামা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, পাঁজি দেখতে ভুল করিসনি তো?

ঠিকই দেখেছি।—সন্ডয়ে জবাব দিলুম আমি।

মনে হচ্ছে আজও বিয়ের তারিখ আছে।—এই ব'লে মামা মাছের বাজারে গিয়ে ঢুকলেন। মাছ সেদিন সত্যিই খুব আক্ৰা ছিল। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি আমায় বেশ খানিকটা রাগের স্বরেই বললেন, তুই মিছে কথা বলছিস জয়া।

কেন মামা?

হয় তুই পাঁজি দেখিস নি, নয় তো পাঁজি ভুল। আজ নিশ্চয়ই বিয়ের তারিখ।

আমি জবাব দিলুম না। দোকানীই আমার কথা শুনে বললে, আজ, আজ যে জামাই-বধী। সেই জন্তই জিনিসপত্র সব আক্ৰা।

দোকানীর কথা শুনে মামা প্রায় বাজার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন।

সর্বনাশ করেছে! আজ তো তা হ'লে কোন জিনিসেই হাত দেওয়া যাবে না জয়া। তোর মামীমাকে বলিস, আজ আমরা সব আলুভাতে আর পাটনার মুহুর ডাল দিয়ে ভাত খাব। মুহুর ডালের সবটুকুই তো প্রোটিন। ওং, তুই তো আবার প্রোটিনের মানে জানিস না! এই ব'লে মামা

খুব তাড়াতাড়ি ক'রে হাঁটতে লাগলেন তরকারির বাজারের দিকে।

আমি বললুম, আমরা সবাই তো প্রোটিন খেতে ভালবাসি, কিন্তু নন্দদার বড় অসুবিধে হবে।

কেন?—মামা মুখ ভেঙে জিজ্ঞাসা করলেন, নন্দবাবু প্রোটিন খেতে ভালবাসেন না কেন?

নন্দদা সাহেবদের ইস্কুলে পড়ে। তাই সে সাহেবী খাবারই পছন্দ করে।

আমার কথা শুনে আলুর দোকানের সামনে দাঁড়িয়েই মামা পাগলের মত হাসতে লাগলেন। দু দিকেই আলুর দোকান। আলুওয়ালারা সবাই আমার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে ব'সে ছিল। আমি বড় অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগলাম। হাসি থামছে না দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি এত হাসছ কেন মামা?

হাসতে হাসতে মামা জবাব দিলেন, ওরে বোকা মেয়ে, প্রোটিন তো খাস বিলেত থেকেই আমদানি। নন্দ তবে মুহুর ডাল খেতে ভালবাসে না কেন?

মামার প্রশ্নের আমি কোন জবাব খুঁজে পেলুম না। 'সাহেব' এবং 'বিলেত'—এই দুটো কথার প্রতি মামার ছিল অপরিণীম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার পরিমাণ যে কত বেশী ছিল সেটা বুঝতে আমার খুব বেশী সময় লাগে নি। ধুতি চাদর প'রে মামা কলেজে পড়াতে যেতেন বটে কিন্তু আমি জানতুম যে, একজন পাকা সাহেব ঐ ধুতি চাদরের তলায় লুকিয়ে আছেন। কিছুদিন আগেই তো গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন শেষ হয়েছে। নন্দদার কাছে শুনেছি যে, মামা নাকি সেই সময় নিজের লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে গান্ধীজীর নিবুদ্ধিতা সম্বন্ধে দিনরাত বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন। ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা খুবই কম ছিল ব'লে তিনি বক্তৃতা দিতেন ক্লাসের বাইরে। ইংরেজ কোম্পানি পরিচালিত খবরের কাগজে তিনি প্রতি সপ্তাহে একটা ক'রে প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর প্রশ্ন ছিল যে, রাজনীতির ঘোলা জলে যদি ছাত্র-সমাজ ডুবে যায় তা হ'লে ভারতবর্ষের মুক্তি হবে কি করে?

হরিশ মুখার্জি রোডে তিনটে মাস কেটে গেল, কিন্তু ইস্কুলে ভরতি করবার জন্তে মামার কিংবা মামীমার কোন আগ্রহ দেখা গেল না। ঘুম থেকে উঠে মামার সঙ্গে

বাজারে যাই। ফিরে এসে মামীমার ফুটফরমাস খাটি, মাছ এবং তরকারি সব কেটেকুটে দিয়ে নানীনাথকে বুঝিয়ে দিতে আমার প্রায় দু'ঘণ্টা লাগে। আমি আসবার পরে, মামীমার শরীর আরও খারাপ হয়েছে। বেলা আটটা পর্যন্ত তিনি বিছানায় শুয়ে থাকেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে কোলের বাচ্চাটাও ঘুমোয়। আমি আসবার পর নন্দলা ও রমারও নাকি ঘুমের নেশা বেড়ে গেছে অত্যন্ত বেশী পরিমাণে। রান্নাবান্নার কাজ সব নানীনাথকে বুঝিয়ে দিয়ে নন্দদার ঘরের বাইরে থেকে আমি ডাকি, নন্দলা, বেলা আটটা বেজে গেছে। সেখান থেকে ঢুকে পড়ি মামীমার ঘরে। রমাকে ভুলে দিয়ে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে ঘর থেকে যখন বেরিয়ে আসব, মামীমা তখন বলেন (প্রায় প্রত্যেক দিনই বলেন), ধোকনের বিছানাটা নিয়ে যা। ধুয়ে দিস। আমি যেন ভুলে গিয়েছিলাম (প্রত্যেক দিন ইচ্ছে করেই ভুলে যেতাম), এমন ভাব দেখিয়ে বললাম, ওঃ, ই্যা, নিয়ে যাচ্ছি। ধোকনবাবু তো বিছানাটা ভিজিয়ে রেখেছেন দেখছি।

সেদিন সকালবেলা নন্দদার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তিন-চারবার ডাকলুম, কিন্তু তার সাড়া পেলুম না। দরজাটার হাত লাগাতেই দেখি যে, দরজাটা খুলে গেল। বিছানায় শুয়েই নন্দলা ডাকল, জয়া, এদিকে আস।

তুমি জেগে আছ না-কি? রাজিতে দরজা বন্ধ করো নি?

না।

কেন? তোমার ভয় করে না নন্দলা?

না।

বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই নন্দলা আমায় একটা হেঁচকা টান দিয়ে বসিয়ে দিল খাটের ওপর। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলুম না। আমি তাই জিজ্ঞাসা করলুম, কি চাই তোমার, নন্দলা?

আমার কথার জবাব না দিয়ে সে এক দৃষ্টিতে চেয়ে বসেছিল আমার দিকে।

বিছানায় বসে হঠাৎ কেন যেন আমি ভবতোষের কথা ভাবতে লাগলুম। তিন মাস হয়ে গেছে, ভবতোষের কাছ থেকে একটা চিঠিও পাই নি। ডাক-টিকিটের অভাব ঘটতে পারে বলেই আমি তাকে দশটা টাকা পর্যন্ত

দিয়ে এসেছিলুম। মাছ পুষ্কর হয়ে জন্মালেই কি অকৃতজ্ঞ হয়? বারো বছর বয়স থেকে পুষ্করমাছের কেবল একটা চেহারা ই আমি দেখে আসছি। রত্না, তোরা তো পুষ্কর-গুলোকে পূজা করিস, স্বামীর ফোটোখানা তোর পূজোর ঘরে টাঙানো আছে আমি দেখে এসেছিলাম। তোর চাকরের মুখে শুনেছি, সকাল-সন্ধ্যা দরজা বন্ধ করে তুই নাকি স্বামীর ফোটো পূজা করিস দু'বেলা মিলিয়ে চার ঘণ্টা। এ পূজা কেন? তোরা শাস্ত্র-শক্তির পূজা তোদের পুণ্যসঙ্ঘের প্রিয়তম পথ—সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। স্বামীর ফোটোখানা কালীর ফোটোর পাশেই টাঙিয়ে রাখার অর্থ কি? শক্তি ভিক্ষা করছিস কার জন্তে? স্বামী তো তোর স্ত্রীনাথ, সকাল বিকেলে নিজের বুক চিরে কালীর পায়ে দু'ফোঁটা রক্ত দান করেন। মাসিক দু'হাজার টাকা মাইনে না পেলে তিনি এই দু'ফোঁটা রক্তের লোকমান কিছতেই পূরণ করতে পারতেন না। তোর স্বামীর মত ভাগ্য কখন বাঙালীর আছে, বল? তা ছাড়া বুক চিরলেই সব বাঙালীর বুক দিয়ে যে রক্ত বেরয় না সে খবর তো তোরা কেউ রাখিসও না। কিন্তু আমাকে বাঙালীর বৃকের খবর রাখতে হয়েছে। বিশেষ করে পুষ্কর জন্তুগুলোর বৃকের খবর যদি আমি না রাখতুম, তা হ'লে কাশিয়ংয়ের উচুতে উঠে আছ আমি তোকে এ চিঠি লিখতে পারতুম না। রত্না, ভাবছিস, তোর স্বামীকে নিয়ে আমি ঠাট্টা করছি? না যে বোকা মেয়ে। তোর স্বামী কি আমার ঠাট্টার পাত্র? বিলিভী রেড দিয়ে বুক চিরে তিনি কালীর পায়ে রক্ত দান করছেন কেন? আরও মাইনে বাড়বে ব'লে? না, দু'হাজারের অঙ্কটাকে ধ'রে রাখবার জন্তে? মাসিক দু'হাজার টাকার সৌভাগ্য তোর স্বামীর প্রক্ষেপ কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। রাগ করিস নে রত্না, তোর আগে আমি তোর স্বামীকে চিনতুম। আমার বিশ্বাস, তিনি হয়তো বৃকের রক্ত দান করে পুরনো পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছেন। চমকে উঠছিস কেন? তাঁর জন্তে যদি কারো নিজের বুক ভেঙে গিয়ে থাকে, তা হ'লে কি তিনি তাঁর দু'ফোঁটা রক্ত নষ্ট করতে পারেন না? পারেন, অবশ্যই পারেন। গল্পের মাঝখানে হঠাৎ তোকে এমন করে চমকে দিলুম ব'লে আমায় তুই ক্ষমা করিস। কিন্তু আমার তো ভাই কোন উপায় ছিল না। একদিন না একদিন তোর

স্বামীর কথা তোকে বলতেই হ'ত। একদিন তোকে বলব নিশ্চয়ই। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত, আমি আশা করি, তোর স্বামী-দেবতার ফোটোখানা যেন ঠাকুর-ঘরেই টাঙানো থাকে।

একটু আগেই ভবতোষের কথা ভাবতে গিয়ে নন্দদার বিছানার ওপর কতক্ষণ যে নিঃশব্দে ব'সে ছিলুম আজ আর তা মনে নেই। ঋনিকক্ষণ পরে নন্দদা আমার হাতের ওপর চাপ দিয়ে বললে, তুই কিন্তু বেশ ভালই আছিস জয়া।

কেন?

তোর তো আর লেখাপড়ার ঝঙ্কি নেই।

লেখাপড়ার কথা উল্লেখ করতেই আমার চোখ ভেঙে জল আসবার উপক্রম। গত তিন মাসের মধ্যে লক্ষ্মীর পাঁচালী ছাড়া আমার আর কিছু পড়বার সুযোগ আসে নি। আমি এখানে আসবার আগে মামীমা নিজেই পড়তেন। কিন্তু বানান ক'রে পড়তে হ'ত ব'লে তাঁর পূজো শেষ করতে সময় নিত অনেক। পূজো না করলে যে হিন্দুদের পাপ হয় তেমন মন্তব্য আমি মামীমার কাছে প্রত্যেক দিনই শুনতুম। কিন্তু বেশীক্ষণ পূজো করতে বসলে যে মামীমার কোমরে ব্যথার আক্রমণ তীব্রতর হ'ত সে সংবাদ তিনি না বললেও আমি জানতাম। অতএব আমি আসবার পরে তিনি পাঁচালী পড়বার কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি পেলেন। এবং সুন্দর ক'রে পাঁচালী পড়বার গুণের জন্তে মামীমা যে আমার ভাললোকের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারবেন তেমন প্রতিশ্রুতি আমি তিন মাসের মধ্যে ত্রিশবার পেয়েছি।

তিনি বলতেন, হিন্দুদের পূজো-আচ্চা নিয়ে থাকাই হচ্ছে ধর্ম। মামা কাছে থাকলেও তিনি মামীমার কথার কোনদিনও প্রতিবাদ করতেন না। উপরন্তু, মামা যেন মামীমার কথায় সমর্থন করতেন ব'লে মনে হ'ত। মামীমার মন্তব্য শুনে আমি একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, পাঁচালী পাঠ করলেই যে ধর্মপালন করা হয়, তেমন যুক্তি কি সত্যি?

আলবৎ সত্যি।—মামীমা তেড়ে উঠে জবাব দিলেন।

তা হ'লে গত তিন মাস থেকে তুমি কিন্তু ধর্ম পালন কর নি মামীমা।

কেন?

কারণ, পাঁচালী পাঠ করছি আমি।

পূজো-আচ্চার কথা নিয়ে তুই কি ঠাট্টা করছিস না-কি জয়া?

এমন কথা ব'লো না, মামীমা। ঠাট্টা যে কি জিনিস আমি তা জানি না। জন্ম থেকে এই বারো বছর বয়স পর্যন্ত ঠাট্টার কথা শোনবারও সুযোগ আমি পাই নি। কেবল তোমার কথা শুনলেই মনে হয়, তুমিই আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ—কেবল তুমি নও, তোমরা সবাই।

ধার্মিক মামীমা রাগে ধরধর ক'রে কাঁপতে লাগলেন। কাঁপতে কাঁপতেই তিনি প্রশ্ন করলেন, ঠাট্টার কথাটা কি শুনি?

সত্যি কথা বলতে কোনদিনও আমি ভয় করতে শিখি নি। অতএব আমি বললুম, আমাকে দিয়ে পাঁচালী পাঠ করিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করছ তুমি এবং তোমরা। এটা ঠাট্টা নয় তো কি? মামীমা, আমি তোমাদের বাসন মেজে দেব, খোকনের রাতের বিছানা ধুয়ে দেব, তোমার কোমর টিপে দেব, বাজার ক'রে দেব, আর যা যা বলবে সব ক'রে ক'রে দেব। আমি পুণ্য চাই নে, ধর্ম চাই নে—

কি চাস, বজ্জাত মেয়ে? বাধা দিয়ে মামীমা ধমকে উঠলেন।

পড়তে চাই, পাঁচালী নয়, ইঙ্কুলে।

আমার মুখ থেকে এতবড় অধর্মের কথা শুনে মামীমা পুনরায় প্রশ্ন করলেন, পাঁচালীর চেয়ে ইঙ্কুলের বই বড় হ'ল?

হ্যাঁ। বড়মামাকে দেখেও কি দেটা তুমি বুঝতে পারছ না, মামীমা?

পুরুষমাতুলদের কথা ছেড়ে দে। ওরা বাইরে বাইরে ঘোরেন ব'লে সংসারের অনেক কাজই করতে পারেন না। কিন্তু মেয়েদের তো তেমন অজুহাত দেওয়া চলে না। মেয়েদের ধর্মকর্মে মন না থাকলে পৃথিবীটা যে বাসের অযোগ্য হয়ে উঠবে, জয়া? পুরুষদের সাতখুনও মাপ।

তারপর অনেক দিন কেটে গেছে। বয়সও বেড়েছে আমার। কিন্তু মামীমার এই কথাগুলো কোনদিনও মন থেকে মুছে যায় নি। কেন যে পুরুষদের সাতখুনও মাপ, তা আমি ভাই-আজ্ঞাও বুঝতে পারি না। হিন্দুসমাজে

ধর্ম পালন করা কি কেবল মেয়েদেরই কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়? বড়মামাকে আমি কোনদিনও পূজো-আচ্চা করতে দেখি নি। পূজো-আচ্চার প্রতি মামার যে বিন্দুমাত্র আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল, তেমন বিশ্বাস আমার কোনদিনই হয় নি। অথচ বাইরের আড়ম্বর বজায় রাখবার জন্তে তিনি কী না করতেন! হিন্দুদের দেবদেবীদের নিয়ে কেউ যদি কখনো ঠাট্টা করত, তা হ'লে মামা তার সঙ্গে কলেজ কামাই ক'রেও তর্ক করতেন। তর্ক ক'রে তিনি বোঝাতে চাইতেন যে, তাঁর মত সং-হিন্দুর সংখ্যা ভারতবর্ষে বড় কম নেই। অথচ মামীমা যখন পূজো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকতেন, বড়মামা কখনো ভুল ক'রেও একবার ঠাকুর-ঘরে উকি দিয়ে পুণ্য সঙ্ঘের চেষ্টা করতেন না। বরং তাঁর কথাবার্তা শুনলে মনে হ'ত যে, পূজোপার্বণ ইত্যাদি ব্যাপারগুলো মেয়েদের কাজ বলেই তিনি বিশ্বাস করতেন। আমি তো মামার সঙ্গেই বাজারে যেতুম। পূজোর জন্তে তিনি সবচেয়ে কম দামের জিনিস কিনে নিয়ে আসতেন। কলা কিনতেন দু-তিন ইঞ্চির চেয়ে লম্বা নয়। খোসা ছাড়াতে গিয়ে তিন-চারটে কলা নষ্ট হয়ে যেত। শসা কিনতে গিয়ে মামা বেছে বেছে সবচেয়ে খারাপ শসা কিনতেন নামমাত্র মূল্যে। বাড়ি ফেরবার মুখে মামাকে একদিন আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম, যে-সব জিনিস আমরা নিজেরা খেতে পারি নে, তা কি ঠাকুর-দেবতাকে দেওয়া যায় মামা?

মামা তখন রসা বোভ পার হচ্ছিলেন। রাস্তার ও-পারে গিয়ে তিনি বললেন, এসব জিনিস থেকে তো প্রসাদ তৈরি হবে। প্রসাদের কোন কোয়ালিটি থাকে না। উনোনের ছাই যদি কেউ প্রসাদ বলে নিয়ে আসে, তবে তাও ভক্তির সঙ্গে বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু তুই এসব ধর্মের কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস কেন? তুই বুঝতে পারবি নে।

কেন মামা?

আমরা তখন প্রায় বাড়ির কাছে এসেই পড়েছি। বাইরের ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে মামা বললেন, এসব কথা বুঝতে হ'লে লেখাপড়া শিখতে হয়। তুই তো লেখাপড়া করিস না জয়া।

সে কি মামা, আমি তো লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়ি।

একটু হেসে বড়মামা ডক্টর যাদব মিত্র বাড়ির মধ্যে ঢুক পড়লেন। এ সম্বন্ধে তিনি আর আলোচনা করলেন না।

আজ আবার নন্দদা ভোরবেলায়ই আমায় বললে যে, আমি বেশ ভালই আছি। কারণ, আমার লেখাপড়ার কোন ব্যক্তি নেই। নন্দদার কথা শুনে আমি আর চোখের জল ক্লেষে রাখতে পারলুম না। লেখাপড়া করতে পারছি নে বলেই যে দুঃখের বোঝা আমার প্রতিদিন অসহনীয় হয়ে উঠছে, তেমন কথা হরিশ মুখার্জি বোডের কাকে আমি বোঝাই বল? ঘর বাঁট দেওয়া কিংবা বাসনকোসন মাজাই তো আমার একমাত্র কাজ নয়! আমার চোখে জল দেখতে পেয়ে নন্দদা জিজ্ঞাসা করলে, কাঁদছি'স কেন?

নন্দদার কথার জবাব দিলুম না। চূপ ক'রে রইলুম খানিকক্ষণ। চূপ ক'রে রইলুম বটে, কিন্তু নন্দদা বার বার ক'রে সেই একই প্রশ্ন করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আমি বললুম, নন্দদা, আমি কাঁদছি কেন জান? আমি লেখাপড়া করতে চাই—আমার তোমরা ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দাও। ইস্কুল থেকে ফিরে এসে আমি তোমাদের সব এঁটো বাসন মেজে দেব। নন্দদা, তোমরা জান না, কেউনগরে আমি প্রতি বছর প্রথম হয়ে ওপরের ক্লাসে প্রমোশন পেয়েছি। আমার কথা শুনে নন্দদা বিছানায় উঠে বসল। চণ্ডা বুকটা তার আমার দিকে তুলে ধ'রে সে চেয়ে রইল বিশ্বাসের দৃষ্টিতে। কী হৃদয় নন্দদার স্বাস্থ্য। আমার নাক থেকে ওর বকের দূরত্ব দু ইঞ্চির বেশি নয়। নন্দদার স্বাস্থ্য থেকে তাই কেনন একটা স্বমধুর গন্ধ ভেসে আসছিল আমার নাক পর্যন্ত। বহু বছর পরে আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে, সেই গন্ধটা ছিল স্বস্থতার নিদর্শন। নন্দদার আঠারো বছরের স্বাস্থ্য পঁচিশ বছর না পেরতেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সে এক অতি মর্মান্তিক কাহিনী! রস্মা, নন্দদার কাহিনী শোনবার জন্তে তুই হয়তো সময় নষ্ট করতে চাইবি না। কারণ, নন্দদাকে তুই কখনো দেখিস নি। কিন্তু আমি তো ভাই তাকে ভুলতে পারি না।

সেদিন সে আমার চোখের জল দেখে মুহূর্তের মধ্যে সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছিল। কেবল সহানুভূতিশীল নয়, সে যেন আমার মুক্তির একটা রাস্তাও বার ক'রে ফেলল।

একটু পরেই সে বললে, স্বরনার মা মিসেস সবিতা গুপ্তকে আমি চিনি। তিনি তো বিধানচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ের

হেড-মিস্ট্রেস। তাঁকে বললে কেমন হয়? অবিশিষ্ট বরনাকে বললেও চলে।

নন্দদা চিন্তাশ্রিতভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। পরে বুঝেছিলাম, আমার ইচ্ছুলে ভর্তি করবার জন্তেই কেবল সে চিন্তা করছিল না। বরনার সঙ্গে দেখা করবার সহজ রাস্তা তৈরি করবার কথাও সে ভাবছিল। নন্দদা বরনাকে ভালবাসত। একই ইচ্ছুলে আমি আর বরনা যদি পড়ি, তা হ'লে কি নন্দদার একটু সুবিধে হয় না? হয়, নিশ্চয়ই হয়। বরনা যদিও ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ছিল, আমার চেয়ে দু ক্লাস ওপরে, তাতে তো বন্ধুত্ব করবার কোন অসুবিধে নেই। তবে? নন্দদা বললে, আমি যেমন ক'রে পারি তোর ব্যবস্থা একটা করবই। আমি যে খুব একজন স্বার্থহীন ছেলে, তা কিন্তু মনে ভাবিস নে জয়া। আমার এতে পুরোপুরি স্বার্থ আছে। তা ছাড়া, আমার মনে হয়, পৃথিবীর কোন বড় বহরের মানুষই স্বার্থহীন ভাবে কাজ করতে পারে না। কারণ, স্বার্থহীন হওয়ার মত তাদের হাতে সময় কই, বল?

আমি চমকে উঠলাম।

মামা দোতলা থেকে নীচে নামছিলেন। বেশ জোরে জোরে পা ফেলে ফেলে নীচে নামছিলেন তিনি। বাজারের পথে হাঁটবার পদক্ষেপ এ নয়। প্রতিদিনকার সঙ্গে আজকের পদক্ষেপ তাঁর একেবারেই মিলছে না। মনে হ'ল, তিনি নন্দদার ঘরের দিকেই আসছেন। ভয় পেয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কি?

ব্যাপার? কিছুই না। তোর মুখটা একটু সরিয়ে নে জয়া। নাকের নিখাস তোর কি রকম গরম হয়ে উঠেছে! বুকে আমার ফোঁসকা না পড়ে!

বললাম, ভয় পেয়েছি ব'লেই বোধ হয় নিখাস আমার গরম হয়ে উঠেছে। সে বাক, তুমি কোন অগ্নায় কাজ কর নি তো নন্দদা?

নন্দদা জবাব দেওয়ার আগেই বড়মামা এসে ঘরে ঢুকলেন।

মামার বাড়িতে এসে এই আমি প্রথম দেখলুম, বড়মামার সঙ্গে নন্দদা তর্ক করতে সাহস পেয়েছে। কেবল সাহসের মূলধন নিয়েই বড়মামার সঙ্গে তর্ক করা যায় না। প্রতিটি কথাই মধ্যে যুক্তি থাকা চাই। তা ছাড়া প্রত্যেকটি

কথার মধ্যে যেন কোথাও এতটুকু মিথ্যে বলবার প্রয়াস না থাকে। বড়মামা নিজে কোনদিন ভুল ক'রেও মিথ্যে কথা বলেন নি। মিথ্যে কথা বলা যে মহাপাপ তা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তিনি বলতেন, একবার যে মিথ্যে কথা বলে, তাকে আর কখনই বিশ্বাস করা চলে না, এমন কি সে যদি সত্যিকথাও বলে। আজকালকার শিক্ষা-পদ্ধতি থেকে যে চরিত্র গঠনের মূলনীতি ক্রমশই উৎসর্গ হয়ে যাচ্ছে, সে সম্বন্ধে মামা প্রায়ই বক্তৃতা দিতেন তাঁর সম্মান-সের কাছ।

ঘরের মধ্যে ঢুকে প্রথমেই মামা নন্দদার টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। টেবিল থেকে একটা একটা ক'রে প্রত্যেকটা বই তিনি হাতে নিয়ে পাতা ওপটাতে লাগলেন। কেমিস্ট্রি বইখানার মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে মামা জিজ্ঞাসা করলেন, কলেজ কামাই ক'রে আজকাল কি তুমি মাঠে-ময়দানে বক্তৃতা দিতে যাচ্ছ?

দু-একদিন কলেজ কামাই করলে মহাভারত অন্তত হয় নাকি?—নন্দদার এই পাণ্ডা-প্রশ্ন শুনে বড়মামা বই থেকে চোখ তুলে চেয়ে রইলেন তাঁর সম্মানের দিকে। নন্দদা তখন ইচ্ছে ক'রেই যেন তাঁর চওড়া বুকটাকে আরও বেশি ক'রে চওড়া করতে লাগল। বড়মামা অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন নন্দদার চওড়া বকের দিকে। অবাক হয়েই বোধ হয় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুই আমার ভয় দেখাচ্ছিস নাকি?

নন্দদা জবাব দিল না।

বড়মামা নিজের মনে মনেই যেন বলতে লাগলেন, বাংলার ভবিষ্যৎ খুব অন্ধকার। কি এক বিকৃত-বিজ্ঞান-বুদ্ধি এসে মানুষের মন থেকে ক্রমে ক্রমে সব রকম নীতিবোধ মুছে দিয়ে যাচ্ছে।...নন্দ, তুই তো বার্ষিক পরীক্ষায় পাস করতে পারিস নি। কেন? আমার তুই মিছে কথা বলেছিস কেন?

আমি কোন জবাব দেব না।—বললে নন্দদা।

আজ থেকে আমার এখানে তোর আর থাকাও চলবে না।—বড়মামার আদেশের স্বরে দুর্বলতার আভাসও ছিল না।

সেই-জন্তেই তো জামাকাপড় সব গুছিয়ে নিচ্ছি।—নন্দদা সত্যি সত্যি জামাকাপড় সব গুছোতে লাগল।

বড়মামা এবার আমার দিকে চেয়ে বললেন, চল জয়া, আমরা এবার বাজারে যাই। তোর মামীমা আজ আবার খুব ধুমধাম করে শনিপূজা করছেন।

দরজার কাছে গিয়ে তিনি পুনরায় বললেন, এ বাড়িতে বারো মাসে তেরোপার্বণের ধর্ম তো লেগেই আছে।...কিন্তু মিথ্যে না বলার ধর্ম এখানে তো কেউ মানে না।

মামা চলে যাওয়ার পরে হঠাৎ আমার চোখ পড়ল কেমিলি বইখানার দিকে। বইটা দেখলুম খুলেই রেখে গেছেন মামা। খোলা পাতা দুটোর মাঝখানে ছোট্ট সাইজের একটা ফোটো রয়েছে। ফোটোখানা হাতে নিয়ে আমি নন্দদাকে জিজ্ঞাসা করলুম, এটা কার ছবি?

আমার হাত থেকে ছোঁ মেরে ফোটোখানা নিয়ে নন্দদা বললে, বরনা গুপ্তর ছবি।

মামা কিন্তু ছবিখানা দেখে গেলেন নন্দদা।

নিশ্চয়ই নন্দদা ছবিখানা কুটিকুটি করে ছিঁড়তে লাগল আমারই চোখের সামনে।

রাত একটা না বাজতেই মিস জয়া বহু ঘুমিয়ে পড়লেন আজ। খুবই আশ্চর্য বোধ করল নিশীথ। করিডোরে সে পাঘচারি করছিল। দ্বিধিমণি না ঘুমলে নিশীথ ঘুমতে যায় না। ধীরে ধীরে অস্ফুট নিশ্চয়ই নিশীথ দরজাটা খুলে ফেলল। জয়াদি সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছেন!

বহু বছর পরে এমন দৃশ্য দেখবার সৌভাগ্য হ'ল নিশীথের। রাত্রিবেলা দ্বিধিমণি ওর ঘুমচ্ছেন! তবে কি তাঁর স্বাস্থ্য আবার ফিরে এল? কাশ্মিরে আজ তাঁর ষষ্ঠ রাত্রি পার হচ্ছে—জয়া বহুর মুখের দিকে চেয়ে নিশীথ পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারল যে, দ্বিধিমণির অশান্তি অনেক কমে গেছে। কমবেই। বিন্দুমাত্র অশান্তিও আর থাকবে না জয়াদির যদি বিয়ে হয়। বিয়ে? হ্যাঁ, বিয়ের মধ্যেই শুধু তিনি পাবেন, পাবেন স্বাভাবিকতা, জীবল নিশীথ। ভাবতে ভাবতে কখন যে সে ঘরের বাতিটা নিবিয়ে দিয়েছে নিশীথের তা খেয়াল ছিল না। অন্ধকার ঘর। ঘরটা উপস্থিত মিস জয়া বহুর শোবার ঘর। এই কথাটা ভাবতে গিয়ে নিশীথ যেন আজ একটু লজ্জাই পেল। দ্বিধিমণির স্বাস্থ্য ক্রমে ক্রমে ফিরে আসছে। চোয়ালের

হাড় দুটোর ওপর মাংস গজিয়েছে এ কদিনের মধ্যেই। মাংস?

ঘর থেকে বেরিয়ে এল নিশীথ। করিডোরে দাঁড়িয়ে সে ভাবল, হ্যাঁ, মাংস। বাঁশপাতার মত শুকনো শরীরটায় মাংস কই? বিয়ের আগে খানিকটা মাংস না গজালে ডাক্তার প্রধানের কৃতিত্ব বোকা যাবে কি করে? আজ সকালে ডাক্তার প্রধান এসেছিলেন। তিনি ভাল করে পরীক্ষা করেছেন দ্বিধিমণিকে। পরীক্ষা করবার সময় নিশীথ করিডোরেই দাঁড়িয়ে ছিল। ঘরের ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকলে দ্বিধিমণির কোন আপত্তি হ'ত না। কিন্তু আপত্তি ছিল ডাক্তার প্রধানের। তিনিই তো ওকে বলেছিলেন বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে।

করিডোর দিয়ে হাঁটতে লাগল নিশীথ। মধ্যরাত্রিতে ওর টোঁটের ওপর হাসির রেখা ভেসে উঠল। ডাক্তার প্রধানের দু'দাগ ওষুধ খাওয়ার পরেই দ্বিধিমণির ঘুম এল নাকি? আসবেই। ডাক্তার প্রধান যে ওকে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়বার আদেশ দিয়েছিলেন, তাতে নিশীথ একটুও অসন্তুষ্ট হয় নি। বরং সন্তুষ্টই হয়েছে। কথানা শুকনো হাড়ের সমষ্টি ভেবে যে ডাক্তার প্রধান দ্বিধিমণিকে উপহাসের পাত্রী করে তোলেন নি, তাতে নিশীথ খুবই আনন্দ লাভ করেছে। ওকে ঘরের বাইরে যেতে বলার অর্থ কি? করিডোরে পাঘচারি করতে করতে নিশীথ কথারটার একটা অর্থ বার করবার চেষ্টা করতে লাগল।

অর্থ একটা আছে। নিশীথ একটা অর্থ খুঁজেও পেল। ওর লজ্জা বাড়ল ডাক্তার প্রধানের প্রতি। কেন বাড়বে না? তিনি ইচ্ছে করলে তো দ্বিধিমণিকে উপহাস করতে পারতেন—ঘোবনের কোন চিহ্ন নেই ব'লে তিনি কি পারতেন না নারীজাতির তালিকা থেকে দ্বিধিমণির নামটা কেটে ফেলতে? ফাঁকি দেওয়ার জগ্রে ডাক্তার প্রধান এক বোতল ব্রোমাইড মিকশার লিখে দিয়ে সহজেই চলে যেতে পারতেন। ব্রোমাইড মিকশার খেয়ে যে দ্বিধিমণির ঘুম আসে না, তা তো তিনি জানতেন না! তবে? তবে কেন তিনি নিশীথকে বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে বললেন? লুকোবার মত মিস জয়া বহুর এমন কি-ই বা আছে! নিশীথ পশ্চিম দিকের জানলাটা খুলে দিল।

হাওয়া আসছে। মধ্যরাত্রিতে পাহাড়ের গায়ে

ধাক্কা খেয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকে পড়ছে করিডোরের মধ্যে। হিম-শীতল হাওয়া। এ হাওয়ার কোন গরম খবর নেই। নিশীথের মনে হ'ল, হাওয়ার বুকে বুঝি জ্বরে রয়েছে শতাব্দীর সঞ্চিত দীর্ঘশ্বাস।

হিম-পড়ার শব্দ পেলে নিশীথ। ঝাউগাছ থেকে টুপটুপ করে ফোঁটা পড়ছে। দীর্ঘশ্বাসকে ধরে রেখে লাভ কি? তার চেয়ে কৈদে কৈদে বুকটাকে হাক্কা করে দেওয়া অনেক ভাল, ভাবল নিশীথ। কিন্তু হাওয়ার বুকে আজ যেন বিন্দুমাত্র নরম অহুভূতি নেই ব'লে মনে হ'ল ওর। নিশীথ জানলাটা বন্ধ করে দিল।

দিদিমণি আজ মধ্যরাত্রিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ডাক্তার প্রধান দিদিমণির দেহটাকে অবজ্ঞা করেন নি। উপহাসের স্বরে তিনি বিশ্লেষণ করে বলেন নি যে, তাঁর শরীরে আর স্বাস্থ্য নেই। দেহের কোথাও যদি একটু-আধটু স্বাস্থ্য থেকেও থাকে, তা নিয়ে জীবনের উত্তাপ আর বেশি দিন ধরে রাখা যাবে না। ইচ্ছে করলেই ডাক্তার প্রধান এসব কথা বলতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি বলেন নি, দিদিমণির কঙ্কালটার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এসেছে। কেবল শ্রদ্ধা নয়, তাঁর দেহটার প্রতি গভীর পবিত্রতাবোধ না থাকলে ডাক্তার প্রধান কিছুতেই পারতেন না ওকে বাইরে ষাওয়ার আদেশ দিতে। করিডোরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নিশীথ অহুপস্থিত ডাক্তারের প্রতি হাত তুলে নমস্কার জানাল।

এটা নিঃস্বার্থনমস্কার নয়। ডাক্তার প্রধান আজও অবিবাহিত। নিশীথ খবর নিয়ে জেনেছে যে, সংসারে তাঁর কোন রকম বন্ধন পরিস্থ নেই। বন্ধন ছিল, ডাক্তার প্রধান তা কেটে-ফেলতে বাধ্য হয়েছেন। কেটে কেল্পেছেন প্রায় পঁচিশ বছর আগেই। ডাক্তার প্রধান আজ পর্যন্তাল্লিশ পা দিয়েছেন। বিশ বছর বয়সে তিনি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এসব খবর নিশীথ জেনেছে রেল-স্টেশনের ছোট কেরানীবাবুর কাছে। তিনি ডাক্তার প্রধানের আত্মীয়।

ছোট কেরানীবাবু একদিন বলেছিলেন, খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে আমরা তাঁকে সমাজে আর স্থান দিই না। স্থান পাওয়ার ক্ষেত্রে তিনি অবশিষ্ট চেষ্টাও করেন নি।... কি হবে সমাজে ঢুকে? খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন ব'লেই

তো তিনি আজ এত উচ্চশিক্ষিত। পাত্রী মাহেব্বা তাঁকে বিলেত পর্যন্ত ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছেন। খ্রীষ্টান না হ'লে তিনি এসব সুবিধে পেতেন না।

কেরানীবাবুর কথা শুনে নিশীথ সেদিন খুবই অবাক হয়েছিল। টাকার সুবিধে পাওয়ার ক্ষেত্রে মাহুদ ধর্ম বদলায় নাকি? ছোট কেরানীবাবুর কথা যদি ঠিক হয়, তা হ'লে ডাক্তার প্রধানের প্রতি নিশীথের কোন শ্রদ্ধাই থাকতে পারে না। চোর-ডাকাতের চেয়ে ডাক্তার প্রধান তবে ভাল হ'ল কি করে? অভাবের তাড়নায় অনেকে চুরি করে, নিশীথ তাদের ক্ষমা করতে পারে। কিন্তু যারা টাকার সুবিধে পাওয়ার ক্ষেত্রে ধর্ম বদলায়, তাদের সে ক্ষমা করতে পারে না। ধর্মজ্ঞান নিশীথের প্রবল। ওর বাবা ছিলেন পণ্ডিতলোক। কিন্তু নিশীথ লেখাপড়া শিখতে পারে নি। মুখ দিয়ে কথা কোটবার আগেই ওর বাবা মারা যান। পাড়া-গাঁয়ের সমাজ ওকে প্রতিপালন করবার দায়িত্ব নিল না। রাষ্ট্র হয়তো এ দায়িত্ব নিতে পারত। কিন্তু রাষ্ট্র যে কি এবং কোথায়, নিশীথের মা তার ঠিকানা জানতেন না। অতএব একবারে ভিক্ষের ওপর নির্ভর করে মা ওর চলে এলেন কলকাতায়। তারপর মস্তবড় কাহিনী। কাহিনী যত বড়ই হোক, নিশীথ লেখাপড়া শিখতে পারল না। নিরক্ষর নিশীথের ধর্মজ্ঞান হ'ল। ভাল-মন্দ-শ্রায়-অশ্রায়-বিচারবোধ যেন শিক্ষিত লোকদের চেয়েও অনেক বেশী হ'ল নিশীথের। ছেলেবেলাতেই এসব লক্ষণ ওর প্রকাশ পেতে লাগল। মা ভাবলেন, পারিবারিক রক্তের গুণেই নিশীথের চরিত্র এমন ঐশ্বর্যশালী হয়েছে।

আজ আবার নতুন করে ডাক্তার প্রধানের কথা মনে পড়ল ওর। মনে পড়ল ফাদার হেনরির কথা। ধর্মাস্ত্র গ্রহণের সময় ফাদার হেনরি ছিলেন ডাক্তার প্রধানের পুরোহিত। তিনি কি তবে ডাক্তার প্রধানের আধ্যাত্মিক প্রেরণার অভাবের কথা ভেবে দেখেন নি? বিশ বছর বয়সের এক পাহাড়ী যুবক ধর্মাস্ত্র গ্রহণ কেন করছে, তা তো ফাদার হেনরির খুব ভাল করে ভেবে দেখবার কথা ছিল। তবে?

করিডোরের অন্ধকারে যেন একটু একটু করে গাঢ়তর হয়ে উঠছে ব'লে মনে হ'ল নিশীথের। না, চরিত্রহীন

মাছবের সঙ্গে দ্বিদিমণির পরিচয় করিয়ে দিয়ে ভাল হয় নি। টাকার স্ববিধে পাওয়ার ক্ষমতা যারা ধর্মাস্ত্রের গ্রহণ করে, তাদের চরিত্রহীনতা যে ইহজীবনে আর ঘোচবার নয়, সে সম্বন্ধে নিশীথের কোন সন্দেহই নেই। অল্পতাপ এল নিশীথের মনে। ওর সাহায্য না পেলে ডাক্তার প্রধান কিছুতেই এ বাড়িতে প্রবেশ করতে পারতেন না। আজ সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ডাক্তার প্রধান হাসিমুখে নিশীথের কানে কানে বলেছিলেন, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, নিশীথ। মিস বহুর অস্থখ আমি ভাল করবই।

অস্থখটা ধরতে পেরেছেন কি ?

হ্যাঁ।

ডাক্তার প্রধানের কৃতিত্বের প্রতি সন্মম জানাল নিশীথ।—ব্যাগটা আমার কাছে দিন, আমি পৌঁছে দিয়ে আসি, ডাক্তারসাহেব।

না, নিশীথ। তুমি এবার দ্বিদিমণির কাছে যাও।—দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার প্রধান। বেরিয়ে যাওয়ার সময় পেছন ফিরে তিনি বললেন, ধন্যবাদ নিশীথ। জীবনে এই বোধ হয় প্রথম আমি সত্যিকার রোগী পেলুম।

চামড়ার ব্যাগটা হাতে নিয়ে ডাক্তার প্রধান নামতে লাগলেন নীচে। পাহাড়ের পা দিয়ে সিঁড়িটা নেমে গেছে কার্ট রোড পর্যন্ত। দরজায় দাঁড়িয়ে নিশীথ চেয়ে ছিল সেই দিকেই। একেবারে শেষ সিঁড়িটার গিয়ে ডাক্তার প্রধান যখন পৌঁছলেন, তখন ফাদার হেনরির সঙ্গে দেখা হ'ল তাঁর। ওরা দুজনে কার্ট রোডের দিকে হাঁটতে লাগলেন। একটু পরে আর তাঁদের দেখতে পাওয়া গেল না।

নিশীথ দরজা বন্ধ ক'রে দিল।

মিস জয়া বহু ভাকছিলেন ওকে। দরজা বন্ধ ক'রে নিশীথ ছুটে এল মিস জয়া বহুর শোবার ঘরে। বেলা তখন বোধ হয় বারোটার বেশি নয়। ডাক্তার প্রধান এসেছিলেন ঠিক এগারোটার। এক ঘণ্টা ধরে কোন ডাক্তার একই রোগী পরীক্ষা করেন ?

দেখি, প্রেসক্রিপশানটা যাও তো।—হাত বাড়াল নিশীথ।

প্রেসক্রিপশান ?—মিস জয়া বহু উঠে ব'সে বললেন, প্রেসক্রিপশান নেই।

কেন, ভিজিট যাও নি ?—নিশীথের ভক্তিতে বিশ্বাসের আভাস।

ভিজিট উনি নিলেন না। উনি বললেন, আমাদের মধ্যে দেনাপাওনার কোন হিসেব থাকবে না। হিসেব থাকবে না বতদিন না আমি ভাল হয়ে উঠি।

কিন্তু ওষুধ ছাড়া তুমি কেমন ক'রে ভাল হয়ে উঠবে ?

ওষুধ উনি দিয়ে গেছেন রে নিশীথ। না না, ওষুধের নাম আমি তোকে বলব না।—জয়া বহুর গলার স্বরে কৃত্রিম উদ্ভা। কৃত্রিমতার পরিমাণ বেশ খানিকটা বাড়িয়ে দিয়ে তিনিই আবার বলতে লাগলেন, আমার সব কথাই তো তুই জানিস। তোরা কাছে কোন কিছুই গোপন করতে পারি নি। আমার জীবনটা তোরা সামনে প'ড়ে রয়েছে একটা খোলা বইয়ের মত। নিশীথ, এবার আমি হু-চারাটে কথা তোরা কাছ থেকে গোপন ক'রে রাখব। ডাক্তার প্রধানের দেওয়া ওষুধটার নাম আমি তোকে বলব না।

মনের আনন্দ যেন প্রকাশ না পায় সেই ক্ষেত্রে নিশীথ এরই মধ্যে জানলা বন্ধ করবার অজুহাতে মুখটা ঘুরিয়ে রেখেছিল উণ্টো দিকে। ডাক্তার প্রধানের ওষুধ তা হ'লে দ্বিদিমণির পছন্দ হয়েছে। হবেই। নিশীথ জানে, অমিতাভবাবু যা দিতে পারেন না, ডাক্তার প্রধান তা পারেন। সাংসারিক জীবনের আভাবিকতা ফিরিয়ে আনবার ক্ষমতা রাখেন ডাক্তার প্রধান।

নিশীথ চ'লে বাড়িল। মিস জয়া বহু বললেন, একবার কাছার হুবারার গেস্ট-হাউসে যেতে হবে।

কেন ?

অমিতাভকে আমি সন্ধ্যার সময় আসতে বলেছিলুম। তাঁকে আসতে বাধ্য ক'রে দিয়ে আসবি।

সে কি দ্বিদিমণি ? তিনি এখানে থাকেন না ?

হ্যাঁ। রাত আটটার সময় আসতে বলিস। সন্ধ্যার সময় আমি একটু ব্যস্ত থাকব।...ডাক্তার প্রধানকে চা খেতে বলেছি।

করিডোরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নিশীথ সকালবেলার কথাগুলোই সব ভাবছিল। একটু আগেই সে দেখে এসেছে যে, মিস জয়া বহু চিঠি লিখতে লিখতে সহসা ঘুমিয়ে পড়েছেন। সহসা ঘুমিয়ে পড়বার মত মুহূর্ত তাঁর জীবনে

খুব কমই এসেছে। নিশীথ খুশী হয়েছে আশাতীত ভাবে। দিদিমণির স্বাস্থ্য ফিরে আসছে; শরীরের উন্নতি তিনি আর নিশীথের দৃষ্টি থেকে গোপন করে রাখতে পারছেন না।

কি মনে করে নিশীথ ব'সে পড়ল করিডোরের মেঝের ওপর। আজ আর ওর ঘুম আসছে না। কি হবে ঘুমিয়ে? জীবনের বেশির ভাগ সময়ই তো কেটে গেছে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। আজ না হয় চোখ বুজে একটু ধ্যানে বসা যাক, ভাবল নিশীথ। জীবনের চল্লিশটা বছর কেটে যাওয়ার পরে দিদিমণিকে আজ স্নহ দেখাচ্ছে। নিশীথের বিশ্বাস, কেবল কার্শিয়ংয়ের আবহাওয়ার সাধ্যই ছিল না দিদিমণিকে স্নহ করে তোলার। নিশীথ বছরব্যাপি তো মিস জয়া বহুর সঙ্গে কার্শিয়ংয়ে এসেছে হাওয়া পরিবর্তনের জন্তে। কিন্তু তাতে জয়াটির স্বাস্থ্য কোনদিনই ভাল হয় নি। নিশীথের ধারণা, এবার কেবল জয়াটির স্বাস্থ্যই ভাল হচ্ছে না, গোটা কার্শিয়ংটাকেও স্নহ দেখাচ্ছে। এ কেমন করে হ'ল? তবে কি এর পেছনে কোন অদৃশ্য শক্তি কাজ করছে? চোখ বুজল নিশীথ। জীবনের কঠিনতম প্রশ্নের জবাব পাওয়ার জন্তেই যেন নিশীথ রওনা হ'ল ধ্যানের রাজ্যের দিকে। সেখানে কি না পাওয়া যায়।

রাত প্রায় শেষ হয়ে এল। নিশীথের ধ্যান এখনো ভাঙে নি। সারা পৃথিবীটাই যেন একটা ধ্যানের রাজ্য হয়ে উঠেছে নিশীথের কাছে। দিদিমণি ওর ঘুমচ্ছেন, না, তিনিও ধ্যানে বসেছেন? অদ্ভুত ধরনের একটা আনন্দের বাতাস ব'য়ে যাচ্ছে নিশীথের চার দিক দিয়ে। প্রাণপণে সে নিখাস টানতে লাগল—আনন্দের নিখাস। এ আনন্দের মূল কোথায়?

জবাব পেল নিশীথ। পেল ধ্যানমগ্না জয়াটির কাছ থেকেই। তিনি যেন বললেন—আমি ঘুমুই নি নিশীথ, আনন্দের সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছি। আর কি সুখই না হচ্ছে। এর মূল কোথায় জানিস? সৃষ্টিকর্তাই হচ্ছেন এর মূল। আমরা সভ্য ব'লেই এই মূলের খবর খুঁজে পেয়েছি। সভ্যতা কি? মানব-সমাজের সমষ্টিগত মঙ্গলই হচ্ছে সভ্যতা। 'মানব-সমাজের মঙ্গল হোক' 'মানব-সমাজের মঙ্গল হোক'—এই ধ্বনি কি তুই শুনতে পাচ্ছিস না নিশীথ? এই ধ্বনিটা কোথা থেকে আসছে? আসছে সেই অজ্ঞেয়

বহুস্তের মূল থেকেই। সৃষ্টিকর্তা নিজেই হচ্ছেন সেই বহুস্ত, যে-বহুস্ত প্রমাণসাপেক্ষ নয়, অখণ্ড বাস্তব।

মিস জয়া বহু আজ ঘুম থেকে উঠে পড়েছেন খুব ভোরে। নিশীথ সকালবেলা গরম কফি নিয়ে এসে হাজির হয় প্রতিদিন। আজ তার কফি আনতে দেরি হচ্ছে দেখে তিনি বেরিয়ে এলেন বাইরে। নিশীথ দেয়ালের পায়ে হেলান দিয়ে ঘুমচ্ছিল। মিস জয়া বহু অবাক হলেন খুবই। পূর্বদিকের খোলা জানলা দিয়ে বোঝা এসে পড়েছে করিডোরের মধ্যে। নিশীথের তবু ঘুম ভাঙল না। মিস জয়া বহু ডাকলেন, নিশীথ—নিশীথ—

আজ্ঞে।—নিশীথ উঠে দাঁড়াল।

ব্যাপার কি? এখানে ব'সে ঘুমচ্ছিস কেন?—জিজ্ঞাসা করলেন মিস জয়া বহু।

ঘুমচ্ছিলাম না-কি?—নিশীথ এখনো ঠিক বুঝতে পারছিল না, সে ঘুমচ্ছিল কি না।

ঘুমচ্ছিলি, না, ধ্যান করছিলি, আমি কি করে জানব? এক পেয়লা গরম কফি দিতে পারিস?—জিজ্ঞাসা করলেন জয়া বহু।

নিশ্চয়, নিশ্চয়।—চোখ রগড়াতে রগড়াতে নিশীথ হাঁটতে লাগল রান্নাঘরের দিকে।

জয়া বহু ডাকলেন, নিশীথ, একটু দাঁড়া।

কেন দিদিমণি?

তুই ঘুমতে যা। আজ কফি আমিই তৈরি করব। কি রে, বোকার মত হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে কি দেখছিস?

তোমাকে দেখছি, মানে—তুমি যে সেরে উঠছ তাই দেখছি। তুমি এবার পুরোপুরিভাবে ভাল হয়ে যাবে দিদিমণি। তোমার মনের কথা আমি জানতে পেরেছি।

কেমন করে?

ধ্যানে।—জবাব দিল নিশীথ।

এই সময় বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল। মিস জয়া বহু বললেন, বোধ হয় অমিতাভ এসেছে।

তোমরা তা হ'লে বসবার ঘরে গিয়ে গল্প কর, আমি ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে দু পেয়লা কফি নিয়ে আসছি। ব্রেকফাস্ট কটায় যাবে?

আর এক ঘণ্টা পরে দিস।—বললেন জয়া বহু।

দরজা খুলতেই ওপাশ থেকে ফাদার হেনরি বললেন,
শুভ মর্নিং, মিস বোস।

শুভ মর্নিং, ফাদার। আমি ভাবলুম, অমিতাভ এল
বুঝি। আহ্ন।

বসবার ঘরে এসে বসলেন ফাদার হেনরি। মিস জয়া
বহু বসলেন ফাদার হেনরির উল্টো দিকে। তিনি লক্ষ্য
করলেন যে, ফাদার হেনরি বইয়ের দিক থেকে একবার
চোখ ঘুরিয়ে নিলেন। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট
বার করে একটা সিগারেট ধরিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,
কেমন আছেন এখন?

ভালই আছি। কার্শিয়ংয়ের আবহাওয়া মন্দ লাগছে
না।—জবাব দিলেন জয়া বহু।

লাগবে, ভাল লাগবে কার্শিয়ং।—হোমিওপ্যাথি
ওষুধের বাক্সটা সেটার টেবিলের ওপর রেখে তিনিই আবার
বললেন, কার্শিয়ংয়ে কেবল আবহাওয়া নেই, উচ্চতাও
আছে। আই মীন, ইংরেজী শব্দ হাইটের বাংলা অন্তর্বাদ
উচ্চতা নয়, মানে সেই অর্থে নয়, মানে—

বাধা দিয়ে জয়া বহু বললেন, বুঝেছি। তবে স্বাস্থ্য
আমার ভাল হচ্ছে আবহাওয়ার জন্তে, না, উচ্চতার জন্তে,
তা আমি এখনো বুঝতে পারি নি।

বুঝবেন, ক্রমে ক্রমে অবশ্যই বুঝবেন। দেখুন মিস
বোস, দি গ্লোরি অব গড—। শেল্ফের দিকে চেয়ে
ফাদার হেনরি আগের লাইনটা শেষ না করে বললেন, জাঁ
পল সার্তর এখনো রয়েছে দেখছি—আই মীন, শেল্ফে
রয়েছে। আপনি কি আজও তাঁর জীবনদর্শনে বিশ্বাস
করেন নাকি?

Existentialism হচ্ছে আমার নিজেরই জীবনদর্শন,
ফাদার।

টু, কোয়াইট টু। আপনার চেহারায় তার ছাপ
রয়েছে। প্রতি মুহূর্তে এক-একটা করে সংকট আসছে
আপনাদের জীবনে—ক্রাইসিস। ইন্ ফ্যাক্ট, ক্রাইসিস
অথবা সংকট হচ্ছে আপনাদের জীবনের চিরস্থায়ী সত্য।
জীবনের সত্য হোক বা না হোক, আপনাদের ফিলজফির
সত্য তো বটেই। এই সংকট থেকে পরিত্রাণের
কোন পথ আপনাদের নেই। আপনাদের নেই মানে,

আপনাদের দর্শনশাস্ত্রের কোথাও নেই। অ্যাম আই
কারেন্ট, মিস বোস?

ইয়া, ফাদার।

তা হ'লে সারা জীবন ধরে যদি সংকটের মধ্যেই ডুবে
থাকেন, অর্থাৎ জীবনটা যদি সংকটের প্রতিশব্দ হয়, তবে
ভগবানের কীর্তি আপনি দেখবেন কি করে?

এক পেয়াল কফি খেয়ে নিন, ফাদার।—এই ব'লে
জয়া বহু নিশীথের হাত থেকে কফির পেয়াল ছুটো
নামিয়ে নিয়ে সাজিয়ে রাখলেন সেটার টেবিলের ওপর।
হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্সটা নিশীথের হাতে তুলে দিয়ে
তিনি বললেন, ঐ বড় টেবিলের ওপর সরিয়ে রাখ।

নিশীথ বাক্সটা সরিয়ে রাখল। সরিয়ে রেখে সে
জিজ্ঞাসা করলে, ঘরের জানলাগুলো খুলে দি দিদিমণি?

দে।—তারপর ফাদার হেনরির দিকে চেয়ে তিনি
জিজ্ঞাসা করলেন, এখন বুঝি ডাক্তারি করতে বেরিয়েছেন,
ফাদার?

ইয়া। সকালবেলার প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হচ্ছে
আমার গীর্জাতে গিয়ে প্রার্থনা-সভায় যোগ দেওয়া।
তারপরে দু ঘণ্টা আমার কাঁটে রোগীদের চিকিৎসার কাজ
নিয়ে। জানেন তো, এদিককার মানুষ কত গরিব!

জানি ফাদার, জানি। না জানলে, আপনাদের চকিৎস
ঘণ্টাই প্রশংসা করি কেন? মানুষের জন্তে আর কাউকেই
তো আপনাদের মত ভাবতে দেখি না। ইন্সুল কলেজ
হাসপাতাল ইত্যাদি চালাবার জন্তে কত দূরদেশ থেকে
আপনারা সব ছুটে এসেছেন ভারতবর্ষে।

একটু ভুল হ'ল আপনার, মিস বোস। ইন্সুল কলেজ
কিংবা হাসপাতাল চালাবার জন্তে আমরা এখানে আসি
নি। আমরা এসেছি ধর্মপ্রচারের জন্তে।

তা হোক, আপনারা যাচ্ছে তাই প্রচার করতে পারেন
আমরা তা শুনে বাব না। আমরা দেখব আপনাদের
ইন্সুল কলেজ হাসপাতাল, এবং—। একটু হেসে মিস জয়া
বহু বললেন, দেখব আপনার এই ছোট্ট হোমিওপ্যাথি
ওষুধের বাক্সটা। দু-দশজন রাষ্ট্রনায়কের অথবা ধর্মযাজকের
দু-দশ কোটি বক্তৃতার চেয়েও দামী আপনার এই এক
ফোঁটা ওষুধ। বক্তৃতা দিয়ে আধখানা গরিবকেও বাঁচানো
যায় না, কিন্তু আপনি আপনার ওই ওষুধ দিয়ে একটা

গোটা বস্তিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। ফাদার, মাহুয়ের জন্তে অনেকে অনেক কিছু হয়তো করে, কিন্তু গরিব মাহুয়দের জন্তে তো আপনাদের মত এমন সংঘবদ্ধভাবে কাউকে কিছু করতে দেখি নি। ডাক্তার প্রধানের সঙ্গে আলাপ-হওয়ার পরে, আপনাদের কীর্তি সন্দেশে আমার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আপনাদের সাহায্য না পেলে তিনি হয়তো আজ মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের বাড়ির দরজায় বন্দুক হাতে নিয়ে পাহারাওয়ালার কাজ করতেন। কত মাইনে পেতেন তিনি? ডাক্তার বিধান রায়ের একটা 'কী'র সমান হ'ত না তাঁর এক মাসের মাইনে। কিন্তু আজ দেখুন তো ডাক্তার প্রধানের অবস্থা কি? কী ছাড়াই তিনি আমার চিকিৎসা করছেন। এবং একটি পয়সা না নিয়েই তিনি আমার আরোগ্য ক'রে তুলবেন ব'লে কথা দিয়েছেন। বক্তৃতা দিতে সবাই পারে, কিন্তু কথা দিতে কখন পারে, ফাদার?

ইন্টারেক্টিং! খুবই হাসির খোরাক আছে আপনার বিশ্লেষণে। কিন্তু ডাক্তার প্রধান আমাদের কাছে কোন সাহায্যই পান নি, পেয়েছেন ভগবানের কাছে। আজ উঠি—

নিশীথ জানলাগুলো খুলবে ব'লে পেছন দিকে এতক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল। এঁদের কথাবার্তা শুনে ভাল লাগছিল নিশীথের। ফাদার উঠছেন ব'লে নিশীথ এবার তাড়াতাড়ি ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে যাওয়ার আগেই নিশীথের মনে হ'ল যে, ডাক্তার প্রধান বোধ হয় টাকাপয়সার স্ববিধে পাওয়ার জন্তে ধর্মাস্ত্র গ্রহণ করেন নি। এত খারাপচরিত্রের মাহুয় তিনি নন।

ফাদার হেনরি উঠে পড়েছেন দেখে মিস জয়া বহু জিজ্ঞাসা করলেন, গীর্জার প্রার্থনা-সভায় কি অমিতাভর সঙ্গে আপনার দেখা হয় নি?

প্রশ্ন শুনে ফাদার হেনরি পুনরায় ব'সে পড়লেন সোফার ওপর। হাসতে হাসতে তিনি বললেন, সেখানে তার সঙ্গে দেখা হবে কি ক'রে? সে তো খ্রীষ্টান নয়। তা ছাড়া আমার যতদূর বিশ্বাস, অমিতাভ কোন ধর্মই মানেন না। অমিতাভ সেন সন্দেশে আপনার এতবড় ভুল হ'ল কি ক'রে, মিস বোস? জয়া বহু একটু অপ্রস্তুত বোধ করলেন। অমিতাভ সেন ছিল তাঁর দার্শনিক-গুরু।

হঠাৎ তিনি কেন তবে আজ ওর সন্দেশে এমন একটা মন্তব্য ক'রে বসলেন? একটু ভেবে নিয়ে জয়া বহু বললেন, সেদিন অমিতাভ রিলকের একটা কবিতা পাঠ করছিল—বলাহুবাদ। পৃথিবীতে এত কবিতা থাকতে, সে কেন যে বিশেষ ক'রে ওই 'পিয়েতা' কবিতাটার অহুবাদ করেছিল তার অর্থ বুঝতে না পেরেই হয়তো আমি তার সন্দেশে আজ এতবড় ভুল ক'রে বসলাম! কিন্তু সত্যিই কি আমার ভুল, ফাদার?

ভুল—মারাত্মক ভুল। অমিতাভ সেন কবি। কাল ওকে দিয়ে আমি গর্জদ ফন ল ফর—এর একটা কবিতা বাংলায় অহুবাদ করিয়ে নিয়েছি। কবিতাটির নাম হচ্ছে "খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রতি স্তবগান"। কবিতাটি শুনে আপনার দ্বিতীয়বার ভুল হওয়ার ভয় আছে।

কবিতাটা সঙ্গে আছে কি?

বোধ হয় আছে। ফাদার হেনরি তাঁর ক্যাসকের পকেট হাতড়ে একটা নোট-বই বার করলেন। সেই বই থেকে একটা আলাদা কাগজের টুকরো টেনে নিয়ে তিনি বললেন, আপনি পড়ুন, আমি শুনি।

মিস জয়া বহু নীচু গলায় ধীরে ধীরে পড়তে লাগলেন—

"এবং কহিল এক কণ্ঠস্বর:

করিব অন্তরে প্রবেশ এক অন্তহীন দেশের, তার

লাগি পাহুকা মোর ফেলিতেছি খুলিয়া, আর
নখর মোর মাঝে আছে বাহা কিছু সমস্ত তাহা

দিতেছি ছাড়িয়া অঙ্গ হতে।

জীবনের মোর বহুস্তম্বন হে উৎস-সকল, হও তবে

উদ্ভিত।

পাতকের হে মোর সকল কৃষ্ণ-বিহঙ্গ, মোর রাজির

দিকে এসো আজি উড়িয়া,

মেলিয়া পক্ষ তব এসো নেমে ধরা 'পরে, মোর কাছে,

তড়িৎবেগে।

বাসনা আজি প্রাণে, লাভতে মোর ভগবান, প্রবেশ

করিব মম নিবিড়তম যাতনায়।

যাতনাই বিশ্বমাঝে মহান, তা যে শক্তিময় অনন্ত।

সেই শাস্ত প্রেম, আদিয়া যাহার মাঝে পড়িতেছে

ভাঙিয়া স্বর্গ-মর্ত্য-লোক,

তারও ভার বহিতেছে যাতনা।

হে পুণ্য ভগবান! হে সবল ভগবান! হে অসীম
ভগবান!

হে মোর পাপ-নিম্নে অধিষ্ঠিত ভগবান, হে মোর
দীনতা-নিম্নে অধ্যুষিত ভগবান,

হে মোর মৃত্যু-নিম্নে উপনিবিষ্ট ভগবান,
তব ক্রুতের উপর আমি মোর অধর-গুণ নিবেদন
করিলাম।

তব মহাক্রুশের উপর আমি মোর আত্মা সমর্পণ
করিলাম।

পড়া শেষ হওয়ার পরে জয়া বহু চুপ করে বসে
রইলেন। হয়তো কবিতাটির অর্থ তাঁর কাছে এখনও
পরিষ্কার হয় নি।

ফাদার হেনরি বললেন, আমি এবার চলি। কাল রাত
থেকে অমিতাভ অস্থস্থ হয়ে পড়েছে।

কি অস্থস্থ?—জ্ঞানতে চাইলেন জয়া বহু।

বোধ হয় সর্দি-জ্বর। ভয়ের কোন কারণ নেই। হু
ফোটা ওষুধ খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি কি ওকে দেখতে যেতে পারি না, ফাদার?

একটু অস্থস্থ আছে। ওখানে যে মহিলাদের
প্রবেশাধিকার নেই। এটা গীর্জা-কর্তৃপক্ষের আইন।

তা হলে অমিতাভকে এখানে আনানো যায় না?
দরজার ও-পাশ থেকে নিশীথ ঘরে ঢুকল। জয়া বহুর
দিকে চেয়ে সে বললে, অমিতাভবাবুকে ডাক্তার প্রধান
এই মাত্র দেখে এলেন। জ্বর খুব সামান্যই আছে।
তাকে এখন টানাহেঁচড়া করবার দরকার নেই।

হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই ভাল।—সায় মিলেন ফাদার হেনরি।
তারপর তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মিস জয়া
বহু কবিতা-লেখা কাগজটার দিকে চেয়ে ছিলেন। বোধ হয়
মনে মনে দ্বিতীয়বার পড়ছিলেন তিনি।

নিশীথ বললে, কাগজটা বোধ হয় ফাদার হেনরির—
ও, হ্যাঁ। ছুটে গিয়ে দিয়ে আসতে পারবি?
পারব।

আচ্ছা, থাক। আমার জন্মেই ফাদার হেনরি বোধ হয়
কবিতাটা নিয়ে এসেছিলেন। অন্তত আর একবার পড়তে
কোন আপত্তি নেই, বুঝি নিশীথ?
বুকেছি দিদিমণি।

[ক্রমশ]

জ্যোৎস্না-রাত্রি

সুশীলকুমার গুপ্ত

অপরূপ জ্যোৎস্না-রাত্রি এসেছিল কাল।

বুমাতে পারি নি আমি। বাতাস উত্তাল
ডেকেছে আমাকে শুধু খোলা জানালায়,
যেখানে ফুটেছে ফুল মাধবীলতায়।

আশ্চর্য ভোরের স্বপ্নে স্বর্ণচাঁপা-শাখে
বিনীত পাখির মত এ হৃদয় কাকে
ডেকে ডেকে হয়েছে অস্থির। জ্যোৎস্নাধারে
প্রাণপাত্র ভরে কারে দিতে গেছি ধারে।

নিদ্রিত সঙ্গীত কত জেগেছিল মনে
হাওয়ার দোলায়। মায়া-জ্যোৎস্নার দর্পণে
দেখেছি বিশ্বত মুখ। শবরী তারার
নয়নে পড়েছি মহাকাব্য প্রতীকার।

এ জ্যোৎস্না-রাত্রির স্পর্শে অহল্যা নিখিল
জাগে নবরূপে; আসে প্রেম ঝিলমিল।

দা—খে-নি-কা-না-কে-তিন্।—স্বভাব শেষ রাত্রির গায়
সুন্ধতার বৃকে তরঙ্গ ভুলে তবলা-সহরার শব্দটা
মিলিয়ে যাচ্ছে রাধাচরণ মুখুজ্জের পাটের ক্ষেতের ওপর
দিয়ে শিবভলি ছাড়িয়ে বহুদূরে। রতন বাঁড়ুজ্জ এক দ্রুত
বাক্সিয়ে চলছে যে, তার আঙুলগুলো চোখে পড়ছে না।
বাক্সনার তালে তালে তার মন ভেসে চলে গেল স্বভাবের
নদী বেয়ে বহুদূর অতীতে।

কী দিনই ছিল! সে আসরে বসলে যে কোন ওস্তাদের
বৃক ছরছর করে কেঁপে উঠত। পাবনার এক গ্রামের
দরিদ্র ব্রাহ্মণ-বংশের ছেলে সে। বাপ-পিতামহের বংশাঙ্ক-
ক্রমিক পুরোহিতের ব্যবসায় মনোযোগ না দিয়ে বাঁড়া-তবলা
নিয়ে সে হাত সাধত সেই দশ বছর বয়স থেকে। কুড়ি
বছর বয়সেই তার যশোসৌরভ ছড়িয়ে পড়েছিল পাবনা
জেলা ছাড়িয়ে সারা বাংলা দেশে। একবার নিখিল-
ভারত সঙ্গীত-সম্মেলন থেকে তবলা বাজানোর নিমন্ত্রণ
এসেছিল তার। সেই সঙ্গীত-সম্মেলনীতে যোগ দেওয়ার
জন্ত সে স্বদূর পাবনা থেকে পদ্মা আর গঙ্গা পাড়ি দিয়ে
নৌকো করে এসেছিল কলকাতায়। তার বাজনা শুনে
আসরের মাঝখানেই তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ ওস্তাদ আল্লাবক্স
উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন।

তার পিঠ চাপড়ে তিনি বলেছিলেন, সাবাস্ বেটা,
সাবাস্। একটি হীরে-বসানো আংটি আল্লাবক্স তাকে উপহার
দিয়েছিলেন। জীবনের সব চাইতে বড় পুরস্কার সেদিন
পেয়েছিল রতন বাঁড়ুজ্জ। চোখে তার আনন্দ-উচ্ছ্বসিত
অশ্রু ছলছল করে উঠেছিল। তার দশ বছর বয়সে যে
সাধনা সে শুরু করেছিল, তা সার্থক হয়েছিল তার ছাব্বিশ
বছর বয়সে। সেদিন মন ভরে গিয়েছিল রতন বাঁড়ুজ্জের;
বৃকে ভুলে উঠেছিল গর্বের উল্লাস। ওস্তাদ আল্লাবক্স
বলেছিলেন, বাংলা দেশের অজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে থেকে
কি করবে? চল, আমার সঙ্গে লক্ষ্মী চল। সারে
হিন্দুস্থানের দরবারে তোমার সুনাম ছড়িয়ে পড়বে।
লক্ষ্মী! সেই হাসিনাবাদ, ইমামবাড়া, চকবাজার আর
ছাত্তারমঞ্জিলের দেশ! যেখানকার আকাশে বাতাসে
ছড়িয়ে আছে বিস্তৃত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের স্বরে লয়ে

বিস্তারে নানা রাগ-রাগিণীর আলাপ! রতন বাঁড়ুজ্জের
চোখে স্বপ্ন নেমে এসেছিল। যাবে, যাবে, সে নিশ্চয়ই
যাবে—তার বৃকের ভেতরে লক্ষ্মীতে যাওয়ার বাসনা
বলিষ্ঠ স্বপ্নের মত উঁচু হয়ে দাঁড়াল। ভালিমের দানার
মত ঠোটে ঝিলিমিলি হাসি ফুটিয়ে হীরাবাঈও বলেছিল,
আপনি এত বড় তবলচী! এখানে পড়ে থাকবেন কেন?
চলুন আমাদের সঙ্গে। মুখ্য অপসক চোখে সে মুহূর্তের
জন্ত তাকিয়ে ছিল, রতন বাঁড়ুজ্জের মুখের দিকে। ইয়া,
তাকানোর মত তার চেহারা ছিল বই কি! ছুধে-আলতা
মেশানো ছিল তার গায়ের রঙ। একমাথা ঘন কৌকড়ানো
চুল। ছোট ছোট ছোটো উজ্জল চোখে প্রতিভার দীপ্তি।
কিন্তু—

কিন্তু গোল বাখাল আল্লাবক্সের তবলচী ইয়াকুব।
ওস্তাদের মুখে রতন বাঁড়ুজ্জের অজস্র প্রশংসা যেন তার
কানে গরম তরল নীচে ঢেলে দিয়েছিল। সে আসরের
এক কোণে বসে হিংসায় জ্বলে-পুড়ে মরছিল। কুটিল
চোখে বার বার তাকিয়ে দেখছিল রতন বাঁড়ুজ্জের ফতুরার
নীচে সাধা বকবক পৈতাটার দিকে। যখন বাপ-মা,
বাড়িদর, জমি-জমা সমস্ত বন্ধন অগ্রাহ্য করে রতন বাঁড়ুজ্জ
যেতে প্রস্তুত, এমনি সময় একদিন গভীর রাতে নিরালায়
ডেকে চোখের কোণা দিয়ে তাকিয়ে ইয়াকুব তাকে
বললে, ঠাকুর, বলি যাচ্ছ তো! ওস্তাদের দলে থাকতে
গেলে কিন্তু তোমাকে অনেক মাশুল দিতে হবে।

কোন মাশুল দিতে আমি প্রস্তুত নই। আমি তো
যেতে চাই নি, ওস্তাদই তো আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন।

না—না, সে মাশুল নয়—খেড়িয়ে একটু হেসে ইয়াকুব
বলেছিল, ঠাকুর, তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি সৎ ব্রাহ্মণের
ছেলে। কিন্তু ওস্তাদের দলে থাকলে তোমাকে জাত
খোয়াতে হবে।

কেন?

গাঁজা মদ একটু খেতে হবে। আর বাড়ীজীদের সঙ্গে—
কি! বাঁ-বাঁ করে উঠেছিল বাঁড়ুজ্জের কান দুটো।
মুহূর্তে তার মনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল বংশাঙ্কক্রমিক
সংস্কার।

গাঁজা! মদ! বাঁড়ী! না, না, সে অসম্ভব! আমার বাবা যে স্মরণীয় না ক'রে জল পর্যন্ত খান না।

মুসলমানদের ছায়া মাড়ালে আমাদের স্নান করতে হয়—

ছায়া নয়। মুসলমানের মেয়ের এঁটো মদ খেতে হবে।—
হো-হো ক'রে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল ইয়াকুব। ছুটে পালিয়ে
গিয়েছিল রতন বাঁড়ুজ্জ। রাত্রির সেই নিবিড় অন্ধকারে
গম্বার বৃকে নৌকা ভাসিয়ে সে কলকাতা ছেড়ে এসেছিল...

আঃ, এই ভোর রাতে কেন জ্বালাতন করছ? একটু
ঘুমিয়েও নিস্তার নেই—যেন পেতলের বাসন কেউ নখ দিয়ে
আঁচড়াচ্ছে এমন কর্কশ গলায় লেপের ভেতর থেকে বললে
রতন বাঁড়ুজ্জের গিন্নী নিস্তারিণী। বাঁড়ুজ্জের কিন্তু কোন
জ্বরে নেই। এক মনে সে বাজিয়ে চলেছে। কানেও
আজকাল কম শোনে সে। বয়স হয়েছে প্রায় বাহাস্তরের
কাছাকাছি। মাকড়সার জালের মত অজস্র রেখা পড়েছে
মুখে। ঝুলে পড়েছে গলার চামড়া গলকবলের মত।
চোখের জ্যোতিও ক'মে এসেছে। আপাদমস্তক লেপ
মুড়ি দিয়ে নাক মুখ পর্যন্ত ঢেকে জোড়াসন হয়ে ব'সে
কালের ওপরে বাঁয়া আর বিছানার ওপরে তবলা রেখে
তন্ময় হয়ে সে বাজাচ্ছে। বাঁশের কবির ওপর মাটি-লেপা
ঘরের এক কোণে কালি-পড়া একটা লঠন জ্বলছে। সেই
স্নান স্তিমিত আলোয় ঘরের চারিদিকে দারিদ্র্যজীর্ণ এই
পরিবারের হতশ্রীর চিহ্ন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ঘরের এক
কোণে দড়ির ওপরে ঝুলছে কয়েকটা ময়লা শাড়ি, দু-একটা
ছেঁড়া জামা। তার উল্টো দিকে থাকে থাকে সাদানো
আছে হাতলভাঙা তোবড়ানো বাস্ক-তোবড়ের স্তম্ভ। মুখ
নীচু ক'রে চোখ বুজে রতন বাঁড়ুজ্জ তবলা বাজাচ্ছে আর
তার ফাটা ফাটা বেগুনী টোটার কোণায় কোণায় ফুটে
উঠেছে হাসির আভা। হয়তো পয়তাল্লিশ বছর আগে
আল্লাহক্সের প্রশংসাদীপ্ত সেই গৌরবোজ্জ্বল দিনের স্মৃ-
তির আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার মনের ভেতরটা।

তোমার তবলার বোল শুনেই চোর কি পালাবে
ভেবেছ?—কাঁজালো গলায় আবার ব'লে উঠল
নিস্তারিণী—তোমার এই ভাঙা ঘরে কি এমন মহামূল্যবান
সম্পত্তি আছে শুনি?

তোকে কে বলেছে, আমি চোর তাড়ানোর জন্তে

বাজাই? হাত মাথতে হবে না?—চীৎকার ক'রে রুখে
উঠল রতন বাঁড়ুজ্জ। রেগে গেলেই সে জীকে 'তুই'
সম্বোধন করে। রোজ ভোররাতে এই তবলার শব্দে
পাড়ার লোকও আপত্তি তুলেছিল। রতন বাঁড়ুজ্জ তাদের
বলেছিল, ভেবে দেখুন, আপনাদের উপকারই করি।
ভোরে গৃহস্থের গাঢ় ঘুমের সম্বোধন নিয়ে চোর চুরি করে।
আমাদের পাড়ায় যে চুরি হয় না, তার কারণ আমার
তবলা। তার যুক্তি শুনে চুপ ক'রে গিয়েছিল পাড়ার
লোকে। আশুন-বরা চোখে কয়েক মুহূর্ত জীর দিকে
তাকিয়ে হঠাৎ মুখটা বিকৃত ক'রে বললে বাঁড়ুজ্জ, ওরে
আমার মহারাণী রে! তবলার শব্দে শনার নিদ্রার
ব্যাঘাত হয়! বা, ওঠ, উঠোনে গোবর জলের হড়া দে
গে যা—

অসভ্যের মত কথা ব'লো না বলছি।—লেপের ভেতর
থেকে ক্রুদ্ধ সাপিনীর মত ফুঁসে উঠল নিস্তারিণী।

কেন? কি করতে পারিস তুই?—মোটো একটা
কাঁথা গায়ে জড়িয়ে নিস্তারিণীর তক্তাপোষের দিকে
এগিয়ে এল। নিস্তারিণীর পাশেই গভীর ঘুমে অচেতন
বাইশ বছরের অনুচা মেয়ে শেকালীর দিকে ইঙ্গিত ক'রে
বললে, তুই ভেবেছিল, তোর ছাপড়াল চাকরি করে ব'লে
তোকে আর পায় কে, না? দেখি তোর ঐ হাতীর মত
মেয়েকে কে বিয়ে দেয়! তোর ব্যাটা কামাই ক'রে টাকা
পাঠাচ্ছে আর তুই মজা ক'রে জমাচ্ছিস! তুই আর তোর
ব্যাটা বেটা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল
হারামজাদী!—নরুন-চেরা ছোট ছোট ছোটো চোখ আরও
কুঁচকে সে নিস্তারিণীর দিকে তাকাল। নিস্তারিণী আর
একটা কথা বলল না, পাশ ফিরে সে লেপের ভিতরে
তলিয়ে গেল। সে ভাল ক'রেই জানে, আরও কিছু
বলেই অল্লীল কথার ঝড় উঠবে; দুর্গন্ধযুক্ত কাঁদার মত
বত নোংরা কথা ছিটকে আসবে সারা মুখে গায়ে। সে
বুক উজাড় ক'রে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। তার
সুদীর্ঘ পয়তাল্লিশ বছরের দাম্পত্যজীবনে এই মালুমটা তাকে
কোনদিন কোন সময় ভাল ক'রে একটা কথা বলেছে কি না,
তার মনে পড়ে না। অসহ্য একটা যন্ত্রণার পীড়নে জ্বলে
যায় তার মাথার ভেতরটা। কতবার তার মনে হয়েছে,
'হুস্তোর' ব'লে সব ছেড়ে ছুড়ে সে চ'লে যাবে তার ছেলে

দীহর কাছে এলাহাবাদে। সেখান থেকে মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বারে গিয়ে কিছুদিন তীর্থধর্ম করে আসবে। কিন্তু—

কিন্তু কস্তাদাদের হুশিয়ারিটা যে এই দরিদ্র সংসারে চেপে রয়েছে বিশ মণ ভারী একখানা পাথরের মত। পাড়ায় ছুপ্তরের মেয়ে-গজালির আসরে নিস্তারিণী বলে, আমার মনে শাস্তি নেই ভাই। কি যে করি! দেখতে দেখতে তো মেয়ের বয়স কম হ'ল না। এই বুকে আর গলায় ক'রে আগলে রেখেছি। কোথাও এক পা বেরোতে পারি না।

শেফালী। রতন বাঁদুজের একমাত্র কন্যা। গোল পুরুস্ত মুখ। সাদা ধবধবে গায়ের রঙ। মাজা পর্যন্ত ভেঙে পড়া কালো চুলের রাশ। বড় বড় দুটো কালো চোখে বিষাদের ছিটে। তাকে কেন্দ্র করেই গরিবের সংসারে যত বিরোধ, যত অশান্তি ঘনীভূত হয়ে ওঠে। এক এক সময় রাগে ছুঃখে অপমানে শেফালীর ইচ্ছে করে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে। অনেকবার দীননাথ ভাল পাত্রের খোঁজ দিয়ে এলাহাবাদ থেকে চিঠি দিয়েছে তার বাবাকে। কিন্তু পাত্রের চাহিদা শুনে বাড়িতে ব'সেই রতন বাঁদুজের বাতিল ক'রে দিয়েছে ছেলের প্রস্তাব। রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে সে নিস্তারিণীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, আমরা রাঢ়ী শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ। আর আমার মেয়ে স্তম্ভরী। সারাজীবন আমি পুরুতগিরি ক'রে যে এক হাজার টাকা জমিয়েছি, তার এক পয়সা বেশী খরচ করব না মেয়ের বিয়েতে। এতে মেয়ের বিয়ে হোক কি না হোক।

ধারকর্জ ক'রেও তো মাহুষ মেয়ের বিয়ে দেয়।—বলে নিস্তারিণী, কথায় বলে কস্তাদায়—

চুপ ক'রে থাক তুই।—ফাটা বাঁশের মত গলায় টেঁচিয়ে ওঠে রতন বাঁদুজ, ভিটেমাটি ঘরবাড়ি সব বেচে তোর গর্ভজাত ওই মোঘের মত মেয়ের বিয়ে দিয়ে কি শেষ পর্যন্ত না খেয়ে পেটে গামছা বেঁধে প'ড়ে থাকব? তার চোয়াল দুটো খিলের মত এঁটে বসে দু'গালে। দাঁতে দাঁত ঘ'ষে আবার সে বলে, প্রলয়করী জীবুদ্ধি যত সব—

আশ্চর্য মাহুষ এই রতন বাঁদুজ। এমন নিপুণ শিল্পী। যার আঙুলের ললিতবিজ্ঞাসে বাঁমা-তবলায় কাহারবা দাদরার মধুর বন্ধারে শত শত জনতা কেমন আচ্ছন্ন, কেমন বিবশ হয়ে যায়। সেই ডাকসাইটে তবলচী রতন

বাঁদুজের কিন্তু সংসারে বিশ্বাস করে না কাউকে। জন-মজুরেরা ফাঁকি দেবে ব'লে সে নিজে এই বয়সে চৈত্রেয় আশ্বিন-ঝরা বোদ মাথায় ক'রে বাড়ির পাশে আনারসের বাগানে বেড়া বাঁধে। সে মাছের বাজারে গেলে খুব ঝাঙ্ক মাছওয়ালারও কপালে বিরক্তির রেখা ফুটে ওঠে। কেননা মাছের সের যদি হয় পাঁচ সিকে, তা হ'লে মাছওয়ালার সামনে ব'সে ঠিক ছয় আনা থেকে শুরু ক'রে দর করতে করতে শেষ পর্যন্ত দশ আনা সেরে মাছ কিনে তবে ছাড়বে। তারপর ডান হাতে শালপাতার চৌড়ায় মাছ আর বাঁ হাতে একটা ছোট কঞ্চি নিয়ে আকাশের দিকে উচিয়ে খুব সম্বর্ণপণে শহরের সদর রাস্তা ধ'রে বাড়ির দিকে ফিরবে। কঞ্চিটা ভাইনে বাঁয়ে তুলিয়ে সেই নক্ষত্র-চেরা দুটো চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘন ঘন তাকাবে আকাশের দিকে, যদি ছোঁ মেয়ে চিল তার মাছ নিয়ে যায়! বিশ্বাস নেই কাউকে।

“মহাকালের কোলে এসে গোঁরী হ'ল মহাকালী—”

বিকেলের কোমল বিষম ছায়া নেমেছে চারিদিকে। বাঁদুজের খুব প্রিয় গায়ক যতীন ঋপদ গান ধরেছে। পশ্চিমের আকাশে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে গাঢ় লাল রঙের ঝিলিমিলি। বাঁদুজের বাগানে বৃন্দাবনী আমগাছের পাতায় পাতায় রঙের ছিটে। যতীনের ভরাট গলায় ঋপদ গানের মধুর স্বরের মূর্ছনা শিবতলির ফাঁকা সু-ধু মাঠের ওপর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে বহু দূরে। আর রতন বাঁদুজের মাথা নীচু ক'রে তন্ময় হয়ে পাখোয়াজের বুকে মেঘমল্ল গজীর আওয়াজ তুলে সদত করছেন ঐ গানের সঙ্গে। আধুনিক গায়ক আর আধুনিক গান একেবারে সহ্য করতে পারে না বাঁদুজ। ‘তুমি গাও আমি শুনি, আকাশের তারা শুনি’, ‘বিরহের বালুচর’, ‘ভালবাসা ভিখারী’—ওসব আবার গান না কি?

স্বপ্নায় রিবি ক'রে ওঠে বাঁদুজের মনটা। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মত দীর্ঘ আলাপের বিস্তার নেই, নেই ধ্যান-গজীর ব্যাপ্তি আধুনিক গানে। আধুনিক গান যেন কোন দুর্বল মাহুষের রোগজর্জর জীর্ণ দেহের ওপরে ঝলমলে সিন্ধের জামা। ‘মহাকালের কোলে—’ পর্যন্ত গেয়েই মাথাটা ঝাঁকিয়ে পাখোয়াজের আওয়াজের সঙ্গে তাল রেখে খেয়ে গেল যতীন।

বাহবা।—উচ্ছসিত হয়ে ব'লে উঠল রতন বীড়ুজ্জ।
গান শেষ ক'রে এক খিলি পান মুখে পুরে দিল যতীন।
আবেগভরা গলায় বীড়ুজ্জ বললে, নাও হে যতীন, এবার
একটা টোড়ী খর তো।

তানপুরায় বন্ধার তুলল যতীন।

ইনসিওর আছে, ইনসিওর—নিস্তারিণী দেবী।—
বাইরে বাদামগাছের নীচে দাঁড়িয়ে হেঁকে উঠল পিওন।

ছিলে—হেঁড়া ধনুকের মত তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠল
রতন বীড়ুজ্জ। তার চোখ-ছোটো সাপের জিভের মত
চিকচিক ক'রে উঠল। চিংকার ক'রে বললে, থাম, থাম
হে, বাচ্ছি।

কিন্তু আপনাকে তো দিতে পারব না।—সবিনয়ে
পিওন বললে, ইনসিওর আছে নিস্তারিণী দেবীর নামে।
আমার সামনে তাঁকে সই ক'রে টাকা নিতে হবে।

কে পাঠিয়েছে?

দীননাথ ব্যানার্জি পাঠিয়েছে এলাহাবাদ থেকে।

ও, বাপকে বিশ্বাস নেই! গর্ভধারিণীর নামে টাকা
পাঠানো হয়েছে।—কথার শেষে কুকুরের কান্নার মত অদ্ভুত
শব্দ ক'রে হেসে উঠল রতন বীড়ুজ্জ, কত টাকা পাঠিয়েছে?
দেড় হাজার টাকা।

দেড় হাজার! কুৎসিত সম্ভ্রমকুটিল চোখে তাকাল
রতন বীড়ুজ্জ নিস্তারিণীর দিকে : যার মাইনে ছশো টাকা,
সে দেড় হাজার টাকা পাঠায় কি ক'রে? ছেলেকে
সরকারী তবিল তছরূপ করার বুদ্ধি দিয়েছিল না কি?
এই!—হেঁকে বললে বীড়ুজ্জ।

বুক অবধি ঘোমটা টেনে লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে
রইল নিস্তারিণী।

না দাদা, ও-সব বলছেন কেন বউমিকে?—বললে যতীন,
দীহু হয়তো তার প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে কি মাইনে
অগ্রিম নিয়ে বোনের বিয়ের জন্ত টাকা পাঠিয়েছে।
সরকারী চাকরিতে ধার নেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে!—অসহিষ্ণু হয়ে পিওন ব'লে
উঠল, কই আসুন, সই ক'রে টাকা গুনে নিন।

ধীর পায়ে এগিয়ে এল নিস্তারিণী। দোয়াত কলম
এগিয়ে দিল শেকালী। কাঁপা হাতে ধ'রে ধ'রে নিস্তারিণী
তার নাম সই ক'রে শিলমোহর-দেওয়া খামটা নিল। যতীন

ঠিকই বলেছে। খাম খুলতেই করকরে এক শো টাকার
পনেরটা নোটের সঙ্গে দেখা গেল দীহুর চিঠি। মাইনের
টাকা অগ্রিম নিয়েই সে টাকা পাঠিয়েছে। আগামী
অগ্রহায়ণেই সে শেকালীর বিয়ে ঠিক ক'রে ফেলেছে।
ছেলেটি চাকরি করে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে। দীহুর মেসেই
ধাকে। ছগলীর ধনিয়াখালী গ্রামে ছেলের কিছু জমি-
জমা আর একটা পাকা বাড়ি আছে। দীহু আরও লিখেছে,
বাবার এক হাজার আর এই দেড় হাজার নিয়ে—শেকালীর
বিয়ে হয়ে যাবে। তিনি যেন কোনও আপত্তি না করেন।
আর ছেলের একটা ফোটোও পাঠিয়েছে দীহু—

না না, ওসবের মধ্যে আমি নেই—চিংকার ক'রে উঠল
রতন বীড়ুজ্জ, কোথাকার কোন্ অজ্ঞাতকুলশীল ছেলে!
তার সঙ্গে আমি আমার মেয়ের বিয়ে দিতে পারি না।
তাও যদি তোমরা বিয়ে দাও, তা হ'লে একটি পয়সা আমি
দেব না।—পৈশাচিক বিকৃতিতে তার চোখের তারা ছোটো
কাঁপতে লাগল। তার এষাড়ে-থেষাড়ে মুখটা কেমন নিষ্ঠুর
হয়ে উঠল। রাগে হুপহুপ ক'রে পা ফেলে, নামাবলীটা
গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে গেল রতন। বড় ঘরের বারান্দায়
পাথুরে মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে বসে রইল নিস্তারিণী।
তার হু গাল বেয়ে ঝরছে অশ্রুর শীর্ণ ধারা।

শহরের একেবারে পশ্চিম দিকে আতাই নদীর ধারে
জেলোপাড়া। এ অঞ্চলে জেলোদেবকে 'মালো' বলে সবাই।
দশরথ মালো বেশ পয়সাওয়ালা লোক। তার ধানের
গোলায় সামনে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় হাঁক দিল রতন
বীড়ুজ্জ, দশরথ, একবার এদিকে এস তো?

আরে ঠাকুরমশাই যে, কি ব্যাপার?—একগাল হেসে
বেরিয়ে এল দশরথ : পেন্নাম ঠাকুরমশাই।

বেশ দশরথ, বড় বিপদে পড়েছি।—কুতকুতে চোখ
ছোটো শাপিত দৃষ্টি চারিদিকে বুলিয়ে নিয়ে রতন বীড়ুজ্জ
বললে, আমার সহধর্মিণী, ছেলে—সবাই মিলে আমাকে
ফাঁকি দিচ্ছে। আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। এলাহাবাদে
চাকরি করে কোথাকার কোন্ এক ছেলের সঙ্গে আমার
মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছে দীহু। ওদের লক্ষ্য, আমার
আজীবনসঞ্চিত অর্থ এক হাজার টাকার দিকে।

তা ভালই তো ঠাকুরমশাই।—বুক অবধি ভেঙে পড়া
কালো কুচকুচে দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললে দশরথ,
আপনার ছেলে নিজের যখন বিয়ে ঠিক করেছে—

না না, তুমি বুঝ না, তুমি বুঝ না দশরথ—বাকুল
গলায় বললে রতন বাঁড়ুজ্জ, চক্রান্ত! চক্রান্ত! আমার
টাঁকাটা ধ্বংস করে আমাকে না খাইয়ে মারার মতলব।
যেমন-তেমন একটা বিয়ে দিয়ে মেয়েটাকে জলে ভাসিয়ে
দিয়ে, মাকে নিয়ে চলে যাবে দীহু এলাহাবাদে। আর
বুড়ো বাপ—থাক্ ব্যাটা তুই শুটকি হয়ে। আজকালকার
ছেলেদের তুমি জানো না দশরথ।

কিন্তু আমি কি করতে পারি?

তুমি যে আমাকে একদিন বলেছিলে দশরথ, রাঙামাটি
গ্রামে তোমার ছেলের বন্ধু এক বামুনের ছেলে আছে।
হোক দোজবরে। থাক্ ছ-একটা ছেলে। পরমা কড়ি
তো কিছু লাগবে না! তুমি ঠিক করে দাও ভাই। চল
চল, তুমিই না হয় আমার মেয়েটাকে দেখে আসবে?

সে কি? আমি জেলে হয়ে বামুনের মেয়ে দেখতে
যাব? পাড়ার লোক কি বলবে।

না না, কেউ কিছু বলবে না।—তুমি চল ভাই।

বাঁশের বেড়াঘেরা রান্নাঘরে বসে কেরোসিনের ডিবে
মিটিমিটি আলোয় রান্না করছে নিস্তারিণী। বাতাসে
ভাসছে ডাল-সোণারের গন্ধ। অন্ধকার উঠানের এক
কোণ থেকে ভেসে উঠল রতন বাঁড়ুজ্জের কর্কশ গলায়
আওয়াজ : এই শেফালী, যে ভাবে আছিল সেই ভাবেই
বেরিয়ে আয়—তাকে দেখতে এসেছে দশরথ।

দশরথ! ধরক করে উঠল নিস্তারিণীর বকের ভেতরটা।
উত্তেজনা তার মনের ভেতরটা তোলপাড় করে উঠল।
বেড়ার ফাঁকে চোখ লাগিয়ে দশরথকে দেখেই তার রক্তে
যেন আগুন ধরে গেল।

রান্নাঘর থেকে চাপা তীক্ষ্ণ গলায় বাঁড়ুজ্জকে ডাকল
নিস্তারিণী, শোন, এদিকে এস।

জানি, তোর মত হবে না।—চোখের কোণা দিয়ে তার
দিকে তাকিয়ে বললে বাঁড়ুজ্জ, শোন, দশরথের ছেলের
বন্ধু নিবারণ চট্টোপাধ্যায়। আড়াই শো বিঘে ধানী জমি
আছে ছেলের। তবে একটু খুঁত, ছেলে দোজবরে।

না, না, শীগগির বিদেয় করে দাও দশরথকে।—
কামান্ধরা আঁতর্গলায় চিংকার করে উঠল নিস্তারিণী,
ছিঃ ছিঃ, জেলেকে নিয়ে এসেছ বামুনের মেয়ে দেখাতে?

ও, তোর বুঝি আড়াই-হাজারী জমাইকেই চাই?

দেখ, দশরথকে বিদেয় করবে কি না বল।—তীব্র তীক্ষ্ণ
গলায় চিংকার করে উঠল নিস্তারিণী। রাগে উত্তেজনা
তার বুকটা হাঁপরের মত ওঠানামা করতে লাগল। খসে
পড়ল মাথার কাপড়। চোখ দুটো যেন ছ'খণ্ড আগুনের
মত চক চক করে উঠল। হঠাৎ ছুটে গিয়ে রান্নাঘরের
এক কোণ থেকে মাছ-কাটা বাঁটটা তুলে নিয়ে উগ্র গলায়
বললে, শোন, ভাল চাও তো। দশরথকে বিদেয় কর, না
হলে এই বাঁট আমি নিজের গলায় বসিয়ে দেব। তার
চোখের দিকে তাকিয়ে কেমন ভয় পেয়ে গেল রতন,
তাড়া খাওয়া জন্তর মত রান্নাঘর থেকে নেমে দশরথকে
নিয়ে বাইরের জমার অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তিন দিন পর। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে নেমেছে
রতন বাঁড়ুজ্জের বড় বড় আমগাছে ঘেরা আনারসের
বাগানে। রতন বাঁড়ুজ্জ বাঁয়া-তবলা নিয়ে সিঁতিল
সার্জনের বাড়িতে গানের জলসায় গিয়েছে, তার ফিরতে
রাত হবে। বড় ঘরের বারান্দায় প্রদীপের আলোতে
মহাভারত পড়তে পড়তে নিস্তারিণীর চোখ দুটো তন্দ্রায়
জড়িয়ে এসেছে। নিঃশব্দ পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল
শেফালী। সে বিচিত্র সাজে সেজেছে আজ। তার তদ্বী
দেহটা পাক দিয়ে উঠেছে ডুবে নীল শাড়ি। মস্ত বকবকে
সুগঠিত ঘাড়ের ওপরে ঝুলছে আঁট করে বাঁধা মস্ত কালো
খোঁপা। খোঁপায় পরেছে রূপোর ফুল-বসানো সস্তা
কাঁটা। এক মুহূর্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে কি ভেবে
প্রদীপটা নিয়ে সে জন্তপায়ে ঘরে এল। তার বকের
ভেতরে ভয়ের ধুকপুক। তবুও কোঁতুল হুঁপবার।
তার মাজা মাজা মুখে হাসি লজ্জা ভয়ের বিচিত্র একটা
ছাপ পড়ল। সে নিস্তারিণীর বিছানার তোশকটা উল্টে
বের করল দীহুর পাঠানো সেই ইনসিওরের খামখানা।
খাম খুলতেই বেরিয়ে পড়ল, ইম্পিরিয়াল ব্যাকে চাকরি
করা সেই ছেলের ফোটো। মেটে প্রদীপের ছায়া-কাঁপা
আলোয় উৎসুক অপলক চোখে শেফালী তাকিয়ে রইল
ছবিটার দিকে। কি টানা টানা চোখ। ব্যাক-ব্রাস
করা ঘন কঁোকড়ানো চুল। চওড়া কপাল। পাতলা
ঠোঁট দুটোর কোণায় কোণায় ঝিলিমিলি হাসির আভা।
আলোবাতাসহীন শ্বাসরোধী অন্ধকার এই কুমারী-

জীবনের কারাগার থেকে তাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যাবে এই ছেলেটি। বাইশ বছরের মেয়ের চোখে স্বপ্ন নেমে এল। বিয়ে! বর! ঘর! ভবিষ্যতের সেই স্বর্ণছবি তার মনের আকাশে রামধনুর মত ঝিলমিল ক'রে উঠল। মাইনে পায় দেড় শো টাকা। তা চলে যাবে বেশ হুজনের। প্রথমেই ওর সিগারেট খাওয়া বন্ধ করতে হবে।

বাঃ! বাঃ! বেশ! হাসির ভঙ্গীতে মুখটা বিকৃত ক'রে দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বললে রতন বাঁড়ুজ্জে, বা রে। ধূসো মেয়ে লুকিয়ে, লুকিয়ে পরপুরুষের কোটো শেখতে লজ্জা করে না? যা না, যা, তোর কাপড়-চোপড় যা আছে বগলে পুঁটলি করে নিয়ে চ'লে যা ছেলের কাছে। ছেলের দোতলা বাড়ির কার্নিশ-খোয়া জল ধা গে যা—আকস্মিক রুঢ় কথার আঘাতে নিদ্রাক্ষণ লজ্জায় যেন পক্ষাঘাতের মত অসাড় হয়ে গেল শেকালীর সর্বাঙ্গ। আঁচলে মুখ ঢেকে ধরধর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ছিঃ ছিঃ, তুমি কি চায্য?—তীর ঘুঘায় জ্বলে উঠে বললে নিস্তারিণী, নিজের মেয়েকে তুমি এসব কি বলছ?

মাথাটা নীচু করে নিঃশব্দে মিটিমিটি হাসতে লাগল বাঁড়ুজ্জে।

রাত্রে খেতে বসে রতন বাঁড়ুজ্জে হাসিতে মুখটা উদ্ভাসিত ক'রে জীকে বললে, সিভিল সার্জেন কি রকম প্রশংসা করল পো জ্ঞান? বলল, বাংলা দেশ কেন, সারা ভারতবর্ষে নাকি আমার মত তবলচী সহজে মিলবে না।

আশ্চর্য! এই লোকটা এত মিষ্টি ক'রে কথা বলে কেন? সন্দেহের ধূসর ছায়া পড়ল নিস্তারিণীর মনে। হঠাৎ গলার স্বরটা নামিয়ে যতটা সম্ভব মধু ঢেলে দিয়ে বললে বাঁড়ুজ্জে, শোন গিন্নী, দীহুর টাকাটা আমাকে দাও। আমার কাছেই রাখি। তুমি যে ভুলো মানুষ।

না।—কাঁদিয়ে বললে নিস্তারিণী, টাকাটা আমি আমার বাবাকে রেখেছি। একেবারে বিয়ের সময় বের করব।

দেবে না?—ভাত ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রতন বাঁড়ুজ্জে। ক্রুদ্ধ সাপের মত হলে উঠল, তার শরীর। খর দৃষ্টিতে নিস্তারিণীর মিকে তাকিয়ে আকাশ কাঁপিয়ে চিংকার করে উঠল, বল্ টাকা দিবি কি না?

না। দেবে না।

দিবি না?—বন্দুকের গুলির মত ছিটকে বেরিয়ে গেল রতন বাঁড়ুজ্জে। উঠোনে দাঁড়িয়ে চিংকার ক'রে বললে, আচ্ছা দেখে নেব, কেমন ক'রে তুই মেয়ের বিয়ে দিস? ইঞ্জী হয়ে তুই স্বামীকে অবিশ্বাস করছিস।

প্রথম করছে মাঘের শীত। নিযুতি রাত। প্রথম রাত্রে বৃষ্টি হয়ে গেছে। কালো মেঘে ঢাকা আকাশ। রতন বাঁড়ুজ্জের আমগাছ ঘেরা আনারসের বাগানে ছুরন্ত হাওয়ায় শৌ-শৌ শব্দ। হাওয়ায় কাঁপা অজস্র পাতা থেকে টুপটাপ ক'রে বড় বড় ফোঁটায় জল ঝরে পড়ছে মাটিতে। খুব সম্ভবপণে পা টিপে টিপে রতন এগিয়ে এল নিস্তারিণীর বিছানার কাছে। তার বালিশের নীচ থেকে চাবির গোছা নিয়ে সে কাঠের সিন্দুক খুলে ফেলল।

লেপ তোশক আর ছেঁড়া কাপড়ে ভরা সিন্দুকের এক কোণে অ্যালুমিনিয়ামের কোঁটোটা অন্ধকারেও চকচক ক'রে উঠল। কোঁটো খুলে নতুন নোটের তাড়া স্পর্শ করতেই অদ্ভুত একটা মাদকতাময় অম্লভূতি ছড়িয়ে পড়ল বাঁড়ুজ্জের সারা শরীরে। টিপ টিপ ক'রে কাঁপছে তার বুকের ভেতরটা। লোভের আভাষ দগদগে ঘায়ের মত জ্বলছে তার কৃতকৃতে দুটো চোখ। নোটের গোছা কোমরে গুঁজে আলগোছে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সে উঠোনে নেমে এল। রামাঘরের ধারে আটখরী আর কালকাস্তুরের ঝোপের ভেতরে হামাগুড়ি দিয়ে সে এগিয়ে চলল। যেন ছুঁগেগের পটভূমিতে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে চলেছে একটা হিংস্র জন্তু। খড় খড় শব্দ ক'রে সে খড়ির ঘরের ঝাঁপটা খুলে ফেলল। কয়েক মুহূর্ত পরেই দূরে সদর রাস্তায় হেঁকে উঠল চৌকিদার—হে জাগো—জাগো—জাগো—

চমকে উঠল বাঁড়ুজ্জে। একটা অশরীরী ছায়ার মত চোখের পলকে এসে উঠল বড় ঘরের বারান্দায়। ক্রান্ত কুকুরের মত হাঁফাতে লাগল।

“মহাকালের কোলে এসে গৌরী হ'ল মহাকালী—”

সেই ভোরে পাখোয়াজে মেঘের ডাকের মত গুমগুম ধনি তুলেছে রতন বাঁড়ুজ্জে। চোখ বুজে মাথা নীচু ক'রে বাজাচ্ছে আর গুনগুন ক'রে স্বর ভাঁজছে। তন্দ্রা-জড়ানো চোখে সেই অপূর্ব বাজনা শুনে নিস্তারিণী। ভাবছে,

কত বড় গুণী তার স্বামী! কিন্তু সংসারের ব্যবহারিক জীবনে অত নিষ্ঠুর কেন?

বেলা বাড়ল। প্রতিদিনের মতই গায়ে একটা নামাবলী জড়িয়ে রতন বাঁড়ুচ্ছে মাছের বাজারে চলে গেল। কি একটা কাজে চাবি দিয়ে সিন্দুক খুলতেই হিম হয়ে গেল নিস্তারিণীর বুকের রক্ত।

শেফালী, কোটোর ভেতর থেকে টাকা কে নিল রে?— ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল নিস্তারিণী। শেফালী কিছুই বলতে পারল না। সারা ঘরের প্রত্যেকটি বাস্তু-বিছানা, মশারি তখনই করে খুঁজল নিস্তারিণী। দেড় হাজার টাকা! অদ্ভুত একটা ভয় তার বুকের হাড়ে হাড়ে জমাট বাঁধল। চোখের সামনে ঘনিয়ে এল পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার। হঠাৎ শেফালী বললে, মা, বাবা সরিয়ে রাখতে পারে তো টাকাটা।

ধ্বক করে জ্বলে উঠল নিস্তারিণীর চোখ দুটো। অবরুদ্ধ গলায় বললে, হ্যাঁ, তুই ঠিক বলেছিল।

কিছুক্ষণ পরেই মাছ কিনে বাজার থেকে ফিরল রতন বাঁড়ুচ্ছে। টলতে টলতে এগিয়ে এসে ক্লাস্ত করুণ গলায় বললে নিস্তারিণী, তুমি দীহুর টাকা সরিয়ে রেখেছ?

টাকা! আমি সরিয়ে রেখেছি মানে?—চিৎকার করে উঠল বাঁড়ুচ্ছে: আমাকে চোর বলতে লজ্জা করল না তোর? ঘরে চোর সিঁদ-টিদ কেটেছে কি না দেখেছিল?

তোমার পায়ে পড়ি গো। তুমি যদি নিয়ে থাক, তা হ'লে স্বীকার কর শুধু। টাকা আমি চাই না। তোমারই মেঘের বিয়ের টাকা।—তার পায়ের কাছে কান্নায় ভেঙে পড়ল নিস্তারিণী। কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করল না রতন বাঁড়ুচ্ছে।

দীহুকে চিঠি দিল নিস্তারিণী। দীহু জানাল, ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই। ও টাকা বাবাই নিয়েছেন। বিয়ের সময় বাবা দিয়ে দেবেন।

কয়েক মাস পর। গ্রীষ্মের ছপুনের রোদ মাথায় করে

সারাদিন আনারসের বাগানের বেড়া বেঁধে অস্থির পড়ল রতন বাঁড়ুচ্ছে। কাঁপুনি দিয়ে এল জ্বর। শঙ্কিত হয়ে উঠল নিস্তারিণী। টেলিগ্রাম করতেই দীহুও এসে পড়ল এলাহাবাদ থেকে। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, ডায়বেটিসের লক্ষণ। সেই সঙ্গে 'লো ব্লাডপ্রেসার'ও আছে। কখন কি হয় বলা যায় না।—

দিন সাতেক পর বাঁড়ুচ্ছের শরীরের অবস্থা আরও খারাপ হ'ল। থেকে থেকে কেমন বিচিত্র দৃষ্টিতে উর্ধ্বমুখে তাকাতে লাগল। কান্নার রোল উঠল বাড়িতে। বাঁড়ুচ্ছের বুকের ওপর ছমড়ি খেয়ে পড়ে নিস্তারিণী বললে, ওগো, এখনও বললে না, টাকাটা কোথায় রেখেছ?

বলব, বলব, নিশ্চয়ই বলব।—জড়িত গলায় বললে রতন বাঁড়ুচ্ছে। একটু পরে সে ডাকল, দীহু! ঘরের সবাই উৎকর্ষ হয়ে উঠল। হয়তো টাকাটার কথা বলবে এবার। বাঁড়ুচ্ছে বললে, দীহু, একবার যতীনকে ডেকে দিবি বাবা! ও-রকম রূপদ গান কিন্তু কেউ গাইতে পারে না।

ওগো, বলবে না? টাকাটা কোথায় রেখেছ? এমনি করে আমাদের জলে ভাসিয়ে যাবে?—ব্যাকুল হয়ে আর্ত-গলায় চিৎকার করে উঠল নিস্তারিণী।

দীহু, শোন।—বললে বাঁড়ুচ্ছে, আমার পাখোয়াজ, বায়ান্তবলা কাউকে দিবি না, বুঝলি?

হতাশ হয়ে গেল ঘরের সবাই।

রাত্রি বাড়ল। আসন্ন বৈধব্যের আশঙ্কাকেও ছাপিয়ে নিস্তারিণীর মুখে নেমে এল কন্যাধর্মের হুচিস্তার কালো ছায়া। চাপা কান্না থমকে রইল তার চোখে। টাকাটা কোথায় আছে বলে যেতে পারল না রতন বাঁড়ুচ্ছে।

কিন্তু টাকাটা ছিল। শুধু সেই টাকা নয়। দীহুর টাকার সঙ্গে বাঁড়ুচ্ছের এক হাজার টাকাও ছিল ওই খড়ির ঘরের বাঁশের খুঁটির ফোকরের ভেতরে। বছরের পর বছর বর্ষার জলে ওই খুঁটি জীর্ণ হয়ে যাবে, উইপোকায় টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলবে নোটের গোছাগুলো, ঠিক এমনি শেফালীরও তদ্বীদে উচ্ছল যৌবনের জোয়ারে ধরবে ভাঁটার টান; তার দুখে-আলতা-রাঙা কমনীয় মুখানায় বয়স তার রেখা আঁকবে একটার পর একটা।

বাইশে শ্রাবণ

শ্রীজয়স্বনাথ রায়

প্রত্যেক বছর ধরে, বারো মাস পরে পরে
ফিরে আসে একই দিন, একই সেই ক্ষণ
সময় বারোটা দশ, বাইশে শ্রাবণ !
চৈত্রের আতপ্ত বেলা, বৈশাখের কালো ঝড়,
আষাঢ়ের পুঞ্জ মেঘে বরষা-মল্লার—
শরতের শেফালিকা, হেমন্ত গোধূলি আর
ফাল্গুনের অজস্র সন্তার

বছরে বছরে আনে কত কথা কত গান
পঁচিশে-বৈশাখ-মাথা কত উপচার—
তবু সব ভুলে দেয় কোনো এক ক্ষণ,
জানালায় দেখি চেয়ে সমস্ত আকাশ বেয়ে
ঝরো-ঝরো বরষার অঝোর বর্ষণ ।
সেই সাথে মনে পড়ে আবার বছর পরে
ফিরে এল সেইদিন বাইশে শ্রাবণ !

বাইশে শ্রাবণ,
আহা কী আশ্চর্যময় উদয়-গগন হতে
একটি সূর্যের সেই অস্ত-গমন ;
সে দিন দেখেছি চেয়ে বিষন্ন দিনের শেষ
মান ছলোছল
ঘনায় রাজির ছায়া, পথে পথে বাড়ে কোলাহল ।
ওদিকে জাহ্নবী-তটে ধুমায়িত পুত-চিত্তানল
মহাকাশ করে সংক্রমণ—
হয়তো দিগন্ত-পারে স্বর-লোকে শব্দ বাজে
ঠিক সেই মুহূর্তে তখন !
আমরা, উত্তরকাল আশার নেশায় ভরা
আমরাও কিছু লিখি কিছু গান গাই,
জীবনের কাঁটা-গাছে এনে দিতে কিছু ফুল
আকাশের রঙে রঙে কলম রাঙাই,

তবু যেন কোথায় কী হয়ে যায় ভুল—
যে ফুল কোটাতে চাই ঠিক সেই ফুল
ফুটেও ফোটে না আর—হঠাৎ একদা দেখি :
আমাদের যত স্বর রেখা আর রঙ
সব একে, সব পেয়ে, সব লিখে দিয়ে গেছে
চ'লে-বাওয়া কোন এক বাইশে শ্রাবণ !

দুখেই দীপালি-জ্বালা, ক্লান্তি ও জরায় মাথা
এ পৃথিবী তবুও সুন্দর—
যখন একাকী ভাবি কি রঙে রাঙাল তারে
একা একা আশিটি বছর !
উৎসবে জ্বলছে আলো, দুঃখে এনে দিয়েছে গৌরব,
অপমানে অনেক সম্মান,
মৃত্যুর কুয়াশা ছিঁড়ে শুনিয়ে গিয়েছে বার বার
আর কোনো জীবনের গান !

* * * * *
সমস্ত আকাশ ছেয়ে নেমেছে মেঘের ছায়া
ফিরে এল বাইশে শ্রাবণ,
জানালায় দেখি চেয়ে ঝরে পড়ে ঝরো-ঝরো
বরষার অঝোর বর্ষণ,
আর মনে মনে ভাবি, কতি কি আমরা যদি
কোন চিহ্ন নাও রাখি এখানে ধূলোয়—
আমাদেরই হয়ে কেউ রেখে গেল এখানে অনেক
এ তো ভুল নয়,—
সেই দেওয়া, সেই দান, অজর অমর হয়ে
গেয়ে যাবে আমাদেরই গান—
পঁচিশে-বৈশাখ-মাথা, ফিরে-আসা শ্রাবণের
বাইশের তারিখে প্রণাম ।

শ্রীঅরবিন্দেন্দ্র বক্ষিমচন্দ্র

অম্বুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

৪

বক্ষিমের বহুমুখী প্রতিভা

খাঁ

সাহিত্যিক হয়ে সাংসারিক ব্যাপারেও কেউ যদি দক্ষতার প্রমাণ দেখায়, তা হ'লে লোকে বলে এ একটা অলৌকিক কথা। সাধারণ লোকের মনে এই ধারণাটাই বহুমূল্য হয়ে আছে যে, কাব্যপ্রতিভার সঙ্গে সাংসারিক বুদ্ধি জিনিসটা থাকতেই পারে না। অবশ্য সাধারণের অনেক ধারণাই এমনি অমূলক, তারা উপর থেকে গোটাকয়েক দৃষ্টান্ত দেখেই এমনি একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত ক'রে নেয়। কিন্তু বস্তুতপক্ষে এ কথা ঠিক নয়, কারণ যদি একটু সহায়ভূতি নিয়ে ধীরভাবে বিচার করা যায় তা হ'লে দেখা যাবে যে, বড়ো বড়ো মনীষী ও সাহিত্যিকদের মধ্যে দু-একটা ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশের প্রতিভার লক্ষণই হ'ল তাদের বহুমুখী শক্তি। বাদের ভালরকম লেখবার ক্ষমতা থাকে তাদের অন্তান্ত ক্ষমতাও ভালরকম থাকে, বিশেষ ক'রে থাকে তাদের পূর্ববেক্ষণ-শক্তি আর অনেক কিছু সৃষ্টি করবার শক্তি, যেমন দেখা যায় ঔপন্যাসিকদের মধ্যে। এর অনেক জলন্ত দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেমন জার্মানির গ্যোটে, ইংলণ্ডের শেক্সপিয়ার, ফীল্ডিং, ম্যাথু আর্নল্ড প্রভৃতি। সাংসারিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে যেখানে কর্মনিপুণ্যের অভাব আছে মনে হবে সেখানেও ভাল ক'রে খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, সে নিপুণ্য ছিলই, কেবল অব্যবহারে তা মনের গুদামঘরে তালাবদ্ধ থেকে মরচে ধ'রে গেছে। কবি ও গুণীজনেরা যে সাংসারিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ হয়ে অসহায়ের মত থেকে যায়, তার কারণ ঐভাবে ধাকাটাই তারা পছন্দ করে; তাদের মানবপ্রকৃতির এই দিকটাকে তারা ইচ্ছা ক'রেই নষ্ট হয়ে যেতে দেয়, যাতে সম্পূর্ণ নিরীক্কাটে তারা নিজেদের কল্পলোকে বিচরণ করতে পারে; তাদের মোমবাতির দু'দিকে দুটো মুখ আছে বলেই তারা একটা মুখ ছেড়ে দিয়ে কেবল অপর মুখটাকেই সর্বদা জালিয়ে রাখে। বক্ষিম ছিলেন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের অন্ততম, তাই তাঁর ছিল বহুমুখী প্রতিভা, তা সব দিক দিয়েই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশও পেয়েছিল। একটিমাত্র মগজের মধ্যে

তাঁর প্রতিভার সকল গুণ একসঙ্গে ঠাণ্ডা ছিল, তাই একাধারে তিনি ছিলেন পণ্ডিত, কবি, প্রবন্ধকার, ঔপন্যাসিক, দার্শনিক, আইনজ্ঞ, সমালোচক, শাসক, ভাষাতত্ত্ববিদ, ধর্মার্থ বিচারক ইত্যাদি অনেক কিছু। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে যে, তাঁর এই সব গুণের কোনটার সঙ্গে কোনটার সম্বন্ধ নেই। তাঁর ভাষাশিল্পের দিকে যেমন টান, তেমনি আবার আইনের নিখুঁত বিচারের দিকেও টান; সরকারী নথিপত্র লিখতে জানেন রীতিমত মূল্য-মানার সঙ্গে, আবার সাহিত্যিক প্রবন্ধও লেখেন অতি চমৎকার; নিরীহ ভাল ছেলের মত পরীক্ষাও পাস করেন, আবার শাসকের বজ্রমুষ্টিতে অত্যাচারী দস্যুদেরও দমন করেন; দর্শনের অতি জটিল সমস্যা নিয়েও নাড়াচাড়া করেন, আবার শব্দরচনার অতি সূক্ষ্ম সমস্যা নিয়েও লেগে যান; জীবনের উপভোগ্যাদির কথাটাও বোঝেন ভাল, আবার আধ্যাত্মিকের দিকটাও কম বোঝেন না; নীরস ব্যাকরণও রপ্ত ক'রে নেন, আবার সরস কবিতারও সৃষ্টি করেন।

কিন্তু এমন বহুমুখী প্রতিভা থাকলে আমরা কি করতাম? তারই গর্বে বিস্ময়িত হয়ে আমরা সকল দিক দিয়ে পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাতে কি অসংকোচে সকল ব্যাপারেই বিজ্ঞা ফলাতে যেতাম? তাতে পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা দেখানো হ'ত বটে, কিন্তু সেটা নিতান্তই ভুল কাজ করা হ'ত। প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতাগুলি নিয়ে সকল ক্ষেত্রেই তাকে সমানভাবে প্রয়োগ করতে গেলে তুমি আপন বৈশিষ্ট্যটুকু নিশ্চয় হারিয়ে ফেলবে। বক্ষিম এতটা ভুল-কাজ কিছু করেনি নি। তাঁর নিদ্রাশ বৈশিষ্ট্য কেবল সাহিত্যে, অর্থাৎ গুণসাহিত্যের ক্ষেত্রে, এ কথা তিনি খুবই জানতেন। তাঁর গীতিকাব্য রচনাও মনোরম ছিল, কিন্তু তার সংখ্যা নিতান্তই কম; দর্শনতত্ত্বও তাঁর প্রিয় ছিল, কিন্তু তাই নিয়ে লিখেছেন তিনি কেবল শেষ জীবনে; আইনবিজ্ঞাও তাঁর প্রিয় ছিল, কিন্তু তাই নিয়ে চর্চা করেছেন কেবল প্রথম জীবনে; এদিকে

যা কিছু পাণ্ডিত্য ও দার্শনিক জ্ঞান তিনি আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন সমস্তই কাজে লাগিয়েছিলেন তাঁর অল্পপম সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে, জগতের সকল শ্রেষ্ঠ লেখকই যা ক'রে থাকেন। তাই অপরূপ বৈচিত্র্য ও নানাবিধ জ্ঞানসম্বারে সমৃদ্ধ হয়ে তাঁর লেখাগুলি নানা বিষয়ের সূক্ষ্ম বিচার সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিতে পেরেছে। এই গুণ-সাহিত্যের ভিতর দিয়েও তিনি তাঁর বহুমুখী প্রতিভাকে নানাভাবে প্রকট করতে পারতেন, কিন্তু তা না ক'রে তিনি আপন বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেই সব কিছুকে সীমাবদ্ধ রাখলেন। নিজের ভূমি ছেড়ে অন্য ভূমিতে বিচরণ করতে কখনই তিনি যান নি। যখনই দু-একবার অপর ভূমিতে পা দিয়েছেন তখনই বৃষ্টিতে পেরেছেন যে, তিনি অনর্থক শক্তিক্ষয় করেছেন। কেবল এক জায়গায় তাঁকে এমনি অযথা শক্তিক্ষয় করতে বাধ্য হতে হয়েছিল, সে তাঁর চাকরির কাজে। ভারতের দুর্ভাগ্য মধ্যবিস্তরের জীবন এমনই অসহায় যে, তার মধ্যে কেউ প্রতিভা নিয়ে জন্মালেও বাঁচবার জন্তেই তাকে আত্মহত্যা করতে হয়—হয় চাকরি, না হয় আইনজীবীর কাজ তাকে বেছে নিতে হয়। অর্থাৎ হয় বিষ খেয়ে মরো, নয়তো বৃকে ছুরি বসিয়ে দাও। আরও যে সব পেশা আছে তার মধ্যে শিক্ষা-বিভাগের কাজে খানিকটা ছুটির ফাঁক পাওয়া যায়, আর আছে এই শাসন-বিভাগের কাজ, তাতে প্রত্যক্ষভাবে পরিবর্তে পরোক্ষভাবেই মনের উপর জুলুম চলে ব'লে প্রতিভা নষ্ট হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম। কিন্তু বর্তমান সময়ে নানারূপ প্রয়োজনের চাপে তাতেও অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়।

বন্ধিমের যে বহুমুখী তৎপরতা ছিল তা হ'ল শিক্ষিত হিন্দুর পক্ষে একটা সাধারণ লক্ষণ। যদিও একে এক হিসাবে সৌভাগ্য আর এক হিসাবে দুর্ভাগ্য বলতে হবে, কিন্তু এই ছিল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের একটা বিশেষত্ব। পুরুষ-পুরুষাঙ্কুরে এটা আমাদের রক্তের মধ্যে চ'লে এসেছে, আগেকার লোকেরা গত তিন হাজার বছর ধ'রে যে ভাবে বুদ্ধিবৃত্তিকে শান দিয়ে এসেছেন এটা তারই ফল। কিন্তু এতে একটা মস্ত দোষ এসে পড়ে, কারণ প্রতিভাকে ছুটিয়ে তুলতে হ'লে তার পক্ষে এই বহুমুখীনতাকে অতি সাবধানে দাবিয়ে চলতে হয়। যেটা আমার বিশেষ

বৈশিষ্ট্য কেবল সেটাকেই আঁকড়ে ধ'রে থাকব, প্রতিভার পক্ষে এটা খুব জাঁকের কথা না হতে পারে; কিন্তু এই হ'ল জীবনের সোজা নিয়ম আর এই হ'ল বুদ্ধিমানের কাজ। আমরা কিন্তু সকল বিষয়ের দিকেই ঝুঁকে সমান কৃতিত্ব দেখাতে চাই; একবারও ভেবে দেখি না যে, মন জিনিসটারও ক্ষয় আছে, অগ্ন্যস্ত্র জিনিসের মত এরও তার সহবার একটা সীমা আছে। এ কথা ভুলে যাই যে, কেবল বিশিষ্ট বৃত্তির চর্চাতেই নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা আসতে পারে; তা ছাড়া আমাদের শক্তির ভাণ্ডার অক্ষুরন্ত নয়, সব দিক থেকে খরচ করতে থাকলে শেষ পর্যন্ত জন্মায় এসে টান পড়ে। এই সব কথা না বুঝে আমরা মোমবাতিটার দুই মুখই সমানে জালিয়ে রাখতে চাই। আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যেও এই প্রচেষ্টা দেখা যায়, সে যেন সব দিক থেকে মানুষকে মাড়াই করার অমোঘ যন্ত্র; এ যন্ত্র কেবল মানুষটাকেই বধ করে না, এর উৎপত্তি হয়েছে মানুষের আত্মাটিকে বধ করার জন্তে; তার জীবনের চেয়েও বেশি দামী তার ভিতরকার ব্যক্তিত্বের যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সেইটিকে একেবারে নিবিয়ে দেবার জন্তে। কালীনাথ তেলাঙের সাহিত্যিক প্রতিভারও এমনি মারাত্মক পরিণতি ঘটেছিল। নানারকম দুর্লভ গুণের অধিকারী হয়েও, এবং এক উদীয়মান জাতির নিত্য বাহনীয় প্রতিভার অধিকারী হয়েও তিনি যে জগতে স্থায়ী রকমের কোনও কীৰ্ত্তি রেখে যেতে পারলেন না, শিক্ষার এই মাড়াই যন্ত্রই হ'ল তার এক অগ্ন্যস্ত্র কারণ। তেলাঙ প্রধানত ইংরেজী ভাষাতেই যা কিছু লিখতেন, কারণ সেই বিজ্ঞাই তাঁকে শেখানো হয়েছিল। কিন্তু পরের দেশের ভাষা ভূমি যতই ভাল ক'রে শেখ, সে ভাষায় যতই ভাল ভূমি লিখতে পার, তোমার প্রতিভার তাতে সম্পূর্ণ বিকাশ হতে পারবে না। তিনি আরও এক মস্ত ভুল করেছিলেন এই যে, নিজের বৈশিষ্ট্যকে সার্থক হতে তিনি স্বযোগ দেন নি; যদিও তাঁর স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল সাহিত্যসৃষ্টির দিকে, যা তাঁর লেখার দিকে একটু লক্ষ্য করলেই স্পষ্ট বোঝা যায়, তবু তিনি ঠিক ঐ জিনিসটাকেই বাদ দিয়ে অগ্ন্যস্ত্র সকল দিকে অযথা তাঁর শক্তিক্ষয় করেছিলেন। এ বিষয়ে বন্ধিমকে যথেষ্ট ভাগ্যবান বলতে হবে। তিনি লিখতে

শুরু করলেন তাঁর নিজেরই মধুসূদন মাতৃভাষার মাধ্যমে, আর সাহিত্যসৃষ্টির দিক দিয়েই তাঁর সমস্ত শক্তিকে নিয়োগ করলেন, যদিও এটা ঠিক কথা যে তাঁর যা অসাধারণ মৌলিক ছিল তা যে কোনো দিক দিয়েই হোক ফুটে বেরিয়ে আসত। তবে তাঁর জীবনের চাকরি-বাধ্যতা না থেকে যদি তিনি নির্বিবাদে এই কাজ করে যাবার অবসর পেতেন, তা হ'লে এর চেয়েও আরো কত বহুমূল্য জিনিস তিনি যে আমাদের দিয়ে যেতে পারতেন সে কথা মনে করলে দুঃখ হয়। প্রায় চল্লিশটি বছরের সাহিত্যসেবার ফলে তিনি আমাদের জন্তে রেখে গেছেন দশখানি উপন্যাস, ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে দুটি প্রবন্ধ-পুস্তক, এবং আরো কিছু অগ্ৰাস্থ ধরনের সাহিত্য। তাঁর এই অবদান-গুলি সংখ্যায় কম হ'লেও ওজনে ভারী খাঁটি সোনা। আর এমনও হতে পারে যে, এর চেয়ে বেশী স্বযোগ থাকলেও তিনি এর চেয়ে বেশী কিছু লিখতে পারতেন না। প্রকৃতির রাজ্যে তুচ্ছ কাচ পাথর আর মিশাল ধাতুর টুকরো অনেক জায়গাতেই মেলে আর প্রচুর পরিমাণেই মেলে, কিন্তু খাঁটি সোনা মেলে মাত্র বিশেষ বিশেষ জায়গাতে আর তাও অতি অল্প পরিমাণে।

৫

বঙ্কিমের সাহিত্য-জীবনের ইতিহাস

বঙ্কিমের জীবনে রীতিমত সাহিত্যসেবা প্রথম শুরু হয় খুলনায় থাকতে, যদিও আগে ছাত্রাবস্থাতে তিনি মাঝে মাঝে কবিতা লিখতেন। সে সময়ে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দুটি সাময়িক পত্রিকা বের করেছিলেন—‘সংবাদ প্রভাকর’ ও ‘সাদুসংবাদ’। তাতে দ্বারিকানাথ ও দীনবন্ধু মিত্র দুজনেই ঈশ্বর গুপ্তের অন্তরকরণে ছাত্রজ্ঞানোচিত ভাবে অনেক কিছু লিখতেন। বঙ্কিমও তখন তাঁদের দলে যোগ দেন, কিন্তু গোড়াতেই তাঁর মৌলিক ধরনের রচনাদি দেখে সূক্ষ্মদর্শী ঈশ্বরচন্দ্র এই অপরিচিত ছাত্রটির মধ্যে প্রকৃত প্রতিভার পরিচয় পেয়ে যান।

মধুসূদন দত্তের মত বঙ্কিমও একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রথম ইংরেজী ভাষাতেই লিখতে শুরু করেছিলেন, সব-প্রথম তিনি ‘রাজমোহনের স্ত্রী’ নামে একটি ইংরেজী

উপন্যাস লেখেন। কিন্তু পরে মধুসূদনের মতই তিনি নিজের ভুল নিজে বুঝলেন। তিনি বুঝলেন, প্রত্যেকে যেমন কথা বলার বেলাতে স্বাভাবিক ভাবে শেখা নিজের মাতৃভাষাতেই সবচেয়ে সহজে বলতে পারে, তেমনি লেখার বেলাতেও সেই ভাষাতেই সে নিজেকে সবচেয়ে ভাল ভাবে প্রকাশ করতে পারে, তাতেই সে পরিপূর্ণভাবে ও জোরের সঙ্গে নিজের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে পারে। যতই সে অবহেলা করুক, যতই ভুলে যাক, তবু নিজের মাতৃভাষার উপর তার একটা জয়গত দখল থাকবেই। কাজেই সেই ভাষাতেই সে পরম নিশ্চিন্তে লিখে যেতে পারবে আর কোনও মৌলিকতা থাকলে তাও অনায়াসে ফুটিয়ে তুলতে পারবে। অন্য কোনও শেখা ভাষাতে লিখে সে মৌলিকতাকে ফুটিয়ে তোলা প্রায়ই অসম্ভবে গিয়ে দাঁড়ায়। কারণ মনটা সর্বদাই তার আপন নিগূঢ় অক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে থাকে, তখন সেই ভাষটাই একটা গুরুভার বোঝার মত চেপে থাকে, কাজেই সে তখন নিজের অজ্ঞানিতে পরের নকল করবার দিকেই ঝোঁকে, নতুবা নিজের ভাষটিকে নষ্ট করে ফেলে, এবং যা কিছুই সে রচনা করে তা একটা খেলো ধরনের জিনিস হয়ে দাঁড়ায়। কারণ তা হবে একটা অস্বাভাবিক বা ভেজাল জিনিস, মুখের মধ্যে পাথর ভরে নিয়ে কথা বললে যেমন শোনায কিংবা কাঠের পা নিয়ে চলতে থাকলে যেমন দেখায় তেমনি। বঙ্কিম ও মধুসূদনের যথেষ্ট মৌলিকতা থাকা সত্ত্বেও ইংরেজীতে লিখতে যাওয়া যে ভুল—এ কথা দুজনেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই মধুসূদন তাঁর ‘ক্যাপটিভ লেডি’ লেখার পর আর দ্বিতীয় কোনও ইংরেজী কাব্য লিখলেন না, বঙ্কিমও তেমনি তাঁর ‘রাজমোহনের স্ত্রী’ লেখার পর দ্বিতীয় কোনও ইংরেজী উপন্যাস লিখলেন না।

বঙ্কিম প্রথম উপন্যাস লিখতে শুরু করেন খুলনায়, আর সেই প্রথম উপন্যাসটি শেষ করেন বাকুইপুরে। সেখানে থাকতেই আরও কিছু উৎকৃষ্ট জিনিস তিনি লেখেন। তাঁর সেই প্রথম উপন্যাস হ'ল ‘দুর্গেশনন্দিনী’, যা নতুনতর বাংলা গল্প-রচনার প্রথম নিদর্শন হিসাবে চিরদিন অমর হয়ে থাকবে। ঐ বাকুইপুরে থাকতেই তিনি আরও লিখলেন ‘কপালকুণ্ডলা’ এবং ‘সুগালিনী’,

এবং তার পরে শুরু করলেন তাঁর সেই বিখ্যাত 'বিষবৃক্ষ'। বহরমপুরে গিয়ে তিনি 'বঙ্কিমর্শন' পত্রিকাটির সম্পাদনা শুরু করেন। এতে চারিদিকে বাংলা রচনা সম্বন্ধে একটা সাড়া পড়ে গেল, তাঁর দেখাদেখি পরে আরও অনেক সাহিত্য-পত্রিকার আবির্ভাব হ'ল, এবং তার আদর্শ নিয়ে আরও উন্নত ধরনে প্রকাশিত হ'ল প্রগতিশীল ঠাকুর-বাড়ির সাহিত্য-পত্রিকা 'ভারতী'।

যাই হোক, এর পর থেকে বঙ্কিম একে একে আমাদের দিতে থাকলেন তাঁর পরিণত লেখনীর অমর কীর্তিস্বরূপ তাঁর 'চন্দ্রশেখর,' 'কৃষ্ণকান্তের উইল,' 'দেবী চৌধুরাণী' 'আনন্দমঠ,' 'সীতারাম,' 'ইন্দিরা' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর'। বহরমপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের পদে কাজ করবার সময় থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকল, তার থেকে তিনি কখনই আর সেবে উঠতে পারলেন না, মৃত্যু পর্যন্ত সেই ভয়ঙ্কর নিয়ে তাঁকে দিন কাটাতে হয়েছে। কিন্তু দৈহিক অসুস্থতাকে তুচ্ছ করে সাহিত্যের সাধনাতে বরাবরই তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। জীবনের শেষের কয়েকটি বছর তিনি সর্বক্ষণ কষ্ট ভোগ করেছেন, তবু সেই কয় বছর ধরেই তিনি আরও বেশী সাফল্যের সঙ্গে অনবরত লিখে গেছেন। তিনি যৌবনে ছিলেন ভোগী, পরিণত বয়সে ছিলেন আমোদপ্রিয়। জীবনের আনন্দবিলাস ও সৌন্দর্যবোধ সম্বন্ধে স্বভাবতই একটা শিল্পীজ্ঞানোচিত দৃষ্টিভঙ্গী থাকায় তিনি কঠোরব্রতী সন্ন্যাসীর আদর্শকে কখনই ভাল বলে স্বীকার করেন নি আর উৎকর্ষ ধর্মনিষ্ঠাকে অবজ্ঞার চোখেই দেখে এসেছেন। কিন্তু এখন জীবনেব অপরাহ্নকালে যখন মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে এল, তখন তাঁর অন্তরাশ্রয় শাস্তের অবলম্বন খুঁজতে ধর্মের দিকে ঝুঁকেছিল। তাই শেষের উপন্যাসগুলিতে দেখা যায়, উত্তরোত্তর দার্শনিকতার দিকে তাঁর একটা টান, এবং শেষকালে শিল্পীর আসন ছেড়ে দার্শনিক চিন্তাধারা নিয়ে তাঁকে দার্শনিকের স্থানে উঠে দাঁড়াতে হ'ল। অসহ্য দৈহিক যন্ত্রণা নিয়ে তিনি ভগবদগীতা ও বেদ পাঠে নিজে-নিমগ্ন করলেন এবং সেই সব অমূল্য ভাণ্ডার থেকে চূর্ণভ রত্নরাজি সংগ্রহ করতে থাকলেন, আর দেশবাসীদের হাতে তাদের ভাষায় সেই সব জিনিস তুলে দেবার জন্তে বঙ্গপত্রিকার হলেন। তাই তিনি লিখলেন 'কৃষ্ণচরিত্র'

ও ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আরও এক গ্রন্থ। ভগবদগীতা ও বেদের বাংলা ভাষ্য প্রস্তুত করা ছিল তাঁর অন্তিমের বাসনা। গীতার-তিনটি অধ্যায় তিনি শেষ করতে পেরেছিলেন, কিন্তু বেদের ভাষ্য করার সংকল্প তাঁর সফল হতে পেল না; তা যদি ক'রে যেতে পারতেন, তা হ'লে আমাদের কাছে তা এক অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকত। মৃত্যু ইতিমধ্যে ঘারে এসে অপেক্ষা করছিল, সে তাঁর হাত থেকে কলমটি কেড়ে নিলে, সেই অপূর্ব প্রতিভার শেষ লেখাটা আর লিখে যেতে দিলে না। তবে যে দশটি অমূল্য রত্ন তিনি রেখে গেছেন, আমাদের পক্ষে তাই যথেষ্ট। দশজন আলাদা আলাদা খ্যাতিমান পুরুষের সম্মিলিত খ্যাতির চেয়েও তাঁর একার খ্যাতি তাতেই অনেক বেশি, এবং সে খ্যাতি চিরদিন অমর হয়ে থাকবে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিমের স্থান

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমের স্থান কোথায় সে কথা বলা আদৌ কঠিন নয়; গভ-সাহিত্যে তাঁর সমতুল্য কেউই নেই, কেবল কাব্য-সাহিত্যে রয়েছেন একজন, যিনি তাঁর কাছাকাছি দাঁড়াতে পারেন। তবে ইংরেজী ভাষার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে তাঁর তুলনা করতে গেলে সেখানেই কাজটা কিছু কঠিন হবে; কিন্তু আমার মতে কেবল একজন ছাড়া অন্য সকলেরই চেয়ে বঙ্কিমের স্থান উচুতে; কোনও কোনও বিশেষ গুণে বঙ্কিমের চেয়ে তারা বড় হতে পারে, কিন্তু মোটের উপর সব দিক দিয়ে বিচার করলে বঙ্কিমই হবেন শ্রেষ্ঠ, আর বিশেষতঃ একটা কথা এই যে তিনি হলেন সকলের চেয়ে নিখুঁত ও নিটোল শিল্পী। জীবনের ইতিহাসের দিক দিয়ে, ভাগ্যের দিক দিয়ে আর চরিত্রেরও দিক দিয়ে এঁর সঙ্গে অনেকখানি মিল দেখা যায় ইংরেজী উপন্যাসের জনকস্বরূপ হেনরী ফীল্ডিংয়ের সঙ্গে, তবে সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে এঁরা দুজনে দুই বিভিন্ন স্তর থেকে কাজ ক'রে গেছেন। বঙ্কিমের রচনার মধ্যে পাওয়া যায় একটা দার্শনিক ইঞ্জিত, জীবনের সম্বন্ধে একটা স্বগভীর কাব্যদর্শী মনোভাব, একটা সুস্পষ্ট সৌন্দর্যবোধ; ফীল্ডিংয়ের লেখার মধ্যে এ জিনিস নেই। বঙ্কিমের সঙ্গে স্কটের তুলনা করা আজকাল একটা ধূয়ো হয়ে দাঁড়িয়েছে, অনেকেরই মুখে

শোনা যায় যে বঙ্কিম নাকি বাংলার স্বর্গ। তারা মনে করে যে, এতে বৃষ্টি তাঁকে খুব একটা উচ্চ পৌরবের স্থানে তুলে দেওয়া হ'ল, এটুকু বুঝতে পারে না যে তাঁকে বরং এতে যথেষ্ট অপমানিতই করা হ'ল। বহু জটিলপূর্ণ ও অপরিণত শক্তির একজন স্বচ্ছ লেখকের সঙ্গে কি পরম শক্তিশালী মৌলিক প্রতিভার তুলনা করা চলে? স্বর্গের অবস্থা অনেকগুলি অসাধারণ গুণ ছিল, কিন্তু আবার দোষত্রুটিও যথেষ্ট ছিল। তাঁর লেখনভঙ্গীতে তেমন দৃঢ়তার ছাপ ছিল না; অল্পপ্রেরণার জোরে অনেক জায়গায় খুব ভালই লিখেছেন, কিন্তু বাকি সব জায়গাতে দেখা যায় যে তাঁর লেখার মধ্যে নিজস্ব কোনও রচনামূল্য নেই; ঘটনা বর্ণন করবার শক্তি যতই থাকে, কিন্তু প্রকৃত রসবোধের অভাব থাকায় তার মোট ফলটা বিপরীত হয়ে দাঁড়িয়েছে; তাঁর উপন্যাসের যে চরিত্রগুলির দিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষিত হবার কথা, সেগুলি অধিকাংশই যেন সাক্ষীগোপালের মত, তার মধ্যে তেমন সত্যিকার প্রাণের সাড়া নেই: কেবল বাইরের দিক থেকেই মনে হতে পারে যে তারা উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে, কিন্তু ভিতরের দিক থেকে নয়। স্বর্গ কেবল রেখাচিত্রটাই একে যেতে পারতেন, সেই রেখাগুলোকে রঙ দিয়ে স্নন্দরভাবে ভরাট ক'রে দিতে পারতেন না। এখানে বঙ্কিম তাঁকে অভিক্রম ক'রে গেছেন; তাঁর লেখার মধ্যে ঘটনা ও সংলাপ এমন ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়ে গভীর অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে, তাতেই পুরুষ ও নারী চরিত্রগুলিকে অবিকল রক্তমাংসের মানুষের মত দেখাচ্ছে। এ ছাড়া তাঁর প্রধান প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে যে প্রাণলক্ষণ ও কাব্যস্বপ্না সহজ প্রাচুর্যে উপচে উঠেছে, তা ইংরেজী সাহিত্যের মধ্যে কেবল ব্রটি ভয়ীষ্মের লেখা ও জর্জ মেরিডিথের লেখাতে ছাড়া অন্য কোথাও মেলে না। নারী-চরিত্রের মধ্যে সৃগভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকা নাট্যকারের পক্ষে এক বিশেষ গুণ, বঙ্কিমের মধ্যে এই গুণটিও ছিল। অন্ত লেখকের কোনও উপন্যাসের মধ্যে যতই খুঁজে দেখ, বঙ্কিমের উপন্যাসের জীবন্ত নারীচরিত্রের মত আর কোথাও মিলবে না। এমন কি, খুব প্রতিভাবান উপন্যাসিকের বেলাতেও দেখা যায় যে, তারা নারীচরিত্রের অন্তরে ঢুকতে পারে না, বাইরে পর্যন্ত পৌঁছেই থেমে যায়।

এ বিষয়ে ফৌল্ডিংয়েরও হার হয়েছে; স্বর্গের নায়িকারা তো যেন কতকগুলি মোমের পুতুল, এমন কি তাঁর শ্রেষ্ঠা নায়িকা রেবেকা অতিরিক্ত-রঙ-চড়ানো একটা কাঠের পুতুল ছাড়া আর কিছুই নয়; এমন কি বহুখ্যাত থ্যাকারের লেখার মধ্যেও জীবন্ত নারী মেলে মাত্র তিনটি কি চারটি। চূড়ান্ত নাট্যপ্রতিভা যাদের ছিল তাঁরাই কেবল নারীদের অন্তরের গুপ্তরহস্য ভেদ করতে পেরেছেন। শেক্সপীয়ারের এই গুণটি ছিল পূর্ণ মাত্রায়, বর্তমান শতাব্দীর মধ্যে ছিল মেরিডিথের আর ছিল আমাদের দেশে বঙ্কিমের।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চশমা-চড়ানো সংস্কারকামীর দল হিন্দুদের জীবনে নগণ্য উপাদানবস্তু ছাড়া উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই দেখেন না, আর নারীচরিত্রের মধ্যে দেখেন কেবল হীন আহুগত্য বৃত্তি, তাদের মধ্যে আছে কেবল সংকীর্ণতা ও অপার অসুখতা। কিন্তু বঙ্কিম তাঁর কবির দৃষ্টি নিয়ে তাদের মধ্যেই অনেক গভীরতম সম্পদের আবিষ্কার করতে পেরেছেন। এ দেশের মানুষের জীবনেও যে কতখানি মাধুর্য ও চমৎকারিত্ব থাকতে পারে, এখানকার নারীদের হৃদয়েও যে কত প্রেম ও মহিমা লুকিয়ে থাকে, কত গভীর যে হতে পারে তাদের হৃদয়বেগ, কতই যে তাদের মনের দৃঢ়তা, কোমলতা, কমনীয়তা, অনির্বচনীয়তা, তা তিনি তাদের অন্তরে প্রবেশ ক'রে দেখেছেন; আর সেই সব কথা তাঁর শিল্পী-কবির অমর তুলিতে দিব্য চিত্রে আঁকা হয়ে উপন্যাসগুলির পাতায় পাতায় অগ্নান হয়ে ফুটে আছে। আমাদের দেশের সংস্কারকামীদের পক্ষে সেই সব কথা বঙ্কিমের লেখা থেকে শিখে নেওয়া উচিত। সংস্কার এনে ফেলবার অদম্য উৎসাহে তাঁরা এ দিকটা একবারও ভেবে দেখেন না, বোকা দরজীদের মত দামী কাপড়টাকে কেটে ছেঁতে কেবল আধুনিক চেহারাটার সঙ্গেই মাপসই করতে চান, ভবিষ্যতেও সে মাপে কাজ চলবে কি না তার দিকে কোনও খেয়াল নেই। দেশের আগেকার ছাঁচের বদলে তাঁরা হাল বিলাতী ছাঁচে মেয়েদের ঢালাই করতে চাইছেন, কিন্তু আগেকার ছাঁচে তবু কিছু দামী জিনিসের সাক্ষাৎ পাবার সম্ভাবনা ছিল, আর এখনকার ছাঁচে যা দাঁড়াচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে কেবল অন্তঃসারশূন্য কতকগুলি চটুল মানবী, যারা পারে শুধু ভড়ং করতে, পুরুষ ভোলাতে আর পিয়ানো বাজাতে। এমনি ক'রে সংস্কারের নামে

দেশের সব কিছু দুই জিনিস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এমন সংস্কার অবিলম্বে খামিয়ে দেওয়া উচিত। মানব-আত্মার যে আভাবিক দিব্য মহিমা, তাকে এই ভাবে নষ্ট না করেও ততো অনেক বৃহত্তর বিস্তারের পথ উন্মুক্ত করে দিয়ে সেই জিনিসেরই আরও উৎকর্ষ সাধন করা যায়। আমাদের দেশের মেয়েরা তা হ'লে প্রাণের ও জ্ঞানের দুই দিক থেকেই মনোরম ও মহীয়সী হতে পারে, এবং কতকগুলি হীনমতি ও অর্বলোলুপ সন্তানের মা হওয়ার বদলে জ্ঞানী গুণী ও বীর সন্তানের মা হতে পারে।

বঙ্কিমের রচনাশৈলীর সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে যাওয়া আমার পক্ষে খুঁটত হবে। তাঁর লেখার ভিতরকার যে অনবচ্ছিন্ন সৌন্দর্য, তাঁর ভাষার ছন্দে একাধারে যে দৃষ্ট বীর্ষ ও পরিপাটী মাধুর্য, আমার লেখনীর ভাষা তার সম্যক

পরিচয় দিতে সক্ষম নয়। কেবল এইটুকুই আমি বলতে পারি যে, বঙ্কিমের নিখুঁত ও গভীর সৌন্দর্যবোধই তাঁকে সকলের চেয়ে বড় করে তুলেছে। বাংলা ভাষার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যই হ'ল সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলতে পারা, আর ইউরোপীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে বাংলা ভাষার এই গুণটাই আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। প্রাচীন হিন্দু-সাহিত্যের শিল্পকৃষ্টির মধ্যে যে সব অসম্ভবের কল্পনা থাকত—যেমন রামচন্দ্রের বানর-বাহিনীর কথা, রাবণের দশমুণ্ডের কথা—সে সব জিনিস এখনকার সাহিত্যের পক্ষে একেবারে অচল হয়ে গেছে। কিন্তু কল্পনার ফুল ফোটানোর দিক দিয়ে কিংবা মাহুঘের হৃদয়মাধুর্য প্রকাশের দিক দিয়ে তখনকার দিনের 'শকুন্তলা' থেকে আমরা যতখানি আশ্বাদ পেয়েছি, এখনকার বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা' ও 'বিষবৃক্ষে'র মধ্যে তার চেয়ে কিছু কম নেই।

মেঘালয়ে

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

বিশ শতকের বিশ্ব। বিজ্ঞানের স্বর্গে করে বাস
— মাহুঘ এখন। তার আজ্জাবহ আকাশ বাতাস;
মেঘ—মভোচারী, সমুদ্রবিহারী। আর্থিক সঙ্গতি
সহায় হ'লেই তার পৃথিবীতে অনিরুদ্ধগতি।
তবু মেঘ দেখে কোনো শ্রাবণের আসন্ন উন্মেষে
রসিক জনের চিত্ত স্পৃহণীয় কামনার দেশে
পাড়ি দেয়। আড়ি পাতে মন তার সাথে। চেতনার
শরশয্যা স্বপ্ন ভাঙে, বৃক্কত আনে বেদনার;
মানে না পুনরাবুত্তি—মায়ালোক। নৃতনের স্বর
পার আনো, ব্যথা দাও—যদি না থাকেই হৃদয়
রসায়ন।

'ধূম জ্যোতি জল বায়ু সৃষ্টি করে মেঘ'—
জেনেও যে কবি তপ্ত বিরহের হৃদয়-আবেগ
মেঘের পথেই দিল, তাঁর কথা থাকি ছিন্নমালা
যে-জীবন নিদাঘ-পথের প্রান্তে—কে জুড়াবে জালা
তার? সহস্র ব্যথার শলা যুগপৎ কিংবা ক্রমে—
ক্রমে বিদ্ধ করে; আর, আশার-পাথর চোখে জমে
হৃদয় দিনেই। প্রেমে অবিশ্বাস,—সাহসিকতার
নজীর অচিরজীবী; কৃত্রিম দাম্পত্য-সখ্য তার।

প্লেটোনিক ভালবাসা বনাম কুশীদজীবী মন:
পৃথিবী বিপণি-কল্যাণ—চায় না হৃদয়, চায় ধন।

বহির্বিশ্ব

পল ভ্যালেরির কবিতা

রবের অঁতোয়ান, এস. জে.

দক্ষিণ ফ্রান্সের সেট নামক এক ক্ষুদ্র শহরে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর পল ভ্যালেরি জন্মগ্রহণ করেন। মন্টপেলিয়াসের আঁদ্রে জিদের সঙ্গে ভ্যালেরির প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে। সেই থেকে প্রতীকবাদী (সিম্বলিস্ট) কবিদের রচনাবলী পাঠ ভ্যালেরির পক্ষে গুরুতর অধ্যয়নের পর অবসরবিনোদনের এক সুন্দর উপায় হয়ে দাঁড়ায়। তখন তাঁর বয়স আঠারো বছর মাত্র। তার আগেই তিনি কোন্ পথে কাব্যচর্চা করবেন সে আদর্শ বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর নিজের কথায় তিনি হতে চেয়েছিলেন: “an algebrist at the service of a refined dreamer.” ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে আমরা দেখি প্যারিস শহরে। এখানে বিজ্ঞান এবং দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নের ফাঁকে ফাঁকে তিনি তাঁর অধিকাংশ সময় কাটাতেন ষ্টিফেন মালার্মের গৃহে তরুণ প্রতীকবাদী কবিদের সাহচর্যে। তাঁর প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত হবার পর ভ্যালেরি মালার্মের মনস্তত্ত্বজ্ঞানের চর্চার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এই সময়ে গণ্ডে তাঁর দুটি ক্ষুদ্রায়তন পুস্তক প্রকাশিত হয়। *Introduction a la Methode de Leonard de Vinci* (১৮৯৪) পুস্তকে তিনি এক মহান শিল্পীর মননপ্রক্রিয়ার নিপুণ বিশ্লেষণক্ষমতার পরিচয় দান করেন। পক্ষান্তরে *Soiree avec M. Teste* (১৮৯৫) পুস্তকে দেখতে পাই ধ্যানভ্রম্যতার জ্ঞাত তরুণ কবি-মনের গভীর আকৃতি, যে ভ্রম্যতার ফল পরিপূর্ণ অনাসক্তি। নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা, দীর্ঘস্থায়ী নীরবতার জ্ঞাত কবির ব্যাকুলতার অন্ত নেই। এই নীরবতার আবহাওয়াতেই যেন কবি তাঁর আত্মার স্ফুর্তি খুঁজে পান। এর পর প্রায় সত্তেরো বছর তিনি কাব্যরচনা থেকে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত থাকেন। তিনি তাঁর এই প্রলম্বিত নীরবতাকে ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে—

“যে খেলা বলতে গেলে আমি প্রায় আরম্ভই করি নি, কিংবা আরম্ভ করলেও না ভেবেচিন্তে আরম্ভ করেছিলাম,

সে খেলায় আমি কাস্ত দিলাম। এটি এমন এক খেলা যাতে মাহুষ অপরের চিন্তাজ্বর করবার চেষ্টার মধ্যে স্বীয় ‘আত্মা’ খোঁজাবার নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখতে পায়—‘আত্মা’ বলতে আমি বোঝাতে চাই মনের স্বাধীনতা, পবিত্রতা, বৈশিষ্ট্য ও সার্বভৌমত্ব।”

এই নিষ্ক্রিয়তার বৎসরগুলিতে ভ্যালেরি মনস্তত্ত্ব ও গাণিতিক বিষয় নিয়ে প্রচুর অধ্যয়ন করেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে আঁদ্রে জিদের অহুরোধে তিনি তাঁর কিছু পুরাতন কবিতার সংগ্রহ নিয়ে পুনরায় সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশে সম্মত হন। তারপর থেকে একটানা চলে তাঁর সাহিত্য-সাধনা—প্রবন্ধ-নিবন্ধ, ভাষণ, কবিতা ও নাতিদীর্ঘ গীতিনাট্য রচনার সক্রিয় তৎপরতা। ১৯২৫ সনে তিনি ফরাসী অ্যাকাডেমির নির্বাচিত সদস্যপদ লাভের গৌরব অর্জন করেন। ১৯৩৮ সনে কলেজ ডু ফ্রাঁসে ভ্যালেরিকে কাব্যের স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর মতামত জ্ঞাপনের সুবিধানানের জন্য একটি বিশেষ বক্তৃতামালার প্রবর্তন করা হয়। ১৯৪৫ সনে ভ্যালেরির মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তাঁর শেষতম গ্রন্থ *Mon Faust* প্রকাশিত হয়। বইটিতে দুটি প্রতীকধর্মী নাটকের খসড়া লিপিবদ্ধ আছে।

ফরাসী সাহিত্যে পল ভ্যালেরির স্থান ঠিক কোণায়, নিরূপণ করা সহজ নয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁকে কোন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। ভ্যালেরি নির্জনতার স্বপ্ন দেখতেন, তাঁর সেই স্বপ্ন সার্থক হয়েছিল। তবে তাঁর কাব্যজীবনের উপর কোন্ কোন্ কবির প্রভাব সবচেয়ে বেশী কার্যকরী হয়েছিল, সে বিষয়ে কিছু বলা যেতে পারে। সেখানেও উক্ত প্রভাবের ভিত্তিতে ভ্যালেরির কবিপ্রতিভার মূল্যায়ন অপেক্ষা তাঁর বিচারশীল কবিমনের স্বকীয়তার উপর জোর দেওয়া সমধিক যুক্তিযুক্ত হবে। সমসাময়িক কাব্য-আন্দোলনের বহুতর প্রভাবের মধ্যে থেকেও তাঁর গ্রন্থবর্জন-তৎপর মন নিজস্ব দ্বারায় কি ভাবে কাজ করেছে

সেইটে অহুধাবন করা দরকার। সাহিত্য-জগতে এইরূপ একটি ধারণা প্রচলিত যে, সাহিত্যিকের জীবন নানা প্রভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এটি ভ্রমাত্মক ধারণা। তা ছাড়া, ভ্যালেরির ছিল পরিপূর্ণ স্বাভাব্যের জন্ত উদগ্র কামনা, এই ধারণা সেই স্বাভাব্যস্পৃহার সম্পূর্ণ বিরোধীও বটে। কাজেই-ভ্যালেরিকে ভ্যালেরির আদর্শের মানদণ্ডে বিচার করাই নিরাপদ।

ভ্যালেরির রচনাবলীর মধ্যে আত্মপ্রীতির স্বর অতিশয় প্রবল। এই আত্মকেন্দ্রিকতার দ্বারা আমরা তাঁর পছন্দ-অপছন্দ জানতে পারি। ভ্যালেরির একমাত্র লক্ষ্য হ'ল স্বকীয় ব্যক্তিসত্তার স্বাভাব্য। স্বীয় চিন্তা ও কল্পনার সৌন্দর্যে তিনি এমন মুগ্ধ ছিলেন যে, সেইসব স্বল্পস্থায়ী ভাব ও ভাবনাকে চিরস্থায়ী রূপের মধ্যে অমর করে রেখে যাওয়া ছাড়া তাঁর আর কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না। বোদলেয়রকে ভ্যালেরির এত ভাল লাগে কেন? ভাল লাগে যেহেতু বোদলেয়র রোমান্টিক কবিদের অচেতনতার সংস্কার মনে নিতে পারেন নি। এডগার আলান পো এই ক্ষেত্রে বোদলেয়রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। পোর রচনায় ছিল পরিচ্ছন্নতা, বিশ্লেষণ-ক্ষমতা, যুক্তিবাদ ও কল্পনাকুশলতার সুষ্ট সমন্বয়। বস্তুবাদ তার আগেই স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যপ্রেরণার সংস্কার বর্জন করে সজ্ঞান চিন্তার আদর্শ গ্রহণের দ্বারা রোমান্টিক আন্দোলনের মূল গভীর আঘাত হেনেছিল। রোমান্টিক সম্প্রদায়ের প্রতি বাস্তব-সত্যের আদর্শে আত্মশীল বস্তুবাদী লেখকদের ঘৃণা ছাড়া আর কিছু ছিল না। এইভাবেই প্রতীকবাদী কবিতার সূচনা হয়। বোদলেয়রই হলেন ওই প্রতীকবাদী কাব্য-আন্দোলনের ধারার মূখ্য প্রবর্তক।

অন্ত পক্ষে, মালার্মের সাহচর্য ভ্যালেরির কবিত্বশক্তিকে উদ্বোধিত করতে কম সাহায্য করে নি। মালার্মে সম্বন্ধে ভ্যালেরি লিখেছেন—

“মালার্মের স্বভাবমার্ধুরের জন্ত তাঁকে ভালবাসার সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি বলে মনে হয়। এ ছাড়া, মনুষ্য-দেহের আবরণে তিনি আমার চোখে ছিলেন কবিতা-সম্পর্কিত তাবৎ বস্তুর প্রতি প্রগাঢ় আত্মশীলতার প্রতীক। তাঁর তুলনায় অন্যান্য লেখকেরা কবিতা নিয়ে নিতান্ত ছেলেখেলা করেছেন বলে মনে হয়। তাঁদের কেউ কবিতাকে চরম সত্তারূপে স্বীকার করতে পারেন নি।”

তিনজন লেখক ভ্যালেরির নিকট ‘অহং’-এর অপার গভীর রহস্য উন্মোচিত করেছিলেন বলা যেতে পারে। তাঁরা হলেন—এডগার আলান পো, বোদলেয়র, মালার্মে। ভ্যালেরির অন্তর্গূঢ় সত্তার উদ্বোধনে এই তিন কবি বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। ভ্যালেরির সমস্ত কবিকল্পনার মূলে ছিল আত্মজ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়ের গভীর আকাঙ্ক্ষা। তিনি তাঁর প্রিয় লেখকের মধ্যে যেন তাঁরই অন্তর্দ্বন্দ্বের একটি আভাস খুঁজে পেয়েছিলেন। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব—যা তাঁর স্বভাবের গভীরে লুক্কায়িত ছিল—হ'ল কাব্যপ্রীতি ও বুদ্ধির সর্বাঙ্গিক দাবীপূরণের দুর্জয় প্রয়োজনবোধের মধ্যে দ্বন্দ্ব। এই স্বভাববিরোধের জন্তই তাঁর প্রতিজ্ঞা নিম্নলিখিত রূপ ধারণ করে :

“অনেক বিচার-বিবেচনা করে আমি সংকল্পের আকারে এই অভিমত লিপিবদ্ধ করে রাখি যে, যদি কোনদিন আমাকে লিখতে হয়, তা হ'লে ভাবাবেশে বিহ্বল হয়ে লেখার চাইতে পরিপূর্ণ সজ্ঞানে এবং স্পষ্টভাবে লেখাই আমি বহুগুণ পছন্দ করব, সে জন্ত যদি মামুলী কিছু লিখতে হয় তা-ও স্বীকার।”

এই অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ নির্ণয় এবং ভ্যালেরি-কৃত তার মীমাংসা প্রয়াসের প্রকৃতি অহুধাবনের মধ্যেই ভ্যালেরির কাব্যবিচারের মূল সংকেত নিহিত আছে বলে মনে করি।

ভ্যালেরি কবিতাকে বলেছেন খেলা। প্রচলিত অর্থে ‘খেলা’ মানে এক্ষেত্রে জীবনযাত্রার গ্লানি থেকে অব্যাহতি লাভের উপায়। সাধারণতঃ খেলায় জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায়, বিশ্রামের মধ্য দিয়ে তা আমাদের জীবন-সংগ্রামের যোগ্যতা বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু ভ্যালেরির নিকট খেলার মানে ভিন্ন। তাঁর চোখে খেলা হ'ল যুক্তির চূড়ান্ত প্রয়াস। খেলা আদর্শে কাজের বিরাম নয়, পরস্তু কাজের সেরা কাজ। আমরা যাকে সংগ্রাম বলি, তা মূলতঃ এই খেলার মধ্যেই নিহিত আছে, জীবনের মধ্যে নয়। এই সংগ্রামশীলতারই অপর নাম যুক্তি।

ভ্যালেরির মতে আমাদের বাইবেকার জীবন হ'ল কতকগুলি অবস্থাবিশেষের সমষ্টি মাত্র। নিষ্ক্রিয়তাই এই জীবনের ধর্ম। তিনি চেয়েছিলেন, মানুষের আত্মা পরিপূর্ণ সচেতনভাবে জীবনের এই অবস্থাবিন্যাস

উর্ধ্বে উঠে জীবনের নিরপেক্ষ দর্শকে আপনাকে রূপান্তরিত করুক। গতাহুগতিক জীবনযাপন-প্রণালীর স্বাণ্ড মনের ভিতর প্রচণ্ড একঘেষেমির সৃষ্টি করে। এই একঘেষেমির কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় স্বজনীয়কমতার দ্বারা আপনাকে মগ্নিত করে তোলা।

কিন্তু পরিপূর্ণ মুক্তি বোধ করি সম্ভব নয়। সেই কারণে ভ্যালেরি তাঁর বহিজীবনের গতি অবস্থাবৈজ্ঞান্য উপর ছেড়ে দিতে অস্বীকার ছিলেন না। কিন্তু অন্তরের স্বাধীনতা যে কোন প্রকারে অক্ষুণ্ণ রাখা চাই। আর তারই জন্য বুদ্ধিজীবীর তপস্ক্রমের কঠোর পথ সানন্দে বরণ করে নেবার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। ভ্যালেরির আধ্যাত্মিক উর্ধ্বগতির মূল সূত্র হচ্ছে এই—

“মাহুষের মাহুষত্বের পরিচয় তার চৈতন্যে। চৈতন্যের ধর্ম নিরন্তর প্রয়াস, প্রতীয়মান বস্তুনিচয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ অনাসক্তি। ক্রমাগত চেষ্টায় এই অনাসক্তি অর্জন করতে হয়। বস্তুতঃ গুণ এবং ব্যাপ্তি-নিরপেক্ষ ভাবে এই চৈতন্যের বিস্তার। আধ্যাত্মিক অভীক্ষায়ুক্ত মাহুষ এই প্রক্রিয়ার দ্বারাই শেষ পর্যন্ত সব রকমের বস্তু সম্পর্কে নির্বোধ অর্জন করেন।”

এই যে পরিপূর্ণ অনাসক্তি, তা কি ভাবে কাব্যপ্রেরণার উৎস হতে পারে? এর যে উত্তর ভ্যালেরি দিয়েছেন তা কিঞ্চিৎ অদ্ভুত। তাঁর মতে পরিপূর্ণ অনাসক্তি ছাড়া কাব্যাহুভূতি সম্ভব নয়। কেন না, এই অনাসক্তির দ্বারাই অহং স্বেচ্ছাকৃত ভাবে আপনাকে পৃথিবীর কেন্দ্রমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে; পৃথিবীর দাবতীয় অসংলগ্নতা, বাইল্য ও জটিলতাকে পরাস্ত করে প্রকৃত স্বজনীপ্রয়াসের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে। অর্থাৎ জীবনের অরাস্তক অসংলগ্নতা থেকে মানবিক আত্মাকে এমন ভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে হবে যে, সে যেন জীবনের উপর পরিপূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করতে পারে, যে বিশ্বজ্বলার দ্বারা মাহুষ-জীবন পাকে-পাকে জড়ানো তাকে অখণ্ড জন্মের সামঞ্জস্যে রূপান্তরিত করতে পারে।

কাজেই ভ্যালেরির কৃচ্ছ সাধনা কিঞ্চিৎ ভিন্নমার্গী। যে রহস্যময় উচ্চচড়ার অভিমুখে ভ্যালেরির কৃচ্ছ বতী

প্রয়াসের গতি, সেটি ধ্যানের শৃঙ্খল নয়। ধ্যান ও ধ্যানহতা আসলে নিষ্ক্রিয়তার নামান্তর। এতে মনের ভিতর এক ধরনের একঘেষেমির সৃষ্টি হয়, যার তুল্য দাসত্ব আর কিছু হতে পারে না। কর্মেই মাহুষের মুক্তি। ভ্যালেরির কথা হ'ল—

“শক্তি ছাড়া জ্ঞানের সার্থকতা নেই। আমি যা পারি, কেবল মাত্র সেইটুকুই ‘আমার জ্ঞানের সীমা’ (I Know nothing but what I can do)। কি হ'লে নিমুক্ত মন সক্রিয় হতে পারে? এই হ'লে যে, অবস্থার জটিলজাল থেকে নিজেকে মুক্ত করে মন যদি পুনরায় আপনাকে পৃথিবীর অভিমুখে স্বেচ্ছায় চালিত করে এবং আপনার স্বকীয় পরিকল্পনা অমুযায়ী পৃথিবীকে নতুন করে গড়ে তোলে। নিষ্ক্রিয় একাকিত্ব আত্মার জন্য নয়।

ভ্যালেরির মতে জ্ঞান বা বোধি প্রকৃত অর্থে জাগতিক ঘটনা-প্রবাহ—যাতে আমরা সবাই অসহায়ভাবে জড়িয়ে পড়ি—লক্ষ্য করে যাওয়া নয়; জ্ঞান বলতে বোঝায় যা আছে তার ভিতর যা নেই তারি আবেগ সঞ্চালিত করা। এইরূপ জ্ঞানের দ্বারাই আত্মা জাগতিক মোহ থেকে অব্যাহতি লাভ করে, কেন না, জ্ঞান মানেই হ'ল “not to be what one is”—আমরা যা আছি তা না হওয়া। আমাদের পরিদৃশ্যমান অস্তিত্বকে অতিক্রম করার মধ্যেই জ্ঞানের সার্থকতা।

ভ্যালেরির নিকট কাব্যচর্চা নিছক লিখনবিলাস ছিল না। তিনি সত্তা জনপ্রিয়তা আর অনারাস ধাত্মিকে সর্বদাই ঘৃণা করতেন। উপরে তাঁর মনোজীবনের যেটুকু ধরে দেওয়া হয়েছে তা থেকেই এ কথার বাখ্যার্থ্য প্রতিপন্ন হবে আশা করি। বস্তুতঃ কবিতা ছিল তাঁর নিকট জীবনরহস্যের সমাধানে স্বেচ্ছা-আরোপিত সংযম—মুক্তি ও আত্ম-উপলব্ধির পথ। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, ভ্যালেরি তাঁর কাব্যসাধনার দুর্ভাগ আদর্শ স্থাপনার দ্বারা যে গভীর উপলব্ধিসকল আমাদের জন্য রেখে গেছেন তা চিরকাল তাঁর কাব্যাদর্শের কার্যকারিতা ও সারবস্তুর নিদর্শন হয়ে থাকবে।

তিমিরের অভিসারে

সুনীলকুমার লাহিড়ী

যাযাবরী, তোর ঘরের মায়ায় লাগল কি নেশা শেষে ?
মায়া-জিঞ্জিরে বাঁধা প'ড়ে গেলি জীবন-কিনারে এসে ?

প্রদোষে ঘে ঘর বাঁধি নিছ হাতে,

ভেঙে ফেলি তাবে প্রভাতের সাথে,

নিশি অবসানে পথ চলি পুন তোরি হাতখানি ধরি—

রাতটুকু শুধু কাটে কোন স্বতে তাঁবু আশ্রয় করি ।

বন-বিহগীর ভোরের কাকলী উবার আকাশে জাগে,

মান শুকতারা দীপ্তি হারায় যবে নবাক্ষণ রাগে—

তখনি তাঁবু আত্মনা তুলি ;

ঘরের মমতা একেবারে তুলি,

পথে বাহিরাই চলায় নেশায় অজ্ঞানার নদীপারে ।

যাযাবরী, মোরা চলি চিরকাল তিমিরের অভিসারে ।

ঘরের বাঁধনে মায়ায় কাঁদনে আমরা কতু কি তুলি ?

মরণ বাঁচনে তাই তো এতই সহজ করিয়া তুলি ।

নূতন হইতে নূতনের পানে,

আজীবন ছুটি-কার সন্ধানে ?

সে চির-অজানা থাকে অজানাই—থামে না এ পথ চলা ।

ওঠ যাযাবরী, পথ টানে মোরে, মিথ্যা ধামিতে বলা ।

ফাহুস

অনাদি মণ্ডল

আকাশের কালো বৃকে উড়ন্ত ফাহুস ।

কেমন অচ্ছন্দবেগে চলে দেখ উড়ন্ত ফাহুস ।

শুধু চলে, শুধু চলে, অবিরাম কালো বৃক চিরে

মাটির পৃথিবী ছেড়ে পার হয় বাতাসের ঘর,

তুলকা চালেতে চলে বহুদূর নাহি চেয়ে ফিরে ।

এমনি আলোকতরী দেখেছিহু কবে কোন কালে

কম-কালো পর্দায় ঝাঁঝি-ডাকা রাতের গভীরে,

সে কোন পরান-মাঝি টিমটিমে আলো জ্বলে জ্বলে

পেরোয় অনেক জল একটানা ভাটিয়ালা হয়ে ।

উচুতে উচুতে ঘাই, গ্রহলোক মনোলোক খুঁজি—

লাকালাকি কুঁদোকুঁদি করে মরি অশেষ অটেল ।

ফাহুসের মত তৃপ্তি আমরাও সবটুকু পাই

গরবেতে ফেঁপে ফেঁপে, অপরকে টেকা মারি খুব

রঙিন পোষাকে ঢেকে আপনায় ক্লান্ত কঙ্কাল,

ঝাঁক ঝাঁক প্রজাপতি ফুল খুঁজি পশ্চিম ও পূব ।

জানি না ফাহুস কিনা ! আমাদেরও নেই কোনো হুঁশ,

এক ফোঁটা আলো বৃকে কত না দেখাই মোরা খেলা,

আমাদেরও আলো নেভে,

মাটিতে হুঁড়ি খাই আমরা ফাহুস—

আমরাও নিশ্চয় ফাহুস ।

বর্ষাঙ্গন

ঐশান্তি পাল

তৃষিত নিদ্রাধ-শেষে—

নিম্নে জনভার বারতা আশার
আঘাট দাঁড়াল হেসে।

আজ ঈশানের কোণ ঘোলা,
মোর মরমে লেগেছে দোলা,
ওরে শেষ ক'রে ফেল্ যত কিছু কাজ
যেখানে যা আছে তোলা।

নভের নীলিমা ঢাকা—

নবীন নীরদে গভীর গরদে,
কোলে রামধনু আঁকা।

বুঝি হারাল ভাঙের ঝোলা,
তাই ঝাঞ্জে জ্বল্লে ভোলা,
ওরে শেষ ক'রে ফেল্ যত কিছু কাজ
যেখানে যা আছে তোলা।

নবযৌবন ভরে—

খলদকলা নদীচকলা
বাসকসজ্জা পরে।

বুকে ফেনিল মদির গোলা,
হ'ল গানের ছয়ার খোলা,
ওরে শেষ ক'রে ফেল্ যত কিছু কাজ
যেখানে যা আছে তোলা।

তাণ্ডব হবে শুরু—

প্রমথবা গায় বজ্র-বীণায়
কাঁপে দামিনীর ভুরু।

আজ মাগরের ঢেউ ফোলা,
আজ কাননে লেগেছে দোলা,
ওরে শেষ ক'রে ফেল্ যত কিছু কাজ
যেখানে যা আছে তোলা।

তার স্বভূতর আগে

আনন্দ বাগচী

চারপাশে সাদা পর্দা, শুধুখের গন্ধ, জানালায়
আকাশের চমকানো নীল, একা বালিশের পিঠে
আলগোছে ঠেস দিয়ে ঈষৎ বসার ভঙ্গিমায়
শুয়েছিল, দূরে এক হুমড়ানো পাহাড়ের ভিটে
ছোট্ট ছেলের আঁকা ছবিটির মত, সেই দিকে
অতিক্রান্ত চোখ দুটি তুলে ধরা; কাছে গিয়ে বলি :
'ভালবেসেছিল কেউ একটিই ফুলের কলিকে,
সে গল্প বোধ হয় জান ?' বাইরে সন্ধ্যার রাজা হোলি।

মুক্যালিপটাসের ছায়া দীর্ঘ হ'ল দেওয়ালের গায়,
চমকে তাকাল মুখে, মোমরঙ হাত দুটি ধ'রে
বললাম, 'মনে রেখো আজো ছুঁতে পারি নি তোমায়';
ঘড়িটা চড়ুই-স্বরে শব্দ তোলে। অস্থখের ঘোরে
কি যেন বলতে গিয়ে চারপাশে সাদা পর্দা দেখে
ভয় পেয়ে থেমে গেল গোপন কথাটি উহঁ রেখে।

একটি জলের ধারা অত্যন্ত তে তার কালো মুখে
আমার ব্যথার কাব্য লিখে গেল রূপালী চাবুকে ॥

প্রসঙ্গ কথা

‘বস্তু’ সাহিত্য

নারায়ণ চৌধুরী

আজকাল আমাদের সাহিত্যের কোন কোন সমালোচক এই একটা রব তুলেছেন যে, সাহিত্যে ‘রকের’ ভাষা, বস্তির ভাষা এবং বিস্তির ভাষাকে তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হবে। এই সব সমালোচকদের প্রতিপাল্য এই যে, আধুনিক বাংলা-সাহিত্য ভাষা-প্রয়োগের ব্যাপারে শালীনতার চেতনার দ্বারা অতিমাত্রায় আবিষ্ট; ভাষার আত্যন্তিক শালীন ব্যবহারের ভিতর রুচির সূক্ষ্মতা প্রকাশ পায়, কিন্তু জীবনের প্রাণবন্ততা প্রকাশ পায় না; যে শিক্ষিত জনের ভাষা বাংলা-সাহিত্যে ব্যবহার হয়, সেই শিক্ষিত সম্প্রদায় সমগ্র বাঙালী সমাজের এক অকিঞ্চিৎকর ভগ্নাংশ মাত্র, কাজেই তাদের ভাষায় বাঙালী সমাজের প্রকৃত রূপ উদ্ঘাটিত হওয়া সম্ভব নয়; সর্বোপরি, ভাষা-ব্যবহারে বাঙালী লেখকদের এই অতিরিক্ত স্তম্ভিতবোধ প্রকৃত পূর্বে ছিল না, এটি ইংরেজী সাহিত্যের ঋণ থেকে আসা ‘রোমান্টিক ভিক্টোরীয়’ ঐতিহ্যের কুফল, যার দরুন আমাদের সমগ্র আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের ‘আন্দোলন শীলতা-চর্চার নামে জীবনের স্বাভাবিকতা থেকে একে-বারেই ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে এবং ঘটনা ও চরিত্রচিত্রণে প্রচণ্ড এক কৃত্রিমতার জন্ম দিয়েছে। এই সব বিবেচনায় উক্ত সমালোচকদের সিদ্ধান্ত হ’ল এই যে, বাংলা-সাহিত্যকে যদি বাস্তবায়ন এবং প্রকৃত জীবনবোধের দ্বারা উদ্ধৃত করে তুলতে হয়, তা হ’লে বাঙালী লেখকদের ভাষার এই অতিরিক্ত স্তম্ভিতবোধনা ছাড়তে হবে, প্রাণশক্তিকে অশীলতা-ভীতির উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে, তথাকথিত নীতির দাবিকে সত্যের দাবির অঙ্গগত ও অধীন করতে হবে। আধুনিক বাংলা-সাহিত্য কৃত্রিম এক জীবনদর্শন-প্রসূত শালীনতার পাণ্ডুরোগে ভুগছে, স্বাভাবিকতার রক্তসঞ্চারেই শুধু এই ব্যাধির প্রতিকার হতে পারে।

আলোচ্য সমালোচকদের মতে বাংলা-সাহিত্যে এই অতিরিক্ত শালীনতার সংস্কারের প্রাধান্যের জন্য বন্ধিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ দায়ী। তাঁরাই হলেন বাংলা-

সাহিত্যে রোমান্টিক ভিক্টোরীয় ঐতিহ্যের প্রধান ধারক ও বাহক। বিশেষ, রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ির আবহাওয়ায় বলবৎ ধর্মীয় তথা স্নানীতিবাদী প্রভাবের কারণে এই ভাষাগত শালীনতার সংস্কারকে কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত পরিমাণে যত্ন-পরিচর্যা করেছেন। পূর্বে ঠিক এই অবস্থা ছিল না। ভারতচন্দ্র এবং ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়, দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে এবং ‘ছতোম প্যাচার নকশা’য় বন্ধিম-রবীন্দ্র-পোষিত সাহিত্যিক সংস্কারের বিপরীত মনো-ভাবের প্রতিকলন দেখতে পাওয়া যায়। উল্লিখিত লেখকদের রচনাবলীতে শালীনতার অভাব হয়তো কিঞ্চিৎ উগ্র রকমেই আছে, কিন্তু জীবনশ্রীতিতে ও সম্ভাবিতায় সেই বিচ্যুতির পূরণ হয়েছে। দেহবাদ সম্পর্কে তাঁদের কোনরূপ নাক-সিটকানো মনোভাব ছিল না। তাঁরা জেনে-গুনে বাস্তব সঙ্গতির আদর্শকে তাঁদের রচনার দ্বারা ভিতর গ্রথিত করেছিলেন। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর ‘সধবার একাদশী’ নাটকে তথাকথিত ইতরজ্ঞানোচিত বিস্তি-খেউড়ের ভাষা ব্যবহারে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নি। ফলে তদ্রূপিত সাহিত্য হয়তো এখনকার কালের রুচিতে পরিপুষ্ট কুলীন পাঠকদের পাতে দেওয়ার যোগ্য হয় নি, কিন্তু তা বাস্তবাহুসারী হয়েছে, জীবনধর্মের সম্ভাবনাকে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। অল্প দিকে টেকচাঁদী ও ছতোম ভাষায় রুচিবৈদম্ব্যের প্রমাণ না থাকতে পারে, কিন্তু অগণিত সাধারণ মানুষের মুখের কথাই আসল তাতে ঠিক ঠিক প্রতিকলিত হওয়ায় সাহিত্যের পরিধির সম্প্রসারণ ঘটেছে, তার ভিতর বহু-আকাজ্জিত গণতান্ত্রিক চেতনার স্বর লেগেছে। শুধু ভারতচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্ত দীনবন্ধু মিত্র প্যারীচাঁদ মিত্র কালীপ্রসন্ন সিংহ কেন, উক্ত সমালোচক-বৃন্দ তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানসাগর মহাশয়ের ভাষারীতিকে পর্যন্ত তাঁদের নজিররূপে দাঁড় করাতে চান। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর কতিপয় হাস্য রচনায় একাধিক আরবী ফারসী এবং দেশজ শব্দ ব্যবহার করেছিলেন এবং ক্ষেত্র-

বিশেষে প্রয়োজনতঃ আপাত-অকৃতিকর ভাষা ব্যবহারেও পশ্চাদ্দপ হন নি—এই যুক্তিতে এঁরা দীর্ঘরচনকে সাহিত্যে naturalism-এর সমর্থক বলতে চান। ব্রিটিশ-উত্তর বাংলা-সাহিত্যের প্রাথমিক অধ্যায়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনায় যে naturalism-এর সূত্রপাত, দীনবন্ধু মিত্রে তার পরিপূষ্টি এবং কালীপ্রসন্ন সিংহে তার পরিণতি। পরবর্তী কালের বাংলা-সাহিত্য বঙ্কিম-রবীন্দ্রাদর্শের প্রভাবে এই naturalism থেকে বিচ্যুত হয়ে অবাস্তব রুচিবৈদগ্ধ্যের কল্লিত আভিজাত্যকে আশ্রয় ক’রে ভাষায় ও ভাবে স্বাভাবিকতারই পোষকতা করেছে মাত্র।

প্রথমে সুপণ্ডিত কবি-সমালোচক ডক্টর হুশীলকুমার দে মহাশয় দীনবন্ধু মিত্রের আলোচনা-গ্রন্থে আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের বিরুদ্ধে এই আভ্যন্তরিক শালীনতার অভিযোগ উত্থাপন করেন। পরে তিনি তাঁর সম্পাদিত ‘বাংলা প্রবাহ’ গ্রন্থে এই অভিযোগের সূত্রটিকে আরও কিঞ্চিৎ সম্প্রসারিত করেন। এক্ষণে অক্সফোর্ড কতিপয় সমালোচকও স্জাতসারে বা অস্জাতসারে ডক্টর দেব মতের প্রতিধ্বনি ক’রে বাংলা-সাহিত্যকে জীবনধর্মী ক’রে তোলবার সাধনায় মেতেছেন। এই আন্দোলনের পোষকতা করতে গিয়ে একজন লেখক সেদিন কোনও একটি পত্রিকায় ফরাসী সাহিত্যের আলোচনা করতে গিয়ে এমন পর্বস্তু বলেছেন যে, “কাব্যের এবং দর্শনের ভাষার সঙ্গে খিস্তির ভাষার ব্যবধান বড়জোর একচুল এবং খিস্তির ভাষার মধ্যে কাব্য বা দর্শনের ভাষার চাইতে কম ব্যঞ্জনা লুকিয়ে নেই।” উক্তিটির বৈপ্লবিকত্ব এতই ঘোরতর চমক-লাগানো যে, এর পরিপূর্ণ অর্থবোধ হতে কিঞ্চিৎ সময় লাগে। কিন্তু বৈপ্লবিক উক্তিমাত্রই গ্রহণযোগ্য মনে করবার কারণ নেই। এক-একটি চমক-ধরানো কথা এমন যে, অতিমাত্রায় আধুনিকতাভিমাত্রীর পক্ষেও তা হজম করা শক্ত। বোধ হয় আলোচ্য উক্তিটিও এই পর্যায়ে পড়ে।

তথাকথিত জীবনধর্ম ও স্বাভাবিকতার খাতিরে সাহিত্যে অশালীন ভাষা ব্যবহারের স্বপক্ষে এই যুক্তিজাল-বিস্তারপ্রয়াসকে আমরা পশ্চাদ্গতির নিদর্শন বলে মনে করি। এটি ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দেবার প্রয়াসেরই নামাস্তর। নানা বর্বরজনোচিত বিশ্বাস ও আচরণকে বর্জন করতে করতে যেমন মানবসভ্যতার ক্রমিক অগ্রগতি সাধিত

হয়েছে, তেমনি বহু অশালীন ও অমার্জিত শব্দব্যবহারের অভ্যাস ত্যাগ করতে করতেই ভাষা ক্রমশঃ সৌন্দর্য ও সৌকুমার্যের পথে এগিয়ে চলেছে। সভ্যতার অগ্রগতি ও ভাষার অগ্রগতির প্রক্রিয়া একই পথ বেয়ে চলে, কেননা সভ্যতা এবং ভাষার উচ্চাচচ অবস্থার মধ্যে সর্বদাই আনুপাতিক সম্পর্ক বিद्यমান। বাংলা-সাহিত্যের অগ্রগতির প্রাথমিক স্তরগুলিতে তৎকালীন লেখকদের রচনায় অশালীন ভাষা ব্যবহারের অভ্যাস যদি কিঞ্চিৎ উগ্ররকমেই প্রকাশ পেয়ে থাকে, বুঝতে হবে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের অনগ্রসরতার জন্যই সেই সেই কালের লেখকদের পক্ষে ওইরূপ উচ্ছৃঙ্খল হওয়া সম্ভব হয়েছে। এটি জীবন-ধর্মের আদর্শের প্রতি অহুসারগন্য, naturalism-এর প্রতি মমত্বের প্রসঙ্গও এ ক্ষেত্রে ওঠে না; এটি নেহাতই লেখক-মনের অপরিণত অবস্থার ছোতক। দীনবন্ধু মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহের যুগের পর বাংলা-ভাষা আরও অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের অপরিণীম ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এবং অক্সফোর্ড আরও বহু লেখকের চেষ্টায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আজ এমন এক পরিণত স্তরে এসে উপনীত হয়েছে, যে আবহাওয়ায় রুচির স্থূলত্ব তথা অশালীনতা কোন সাহিত্যসেবীরই মনঃপূত হতে পারে না। পূর্ববর্তী লেখকদের বিচারপ্রবণতা গ্রহণবর্জনক্ষমতা ও নানা মূল্যবান অভিজ্ঞতার স্মৃকল বর্তমান লেখকেরা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছেন। পূর্ববর্তীরা শালীন-অশালীনের পার্থক্যনিরূপণে যে বিচার-শক্তি প্রয়োগ করতেন সে শক্তি তাঁরা আয়াসের দ্বারা অর্জন করেছিলেন, কিন্তু বর্তমান বাঙালী লেখকদের জীবনে তা একান্ত সহজাত। দীর্ঘকালীন ভাষাচর্চার ঐতিহ্য পশ্চাতে বিলম্বিত থাকায় বর্তমান বাঙালী লেখকদের কান মন স্বভাবতঃই এমন স্পর্শকাতর হয়েছে যে, যে-কোন একটি অশালীন শব্দের প্রয়োগে তাঁদের সহজ শিল্পবোধ আকস্মিক আঘাতে যেন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের সুস্থ প্রভাবে পুষ্ট যে-কোন আধুনিক বাঙালী লেখকের কলম অমার্জিত শব্দ ব্যবহার করতে গিয়ে অবধারিত ভাবে হৌচট খায়। ‘সখবার একাদশী’র সংলাপের ধরনে আত্মকের দিনের কোন বাঙালী নাট্যকার যদি তাঁর রচনায় খিস্তি-খেউড়ের ভাষা অবতারণার চেষ্টা করেন, তা হ’লে তাঁর

কলমের কালি স্বাভাবিক দ্বিধাবশতঃই লজ্জায় লাল হয়ে উঠবে। পুনরায় বলি, এটি জীবনধর্ম বনাম কৃত্রিম শালীনতার স্বন্দর প্রশ্ন নয়, সূচিবাইগ্রস্ততার অপবাদও এ প্রশ্নে অবাস্তব; এটি নিছকই পরিমার্জিত রুচির কথা। অনেক দিনের অভ্যাসে এ রুচি গ'ড়ে উঠেছে, আজ ইচ্ছা করলেই আমরা এ রুচিবোধকে আমাদের সাহিত্য থেকে—সুতরাং জীবন থেকে—বিদায় দিতে পারি না। যেমন শিক্ষিত জনের কথাবার্তায় তেমনি লিখিত সাহিত্যের বর্ণনায় ও সংলাপে আজ অঞ্জলি বা অমার্জিত শব্দের প্রয়োগ কদাচ হয়ে থাকে। আধুনিক কালের রুচিতে বাধে ব'লেই এ রকমটি হয়। তবু বরং লোকে বাস্তব জীবনে স্তম্ভ মুহূর্তের সংলাপে অশালীন শব্দব্যবহার গ্রাহ্য ও সহ্য করে, কিন্তু ভাষার লিখিত রূপের ভিতর এ জাতীয় শৈথিল্য কেউ ক্ষমা করে না। মাহুষের মন পরিণত হয়েছে, সুতরাং তার বোধও তীক্ষ্ণতর হয়েছে। দীর্ঘস্থায়ী ভাষাচর্চায় অহুত্বতির স্পর্শকাতরতাও দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ এমন হয়েছে যে, কেউ মুখের কথায় এবং লিখিত ভাষায় রুচ কিংবা অমার্জিত একটি শব্দ ব্যবহার করলে খট করে তা কানে লাগে; অশালীন মনোভাবের প্রকাশক বাক্যবিশ্লেষের দৃষ্টান্তে অস্তর পীড়িত হয়। পূর্ববর্তী শক্তিমান বাঙালী লেখকদের সন্দেহাত্মকপ্রভাবেই যে আধুনিক বাঙালী লেখক ও পাঠকসম্প্রদায়ের ভিতর এ জাতীয় সুন্দর কমনীয়তার বোধ গ'ড়ে উঠেছে, তা বৃদ্ধিতে কষ্ট হয় না। আমাদের অন্ততন ভাষাগত সৌন্দর্য ও রুচিবোধ যদি রোমাঞ্চিক ভিত্তিরূপী ঐতিহ্যের পরিণামফল হয়ে থাকে, তবে-তা নিয়ে বিবাদ করবার কারণ দেখি না। বরং ঐতিহ্যটিকে তার জন্ত স্বাগত-জানাতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ আমাদের মাধ্যম থাকুন যে তাঁরা তাঁদের সাহিত্যের সং ও স্বস্থ প্রভাবের দ্বারা বাংলা-সাহিত্য থেকে ক্ষুধি-খেউড়ের ভাষাকে কেঁটিয়ে বিদায় করেছেন। আজও যদি আমরা টেকচাঁদী ও হুতোমী ভাষার সংস্কারের ভিতর আবদ্ধ হয়ে থাকতাম তাতে এ কথাই শুধু প্রমাণ হ'ত যে, অশালীনতা আমাদের স্বভাবে বদ্ধমূল, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ বুধাই আমাদের ভিতর আবিস্কৃত হয়েছিলেন। তেমন অপবাদ মেনে নিলে প্রচণ্ড কলঙ্কের বোঝা মাধ্যম ক'রে নেওয়া হয়। আশা করি এ কালের কোন সংস্কৃতি-নিষ্ঠ বাঙালীই তা নিতে চাইবেন না।

প্রতিবাদীরা প্রাতঃস্মরণীয় ইন্সরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের নাম এই প্রশ্নে অযথা উত্থাপন করেছেন। তিনি প্রাকৃতজনমূলভ ভাষায় গুটিকয়মাত্র প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, তাঁর সমগ্র সাহিত্যের তুলনায় এর পরিমাণ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তা ছাড়া লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, সৃষ্টিপ্রেরণা বা শিক্ষাবিস্তারের তাগিদ এই রচনাগুলির উৎস নয়, নিতান্ত সাময়িক প্রয়োজনের তাড়না থেকে তাদের উদ্ভব। প্রতিপক্ষের কোন বিপরীত মতের যুক্তি-খণ্ডনকালেই প্রধানতঃ বিজ্ঞানাগর মহাশয় এ জাতীয় রচনারীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। সৃষ্টির তাগিদ অপেক্ষা স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার ইচ্ছাটাই এ সকল রচনার মূল কথা। ফলে এ জাতীয় রচনার সমাদরের আয়ুও খুব দীর্ঘ হয় নি। বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের 'নীতার বনবাস' কিংবা 'শকুন্তলা' ভাষার বিশুদ্ধি গান্ধীর্ষ ও প্রসাদগুণে চিরকাল বাঙালী পাঠকের মনোহরণ করবে, কিন্তু তাঁর প্রাকৃত ভাষাশ্রিত চটুল ধরনের ওই কয়টি রচনার কথা আজ আর কারও মনে নেই। নিতান্ত সে-সব 'বিজ্ঞানাগর-গ্রন্থাবলী'র পাতায় সন্নিবদ্ধ থেকে বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের লেখনীর সচলতার প্রমাণ দিচ্ছে, তার বেশী কিছু নয়। বাংলা-গণ্ডের অন্ততম স্রষ্টারূপে বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের যে প্রতিষ্ঠা, সে তাঁর সংস্কৃত-ধ্বনিময় দৃঢ়সংবদ্ধ গভীর-গভীর ভাষারীতির জন্ত, কোথায় তিনি তাঁর রচনায় 'তাকত', 'বেহুদা', 'ফাজিল', 'ছরকট' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন সে জন্ত নয়। বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের শেখোক্ত রচনারীতির স্মৃতি দেশবাসীর মন থেকে মুছে গেছে, কিছু সংখ্যক ভাষা-গবেষকের গবেষণার খোরাক জ্বোটানো ছাড়া অন্তকার দিনে তার আর কোন সার্থকতা নেই।

এইখানে ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে একটি মূল প্রশ্নের উত্থাপন করব। আশা করি, বিরুদ্ধমতালম্বীরা বিষয়টি দীর চিন্তে বিবেচনা ক'রে দেখবেন।

ভাষাপ্রয়োগের ব্যাপারে যারা স্বভাববাদী, তাঁরা মুখের ভাষার আদল অহুযায়ী লিখিত ভাষাকে গঠিত করতে চান। মৌখিক এবং লিখিত ভাষার মধ্যে ব্যবধানকে তাঁরা কৃত্রিমতার নিদর্শন মনে করেন, কাজেই এই কৃত্রিমতার বিলোপে তাঁরা কৃতসংকল্প। কিন্তু যতই তাঁরা চেষ্টা করুন, লিখিত ভাষা কোন কালেই কি মুখের ভাষার

হুবহু প্রতিক্রম হতে পারে? অতিবড় গণতান্ত্রিক সমাজেও আমাদের মনে হয় মুখের ভাষা আর কলমের ভাষায় কিছু না কিছু প্রভেদ থেকে যাবে। ছইয়ের রীতি আলাদা, স্তত্রাং তাদের বাগ্‌ভঙ্গিও আলাদা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। মানুষ কথা বলে একভাবে, আর তাকে লিখিত রূপ দিতে গেলেই রীত্যন্তরের আশ্রয় গ্রহণ করে। কেন করে? করে এই জ্ঞাত যে, মুখের কথা অসংলগ্ন, প্রায়শ অর্ধসমাপ্ত ও ব্যাকরণ-বিরাধী এবং ব্যক্তিভেদে নানারূপ অঙ্গভঙ্গি ও মুদ্রাদোষের দ্বারা ব্যঞ্জিত কিংবা বিকৃত। মানুষের মুখের কথাকে কলমের মুখে হুবহু রূপ দিতে গেলে সাহিত্যে নৈরাজ্য অবশ্যজারী। বাস্তববাদ কিংবা স্বাভাবিকতার খাতিরে এই অরাজকতাকে কোন ক্রমেই প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। মানুষের লেখনীর ভাষা সংস্কৃত ভাষা, শৃঙ্খলার ভাষা, অপিচ শোভনতা ও শালীনতার ভাষা। লেখকের শিল্পীমূলভ সৌন্দর্য ও রুচিবোধের জন্তই এই ভাষাগঠনের বেলায় তাঁকে সর্বপ্রকার অশালীনতা ও কুরুচিক সমস্তে এড়িয়ে চলতে হয়। রিয়ালিজমের খাতিরে দেহবাদকে তবু বরং সাহিত্যে উৎখাপিত করা চলে, কিন্তু এই দেহবাদের চিত্রণে ভাষাব্যবহার কোন ক্রমেই রুচিবিগর্হিত হওয়া চলবে না। দেহবাদসম্পর্কিত রচনা কোনটি যে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়, কোনটি হয় না, সে কেবল ভাষাব্যবহারে এই শিল্প ও রুচি-বোধের তারতম্যের জন্তই। দেহবাদী ভাব কল্পনা ঘটনার প্রকাশ স্তূলতামগুিত তথা ব্যঙ্গনাহীন হ'লে তা হয় পোর্নোগ্রাফি, পোর্নোগ্রাফিকে রিয়ালিজম ব'লে ভুল করবার কোনই কারণ নেই। বাস্তব-সঙ্গতির আদর্শের খাতিরে, জীবনবাদের খাতিরে আমরা সাহিত্যে দেহবাদী বিষয়বস্তুর অল্পপ্রবেশ ঘটাতে দিতে রাজী আছি, কিন্তু তার রূপায়ণে সর্বাবস্থায় স্মৃতিত ব্যঙ্গনার আশ্রয় লওয়া চাই। অশালীন ভাষা অহুন্দর ব'লেই পরিত্যাজ্য। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসরচনায় দেহবাদী বিষয়কে বর্জন করেছেন এমন কথা বলা যায় না ('কৃষ্ণকাস্তের উইল', 'বিষবৃক্ষ', 'চোখের বালি', 'চতুর্দশ' 'ঘরে-বাইরে' ও 'যোগাযোগ' এ কথার বিপরীতে সাক্ষ্য দেবে); কিন্তু তাঁদের পরিমার্জিত শিক্ষালব্ধ সূক্ষ্ম রুচিণীল মন কোন সময়েই ভাষাগত অঙ্গীলতাকে বরদাস্ত করতে

পারে নি। আর শুধু বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথই নয়, এমন যে শরৎচন্দ্র, যাকে বাঙালী সাহিত্যিক সমাজ রিয়ালিস্ট লেখক ব'লে জানেন, তিনিও কোথাও দেহবাদী চিত্র-চরিত্রের রূপায়ণে শালীনতার গুণী অতিক্রম করেন নি। 'গৃহদাহ'র যেখানটায় ^{জুলকা} ও স্বরেশের জীবনে একান্ত স্বাভাবিক দেহগত বিজ্ঞাস্তির কথা আছে, শরৎচন্দ্র জীবনবাদের নজিরে ইচ্ছা করলেই সেখানে প্রগল্ভ হতে পারতেন, কিন্তু তাঁর সহজাত শিল্পবোধ তাঁকে বাধা দিয়েছে। তিনি দু-একটি ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যঙ্গনাঘন বাক্য সংযোজন ক'রেই তথায় গল্পকারের কর্তব্য সমাপন করেছেন।

পুনরায় বলি, বস্তির ভাষা, খিস্তির ভাষা বহুজনকথিত ব'লেই তা সাহিত্যগ্রাহ্য হতে পারে না। ভাষাপ্রয়োগের বেলায় সংখ্যাবহুলতার যুক্তি অপেক্ষা শিল্পের যুক্তি অনেক বেশী গ্রাহ্য ও মান্য। আমরা বিষয়বস্তুর গণতান্ত্রিকীকরণের পক্ষপাতী, এমন কি ভাষাকে যতদূর সম্ভব জীবনানুসারী ক'রে তোলার নীতিও আমরা স্বীকার করি; কিন্তু ভাষার অশালীন ও কুরুচিকর প্রয়োগ কোন সময়েই বরদাস্ত করতে প্রস্তুত নই। সাহিত্যের ভিতর যে রকম সমাজব্যবহারই প্রতিকলন ঘটুক না কেন, হোক সাহিত্য গণতান্ত্রিক সাম্যবাদী বা আর কিছু, ভাষার আভিজাত্য বিগুন্ধি ও গাঙ্গীর্ষ সর্বথা রক্ষিতব্য। বাস্তব-জীবনের সাহিত্য সঙ্গতির অজুহাতে আমরা যদি ভাষায় নৈথিল্যের প্রশ্রয় দিই, তা হ'লে বাংলা-সাহিত্যের এত দিনের সমস্ত গড়া ঐতিহ্যের ধ্বংস স্থনিশ্চিত।

প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কি মুখের ভাষাকে নির্বিচারে কলমের ভাষা ক'রে তুলব? কিংবা, কলমের ভাষার দ্বারা মুখের ভাষার আংশিক নিয়ন্ত্রণের নীতি স্বীকার করব? আমার তো মনে হয়, আমরা যদি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আদর্শে (এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কথাই বিশেষভাবে মনে পড়ছে) আমাদের মৌখিক সংলাপের ভাষাকে কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করতাম, তা হ'লে অনেক রুঢ়তা ও অসৌন্দর্যের পীড়ন থেকেই বোধ হয় আমাদের স্বকুমার অল্পভুক্তিকে রক্ষা করতে পারতাম। সাহিত্য জীবনের মর্পণস্বরূপ—এ রকম বলা হয়ে থাকে। উক্তিটি একতরফা। কেননা, সাহিত্যই যে শুধু জীবনকে অহুসরণ করে তাই নয়, জীবনের পক্ষেও সাহিত্যকে অহুসরণ করবার অবকাশ

আছে, থাকা উচিত। পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ছন্দে সাহিত্য জীবনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, জীবন সাহিত্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সাহিত্য জীবন থেকে দু'হাতে উপাদান আহরণ করে, জীবন সাহিত্য থেকে সৌন্দর্য ও সত্যের অল্পপ্রেরণা লাভ করে আপনাকে উন্নীত করে।

তা যদি হয়, তবে কেন 'রকে'র ভাষা, বস্তির ভাষা, খিতির ভাষাকে সাহিত্যে পাংক্ত্য করা হবে? এদের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠতার তকমা আঁটা আছে বলেই কি? জীবনকে ষাধাধভাবে, অবিকৃতভাবে সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলতে হবে—এই যুক্তিই কি এই ক্ষেত্রে একমাত্র যুক্তি? যুক্তিটি খোপে টিকবে বলে মনে হয় না। সত্য বটে বস্তিবাসী জনসাধারণ আমাদের সমাজের সমগ্র জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশ, দেশের অনক্ষর নিপীড়িত মানুষ প্রায় সকলেই কোন না কোন আকারের বস্তিবাসকে তাদের বিধিলিপি বলে মেনে নিয়েছে। তাদের ভাগ্যের উন্নয়ন আমরা সর্বতোভাবে কামনা করি, তাদের জীবন-যাত্রার মান উন্নীত হয়ে তথাকথিত ভদ্র মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের সঙ্গে তাদের মানসিক প্রভেদ সম্পূর্ণ ঘুচে যাক—এ আমাদের একান্ত অন্তরের কথা। তাদের মুখে খিতি-খেউড়ের ভাষা আমরা শুনতে চাই না, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বৈদগ্ধ্যের প্রসাদে তাদের ভাষা একদিন শালীন ও সুন্দর হয়ে উঠবে—এইটাই আন্তরিকভাবে সকলের কাম্য। কিন্তু যতদিন না এই বাহ্যিক লক্ষ্য বাস্তবায়িত হচ্ছে, ততদিন তাদের মুখের ভাষার সঙ্গে কলমের ভাষার পার্থক্য বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। সাহিত্যে মাথাগুনতির জোর অপেক্ষা মাথার জোর বড়, এই মাথার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। লেখকের সহজাত সৌন্দর্যবোধ ও রুচিকে কোনমতেই সংখ্যা-গরিষ্ঠতার পায়ে বিকিয়ে দেওয়া চলবে না। ফুটবল-খেলার মাঠের ভাষা ফুটবল-খেলার মাঠেই থাকুক, রোয়াকের ভাষা রোয়াকেই থাকুক, ব্যারাকের ভাষা

ব্যারাকেই থাকুক, naturalism-এর অঙ্কুহাতে তাদের সাহিত্যে পাংক্ত্য করার যুক্তি বাংলা-সাহিত্যের বহু-কষ্টে-গ'ড়ে-তোলা শালীন আবহাওয়াকে কলুষিত করে তোলাবারই অপপরামর্শ মাত্র। আমরা বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য সাহিত্যিকদের কল্যাণে হুতোমী যুগ ছাড়িয়ে এসেছি, naturalism-এর ভ্রান্ত আদর্শের বশবর্তী হয়ে সে যুগে আর ফিরে যেতে চাই না। বাঙালীর একান্ত ভাগ্য বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা-সাহিত্যের অন্যান্য দিকপালগণ তাকে বর্তমান স্তরে সমুত্তীর্ণ করে দিয়েছেন, আজ বঙ্কিম-রবীন্দ্রের ঐতিহ্য অস্বীকার করে আমরা যদি পুনরায় হুতোমী ঐতিহ্য গ্রহণে আগ্রহ প্রদর্শন করি, তাতে শুধু আমাদের বিচারবুদ্ধির ভ্রান্তিরই প্রমাণ হবে, আর কিছুই প্রমাণ হবে না। সাহিত্যে বৈচিত্র্যের আশ্বাদনের জন্য ক্ষেত্রবিশেষে হয়তো 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র ভাষার শরণ নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাকে যদি আদর্শ এক ভাষারীতি হিসাবে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়, সর্বসাধ্য উপায়ে তাতে বাধা দেওয়া উচিত বলে মনে করি।

আসলে বস্তু বলুন, ব্যারাক বলুন,—এগুলি অসম সমাজব্যবস্থার অন্তায় শোষণের ফল মাত্র। পুঁজিবাদী সমাজের এগুলি বিকার। বিকৃতির শোষণ সর্বাংশে কাম্য, তা বলে বিকৃতির আবহাওয়ায় পুষ্ট অহুন্দের ভাষারীতির সমর্থন কোনক্রমেই করা চলে না—এমন কি, স্বাভাবিকতার খাতিরেও নয়। "কাব্যের এবং দর্শনের ভাষার সঙ্গে খিতির ভাষার ব্যবধান বড় জোর একচুল"—এ কোন দেশের খিতির ভাষা জানতে একান্ত নাথ হয়। মনে হচ্ছে কাব্য ও দর্শন সম্পর্কে আমাদের নতুন করে পাঠ নেওয়া দরকার, অন্ত্যায় এই জাতীয় সমীকরণ খাতস্থ হবার নয়। বর্তমান প্রচলিত সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন না করে ধারা সমাজব্যবস্থার অহুচিত বৈশিষ্ট্যগুলিকে সাহিত্যে বাঁচিয়ে রাখার পক্ষে যুক্তি দেন, তাঁরা অজ্ঞাতসারে প্রতিক্রিয়াশীলতারই পোষকতা করেন মাত্র।



বাচ্চা ছেলেটাকে কবর দিয়ে এইমাত্র ফিরে এল সুবাই। রাত অন্ধকার। সন্ধ্যার অনেকখানি গড়িয়ে গেছে রাতের দিকে। বাতাস বইছে না, কোথাও শব্দ নেই। সারা দিনের রোদ লেগে গাছের পাতাগুলো তখনও ঝিমুচ্ছে।

বরাবর ঘিও-র মনে দৃঢ় ধারণা ছিল তার মরবার আগে সংসারের অল্প কেউ মরবে না। বস্তুত তার নিজের ফুসফুস দুটো ঝাঁজরা হয়েও সে বেঁচে আছে, এত বড় যুদ্ধ তার একটুও কতি করতে পারে নি—আর শেষে মাত্র পাঁচ দিনের অরে মারা গেল কোলের বাচ্চা ছেলেটা। ভাগ্যের লীলা সত্যি কি বিচিত্র।

কবরের পাশে ঘাসের ওপর মুখ ঢেকে অনেকক্ষণ বসে ছিল ঘিও। একটু একটু করে ধীরে ধীরে মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চাঁদ। কিন্তু ও-পাশের কোণে দেখা দিয়েছে এক টুকরো জলভরা কালো মেঘ—আসন্ন ঝড়ের সংকেত যেন। রাতের পোকারা শুরু করেছে তাদের দৈনন্দিন ডাক; বাঁশঝাড়ের ফাঁক থেকে জায়গার জায়গার ছিটকে পড়েছে চাঁদের ফ্যাকাশে আলো। ঘিও-র মাথায় তারই একটুখানি লেগে ছিল। কি ভেবে মুখ তুলে চাঁদের দিকে তাকাল ঘিও। কোটরে-টুক-পড়া দু চোখের দৃষ্টি কেমন যেন বিষন্ন আর বোলাটে। সমস্ত চোখে মুখে ফুটে উঠেছে পাণ্ডুরতা আর থেকে থেকে কঁপে কঁপে উঠছে চোঁচ দুটো। এপাশ ওপাশ খোঁজাখুঁজি করে লাঠিটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। লম্বা মাঝারি গোছের রোপা চেহারার ঘিওর। পোশাক দেখলে মনে হয়, মহাযুদ্ধের পাঁচ বছর পর লেপ্তার আর পরিবর্তন হয় নি।

চলতে চলতে হঠাৎ কবরটার দিকে ধমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ঘিও। তারপর নিজের মনেই বললে, ঘুমোও লম্বাটি—বাবা আমার। রোগে জর্জর বাবা কিংবা হতভাগ্য মায়ের বিছানা থেকে ওখানে অনেক আরামে ঘুমতে পারবি। মশা নেই, কোন কষ্ট নেই—বেশ আরামে ঘুমো বাবা। ই-আর, তোর অক্ষম বাবা আর কতদিনই বা স্বপ্ন নিতে পারত। আর তোর মা নানকিং থেকে

রচনা—চৈনিক লেখক কুমো-মো-জো

অনুবাদ—শ্রীতম্ময় বাগচী

উহান, উহান থেকে নানকিং পালিয়ে বেড়িয়ে আজ শান্ত শান্ত। তার ওপর চারটে ছেলেমেয়ের সঙ্গে ঘাড়ে চেপেছে এই অধর্ব বুড়োর ভার। বাড়িতে কত অস্থবিধা কত অসুখ। তার চেয়ে এখানে নিশ্চিন্তে ঘুমো—

এবার ঘিও-র মনে হ'ল সে বুঝি কঁাদবে। কিন্তু চোখে জল কোথায়? আকাশ জুড়ে ঝড়ের মাতামাতিতে এক ফোঁটা জলও পড়ল না। একটু যেন ব্যঙ্গ করেই কালো মেঘ চলে গেল—চাঁদের মুখে তাই বিজয়িনী হাসি।

ধানের ক্ষেতের আল বেয়ে ধীরে ধীরে ফিরে চলল ঘিও। সঙ্গে চলছে তার বিরাট ছায়া। ঘিও-র হাতের লাঠির ঠুকঠুক শব্দের প্রতিধ্বনি উঠেছে ক্ষেতের ব্যাঙদের বৃকে। ক্ষেত ছাড়িয়ে এবার এল একটা নদীর পারে; তারপর আর একটা পাহাড়ের পোল পেরিয়ে, আর একটা ধানক্ষেত ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল পূর্ব দিকে। ছায়াটা এবার সামনে এসে পড়েছে। তারপর ভান দিকের এক বাড়ির আড়ালে এসে ছায়াটা আর দেখা গেল না। আলতোভাবে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ঘিও ঢুকে পড়ল সেই বাড়ির মধ্যে।

ঘরের ভেতর নেমেছে চাপা কামার এক ধমধমে ভাব। খানিক পরে জমাট-বাঁধা অন্ধকার কেমন যেন ফিকে হয়ে গেল। সেই আবছা আলো-আধারের মাঝে ঘিও দেখল, তার স্ত্রী বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে ছোট মেয়েটার পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। বিছানার এক পাশে ছোট ছেলেটা ঘুমুচ্ছে। ঘিও রুখ শিশুর কপালে হাত রেখে জ্বরের তাপ অনুভব করতে চেষ্টা করল। তারপর তার গায়ে একটা চাদর ঢাকা দিয়ে দিল।

ওদের মা বিরক্তভাবে বললে, কেন শুধু শুধু চাপা দিচ্ছ, ও কি গায়ে রাখবে?

কথাটা শেষ হতে না হতেই দুজনে দেখলে ছেলেটা ঢাকা সরিয়ে ফেলেছে।

অবসন্ন আর স্থানুর মত চূপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ঘিও। তারপর এক সময় ঘরের নিস্তব্ধতা ভেঙে বললে, এখনও পর্যন্ত তুমি বোধ হয় কিছু মুখে তোল নি?

এখন আর আমার মুখে খাবার রুচবে না। চেন-আর ই-আরকে দেখবার জন্তে খুব বায়না ধরছিল, একটা কেক দিয়ে কোন রকমে ভুলিয়ে রেখেছি।

মারা যাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত হাসপাতালে ই-আর-এর কাছেই ছিল চেন-আর। সবমাত্র আঙ্গ বিকেলে কোন রকমে ভুলিয়ে ওকে নিয়ে আসা হয়েছে। তবেই কবর দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ছপুর থেকে যিও কিছুই খায় নি, কিন্তু এই মুহূর্তে ও যে কি করবে তা ভেবে ঠিক করতে পারে না। মশা তাড়াবার জন্তে ঘরের কোণে যে ধূপ জলছিল তার ভারী গন্ধে সমস্ত ঘরখানা ছেয়ে গেছে। স্ত্রীকে ডেকে যিও বললে, তুমি এবার শুয়ে পড়। এই ধূপের গন্ধে ২-৩ দিন আবার কান্না জুড়ে দেবে।

তার স্ত্রী নিঃশব্দে চেয়ার থেকে উঠে এসে মশারিটা টাঙিয়ে দিল। এতক্ষণে লাঠিটা ঠিক জায়গায় রেখে জামাটা খুলে হুকে টাঙিয়ে রাখল যিও। তারপর ধূনাটা নিবিয়ে একটা আলো জ্বলে টেবিলে এসে বসল।

কাগজপত্র, গুপ্তের শিশি আর দুধের বোতলে টেবিল ভরতি। সেই স্তূপীকৃত জঞ্জালের এক পাশে রয়েছে সকালের ডাকে আসা একরাশ চিঠি। অতদিন হ'লে প্রতিদিনের অভ্যাসমত চুং-কিং-এর সংবাদপত্রগুলো খুলত, কিন্তু আজ কি ভেবে সেগুলো সরিয়ে রেখে তুলে নিল দুখানা চিঠি। একটা খামের মুখ ছিঁড়তেই বেরিয়ে এল চিঠির সঙ্গে জড়ানো একতড়া নোট। চিঠিতে লেখা—

যিও,

সাহিত্যিক-সাহায্য-সমিতি থেকে যে এক হাজার ডলার তোমাকে দেওয়া হয়েছে—এই সঙ্গে পাঠালাম। এ সাহায্য গ্রহণ করতে তোমার ঘেন কোন কুণী না হয়। আর খুব তাড়াতাড়ি প্রাপ্তিসংবাদ দিও। তোমার অসুস্থতার খবর তোমার বন্ধুরা চিন্তিত, আর তারা তোমার কাছে যে কতখানি ঋণী তার প্রমাণস্বরূপ এই সামান্য অর্থ তোমাকে পাঠাচ্ছে। এই সাহায্য গ্রহণে তোমার কোন অপমান হবে না। আশা করি, বাড়ির সবাই কুশল। ইতি
তুং ফেং

এক হাজার ডলারের এই সাহায্য নিতান্ত সহজ আর স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করল যিও। এই ধরনের কোন সাহায্য সংগ্রহের চেষ্টা তার পুরনো সহকর্মীরা করছে—সে

খবর ভাসা ভাসা ভাবে পেয়েছিল যিও। তার সম্মানদের অসুস্থতার কল্যাণে এতদিনে সম্ভব হ'ল। তাই তুং ফেং-এর উপদেশ গ্রহণ করার আর কোন বাধা রইল না তার। তুং ফেং শুধু বন্ধু নয়, তার অফিসের সর্বময় কর্তা। এক বছর ধরে যিও অসুখে ভুগছে, তবু তার জায়গায় অল্প কাউকে নেওয়া হয় নি—সবাই নিজেরা ভাগাভাগি করে নিয়েছে যিওর কাজগুলো। এসব কারণে তুং ফেং-এর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ছিল যিও।

চিঠির সব শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণটা মূলতঃই রেখে দ্বিতীয় চিঠিটা খুলল যিও। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি থেকে যে কটা বই নিয়েছিল সেগুলো ফেরত দেবার ভাগাধা দিয়েছে তারা। তার পুরনো কর্মক্ষেত্রে বোমা-বর্ষণের সময় অগ্ন্যাগ্নি জ্বিনিসের সঙ্গে সেই বইগুলোও নষ্ট হয়ে গেছে। তাই চিঠির ভাষা তার কর্তব্যবোধকে বেশ একটু আঘাত করেছে : “আমাদের একান্ত অনুরোধ বইগুলি ফেরত দিয়ে বাধিত করবেন। কারণ বইগুলি দুশ্রাপ্যই শুধু নয়, সেগুলির প্রয়োজন আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করছি।”

কিন্তু বইগুলো এখন সে ফেরত দেবে কোথা থেকে? কথটা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ যিও-র নজর পড়ল ডলারের বাণ্ডিলের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে চোখ চলে গেল পাশের মশারির দিকে। প্রদীপের মুহূ আলোয় মশারিতে তার ছায়া অল্প অল্প দুলছে। সত্যি কি ভীষণ রোগা হয়ে গেছে সে।

মশারির একটা দড়ি বুলছিল, তার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন এক ইচ্ছা বিদ্যুতের মত খেলে গেল যিওর মনে। খানিক পরে চেয়ার থেকে উঠে মশারির কোণটা তুলে ভেতর দিকে তাকাল—কয় শিশুপুত্রের পেটে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে অসুস্থভাবে কান্দছে তার স্ত্রী।

ধীরে ধীরে মশারিটা গুঁজে আবার সোফায় এসে বসল যিও। মনে মনে ভাবতে থাকে, ওই এক হাজার ডলার কি ভাবে সে খরচ করবে। সাহায্যটা ঠিক সময় এসেছে, আর ও সেটা গ্রহণ করবে। যে দুখানা বই গেছে যুদ্ধের আগে, তার দাম ছিল দশ ডলার। এখন হয়তো দু শো কিংবা তিন শো হবে। হস্তরাং ওদের তিন শো পাঠালেই হবে। সত্যি, বইগুলোর প্রয়োজন জরুরী। অল্প লোকের কত হবিধা হ'ত! পড়াশুনার মূল্য অনেক, তা যিও জানে। ঠিকমত পড়া না থাকায় সে, নিজেই কত লোককে কত

ভুল মানে ব'লে দিয়েছে। দু বছর আগে একটা কবিতার শেষ দুটো কথার ঠিকমত মানে না জানায় রীতিমত এক বক্তৃতাই দিয়েছিল। পরে 'ঔষ-যুয়ান'র পাতায় হঠাৎ আসল মানেটা পেয়েছিল খুঁজে। সেদিন প্রথম জানল, 'তিয়ান' মানে পদ্মফুল। ফুলের প্রাচুর্য বোঝাতেও কথার ব্যবহার হয়। সুতরাং যে ক্লাবে সে ভুল বক্তৃতা দিয়েছিল, তাদের এক সেট 'ঔষ-যুয়ান' উপহার দেওয়ার নৈতিক দায়িত্ব আছে। অর্থাৎ এ বই কিনতে আরও দুশো ডলার লাগবে।

ই-আর মারা যাবার আগে তাকে এক শিশুসদনে ভরতির ব্যবস্থা হয়েছিল। তাকে ওরা রাখতে রাজী হয়েছিল ব'লে স্কল-কর্তৃপক্ষের কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ রয়েছে যিও। যদি হঠাৎ মারা না যেত, তা হ'লে তার জামা-কাপড় তৈরী করাতেই লাগত পাঁচশো ডলার। সুতরাং ওটা যিও শিশুসদনের কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু ই-আরকে কবর দেবার সময় যে চার শো ডলার ধার নেওয়া হয়েছিল সেটা বাকী থেকে যায় যে! তার চেয়ে তুং ফেংকেই অল্পরোধ করবে টাকার বিলি ব্যবস্থার জন্তে। অল্প আর কিছু ভাবতে পারছে না যিও। উঠে এসে একটা প্যাড টেনে নিয়ে চিঠি লিখতে বসল :

তুং ফেং,

আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। আপনার উপদেশানুযায়ী প্রেরিত হাজার ডলার গ্রহণ করলাম। কিন্তু এই অর্থের ব্যবহার ব্যাপারে আমার কয়েকটি অল্পরোধ আপনাকে রাখতে হবে।

এক বছর আগে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি থেকে যে দুটি বই নিয়েছিলাম, বোমা-বর্ষণের সময় সেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। কর্তৃপক্ষ বইগুলো ফেরত দেবার তাগাদা দিয়ে যে চিঠি দিয়েছেন এই সঙ্গে সেটা পাঠালাম। আমার পক্ষে ক্ষতিপূরণ দেওয়া ছাড়া অল্প উপায় নেই। অতএব তিন শো ডলার পাঠিয়ে দেবেন, যাতে ওরা বইগুলো আবার সংগ্রহ করতে পারেন।

অল্প হবার আগে যুব-সভ্যে যে কটা বক্তৃতা দিই, তার একটাতে 'তিয়ান'-এর মানে সম্বন্ধে ভুল তথ্য দিয়েছিলাম। ও-ব্যাপার আজও ভুলতে পারছি না। সেই ভুলের মামুলস্বরূপ তাদের দুশো ডলার দিতে চাই—তা হ'লে তারা এক সেট 'ঔষ-যুয়ান' কিনতে পারে।

ই-আরকে ভরতি করবার জন্তে আপনি যে শিশুসদনের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন, তার আর প্রয়োজন হবে না। আজ সকালে ই-আর মারা গেছে। সে বেঁচে থাকলে তার জন্ত যে খরচ করতে হ'ত এখনও সে বরকম হোক তাই আমি চাই। কৃতজ্ঞতার দান হিসাবে আপনি যদি তাদের পাঁচ শো ডলার পাঠান তা হ'লে খুশী হব।

ই-আরকে কবর দেবার জন্তে বাড়িওয়ালীর কাছ থেকে যে চার শো ডলার ধার নিয়েছিলাম আপনি যদি তা পরিশোধের দায়িত্ব নেন তবে উপকৃত হব। কারণ ওপরের খরচের পর হাজার ডলারের আর কিছুই বাকী থাকবে না। আপনার ওপর এত ভার দিচ্ছি ব'লে আপনি যেন অসন্তুষ্ট হবেন না, এইটুকুই আমার মিনতি রইল। আমার অক্ষমতা কতখানি, তা আপনার অজানা নেই। ভগবানের কাছে আপনার সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করছি। ইতি

বিনীত—যিও

চিঠিটা শেষ ক'রে টাকটা হুজ্ব এক বড় খামে পুরে তুং ফেং-এর নাম-ঠিকানা লিখে টেবিলের ওপর রেখে দিল যিও। মাথার মধ্যে সেই অদম্য শেষ বাসনা তখনও ঘুরপাক খাচ্ছে। সে সম্বন্ধে চিঠিতে কোন স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও আভাস তো রয়েছে চিঠি জুড়ে—যেমন মশারির ওপর পড়েছে তার স্নান ছায়া। নিজেই শুধু ও-পথ নেবে না, সবাইকে ডাকবে তার পথে।

ধানিক বাদে জী বললে, চিঠি রেখে এখন স্ততে এস। তোমার অস্থখ বাড়লে কি করব বল দেখি?

যিও ভাবে, এক অব্যক্ত কামার ঢেউ তার গলা পর্যন্ত ফেনিয়ে উঠেছে। কিন্তু চোখে জল কই? তুং ফেংকে লেখা চিঠিটা পকেটে পুরে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল সোফার ওপরই। যতক্ষণ না জী ঘুমিয়ে পড়ে ততক্ষণ তাকে জেগে থাকতে হবে। কিন্তু শ্রান্ত দেহ আজ আগে ক'রে বসল বিশ্রামের দাবি।

স্বাই-লাইটের ফাঁক দিয়ে আলনার পাশ বেঁধে ধীরে ধীরে যেন এগিয়ে আসছে চাঁদের ফ্যাকাশে আলো। অনেকক্ষণ পরে তার জী নিঃশব্দে মশারি টাঙিয়ে দিয়ে গেল সোফার ওপর। ক্লান্ত শ্রান্ত যিও তা জানাতেও পারল না।

প্রসঙ্গ কথা

‘বসি’ সাহিত্য

নারায়ণ চৌধুরী

আজকাল আমাদের সাহিত্যের কোন কোন সমালোচক এই একটা রব তুলেছেন যে, সাহিত্যে ‘রকের’ ভাষা, বস্তির ভাষা এবং খিস্তির ভাষাকে তাদের স্বথাযোগ্য স্বধা দিতে হবে। এই সব সমালোচকদের প্রতিপাল্য এই যে, আধুনিক বাংলা-সাহিত্য ভাষা-প্রয়োগের ব্যাপারে শালীনতার চেতনার দ্বারা অতিমাত্রায় আবিষ্ট; ভাষার আত্যন্তিক শালীন ব্যবহারের ভিতর রুচির সূক্ষ্মতা প্রকাশ পায়, কিন্তু জীবনের প্রাণবন্ততা প্রকাশ পায় না; যে শিক্ষিত জনের ভাষা বাংলা-সাহিত্যে ব্যবহার হয়, সেই শিক্ষিত সম্প্রদায় সমগ্র বাঙালী সমাজের এক অকিঞ্চিৎকর ভয়াংশ মাত্র, কাজেই তাদের ভাষায় বাঙালী সমাজের প্রকৃত রূপ উদ্ঘাটিত হওয়া সম্ভব নয়; সর্বোপরি, ভাষা-ব্যবহারে বাঙালী লেখকদের এই অতিরিক্ত গুচিবাইগ্রস্ততা পূর্বে ছিল না, এটি ইংরেজী সাহিত্যের খাত বেয়ে আসা ‘রোমান্টিক ভিক্টোরীয়’ ঐতিহ্যের কুফল, যার দরুন আমাদের সমগ্র আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের আন্দোলন জীলতা-চর্চার নামে জীবনের স্বাভাবিকতা থেকে একে-বারেই ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে এবং ঘটনা ও চরিত্রচিত্রণে প্রচণ্ড এক কৃত্রিমতার জন্ম দিয়েছে। এই সব বিবেচনায় উক্ত সমালোচকদের দিকান্ত হ’ল এই যে, বাংলা-সাহিত্যকে যদি বাস্তবায়ন এবং প্রকৃত জীবনবোধের দ্বারা উদ্ধৃত করে তুলতে হয়, তা হ’লে বাঙালী লেখকদের ভাষার এই অতিরিক্ত খুঁতখুঁতেপনা ছাড়তে হবে, প্রাণশক্তিকে অঞ্জলিতা-ভীতির উদ্দেশ্যে স্থান দিতে হবে, তথাকথিত নীতির দাবিকে সত্যের দাবির অঙ্গগত ও অধীন করতে হবে। আধুনিক বাংলা-সাহিত্য কৃত্রিম এক জীবনদর্শন-প্রসূত শালীনতার পাণ্ডুরোগে ভুগছে, স্বাভাবিকতার রক্তসঞ্চারেই শুধু এই ব্যাধির প্রতিকার হতে পারে।

আলোচ্য সমালোচকদের মতে বাংলা-সাহিত্যে এই অতিরিক্ত শালীনতার সংস্কারের প্রাধাত্যের জন্ম বন্ধিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ দায়ী। তাঁরাই হলেন বাংলা-

সাহিত্যে রোমান্টিক ভিক্টোরীয় ঐতিহ্যের প্রধান ধারক ও বাহক। বিশেষ, রবীন্দ্রনাথ ছোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ির আবহাওয়ায় বলবৎ ধর্মীয় তথা স্ত্রীতাবাদী প্রভাবের কারণে এই ভাষাগত শালীনতার সংস্কারকে কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত পরিমাণে স্বত্ব-পরিচর্যা করেছেন। পূর্বে ঠিক এই অবস্থা ছিল না। ভারতচন্দ্র এবং দৈবর গুপ্তের কবিতায়, দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে এবং ‘ছতোয় প্যাচার নকশা’য় বন্ধিম-রবীন্দ্র-পোষিত সাহিত্যিক সংস্কারের বিপরীত মনো-ভাবের প্রতিকলন দেখতে পাওয়া যায়। উল্লিখিত লেখকদের রচনাবলীতে শালীনতার অভাব হয়তো কিঞ্চিৎ উগ্র রকমেই আছে, কিন্তু জীবনগ্রীতিতে ও সঙ্গীবতায় সেই বিচ্যুতির পূরণ হয়েছে। দেহবাহ সম্পর্কে তাঁদের কোনরূপ নাক-সিটকানো মনোভাব ছিল না। তাঁরা জেনে-শনে বাস্তব সঙ্গতির আদর্শকে তাঁদের রচনার ধারার ভিতর গ্রথিত করেছিলেন। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর ‘সখবার একাদশী’ নাটকে তথাকথিত ইতরজনোচিত খিস্তি-খেউড়ের ভাষা ব্যবহারে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নি। ফলে তদ্রচিত সাহিত্য হয়তো এখনকার কালের রুচিতে পরিপুষ্ট কুলীন পাঠকদের পাতে দেওয়ার যোগ্য হয় নি, কিন্তু তা বাস্তবায়নময়ী হয়েছে, জীবনধর্মের সঙ্গীবনীম্পর্শে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। অন্য দিকে টেকচাঁদী ও ছতোমী ভাষায় রুচিবৈলম্ব্যের প্রমাণ না থাকতে পারে, কিন্তু অগণিত সাধারণ মানুষের মুখের কথার আদল তাতে ঠিক ঠিক প্রতিকলিত হওয়ায় সাহিত্যের পরিধির সম্প্রসারণ ঘটেছে, তার ভিতর বহু-আকাজিক গণতান্ত্রিক চেতনার সুর লেগেছে। শুধু ভারতচন্দ্র দৈবর গুপ্ত দীনবন্ধু মিত্র প্যারীচাঁদ মিত্র কালীপ্রসন্ন সিংহ কেন, উক্ত সমালোচক-বৃন্দ তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে দৈবরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষারীতিকে পর্যন্ত তাঁদের নজিররূপে দাঁড় করাতে চান। দৈবরচন্দ্র তাঁর কতিপয় হাক্ক রচনায় একাধিক আরবী ফারসী এবং দেশজ শব্দ ব্যবহার করেছিলেন এবং ক্ষেত্র-

বিশেষে প্রয়োজনতঃ আপাত-অরুচিকর ভাষা ব্যবহারেও পশ্চাদ্গত হন নি—এই যুক্তিতে এঁরা ঈশ্বরচন্দ্রকে সাহিত্যে naturalism-এর সমর্থক বলতে চান। ব্রিটিশ-উত্তর বাংলা-সাহিত্যের প্রাথমিক অধ্যায়ে বিজ্ঞানগত মহাশয়ের রচনায় যে naturalism-এর সূত্রপাত, দীনবন্ধু মিত্রে তার পরিপুষ্টি এবং কালীপ্রসন্ন সিংহে তার পরিণতি। পরবর্তী কালের বাংলা-সাহিত্য বঙ্কিম-রবীন্দ্রাদর্শের প্রভাবে এই naturalism থেকে বিচ্যুত হয়ে অবাস্তব রুচিবৈদগ্ধ্যের কল্পিত আভিজাত্যকে আশ্রয় করে ভাষায় ও ভাবে অস্বাভাবিকতারই পোষকতা করেছে মাত্র।

প্রথমে সুপণ্ডিত কবি-সমালোচক ডক্টর স্থলীলকুমার দে মহাশয় দীনবন্ধু মিত্রের আলোচনা-প্রসঙ্গে আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের বিরুদ্ধে এই আত্যস্তিক শালীনতার অভিযোগ উত্থাপন করেন। পরে তিনি তাঁর সম্পাদিত ‘বাংলা প্রবাদ’ গ্রন্থে এই অভিযোগের সূত্রটিকে আরও কিঞ্চিৎ সম্প্রসারিত করেন। এক্ষণে অত্যন্ত কতিপয় সমালোচকও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ডক্টর দেব মতের প্রতিধ্বনি করে বাংলা-সাহিত্যকে জীবনধর্মী করে তোলাবার সাধনায় মেতেছেন। এই আন্দোলনের পোষকতা করতে গিয়ে একজন লেখক সেদিন কোনও একটি পত্রিকায় ফরাসী সাহিত্যের আলোচনা করতে গিয়ে এমন পর্যন্ত বলেছেন যে, “কাব্যের এবং দর্শনের ভাষার সঙ্গে খিস্তির ভাষার ব্যবধান বড়জোর একচুল এবং খিস্তির ভাষার মধ্যে কাব্য বা দর্শনের ভাষার চাইতে কম ব্যঞ্জনা লুকিয়ে নেই।” উক্তিটির বৈপ্রবিকল্প এতই ঘোরতর চমক-লাগানো যে, এর পরিপূর্ণ অর্থবোধ হতে কিঞ্চিৎ সময় লাগে। কিন্তু বৈপ্রবিক উক্তিমাত্রই গ্রহণযোগ্য মনে করবার কারণ নেই। এক-একটি চমক-ধরানো কথা এমন যে, অভিমাত্রায় আধুনিকতাবাদমাত্রের পক্ষেও তা হজম করা শক্ত। বোধ হয় আলোচ্য উক্তিটিও এই পর্যায়ে পড়ে।

তথাকথিত জীবনধর্ম ও স্বাভাবিকতার খাতিরে সাহিত্যে অশালীন ভাষা ব্যবহারের স্বপক্ষে এই যুক্তিজাল-বিস্তারপ্রয়াসকে আমরা পশ্চাদ্গতির নিদর্শন বলে মনে করি। এটি ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দেবার প্রয়াসেরই নামান্তর। নানা বর্বরজনোচিত বিশ্বাস ও আচরণকে বর্জন করতে করতে যেমন মানবসভ্যতার ক্রমিক অগ্রগতি সাধিত

হয়েছে, তেমনি বহু অশালীন ও অমার্জিত শব্দব্যবহারের অভ্যাস ত্যাগ করতে করতেই ভাষা ক্রমশঃ সৌন্দর্য ও সৌকুমার্যের পথে এগিয়ে চলেছে। সভ্যতার অগ্রগতি ও ভাষার অগ্রগতির প্রক্রিয়া একই পথ বেয়ে চলে, কেননা সভ্যতা এবং ভাষার উচ্চাচর অবস্থার মধ্যে সর্বদাই আনুপাতিক সম্পর্ক বিद्यমান। বাংলা-সাহিত্যের অগ্রগতির প্রাথমিক স্তরগুলিতে তৎকালীন লেখকদের রচনায় অশালীন ভাষা ব্যবহারের অভ্যাস যদি কিঞ্চিৎ উগ্ররকমেই প্রকাশ পেয়ে থাকে, বুঝতে হবে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের অনগ্রসরতার জন্মই সেই সেই কালের লেখকদের পক্ষে ওইরূপ উচ্ছৃঙ্খল হওয়া সম্ভব হয়েছে। এটি জীবন-ধর্মের আদর্শের প্রতি অনুরাগ নয়, naturalism-এর প্রতি মমত্বের প্রসঙ্গ এ ক্ষেত্রে ওঠে না; এটি নেহাতই লেখক-মনের অপরিণত অবস্থার ছোতক। দীনবন্ধু মিত্রে ও কালীপ্রসন্ন সিংহের যুগের পর বাংলা-ভাষা আরও অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের অপরিণীত ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এবং অজ্ঞাত আরও বহু লেখকের চেষ্টায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আজ এমন এক পরিণত স্তরে এসে উপনীত হয়েছে, যে আবহাওয়ায় রুচির স্থলয় তথা অশালীনতা কোন সাহিত্যসেবীরই মনঃপূত হতে পারে না। পূর্ববর্তী লেখকদের বিচারপ্রবণতা গ্রহণবর্জনক্ষমতা ও নানা মূল্যবান অভিজ্ঞতার স্বফল বর্তমান লেখকেরা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছেন। পূর্ববর্তীরা শালীন-অশালীনের পার্থক্যনিরূপণে যে বিচার-শক্তি প্রয়োগ করতেন সে শক্তি তাঁরা আয়াসের দ্বারা অর্জন করেছিলেন, কিন্তু বর্তমান বাঙালী লেখকদের জীবনে তা একান্ত সহজাত। দীর্ঘকালীন ভাষাচর্চার ঐতিহ্য পশ্চাতে বিলম্বিত থাকায় বর্তমান বাঙালী লেখকদের কান মন স্বভাবতঃই এমন স্পর্শকাতর হয়েছে যে, যে-কোন একটি অশালীন শব্দের প্রয়োগে তাঁদের সহজ শিল্পবোধ আকস্মিক আঘাতে বেন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের হৃদয় প্রভাবে পুষ্ট যে-কোন আধুনিক বাঙালী লেখকের কলম অমার্জিত শব্দ ব্যবহার করতে গিয়ে অবধারিত ভাবে হোঁচট খায়। ‘সধবার একাদশী’র সংলাপের ধরনে আজকের দিনের কোন বাঙালী নাট্যকার যদি তাঁর রচনায় খিস্তি-খেউড়ের ভাষা অবতারণার চেষ্টা করেন, তা হ’লে তাঁর

কলমের কালি স্বাভাবিক দিশাবশতঃই লজ্জায় লাল হয়ে উঠবে। পুনরায় বলি, এটি জীবনধর্ম বনাম কৃত্রিম শালীনতার দ্বন্দ্বের প্রশ্ন নয়, শুচিবাইগ্রস্ততার অপবাদও এ প্রশ্নে অব্যাহত; এটি নিছকই পরিমার্জিত রুচির কথা। অনেক দিনের অভ্যাসে এ রুচি গ'ড়ে উঠেছে, আজ ইচ্ছা করলেই আমরা এ রুচিবোধকে আমাদের সাহিত্য থেকে—সুতরাং জীবন থেকে—বিদায় দিতে পারি না। যেমন শিক্ষিত জনের কথাবার্তায় তেমনি লিখিত সাহিত্যের বর্ণনায় ও সংলাপে আজ অশ্লীল বা অমার্জিত শব্দের প্রয়োগ কদাচ হয়ে থাকে। আধুনিক কালের রুচিতে বাধে ব'লেই এ রকমটি হয়। তবু বরং লোকে বাস্তব জীবনে স্রষ্টা মুহূর্তের সংলাপে অশালীন শব্দব্যবহার গ্রাহ্য ও সহ্য করে, কিন্তু ভাষার লিখিত রূপের ভিতর এ জাতীয় শৈথিল্য কেউ কমা করে না। মাহুকের মন পরিণত হয়েছে, সুতরাং তার বোধও তীক্ষ্ণতর হয়েছে। দীর্ঘস্থায়ী ভাষাচর্চার অহুত্বের স্পর্শকাতরতাও দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ এমন হয়েছে যে, কেউ মুখের কথায় এবং লিখিত ভাষায় রূঢ় কিংবা অমার্জিত একটি শব্দ ব্যবহার করলে ষ্ট্র'ক'রে তা কানে লাগে; অশালীন মনোভাবের প্রকাশক বাক্যবিন্যাসের দৃষ্টান্তে অন্তর পীড়িত হয়। পূর্ববর্তী শক্তিমান বাঙালী লেখকদের সদ্‌গুণপ্রভাবেই যে আধুনিক বাঙালী লেখক ও পাঠকসম্প্রদায়ের ভিতর এ জাতীয় জন্মের কমনীয়তার বোধ গ'ড়ে উঠেছে, তা বৃত্তে কষ্ট হয় না। আমাদের অজ্ঞতন ভাষাগত সৌন্দর্য ও রুচিবোধ যদি রোমান্টিক ভিক্টোরীয় ঐতিহ্যের পরিণামফল হয়ে থাকে, তবে তা নিয়ে বিবাদ করবার কারণ দেখি না। বরং ঐতিহ্যটিকে তার জন্ত স্বাগত জানাতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ আমাদের মাথায় থাকুন যে তাঁরা তাঁদের সাহিত্যের সং ও স্রষ্টা প্রভাবেই দ্বারা বাংলা-সাহিত্য থেকে ক্ষুদ্র-শ্রেণীর ভাষাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছেন। আজও যদি আমরা টেকচাঁদী ও ছতোমী ভাষার সংস্কারের ভিতর আবদ্ধ হয়ে থাকতাম তাতে এ কথাই শুধু প্রমাণ হ'ত যে, অশালীনতা আমাদের স্বভাবে বদ্ধমূল, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ বুধাই আমাদের ভিতর আবির্ভূত হয়েছিলেন। তেমন অপবাদ মেনে নিলে প্রচণ্ড কলঙ্কের বোঝা মাথায় ক'রে নেওয়া হয়। আশা করি এ কালের কোন সংস্কৃতি-নিষ্ঠ বাঙালীই তা নিতে চাইবেন না।

প্রতিবাদীরা প্রাভঃস্মরণীয় দৈবরচন্য বিভাসাগর মহাশয়ের নাম এই প্রশ্নে অবধা উত্থাপন করেছেন। তিনি প্রাকৃতজনহুলভ ভাষার গুটিকয়মাত্র প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, তাঁর সমগ্র সাহিত্যের তুলনায় এর পরিমাণ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তা ছাড়া লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, সৃষ্টিপ্রেরণা বা শিক্ষাবিস্তারের তাগিদ এই রচনাগুলির উৎস নয়, নিতান্ত সাময়িক প্রয়োজনের তাড়না থেকে তাদের উদ্ভব। প্রতিপক্ষের কোন বিপরীত মতের যুক্তি-খণ্ডনকালেই প্রধানতঃ বিভাসাগর মহাশয় এ জাতীয় রচনারীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। সৃষ্টির তাগিদ অপেক্ষা স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার ইচ্ছাটাই এ সকল রচনার মূল কথা। ফলে এ জাতীয় রচনার সমাহারের আয়ুঃ খুব দীর্ঘ হয় নি। বিভাসাগর মহাশয়ের 'নীতার বনবাস' কিংবা 'শকুন্তলা' ভাষার বিভুদ্ধি গাভী ও প্রসাদগুণে চিরকাল বাঙালী পাঠকের মনোহরণ করবে, কিন্তু তাঁর প্রাকৃত ভাষাশ্রিত চটুল ধরনের ওই কয়টি রচনার কথা আজ আর কারও মনে নেই। নিতান্ত সূ-সব 'বিভাসাগর-গ্রন্থাবলী'র পাতায় সন্নিবদ্ধ থেকে বিভাসাগর মহাশয়ের লেখনীর সচলতার প্রমাণ দিচ্ছে, তার বেশী কিছু নয়। বাংলা-গজের অন্ততম স্রষ্টারূপে বিভাসাগর মহাশয়ের যে প্রতিষ্ঠা, সে তাঁর সংস্কৃত-ধ্বনিময় দৃঢ়সংবদ্ধ গভীর-গভীর ভাবারীতির জন্ত, কোথায় তিনি তাঁর রচনায় 'তাকত', 'বেহুদা', 'কাঞ্জিল', 'ছরকট' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন সে জন্ত নয়। বিভাসাগর মহাশয়ের শেষোক্ত রচনারীতির স্মৃতি দেশবাসীর মন থেকে মুছে গেছে, কিছু সংখ্যক ভাষা-গবেষকের গবেষণার ধোরাক জোটানো ছাড়া অত্‌কার দিনে তার আর কোন সার্থকতা নেই।

এইখানে ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে একটি মূল প্রশ্নের উত্থাপন করব। আশা করি, বিরুদ্ধমতালম্বীরা বিষয়টি ধীর চিন্তে বিবেচনা ক'রে দেখবেন।

ভাষাপ্রয়োগের ব্যাপারে যারা 'স্বভাববাদী', তাঁরা মুখের ভাষার আদল অহুযায়ী লিখিত ভাষাকে গঠিত করতে চান। মৌখিক এবং লিখিত ভাষার মধ্যে ব্যবধানকে তাঁরা কৃত্রিমতার নিদর্শন মনে করেন, কাজেই এই কৃত্রিমতার বিলোপে তাঁরা কৃতসংকল্প। কিন্তু যতই তাঁরা চেষ্টা করুন, লিখিত ভাষা কোন কালেই কি মুখের ভাষার

হুবহু প্রতিকল্প হতে পারে? অতিবড় গণতান্ত্রিক সমাজেও আমাদের মনে হয় মুখের ভাষা আর কলমের ভাষায় কিছু না কিছু প্রভেদ থেকে যাবে। দুইয়ের রীতি আলাদা, স্বতরাং তাদের বাগ্‌ভঙ্গিও আলাদা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। মাহুয কথা বলে একভাবে, আর তাকে লিখিত রূপ দিতে গেলেই রীত্যন্তরের আশ্রয় গ্রহণ করে। কেন করে? করে এই জ্ঞাত যে, মুখের কথা অসংলগ্ন, প্রায়শ অর্ধসমাপ্ত ও ব্যাকরণ-বিরোধী এবং ব্যক্তিভেদে নানারূপ অঙ্গভঙ্গি ও মুদ্রাদোষের দ্বারা ব্যক্তি কিংবা বিকৃত। মাহুযের মুখের কথাকে কলমের মুখে হুবহু রূপ দিতে গেলে সাহিত্যে নৈরাজ্য অবশ্যজ্ঞাবী। বাস্তববাদ কিংবা স্বাভাবিকতার খাতিরে এই অরাজক-তাকে কোন ক্রমেই প্রায়শ দেওয়া চলে না। মাহুযের লেখনীর ভাষা সংখ্যের ভাষা, শৃঙ্খলার ভাষা, অপচ শোভনতা ও শালীনতার ভাষা। লেখকের শিল্পীহুলভ সৌন্দর্য ও রুচিবোধের জ্ঞানই এই ভাষাগঠনের বেলায় তাঁকে সর্বপ্রকার অশালীনতা ও কুরুচিকে সযত্নে এড়িয়ে চলতে হয়। রিয়ালিজমের খাতিরে দেহবাদকে তবু বরং সাহিত্যে উত্থাপিত করা চলে, কিন্তু এই দেহবাদের চিত্রণে ভাষাব্যবহার কোন ক্রমেই রুচিবিগর্হিত হওয়া চলবে না। দেহবাদসম্পর্কিত রচনা কোনটি যে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়, কোনটি হয় না, সে কেবল ভাষা-ব্যবহারে এই শিল্প ও রুচি-বোধের তারতম্যের জ্ঞানই। দেহবাদী ভাব কল্পনা ঘটনার প্রকাশ স্থূলতামণ্ডিত তথা ব্যঙ্গনাহীন হ'লে তা হয় পোর্নোগ্রাফিক, পোর্নোগ্রাফিকে রিয়ালিজম ব'লে ভুল করবার কোনই কারণ নেই। বাস্তব-সঙ্গতির আদর্শের খাতিরে, জীবনবাদের খাতিরে আমরা সাহিত্যে দেহবাদী বিষয়বস্তুর অল্পপ্রবেশ ঘটাতে দিতে রাজী আছি, কিন্তু তার রূপায়ণে সর্বাবস্থায় স্মৃতিত ব্যঙ্গনার আশ্রয় লওয়া চাই। অশালীন ভাষা অহন্দর ব'লেই পরিত্যাজ্য। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসরচনায় দেহবাদী বিষয়কে বর্জন করেছেন এমন কথা বলা যায় না ('কৃষ্ণকান্তের উইল,' 'বিষবৃক্ষ,' 'চোখের বালি,' 'চতুরদ' 'ঘরে-বাইরে' ও 'যোগাযোগ' এ কথার বিপরীতে সাফ্য দেবে); কিন্তু তাঁদের পরিমার্জিত শিক্ষালব্ধ সূক্ষ্ম রুচিশীল মন কোন সময়েই ভাষাগত অশ্লীলতাকে বরদাস্ত করতে

পারে নি। আর শুধু বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথই নয়, এমন যে শরৎচন্দ্র, যাকে বাঙালী সাহিত্যিক সমাজ রিয়ালিস্ট লেখক ব'লে জ্ঞানেন, তিনিও কোথাও দেহবাদী চিত্র-চরিত্রের রূপায়ণে শালীনতার গণ্ডী অতিক্রম করেন নি। 'গৃহদাহ'র যেখানটায় অলকা ও সুরেশের জীবনে একান্ত স্বাভাবিক দেহগত বিভ্রান্তির কথা আছে, শরৎচন্দ্র জীবনবাদের নজিরে ইচ্ছা করলেই সেখানে প্রগল্ভ হতে পারতেন, কিন্তু তাঁর সহজাত শিল্পবোধ তাঁকে বাধা দিয়েছে। তিনি দু-একটি ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যঙ্গনাঘন বাক্য সংযোজন ক'রেই তথায় গল্পকাবার কর্তব্য সমাপন করেছেন।

পুনরায় বলি, বস্তির ভাষা, বিস্তির ভাষা বহুজনকথিত ব'লেই তা সাহিত্যগ্রাহ্য হতে পারে না। ভাষাপ্রয়োগের বেলায় সংখ্যাবহুলতার যুক্তি অপেক্ষা শিল্পের যুক্তি অনেক বেশী গ্রাহ্য ও মান্য। আমরা বিষয়বস্তুর গণতান্ত্রিকী-করণের পক্ষপাতী, এমন কি ভাষাকে যতদূর সম্ভব জীবনানুসারী ক'রে তোলার নীতিও আমরা স্বীকার করি; কিন্তু ভাষার অশালীন ও কুরুচিকর প্রয়োগ কোন সময়েই বরদাস্ত করতে প্রস্তুত নই। সাহিত্যের ভিতর যে রকম সমাজব্যবস্থারই প্রতিফলন ঘটুক না কেন, হোক সাহিত্য গণতান্ত্রিক সাম্যবাদী বা আর কিছু, ভাষার আভিজাত্য বিগুপ্তি ও গাঙ্গীর্ষ সর্বথা রক্ষিতব্য। বাস্তব-জীবনের সাহিত্য সঙ্গতির অজুহাতে আমরা যদি ভাষায় শৈথিল্যের প্রায়শ দিই, তা হ'লে বাংলা-সাহিত্যের এত-দিনের সযত্নে গড়া ঐতিহ্যের ধ্বংস স্থানিচিত।

প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কি মুখের ভাষাকে নির্বিচারে কলমের ভাষা ক'রে তুলব? কিংবা, কলমের ভাষার দ্বারা মুখের ভাষার আংশিক নিয়ন্ত্রণের নীতি স্বীকার করব? আমার তো মনে হয়, আমরা যদি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আদর্শে (এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কথাই বিশেষভাবে মনে পড়ছে) আমাদের মৌখিক সংলাপের ভাষাকে কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করতাম, তা হ'লে অনেক রুঢ়তা ও অসৌন্দর্যের পীড়ন থেকেই বোধ হয় আমাদের স্বকুমার অল্পভুক্তিকে রক্ষা করতে পারতাম। সাহিত্য জীবনের দর্পণস্বরূপ—এ রকম বলা হয়ে থাকে। উক্তিটি একতরফা। কেননা, সাহিত্যই যে শুধু জীবনকে অহুসরণ করে তাই নয়, জীবনের পক্ষেও সাহিত্যকে অহুসরণ করবার অবকাশ

আছে, থাকা উচিত। পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার
ছন্দে সাহিত্য জীবনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, জীবন সাহিত্যের
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সাহিত্য জীবন থেকে হ' হাতে
উপাদান আহরণ করে, জীবন সাহিত্য থেকে সৌন্দর্য ও
সত্যের অহুপ্রেরণা লাভ করে আপনাকে উন্নীত
করে।

তা যদি হয়, তবে কেন 'রকে'র ভাষা, বস্তির ভাষা,
খিস্তির ভাষাকে সাহিত্যে পাংক্লেয় করা হবে? এদের
উপর সংখ্যাগরিষ্ঠতার তকমা আঁটা আছে বলেই কি?
জীবনকে ষাষথভাবে, অবিকৃতভাবে সাহিত্যে ফুটিয়ে
তুলতে হবে—এই যুক্তিই কি এই ক্ষেত্রে একমাত্র যুক্তি?
যুক্তিটি ধোপে টিকবে বলে মনে হয় না। সত্য বটে
বস্তিবাদী জনসাধারণ আমাদের সমাজের সমগ্র জনসংখ্যার
এক বৃহৎ অংশ, দেশের অনাকর নিপীড়িত মানুষ প্রায়
সকলেই কোন না কোন আকারের বস্তিবাসকে তাদের
বিধিলিপি বলে মেনে নিয়েছে। তাদের ভাগ্যের
উন্নয়ন আমরা সর্বতোভাবে কামনা করি, তাদের জীবন-
যাত্রার মান উন্নীত হয়ে তথাকথিত ভদ্র মধ্যবিত্ত সমাজের
মানুষের সঙ্গে তাদের মানসিক প্রভেদ সম্পূর্ণ ঘুচে যাক—
এ আমাদের একান্ত অন্তরের কথা। তাদের মুখে খিস্তি-
খেউড়ের ভাষা আমরা শুনতে চাই না, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক
বৈদগ্ধ্যের প্রসাদে তাদের ভাষা একদিন শালীন ও সূক্ষ্ম
হয়ে উঠবে—এইটাই আন্তরিকভাবে সকলের কাম্য। কিন্তু
যতদিন না এই বাঞ্ছিত লক্ষ্য বাস্তবায়িত হচ্ছে, ততদিন
তাদের মুখের ভাষার সঙ্গে কলমের ভাষার পার্থক্য বাঁচিয়ে
রাখতেই হবে। সাহিত্যে মাথাগুনতির জোর অপেক্ষা মাথার
জোর বড়, এই মাথার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।
লেখকের সহজাত সৌন্দর্যবোধ ও রুচিকে কোনমতেই
সংখ্যা-গরিষ্ঠতার পায়ে বিকিয়ে দেওয়া চলবে না। ফুটবল-
খেলার মাঠের ভাষা ফুটবল-খেলার মাঠেই থাকুক,
বোম্বাকের ভাষা বোম্বাকেই থাকুক, ব্যারাকের ভাষা

ব্যারাকেই থাকুক, naturalism-এর অজুহাতে তাদের
সাহিত্যে পাংক্লেয় 'করবার যুক্তি বাংলা-সাহিত্যের বহু-কণ্ঠে-
গ'ড়ে-তোলা শালীন আবহাওয়াকে কলুষিত করে
তোলবারই অপপরামর্শ মাত্র। আমরা বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ
এবং অন্যান্য সাহিত্যিকদের কল্যাণে হুতোমী যুগ
ছাড়িয়ে এসেছি, naturalism-এর প্রান্ত আদর্শের বশবর্তী
হয়ে সে যুগে আর কিরে যেতে চাই না। বাঙালীর একান্ত
ভাগ্য বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা-সাহিত্যের অন্যান্য
দিকপালগণ তাকে বর্তমান স্তরে সম্মুখী করে নিয়েছেন,
আজ বঙ্কিম-রবীন্দ্রের ঐতিহ্য অস্বীকার করে আমরা যদি
পুনরায় হুতোমী ঐতিহ্য গ্রহণে আগ্রহ প্রদর্শন করি, তাতে
শুধু আমাদের বিচারবুদ্ধির প্রান্তিরই প্রমাণ হবে, আর কিছু
প্রমাণ হবে না। সাহিত্যে বৈচিত্র্যের আনন্দের অল্প
ক্ষেত্রবিশেষে হয়তো 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র ভাষার শরণ
নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাকে যদি আদর্শ এক ভাবারীতি
হিসাবে ভুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়, সর্বসাধ্য উপায়ে তাতে
বাধা দেওয়া উচিত বলে মনে করি।

আসলে বস্তু বলুন, ব্যারাক বলুন,—এগুলি অসম
সমাজব্যবস্থার অন্তায় শোষণের ফল মাত্র। পুঁজিবাদী
সমাজের এগুলি বিকার। বিকৃতির শোষণ সর্বাত্মক কাম্য,
তা বলে বিকৃতির আবহাওয়ায় পুষ্ট অসুন্দর ভাবারীতির
সমর্থন কোনক্রমেই করা চলে না—এমন কি, স্বাভাবিকতার
খাতিরও নয়। “কাব্যের এবং দর্শনের ভাষার সঙ্গে খিস্তির
ভাষার ব্যবধান বড় জোর একচুল”—এ কোন্ দেশের খিস্তির
ভাষা জানতে একান্ত সাধ হয়। মনে হচ্ছে কাব্য ও দর্শন
সম্পর্কে আমাদের নতুন করে পাঠ নেওয়া দরকার, অত্যাধিক
এই জাতীয় সমীকরণ ধাতস্থ হবার নয়। বর্তমান প্রচলিত
সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন না করে
ধারা সমাজব্যবস্থার অহুচিত বৈশিষ্ট্যগুলিকে সাহিত্যে
বাঁচিয়ে রাখার পক্ষে যুক্তি দেন, তাঁরা অজ্ঞাতনামে
প্রতিক্রিয়াশীলতায়ই পোষকতা করেন মাত্র।



রচনা—চৈনিক লেখক কুমো-মো-জো

অনুবাদ—শ্রীভদ্রনাথ বাগচী

বাচ্চা ছেলেটাকে কবর দিয়ে এইমাত্র ফিরে এল সুবাই।
রাত অন্ধকার। সম্ভ্রান্ত অনেকখানি গড়িয়ে গেছে
রাতের দিকে। বাতাস বইছে না, কোথাও শব্দ নেই।
সারা দিনের রোদ লেগে গাছের পাতাগুলো তখনও
ঝিমুচ্ছে।

সুবাইর ঘিও-র মনে দৃঢ় ধারণা ছিল তার মরবার
আগে সংসারের অস্ত্র কেউ মরবে না। বস্তুতঃ তার নিজের
ফুলফুল ছোটো ঝাঁজরা হয়েও সে বেঁচে আছে, এত বড়
যুদ্ধ তার একটুও ক্ষতি করতে পারে নি—স্মার শেষে মাত্র
পাঁচ দিনের জরে মারা গেল কোলের বাচ্চা ছেলেটা।
ডাক্তার লীলা সত্যি কি বিচিত্র!

কবরের পাশে ঘাসের ওপর মুখ ঢেকে অনেকক্ষণ বসে
ছিল ঘিও। একটু একটু করে ধীরে ধীরে মেঘের আড়াল
থেকে বেরিয়ে এল চাঁদ। কিন্তু ও-পাশের কোণে দেখা
দিয়েছে এক টুকরো জলভরা কালো মেঘ—আসন্ন ঝড়ের
সংকেত যেন। রাতের পোকারা শুরু করেছে তাদের
দৈনন্দিন ডাক; বাঁশঝাড়ের ফাঁক থেকে জায়গায় জায়গায়
ছিটকে পড়েছে তাঁদের ক্যাকাশে আলো। ঘিও-র মাথায়
তারই একটুখানি লেগে ছিল। কি ভেবে মুখ তুলে তাঁদের
দিকে তাকাল ঘিও। কোটরে-টুক-পড়া ছু চোখের দৃষ্টি
কেমন যেন বিষন্ন আর ঘোলাটে। সমস্ত চোখে মুখে ফুটে
উঠেছে পাণ্ডুরতা আর থেকে থেকে কঁপে কঁপে উঠছে
ঠোট ছোটো। এপাশ ওপাশ খোঁজাখুঁজি করে লাঠিটা
নিয়ে উঠে দাঁড়াল। লম্বা মাঝারি গোছের রোগা চেহারা
ঘিওর। পোশাক দেখলে মনে হয়, মহাযুদ্ধের পাঁচ বছর
পর সেগুলোর আর পরিবর্তন হয় নি।

চলতে চলতে হঠাৎ কবরটার দিকে ধমকে দাঁড়িয়ে
পড়ল ঘিও। তারপর নিজের মনেই বললে, ঘুমোও
লক্ষ্মীটি—বাবা আমার। রোগে জর্জর বাবা কিংবা হতভাগ্য
মায়ের বিছানা থেকে ওখানে অনেক আরামে ঘুমতে
পারবি। মশা নেই, কোন কষ্ট নেই—বেশ আরামে
ঘুমো বাবা। ই-আর, তোর অক্ষম বাবা আর কতদিনই
বা যত্ন নিতে পারত! আর তোর মা নানকিং থেকে

উহান, উহান থেকে নানকিং পালিয়ে বেড়িয়ে আজ শ্রান্ত
ক্লান্ত। তার ওপর চারটে ছেলেমেয়ের সঙ্গে ঘাড়ে চেপেছে
এই অর্থব বুড়োর ভার! বাড়িতে কত অসুবিধা কত
অবহেলা! তার চেয়ে এখানে নিশিষ্ঠে ঘুমো—

এবার ঘিও-র মনে হ'ল সে বৃষ্টি কাদবে। কিন্তু চোখে
জল কোথায়? আকাশ জুড়ে ঝড়ের মাতামাতিতে এক
কোঁটা জলও পড়ল না। একটু যেন ব্যঙ্গ করেই কালো
মেঘ চলে গেল—তাঁদের মধ্যে তাই বিজয়িনী হাসি।

ধানের ক্ষেতের আল বেয়ে ধীরে ধীরে ফিরে চলল
ঘিও। সঙ্গে চলছে তার বিরাট ছায়া। ঘিও-র হাতের
লাঠির ঠুকঠুক শব্দের প্রতিধ্বনি উঠেছে ক্ষেতের ব্যাঙদের
বুকে। ক্ষেত ছাড়িয়ে এবার এল একটা নদীর পারে;
তারপর আর একটা পাহাড়ের পোল পেরিয়ে, আর একটা
ধানক্ষেত ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল পূর্ব দিকে। ছায়াটা এবার
সামনে এসে পড়েছে। তারপর ডান দিকের এক বাড়ির
আড়ালে এসে ছায়াটা আর দেখা গেল না। আলতোভাবে
কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ঘিও টুকে পড়ল সেই
বাড়ির মধ্যে।

ঘরের ভেতর নেমেছে চাপা কান্নার এক ধমধমে ভাব।
খানিক পরে জমট-বাঁধা অন্ধকার কেমন যেন ফিকে হয়ে
গেল। সেই আবছা আলো-আধারের মাঝে ঘিও দেখল,
তার স্ত্রী বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে ছোট মেয়েটার পিঠে
হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। বিছানার এক পাশে ছোট ছেলেটা
ঘুমুচ্ছে। ঘিও রুগ্ন শিশুর কপালে হাত রেখে জরের তাপ
অন্তর্যব করতে চেষ্টা করল। তারপর তার গায়ে একটা
চাদর ঢাকা দিয়ে দিল।

ওদের মা বিরক্তভাবে বললে; কেন শুধু শুধু চাপা দিচ্ছ,
ও কি গায়ে রাখবে?

কথাটা শেষ হতে না হতেই হুজনে দেখলে ছেলেটা
ঢাকা সরিয়ে ফেলেছে।

অবসন্ন আর স্বাগ্রহ মত চূপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ঘিও।
তারপর এক সময় ঘরের নিস্তব্ধতা ভেঙে বললে, এখনও
পর্যন্ত তুমি বোধ হয় কিছু মুখে তোল নি?

এখন আর আমার মুখে খাবার রুচবে না। চেন-আর ই-আরকে দেখবার জন্তে খুব বায়না ধরছিল, একটা কেক দিয়ে কোন রকমে ভুলিয়ে রেখেছি।

২- মারা যাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত হাসপাতালে ই-আর-এর কাছেই ছিল চেন-আর। সবমাত্র আঙ্গ বিকেলে কোন রকমে ভুলিয়ে ওকে নিয়ে আসা হয়েছে। তবেই কবর দেওয়া সম্ভব হয়েছে। দুপুর থেকে যিও কিছুই খায় নি, কিন্তু এই মুহূর্তে ও যে কি করবে তা ভেবে ঠিক করতে পারে না। মশা তাড়াবার জন্তে ঘরের কোণে যে ধূপ জ্বলছিল তার ভারী গন্ধে সমস্ত ঘরখানা ছেয়ে গেছে। স্ত্রীকে ডেকে যিও বললে, তুমি এবার শুয়ে পড়। এই ধূপের গন্ধে ২-স্নন আবার কান্না জুড়ে দেবে।

তার স্ত্রী নিঃশব্দে চেয়ার থেকে উঠে এসে মশারিটা টাঙিয়ে দিল। এতক্ষণে লাঠিটা ঠিক জায়গায় রেখে জামাটা খুলে হুকে টাঙিয়ে রাখল যিও। তারপর ধুনোটা নিবিয়ে একটা আলো জ্বলে টেবিলে এসে বসল।

কাগজপত্র, গুপ্তের শিশি আর দুধের বোতলে টেবিল ভরতি। সেই শুশুকৃত জঞ্জালের এক পাশে রয়েছে সকালের ডাকে আসা একরাশ চিঠি। অল্পদিন হ'লে প্রতিদিনের অভ্যাসমত চুং-কিং-এর সংবাদপত্রগুলো খুলত, কিন্তু আজ কি ভেবে সেগুলো সরিয়ে রেখে তুলে নিল দুখানা চিঠি। একটা খামের মুখ ছিঁড়তেই বেরিয়ে এল চিঠির সঙ্গে জড়ানো একতাড়া নোট। চিঠিতে লেখা—
যিও,

সাহিত্যিক-সাহায্য-সমিতি থেকে যে এক হাজার ডলার তোমাকে দেওয়া হয়েছে—এই সঙ্গে পাঠালাম। এ সাহায্য গ্রহণ করতে তোমার যেন কোন কুষ্ঠা না হয়। আর খুব তাড়াতাড়ি প্রাপ্তিসংবাদ দিও। তোমার অসুস্থতার খবরে তোমার বন্ধুরা চিন্তিত, আর তারা তোমার কাছে যে কতখানি ঋণী তার প্রমাণস্বরূপ এই সামান্য অর্থ তোমাকে পাঠাচ্ছে। এই সাহায্য গ্রহণে তোমার কোন অপমান হবে না। আশা করি, বাড়ির সরাই কুশল। ইতি
তুং ফেং

এক হাজার ডলারের এই সাহায্য নিতান্ত সহজ আর স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করল যিও। এই ধরনের কোন সাহায্য সংগ্রহের চেষ্টা তার পুরনো সহকর্মীরা করছে—সে-

খবর ভাসা ভাসা ভাবে পেয়েছিল যিও। তার সম্মানদের অসুস্থতার কল্যাণে এতদিনে সম্ভব হ'ল। তাই তুং ফেং-এর উপদেশ গ্রহণ করার আর কোন বাধা রইল না তার। তুং ফেং শুধু বন্ধু নয়, তার অফিসের সর্বময় কর্তা। এক বছর ধ'রে যিও অস্থিরে ভুগছে, তবু তার জায়গায় অল্প কাউকে নেওয়া হয় নি—সবাই নিজেরা ভাগাভাগি ক'রে নিয়েছে যিওর কাজগুলো। এসব কারণে তুং ফেং-এর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ছিল যিও।

চিঠির সব শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণটা মূলতুবি রেখে দ্বিতীয় চিঠিটা খুলল যিও। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি থেকে যে কটা বই নিয়েছিল সেগুলো ফেরত দেবার তাগিদা দিয়েছে তারা। তার পুরনো কর্মক্ষেত্রে বোমা-বর্ষণের সময় অত্যাচারিত জিনিসের সঙ্গে সেই বইগুলোও নষ্ট হয়ে গেছে। তাই চিঠির ভাষা তার কর্তব্যবোধকে বেশ একটু আঘাত করেছে : “আমাদের একান্ত অহরোধ বইগুলি ফেরত দিয়ে বাধিত করবেন। কারণ বইগুলি দুস্ত্রাপ্যই শুধু নয়, সেগুলির প্রয়োজন আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করছি।”

কিন্তু বইগুলো এখন সে ফেরত দেবে কোথা থেকে? কথটা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ যিওর নজর পড়ল ডলারের বাণ্ডিলের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে চোখ চ'লে গেল পাশের মশারির দিকে। প্রদীপের মুহূর্ত আলোর মশারিতে তার ছায়া অল্প অল্প ঢুলছে। সত্যি কি ভীষণ রোগা হয়ে গেছে সে।

মশারির একটা দড়ি ঝুলছিল, তার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন এক ইচ্ছা বিদ্যুতের মত খেলে গেল যিওর মনে। খানিক পরে চেয়ার থেকে উঠে মশারির কোণটা তুলে ভেতর দিকে তাকাল—কপ্প শিশুপুত্রের পেটে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে অশ্রুটভাবে কাঁদছে তার স্ত্রী।

ধীরে ধীরে মশারিটা গুঁজে আবার সোফায় এসে বসল যিও। মনে মনে ভাবতে থাকে, ওই এক হাজার ডলার কি ভাবে সে খরচ করবে। সাহায্যটা ঠিক সময় এসেছে, আর ও সেটা গ্রহণ করবে। যে দুখানা বই গেছে যুদ্ধের আগে, তার দাম ছিল দশ ডলার। এখন হয়তো দু শো কিংবা তিন শো হবে। হুতরাং ওদের তিন শো পাঠালেই হবে। সত্যি, বইগুলোর প্রয়োজন জরুরী। অল্প লোকের কত স্ববিধা হ'ত! পড়াশুনার মূল্য অনেক, তা যিও জানে। ঠিকমত পড়া না থাকায় সে নিজেই কত লোককে কত

ভুল মানে ব'লে দিয়েছে। দু বছর আগে একটা কবিতার শেষ দুটো কথার ঠিকমত মানে না জানায় রীতিমত এক বক্তৃতাই দিয়েছিল। পরে '৭২-মুদ্রান' পাতার হঠাৎ আসল মানেটা পেয়েছিল খুঁজে। সেদিন প্রথম জানল, 'তিয়ান' মানে পদ্মফুল। ফুলের প্রাচুর্য বোঝাতেও কথার ব্যবহার হয়। সুতরাং যে ক্লাবে সে ভুল বক্তৃতা দিয়েছিল, তাদের এক সেট '৭২-মুদ্রান' উপহার দেওয়ার নৈতিক দায়িত্ব আছে। অর্থাৎ এ বই কিনতে আরও দুশো ডলার লাগবে।

ই-আর মারা যাবার আগে তাকে এক শিশুসদনে ভরতির ব্যবস্থা হয়েছিল। তাকে ওরা রাখতে রাজী হয়েছিল ব'লে স্থল-কর্তৃপক্ষের কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ রয়েছে যিও। যদি হঠাৎ মারা না যেত, তা হ'লে তার জামা-কাপড় তৈরী করাতেই লাগত পাঁচশো ডলার। সুতরাং ওটা যিও শিশুসদনের কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু ই-আরকে কবর দেবার সময় যে চার শো ডলার খার নেওয়া হয়েছিল সেটা বাকী থেকে যায় যে। তার চেয়ে তুং ফেংকেই অহরোধ করবে টাকাটার বিলি ব্যবস্থার অন্তে। অন্য আর কিছু ভাবতে পারছে না যিও। উঠে এসে একটা প্যাড টেনে নিয়ে চিঠি লিখতে বসল :

তুং ফেং,

আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। আপনার উপদেশাভ্যাসী প্রেরিত হাজার ডলার গ্রহণ করলাম। কিন্তু এই অর্থের ব্যবহার ব্যাপারে আমার কয়েকটি অহরোধ আপনাকে রাখতে হবে।

এক বছর আগে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি থেকে যে দুটি বই নিয়েছিলাম, বোমা-বর্ষণের সময় সেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। কর্তৃপক্ষ বইগুলো ফেরত দেবার তাগাদা দিয়ে যে চিঠি দিয়েছেন এই সঙ্গে সেটা পাঠালাম। আমার পক্ষে ক্ষতিপূরণ দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই। অতএব তিন শো ডলার পাঠিয়ে দেবেন, যাতে ওরা বইগুলো আবার সংগ্রহ করতে পারেন।

অনুগ্রহ বার আগে যুব-সভ্য যে কটা বক্তৃতা দিই, তার একটাতে 'তিয়ান'-এর মানে সন্দেহ ভুল তথ্য দিয়েছিলাম। ও-ব্যাপার আজও ভুলতে পারছি না। সেই ভুলের মাশুলস্বরূপ তাদের দুশো ডলার দিতে চাই—তা হ'লে তারা এক সেট '৭২-মুদ্রান' কিনতে পারে।

ই-আরকে ভরতি করবার ক্ষেত্রে আপনি যে শিশুসদনের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন, তার আর প্রয়োজন হবে না। আজ সকালে ই-আর মারা গেছে। সে বেঁচে থাকলে তার ক্ষত যে ধরচ করতে হ'ত এখনও সে রকম হোক তাই আমি চাই। কৃতজ্ঞতার দান হিসাবে আপনি যদি তাদের পাঁচ শো ডলার পাঠান তা হ'লে খুশী হব।

ই-আরকে কবর দেবার অন্তে বাড়িওয়ালীর কাছ থেকে যে চার শো ডলার খার নিয়েছিলাম আপনি যদি তা পরিশোধের দায়িত্ব নেন তবে উপকৃত হব। কারণ ওপরের খরচের পর হাজার ডলারের আর কিছুই বাকী থাকবে না। আপনার ওপর এত ভার দিচ্ছি ব'লে আপনি যেন অসন্তুষ্ট হবেন না, এইটুকুই আমার মিনতি রইল। আমার অক্ষমতা কতখানি, তা আপনার অজানা নেই। ভগবানের কাছে আপনার সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করছি। ইতি

বিনীত—যিও

চিঠিটা শেষ ক'রে টাকাটা হুদ্ব এক বড় খামে পুরে তুং ফেং-এর নাম-ঠিকানা লিখে টেবিলের ওপর রেখে দিল যিও। মাথার মধ্যে সেই অদম্য শেষ বাসনা তখনও ঘুরপাক খাচ্ছে। সে সন্দেহে চিঠিতে কোন হুস্পট উল্লেখ না থাকলেও আভাস তো রয়েছে চিঠি জুড়ে—যেমনি মশারির ওপর পড়েছে তার ম্লান ছায়া। নিজেই শুধু ও-পথ নেবে না, সবাইকে ডাকবে তার পথে।

খানিক বাদে জী বললে, চিঠি রেখে এখন শুতে এস। তোমার অহুত বাড়লে কি করব বল দেখি?

যিও ভাবে, এক অব্যক্ত কান্নার ঢেউ তার গলা পর্যন্ত ফেনিয়ে উঠেছে। কিন্তু চোখে জল কই? তুং ফেংকে লেখা চিঠিটা পকেটে পুরে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল সোফার ওপরই। যতক্ষণ না জী ঘুমিয়ে পড়ে ততক্ষণ তাকে জেগে থাকতে হবে। কিন্তু শ্রান্ত দেহ আজ আগে ক'রে বসল বিশ্রামের দাবি।

স্কাই-লাইটের ফাঁক দিয়ে আলনার পাশ ঘেঁষে ধীরে ধীরে যেন এগিয়ে আসছে চাঁদের ক্যাকাশে আলো। অনেকক্ষণ পরে তার জী নিঃশব্দে মশারি টাঙিয়ে দিয়ে গেল সোফার ওপর। ক্লান্ত শ্রান্ত যিও তা জানাতেও পারল না।

গ্রন্থ-পরিচয়

কথা-সাহিত্য

চরকাসেম (পরিবর্তিত ২য় সংস্করণ) : অমরেন্দ্র ঘোষ। বুক ওয়ার্ল্ড লিঃ, ৫ হেষ্টিংস স্ট্রীট।

কুসুমের স্মৃতি : অমরেন্দ্র ঘোষ। নব ভারতী, ৫ শ্রীমাচরণ দে স্ট্রীট।

অমরেন্দ্র ঘোষের 'চরকাসেম' বাংলার নিম্নশ্রেণীর মুসলমান সমাজের একটি উজ্জল, বস্তুনিষ্ঠ চিত্র। শরৎচন্দ্র তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে মুসলমান সমাজের উপর ভিত্তি করিয়া যে নতুন ধরনের উপন্যাস রচনার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি অমরেন্দ্র ঘোষের এই উপন্যাসে পালিত হইয়াছে। লেখক যেন মুসলমান সমাজের মধ্যে বিভিন্ন পরিবারকে এক সূত্রে গ্রথিত করিবার যে নিগূঢ় বহুশ্রম প্রবণতা আছে তাহার মর্যাদাটন করিয়াছেন। বিশেষতঃ নৌকার মাঝি-মাল্লা, জেলে প্রভৃতির মধ্যে জীবিকার্জনের নির্মম প্রয়োজনে যে সমবায়-নীতির অল্পশীলন হয়, তাহার পিছনে ধর্মগত সমপ্রাণতা, ঐক্যবন্ধন ও শৃঙ্খলাবোধের প্রেরণাটি তিনি অতি সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। অবশ্য যে কোন সমাজের ভ্রাতৃ এই সমাজেও ঈর্ষা, ঘেঁষ, কুটিলতা, সমাজবিরোধী স্বার্থপরতার অভাব নাই। তথাপি মনে হয় যে-সমাজবন্ধন এই নদীমাতৃক দেশের মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে যতটা বন্ধমূল ও গভীরভাবে স্বীকৃত, এমন আর কোথাও নহে। নদীর তীরে বাস করিয়া ইহার খামখেয়ালী অল্পগ্রহ-নিগ্রহের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, নদীপথে উহারই অনিশ্চিত প্রসাদবস্ত্র জীবিকার উপর নির্ভর করিয়া ইহাদের মধ্যে স্বভাবতঃই একটা ব্যষ্টির অতীত গোষ্ঠীনির্ভরতা গড়িয়া উঠে। এই বৃহত্তর সমাজ-বস্তুর রূপটি উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর মধ্যে চমৎকারভাবে ফুটিয়াছে। কাসেমের চরে হিন্দু রসময় দাস বাস করে, সেও প্রায় এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই হিন্দু-মুসলমানের মিলন কোন সাম্প্রদায়িক ভাববিলাসের মাধ্যমে নহে, জীবনের স্বাভাবিক আকর্ষণেই সম্পাদিত হইয়াছে। ইহাদের কথাবার্তা, আশা-নৈরাশির উত্থান-পতন, জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার প্রাণাসক্তকর অথচ ব্যর্থকরণ প্রচেষ্টা, ইহাদের মনের সূক্ষ্ম গতিবিধি ও পারস্পরিক মন্ত্রণা পরামর্শ সমস্ত একটি অনুবৃত্ত স্বাভাবিকতার ছন্দে গ্রথিত হইয়াছে। ইহাদের ব্যবহৃত কথা আঞ্চলিক ভাষা, ইহাদের কৌতুকপ্রকাশের ভঙ্গী, তির্যক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও জীবনযাত্রা হইতে সত্য-আহরিত ভাষণরীতি—সবেরই উপর প্রত্যক্ষ অল্পভূতির ছাপ মারা আছে। লেখক ইহাদের

সমগ্র জীবনযাত্রাকে অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শিতা ও সহায়ভূতির সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন ও ইহাদের মূখনিঃসৃত ভাষা তীক্ষ্ণ, স্বাচ্ছন্দ্য সরসতার সাহিত্য বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার নিজের বিবৃতি ও মন্তব্যসমূহও ঠিক একই সুরে বাঁধা—যে সমাজের চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন তাহারই ভাবপরিধির মধ্যে নিভুল মাত্রা-দানের সহিত সন্নিবিষ্ট।

এই জাতীয় উপন্যাসে সাধারণত ব্যক্তিজীবনের বৃহত্তর গভীরভাবে অল্পভূত হইবার কোন অবকাশ থাকে না। ব্যক্তি এখানে গোষ্ঠীর অবিচ্ছিন্ন অঙ্গরূপে আবিস্কৃত হয়। তথাপি কাসেম, ফুলমন ও আবু অন্তত এই তিনটি চরিত্রে লেখক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। কাসেম সরল অন্ধ ও কল্পনাপ্রবণ যুবক, নিজের যে কোন অসাধারণ গুণ আছে সে বিষয়ে তাহার কোন ধারণা নাই। তথাপি শূন্যগর্ত আভিজাত্যের বিরুদ্ধে তাহার যে আত্মজীবন প্রতিবাদ ও সংগ্রাম, ফুলমনের প্রতি তাহার যে বিরাগ-আকর্ষণমিশ্র হীনমত্ততা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংকল্পের সমবায় গঠিত মনোভাব, তাহাই তাহার নেতৃত্বস্বরূপের হেতু হইয়াছে। এই দুর্লভকে জয় করিবার তীব্র আগ্রহ তাহাকে বীররূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ইহার পর চর কাসেমের সলিলগর্ভ হইতে অত্যন্ত উত্থানের ফলে তাহার চিরদিনের স্বপ্ন সত্য হইয়াছে ও ইহা তাহার নেতৃত্বশক্তিবিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র ও প্রেরণা যোগাইয়াছে।

'চরকাসেম' 'পদ্মানদীর মাঝি'র পরেই এক শ্রেণীর মুসলমান সমাজের একটি নিখুঁত, সরস প্রতিচ্ছবি—ইহাতে লেখকের সামগ্রিক গোষ্ঠী-চিত্রাঙ্কণ ও ব্যক্তিস্ব সূত্র এই উভয়-বিধ স্তরেরই কৃতিত্বপূর্ণ পরিচয় মিলে। এই শান্ত পল্লীজীবনে কিন্তু সমাজবিপ্লবের পূর্বাভাস, বড়ো হাওয়ার প্রথম সঙ্কেত জাগিয়াছে। বিশ্বযুদ্ধের অসহনীয় আবির্ভাব সমাজজীবনের উপর আক্ৰিষ্ট হইয়া উহাকে কেন্দ্রীভূত করিয়াছে। স্বদূর চরকাসেম রণাঙ্গনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া উহার ভূকম্পনকারী ঘূর্ণিঝড়ের অত্যন্ত জীবনযাত্রা হইতে সবেগে উৎক্লিষ্ট হইয়াছে। জীবন হালধার বৈপ্লবিকতার দৃঢ়রূপে উপন্যাসে প্রবেশ করিয়া এক অচিন্তিতপূর্ব আমূল পরিবর্তনের সূচনা করিয়াছে।

তাঁহার 'কুসুমের স্মৃতি' নামে ছোটগল্প-সংগ্রহের মধ্যেও তাঁহার শিল্পবোধ, সাক্ষাতিক পরিমণ্ডল রচনা ও আঙ্গিক বিভ্রাস-নৈপুণ্যের নিদর্শন স্থপরিষ্কৃত। এই সমস্ত গল্পের মধ্যে বাস্তব প্রেরণা অপেক্ষা মনোজ্ঞ কল্পনা, কবিত্বময় অল্পভূতি ও মূর্ত্তের উজ্জ্বলতার সার্থক রূপায়ণই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। আধুনিক বাঙালী

ঔপন্যাসিক গোষ্ঠী বৃহৎ উপন্যাসে নির্মমভাবে বস্তুনিষ্ঠ ও উগ্রমতবাদপ্রসূ, কিন্তু ছোটগল্পে সুকুমারকল্পনাপ্রবণ। তাঁহাদের মনে সৌন্দর্য্যভূতির ধারাটি উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রতিহত হইয়া ছোটগল্পের সন্নিবেশিত গভীর মধ্যে উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। উপন্যাসে যিনি একাগ্রভাবে সমাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিশ্লেষণ-তৎপর, ছোটগল্পে আবার তিনিই স্বপ্নাবিষ্ট, সৌন্দর্য্যধানমগ্ন, ভাবতন্ময়। যাহার এক হাত নির্মম সমস্তার সহিত প্রাণাঙ্কুর মল্লযুদ্ধে ব্যাপ্ত, তাহারই আর এক হাত খেয়ালী কল্পনার প্রিয়-কণ্ঠালিঙ্গনে আত্মবিস্মৃত। অমরেন্দ্র ঘোষের রচনাতেও এই উভয়বিধ প্রবণতাই লক্ষ্যীয়। সমস্তাপীড়িত জীবনে এই স্বপ্নপ্রয়াণপ্রবণতা মাহুষের স্বভাবসিদ্ধ বৈতপ্রকৃতির স্বাক্ষর বহন করে। লেখকের কৃতিত্ব এই যে যখন তিনি স্বপ্ন দেখেন তখন তাহাতেই পরিপূর্ণভাবে আত্মনিমজ্জিত হইয়া যান—তাঁহার স্বপ্নের মধ্যে বাস্তব ও বাস্তবের মধ্যে স্বপ্ন অল্পপ্রবিষ্ট হইয়া একটা আলো-ঐধারি মরীচিকার সৃষ্টি করে না। ‘কুসুমের স্মৃতি,’ ‘স্বর্ঘ্যমুখীর মৃত্যু,’ ‘সারদার স্মরণ’ প্রভৃতি গল্পগুলি লেখকের এই সীতিপ্রাণ স্বপ্নপ্রবণতার সুন্দর নিদর্শন।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবন্ধ

নবযুগের বাংলা : বিপিনচন্দ্র পাল। যুগযাত্রী প্রকাশক লিমিটেড, ৪১-এ বলদেওপাড়া রোড, কলিকাতা-৬। ছয় টাকা।

অদেবী আন্দোলন এবং পরে অসহযোগ আন্দোলনের ফলে “আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতি”র বহিমুখী চিন্তা যখন আত্মমুখী হইল, বাংলা দেশের তিনজন মনীষী তখন বাঙালীর সমাজ ও ধর্মের ইতিহাস পূর্বাধার অহুস্ফটন ও অহুস্ফলন করিয়া তাহাকে “আপনাকে জানি”বার কাজে সহায়তা করিয়াছিলেন—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র পাল। আচার্য হরপ্রসাদ বর্ধমান-সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় চিন্তন-সম্পাদিত ‘নারায়ণে’ এবং বিপিনচন্দ্র ‘বঙ্গবাণী’ মাসিকপত্রে বাঙালীর সাধনার বৈশিষ্ট্যের কথা অপরূপ ভঙ্গিতে ও ভাষায় স্তনাইয়াছিলেন। বিপিনচন্দ্রের ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত সেই “নবযুগের কথা” (১৩২৮-৩১) পুস্তকাকারে পাইবার জন্য তখনই শিক্ষিত সমাজের বিশেষ আগ্রহ দেখা গিয়াছিল। এতদিন পরে তাঁহারই সুযোগ্য পৌত্র নারায়ণ পাল এম-এ যে পিতৃকৃত্য সম্পাদন করিলেন তৎক্ষণাৎ আমরা শ্রীমানকে আশীর্বাদ করিতেছি।

‘নবযুগের বাংলা’ “পরিশিষ্ট” লইয়া সপ্তদশ কথায় বিভক্ত। গোড়াতেই “বাংলার বৈশিষ্ট্য” বিচার করিয়া বিপিনচন্দ্র রামমোহনের প্রবর্তনায় ও ইংরেজ-শিক্ষিত “ইয়ং

বেঙ্গলে”র সাধনায় যে নবযুগের বাংলা গড়িয়া উঠিল তাহার উপর ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব—দেবেজনাথ ও কেশবচন্দ্রের প্রভাব বর্ণনা করিয়াছেন (৪র্থ হইতে ৭ম কথা)। তৎপরে মনীষী রাজনারায়ণের ভাবনায় কি ভাবে স্বাদেশিকতার উন্মেষ হইল এবং নবগোপাল মিত্র প্রভৃতির চেষ্টায় “হিন্দুমেলা”র মধ্য দিয়া তাহা কি ভাবে কার্যকরী রূপ লইল সেই কাহিনী বলা হইয়াছে (৮ম-২২ম কথা)। তাহার পর বাংলা-সাহিত্যের পথে বঙ্কিমচন্দ্র ও “বঙ্গদর্শন” বাংলার নবযুগকে কি ভাবে প্রভাবিত ও রূপায়িত করিলেন বিপিনচন্দ্র অতি চমৎকারভাবে তাহা দেখাইয়াছেন (১০ম-১৩শ কথা)। চতুর্দশ কথায় নবযুগ-রচনার রঞ্জালয়ের প্রভাব বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ কথায় রাষ্ট্রগুরু হরেন্দ্রনাথের অভ্যুদয়ে ও আনন্দমোহনের চিন্তা-ধারায় নব্যবাংলা যে নূতন বৈজ্ঞানিক প্রেরণা লাভ করিল তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। শেষের দিকে এই কাহিনী সম্পূর্ণতা লাভ করিবার অবকাশ পায় নাই, কিন্তু তাহাতে নবযুগের বাংলাকে বৃষ্টিবার কোনও অসুবিধা ঘটে নাই।

এই গ্রন্থখানি প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর অবশ্যপাঠ্য। বিপিনচন্দ্র প্রারম্ভেই বলিয়াছেন : “বাংলার চিন্তারাজ্য আজ নিষ্পন্ন, ভাবের স্রোত বন্ধ, বাংলার যে একটা বৈশিষ্ট্য চিরদিন ছিল, এখনও আছে, যে বৈশিষ্ট্য হারাইলে ভারতবর্ষের সমষ্টিগত চিন্তা, ভাব ও কর্মভাণ্ডারে বাংলার আর কিছুই দিবার থাকিবে না, সে বৈশিষ্ট্যের কথা আজিকার বাঙালী...ভুলিয়াছেন।” সেই কথা স্মরণ করাইয়া বাঙালীকে পুনঃসচেতন করাই বিপিনচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল। বাঙালী এই গ্রন্থপাঠে পুনরায় উবুদ্ধ হইলে বিপিনচন্দ্রের রচনা সার্থক হইবে।

স.

বাংলা সাহিত্য : ডক্টর মনোমোহন ঘোষ, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিটি সোসাইটি, ২১ বলরাম ঘোষ স্ট্রিট, কলিকাতা-৪। দশ টাকা।

শ্রীমনোমোহন ঘোষের ‘বাংলা গল্পের চার যুগের’ পর তাঁহার রচিত বাংলা সাহিত্যের একখানি সম্পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের জন্য আমরা প্রতীক্ষা করিয়া ছিলাম। আমরা এতদিনে তাহা পাইয়া আনন্দিত হইলাম। ইহা প্রধানতঃ ছাত্রপাঠ্য হইলেও বাংলা-সাহিত্যের মূল কাহিনী ইহাতে ধারাবাহিক ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রধান প্রধান সমস্তাগুলিও সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রথমার্ধ অর্থাৎ বাংলা-কাব্যের ইতিহাস নূতন রচিত শেষার্ধ অর্থাৎ গল্পের ইতিহাস প্রথম গ্রন্থেরই বিস্তার মাত্র। গ্রন্থকার উচ্ছ্বাসবর্ণিত সংবত ভাষায় গ্রন্থখানি রচনা করিয়া ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। বাংলা-সাহিত্যের অন্ত্যন্ত ইতিহাস হইতে ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি “প্রত্যেক যুগের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি ও

তদানুসঙ্গিক সামাজিক অবস্থার যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং সেই যুগে সমগ্র সমাজ কোন আদর্শের প্রেরণায় চলিয়াছিল তাহার নির্ণয় করিয়াছেন। অর্থাৎ সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে সামাজিক ইতিহাসও এই গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে।

বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস : শ্রীশ্যামলাল ভট্টাচার্য। এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং লিঃ, কলিকাতা-১২। পনর টাকা।

সাহিত্যপদবাচ্য নাটক যদিও বাংলা ভাষায় খুব কমই রচিত হইয়াছে, কিন্তু এই বিভাগের ইতিহাসভাগ্য খুব জোর। ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু যত্নে সংগৃহীত নাট্যপঞ্জীকে ভিত্তি করিয়া নগণ্য ভালর সঙ্গে অগণ্য বাজে মালের মিশাল দিয়া বাংলা নাট্য-সাহিত্যের অনেকগুলি অতিকায় ইতিহাস ইতিমধ্যেই গড়িয়া উঠিয়াছে। বিশ্বর বলিতে হইয়াছে বলিয়া স্বভাবতই “বিশ্বর মিছা” এইগুলিতে স্থান পাইয়াছে। এতগুলি ভুবিমাল বাজারে চালু হইবার জন্য নিঃশেষেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমই দায়ী। সুতরাং আলোচ্য গ্রন্থের অতিকায়-দোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের স্বেচ্ছাকৃত নহে, বরঞ্চ তিনি কাহিনীকে ধারাবাহিকতা দান করিয়া নানা দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া বিবসকে সরস করিয়া তুলিয়াছেন। রূপকথার বারো হাত কাঁড়ের তেরো হাত বাঁচির মত বাংলার মাত্র আড়াই খানি নাট্যের আড়াই হাজারী ইতিহাস উপাদেয় হইয়াছে। বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ভট্টাচার্য-কৃত এই এক শত বৎসরের ইতিহাসে (১৮৫২-১৯৫২) সকল নাট্যকারই যথাযথ মর্যাদায় স্থান পাইয়াছেন। কিছু নূতন খবরও গ্রন্থকার সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। সাধারণ পাঠকের পক্ষে ইহা একখানি সুখপাঠ্য গ্রন্থ হইয়াছে।

কবিতা

সায়ন্তনী : শ্রীশ্রীলকুমার দে। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭ ইঙ্গ বিখাস রোড, কলিকাতা-৩৭। দুই টাকা।

“সায়ন্তনী” শ্রীশ্রীলকুমার দেব সর্বাধুনিক কাব্যগ্রন্থ। “প্রাক্তনী,” “অন্ততনী,” “লীলায়িতা” কাব্যের বিদগ্ধ কবিকে অপরাহ্নিক বিধুরতায় আর এক মূর্তিতে দেখা গেল। শ্রীশ্রীলকুমার মূলতঃ প্রেম ও যৌবন-স্বপ্নের কবি—“সায়ন্তনী” কাব্যগ্রন্থে তার একটি বিশিষ্ট পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। কবির প্রথম দিকের কাব্যগ্রন্থসমূহে যে দীপ্ত মধ্যাহ্নের স্বপ্ন-স্বরা কাব্য-পরিমণ্ডলকে আবেষবিহীন করে তুলত, তার জায়গায় এক করুণ-স্বপ্নের স্বতির ব্যঞ্জনা প্রৌঢ় কবির দীর্ঘবাসের সহচর হয়ে উঠেছে।

সায়ন্ত-আলোক-বাসিনী প্রিয়ার সৌন্দর্য অধিকতর লাবণ্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে—“বিকশিত হল স্বতিরসে

বিস্মৃতি।” “সায়ন্তনী”র কবি দেহ ও দেহোত্তীর্ণতার এক অপরূপ সঙ্গম-তীর্থের অভিনায়ী। দেহকে অতিক্রম করে এক দূরধানী রোম্যান্টিক ভাবনা কবিকে যেমন অধীর করেছে তেমনি বিধুরও করেছে, অথচ দেহকে অস্বীকারও করা হয় নি। শ্রীশ্রীলকুমারের প্রেম-সাধনায় দুই আপাত-বিপরীত কোটির সমন্বয় ঘটেছে। এর মূলে আছে তাঁর জীবন-রসিকতা—এই জীবন-রসিকতাই ভুক্তি ও মুক্তির মাল্যবন্ধনে কবি-দৃষ্টিকে একটি বিস্তৃত ক্ষয়ধর্মের দীক্ষা দিয়েছে। প্রৌঢ় কবির কাছে যৌবন-বিদায়ের দুঃসহ বেদনা একটি সঘন দীর্ঘবাসে রূপ পেয়েছে—চিত্র-চাতুর্ষ্যে এক রমণীয় স্মৃতি-সৌরভ :

“জড়ো হল কবে মনের গহনে মনের বাধা,

ঘরের নন্দী হানিল জুড়ুটি মুহূর্তে হেসে,

যৌবন-ছলা গেল রসকলা হাসা ও কান্দা,

আমার বাঁশরী তোমার গাগরী গেল ভেসে।”

তথাপি “দূর হতে স্মরি দেহের রেখাটি দিবস বায়ী।”—জীবন-অমুরাগী এই কবির কাছে দেহ বা দেহজাত কামনা ব্যর্থ নয়—তথাপি সেই কামনাই সর্বস্ব নয়। তাই কালিদাসের “মদন-ভঙ্গ্য” এবং “রতিবিলাস” নূতন তাৎপর্ষ্যে মণ্ডিত হয়েছে। কবি প্রেমকে এক আদিম ও চিরন্তন প্রবাহ হিসেবেই দেখেছেন—তাই শত বেদনাতেও নূতন স্বর্গ আবিষ্কার করেছেন। ব্রাউনিংয়ের বাঙালী কবিও বলতে পারেন :

“নহে বিজ্রোহ, আনে সমারোহ

নূতনের লাগি পুরাতন মোহ;

শাশ্বতে রহে বেড়িয়া ক্ষণটি, শাশ্বত ক্ষণটিরে।”

“সায়ন্তনী” কাব্যের আত্মকগত কর্তকগুলি বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। কবি-ভাষণ ও বাণী-নিয়তি সূক্ষ্মচিত্র বাক-বিস্তারের গাঢ়তা কবিতাগুলিকে এক সংযত-সুভৌল রূপমুতি দিয়েছে। নূতন শব্দযুগ্ম ও শব্দের নূতন অর্থ স্রোতনা—উভয়বিধ কোশলেই কবি সিদ্ধ। সংযত সাহিত্যে অসাধারণ অধিকারই কবিকে শব্দ ও অর্থালঙ্কারের সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ প্রয়োগে সাহায্য করেছে। এই কাব্যখানিতে ক্লাসিক্যাল ও রোম্যান্টিক পন্থার যুগ্মবেগী রচিত হয়েছে। কবি তাঁর রোম্যান্টিক উদ্যোগ কামনাকে রূপায়িত করেছেন ঋজু-দীপ্ত, সংযত-সংহত ঘনপিন্ড ক্লাসিক্যাল রীতির মাধ্যমে—অথচ শব্দার্থবাহী ব্যঞ্জনা একটি অশরীরী লাভণ্যের মত স্নেহে থাকে।

“সায়ন্তনী” কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ও মোহিতলালের কাব্য-প্রভাবের আতিশয্য লক্ষ্য করা যায়। এই প্রভাব শব্দ-চয়নে, বাণী-বিস্তারে এবং ভাবনায় অনেক সময় চোখে পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথ রায়

সংবাদ-সাহিত্য

বাংলা-ভাষাভাষীদের পক্ষে এই মাসের সর্বাধিক আনন্দের সূত্রাঙ্গ, সম্প্রতি বোম্বাইয়ে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারকালে (৩০ জুলাই) বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ঘোষণা করিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গের ঘরোয়া সরকারী কাজে অতঃপর বাংলা-ভাষা যতদূর সম্ভব ব্যবহৃত হইবে। মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের আর্মিলে মুখ্যসচিব শ্রীমুকুন্দর সেনের বিশেষ চেষ্টায় কয়েক বৎসর পূর্বে এই কার্য আরম্ভ হইয়াছিল। প্রদেশ-শাসনে হাতকেরতা ঘটায় সে উদ্ভব অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। অনেক তোড়জোড়ের ফলে শাসন-সংক্রান্ত কয়েকটি বিভাগের পরিভাষা প্রস্তুত হয়। উৎসাহের অভাবে সম্ভবতঃ সেগুলি তাকে তোলা আছে। সৌভাগ্যের বিষয় বিধান-পরিষদে ও বিধান-সভায় সভ্যগণের বক্তৃতাদি মাতৃভাষায় লিপিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত চালু আছে, এবং নূতন সংবিধান অমুখ্যায়ী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হইলে সেনেট সিণ্ডিকেটের সভ্যগণের ভাষণও (বাংলা ভাষায় প্রদত্ত হইলে) বাংলাতেই ছাপা হইতেছে। তথাপি মা এতদিন সংমারের পর্ষায়েই ছিলেন, আশা হইতেছে অতঃপর তিনি ষষ্ঠ মাতৃভাষে বৃত্তা হইবেন। এতকাল প্রধান অমুখ্যায়ী ছিল পরিভাষার, ভারত ও অন্তর্গত প্রাদেশিক সরকারের উদ্ভব-উৎসাহে সংস্কৃতমূলক সর্বভারতীয় পরিভাষা রচনার কাজ অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে। সুনীতিকুমার স্বাধিক “ভয়াবহ” এবং জগদ্বরলাল “নৈরাস্ত্রজনক” বলিয়াছেন (আমাদের “সংবাদ-সাহিত্য” জুটব্য) সেই নাগপুরীয় পরিভাষাই আর চরম নয়, তাহার পর অনেক জল অনেক নদীপথে প্রবাহিত হইয়াছে। বাংলার জলু বিধানচন্দ্রের শাসনে কলিকাতার মা-গঙ্গা এতদিন অবরুদ্ধা ছিলেন, এইবার তিনি তাঁহার কুপায় মুক্তিরাজ করিলে হতভাগ্য মগরবংশীয়েরা নিশ্চয়ই উদ্ধার পাইবে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিধানচন্দ্রের উক্তি কখনও মিথ্যা নাই, তিনি বলিয়াছেন, “সমস্ত প্রকার কাজ-কর্ম বাংলায় হইবে।”

আন্তঃপ্রাদেশিক ও রাষ্ট্রীয় সর্বভারতীয় জবানের গৌরব নিঃসন্দেহে হিন্দীর প্রাপ্য, বিধানচন্দ্র সে কথাও বলিয়াছেন। তিনি কেন, তাঁহার পূর্বে বাংলাদেশের শিরোমণি বাহারা—রাজনারায়ণ, ভূদেব, কেশব সকলেই সে কথা বলিয়াছেন, বর্তমানে ভারতবর্ষে ভাষাতত্ত্ববৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ সুনীতি-কুমারের দৃঢ় ও স্থিতিস্থিত মত ইহাই। সুতরাং সে দিক দিয়াও বাঙালীকে প্রস্তুত হইতে হইবে, ভাষা ও সাহিত্যের অভিমানে বিমুগ্ধ হইয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিলে তাহারই সমুহ ক্ষতি। প্রয়োজনের তাগিদে সম্পূর্ণ বৈদেশিক ও বিজ্ঞাতীয় অক্ষর ও ভাষা বাহারা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিল, ভালবাসার তাগিদেও ছিল তাহা অস্বীকার করিব না, তাহারা কেন যে বাংলা-ভাষার প্রায় অল্পরূপ অক্ষর ও ভাষাকে অধিগত করিতে পারিবে না তাহার যুক্তি বোঝা কঠিন। গত মঙ্গলবার (২ আগস্ট) শ্রীঅতুল গুপ্তের সভাপতিত্বে অহুষ্ঠিত নিম্নলিখিত ভারত-বঙ্গভাষা-প্রসার-সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে আমরা উপস্থিত ছিলাম। সম্পাদক শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ যে বিস্তৃত বার্ষিক বিবরণী পাঠ করিলেন তাহাতে দেখিলাম, ভারতের সকল প্রদেশে অবলম্ব্যভাষাভাষীরা বাংলা শিখিতে অতিশয় আগ্রহাধিত, সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দিতে পারিলে তাঁহাদের সংখ্যা সুবিপুল হইয়া উঠিবে। বাঙালীই বা পিছপাও থাকিবে কেন? হিন্দী-প্রবর্তকদের জুলুম এবং সরকারী বাধ্যতা অনেকের মনকে বিমুগ্ধ করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে ইহাতে আমাদের লাভ বই লোকসান নাই। ইংরেজী ভাষার বিপুল সাহিত্য-সম্পদের, হিন্দী ভাষার লিঙ্গসঙ্কটের দোহাই অনিচ্ছুকের মিথ্যা অজুহাত ছাড়া কিছুই নয়।

আজ ভারত স্বাধীন হইয়াছে বলিয়াই যে এ চেষ্টা নূতন হইতেছে তাহা নয়। বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের অভিনব প্রচেষ্টার কথা সর্বজনবিদিত। কিঞ্চিৎ সরকারী

সাহায্য এবং দেশের লোকের কিছুটা সহায়ত্ব পাঁইলে তিনি এ বিষয়ে বাংলা দেশকে পৃষ্ঠাশ বছর আগাইয়া দিতে পারিতেন, আজ যাহাকে সফট বলিয়া মনে হইতেছে তাহাকেই সম্পদরূপে আমরা গণ্য করিতাম। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাঙালী মাঝেই যদি প্রতিজ্ঞা করেন যে, বেন-তেন-প্রকারেণ দেবনাগরী অক্ষর তাঁহারা আয়ত্ত করিবেন তাহা হইলে আমরা দেখিব, বাঙালী লেখকদের রচনায় অচিরাত্ হিন্দী-সাহিত্য ফলে-ফুলে সুশোভিত হইয়া উঠিবে। আজ যাহা বিড়কি-পথে চোরাইমাল-রূপে পাচার হইতেছে, কাল সদয় পথে তাহাই যথাযোগ্য কাঞ্চনমূলে গৃহীত হইবে। প্রয়োজন মাত্র মানসিকতার পরিবর্তনের।

দুইখানি পুরাতন পুস্তক হঠাৎ আমাদের হাতে আসিয়া উপরের চিন্তাধারা উদ্ভূত করিয়াছে। একখানির নাম 'মতলব সংগ্রহ' (অর্থাৎ নব ভাষা কা উত্তার)'; টাইটেল পেজ বা পরিচয়-পৃষ্ঠায় আরও লেখা আছে—“জিসকো হিন্দী, অংগরেজী, উর্দু, বংগলা, গুজরাতি, মরাঠী, তৈলংগী, দিল্লীবাংল, মারবাড়ী, নব ভাষায়োঁ মে বিজ্ঞার্থিয়োঁ শের সর্বসাধারণকে হিতার্থে রামলাল নেমানী নে সংগ্রহ কর নিজ রাম-প্রেস মে মুদ্রিত করবা প্রকাশিত কিয়া। চতুর্থ সংস্করণ কলকাতা, জুন ১৯০৩ ইং।” ৫৮২ পৃষ্ঠার বই, দাম মাত্র ২।০।

বইখানি বিচিত্র। সমগ্র ভারতের ভাষা ও লিপিসকট নিবারণের এই প্রচেষ্টা স্থূল হইলেও অল্পকরণীয়। ইহার প্রথম প্রকাশ প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে, আধুনিক ভারতীয় সভ্যতার তদানীন্তন কেন্দ্র আমাদের এই কলিকাতা শহরে। চতুর্থ সংস্করণের বই আমরা পাইয়াছি, তাহা হইতেই অহুমান করিতে পারি ইহা জনপ্রিয় হইয়াছিল। ইহার পর-বদেশী-আন্দোলন অথবা অন্য কোন্ বৈপ্লবিক কারণে এই চেষ্টা স্থগিত হয় আমরা জানি না। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সংস্কার করিয়া এই ‘মতলব সংগ্রহ’র পুনঃপ্রকাশ হইলে ভাল হয়। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ-রাষ্ট্রভাষা-প্রচার সমিতির উদ্যোগে সংস্কৃত ‘মতলব-সংগ্রহ’র প্রকাশ-

ব্যবস্থা করিতে পারেন। বইখানি নাড়িয়া-চাড়িয়া আমরা দেখিয়াছি। হিন্দীর মাধ্যমে যে কোনও ভাষাভাষী ব্যক্তিকে ইহা সর্বভারতীয় হইবার মতলব দিতে পারিবে।

দ্বিতীয় বইখানির নাম ‘দি হিন্দী সায়েন্টিফিক প্রসারি’ বা হিন্দী বৈজ্ঞানিক পরিভাষা। ইহাতে জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন, ভূগোল, দর্শন, পদার্থবিজ্ঞান ও অর্থনীতির হিন্দী পরিভাষা সংগৃহীত হইয়াছে। বেনারস নাগরী প্রচারিণী সভার সম্পাদক শ্রীশ্রামহন্দর দাস এক সম্পাদক-মণ্ডলীর সহায়তায় এই গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রকাশকাল ১৯০৬। সম্পাদক-মণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল—বাবু ভগবান দাস, বাবু ভগবতী সহায়, বাবু দুর্গাপ্রসাদ, বাবু গঙ্গানাথ ঝা, লালু খুশিরাম, অধ্যাপক এন. বি. রানাডে, মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী, বাবু শ্রামহন্দর দাস, বাবু ঠাকুরপ্রসাদ ও পণ্ডিত বিনায়ক রাওকে লইয়া। ভারতের তৎকালীন মনোবীমাত্রেরই সাহায্য লওয়া হইয়াছিল। ইহারও পূর্বে ভারতীয় ভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নের যে সম্ভবতঃ উদ্ভূত হইয়াছিল এই গ্রন্থের ভূমিকায় তাহা বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম চেষ্টা হয় ১৮৮৮ সনে বরোদার তদানীন্তন মহারাজ সমাজি রাও গাইকোয়াড়ের পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থায়নকুল্যে অধ্যাপক টি. কে. গঙ্কর কর্তৃক। বরোদার কলাভবন কর্তৃক মারাঠী ও গুজরাটী ভাষায় পরিভাষার পাঁচ খণ্ড প্রকাশিতও হয়। কিন্তু কলাভবন-কর্তৃপক্ষের সহিত অধ্যাপক গঙ্করের মনোমালিঙ্গ হেতু কাজ বন্ধ হইয়া যায়। দ্বিতীয় চেষ্টা হয় ১৯০১ সনে কলিকাতার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক। রসায়ন, ভূগোল ও জ্যোতিষ তিন বিষয়ে বাংলা পরিভাষা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, কিন্তু তাহাও নানা কারণে বন্ধ হইয়া যায়। ফেলিক্স কেরী (১৮২১) হইতে শুরু করিয়া আরও অনেকে ব্যক্তিগত ভাবে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রস্তুতের চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই গ্রন্থে অবশ্য তাহার উল্লেখ নাই। আলোচ্য গ্রন্থের পরিভাষা তিন বৎসর ধরিয়া প্রস্তুত হয়। আচার্য রামেন্দ্রচন্দ্র দ্বিবেদী প্রমুখ পূর্বগামীদের সম্পূর্ণ

সাহায্য গ্রহণ করা হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ের পরিভাষা সংশোধক সমিতির নিকট প্রেরিত হইয়া পরীক্ষিত হয়। সংশোধিত পরিভাষা গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ ঠিক অর্ধশতাব্দী পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষেরা কাজ অনেকটা আগাইয়া রাখিয়াছেন। সম্ভবতঃ, খবর রাখি না বলিয়া আমাদের কাছে আবার গোড়া হইতে আরম্ভ করিতে হইয়াছে। এই গ্রন্থের পরিভাষা পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, ইহা সমগ্র ভারতের গ্রহণযোগ্য। এই আশ্রয় যদি অস্বাভাবিক বিষয়ের পরিভাষা প্রস্তুত হয় তাহা হইলে ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলির পরস্পর আদান-প্রদানে কোনই অসুবিধা হইবে না। পরিভাষার সমীকরণ হইলে ভাষার বাধাও শীঘ্রই অস্বহিত হইবে—অন্ততঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। মারাঠী পণ্ডিত উচ্চকোটির গণিতের গ্রন্থ লিখিলে বাঙালী ছাত্রের তাহা বুঝিতে অসুবিধা হইবে না; বাঙালীর লেখা পদার্থবিজ্ঞান গুরুরাটী ছাত্রও বুঝিতে পারিবে। এই কারণেই সংস্কৃত-আশ্রিত হিন্দী পরিভাষার প্রয়োজন—তাহাই সর্বভারতীয় পরিভাষা হইবে। গত ৬৬ বৎসর ধরিয়া যে চেষ্টা হইয়াছে তাহাকেই ভিত্তি করিয়া আজ যদি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগণ সর্বত্র এক পরিভাষা চালু করেন তাহা হইলে ভাষামস্ত্র অনেক সহজ হইয়া আসিবে।

গোপালদাস আবার একটা বসিকতা ছুঁড়িয়াছেন। লিখিয়াছেন, “দেশে থাকিতে একটা প্রবাদবাক্য প্রায়ই স্মরণিতাম, কিন্তু তখন তাহার অর্থ বুঝিতাম না। প্রবাদটি হইতেছে—মামার জাত, কে দেয় কার কাঁধে হাত। আসল কথাটা কাঁধ নয়, বুঝিতেই পারিতেছি। ইউরোপের বিভিন্ন রাজধানী ও প্রধান প্রধান শহরে চার প্রধান, তিন প্রধান, দুই প্রধানদের পরস্পর মোলাকাৎ-বাসরে উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তোমাদের জগদ্বরলালেরও পিছু লইয়াছিলাম। সর্বত্রই মিলন-ধরগুলি দেখিলাম ধোঁয়ায় অন্ধকার—আটম বোমা আর হাইড্রোজেন বোমার ধোঁয়া। সে ধোঁয়ার আদি অন্ত নাই। কেহই চোখে কিছু দেখিতে পায় না, কে কাহার কাঁধে হাত দেয় তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। তোমরা ধরে, বসিয়া খবরের কাগজ

পড়িয়া অবাক হইয়া যাও—আইসেনহাওয়ার-বুলগানিনে কোলাকুলি হইল, টিটো ক্রুশ্চেভের সহিত নাক-ঘষাঘষি করিলেন। লাই ইডেনের চুমা খাইল, জগদ্বরলাল চাচিলের নাক কামড়াইয়া দিল ইত্যাদি। আসলে এসব বোমার ধোঁয়া ত্রাসার, বোমার অন্ধকার। মামার জাত—কে দেয় কার কাঁধে হাত।”

গোপালদাস যত বয়স বাড়িতেছে ততই ভালুগার হইয়া পড়িতেছেন, কি আর বলিব।

নেমেসিস (Nemesis) বা নিয়তিনিয়মিত অনিবার্য প্রতিহিংসা এতকাল পরে রবীন্দ্রনাথকে সত্যসত্যই ঘায়েল করিল। তা করুক। অনিবার্যকে কেহ নিবারণ করিতে পারে না, সে রবীন্দ্রনাথই হউন আর গান্ধীজিই হউন। আমাদের চুপ এই যে, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা পড়িল মড়ারই একান্ত অক্ষিত এলাকায়। অর্থাৎ ‘দেশ’ পত্রিকার পৃষ্ঠায় (৩০ জুলাই ১৯৫৫) কে একজন মনুধনাথ ঘোষ মৃত রবীন্দ্রনাথকে আগাপাছতলা জুতাইলেন। নেমেসিস যখন বলিয়াছি তখন রবীন্দ্রনাথের অপরাধের কথা স্বীকারই করিতেছি। তিনি মাত্র বোল ৬৭ বৎসর বয়সে ১৮৭৭ সনের ‘ভারতী’ পত্রিকায় ‘মেঘনাদবধ কাব্য’কে উপলক্ষ্য করিয়া মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্তকে আপাদমস্তক প্রহারে জর্জরিত করিয়াছিলেন। প্রহারের কারণ দর্শাইয়াছিলেন এই যে, ‘মেঘনাদবধ’র রাবণ বাহ্মিকির রাবণ হয় নাই, মধুসূদন তাহার রাবণকে পুত্র-শোকে অব্যবধারায় কাঁদাইয়াছেন, বাঙালী বিধবার মত আলুলায়িতভাবে শোক করাইয়াছেন। কাব্যমার্গে মধুসূদন নিঃসংগরে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ—গুরুস্থানীয়। স্ততঃসেই কিশোর বয়সে গুরু-লাঞ্ছনার অপরাধ তাহাতে অঙ্গিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের অপরাধের গুরুত্ব বাহ্যিক উপলক্ষ্য করিতে চান, তাহার ৭৮ বৎসরের পুরাতন ‘ভারতী’র কাঁদাইল হাতের কাছে না পাইলে স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ গোস্বামীর ‘মধু-স্মৃতি’ (১ম সংস্করণখানি) একবার উন্টাইয়া দেখিয়া লইবেন।

নিয়তির অমোঘ প্রতিহিংসা যদিচ বিলম্বে আসিয়াছে—তবু আসিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে প্রথম আঘাত আসে

‘চিত্রাঙ্গদা’-চিত্রনির্মায়ক কোম্পানির হাত হইতে; রবীন্দ্রনাথ যেমন ‘স্বভাৱত’ মানেন নাই, তাঁহারাও তেমনি রবীন্দ্রনাথকে মানেন নাই; রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদাকে সুইমিং কস্টাম পরাইয়া ছাড়িয়াছেন। সে আঘাত ততটা গুরু নয়, গুরু আঘাত হানেন বিশ্বভারতীর তথাকথিত কর্তব্যকিত্তা—উক্ত চিত্রের উপর আশীর্বাদী প্রশংসা বর্ণন করিয়া। “তোমার আপনজন” শুধু “ছাড়বে তোরেই” নয়, মারবে তোরে। নিয়তির বিতীয় পরিহাসবিজ্ঞমিত আক্রমণ—৩০ জুলাইয়ের ‘দেশে’ “রবীন্দ্রনাথের ‘কর্ণকুন্তী সংবাদ’” প্রবন্ধে। পরিহাস ‘দেশে’র কর্তৃপক্ষের। লেখক মন্থনাথ ঘোষ চার্জ করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কুন্তীকে সাফিসিয়েটলি মন্তলববান্ধ এবং কর্ণকে হিরোয়িকালি চুম্বাৎ করিয়া দেখান নাই, ভাগ্যবিড়ম্বিতা স্নেহপরায়ণা মা করিয়া এবং মাতৃস্নেহবঞ্চিত করুণার্জচিত্ত সন্তান করিয়া দেখাইয়াছেন। কবরস্থ মাইকেল নিশ্চয়ই মুহু মুহু হাস্ত করিতেছেন।

লেখক মন্থনাথ ঘোষ অপোগণ্ড বালক হইলেই ব্যাপারটি পূরাপূরি সঙ্গত হইত। প্রবন্ধ পড়িয়া মনে হইল, তিনি বালকত্ব, কিশোরত্ব ও যুবকত্ব অতিক্রম করিয়াছেন। লেখার ভাষা শ্রাস্তি জন্মাইতেছে নহিলে মনে করিতে পারিতাম, ইনি বুঝি আমাদের সেই জীবনীলেখক মন্থনাবাবু। তিনি নন। এতখানি ভাষার চটুলতা তাঁহার স্বারা সম্ভব নয়। তা ছাড়া তিনি ভদ্রলোক, বন্ধুর মৃতা ও ভ্রষ্টা পত্নীর কথা কখনই এভাবে সর্বজনসমক্ষে উদ্ঘাটিত করিতেন না, নিজের সহধর্মিণীর অতিরিক্ত সন্তানবাৎসল্যের জন্ম এভাবে প্রকাশে অভিযোগ আনিতেন না। ইনি অন্য কোনও দুঃসাহসী মন্থন, যিনি রক্তকেও ভক্ষ্য করিবার প্রয়াসী।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের বিব্রন্ধে যেমন অকাট্য যুক্তিনিচয় প্রয়োগ করিয়াছিলেন, ১৯৫৫ সালেও মন্থনাথ তেমনি রবীন্দ্রনাথের বিব্রন্ধে একটার পর একটা অকাট্য যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু বহু অকাট্য যুক্তির সমাবেশে লজিকের ম্যাজিক দেখানো যায়, কাব্যের বা জীবনের সত্য উদ্ঘাটিত হয় না। মন্থনাথ সব জানেন, শুধু এই কথাটাই শিখেন নাই যে কাব্যই জীবন এবং জীবনই কাব্য। কোনও দুইটি সত্য ও মহৎ সৃষ্টি একে অন্যকে সম্পূর্ণ অতুসরণ করিয়া চলিতে পারে না। ভিন্ন

বক্ষ্যে চোলাই হইলে কাব্য ও সাহিত্যের রসায়নাগারে একই বস্তু ভিন্ন রূপ রঙ ও রস গ্রহণ করে। এই সৃষ্টিতত্ত্ব বিজ্ঞানের অতীত, ইহা অনির্বচনীয়।

মন্থনাথের সব কথাই সত্য, শুধু যে ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়াইয়া তিনি কথা বলিয়াছেন সেইটি দৃঢ় ভিত্তিকা নয়, সরণশীল চোরাবালি। রবীন্দ্রনাথের ‘মেঘনাথবধ কাব্যে’র সমালোচনার ভিত্তিও ছিল এইরূপ শিথিল। মন্থনাথের সেই ভিত্তিভূমি হইতেছে এই উক্তি—“বে কবিতায় এই যুক্তিকার পৃথিবীর মানুষ দেখি না, দেখি একটা দূরাকাশের রজনীন ফাহস, একটা ফাঁকা আদর্শ এবং তারই জন্ত যত দরদ, যত ব্যাকুলতা তাকে আমি কিছুতেই মহৎ কবিতা বলিতে পারি না।”

তুমি না বলিলেও বন্ধু, রসিকজনে তাহাকেই মহৎ কাব্য বলেন।

এই মাসের সাহিত্য-সংবাদ হইতেছে কলিকাতায় আমেরিকার পোয়েট্রি (‘Poetry’) পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক কবি কার্ল শাপিরো (Karl Shapiro) আসিতেছেন। এই সেদিন ইংরেজ কবি টিকেন স্পেন্ডার আমিয়া বক্তৃতায় কবিতা-আবৃত্তিতে আমাদেরকে শিক্ষিত অভিজ্ঞ করিয়া গেলেন। এবার কার্ল শাপিরো। আমাদের কলিকাতার গ্রহসংস্থানে এখন চন্দ্র এবং শুক্র প্রবল।

কার্ল শাপিরোর জন্ম ১৯০৪ সনে, অর্থাৎ তিনি সবে পঞ্চাশ অতিক্রম করিয়াছেন। প্রথম জীবনে লেভিনসন পুস্তকালয়ের দ্বারা যদিও তাঁহার গোড়ার দিকের কবিতা স্বীকৃতিলাভ করিয়াছিল, সেগুলির বহুলপ্রচার ও সমালোচনাও হইয়াছিল; কিন্তু তিনি সত্যকার কবিস্বীকৃতি ও যশ অর্জন করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আহত তাঁহার বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে কাব্যরূপ দিবার পর; সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমেরিকার নবীন কবিসমাজের পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯৪২ হইতে ১৯৪৫-এর শেষ পর্যন্ত তিনি দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে ইউ. এস. সৈন্যদলে কাজ করেন; ১৯৪৪ সনে তাঁহার কাব্যগ্রন্থ ‘ভি-লেটার’ (‘V-Letter’) পুলিটজার পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত হয়। তাঁহার ‘এসে অন রাইম’ (‘Essay on Rime’) আধুনিক কবিতা

বিষয়ে বিস্তৃত অল্পশীলনের ফল; ছইটম্যান, জয়েন্স, ইয়েটস, এলিয়ট প্রভৃতি খ্যাতনামা কবিদের কাব্যলোচনা ইহাতে স্থান পাইয়াছে। দৈনন্দলে কাজ করিতে করিতে ইহা রচিত হয় এবং ১৯৪৫ সনের শেষে প্রকাশিত হয়। দৈনন্দল হইতে ছাড়া পাইয়াই তিনি লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের কাব্য-বিভাগের অধিকর্তা হন। ১৯৪৭ সনে তাঁহার 'ট্রায়াল অব পোয়েট্রি' ('Trial of Poetry') প্রকাশিত হয়।

কার্ল শাপিরো আসিতেছেন। আমরা তাঁহার কবিতা শুনিব, কাব্যবিচার শুনিব। তাঁহাকে আমাদের কথা শুনাইতে চেষ্টাও আমরা করিব। এই আদান-প্রদানের ফলে তিনি যদি পুরাতন ভারতবর্ষকে এবং আমরা যদি নবীন আমেরিকাকে ঘনিষ্ঠভাবে বুঝিতে পারি, তবেই তাঁহার আসা সার্থক হইবে। নতুবা তথাকথিত ডেলিগেশনের মত এই আগমনও খানাপিনা ও মৌখিক সৌজন্যবিনিময়ে পর্ববসিত হইয়া ব্যর্থ হইবে।

দুঃখ ও লজ্জার কথা, ভারতবর্ষের সকল প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক ভাষায় এখনও রামায়ণ মহাভারত লিখিত ও মুদ্রিত হয় নাই। অথচ রামায়ণ-মহাভারতের শিক্ষা না হইলে কোনও ভারতবাসীর ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি সমতা হইবার কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ

বলিয়াছেন, "এই রামায়ণ, মহাভারত আমাদের সমস্ত জাতির মনের খাণ্ড...এই দুই মহাগ্রন্থই আমাদের মহুগ্ৰন্থকে দুর্গতি হইতে রক্ষা করিয়া আনিয়াছে। মহানদী যেমন সকল দেশে নাই, তেমনি মহাকাব্য পৃথিবীর অতি স্বল্প-জাতির ভাগ্যেই জুটিয়াছে। আবার যে-দেশের মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারত, সে দেশের সৌভাগ্যের অন্ত নাই।" ভারতীয় হইয়াও বাহারা রামায়ণ-মহাভারত পাঠের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত, তাহারা হতভাগ্য। নেপালী ভাষায় রামায়ণ-মহাভারত ছিল না। বাংলা দেশের সদাশয়রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় নেপালীদের এই অভাব মোচনের জন্য তৎপর হইয়াছেন। তিনি ইতিমধ্যেই বহু বলাস্ব ব্যক্তির অর্থসাহায্যে ভাষ্যভূক্ত হিন্দী রামায়ণ নেপালী ভাষায় অনুবাদ করাইয়া প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছেন। নেপালী ভাষায় গীতা ছাপাইয়াও তিনি নামমাত্র মূল্যে বিতরণ করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি নেপালী মহাভারতও প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন। এই কার্যে তাঁহার পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় দুই-ই প্রচুর হইতেছে, তথাপি তিনি ভারতবাসীর মহাভারতীয়ত্ব সম্পাদনে পশ্চাদ্গমন হন নাই। তাঁহার মত এমন কল্যাণকর প্রচেষ্টায় ইদানীং কেহ হাত দেন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ, সুতরাং তিনি জয়যুক্ত হইবেন। ভগবান তাঁহার কল্যাণ করিবেন।

২৭শ বর্ষ,
১১শ সংখ্যা



ভাদ্র ১৩৬২

আত্মস্মৃতি

চতুর্থ প্রবাহ—পঞ্চম তরঙ্গ

পরিচয়-কথা (২)

শ্রীসজনীকান্ত দাস



গত সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় অতুল বসু ও বামিনী-বায়ের প্রসঙ্গ আমি ১৯৩৪ সনের দিনলিপি দেখিয়াই লিখিয়াছিলাম। ১৯৩১ সনের একটা ঘটনা আমার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছিল। শ্রীঅতুল বসুর স্বতিতে তাহা জাগ্রত ছিল, তিনি আমাকেও স্মরণ করাইয়া দিলেন। পূজাবকাশের পর ১৯৩১ সনের শেষাংশে এক নীতের সকাল। ‘প্রবাসী’র চাকরি ছাড়িয়া তখন আমি সম্পূর্ণ বেকার। অধরোষ্ঠ ও দক্ষিণহস্তের প্রত্যাহ ছুই বেলা সংযোগবিধানের কঠিন প্রয়াসে আমি যতটা না ঘর্ষাস্তকলেবর, ততোধিক বিভ্রান্ত-চিত্ত। কোনও জন্মে ‘শনিবারের চিঠি’তে মাসগত পাপক্ষয় করিতেছিলাম। বাংলা-সাহিত্যের মত বঙ্গীয় কলাশিল্পেও তখন “এলোমেলো ক’রে কে-মা লুটেপুটে খাই”দের অভিযান চলিতেছে। সাহিত্য বাহাদের ধ্যান জ্ঞান সাধনা ও উপজীবিকা তাঁহারা অভাবতঃই যেমন বিচলিত হইয়াছিলেন, শিল্প বাহাদের অন্তরের একান্ত সাধনা তাঁহারাও কম অতিষ্ঠ হন নাই। প্রমাণ মিলিল সেই দিন সকালে আমার রায়েজলাল স্লিটের গৃহপ্রাঙ্গণে শিল্পী জয়ীর আকস্মিক অভাগমে—বামিনী বায়, অতুল বসু ও সত্যীশ সিংহ। সাহিত্যের একটা নীতিমূলক আদর্শকে আশ্রয় করিয়া আমরা সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছি বলিয়া অতুল বসু অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। প্রশ্ন করিলেন, ইহা আমাদের সাময়িক খেয়াল মাত্র, না, দূর-প্রসারী সংগ্রাম—আমার ডায়েরিতে “ওয়ার” কথাটা লেখা

আছে। উত্তর দিয়াছিলাম, ইহা আমাদের জীবন-মরণ-সংগ্রাম। কারণ, উহারা বাঁচিলে আমরা বাঁচিব না। শিল্পকলা বিষয়েও আমাদের সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি ও কৃতিমত এলোপাতাড়ি মার যে দিই নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহা সাহিত্যের সঙ্গে আত্মবিকৃত ভাবে। “উহারা বাঁচিলে আমরা বাঁচিব না”—আমার এই স্পষ্ট ঘোষণা শিল্পীদের ভাল লাগিয়াছিল। তাঁহারা আমাদের আহ্বান জানাইয়াছিলেন কলাশিল্প বিষয়েও ধারাবাহিক অভিযান চালাইবার জন্ত। আমি অনধিকার চর্চার অজুহাত দেখাইয়াছিলাম। ভারতীয় বীণার বিভিন্ন তন্ত্রী সাধক হইলেও আমাদের মন যে একত্বের বাঁধা, ১৯৩১ সনের শেষেই তাহা পরস্পর জানাজানি হইয়াছিল। এই ভিত্তির উপরেই ১৯৩৪ সনের ঘনিষ্ঠতা।

শ্রীঅনাথনাথ বসু—আমাদের অহুদা’র সহিত সম্ভবতঃ বিশ্বভারতীর সূত্রপাতের যুগে আমার ঘন ঘন শাস্তিনিকেতন-গত্যাতকালে আলাপ হইয়াছিল। তিনি তখন কটকট-সম্মল গান্ধীপন্থী দেশকর্মী; বোলপুরের কাছাকাছি কোনও আশ্রমে চরকা-ধন্দ্র প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন পরিচয় ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে উঠিবার অবকাশ পায় নাই। তাহার পর কবে তিনি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের দিকে বুকিয়াছিলেন, কবে সাহেব সাক্ষিয়া পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, আমার জানা ছিল না। ১৯৩৩ সনের শেষাংশেই তিনি যখন শিকাগোর

বিশ্ব-প্রদর্শনী দেখিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন আবার দেখা হইল। আমার সহকারী কিরণকুমার রায়ের তিনি ছিলেন অহুদা—‘বদলী’-আপিসে একদিন পদার্পণ করিয়া আমারও অহুদা হইলেন। ১৩৪০ সালের শৌবের ‘বদলী’তে তাঁহার দীর্ঘ সচিত্র প্রবন্ধ “শিকাগো বিশ্ব-প্রদর্শনী” বাহির হইল। ১৫ই জানুয়ারি (১৯৩৪) অপরাহ্নে বিহার-ভূমিকম্প। ২০এ জানুয়ারি সকালে বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ও সমালোচক গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ও শিক্ষাবিদ অনাথনাথ বসুর অহুগামী হইয়া আমি ও কিরণ কুষ্টিয়া যাত্রা করিলাম। সেই দিনই বৈকালে কুষ্টিয়া উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে সরস্বতীপূজা উপলক্ষ্যে সভা—গিরিজাশঙ্কর সভাপতি, অনাথনাথ প্রধান অতিথি। ভূমিকম্পের আঘাত মনে ছিল, আমি “হুর্দিন” শীর্ষক কবিতা পাঠ করিলাম। প্রকৃতপক্ষে প্রকান্ত সভায় ইহাই আমার প্রথম সক্রিয় সহযোগ। অহুদার সঙ্গে এইখানেই ঘনিষ্ঠ হইবার অবকাশ পাইলাম; বিহারের ভূমিকম্পীড়িতদের সাহায্যার্থ কিছু করা যায় কি না, সে বিষয়ে উভয়ে অনেক পরামর্শ করিলাম এবং রাণাঘাট স্টেশন হইতে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’-আপিসে শ্রীমাননলাল সেনকে এই অহুরোধ জানাইয়া এক টেলিগ্রাম পাঠাইলাম—কলিকাতার প্রত্যেক সরস্বতী-পূজা-মণ্ডপে আবেদন করিয়া তিনি যেন সংগ্রহীত টাকার কিছু অংশ বিহারের আর্ন্তজ্ঞানের নিমিত্ত হস্তগত করেন। আর্ন্তসেবা প্রসঙ্গে কথায় কথায় অহুদা তাঁহার বন্ধু শ্রীনির্মলকুমার বসুর নামোল্লেখ করিলেন। সেই মাঘী শ্রীপঞ্চমীর রাতে রাণাঘাট স্টেশনের স্তিমিত আলোকে “নাম-পরতাপে” পূর্বরাগ হইল।

একদিন অহুদাই শ্রীনির্মলকুমার বসুকে সঙ্গে করিয়া ‘বদলী’-আপিসে আনিলেন; হুসু, সবল, সৌম্যদর্শন পুরুষ—কোথায় যেন একটু বিদ্যাসাগরী স্পর্শ আছে। যদিও পায়ে তালতলার চটি ছিল না, বন্ধুরী খাটো মটকা-রঙা কোর্টার সঙ্গে একটা বেমানান পাহাড়-ভাড়া শুই ছিল তবু কানে যেন চট্টির ফটফট আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। বয়সের হিসাব হইল না, বিবাহান কঠে “নির্মলদা” ডাক আপনি নিঃসারিত হইল।

আমার জীবনে তিনটি মানুষ দেখিয়াছি, বাঁহারা বয়সে ভারিকি না হইলেও সহজাত কবচকুণ্ডলের মত

ভারিকির চাল লইয়া জ্ঞানগ্রহণ করিয়াছিলেন—এক, শ্রামাশ্রমাদ; দুই, নির্মলকুমার বসু; এবং তিন, অতুল্য বোধ। অল্পকালের আলাপেই বুঝিতে পারিলাম, ইনি সেই-জাতীয় মানুষ বাঁহার উপর নির্ভরে নির্ভর করা-চলে। সে বোঝা আমার ভুল হয় নাই; গত বাইশ বৎসর নির্মলদার অব্যাহত স্নেহ আমাকে অতিমিত্ত করিয়াছে, পরে হিসাব খতাইতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে নির্মলদা আমার কয়েক মাসের ছোট।

নির্মলদার সঙ্গে পরিচয় যতই ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল ততই তাঁহার জ্ঞানের পরিধি দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিতে লাগিলাম। পাণ্ডিত্য কথাটা ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিলাম না, তিনি পণ্ডিত নন—জ্ঞানী। তাঁহার সকল পাণ্ডিত্য জ্ঞানে পর্ববসিত, অর্থাৎ তিনি অধীত ও অজিত বিজ্ঞা ব্যবহার ও প্রয়োগ করিয়া থাকেন। নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞান, ভূগোল এবং ভূবিজ্ঞা তাঁহার বিশেষ অহুশীলনের বিষয় হইলেও ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, মন্দির-স্থাপত্য ও গান্ধীবাদ সম্পর্কে তিনি ভারতবর্ষে একজন বিশেষজ্ঞ। কোনও বিষয়ে নিছক তাত্ত্বিকতায় তিনি বিশ্বাসী নন, সকল বিষয় হাতে-কলমে অহুশীলন করিয়া দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া কথা বলেন। আমাদের প্রাচীনা ঠাকুরমাদের নিত্য-ব্যবহৃত টোটকা-ঔষধ সম্বন্ধেও তাঁহার সংগ্রহ ও জ্ঞান উল্লেখযোগ্য, বন্ধুবান্ধবদের পারিবারিক বিপদে ও সঙ্কটে এই জ্ঞান প্রয়োগ করিয়া আশ্রয়-ব্রহ্মচারী নির্মলকুমার প্রায় শাখু-সন্ধ্যাসীর খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

নির্মলকুমার দৃঢ়চরিত্র নিয়মনিষ্ঠ মানুষ, ইংরেজীতে যাহাকে বলে “প্রিন্সিপল মেথডিকাল” তিনি সেই জাতীয়; বাঁহারাই তাঁহার সহিত দেশভ্রমণের স্রবোগ পাইয়াছেন তাঁহারাই জ্ঞানেন, তিনি পথের সর্ববিঘ্নের গজসিংহ; ভূকায় ছাতি ফাটিয়া বাইতেছে, কাছাকাছি জল নাই—নির্মলকুমারের ঝোলা হইতে আয়ুর্বেদ মতে হরিতকী আয়লকী ষষ্টিমধু কাবাবচিনি অথবা অ্যালোপ্যাথিক মতে লেমন-ড্রপ-লজ্জেল বাহির হইল, জুতার ট্র্যাপ ছিঁড়িয়া গিয়া কঙ্করময় পথ চলা অসম্ভব হইয়াছে নির্মলকুমার ঝুলি হইতে সেক্টিপিন বাহির করিয়া কাজ-চলা-গোছ ব্যবস্থা করিলেন; পথে কলমুল বাদাম জাতীয় খাদ্য যাহাই জুটুক খোশা ছাড়াইবার, খোলা ভাঙিবার উপায় নির্মলকুমারের

আয়ত্তে আছে। তিনি সঙ্গে থাকিলে নির্ভয়ে মুহূর্ত ঘাইতে পার, পেটের অস্থখ করিবার মত করিয়া ধাইতে পার, মাথা ধরাইবার মত হজা করিতে পার—প্রতিকার নির্মলকুমারের জ্বলির মধ্যেই বর্তমান। কখনও কখনও তাঁহার এই দিকটা দেখিয়া মনে হইয়াছে তিনি খুঁটিনাটির প্রতি একটু বাড়াবাড়ি রকমের দৃষ্টিসম্পন্ন—ফর্ম বজায় রাখিতে গিয়া অনেক সময় আসল লক্ষ্যকে অবহেলা করিয়া বসেন। খুঁটিনাটির প্রতি অহরূপ তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন আরও দুইটি মানুষ আমি দেখিয়াছি—ডক্টর গিরীন্দ্র-শেখর বসু ও তৎসদৃশ্যে ত্রিভুজশেখর বসু। টেবিল ফাইল আলমারি দেওয়াল তাকের কোণাও পান হইতে চুন গণিবার জো নাই; ছুরি কাঁচি পেপার-ওয়েট ও পেপার-কাটারের সঙ্গে স্কেল ও দাঁড়ি-পাল্লা ইহাদের নিত্য-ব্যবহার্য বস্তু মध्ये পড়িত। গিরীন্দ্রবাবুর বেলায় দেখিয়াছি মাপ ও ওজন ঠিক রাখিতে গিয়া তাঁহার গতি ব্যাহত হইত। মনস্তত্ত্ববিদেরই ইহা ব্যতিক্রম দাঁড়াইয়াছিল। বৈজ্ঞানিক রাজশেখর বসুর প্রথর শিল্পসাহিত্যবুদ্ধি তাঁহার নিয়মনিষ্ঠাকে ব্যাধিতে পরিণত হইতে দেয় নাই। এই বুদ্ধিই হয়তো কড়ায়-কড়া-কাহনে-কানা হওয়া হইতে নির্মলকুমারকে রক্ষা করিবে।

এই বুদ্ধি অর্থাৎ শিল্পসাহিত্যবুদ্ধি নির্মলকুমারের ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই প্রবল ছিল; কিন্তু তিনি তাহা এতাবৎকাল দমন করিয়া চলিয়াছেন। যাহারা তাঁহার ‘পরিভ্রাজকের ডায়েরি’ পড়িবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারাই অপরূপ সাহিত্যস্বয়ম্ভাসমণ্ডিত কয়েকটি চিত্র পাঠে বিশ্বয় অহুভব করিয়াছেন। মাত্র কয়েকটি রেখার সাহায্যে অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ছবি আঁকার ক্ষমতা তাঁহার আছে, এবং সে ছবির প্রত্যেকটিই বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সাহিত্যিক ছাড়া অন্য সকলেরও তাহা ভাল লাগে। কিন্তু তিনি সাহিত্যসেবাকে পাশে সরাইয়া রাখিয়া দেশের ঐতিহ্য ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন করিতে বন্ধপরিকর হইয়া দেশের সর্বত্র টহল দিয়া ফিরিতেছেন। তাঁহার মধ্যে যে বাধাবরটি বাস করে তিনিই যদিও তাঁহার মাধ্যম নিরন্তর ডাকশ মারিয়া বেশীদিন এক স্থানে তিষ্ঠাইতে দেন না—আমরা লাভবান হই তাঁহার এই ভ্রমণলব্ধ অভিজ্ঞতার ফল ভোগ করিয়া।

নির্মলকুমার সব্যসাচী। ইংরেজী বাংলা উভয় ভাষায় তাঁহার ডাইনে বায়ে কলম চলে, উভয় ভাষাতেই তিনি প্রথম শ্রেণীর বক্তা। কিন্তু ইহা দ্বারা আমার নিকট নির্মলকুমারের বিচার নয়, তিনি আমাদের বিপদবারণ বন্ধু—একাধারে ক্রোধ, ফিলজফার অ্যাণ্ড গাইড—স্বস্থ, পরামর্শ-দাতা ও পথপ্রদর্শক।

১৩৪১ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯৩৪ সনের গোড়ায় বাংলা দেশের রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে অকস্মাৎ কমিউনিজমের প্রভাব লক্ষিত হয়। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের অহিংস সৈনিকদের মধ্যে চট্টগ্রামের সশস্ত্র হিংসাত্মক বিপ্লবের সৈন্তেরা আসিয়া পড়িলে জেলে জেলে এক ঠাণ্ডা মানসিক সংগ্রাম চলিতে থাকে। কটক-দ্বার-কটক-উচ্ছেদ-নীতির সাহায্যে সন্ত-আগত কমিউনিজমের হাতে দৃঢ়মূল গান্ধীবাদের সংহার কামনা করিয়া তদানীন্তন ইংরেজ সরকার নানাভাবে কমিউনিজমকে প্রলয় দিতে থাকেন। এক টিলে দুই পাখী মারিবার স্বপ্নও তাঁহারা দেখিয়াছিলেন—গান্ধীবাদের সঙ্গে সন্ধাঙ্গবাদ। নব-তন্ত্রের পক্ষে দুই-একজন সক্ষম প্রচারক নেতৃস্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অহিংস পক্ষের নল নীল গর গবাক্ষ—একে একে বহু সেনাপতিরই পতন হইতে লাগিল। নির্মলকুমার তখনই কারাগারের লৌহতোরণবার অতিক্রম করিয়া গভারাত করিতেছেন। তিনি গান্ধীপক্ষে দাঁড়াইলেন, তাঁহার জ্ঞান ও বিশ্বাসের ভিত্তি আকস্মিক আঘাতে বিচলিত হইবার মত শিথিল ছিল না। তিনি টিকিয়া গেলেন এবং এই সংঘর্ষে কমিউনিজম-মতবাদকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে আরক্ত করিয়া ফিরিলেন। আমার সহিত যখন তাঁহার পরিচয় ঘটিল, তখন তিনি গান্ধীবাদ ও কমিউনিজম লইয়া বিশেষভাবে অধ্যয়ন-অহুশীলন করিতেছেন। ‘বঙ্গশ্রী’র পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে তাঁহার সৃষ্টিবিস্তৃত মতামত ব্যক্ত করিতে আমি তাঁহাকে সরাসরি অহরোধ করিলাম। ১৩৪১ সালের আশ্বিনের ‘বঙ্গশ্রী’র প্রথম প্রবন্ধরূপে নির্মলকুমার বসুর ‘কমিউনিজম ও গান্ধীবাদ’ প্রবন্ধ বাহির হইল। সুস্ব বিবেচনের দ্বারা দুই মতবাদের পার্থক্য তিনি সেদিন যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন, আজিকার দিনেও সে পার্থক্য বজায় আছে। তখনও কমিউনিষ্ট জগতে লেনিনের যুগ চলিতেছিল, হিটলারের অভ্যুদয় হয় নাই এবং মহামাত্র স্টালিন ট্রুটস্কির

বুদ্ধির কারাগার হইতে পোকুলে নীত হইয়া সেখানেই বাড়িতেছেন। নির্মলকুমারের প্রবন্ধের শেষাংশ উদ্ধৃত করিতেছি।—

“গান্ধীজী স্বীয় পথে মানুষকে যে আসন দিয়াছেন, তাহার অন্তর্নিহিত শুভবুদ্ধির উপর বস্তুটা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, কমিউনিজমে তাহা করা হয় না।... ”

কমিউনিজমের মতে মানুষ অন্তরে দুর্বল। সেই জন্ত করেকজন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোক হলে বলে কোশলে কোমণ্ড উপায়ে একবার রাষ্ট্রের অধিকার হস্তগত করিয়া লইতে পারিলেই সেই শক্তিকে মানুষের মন পরিবর্তন করিবার কাজে নিয়োগ করিবে। শিক্ষার বিস্তারের দ্বারা তাহার মানুষকে সাম্যের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবে; কিন্তু যদি মানুষ তাহাতে আগন্তি করে তবে রাষ্ট্রের সকল শক্তি ব্যয় করিয়া তাহার স্বাধীনতাকে ধ্বংস করিতে হইবে। শাসনের দ্বারা, ভয়প্রদর্শনের দ্বারা, শিক্ষার দ্বারা তাই কমিউনিজম মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়োজিত করিতে চায়। শিক্ষা কার্যকরী না হইলে রাষ্ট্রের শাসনের উপরেই তাহা অধিক আস্থা স্থাপন করে। ইহাকেই কমিউনিজম আপাততঃ একমাত্র কার্যকরী পন্থা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

গান্ধীজী কিন্তু মূলতঃ ইহার বিরোধী। তিনি বলেন, যদি জয়ের দ্বারা মানুষকে পরিচালিত করিতে হইল, তবে সেই প্রতিষ্ঠান, সেই সামাজিক ব্যবস্থা কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। মানুষকে ভয়ভুক্ত করাই, আত্মার বলে উন্নত করাই যখন শেষ লক্ষ্য, তখন কোন অবস্থাতেই তাহাকে ভোলা যায় না, বাহিরের রূপকে অন্তরের চরিত্রের উপরে স্থান দেওয়া যায় না। যে প্রতিষ্ঠান রূপকে বজায় রাখিতে গিয়া মানুষকেই ধ্বংস করিল, তাহাকে তিনি কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত নহেন। তাহা যে মানুষকে বড় করিতে পারিবে একথা তিনি কোন দিনই স্বীকার করেন না।

মানুষের অন্তরের প্রতি এই গভীর অস্বস্তি, এখন হইতেই তাহার অন্তরকে শক্তিশালী করিবার একনিষ্ঠ চেষ্টা গান্ধীজীকে কমিউনিষ্টগণ হইতে অনেকখানি তফাৎ করিয়া দিয়াছে। সাধনার বহিরঙ্গের উপর তাঁহার আস্থা কম। তাঁহার দৃষ্টি সর্বদা বাহিরের আবরণকে ভেদ করিয়া অন্তরের চরিত্রের, তাহার গতির উপর নিবদ্ধ রহিয়াছে। কমিউনিজম তাহার পরিকল্পিত ভয় এবং সাহসে মেশানো মানবচরিত্রের স্থানান্তর উপর বিশ্বাস করে। সেই জন্ত কখনও ইহা সেই ভয়কে, কখনও বা প্রেমকে অবলম্বন করিয়া বাহিরে দেখিতে একটি হঠাৎ রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্মাণ করে; এই ক্ষণস্থায়ী যে, সাম্যত্বের সেই কেঁজালার মধ্যে পড়িলে মানুষ আর স্বার্থের বশে কিছু করিবার হযোগ পাইবে না, বাধ্য হইয়া তাহাকে প্রেমের পথ ধরিতে হইবে।

কমিউনিজমের লক্ষ্য যেমন স্পষ্ট এবং সাধনা অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট আমরা তেমনই দেখিলাম যে গান্ধীবাদের হৃদয় লক্ষ্য নক্ষত্রের আলোর মত স্পষ্ট হইলেও তাহা মাটির যে পথের উপর দিয়া মানুষ যাতায়াত করে তাহার উপর তেমন আলোকপাত করিতে পারে না, সে পথের অন্ধ-তমসা

শুধু একান্ত সাধকের দৃষ্টিই ভেদ করিতে পারে। অপরের পক্ষে তাহা বিশবসম্ভব। প্রেমের বশে দুঃখকে বরণ করিয়া লওয়ার এই পথ তরবারির সীমারেখার মত স্পষ্ট হইলেও তেমনই সর্বাঙ্গ, তেমনই নিষ্ঠুর। কাপালিকের সাধনার মত তাহা সাধকের জন্ত নিজস্ব আর কিছুই রাখিয়া যায় না, তাহার সকল সম্বন্ধকে প্রেমের যজ্ঞে নির্মমভাবে দহন করে।

ইহার তুলনায় কমিউনিজমের দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত সর্বাঙ্গ। আমাদের দ্বারা বিজ্ঞানের দ্বারা জনতার দুঃখকে দূর করিতে পারিবে, এই অভিমানের উপরেই তাহা প্রতিষ্ঠিত। গান্ধীজীর পথে যে বীরত্বের প্রয়োজন হয় তাহা কণিকের জন্ত হস্ত পাশের বাকীর পায়ের আওয়াজ হইতে বল পায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা একাকী চলার পথ, যে পথে ক্ষোভের স্বাক্ষরতাকে পরিহার করিতে হয়, ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে একাকী বিচরণ করিবার সাহসের প্রয়োজন হয়। ইহার তুলনায় লেনিনের পথ অপেক্ষাকৃত সহজ, এবং সেই জন্তই শক্তি ও দুর্বলতার জড়ানো সাধারণ মানুষের কাছে তাহা এত প্রিয়, এমন আশার সম্পন্ন। সেখানে একা যাইবার বালাই নাই, বহু লোকের পথ চলার কোলাহলের মধ্যে নিজের আন্তরিক দুর্বলতাকে বিস্মৃত হইবার হযোগ পাওয়া যাইতে পারে।

সাধিক ও রাজনিক ধর্মের মধ্যে যে প্রভেদ, গান্ধী এবং লেনিনের পথের মধ্যেও ঠিক সেই প্রভেদ বর্তমান রহিয়াছে। উভয়েই মানুষের প্রতি প্রেমের ভ্রম হইতে উৎসারিত হইয়াছে। কেবল একজন দুঃখের অভিক্রমে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, মানুষকে চিরদিন যে অন্তরের আবেশে অন্ধকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া বাইতে হইবে, ইহাকেই চরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন; এবং অপরজন মানুষ যে ইচ্ছার বলে জ্ঞানের দ্বারা, বিজ্ঞানের সাহায্যে জনতার রূপকে পরিবর্তিত করিয়া দিতে পারে এই বিশ্বাসের, এই অভিমানের উপরেই তাঁহার সকল আশা রচনা করিয়াছেন; ইহাই হইল উভয়ের মধ্যে চরম পার্থক্য।

অন্তর্মিশ্র রজনীর আকাশতলে লেনিন কর্মকারের বেশে লৌহের উপরে প্রায়শ্চৌল্যে রাখিয়া প্রচণ্ড বেগে তাহাতে আঘাতের পর আঘাত করিয়া বাইতেছেন। সম্মুখে প্রায়শ্চৌল্যের আলো ছলিতেছে। কিন্তু উপরে রাজির যে অন্ধকার ঘেরিয়া আছে তাহা তিনি দেখিতে পাইতেছেন না। তাঁহার অন্তরের বিকৃত আশা, বাহুর বিপুল শক্তি, কর্মের প্রচণ্ড উদ্ভাবনা, সবই নক্ষত্রের শিশুর কঠোর আলোর স্পর্শে পরাহত হইয়া বাইতেছে, তাঁহাদের কাছে মৃত্যু ও জীবনের মধ্যে যেমন প্রভেদ নাই, মানুষের এই ক্ষুদ্র দুঃখদুঃখের লীলারও তেমনই কোম অর্থ নাই, কোন মূল্য নাই। আর অপর পক্ষে গান্ধী নিষ্ঠুর, নিরব রাজির অন্ধকার ভেদ করিয়া হৃদয় নক্ষত্রালোকের দিকে চিরদিনের বাজীর মত পথ বহিয়া চলিয়াছেন। সে বাজীর কোমলতাই শেষ হইবে না জানিয়াই তিনি তাঁহার সকল শক্তি সকল দৃষ্টি শুধু পায়ের তালের উপরেই নিবদ্ধ করিয়াছেন, পথে “চলার” তুল হইলে একবার আকাশের দিকে চাহিয়া নিজের শিশুরা ঠিক করিয়া লইতেছেন। বিগত কাল এবং অনাগত ভবিষ্যতের মধ্যে বর্তমানের যে মহাসম্মেলন বিরাজ করিতেছে, তাহারই উপর তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি, সকল প্রাণকে চালিয়া দিয়াছেন। ইহাই হইল তাঁহার বিশেষত্ব, ইহাই হইতেই তিনি জীবনের সকল শক্তি লাভ করিয়া থাকেন।”

নির্মলকুমারের সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় উপরের উদ্ধৃতিতেই আছে; কিন্তু তিনি তাহা সম্যক প্রয়োগ করিবার স্বযোগ নিজেই দেন নাই। হিমালয়ের উত্তীর্ণ শিখরের এবং বালু-প্রস্রবন উড়িয়া ও দক্ষিণ-ভারতের সুপ্রাচীন মন্দিরগুলির আশ্রয় তাঁহার কাছে এত প্রবল যে, সাহিত্য-সাধনার নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ তাঁহার নাই। ইহার উপর রাঁচি-হাজারিবাগ-ছোটনাগপুর অঞ্চলের আদিবাসীদের এবং ময়ূরভঞ্জ-অঞ্চলের প্রস্তরীভূত উদ্ভিদ ও প্রাণীদের ডাক আছে। পশ্চিমবঙ্গ পূর্ববঙ্গ ও বিহারে গান্ধীজীর অগ্রগমন করিয়া তাঁহার যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় তিনি ইংরেজী-বাংলা ভাষায় আমাদের উপহার দিয়াছেন, তাহা একান্তই বাই-প্রভাষ্ট—কালতু ফসল। সাহিত্যিক নির্মলকুমারের আশা আমি এখনও রাখি, হৃদয়ের পিপাসা মিটাইয়া তিনি কবে বাগবাজারের কোর্টরে ডানা গুটাইয়া বসিবেন তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছি।

নির্মলকুমারের সঙ্গে আমার সাহিত্য-জীবনের সর্বাধিক ট্রাজেডি জড়াইয়া আছে। ‘আত্মস্মৃতি’র পূর্বাঙ্গ পাঠকেরা যদিও জানেন ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আমি গান্ধীজীর অগ্রবক্ত ভক্ত, ‘শনিবারের চিঠি’র স্তম্ভ গান্ধী-বিরোধী মোহিতলালের ধারণা হইয়াছিল—নির্মলকুমার আমাকে গান্ধীভক্ত করিয়া তুলিয়া ‘শনিবারের চিঠি’র ক্ষতি করিতেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের গান্ধীর মত আমাকে নির্দেশ দিয়াছিলেন দুর্ধোধনকে ত্যাগ করিবার জ্ঞ। বাহা আত্মনেপদী, তাহাকে পরম্পদী আখ্যা দিতে আমি রাজী হই নাই—নির্মলকুমারকে বর্জন করিবার কোন সঙ্গত কারণ আমি খুঁজিয়া পাই নাই। ফলে মোহিতলালের সহিত আমার সম্পর্কে পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়াছিল।

ডাক্তার সাহিত্যিক শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্যের বন্ধু বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘটকালিতে লাভ করিয়াছিলাম। ঘাটশীলার আরণ্য ও পার্বত্য প্রকৃতি বারম্বার বিভূতিকে আহ্বান করিত। সেখানকার পুষ্পব্যবসায়ী ডিক্রোন কোম্পানির সাহিত্য-প্রাণ স্বত্বাধিকারী দ্বিজেন্দ্র মল্লিক বেশ একটি সাহিত্য-পরিবেশ রচনা করিয়াছিলেন; বিভূতিভূষণ, সঙ্গীক ব্যারিস্টার নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত, উত্তর-পাড়ার শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী বাণী রায়, শ্রীমতী পরিমল দাস প্রভৃতি মিলিয়া স্ববর্ণরেখার তীরে

একটি সাহিত্যচক্রও নির্মাণ করিয়াছিলেন। অদূরবর্তী গালুড়ি-গ্রামে পশুপতিবাবুর অবসর-বিনোদনের একটি আশ্রয় ছিল। নীরদরঞ্জন ছিলেন তাঁহার প্রতিবেশী ও বন্ধু, স্তবরাং পশুপতিবাবুরও স্ববর্ণচক্র-ভূক্ত হইতে বিলম্ব হয় নাই। বিভূতিভূষণ সেই পরিচয়ের জোরে আমারও সহিত তাঁহার পরিচয় সাধন করাইয়া দেন। প্রথম আলাপেই বৃত্তিতে পরিলাম—পশুপতিবাবুর সাহিত্যিক পরিচয় স্ববর্ণচক্রেই সীমাবদ্ধ নয়, তিনি রবি-চক্রেরও একজন অন্তরঙ্গ সভ্য, অয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিয়া থাকেন। তথাপি সাহিত্য ছিল তাঁহার শব্দের খেলা।

পশুপতি ভট্টাচার্যকে বন্ধুরূপে পাইয়া আমার সেই নিত্যস্ত দুঃখস্বায় আমি বহু বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলাম। তখন সবে ‘বঙ্গশ্রী’র চাকরি লইয়াছি, রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে থাকি, চোটা স্বদের জের তখনও চলিতেছে। সংসার-যাত্রার সহায়তার জন্ত একাধিক লোক রাখিবার সঙ্গতি ছিল না—একাধারে পাচিকা, দাসী এবং শ্রীমান রঞ্জনর ধাত্রী ছিল সরস্বতী নামধেয়া এক প্রোঢ়া। আমার ‘হরিশ্চন্দ্র’ গল্পে এই প্রোঢ়ার কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। ঠিক এই সময়ে সে হঠাৎ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইল এবং তাহার বুদ্ধির জড়তা দেখা দিল। সেই নিদারুণ সঙ্কটকালে ডাক্তার পশুপতিবাবু নিয়মিত হাজিরা দিতে লাগিলেন এবং অচিরে পরিবারের চিরস্থায়ী বন্ধু মধ্যে পরিগণিত হইলেন। ১৩৪০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে ইংরেজ-কল্যাণলিন শ্রবণের “স্কুলমাস্টার” গল্পের অনুবাদ “মাস্টার মশাই” মারফত তিনি ‘বঙ্গশ্রী’র সাহিত্যিক-গোষ্ঠীভুক্ত হইলেন।

পশুপতিবাবুর সাহিত্য-সাধনা বিচিত্র পথে অগ্রসর হইয়াছে। সাহিত্য গোড়ায় ডাক্তারের অবসর-বিনোদনের উপায় মাত্র ছিল, ধীরে ধীরে তাহাই তাঁহার প্রায় একান্ত সাধনা হইয়া পাড়াইয়াছে। গোড়ায় তিনি ছিলেন অনুবাদক এবং চিকিৎসা ও ধাত্ততত্ত্ব বিষয়ে গবেষণাকারী লেখক, বর্তমানে তাঁহার উপন্যাসে ও প্রবন্ধে অতি গভীর জীবন-দর্শন আত্মপ্রকাশ করিতেছে। তাঁহার প্রথম দিককার আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে আমরা তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম অস্থিরচিত্ত লক্ষ্যহীন পথের পথিকরূপে, দেহাশ্রিত স্থল প্রেমের লুক্ক পূজারীরূপে। তাঁহার সাহিত্যিক মন তখন নানা জটিলতার গোলোকধাঁষায়

বিলাস ছিল, আজ তিনি সহজ পথের পথিক সহজ মানুষ, দেবতা তাঁহার লক্ষ্য স্থির ও নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহাকে কৃপা করিয়াছেন।

তাঁহার সাহিত্যিক জীবন পথালোচনা করিয়া আমি ইহাই উপলব্ধি করিয়াছি যে, যেখানে সত্যকার জীবন-জিজ্ঞাসা আছে সেখানে সহস্র জটিলতা থাকিলেও মানুষ আপনার পথ খুঁজিয়া পায়, নিজে সহজ ও সুন্দর হইয়া অপরকেও পথনির্দেশ করিতে পারে। সাহিত্যিক পশুপতি ভট্টাচার্যের সত্যকার সাহিত্যসাধনা এতদিনে শুরু হইয়াছে। “মহাযোগী” শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে তাহা সার্থক হইবার পথ খুঁজিতেছে। নিরন্তর ঐকান্তিক ও একনিষ্ঠ সাধনা করিলে যে শেষ পর্যন্ত দেবতা প্রসন্ন না হইয়া পারেন না, পশুপতিবাবুর জীবনে আমি তাহাই দেখিতেছি।

ডাক্তার রামচন্দ্র অধিকারী যক্ষ্মারোগ-বিশেষজ্ঞ হিসাবেই পরিচিত; বাংলা-সাহিত্যের এমন প্রেমিক ও সমর্থদার আমি অল্পই দেখিয়াছি। কিরণকুমারের তিনি বন্ধু ছিলেন। ‘বঙ্গশ্রী’র আড্ডায় গোড়া হইতেই তাঁহাকে দেখিয়াছি। কাগজের উপর কলমের সাহায্যে কথার ফুল ফুটাইবার অভ্যাস তিনি করেন নাই, মুখে মুখে সাহিত্য-রচনা করিয়া মজলিস-মনোরঞ্জন করা তাঁহার একটা ব্যসন ছিল। অর্থাৎ তিনি চমৎকার কথা বলিতে পারিতেন। রবীন্দ্রনাথ ও তৎপরবর্তী বাঙালী কবিদের একনিষ্ঠ পাঠক তিনি, কথায় কথায় প্রায়শই রবীন্দ্রনাথ এবং কখনও কখনও বটীন্দ্রমোহন-কঙ্কণানিধান-বটীন্দ্রনাথ-কুমুদরঞ্জন-মোহিতলাল-কালিদাস-নন্দরূপ এবং কদাচিত্ত সজনীকান্তের ‘রাজহংস’ের কবিতা আবৃত্তি করিতেন। ভারী গলায় তাঁহার আবৃত্তি খুব ভাল লাগিত। তাঁহার সাহিত্যরসিক মূর্তিটি প্রথমে ধরিতে পারি নাই, নিছক আড্ডাবিলাসী বলিয়াই তাঁহাকে মনে হইয়াছিল। ১৯৩৪ সনের ২রা জানুয়ারি তারিখে ‘বঙ্গশ্রী’-আপিসে জ্যেষ্ঠ আড্ডা বসিয়াছিল। ডক্টর হুশীলকুমার দে, ডাক্তার রামচন্দ্র অধিকারী, সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকমল সিংহ, কুমুদবন্ধু সেন ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। আড্ডা খুব জমিয়া উঠিয়াছিল, হঠাৎ কে যেন সংবাদ আনিলেন,

অ্যালবার্ট হলে সেই দিন সম্ভ্রাম কবি সরোজিনী নাইডু “মানবজীবনে কবিতার প্রভাব” বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন ও তৎসঙ্গে স্বরচিত কবিতা পাঠ করিয়া শুনাইবেন। আড্ডা ছাড়িয়া যাইতে কাহারও ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ডাক্তার রামচন্দ্র অধিকারীকে কিছুতেই নিরন্তর করা গেল না। তিনি যাইবেনই এবং আমাকেও লইয়া যাইবেন। শেখপীর-প্রোক্ত স্কলগামী বালকের মত সভাস্থলে উপস্থিত হইলাম। দেবীলাল শ্রীতুলসী গোস্বামী সেখানে আসর জাঁকাইয়া বসিয়া আছেন, কিরণকুমার রায় এবং শ্রীকালিদাস নাগ তদ্বির-তদারক করিতেছেন। যথাকালে সরোজিনী নাইডু উপস্থিত হইয়া সকলকে আপ্যায়িত করিলেন এবং পিকবিনিমিত্ত কঠে নানা দৃষ্টান্ত আবৃত্তির সঙ্গে কবিতার ঐশী শক্তি সম্বন্ধে চমৎকার একটি বক্তৃতা করিলেন। তিনি বলিলেন, কবিতা জীবনের দর্পণস্বরূপ, সমাজ ও ব্যক্তি, ব্যক্তি ও সমষ্টির আত্মিক চিত্র ইহাতে প্রতিফলিত হয়; মানব-জীবনে কবিতার মৃত্যু হইলে ধীরে ধীরে মানুষের তথা সমাজের অধোগতি হয়, সাধারণ তেল-চুন-লকড়ি সংগ্রহের উদ্ভমও ধীরে ধীরে নিতেজ হইয়া সমাজকে জড়পিণ্ডে পরিণত করে। বক্তৃতার শেষে তিনি স্বরচিত কয়েকটি কবিতা, বিশেষ করিয়া দেশপ্রেম-মূলক কবিতা-গুলি, আবৃত্তি করিলেন। সম্ভ্রাম সার্থক হইল দেখিয়া মনে মনে ডাক্তার রামচন্দ্র অধিকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হইলাম।

তিনিও আমাকে ছাড়িলেন না। ইউরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেন সমিহিত তাঁহার আইবুড়ো-বিবরে লইয়া গেলেন। সেখানে অনেক রাজি পর্যন্ত কাব্যচর্চা চলিল। গভীর রাত্রে এই ধারণা লইয়া ফিরিয়া আসিলাম যে, বিতায় ও উপজীবিকায় তিনি বাহাই হউন, আসলে একটি সহৃদয় ভাবুক প্রাণ ওই ঢিলাঢালা অসদৃশ কাঠামোর মধ্যে বাস করে। মনে আছে যক্ষ্মারোগ সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞানের পরিধি দেখিয়া সেই দিন তাঁহাকে অহুরোধ করিয়াছিলাম তাঁহার জ্ঞান মাতৃভাষায় সকলের উপযোগী করিয়া প্রকাশ করিতে। দীর্ঘ কুড়ি বৎসর পরে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে আমার অহুরোধ প্রতিপালিত হইয়াছে। আমরা ডাক্তার রামচন্দ্র অধিকারীর ‘ক্ষ্মারোগ-কথা’ পাইয়াছি। এই বইখানি যাহারা পড়িবেন তাঁহারাই উপলব্ধি করিতে পারিবেন, ডক্টর অধিকারীর সাহিত্যপ্রতিভাও বড় কম ছিল না।

তবে এ কথাও মনে মনে স্বীকার করিব, তিনি সাহিত্যিক হন নাই, ভালই হইয়াছে। সাহিত্যিক-সহৃদয়তা তাঁহাকে মানবপ্রেমিক করিয়া বহু দরিদ্র মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের বিপত্ত্যারণ বন্ধ করিয়া তুলিয়াছে। যে ভয়াবহ ব্যাধি ধীরে ধীরে শহর ও শহরতলীর অসহায় মানুষকে গ্রাস করিতেছে, তাঁহার সাধ্যমত সেই ব্যাধির সহিত তিনি যুদ্ধ করিতেছেন; ব্যাধিগ্রস্ত আত্মীয়বন্ধু-পরিত্যক্ত মানুষদের জন্ত নতুন সমাজ সংসার ও আশ্রয় রচনা করিবার কাজে তিনি ব্যাপৃত হইয়াছেন এবং বহু নিরুপায় সংসারকে ব্যক্তিগত পরামর্শ ও সেবা দিয়া একেবারে ভাসিয়া যাইতে দেন নাই। তাঁহার পরিচিতদের মধ্যে এমন মানুষ কমই আছে, যাহারা আত্মীয় বন্ধু বা পরিচিতের কারণে তাঁহার দ্বারস্থ হইয়া উপকৃত হয় নাই। তাঁহার বন্ধুবাৎসল্যে আমরা সকলেই ধন্ত।

এই “পরিচয়-কথা” হুজ্রে আরও একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য, যাহাকে ছায়াচিত্রের ছায়াযুক্তি বলিতে পারি—“বিষবৃক্ষে”র প্রবণামিনী ছায়া। ১৯৩৪ সনে বছরের গোড়া হইতেই আমাকে ঘেন ছায়াছবির ভূতে ধরিয়াছিল। সপ্তাহের মধ্যে অস্তুতঃ পাঁচ দিন সিনেমার ছবি দেখা বাতিকে দাঁড়াইয়াছিল। কোন কোন দিন দুইবারও দেখিতাম। হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় তখন ধর্মতলা স্ট্রিটের “রঙনক মহল” নামক ছবিঘরের ম্যানেজার—তাঁহার রূপাই ছিল সমধিক। অ্যুট আনার টিকিটে ছবি দেখিতে তখন লজ্জা বা অসুবিধা ছিল না। চলচ্চিত্রশিল্পের সহিত যোগাযোগের সম্ভাবনা তখন আমার হৃদয়বর্তী কল্পনাতেও ছিল না। তবু পাগলের মত ছবি দেখিয়া ছবিতে গল্প বলার টেকনিক আয়ত্ত করিতেছিলাম। তখন সিনেমা-জগতে নিউ-থিয়েটার্সের জয়-পতাকা সবে উড়িতে আরম্ভ হইয়াছে—প্রমথেশ বড়ুয়া, দেবকী বসু ও নীতীন্দ্র বসুর খুব নাম।

হঠাৎ ৩০ মার্চ (১৯৩৪) তারিখে নীতীন্দ্র বসুর সহিত পরিচয় বাটল, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় আলাপ করাইয়া দিলেন। চলচ্চিত্র বিষয়ক দুই-চারিটি কথা হইতেই নীতীনবাবু আমাকে একটি গল্পের “সিনারিও” বা চিত্রনাট্য লিখিতে বলিলেন। “গোড়ার কবিতা ও শেষের কবিতা” নামক একটি ধারাবাহিক গল্প পাঁচ বৎসর পূর্বে ‘শনিবারের চিঠি’তে লিখিতে লিখিতে আর শেষ করি নাই। বাড়ি ফিরিয়া সেই গল্প লইয়া পড়িলাম। গল্পটিকে যতদূর সম্ভব চটকদার করিয়া তুলিলাম। কিন্তু নীতীন বসুর মনোহরণ করিতে পারিলাম না। তখন ‘অক্সফোর্ড বুক অব বেঙ্গলি ভার্গ’ প্রস্তুত সম্পর্কে শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মারফৎ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘন ঘন যোগাযোগ ঘটাইতেছিল। সে কাহিনী পরে বক্তব্য। নীতীন বসু এই যোগাযোগের সংবাদ পাইয়াছিলেন। তিনি একদিন বলিলেন, রবীন্দ্রনাথের একটা ছোটগল্প বাছিয়া লইয়া স্বয়ং কবির পরামর্শে যদি তাহার চিত্রনাট্যরূপ প্রস্তুত করি, তাহা হইলে তাহা কাজে লাগানো যাইতে পারিবে। এই এপ্রিল মাসে লোভে লোভে ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে উপস্থিত হইলাম। ‘অক্সফোর্ড বুক অব বেঙ্গলি ভার্গ’ সম্পর্কে কথার ফাকে নীতীন বসুর প্রস্তাবটাও কবির গোচর করিলাম। তিনিও উৎসাহিত হইলেন। “দুর্গাশা,” “ক্ষুধিত পাষণ” ও “পরিশোধ” এই তিনটি গল্প লইয়া বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা চলিল। কিন্তু আমার সিনেমা-ভাগ্য তখনও প্রসন্ন হয় নাই। নীতীন বসু গাছে তুলিয়া মই লইয়া সরিয়া পড়িলেন। ১৯৩৭ সনে প্রমথেশ বড়ুয়া প্রথম গাছে মই লাগাইয়া আমাকে নামাইলেন, এবং ১৯৪৫ সনে স্বয়ং নীতীন বসু যাহা লইয়া উপস্থিত হইলেন তাহা মই নয়, তাহাকে মার্বলপাথর-বাঁধানো সিঁড়িও বলা যাইতে পারে।

[ক্রমশঃ]



আজ সারা রাত

অসিতকুমার

(সিদ্ধ্য?)

আজ সারারাত পাতারা কাঁপবে ভিজে হাওয়ায়,
বৃষ্টি পড়বে নগ্ন কোমল রাতের গায়।
শিরায় শিরায় ধুয়ে ধুয়ে যাবে অন্ধকার—
মুগ্ধ মেঘেরা ঘুরবে অবোধ শূন্যতায়।

আজ সারা রাত শিকড়ে শাখায় গাছের দল—
মাথবে বাতাস, পান করে নেবে বৃষ্টিজল,
নরম কাঁদায়, ভাঙবে নীরব বীজের ঘুম,
মাটির গন্ধে জাগবে মাঠের মৃতকুসুম।

আজ সারারাত বৃষ্টি পড়বে—সারাটা রাত—
হৃদয়ে হৃদয়ে দোলা দিয়ে যাবে হাওয়ার হাত,
স্বর্ধবলয় পার হয়ে ঘুরে তিমিরলোক,
ঘিরবে তোমায় আমার; ভরবে অন্ধ চোখ।

আজ সারা রাত গৃহ দুর্শায় কাঁপবে প্রাণ,
মরে আসা জ্ঞান স্বপ্ন সোঁতায় আসবে বান,

হাওয়ায় ভাসবে সবুজ ধানের স্বপ্নস্বর—
আজ সারারাত আকাশ মাটির উঠবে পান।

কখন ক্রান্ত হৃদয় খুঁজেছে অন্ধকার,
পাই নি অস্ত বন্দী-জীবন-যন্ত্রণার।
এখন হঠাৎ বিদ্যুৎ-নীল উদ্ভাসন—
যুগান্তরের অজানা আশায় কাঁপায় মন।

এ রাত কি মেবে একটি দিনের স্বপ্নবাদ।
জীবনে জড়াবে ধান-শিশুদের আশীর্বাদ।
মেবে কি মৌন মায়াবী আকাশ নন্দনীল—
স্বর্ষের বৃকে ঘুরে ঘুরে ওড়া শব্দচিহ্ন?

কি জানি কে জানে! এখন কেবল সারাটা রাত—
অন্ধকারেতে দোলা দিয়ে বাক হাওয়ার হাত।
গাছেরা হলুক, ভিজুক পৃথিবী, শুধু আকাশ—
এনে দিক মনে দূর মৃত্যুর কল্লাভাস।

পাহাড়

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

বন্ধুর ঘুর পথে চলি আমি পাহাড়,
কুয়াশায় পথ ঢাকা, নাহি চলে দৃষ্টি;—
বাক্যে বাক্যে ঘুরে চলি অধীর অশান্ত,
নবযুগ ডাকে ঐ, ডাকে নব সৃষ্টি।

উঁচু নীচু ভাঙা পথ, আসে বাধাবিহ্ন,
তবু হাতছানি দেয় আলোকের রশ্মি;
হৃদয় অরুণাচলে জাগে তার চিহ্ন,
নতুন দিনের শুরু আধারেরে ভস্মি—

বায় বার খামি পথে, ঘিরে ধরে ক্রান্তি,
শরীর অবশ হ'ল, চোখে নামে স্থপ্তি,

বক্ষেতে তবু মোর এ কি এ অশান্তি,
আধপথে পথচারী নাই তোর মৃতি।

হোক না সে ধূ-ধূ মরু, ধরবায় কক্ষ
সীমাহীন কত পথ, কিছু নাই স্থির যে—
আশ্রয় কোথা নাই, তবু নাই দুঃখ,
নির্ভয়ে চল আগে নিঃসীম বীর্ষে।

মর্মের ক্রন্দনে কাঁদে যবে চিত্ত
বক্ষের তলে বাজে বিপ্লব-তুর্ধ—
স্বচীমুখ বালুঝড় গরজাক নিত্য,
তবু ওঠে আলো-বাঙা ঐ নবস্বর্ধ!

রবীন্দ্রনাথের পত্র-সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ রায়

১

প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের ভাবগত পার্থক্যের সবচেয়ে বড় কথা বোধ হয় বিষয় ও ব্যক্তির সম্পর্ক-নির্ণয়ের দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন। প্রাচীন সাহিত্যের ব্যক্তিবিলোপী বিষয়মুখীনতা আধুনিক সাহিত্যে দুর্লভ বললেই হয়। ব্যক্তি সেখানে অল্পপস্থিত, অথচ বিষয়ের গরিমা ও সর্বদ্বন্দ্ব অথগুতা বিশ্বয়কর মহিমা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। নৈব্যক্তিকভাবে দেশকালের ইতিহাস রচনা করা তাঁদের পক্ষেই সম্ভব হ'ত। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে এই সব রচনায় রচয়িতার ব্যক্তিজীবনের ভাললাগা মন্দলাগা সম্পূর্ণ অল্পপস্থিত। কিন্তু একালের কথা স্বতন্ত্র—ব্যক্তিজীবনের একান্ত উদঘাটন ও রচয়িতার উচ্চসামিধ্য সব শ্রেণীর সাহিত্যেই অল্পবিস্তর লক্ষ্য করা যায়। জীবনী, আত্মজীবনী, ডায়েরি, স্মৃতিচিত্র, চিঠিপত্র প্রভৃতি আত্মোদঘাটনের বহুতর মাধ্যম আধুনিক সাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ হয়েছে। ইউরোপ এ বিষয়ে অগ্রণী—দীর্ঘকালের অভ্যাসে ও অল্পশীলনে ইউরোপ চিঠিপত্রকেও অপেক্ষা সাহিত্যিক মর্যাদা ও কৌলীন্ত দিতে সক্ষম হয়েছে। যে কোন প্রকারের চিঠিপত্রই উচ্চতর সাহিত্যের অঙ্গীভূত হতে পারে না। পত্রলেখকের রচনারীতি, স্বস্থ রসবোধ ও অন্তরঙ্গ উপস্থিতি অতি তুচ্ছ ও সাধারণকেও অসামান্য ক'রে তোলে। শ্রেষ্ঠ পত্রসাহিত্যের মধ্যে যত্নকৃত শিল্প-প্রয়াস, কষ্টকল্পিত হাস্যরস, অথবা তথ্যভারাক্রান্ত দুর্বল চিন্তা প্রভৃতি বর্জিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যে চিঠি প্রয়োজনের কাছে দাসত্ব লিখে দেয়, তার ওপর কোন ক্রমেই উঠতে পারে না, তার কোন সাহিত্যিক মর্যাদাই নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিপত্রের খুব বেশী সাহিত্যিক মূল্য নেই। তাঁর রচনা-বিচারের উপাদান হিসেবে এর যথেষ্ট মূল্য থাকলেও, শুধু চিঠি হিসেবেই এর কোন উচ্চতর ব্রহ্মমূল্য নেই। অথচ মধুসূদনের প্রতিটি চিঠি তাঁর ব্যক্তিত্বের অপেক্ষা আলোকে উদ্ভাসিত। অনেকে হয়তো খুব বড় সাহিত্যিক নন, এমন কি হয়তো সাহিত্যিকই নন, অথচ তাঁদের চিঠিপত্র জগদ্বিশ্রাস্ত—এমন উদাহরণও পত্র-সাহিত্যের ইতিহাসে মিলবে।

দীর্ঘকালের অল্পশীলনের ফলে ইউরোপীয় সাহিত্যে

চিঠিপত্র একটি স্থান অধিকার করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই পত্র-সাহিত্য সাহিত্যিক কৌলীন্তের অধিকারী। এর অধিকাংশ চিঠিই অভিজ্ঞাভবংশীয় মহিলাদের রচিত। যে সমাজে তাঁরা চলাফেরা করতেন তার একটি অন্তরঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর পত্র-রচয়িতাদের মধ্যে মাদাম সেভেনী ও মাদাম ডার্বেলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে-যুগের প্রচুরতর অবকাশ ও জীবনযাত্রার মন্বরা পত্র-সাহিত্যের জন্য সম্ভবতঃ অধিক অল্পকূল ছিল। সম্ভবতঃ অপেক্ষা একটি উত্তরের প্রত্যাশাও পত্রলেখককে অধিকতর উৎসাহিত করেছে। কারণ, “Those were glorious days when leisure called for the goose-quill and therefore, epistles in the form of essay. Even a young man wasted two sheaves to get a guinea from an old aunt. Ideas required elaboration and style flourished in the process.” বৈচিত্র্য ও আয়তনে পত্র-সাহিত্যের সম্রাট ছিলেন ভল্টেয়ার—শ্লেষ বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও অননুগ্রহণীয় গল্পরীতিতে ভল্টেয়ারের পত্র-সাহিত্য সমৃদ্ধ।

পাঠ্যপুস্তকগন্ধী হয়েও কুপার ও চেস্টারটনের পত্রাবলীর কতকগুলি বিশেষ মূল্য সাহিত্যজগতে স্বীকৃত হয়েছে। কবি ও সাহিত্যিকদের অনেকেরই চিঠি তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে খুব কমই সাহিত্যিক মর্যাদা পেয়েছে। বায়রন, কীটস, লরেন্স, কাথারিন ম্যানসফিল্ড প্রভৃতি কয়েকজন কবি-সাহিত্যিকের রচনা উচ্চতর সাহিত্যিক মর্যাদা হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। প্রাক-রবীন্দ্রযুগের বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে সাহিত্যিকমর্যাদাসম্পন্ন চিঠি প্রায় দুর্লভ বললেই চলে। প্রায়-রবীন্দ্রযুগের শ্রেষ্ঠ পত্রসাহিত্য-রচয়িতা মধুসূদন—অবশ্য মধুসূদনের সব চিঠিই ইংরেজীতে লেখা। কিন্তু মানুষ মধুসূদন ও কবি মধুসূদনের এমন নিকটসামিধ্য মধুসূদনের অল্প কোন রচনায় পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িকদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ও প্রমথ চৌধুরীর পত্র-সাহিত্য উল্লেখযোগ্য। স্বামীজীর পত্রাবলীতে গল্পরীতির ইম্পাত-কঠিন বাধুনি ও বলিষ্ঠতা লক্ষণীয়—বীর সন্ন্যাসীর এক বীরদ্বীপ্ত ব্যক্তিত্বের প্রতিফলনে তাঁর পত্রাবলী বাংলা-সাহিত্যের এক উৎকৃষ্ট সম্পদরূপে পরিগণিত। প্রমথ

চৌধুরীর পত্রাবলীতে তাঁর স্বকবিত গল্পরীতি ও বুদ্ধিদীপ্ত আলাপচারণার বাহক। তথাপি রবীন্দ্রনাথের পত্র-সাহিত্য অতুলনীয়। বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যের দিক দিয়েও এর পরিধি কম নয়। সম্ভবতঃ প্রাচুর্যে তিনি পত্ররচয়িতাদের মধ্যে ভণ্টেয়ারের ঠিক নীচেই। কিন্তু ভণ্টেয়ারের স্ববিপুল পত্র-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সেই কল্পনাপ্রসারতা কোথায়? তাঁর অনেকগুলি চিঠি কবি-মানস ও কাব্যজীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ের অপরূপ ব্যাখ্যা—এই দিক দিয়ে কীটসের পত্রাবলীর মতই তাঁর পত্র-সাহিত্যের মূল্য। প্রত্যেকটি চিঠির মধ্যেই একটি অপরূপ স্বজনশীল মন আত্মপ্রকাশ করেছে। সামান্য ও অতিতুচ্ছ বিষয়কে অবলম্বন করে শিল্পীর রসিক-চিত্ত নানা ধোয়ালখুশির মালা গাঁথে চলেছে। পত্ররচনাতেও রবীন্দ্রনাথ স্বনিপুণ রূপদক্ষ।

২

‘যুরোপ-প্রবাসীর পত্র’ (১২৮৮) রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম পত্র-সংকলন গ্রন্থ। কবির পত্র-সাহিত্যের সর্বপ্রথম সংকলন হলেও নানা কারণে গ্রন্থটি মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের সাহিত্য আলোচনার পক্ষে এই সংকলনটি অপরিহার্য। ‘যুরোপ-প্রবাসীর পত্র’, ‘যুরোপ-যাত্রীর ডায়েরী’ ও ‘ছিন্নপত্রের’ কিয়দংশ মিলে ভিক্টোরীয় যুগের একটি চিত্র উদ্ঘাটিত হয়ে ওঠে। প্রাক-মহাযুদ্ধ উনিশশতকী ইউরোপ আজ একটি বিশ্বস্তপ্রায় কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। একটি তরুণ-মনের ভাললাগা-মন্দলাগার সঙ্গে জড়িয়ে আছে গ্লাডস্টোন-শাসিত ইংলণ্ডের একখানা ঘনিষ্ঠ ছবি। হয়তো ইউরোপীয় জীবন-প্রসঙ্গে কবির মস্তব্য আজ স্বার্থ ব’লে বিবেচিত হবে না, হয়তো অনেক জায়গায় দৃষ্টিভঙ্গীও আংশিকত-দোষদুষ্ট, অনেক জায়গায় আবার অথবা স্বাভাবিক বা বক্রোক্তিও যে না আছে এমন নয়; কিন্তু কবির এই প্রথম যুগের পত্রসংকলনটিতেও এক জাতীয় ঔদার্য চোখে-পড়ে—যা একজন সতেরো-আঠারো বছর বয়সের কিশোরের পক্ষে অস্বাভাবিক।

আর একটি কারণে এই গ্রন্থটি মূল্যবান। কথ্যভাষাকে কতদূর সহজ ও সাবলীল করে তোলা যায় তার প্রমাণ এই পত্রসংকলনটি—এখানে মনে রাখতে হবে যে প্রথম চৌধুরী-পরিচালিত ‘সবুজপত্র’ পত্রিকার কথ্যভাষার

আন্দোলন এর প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পরের ঘটনা। পরিচ্ছন্ন ও বাহ্যল্যবজ্জিত গল্পরীতির উদাহরণ হিসেবে এই পত্র-সংকলনটি সম্ভবতঃ বাংলা কথ্যরীতির পথিকৃত হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। পরবর্তী কালে কবির কথ্যভাষার গল্পরীতি যদিও অধিকতর শিল্পসমৃদ্ধ ও কারুশক্তি, তবুও এইখান থেকেই যে তার কাঠামোটি তৈরী হয়েছিল তা বেশ বোঝা যায়। কবি এ সম্পর্কে গ্রন্থের ভূমিকায় যা বলেছেন তা সর্বাংশে প্রণিধানযোগ্য—“যুরোপ প্রবাসীর পত্রশ্রেণী আগাগোড়া অরক্ষণীয় নয়। এর স্বপক্ষে একটা কথা আছে, সে হচ্ছে এর ভাষা। নিশ্চিত বলতে পারি নে, কিন্তু আমার বিশ্বাস বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষায় লেখা বই এই প্রথম।...আমার বিশ্বাস বাংলা চলতি ভাষায় সহজ প্রকাশপটুতার প্রমাণ এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে।”

‘ছিন্নপত্রের’ প্রথম প্রকাশকাল ১৩১২ সাল। ‘ছিন্নপত্রের’ রচনাকালের পরিধি দশ বছর বিস্তৃত—১৮৮৫-এর অক্টোবর থেকে ১৮৯৫-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত। ‘ছিন্নপত্র’ শুধু পত্র-সাহিত্যের দিক থেকেই নয়, রবীন্দ্রনাথের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ গল্প-গ্রন্থ হিসেবেও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ‘সাধনা’-‘ভারতী’র যুগের এই পত্রগুচ্ছ স্বাদ-বৈচিত্র্যে সহজ-সাবলীলতায় ও কবি-মানসের অপরূপ ব্যাখ্যায় রবীন্দ্র-রচনার একটি মধ্যমণি। কবি-জীবনের সে এক আশ্চর্য অধ্যায়—সৃষ্টির প্রাচুর্য প্রকাশের নূতন নূতন রীতিতে স্বাক্ষরিত—কবিতায়, সঙ্গীতে, ছোটগল্পে, চিঠিতে, প্রবন্ধে কবি তাঁর সৃষ্টিধারাকে বিচিহ্নিত করে তুলেছেন। ‘ছিন্নপত্রের’ সঙ্গে সমকালীন অন্যান্য রচনার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়।—দশ বছরের বিবিধ রচনার মহাভাষ্যকার ‘ছিন্নপত্রের’ রবীন্দ্রনাথ। ভাললাগা, মন্দলাগার ধোয়াল-খুশির আমেজ অনেকগুলি চিঠিতে একটি অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগুরুত্বকে উদ্ঘাটিত করেছে। তাই এখানেই বলা সম্ভব হয়েছে: “কৃত্রিম জীবনের জটিল গ্রন্থগুলি একে একে উন্মুক্ত হয়ে থাক, মুগ্ধ সংস্কারের এক-একটি বন্ধন কঠিন বেদনার দ্বারা একান্ত ছিন্ন হোক, নিবিড় নিভৃত অন্তরতম সাক্ষ্যের মধ্যে অন্তঃকরণের চিরসাক্ষ্য উদ্ভাপ একটি গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মুক্তিলাভ করুক এবং জগতের সঙ্গে সহজ সরল সঘন্যের মধ্যে অনায়াসে যেন বলতে পারি আমি ধন্ত।” ‘ছিন্নপত্রের’ কবি এই সহজ দৃষ্টির অধিকারী। তথ্যপ্রিয়তা ও তথ্যবিলাস অতিক্রম করে অপ্রয়োজনের আনন্দ প্রতি চিঠিতেই স্বতোঃসারিত।

‘ছিন্নপত্র’ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে অজিত চক্রবর্তী দুঃখ করেছেন যে, এই গ্রন্থে কবি তাঁর দৈনন্দিন জীবনের অনেক কথা কেটে-ছেটে বাদ দিয়েছেন। কথাটা অবশ্য অযথার্থ নয়, কিন্তু এ কথাও বলা যায় যে, এইটিই হ’ল পত্রচয়িতা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি। দৈনন্দিন জীবনের ডায়েরি রচনা করা অথবা ‘মাহুষ আকারে বন্ধ যে জন ঘরে’ তার গোটা অনার্ত্ত মূর্তি প্রকাশ করা পত্রচয়িতা রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য নয়। বাঘরনের চিঠিপত্রে যে-জাতীয় অসংযত আত্মোদ্ঘাটন আছে, রবীন্দ্রনাথের কোন পত্র-সাহিত্যেই তা নেই। এইখানেই পত্রচয়িতা রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্য সংযত ও সাবধানী মনের পরিচয়বাহী। কারণ তাঁর বেশীর ভাগ পত্রে যে ব্যক্তিগত বিষয়ের পরিচয় আছে তিনি শিল্পী ও রসিক। সুতরাং এখানে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনী অহুসন্ধান করা একপ্রকার ব্যর্থতা—কবি নিজেই বলেন—“কবিরে পাবে না তাঁহার জীবন-চরিতে”। কিন্তু ‘ছিন্নপত্র’-পাঠকের সে খেদ না থাকাই উচিত—কারণ কবি এখানে তাঁর শিল্পীজীবনের অনেকখানিই প্রকাশ করেছেন।

যে কালে ‘ছিন্নপত্র’ রচিত হয়, তখন কবির শিল্পবোধ এক বৃহত্তর সত্যের অভিমুখে চলেছে। জীবনের মধ্যে সত্যের এই গভীর অহুভব ‘ছিন্নপত্র’ের বিভিন্ন চিঠিতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।—এক মহাশিল্পীর পদসঙ্কার কবি তাঁর অন্তস্তলে অহুভব করেছেন—“আমার জীবনের অন্তস্তলে ক্রমশই যেন একটা নূতন সত্যের উন্মেষ হচ্ছে; কেবল তার আভাস পাই যে, আমার পক্ষে সে এক স্থায়ী নিত্য সখল, আমার সমস্ত জীবন-খনিজ-গলানো খাটি সোনাটুকু, আমার সমস্ত দুঃখকষ্টের ভূবের ভিতরকার অমৃত শস্যকণা; সেটাকে যদি কখনো পরিষ্কৃত ক’রে পাই তা হ’লে সে আমার টাকাকড়ি খ্যাতি প্রতিপত্তি সবচেয়ে বেশী হয়—যদি সম্পূর্ণ নাও পাই তবু সেই দিকে চিন্তের অনিবার্য স্বাভাবিক প্রবাহ, সেও একটা পরম লাভ।”—‘ছিন্নপত্র’ের শেষ দিকের চিঠিগুলিতে রবীন্দ্র-মানসের পট-পরিবর্তনের ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে—জীবনের এক প্রগাঢ় সত্যাহুভূতি কবিকে নূতন জীবন-জিজ্ঞাসার প্রাণ্ডীমায় অগ্রসর করিয়ে দিয়েছে। এই হিসেবে ‘ছিন্নপত্র’ রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ কবি-চরিত।

‘ছিন্নপত্র’ের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য কবির নিসর্গ-জিজ্ঞাসা। ‘ছিন্নপত্র’ের কবির সম্মুখে এক বিস্তৃত রূপলোক উদ্ঘাটিত। আনন্দ-ভরম কবি বলেছেন, “যদি বাসনা এবং সাধনা-অহুরূপ পরকাল থাকে তা হ’লে এবার আমি এই ওয়াড়-পরানো পৃথিবী থেকে বেরিয়ে গিয়ে যেন এক উদার উন্মুক্ত মৌলধের আনন্দলোকে গিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারি।”—‘ছিন্নপত্র’ের এক-একটি চিঠি যেন এক-একটি স্বভাবোক্তির কবিতা। ১৮৯৫-এর ১৬ই ডিসেম্বরের একটি চিঠিতে এক অপরূপ সন্ধ্যার বর্ণনা আছে: “কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী—আর তারই মাঝখানে একটি সন্ধ্যাহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা, মনে হয় যেন একটি সোনার চেলিপর্য বধু অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে; ধীরে ধীরে কত শত সহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্বত নগর বনের উপর দিয়ে যুগ-যুগান্তর কাল সমস্ত পৃথিবী মণ্ডলকে একাকিনী মাননেত্রে, মৌনমুখে, শাস্তপদে প্রদক্ষিণ ক’রে আসছে।”—বর্ণনাটির মধ্যে সন্ধ্যার সমস্ত ক্লাস্তি ও কবিস্বপ্নের নির্জন একাকিত্ব একটি স্বপ্নমুগ্ধ রূপলোকের সৃষ্টি করেছে। অবশ্য এই জাতীয় চিঠি কবির মনের এক-একটি “মুভ”-কে আশ্রয় ক’রেই উদ্ভাসিত—সেইজন্যই সম্ভবতঃ গীতিকবিতারও জন্মক্ষণগুলির সঙ্গে এই পত্রাংশগুলি নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। ‘ছিন্নপত্র’ের নিসর্গাহুভূতির আর একটি প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই রীতিকে বলা যেতে পারে চিত্ররীতি—এখানে পূর্ণ চিত্রাঙ্কন ও রেখাচিত্রণ—এই দুটি প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায়। ‘ছিন্নপত্র’ের কেন্দ্রীয় আকর্ষণ পদ্মা ও পদ্মালালিত জনপদ-জীবনের চিত্র। ‘সোনার তরী’ ও ‘চিত্রা’র অনেকগুলি প্রকৃতিকবিতার বথার্থ টীকাকার কবির এই সমস্ত চিঠি। ‘গল্পগুচ্ছে’র অনেকগুলি গল্পের পটভূমিকাও এখানে উন্মোচিত হয়েছে।

রবীন্দ্রপত্র-সাহিত্যের ইতিহাসে ‘ছিন্নপত্র’ই সর্বপ্রথম অন্তর্গত ও স্বত্বচারী একটি মুদ্রণ দ্বারা পড়েছে।—বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে এই একান্ত সামান্য ব্যতীত সেই মনটি হয়তো ধরা পড়ত না। কবি নিজেই বলেছেন: “এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে সেই আমার একটি মানসিক ঘরকন্নার সম্পর্ক। জীবনের যে গভীরতম অংশ সর্বদা-মৌন এবং সর্বদা-গুপ্ত, সেই অংশটি আস্তে আস্তে বের

হয়ে এসে এখানকার অনাবৃত সন্ধ্যা এবং অনাবৃত মধ্যাহ্নের মধ্যে নীরবে এবং নির্ভয়ে সঞ্চরণ ক'রে বেড়িয়েছে।—এইসব নির্জন মুহূর্তে কবির অন্তরঙ্গ সঙ্গী জুটেছে এমিয়েলের জার্নাল—কবির স্বীকৃতি : “এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু খুব অল্প ছাপার বইয়ে পেয়েছি।”—‘ছিন্নপত্র’র চিঠিগুলিও অনেকটা জার্নালধর্মী। মৃত প্রকৃতি, নীলা-কাশের অসীম বিস্তৃতি ও আত্মমুগ্ধ ভাললাগার আবেশে গঁথে তোলা কয়েকটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। ‘ছিন্নপত্র’ তাই দোসরহীন অনন্ত!

৩

‘ছিন্নপত্র’ মোটামুটিভাবে “সিরিয়াস” এবং লিরিকের স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অখণ্ড রূপ। কবি যে কত লঘু হাস্য ও ঘরোয়া হতে পারতেন তার প্রেষ্ঠ প্রমাণ ‘ভাহুসিংহের পত্রাবলী’।—এই পত্রগুলি কবির পরিণত বয়সের রচনা—‘মহা’ ‘বনবাণী’ ‘তপতী’ ‘শেষের কবিতা’ রচনার প্রায় সমসাময়িক। গৃহরীতিও একটি অপূর্ব পরিণতি লাভ করেছে—কবির খেয়াল-খুশি মত গৃহরীতির যদুচ্চ-ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। [“ভাহুসিংহ” নামটি কবি তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে মাত্র দুবার ব্যবহার করেছেন—একবার এই পত্রাবলী রচনার সময়, আর একবার প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে ‘ভাহুসিংহের পত্রাবলী’ রচনায়। কিন্তু এই ছদ্মনামটি ব্যবহার করার কারণ সম্ভবতঃ দুটি ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। পঞ্চাশ বছর আগে প্রাচীন রীতিতে কাব্যরচনার ছলে কবি পুরাতন-গদ্যী এই নামটির অন্তরালে আত্মপোষন করতে চেয়েছিলেন—সেদিন এর পেছনে অনেকখানিই ছিল কোতূহল। কিন্তু প্রৌঢ় কবির কাছে আবার পঞ্চাশ বছর পরে এই নামটি গ্রহণের তাৎপর্য আর কোতূহল নয়, —এবার নিছক কোতূহলবশেই কবি তাঁর কিশোর বয়সের নামটিকে গ্রহণ করেছেন। যার কাছে কবি এই সব চিঠি লিখেছেন সে-ও যে বালিকা, তাই সম্ভবতঃ কবিকে কিশোর বয়সের প্রিয়নামটিকেই স্মরণ করতে হয়েছে।]

এই পর্যায়ের চিঠিগুলির প্রসঙ্গে কবি প্রায় দশ বছর পরে যে মন্তব্য করেছেন তা অত্যন্ত প্রাধান্যযোগ্য : “...চিঠির বেশীর ভাগ লেখা শান্তিনিকেতন থেকে। তাই সেগুলির মধ্য দিয়ে স্বতই বয়ে চলেছে শান্তিনিকেতনের

জীবনযাত্রার চলচ্ছবি। এগুলিতে মোটা সংবাদ বিশেষ কিছু নেই, হাসি-তামাশায় মিশিয়ে আছে সেখানকার আবহাওয়া, জড়িয়ে আছে সাংসারিক ব্যাপারে আনাড়ি মেয়েটির ছেলেমানুষির আভাস, আর তার সঙ্গে লেখকের সর্কোতুক স্নেহ। বিশেষ কিছু বলতে হবে না মনে ক'রে হালকা মনে আটপোরে রীতিতে যা বলা যেতে পারে তাকে কোন শানবঁধানো পাকা সাহিত্যিক রাস্তায় প্রকাশ করবার উপায় নেই।—এইখানেই ‘ভাহুসিংহের পত্রাবলী’র সঙ্গে ‘ছিন্নপত্র’র প্রভেদ।—‘ভাহুসিংহের পত্রাবলী’ একটি চমকপ্রদ পত্রসংকলন—শানবঁধানো পাকা সাহিত্যিক রাস্তা বর্জিত হ'লেও শিশুমনের গহনে প্রৌঢ় কবির সাবলীল-প্রবেশ অত্যন্ত সহজ ও অন্তরঙ্গ। শিশুমনের গহনে প্রবেশাধিকারের সহজ মন্ত্রটি কবির আয়ত্ত। ‘শিশু’, ‘শিশু ভোলানাথ’, ‘ছেলেবেলা’—প্রভৃতি গ্রন্থের সঙ্গে এই গ্রন্থটি মিলিয়ে পড়লেই এর সহজ মাধুর্যটুকু উপলব্ধি করা যাবে। চিঠিগুলিতে এক সর্কোতুক স্নেহের আলো ঝলসে উঠেছে। কথ্যভাষা অতি সরল আলাপচারণায় বিস্তৃত—শিশুর সঙ্গে বাক্যালাপ করতে গিয়ে কবি যেন ক্ষণিকের জ্ঞান তাঁর হারানো শৈশব খুঁজে পেয়েছেন। কোতূহল-পরিহাসে কবি যে কতখানি কাছের মানুষ তার প্রমাণ সংকলনটির পাতায় পাতায় : “আজ তোমার চিঠি পেতে দেবী হ'ল দেখে ভাবলুম হয়তো অমৃতসর কংগ্রেসে তোমাকে ডেলিগেট করেছে কিংবা হাওয়া জাহাজে কাপ্তেন রসের সঙ্গে তুমি অষ্ট্রেলিয়ায় পাড়ি দিয়েছ। কিংবা হিমালয়ের পর্বতশৃঙ্গে কোনো পণ্ডহারী বাবার শিষ্য হয়ে মাটির নীচে ব'সে একমনে নিজের নাকের ডগা নিরীক্ষণ করচ কিংবা লয়েড জর্জের প্রাইভেট সেক্রেটারীর সর্দি হয়েছে খবর পেয়েই তুমি সেই পদের জ্ঞান দরখাস্ত করতে ইংলণ্ডে চলে গিয়েছ।”—পত্রাংশটুকুতে যে প্রবল হাস্যবেগ অনিবার্য হয়ে উঠেছে, তার মধ্য থেকেই কবির খেয়াল-খুশি ও মেজাজ অতি সহজেই উদ্ঘাটিত হয়েছে।

‘ভাহুসিংহের পত্রাবলী’তে যে বালিকাটির কাছে চিঠি লেখা হয়েছে তাকেও তার বয়সের তুলনায় অসাধারণ বলতে হবে। তার কারণ কবির অনেকগুলি রচনা সম্পর্কে সে কতকগুলি মন্তব্য করেছে—মন্তব্যগুলি আবার কতকগুলি সংশোধনী প্রস্তাব! কবিও এই বালিকার প্রত্যেকটি

সমালোচনা-প্রসঙ্গে যতদূর সম্ভব উত্তর দিয়ে চলেছেন—
সহজভাষায় কবির এই উত্তরগুলি যেমন মন্থন, তেমনি
মুকুতার—কবি অদ্ভুতভাবে ছেলেভোলানোর খেলা
খেলেছেন :—“কবিশেষের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ।
রাজকন্টার সঙ্গে নিশ্চয়ই তার বিয়ে হ'ত, কিন্তু তার পূর্বেই
সে মরে গিয়েছিল। মরাটা তার অত্যন্ত ভুল হয়েছিল,
কিন্তু সে আর এখন শোধরাবার উপায় নেই। যে খরচে
রাজা তার বিয়ে দিত সেই খরচে খুব ধুম ক'রে তার
অন্ত্যেষ্টি সংকার হয়েছিল। ক্ষুধিত পাষণে ইরাণী বাদির
কথা জানবার জন্য আমারও খুব ইচ্ছে আছে কিন্তু যে
লোকটা বলতে পারত আজ পর্যন্ত তার ঠিকানা পাওয়া
গেল না।”—গল্পের সমাধানটুকু শোনার জন্য শিশুর চির-
আকাঙ্ক্ষা—গল্পের সম্পূর্ণ উপসংহার সে ভুলবেই। তার
হাত এড়াতে এমন সব উত্তর ফাঁদতে হবে, যার পরে সে
আর কিছু প্রশ্ন করতে না পারে। রবীন্দ্রনাথ স্বকৌশলে
এই সব সম্ভব অসম্ভব নানা কথার অবতারণা করেছেন—
শিশুর সঙ্গে কবিও খুলীমনে ব'কেই চলেছেন—অথচ কী
অপরূপ সেই বকুনি! বালিকার সঙ্গে কথার লুকোচুরি
খেলেতে ব'সে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে কবিও তাঁর বালক
বয়স ফিরে পেয়েছেন যেন।

‘ভাহুসিংহের পত্রাবলী’র কোতুক-পরিহাসের স্বর
ছাপিয়ে মাঝে মাঝে কবির ভাললাগার আবিষ্ট মন
আত্মপ্রকাশ করে—এই সব চিঠি ‘ছিন্নপত্র’র স্বরের সঙ্গে
মেলানো। ‘ভাহুসিংহের পত্রাবলী’তে কবি যখন তাঁর
মনের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছেন তখনই তার
প্রকাশ যথার্থ নিরীক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেখানেও
‘ছিন্নপত্র’র তুলনায় এর প্রকাশরীতি অনেকখানি বাহুল্য-
বর্জিত। আপন মনের নিগূঢ় রস-সঞ্চারে ‘ছিন্নপত্র’র
গতরীতি ভাব-গন্তীর ও রস-মন্ডর, কিন্তু ‘ভাহুসিংহের
পত্রাবলী’র গতরীতিতে সদা-জাগ্রত চলতামিহিতা একটি বড়
বৈশিষ্ট্য—এই রীতি যেন বৈশীক্ষণ আবিষ্ট থাকতে দেয় না।

মনে হয় ভাবুক ভাহুদাদাটি নিজের স্বপ্নমোহে আচ্ছন্ন হয়ে
বৈশীক্ষণ ব'সে থাকতে পারেন না, কিশোরী নাতনীটি সম্ভব-
অসম্ভব নানা বকুনিতে তাঁর তপোভঙ্গ করে। তথাপি
এখানে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে কবির স্বপ্রাণিষ্ট মন ভাললাগার
মধ্যে তন্ময় :—“নদী আমি বড় ভালবাসি ; আর ভালবাসি

আকাশ। নদীতে আকাশে চমৎকার মিলন, বড়ে বড়ে
আলোয় ছায়ায়,—ঠিক যেন আকাশের প্রতিধ্বনির মতো।
আকাশ পৃথিবীতে আর কোথাও আপনার সাড়া পায় না
এই জলের উপর ছাড়া।”—‘ভাহুসিংহের পত্রাবলী’কে
একজন সমালোচক “মসলিনের” সঙ্গে তুলনা করেছেন : “A
shot muslin again, if that were possible, for
colours chase each other with every change
in the lightfall. No, these letters are not
trifles. They are only the god's play at the
foot of Olympus on beds of asphodel.”

সম্প্রতি-প্রকাশিত দৌহিত্রী নন্দিতা দেবী ও পৌত্রী
নন্দিনী দেবীর নিকট লিখিত পত্রাবলীর সঙ্গে ‘ভাহুসিংহের
পত্রাবলী’র একটি নিকট সম্পর্ক আছে। সর্বোত্তম স্নেহ
উভয়ই লক্ষণীয়। কিন্তু দৌহিত্রী এবং পৌত্রীর নিকট
লিখিত পত্রাবলীতে (চিঠিপত্র, চতুর্থ খণ্ড) ঘরোয়া স্বরটি
আরো বেশী চোখে পড়েছে—আত্মীয়-স্বজন-পরিজন প্রসঙ্গও
বাদ পড়ে নি। অত্যন্ত কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথকে এই
শ্রেণীর চিঠির মধ্যে পাওয়া যায়। নন্দিতা দেবীকে লিখিত
চিঠির সম্বোধনগুলি পর্যন্ত কোতুকরসপূর্ণ—কবির
মেজাজ এখানে একবারেই হাল্কা। রবীন্দ্রনাথের বহু
স্মরণীয় পরিহাস এই পত্রগুলে সঙ্কলিত হয়েছে।
শান্তিনিকেতন থেকে লেখা একখানা চিঠি কবি উপসংহার
করেছেন বিচিত্র ভঙ্গীতে : “শীত রীতিমত জমেচে।
পিঠের উপর মোটা কাপড়ের বোকা বেড়ে উঠেচে।
খোবার গাধার যে কি দুঃখ তা স্পষ্ট বোকা
যাচ্ছে।” নন্দিতা দেবীর ম্যাট্রিক পাসের খবর পেয়ে
কবি যে চিঠি লিখেছেন তা আগাগোড়া কোতুকরসে পূর্ণ :
“গতকল্য অপরাহ্নে চারু ভট্টাচার্যের কাছ থেকে একটা
চিরকুট এসে পৌছল তাতে দেখা গেল নন্দিতা নামে এক
মহিলা ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাস করে তার
মাতামহের লোকবিখ্যাত পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে।
তোমার সেই পরীক্ষা-খেলার কর্ণপ্লার মূত্রিতচক্ষু মাষ্টার
মহাশয়ের জয়জয়কার। আমি লজ্জায় পড়ে গেছি—
মনে করেছি তার শরণাগত হব, অসম্ভব ম্যাট্রিকটাও
কোন মতে যদি তরে যেতে পারি।” নন্দিনীর কাছে
লেখা চিঠিতে কবি আরও ছেলেমানুষ—কারণ থাকে উদ্দেশ
ক'রে লেখা সে যে নেহাত শিশু—তাই কোন রকম বয়স

বুদ্ধির কথা এখানে একেবারেই নেই : “আজকাল রোজ রোজ খুব লোকজন আসতে আরম্ভ করেছে। ..পালাতে যদি পারতুম তো খুশী হতুম। তোমার পুতুলের বাসুর মধ্যে আমাকে লুকিয়ে রাখলে না কেন? তোমাদের ওখানে যে রকম ঠাণ্ডা তাতে বোধ হয় তোমার পুতুলের সর্দি কাশি আরম্ভ হয়েছে—তাই এই কুমালটা পাঠিয়ে দিলুম।”—ঘরোয়া রীতির দিক থেকে দোহিঙ্গী ও পৌজীর কাছে লেখা চিঠি অত্যন্ত উপভোগ্য।

৪

রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক চিঠিপত্র এ পর্যন্ত তিনটি সংকলনে প্রকাশ করা হয়েছে। এই তিন খণ্ডে (চিঠিপত্র প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড) সম্ভবতঃ পারিবারিক বা ঘরোয়া রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশী ধরা দিয়েছেন। চিঠিপত্র, প্রথম খণ্ড পত্নীকে লিখিত কবির ছত্রিশখানি চিঠির সংকলন। এই চিঠিগুলির আশ্বাদন স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক ও গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র তাঁর স্বদীর্ঘ সাহিত্য-জীবনের মধ্যেও অভ্যন্তরীণ দুর্লভ। ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গী পরিমিত অতিক্রম ক’রে রবীন্দ্রনাথিত্যে দেশ-কালের অতীত একটি সর্বজনীন আবেদন আছে—সে ক্ষেত্রে কবির গার্হস্থ্যজীবন ও পারিবারিক বন্ধনেরও যে একটি স্বতন্ত্র রূপ আছে তা এই চিঠিগুলি প্রকাশের পূর্বে লোকচক্ষুর অগোচরেই ছিল। এই পত্রগুলো স্বামী ও পিতা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের ঘরোয়া রূপ ফুটে আছে। ইউরোপের বিভিন্ন মনীষীর আত্মজীবনী ও পত্রসাহিত্যে জীপুত্র-পরিজনপরিবেষ্টিত মূর্তি পাওয়া যায়—অনেক সময় সমালোচকেরা এই সব উপাদান থেকে তাঁদের অন্তর্জীবনও আলোচনা করেছেন। জীবর কাছে লিখিত রবীন্দ্রনাথের এই ছত্রিশটি চিঠির ছ-একটি ছাড়া কবির সাহিত্যালোচনার উপাদান হিসেবে তা খুব উপযোগী নয় সত্য, কিন্তু মানুষ রবীন্দ্রনাথকে ধরার সবচেয়ে বড় উপাদান এই চিঠিগুলিতে ছড়িয়ে আছে। চিঠিগুলির কালবিস্তার প্রায় এগারো বারো বছর (১৮৯০-১৯০১), অর্থাৎ বিবাহিত জীবনের প্রথম ছ-সাত বছর বাদ দিয়ে মোটামুটি জীবনযোগের পূর্ব পর্যন্ত চিঠিগুলির সংকলন। এর সঙ্গে এই সময়ে লিখিত জীবর চিঠিগুলিও যদি থাকত তা হ’লে রবীন্দ্র-জীবনী রচনার পক্ষে একটি মূল্যবান উপাদান হ’ত।

হাসি-পরিহাস, পুত্রকন্টার প্রতি স্নেহ উদ্বেগ, স্ত্রীকে নানা উপদেশ দেওয়া, নিজেকে ভবিষ্যৎ ও পুত্রকন্টার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা, নব-বিবাহিতা কন্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞ মন্তব্য—কোন কোন চিঠি বেশ হাল্কা স্বরের, আবার কোনটি একটু গুরুগম্ভীর ভাবের, পরিবারাশ্রয়ী একটি মানুষের হৃদয়বৃত্তির কত বিচিত্র স্পন্দন! একটি স্থল—পরিহাসের উল্লেখ প্রথম চিঠিতেই দেখা যায় : “যেমুনি গাল দিয়েছি অমুনি চিঠির উত্তর এসে উপস্থিত। ভাল-মানুষির কাল নয়। কাকুতিমিনতি করলেই অমুনি নিজ মূর্তি ধারণ করেন আর ছোটো গালমন্দ দিলেই একেবারে জ্বল। একেই তো বলে বাঙ্গাল!”—পিতা রবীন্দ্রনাথের স্নেহদুর্লব মন কয়েকটি চিঠিতে ধরা পড়েছে : “বেলি খোকার জন্তে এক একবার মনটা ভারি অস্থির হয়। বেলিকে আমার নাম করে ছোটো ‘অড’ খেতে দিয়ে। আমি না থাকলে সে বেচারী তো নানারকম জিনিস খেতে পায় না। খোকারও কোনরকম করে মনে করিয়ে দিয়ে।” বাংলাদেশের উত্তরপুরুষ ঋষিকবির নিস্পৃহ শিল্পচরণের বিশ্বকর অভিব্যক্তি দেখতেই অভ্যস্ত—কিন্তু বাংলাদেশের আরো পাঁচজন ছা-পোষা গৃহীর মত কবিরও যে স্নেহদুর্লব মন ছিল তা বুঝতেও আজ অসম্ভব হয়।

জীবর কাছে লেখা এই চিঠিগুলিতে প্রথম যৌবনের মোহমদ্রিতা অথবা অকারণ বিহ্বলতা একেবারে নেই বললেই চলে। একটি পরিপূর্ণ সংসার, পরিভূষ মন নানাপ্রকার অভিজ্ঞতায় অগ্রমস্ত। এই সমস্ত চিঠিতে ‘মহুয়া’র বলিষ্ঠ প্রেমের পূর্বাভাস পাওয়া যায় যেন। ১৮৯৮-এ লেখা একখানা চিঠিতে কবি বলছেন : “স্ত্রী-পুরুষের অল্পবয়সের প্রণয়মোহে একটা উচ্ছ্বসিত মস্ততা আছে কিন্তু এ বোধ হয় তুমি তোমার নিজের জীবন থেকেও অনুভব করতে পারচ—বেশি বয়সেই বিচিত্র বৃহৎ সংসারের তরঙ্গ দোলার মধ্যেই জীপুরুষের ষথার্থ স্থায়ী গভীর সংঘত নিঃশব্দ শ্রীতির লীলা আরম্ভ হয়, নিজের সংসারবৃত্তির সঙ্গে বাইরের জগৎ ক্রমেই বেশি বাইরে চলে যায়—সেই জন্তেই সংসারবৃত্তি হ’লে এক হিসেবে সংসারের নির্জনতা বেড়ে ওঠে এবং ঘনিষ্ঠতার বন্ধনগুলি চারদিক থেকে দুজনকে জড়িয়ে আনে।”—এই চিঠিখানি সংকলনটির শ্রেষ্ঠ চিঠি। নরনারীর প্রেমজীবনের যে পরিণত মস্তব্য

করা হয়েছে তা রবীন্দ্রনাথের বহু রচনায় প্রতিকলিত হয়েছে, ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতাই কবির শিল্প-জীবনকে মহিমাযিত করেছে। সাংসারিক জীবন সম্পর্কে টুকিটাকি নানা কথা, ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পিতার দায়িত্ব প্রভৃতি অল্প কথায় কয়েকটি স্মরণীয় চিঠিতে গাঁথা আছে। কয়েকটি চিঠিতে স্বস্থ, পরিতৃপ্ত পারিবারিক জীবনের ভবিষ্যৎ-কামনার কথাও আছে। কবির জীবন-বিধাতা কবির এই ছোট কামনাটুকু অল্পদিনের মধ্যেই ভঙ্গীভূত করলেন— সম্ভবতঃ বৃহত্তর পরিবার কবির প্রতীক্ষায় ছিল।

চিঠিপত্রে (চতুর্থ খণ্ড) জ্যোতী কন্ঠা মাদুরীলতা দেবী ও কনিষ্ঠা কন্ঠা মীরা দেবীকে লেখা চিঠিগুলি সঙ্কলিত হয়েছে। সন্তানের অস্থিতার সংবাদে শব্দাতুর পিতৃহৃদয়ের পরিচয় অনেক চিঠিতে ফুটে উঠেছে—এমন কি কবির বিচিত্র হোমিওপ্যাথিচর্চার খবরও অজানা থাকে না। তা ছাড়া আত্মীয়-পরিজনদের খুঁটিনাটি খবরে এই সব চিঠি পূর্ণ। ভাষার আতিশয্যহীন পরিচ্ছন্নতা লক্ষণীয়। পারিবারিক জীবন ও প্রত্যাহের খবরাখবরের মাঝখান থেকে মাঝে মাঝে কবি তাঁর জীবনসত্যকে দেখতে পাচ্ছেন। ইউরোপের কর্মবহুল বেগবান জীবনস্রোত কবিকে নতুন উপলব্ধির সন্নিপত্তী করেছে: “দেশের গণ্ডী আমার ঘূচে গেছে—সকল দেশকেই আমার হৃদয়ের মধ্যে এক দেশ করে তুলে তবে আমি ছুটি পাব। আমার নামের সঙ্গে আমার কাজের যোগ আছে। পূর্বদিগন্তে আমার প্রথম জীবনযাত্রা আরম্ভ হয়েছে পশ্চিম দিগন্তেই আমার জীবন-যাত্রার অবসান হবে।... আমাকে যিনি কাজে লাগাবার জন্য এতদিন ধরে নানা স্বপ্নে ছুঁতে গ’ড়ে তুলেছেন তিনিই আমাকে নিজে চালনা করে কাজে বাটাবেন। আমার দেশের কাজ নয়—তাঁর জগতের কাজ।” সমসাময়িক ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণের নানা তথ্য মীরা দেবীকে লেখা চিঠিতে পাওয়া যায়। আবার বিশ্বযাত্রার অন্তরালে কবির পারিবারিক দায়িত্ব যে চাপা পড়ে নি তাও বেশ বোঝা যায়। জীবনে স্বজন-বিয়োগের বেদনা পেয়েছেন— কিন্তু সেই বেদনাকে বিশেষ রসে পরিণত করার অপূর্ণ ক্ষমতা ছিল কবির। দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুর পরে কবি মীরা দেবীকে যে চিঠি লিখেছেন তা রবীন্দ্র-সাহিত্যের এক বিশেষ দিগদর্শন: “শমী যে রাজে গেল

তার পরের রাজে বেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোত্স্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়েচে তার লক্ষণ নেই।... সাহস যেন থাকে, অবসাদ যেন না আসে, কোনোখানে কোনো স্মৃতি যেন ছিন্ন হয়ে না যায়—যা ঘটেচে তাকে যেন সহজে স্বীকার করি, যা কিছু রয়ে গেল তাকেও যেন সম্পূর্ণ সহজ মনে স্বীকার করতে দ্রুত না ঘটে।” রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই উপলব্ধির স্বাক্ষর নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

চিঠিপত্র (পঞ্চম খণ্ড) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতির্জ্ঞ-নাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর কাছে লিখিত চিঠিগুলির সংকলন। কয়েকখানি চিঠি বাদ দিলে প্রায় সব চিঠিই শেষোক্ত দুজনকে লেখা। পারিবারিক চিঠির কিছু স্বাদ থাকলেও এই চিঠি দ্বী বা কন্ঠাদের কাছে লেখা চিঠি থেকে যেন ভিন্নরূপের। কারণ চৌধুরী-দম্পতির কাছে লেখা চিঠিতে হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির ঘনিষ্ঠ সমন্বয় আছে—এর ফলে কবি এখানে পারিবারিক পরিমিতিকে অনেক পরিমাণেই কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন। ইন্দিরা দেবীর চিঠিতে কবির বিবিধ রচনা সম্পর্কে মন্তব্য আছে। বিশেষ করে রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যাবে। রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনার পক্ষে প্রমথ চৌধুরীর কাছে লেখা কবির চিঠিগুলির মূল্য আরও বেশী। বাংলা দেশের এই অসাধারণ দম্পতিটি শুধু পারিবারিক স্নেহেই নয়, চিন্তাজগতের দিক থেকেও কবির যে কতখানি সম-প্রাণ ছিলেন, চিঠিগুলি পড়লেই তা বোঝা যাবে। কারণ এঁদের দুজনেরই রচনা ও রসিকতার ওপর ছিল কবির অসাধারণ শ্রদ্ধা। প্রমথ চৌধুরীর কাছে লেখা প্রথম যুগের কয়েকটি চিঠিতে ‘ছবি ও গান’, ‘কড়ি ও কোমল’ এবং ‘মানসী’ পর্বের কবির মানস-জীবনের অপরূপ উদঘাটন আছে। একখানি চিঠিতে কবি বলেছেন: “আমি সত্যি সত্যি বুঝতে পারি নে আমার মনে স্বপ্নরূপে বিরহমিলনপূর্ণ ভালবাসা প্রবল, না, দৌন্দবের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল। আমার বোধ হয় দৌন্দবের আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিক জাতীয়, উদাসীন গৃহত্যাগী; নিরাকারের অভিযুক্ত। আর ভালবাসাটা লৌকিক আকারে— সাকারে জড়িত। একটা Shelleyর ‘Skylark’ আর একটা হচ্ছে Wordsworth-এর ‘Skylark’। একজন

অনন্ত হৃদা পান করচে, আর একজন অনন্ত হৃদা দান করচে।” এই পত্রাংশটিতে রবীন্দ্রপ্রতিভার মূল সত্য নিহিত আছে। ‘সবুজপত্রের’ যুগ রবীন্দ্র-জীবনের পক্ষে একটি মূল্যবান অধ্যায়—এই অধ্যায়ের কবি-মানস ও ‘সবুজপত্রের’ বহু দরকারী জ্ঞাতব্য তথ্য চিঠিগুলিতে মিলবে। প্রথম চৌধুরীর একাধিক রচনা সম্পর্কে কবির সংক্ষিপ্ত অথচ বিদগ্ধ মন্তব্য চিঠিগুলির অন্তর্গত। ঐশ্বর্য। অনতি-অতীত অথচ আধুনিক ইতিহাসের দুই শ্রেষ্ঠ মনের অপরিমিত ঐশ্বর্যে চিঠিগুলি সমৃদ্ধ।

৫

রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব ভ্রমণকাহিনীই পত্রাকারে রচিত। স্বতরাং ভ্রমণকাহিনীগুলিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পত্র-সাহিত্যের পর্যায়েই পড়ে। কিন্তু এই পর্যায়ের চিঠিগুলি পত্র-সাহিত্য অপেক্ষা যেন ভায়েরিরই অনেকটা কাছাকাছি। ব্যক্তিগত স্বরও এই শ্রেণীর পত্রসাহিত্যে অত্যন্ত কম। বিদেশী জীবন, তার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য কবি অপূর্বভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন, অথচ অতিরিক্ত তথ্যভারাক্রান্ত ক’রেও তোলেন নি। জীবন-রসিক শিল্পী সমস্তই গ্রহণ করেছেন, কিন্তু নিজের “ভারকরসে” তাকে রসায়িত ক’রে তুলেছেন। ইউরোপ, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, জাপান, পারস্য, রাশিয়া—প্রভৃতি দেশের প্রচুর জ্ঞাতব্য তথ্যও আছে, শিল্প-সংস্কৃতি ও জীবন-সমালোচনাও রয়েছে বিস্তর,—কিন্তু এ দেখা যে সম্পূর্ণ রসদৃষ্টি এ কথা আরও সত্য। ‘পথে ও পথের প্রান্তে’ পত্র-সঙ্কলনটি ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে কবি যখন ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন তখনকার পথ ও পথের প্রান্তের চলচ্ছবি—চিঠিগুলি শ্রীযুক্ত রাণী মহলানবিশকে লেখা। এই সংকলনটিতে চলতি পথের বর্ণনা থাকলেও “কিছুকাল ধ’রে নতুন নতুন অভিজ্ঞতাত্ম ক্ষেত্রে নিরন্তর যে তর্কবিতর্ক আলোচনা চলছিল তারই বাক্যলাপের বেগ এই চিঠিগুলির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু যুরোপ ভ্রমণের বৃত্তান্ত যা কোথাও প্রকাশ পেল না তার দাম খুব বেশী।”—রবীন্দ্রনাথের পত্রাকারে বিধৃত ভ্রমণ-বৃত্তান্তটি পড়লে ইংরেজ সমালোচকের আপ্তবাক্যটি খুবই মূল্যবান বলে বোধ হবে—“Ultimately it is pro-

bably true that a first-rate travel-book depends comparatively little upon strangeness or remoteness of the locality, and much upon the character and vision of the traveller.”

‘পথে ও পথের প্রান্তে’ সঙ্কলনটি ঠিক কোনও বিশেষ দেশভ্রমণের বৃত্তান্ত নয়। চলমান জীবনের যে সমস্ত চলতি ছবি, পথভ্রমণের ক্ষীণত রেখাটুকু অথবা অর্থগূঢ় চলতি ভাব পত্রগুচ্ছতে ফুটে উঠেছে তার টুকরো রেখাচিত্রণ অবিস্মরণীয়। কবি একথানা চিঠিতে লিখেছেন: “আমি প্রায় প্রত্যেক চিঠিতেই আমার এই চেয়ে-দেখার বিবরণটা লিখি। পৃথিবী কিছুতেই আমার কাছে পুরানো হ’ল না—ওর সঙ্গে আমার মোকাবিলা চলেছে এইটেই আমার সব খবরের চেয়ে বড় খবর।”—রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণবৃত্তান্তমূলক পত্র-সঙ্কলনগুলির সব চেয়ে বড় কথা হ’ল এইটি। আত্মোপলব্ধি ও আত্মজিজ্ঞাসার স্বর সর্বত্র ছড়ানো আছে—এই সময়ের কাব্যগ্রন্থগুলির সঙ্গে চিঠিগুলি মিলিয়ে পড়লেই কবির বিশেষ অভিপ্রায়টি বোঝা যাবে। সন্তোষকুমারের মৃত্যুভাবনার দ্বারা রঞ্জিত তিন-চারটি চিঠি মৃত্যু-রহস্য ও জীবন-জিজ্ঞাসার আন্দোলনে স্পন্দিত। সর্বত্রই একটি গভীরাত্মীয় মন চিন্তার গ্রন্থিমোচন ক’রে চলেছে। প্রাচীন ঐজিপ্টের ভূগর্ভ-উদ্ধৃত স্থাপত্য-কীর্তি, কায়রোর হোটেল, ম্যাক্সিম, আরবী সাহিত্য, সহযাত্রী জার্মান নৃত্যবিদ,—প্রভৃতির টুকরো কথার মধ্যে কবির মন্তব্যগুলি গভীরপ্রসারী। ভ্রাম্যমাণ কবি চলার ফাঁকে ফাঁকে জগৎ ও জীবনের যে সত্য উদ্ঘাটিত করেছেন তা বিস্ময়কর। অনেকগুলি চিঠি পত্র-সাহিত্যের এলাকা পার হয়ে ডায়েরির সীমায় এসে পড়েছে—এই সব চিঠি যেন কাউকে লেখা হয় নি, আপন হৃদয়ের গোপন নিষ্পিকার স্বগতোক্তিসমূহকে যেন ভাষা দিয়েছেন। প্রায় সমস্ত বছরের সীমারেখায় এসে কবির আত্মোপলব্ধি স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তিনি শুধু শিল্পী নন, জীবনশিল্পী। কবি বলেছেন, “আমার বীণার অনেক বেশী তার, সব তারে নিখুঁত স্বর যেলালো বড় কঠিন। আমার জীবনের সব চেয়ে কঠিন সমস্যা আমার কবিপ্রকৃতি। হৃদয়ের সব অহুত্বিত্ব দাবীই আমাকে মানতে হ’ল—কোনটাকে (৪১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

তিনজনের ছোট্ট সংসারে কোন অশান্তি ছিল না। স্বধা, তার বাবা হরগোবিন্দ আর স্বধার ছোট ভাই হাবুল—তিনজনে মিলে শহরের সীমান্তে যে একটুখানি সংসার রচনা করেছিল তাতে অভাব অনটন অসুবিধে অনেক কিছুই ছিল, কিন্তু অশান্তির কথা কারও মনে হয় নি। সরু গলির মধ্যে পুরনো দোতলা ভাড়াটে বাড়ি। তার একতলায় একখানি মাত্র ঘর তিনজনের ভাগে জুটেছে। এই ঘরখানির মধ্যেই রান্না খাওয়া শোওয়া সব। আবার এই ঘরে বসেই হাবুল তার স্কুলের পড়া পড়ে। অসুবিধে বুঝি হ'ত। স্বধা মাঝে মাঝে হরগোবিন্দকে বলত, বাবা, আর একটা ভাল বাড়ি দেখ। এই একখানা ঘরে কি চলে ?

হরগোবিন্দ বলতেন, তা ঠিক। তোদের ভাবি কষ্ট হচ্ছে। বাড়িটা বদলাতে হবে।

কিন্তু বছর তিনেকের মধ্যে বদলানো আর হয়ে ওঠে নি। অবশ্য ভাল বাড়ির খোঁজ অনেকবারই এসেছে। দুখানা ঘর আর রান্নাঘর বাথরুম সমেত ফ্ল্যাটের খবর কয়েকবারই নিয়ে এসেছে হাবুল। হরগোবিন্দ চাটুষ্যে উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িও দেখে এসেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাড়া, সেলামি আর আড়াভাসের অঙ্ক শুনে আর এগোন নি। পুরনো বাসায় ফিরে এসে ছেলেমেয়েকে বলেছেন, দূর, মিছিমিছি কতকগুলো টাকা নষ্ট করা। তার চেয়ে এই কুড়ি টাকার ঘর আমাদের ঢের ভাল। আর এর চেয়ে বেশী জায়গায় আমাদের হবেই বা কি ?

স্বধা হেসে বলত, আমি জানতুম বাবা। তুমি এ ঘর ছেড়ে কোথাও নড়বে না।

হরগোবিন্দ জবাব দিতেন, নড়ব রে, নড়ব। আগে দায়মুক্ত হই, তারপর অল্প দিকে তাকাব। এখন কি আমার বাজে খরচ করবার সময় আছে ?

বাবার কথার মানে যে কি তা ভাইবোন দুজনেই বুঝতে পারত। হাবুল পড়তে পড়তে দিদির দিকে একবার তাকিয়ে মুখ মুচকে হেসে ফের বইয়ে মন দিত।

স্বধা লজ্জিত হয়ে বলত, বাবা, আমি বুঝি তোমার একটা দায় ? তুমি কেবলই ওই এক কথা বল।

হরগোবিন্দ বলতেন, দায়ই তো। পিতৃদায়, মাতৃদায়, কন্যাদায়। কিন্তু তোকে বিদায় দিয়ে কি ক'রে যে আমি থাকব তাই ভাবি।

স্বধা একটুকাল চুপ ক'রে থেকে বলত, আমাকে বিদায় দেওয়ার কথা তোমাকে অত ভাবতে হবে না বাবা। আমি চলে গেলে তোমাদের চলবে কি ক'রে ? হাবুল তো এখনও কত ছোট। ও কি তোমার যত্ন-আত্তি করতে পারবে ? ও বড় হোক, বিয়ে-খা করুক, তারপর—

হরগোবিন্দ হাসতেন : পাগলী। ততদিন তুই যে একেবারে বড়ী হয়ে যাবি।

স্বধা বলত, তা হ'লে তো ভাবনাই চুকে গেল। চিরকালের জন্তে তোমার বড়ী মা হয়ে তোমার কাছে থেকে যাব। আমাকে কাছছাড়া করবার কথা তুমি আর তখন ভাবতেই পারবে না।

কিন্তু ওই একটিমাত্র কথা ছাড়া হরগোবিন্দের আর কোন ভাবনাই যেন নেই। দিনের বেশীর ভাগ সময় অফিসের কাজে কাটে। বাকী সময়টুকু স্বধার বিয়ের চিন্তা চেষ্টা আর আলোচনা নিয়েই থাকেন হরগোবিন্দ।

পাড়ায় কৃপণ ব'লে বদনাম আছে তাঁর। কোন অস্থান-প্রতিষ্ঠানের জন্তে টাকা চাইতে গেলে সিকি-আধুলির বেশি তাঁর হাত দিয়ে গেলে না। নিজের জামা কাপড় জীর্ণ হয়, ময়লা হয়; সে সম্বন্ধে তাঁর জাক্কেপ নেই। কিন্তু ছেলের পোশাক আর মেয়ের শাড়ি গয়না কিনে দেওয়ার দিকে দারুণ ঝোঁক। ফুরাত্ত পেনেই মেয়েকে নিয়ে আকরার দোকানে যান। পুরনো গয়না ভেঙে নতুন ডিজাইনের ফরমাসেন দেন। বছরে দু-চারখানা ক'রে নতুন গয়না না গড়ালে হরগোবিন্দের তৃপ্তি হয় না। স্বধা প্রায়ই আপত্তি করে : এত গয়না কেন করছ বাবা ?

হরগোবিন্দ জবাব দেন, সব তো একসঙ্গে করতে পাবব না, আস্তে আস্তে ক'রে রাখি। তোর মার তো কিছুই আর পেলি নে।

প্রায় বছর তিনেক বন্ধ্যায় ভুগে স্বধার মা নির্মালা মারা গেছেন। সেও বছর দশেক হ'ল। তখন মাইনে বেশী ছিল না হরগোবিন্দের। 'স্ত্রীর শুধু-পথের খরচ জোগাতে তাঁর গায়ের গয়না থেকে শুরু করে নিজের ঘড়ি বোতাম পর্যন্ত গেছে। আরও প্রায় সাত-আট শত টাকা দেনা হয়েছিল। কষ্ট করে থেকে বিলাস-ব্যসন ত্যাগ করে সব দেনা-দায় শোধ দিয়ে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছেন হরগোবিন্দ। তাঁর মত একজন দেড় শো টাকার কেরানীর পক্ষে এ বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়। স্বধাকে ভাল ঘরে-বরে দেবেন—এখন এই তাঁর একমাত্র সাধ। সেই সাধ মেটাবার জন্তে তিনি অসাধ্য সাধন করছেন। অফিসের চাকরির পরে একটি পার্টটাইম কাজ নিয়েছেন। সংসার-খরচের জন্তে যা লাগে মেয়ের হাতে তুলে দেন, বাকী টাকাটা ব্যাঙ্কে রাখেন। গয়নাও অল্পসল্প মেয়ের গায়ে থাকে। পাছে হারিয়ে যায় কি চুরি যায়, সেই আশঙ্কায় বিদেশী ব্যাঙ্কে বেশী ভাড়া দিয়ে বাকীগুলি নিরাপদে রাখেন হরগোবিন্দ।

মাঝে মাঝে হাবুল স্বধাকে বলে, দিদি, বাবা তোকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন।

স্বধা হেসে জবাব দেয়, ভারি হিংস্টে তো তুই! কিসে প্রমাণ পেলি? বাটখারায় গুজন করে দেখেছিল?

হাবুল বলে, দেখেছি বই কি। আমার ঘেথানে এক পো, তোর সেথানে এক সের। তোর-বিয়ের জন্তেই তো বাবা কেবল টাকা জমাচ্ছেন।

স্বধা বলে, ও, তোর বুদ্ধি সেই দুঃখ! তোর বিয়ের জন্তেও আর একজনের বাবা এর চেয়ে বেশী টাকা জমিয়ে তুলছে তা জানিস?

টাকাও জমে, গয়নাও জমে। বিয়েই শুধু হয় না স্বধার। তিন-চার বছর ধরে এত লক্ষ্য এল গেল, কিন্তু হরগোবিন্দের মোটে পছন্দই হয় না। যে ছেলের রূপ আছে তার বিজ্ঞা কম, যার বিজ্ঞা আছে তার আবার বিজ্ঞা বিক্রির সামর্থ্য কম, যার অর্থ আছে তার হয়তো কুল নেই; এমনি বাছাই করতে করতে স্বধার বয়স কুড়ি পেরিয়ে গেল।

স্বধার মাসীমা থাকেন বউবাজারে। তিনি প্রায়ই এসে হরগোবিন্দকে তিরস্কার করে যান : জামাইবাবু, এ করছেন

কি? দেখে শুনে মেয়ের এবার বিয়ে দিয়ে দিন। বয়স হয়ে গেছে। এখন বেশী বাছবিচার করা কি ভাল?

হরগোবিন্দ জবাব দেন, কি করব বল কমলা? তোমার মত চার-পাঁচটি ভোঁ নয়, আমার ওই একটি মাত্রই মেয়ে। বাছবিচার একেবারে ছেড়ে দিলে কি চলে? তা ছাড়া হিন্দুর ঘর। একবার ভুলভালি হ'লে তো আর শোধরাবার জো নেই।

স্বধাও বাপের পক্ষ টেনে কথা বলে। তারও বিয়েতে ভারি অমত। হাবুল আরও বড় হোক, স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকুক, নিজের শরীরের আর জিনিসপত্রের যত্ন নিতে শিখুক, তারপর বিয়ে করবে স্বধা। এখনও দিদিকে না হ'লে হাবুলের যে একদিনও চলে না।

মেয়ের এই যুক্তিতর্কে মনে মনে খুশীই হন হরগোবিন্দ। শুধু বাইরের চেহারা নয়, কদমটাও মায়ের মতই পেয়েছে স্বধা। ভারি কোমল মন, স্নেহভরা বুক। হরগোবিন্দ অফিসে বেকার আগে লণ্ডি থেকে ধুইয়ে আসা শার্টে যখন বোতাম পরাতে বসে স্বধা, কি উপুড় হয়ে তাঁর পায়ের জুতা বাশ করতে থাকে, দেখলে টাঁড়ানো নির্মলার প্রথম যৌবনের কোটোর সঙ্গে মেয়েকে মিলিয়ে দেখেন হরগোবিন্দ। আকৃতি-প্রকৃতিতে ঠিক একেবারে দ্বিতীয় নির্মালা। তেমনি পিঠভরা কালো চুলের রাশ, তেমনি শ্রামলা গায়ের রঙ, আর ঠিক তেমনি নাক চোখ ঠোঁট চিবুকের ছাঁদ। স্বধার মায়ের সঙ্গে তার যে এত মিল আছে, তা ওর মাসী মেনো স্বীকার করতে চায় না। কিন্তু নির্মলাকে কি হরগোবিন্দের চেয়ে তারা বেশী দেখেছে, না, বেশী স্নেহেছে?

শুধু বাপকেই নয়, ভাইকেও ভারি যত্ন করে স্বধা-হরগোবিন্দের মনে হয়, নির্মালা বেঁচে থাকলেও যেন হাবুলের এত বেশী যত্ন হ'ত না। এই সেদিন পর্যন্ত গামছা দিয়ে ভিজ্ঞে মাথা মুছে তার টেরি কেটে দিয়েছে স্বধা। আজকাল হাবুল দিদির চেয়ে ইঞ্চি দুই লম্বা হয়ে গেছে। ব'লে স্বধার পক্ষে ভাইয়ের মাথা আঁচড়ে দেওয়ার আর সুবিধে হয় না। কিন্তু এখনও নাওয়া খাওয়ার সব ব্যাপারেই হাবুল দিদির ওপর নির্ভরশীল। খার্ড ক্লাসে পড়লে হবে কি, বয়স চোদ্দ উত্তরে পনেরোয় পড়লেই বা কি হবে, স্বভাবে এখনও হাবুল প্রায় আট-দশ বছরের বালক।

যেমন অগোছালো, তেমনি অচমৎকার। ওর বইপত্রর খাতা-কলম কোথায় থাকে, স্থলের সময় সব খোঁজ পড়ে। আকস্মিক ষাওয়ার সময় হরগোবিন্দ যেমন ব্যস্ত হয়ে ডাকতে থাকেন—সুধা, সুধা; হাবুলও তেমনি স্থলে যাওয়ার সময় ডাকে—দিদি, দিদি।

রামা রেখে, কি হাতের অস্ত্র কাজ ফেলে সুধাকে তৎক্ষণাৎ উঠে আসতে হয়। বিয়ের কথায় ও যে হাবুলের নাবালকত্বের দোহাই দেয় তা একেবারে অযথা বলা চলে না।

হরগোবিন্দও সন্তানবৎসল কম নন। ঠিকে-ঝিকে-কাঁজ কামাই করে তিনি নিজের হাতে বালতিতে ক'রে জল টানেন, বাটনা বাটেন, মেয়ের উত্থান ধরিয়ে দেন।

সুধা আপত্তি ক'রে বলে, আচ্ছা বাবা, তুমিই যদি এসব করবে তো আমি আছি কি জন্তে? তুই বালতি জল কি আমি তুলতে পারি না? হরগোবিন্দ মাথা নেড়ে বলেন, না, তা পার না। জল তুলতে গিয়ে তোমার মোমের মত তুলতুলে হাতে যদি কড়া পড়ে যায় তোমার শরীরে শাওড়ী কি আমাদের খোঁটা দিতে ছাড়বেন? আর কেবল কি শরীরে শাওড়ী? তাঁদের স্বপুত্রটিও আমাদের ছেড়ে কথা কইবেন না। সুধা লজ্জিত হয়ে মুখ নীচু ক'রে বলে, কি যে বল বাবা।

উত্থান ছাড়াও একটি স্টোভ আছে ঘরে। কিন্তু পারতপক্ষে সেটা সুধাকে হরগোবিন্দ ধরাত্তে দেন না। যদি কোন বিপত্তি ঘটে। যদি কোন খুঁত হয়ে যায় মেয়ের, তা হ'লে কি রক্ষা আছে! প্রথম প্রথম ঘরের মেয়েয় ঢালা বিছানা ক'রে ছেলেমেয়েকে নিয়ে একসঙ্গেই শুতেন হরগোবিন্দ। এক পাশে তিনি, মাঝখানে হাবুল, আর একপাশে সুধা। কিন্তু একদিন ঘুমের ঘোরে 'গোল' 'গোল' ক'রে দিদির গায়ে লাগি ছুঁড়ল হাবুল। সুধা না চৈকালে হাবুলের কপালে যে সেদিন কি হ'ত তা বলা যায় না। মেয়ের জন্তে ছেলেকে মারতে পারলেন না হরগোবিন্দ, কিন্তু আচ্ছা ক'রে বকুনি লাগালেন। তারপর ছোট একখানা তক্তাপোশ কিনে এনে সুধার আলাদা বিছানার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। তার কোনও আপত্তি শুনলেন না। কেবলই বলতে লাগলেন, যদি চোখে মুখে লেগে যেত তা হ'লে কি হ'ত?

সুধা বললে, ম'রে যেতাম একেবারে! আমার কি

এমনই মোমের শরীর যে একটা টোকা পর্যন্ত আমি সহিতে পারি না!

হরগোবিন্দ বললেন, কেন সহিবি? মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছিল জীবনভোর কত কি সহিতে হবে। কিন্তু আমার কাছে যতদিন আছিস, একটু আঁচড়ও তোর গায়ে আমি লাগতে দেব না।

তক্তাপোশে শোয় সুধা। আর নীচে হাবুলকে নিয়ে থাকেন হরগোবিন্দ। শুয়ে পড়তে না পড়তেই হাবুল ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু হরগোবিন্দ ঘুমোন না। শুয়ে শুয়ে মেয়ের সঙ্গে গল্প করতে থাকেন। তাঁর সেই প্রথম জীবনের গল্প, প্রথম যৌবনের গল্প। স্থল-কলেজ বন্ধুবান্ধব, সীতার, শিকার, দেশভ্রমণ আর দুঃসাহসিকতার কাহিনী। সুধার মায়ের কথাও শুনে। মেয়ের কাছে কিছুই গোপন করেন না হরগোবিন্দ। মেয়ে এখন তাঁর বান্ধবীর মত। নির্মলার সেই প্রথম বয়সের মান-অভিমান শাড়ি-গয়নার আবদার, খুঁটিনাটি নিয়ে কলহ-মিলনের কাহিনী। এসব গল্প সুধা বহুবার শুনেছে। কিন্তু কোন কথা ব'লে একবারও বাবাকে বাধা দেয় না। তারপর অতীত থেকে ভবিষ্যতে চ'লে যান হরগোবিন্দ। সুধার ভাবী ঘর-সংসারের চিত্র আঁকেন। মেয়ের শরীর-বাড়িতে কত ছলে কতবার ক'রে যাবেন, প্রজ্ঞাভাজন হয়েও জামাইয়ের সঙ্গে কি রকম বন্ধুর মত ব্যবহার করবেন, বছরে কবার ক'রে মেয়ে-জামাইকে নিয়ে কলকাতার বাইরে সমুদ্র কি পাহাড়ের ধারে বেড়াতে বেরবেন, তার জল্পনা কল্পনা চলে। জামাই পেশায় কি হবে—ডাক্তার না উকিল, প্রফেসর না ইঞ্জিনিয়ার, সে সম্বন্ধে মেয়ের মতামত জিজ্ঞেস করেন হরগোবিন্দ। তার গায়ের রঙ, চোখ-মুখের গড়ন, শরীরের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধেও মেয়ের মত নিতে ছাড়েন না।

হরগোবিন্দের এত জিজ্ঞাসার, এত জল্পনা-কল্পনার উত্তরে সুধা সংক্ষেপে বলে, তোমার পছন্দেই আমার পছন্দ বাবা। তুমি যেমন চাইবে তেমনি হবে।

ছেলে-মেয়ে নিয়ে হরগোবিন্দ বেশ ছিলেন। তাঁদের এই ছোট সংসারে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কারুরই বিশেষ কোন স্থান ছিল না, যেন বাইরের জগতের কাউকে দিয়ে তেমন কোন প্রয়োজন নেই হরগোবিন্দের। কিংবা

সেটুকু প্রয়োজন আছে সেটুকু শুধু বাইরেরই প্রয়োজন। কাগজের হকার, ডগওয়লা, কয়লাওয়লা, মূদী আর ট্রাম-বাসের কণ্ডাক্টরের মতই স্বজনবন্ধু পাড়াপড়শীর সঙ্গে ব্যবহার করতেন হরগোবিন্দ। তাঁরা কেউ এলে দু মিনিট যেতে না যেতেই তিনি তাঁদের বুঝিয়ে দিতেন, তৃতীয় কি চতুর্থ মিনিটে তাঁদের ঘরে আগন্তকের আর থাকবার দরকার নেই। হরগোবিন্দের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে সবচেয়ে যারা কাছে থাকেন—তাঁরা শ্রালিকা কমলা আর ভায়রাভাই মণিময় চক্রবর্তী—তাঁরা পর্যন্ত এসে অস্বস্তি বোধ করতেন। বৈশিষ্ট্য টিকতে পারতেন না। কমলা বোনপো-বোনঝিকে মাঝে মাঝে নিয়ে নিজের কাছে রাখতে চাইতেন, কিন্তু ‘আজ নয়, কাল’ বলে একটা না একটা অভ্যুহাতে হরগোবিন্দ প্রায়ই তাঁর অমরোখ এড়িয়ে যেতেন। ইদানীং অভিমানে কমলা আর তাদের নেওয়ার কথা মুখে আনতেন না।

ছুটিছাড়ার দিনে হরগোবিন্দ নিজেই মাঝে মাঝে ছেলে-মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে বেরুতেন। কোনদিন আত্মীয়স্বজনের বাড়ি, কোনদিন চিড়িয়াখানা যাহুঘর, কোনদিন বা গঙ্গার ধার দিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। বছরে একবার ক’রে সিনেমা আর একবার ক’রে সার্কাস বরাদ্দ ছিল স্বধা-হাবুলের ক্ষেত্রে। হরগোবিন্দ নিজেই ওদের সঙ্গে ক’রে নিয়ে যেতেন। তাদের মাঝখানে আর কেউ আহুক আর কেউ থাকুক, তা তিনি বড় একটা পছন্দ করতেন না।

তবু চতুর্থ ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটল।

ভাস্কর নয়, উকিল নয়, প্রফেসর ইঞ্জিনিয়ার কিছু নয়, সে নেহাতই সাধারণ একজন প্রাইভেট টিউটর, নাম ইন্দুভূষণ দাস। তার বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ, বড় কালো, আকার মাঝারি, চোখ ছোট, নাক চ্যাপটা। সুপুরুষ তাকে কিছুতেই বলা চলে না, বরং স্বভাব এত শাস্ত আর নিরীহ যে পুরুষ বলতেও দ্বিধা হয়।

বার্ড ক্লাস থেকে সেকেন্ড ক্লাসে প্রমোশন পেল বটে হাবুল, কিন্তু কোন বিষয়েই নম্বর ভাল পেল না। ইংরেজীতে টেনে-মেনে পাস করেছে, অঙ্কে পাসের নম্বর পর্যন্ত পায় নি।

স্বধা বললে, বাবা, আমাকে না হয় সেকেন্ড ক্লাস থেকেই পড়া ছাড়িয়ে এনে ঘরে বসিয়ে রেখেছ, হাবুলকে তো আর

তা পারবে না। ওকে পড়াতেই হবে। কিন্তু শুধু স্কুলের ওপর যদি ভরসা কর, ওর কিছু হবে না তা বলে দিচ্ছি।

হরগোবিন্দ বললেন, তা হলে কি করতে হবে?

স্বধা বললে, প্রাইভেট টিউটর রাখ।

হরগোবিন্দ বললেন, ওরে বাবা, সে যে বহু টাকার খাঙ্কা!

স্বধা বললে, তা হোক। ও যদি মাহুষ না হয়, টাকা দিয়ে করবে কি? ভোমার দেখবার যখন সময় নেই, মাস্টার একজন না রাখলে চলবে না।

প্রথমে খোঁজ পড়ল পাকা দাড়িওয়লা অভিজ্ঞ শিক্ষকের, কিন্তু তাঁদের দক্ষিণা অনেক। চল্লিশ-পঞ্চাশের কমে কেউ রোজ সব বিষয় পড়িয়ে যেতে রাজী নন। শেষ পর্যন্ত দরকষাকষি করে কুড়ি টাকায় ইন্দুভূষণকে পাওয়া গেল। সে শ্রামবাজারের একটা মেসে থাকে। ওদিকেরই কোন একটা হাই-স্কুলে পড়ায় আর টিউশনি করে। বেলগাছিয়ার এদিকে আরও দু-এক বাড়িতে ছেলে পড়িয়ে সে স্বনাম কিনিছে। হরগোবিন্দের দু-তিনজন প্রতিবেশী তার নাম সুপারিশ করলেন।

হরগোবিন্দ ইন্দুভূষণকে নিজের ঘরে নিয়ে এসে ছেলে-মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর হেসে বললেন, আপাতত কুড়ি টাকা ক’রেই দেব। তারপর ছেলের রেজাল্ট যদি ভাল হয় তখন আলাদা বকশিশ আছে। মিথ্যে বলছি নে, তখন যা চাইবেন—

ঘরের এক কোণে ব’সে তরকারি কুটছিল স্বধা, বাবার কথা শুনে ভারি লজ্জা পেল। হি-ছি, একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কি অমন ক’রে কথা বলতে হয়!

ইন্দুভূষণ হেসে বললে, ও যদি ভাল রেজাল্ট করে, সেই তো আমার সবচেয়ে বড় বকশিশ হরগোবিন্দবাবু।

বাঁটি থেকে চোখ তুলে ইন্দুভূষণের দিকে তাকাল স্বধা। তার ঠোটে তখনও একটু হাসি লেগে রয়েছে। স্বধার মনে হ’ল, এমন শাস্ত স্বন্দর হাসি সে জীবনে আর কারও মুখে দেখে নি। তা ছাড়া পান্টা জ্বাবটাও ভারি চমৎকার লাগল। এমন কথা যে-কোন পেশাদার শিক্ষকই হয়তো বলেন, বলতেন। কিন্তু স্বধার মনে হ’ল, এমন অন্তর দিয়ে কেউ বলতে পারতেন না।

পরদিন থেকে রোজ সম্ভ্রাম ইন্দুভূষণ হাবুলকে পড়াতে

আসে। স্বধা নিজের খাটের ওপর ফরসা চাদর পেতে শিক্ষক-ছাত্রের বসবার আসন করে দেয়। ইন্দুভূষণ হাবুলকে একমনে পড়াতে থাকে। ঘরে যেন আর দ্বিতীয় কেউ নেই। এতটা মনোযোগিতা স্বধার কেন যেন ভাল লাগে না। ভালে সম্বর দিতে দিতে সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, রান্নার গন্ধে আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে না?

ইন্দুভূষণ হাবুলের অন্ধের ভুল বার করে দিয়ে স্বধার দিকে তাকায় : আমাকে বলছেন?

স্বধা হেসে বলে, নয়তো কাকে? আপনি কি ভেবেছেন, হাবুলের সঙ্গে এতক্ষণ ভদ্রতা করছিলাম?

ইন্দুভূষণও না হেসে পারে না; বলে, ও! ভদ্রতা! তা হ'লে তো ভদ্রতা করে আমাদেরও জবাব দিতে হয়—না না, মোটেই কষ্ট হচ্ছে না, ভারি চমৎকার লাগছে।

স্বধা হাসি মুখে বলে, আর যদি ভদ্রতা বাদ দিয়ে বলেন, তা হ'লে?

ইন্দুভূষণ জবাব দেয়, তা হ'লেও আমার বক্তব্যটা বদলায় না। আপনি মোটেই উদ্বিগ্ন হবেন না। রান্নার গন্ধ আমার সত্যিই খুব ভাল লাগে।

আপনি ঠাট্টা করছেন। এমন জায়গায় বসে কেউ পড়াতে পারে?

ইন্দুভূষণ একটু চুপ করে থেকে বলে, না, ঠাট্টা নয়। আপনাকে বাঁধতে দেখে নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। তখন পড়াতুম না, পড়তুম। বাবা ছিলেন গুণ্ডের ক্যান্ডাসার। বাইরে বাইরে ঘুরতেন। মার ওপর ছিল সব ভার। তিনি জোর করে টেনে নিয়ে রান্নাঘরে বসাতেন। আর হলুদ-মাখা হাতে কালো স্নেটের ওপর অঙ্ক লিখে দিতেন। অনেক দিন পরে ঠিক সেই রান্নার বাঁজ, রান্নার গন্ধ আজ পেলাম এখানে।

শুনতে শুনতে স্বধার গা কেন যেন সিরসির করে ওঠে। আন্তে আন্তে জিজ্ঞাসা করে, আপনার মা এখন কোথায় আছেন?

ইন্দুভূষণ জবাব দেয়, আমার স্বভিতে।

আর বাবা?

বছর পাঁচেক হ'ল তিনিও চ'লে গেছেন।

স্বধা ঋণিকক্ষণ চুপ করে থাকে। কড়ার মধ্যে

অনড় হয়ে থাকে খুঁজি। একটু বাদে ফের সে জিজ্ঞাসা করে, আর কে কে আছেন আপনার? ভাই, বোন?

ইন্দুভূষণ বলে, কেউ না।

স্বধা যেন আত্ননাদ করে ওঠে : কেউ না! কেউ না- থাকলে মানুষ থাকে কি করে? আমারও মা নেই, কিন্তু বাবা আছেন, ভাই আছে। আর আপনার সত্যিই কেউ নেই?

ইন্দুভূষণ এ কথার কোন জবাব না দিয়ে স্বধার সেই মমতা-ভরা বর্ণনা-ভরা কালো বড় বড় চোখ দুটির দিকে অবাক হয়ে একটুকাল তাকিয়ে থাকে। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ছাত্রকে বলে, হাবুল, এবার রেকারিংয়ের অঙ্কটা কর তো।

এমনি করে আন্তে আন্তে আলাপ জমে, আলাপ এগোয়। একদিন স্বধা বলে, আপনি তো রোজ শুধু রান্নার গন্ধ নিয়েই যান। আজ আপনাকে খেয়ে যেতে হবে।

ইন্দুভূষণ আপত্তি করে : না না। তারপর একটু হেসে বলে, ঝাণেই তো রোজ অর্ধভোজন হয়ে যায়।

স্বধা বলে, কিন্তু দু-একদিন পূর্ণভোজও তো হতে পারে। তাতে আপনার জাত যাবে না।

ইন্দুভূষণ বলে, আমার জাতের জন্তে তো ভয় নেই।

স্বধা বলে, আমাদের জাতের জন্তেই বুকি ভয়! আপনি ভাববেন না, অত বাচবিচার আমরা করি নে। তা হ'লে কি আর এ ভাবে থাকতে পারি?

পড়ানো হয়ে গেলে ইন্দুভূষণকে খেতে বসতে হয়। আয়োজনে পরিবেশনে খুবই স্বত্ব নেয় স্বধা। দু-একটা নতুন তরকারি বাঁধে। যেন কোন উৎসবের দিন এসেছে। এ ধরনের নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ মানে দু-তিন দিন লেগেই থাকে।

একদিন অফিসে বেরবার সময় হরগোবিন্দ ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি রে হাবুল, মাস্টার মশাই কেমন পড়াচ্ছে তোকে?

হাবুল বললে, ভালই পড়াচ্ছেন বাবা।

হরগোবিন্দ বললেন, আচ্ছা, তুই আমার জন্তে একটা সিগারেট নিয়ে আয় তো।

হাবুল বেরিয়ে গেলে মেয়েকে বললেন, স্বধা, তোকে একটা কথা বলি।

বল।

হরগোবিন্দ বললেন, মাস্টার যাতে ফাঁকি না দেয়, যতক্ষণ থাকে যাতে মন দিয়ে পড়ায় তুইই তা দেখবি। কিন্তু তুই নিজেই নাকি তার সঙ্গে গল্পগুস্তাব ক'রে সময় নষ্ট করিস ?

বাপের শাসনে স্বধার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, এ নালিশ তোমার কাছে কে করেছে বাবা ? হাবুল ?

হাবুল কেন করবে ? সে করলে কোন দোষের হ'ত না। কলতলায় অন্য ভাড়াটেরা সব আলোচনা করছিল, তাই কানে গেল।

স্বধা বললে, এর আগে অন্য কারও কথা তো তুমি কানে তুলতে না বাবা !

হরগোবিন্দ বললেন, এখনও তুলি নে। তবে জানিস তো, বাড়িটায় যত সব বাজে লোকের আড্ডা। তা ছাড়া আমার ঘরে আর তো কোন মেয়েছেলে নেই। তাই আমাদের একটু সাবধান হয়ে চলাই ভাল।

বেশ, তুমি যদি বল, তাই চলব বাবা।

হ্যাঁ, তাই চলিস। আর অত খাওয়ানো-দাওয়ানোরই বা দরকার কি। কোন উপলক্ষ-টুপলক্ষ হ'লে বললি, সে আর এক কথা।

স্বধা বললে, বেশ।

কলতলায়, বাথরুমে, বাড়ির আরো সব ভাড়াটের ঘরে ইন্দুভূষণের সঙ্গে তার এই ঘনিষ্ঠতা নিয়ে যে ফিসফিস গুজবগুজব শুরু হয়েছে, তা স্বধারও কানে গেছে। তারই প্রায় সমবয়সী কোণের ঘরের রেণু সেদিন গায়ে প'ড়ে হেসে বলেছে, কি ভাই, মাস্টার মশাই শুধু হাবুলকে পড়ান, না, তোমাকেও পড়ান ?

স্বধা গম্ভীরভাবে জবাব দিয়েছে, আমাকেও পড়ান।

মোতলায় সরকারদের ছোট বউ স্থলতা কাছেই ছিল, সে সঙ্গে সঙ্গে হেসে জিজ্ঞাসা করেছে, ও মা, তাই বল। তা কোন ক্লাসের পড়া পড়ান তোমাকে—বি. এ. ক্লাসের বুঝি ? বলতে বলতে হেসে রেণুর গায়ে গড়িয়ে পড়েছিল স্থলতা।

স্বধা কোন কথা না ব'লে জল নিয়ে ঘরে চ'লে এসেছে।

কিন্তু শুধু বউ-ঝিরাই নয়, এ বাড়ির পাঁচঘর ভাড়াটের নানাবয়সী পুরুষরা পর্যন্ত ব্যাপারটা শব্দে উৎসুক হয়ে

উঠেছে। স্বধা বাদে কাাকাবাবু আর মেসোমশাই বলে সেই প্রোট কম্পাউণ্ডার পঞ্চানন সরকার, পোস্ট-অফিসের কেরানী হীরালাল গাঙুলি, রেল-অফিসের বীরেশ্বর মিত্র ; স্বধা বাদে নামের সঙ্গে দাদা যোগ ক'রে ডাকে, সেই বাসু রণজিৎ আর স্বরেন সকলেরই কানে গেছে, চোখে পড়েছে বিষয়টা। তাদের ভাবভঙ্গি, হাসি আর ভাকাবার ধরন দেখলেই স্বধা টের পায়, সকলেই যেন কিছু একটা মনে মনে আন্দাজ করেছে।

এতদিন হরগোবিন্দকে সবাই বলত দাস্তিক, অমিশুক অসামাজিক। স্বধাকেও তাই বলত। বেশী রকম দেমাকী, অহংকারী। তারপর সকলেই তাদের শব্দে উদাসীন হয়ে থাকত। স্বধা আজও সেই উদাসীনই রয়েছে, কিন্তু অন্য সবাই যেন আগের মত আর দূরে স'রে থাকতে পারছে না। বাবা আর ভাই ছাড়া তৃতীয় আর একটি পুরুষের সঙ্গে স্বধার সামান্য আলাপ হয়েছে ব'লে এই গোটা বাড়িটা যেন তার ছোট ঘরখানির মধ্যে ছমড়ি খেয়ে পড়তে চাইছে। শুধু যে তারাই স্বধার শব্দে সচেতন হয়ে উঠেছে তাই নয়, স্বধাও তাদের শব্দে অচেতন থাকতে পারছে না। এ বাড়িতে যে এতগুলি লোক থাকে তা কি স্বধাই এতদিন টের পেয়েছে। শুধু এই বাড়িটাই বা কেন, তাদের গলির আরও দু-তিনখানা বাড়ির মেসার-পুরুষে পর্যন্ত যেনে ফেলেছে কথাটা। ইন্দু মাস্টার সঙ্গে তাদের খোজ-খবর নেওয়ার ধরন দেখেই স্বধা তা বুঝতে পেরেছে। যেন প্রাইভেট টিউটর আর কারও বাড়িতে আসে না, তার সঙ্গে বাড়ির আর কোন মেয়ে কি বউ কথা বলে না, যেন এ পাড়ায় একটি ছেলের সঙ্গে একটি মেয়ের এই সর্বপ্রথম আলাপ হয়েছে।

কিন্তু অন্য কারও বাকা কটাক্ষে, খোঁচা দেওয়া কথায় স্বধার কিছু এসে-যায় না। বাবা যে তাকে আরও একদিন সতর্ক ক'রে দিলেন, তাতেই স্বধার মনে একটু লাগল।

হরগোবিন্দ বললেন, স্বধা, একটু সাবধান হয়ে চলিস। তোর ঘরে তো মা নেই, আর কানেক্ষম ফেলে বেশীক্ষণ ঘরে ব'সে থাকা আমার পক্ষেও সম্ভব নয়। তোর নিজেকেই বুঝে সমঝে চলতে হবে।

স্বধার ভারি হুঃখ হ'ল, মনে মনে ঠিক করল ইন্দু-

ভূষণের সঙ্গে সে আর কোন কথা বলবে না। চায়ের কাপটি পর্যন্ত হাবলকে দিয়ে দেওয়াবে।

কিন্তু সন্ধ্যা রাখা গেল না। স্বধা কথা না বললে কি হবে, আজ অন্তপক্ষ থেকে কথা শুরু হ'ল। হাবলকে এক প্যাসেজ ট্রান্সেশন করতে দিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ইন্দুভূষণ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আজ বড় গম্ভীর হয়ে রয়েছেন যে? শরীর খারাপ করেছে নাকি?

শেষের কথাটুকুতে ভারি মমতা প্রকাশ পেল ইন্দুভূষণের। সে নিজে থেকে সহজে আগে আলাপ করে না। আজ করল। এতেও ভারি নতুন লাগল স্বধার, ভারি ভাল লাগল। বাড়িগুরু লোকের বিরূপতা ইন্দুভূষণের ওই এক ফোঁটা দরদে যেন সব ধুয়ে মুছে গেছে।

প্রতিজ্ঞা তুলে গিয়ে স্বধা ব'লে ফেললে, মাহুষের শরীরটাই বুঝি সব?

স্বধার অভিযোগের ভঙ্গিতে ইন্দুভূষণ মুহূর্ত হাসল : ও, আপনি বুঝি মন খারাপ হওয়ার কথা বলছেন! সত্যি মন খারাপ হওয়াটা শরীর খারাপ হওয়ার চেয়ে ঢের বেশী কষ্টের।

খারাপ হওয়ার কথা শুনতেও এত ভাল লাগে।

স্বধা হেসে বললে, আপনি কি ক'রে জানলেন? আপনারও মাঝে মাঝে মন খারাপ হয় নাকি?

হয় বই কি।

তখন কি করেন?

চূপচাপ ব'সে থাকি, না হয় বই পড়ি। আচ্ছা, আপনি কি কেবলই রাম্যাবাম্মা ধরসংসার নিয়ে থাকেন, বইটাই পড়েন না?

পড়ি বই কি, হাতের কাছে যা পাই তাই পড়ি।

ইন্দুভূষণ হাসল, আপনি বুঝি প্রতিজ্ঞা করেছেন, হাতের কাছে যা পাবেন শুধু তাই পড়বেন?

স্বধা মুখ তুলে একবার তাকাল, তারপর চোখ নামিয়ে মুহূর্তে বললে, কেউ যদি খুঁজে পেতে এনে দেয় তাও পড়তে পারি।

ইন্দুভূষণ যেন শুধু এইটুকুর অপেক্ষায় ছিল। তারপর থেকে প্রায় রোজ সে বই আনতে লাগল। সব গল্প-উপন্যাস নয়। জীবন-চরিত, ভ্রমণ-কাহিনীও আছে। কিন্তু স্বধার গল্প-উপন্যাস ছাড়া আর কিছুতে মন ওঠে না।

আস্তে আস্তে স্বধার কাছে আর এক জগতের দ্বার খুলে যেতে লাগল। সে জগৎ এই ভাড়াটে বাড়ির লোকজনের মত অহুদার নয়, প্রতিকূল নয়, সে জগৎ বড় মনোরম আর মধুর। এর আগে কে জানত পৃথিবীতে এত ভাল ভাল বই আছে! আর সে সব বইয়ের লেখকেরা স্বধারই মনের কথা চুরি ক'রে নিয়ে লিখেছে! এর আগে কে জানত তাদের বাড়ির সামনে ছোট্ট পুকুরটার ধারে যে ছোট্ট নারকেলগাছ রয়েছে তাদের পাতাগুলি এত সবুজ, বোমেনের বাড়ির ছাদে সাদা সাদা চন্দ্রমল্লিকার টবগুলি এত সুন্দর! তারও ওপরে অগ্নিনিভি তারাতারা আরও সুন্দর আকাশ কি চোখে পড়েছে এর আগে!

মাঝে মাঝে দশ-বারো বছরের একটি ছেলে এই রাস্তায় ফুল ফিরি করতে আসে, তার নাম স্বখন। ওর নামটি যে এত ভাল, এমন ধ্বনিময়, অর্থময়, কই, এর আগে তো স্বধার তা খেয়াল হয় নি! তার কাছে থেকে প্রায়ই চার আনা ছ' আনার ফুল কিনে নেয় স্বধা। কোনদিন সাদা বেল কি রজনীগন্ধা। কোনদিন বা রক্ত গোলাপ। কোনদিন সে ফুলে ফুলদানি সাজায়, কোনদিন নিজের খোঁপায় গোঁজে।

হরগোবিন্দের কিছুই চোখ এড়ায় না। মনে মনে ভাবেন, আজকালকার মেয়েগুলির লজ্জা শরম বড় কম। একদিন স্পষ্ট ক'রেই বললেন, মিছিমিছি ফুলের পেছনে এত পয়সা নষ্ট করিস কেন স্বধা?

স্বধা জবাব দেয়, কই, ফুল তো বেশী কিনি নে বাবা।

হরগোবিন্দ ভিজ্জে গামছা দিয়ে গা রগড়তে রগড়তে বলেন, এতেও তোর বেশী কেনা হয় না! তুই কি বাগান শুক্কু কিনতে চাস? হ্যাঁ, আর এক কথা। গয়না যদি পরতে ইচ্ছা হয়, বল, ডন্ট থেকে সব নিয়ে আসি। ওসব ফুলের সাজ-টাজ ভাল না। ভদ্রলোকের মেয়েরা ও ভাবে সাজে না। ও সব করে—। রুঢ় কথাটা পালটে নিয়ে হরগোবিন্দ বলেন, ইয়েবা।

স্বধা হয় নিকন্তর থাকে, না হয় অল্প কথা পাড়ে। মনে মনে খুবই রাগ হয় তার। বাবা যেন আজকাল কি রকম হয়ে যাচ্ছেন! সে খোঁপায় ফুলের মালা জড়াল কি না-জড়াল তা কেন বাবা দেখতে আসবেন! সংসারের কাজ-কর্ম কি সেবাস্বত্বের যদি কোন ক্রটি হয় তবেই তিনি

রাগ করবেন। মেয়ের সাজসজ্জার দিকে কেন তাঁর চোখ পড়বে।

কিন্তু হরগোবিন্দ পছন্দ না করলে কি হয়, ইন্দুভূষণ যে ফুল খুব ভালবাসে তা স্বধার বুঝতে বাকি নেই। সে প্রশংসা-ভরা চোখে স্বধার ফুলদানির দিকে তাকায়, ছাত্রকে অ্যামিতির উপপাত্ত বোঝাতে বোঝাতে এক-একবার স্বধার খোঁপার গোলাপটির দিকে অপলকে চেয়ে থাকে।

স্বধা সম্ভার আগেই রান্নার পাট চুকিয়ে দিয়ে টুল পেতে বোনার কাজ নিয়ে বসে, না হয় ইন্দুভূষণের এনে দেওয়া গল্পের বই পড়তে থাকে।

হরগোবিন্দ এক-একদিন অফিস থেকে ফিরে এসে স্বধাকে এমন ইন্দ্রানীর মত ব'সে থাকতে দেখে গম্ভীর হয়ে যান। মেয়েকে কাজের ফরমাসের ক'রে ঘরের বাইরে পাঠিয়ে দেন। তারপর ইন্দুভূষণের দিকে চেয়ে বলেন, কি মাস্টার, পড়ানো-টড়ানো কেমন চলছে?

ইন্দুভূষণ নঃক্ষেপে বলে, ভাল।

হঁ, কি রকম ভাল, ছেলের পরীক্ষার ফল দেখলেই তা টের পাব।

ইন্দুভূষণ হেসে বলে, বেশ তো, দেখবেন।

ওর এই নিশ্চিন্ত হাসিতে ভিতরে ভিতরে হরগোবিন্দ কেমন যেন একটা অপমান বোধ করেন। মনে মনে ভাবেন, এত জোর ও কোথেকে পায়! "ও কি বোঝে না হরগোবিন্দ সব টের পেয়েছেন! বামন হয়ে ওর যদি চাঁদে হাত দেওয়ার স্পর্ধা হয়ে থাকে হরগোবিন্দ যে কোন মুহুর্তে সেই হাত মুচড়ে ভেঙে ফেলতে পারেন। মিটমিটে শয়তান ছোকরা। কি ক'রে স্বধার সঙ্গে কথা বলবে সেই ছিল খোঁজে। স্বধা যখন হরগোবিন্দের সঙ্গে কথা বলে, ও কান খাড়া ক'রে থাকে; স্বধা যখন ওকে কিছু বলে, ও যেন স্বর্গ হাতে পায়।

যে কোন সময় হরগোবিন্দ ওকে তাড়িয়ে দিতে পারেন। বলতে পারেন, তোমার পড়ানো ভাল হচ্ছে না মাস্টার। তোমাকে দিয়ে আমার কাজ চলবে না।

কিন্তু এইটুকু অপমানে যেন বড় লঘু শাস্তি হয়ে যায়। হরগোবিন্দের ইচ্ছা আরও কঠিন শাস্তি দেন ওকে। শূত্র হয়ে বামুনের মেয়ের দিকে তাকাবার গুরু দণ্ড। না, কাজ

থেকে ওকে ছাড়িয়ে দেবেন না হরগোবিন্দ। কাজে বহাল রেখেই ওকে অপমান করবেন। ওর চোখের সামনে স্বধার বিষে দিয়ে দেবেন। বিষের দিন নিমন্ত্রণ ক'রে এনে চাকরের মত ফাই-করমাসের খাটাবেন। স্বধা স্বস্তর-বাড়ি চ'লে গেলে ওর আরও পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়ে টিউটরের চাকরিতে বহাল রাখবেন। তারপরে ছোকরা খালি ঘরে কি ভাবে ছটফট করে দেখবেন চেয়ে চেয়ে। তার আগে মশা মেয়ে হাত নষ্ট ক'রে লাভ নেই।

শত্রুনির্ধাতনের সহজ পথ হরগোবিন্দের মনঃপুত নয়। অফিসে যারা তাঁর বিরুদ্ধে ক্লিক করে, তাদেরও তিনি এমনি বহু দিন ধ'রে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জখ করেন। তাতে শত্রুকে শাস্তি দেওয়ার স্বধাহুতী দীর্ঘস্থায়ী হয়। যে লজেন্স চুষে খাওয়ার জন্তে, তা তিনি চিবিয়ে খেতে চান না। বরানগরের মুখ্যযোদের সঙ্গে যে সঙ্ঘর্ষটা চলছিল তা তিনি পাকা ক'রে ফেললেন। ছেলেটি এ. জি. বেঙ্গলে চাকরি করে। নিজস্ব বাড়ি আছে শহরে। তার বাবা মেয়ে দেখে পছন্দ ক'রে গেছেন। ছেলে নিজেও এসে দেখবে কি না জিজ্ঞাসা করায় বলেছেন, ওসব বেয়াড়াপনা আমাদের ক্যামিলিতে নেই মশাই। ছেলে আগে দেখবে কি। দেখবে সেই শুভদৃষ্টির সময়। স্বধার ঠিকুজী নিয়ে মুখ্যযো মশাই কুলপুরোহিত দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে জেনেছেন একেবারে রাজঘোটক। এমন মিল আর কোন কনের ঠিকুজীতে পান নি। স্বধার মত এত স্নেহ আর কোন মেয়ের মধ্যে মেলে নি। ঠিকুজী আর মেয়ের লম্বাশ্রী দেখেই এগিয়েছেন মুখ্যযো মশাই। নইলে হরগোবিন্দের সামাজিক অবস্থা বিচার করলে এতদূর অগ্রসর হওয়ার কারণ ছিল না।

রাজে খাওয়াদাওয়া সেবে ঘরের মেয়ে যখন বাবা আর হাবুলের জন্তে বিছানা পাতবার উত্তোপ করছিল স্বধা, হরগোবিন্দ তত্ত্বপোশে পা ঝুলিয়ে ব'সে সিগারেট টানতে টানতে বললেন, বরানগরের সঙ্ঘর্ষটাই ঠিক করলাম স্বধা। বেশী বড়লোকের পেছনে ছোটোছুটি ক'রে লাভ নেই। নিজের শক্তিসামর্থ্যে যা কুলোয় তাই করাই ভাল। দেখে শুনে মনে হ'ল ওরা আমাদের মতই গেরস্থ। ঠাকুর-দেবতা ধর্মকর্ম মানে। আমাদের সঙ্গে বেশ মিলবে। পাকা-

দেখার দিন ঠিক করবার আগে তোর মাসীকে একবার খবর দিতে হবে। শত হ'লেও এসব কাজ মেয়েছেলে না হ'লে—

হাবুলের জন্তে একটি আর হরগোবিন্দের জন্তে জোড় বালিশ পেতে দিয়ে সন্ত সাবান-কাচা পরিষ্কার ঢাকনি সেই বালিশের ওপর বিছিয়ে দিল স্নান। ছোট ভাইয়ের দিকে চেয়ে বললে, ব'সে ব'সে কিমুচ্ছিস কেন হাবুল, এবার শুয়ে পড়।

তারপর ফের বিছানার চারদিকে চান্দর শূঁজে দিতে লাগল।

হরগোবিন্দ বললেন, আমার কথার জবাব দিচ্ছিস নে যে ?

স্নান বললে, জবাব দেওয়ার আর কি আছে ! ওসব বিয়ে-টব্বির মধ্যে তোমার গিয়ে কাজ নেই।

গিয়ে কাজ নেই মানে ? কেন, সম্বন্ধ কি তোর পছন্দ হচ্ছে না ? ছেলেটির কোটো তো আমি তোকে দেখিয়েছি। বেশ স্নন্দর স্বাস্থ্যবান চেহারা। আমার অফিসের বন্ধুরাও এ সম্বন্ধের বেশ ভারিফ করল।

স্নান বললে, সে জন্তে নয় বাবা। আমি কোনদিন বিয়ে করব না। আমি তোমার কাছেই থাকব।

হরগোবিন্দ সন্তোষে বললেন, তাই কি হয় রে পাগলী ! অবশ্য তুই চ'লে যাবি ভেবে আমারও কি কষ্ট হয় না ? খুবই হয়। কিন্তু হ'লে কি করব। এই তো সংসারের নিয়ম। মেয়েকে পরের ঘরে পাঠাতেই হবে। সেই পরই তার আপন। সেই ঘরে গিয়ে তুই যদি স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখে থাকতে পারিস স্নান, আমার তাতেই সুখ, তাতেই শান্তি।

স্নান বাবার মশারি টাঙিয়ে দিতে দিতে বললে, তুমি এবার শুতে যাও বাবা।

হরগোবিন্দ বললেন, যাচ্ছি রে যাচ্ছি। আমার কথার জবাব দে। তা হ'লে বরানগরের—

স্নান বললে, না বাবা। আমি ও-ধরনের সুখ-শান্তি চাই নে।

সিগারেটের টুকরোটা জানলা দিয়ে ফেলে দেওয়ার জন্তে হরগোবিন্দ তন্তুপোশ ছেড়ে উঠে এসেছিলেন, সেই অবসরে আলো নিবিয়ে নিজের মশারিটা ফেলে দিয়ে স্নান

নিজেই শুয়ে পড়ল। যেন সব আলোচনার এতেই ছেদ পড়ে যাবে।

মেয়ের এই অভব্যতা দেখে মনে মনে ভারি চটলেন হরগোবিন্দ। এত স্পর্ধা ওর হ'ল কোথেকে ! অবশ্য বিয়ের নামে স্নান এর আগেও আপত্তি করত। কিন্তু সে আপত্তির স্বর ছিল অস্ত্র ধরনের, এখনকার মত এমন একগুঁয়ে স্বভাব তো তখন ছিল না স্নান ! এমন উদ্ধত ভক্তিও তখন দেখা যায় নি।

হরগোবিন্দ শুতে গেলেন না। মেয়ের মশারির কাছে দাঁড়িয়ে গলা স্বাসাধ্য নরম ক'রে বললেন, তুই না চাইলেই তো আমি না চেয়ে পারি নে। বাপ হয়ে নিজের স্বার্থের জন্তে তোকে চিরকাল আইবুড়ো ক'রে রাখব, তোর জীবনটাকে নিঃফল ক'রে দেব—এ কথা যে আমি ভাবতেও পারি নে স্নান। তোর কিসে অমত তাই বল, বরানগরের ওই সম্বন্ধ যদি তোর পছন্দ না হয়, ভবানীপুরের সেই ওভারসীয়ার ছেলেটিরই তা হ'লে ফের খোঁজ করি।

স্নান মশারির ভেতর থেকে বললে, না বাবা, তোমার আর কোন খোঁজখবর করতে হবে না।

হরগোবিন্দ ধৈর্য হারিয়ে হঠাৎ ব'লে ফেললেন, তার মানে ? তুমি নিজেই বুঝি খোঁজ-খবর ক'রে রেখেছ ? গুপবতী মেয়ে কিনা ! বেশ, কাকে পছন্দ করছ তুমিই বল।

স্নান চুপ ক'রে রইল।

হরগোবিন্দ বললেন, ব'লে ফেল। আজই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক। বলি, তার নাম ধাম তো আমাকে জানাবি, না কি ?

স্নান বললে, তুমি শুয়ে পড় বাবা। টেচামেচিতে হাবুলের ঘুম ভেঙে যাবে।

হরগোবিন্দ বললেন, ভাঙে ভাঙুক। আমি সব জানতে চাই। তুই সব আমাকে খুলে না বললে আমি কিছুতেই আজ ঘুমোতে পারব না।

স্নান যত্নস্বরে বললে, তোমার সে সব কথা জেনে দরকার নেই বাবা।

হরগোবিন্দ বললেন, জেনেও দরকার নেই ! আমাকে না জানিয়ে শুনিয়েই বুঝি তুই বিয়ে করবি ?

স্বধা বললে, না বাবা, তা কোনদিন করব না। আমি কোনদিনই জীবনে বিয়ে করব না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

হরগোবিন্দ চ'টে উঠে বললেন, বিয়ে করবি কেন, দিনরাত সেই মাস্টারের সঙ্গে কষ্ট-নষ্ট করবি! নিশ্চয় পাড়া ভ'রে গেল। কাকে পছন্দ করেছিল তাই শুনি?

স্বধা তেমনি মুহূর্তে কিছু স্পষ্ট করে বললে, তোমার স্তনে লাভ নেই বাবা। তার সঙ্গে তুমি কোনদিন আমার বিয়ে দেবে না। আর তোমার অমতে আমিও তাকে বিয়ে করব না। যেমনি আছি তেমনিই থাকব।

দাঁতে দাঁত ঘষলেন হরগোবিন্দ, বললেন, থাকা না-থাকা বুঝি তোমার ইচ্ছে? হারামজাদী! ওই হতভাগা মাস্টার ছোকরাকে তুমি সব সমর্পণ ক'রে বসেছ। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম।

স্বধা শাস্তভাবে বললে, বুঝতে তুমি অনেক আগেই পেরেছ বাবা। রাত দুপুরে আর চেষ্টামেচি ক'রো না—বাড়িভুক্ত লোক সব স্তন্যে পাচ্ছে। তুমি যাও, শুয়ে ঘুমোও গিয়ে।

হরগোবিন্দ বললেন, ই্যা, ঘুমোব। ঘুমোবার তুমি কত ব্যবস্থা ক'রে রেখেছ।

স্বধা কোন কথা না বলে পাশ ফিরল। যেন গভীর ঘুম পেয়েছে তার।

হরগোবিন্দ ফিরে এসে নিজের বিছানায় ঢুকলেন। হাবুল ঘুমের ঘোরে পাশবানিশ ভেবে বাপকে জড়িয়ে ধরল। বছর তেরো-চোদ্দ হ'ল বয়স। কিন্তু এই বয়সেও ওর মুখ থেকে লাল পড়ে। সেই লাল লাগল হরগোবিন্দের গায়ে। কিন্তু তাঁর মনে মোটেই বাৎসল্য-রস উদ্ভিক্ত হ'ল না। ঘৃণা বিরক্তি আর বিদ্বেষে তিনি ঠেলে দূরে সরিয়ে দিলেন ছেলেকে। সব শত্রু, সব শত্রু। অল্পবয়সে স্বধাও তো এমন ক'রে তাঁকে জড়িয়ে ধরত। তাঁর বুকের সঙ্গে মিশে না থাকলে, তাঁর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে না থাকলে স্বধার ঘুম আসত না। স্বধার মা নির্মালা হাসত, কি পাজী আর হিংস্টে মেয়ে দেখেছে। হরগোবিন্দের সেই বুকের স্বধা আজ বিষ হয়ে গেছে।

একটা মশা কি ক'রে যেন ঢুকেছে মশারির মধ্যে। স্তন স্তন ক'রে অনেকক্ষণ ধ'রে বিরক্ত করছে কানের

কাছে। হরগোবিন্দ অতিষ্ঠ হয়ে উঠে বসলেন। তারপর সেই অন্ধকারেই দু হাতের তালুতে প্রচণ্ড শব্দ ক'রে স্ক্রু ক'রে দিলেন সেই গুনগুনানি। মনে মনে হাসলেন হরগোবিন্দ। তাঁর লক্ষ্য অব্যর্থ। মশার সামান্য রক্ত দু হাতেই লেগে রইল। কিন্তু হরগোবিন্দ হাত মুছলেন না।

ভোর-ভোর সময়ে ডেকে তুললেন ছেলেকে : এই, ওঠ, ওঠ। কত আর ঘুমবি?

হাবুল বললে, আর একটু পরে উঠব বাবা।

না, ওঠ। সকালে ওঠা ভাল।

হাতমুখ ধোয়ার পর হাবুলকে বললেন, চল, বেড়িয়ে আসি। সকালের হাওয়া গায়ে লাগালে শরীর ভাল থাকে।

পুকুর ছাড়িয়ে ছোট্ট মাঠ। সেই মাঠে নেমে হঠাৎ ছেলের হাতখানা নিজের মূর্তির মধ্যে তুলে নিলেন হরগোবিন্দ।

হাবুল ভয়ে আঁতকে উঠল; বললে, আমার কোন দোষ নেই বাবা, আমাকে মেরো না। আমি দিদিকে গোড়াতাই বারণ করেছিলাম।

হরগোবিন্দ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকালেন। পরনে হাফপ্যান্ট, ছিপছিপে রোগা চেহারা। গায়ের রঙ খুব ফরসা। মাথার চুলগুলি কটা আর কৌকড়ানো। ছেলেটার চোখ দুটো ঠিক ওর মার মত বড় বড় হয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে স্নেহের পরিবর্তে নির্মম কৌতুক আর কৌতুহল উদগ্র হয়ে উঠল হরগোবিন্দের। মুহূর্তেই বললেন, আমি জানি, তোর কোন দোষ নেই। তুই খুবই ভাল ছেলে। আমাকে সব খুলে বল। ভয় নেই, স্বধা কিছু জানতে পারবে না।

হাবুল ভবু বলতে চায় না। কেবল আমতা আমতা করে। কিন্তু ঝাড় উকিলের মত জেরা ক'রে ক'রে সব বের ক'রে নিলেন হরগোবিন্দ। বই এনে দেওয়া আর ফিরিয়ে দেওয়ার সময় কি ক'রে টুকরো চিঠির আদানপ্রদান চলেছে দুজনের মধ্যে, কবে সহপাঠিনী সখীর সঙ্গে দেখা করার নাম ক'রে বেশবন্ধু পার্কে স্বধা গিয়ে সাক্ষাৎ করেছে ইন্দু মাস্টারের সঙ্গে। কবে একদিন ম্যাটিনি শোতে ওরা সিনেমা দেখতে গিয়েছিল, হাবুলের বাওয়ার কথা ছিল সেই সঙ্গে, কিন্তু হঠাৎ ওরা তাকে আর এক বছর সঙ্গে চিড়িয়াখানায় নতুন বাঘ দেখতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। হাবুল কিছুই গোপন

করল না, গোপন করতে পারল না। ফেরবার সময় মোড়ের দোকান থেকে বড় এক ঠোঙা কচুরি জিলিপি আর হালুয়া কিনে নিলেন হরগোবিন্দ। এসব খাবারের ওপর হাবুলের দারুণ লোভ। কিন্তু কোনদিন তিনি ছেলে-মেয়েকে এগুলি খেতে দেন না। আজ দিলেন।

হাবুল কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করলে : ওসব কেন নিচ্ছ বাবা ?

হরগোবিন্দ বললেন, খা একদিন। এসব তো তোরা ভালবাসিস।

হাবুলের মনে হ'ল, মুখে ও-কথা বলছেন বটে বাবা, কিন্তু চোখ দুটো সন্ত-ধ'রে-আনা চিড়িয়াখানার সেই বাঘের মতই জলজল করছে। ভয়ে ভয়ে বাপের পিছনে পিছনে সে বাড়িতে ঢুকল। না জানি কি কাণ্ড ঘটে চা খাওয়ার সময়!

কিন্তু হরগোবিন্দ স্বধাকে কিছু বললেন না। শুধু চা আর খাবার খেতে খেতে মেয়ের দিকে বার কয়েক চোখ তুলে তাকালেন। সেই চোখের দিকে চেয়ে একবার শুধু স্বধা শিউরে উঠল। কিন্তু দ্বিতীয় বার আর ভয় পেল না। তার দু চোখ থেকেও ঘৃণা আর বিদ্বেষ আগুনের হলকার মত বাপের ওপর ক'রে পড়তে-লাগল। বাপ আর মেয়ের মধ্যে যেন কোনদিন কোন মধুর সম্পর্ক ছিল না, স্নেহ আর প্রেমের স্বাদ যেন কেউ কোনদিন পায় নি। হৃৎকেন্দ্রে যেন হৃৎকেন্দ্রে শব্দ হয়েই জ্বলেছে।

হরগোবিন্দ মুখে কিছুই বললেন না, মেয়ের কাছে কোন কৈফিয়ৎ চাইলেন না। অন্য দিনের মতই বাজার করলেন, ফিরে এসে দাড়ি কামালেন, নাওয়া-খাওয়া শেষ ক'রে আপিসের জন্তে তৈরি হলেন, স্বধা অন্য দিনের মতই ঘরের কাজকর্ম ও রান্নাবান্না সারল, ঠাই ক'রে বাপ আর ভাইকে ভাত-বেড়ে দিল। তবু হাবুলের মনে হতে লাগল আজকার দিনটা আলাদা। কেমন যেন ধ্বংসের ভয়-ভয় ভাব তাকে সারা দিন আচ্ছন্ন ক'রে রাখল। খেয়েদেয়ে ফুলে যাওয়ার পরেও বাবার জলন্ত চোখ আর দিদির নিবন্ধ মুখের কথা হাবুলের বার-বার মনে পড়তে লাগল।

হরগোবিন্দ ব'লে গিয়েছিলেন অফিস থেকে তাঁর ফিরতে অনেক রাত হবে। কিন্তু দেখা গেল অন্য দিনের চেয়ে অনেক সকাল সকাল, সন্ধ্যার বেশ একটু আগেই

ফিরে এলেন তিনি। স্বধা বাবাকে এত তাড়াতাড়ি ফিরতে দেখে একটু বিস্মিত হ'ল। কিন্তু কোন কৌতূহল প্রকাশ করল না, কি কোন কারণ জিজ্ঞাসা করল না, নিঃশব্দে চা করল, পাপর ভাজল, হরগোবিনদের সামনে ধ'রে দিল, কিন্তু অন্য দিনের মত কোন কথা বলল না। হরগোবিন্দ ভেবেছিলেন, মেয়ে ক্ষমা চাইবে, ভিত্তিহীন কৈফিয়ৎ দেওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু সে সব কিছুই হ'ল না। মৌনতার মধ্যে স্বধার যে স্পর্ধা, যে বেপরোয়া ভাব ফুটে বেরল তাতে ভিতরে ভিতরে হরগোবিন্দ জ্বলতে লাগলেন। এক সময় জিজ্ঞাসা করলেন, কই, হাবুল ফিরল না? স্বধা বললে, খেলতে গেছে, ফিরবে এখন।

খানিক বাদেই হাবুল ফিরে এল। বাবাকে দেখে চমকেও গেল একটু। কিন্তু হরগোবিন্দ সংক্ষেপে শান্তভাবে বললেন, পড়তে ব'স।

আর তার একটু পরেই এল ইন্দুভূষণ। হাতে এক ভজন রজনীগন্ধা। দিন কয়েক আগে স্বধার খালি ফুলদানি লক্ষ্য ক'রে ইন্দুভূষণ বলেছিল, কি, ফুলের শব্দ মিটে গেল নাকি? আজকাল যে আর ফুল দেখি নে! স্বধা জবাব দিয়েছিল, শব্দ মিটেবে কেন? কিন্তু কদিন ধ'রে স্বধন আর এ পাড়ায় আসে না, ফুলও রাখতে পারি নে। বোধ হয় অস্বথ-বিস্বথ হয়েছে ওর। ইন্দুভূষণ হেসে বলেছিল, যদি আপত্তি না থাকে স্বধনের অস্বথ না সারা পর্যন্ত তার কাজটা আমিও নিতে পারি।

সেই ফুল আজ নিয়ে এল ইন্দুভূষণ। কিন্তু ঘরের ভিতরে হরগোবিন্দকে দেখে কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। তার আসার সময় সাধারণত তিনি থাকেন না। প্রায়ই ইন্দুভূষণের বেরোবার মুখে তিনি ঘরে ঢোকেন। তা ছাড়া স্বধার মুখ আজ বড়ই গম্ভীর, আর বিষন্ন। কেউ কোন কথা বলছে না দেখে ইন্দুভূষণ বললে, হাবুল, ফুলগুলি তুলে রাখ।

হরগোবিন্দ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি রাখছি। বাঃ, চমৎকার মোটা-মোটা ডাঁটাগুলি তো! এ ফুল বোধ হয় ধারে কাছে পাওয়া যায় না, কি বলেন মাস্টার মশাই! ইন্দুভূষণ লজ্জিত হয়ে বললে, আজ্ঞে না। কলেজ স্ট্রীট মার্কেট থেকে এনেছি।

হরগোবিন্দ বললেন, ভারি চমৎকার ফুল।

ইন্দুভূষণ হাবুলকে পড়াতে শুরু করল। আর সেই ফাঁকে হরগোবিন্দ উঠে একবার বাড়ির ভিতরে চ'লে গেলেন। অল্প ভাড়াটেদের সঙ্গে কিসকিন্স ক'রে কি যেন আলাপ করলেন।

ইন্দুভূষণ স্বধার দিকে চেয়ে বললে, কি ব্যাপার? আজ বে এমন—

স্বধা ভাইকে ইচ্ছিতে দেখিয়ে চৌটে আঙুল ছোঁয়াল। তার মানে আজ হাবুলও বেদলী হয়েছে। আরও সাবধান আরও সতর্ক হবার প্রয়োজন হয়েছে স্বধা আর ইন্দুভূষণের।

খানিকক্ষণ বাদে হরগোবিন্দ ক্বিরে এসে নিজের জায়গায় তেমনি স্থির হয়ে বসলেন। ইন্দুভূষণ অল্প দিনের তুলনায় আজ কিছুক্ষণ বেশী সময় নিয়ে বেশী যত্ন ক'রে পড়াল ছাত্রকে। তারপর পরের দিনের জন্তে অল্প আর ট্রান্সলেশনের টাস্ক দিয়ে বিদায় নিয়ে বেরোতে যাবে হরগোবিন্দ এলেন পিছনে পিছনে : মাস্টার, চল, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি। তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

স্বধা এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিল। এবার দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণস্বরে বললে, ওঁকে যা বলবার আমার সামনে বল বাবা। ওঁকে তুমি কিছুতেই অপমান করতে পারবে না।

হরগোবিন্দ বললেন, অপমান করব কেন? শুধু ছ-একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রে নেব। কি মাস্টার, তোমার কি ভয় হচ্ছে?

ইন্দুভূষণ একবার স্বধার দিকে-তাকাল, তারপর হরগোবিন্দের দিকে চেয়ে বললে, না, ভয় কিসের? চন্দন। পুকুর ছাড়িয়ে সেই ছোট্ট মাঠ। মাঠ পেরিয়ে শহরভল্লীর নির্জন সড়ক অন্ধকার গলি। সেই গলির মুখে হরগোবিন্দ হঠাৎ থেমে দাঁড়ালেন। তারপর ইন্দুভূষণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, মাস্টার, তোমার পেশাটা কি সত্যি ক'রে বল তো? ছেলে-পড়ানো, না, মেয়ে-বখানো?

ভয়ে ইন্দুভূষণের বুক কাঁপছিল, কিন্তু মুখের বড়াই অত সহজে ছাড়ল না : আপনার ও-ধরনের কথার জবাব দিতে আমি প্রস্তুত নই।

আচ্ছা, আমরা তোমাকে প্রস্তুত ক'রে নিচ্ছি।—ব'লে

জনছয়েক ছারামুতি মাঠের ভিতর থেকে এগিয়ে এল। এদের কাউকে কাউকে চিনতে পারল ইন্দুভূষণ। এরা স্বধার সেই প্রভিবেশী দাদার দল। একই বাড়ির ভাড়াটে।

ইন্দুভূষণ ভয় পেয়ে বললে, কি মতলব আপনারদের। মারবেন নাকি?

একজন বললে, না না না, আমরা শুধু জবাবটুকু বের ক'রে নেব।

আর একজন উপমা দিয়ে বুঝিয়ে বললে, টিউব টিপে শুধু পেস্টটুকু বের ক'রে নেব দাদা।

হরগোবিন্দ তাদের সঙ্গে এসেছিলেন। একজন বললে, মেসোমশাই, আপনাকে আর আসতে হবে না। আমরা আপনাকে ঠিক সময়ে খবর দিয়ে আসব।

খবর পাওয়া গেল সপ্তাহ খানেক বাদে। হাসপাতালে জরবিকারে মৃত্যু হয়েছে ইন্দুভূষণের। প্রথমে দিন কয়েক মেসেই প'ড়ে ছিল। আহত অবস্থায় কারা যেন মেস-বাড়ির দরজায় পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল তাকে। প্রথমে মেসের লোকেরা তেমন গ্রাহ্য করে নি। তারপরে অবস্থা ধারাপ হওয়ায় কয়েকজনে তাকে হাসপাতালের জেনারেল ওয়ার্ডে ভরতি ক'রে দিয়ে আসে।

স্বধা সাত দিন ধ'রেই ছটকট করছিল। কিন্তু হরগোবিন্দ কড়া পাহারা বসিয়েছিলেন দোরগোড়ায়। কেউ তাকে ঘর থেকে বেরোতে দেয় নি। খবরটা সকলেই চাপতে চেষ্টা করেছিল। তবু চাপা রইল না। বাড়ির ছেলোদের কিসকিন্সানির ভিতর দিয়ে সে খবর স্বধার কাছে ভেসে এল।

স্বধা কাঁদল না, টেচামেচি করল না, শুধু দিন দুই বিছানায় উপুড় হয়ে প'ড়ে রইল। শুকনো কালো একরাশ চুল পিঠের ওপরে ছড়ানো। তার ফাঁকে স্বন্দর তরুমেহ থেকে থেকে কৈপে কৈপে উঠতে লাগল।

হরগোবিন্দ পাশে এসে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, স্বধা!

স্বধা কোন জবাব দিল না।

হরগোবিন্দ মেয়ের পিঠে আশ্তে আশ্তে হাতখানি রাখলেন। স্বধা কোন সাড়া দিল না।

হরগোবিন্দ বললেন, স্বধা, তুই আমাকে বিশ্বাস কর, এতটা বে হবে আমি ভাবতেই পারি নি। আমরা ওকে শাস্তি দিতেই চেয়েছিলাম, সরিয়ে দিতে চাই নি।

স্বা কোন মন্তব্য করল না।

তৃতীয় দিনে স্বা ফের উঠে দাঁড়াল। আবার সংসারের কাজে হাত দিল, ভাইয়ের জুল আর বাপের আপিসের রান্না রান্নাতে বসল। ওপর থেকে সবই ঠিক আগের মতই চলতে লাগল। কিন্তু ভিতর থেকে কোন কিছুই আর আগের মত রইল না। একটি মেয়ে রাঁধে, বাড়ে, ঘর শুছোয়, বিছানা পাতে—সবই করে। হরগোবিন্দ চেয়ে চেয়ে দেখেন। এ যেন তাঁর সেই চির-আদরের স্বা নয়, তারই একখানা অবিকল পাথরের প্রতিমূর্তি। সেই মূর্তির চোখ আছে, তাতে পলক নেই; সে মূর্তির অপরূপ ছুটি হৃদয় রক্তাভ ঠোঁট আছে, কিন্তু তাতে হাসি নেই; সে মূর্তির বুকের নীচে হৃদয়ও হয়তো আছে, কিন্তু তাতে স্নেহ মমতা প্রীতি প্রদায় চির মাত্র নেই।

এই পাথর আর বরফের দেশে হাবুল বৈশীক্ষণ থাকতে পারে না। তার যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। শুধু খাওয়া আর শোওয়ার সময় ছাড়া সারাদিন বাইরে বাইরে থাকে। কিন্তু হরগোবিন্দকে তার চেয়ে বৈশীক্ষণ থাকতে হয়। মেয়ের ভাবভঙ্গি দেখে এখনও তাঁর গায়ে জ্বালা ধরে, মনে রাগ হয়; কিন্তু রাগ প্রকাশ করতে কোঁথায় যেন বাধে! আস্তে আস্তে সব দাহ প্রদাহ সব উত্তেজনা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। এক সীমাহীন ক্ষীণতল সমুদ্রের মধ্যে তাঁরা দুজনে যেন জনপ্রাণীহীন তর্পণশূন্য দুই দ্বীপ। শুধু দূর থেকে একজনকে আর একজনের চোখে পড়ে। পারাপার হবার মত মাঝখানে কোন সেতু নেই, খেয়া নেই।

একদিন হরগোবিন্দের চোখে পড়ল, স্বা বেশভূষা সব ছেড়ে দিয়েছে। কালোপেড়ে শাড়ি পরে। হাতে/দুগাছি চুড়ি ছাড়া আর কোথাও কোন গয়না নেই। সোনার গয়নাও নয়, ফুলের গয়নাও নয়। আর একদিন খাওয়ার সময় লক্ষ্য করলেন, স্বা শুধু ডাল-তরকারি দিয়ে খেয়ে উঠছে। মাছ-মাংস ছুঁয়েও দেখছে না। সব বাপ আর ভাইকে দিয়ে দিচ্ছে।

হরগোবিন্দ কিছুক্ষণ শুক্ন হয়ে থেকে বললেন, মাছ খেলি নে কেন স্বা?

স্বা বললে, খেতে ইচ্ছে করে না।

হরগোবিন্দ বললেন, কিন্তু কেন ইচ্ছে করে না শুনি?

তুই কি বিধবা? ভোদের কি বিয়ে হয়েছিল?

স্বা বললে, মন্ত্রপড়া বিয়েটাই কি সব?

হরগোবিন্দ বললেন, ছি ছি ছি, বাপের সামনে এ কথা বলতে তোর লজ্জা হ'ল না?

স্বা নির্বিকারভাবে বললে, তুমি শুনতে চাইলে তাই বললাম। অিজ্ঞেস করতে তোমারও তো লজ্জা হয় নি বাবা।

হরগোবিন্দ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, তোর সব কথা মিথ্যে স্বা। কেবল জেন ক'রে এসব কথা বলছিল। এমনি ক'রে আমার ওপর শোধ নিতে চাচ্ছিল। কিন্তু তুই আমাকে দিনরাত পুড়িয়ে মারছিল কেন? তোর যদি সন্দেহ হয়ে থাকে, তুই এর চেয়ে থানা-পুলিস কর, আইন-আদালত কর, সে অনেক ভাল।

একটু যেন হাসি ফুটল স্বার মুখে। স্বা বললে, সে সব যারা করতে পারত তেমন আত্মীয়স্বজন তার কেউ নেই। থাকার মধ্যে আছি আমি। কিন্তু আমি যে তোমার মেয়ে। তুমি খুন ক'রে এলে তোমার সেই হাত আমি আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেব। সে হাতে শিকল পরাব কেন? আমি যে তোমার মেয়ে।

হরগোবিন্দ আত্ননাদ ক'রে উঠলেন: তুই আমার কেউ ন'স, কেউ ন'স। তুই আমার শত্রু, চিরজন্মের শত্রু।

কিছুদিন চুপচাপ থাকবার পর হরগোবিন্দই ফের এগিয়ে আসতে চেষ্টা করেন, মৃত সম্পর্কে আবার যেন উজ্জীবিত ক'রে তুলতে চান। নিজের থেকেই কথা আরম্ভ করেন হরগোবিন্দ। ১০ রাত্রে শুয়ে শুয়ে আগের মতই পুরোন দিনের কথা তোলেন। স্বার মায়ের গল্প, মামাবাড়ির গল্প। কিন্তু বাপের স্বভিকথার স্বার আর কোন আগ্রহ নেই। হরগোবিন্দ একাই কথা ব'লে যান। তক্তাপোশ থেকে স্বার কোন সাড়া মেলে না।

হরগোবিন্দ বলেন, ও স্বা, ঘুমোনি নাকি?

স্বা অতি সংক্ষেপে জবাব দেয়, হাঁ।

মাছধরার গল্প, নৌকাডুবির গল্প, বিদেশ বিভূঁইয়ের নানা রকম হাস্যাহসিক রোমাঞ্চকর কাহিনী শুরু করেন হরগোবিন্দ। যে সব কাহিনী স্বা উৎকর্ষ হয়ে রক্তধাসে শুনত আজ আর সে সব গল্পে তার কোন কোঁতুল নেই।

হাসির গল্পে সুধা আর হাসে না, ভূতের গল্পে ভয় পায় না, ঘর-সংসারের আলোচনায় কোন উৎসাহ আগ্রহ প্রকাশ করে না। কিছুতেই সেই আগের মত আলাপ জমতে পারেন না হরগোবিন্দ।

সেদিন অক্সিস থেকে ভাড়াভাড়াড়ি করে এলেন তিনি। তিনখানা সিনেমার টিকিট একেবারে কিনে নিয়ে এসেছেন।

হরগোবিন্দ বললেন, চল যাই সুধা, কতদিন ছবি দেখি নে। মধুমালতীর মত এমন চমৎকার বই শিগগির আর আসে নি। কথায় কথায় গান। তুই তো গান ভালবাসিস।

ছেলেকে ইশারা করেন হরগোবিন্দ। হাবুল ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গিয়ে বলে, চল না দিদি।

সুধা জবাব দেয়, আমাকে বিরক্ত করিস নে হাবুল। তোদের ইচ্ছে হয় তোরা যা।

অহরোধ উপরোধ ছেড়ে হরগোবিন্দ ফের রাগারাগি শুরু করেন। কিন্তু কোন ফল হয় না। শেষ পর্যন্ত টিকিট তিনখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেন তিনি।

যাচুঘর, চিড়িয়াখানা, লোক কি গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাবেও আর কান দেয় না সুধা। বলে, তোমরা যাও।

আর একদিন ভরি তিনেক ওজনের একগাছি হার নিয়ে এলেন হরগোবিন্দ। ধানের ছড়ার ডিজাইন। নতুন উঠেছে। বললেন, পরে দেখ সুধা, তোকে ভারি চমৎকার মানাবে।

সুধা বাপের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে আশ্তে আশ্তে বললে, কেন মিছিমিছি টাকাস্তুলি নষ্ট করলে বাবা! আমি তো ওসব ছেড়ে দিয়েছি।

ছেড়ে দিয়েছি! ঠাঁত কিড়মিড় করতে থাকেন হরগোবিন্দ। কিন্তু কোন ফল হয় না। বাপের স্নেহের যেমন প্রত্যাশা করে না সুধা তেমনি শাসনকেও ভয় করে না আর। নিখুঁত আক্রোশে হরগোবিন্দ মাঝেমাঝে আগুনের মত জ্বলে ওঠেন আবার গভীর নৈরাশ্রে বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে যান।

একদিন বউবাজার থেকে সুধার মাসী কমলা এল খোঁজ নিতে। সুধাকে নিয়ে যাবার জন্তে অনেক মাধাসাদি

করল। কিন্তু সে কিছুতেই যাবে না। বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে কমলা হরগোবিন্দকে তিরস্কার করে বললে, জামাইবাবু, আপনিই বা কি ধারার মানুষ! এমন হাত-পা কোলে করে বসে আছেন কেন? জোর করে বিয়ে দিয়ে দিন মেয়েটার। যেমন করে হোক, যার সঙ্গে হোক, বিয়ে দিন।

হরগোবিন্দ বললেন, সেই বরানগরের মুখ্যদ্বারা তো পিছিয়ে গেল।

কমলা বললে, যাবে না? ভাংচি দেওয়ার লোকের অভাব আছে নাকি এখানে? ভাল চান তো এই বাড়ি ছাড়ুন, পাড়া ছাড়ুন। কলকাতা শহরে কি আর জায়গা নেই?

কমলা শুধু রূপবতীই নয়, বুদ্ধিমতীও। ভেবেচিন্তে তার পরামর্শ নেওয়াই ঠিক করলেন হরগোবিন্দ। উত্তর ছেড়ে চ'লে গেলেন দক্ষিণে। কালীঘাটের সদানন্দ রোডে পঁচাত্তর টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট ভাড়া করলেন। সুধা শোবার ঘর। রান্নাঘর বাথরুম সব আলাদা। মেয়ে-জামাই এসে মাঝে মাঝে যদি বাস করে, কোন অসুবিধে হবে না।

বাড়ি বদলানোর ব্যাপারে সুধা কোন আপত্তি করল না, কিন্তু বিয়ের কথায় ফের বৈকে বসল।

সুধা বললে, তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিতে পার, সরিয়ে দিতে পার, কিন্তু জোর করে বিয়ে তুমি আমাকে কিছুতেই দিতে পারবে না। তা হ'লে চরম কেলঙ্কারি হবে।

মেয়ের মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে গেলেন হরগোবিন্দ। ওকে বিশ্বাস নেই, ও এখন সব করতে পারে।

আবার কিছুদিন চূপ করে রইলেন হরগোবিন্দ। চূপ করে রইল সুধা। দুজনের মাঝখানে শব্দহীন দুঃসহ সেই শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যেতে লাগল।

সুধাকে এখন আর বাপ-ভাইয়ের সঙ্গে এক ঘরে থাকতে হয় না। সে আলাদা ঘর পেয়েছে। মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে মেয়ের সেই ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখেন হরগোবিন্দ। দেখবার মত কিছু নেই। দায়ী কোন আসবাবপত্র সে ঘরে রাখতে দেয় নি সুধা। এমন কি, একখানা তক্তাপোশ পর্যন্ত না। ঘরের এক কোণে দেয়ালের ধারে বিছানা গুটানো। ডান দিকে ছোট একটি বইয়ের শেল্ফ। বইগুলি না খুলেও হরগোবিন্দ বুঝতে পারেন

এগুলি তার দেওয়া, যে শত্রু ম'রেও মরে নি। তাকের ওপরে একটি শূন্য ফুলদানি। সেদিন ফিরে এসে হরগোবিন্দ ব্রজনাগদ্বাণ্ডলি বাইরে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন। তারপর ফুলদানিতে আর কোন ফুল রাখে নি সুধা।

আবার একদিন স্নেহকে নিজের কাছে ডেকে নিলেন হরগোবিন্দ, বললেন, সুধা, আমি তোরা বাপ।

সুধা বললে, কি বলছ বল।

হরগোবিন্দ খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, আমাদের কি তুই কমা করতে পারিস নে?

সুধা মুখ নীচু ক'রে বললে, ওসব কথা থাক বাবা।

এর পর হরগোবিন্দ কি বলবেন ভেবে পেলেন না।

আরও কিছুক্ষণ ব'সে থেকে থেকে সুধা এক সময় উঠে নিজের ঘরে চ'লে গেল।

ছোট টেবিলটিতে ব'সে হাবুল নিজের মনে পড়ছিল। আজকাল ও একা-একাই পড়ে। নিজের মনেই থাকে। বাড়ির এই নিঃসঙ্গ একক জীবনে হাবুলও এতদিনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। বাবা আর দিদির মাঝখানে সে আর বোজক নয়, সেও যেন স্বতন্ত্র তৃতীয় একটি স্বীপ।

ছেলের দিকে হরগোবিন্দ অপলকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। আরও লম্বা হয়েছে। কিন্তু রোগাটে ভাবটি যায় নি। দেখলে কেমন যেন মায়ী হয়। হরগোবিন্দ বললেন, হাবুল, শোন। হাবুল বললে, কি বাবা? হরগোবিন্দ বললেন, আয়, আমার কাছে আয়।

হাবুল বিস্মিত হয়ে উঠে এল। বাবা অনেক দিন হ'ল এমন ক'রে ডাকেন না। ভয়ে ভয়ে কাছে এসে দাঁড়াল। হরগোবিন্দ হঠাৎ তক্তাপোশ ছেড়ে উঠে এসে ছেলেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন, হাবুল, আমার হাবুল—

হাবুল কিছুক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর অতিকষ্টে দম ছাড়তে ছাড়তে বললে, বাবা, আমাকে ছেড়ে দাও। বড্ড লাগছে। ব্যথা পাচ্ছি।

হরগোবিন্দ যেন চমকে উঠলেন, ছেলেকে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিয়ে বললেন, তুইও ব্যথা পাচ্ছিস? আচ্ছা যা।

হাবুল ফের গিয়ে পড়তে বসল। হরগোবিন্দ পা টিপে টিপে জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু জানলাটা আর খুললেন না। খুললেই সুধাকে দেখা যাবে। দেয়ালের

কাছে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। উৎকর্ণ হয়ে যেন কিছু একটা শুনতে চাইছেন তিনি। কিন্তু কিছুই শোনা গেল না। শুধু নিজের দীর্ঘশ্বাসের শব্দই কানে ভেসে এল।

পরদিন সকাল সকাল অফিসে বেরলেন হরগোবিন্দ। একই টেবিলে ব'সে কাজ করেন স্নেহের সমান্দার। হরগোবিন্দের সহকর্মী সময়সী। খুব সামাজিক আর সদালাপী মানুষ। চারদিকের খোজখবর রাখেন। সাধ্যমত উপকার করেন সহকর্মীদের। অবিবাহিত ছেলের জন্তে মেয়ে খুঁজে দেন, মেয়ের জন্তে ছেলে। মনিবদের জন্তে বি আর ঠাকুর-চাকরের খোজ আনেন, কর্মপ্রার্থী বেয়ারাদের মনিব জুটিয়ে দেন। এতদিন তাঁর কাছে মুখ খোলেন নি হরগোবিন্দ, আজ মন খুললেন।

• ফাইল-পত্র ভাগ ক'রে নিতে নিতে বললেন, ভাই স্নেহ, আমার একটা কাজ ক'রে দেবে?

স্নেহনবাবু বললেন, কি কাজ?

একটি ছেলে দেখে দেবে আমাকে?

কি রকম ছেলে?

বামুনের ছেলে হ'লেই ভাল হয়। অল্প জাত হ'লেও—

অল্প জাত হবে কেন? তুমি বামুন, তোমাকে বামুনের ছেলেই দেব। বামুনের অভাব আছে নাকি? তারপর? ছেলেটি এম. এ. পাস হ'লেই ভাল হয়, বি. এ. পাস হ'লেও ক্ষতি নেই।

স্নেহনবাবু বললেন, কেন এম. এ. পাস ছেলের অভাব আছে নাকি? তারপর?

হরগোবিন্দ বললেন, কাজ-কর্ম যা করে করুক। খেয়ে প'রে থাকতে পারলেই হ'ল।

স্নেহনবাবু হেসে বললেন, বিলক্ষণ। তারপর? কার জন্তে হে? নিজের মেয়ের জন্তে নাকি? আরে ভাই, খুলেই বল না জামাই চাই একটি। আছে আমার হাতে। জামাই করতে চাও তো বল।

হরগোবিন্দ বললেন, না ভাই, জামাই নয়, জামাই নয়।

স্নেহনবাবু বললেন, তবে?

হরগোবিন্দ বন্ধুর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বললেন, একজন প্রাইভেট টিউটর—ছেলের জন্তে একজন প্রাইভেট টিউটর।

এই গ্রন্থের কলন

দীপক চৌধুরী

সপ্তম রাতি

বন্ধু, এইমাত্র খবর পেলুম যে, অমিতাভের আজ আর জ্বর নেই। আজ সকাল থেকে নিশীথ সেখানেই আছে। আছে এবং অমিতাভের বিছানার কাছে বসে সেবা করছে। অদ্ভুত এই লোকটি! অমিতাভের প্রতি ওর মনোভাব তো আমার আর জানতে বাকি নেই! অমিতাভকে সে একেবারেই পছন্দ করে না। তবু সকাল থেকে নিশীথ ওখানেই পড়ে আছে। সন্ধ্যায়, ফাদার ছুবোয়া পর্যন্ত নিশীথের কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেছেন। এমন নিঃস্বার্থভাবে কোন নিরক্ষর লোক যে কাউকে সেবা করতে পারে তা তিনি এই প্রথম দেখলেন। নিশীথের কল্যাণের জন্তে ফাদার ছুবোয়া নাকি আজ সন্ধ্যাবেলা গীর্জাতে গিয়ে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে প্রার্থনা করেছেন! আশা করি, শেষ পর্যন্ত নিশীথের কল্যাণ হবে। হয়তো হবেই।

কিন্তু আমার বিশ্বাস, একেবারে নিঃস্বার্থভাবে নিশীথ অমিতাভকে সেবা করতে যায় নি। ওর একটা কিছু গোপন উদ্দেশ্য ছিল বলে আমার সন্দেহ হচ্ছে। অমিতাভকে ছুঁয়ে দেখবার সৌভাগ্য ওর এই প্রথম এসেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অমিতাভ যে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল তার খবরটা নিশীথ শুনেছে লোকের মুখ থেকে। অমিতাভের মুখ থেকে আজ পর্যন্ত সে একটা কথাও শোনে নি। নিশীথ কেন, আমিও শুনি নি। হয়তো—। হয়তো কেন, অমিতাভকে সত্যি সত্যি পরীক্ষা করে দেখবার জন্তেই নিশীথ গেছে ফাদার ছুবোয়ার গেস্ট-হাউসে। বাইরে থেকে অমিতাভের কতটুকু ক্ষতি আমরা দেখতে পেয়েছি? একটা হাত, একটা পা এবং একটা চোখ ওর নেই, কিন্তু—?

যত্না, সত্যিই যদি নিশীথ সেই উদ্দেশ্য নিয়েই সেখানে গিয়ে থাকে, তা হলে ওকে আমি দোষ দেব কি ক'রে? নিশীথের বোধ হয় ধারণা জন্মেছে যে, অমিতাভকে আমি ভালবাসি। বিশ্বের অহুষ্ঠান ছাড়া যে ভালবাসার কোন

সার্থকতা নেই তেমন ধারণা নিশীথের অনুগত। অতএব, অমিতাভকে ভালবেসে লাভ কি? তুই নিজেও তো তাকে ভালবাসতে পারতিন না, রত্না। পারতিন কি? তোর স্বামী যদি অমিতাভের মত গুরুতরভাবে আহত এবং অকেজো হয়ে পড়তেন, তা হলে তুই কি তাঁকে বিয়ে করতে পারতিন? জানি, এখন তোরা সব লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দিবি। ঘরে দুটো তোর ছেলেমেয়ে আছে কিনা, তাই তুই হয়তো বলবি যে, সত্যিকারের ভালবাসার সঙ্গে ঘেহের কোন সম্পর্ক নেই। এসব কথা গল্প উপস্থাসে চলে, কিন্তু—। একটু দাঁড়া। নিশীথ এসেছে।

জয়া বহু কলমটা রেখে দিয়ে নিশীথকে জিজ্ঞাসা করলেন, অমিতাভ কেমন আছে? চলে এলি কেন?

তিনি ভাল আছেন। জ্বর নেই। দু-তিন দিনের মধ্যেই হয়তো ভাত খেতে পারবেন। কিন্তু এখানে আসতে তাঁর অসুস্থত এক সপ্তাহ লাগবে।

এক সপ্তাহ? বলিস কি?—মিস জয়া বহু যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

হ্যাঁ দিদিমনি, এক সপ্তাহের বেশিও হতে পারে।

তা হলে আমিই যাব ফাদার ছুবোয়ার গেস্ট হাউসে।— এই বলে মিস জয়া বহু চিঠির কাগজগুলো সব শুছোতে লাগলেন।

একটু হেসে নিশীথ বললে, শুনেছি ওখানে মেয়েদের যাওয়া নিষেধ।

তুই কি বোকা! আমি তো পুরুষের পোষাক প'রে যাব রে। নিশীথ, তোর একটা ধৃতি পাঞ্জাবি নিয়ে আয় তো।—মিস জয়া বহু নিশীথের হাতঘড়ির দিকে চেয়ে পুনরায় বললেন, রাত মাত্র ন'টা। চল না বাই, অমিতাভকে দেখে আসি। পুরুষের পোষাক প'রে গেলে তো আর পাপ হবে না।

পাপ-পুণ্যের কথা বলতে পারব না, তবে রাত ন'টার পরে বাইরের ফটক বন্ধ হয়ে যায়। যাবে কি ক'রে?

কেন, পাঁচিল টপকে যাব! কত উচু পাঁচিলটা? দশ, বারো, পনেরো ফুট? এর চেয়ে বেশি হ'লে অবশিষ্ট মই লাগবে একটা। যা না, ডাক্তার প্রধানের বাড়ি থেকে একটা মই চেয়ে নিয়ে আয় না।

তোমার বোধ হয় নতুন ব্যারাম হ'ল।—নিশীথ দু পা এগিয়ে গেল জয়া বহুর দিকে। আতঙ্কের স্বরে জিজ্ঞাসা করল সে, তোমার মাথা-টাথা ঠিক আছে তো, দিদিমণি?

নিশীথের কথা শুনে জয়া বহুর উৎসাহ সব হারিয়ে ফেললেন। কেবল কায়দা জানা থাকলেই প্রাচীর টপকানো যায় না, মনে থাকা চাই প্রবল উৎসাহ।

বস্ত্রার কাছে লেখা চিঠির কাগজগুলোর দিকে চেয়ে জয়া বহু এবার বললেন, রাত ন'টা বেজে গেছে, অমিতাভকে এখন বিরক্ত করা ঠিক হবে না। গেস্ট-হাউসের ফটক খোলা থাকলেও আমাদের এখন যাওয়া উচিত নয়।

হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ, দিদিমণি। খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছেন তিনি।

এক দিনের জুরে এত বেশী দুর্বল হয়ে পড়লেন কেন? ডাক্তার প্রধান তাঁর ভুল চিকিৎসা করছেন না তো?

তার মানে?—অবাক হ'ল নিশীথ।

জয়া বহু অবাক না হয়েই জবাব দিলেন, কি জানি! ডাক্তার প্রধান হয়তো অমিতাভকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে হিংসে করেন খুবই। নইলে, একদিনের মধ্যে অমিতাভ এত বেশী ভেঙে পড়ল কেন?

নিশীথ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, কোন কথা বলল না। কি বলবে নিশীথ? এবার নিশ্চয়ই জয়াদিত্র মাথা ধরাপ হয়ে গেছে। অতএব সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্তে ঘুরে দাঁড়াল। জয়া বহু জিজ্ঞাসা করলেন, কি রে, আমার কথার জবাব দিলি না?

কোন কথাটার জবাব দেব দিদিমণি?

অমিতাভ একদিনের মধ্যে এত বেশী দুর্বল হয়ে পড়ল কি করে?

জয়া বহুর দিকে পুনরায় ঘুরে দাঁড়াল নিশীথ। তারপর সে বললে, ভগবান নিজেই অমিতাভবাবুকে দুর্বল করে রেখেছেন। একটা হাত, একটা পা, একটা চোখ, আর—কথাটা শেষ না করে নিশীথ থেমে গেল হঠাৎ। মিস

জয়া বহু খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে উঠে বসলেন। ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, আর, আর কি, নিশীথ? চুপ করে রইলি কেন? বল, বল, তোদের ভগবান আর কি কি নিয়ে গেছে অমিতাভর কাছ থেকে?—জয়া বহু নেমে এলেন বিছানা থেকে। নিশীথের ঘাড়ের হাত রেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কতদূর পর্যন্ত এগিয়েছিলি তুই? মানে, ওর গায়ে তুই হাত দিয়েছিলি না কি?

না।

কেন? কেন তুই ওর গায়ে হাত দিস নি?—মিস জয়া বহুর কণ্ঠে ভেসে উঠল অসহায় স্বর: কেন তুই পরীক্ষা করে দেখলি না নিশীথ? এমন স্বযোগ আর কোনদিনও আসবে না।—মিস জয়া বহু যেন কেঁদে-ককিয়ে ঘরের আবহাওয়া গরম করে তুললেন। হতভম্বের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল নিশীথ। মনে মনে সে ভাবছিল যে, দিদিমণি ওর গোপন উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছেন। নিঃস্বার্থ সেবার আদর্শ নিয়ে যে সে যায় নি অমিতাভর কাছে, তা তিনি ধরে ফেলেছেন অতি অনায়াসে। তার আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি? নিশীথ চ'লে এল বাইরে। করিডোরের অন্ধকারের মধ্যে মিশে যেতে ওর এক মিনিটও লাগল না। কিন্তু জয়া বহু এসে ওকে ধরে ফেললেন চৌকাঠের ওপাশে। বৃকের আর্তনাদ তিনি ডাসিয়ে তুললেন সেই একই প্রশ্নের মধ্যে: কেন, তুই ওর গায়ে হাত দিয়ে পরীক্ষা করে দেখে এলি না, নিশীথ?

করিডোরের অন্ধকারের দিকে মুখ করে নিশীথ জবাব দিল, অমিতাভবাবুর যে পাটা আঁত আছে সে পায়ে হাত দিতে গিয়েছিলুম, কিন্তু—

কিন্তু কি, নিশীথ? লোকে যা বলে তা সত্যি নাকি? তোদের ভগবান কি নিষ্ঠুর! কি নিষ্ঠুর তোদের ভগবান!—জয়া বহুর আর্তনাদ এবার করিডোরের দেওয়ালে প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, বল না নিশীথ, কি দেখলি?

কিছু না। অমিতাভবাবু তাঁর গায়ে হাত দিতে দিলেন না। তিনি বললেন যে, একটা তো পা, টিপে কি হবে নিশীথ? পায়ের তলা থেকে হাত আমি সরিয়ে নিলুম। আমার উদ্দেশ্য তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। দিদিমণি, হাতটা সরিয়ে নেওয়ার পরে আমি দেখলুম, অমিতাভবাবুর চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে।

ও চোখের জল নয়। তোদের ভগবানের নিষ্ঠুরতা সব অমিতাভের চোখ দিয়ে গ'লে গ'লে পড়ছে। নিশীথ, আমি এখন কি করব? স্বাস্থ্য আমার ভাল হয়েছে—আমি যে স্বস্থ হয়ে উঠছি, নিশীথ। আমি কি করব, তুই বল।

অমিতাভবাবুকে ভুলে যাও।

পাগল! তুই উন্মাদ, নিশীথ। অমিতাভকে আমি কি করে ভুলে যাব? সে যে আমার সব—

সব?

তাকে বোধ হয় আমি ভালবাসি। মানে, ইচ্ছে করলেই ভালবাসতে পারি।

কি লাভ তাঁকে ভালবেসে, দিদিমণি?

লাভ-লোকমান জানি না—ভালবাসার শিক্ষা তো আমি তোর কাছেই পেয়েছি। নিশীথ, তুই আমার গুরু। গত দশ বছরের ইতিহাস কি তুই ভুলে গেলি নাকি? 'ভালবাসা' কথাটার তো আমার কাছে কোন মূল্যই ছিল না। আমি জানতুম, পুরুষ-স্ত্রীলোকে বেঁধে রাখবার জন্তে মেয়েরাই কেবল 'ভালবাসা' কথাটা ব্যবহার করে। কিন্তু আজ আমার বিশ্বাস বদলেছে। আমি দেখলুম, ভালবাসার মত এত ভাল ওষুধ পৃথিবীর কোন বৈজ্ঞানিকই আবিষ্কার করতে পারে নি। আমি দেখলুম, সাবিত্রীর টি. বি. রোগও ওই ওষুধে ভাল হয়ে গেল। নিশীথ, আমি অমিতাভকে বিয়ে করতে চাই।

তুমি পাগল হয়ে গেছ, দিদিমণি।

কেন? ভালবাসার ওষুধ দিয়ে কি অমিতাভকে আমি আরোগ্য ক'রে তুলতে পারব না?

এ বিয়ে স্বাভাবিক নয়, কারণ, তোমাদের সম্মান হবে না।

সম্মান তো তোরও নেই—

জয়া বহু আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, নিশীথ বাধা দিয়ে বললে, তোমার জন্তেই তো আমার সম্মান হ'ল না, দিদিমণি।—মস্তবড় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিশীথ এবার করিডোরের অন্ধকারে মিশে গেল।

দরজার ওপাশেই জয়া বহু দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন অমিতাভ সেনের কথা। ফরাসীদেশে অমিতাভ সেনকে আজ আর কেউ চিনতে পারবে না। কী বিরাট

পরিবর্তন তিনি লক্ষ্য করছেন অমিতাভ সেনের মধ্যে!

ভালবাসা কথাটার একটা নতুন অর্থ যেন তিনি খুঁজে পেয়েছেন ওর ওই পাথরে বাঁধানো চোখটার অভ্যন্তরে। পাথরের ভাষা আজ আর তাঁর কাছে অর্থহীন ব'লে মনে হয় না। এ ভাষাও এনেছে সেই ভালবাসার বাণী। নিশীথের মত নিরক্ষর লোক বোধ হয় বুঝতে পারে না যে, দেহের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও অমিতাভকে ভালবাসা যায়। বোধ হয় যায়। এমনি একটা অনিশ্চিত উপসংহারে পৌঁছুবার চেষ্টা করতে করতে মিস জয়া বহু এসে ঢুকে পড়লেন নিজের ঘরে। রক্তার কাছে চিঠি লেখবার জন্তে তিনি প্রস্তুত হতে লাগলেন। ত্রিশ বছর আগের ঘটনাগুলো এবার তাঁর কলমের মুখে এসে ভিড় জমাতে আরম্ভ করবে।

রক্তা, শুনে তুই নিশ্চয়ই আশ্চর্য বোধ করবি যে, কাল আমি চিঠি লিখতে লিখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। অনিদ্রারোগ আমার ক্রমে ক্রমে সেরে যাচ্ছে। হেঁড়া স্বাস্থ্য সব ঝোড়া লাগল নাকি? টি. বি. রোগের পোকাগুলো সব গেল কোথায়? কাল রাত্রিতে মাংস-পরটা খেয়ে হজম করলুম কি ক'রে? চল্লিশ পেরুলে কি হবে, মনে হচ্ছে আমি আবার আমার কচি-বয়স ফিরে পাচ্ছি। গত পনেরোটা বছর আমার দেহ থেকে পচা মাংসের মত যেন খ'সে খ'সে প'ড়ে যাচ্ছে। পনেরোটা বছর যেন পনেরোটা বিষাক্ত কৌড়ার মত আমার দেহের ওপর চেপে বসে ছিল।

কেবল নতুন দেহ নয়, নতুন মনও আমি ফিরে পাচ্ছি। কবিতা পাঠ করবার মত মন আমার জ্যাস্ত হয়ে উঠেছে। ভাবছি, এসব অসম্ভব ব্যাপার ঘটছে কি ক'রে? কি ক'রে যে ঘটছে আমি নিজেও তা জানি না। আমি কিছু জানবার আগেই সব কিছু ঘ'টে যাচ্ছে। কবি এলিয়ট তাঁর একটা লেখার মধ্যে আমার অবস্থাটা কি সুন্দরভাবেই না বর্ণনা করেছেন। শুনবি?

Or, take a surgical operation.
In consultation with the doctor and the surgeon,
In going to bed in the nursing home,
In talking to the matron, you are still the subject,

The centre of reality. But, stretched on the
table,
You are a piece of furniture in a repair
shop.

For those who surround you, the masked
actors,

All there is of you is your body
And the 'you' is withdrawn....

কাশিয়ং পাড়াগাঁ ব'লে এখানে ভাল বই কিংবা
সাহিত্যপত্র কিছু পাওয়া যায় না। (শুনেছি, ফিল্মের
কাগজ, দৈনিক এবং সাপ্তাহিক কাগজ পাওয়া যায়।)
আমি তাই নিশীথকে পাঠিয়েছিলুম দাঙ্গিলিংয়ের বুক-
স্টলে। সেখানে এলিয়টকে পাওয়া গেল।

এবার থেকে আমি বোধ হয় জঁ পল সার্তর আর পড়ব
না। ভাবছি, পাত্রী সাহেব আমার বদলে দিয়েছেন?
না রে, না। ফাদার হেনরির কথা শুনে আমি কেন যাব
আমার বইয়ের শেল্ফ পরিষ্কার করতে? ওঁদের শেল্ফে
কি এলিয়ট আছেন? বোধ হয় নেই। গীর্জা-কর্তৃপক্ষের
যদি আপত্তি না থাকে, তা হ'লে একদিন ওঁদের লাইব্রেরিটা
গিয়ে আমি দেখে আসব। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি ব'লে
পদে পদে অনেক অসুবিধে আমার ভোগ করতে হচ্ছে।
বইয়ের আলোচনা যখন উঠেই পড়ল, তখন একটা কথা
তাকে না জানিয়ে পারছি না। দু দিন আগে কলকাতা
থেকে একটা বইয়ের পার্সেল এসেছে। কে যে পাঠিয়েছে
বুঝতে পারলুম না। ভবতোষ নয় তো?

কাল সকালে পার্সেলটা খুলেছিলাম। জার্মান, ফরাসী
এবং ইংরেজ লেখকদের সঙ্গে তিনি, (মানে যিনি পার্সেলটা
পাঠিয়েছেন। মনে হয়, ভবতোষই পাঠিয়েছে) একজন
বাঙালী কবিকেও পাঠিয়েছেন। খুবই কোঁতুহল হ'ল।
হ'ল এই জন্তে যে, বহু বছর ধ'রে আমি বাংলা কথা বলছি
বটে, কিন্তু বাংলা লেখার সঙ্গে আমার কোন পরিচয় ছিল
না। বিখ্যাস করবি কি না জানি না, বাংলা দেশের মাত্র
দুজন কবির নাম আমি স্মরণ ক'রে রাখতে বাধ্য হয়েছি।
সেইরা আমার বাধ্য করেছেন বললেই সত্য বলা হবে।
আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্প পড়তে পারি। কিন্তু দ্বিতীয়
শ্রেণীর কবিতা পড়তে পারি না। পারি না এই জন্তে যে,
দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতা পাঠে আমি মানসিক পীড়ায় কষ্ট
পাই। আর কেউ না জাহুক ভবতোষ জানত যে, সেই

জন্তে আমি কখনো দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতার বইতে হাত
দিতুম না। কেনা তো দুয়ের কথা।

পার্সেলটা খুলতেই আমার চোখে পড়ল সুবীন্দ্রনাথের
একখানা কবিতার বই। (ইনিই হচ্ছেন দু-নম্বর কবি
যিনি তাঁর নাম আমার স্মরণ করিয়ে রাখতে বাধ্য করেছেন।
পদ্মা নম্বরের নাম জানতে চেয়ে তুই আমার লজ্জা দিল নি
যেন!) বইখানা খুলে আমি পাতা ওলটাতে লাগলুম। পাতা
ওলটানো যখন আমার শেষ হ'ল, তখন বেলা একটা বেজে
গেছে। মানে প্রায় পাঁচটা ঘণ্টা এর মধ্যে আমি খরচ
ক'রে ফেলেছি। বিদেশী কবিদের কবিতা সুবীন্দ্রনাথ
বাংলায় অনুবাদ করেছেন। বিদেশী কবিদের কবিতার এত
ভাল অনুবাদ পৃথিবীর অল্প কোন ভাষায় কেউ করতে
পেরেছেন ব'লে আমার মনে হয় না। (ইংরেজী ভাষার
কথা বাদ দিয়ে বলছি না কিছু।) যা হোক, বইখানা
হাতে নিয়ে আমি ব'সেই ছিলুম। বেলা একটা বেজে গেছে
ব'লে নিশীথ ব্যস্ত ভাবে এসে ঘরে ঢুকল। জিজ্ঞাসা
করলে, একটা বেজে গেছে, থাকে না?

আজ আর থাক না, প্রচুর খেয়েছি। খিদে নেই।

কি খেলে?

কবিতা।

কথাটা বুঝতে না পেরে নিশীথ অবাক হয়ে আমার
দিকে চেয়ে রইল। আমি বললুম, মনের খিদে মিটেছে—
কলকাতা থেকে অনেক ভাল ভাল বই এসেছে।

সারাজীবন ধ'রেই তো বই পড়লে, কিন্তু—

বাধ্য দিয়ে আমি বললুম, সারাজীবন ধ'রে যা পড়েছি,
তা সব ভুলে যেতে চাই। এবার থেকে আমি আবার
নতুন পড়া শুরু করব। বুঝি, নিশীথ?

বুঝেছি। পাত্রী সাহেব তোমার মাথা খারাপ ক'রে
দিয়েছেন।—একটু চুপ ক'রে থেকে নিশীথই আবার বললে,
এঁরা কিন্তু মনে করেন যে, সারা ভারতবর্ষ একদিন খুঁটান
হয়ে যাবে। মনে হ'ল, এই খবরটা দেবার জন্তেই নিশীথ
আমার ঘরে ঢুকে পড়েছে। তাই আমি ওকে জিজ্ঞাসা
করলুম, কথাটা তোকে বললে কে?

ডাক্তার প্রধান। তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষের আত্মার
সেই দিনই মুক্তি হবে যেদিন এ দেশের সবাই রোমান
কাথলিক হয়ে যাবে।

বলিস কি, ছত্রিশ কোটি রোমান ক্যাথলিক ?

হ্যাঁ, দিদিমণি।

মা গো, সারা পৃথিবীতে ছত্রিশটা মানুষ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আর এখানে আমরা ছত্রিশ কোটি রোমান ক্যাথলিক নিয়ে কি করব ? না নিশীথ, তুই বোধ হয় ভুল শুনেছিল। ডাক্তার প্রধান সম্ভবতঃ বলেছেন যে, ভারত-বর্ষের আত্মার মুক্তি হবে সেদিনই, যেদিন এখানে অন্ততঃ ছত্রিশজন মানুষের সন্ধান আমরা পাব।

না, ভুল আমি শুনি নি।—বেশ একটু জোর দিয়েই কথাটা বললে নিশীথ। আলোচনাটা বন্ধ করবার জুড়ে আমি বললুম, সারা ভারতবর্ষ খুঁটান হ'ল কি বোধ হয়ে গেল তাতে আমাদের কিছু এসে-যাবে না। আমরা ততদিন বেঁচে থাকব না। আমাদের সম্ভানসম্মতিদেরও বাঁচবার আশা নেই। কারণ, তোর তো ছেলেপিলে নেই, আর আমারই বা হবে কি ক'রে, বিয়ে হয় নি যে ?

এমন কথা কেন বলছ, দিদিমণি ? ভারতবর্ষের অন্ধহানি হ'লে তোমার কি কষ্ট হবে না ? ভারতবর্ষের দেহ আর তোমার দেহ তো আলাদা নয়।

তবে তুই ডাক্তার প্রধানকে আমার এখানে ডেকে নিয়ে এলি কেন ?

তুমি কি আবার তাঁকে আমাদের সমাজে ফিরিয়ে আনতে পারবে না, দিদিমণি ?

নিশীথ।—আমার গলায় বিশ্বয়বোধক স্বর উঠল ভেসে। আমিই আবার বললুম, এতদিন আমার ধারণা ছিল তুই মাহুস। এখন মনে হচ্ছে তুই কেবল হিন্দু, যেমন ঠাণ্ডা সবাই কেবল রোমান ক্যাথলিক। একটা কথাও আর না ব'লে নিশীথ আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রহস্য, বলতে পারিস এই নিশীথ লোকটি কে ?

মাসটা বোধ হয় ফেব্রুয়ারি ছিল। নন্দদা সত্যি সত্যি বাড়ি থেকে একদিন বেরিয়ে গেল। কোথায় গেল এবং কেন যে গেল তার কারণটা আমার খুব পরিষ্কারভাবে জানা ছিল না। বড়মামার কথায় তার এমন কিছু অপমান বোধ করা উচিত হয় নি। নন্দদার নিজেরই তো খুব গুরুতর অপরাধ হয়েছিল। সে কেন পাল করেছে ব'লে বড়মামার কাছে মিথ্যে কথা বলতে গেল ?

কেবল ফেল করবার জুড়ে বড়মামা তাকে কিছুতেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলতেন না। কেমিস্ট্রি বইখানার মধ্যে করবার ছবিখানা তিনি দেখেছিলেন বটে, কিন্তু তাতেও বড়মামা নন্দদাকে কোন শাস্তি দিতেন ব'লে আমার বিশ্বাস হয় নি। তবে নন্দদা হঠাৎ একদিন বাড়ি থেকে চ'লে গেল কেন ? স্বরনাকে জিজ্ঞাসা ক'রেও কোন খবরই আমি জানতে পারি নি। বড়মামা নিজে এ সম্বন্ধে একেবারেই আগ্রহশীল ছিলেন না। তাঁকে দেখে অন্তত কেউ তা বুঝতে পারত না। মামীমা মাঝে মাঝে নন্দদার জুড়ে কাঁদতেন। কাঁদতেন আমাদের সামনে, বড়মামার সামনে নয়। বড়মামার আদেশ ছিল যে, এ বাড়ির কেউ যেন নন্দদার নাম না করে। কেবল মিথ্যে কথা বলার অপরাধই নন্দদার একমাত্র অপরাধ ছিল না। নন্দদা লুকিয়ে লুকিয়ে একটা বৈপ্লবিক দলে যোগ দিয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি ঐকান্তিক ভাবে শ্রদ্ধাশীল হয়েও সে গান্ধীজীর অহিংসা-নীতিতে বিশ্বাস করত না। বড়মামা একদিন বাড়ি ফিরলেন বেশ একটু রাত ক'রে। আমরা সবাই খুব উদ্ভিগ্ন হয়ে উঠে-ছিলাম। মাঝে মাঝে তিনি অত্যন্ত চেনা রাস্তাও চিনতে পারতেন না। ভবানীপুরের দিকে না এসে তিনি অনেক দিন ভুল ক'রে শ্রামবাজারের ট্রামে চেপে বসেছেন। মামীমা তাঁর সম্বন্ধে অনেক মজার মজার গল্প বলতেন আমাদের। তিনি একবার ঢাকা সরকারী কলেজ থেকে বদলি হয়ে কলকাতা এসেছিলেন। এক বছর পরে ঢাকার বাড়িওয়ালা এসে একদিন বড়মামার সঙ্গে দেখা ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, ঢাকার বাড়িটা রেখে আর কি করবেন ? এক বছর ধ'রে তো শুধু শুধু ভাড়া দিলেন ! মামা বললেন যে, বাড়ি তিনি ছাড়বেন না, ভাড়া দিয়ে যাবেন। জানতে চাইলেন বাড়িওয়ালা, কেন বলুন তো ? মামা তাঁকে বললেন, যদি কখনো আবার ঢাকায় বদলি হই, তা হ'লে বাড়ি পাব কোথায় ?

মামীমার গল্প শুনে আমরা কী হাসিটাই না হেঁচকেছিলাম সেদিন। আজ তাঁর ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে, আমরা আবার একটা মজার গল্পের প্রতীক্ষায় ছিলাম। মামা না জানি কি অদ্ভুত কাণ্ড ক'রে বাড়ি ফিরবেন আজ ! কিন্তু বাড়ি যখন ফিরলেন, তখন তাঁর মুখের ওপর

বিরাট এক দুর্ঘটনার ছাপ পড়েছে বলে মনে হ'ল আমাদের। সেদিন আমাদের সত্যই মনে হয়েছিল যে, ইংরেজ রাজত্বের বোধ হয় অনিবার্য অবসান ঘটেছে। এর চেয়ে খারাপ দুর্ঘটনা সেদিন আমার পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব ছিল না।

মামা বাড়ি ফিরে এসে বললেন, নন্দ আমাদের কেউ নয়। ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটাবার ক্ষমতা সে সম্রাসবাদীদের দলে গিয়ে যোগ দিয়েছিল। ধরা পড়েছে। কোথায় কোন এক ব্যাক লুটের ব্যাপারে সে ধরা পড়েছে। তোমরা কেউ বিশ্বাস কর যে, নন্দ ডক্টর বাদব মিত্রের ছেলে?—বলতে বলতে তিনি দোতলায় উঠে যেতে লাগলেন। আমরা জ্ঞানতুম, একবার লাইব্রেরি-ঘরে গিয়ে পৌঁছুতে পারলে, সংসারের সব কিছু তিনি ভুলে যাবেন। ইতিহাস কি? সময়ের স্রোত। সেই স্রোতের মধ্যে নন্দা তো একটা সামান্য কুটো পর্বস্ত নয়।

আমি কিন্তু নন্দাকে ভুলতে পারলুম না। বাড়ি থেকে চ'লে যাওয়ার আগে সে মিসেস সবিতা গুপ্তর সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিল। আমার মেধা এবং পরীক্ষা পাসের কৃতিত্ব সম্বন্ধে সে সব কথাই বলেছিল তাঁর কাছে। বিধানচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার স্বযোগ করে দিয়েছিল নন্দা।

একদিন আমি মামার লাইব্রেরি-ঘরটা পরিষ্কার করছিলাম। এটাই ছিল আমার কাছে সবচেয়ে আনন্দের কাজ। লাইব্রেরি-ঘরে ঢোকবার ক্ষমতা সকালবেলা থেকেই আমি ছটফট করতুম। মামা কলেজে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি গিয়ে ঢুকে পড়তুম সেখানে। ছুটির দিনে মামার সামনেই আমি কাজ করতুম লাইব্রেরি-ঘরে। টেবিলের ওপর বুক ব'লে মামা লেখার মধ্যে ডুবে থাকতেন। টেবিলটা ছিল মস্ত বড়। অসংখ্য বই পড়ে থাকত টেবিলের ওপর। আমি যে ঘরদোর সাজ করছি, তা তিনি একবার চেয়েও দেখতেন না। কি করে দেখবেন? লাইব্রেরি ঘরে মামা যে অস্ত্র মাহুষ হয়ে যেতেন, কেবল অস্ত্র মাহুষ নয়—অস্ত্র জগতের মাহুষ। মামার টেবিলটা ছিল ভারত সাম্রাজ্যের মত, বিগত দিনের বাদশারা যেন পুতুলের মত সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকত তাঁর টেবিলের ওপর।

সেদিন মামার ছিল ছুটির দিন। সকালবেলা তিনি কি এক প্রয়োজনীয় কাজে বাইরে বেরিয়েছিলেন। হাতে আমার সেদিন খুব বেশী কাজও ছিল না। থোকনকে চান করিয়ে বাইরে-দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এলাম বেলা এগারোটা না বাজতেই। মামীমাকে বললাম, আজ একটু সকাল সকাল লাইব্রেরি-ঘরটা পরিষ্কার করে দিয়ে আসি। মামা নিশ্চয়ই বেলা বারোটার আগে ফিরবেন না।

মামীমা পূজোর ঘরে ছিলেন। নন্দা ধরা পড়বার পর থেকে তিনি প্রায় সমস্ত দিনটা পূজোর ঘরে কাটিয়ে দেন। ক'দিন থেকে তাঁর বোধ হয় মামার সঙ্গে দেখাও হয় না। মামার কাছে শুনেছিলাম যে, তিনি এক গেলাস জল পর্বস্ত খেয়ে হজম করতে পারেন না। কথাটা একটু বাড়িয়ে বলা বটে। কিন্তু সত্যিই মামীমার স্বাস্থ্য ছিল খুবই খারাপ। নন্দা বাড়ি থেকে চ'লে যাওয়ার পরে মামীমা বোধ হয় আধ গেলাস জল খেয়েও হজম করতে পারছেন না। কারণ তাঁকে আমি জলস্পর্শ করতে দেখি নি এক দিন।

লাইব্রেরি-ঘরে যাওয়ার কথাটা ঘোষণা করে আমি ঠাকুর-ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলাম। মামীমা আমার জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়ারে রে জয়া, আজকের খবরের কাগজে কি লিখেছে রে? ওদের মোকদ্দমা শুরু হবে কবে থেকে?

কবে থেকে শুরু হবে তার তারিখ এখনো পড়ে নি।

তোর মামা তো একটা পয়সাও খরচ করবেন না—নন্দর ক্ষমতা উকিল-ব্যারিস্টার কেউ থাকবে না।

এ নিয়ে তুমি চিন্তা করো না, মামীমা। মোকদ্দমা শুরু হতে এখনও দু-তিন মাস লাগবে। তত দিনে মামা নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করবেন।

করবেন বলে তো আমার বিশ্বাস হয় না। আমি নিজেও কিছু করতে পারি না। শরীরের যা অবস্থা, তাতে বেশী দিন বোধ হয় আর বাঁচবও না।

এই ছোট্ট ঘরটা সারাদিন ব'লে না থেকে, খোলা হাওয়ায় যদি শানিকটা ঘুরে বেড়াতে পারতে—মানে, খাওয়া-দাওয়া তো করা দরকার, তুমি কিছুই তো খাচ্ছ না। আমার কথা শুনে মামীমা ব্যাধা পেলেন। ব্যাধা পেয়ে তিনি একটুও রাগ করলেন না। আগের মত তিনি

আমায় শাসন করবার চেষ্টাও করলেন না। শরীরে আর এক বিন্দু শক্তি নেই বলেই হয়তো অত্যন্ত নরম গলায় তিনি বললেন, আমার কি খাবারের অভাব আছে রে? এখানেই তো প্রসাদ পাচ্ছি।

পাচ্ছ সে কথা ঠিক। কিন্তু বেশী কিছুই পাচ্ছ না। বাজারের সব চেয়ে ছোট ছোট ফল কেনেন মামা। মোকানদারেরা আজকাল মামাকে দেখলেই বুঝতে পারে যে, তিনি পূজার ফল কিনতে আসছেন। মামীমা, তুমি একটু ভাল ক'রে খাওয়া-দাওয়া কর। কেবল প্রসাদ খেয়ে তো বেঁচে থাকতে পারবে না।

আমি বুঝলুম, মামীমা আরও বেশী বাধা পেলেন। আমার কথার কোন প্রতিবাদ করলেন না তিনি। আমি দেখলুম, তাঁর চোখের নীচে কালি পড়েছে। স্বাস্থ্যহীনতার শতাব্দিক লক্ষণ তাঁর সর্বদেহে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষণ মামীমার মন এবং দেহের কোথাও নেই। মামীমা চুপ ক'রে রইলেন বলে আমি বললুম, আমি যাচ্ছি, মামীমা। খোকনকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি। এদিকে এখন আমার আর কোন কাজ নেই।

আমি না মরলে তোর কাজ ফুরাবে না, জয়া।

এ কথা কেন বলছ, মামীমা?

শরীরটা ভাল নেই, মনে হচ্ছে আবার বোধ হয় আমার—

আমি নিঃশব্দে ওখান থেকে স'রে এলাম। সেদিন আমি অনেক কথাই পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারতুম না। কিন্তু মামীমার ব্যাপারটা বুঝতে আমার কোন কষ্ট হয় নি। ব্যাপারটা কেবল মামীমার নয়, মামারও বটে। মামা যে বছরের পর বছর ক্রমাগত পাপ ক'রে আসছেন সে সন্দেহে আমার কোন সন্দেহই ছিল না। কেন থাকবে? ডক্টর ঘানব মিত্র কি বুঝতে পারেন না যে, যার এক গেলাস জল খেয়ে হজম করবার শক্তি নেই, তাঁর পক্ষে এত বেশী সন্তান ধারণ করা অসম্ভবতার সামিল?

লাইব্রেরি-ঘরে এসে টেবিল-চেয়ার সব মুছতে লাগলুম আমি। কাজে আজ একেবারেই মন বসছিল না আমার। ভাল লাগছিল না প্রতিদিনকার মত বইগুলোকে বুক চেপে আদর করতে। সবই যেন অর্থহীন মনে হচ্ছিল। এত সব বই প'ড়ে প'ড়ে বড়মামা শিক্ষিত হতে পারলেন

কই? একটু দাঁড়া ভাই রত্না, পশ্চিম দিকের জানলাটা খুলে দিয়ে আসি। হঠাৎ যেন গরম বোধ হচ্ছে আমার।

মিস জয়া বস্তু চিঠির কাগজের ওপর কলমটা রেখে দিয়ে উঠে পড়লেন বিছানা থেকে। মনে হ'ল রাত এখন অনেক হয়েছে। কুঁজো থেকে এক গেলাস জল গড়িয়ে নিলেন নিচ্ছেই। চিঠি লিখতে লিখতে আজ তাঁর তেষ্ঠা পেয়েছে। জল খাওয়ার পরে তিনি বাতিটা দিলেন নিবিয়ে। পরিশ্রান্ত বোধ করছিলেন তিনি। ত্রিশ বছর আগের ঘটনাগুলোকে সঠিক ভাবে খুঁজে এনে লিপিবদ্ধ করা খুব সহজ কাজ নয়। জানলাটা খুলে দিয়ে মিস জয়া বস্তু চেয়ে রইলেন আকাশের দিকে। একটুও মেঘ নেই আকাশে। ঝাউগাছগুলোর ফাঁক দিয়ে অসংখ্য তারা দেখা যাচ্ছে। এমন স্নন্দর, কালো কুচকুচে আকাশ কাশিয়ংয়ে এসে এই তিনি প্রথম দেখলেন। মিনিট দশ পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন খোলা জানলার সামনে। অমন অবাক হয়ে কি দেখছেন তিনি? গেস্ট-হাউসটা নয় তো? অমিতাভ সেনের সর্দি-জ্বর। লোকটা সেখানে প'ড়ে রইল, তিনি তার কাছে যেতে পারলেন না একবার। যাদের মনের উচ্চতা কাশিয়ংয়ের উচ্চতাকে ছাড়িয়ে গেছে, তাঁদের আবার মেয়েমানুষের ভয় কেন? গেস্ট-হাউসে গেলে ধর্মের গায়ে ফোঁকা পড়ত নাকি? জয়া বস্তু তাঁর প্রশ্নের জবাব পেলেন না। তিনি এসে পুনরায় চিঠি লিখতে আরম্ভ করলেন।

আজ খুবই পরিশ্রান্ত বোধ করছি। এই মাত্র জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম আমি। কালো কুচকুচে আকাশের দিকে চেয়ে কেন যেন মনে হ'ল আমার যে, আত্মিক দুঃখ না পেলে মানুষ বোধ হয় সত্যিকারের মানুষ হতে পারে না। কাশিয়ংয়ের আকাশটাকে তাই কি আমার কাছে আজ রহস্যবৃত্ত মনে হচ্ছে?

রত্না, দুবের ওই ছায়াপথের দিকে চেয়ে চেয়ে কি দেখছিলুম আমি জানিস? দেখছিলুম, একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ জগতের অস্তিত্ব। দেখছিলুম মানে দেখবার চেষ্টা করছিলুম। কার ইচ্ছায় জগৎটা এমনভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ হ'ল? তিনি কে? উপনিষদের সঙ্গে স্বর মিলিয়ে আজ

আমার বলতে ইচ্ছা করছে : আমরা তাঁকে দেখি নি, অথচ দেখেছি। আমরা তাঁর কথা শুনি নি, অথচ শুনেছি। তাঁর কথা আমরা ভাবি না, অথচ ভাবি। তাঁকে আমরা জানি না, তবুও জানি।

এসব কথা শুনে বিরক্ত বোধ করছিল নাকি? তা হ'লে থাক্। এবার আমি ফিরে যাচ্ছি কলকাতায়—মামার লাইব্রেরি-ঘরে। ঘরটা পরিষ্কার করবার জন্যে এইখানে চুকেছিলাম তা বোধ হয় তোর মনে আছে। বইগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে প্রতিদিনই আমি স্বপ্ন দেখতুম। কবে আমি লেখাপড়া শিখব? বইগুলো সব পড়বার মত বিত্তে আমার কবে হবে? আজও আমি এসব কথা ভাবছিলাম আর টেবিলের খোলা বইগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম।

সিঁড়ি দিয়ে কে যেন ওপরে উঠে আসছিলেন। মামার পায়ের শব্দ এ নয়। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই আমি দেখলাম, মিসেস সবিতা গুপ্ত মামার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। বিধানচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালক-কমিটীর সভাপতি ছিলেন মামা।

আমি বললাম, মামা তো এখনো ফেরেন নি। আপনি ভেতরে এসে বসুন। তিনি সম্ভবতঃ এখনি ফিরে আসবেন। বেলা তো কম হ'ল না।

চেয়ারে বসে তিনি আমার দিকে চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। কথা বললেন না একটিও। টেবিলে ছড়ানো বইগুলো আমি সাক্ষিয়ে শুছিয়ে রাখছিলাম। তিনি আমার কাজ দেখছিলেন। তিনি আমার কাজ দেখবেন ব'লেই আমি হয়তো আজ বেশী মনোযোগ দিয়ে কাজ করছিলাম। খানিকক্ষণ পরে তিনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি?

জয়া বসু।—আমি এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালাম।

নম্বর কাছে তোমার কথা সব শুনলাম। ইচ্ছে করলে তুমি আমার ইচ্ছা ভর্তি হতে পার।

ভর্তি হওয়ার তো আমার খুবই ইচ্ছে, কিন্তু—

কিন্তু কি?—জিজ্ঞেস করলেন মিসেস সবিতা গুপ্ত।

আজ আর কোন কথা গোপন করব না ব'লে মনে মনে ঠিক ক'রে কেললাম। এমন সুযোগ জীবনে আমার আর দ্বিতীয়বার আসবে না। তাই তাঁকে বললাম, মামা বোধ হয় ইচ্ছার মাইনে দিতে চাইবেন না।

কেউনগরে তোমার মাইনে দিত কে?

সেখানে আমার মাইনে লাগত না।

মিসেস গুপ্ত চুপ ক'রে কি যেন ভাবতে লাগলেন। ইতিমধ্যে সাহস আমার বেড়ে গেছে অনেক। আমি তাই বললাম, কেউনগরে আমি কেবল প্রথম হয়ে পাস করতুম না, আমি শতকরা নব্বই ভাগ নম্বর রাখতুম—অর্থাৎ আমার এক নম্বরও কাটা যেত না।

তাই নাকি?—মিসেস গুপ্ত যেন কোথায় চ'লে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি পুনরায় বললেন, বেশ, আমিও তোমায় ক্রী ক'রে দেব, যদি তুমি প্রথম হয়ে পাস করতে পার। কেবল তাই নয়, বইপত্রের তোমার একখানাও কিনতে হবে না। আমি তোমায় কিনে দেব সব।

আনন্দের আতিশয্যে হঠাৎ আমি ব'সে পড়লাম মেঝের ওপর। মেঝের ওপর ব'সে মিসেস গুপ্তের পায়ের ধুলো নিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কবে থেকে ইচ্ছা যাব?

ছুটো মাস তোমার নষ্ট হয়েছে, ফেরয়ারি শেষ হয়ে যাচ্ছে—

বাধা দিয়ে বললাম, তা বাক, আমার তাতে একটুও অসুবিধে হবে না। আপনি বলুন কবে থেকে আমি ইচ্ছা যাব? ইচ্ছাটা তো আমি চিনি।

হেসে কেললেন মিসেস গুপ্ত। হাসতে হাসতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ইচ্ছাটা তুমি চিনলে কি ক'রে?

বাক্যের মাওয়ার পথে বোঝ আমি দুবার ক'রে দেখি। সামনে গেটের ওপরে বড় বড় ক'রে লেখা রয়েছে বিধান-চন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়। সেদিন তো আমি একলাই বাক্যেরে গিয়েছিলাম। ফিরতে প্রায় এগারোটা বাজল। গেটের কাছে পৌঁছতেই শুনি ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা বাজছে—ঠিক যেন আমাদের কেউনগর ইচ্ছার ঘণ্টা। তারপরে কি হ'ল জানেন?

না তো, কি ক'রে জানব?

আমি চুকে পড়লাম ইচ্ছা। ভেতরে মস্তবড় একটা বাগান। ছ গজ মাত্র রাস্তা গেছে। ও মা, কোথা থেকে একটা হিন্দুস্থানী দারওয়ান এসে আমায় ধমকাতে লাগল। আমার হাতে ধ'রে মারল একটা টান—হাত থেকে বাক্যেরের থলিটা গেল প'ড়ে। এক পোয়া আলু ছিল ওতে, আর দুটো ছোট ছোট কইমাছ ছিল। মামার

জন্তে কইমাছ—তিনি বারোটার সময় কইমাছের বোল খেয়ে কলেজে পড়াতে যাবেন। কিন্তু এদিকে তো দারওয়ানটা আমার হাত থেকে সব ফেলে দিয়েছে—মেয়েরা আমার ঘিরে মজা দেখছে। আমি কোনরকমে খলিটা নিলুম কুড়িয়ে। দারওয়ানটা হিড়হিড় করে টানতে টানতে আমার ফর্টকের বাইরে নিয়ে এসে ধমকে বললে, কক্ষনো আর এখানে ঢুকবি না। মা গো, লোকটার মুখভরা দাড়িগোঁফ, আর কী রাগী! বাড়ি ফিরে সে আর এক লম্বাকাণ্ড। মামা তো রেগে অস্থির! বেলা হয়েছে, এখনো কইমাছ রান্না হয় নি কেন? তারপর খলিতে যখন কইমাছ দুটো পাওয়া গেল না, তখন—উরে বাবা, দাড়িগোঁফ না থাকলে কি হবে, মামার সে কী রাগ! সেই তুলনায় আপনাদের দারওয়ান তো বাচ্চা ছেলে। যাকগে, তাতে আমার গালের কোন ক্ষতি হয় নি। মামা ঠাস ঠাস করে আমার গালের ওপর চড় বসিয়ে দিলেন। আমি শুনি নি, তবু আন্দাজে বলতে পারি যে, সাতটা কি আটটা চড় এসে আমার গালের ওপর পড়ল। একজন্তে মামাকে অবশি দোষ দেওয়া যায় না। সত্যিই তো, ফিরতে আমার অনেক ঘেরি হয়ে গিয়েছিল। মাছগুলো যে আপনাদের ইঙ্কুলে হারিয়ে এসেছি তাও তো মিথ্যে নয়? কি দরকার ছিল আমার ইঙ্কুলের মধ্যে ঢোকবার? কেউনগর ইঙ্কুলের মত ঘণ্টা কি ছুনিয়ার আর কোথাও নেই? যাকগে সেসব পুরনো কথা। কবে থেকে আমি ইঙ্কুলে যাব? ঝি-চাকরাণীর কাজ করতে আমার আর ভাল লাগছে না, সবিতাদি।

কিন্তু—। একটু ভেবে নিয়ে মিসেস গুপ্ত বললেন, এ বছরটা তো তোমায় মাইনে দিয়ে পড়তে হবে। তোমার হয়ে ডক্টর মিত্রের কাছে আমি-ই না হয় প্রতি মাসের মাইনেটা চেয়ে নেব।

পাবেন না। এতবড় সংসার চালিয়ে মামার হাতে একটা পয়সাও থাকে না। তার ওপরে আমি এসে আবার তাঁর ঘাড়ে চেপে বসলুম। আমার কাপড়চোপড় কিনতে তাঁর এখনো একটা পয়সাও খরচ হয় নি, হয়তো আরও দু-এক বছর খরচ হবে না। কিন্তু আমার খাবার জন্তে মামার তো পয়সা খরচ হচ্ছে। তা হলে আমার কি ইঙ্কুলে আর পড়া হবে না?

হবে, নিশ্চয়ই হবে। পরে আমি ডক্টর মিত্রের সঙ্গে দেখা করে সব ঠিক করে নেব। আজ উঠছি।

কখন দেখা করবেন? কি বলব মামাকে?

কিছু বলতে হবে না। আমি দু-এক দিনের মধ্যেই আসব।—এই বলে তিনি উঠলেন। আমি তাঁর পেছনে পেছনে দরজা পর্যন্ত এলুম। তিনি প্রথম সিঁড়িটার যখন পা দিয়েছেন তখন পেছন থেকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—আমি নিজেই যদি আজকালের মধ্যে টাকা যোগাড় করতে পারি?

সে কি? তুমি কি করে টাকা যোগাড় করবে, জয়া?—মিসেস গুপ্ত খুবই অবাক হলেন।

বললুম, মরবার সময় আমার মা কিছু সম্পত্তি দিয়ে গেছে আমাকে। সেটা বিক্রি করলে, মোটা টাকা না হোক, কিছু টাকা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতে তিনি বললেন, দেখি, ডক্টর মিত্র যদি না দেন, তা হলে তোমার সম্পত্তি-বিক্রির কথা ভাবা যাবে।

বেলা বারোটা বাজল, মামা এখনো ফিরলেন না। এতক্ষণ তিনি বাইরে গিয়ে কি করছেন? খুব দরকারী কাজ না থাকলে মামা ছুটির দিনে বাইরে যান না। গেলেও দু-এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসেন। আজ তা হলে তিনি এত ঘেরি করছেন কেন? নন্দদার জন্তে তিনি কি তবে উকিল-ব্যারিস্টার ঠিক করতে গেছেন? বিশ্বাস হয় না আমার।

মিসেস গুপ্ত চলে যাওয়ার পরে আমি লাইব্রেরি-ঘরে বসে ছিলাম। এ মাসের বাংলা মাসিক কাগজগুলো উন্টে-পাল্টে দেখছিলাম আমি। বড় বড় দুটো মাসিক কাগজে দেখলুম বড়মামার লেখা রয়েছে। আমি কবে লিখব? লেখাপড়া করবার স্বযোগ পেলে আমি কেন বড়মামার চেয়ে ভাল লিখতে পারব না? কিন্তু ইঙ্কুলে ভর্তি হওয়ার পথ পাচ্ছি কই? বড়মামা এক বছর পর্যন্ত ইঙ্কুলের মাইনে দেবেন বলে আমার একেবারেই বিশ্বাস হয় না।

একটু আগেই আমি যে মায়ের সম্পত্তির কথা সবিতা গুপ্তের কাছে উল্লেখ করেছিলাম, মনে আছে কি তোমার, রত্না? সম্পত্তি মানে, সেই সোনার ফ্রেমটার কথাই আমি ভাবছিলাম। সোনার ফ্রেম দিয়ে মা যে বাবার

ফোটোখানা বাঁধিয়ে রেখেছিলেন, তার খবর তো তোকে আগের চিঠিতেই জানিয়েছিলুম। এখন ইস্কুলের মাইনে যোগাবার জন্তে ফ্রেমটা বেচে ফেলবার ব্যবস্থা করা যায় কি? তা ছাড়া আমার অল্প কোন পথ ছিল না। মা মারা যাওয়ার পরে বাবার কাছ থেকেও কোন টাকা আসে নি। তাঁর সঙ্গে চিঠিপত্রের আদান-প্রদানও ছিল না।

একটু পরে সিঁড়িতে মামার পায়ের শব্দ পেলুম। তিনি আসছেন। কার উদ্দেশ্যে তিনি যেন বাক্যবাণ বর্ষণ করতে করতে উপরে উঠে আসছিলেন। আমি বেরিয়ে এলুম লাইব্রেরি-ঘর থেকে। জিজ্ঞাসা করলুম, কি হয়েছে মামা?

ঐ স্বাউণ্ডে লটার কাণ্ড দেখ! ওকে খুব দিয়েছি।

কাকে দিলে?

তোর বাবা—হরিদাসকে।

কি দিলে? মানে—

মনি-অর্ডারটা ফেরত পাঠিয়ে দিলুম। তোর নামে সে ছ শো টাকা পাঠিয়েছিল। আমরা কেন নিতে যাব তার টাকা? আমরা কি ওর কাছে ভিক্ষে করতে গেছি? কেন, জ্যা কি তার মামার বাড়িতে খেতে পাচ্ছে না? তুই কি বলিস, জ্যা? মনি-অর্ডার ফেরত দিয়ে ভাল করি নি?

খুব ভাল করেছ। কিন্তু তোমার এত ঘেরি হ'ল কেন? এমন ভাবে অনিয়ম করলে তোমার যে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে মামা।

লাইব্রেরি-ঘরে চুকে মামা বললেন, সি. আই. ডি. পুলিশের বড় সাহেব আমার ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁকে কি ব'লে এলুম জানিস?

না।

পা থেকে মোজা খুলতে খুলতে মামা বললেন, তাঁকে বললুম যে, নস্তু আমার ছেলে নয়। ঠিক বলি নি?

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, মামা।

বললুম সাহেবকে যে, ফাঁসি দাও ওকে। আমার তাতে কিছু এসে-যাবে না। তোরা ভেবেছিলি যে, আমি চোখের জল ফেলব? বোকা! জল এত শস্তা নয়। এক ফোঁটা জলও আমি নষ্ট করব না।

তুমি ঠিক বলেছ, মামা। এবার চান ক'রে নাও।

মামীমার শরীরটা আজ খুবই খারাপ। অসময়ে খেয়ে তোমার শরীর যদি আবার ভেঙে পড়ে, তা হ'লে, সংসারটাকে সামলাবে কে?

গায়ের জামাটা খুলে আমার হাতে দিয়ে মামা এবার শাস্ত হয়ে বললেন, আমার শরীর যদি কোনদিন ভেঙে পড়ে তা হ'লে জানবি, এর জন্তে দায়ী নস্তু।

আমরা তো তাই জানি, তুমি স্বীকার কর না-কর। আচ্ছা, উকিল-ব্যারিস্টার লাগালে—

কথা শুনে মামা একরকম তেড়ে এলেন আমার দিকে। এসে বললেন, নস্তু আমাদের কেউ নয়।

আলোচনাটা অল্প দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্তে মামাকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, আচ্ছা, মনি-অর্ডারের কুপনটা তুমি পড় নি? বাবা কি একটা লাইনও লেখেন নি?

বড়মামা সহসা আমার তাঁর বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, এখানে তোকে কেউ যত্ন করে না, যত্ন করবার মত নেইও কেউ। বাবার কাছে ঘাবি, জ্যা?

না মামা। তোমাদের কাছেই তো আমি খুব ভাল আছি।

মিছে কথা বললি? সেদিন তোকে অমন ক'রে মারলুম, তবু তুই বলছিলি, এখানে ভাল আছিস?

হ্যাঁ মামা, তবু বলছি এখানে আমি ভাল আছি। কেষ্টনগর থেকে তুমি যদি কুড়িয়ে না নিয়ে আসতে, তা হ'লে আজ আমি কোথায় থাকতুম?

কাপড়ের কোঁচা দিয়ে বড়মামা চোখ মুছলেন। মামা তবু বলেন যে, নস্তুদার জন্তে তিনি নাকি এক ফোঁটা জলও নষ্ট করতে রাজী নন।

সেই দিনই বিকেলবেলা ঝরনা এল। আমার সঙ্গে ওর আগে একদিন দেখা হয়েছিল। আমার ঘরে ব'সেই দুজনে গল্প করছিলাম। আমার ইস্কুলে ভর্তি হবার কথা নিয়ে খানিকক্ষণ আলোচনার পরে ঝরনা উঠে গিয়ে হঠাৎ ঘরের দরজাটা দিলে বন্ধ ক'রে।

জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপার কি, দরজা বন্ধ করলে যে?

একটা গোপনীয় কথা আছে। নস্তুদাকে তো তুমি খুব ভালবাসতে?—ঝরনা এসে বসল আমার গা বেঁধে।

বললুম, হ্যাঁ, ভালবাসতুম। তবে, এসব চুরি-ডাকাতির ব্যাপারটা তার আমার একেবারেই ভাল লাগে নি।

সে কি!—ঝরনা যেন আকাশ থেকে পড়ে পুনরায় বললে, দেশের স্বাধীনতার জন্তে ব্যাক থেকে হু লাখ টাকা নেওয়াকে ডাকাতি বলে না। তাও তো টাকাটা কাজে লাগল না, ধরা পড়ে গেল। একে ডাকাতি বল তুমি?

হ্যাঁ ভাই। প্রয়োজন যত বড় হোক, ডাকাতিকে ডাকাতি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। তা ছাড়া নন্দদার এখন লেখাপড়া করার বয়স, স্বাধীনতার জন্তে ডাকাতি করতে বাওয়া তার উচিত হয় নি।

আমার কথা শুনে ঝরনা একেবারে চুপ করে গেল। একটু বাদেই আমি ওকে বললুম, আমার কথা ছেড়ে দাও, আমি তো পাড়াগাঁ থেকে এসেছি। কিন্তু তুমি তো তোমার গোপনীয় কথাটা বললে না, ভাই?

কি করে বলি? তোমাকে বিশ্বাস করি কি করে?

নন্দদার কথা তুমি আমায় নির্ভয়ে বলতে পার।

এর মধ্যে ঝরনা বার কয়েক জানলার কাছে গিয়ে রাস্তার দিকে কি যেন দেখে এল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তোমার সঙ্গে কেউ এসেছে নাকি?

হ্যাঁ, নন্দদাদের দলের লোক। জান তো টাকার অভাব বলেই ওরা নন্দদার জন্তে উকিল-ব্যারিস্টার রাখতে পারে নি।

ঝরনার কথা শুনে তখনই আমি বললুম, মামা কিন্তু মোকদ্দমার জন্তে এক পয়সাও খরচ করবেন না।

জানি, দলের লোকেরাও তাই জানে। কিন্তু নন্দদাকে কি করে সাহায্য করা যায় সেইটেই এখন আমাদের ভাবতে হবে। টাকা তো কম লাগবে না।—জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে ঝরনা তার গলার স্বর নীচু করে আবার বললে, নন্দদা জানতে চেয়েছে যে, তোমার মামীমার গয়নাগুলো মোকদ্দমার খরচের জন্তে ব্যবহার করা যায় কি না?

মামীমাকে তা হলে আমি জিজ্ঞাসা করে আসি।—এই বলে আমি উঠতে বাচ্ছিলাম। ঝরনা আমায় টেনে ধরে রাখল, উঠতে না দিয়ে বললে, তুমি বড় ছেলে-মাছ ভাই। জিজ্ঞাসা করতে গেলে চার দিকে হৈ-টৈ পড়ে যাবে। তোমার মামাকে তো আর কারো চিনতে বাকি নেই!

তবে?—এমন ভাবে প্রশ্নটা আমি করলুম যেন আমি

নিজেই আজ একটা অসহায় অবস্থার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছি। বোধ হয় এমন অবস্থা থেকে উদ্ধার করবার জন্তেই ঝরনা আমায় বললে, কাউকে কোন কথা জানিয়ে দরকার নেই। মামীমার আলমারির চাবিটা কোথায়?

ঝরনার কণ্ঠস্বরে বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিকতার স্বর শোনা গেল না। যতটা সম্ভব আমার নিজের মনের অবস্থাটা ওকে জানতে না দিয়ে বললুম, চাবিটা মামীমার বাগিশের তলায় থাকে।

নিশ্চয় আসতে পার?—জিজ্ঞাসা করল ঝরনা।

পারি। কিন্তু চাবি দিয়ে কি করবে?

আমি কিছুই করব না। তোমাকেই আলমারিটা তাঁর খুলতে হবে।

কেন?

গয়নার বাজটা আমাদের চাই।

আমি কিছু বলার আগেই দেখলাম যে, দলের লোকটি মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে উকিঝুঁকি মারছে। আমার ভয় করতে লাগল। আমি চুপ করে আছি দেখে ঝরনা জিজ্ঞাসা করলে, এটুকু কাজ কি তুমি নন্দদার জন্তে করতে পারবে না?

না।

কেন?

আমি চুরি করতে পারব না।—আমার জবাবের মধ্যে যে নৈতিক জোর রয়েছে ঝরনার বুকে একটুও কষ্ট হ'ল না। জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে দলের লোকটি আমার কথা শুনতে পেয়েছে। শুনতে পেয়েছে বলেই সে বললে, বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে। তোমাদের কথা কি শেষ হয় নি?

কথা শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু কাজটা হ'ল না।—ঝরনার কণ্ঠস্বরে হতাশার পরিমাণ প্রচুর।

ঘরের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে লোকটি তখন বললে, নন্দকে তা হলে বাঁচানো গেল না। আশ্চর্য, সবাই খেয়ে-দেয়ে নাকে তেল দিয়ে খুমবে, আর আমরা কেবল বনবাদাড়ে ইংরেজের গুলি খেয়ে মরব! চ'লে এস ঝরনা—

আমি বললুম, একটু দাঁড়াও।—ঝরনাকে দাঁড়াতে বলে আমি চ'লে এলুম মামীমার ঘরে। মামীমা অবিভ্রি তখন ঘরে ছিলেন না। আমার ট্রান্সটা মামীমার তক্তাপোশের তলায় এনে রাখা হয়েছিল কদিন আগে।

একটু পরে আমার নিজের ঘরে ফিরে এসে স্বরনাকে বললুম, এই ফোটোখানা আমার বাবার। মা এই ফোটোখানা বাঁধিয়েছিলেন সোনা দিয়ে। অনেকটা সোনা আছে এতে। এটা বেচে কি তোমরা নন্দদার জন্তে উকিল-ব্যারিস্টার রাখতে পারবে না?

নিশ্চয়, নিশ্চয়। দেখি।—বাইরে থেকে জানলা দিয়ে হাত বাড়াল মলের লোকটি। স্বরনা ফোটোখানা গুলিয়ে দিল তার হাতে। মুহূর্তের মধ্যে সে সোনার ফ্রেমটা খুলে নিয়ে বাবার ফোটোটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ঘরের দিকে। তারপর সে বললে, স্বরনা, আমি যাচ্ছি। উপস্থিত এইটেকেই অনেক কাজ হবে।

লোকটি অন্তহিত হয়ে গেল।

স্বরনাও গেল। গেল এক ঘণ্টা পরে।

রাত বোধ হয় আটটা হবে। খোকনকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আমি মামার লাইব্রেরি-ঘরে গিয়ে বসলাম। তিনি বেড়াতে বেরিয়েছেন। সাড়ে আটটার মধ্যেই ফিরে আসবেন। ইস্কুলে ভর্তি হবার আর তো কোন রাস্তা নেই। অতএব, আমি নিজেই আজ মামাকে অল্পরোধ করব বলে মনে মনে ঠিক করে রাখলাম। বাবার টাকা তো মামা নিজেই আজ ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন। বিকেলবেলা স্বরনা এসে আমার শেষ সম্পত্তিটুকুও নিয়ে গেল। সোনার ফ্রেমটা দিয়ে দিলুম বলে আমার বিন্দুমাত্র অহুতাপ আসে নি। নন্দদা যদি মুক্তি পায়, তা হলে আমার অহুতাপ করার কোন কারণই থাকবে না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার চেয়ে সেদিন নন্দদার মুক্তির মূল্য আমার কাছে ছিল অনেক বেশী।

সাড়ে আটটার সময় মামা বাড়ি ফিরলেন। সিঁড়ি দিয়ে তিনি ওপরে উঠছেন। বড় ভয় করতে লাগল। আমার অল্পরোধ যদি তিনি না রাখেন? লাইব্রেরি-ঘরে মামার মন এবং চেহারা যেত বদলে। একতলার সাংসারিক মামার সঙ্গে যে দোতলার জ্ঞানতপস্বীর একেবারেই মিল ছিল না—সে কথা তো তোকে আগের চিঠিতেই জানিয়েছি। আজ সেই বিশ্বাসটুকুর ওপর নির্ভর করে মামার কাছে আমার আঞ্জিটা পেশ করব বলে আমি মনে মনে শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলাম।

মামা এলেন। কোন কথা বললেন না আমার সঙ্গে।

সোজা গিয়ে বসে পড়লেন চেয়ারে। কেম্‌ব্রিজ ইতিহাসের বেশ মোটা একটা ভ্যালুম খোলাই পড়ে ছিল টেবিলের ওপর। তিনি সেই বইখানার মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। আমি চেয়ে রইলাম মামার মুখের দিকে। আমার মনে হ'ল, মামার মন আজ ইতিহাসের বইতে আবদ্ধ নেই।

আমার আনন্দাজ মধ্যে হ'ল না। একটু পরেই তিনি আমার ডাকলেন, জয়া।

আসছি মামা। আমি তাঁর বাঁ দিকে গিয়ে দাঁড়ালুম। আমার ঘাড়ে হাত রেখে তিনি বললেন, কাল থেকে তুই ইস্কুলে পড়তে যাবি।

কোন ইস্কুলে?—কথাটা সত্যি কি না পরীক্ষা করে দেখবার জন্তেই প্রশ্নটা আমি করলুম।

বিধানচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়। মিসেস গুপ্তর ওখানে আমি গিয়েছিলাম। টাকাপয়সার ব্যবস্থা সব আমি করে দিয়েছি। একটা বছর তোর শুধু শুধু নষ্ট হ'ল।

তা হোক, আর তো নষ্ট হওয়ার ভয় রইল না।

আমারই দোষ। ঘর লেখাপড়া হওয়ার নয়, তার জন্তে কত টাকাই না নষ্ট করলুম। বাক, আমার আর হুঁশ নেই। ছেলের অভাব বোধ হয় তুইই যেটাতে পারবি। দিনকাল বদলে যাচ্ছে জয়া। ছেলেদের সমান হচ্ছে মেয়েরাও।

কেবল সমানই হচ্ছে? তাদের কি মেয়েরা ছাড়িয়ে যেতে পারবে না, মামা?

পারবে, নিশ্চয়ই পারবে।—সহসা মামা চিন্তার মধ্যে ডুবে গেলেন। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম তাঁর পাশেই। একটু পরেই পা টিপে টিপে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। মামা ডাকলেন আমায়, জয়া—

ঘুরে দাঁড়িয়ে জবাব দিলুম, এই যে মামা।

মামার মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম যে, তিনি এ ঘরে এখন উপস্থিত নেই। কি যেন তিনি চিন্তা করছেন খুব গভীরভাবে। চিন্তা করতে করতে তিনি বোধ হয় কোন এক নতুন জগতে বিচরণ করছেন।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। হঠাৎ মামা কথা বলতে লাগলেন। কথা ঠিক নয়, বক্তৃতা। মনে হ'ল, তিনি যেন তাঁর ক্লাসের ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে বলছেন, নন্দ স্বাধীনতা চায়, আমি চাই নে? কিন্তু স্বাধীনতার জন্তে

নক্সা যা করেছে, আমি তা করতে পারি নে। শাসক-ইংরেজ আর সভ্য-ইংরেজের মধ্যে অনেক তফাত। প্রাচীনকালের গল্প দেশের কথা মনে ক'রে দেখতে বলছি। কি হয়েছিল সেখানে?—প্রশ্ন ক'রে মামা চেয়ে রইলেন আমার দিকে। মামা কি পাগল হয়ে গেলেন না কি? আমার দিকে চেয়ে তিনি পুনরাবৃত্তি প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছিল সেখানে? সেখানে—মানে, প্রাচীন গল্প দেশে?

ভয় পেয়ে আমি বললুম, কি হয়েছিল সেখানে আমি জানি না মামা।

রোমানরা যদি গল্প দেশ দখল না করত, তা হ'লে ওদের মধ্যে একতা আসত না। কেবল একতার কথা নয়, পরবর্তী কালের সব কিছু উন্নতির মূলেই তো ছিল রোমান-সংস্কৃতি। ইংরেজদের তোরা ভয় করিস, আমি করি নে। পাশ্চাত্য-সভ্যতার আলো যদি ওরা না জ্বালত, তা হ'লে হিন্দুস্থানের হিন্দী-অন্ধকার দূর হ'ত কি ক'রে? জয়া, বাইরের শত্রু এসে কোন সভ্যতাই নষ্ট করতে পারে না। প্রথমে সভ্যতা নষ্ট করে ভেতরের শত্রু। তা ছাড়া, জাতি যদি প্রথমে আত্মহত্যা না করে, তা হ'লে বিদেশী শত্রু এসে ঘাড়ের ওপর চেপে বসতে পারেও না। সে যাক। আমি কেবল তাদের 'এইটুকুই বলতে চাই যে, নক্সা আমাদের কেউ নয়।—এই পর্বন্ত ব'লে মামা সহসা বক্তৃতা দিলেন বন্ধ ক'রে। ছ হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে তিনি ব'সে রইলেন, একটি কথাও আর বললেন না।

আমি নিশ্চয়ই সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম।

রত্না, ওপরে যে মামার বক্তৃতার সারাংশটা দিলাম, সেটা পরবর্তী কালে মামার মুখ থেকে একাধিকবার শুনেছি। নইলে সেদিনকার বক্তৃতার একটা কথাও আমি লিখতে পারতাম না। হয়তো সবটা লিখতে পারিও নি। আমার মনে আছে, রোমান-সংস্কৃতি সম্বন্ধে মামা বেশ লম্বা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কিন্তু সবটা মনে রাখবার মত বয়স কিংবা বিস্তে আমার সেদিন ছিল না।

পরের দিন মামা নিজেই আমায় ইস্কুলে নিয়ে গিয়ে ভর্তি ক'রে দিয়ে এলেন। পার্স থেকে শুনে শুনে টাকা বার করলেন তিনি। এক মুহূর্তের জন্তেও তাঁর হাত কাঁপল না। আমি ভর্তি হয়ে গেলুম। মাত্র এক দিনের মধ্যে মামা আমার ওপর এতটা স্নেহশীল হয়ে উঠলেন কি ক'রে?

এ সম্বন্ধে আমি অনেক ভেবেছি। একটা কারণ ছাড়া, দ্বিতীয় কারণ আমি খুঁজে পাই নি। লেখাপড়াকে মামা দেবতার চেয়েও বেশী ভালবাসতেন। নক্সা তাঁকে হত্যা করেছে ব'লেই হয়তো তিনি তাঁর সবটুকু স্নেহ সেদিন আমার ওপর ঢেলে দিয়েছিলেন।

আমার নতুন জীবন আরম্ভ হ'ল। ইস্কুলে যেতে শুরু করলুম। ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার পরের দিন মামা আমায় বললেন, আজ থেকে তোকে আর বাজারে যেতে হবে না। আমি একলাই বাজার ক'রে নিয়ে আসব।

কেন মামা?

এখন থেকে তোকে লেখাপড়া করতে হবে। এদিককার কাজও তো তোর অনেক।

তা হোক। এদিককার কাজ করব, বাজার করব এবং লেখাপড়াও করব।—এই ব'লে আমি বাজারের ব্যাগটা হাতে নিয়ে বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে গেলুম।

মামা বললেন, বেশ, আজ চল আমার সঙ্গে। কাল থেকে তোর আর যাওয়ার দরকার হবে না।

বাজারের দিকে হাঁটতে হাঁটতে মামা বলতে লাগলেন, পরীক্ষায় কিন্তু তোর প্রথম হয়ে পাস করা চাই জয়া। মামার মুখরক্ষা করতে পারবি তো?—প্রশ্নটা ক'রে তিনি আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বাজারের কটকের সারনে। আমিও মামার চোখের দিকে সোজাভাবে চেয়ে গম্ভীরভাবেই বললাম, তোমার কোন ভাবনা নেই মামা। তুমি দেখো, আমি তোমার মুখরক্ষা করবই।

সাবাস, সাবাস!—বলতে বলতে মামা ঢুকে পড়লেন বাজারে। মাছের দোকানের সামনে এসে তিনি যেন তাঁর মনের কথাটা ব্যক্ত করার জন্যে বললেন, তুই তো হাজার হ'লেও মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষের কাছে কী আর আশা করা যায়, বল?

কী এবং কতটা তুমি আশা কর বল?—পান্টা প্রশ্ন করলাম আমি। আমার প্রশ্নটার সোজাহুজি জবাব না দিয়ে মামা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। একটু পরে আমার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, ছেলেগুলো আমার একটাও মানুষ হবে না।

মামার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবার কারণটা বুঝতে আমার অসুবিধে হ'ল না।

এক সপ্তাহ পরে মিসেস সবিতা গুপ্তকে মামা ডেকে পাঠালেন। সেদিনটা ছিল রবিবার। তিনি এসে বসলেন লাইব্রেরি-ঘরে। সেখানে আমিও ছিলাম। মামা মিসেস গুপ্তের হাতে টাইপ-করা একটা চিঠি দিয়ে বললেন, আমি আপনাদের ইস্কুলের সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ রাখতে চাই নে। সভাপতির পদ থেকে আমি সরে দাঁড়ালুম।

কেন বলুন তো?—জিজ্ঞাসা করলেন মিসেস গুপ্ত।

মামা তখনুনি জবাব দিলেন না। তিনি পশ্চিম দিকের শেলফের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। মেঝে থেকে একেবারে মিলিং পর্যন্ত থাক-ভর্তি বই। এদিককার বইগুলো ইতিহাসের নয়, সবই শিক্ষা সম্পর্কে। দু-একখানা বই টেনে নিয়ে মামা উটেপাটে দেখতে লাগলেন। কি যেন তিনি গভীরভাবে ভাবছিলেন।

একটু পরে ডক্টর যাদব মিত্র এসে বসে পড়লেন তাঁর চেয়ারে। মিসেস গুপ্তের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, অসহযোগ আন্দোলনের পরেই আমার উচিত ছিল বাংলা দেশের সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করা।

কেন, ডক্টর মিত্র?—জিজ্ঞাসা করলেন মিসেস গুপ্ত।

এবার মামা উত্তর দিতে ধেরি করলেন না, বললেন, শিক্ষার প্রতি মানুষের আর সন্দেহবোধ নেই। আমার বিশ্বাস, আর বিশ্ব-বাইশ বছরের মধ্যে শিক্ষার মূলগত অর্থ যাবে বদলে। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো রাজনীতি চর্চার আখড়া হয়ে উঠবে।

আর একটু ব্যাখ্যা ক'রে বলুন।—অহরোধ জানিয়ে মিসেস গুপ্ত পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, উনবিংশ শতাব্দীর ট্র্যাডিশন ক্রমে ক্রমে উঠে যাচ্ছে ব'লে কি আপনি ভয় পাচ্ছেন ডক্টর মিত্র?

ব্যক্তিগত ভাবে আমার ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। আমার সম্ভানরা কেউ মানুষ হবে না। সে কথা থাক। মিসেস গুপ্ত, আপনি এইমাত্র ট্র্যাডিশনের কথা বলছিলেন না? দেখুন, বর্বর যুগ থেকে এ পর্যন্ত মানুষ বত রকমের শিক্ষা-ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছিল তার মধ্যে দুটো উপাদান ছিল অত্যাবশ্যক—একটা ট্র্যাডিশন এবং অপরটা হচ্ছে টেকনিক। আজ পর্যন্ত আমরা ট্র্যাডিশনকেই বেশী প্রাধান্য দিয়ে এসেছি। এটা তর্কের

বিষয় নয়, এটা ঐতিহাসিক সত্য। আজ আমরা কি দেখছি? সমাজের কোন বাধীন অস্তিত্ব নেই। সমস্ত ক্ষমতা গিয়ে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে রাজনীতির হাতে। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক সভ্যতা পরিচালিত হচ্ছে রাজনীতির দ্বারা। রাষ্ট্র বধন শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করবে, তখন তার উদ্দেশ্য হবে কি? সেই বিশেষ রাজনৈতিক দলের খেয়াল-খুশিকে কার্ণে পরিণত করার জগ্নেই তারা শিক্ষা-পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। অতএব, শিক্ষা আর সত্যিকার শিক্ষা থাকছে না। অসহযোগ আন্দোলন ভাল কি খারাপ, তা নিয়ে আলোচনা করব না। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে আমি ভবিষ্যৎ মানুষের মনের একটা স্পষ্ট ছবি দেখতে পেয়েছি। আমরা আপনারা মুক্তি দিন, মিসেস গুপ্ত। আমার আন্দোলনও অসহযোগের—রাজনীতির দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আজ যদি আমি আন্দোলন শুরু না করি, তা হ'লে কি আমি সত্যপ্রাপ্ত হব না?

মিসেস গুপ্ত বললেন, সারা ভারতবর্ষের প্রত্যেকেই তো আজ ইংরেজের বিরুদ্ধে ধর্মঘট ঘোষণা করেছে। প্রত্যেকভাবে না করলেও, মনে মনে যে করেছে সে সম্বন্ধে আর ভুল নেই।

মিসেস গুপ্তের কথা শোনবার পরে মামা বার কয়েক ঘরের মধ্যেই পায়চারি করলেন। তারপরে তিনি বললেন, ইংরেজ এ দেশে চিরদিন থাকতে পারবে না। আমরা ধর্মঘট না করলেও ওরা চ'লে যাবে। চ'লে যেতে বাধ্য হবে।

এ কথা আপনি কি ক'রে বলছেন, ডক্টর মিত্র?

বলছি একটি ঐতিহাসিক-আইনের কথা স্মরণ ক'রে। মানব-সভ্যতার ইতিহাস পাঠ ক'রে আমরা জানতে পেরেছি যে, সভ্যতা যত বেশী চারদিকে ছড়াতে থাকে, তার নিজের গভীরতা কমতে থাকে তত বেশী। প্রগতির অল্প সভ্যতাকে কত বারই তো এই চরম মূল্য দিতে হয়েছে। মিসেস গুপ্ত—

কথাটা অসমাপ্ত রইল। দেওয়ালে টাঙানো ভারত-বর্ষের মানচিত্রটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মামা। তিনি চেয়েছিলেন বাংলা দেশের দিকে। তারপরে তিনি বধন আমাদের দিকে মুখ ঘোরালেন, আমরা তখন দেখলুম যে, মামার সমস্ত মুখখানার ওপরে ভীষণ এক শোকের

ছায়া পড়েছে। মনে হয়, তিনি যেন শোকের ছায়াটাকে কুড়িয়ে নিয়ে এলেন মানচিত্রের বাংলা দেশ থেকে।

মিসেস গুপ্তকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, একবার যখন শিকার ইচ্ছা নিয়ে মাঠে ময়দানে ছলোড় আরম্ভ হয়েছে, তখন আমরা আর পারব না এর ইচ্ছাত বাঁচিয়ে রাখতে। মিসেস গুপ্ত, ভারতবর্ষের এতে কতটা ক্ষতি হবে বলতে পারি নে, কিন্তু বাংলা দেশের ক্ষতি আর কোন-দিনও পূরণ হবে না।

তার মানে?—মিসেস গুপ্ত একটু চমকে উঠে পুনরায় প্রশ্ন করলেন, তার মানে কি ডক্টর মিত্র? বাংলা দেশ কি ভারতবর্ষের চেয়েও বড়?

গায়ে-পায়ে বড় না বটে, কিন্তু বাংলার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য—। থাক, এ নিয়ে আর আলোচনা করার দরকার নেই। মিসেস গুপ্ত, কোনরকম আলোচনার দ্বারাই আমরা আর বাংলার সর্বনাশ ঠেকাতে পারব না। অতএব আমরা আপনারা ছুটি দিন। নমস্কার।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবার সময় মিসেস গুপ্ত আমার বললেন, তোমার মামা ইংরেজদের বড় বেনী ভালবাসেন।

হ্যাঁ, মামা নন্দদার ঠিক উঠে। কাল পার্কের মীটিংয়ে কি হয়েছিল জানেন?

কি হয়েছিল?

নন্দদার মকদ্দমার খরচ তোলবার জন্তে পার্কে একটা মীটিং হয়েছিল। ছেলে আর মেয়েদের কি ভিড়! মঞ্চের ওপর নন্দদার একটা ফোটা টাঙানো হ'ল। ছেলেরা সব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল যে, নন্দদার জন্তে ওরা সব জীবন দেবে, রক্ত দেবে ইত্যাদি। কিন্তু উকিল-ব্যারিস্টাররা রক্ত আর জীবন নিয়ে কি করবেন? তাঁরা চান টাকা। রক্তের চেয়ে যে টাকার দাম বেশী তা অবিশিষ্ট মেয়েরা সব জানত। ছেলেদের চেঁচানো খেমে যেতেই মেয়েরা সব নন্দদার ফোটোর দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে সোনার গয়না ফেলতে লাগল। উঃ, সে কত গয়না!

এই পর্যন্ত শুনে মিসেস গুপ্ত বললেন, সোনার বাংলার এই তো হ'ল আসল ইতিহাস! তোমার মামা লেখেন কি? লেখেন তো কতকগুলো খ্রীষ্টান আর তারিখ। ওয়া, স্বাধীন ভারতবর্ষে বাংলার নন্দদারই তো সব সোনার সিংহাসনে বসবে।

আপনি বোধ হয় ঠিকই বলেছেন। কিন্তু পার্কের ঘটনা সব শুনুন। ভিড় ঠেলে আমি একেবারে মঞ্চের সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। ছেলেরা রক্ত দেবার জন্তে আমার চিংকার শুরু করল, আর মেয়েরা ছুঁড়তে লাগল সোনার চুড়ি, আংটি, কানের ঢুল—বৃষ্টির মত সব পড়তে লাগল মঞ্চের চারদিক দিয়ে। এত সোনা জীবনে আমি কখনো দেখি নি, সবিতাদি। ইচ্ছে করছিল, হাত দিয়ে সোনার জিনিসগুলো একটু ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখি। ওয়া, ঠিক এই সময় একটা মন্ত বড় সোনার হার এসে ছিটকে পড়ল আমার হাতের ওপর। হাতের ওপর লেগে পড়ে গেল মাটিতে। অম্ম কেউ দেখতে পায় নি, কারণ সবাই তখন ছুটছে। পুলিশেরা সব পার্কের মধ্যে ঢুকে পড়ে লাঠি মারছে। বে-আইনী সভা। আমি তাড়াতাড়ি করে হারটা মাটি থেকে তুলে নিলুম। পলকের মধ্যে লুকিয়েও ফেললুম। এখন কি করি? সবাই তো সব কিছু ফেলে পালিয়ে যাচ্ছে। নন্দদার ফোটাখানা পর্যন্ত ফেলে গেল ওরা! পুলিশ এখনি লাঠি মেয়ে ফোটাখানা হয়তো ফাটিয়ে ফেলবে। বড় মুশকিলেই পড়ে গেলুম আমি। নন্দদার প্রতি ছেলেদের যদি বিন্দুমাত্র প্রভা থাকত, তা হ'লে সোনার গয়নাগুলো ফেলে দিয়েও ফোটাখানা নিয়ে পালিয়ে যেত ওরা। তা যখন ওরা করল না, আমিই শেষ পর্যন্ত নন্দদার ছাঁকখানা নিয়ে ওখান থেকে দিলুম এক ছুট। পার্কের পেছন দিকের রাস্তায় পুলিশ কেউ ছিল না বলে আমার পালিয়ে আসতে অস্ববিধে হ'ল না।

সোনার হারটা কি করলে?—জিজ্ঞাসা করলেন সবিতাদি।

বললুম, আমার কাছেই আছে।

নন্দদার দলের লোকদের কাছে পাঠিয়ে দাও নি কেন?

ওয়া, পাঠিয়ে দেব কি করে, নন্দদার দলের লোকদের তো, আমি চিনি না। ভাবছি, স্বরনার কাছেই পাঠিয়ে দেব। দুপুরবেলা আপনাদের বাড়ি আমি যেতুমই।

আমার কথা শুনে মিসেস গুপ্ত বেশ খানিকটা অবাক হয়ে আমার জিজ্ঞাসা করলেন, অপরের সোনার হার স্বরনা নেবে কেন? তা ছাড়া এসব বৈধবিক দলের সঙ্গে স্বরনার তো কোন সম্পর্কও নেই।

ওয়া, সে কি কথা! হারটা তো স্বরনারই। ঠিকমত

কলকাতার বর্ষা

উমা দেবী

মেঘ—মেঘ—মেঘ—মেঘ—

ডুবে বাই আকাশের সঙ্গে,

হৃদয় কোথায় পাও এ প্রমত্ত উধাও আবেগ,

কেন ডুবে যেতে চাও মেঘের তরঙ্গে !

রাশি রাশি কালো মেঘ স্তম্ভল কোমল,

ও মেঘে লুকানো আছে সমুদ্রের জল—

চেয়ে দেখে তারও চেয়ে এ অশ্রু আমার আরো

শুদ্ধ ও নির্মল !

আহা—কোন সমুদ্রের তটদেশ-বালুকা

লবকের বন্ধিম লতায়

তোমার অলস বেলা ব'য়ে চ'লে যায়—

ছায়া রা লুটায় তটে আলসে হেলায় !—

সমুদ্র-দীপের এক এলাচ-লবঙ্গ-ছোয়া স্মৃতি হাওয়ায় !

সে স্মৃতি হাওয়া এনে হৃদয়ে ব্লাণ্ড,

হৃদয়ের খুশি যত বিনিময়ে নাও ।

এ জীবনে আছে যত ক্লান্তিময় তাপ

সে শুধু এ নাগরিক সভ্যতার লুকানো উত্তাপ ।

ও শুধু আমরা থাক—তুমি শুধু নাও,

এ মনের খুশি যত, দু হাতে ছড়াও

নয়ম ছায়ায় আর স্মৃতি হাওয়ায়—

আর গাঢ় বর্ষণের আকস্মিকতায় ।

মক্কানী কলিকাতা—আমাদের মক্কায় প্রাণ

কোথায় প্রান্তর পাব ? শ্রামল উদ্ভান ?

কোথায় বা রেবা শিশু কাবেরী বিপাশা ?

আমাদের দৃষ্টি সর্বনাশা !

সে দৃষ্টি কোলে মোহাঞ্জন আবার পরাও—

নীলাঞ্জন ছায়াটুকু হৃদয়ে ছড়াও—

হৃদয়ের খুশি শুধু বিনিময়ে নাও ।

মেঘ—মেঘ—মেঘ—মেঘ—

চারিদিকে মেঘের তরঙ্গ—

ডুবে যায়—গুয়ে যায় ক্লান্তিভরা অঙ্গ ।

ও নীল গভীরে আছে নোনা এক সমুদ্রের স্বাদ,

কত বাসনায় ডুবে ওই নীল—অনীল অগাধ—

ও যেন স্বপ্নের বাপে—হাহাকাধে—ভরা এক হৃদয়ের সাধ !

গ'লে যায় গ্রীষ্মের নির্মোক—

গ্রীষ্মের তুলনা এক কাঠিতের শোক ।

মেঘ—মেঘ—মেঘ—মেঘ—

চারিদিকে মেঘের ছায়ায়

জীবনের সব ক্লান্তি আর নাপরিক শ্রান্তি

—সব মিশে যায় ।

দূর থেকে ভেসে আসা স্মৃতি হাওয়ায়

সুদূর দেশের এক মনোরম বার্তাকে ছড়াও

নীল মোহাঞ্জন ছায়া নয়নে পরাও—

আকাশের স্বপ্ন এনে হৃদয়ে ভরাও—

বিনিময়ে হৃদয়ের খুশিটুকু নাও,

হৃদয়ের খুশিটুকু বিনিময়ে নাও ।

ডুতে পারলে হারটা তো মঞ্চের ওপরে গিয়েই পড়ত ।

রনার ভাগ্য ভাল ব'লেই ওটা ছিটকে এসে পড়ল

মঞ্চের আশ্রয় হাতের কাছে ।

রনার হার ?—মিসেস গুপ্তের কণ্ঠস্বরে কম্পন, ওর

বঁয়ের অস্ত্রে ছ'ভরি সোনা দিয়ে হারটা আমি গড়িয়ে

রখেছি । জয়া !

সবিতাদি ।

নন্দর অস্ত্রে রানা কেন ঘাবে সোনা ছুঁড়তে ?

এর জবাব তো রানা দিতে পারবে, সবিতাদি ।

জয়া !

বলুন ।

হারটা আমার ফিরিয়ে দাও ।

ঠিক এই সময় বাইরের দরজা দিয়ে রানা এসে উপস্থিত হ'ল ।

[ক্রমশ]

শিক্ষণ

(অতৃপ্ত তৃষাময়ী অভিশপ্তা জাতিস্বরূপা)

শ্রীকৃষ্ণধন মে

এল একটি হারানো কাহিনী

কোন কনকস্বপনরথে,

এল একটি হারানো ধামিনী

মোর যৌবন-জাগা পথে,

আজি যুগ-যুগান্তি পাবে

কেন ধরা দিলে আপনারে,

কেন বিস্মৃত অভিসারে

এলে কামনার সৈকতে ?

কত কেতকী-স্বরতি নিশীথে

আমি জেগেছি তম্বাহারা,

আজো শুকতারা আগে সে-পীতে

বারে রচিল সন্ধ্যাতারা।

তুমি এসেছ কি ভীকু পায়ে

মম বাহু-বল্লরীছায়ে,

বন- মর্মরদোলা বায়ে

মনোমর্মরে দিলে সাড়া ?

কবে কণ-বসন্ত লগনে

আমি জেলেছি রূপের শিখা,

কোন অতীতের মক-স্বপনে

আমি সাজিয়েছি মরীচিকা।

কত ফুলমালা গেছে ঝরে,

কত জ্যোছনা যে গেছে মরে,

শত চূষিত এ অধরে

শুধু আঁকা কলক-লিখা।

চির বন্দিতা অভিসারিকা

আমি কালের সিন্ধুতটে,

মম উচ্ছল তহুগীতিকা

কাঁপে যৌবন-ছায়ানটে।

আজো নিশীথে উজ্জয়িনী

শোনে মঞ্জীর বিনি বিনি,

আমি আজো চিরবন্দিনী

শত প্রেমিক-স্বয়ংগটে।

কবে ছুঁয়েছ অরুণ-অতিথি

মোর বেদনার শতদল,

আজো পরমক্ষণের সে স্মৃতি

ভরা অশ্রুতে টলটল।

কত ভূষিত অশ্রু রাতে

লঘু মেঘ-ঢাকা জ্যোছনাত্তে

দেহ- দেহলীর সীমানাত্তে

তুমি এসেছ তৃষা-চপল।

আমি লালসা-জাগর নয়নে

কত যাপিয়াছি মধুনিশা,

শত বাসকসজ্জা-শয়নে

মোর মেটে নি মিলন-তৃষা।

চির- বাহন লুকায়ে রাখি'

আমি দাঁড়াই মদ্রির-আধি,

তহু- বন্দরে লই ডাকি'

আজো যে তরী হারায় দিশা।

আজো মনে কি পড়ে না হে প্রিয়,

কত উতলা মাধবী রাতে

কানে গেলেছিলে কি-বে অমিয়

প্রেম- শুভন-পীতিকাতে ?

কত রেবা-নর্মদা-ফুলে

পথ ছেয়ে গেছে ফুলে ফুলে,

মম লাজ-শুষ্ঠন ফুলে

কেন বেঁধেছিলে রাখী হাতে ?

আমি যুগে যুগে খুঁজি তোমারে,

কত জনম জনম ভোর,

আজো হারা-বসন্ত-মাঝারে

কাঁদে ফুলহীন মালাডোর

তুমি দাঁড়াও আখির আগে,

তব ভুলে-বাণীয়া অহুবাগে,

যদি কত মনে স্বাত জাগে,

—যিটাও এ তৃষা মোর।

রম্যানি বাম্বা

শ্রীমদ্বোধকুমার চক্রবর্তী

১৪

থিওসফিক্যাল সোসাইটি থেকে যখন আমরা বেরিয়ে এলাম, বেলা তখন পড়ে এসেছে। মামা ও মামী দুজনকেই বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। বললুম, ঘুরে ঘুরে বোধ হয় ক্লান্তি এসেছে আপনাদের, এবারে কেরা যাকি।

মামী বললেন, ছপুয়ে গুর এটুকু গড়ানো অভ্যাস।

মুখের পাইপটা সরিয়ে মামা বললেন, অভ্যাসটা আমার একারই?

মামী বললেন, আমরা মেয়েমানুষ, সব কিছুই নইয়ে নেওয়া আমাদের অভ্যাস।

মামা বললেন, কাজেই পুরুষমানুষেরাই অল্পে নেতিয়ে পড়ে, এই তোমার বক্তব্য।

আমি হেসে বললুম, কলাক্ষেত্র দেখে কাজ নেই তা হ'লে।

স্বাতি বললে, কলাক্ষেত্র কি আর্ট গ্যালারির নাম?

বললুম, আর্ট গ্যালারি কেন হবে! পাভলোভার ছাত্রী রুস্ত্রিনী অরুণভেলের নাম শোন নি—সঙ্গীত আর নৃত্যের জন্তে যিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন! কলাক্ষেত্র তাঁরই স্থল। কর্ণাটিক মিউজিক, ভারতনাট্যম্ আর কথাকলি নাচ শিক্ষা দেওয়া হয়। বোনাপু শেখানো হয় এই স্থলে। এদের অতি প্রাচীন নকশার শাড়ির একটা বিশিষ্ট কদর আছে এদিকে।

স্বাতি যেন লাফিয়ে উঠল। বললে, দক্ষিণী নাচ শেখায় এখানে? আমার অনেক দিনের সাধ এদের নাচ দেখবার।

মামার দিকে ফিরে বললে, তোমার বেশী কষ্ট হবে না তো বাবা?

মামা বললেন, গাড়িতে বসে থাকতে আর কষ্ট কি!

মামীকে স্বাতি বললে, তুমি আর আপত্তি ক'রো না মা।

কাজেই সোসাইটির দক্ষিণ দিকে অবস্থিত কলাক্ষেত্রের দরজায় আসা গেল। মামা বললেন, তোমরা দেখে এস,

আমি চোখ বুজে তামাকটা একটু উপভোগ করি।—ব'লে গাড়ির ভেতরেই পা একটু ছড়িয়ে বসলেন।

মামী বললেন, নাচ-গানের মর্ম আমিই বা কি বুঝি! বরং তোমাকেই একটু পাহারা দিই।

সেই ভাল।—ব'লে স্বাতি এগিয়ে গেল। আমি গেলুম পেছনে পেছনে। তারপর খেমে বললে, মুশকিল হ'ল, কি ক'রে আলাপ জমানো যায়!

বললুম, বলবে একবার রামগোপালের নাচ দেখেছিলুম কলকাতায়, কি অপূর্ব! সেই থেকে দক্ষিণের নাচ দেখার জন্তে প্রাণ আকুলি-বিকুলি করছে এতকাল। কিন্তু সাবধান! ভুলেও বালা সুরবতীর নাম ক'রো না। মেয়ে-মানুষের ব্যাপার, অল্প মেয়ের প্রশংসায় হয়তো অফেন্স নিয়ে ফেলবেন।

স্বাতি একটা কটাক্ষ নিক্ষেপ ক'রে এগিয়ে গেল আবার। ভাগ্য ভাল বলতে হবে, একজন শিক্ষার্থীর সঙ্গেই দেখা হ'ল প্রথমে। বললে, বেশ তো, আজ ভারতনাট্যমের ক্লাস। একটু অপেক্ষা করুন, আপনাকে সব বুঝিয়ে দেব।

আমি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলুম কতকগুলো যাত্ত-যন্ত্র। এদের বীণা দেখলুম আমাদের বীণের চাইতে আকারে বড়। সাতটি তার আর চব্বিশটি ঘাট। মনে হ'ল, এটি অধিক শক্তিশালী। অনেক বীণার নাম শুনেছি—বিচিত্রবীণা, রুদ্রবীণা, ব্রহ্মবীণা, ভারতবীণা, কচ্ছপী বীণা, শুধু বীণাও আছে, কিন্তু নিজের চক্ষে এসব দেখি নি। তাই এ দেশের বীণা কোন্ পর্বায়ে পড়ে জানি না। সাপের স্ফণার মত একটি শিঙ দেখলুম। একেই কি নাগস্বরম্ বলে? বীণার জাতের আর একটি যন্ত্র ছিল পাশে। 'বেতার-স্বরগতে' তার নাম দেখেছি গোট্টুবাম্বম্। এখানকার সেন্টাল কলেজ অব কর্ণাটিক মিউজিকের অন্ততম অধ্যাপক প্রবীণ সঙ্গীতজ্ঞ বৃন্দালুর কৃষ্ণমূর্তি শাস্ত্রী রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত অকুঠানে এই গোট্টুবাম্বম্-বাদন বেতারস্থ করেছেন।

সেই শিক্ষার্থিনী মেয়েটি ভেতর থেকে একজন

অপেক্ষাকৃত বয়স্ক মহিলাকে নিয়ে আবার বাইরে এল। স্বাতির সঙ্গে শিষ্টাচার বিনিময়ের পর ইংরেজীতে তারা আলোচনা শুরু করল। মহিলা বললেন, কণ্ঠাটিক মিউজিক আপনার কেমন লাগে?

স্বাতি অকপটে স্বীকার করল, ভাল লাগে না। বললে, রাগসঙ্গীতে আমার অল্পরাগ নেই। সঙ্গীতকে যদি হৃদয়ের ভাব প্রকাশের বাহন বলে স্বীকার করি, তবে অত শক্ত বাঁধা-ধরা বিধি-নিষেধ মানতে ইচ্ছে করে না।

মহিলা বললেন, আমি এই রকম উত্তরই পাব আশা করেছিলুম।

স্বাতি লজ্জিত হয়ে বললে, কেন বলুন তো?

মহিলা বললেন, উত্তর-ভারতে খেয়াল গানের বেপরোয়া প্রচলনই ঋষপদী সঙ্গীতের দাম কমিয়েছে—এই আমার বিশ্বাস।

এই মন্তব্যটি যেন নতুন শুনলুম, তাঁর মুক্তি শুনবার আগ্রহ হ'ল।

তিনি বললেন, ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ঋষপদের আদর যখন ক'য়ে এল, তখন যন্ত্রসঙ্গীত প্রাধান্য পেয়েছিল তার প্রাপ্যের বেশী। তাই কণ্ঠে যন্ত্রের অহুসরণ শুরু হ'ল। উত্তর-ভারতের খেয়ালে এই যন্ত্রসঙ্গীত অহুসরণের নিষ্ঠা আজও অপ্রতিহত আছে। যন্ত্রেরও আদর আছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ তো মানুষের কণ্ঠে যন্ত্রসঙ্গীতের প্রতিধ্বনি শুনতে ভালবাসে না। তাই সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সঙ্গীতে রাগরূপটাই সর্বস্ব নয়। রাগরূপের অতীত আরও একটি স্তর আছে। সেটি আয়ত্ত হ'লে সব সঙ্গীতেরই মার্ধুর্ঘ্যটুকু ধরা পড়ে। দক্ষিণ-ভারতে 'ঘরানা'র শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আমরা বিবাদ করি নে। প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতই আমরা সত্যিকার নিষ্ঠার সঙ্গে চর্চা ক'রে থাকি। এবং এ কথা বললে গর্ব করা হবে না যে, প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতের আমবাই এখন প্রকৃত উত্তরাধিকারী। রাগ-সঙ্গীতের জন্মেও মধুর কণ্ঠ চাই। তানের ব্যবহার হওয়া উচিত পরিমিত। প্রোতার গান শুনতে এসেছে, গলাসাধা শুনতে আসে নি—গায়কের এটুকু মনে রাখা দরকার। আপনাদের রবীন্দ্রন্যূন শুনেছি, অনেক ঐগদ খেয়াল ও

খেয়ালদ গান লিখেছেন বাংলায়। রাগ-সঙ্গীতের প্রচণ্ড বিদ্যেবীরভি সে গান শুনছেন প্রচুর আগ্রহ নিয়ে। তার কারণ আর কিছুই নয়। সে রাগ-সঙ্গীতে মধুর কণ্ঠ আছে, আর আছে পরিমাণজ্ঞান। অর্থহীন যন্ত্র-সঙ্গীতের মত তার ভাল ইনিয়ে-বিনিয়ে ক্লান্ত করে না প্রোতাকে।

স্বাতি নাচের কথা শুনতে এসেছে। বললে, দক্ষিণ-ভারতের নাচের তুলনা আমি দেখি নে। আমার সেই সম্বন্ধেই জানবার বড় আগ্রহ।

মহিলাটি হাসলেন। বললেন, কথাকলি মালাবারের নিজস্ব সম্পত্তি। আপনি যদি সেদিকে যান, তবে সেদিকেই সে নাচ দেখবেন। আমি আপনাকে ভারতনাট্যম্ সম্বন্ধে কিছু বলি। আজ আমাদের ভারতনাট্যমের চর্চা। ইনিও এই নাচ শিখছেন।—ব'লে পাশের মেয়েটিকে দেখিয়ে দিলেন।

তারপর বললেন, দক্ষিণী নৃত্যের ওপর প্রাচীন বই আছে। একটি ভারতের নাট্যশাস্ত্র ও দ্বিতীয়টি নন্দিকেশ্বরের অভিনয়দর্পণ। তাত্ত্বিকের শিবমন্দিরে দেবদাসীরা যে নৃত্যপদ্ধতি অহুসরণ করেছে, তা ভারতের নাট্য-শাস্ত্রাঙ্গ। দক্ষিণের মন্দিরে মন্দিরে তখন দেবদাসীদের নৃত্য হ'ত; কিন্তু অনাচার ও যথেষ্টাচারের জন্মে এক সময় এই নৃত্য বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছিল। ঋষপদী নৃত্যের আদর বেড়েছে অল্পদিন। শুরু মীনাক্ষীস্মরণ পিলে, পেল্লিয়া পিলে, কবি ভাল্লাখোল, চোকলিকম্, মুখুখায়া, শঙ্করম্ নম্বুজি এবং কয়েকজন নর্তকী এই ঋষপদী নৃত্যকে আবার তার স্রাব্য মর্ধাধার প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। বালা সরস্বতীর নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই, ইনিও এক দেবদাসী পরিবারগণ্ডু, তাঁর ঠাকুরমার কাছে তিনি শিক্ষা পেয়েছেন।

ভারতনাট্যমে মূদ্রার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও রসাহুযায়ী নানা মূদ্রা আছে। হাতের শাখামূদ্রাগুলি প্রধানত সংযুক্ত ও অসংযুক্ত। সংযুক্ত মূদ্রায় দুটি হাত মিলিতভাবে একটি ভাব প্রকাশ করে। পতাকামূদ্রা আট রকমের, এতে হাতের পাতা খুলে মূদ্রার বিকাশ। মুষ্টিমূদ্রাও আট রকম। এতে হাত অঙ্গলিবদ্ধ। তাতে আঠারোটি

মুদ্রা। এ ছাড়াও স্বতন্ত্র মুদ্রা আছে তেইশ রকম। মুদ্রা নিয়ে ভরত ও নন্দিকেশ্বরে মতভেদ আছে, ভারত-নাট্যম্ ও কথাকলিতে পার্থক্যও আছে কিছু কিছু। আবার এই সব মুদ্রার জটিলতা না শিখেও নাচ শেখা ও বোঝা দুইই চলে। এইবার আপনাকে ভারতনাট্যমের একটা উদাহরণ দিই।—ব'লে শিক্ষার্থিনী মেয়েটিকে তাঁর নিজের ভাষায় কিছু নির্দেশ দিলেন। মেয়েটি সামনে উঠে এসে পা ছুটি জুড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। হাত দুটি কটিদেশে নাভির সামনে, মুখ সামনের দিকে একটু ঝুঁকে।

মহিলা বললেন, আমরা আলরিপ্পু দিয়ে ভারত-নাট্যমের সূচনা করি। বোল—যাই জাগ যাই হি যাই দ্বিদি যাই ইত্যাদি। মেয়েটি নাচ শুরু করেছে। পা মুড়ে নীচু হয়ে হাত দুটো আনল বৃকের কাছে। গ্রীবা বেকল পাশ থেকে পেছনে ও হাত দুখানা প্রসারিত করল শরীরের দু ধারে। তারপর নমস্কারের ভঙ্গীতে দু হাত যুক্ত করল চিবুকের নীচে। তার পরেই দুটো হাত নিজের দক্ষিণে একত্র প্রসারিত ক'রে দিল অভ্যর্থনার ভঙ্গীতে। আবার নমস্কার। তারপর 'একটু সবু সবু' ভঙ্গী। তারপর ব-এর আকৃতি দুখানা পায়ের একখানা উঠল শূঙ্গে। হাতের একখানা 'সবু', আর একখানা সঁতারের ভঙ্গী। তারপর সঁতারের হাতখানা 'সবু' আর 'সবুরে'র হাতখানা হুমড়ে বৃকের কাছে এনে পাঁচটা আঙুল মেলে চেয়ে দেখল। তখন দুটো পা আবার ব-এর মত। এর পর ডান পায়ে লাগি ছুঁড়ল আর বাঁ হাত নীচে থেকে তুলে আনল মাথার ওপর। ডান হাতে 'সবু'র ভঙ্গী, আর মাথা তুলে দেখাল নিজের বাঁ হাতের মুদ্রা। এর পর দুটো পা মাটিতে তুলে একটু ডান দিকে ঝুঁকে যেন প্রসন্ন করার ভঙ্গী—কেমন দেখলে? বাঁ হাত নিজের বৃকের কাছে আর ডান হাত দর্শকের দিকে।

মেয়েটি ধামল। মহিলা বললেন, এর মানে কি হ'ল বুঝলেন?

স্বাতি ঘাড় নেড়ে জানাল, বুঝতে পারে নি।

মহিলা বললেন, ফুলের পাপড়ি যেমন একটি একটি ক'রে খোলে, সুরের আলোকস্রোতে তেমনি ফুটে ওঠে আমাদের দেহ। মেয়েটিকে আর একবার নির্দেশ দিয়ে বললেন, এইবারে এই আলরিপ্পু নাচ শেষ হচ্ছে দেখুন।

মেয়েটি পা দুটো ব-এর মত ক'রে হাত দুটো দু ধারে বিস্তার ক'রে দাঁড়াল। তারপর ডান পা তুললে, আবার নামাল। মুখটা একবার হেলাল ডান দিকে। এবারে কতকটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ডান পা ছুঁড়ল সামনের দিকে। ডান হাত সামনে আর বাঁ হাত বৃকের কাছে। তারপর বাঁ পা তুলে নিজের বাহুর মাসল দেখার ভঙ্গী। তারপর পা দুটো ব-এর মত ক'রে বাঁ হাত বৃকের কাছে আর ডান হাত পিছনে ছড়িয়ে পেছনে তাকিয়ে 'সবুরে'র ভঙ্গী। এবারে বাঁ পা তুলে নমস্কার, তারপর ডান পা তুলে। আবার পা দুটো ব-এর মত। দু পাশের ছড়ানো হাত সামনে এনে 'সবু সবু,' তারপর পা জুড়ে সোজা দাঁড়িয়ে নিতাই-গৌর নাচ। তারপর সামনে ঝুঁকে ভুঁড়ি কমানোর কদম্ব। এবারে সোজা হয়ে উঠে হাতের নানা মুদ্রা দেখাল মাথার ওপর, তারপর মাথার ওপরেই তালি বাজাল বাঁ পা তুলে। শেষ হ'ল পা জুড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দু হাত দু দিকে ছড়িয়ে, ভাবখানা—কেমন দেখালুম নাচ?

স্বাতির দিকে তাকিয়ে মহিলা হাসলেন এবার। বললেন, এর পর জাতিস্মরণম্ নৃত্য। সদ্ধে রাগ, শঙ্করাভরণ চক্রভাগম্ বসন্ত টৌরী বা ভৈরবী। তার পরের নৃত্য শব্দে বৈষ্ণব রস পরিবেশন। চতুর্থ নৃত্য বর্গম্ হচ্ছে বৃহৎ এবং জনপ্রিয়ও। গায়ক টৌরী-কল্যাণী বা রাগমল্লিকায় বিষ্ণুর কোনো উপাখ্যান গাইবেন, আর নর্তক তাঁর নাচের মাধ্যমে সেই গল্পটি দর্শকদের বুঝিয়ে দেবেন। কবি থিয়াগরাজের গানই আমরা ব্যবহার করি। নাচ সম্পূর্ণ হবে 'ভিলানাম'।

বাইরে হর্নের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। আমার দিকে ফিরে স্বাতি বললে, ওঁরা বোধ হয় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

বললুম, ব্যস্ত হবারই কথা।

মহিলা ব্যাপারটা শুনে যেন লজ্জায় ম'রে গেলেন। বললেন, আমার অবহেলার জন্তই এমন হ'ল। চলুন, তাঁদের এনে ঘরে বসাই।

আমি বললুম, আপনি লজ্জিত হবেন না। সারাদিন ঘুরে ওঁরা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তাইতেই ওঁরা নামেন নি।

মহিলা বললেন, আমরা এখানে তাঁদের বিশ্রামের ব্যবস্থা ক'রে দিতাম।

স্বাতি বললে, আজ আমরা উঠি, যদি সময় পাই কাল আবার বিরক্ত করতে আসব।

আমি অজস্র ধন্বাদ জ্ঞানালুম। মহিলা আমাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে তার চেয়েও বেশী অপরাধ স্বীকার করে সকলকে লজ্জা দিলেন।

বাইরে তখন অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে। রাস্তায় রাস্তায় বাতি উঠেছে জ্বলে। বড় শাস্ত সমাহিত বলে মনে হ'ল এই অঞ্চলটা। পাড়াগাঁয়ের মত যেন ঘুমিয়ে পড়েছে সন্ধ্যাবেলাতেই। স্টেশনে ফেরার পথে গাড়িতে নাচের গল্পই শুরু হ'ল। মামী বললেন, কি দেখলি ভেতরে?

স্বাতির ঘোর তখনও বোধ হয় খানিকটা ছিল। সংক্ষেপে বললে, নাচ। তারপর আমাকে লক্ষ্য করে বললে, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন গোপালদা? আমাদের নাচের মত এদের দেহের ভঙ্গী তেমন লীলায়িত নয়, চেউয়ের মত সহজ দোলা নেই এদের নড়াচড়ায়। কেমন যেন কাঠ কাঠ ভাব, জ্যামিতির কিগারের মত কঠিন আর ভীষণ।

মামী বললেন, এ যুগের নাচ দেখতে আমার কষ্ট হয়। মানুষ প্রথম নাচে মনের উল্লাসে, নিজের আনন্দের ভাগ অপরকে দেবার জন্তে। এই নাচের ভাল ছিল না, শাস্ত ছিল না। তারা ভরতের নাম শোনে নি কোন-দিন। এ নাচ আজও আছে আমাদের চোখের আড়ালে। কসল-কাটা বা নবাবের আনন্দে নাচে সাঁওতাল কোল ভীল। নাচে বুড়ির আশায়, নাচে দেবতার কৃপার জন্তে। সেও নাচ আর কথকও নাচ। তবলার তালের সঙ্গে পা ঠুকে ঠুকে মরে মেয়েগুলো। নাচ কখনও পরাধীন হয়?

আমি বললুম, আপনায় জনপদ নৃত্য ভাল লাগবে। গুজরাতির গরবা, উত্তর-ভারতের কাজরী বা মণিপুরের রাসলীলা।

স্বাতি রূখে উঠল, বললে, মণিপুরের রাসলীলাকে আপনি উচ্চাঙ্গ নৃত্য বলে স্বীকার করেন না?

বললুম, জনপদ নৃত্যের মধ্যে রাসলীলাতেই শিক্ষা ও সাধনার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। এর আঙ্গিকও উন্নত ধরনের। তাইতে যদি একে উচ্চাঙ্গ নৃত্য বল, তাতে

আমি আপত্তি করব কেন। তবে এই সমস্ত নৃত্যের মূলে ধর্মপ্রেরণা, তাই স্বমজ্জিত। আঙ্গিকও ভাল। শুধু পুনরাবৃত্তিবহুল বলে ক্রান্তিকর। মামাবাবু যে স্বতঃস্ফূর্ত নাচের কথা বলছিলেন, সেই প্রাণপ্রাচুর্যের জোরে এসব নাচ আজও সমান আনন্দ জোগাচ্ছে।

স্বাতি বললে, মালাবারে কৈকটকলি বলে এক ধরনের জনপদ নৃত্যের নাম শুনেছিলুম। সেই কৈকটকলিই কি কুধাকলি?

বললুম, কৈকটকলির নাম শুনি নি। তবে কথাকলি উচ্চাঙ্গ নৃত্য বলে প্রচলিত হ'লেও জনপদ নৃত্যের অনেক সাধারণ গুণ আছে এতে। একে নৃত্য না বলে নৃত্যনাট্য বললে হয়তো ভাল হ'ত। কেন না, অভিনয়ের প্রাধান্যই এতে বেশী। এরা রামায়ণ-মহাভারতের উপাখ্যানের অভিনয়ই করে। শুনেছি, পেছনে থেকে দুজন গায়ক গান গায়, আর তবলা বা মন্দিরার তালে তালে নটনটারা নাচে। তাদের প্রসাধনের একটা বিশিষ্ট রীতি আছে। চার বছর ধরে তা শিখতে হয়, ও চার ঘণ্টার দরকার হয় সেই প্রসাধন সমাপ্ত করতে। মুখোশ একটা অপরিহার্য জিনিস। এবং অভিনয়ের সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক চরিত্রাঙ্কনায়ী মুখোশ ও প্রসাধনের পদ্ধতি নির্দিষ্ট আছে। এতে শাখামুজার সংখ্যা বেশী। রেচক ও জ্বিলাসেরও নানা ভঙ্গী। সব মিলে এমন একটা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে যে, অনেক সাধনা করে এ নাচ শিখতে হয়। মেয়েরা ন-দশ বছর থেকে এ নাচ শিখতে শুরু করে অনেক বয়স ও পরিশ্রমে অনেক বয়সে একে আয়ত্ত্ব করে বলে শুনেছি। ভারতনাট্যমের মত মালাবারের মোহিনী নাট্যম্ নাকি এককালে বিশেষ প্রচলিত ছিল। এখন আর এ নৃত্যের আদর একেবারে নেই।

১৫

আমাদের ট্যাক্সি তখন রাউন্ট রোডের ভেতর দিয়ে ফিরছিল। উজ্জল আলোয় দোকানপাট কাঁকে আর হোটেল সব ঝলমল করছে। সেমিকে লক্ষ্য করে আমার চায়ের কথা মনে পড়ল। বললেন, মোগলের হাতে প'ড়ে আজ আর চা জুটল না কপালে!

মামী বললেন, খেয়ে নাও না কোনও দোকানে।

পরামর্শটা সকলেরই পছন্দ হ'ল।

একটা কাফেতে চা খেতে ব'সে স্বাতি বললে, আর
কি দেখবার রইল গোপালনা?

মামাবাবু বললেন, সবই তো দেখা হয়ে গেল।

স্বাতি একটু ভেবে বললে, না, মাছের আকোয়েরিয়াম
এখনও দেখি নি।

বললুম, কোনও আকোয়েরিয়ামের কথা তো শুনি নি।

স্বাতি হেসে বললে, তবেই দেখুন, আমি আপনার
চেয়ে বেশী খবর রাখি। মাছের দিকে ফিরে বললে, সেই
বইটায় পড়েছি মা।

এইবারে আমি হাসলুম। বললুম, উনবিংশ শতাব্দীর
বই পড়লে তো আর বিংশ শতাব্দীর খবর পাওয়া যায় না।
মাদ্রাজের সব মাছ যে বোম্বাইয়ে চালান হয়ে গেছে তা
জান? ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের মেরিন ড্রাইভে খোলা
হয়েছে তারাপোরওয়ালা আকোয়েরিয়াম। এরা এখন
চিড়িয়াখানার ভেতর নতুন একটা খুব খুব করছে।

স্বাতি চিন্তিতভাবে বললে, তবে কাল সারাদিন কি
দেখব? চিড়িয়াখানা আর জাহ্নবর? হো!

মামী বললেন, মাদ্রাজ থেকে যারা ফেরে, তারা কৃত
জিনিস নিয়ে ফেরে—পেতল আর চন্দনকাঠের জিনিস,
শাড়ি—

মামা থামিয়ে দিলেন, বললেন, যাবার সময় আর জঞ্জাল
বাড়িও না। ফেরার পথে কেনাকাটা ক'রো প্রাণ ভ'রে।

আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল মহাবল্লীপুরমের
সমুদ্র। বললুম, আমি একটা সাক্ষেশন দিতে পারি।

স্বাতি অস্বস্তি করল : সমুদ্রে স্নান!

বললুম, হ'ল না।

মামা বললেন, তবে কি বিষ্ণুকাঞ্চী শিবকাঞ্চীর কথা
বলছ?

বললুম, কাঞ্চীর তাঁতি দেখতে যাব? শহর তো
তাঁতিতেই ভরা শুনেছি।

মামা বললেন, তাঁতি দেখতে যাবে কেন? পুষ্পেশ্বর
জাতি, নগরেশ্বর কাঞ্চী—তুমি বলছ তাঁতির কথা!

বললুম, কাঞ্চিভরমে তো তাঁতি আর মন্দির। এমন
মন্দির তো সারা দক্ষিণ-ভারত ছেয়ে আছে। তার জন্তে
একটা দিন নষ্ট?

স্বাতি বললে, তবে ধরেছি এইবার, পক্ষিতীর্থ।

বললুম, আমাদের দেশের মড়া-থেকে শকুনের গায়ে
খানিকটা খড়ি-গোলা জল ঢেলে দিলেই তো পক্ষিতীর্থ।
তবে খানিকটা হয়েছে, আর একটু এগিয়ে মহাবল্লীপুরম।
সমুদ্রের ধারে অপূর্ব জায়গা, সমস্ত দক্ষিণ-ভারতে তার
তুলনা নেই।

মামাবাবু চ'টে উঠলেন, বললেন, হুঁ, কয়েকটা পাখরের
টিবি দেখবার জন্তে অতদূর ঠেঙিয়ে যাচ্ছি আর কি!

আমি চুপ ক'রে গেলুম।

চা খেয়ে বোঝা গেল, আমরা সত্যিই বেশ ক্লান্ত
হয়েছিলুম। সন্ধ্যার চুল গজানোর মত ধীরে ধীরে
আমাদের শক্তি ফিরে এল। মামী বললেন, জিনিস না
কেনো, বাজার দেখতে তো দোষ নেই।

মামার গররাজি নিয়রাজিতে পৌঁছেছে; বললেন,
তোমার বাজার দেখা মানেই তো বাজারটা বাড়ি নিয়ে
যাওয়া।

আর একবার সাধলেই যাই—এই ভাব। মামী বললেন,
বাজারটা বাড়ি নিয়ে আসে কে?

মামা বললেন, ঠিকই তো। যার জন্তে চুরি করি,
সেই তো চোর বলবে!

আমার দিকে ফিরে বললেন, পেছনে লেজুড় না
ধাকলে, বুঝলে গোপাল, আমি এতদিন শাস্ত্রবাক্য
'হিমালয়ঃ ব্রহ্মেণ' মনেতে পারতুম। বয়স তো পঞ্চাশ
হ'ল। বনের বদলে হিমালয়ে গেলে আর কিছু না হোক,
এই গরমে এমন ভেপসে মরতে হ'ত না।

সত্যিই গরমটা যেন এখানে অস্তরকমের। রাতে
বুটি হয়েছিল শুনেছি, সারাদিন মেঘ ক'রে রইল।
সূর্যদেব কখন উঠলেন আর কখন ডুবলেন, টের পাই নি।
ট্রিমিকিনের সমুদ্রবেলায় যখন একবার মেঘের ফাঁক থেকে
উকি মেরেছিলেন, তখন মাথার পিটপিটিনি টের পাই নি
স্বাতির আনন্দে। ক্যামেরাটা সন্ধ্যাবহার করতে পেয়ে যেন
উদ্ভাস হয়ে আনন্দ ছড়িয়েছে।

মাদ্রাজের জলবায়ু এখন ভালর দিকে চলেছে।
অক্টোবর মাসের শেষ থেকে মার্চের গোড়ার দিক পর্যন্ত
এখানকার আবহাওয়া ভারি ভাল। উত্তাপ তখন
সাতষট্টি আর আটাত্তি ডিগ্রীর মধ্যে ঠঠানামা করে।

বাতাসের আর্দ্রতাও কম। দিনের বেলায় মন্য গরম, আর রাতগুলো বেশ ঠাণ্ডা। এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত বড় বিজী গরম। উত্তর-ভারতের মত গরমের তেজ নেই, এক শো ডিগ্রীর ওপরে বড় একটা ওঠে না। কিন্তু জালা আছে। বাতাসের আর্দ্রতা অত্যন্ত বেশী বলে যেমে ভেপ স্বে ওঠে গা। এমন অস্বস্তিকর গরম আর নেই। এখানে বর্ষা হয় বছরে দুবার। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু জুন-জুলাইয়ের গরমের সময় কয়েকবার বর্ষণ করে যায়। আসল বর্ষা অক্টোবর-নভেম্বর মাসে, উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর কাছে।

মামী হাসছিলেন। ষেঘটায় বলেই কেললেন, ডুলিতে চেপে না হয় হিমালয়ে উঠলে, তারপর? ঐ শরীর তো আর তপস্রা করে হয় নি।

হাসলাম আমরাও। মোটা মানুষের মেজাজ কি একটু বেশী ভাল হয়? মামা পাইপে আঙুন ধরিয়ে বললেন, তোমার কাছে যে হার মানি, সেই তো মোর জয়।

মামী একটু ভংগনীর স্বরে বললেন, বয়েস তোমার বাড়বে না?

গাড়িতে বসে মামা বললেন, চল গোপাল, বাজারই করা যাক। কেন আর তোমার মামীর আপসোস থাকে।

বাজারের নামে ট্যাক্সি-ড্রাইভার খুশি হ'ল। আজ আর তাকে নতুন যাত্রী ধরার অপেক্ষার পরীক্ষা দিতে হবে না বলেই বোধ হয় খুশি হ'ল। ভাঙা হিন্দী আর ইংরেজী মিলিয়ে বললে, মাজাজের বাজার না দেখলে যে মাজাজ দেখাই হ'ল না। পুরো শহরটাই যে বাজার।

বললুম, পুরো শহরটা আবার দেখিও না, তু-একটা ভাল দোকানে নিয়ে চল।

ড্রাইভার চুঃখিত ভাবে বললে, মাউন্ট রোডের ভাল দোকান দুটোই বন্ধ হয়ে গেছে, বিদেশীরা যেখানে কাড়াকাড়ি করে জিনিস কেনেন।

জানা গেল, সে দুটি ভিক্টোরিয়া টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট আর সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়াম। সেখানে মহীশূরের চন্দনকাঠের জিনিস, ত্রিবাঙ্কুরের হাতির দাঁতের জিনিস, তাজমহলের নকশা-করা ধাতুর জিনিস, রূপোর কাজকরা তামার প্লেট, এম্বল্স করা রূপোর বাস্ক, সরীসৃপের চালুড়ার তৈরী মেয়েদের ব্যাগ, হৃন্দর নরম মাছুর, বেত

আর তালপাতার জিনিস, আরও কত কি। তবে এরা অফিসের মত দোকান খোলে বন্ধ করে। সকাল নটা থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা ছুটি পর্যন্ত, মাঝে খাবার ছুটি। ট্রাইলার্স চেকও নেয় এরা।

একটু গলা নাড়িয়ে আমাকে বললে, আপনাদের সঙ্গে এসব দোকান, আমাদের বেশের লোক বড় একটা যায় না।

রাউণ্ড টানা ঘুরিয়ে দুবার কয়ুম নদী পেরিয়ে আমাদের চীনেবাজারে নিয়ে এল। নেতাজীকে এরা শ্রদ্ধা করে। তাই চীনেবাজার রোডের নাম দিয়েছে—নেতাজী স্মারক রোড।

মামী একখানা শাড়ি কিনলেন, কাকীপুরমের শাড়ি। শাড়ি সিল্কের ওপর জরির পাড় আর আঁচল। অজ্ঞানে স্বাতির বিয়ে। মামী বললেন, এই শাড়ি প'রে জামাই বরণ করব। সত্যিই এ শাড়ির তুলনা নেই ভারতবর্ষে। আমাদের বেনারসের ব্রোকেডে আছে দামের বিজ্ঞাপন, বেশমের আর টিক্তে কাশনের জোলুস। সিল্কের বাজারে মুর্শিদাবাদও খানিকটা স্থান অধিকার করেছে। কিন্তু বেশমী কাপড় যে এত মজবুত ও এত মোলায়েম হতে পারে, তা এই প্রথম দেখলুম। দুনিয়ার সমস্ত রঙ একত্র করেছে শাড়ির বাজারে, জরির ভারী আঁচলায় বেঁধে রেখেছে এক অতীত দিনের ঐতিহ্যকে। মনে হয়, অনেক যুগ আগে এমনি শাড়ির আঁচল দুলায়ে মন্দিরে মন্দিরে নাচত দেবদাসী, তাই এত রঙের চটক আর সোনার ছড়াছড়ি।

স্বাতির পছন্দ হ'ল না একখানা শাড়িও। বললে, এমন গাঢ় রঙ আর কাঁপা-কোলা শাড়ি কলকাতায় অসম্ভব অচল।

তারপর কটাক্ষে একজন মহিলা খন্দেরকে দেখিয়ে বললে, ওদেরই মানায়। মামীর চেয়ে কম বয়েস নয় মহিলার। মোটা কালো দেহের ওপর চড়িয়েছে টিয়ে-পাখীর রঙের সবুজ শাড়ি। নাকের ফুটোতে হীরের নাক-ছাবি, কানে হীরের ফুল আর খোঁপায় জুইয়ের মালা।

স্বাতির কোনো কাপড় পছন্দ হ'ল না বলে দোকানদার বড় আশ্চর্য হ'ল। বললে, আমার দোকান থেকে 'পছন্দ হ'ল না' বলে কেউ ক্রি়ে যায় নি। বিদেশী মহিলাও কিনেছেন কাকীপুর শাড়ি। বলেছেন, দেশে গিয়ে

ভারতীয় মেয়েদের কায়দায় পরতে না পারলে কেটে দৈর্ঘ্য ড্রেস ক'রে নেবেন।

স্বাতি বললে, আমাদের কলকাতায় এর চেয়ে ভাল শাড়ি পাওয়া যায়।

ম্যাট বাজার থেকে মামী একখানা মাহুর কিনলেন। বেশ মোটা শক্ত ঘাসের তৈরী মাহুর। ঘরে কার্পেটের মত এর ব্যবহার চলে। এমন মিহি আর নরম। বেশেয়ের ওপর বসেছি ব'লে ভ্রম হবে অন্তমনস্কদের। দোকানদার বললে, এ মাহুর আসে তিক্রনেলভেলি থেকে।

রতনবাজারে মামী একটা গহনার দোকানে ঢুকলে। কোমরের একখানা ভারী বিছে দেখে মায়ে মেয়ে হাসল কিছুক্ষণ। তার চেয়েও আশ্চর্য হলেন মাথার একটা গয়না দেখে। ভারী ভারী রূপোর গয়নাও ছিল, আঙুলের চুটকি আর মল থেকে খোঁপার ফুল পর্যন্ত। মেয়ে বললে, এমন ভারী গয়নাও পরতে পারে এরা?

মা বললেন, কেন পারবে না, আমরাই পরেছি ছেলেবেলায়।

কেনা হ'ল এক জোড়া রূপোর পিলহুজ পাঁচ প্রদীপের, আর ব্রোঞ্জের একটা নটরাজমূর্তি। এ স্বাতির পছন্দ, বললে, ড্রয়িংরুমে রাখবার মত জিনিস।

আর এক জায়গায় বাতাস আকুল হয়ে আছে ফুলের গন্ধে। ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে বললে, স্নাওয়ার বাজার।

মামা বললেন, ফুল দেখে পাগল হবার ব্যয়েস গেছে। ও তোমরাই দেখ।

গাড়ি থেকে নামবার সময় মামী বললেন, ফুল দেবতাদের জিনিস, রাক্ষসেরা ভালবাসতেন ব'লে শুনি নি।

কথাটি বড় লাগল। হজরত মহম্মদ বলতেন যে, খাঙ্গা যেমন দেহের ক্ষুধা মেটায়, ফুলের স্বরকার তেমনি মনের ক্ষুধা মেটাতে। তাই

“জ্যোটে যদি মোটে একটি পয়সা

খাঙ্গা কিনিও ক্ষুধার লাগি।

যদি ছুটি জ্যোটে তবে একটিতে

ফুল কিনে নিও হে অহুরাগী।”

ইজের নন্দনকাননে ফোটে পারিজাত। আর রাবণের অশোককাননে সীতার অশ্রুতে কান্ পারিজাত ফুটেছে, তার বর্ণনা করতে ভুলে গেছেন কবি বায়ীকি।

স্বাতি বললে, এমন অদ্ভুত বাজার দেখি নি কলকাতায়।

ভাল ক'রে দেখে আমিও স্বীকার করলুম, এমন ফুলের বাজার নেই কলকাতায়। সেখানে এখন অ্যান্টার ডালিয়া আর চন্দ্রমল্লিকা ওঠে নি, শক্ত ডাঁটার রজনীগন্ধা আর স্নাডিওলাসে ভ'রে আছে তাদের কাচের শো-কেস-গুলো। লোকে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল কিনে নিয়ে যাচ্ছে ফুলদানির জন্তে। এখানে টেবিলের ওপর সাজিয়ে বসেছে মল্লিয়ম্—মানে বেল জুই মল্লিকা, আর গোলাপের মালা। ফুলদানি সাজাবার কাট-স্নাওয়ার নেই কারও কাছে। একদিকে দোকানীরা বসেছে টুলের ওপর। মেয়ে পুরুষ ছুঁলই, সামনে ছোট ছোট চৌকো টেবিল। আর এক ধারে খন্ডের সব মেয়েরাই। জুই আর বেলের মালা কিনছে খোঁপার জন্তে। এ দেশের মেয়েরা এত ফুল ভালবাসে! খোঁপায় মল্লিয়মের মালা নেই এমন মেয়ে দেখেছি কি আজ!

আমাদের দেশে বেল জুইয়ের দিন ফুরিয়েছে। এদেরও তো একদিন ফুরোবে, তখন মেয়েরা কি পরবে চুলে?

ফলের বাজারে মামী কিনলেন অসময়ের আম, কমলালেবু আর লাল কলা। আঙুরের সের বললে, চার আনা। স্বাতি তো স্বপ্ন দেখছে ডাবল, চার আনা সের আঙুরের? আমাদের দেশে যে চার আনার আঙুর চাইতে লজ্জা করে।

আধ সের আঙুর কেনা হ'ল দু আনায়। গোটা কয়েক মাত্র আঙুর উঠল, স্বাতি বললে, এই তোমার আধ সের?

এই তো আধ সের; ষোলটার ওজন যদি এক সের হয়, তবে আট তোলায় আর কত উঠবে?

স্বাতি প্রাণ খুলে হাসল।

দৈর্ঘ্যবাজার এম্প্রানোড ব্রডওয়ে ঘুরে আমরা ফিরলুম। সেন্ট্রাল স্টেশনের পর বাকিংহাম খাল পেরিয়ে ড্রাইভার দাঁড়াল। বললে, মুওর মার্কেটটা একবার দেখে নিন। শতিনেক দোকানে না পাবেন এমন জিনিস নেই।

একটা চারকোণা জায়গায় অসংখ্য দোকান। তবে স্বাতি বললে, আমাদের নিউ মার্কেটের কাছে লাগে না।

পৃথিবীর সব কিছু এনে জড় করা হয়েছে এক জায়গায়। এমন বাজার আর কোথায় আছে জানি নে।

কর্পোরেশনের বিপন বিল্ডিংয়ের পাশ দিয়ে যাবার সময় ড্রাইভার বললে, এর পেছনে আছে পিপলস্‌ পার্ক, কর্পোরেশন স্টেডিয়াম আর জু।

এগমোরে নেমে মনে হ'ল স্টেশনটা যেন সাজানো হয়েছে আজ। মামাবাবু যখন পরমা মেটাচ্ছিলেন ট্যাক্সির, স্বাতি তখন আশ্চর্য হয়ে স্টেশনের সজ্জা দেখছিল।

মামাবাবু বললেন, এ দেশের লোকেরা অনেক ভদ্র। মিটারে যা উঠেছে, তার চেয়ে কম পরমা নিলে লোকটা। নিজে থেকেই বললে কম দিতে। সারাদিন ঘুরেছি, অত গয়েটিং না দিলেও চলবে।

মামীও আশ্চর্য হলেন একটু।

স্বাতি বললে, আজ কোন উৎসব আছে কি এদের ?

গেটের টিকিট-কলেক্টরকে জিজ্ঞেস করলুম। সে হেসে বললে, এমনি সাজানো হয় রোজ সন্ধ্যাবেলা। এখানকার সব ভাল গাড়িগুলো ছাড়ে সন্ধ্যার পর, আর ফেরে ভোরবেলায়। তাই সন্ধ্যাবেলায় রোজ বাইরের ফুলের টবগুলো তোলা হয় পোর্চে। এই তো সাজানো। অবশ্য আজকের এই ফুলের মালা আর পাতাগুলো পুজোর জন্তে। দেশের যে আর দেরি নেই।

এতক্ষণ পুজোর কথা মনে ছিল না কারও। মনে পড়ল, আজ সপ্তমী তিথি। কলকাতার ঘরে বাইরে অলিতে গলিতে আজ পুজো। শুনেছিলুম, এবারে মাইক্রোকোনে গান বাজাতে দেওয়া হবে না। তা না হ'লে আজ লোকে কানে তুলে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছে। বাংলা আর সে বাংলা নেই। রোগে আর দারিদ্র্যে বাংলার গান শুকিয়ে

গেছে, তাই মাইক্রোকোনে গান বাজাতে হয়। গানের প্রয়োজনও ফুরিয়েছে, তাই আইন ক'রে গান বন্ধ করা হচ্ছে।

কাগজে দেখেছিলুম, এবারে মহীশূরে নাকি দেশের উৎসব হবে না। সেখানেও গণগোল। রাজনীতির চাপে সারা দেশটা ডুবছে।

স্পেন্সারের হোটেলে খাবারের অর্ডার দেওয়া হ'ল। মামা রহস্য ক'রে বললেন, এই বয়সে দু বেলা রসম আর হজম হবে না।

স্বাতি বললে, খাওয়াটা আজ কচবে ভাল। সারাদিন যা বোরা ঘুরিয়েছেন গোপালদা!

বললুম, এখানে সরকারী গাইড পাওয়া যায় টুরিস্ট ইনফরমেশন অফিসে। পাঁচ টাকায় আধ বেলা বোরায়ে। তাদের একজন সঙ্গে নিলে আরও ভাল ক'রে ঘুরিয়ে দেখাত।

মামী বললেন, আমাদের বিনি পরমার গাইড যা ঘুরিয়েছে, তার ধাকা সামলাতে কদিন লাগে দেখ।

রাত্রে শুতে যাবার আগে মামা বললেন, তোমার মহাবল্লীপুরমের গাড়ি কটায় ছাড়ে ?

সময়টা দেখে রেখেছিলুম। বললুম, সকাল সাতটা চল্লিশে। স্বাতিকে ধমক দিলেন মামা। বললেন, এখনো শোও নি তোমরা, শুনেতে পাচ্ছ তো কাল কত সকালে বেরতে হবে।

মামী হাসি চেপে বললেন, তোমরা নিজেরা শোও তো গিয়ে।

[ক্রমশ]



দ্বীপ হাতে বাজারের খলোটা তুলে দিয়ে পরেশবাবু বললেন, ওগো, খবর তো তোমায় বলা হয় নি। সামনের সাতাশে যে পূর্ণেন্দুর বিয়ে।

বিয়ে! পূর্ণেন্দু ঠাকুরপো বিয়ে করতে যাচ্ছে। কই, আমরা তো কোন খোঁজখবর পেলুম না? অকৃত্রিম বিস্ময় ফুটে ওঠে সুনন্দার কণ্ঠে।

পাশে কি গো? বন্ধুবরটি যে এ্যাঙ্কিন ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিলেন। সন্তেরো নখরের ষোণেশবাবুর মেজ মেয়ে—ওই যাকে সে পড়ায়—আহা কি নাম যেন মেয়েটির?

মালতী—নীরসকণ্ঠে সুনন্দা জানায়।

হ্যাঁ হ্যাঁ মালতী। তা বন্ধু আমার দ্বিবি রোমান্স জমিয়ে তুলেছিল দেখছি। নিজের লেডিলভকে নিজেরই শিখিয়ে পড়িয়ে তোমের ক'রে নিয়েছে। এই তো চাই, বউ হবে যাকে বলে প্রিয়শিখা ললিতকলাবিধো, তা নয়, দিনরাত শুধু গয়লার বিল আর বাজারের ফর্দ মিলিয়ে বেড়ানো।

সুনন্দা ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দেয়, তা বেশ তো,—কাল থেকে তুমিই না হয় এ কাজগুলো দেখো, আমি দেখব তোমার ওই কালিদাসের মালিনী হবার একটিনি করা যায় কি না?

আহা, তুমি চটো কেন গিন্নী? বলছিলুম কি যে, আমরা তো এখন বুড়োর দলেই চলে গেছি।

কেন, বুড়া হব কেন? তুমি বুড়া হয়েছ ব'লেই আমিও বুড়ী হতে যাব কোন দুঃখে? আর ওই গিন্নী—ওটা কোন দিশি ডাক শুনি? ভক্তভাবে কথা বলতে শেখ নি? বাপ মা কি আমার কোন নাম দেয় নি?

আচ্ছা গো আচ্ছা, এবার থেকে তোমার আদর ক'রে পুরো নাম ধ'রেই ডাকব'খন। বিব্রত পরেশবাবু স্নানের আয়োজনে গেলেন। দশটায় অফিস, দেরি করা চলে না।

সকাল থেকেই সুনন্দার শুধু কাজ আর কাজ। সাড়ে ছটার ভেতর চা জলধাবার, দাড়ি কামাবার গরম জল তৈরী চাই—হু মিনিট দেরি হ'ল কি বাবুর মুখ শুম হয়ে গেল। তবু যদি একটা ঝি রাখবার মুরোদ থাকত?

একটিমাত্র ছেলে নন্দ, তিন বছরের, কিন্তু বয়সে ক্ষুদ্র হ'লে কি হবে আসলে একটি আশু ডাকাত। সারাদিন শুধু জিনিস ভাঙছে, ছড়াচ্ছে, ছুমদাম পিটছে। তার ওপর আবদার আর আবদার। ঘড়ি ধ'রে খাওয়া, তার হাজারো বায়নাফা। এটা খাব না ওটা খাব না, এটায় ঝাল ওটায় হুন বেশী—ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই সুনন্দা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ন'টা বাজতেই স্বামীর অফিসে যাওয়ার তাড়া—ভাত দাও জল দাও পান দাও দোস্তা দাও, আবার নস্তির কোটোটাও দাও। ভক্তলোকের এমনি কোন গুণ না থাকে, নেশার গুণটি আছে ঠিক বোল আনা। সুনন্দা দেখতে পারে না হু চক্ষে। স্বামী অফিসে গেলে ছেলেকে বাইয়ে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে সাড়ে এগারোটা বেজে যায়। তবে সুনন্দা খানিকক্ষণের জন্ত সোয়াস্তি পায়। এ সময়টা চুল খুলতে খুলতে সে খবরের কাগজ পড়ে। বাস-পেটরা থেকে কাপড়-চোপড় বার ক'রে শুছিয়ে রাখে, কলেজের পুরনো বাস্তবীদের কাছে চিঠি লেখে, মন ভাল থাকলে মেয়ালে টাঙান আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গুণগুণ ক'রে রেকর্ডে শোন—কোন গানের ছ'এক কলি গেয়েও ফেলে।

অভ্যেসমত আজও খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে বসল সুনন্দা। কিন্তু পড়া হয়ে উঠল না। কি যেন অস্বস্তি আর চাপা বিরজিতে মনটা ভ'রে গেছে। পূর্ণেন্দু বিয়ে করছে। পুরুষমাজেই বিয়ে করে, এতে ভাববার কি আছে? তবু সুনন্দা ভাবছে, শেষ পর্যন্ত পূর্ণেন্দুও বিয়ে করতে যাচ্ছে? পূর্ণেন্দুর সঙ্গে পরিচয় তার আজ পাঁচ বছরের। পরেশবাবুর বন্ধু পূর্ণেন্দু—বয়সে বছর তিনেকের ছোট ব'লে পরেশদা ব'লে ডাকে। পরেশবাবুও বন্ধুকে বন্ধুর চেয়ে ছোট ভাই হিসেবে বেশী দেখেন। ছেলেটি ভাল দেখতে, যথেষ্ট লেখাপড়া জানে, কথায় বার্তায় আলাপ ব্যবহারে চমৎকার। সুনন্দার বরার ভাল লেগেছে এই স্নদর্শন স্বশিক্ষিত ছেলেটিকে। ওর দোষের মধ্যে ও কুঁড়ে, তা নইলে কবে পড়াশুনা শেষ করেছে, আজও কোন চাকরীতে ঢুকতে পারল না। পরেশবাবু অবশ্য বার কয়েক কাজের খোঁজ এনে দিয়েছিলেন। কিন্তু ধরাকরার অভাবে সব কটাই বেহাত হয়ে গেছে। এর জন্তে পূর্ণেন্দুর খুব

একটা স্কোভ আছে তাও মনে হয় না। হুনন্দা এ নিয়ে অল্পবোগ করলে হেসে বলেছে, ও তুমি যেতে দাও বউদি। যা যাবার তা যাবেই। যেটা আসবার সেটা আমি না চাইলেও ঠিক জুটে যাবে।

এই বিয়ে করা নিয়েই পূর্ণেন্দুর মুখে কত সব গালভরা বকুনি শোনা যেত। দেশের অর্থনৈতিক দুর্দিনে, খাদ্যসমস্যা, এ সময় কি হবে আরও গোঁটাকয়েক অপোগণ্ড সৃষ্টি করে। তার চেয়ে বেশ আছে, খাচ্ছি দাচ্ছি ঘুরে বেড়াচ্ছি। হুনন্দা যদি বলত, বুকলে ঠাকুরপো, আমি লিখে দিচ্ছি বিয়ে না করলে তোমার পয় আসবে না। আমরা মেয়েরা হলুম তোমাদের স্বর্গমোভাগ্য সবকিছুর মূলে। পূর্ণেন্দু অমনি জবাব দিত, তা পয় যে কত আসে তা দাদাকে দেখেই তো বুঝতে পাচ্ছি। হুনন্দা চোখ পাকিয়ে বলত, বটে। আমার অপয়া বলা? শেষকালে পরেশ তার স্বভাবসিদ্ধ রসিকতা দিয়ে ঝগড়ার মিটমাট করে দিত।

সেই পূর্ণেন্দু আজ বিয়ে করতে যাচ্ছে এতে হুনন্দার খুশি হবারই কথা। কিন্তু হাজারো চেষ্টা করেও হুনন্দা মনে খুশির ভাব জাগিয়ে তুলতে পারল না। পুরুষ জাতটাই অমনি, মুখেই বড় বড় বুলি, বিয়ে করব না, হেন করব না তেন করব না। কিন্তু যেই কোন মেয়ের চোখে চোখ পড়ল, অমনি লজ্জাঘেন্না সব বিসর্জন দিয়ে ছুটল তার পিছনে। দেখে শুনে পুরুষ জাতটার উপর ঘেন্না ধরে গেছে হুনন্দার। আজক না একবার পূর্ণেন্দু তার সামনে, এমন দু'কথা শুনিবে দেবে যে বুঝতে পারবে কার সামনে এতকাল লম্বা লম্বা সব বুলি ছেড়ে এসেছে।

রাতিরে খাওয়ার পর আবার প্রসঙ্গটা উত্থাপন করল হুনন্দা। ই্যাগা, কাজটা কি ঠিক হচ্ছে?

কোন কাজটা?

না—এই বলছিলুম পূর্ণেন্দু ঠাকুরপোর বিয়ের কথাটা। ধর, এখনও তো কোন কাজকর্ম কিছু জোঁটাতে পারলে না, একরকম বেকারই তো বলা চলে। এ সময়ে বিয়ে করাটা কি ঠিক হচ্ছে?

কথাটা পরেশও যে না ভেবেছে তা নয়। পূর্ণেন্দু তার বন্ধু—ওর ভালমন্দ সম্পর্কে তার নিজেরও কিছুটা দায়িত্ব রয়েছে। এ সময়ে পূর্ণেন্দুর বিয়ে করা যে খানিকটা বেহিসাবীর মত কাজ হচ্ছে তা অস্বীকার করা যায় না।

তবু কান্নার ব্যক্তিবাদীনতায় হাত দেওয়া উচিত নয়—ব'লেই সে এতে বাধা দেয় নি। উটে পূর্ণেন্দু তার অফিসে এসে বথন ব'লে গেল, পরেশদা, বেহিসাবীর মত কাজ করতে যাচ্ছি, জানি না কোথায় গিয়ে ঠেকব। পরেশ অমনি বিস্তৃত বন্ধুর মত আশ্বাস দিয়েছে, কুছ পরোয়া নেই ভায়া। উপায় না দেখে তো বউকে নিয়ে সোজা চ'লে আসবে আমার হোটেল। দরজা খোলাই থাকবে। চিরদিনের আশাবাদী পরেশ, নিজের জীবনে বিশেষ কিছু না করতে পারলেও মনে মনে বিশ্বাস করে পূর্ণেন্দু কিছু একটা করবেই। কিন্তু এসব কথা হুনন্দাকে বলা যায় না, বললেও সে বুঝবে না।

খানিক চুপ থেকে হুনন্দা নিজের কথারই জাবর কাঁটতে থাকে,—আর মেয়ের বাপকেও বলিহারি যাই বাপু, না হয় ধরেই নিলুম ছেলে রূপেগুণে একেবারে অদ্বিতীয়, তাহলেও তোরই তো মেয়ে, তার ভালমন্দ মদনামঙ্গল দেখবিনে? বিয়ে করে বউকে ধাওয়াবে কি? সম্বলের মধ্যে ওই তো দুটো টুইশনী, তাও তুমি জুটিয়ে না দিলে জুঁত কিনা সম্ভব। নিজের মেয়ের ভবিষ্যৎকে এমনি করে বিসর্জন যে লোকে কি করে দেখে, আমি তো বাপু ভেবেই পাইনে। কই, তুমি যে কিছু বলছ না, বলি ঘুমুলে নাকি? ততক্ষণে পরেশের নাক ডাকতে শুরু করে দেয়। বেশ, সবাই নিশ্চিত হয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোক, হুনন্দার কি দায় পড়ে গেছে পরের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে? বন্ধু তো ওরই, পূর্ণেন্দু হুনন্দার কে হয়—কেউ না।

কিন্তু মাথা না ঘামাতে চাইলেও মাথা ব্যথা তাকে ছেড়ে গেল না। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে লাগল পূর্ণেন্দু আর মালতীর কথা। মালতী—মালতী মেয়েটি হুনন্দার চেনা। তার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, সাদামাটা গোছের চেহারা, মুখে সব সময় কেমন যেন একটা সলজ্জ হাসির ভাব। একই পাড়ায় বাস ব'লে মাঝে মাঝে ছোট ভাইবোনের জামাটা ফ্রকটা সেলাই করবার জন্য তার কাছে আসে, কোন কথা জিজ্ঞেস করলে তবে তার জবাব দেয়, সব মিলিয়ে কেমন যেন মুখচোরা ভাব। বাবা, এ মেয়ের পেটে পেটে এত বিস্তে। তাও তো পড়ে মাত্র ক্লাস টেনে, গান জানে না, বাজাতে জানে না; দুটো

ভাল কথা পর্যন্ত বলতে জানে না। পূর্ণেন্দু যে শেষ পর্যন্ত এমন মেয়ের প্রেমে পড়তে পারে, তা যেন সুনন্দা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না। কি যোগ্যতা আছে এ মেয়ের পূর্ণেন্দুর মত ছেলের মন জয় করবার? মনে মনে সে ভাবতে চেষ্টা করল, কি ভাষায় কি ভঙ্গীতে ওরা এতদিন পরস্পরে প্রেমনিবেদন করে এসেছে। ছবিটা মনে ভেসে উঠতেই অবজায় তার চৌকির কোণ কুঁকিত হয়ে গেল। ছি ছি, পূর্ণেন্দু, যে কিনা এত বেশী রুচির বড়াই করত, সেই শেষ অবধি এমন কুৎসিত রুচির পরিচয় দিল? দেখা যাবে কোথায় থাকে এবার শেলী কীটস্ আর রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শ, সব গিয়ে ঢুকবে বউয়ের আঁচলের তলায়। পূর্ণেন্দুর এই অধঃপতনে সুনন্দা কেমন বিজাতীয় আনন্দ পেতে লাগল।

পরদিন দুপুরে খেয়ে দেয়ে একটু গড়িয়ে নেবার আয়োজন করছে, এমন সময় মালতী এল বেড়াতে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মুখে সলজ্জ হাসি টেনে বললে, দিদি, কলটা একটু দেবে, একটা জামা সেলাই করব? ঘুমের কথা ভুলে গিয়ে সুনন্দা হঠাৎ অতিমাত্রায় উৎসাহী হয়ে ওঠে। কে, মালতী? আর আর বোস—আজকাল আর আসিস না কেন রে? নে, সেলাই পরে হবে'খন—আর দেখি, পল্ল করি। খুঁটে খুঁটে সুনন্দা প্রাঙ্গণ করে, কখনো বা জেরার ভঙ্গীতে, কখনো বা সখীর সঙ্গে রহস্তালাপের স্বরে। সে প্রশ্নের আর শেষ নেই। পূর্ণেন্দুকে ওর কেমন লাগে, পূর্ণেন্দুর তাকে কেমন লাগে, কবে থেকে তাদের ভাব স্বরূপ হয়, কে প্রথমে ভাব করে, কি ভাবে ভাব করে, পূর্ণেন্দু চিঠি দেয় কিনা, কি লেখে চিঠিতে, কি বলে তাকে সম্বোধন করে, চিঠি পেয়ে সে কি করে, কখন জবাব দেয়, কি লেখে সে চিঠিতে। প্রাঙ্গণ করতে করতে সুনন্দার স্বর কখনো কিসকিসিয়ে বলার পর্যায়ে নেমে যায়, কখনো বা সাক্ষীকে কোণঠাসা করবার মুহূর্তে ব্যারিস্টারের মত বক্তৃকঠিন হয়ে যায়। মালতী স্থির অচঞ্চলভাবে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যায়, মুখের কোণে লেগে থাকে সলজ্জ হাসির রেশটুকু। প্রেম তাকে নিজের কাছে নতুন মর্দাদা দিয়েছে, তার চোখের স্থির উজ্জল ছাতিই তার প্রমাণ। বেলা পড়ে এলে সেলাই শেষ করে মেনিনে ঢাকনা পরিয়ে ধীরপদে সে চলে যায়, তার নব্র মহিমার রেশটুকু ঘরের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে।

এক মুহূর্ত মনে হয় সুনন্দা আপন প্রাধান্ত হারিয়ে ফেলেছে। পরক্ষণেই জোর করে সে হেসে ওঠে। প্রেম! এ মেয়ে করবে প্রেম? প্রেমের এ জানে কি, বোঝে কি? এরা যাকে প্রেম বলে জেনেছে তাকে সুনন্দা কোনমতেই মর্দাদা দিতে পারবে না। তবে কি মোহ? সুনন্দা আপন মনে মনোবিশ্লেষণ করে যেতে লাগল। এ নিশ্চয়ই মোহ,—তরুণ বয়সে মেয়ে আর পুরুষ এক হ'লে এ মোহ আসবেই, এ জন্তেই তো শাস্ত্রে বলেছে ঘি আর আগুন একসঙ্গে রাখতে নেই। কিন্তু মোহই যদি হবে, তবে সেটা কিসের মোহ? রূপের?—আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে ভাবতে থাকে রূপের মোহ কোন ক্ষেত্রে হতে পারে। সে নিজে সুনন্দরী,—মুখে বড়াই না করলেও গোপন মনে গর্ব তার আছে যে, তার রূপ কেমন নয়। কিন্তু মালতী?—পুরুষের চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মত এমন কি রূপ তার আছে? রূপের দৈন্তকে আবরণ আর আভরণের কারচুপিতে ঢেকে দেবে, তেমন রুচিই বা তার কোথায়? রূপজ মোহের যা কিছু সম্বল তার কোনটিই তো মালতীর নেই। তবে কি জোরে সে পূর্ণেন্দুকে বাঁধতে পারল? এমন যদি হ'ত তার বাবা কোন বড় অফিসের উপরওয়াল, বেকার পূর্ণেন্দুকে চাকুরীর লোভ দেখিয়ে মেয়েটিকে গছিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছেন, তবু তার একটা মানে খুঁজে পাওয়া যেত। কিন্তু ভদ্রলোক নিজেই কেরানী, ভাবী জামাইকে চাকরী দেবার মুরাদ এ জন্মে আর তাঁর হবে না। ভেবে ভেবে সুনন্দা এর কোন কুলকিনারা করতে পারে না। হঠাৎ অবচেতন মনে একটা সন্দেহ রেখাপাত করে যায়; হয়তো পূর্ণেন্দু নিজে থেকে বিয়ে করতে চাইছে না, হয়তো এ মেয়েকে বিয়ে করবার তার মোটেই ইচ্ছে নেই, হয়তো তাকে এখানে বিয়ে করতে বাধ্য করানো হচ্ছে। এমন তো ঘটেও থাকে।

নিজের এ গোপন আবিষ্কারের বার্তাটুকু কারুর না কারুর কানে পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত সুনন্দা কেবলি ছটকট করতে লাগল। স্বামী সবে অফিস থেকে ফিরেছেন, সে অমনি বলে বদল, ছাখো, আমি ভেবে দেখলুম এ বিয়ে ঠিক এমনি এমনিতেই ঠিক হয় নি, কিছু একটা ব্যাপার এর ভেতর আছে।

ব্যাপার! কি ব্যাপার?

• চোখ মুখের কেমন একটা ভদ্রী ক'রে সুনন্দা চাপা গলায় বলে, আঁহা ছাঁকা আর কি, কিছু যেন বোঝে না।

কিন্তু পরেশ কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। সুনন্দাকে কথাটা ভেঙে বলতে হয়। সব শুনে গম্ভীর হয়ে পরেশ বলে, না না, এ তুমি কি বলছ, এ হতেই পারে না। বাধা পেয়ে সুনন্দা চ'টে যায় : তুমি নিজেকে বোম্‌ ভোলানাথ ব'লে আর সবাইকেও তোমার মত সোজা সরল ভেবে যাও। কার মনে কি আছে তুমি তার কি জ্ঞান? তা ছাড়া, এমন তো আজকাল আকছার হচ্ছে। আমার মেজসামার ছোট শালার কাণ্ডটা মনে নেই—ছি ছি, কি কেলঙ্কারী!

তবু পরেশের সন্দেহ দূর হয় না। পূর্ণেন্দু যে এমন কাজ করতে পারে এটা সে কিছুতেই মানতে রাজী নয়। সুনন্দার মনে হয় তার শেষ অবলম্বন সে হারিয়ে ফেলছে। সে মনে মনে ভেবে রেখেছিল, পূর্ণেন্দুর এ বিপদে সুনন্দার মত পরেশও এসে তার পাশে দাঁড়াবে, তারা দুজনে মিলে যেমন ক'রেই হোক পূর্ণেন্দুকে ওই পাপচক্র থেকে উদ্ধার ক'রে আনবে, কিন্তু পরেশের সাহায্য না পেলে সুনন্দা একা কি করতে পারে, তার সাধ্যই বা কতটুকু? সে ভাবল, একবার পূর্ণেন্দু আহুক, খোলাখুলিই সে জিজ্ঞেস করবে কি রহস্য এর ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে, তাদের এতদিনের অন্তরঙ্গতার দোহাই দিয়ে বাধ্য করবে পূর্ণেন্দুকে সব কথা খুলে বলতে। তখন দেখা যাবে পরেশ কি ক'রে বন্ধুর বিপদে এমন নিষ্ক্রিয় হয়ে ব'সে থাকতে পারে?

কিন্তু দিনের পর দিন চ'লে যায়, পূর্ণেন্দুর আর দেখা নেই। অধীর উৎকণ্ঠায় সুনন্দা অপেক্ষা ক'রে রইল তার আগমন পথের দিকে চেয়ে, তবু পূর্ণেন্দুর আসা হয়ে ওঠে না। অপমানে অভিমানে সুনন্দার হুঁচোখ কেটে জল আসতে চায়। এই তো পুরুষ জাত!—এতদিন সুনন্দাই ছিল তার সবচেয়ে বড় বন্ধু, আর আজ মালতী না কে এক মেয়ে তার কাছে এত বড় হয়ে গেল যে সুনন্দাকে অন্তত বিয়ের খবরটা জানাতেও একবার এল না।

সাতাশে তারিখ বিয়ের দিন। পূর্ণেন্দু এল তার দু'দিন আগে,—অফিসফেরত পরেশকে সঙ্গে নিয়ে। দরজায় পা দিয়েই পরেশ তার স্বভাব মত চৈচিয়ে বললে, কই গো, এদিকে এস, আসামীকে গ্রেপ্তার ক'রে এনেছি। সুনন্দা ভাবল কোন কথা বলবে না পূর্ণেন্দুর সঙ্গে; তার নীরবতা দেখে পূর্ণেন্দু নিশ্চয়ই নিজের ব্যবহারের জন্ত লজ্জিত হবে, নিশ্চয়ই এগিয়ে এসে ক্ষমা চাইবে তার কাছে, তখন সুনন্দা জেনে নেবে—যা সে এতদিন ধ'রে

জ্ঞানতে চাইছে। পূর্ণেন্দু কিন্তু সেদিক দিয়ে একেবারেই গেল না। সহজ হুরে হেসে বললে, এই যে স্ব-বউদি, পরশ দিন কিন্তু ঘুম থেকে উঠেই মাদাকে নিয়ে চ'লে যাবে। ঝুড়ি ঝুড়ি কাজ করবার রয়েছে, তুমি না গেলে কিন্তু সব ভুল, ব'লে দিলুম। পরেশদা চল—দেয়ি হয়ে গেলে আবার কেনাকাটা সব সেবে উঠতে পারব না। আ, একদিন না হয় বউদির হাতের চা নাই বা খেলে, তাতে এমন কিছু অর্থ হয় না। ব্যস্তভাবে পরেশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে সে বেরিয়ে যায়। প্রিয়মিলনের স্বপ্নে সে বিভোর; যাবার সময় পাশে দাঁড়ানো সুনন্দার কাছে বিদায় নিতে পর্যন্ত ভুলে যায়। কাঠের পুতুলের মত সুনন্দা দাঁড়িয়ে থাকে দরজার পাশে, তার মুখের রক্ত কে যেন নিমেষে শুষে নিয়েছে। একবার ভাবে পূর্ণেন্দুকে ডাকে, কিন্তু ডাকতে গিয়ে দেখে, গলা দিয়ে কোন স্বর বেরুচ্ছে না। তেমনি নিষ্পন্দ ভাবেই সে দাঁড়িয়ে থাকে।

বিয়ের তারিখ মঙ্গলবার সাতাশে। সকালে উঠে পরেশ তাগাদা দিল সুনন্দাকে তৈরী হয়ে নিতে। কিন্তু ঘর সংস্কারের সব কাজ ফেলে সুনন্দা এখন কি ক'রে যায়? অতএব পরেশকে একাই যেতে হ'ল। বিকেলবেলা এক ফাঁকে স্ত্রীকে নিতে এসে দেখে, সুনন্দা বিছানায় শুয়ে রয়েছে, অসহ্য মাথা'র ঘষণা। তার ষাণ্ডার কথা আর উঠতেই পারে না, অগত্যা পরেশ একাই ফিরে গেল।

বিয়ের আসর মালতীদের বাড়ি—একই গলিতে দুটো বাড়ি পরে। অন্ধকার ঘরে শুয়ে সুনন্দা শুনতে পেল মালতীদের বাড়ি থেকে ভেসে আসছে সানাইয়ের মিষ্টি-মধুর স্বর। বিয়ে প্রথম লগ্নে রাত আটটায়। সুনন্দা ভাবতে লাগল, এতক্ষণে হয়তো শুভদৃষ্টি হচ্ছে,—রঙিন ওড়নার আড়ালে পূর্ণেন্দু আর মালতী দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে আছে; ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই যুগায় সুনন্দার গাটা ঘিনঘিন ক'রে উঠল। ছি ছি, এ কি বিয়ে? না হয় তার মাথাই ধরেছে, কিন্তু যদি না ধরতো তবু সে কিছুতেই এ বিয়েতে যেতে পারত না।...কিন্তু মাথা'র ঘষণাটা যেন বেড়েই চলেছে। আর সেই সানাইটা, একি একটু ধামবে না বাপু? না হয় তোরা বিয়েই করছিস, তাই ব'লে আর দশটা লোকের ভালমন্দ কিছু নেই? অসহ্য মনে হওয়ায় নেমে গিয়ে জানলাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে এল। তবু মাথা'র ঘষণা বেড়েই চলেছে, মনে হচ্ছে মাথাটা বুঝি ছিড়ে যাবে। তারপর একসময়ে বালিশে মুখ ঢেকে আকুল হয়ে সে কাদতে লাগল।

বাহির্বিশ্ব

ইনিয়াৎসিও সিলোনে

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

গণতন্ত্রের যুগে কোন নাগরিকই রাজনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় দেশ শাসন করবার অধিকার একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল লাভ করে। শাসনযন্ত্রের মাধ্যমে সেই বিশেষ রাজনৈতিক দলের আদর্শ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিদ্বন্দ্বী দলের বিরোধিতা এবং নির্বাচনের দ্বন্দ্ব দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া সর্বদা সরগরম করে রাখে। সংবাদপত্র প্রত্যহ রাজনৈতিক উত্তেজনা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়। জীবনে যখন রাজনীতির এত প্রভাব তখন সাহিত্যেও তার ছায়া পড়া স্বাভাবিক। সাহিত্য তো জীবনেরই প্রতিফলন। রাজনীতি শুধু প্রবন্ধ ও পত্রিকা-সাহিত্যকেই প্রভাবান্বিত করে নি, উপন্যাস-সাহিত্যেও তার অহুগ্রবেশ ঘটেছে। উপন্যাস প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্য নিয়ে। সাহিত্যের এই জনপ্রিয় অঙ্গটিকে অনেক লেখক চিত্তবিনোদন ছাড়াও সমাজ সংস্কার, ধর্ম ও রাজনীতির কথা বলবার ক্ষমতা ব্যবহার করেছেন। বিংশ শতাব্দীতে, বিশেষ করে প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে, রাজনৈতিক উপন্যাসের একটি বিশেষ বর্গ ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। এসব উপন্যাসে শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা অপেক্ষা লেখকের রাজনৈতিক মতবাদ প্রাধান্য লাভ করে। কোথাও একটি বিশেষ মতবাদের সমর্থন, কোথাও বা তার বিরোধিতা কাহিনীর উপজীব্য।

বর্তমান ইতালীর অন্যতম ঔপন্যাসিক ইনিয়াৎসিও সিলোনের (Ignazio Silone) রচনাকে সাধারণতঃ রাজনৈতিক উপন্যাসের শ্রেণীভুক্ত করা হয়। তবু তাঁর রচনার সঙ্গে এই শ্রেণীর অন্যান্য উপন্যাসের পার্থক্যটা স্পষ্টই ধরা পড়ে। সিলোনে কমুনিজমের বিরোধী, কিন্তু তাই বলে অস্ত্র কোন রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যে তিনি জীবন সার্থক হবার ইঙ্গিত খুঁজে পান নি। বরং নীতিবোধ ও ধর্মবোধ থেকে বিযুক্ত কোন রাজনৈতিক পন্থাই মঙ্গলপ্রসূ হতে পারে না, সিলোনের উপন্যাসে এই সিদ্ধান্তের পরিচয় পাওয়া যায়। নীতি ও ধর্মের প্রতি

এই আকর্ষণের ক্ষুদ্র তাঁর রচনা রাজনীতিসর্বস্ব হয়ে ওঠে নি। এই বৈশিষ্ট্য সিলোনের রচনাকে হয়তো সমসাময়িকতার উর্ধ্বস্থান নির্দেশ করতে সাহায্য করবে।

সিলোনের আসল নাম Secondo Tranquilli; কিন্তু এ নাম আজ কেউ জানে না। ইতালীর ক্ষুদ্র শহর পেসিনায় ১৯০০ সনের ১লা মে সিলোনে জন্মগ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক শ্রমিকদিবসে তাঁর জন্ম হওয়াটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সিলোনের জীবন কেটেছে রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে। তিনি কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেছেন, অত্যাচার উৎপীড়ন সয়েছেন; এবং দেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে দীর্ঘকাল তাঁকে বিদেশে কাটাতে হয়েছে। তাঁর উপন্যাসের কাহিনী আত্মজীবনীমূলক এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্পর্শে জীবন্ত।

সিলোনের পিতা ছিলেন একজন ক্ষুদ্র তালুকদার। এত ছোট যে সাধারণ চাষীর মত তাঁকে জমি চাষ করতে হ'ত। স্বামীকে সাহায্য করবার জন্য তাঁর মাও কঠোর পরিশ্রম করতেন। ঐ অঞ্চলের জমির উর্বরা শক্তি ছিল কম। চাষীরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও দু'বেলা পেট ভরে খেতে পেত না। তার উপর ছিল বস্ত্র ও ভূমিকম্পের বিপদ। চাষীদের পশুর মত জীবন ছেলেবেলাতেই সিলোনের মন গভীরভাবে অভিভূত করেছিল। জনগণের দুর্দশার কথা তিনি বই পড়ে শেখেন নি; দেখেছেন নিজের চোখে। তাদের দুঃখের অংশ গ্রহণ করেছেন, তাদের ভাল-বেসেছেন। যে শাসনতন্ত্র কৃষকদের দুর্দশা দূর না করে তাকে আরও দুর্বিষহ করে তুলেছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার সংকল্প সিলোনে কিশোর বয়সেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বেদনা এই সংকল্পকে আরও কঠোর করে তুলতে সাহায্য করেছিল। সিলোনের বয়স যখন মাত্র পনেরো-তখন প্রবল ভূমিকম্পে পেসিনা বিধ্বস্ত হয়। প্রায় পাঁচ হাজার লোক প্রাণ হারায়। সিলোনের দু' ভাই এবং মা ভূমিকম্পে মারা যান।

অবশিষ্ট এক ভাই ফ্যাসিস্টদের নির্মম প্রহারের ফলে জেলখানায় প্রাণ ত্যাগ করে।

সিলোনে ক্যাথলিক স্কুলে শিক্ষালাভ করেছেন। উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা সমাপ্ত করে পাত্রী হবার। স্কুলের পড়া শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে যান নি সিলোনে। না যাবার কারণ দু'টি। প্রথমতঃ তাঁর স্বাস্থ্য এত খারাপ ছিল যে তিনি বেশি দিন বাঁচবেন বলে ভক্তারদের ভরসা ছিল না। দ্বিতীয়তঃ যে শক্তি ও সময় তাঁর ছিল তার সবটুকুই কৃষক আন্দোলনে ব্যয় করতেন। উচ্চশিক্ষার চেয়ে কৃষকদের ভাগ্যোন্নতি অনেক বড় ছিল তাঁর কাছে।

১৯১৭ সনে সিলোনে পেসিনার কৃষক সমিতিতে যোগদান করেন এবং মাত্র সত্তেরো বৎসর বয়সে আত্রাংসি জেলার জমি-মজুর সংঘের সম্পাদক নিযুক্ত হন। ওই বৎসরই তিনি একদল সমাজবাদী যুবকের সঙ্গে যুদ্ধবিরোধী প্রচার আরম্ভ করেন। দলের মুখপত্র 'অগ্রণী'র সম্পাদক ছিলেন সিলোনে। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তাঁর ভাষায় তিনি যুদ্ধের নিন্দা করেছেন। ১৯২২ সনে 'মজুর' পত্রিকা সম্পাদনার ভার পড়ল তাঁর উপর। অল্প দিনের মধ্যেই এই পত্রিকা ফ্যাসিস্ট সরকারের বিষদৃষ্টিতে পড়ল। ফ্যাসিস্ট সমর্থকরা 'মজুর' পত্রিকার আপিস আক্রমণ করে ছাপাখানা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলল।

ফ্যাসিস্ট সরকারের হাতে জীবন বিপন্ন বুঝে সিলোনে দেশ থেকে পালিয়ে গেলেন। গোপনে স্বদেশে ফিরে এলেন ১৯২৫ সনে। তিন বৎসর ধরে তিনি কৃষকদের মধ্যে গোপনে ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন চালাতে লাগলেন। সিলোনে তখন কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্য। সাম্যবাদের আদর্শে তাঁর ছিল অন্ধ বিশ্বাস। ১৯২১ সনে তিনি রাশিয়া ঘুরে এসেছেন। ১৯২৮ সনের পর ইতালীতে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। ফ্যাসিস্ট সরকারের হাত এড়িয়ে তিনি সুইজারল্যান্ডে এসে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। রাজনীতির আবর্ত থেকে দূরে আসবার ফলে সিলোনের মনে সংশয় জাগল। রাজনৈতিক দলের প্রয়োচনায় যে সব আন্দোলন হয় তারা কি সত্যি জনগণের কল্যাণ করতে পারে? অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্মীরা গণ-সেবক নয়, কোন রাজনৈতিক দলের অন্ধ ভক্ত মাত্র। এদের দেশের মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক নেই, তাদের

গভীরভাবে ভালবাসে না, শুধু একটা পুঁথিগত রাজ-নৈতিক মতবাদ অহুসরণ করে চলে। অনেক সময় পার্টির নির্দেশ একনায়কত্বের নামান্তর মাত্র। কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং অস্বাভাবিক রাজনৈতিক দল সম্বন্ধে সিলোনের মোহমুক্তি ঘটল। তিনি সকল দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। এর ফলে তাঁর শত্রু সৃষ্টি হয়েছিল, আততায়ীর হাতে প্রাণনাশের আশঙ্কাও ছিল। কিন্তু সিলোনে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন নি।

রাজনীতির আবর্ত থেকে দূরে চলে আসবার ফলে তাঁর পক্ষে সাহিত্য রচনায় হাত দেওয়া সম্ভব হ'ল। ১৯৩৭ সনে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন; সে বছরই তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ফটোমারা' প্রকাশিত হয়। এক বৎসরের মধ্যে সত্তেরোটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হওয়ায় বইটির জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে।

একটি দরিদ্র গ্রামের নাম ফটোমারা। শুধু দরিদ্রতম কৃষকদের বাস এখানে। কিন্তু এরাও ফ্যাসিস্ট কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পেল না। গ্রামের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র একটা নদী বয়ে যায়; তার জল দিয়ে সামান্য চাষাবাদ করা চলে। এক জমিদার নিকটেই কিছু জমি কিনল। নিজের জমিতে চাষের যাতে সুবিধা হয় সে জন্ত ফ্যাসিস্ট সরকারের কর্মচারীর সঙ্গে যড়যন্ত্র করে জলের গতি পরিবর্তনের ব্যবস্থা করল জমিদার। আর তাকে সাহায্য করল এক জন সরকারী কর্মচারী। কর্মচারী কৃষকদের প্রতারিত করে সম্মতিপত্র সই করিয়ে নিল। পরে ভুল বুঝতে পেরে তারা প্রতিকারের আশায় গেল সদরে। কিন্তু সেখানে জনগণের বন্ধু সেজে এক উকীল তাদের ঠকালো।

গ্রামের কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ ধুমায়িত হয়ে উঠল। তা দমন করবার জন্ত ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়া বার বার গ্রাম আক্রমণ করে বাড়িঘর ধ্বংস করল এবং মেয়েদের উপর করল অমানুষিক অত্যাচার। এই উৎপীড়নের সংবাদ শুনে রোম থেকে এক রহস্যময় অপরিচিত যুবক ফটোমারায় এল কৃষকদের রক্ষা করতে। সে যে আন্দোলন শুরু করল তার ফলে কৃষকদের দুর্দশার অন্ত থাকল না। ফ্যাসিস্ট বাহিনী আন্দোলন দমন করবার জন্ত সর্বশক্তি প্রয়োগ করল; অনেক লোক প্রাণ হারাল, সম্পত্তি ধ্বংস হ'ল।

যারা বৈচে রইল তাদের মনে প্রশ্ন জাগল : এত সংগ্রাম, রক্তপাত ও অত্যাচারের পরে আমরা কি পেলাম ? অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তির জন্য আন্দোলন আরম্ভ করলে অত্যাচার আরও তীব্র হয়ে ওঠে, জনগণের দুর্দশার শেষ থাকে না। এসব আন্দোলনে নেতৃত্ব করা যাদের পেশা তারা এদিকটা কখনও ভেবে দেখে না। ভবিষ্যতে শান্তি আসবে এই আশায় হুঃখ ভোগ করা যায়, সাধারণতঃ এই যুক্তি দিয়ে আন্দোলনকে সমর্থন করা হয়। কিন্তু ভবিষ্যতে যে সত্যি শান্তি আসবে, আজ যার জন্য হুঃখ ভোগ করছি তা সত্যি পাওয়া যাবে, এমন প্রতিশ্রুতি কোথায় ? অত্যাচার অবিচার ও উৎপীড়ন থেকে মুক্তির উপায় হিংসা ও রক্তপাত কেন হবে ? আর কি কোন পথ নেই ? যে অত্যাচারিত, তাকে বেদনার মূল্য দিয়ে প্রতিকার লাভ করতে হবে কেন ? সিলোনে ‘ফন্টামারা’য় যে প্রশ্ন করেছেন তাঁর অগ্রাঙ্ক উপস্থাপনও সেই দিক্‌দৃষ্টি বার বার এসেছে। এই প্রশ্ন ও তাঁর উত্তর খোঁজাটাই সিলোনের রচনার সব চেয়ে বড় কথা।

সিলোনের পরবর্তী উপস্থাপন Bread and Wine শিল্পকর্ম হিসাবে অনেক বেশী উন্নত। ‘ব্রেড অ্যান্ড ওয়াইন’-এর নায়ক পিয়েরো স্পিনার সঙ্গে সিলোনের অনেক মিল আছে। সিলোনের ব্যক্তিগত জীবন এই উপস্থাপনটিকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবান্বিত করেছে।

ফ্যাসিস্ট মুসোলিনি তখন ক্ষমতার শীর্ষদেশে অধিষ্ঠিত। ইতালীর ফ্যাসিস্ট বাহিনী আবির্ভাব লাভ করেছে। দেশের অভ্যন্তরে চলছে কঠোর দমননীতি। ইতালীর কৃষক, মজুর ও বুদ্ধিজীবী নাগরিকরা মুসোলিনির কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্য সজ্জাবদ্ধ হবার চেষ্টা করেছে। এমন সময় নির্বাসন থেকে গোপনে ইতালীতে ফিরে এল পিয়েরো স্পিনা। স্পিনা মুসোলিনির বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছে। ইতালীতে থাকা তার পক্ষে যখন বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াল তখন সে দেশ ত্যাগ করে পালিয়ে গিয়েছিল। গোপনে আবার ফিরে এসেছে। স্পিনার বয়স মাত্র ত্রিশ। কিন্তু তাকে দেখায় বৃদ্ধের মত। আত্ম-গোপনের সুবিধা হবে বলে অধিক মাত্রায় আইওডিন ব্যবহার করে শরীরের এই অবস্থা করেছে। কিন্তু গুপ্ত জীবনের অত্যাচার তার দেহ বেশীদিন সহ্যে পারল না।

এক কৃষকের গৃহে সে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। যে ডাক্তারকে চিকিৎসার জন্য ডেকে আনা হ’ল সে ছিল স্পিনার সহপাঠী। ডাক্তার সাক্ষাৎ স্পিনাকে চিনতে পারলে। প্রথম ভয় হ’ল চিকিৎসা করতে গিয়ে না জানি ফ্যাসিস্টদের রোষদৃষ্টিতে পড়তে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহস সঞ্চয় করে ডাক্তার স্পিনাকে স্বস্থ করে তুলল; সংগ্রহ করে দিল পাত্রীর পোশাক। স্পিনা লাম্যমাণ পাত্রী সঙ্গে ইতালীর সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগল।

পাত্রীর ছদ্মবেশ গ্রহণ করায় স্পিনা দেশকে নতুন দৃষ্টিতে দেখবার সুযোগ পেল। আগে তার কাছে লোক আসত শুধু রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে। রাজনৈতিক দলের নেতা বলে অনেকে তাকে সন্মেলনের চোখে দেখত। এখন পাত্রী মনে করে সবাই তাকে মনের কথা খোলাখুলি ভাবে বলে, একটা সহজ অন্তরঙ্গতা আপনি এসে যায়। ছুটি পরস্পরবিরোধী চরিত্রের মেয়ে স্পিনার প্রতি আকৃষ্ট হ’ল। একজন বিদ্বান্‌চিনা; আর একজনের নাম ক্রিস্টিনা। বিদ্বান্‌চিনার আকর্ষণ দেহসর্বস্ব; ক্রিস্টিনা ঠিক এর বিপরীত। দেহের দাবি সম্বন্ধে সে উদাসীন, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য সে উৎসুক। এই দুই বিভিন্নমুখী নারীচরিত্রের সংস্পর্শে স্পিনার সম্মুখে বৃহত্তর জগতের ছবি ভেসে উঠল। এতদিন সে রাজনীতির সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে ছিল। এখন সে সমগ্র জীবনকে দেখতে পেয়েছে; মাহুয়ের প্রেম, আশা, আকাঙ্ক্ষার কথা যেন এই প্রথম অনুভব করল। স্পিনা নিজেকে প্রশ্ন করল, পার্টির সংকীর্ণতার মধ্যে থেকে কি কেউ অকৃত্রিম জীবনযাপন করতে পারে ? জীবনের সত্যকে উপেক্ষা করে পার্টির স্বীকৃত সংকীর্ণ সত্যকে গ্রহণ করতে হয়; সর্বযুগের মহৎ ত্রায়বোধকে অগ্রাহ্য করে পার্টি বা ত্রায় বলবে তা মানতে হয়। জীবন যদি বিকাশ ও ব্যাপ্তি লাভ না করে, জীবন যদি সঙ্কুচিত হয়ে পার্টির কারাগারে আবদ্ধ হয়, তা হ’লে এত হুঃখ ভোগ করে রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ায় লাভ কি ?

স্পিনার মনে দ্বিধা জেগেছে, কিন্তু এতদিনের বিশ্বাস থেকে হঠাৎ মুক্তি পাওয়া সহজ নয়। এই দ্বন্দ্ব এড়াবার জন্য সে আরও উৎসাহের সঙ্গে ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ করল। ফ্যাসিস্ট গুপ্তচরদের হাতে

স্পিনার বিপদ ঘনিষে এল; আত্মরক্ষার জন্ত সে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করল। এই বিপদের দিনে বিদ্যান্ধিনা তার খোঁজ করল না; রোমের এক কুখ্যাত অঞ্চলে সে তখন দেহের পণ্য সাজিয়ে বসেছে। কিন্তু ক্রিষ্টিনা ভোলে নি; সে স্পিনার সন্ধানে পর্বতের গভীর বনে ঘুরতে লাগল। এমনি ক'রে ঘুরতে ঘুরতে একদিন নেকড়ে বাঘের আক্রমণে ক্রিষ্টিনা প্রাণ হারাল।

ক্রিষ্টিনার শোচনীয় মৃত্যু দিয়ে কাহিনী সমাপ্ত করা হয়েছে। এই পরিণতিটা ইঙ্গিতময়। ক্রিষ্টিনার বিশ্বাস ছিল আত্মার শক্তিতে, জীবনের স্থূল দিকটা তাকে আকর্ষণ করে নি। অথচ তার অপমৃত্যু ঘটল, বিদ্যান্ধিনা বেঁচে রইল। ক্রিষ্টিনা জীবনে যা-কিছু সত্য ও মহৎ তার প্রতীক। ক্রিষ্টিনার মৃত্যু পাঠকের মনে এই আশঙ্কা এনে দেয় যে, রাজনীতির বিষাক্ত আবহাওয়ায় সত্য আঙ্গ বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

সিলোনে স্পিনার জীবন টেনে এনেছেন তাঁর পরবর্তী উপন্যাস *The Seed Beneath the Snow*-এর মধ্যে। 'ব্রেড অ্যাণ্ড ওয়াইন' যে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে এই উপন্যাসে। স্পিনা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করল, *A man who is spiritually a slave cannot work for true freedom*, এই উপলব্ধির ফলে তার পক্ষে পুষ্টিগত রাজনৈতিক মতবাদের মোহ ত্যাগ ক'রে পার্টির গভী থেকে বেরিয়ে আসা সহজ হ'ল। স্পিনা ও জনসাধারণের মধ্যে রাজনীতির যে প্রাচীর ছিল তা গেল দূর হয়ে। এবার সে দেশের মানুষকে নিবিড় ভাবে ভালবাসতে পেরেছে। স্পিনা সানন্দে আবিষ্কার করল, গ্রামের সাধারণ লোকের হৃদয় এখনো শুকিয়ে যায় নি। নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করার বীজ এখনও বেঁচে আছে তাদের মধ্যে। শুধু উৎপীড়নের ফলে অজ্ঞরোদাম হতে বিলম্ব ঘটছে। সিলোনে আশার বাণী শুনিয়েছেন; সত্য একদিন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে।

স্পিনা সবাইকে ভালবাসতে পেরেছে। তাই অল্প একজনকে বাঁচাতে গিয়ে সানন্দে সে মৃত্যু বরণ করল। এই আত্মত্যাগের মধ্যে স্পিনার চরিত্রের মহত্ব ফুটে উঠেছে।

সিলোনের রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়

স্পষ্ট ক'রে পাওয়া যায় *The School for Dictators* নামক গ্রন্থে। স্পষ্ট ক'রে বলছি এই কারণে যে, এখানে মতবাদ প্রকাশের জন্ত গল্পের আশ্রয় নেওয়া হয় নি। তীব্র শ্রেণ ও ব্যক্তির সাহায্যে সিলোনে ক্যাসিডম এবং ডিক্টেটরশিপের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। রাষ্ট্রের ক্ষমতা যাদের করায়ত্ত তাদের দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে নিখুঁত জ্ঞান থাকলেই কল্যাণ করা সম্ভব হয় না; "a genuine knowledge of social reality does not suffice if it is not supported by a strong moral sense."

রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে বলে জনসাধারণের মঙ্গলবিধান কঠিন হয়ে পড়েছে: *Machines, which ought to be man's instrument; enslave him, the state enslaves society, the bureaucracy enslaves the state, the church enslaves religion, parliament enslaves democracy, institutions enslave justice, academies enslave art, the army enslaves the nation, the party enslaves the cause, the dictatorship of the proletariat enslaves Socialism.* এই পাপচক্র থেকে নীতিবোধ ও ধর্মবোধই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে।

সিলোনে একটি মাত্র নাটক লিখেছেন,—*And He Hid Himself*. 'ব্রেড অ্যাণ্ড ওয়াইন'এর একটি ঘটনাকে এখানে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। খ্রীষ্টধর্মের পুনরুজ্জীবনের মধ্যে মানুষের কল্যাণ নিহিত আছে, এই হ'ল নাটকের মূল প্রতিপাদ্য।

সিলোনের সর্বশেষ উপন্যাস *A Handful of Blackberries*. ইতালিয়ার রকো ইতালীর দরিদ্র কৃষকদের জন্ত গভীর সমতা বোধ করত। তাদের মঙ্গল করতে পারবে মনে ক'রে সে কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিল। কম্যুনিষ্ট আদর্শে তার ছিল অন্ধ বিশ্বাস; পার্টির জন্ত প্রাণ দিয়ে কাজ করেছে। বছরের পর বছর শার হয়ে গেল, তবু ইতালীর দরিদ্র জনসাধারণের দুর্ভাগ্য যখন দূর হ'ল না এবং পার্টির মধ্যে একনায়কত্ব যখন প্রবল হয়ে উঠল তখন রকো কম্যুনিষ্ট পার্টি ত্যাগ করল। তার ফলে রকোর জীবনে এল দ্বন্দ্ব। ইহুদী তরুণী স্টেলাকে সে ভালবাসে। রকো কম্যুনিজমের আদর্শে আস্থা হারালেও স্টেলা তার

অনেকটা স্থান হয়ে এসেছে। ‘পথে ও পথের প্রান্তের’ তুলনায় ‘জাপানযাত্রী’র পত্রাংশগুলি দীর্ঘতর ও পূর্ণতর—ভাবনাগুলি যেন অনেকখানি দানাবীধা এবং সংহত। একটি দেশ জাতি কালের কথা হয়েও এর আবেদন সার্বজনীন। একটি জাতির চলন-বলন ও জীবনচর্চার ইতিহাস এখানে আছে, কিন্তু কবিচিত্তের এমন একটি সাধারণ ক্ষমতা আছে যার ফলে নিত্যান্ত বস্তু ও সত্যের অংশও রসে পরিণত হয়েছে। পত্রসঙ্কলনটির মধ্যে যে সমস্ত অংশ আত্মগত সেই সব অংশই শিল্পাংশে শ্রেষ্ঠ। আত্মগত ভাবনায়, দার্শনিকস্থলভ জিজ্ঞাসায় ও শিল্পসম্মত রূপায়ণে ‘জাপানযাত্রী’ কোন কোন অংশ রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্গে তুলনীয়। ৭নং চিঠি ক্লাসিক পর্দায় উদ্ভীর্ণ হয়েছে: “এই প্রকাশের জগৎ, এই গোরাঙ্গী, তার বিচিত্র রঙের সাজ পরে অভিসারে চলেছে—ওই কালোর দিকে, ওই অনির্বচনীয় অব্যক্তের দিকে।...অব্যক্তের দিকে, ‘আবো’র দিকে প্রকাশের এই কুল-ধোয়ানো অভিসার-যাত্রা—প্রলয়ের ভিতর দিয়ে বিপ্লবের কাঁটাপথে পদে পদে রক্তের চিহ্ন এঁকে।” রবীন্দ্র-মানসের সেই চিরন্তন বাণী, জগতীর জীবন-দর্শন পত্রাংশটির মধ্যে অনবচ্ছ ভাষায় রূপ পেয়েছে। জাপানের গৃহসজ্জা, সৌন্দর্যবোধ, কাব্য-চিত্রকলা সম্পর্কে গভীর মন্তব্য সঙ্কলনটির সর্বত্র বিস্তৃত রয়েছে—সঙ্গীত-নৃত্যকলার মাধ্যমে একটি জাতির আত্মপ্রকাশের গরিমময় রূপ কবি দেখেছেন। শিমোমুরার সুবিখ্যাত চিত্রটি উপনিষদের আলোকপ্রাণীর কাছে নতন বাণী নিয়ে এসেছে। জাপানকে অবলম্বন করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্পর্কস্বত্ব কবি নতন করে আবিষ্কার করেছেন। ‘জাপানযাত্রী’তে আকাশ-সমুদ্র-প্রস্থিত বিশ্ব-প্রকৃতির যে কয়েকটি বর্ণনা আছে, তার সঙ্গে কবির আত্মোপলব্ধির স্বরের ছোঁয়াচু লেগেছে—তাই ব্যঙ্গনাগর্ভ গীতিকবিতার মতই এর আনন্দ।

“পারস্তে” অংশটি ‘জাপানে’ অংশটির মত শিল্পকর্ম ও ভাবনার দিক দিয়ে অসাধারণ না হ’লেও এখানেও বহু লোভনীয় অংশ চোখে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে এই অংশটুকুই কবির শেষ ভ্রমণ-কাহিনী। জাপান ও পারস্ত—এই দুই ভূখণ্ডের মধ্যে কবি এক প্রাচ্য-সমপ্রাণতা অনুভব করেছিলেন। কবি বলেছেন: “এদের কাছে—জাপান ও পারস্ত—

নই, প্রাচ্য কবি।” কবি পারস্তের প্রাচীন ইতিহাস ও রসের সঙ্গে আত্মার আত্মীয়তা অনুভব করেছেন। শিরাজ নগরীর শহরতলীতে পারস্তের রূপরসিক হাফিজের সমাধির পাশে বসে কবি অপূর্ব রসানন্দ অনুভব করেছেন,—“এই সমাধির পাশে বসে আমার মনের মধ্যে একটা চমক এসে পৌঁছল, এখানকার এই বসন্ত-প্রভাতে সূর্যের আলোতে দূরকালের বসন্তদিন থেকে কবির হাস্যোজ্জ্বল চোখের সন্দেশ। মনে হ’ল আমরা দুজনেই এক পানশালার বন্ধু, অনেকবার নানারসের অনেক পিয়লা ভর্তি করেছি।” সেদিন কবি অজ্ঞাতসারেই হাফিজের সঙ্গে নিগূঢ় আত্মীয়তা অনুভব করেছিলেন। হাফিজ-রসিক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকেই কবির এই দীক্ষা হয়েছিল। প্রাচীন পার্সি-পোলিস নগরীর ধ্বংসাবশেষ কবিকে সেই অতীত-জীবী সভ্যতার কথা ভাবিয়ে তুলেছে—কবির ‘রোম্যান্টিক’ প্রতিভা এক বহু প্রাচীন সভ্যতার সম্মুখে ঠাড়িয়ে এক দেশকালাতীত মানব-সভ্যতাকেই অনুভব করেছে। আধুনিক পারস্তের নবসৃষ্টির মুহূর্তে কবি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্পূর্ণ মিলন কামনা করেছেন।

৬

‘জাপানযাত্রী’র পত্র এবং ‘জাপানযাত্রী’ যেন একই স্বরে বাঁধা। কালাহুজ্জমিক দিক দিয়েও এই দুটি পত্রসঙ্কলনের ব্যবধান প্রায় এক বছর। বস্তুব্য ও রচনারীতির সমধর্মিতায় একটি গ্রন্থেরই দুটি অংশ বলে মনে হওয়াও এমন কিছু বিচিত্র নয়। এই গ্রন্থটির স্বর একটু গভীর বটে, কিন্তু রবীন্দ্রস্থলভ পরিহাসের অভাব নেই। পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে কবি বৃহত্তর ভারতের রূপ দেখতেই গিয়েছিলেন—সুতরাং ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথের একটি দিক পত্রসঙ্কলনের মধ্যে উদ্ঘাটিত হয়েছে। কবি রামায়ণ ও মহাভারতের বুদ্ধিধর্মী ব্যাখ্যা দিয়েছেন—‘রক্তকরবী’ নাটকের ভূমিকারও কবি এই জাতীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রথম চিঠিতেই কবি ভারত-সংস্কৃতির কবি-ব্যাখ্যাতার ভূমিকা নিয়েছেন—“ভারতবর্ষের সেই সর্বত্র-প্রবেশের ইতিহাসের চিহ্ন দেখবার জন্য আজ আমরা তীর্থযাত্রা করেছি।” জাপানযাত্রার উদ্দেশ্যটি এই অংশে সূচিহ্নিত। মাঝে মাঝে বর্ণনামূলক অংশগুলির মধ্যে কবি

সংস্কৃতি-ব্যাখ্যা করেছেন—অছষ্ঠানবহুল পৌরাণিক হিন্দুধর্ম, শিল্পকলা, সামাজিকতা প্রভৃতির সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির স্ববিস্তৃত পটভূমিকা মিলিয়ে কবি এক অখণ্ড জীবন-সঙ্গীত রচনা করেছেন। বেশভূষা আচার আচরণকেও কবি সহানুভূতির সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছেন।

‘জাভাধাজীর পত্র’ রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য-পরিকল্পনার মূলে অনেকটা কার্যকরী হয়েছে। নৃত্যকেই কবি জাভার আত্মপ্রকাশের প্রধান মাধ্যম বলেছেন, “এ দেশের উৎসবের প্রধান অঙ্গ নাচ। এখানকার নারকেল বন যেমন সমুদ্র-হাওয়ায় ছলছে, তেমন সমস্ত দেশের মেয়ে পুরুষ নাচের হাওয়ায় আন্দোলিত।...কেবল ভাবের আবেগ নয়, ঘটনা-বর্ণনাকেও এরা নাচের আকারে গ’ড়ে তোলে।” কথা-প্রসঙ্গে কবি সাধারণভাবে নৃত্যতত্ত্বের দিকও আলোচনা করেছেন। মুখোশ-নৃত্যের কথাও কবি উল্লেখ করেছেন—মুখোশ-নৃত্যের পরিকল্পনাও কবির হয়তো ছিল। ‘তালের দেশ’ নাটক ঠিক মুখোশ-নাট্য না হ’লেও সজ্জা-নাট্যের (Costume Drama) একটি স্বমঞ্জিত রূপ চোখে পড়ে। ‘জাভাধাজীর পত্র’ গ্রন্থের মূল স্বর দুটি—ভারত-সংস্কৃতির ব্যাখ্যা, আর নৃত্যসঙ্গীত-অভিনয় কলা সম্পর্কে মন্তব্য। শুধু নৃত্যনাট্যই নয়, রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালের নাট্যসাহিত্যের কলা-বৈশিষ্ট্যের বহু প্রমাণ এই গ্রন্থটিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। সবটুকু মিলে একজন কলা-নিপুণ শিল্পীর ও কলা-সমালোচকের বিদগ্ধ প্রকাশ এই গ্রন্থটির রসমর্যাদা বাড়িয়ে তুলেছে।

‘রাশিয়ার চিঠি’র রচনারীতি কবির অস্বাভাবিক পত্র-সঙ্কলন থেকে অনেকখানি ভিন্ন। এর কারণ প্রধানতঃ দুটি—প্রথমটি, এর গতরীতি। ‘রাশিয়ার চিঠি’র গতরীতির মধ্যে পূর্বতন ভ্রমণ-পত্রগুলির মদিরতা নেই। আবেগ এখানে সংহত হয়ে তীক্ষ্ণ বাণীবিশ্রাসে রূপান্তরিত হয়েছে। বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করে, আবেগের কুহক থেকে মুক্ত করে তাকে ধারালো অসিফলকের মত দীপ্ত করে তোলা হয়েছে। বক্তব্যের পরিচ্ছন্নতা ও প্রকাশের স্পষ্টোচ্চারণ ‘রাশিয়ার চিঠি’কে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে। অতিকথন ও বিশেষণ-বাহুল্য এখানে প্রায় পরিত্যক্ত। ‘রাশিয়ার চিঠি’র দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, এর স্বনির্ভর বিষয়মুখীনতায়। রবীন্দ্রনাথের অস্বাভাবিক পত্র-সঙ্কলনে

চূড়ান্ত আত্মনির্ভরতার ছাপ আছে,—অনেক সময় বিষয়ের বিচিত্রমুখী আবেদন অন্তর-সত্যের রূপময় অতিব্যক্তিতে গীতিধর্মী হয়ে উঠেছে। তাই এই সমস্ত চিঠি অনেক ক্ষেত্রেই ডায়েরিধর্মী, আত্মগত ভাবনার বাহন। কিন্তু ‘রাশিয়ার চিঠি’ প্রবন্ধধর্মী—প্রবন্ধের বিষয়মুখীন বৈচিত্র্য ও নির্লিপ্ততা এখানে অল্পপস্থিত নয়। শুধু প্রবন্ধ নয়, মনননিষ্ঠ প্রবন্ধ—তাই গতরীতিতে পেলবতার চেয়ে দীপ্তি বেশী।

কবির দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও কিছু নূতনত্ব লক্ষ করা যায়। একটি নবজাগ্রত দেশ ও জাতি যেমন কবির কাছে বিশ্বয়কর ব’লে বোধ হয়েছে, তেমনই নিজের পরপদানত দেশের রুদ্ধপ্রায় জীবনের কথা তাঁকে বার বার পীড়িত করেছে। সে পীড়ন মাত্রের অপমানবোধের পীড়ন। ‘রাশিয়ার চিঠি’ সঙ্কলনটির মূল স্বর কবিচিন্তার অন্তর্ভুক্ত মানবতা। কবি বলেছেন, “ধনশক্তিতে দুর্জয় পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাঙ্গণদ্বারে ওই রাশিয়া আত্মনির্ভর শক্তি-সাধনার আসন পেতেছে সমস্ত পশ্চিম মহাদেশের জুটু-কুটিল কটাক্ষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এটা দেখাবার জন্য আমি যাব না তো কে যাবে।” মস্তোত্তর কৃষিভবন পরিদর্শন করতে গিয়ে তাদের বিশ্বয়কর সমুদ্রতট কবিকে আনন্দ দিয়েছে। রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন কবি, সঙ্গে সঙ্গে চিত্রকলা ও নাটকেরও আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থের উপসংহার অংশটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সুপরিকল্পিত শোষণনীতিকের অত্যন্ত স্পষ্ট ও দীপ্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন কবি। বর্তমান ধনতান্ত্রিক ও শোষণপরাধন সভ্যতার বীভৎস রূপের বর্ণনায় ‘কালান্তর’ প্রবন্ধ-গ্রন্থটির সঙ্গেই ‘রাশিয়ার চিঠি’র মিল খুঁজে পাওয়া যায়। “রাশিয়া”—ভ্রমণের অভিজ্ঞতা কবি অস্বাভাবিক চিঠিতেও লিপিবদ্ধ করেছেন: “আমি যা বছকাল ধ্যান করেছি, রাশিয়ায় দেখলুম এরা তা কাজে খাটিয়েছে; আমি তা পারি নি ব’লে দুঃখ হ’ল। অল্পবয়সে জীবনের যা লক্ষ্য ছিল ত্রীনিকেন্তনে শান্তিনিকেতনে তা সম্পূর্ণ সিদ্ধি না হোক, সাধনার পথ অনেকখানি প্রশস্ত করেছি। নিজের প্রজাদের সহৃদয়ে আমার অনেককালের বেদনা রয়ে গেছে। মৃত্যুর আগে সেদিককার পথও কি খুলে যেতে পারব না।” (প্রতিমা দেবীর কাছে লিখিত

পথ চলে

শ্রীকরণাময় বসু

আকাবীকা রাঙা পথ কোথা যায় দূরবাক,
দিগন্ত পার হতে যুগতুষ্কা-কি ডাকে ?
তেপান্তরের শেষে ধূ ধূ সমুদ্রে
পথ বুঝি পার হয় জ্যোৎস্না কি রোদুরে ;
ভাঁটা কি উজ্জান ঠেলে, স্তন টেনে পাল তুলে
অথ কি মেখে পথ আহাজের মাঙলে ;
ওই দূর বন্দর রোদুরে বলমল,
লবঙ্গ দ্বারুচিনি দীপন্তিল উজ্জল ।
নারিকেল পাতা কাঁপে, মোহমৌ হাওয়া বয়,
চেউ লাগে ভাঙা তটে, সাগর কি কথা কয় ?
ঝিহুক কুড়ানো খেলা প্রবাল সাগর জলে,
চাঁদ ওঠে, ফুল কোটে, মণি-দীপ চেউয়ে জলে ।

পথ যায় ঘুম চোখে পায়ে হেঁটে কত দূর,—
পদ্মের ফুলবনে মৌমাছি তোলে স্বর ;

সেই বন পার হয়, পার হয় কত দেশ,
হংসের পক্ষেতে পথ কি নিরুদ্ধেশ ?
পার হ'ল মরুপথ, ষর্জুর-কুঞ্জেতে
এতটুকু চোখ বোজে কুহুমের পুঞ্জেতে ;
তার পর চ'লে যায় পার হয়ে বালুঝড়,
নীল পাহাড়তে যেথা পাইনের মর্মর ।
ঝরনার জলধারা বেন কাঁকনের স্বর,
ঝরা পাতা পিছে ফেলে পথ চলে কত দূর ?
পথ খোজে ভালবাসা, মমতার আখিজল,
অপরূপ বেদনায় মায়াময় ছলছল ।

তবু সে বাঁধে না বাসা, করে নাক' সঞ্চয়,
অকুলের উদ্দেশে খেয়ালের খেয়া বয় ।
আধারের যাত্রী সে আলোকের খোলে দ্বার,
চ'লে যায় উদাসীন, ফেলে যায় মণি-হার ।

বিশ্বাস হারায় নি। সে পার্টির সভ্য র'য়ে গেল। আদর্শের সংঘাতের ফলে হৃদয়ের সম্পর্ক জটিল হয়ে উঠল। কিন্তু বেশিদিন অপেক্ষা করতে হ'ল না। স্টেলারও পার্টি সম্বন্ধে মোহমুক্তি ঘটল। এর পরে নায়ক-নায়িকার মিলনের পথে আর বাধা রইল না। এই উপস্থানে সিলোনে অনেকটা প্রচারধর্মী হয়েছেন ব'লে মনে হয়। পূর্ববর্তী রচনার তুলনায় এখানে তাঁর শিল্পপ্রতিভা অনেকাংশে ক্ষয় হয়েছে।

সিলোনে তাঁর প্রায় সকল গ্রন্থই সুইজারল্যান্ডে রচনা করেছেন। ফ্যানিস্ট সরকারের পতনের পর ১৯৪৪ সনে তিনি স্বদেশে ফিরে এসেছেন। সিলোনে এখন নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজবাদে আস্থাবান।

সাহিত্যিক হিসাবে সিলোনের মধ্যে যে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাতে তিনি অনাদ্যসেই বর্তমান পৃথিবীর

একজন শ্রেষ্ঠ লেখক হতে পারতেন। কিন্তু মুসোলিনীর ফ্যানিস্ট আমলে জীবন আরম্ভ হওয়ায় তাঁর অল্পভূতিপ্রবণ মন রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধনা দ্বারা সম্ভাবনাকে পূর্ণতা দিতে পারেন নি।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Fontamara, 1934, Methuen, London.
2. Mr. Aristotle (গল্প ও রেখাচিত্রের সংকলন), 1935, R. M. McBride & Co., N. Y.
3. Bread and Wine, 1936, Methuen, London.
4. The School for Dictators, 1939, Jonathan Cape, London.
5. The Seed Beneath the Snow, 1943, do.
6. And He Hid Himself, 1946, do.
7. A Handful of Blackberries, 1954, do.

রবীন্দ্রনাথের পত্র-সাহিত্য

(৩৬৮ পৃষ্ঠার পর)

ক্ষীণ করলে আমার এই হাজার গানের আসর সম্পূর্ণ জমে না।"—স্বর-সমন্বয় বা স্বরৈক্যের সাধনাই কবি-জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা। বাইরের নানা বৈচিত্র্য একই স্বরের রেখায় যদি বাঁধা না পড়ে তো অশুণ্ড সমগ্রতার সাধনা হয় ব্যর্থ। 'মানসী' কাব্যের প্রথম কবিতা "উপহারে" কবি বহুকাল পূর্বে এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন। গোয়টের জীবন-সাধনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবন-সাধনা এই হিসেবেই ভিন্নরূপী—সম্ভবতঃ শেক্সপীয়রের সঙ্গেও কবির এই প্রভেদ। বিচিত্রতা একটি মূলভাবের দ্বারা শিল্পায়িত ক'রে তোলা রবীন্দ্রপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য:

"একের চরণে রাখিলাম,

বিচিত্রের নর্মবীক্ষী, এই মোর রহিল প্রণাম।"

প্রকৃতি সম্পর্কিত মূল্যবান মন্তব্য অনেক আছে—'বনবাণী' কাব্যের জন্মলগ্নটির কথা বিশেষভাবে জানা যায়। ১৫নং চিঠিখানি প্রকারান্তরে 'বনবাণী' কাব্যের ভূমিকা। খেয়ালী স্রষ্টা রৌদ্রমাখা অলসপ্রহরে ক্ষণিকের ভাব-ঝলকের ছবি এঁকে চলেছেন। কবিবর্ণিত এই ক্লাস্তিভরা কুঁড়েমি কবির শেষ দশকের অনেকগুলি গল্পকবিতার প্রাণ। ৩৬নং পত্রটি 'শেষ সপ্তকে'র একটি প্রসিদ্ধ কবিতার ব্যাখ্যা বললেই চলে। এই পর্বের অনেকগুলি কবিতার ব্যাখ্যাই পত্রাকারে বিস্তৃত হয়েছে। ২০নং ও ২৭নং চিঠি স্বরচিত চিত্র সম্পর্কে মন্তব্যে পূর্ণ। ২৩নং চিঠিতে ছবি ও কবিতার পার্থক্যের কথা বলা হয়েছে। কবিতার বিষয় অস্পষ্ট ভাবে দেখা দেয়, পরে তার বিস্তৃত, কিন্তু ছবি একেবারেই খেয়ালের খেলা—অর্থব্যঞ্জনা তার শেষের কথা। নিজের ছবি সম্পর্কে কবির এই আলোচনা রবীন্দ্র-চিত্রকলার প্রকৃতি-নির্দেশক। কবিতা রচনার মধ্যে যতটুকু প্রয়াস আছে, চিত্ররচনায় ততটুকু প্রয়াসও নেই। কবির মগ্ন-চৈতন্য খেয়ালের রেখায় গাঁথা পড়ে, তারপরে আসে মাজাঘষার পালা। রেখার এই মস্ততার কথা কবি ২৭নং চিঠিতে বিস্তৃতভাবে বলেছেন।

এই সময়ে কবির কবিতার একটি বড় বৈশিষ্ট্য পূর্বস্বতি-রোমন্থনের স্বর। 'পূরবী' কাব্যে যে "শেষ রাগিণীর বীণ" বেজে উঠেছে, তার সঙ্গে অতীত স্মৃতি-চিন্তনের সূক্ষ্ম বেদনার রেশটুকু সুস্পষ্ট-লক্ষ্য। অতীত স্মৃতি-পর্যালোচনায়

কোথায় যেন বেদনার মুহূর্ত রয়েছে। পূর্বস্বতি রোমন্থনের স্নান স্বর কয়েকটি চিঠির উপজীব্য। ১৮নং ও ৫৪নং পত্রসংখ্যায় এই স্বর সবচেয়ে বেশী। ১৮নং পত্রে ক্লাস্ত বার্ষিক্য এড়িয়ে ডাকঘর-শারদোৎসব-গীতাঞ্জলির মুগ্ধ প্রহরের কথায় পূর্ণ—তার সঙ্গে একটি ক্লাস্ত দীর্ঘশ্বাসও আছে: "আমার সেদিনকার পরিচয়টাকে এখানকার প্রদোষাক্ষকাবে ভালো ক'রে আর খুঁজে পাইনে।" শিলাইদহের অতীত স্মৃতির পূর্ণতর পরিচয় ৫৪নং চিঠি-খানির প্রাণ। বার্ষিক্যের অলস মুহূর্তে কবির এই অতীতপ্রসঙ্গী ভাবনা রূপকথার স্বপ্নমোহে বিহ্বল: "মনে পড়ছে সেই শিলাইদহের কুঠি, তেতালার নিভৃত ঘরটি—আমের বোলের গন্ধ আসছে বাতাসে—পশ্চিমের মাঠ পেরিয়ে বহুদূরে দেখা যাচ্ছে বালুচরের রেখা, আর গুণটানা মাঙ্গল। দিনগুলো অবকাশে ভরা—সেই অবকাশের উপর প্রজাপতির ঝাঁকের মতো উড়ে বেড়াচ্ছে রঙীন পাখাওয়ালা কত ভাব এবং কত বাণী। কর্মের দায়ও ছিল তার সঙ্গে—আর হয়তো মনের গভারে ছিল অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, পরিচয়হীন বেদনা।" অতীতের স্বপ্ন-মহর দিন কবির স্মৃতিচারী চিন্তের মণিদর্পণে স্মরণের বিদ্যুৎরেখা আঁকে,—কাব্যধর্মী এইসব চিঠি করুণ-সুন্দর।

এ ছাড়াও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত (৪৮নং), আমেরিকার জীবনচর্চা (৫০নং), হলকর্ষণ উৎসবের ব্যাখ্যা (৪০নং), 'তপতী' ও গল্পকবিতার প্রসঙ্গ (৩২নং), মেঘদূত ব্যাখ্যা (৩৮নং) প্রভৃতি পত্র নানাকারনে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্র-প্রবেশক গ্রন্থ হিসেবে এই ক্ষুদ্রকলেবর সঙ্কলনটি মূল্যবান।

'জাপানে পারস্ত' গ্রন্থ প্রকারান্তরে দুটি গ্রন্থ। এর "জাপানযাত্রী" অংশটি অনেক আগেকার লেখা (১৯২৬),—তার প্রায় ছ-সাত বছর পরে রবীন্দ্রনাথ পারস্ত ভ্রমণ করেন। রচনারীতি ও শিল্পের দিক থেকেও দুটি গ্রন্থে প্রচুর পার্থক্য আছে। "জাপানযাত্রী" অংশটি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ-কাহিনী—রচনাকাল থেকে আজ পর্যন্ত এই গ্রন্থটি বাংলা-সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র স্থানের অধিকারী। "পারস্ত" অংশটি অনেকটা বিবৃতমূলক। "জাপানযাত্রী" মাদকতা ও অপরাধ শিল্পরীতি এখানে যেন

শ্রেষ্ঠ এক সাধনা। সাহিত্যব্রতী যত বেশী নিবিড় ভাবে তাঁর ব্রত আঁকড়ে ধরবেন তত তাঁর ব্যক্তিত্বের উন্মোচন ও প্রসার ঘটবে। এ জিনিস আধ্যাত্মিক সাধনার স্বগোত্র। আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় সাধনার সঙ্গে সাহিত্য-সাধনার প্রণালীগত তফাত নিশ্চয়ই অনেকখানি, তবে বঙ্গদেশের মূল লক্ষ্যে বোধ হয় খুব বেশী প্রভেদ নেই। কেননা শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মবাদীর মত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যশিল্পীও আত্ম-উপলব্ধির পথে মুক্তির অন্তিমারী। আত্মপ্রকাশের দুনিবার আগ্রহ ও প্রেরণাই অপর নাম হ'ল সাহিত্যচর্চা। এই চর্চায় নিরন্তর ব্যাপৃত থাকতে থাকতে মানুষ এমন একটা স্তরে গিয়ে পৌঁছয়, যখন যোগী বা তপস্বীর সঙ্গে তার মানসিক জীবনের বড় একটা তফাত থাকে না। যোগীরা সংসারনিষ্পৃহ, পক্ষান্তরে শিল্পী-সাহিত্যিক সংসারপ্রেমী, জীবনপ্রীতিতে ভরপুর। কিন্তু এই যে ভেদ, এটি হ'ল দৃষ্টিভঙ্গীর ভেদ, দুই বিভিন্ন সাধনমার্গে অবস্থিত দুই বিভিন্ন ব্যক্তির জগৎ ও জীবনকে বিচার করবার প্রণালীর ভেদ, নয়তো তাঁদের উপলব্ধিতে যে খুব বেশী পার্থক্য আছে তা মনে হয় না। তাঁদের সিদ্ধি সমপর্দায়ের, হৃৎকান্ড ব্যক্তিত্ব ও সমপর্দায়ের। তাঁদের সাক্ষ্য কিংবা সার্থকতাবোধ সমগোত্র। খাটি অর্থে একজন সাহিত্যসেবী হলেন তপস্বী—দুর্জয় ও ছেমহীন আত্ম-অভিব্যক্তির সাধনায় তিনি নিমগ্ন। আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় সাধনার মত এই সাধনারও শেষ বিন্দুতে আছে অহংবোধের পরিপূর্ণ বিলুপ্তি ও মুক্তি।

কোভের বিষয়, এই দৃষ্টিতে সাহিত্যসেবাকে বিচার করেন খুব কম জনাই। অধিকাংশের নিকট সাহিত্য হ'ল অবসর-বিনোদন ও সস্তা আমোদ-আহরণের এক লঘু প্রক্রিয়া। কেউ হান্ধা হান্ধে দু-একটি মিষ্টি কবিতা বা ছোটগল্প লিখলেন, অমনি সাময়িক পত্র-পত্রিকাদির আসরে ডকা বেঞ্জে উঠল—এমন লেখক আর হয় না, অনেক কালের ভিতর সাহিত্যে এমন শক্তিমানের আবির্ভাব হয় নি, ইত্যাদি। এর চাইতে আত্মপ্রবন্ধনা আর কিছু হতে পারে না। ধার্য ডকা বাজান তাঁরা যেমন নিজেকে প্রতারণিত করেন, তেমনি ধাঁদের নামে ডকা বাজানো হয় তাঁরাও কম প্রতারণিত হন না। এই ডামাডোলের মধ্যে মুশকিল হয় তাঁদের ধারা সত্যিকার সাহিত্যসেবী, লৌকিক খ্যাতি-প্রতিপত্তির অপেক্ষা না রেখে ধারা স্বীয় মানসমুকুরের

মুখোমুখি হয়ে কঠিন উপলব্ধির সাধনায় নিমগ্ন। চতুর্দিকে সস্তা প্রশংসার কর্ণপটহভেদী জয়নিনাদে মর্মপীড়িত হয়ে কোভে ঘুগায় অভিমানে তাঁরা স্বয়ংচিত নিভৃতির বিবরে মুখ লুকোবার পথ খুঁজে পান না। সকল লেখকই পাঠকের প্রীতি ও সমাদর কামনা করেন। তবে তফাতের মধ্যে কেউ সস্তায় এই প্রীতি অর্জন করতে চান, কেউ তার জন্তে সর্বদাই কঠিন মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকেন। শেবোক্তের সংখ্যা আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে নিতান্ত মুষ্টিমেয় বললেও চলে। তবু গাছনা এই যে, তাঁদের ধারা এখনও বিচ্ছিন্ন আছে। এখনও আমাদের মধ্যে এমন কোন কোন সাহিত্যব্রতী আছেন ধারা মূল্য না দিয়ে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা লাভকে সন্মোহের চোখে দেখে থাকেন, সস্তা জনপ্রিয়তায় ধাঁদের মন ভুগ্ন হয় না, বরং যত বেশী জনসমাদরের হাতছানি আসে তত তাঁরা কঠিনতর ক্লেশস্বীকারের পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হবার জন্তে জনতা থেকে দূরে সরে দাঁড়ান। তাঁরা দুঃখব্রতধারী, স্বেচ্ছায় আত্মবিলোপপ্রয়াসী। সমাজকে অমৃত ও আনন্দ বিলোবার গুঁড় দায়িত্ব তাঁদের উপর জ্ঞাত, সেই কারণেই যেন আরও বেশী করে তাঁরা ত্যাগ ও ক্লুপথের আশ্রয়ী। আনন্দ যদিও সাহিত্যব্রতীর চরম লক্ষ্য, সহজ আয়াস-প্রয়াসের পথে এবং আয়াস-আয়েস বিসর্জন না দিয়ে কদাচ এই লক্ষ্য অধিগম্য হয়ে থাকে। অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব সংশয়জিজ্ঞাসা ভুলভ্রান্তিজনিত অপরিমেয় চিন্তাক্রেশের কঠিন পরীক্ষা সমুত্তীর্ণ না হ'লে সাহিত্যিক সিদ্ধির কিনারায় পৌঁছনো যায় না। বৈষয়িক মানদণ্ডে যে সব জিনিস লোকের কাছ থেকে সচরাচর মূল্য পেয়ে থাকে, প্রকৃত সাহিত্যব্রতীর চোখে তাদের মূল্য সামান্য। সাংসারিক হৃৎভোগের ব্যাপারে অনেকানেক বিষয়ে নিজেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত না করলে বৃদ্ধি অপরকে ভাবকল্পনার ঐশ্বর্য বিতরণ করা যায় না।

সাহিত্যসেবীর সাহিত্যসেবার গুণাগুণ নির্ণয়ের একটি প্রধান উপায় হ'ল ব্যক্তিত্বের বিচার। পূর্বেই বলেছি, ধার সাহিত্যানিষ্ঠা যত গভীর, তাঁর ব্যক্তিত্ব তত প্রশস্ত ও অপ্রতিরোধ্য। এই মানদণ্ডের পরীক্ষায় আমাদের সাহিত্যের কল্পজন লেখক উত্তীর্ণ হবেন বলা কঠিন। কত কত লেখককে জ্ঞানি ধারা লিখনপ্রক্রিয়ার মোটামুটি

সিদ্ধকাম, কিন্তু তাঁদের চারিত্র্য বা মেরুদণ্ডের বল নেই বললেই চলে। তথাকথিত লিপিকুশলতার সঙ্গে এই চারিত্র্যের অভাব কেমন ক'রে খাপ খায় বোঝা দুষ্কর। কেননা আত্মপ্রকাশের ধারাটাই এমন যে, এই প্রক্রিয়ায় অবিশ্রান্ত ভাবে নিজেকে নিয়োগ করার ফলে মানসিকতার ও প্রবণতার রূপান্তর সাধিত হয়, সহজ ভাল মানুষ অমিত শক্তিদ্বারা ব্যক্তিতে পরিণত হয়। এক কথায় ব্যক্তিত্বের স্বরূপের পরিবর্তন হয়। যে ছিল অকবিতার এই প্রক্রিয়ায় কবি হয়ে যাওয়াও আশ্চর্য নয়। কেননা গুণিজনদের ধারণা, আত্মপ্রকাশের অবিরত চেষ্ঠায় মনের ভিতর যে প্রচণ্ড tension-এর সৃষ্টি হয় তার থাকায় কল্পনার অবরুদ্ধ নিষ্করণের স্বপ্নভঙ্গ হওয়া কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়। আত্মবিকাশের ক্রমাগত চেষ্ঠার মধ্যে আছে দৌলদারিত্ব তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হওয়ার অলান্ত সঙ্কেত। লোকে বলে, কল্পনা ও কবিত্ব শক্তি সহজাত। এ কথা সত্য হ'লেও তার বিশেষ দাম নেই। কেননা শিল্পনিষ্ঠ ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা এই যে, যেটুকু স্বাভাবিক শক্তি মানুষ দৈবানুগ্রহরূপে পায় তাতেই তৃপ্ত থাকলে শিল্পকর্মে সাকল্যের আশা হৃদয়পরাহত হয়ে থাকে, ক্ষান্তিবিহীন একনিবিষ্ট চর্চার দ্বারাই শুধু ভিতরের শিল্পী-ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ উদ্ঘাটন সম্ভব। উদ্ঘাটন বলতে এখানে ব্যক্তিত্বের ব্যাপ্তিগত ও গুণগত রূপান্তর দুইই বোঝাচ্ছে। আত্মপ্রকাশের অনলস চেষ্ঠায় শুধু যে কল্পনা-শক্তির উত্তরোত্তর বলবৃদ্ধি হয় তাই নয়, যেখানে কল্পনাশক্তি নেই, মৌলিক স্বজনীশক্তি নেই, তেমন ব্যক্তি-আধারের ভিতর চূর্ণভঙ্গের উন্মেষ হতেও কোন কোন সময় দেখা যায়। প্রতি মানুষেরই ভিতর অফুরন্ত সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে বলে বলা হয়। শিল্পে সাহিত্যে এ কথার বেরূপ নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায় এমন বোধ করি আর কিছুতেই পাওয়া যায় না।

তা যদি হয়, তবে সাম্প্রতিক লেখকদের ব্যক্তিত্বের এইরূপ ভাঙাচোরা চেহারা কেন। অধিকাংশ সাহিত্যিককে দেখলেই মনে হয় আধখানা মানুষ, এমন কি ভগ্নাংশ মানুষ বললেও অতুক্তি হয় না। না আছে বাক্যে দৃঢ়তা, না পাই চিন্তাশক্তির মৌলিকত্বের পরিচয়। সহজ লিপিনৈপুণ্য অনেকেরই আয়ত্তে, কিন্তু ওই নৈপুণ্য

বিল্পের গণের পরীক্ষায় টেকে না এই কারণে যে, তা কতটা অহুশীলনের পথে অর্জিত হয় নি, ওটি নিতান্তই পণ্ডে-পাণ্ডায় বস্তু, সংশয়-জিজ্ঞাসা-অস্থিরতাবিজ্ঞিত সহজিয়া আশীর্বাদরূপে তাকে লাভ করা গেছে। স্বীয় শক্তিতে বা ব্যক্তিত্বের মর্যাদায় অধিকাংশ লেখকেরই কোন আস্থা নেই। কারুরই নিজের উপর বিশ্বাস নেই, তাই প্রত্যেকেই প্রথমে ব্যক্তিকে সাহিত্যিক সম্বন্ধে দেবার ক্ষমতা আশু বাড়িয়ে আছেন। কোন একটি সাময়িক-পত্র সম্বন্ধে-সংখ্যার বান। ডেকেছে বললেও চলে। পারস্পরিক স্বতির ঠেকো দিয়ে পরস্পরের মনোবল জীয়ে রাখবার এ এক হাস্যকর প্রয়াস। তাই কৃচ্ছ্রবতী অহুশীলনের পথে না গিয়ে প্রায় সকলেই তবির তদারকি ধরাধরির দ্বারা আত্মের গুচ্ছাবার তালে আছেন। প্রকৃত সাহিত্যসৃষ্টির দেখা দেই, সাধনার নাম নেই, এদিকে সভাসমিতির হুমোড়। আত্মপ্রত্যয়নিষ্ঠের নিষ্ঠুর একক সাধনার পথে পা বাড়াতো মিথ্যাসঙ্কোচের অন্ত নেই, এদিকে গোপ্তা ও সজ্ঞ গঠনের প্রয়াস আহারনিদ্রা অন্তর্হিত হওয়ার উপক্রম। সবাই মুকবির খোঁজেন, কেউ নিজের ভিতরকার স্পষ্ট শক্তিকে ভালো ক'রে উন্মোচিত করার কথা চিন্তা করেন না। প্রত্যয়-হীনতা, আরামস্বচ্ছন্দ্যের প্রতি আসক্তি এবং স্বীয় ব্যক্তিত্বের উপর প্রবল কৃচ্ছ্রসাধনার ক্রেশভার চাপাতে প্রমুগ্ধ ও অনিচ্ছা—এই ত্রিবিধ কারণ সাম্প্রতিক লেখকদের খণ্ডিত ব্যক্তিত্বের মূলে সক্রিয় রয়েছে বলে মনে হয়।

জানি এ ক্ষেত্রে কেউ কেউ বাঙালী জীবনের বহুমূল অর্থনৈতিক কৃচ্ছ্রতার যুক্তি উত্থাপন করবেন। বাঙালী শিল্পী ও লেখক সম্প্রদায়ের অসম্পূর্ণ-ব্যক্তিত্বের মূল দায়িত্বটুকু তাঁদের আর্থিক দৈন্যের উপর চাপাতে চাওয়া খুবই স্বাভাবিক। আমরা আমাদের স্বভাবের ত্রুটি-বিচ্যুতি-অসম্পূর্ণতার দায়িত্ব সর্বাগ্রে আর্থিক অনটনজনিত প্রতিকূল পরিবেশের উপর আরোপের চেষ্টা করি, তারপর অল্প দিকে দৃকপাতের অবসর খুঁজি। মনস্তত্ত্বটি বিশ্বজনীন এবং প্রায় আমাদের প্রকৃতিগত বলা চলে। কিন্তু এর দ্বারা আমাদের বিচ্যুতির আলোচনা হয় না। পাশ্চাত্যের একাধিক শিল্পীর দৃষ্টান্ত জানি, যারা এর চাইতেও অপকৃষ্ট আর্থিক পরিবেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে স্বীয় ব্যক্তিত্বকে বিকশিত

চিঠি—চিঠিপত্র, ৩ নং)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে লিখিত আর একখানা চিঠিতে কবি লিখেছেন : “জমিদারির অবস্থা লিখেছি। যে রকম দিন আসছে তাতে জমিদারির উপরে কোনদিন আর ভরসা রাখা চলবে না। ও জমিনসটার উপর অনেককাল থেকেই আমার মনে মনে দিকার ছিল, এবার সেটা আরও পাকা হয়েছে। যে সব কথা বহুকাল ভেবেছি এবার রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলাম। তাই জমিদারি ব্যবসারে আমার লজ্জাবোধ হয়।” (চিঠিপত্র, ২ নং)। রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি দুখানি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ যে যেনেশ’র পৌরোহিত্য করেছেন, তার মূলতঃ মানবিকতার। কবির শেষ দশকের কবিতায় নাটকে ও প্রবন্ধে বিশেষভাবে এই স্বরটিই বেজে উঠেছে। কবির জন্মলগ্নটি যেমন বিশেষ যুগসংক্ষিপ্ত, তেমনি তিরোধানলগ্নটিও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাৎপর্যময় মুহূর্তে। ভাঙা-গড়া উদয়-বিলয়ের মধ্য দিয়ে মানবোত্তীর্ণ হাদের যে অভিব্যক্তিদ্বারা কবির চোখের সম্মুখে ভেসে উঠেছে, দেশকালপ্রতিভ সত্যতা ও জনজীবনের নিয়ন্ত-পরিবর্তনশীল কাহিনীর দিক থেকে ভাবীকালের কাছে তা একটি মূল্যবান দলিল।

‘রাশিয়ার চিঠি’র এক-একটি পত্রাংশ সম্ভবতঃ কবির দীর্ঘতম পত্র—তথ্যে পরিপূর্ণ, ‘বিস্মৃতি’র ঘনবন্ধতায় বস্তুর-অংশ প্রধান। কবির সবগুলি ভ্রমণ-পত্রিকাতেই বৈদেশিক সংস্কৃতি ও সভ্যতা সহানুভূতির সাহায্যে উপলব্ধির প্রবণতা লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের পত্র-সাহিত্যে এই জ্ঞান প্রায়শ কোন ঝাঁঝালো অভিব্যক্তি থাকে না—ঐদর্শ্যে তিনি রোল্যান্ড দোসর। সংস্কৃতি যাকে বলেছে “বিদগ্ধ”—পত্রলেখক রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে এই বিশেষণটি স্বার্থভাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের পত্র-সাহিত্যকে এক হিসেবে পত্র-সাহিত্যের মহাকাব্য বলা যায়। স্বদীর্ঘকালের ভাবনার ইতিহাস যেমন এখানে সঙ্কলিত হয়েছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের গল্পরীতির বিবর্তনও খানিকটা লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের উপন্যাসে গল্পরীতির যে অনার্য-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব, পত্র-সাহিত্যে তা নেই বললেই চলে। সম্ভবতঃ কবি চিঠির ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের

ভাষার একটু তফাত ক’রেই চলতেন। পরবর্তী কালে চিঠির ভাষা ও সাহিত্যের ভাষার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষ করা যায় না। উপন্যাস-গল্প-প্রবন্ধের গঠে প্রথম জীবনে কিছু কাঁচা হাতের ছাপ ছিল, কিন্তু পত্র-সাহিত্যের গল্পরীতি যেন প্রথম থেকেই পরিণত—পরবর্তী কালে অধিকতর চর্চা ও যত্নের ফলে এর স্বাচ্ছন্দ্য সূক্ষ্মত্ব হয়েছে, অধিকতর শিল্পিত হয়েছে বক্তব্যের প্রকরণ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত, কাব্য ও নৃত্যনাট্যের অতিচর্চার ফলে রবীন্দ্র-গানের চেহারা প্রায়ই আমাদের চোখে পড়ে না। যদি কদাচিত্ চোখে পড়ে, তা হ’লে দেখা যাবে গল্পরীতির কর্ণায় কবি কতদূর যত্ন-তৎপর।

রবীন্দ্রনাথের পত্র-সাহিত্যকে তাঁর প্রতিভার তুচ্ছ দিকও বলা চলে না। তার কারণ অনেক বড় ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে তিনি পত্র-রীতিকেই অবলম্বন করেছেন। এই দিক দিয়ে পত্র-সাহিত্যকে তিনি দিয়েছেন কৌলীভ। পত্র-সাহিত্যের অবলম্বন হাক্কা হাসি থেকে গভীর আধ্যাত্মিক রস পর্যন্ত সব কিছুই। তথ্য, তথ্য ছাড়াও এর উপরি পাওনাটাই সবচেয়ে বড় পাওনা—সেটি হ’ল একটি মাহুয়ের নিবিড় ও অন্তরঙ্গ সাহচর্য। হয়তো সব সময় পারস্পর্য থাকে না, খেয়াল-খুশির মালা গোঁথে চলেন—তবুও এর কেন্দ্রে থেকে যায় এক স্থির ও অবিচলিত বিন্দু, যার আলোকচক্রে গাঁথা থাকে একটি মাহুয়ের মন। রবীন্দ্রনাথের চিঠি শুধু খবরের প্রত্যাশাই নিয়ে আসে না, তার সঙ্গে নিয়ে আসে অপক্লম মাহুয়টির নিভৃততম আত্মভাষণ। কথার রসেই অনেক সময় কথা জমে উঠেছে—তবু তার ধারাবাহিকতা কি নিটোল—কোথাও বুনোনির জট ঘটে নি—মহুণ-চিকণ মূল্যবান মসলিন যেন, তার ওপর কারুকরণের সূক্ষ্মতা—সহজ-সরল হয়েও বাদশাহী। কবি বলেছেন :—“ভাবুহীন সহজের রসই হচ্ছে চিঠির রস।... এই অতিমাত্র অর্থভারহীন ধ্বনিত-মন খুশী হয়—গাছের মর্মর-ধ্বনির মত প্রাণ-অশ্রোহনের এই সহজ কলরব।”—(‘পথে ও পথের প্রান্তে’, ৩৭নং) রবীন্দ্রনাথের পত্র-সাহিত্যে বক্তব্য ও বলা দুটিই সমান তালে চলছে। রবীন্দ্রনাথের পত্র-সাহিত্য চিঠি হয়েও উপকরণ, উপকরণ হয়েও রস, রস হয়েও মাহুয়ের অন্তরাত্মার স্বচ্ছন্দ-আশ্রোহন।

প্রসঙ্গ কথা

সাহিত্য ব্যক্তিত্বচর্চা

নারায়ণ চৌধুরী

বৎসরাধিককাল পূর্বে একটি নিবন্ধে ("বর্তমান বাংলা-সাহিত্যের অবস্থা," "শনিবারের চিঠি", জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১) আমি বাংলা-সাহিত্যসেবীদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী, ধ্যান-ধারণা, যোগ্যতা-অযোগ্যতার প্রশ্ন ইত্যাদি নিয়ে কিছু বিস্তারিত মন্তব্য করেছিলাম। ওই মন্তব্যাদির ভিতর সম্ভবতঃ কিঞ্চিৎ জালা ছিল, অপ্রিয় সত্যভাষণের রূঢ়তা ছিল, তাতে আমার কোন কোন লেখক বন্ধু আমার উপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, ছ-একজন নিবন্ধটির প্রতিবাদে সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পত্রাঘাতও করেছিলেন। কোন বিষয় সম্পর্কে স্বকীয় অভিমত যখন সুগভীর প্রতীতির আকারে মনের কোণায় বাসা বাঁধে, তাকে প্রকাশ করবার বেলায় ভাষায় উপর কোন কোন সময় নিজেই অজ্ঞাতসারে কিঞ্চিৎ ঝাঁক পড়ে। রচনার স্বভাবসম্পন্ন প্রত্যাশিত মুহূর্ত্ত ওই হৃদয় প্রত্যয়জনিত আবেগের প্রাবল্যের বশে কখন যে আপনার অজানিতে চড়া স্বরে গিয়ে দাঁড়ায়, নিজেই সে খেয়াল থাকে না। ফলে যা হবার তাই হয়—রচয়িতার অভিপ্রায়ের ভুল মানে করা হয়। কিন্তু বলা বাহুল্য, এ স্থলে বক্তব্যটুকুই মাত্র রচয়িতার অভিপ্রেত, বক্তব্যের ঝাঁকটুকু নয়। রচনার ভিতর আবেগপ্রভাবাৎ যদি কোথাও ঝাঁক প্রকাশ পেয়ে থাকে, তবে নিশ্চয়ই তা লেখকের অনিচ্ছাকৃত। বিবেকী লেখকমাত্রের নিজেই এই নিয়ে সন্দোহের অবধি নেই, অপরে আর তাঁর মনে কতটা প্রানিবোধ সৃষ্টি করতে পারেন ?

আজ সেই একই বক্তব্য কিঞ্চিৎ ভিন্নভাবে এই প্রবন্ধে উপস্থাপিত করব। আজকের কথাগুলির পিছনে বত না দাহ আছে, তার চেয়ে পরিতাপের তাড়না আছে অনেক বেশী। গভীর দুঃখে বর্তমান বাংলা-সাহিত্যের অবস্থা সম্পর্কে পুনরায় দু-চার কথা লিপিবদ্ধ করতে বসেছি। ইতিমধ্যে অনেকগুলি মাস অতিবাহিত হয়েছে, মনের উপর সময়ের ও পশ্চাদ্গতির প্রলেপ পড়েছে, কিন্তু মূলতঃ আমার পূর্বতন অভিমত পরিবর্তনের কোন কারণ ঘটে নি। পূর্বে বক্তব্যের

ভিতর যে স্তব্ধতা ছিল আজ সে স্তব্ধতার অবসান হয়েছে, কিন্তু বক্তব্যের মৌলিক বৌদ্ধিকতায় সংশয় প্রকাশের যথার্থ কোন উপলক্ষ ঘটেছে বলে মনে হয় না। বরং বত দিন যাচ্ছে তত সন্ত্রস্ত হয়ে লক করছি, আমাদের অধিকাংশ সাহিত্য-সেবীর মনে সাহিত্যসেবা সম্পর্কে কিছুত কতকগুলি ধারণা বর্তমান। সাহিত্যচর্চার নামে ছেলেখেলার মনোভাবটাই বলবৎ ও ব্যাপক। সাহিত্য যে-হেতু শ্রেষ্ঠ অর্থে 'খেলা', ওই অর্থের রক্ষণপথে সাহিত্যে বিপত্তিও বড় কম দেখা দেয় নি। খেলার মনোভাব সাহিত্যের উপর আরোপ করতে গিয়ে অনেকে সাহিত্য-অহুসীলনকে নিতান্ত সস্তা একটি তৎপরতার পর্ববসিত করেছেন। সৃষ্টিধর্মিতার অজুহাতে তুচ্ছ সহজিয়া সাধনের সংস্কার, স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার নামে চিন্তাবুদ্ধিহীন অনায়াস লিপিকুশলতার আদর্শ আসর জাঁকিয়ে বসেছে। বাংলা-সাহিত্যের মানকে বিশ্ব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলির সমপর্যায়ে উন্নীত করতে হ'লে সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে এই অহুচিত ধারণার মূলচ্ছেদ করতে হবে।

সাহিত্য বিশেষত্বচর্চার বিষয় নয়, সেটি সামগ্রিক জীবন-সাধনার সহিত অবিচ্ছেদ্য। খতিয়ে দেখতে গেলে জীবন-সাধনা ও সাহিত্য-সাধনা এক ও অভিন্ন। এ উক্তির সমর্থনে আমাদের সাহিত্য থেকে সার্থকতম দুটি দৃষ্টান্ত দেখানো চলে—বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তকে কতকাল আর আমরা লোকচক্ষুর সামনে তুলিয়ে রাখব। তাঁদের দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদেরও কি তাঁদেরই মত সাহিত্য-সাধনাকে জীবন-সাধনায় রূপান্তরিত করবার জন্ত চেষ্টা করার প্রয়োজন নেই ? আক্ষেপ এই যে, এই প্রয়োজনবোধের বিশেষ কোন প্রমাণ চোখে পড়ে না। অধিকাংশ লেখকই সাহিত্য বলতে 'লেখা-লেখা খেলা'র অধিক কিছু বোঝেন না। আধুনিক সাহিত্যসেবীদের মধ্যে এই বোধ প্রায়-অহুপস্থিত 'বে, বথার্থ সাহিত্য হ'ল স্বাক্ষ-উপলব্ধি ও ব্যক্তিত্ব-বিকাশের

করবার উপায় অন্বেষণ করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত সেই সাধনায় জয়ী হয়েছেন। এঁদের জীবনে যত বাধাবিপত্তি এসেছে, তত তাঁদের মনোবল দৃঢ়তর হয়েছে, সঙ্কল্প কঠিনতর হয়েছে। বিপদ-বাধার রক্ষ-কঠিন পাথরে তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিত্বকে অবিরত শান দিয়েছেন, তাইতে তাঁদের ব্যক্তিত্ব এত উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়েছে।

আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যে এ-জাতীয় সর্বাঙ্গিক প্রয়াসের দৃষ্টান্তের একান্ত অভাব। সত্য বাস্তবজীবনের সংস্কারে সকলেই আমরা অল্প-বিস্তর বিশ্বাসী, তাই আমাদের ব্যক্তিত্ব এত নমনীয়, দুর্বল, ভঙ্গুর। সহজিয়া সাধনার ভ্রান্ত আদর্শ দেশের শিল্পী-সমাজকে নিতান্ত পন্থ ক'রে রেখেছে। জলভ স্বতঃস্ফূর্তি ও অনায়াস স্বচ্ছন্দতার ধারণা আমাদের রচনারীতিকে কদাপি বুদ্ধিসচেতন সজ্ঞান প্রয়াসের স্তরে উন্নীত হতে দিচ্ছে না। যে অস্বাস্থ্য অধ্যবসায় ও সচেতন শিল্পমনস্কতা পশ্চাতে নিয়োজিত থাকলে ব্যক্তিত্ব অবিসম্বাদী ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে তেমন অধ্যবসায় ও চৈতন্তের প্রখরতা সম্বীভিত রাখতে আমাদের দেহ-মনের জড়তার অবধি নেই। জীবন-যজ্ঞে আমাদের সাক্ষ্যের চাবি প্রায় সকলেরই কম বেশী নীচু স্তরে বাঁধা, তাই অল্প আয়াসের মধ্যেই আমরা প্রচুর আত্মপ্রসাদের হেতু অহরহ অন্বেষণ করি। আধুনিক বাঙালী লেখকদের মনোজীবনের সব চেয়ে যা ক্ষতি সাধন করেছে তা হচ্ছে 'সহজ স্তরে সহজ কথা' বলতে পারার ভ্রান্ত সংস্কার। সহজ কথা সহজ স্তরে বলতে পারা খুবই সহজ ব্যাপার, তা কখনও শ্রেষ্ঠ শিল্পাদর্শের মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে পারে না। শিল্প বা সাহিত্য-সাধনার প্রাথমিক স্তরে অস্বাস্থ্য পরিভ্রমের প্রয়োজন হয়। এই অধ্যায়ে যদি একবার কোনমতে সহজিয়া লীলার সংস্কার শিল্পীমনকে পেয়ে বসে তা হ'লে সংশ্লিষ্ট শিল্পীর আর ভবিষ্যতের কোন আশা থাকে না। শিল্প-সাধনার গোড়ার দিকে সহজিয়া আদর্শের মত অনিষ্টকর আদর্শ বৃষ্টি আর কিছু হতে পারে না; আমাদের সাহিত্যের কোন কোন মহাজন তাঁদের পরবর্তী শিল্প-প্রয়াসীদের সামনে এই আদর্শটি তুলে ধ'রে দেশের সর্বনাশ ক্ষতি সাধন ক'রে গেছেন। কি যবীজ-সজীতে, কি প্রাচ্য কলারীতির অহুশীলনে, কি আধুনিক গল্পোপন্যাস-কবিতার চর্চায় এই সহজিয়া লীলার

এতদূর প্রাধান্ত আজকাল দেখতে পাওয়া যায় যে, মনে হয় এইটিই প্রধান হেতু যার জন্তে আমাদের একালের সাহিত্যিক শিল্পী গায়কদের ব্যক্তিত্ব পূর্ণ-বিকশিত হয়ে উঠতে পারছে না। যবীজনাথ নিজ জীবনে সহজিয়া সাধনাকে আদৌ প্রস্তর দেন নি, অথচ কি এক দুনিরীক্ষ্য কারণে তাঁরই আওতার ছুটির আনন্দের মহিমা সব চাইতে বেশী প্রকীর্তিত হয়েছে। এটি একালের লেখকদের জীবন-গঠনের পক্ষে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করেছে বলে মনে করি। এই প্রভাবের বশেই মুখ্যতঃ সাহিত্যিকদের জীবন থেকে চারিঅর্চা ব্যক্তিত্বচর্চার অভ্যাস লোপ পেতে বসেছে। শিল্পের ললিত লীলায় আত্ম স্থাপন করতে গিয়ে আমরা ব্যক্তিত্বকে প্রকৃত শক্তিমণ্ডিত করবার কথা বিস্মৃত হয়েছি। প্রাচীন কবিকুল-কথিত সাধনার ক্ষুরধার দুর্গম পথ আমরা পরিত্যাগ করেছি। আত্মাত্মিক লালিত্যের তুলান্তপের তলায় বীর্যবত্তা, দার্ঢ্য, বলিষ্ঠতার বজ্রলৌহ চাপা প'ড়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

আমাকে কেউ ভুল বুঝবেন না। সাহিত্য-সাধনা শ্রেষ্ঠ অর্থে নর্যকীড়া—এ কথা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু সাধনার প্রাথমিক অধ্যায়গুলিতে এই ধারণাকে প্রস্তর দেওয়া বোধ করি যুক্তিযুক্ত নয়। তাতে হিতের চাইতে অহিতেরই সম্ভাবনা। ক্রমাগত অহুশীলন, দীর্ঘস্থায়ী অহুশীলন ও সচেতন অহুশীলনের দ্বারা কঠিনকে সহজের কোঠায় নামিয়ে আনতে হয়। তার আগে পর্যন্ত সহজের বিশেষ সার্থকতা নেই। শিল্পসাধনার চূড়ান্ত পর্যায়েই কেবল শিল্পকর্ম 'লীলা' আখ্যা প্রাপ্ত হয়, 'খেলা' আখ্যা প্রাপ্ত হয়, পূর্ব পূর্ব পর্যায়গুলি শিল্পীর ব্যক্তিবিকাশের এক ছেদহীন অংশও ইতিবৃত্ত। শিল্পীর মানসিক প্রস্তুতির প্রক্রিয়া তার সমগ্র জীবনের পরিধিতে বিদগ্ধিত, এই পরিধিপরিভ্রমের অন্তর্গত শুধু সত্যিকার আত্ম-উপলব্ধি সম্ভব। সহজ লীলার সংস্কারের সূচনাও হয় এই অস্তিম পূর্বে। শিল্প বা সাহিত্য-সাধনায় সহজ কথা সহজ স্তরে বলতে পারাটা শ্রেষ্ঠ সাক্ষ্যের নির্ণায়ক নয়; দুর্বলকে ও দুর্ভাগ্যকে সহজ ক'রে তুলতে পারাতেই বোধ হয় শিল্পকর্মের চূড়ান্ত সার্থকতা। আপাত-দুর্বল যখন অবলীলাক্রমে এসে হাতের মুঠোয় ধরা দেয়, সেই পাণ্ডাকেই বলব পরম পাণ্ডা। এই-যে চরম ও পরম

লাভ, এর আশায় নিজেকে আয়ত্ব্য কর্তার সাধনায় ব্যাপ্ত রাখবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু তেমন সর্বগ্রাসী প্রয়োজনের দাবী মেটাতে আমাদের কয়জন সাহিত্যিক প্রস্তুত আছেন? এত বড় বুঁকি নেবার মত ক্লেশ-সহনের মনোবল কয়জনার আছে?

ঠিক এই কারণেই আমাদের সাহিত্যের অধিকাংশ লেখক ছোট বহরের লেখক—তাদের না আছে জীবন-জিজ্ঞাসা, না আছে বিজ্ঞাবুদ্ধির বল। দার্শনিকতার ধার বড় কেউ একটা ধারেন না। স্বীয় মনন ও চিন্তাকে ক্রমাগত বিক্লেষণ ও সমালোচনা করে আত্মশুদ্ধির আত্মহীন চেষ্টার দ্বারা ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধন—সে পথ আমাদের অজ্ঞ নয়। আকাশের দূরবর্তী তারা থেকে পৃথিবীর যতদূর ব্যবধান, অধ্যয়নশীলতা থেকে তাঁদের অনেকেরই প্রাত্যহিক অভ্যাসের ব্যবধান তুচ্ছ। তেতো ওষুধের মত চিন্তা-প্রবণতাকে এড়িয়ে চলতে পারলে তাঁরা আর-কিছু চান না। বলা হবে রসবান্ধব সঙ্গে চিন্তাশীলতার ও প্রজ্ঞার সম্পর্ক তেমন নিগূঢ় নয়। তত্বত্বের বলব, এই ধারণাটা শুধু আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যেই বলবৎ, ইউরোপের অগ্রসর সাহিত্যগুলিতে কুজাপি এই ধারণা প্রচলিত নেই। ইউরোপীয় সাহিত্যে রস এবং দার্শনিকতার সমাহারেই শুধু কাব্য এবং সাহিত্য প্রেষ্ঠ উৎকর্ষভাৱের যোগ্যতা অর্জন করে। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যেও দেখতে পাই রস ও জ্ঞান-ভূয়িত্বের সংস্কার অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। শুধু একেবারে হাল আমলে এসেই দেখতে পাচ্ছি, আমরা সাহিত্য থেকে তত্ত্ববোধ নীতিবোধ সত্যাবোধসমূহা প্রভৃতি সদলক্ষণ-গুলিকে অবাস্তব জ্ঞানে ঝাড়ে-বংশে নিমূল করবার জন্ত উঠে-পড়ে লেগেছি। যেন তথাকথিত সৌন্দর্যচর্চাই সব, সাহিত্যের উপর আর-কিছুর কোনরূপ দাবি থাকতে নেই। সত্য ও কল্যাণ-ভাবনাবিরহিত এই অসার সৌন্দর্য্যবাদের জন্তই আজ সমকালীন বাংলা-সাহিত্যে তরল মানসিকতার এতদূর প্রসার।

তরল মানসিকতার কার্যকরী প্রমাণ দেওয়া কঠিন নয়। বহু উদীয়মান লেখকের লেখা পড়ে মুগ্ধ হই, তাঁদের গল্প-কবিতায় শক্তিমত্তার পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত বোধ করি। তারপর তাঁদের সঙ্গে ঘেঁচে আলাপ করতে গিয়ে নিরাশ হই। দেখা যায়, তাঁদের রচনায় শক্তিমত্তার যেটুকু পরিচয়

পরিষ্কৃত ততটুকুই তাঁদের শক্তির সীমা—এ শক্তি ব্যক্তিত্ব-চর্চার ফল নয়, এ শক্তি সহজাত প্রেরণার বশে পাওয়া। এবং ঠিক এই শেযোক্ত কারণে এ শক্তির আয়ত্ব্যও স্বল্প। কেন না, যে শক্তি আমরা অহুশীলনের দ্বারা লাভ করি নি, বাইবেলোক্ত অস্তরীক্ষচ্যুত মাম্মার মত প'ড়ে-পাওয়া বস্তুরূপে লাভ করেছি, তাকে আমরা দীর্ঘকাল ধারণ ক'রে রাখতে পারি না। এক সময়ে না এক সময়ে সে আমাদের মুঠি গ'লে বেরিয়ে যায়ই। শিল্পে হোক সাহিত্যে হোক অজ্ঞ যে কোন কর্মক্ষেত্রে হোক, শক্তিকে অপ্রতিবোধ্য ক'রে তুলতে হ'লে অনলস প্রেমের পথেই সে উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে—অশিক্ষিতপটুদের পথে কে কবে প্রেষ্ঠ কর্ম সম্পাদন করতে পেরেছেন?

একটা কথা এই প্রসঙ্গে সকলকে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করতে বলি। শক্তির সঞ্চয় এবং শক্তির অভিব্যক্তি কোন সময় তুল্যমূল্য হওয়া উচিত নয়। হ'লে বিপত্তি অনিবার্য। ক্ষোভের বিষয়, আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যের লেখকদের অধিকাংশেরই মানসিক গঠনের মধ্যে এ জাতীয় অপূর্ণতা দেখতে পাওয়া যায়। ফলে তাঁদের ব্যক্তিত্ব মনকে টানে না, উন্টো, আত্মীয়তাস্পৃহাকে প্রতিহত করে। রচনায় উৎকর্ষচিহ্নের যে পরিচয়টুকু আমরা পাই তা যদি সমগ্র ব্যক্তিত্বের আংশিক ফলস্বরূপ হয়, সে ক্ষেত্রেই শুধু রচয়িতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাব্যিত হয়ে উঠতে হয়। কিন্তু দুয়ের ভিতর আঙ্গিক সমীকরণের অতিরিক্ত সম্পর্ক কিছু না থাকলে মন তখনই ন'মে যায়। কোন লেখকের রচনা প'ড়ে মোটামুটি ভাল লাগে অথচ তাঁর ব্যক্তিত্ব মন তেমন আকৃষ্ট হয় না—এই আপাত-অসঙ্গতির হেতু বোধ করি এই যে, রচনার কাজ-চালানো-গোছের উৎকর্ষ-বিধানের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট লেখকের শক্তির সঞ্চয় নিঃশেষিত, তার বাড়ী পুঁজি তাঁর নেই। আমি পূর্বেই বলেছি, আত্মপ্রকাশের বিরামবিহীন প্রচেষ্টায় নিরন্তর নিয়োজিত থাকলে ব্যক্তিত্বের শুধু যে প্রসার ঘটে তাই নয়, তার গুণগত রূপান্তরও ঘটে। ব্যক্তিত্বের এই গুণগত রূপান্তরের তবুটি আমাদের ভাল জানা নেই ব'লেই বোধ হয় আমরা দৈবাহুগ্রহরূপে যে শক্তি লাভ করি তাতেই সন্তুষ্ট থাকি—সে শক্তির অহুশীলনের কথা ভাবি না।

শক্তির অস্থূলন বলতে এখানে কারখানায় উৎপন্নব্রহ্মের পরিমাণের হারে বইয়ের পর বই লেখা বোঝাচ্ছে না, বোঝাচ্ছে না প্রকাশকদের কাছ থেকে প্রেমের কড়ি আদায় করে আরাম-আচ্ছন্দ্যের উপকরণ স্তুপীকৃত করে তোলা,—পাঠকসাধারণের কাছ থেকে উত্তরোত্তর সমাদর লাভের সামর্থ্য ও ভাগ্যও এর দ্বারা বোঝাচ্ছে না; বোঝাচ্ছে ক্রমাগত আত্মবিশ্লেষণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিচার-পর্যালোচনার দ্বারা স্বীয় শিল্পী ও অশ্রুবিধ ব্যক্তিত্বকে সংশোধিত সম্বাসিত ক্রমোন্নত করে তোলা। অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মসমালোচনা এ-জাতীয় শুদ্ধিপ্রয়াসের অপরিহার্য প্রাথমিক শর্ত, আত্মপ্রসাদবোধ এ প্রয়াসের সব চাইতে বড় অন্তরায়। বক্রিমচন্দ্র-মুখ্য ঊনবিংশ শতকের লেখকদের মধ্যে এ জিনিস আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, এ শতাব্দীর পরিধির ভিতর রবীন্দ্রনাথ এ-জাতীয় আত্মোপলব্ধি-প্রয়াসের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। পাশ্চাত্য সাহিত্যে ষষ্টি টলস্টয়ের নাম এ প্রসঙ্গে স্বতঃই সব আগে মনে পড়া উচিত; এ যুগের এলিয়টের নামও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এখনকার সাহিত্যে এই ধরনের সর্বাঙ্গিক ব্যক্তিত্বচর্চার সংস্কার প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে বলে মনে হয়। ফলে সাহিত্য কতকগুলি তরল মনোভাবাপন্ন চটুলবুদ্ধি সাহিত্য-ব্যবসায়ীর মজলিশী আসরে পরিণত হয়েছে—সত্যিকার জ্ঞানী-গুণীরা এই আসরে প্রবেশ করতে স্বভাবের সঙ্কোচ বোধ করেন। মুষ্টিমেয়সংখ্যক স্বধর্মনিষ্ঠ সাহিত্যব্রতী তাঁদের স্বরচিত অভিমানের দুর্গে সদা আত্মগোপন করে আছেন, ভিড়ের দঙ্গলের মধ্যে তাঁদের মুখ কদাচ দেখা যায়।

আরও একটি কথা ব্যক্তিত্বচর্চার প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কেউ কেউ রচনার ভিতর ভাষার অনাড়ম্বরতা ও সহজ প্রবহমানতার প্রমাণ পেলে আশু উল্লসিত হয়ে ওঠেন। যেন ভাষার অনায়াস স্বচ্ছন্দতাটাই সব, ফটিকস্বচ্ছ প্রাঞ্জলতা সবসেরা জিনিস। দেখতে হবে কী জাতীয় বিষয় বা ভাবকে আশ্রয় করে ভাষা তার এই স্বচ্ছন্দ গতিবেগ তথা প্রাঞ্জলতা গুণ লাভ করেছে। রচনার উপজীব্য বিষয় যদি

তরল হয়, রচয়িতার মনোগত ভাব যদি স্বভাবতঃই অগভীর হয়, তবে রচনায় স্বচ্ছন্দতা বা প্রাঞ্জলতাগুণের অবতারণা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। এ কাজ সম্পাদনে মামুলী সাহিত্যবুদ্ধির অতিরিক্ত কিছু দরকার হয় না। সাধারণ মাপের ভাষা-কুশলতা ধারই আরম্ভ আছে তিনিই এ কাজ পারেন। কিন্তু লেখকের চরম পরীক্ষা গভীর ভাব দুরুহ ভাব বিস্তৃত ভাব অবলীলাক্রমে প্রকাশ করার সামর্থ্যে। এই মানদণ্ডেই মুখ্যতঃ লেখকের শক্তিমত্তার বিচার হওয়া উচিত, এবং এই বিচার-ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই শুধু লেখকের ব্যক্তিত্বের যথাযথ পরিমাপ হওয়া সম্ভব। গভীর ও সূক্ষ্ম চিন্তা কল্পনা অহুত্বি যিনি যত সহজে প্রকাশ করতে পারেন, বুঝতে হবে তাঁর ব্যক্তিত্বের উজ্জীবন তত অধিক মাত্রায় সংসাধিত হয়েছে। ব্যক্তিত্বকে নিরবচ্ছিন্ন অন্তর্দ্বন্দ্ব আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার বকষণে পরিষ্কৃত করতে করতে এমন এক স্তরে নিয়ে আসা যায়, যেখানে মন একবার স্থিত হ'লে অতি গভীর ভাবও লেখনীমুখে সাবলীলতামণ্ডিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। এ কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের উত্তরজীবনের রচিত সঙ্গীতের বাণী-অংশ। দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনায় গড়ে-তোলা রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের ঐশ্বর্যময় উত্তর প্রকার এই গানগুলির মাধ্যমে শীর্ষবিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছে। শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রব্যক্তিত্বের সৌরভ গানগুলির ভিতর চারিয়ে আছে। এইরূপ, যে কোন শিল্পকর্মে আমরা গভীরকে সহজ করে পেয়েছি সেখানে শিল্পীর মহত্তম ব্যক্তিত্বময় রূপ প্রকটিত হয়েছে। শিল্পীর ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ রূপের মুখোমুখি হওয়া দেবতা-সন্দর্শনের মত বিরল ভাগ্যের স্ফোতক। মুষ্টিমেয় দুই-চারিজন লেখকের ব্যতিক্রম-দৃষ্টান্ত বাদ দিলে আমাদের সাহিত্যে ব্যক্তিত্বচর্চার সংস্কার ও অভ্যাস লোপ পেতে বসেছে। ফলে সাধারণ ভাগ্যের উপর বরাত দিয়ে মোটামুটি অবস্থায় তৃপ্ত থাকাকাটাই আমাদের বিধিলিপি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলা-সাহিত্যে বক্রিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের যুগের পর নতুন করে শুভলয়ের আবির্ভাব হতে বোধ হয় এখনও অনেক বিলম্ব।

শ্রীঅন্নবিন্দের বন্ধিমচন্দ্র

অনুবাদ—গণপতি ভট্টাচার্য

৬

বাংলার জন্য বন্ধিম কি করেছেন

ইতিপূর্বে বন্ধিমের কীর্তির কথা কেবল সাহিত্যের দিক থেকেই বলেছি। এবার বলতে চাই তার ঐতিহাসিক মূল্যের কথা, বাংলা ভাষার উপর ও বাঙালী জাতির উপর তা কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে সেই কথা। সে কথা বলতে গেলে একটু অতিপ্রশস্তির ভাষা প্রয়োগ করা ছাড়া কোন গতাস্বর নেই। এর আগে একবার আমি বলেছি যে, বর্তমান বাংলা ভাষাকে তিনিই নতুন রূপ দিয়ে সৃষ্টি করে গেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে যদি মধুসূদন দত্তের নামটাও এখানে জুড়ে দেওয়া হয় তাতে কোন অতিশয়োক্তি হয় না। এঁদের দুজনের আবির্ভাব হবার আগে বাংলা ভাষার সুরটি যদিও মধুর এবং মনোরম ছিল, কিন্তু তা ছিল যেন একতারা স্বরের একটানা সুরের মত। শুধু প্রাচীন কবি ভারতচন্দ্র ছাড়া অন্য কোন প্রতিভাশালী ওস্তাদ এ স্বর নিয়ে বেশী নাড়াচাড়া করেন নি; গল্প-সাহিত্যের মধ্যে কেবল বেতালপঞ্চবিশতি ও বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যান ছাড়া বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ছিল না, আর বাংলা কাব্যশিল্পের মধ্যে সেই একটানা মাধুর্যসহ ছাড়া আর বিশেষ কিছুই মিলত না। পৌরুষের দৃঢ়তা, স্বচ্ছতা, প্রসারতা, বিচিত্রতা—এ সব কিছুই তার মধ্যে মিলত না। তার পরে দেখা দিলেন মধুসূদন ও বন্ধিম, গ্রীক প্রবাদে দেবতা টারপেণ্ডার ও আর্কিমিডিসের মত, অবতীর্ণ হয়ে। তাঁরা সেই একতারা স্বরটিতে নতুন নতুন তন্ত্রী বাধলেন। যে ভাষা ছিল এককালে ছয়ে-পড়া ধরনের নারীভাষা, মধুসূদনের হাতে তাই হয়ে উঠল এক তেজোদ্রুপ্ত দেবভাষা, তাই হ'ল বীরব্যঙ্গক মহাকাব্যের ভাষা, যাকে মাধ্যম করে দুর্দাম বাড়ঝাড়া ও নিজেদের বস্তব্যগুলি বঙ্কনিমাদে ব'লে যেতে পারে; সমুদ্রগর্জনের অলুকাবরণে এই ভাষাতেই তিনি তাঁর পরমাশ্চর্য বাকবিশ্বাস করে সকলকে চমৎকৃত করতে থাকলেন। সেই বাংলা ভাষাকে এক অপূর্ব গরিমময় রূপ দিয়ে তিনি মানব-অস্তরের তীব্র জ্বালাময় আবেগরাজিকেও সম্পূর্ণ সার্থকতার সঙ্গে চিত্রিত করে দেখিয়ে দিলেন। মিলটনের শয়তানের

মুখে যেমন তেজোগর্ভ বচনবিস্তার শোনা গেছে, সেই রকমই সতেজ ও সবল বচনবিস্তার মধুসূদনের কাব্যের ছত্রে দেখা যেতে লাগল। কিন্তু তার পরে বন্ধিমের হাতে সেই আগেকার অক্ষুট ও দুর্বল ভাষা গম্ভীর হ'ল সতেজ, সমৃদ্ধ, অপূর্ব গীতিমুখর ও নমনীয়, আর হ'ল মায়ুষের সব কিছু কোমল বৃত্তির এবং সুন্দর কিংবা মহৎ ভাবধারা প্রকাশের উপযোগী। এখানে অবশ্য আমি এমন কথা বলতে চাইছি না যে, বন্ধিম ও মধুসূদনের পূর্ববর্তীগণ এই সকল ক্ষেত্রে কোন কিছুই করেন নি। দেবতারা যে পথে চলবেন সে পথের প্রথম সূচনা আগে থেকেই করা হয়ে থাকে, জমিটা আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে থাকে। অনেক বড় বড় গুণী ব্যক্তি আগে থেকেই এ বিষয়ে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের যথেষ্ট উচ্চ আদর্শ থাকলেও তা এই ভাষার মাধ্যমে ততটা সফল হতে পারে নি। রামমোহন রায়, চিরস্মরণীয় বিভাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ও বাঙালী নাট্যকারগণ সকলেই দেশের সাহিত্য নিয়ে উচ্চ আদর্শের পথে চলতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিভাসাগর যতই জ্ঞানী ও স্বন্দর্শী হোন, তিনি শিল্পী ছিলেন না; অক্ষয়কুমার দত্ত যা কিছু লিখতেন তা কেবল তাঁর সাময়িক পত্রিকার পাঠকদের কাছেই আদর পেত; বাকি সকলের প্রকৃত সাহিত্যিক মৌলিকতা বিশেষ কিছু ছিল না। ভাষাকে প্রাণ দিতে ও তার রূপান্তর আনতে হ'লে যাদুকরের মত একটা যে সহজাত শক্তি থাকা দরকার সেই শক্তি এঁদের মধ্যে কারুরই ছিল না।

বন্ধিমের এমন এক বিশিষ্ট প্রতিভা ছিল যার জোরে তিনি বাংলা দেশের প্রাদেশিক বুলিকে এক জগৎবরণ্য ভাষায় পরিণত করতে পেরেছিলেন। ইংরেজী শিক্ষার ফলে লোকের মনে এমন একটা ধারণা এসে গিয়েছিল যে ইংরেজীর সব কিছুই ভাল, বাংলার সব কিছুই খারাপ। বাংলা ভাষা অতি নগণ্য ব'লে ভদ্র সমাজে তার ব্যবহারই তেমন রইল না; এমন কি স্বয়ং মধুসূদনও তাঁর প্রথম বয়সে এই ভাষাকে তাজিল্য করে বর্জন করেছিলেন। সেই ভ্রান্ত

আদর্শের যুগে দেশগতপ্রাণ বিভাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি কয়েকজন মাত্রই এই ভাষাকে যথোপযুক্ত সম্মান দিতে চেষ্টা করতেন। সেই অবস্থায় মধুসূদন প্রথম যখন তাঁর 'শরিত্তা' ও 'তিলোত্তমা' নামক অসাধারণ দুখানি কাব্যগ্রন্থ লিখলেন তখন দেশে এমন এক সাড়া পড়ে গেল, যার সঙ্গে তুলনা করা যায় এলিজাবেথীয় যুগের ইংলণ্ডে মার্গো কর্তৃক রচিত 'Tamburlaine' নামক নাটকটি প্রকাশিত হওয়াতে ও উনবিংশ শতাব্দীর ফ্রান্সে হিউগো কর্তৃক রচিত 'Hernani' নামক নাটকটি প্রকাশিত হওয়াতে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয় তারই সঙ্গে। ভাষার ঐশ্বর্যে, ভাবের সৌন্দর্যে ও বর্ণনার চমৎকারিত্বে ওই দুটি কাব্য দেশের মানুষের কল্পনাকে ছাপিয়ে গেল; বাংলায় অকস্মাৎ অমিত্রাক্ষর ছন্দের আবিষ্কার করে তিনি বাংলা কাব্যকে পূর্বকার পম্যাদি ছন্দের বাঁধা নিগড় হতে মুক্তিদান করলেন; বাংলা ভাষাতে তিনি স্বর্গ রকমের বাক্যবিভাগ ও ভাববিভাগের এমন এক স্নন্দর পস্থা দেখিয়ে দিলেন, আর তাতে এমন উজ্জ্বল 'জ্যোতির্ময় ও সুসমাময় সঙ্গীতের সৃষ্টি হতে থাকল যে সংস্কৃতভাষিমাত্রী পণ্ডিতগণের আড়ষ্ট অভিজাত্য তার কাছে মান হয়ে যেতে বসল। তাঁর কাব্যে প্রথম বেজে উঠল এমন এক অভূতপূর্ব সৌন্দর্য-স্বৈরিতার ধনি যা আমাদের বর্তমান সাহিত্যে এখনও প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। সংস্কৃত ভাষার যে বিশেষ রকমের কমতা আছে তা এই বাংলা ভাষার মধ্যেও সম্ভব হতে থাকল,—তা এই যে এর মাধ্যমে অনেক কিছুই গড়ে তোলা যেতে পারে, তেমন মৌলিক প্রতিভার হাতে পড়লে এর ভিতর দিয়ে অনেক আশ্চর্য রত্নভাণ্ডার খুলে যেতে পারে; মধুসূদনের হাতেও তাই হতে দেখা গেল। তাঁর হাতে ঐতিমধুর ও বঙ্গীয়ময় কাব্যের এমন উৎসাহারা প্রবাহিত হতে থাকল যা প্রত্যেকের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে বাঙালী জাতিকে আগের চেয়ে অনেক বেশী বীর্যসম্পন্ন ও উন্নতমনা করে তুলল। অবশ্য তাঁর রচনাগুলিকে যথেষ্ট বিরোধেরও সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এক দিকে যদিও তা প্রগতিকামী ব্যক্তিদের কাছে আদর পাচ্ছিল, কিন্তু অন্যদিকে তেমনি প্রাচীনপন্থী বিভাভিমাত্রীদের কাছে রীতিমত অভিশপ্ত হতে থাকল। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা ও গোঁড়া মতের লোকেরা

তো বটেই, এমন কি স্বয়ং বিভাসাগর পর্যন্ত এই কাব্যগুলি প্রথম পড়ে বিশ্বয়ে শিউরে উঠেছিলেন। 'তিলোত্তমা' কাব্যে দেখা গেল যে, একালের নতুন আবেগময় সাহিত্য যেন সেকালের গুরুগম্ভীর অভিজাত সাহিত্যের সঙ্গে টেকা দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে; বলা বাহুল্য নতুন সাহিত্যেরই জয় হ'ল; এর সপক্ষে ছিল যৌবনের উদ্দীপনা, ছিল নবীন তেজ, আর ছিল এক অতুলনীয় প্রতিভা। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় 'যুদ্ধং দেহি' বলে প্রথমে নামল 'তিলোত্তমা', পরে 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্যটি প্রকাশ হয়ে একেবারে 'ওস্তানের মার' দিয়ে দিলে। স্বয়ং বিভাসাগর যখন 'মেঘনাদবধ' সম্বন্ধে রায় দিলেন যে, এ এক চূড়ান্ত কাব্য, তখন সংস্কৃত পণ্ডিতের দল একেবারে চূপ করে গেল। মধুসূদনের বেলায় যে সকল কুচক্রী পণ্ডিতদের দল তারপরে নিশ্চয় রটনা করেছিল, বন্ধিমের লেখার বেলায় তারা একটু আধটু ক্রৌণ প্রতিবাদ জানানো ছাড়া আর কিছুই করতে সাহস করলে না; দেশের লোকের মন তখন আর তাদের কথা গ্রাহ্য করে না। কিন্তু তবু সেই নতুন বিজ্ঞতার গুণগ্রাহী হতে পেরেছিল কেবল অল্পসংখ্যক ব্যক্তি, অর্থাৎ যাদের 'কিছু কিছু' মৌলিকত্ব আছে, যারা সত্যিকার শিক্ষিত নরনারী, আর যারা উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত জমিদার বা ধনী ব্যক্তি, রাজা ধর্মীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মত লোক, শিক্ষাদীক্ষা ও মনের প্রসারতার দিক দিয়ে যারা সাধারণের উপরে,—তেমন মানুষ তখনকার দিনে বাংলা দেশে কম ছিল না, কিন্তু এখন আর প্রায় দেখাই যায় না। যাই হোক, অত বড় একজন মহাকবি যখন মারা গেলেন তখন তাঁর ভক্তের সংখ্যা খুবই কম, খ্যাতিটাও সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

নবগঠিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে মধুসূদন ওইরূপ সংগ্রামের পরে যে শাস্তির অবস্থা এনে দিয়ে গেলেন, বঙ্গিম তখন সেই ক্ষেত্রে সেই কাজে এসে অবতীর্ণ হলেন। বস্তুতঃ নতুন বাংলা ভাষার এই দুই সৃষ্টিকর্তার মধ্যে আশ্চর্য একটা প্রভেদ রয়েছে, কর্মটা যদিও দুজনের একই জাতীয় কিন্তু কর্মফলের ভাগ্য পরস্পরের একেবারে বিভিন্ন। দুজনেরই বিভাশিক্ষা হয়েছিল যথেষ্ট, প্রতিভাও ছিল মৌলিক ধরনের, শিল্পসৃষ্টির শক্তিটাও ছিল অসীম, সৌন্দর্যবোধ ও রস-বিকাশের দক্ষতা ছিল প্রচুর; এই সকল দুর্বল গুণের

অধিকারী হয়ে প্রথমে দুজনেই ভুল পথে পা দিয়েছিলেন। কিন্তু এই পর্যন্তই দুজনের মধ্যে মিল দেখা যায়, তার পরে আর মিল নেই। একজন হলেন গদ্যসাহিত্যের স্রষ্টা, একজন হলেন কাব্যসাহিত্যের; দুজনের জীবনচরিতেও বিস্তর প্রভেদ। মধুসূদন হলেন ধ্বনিসম্পদে ও ভাবসম্পদে উজ্জ্বলিত, হৃদয়বেগের প্রাবল্যে ফেনাযুক্ত, চরিত্রে উজ্জ্বল, অপব্যয়ী, অমিতাচারী, অসংযমী, আর শোকে দুঃখে নানা দুর্ভোগে ভুগে তাঁর জীবনদীপ অকালে নির্বাণিত হল। যিনি একজন অস্বস্তির মত মানুষ ছিলেন, তাঁর ঝটিকাবহুল জীবনের বিবরণগুলি পড়তে পড়তে মনে হয় যেন শেক্সপীয়ারের রাজা লিয়ারের জীবননাট্যের বজ্রবাত্য-বিস্তৃত মর্যাদিক দৃষ্টান্ত পুনরভিনয় শুনিছি, কিংবা থুসিডিডিস বা গিবনের রচিত ইতিহাসের সেই করুণ কাহিনী পড়ছি যাতে প্রাচীন কালের এক এক দুর্ধর্ষ জাতির বা প্রবল পরাক্রান্ত রাজার মারাত্মক পতনের হৃদয়ভেদী বর্ণনা বিশদভাবে চিত্রিত হয়েছে। হৃদয় যার-আছে সে রীতিমত বিচলিত না হয়ে মধুসূদনের এই জীবনকাহিনী পড়তে পারে না। এক হিসাবে তাঁকে শ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যেও সর্বশ্রেষ্ঠ বলতে হয়, কিন্তু শুধু বাংলা দেশ ও পাক্সাব ছাড়া তাঁর লেখা আর কোন দেশে পড়াই হয় না; এমন কি তাঁরই মাতৃভূমির অন্তর্গত বোম্বাই বা মাদ্রাজ প্রদেশে কেউ তাঁর নাম পর্যন্ত শোনে-নি। বঙ্কিমের জীবনের ইতিহাস কিন্তু এর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। চরিত্রের মধ্যে যথেষ্ট দৃঢ়তা থাকলেও প্রকৃতিতে তিনি বরাবরই ছিলেন নম্র, সংযত, শাস্ত; আর ভোগপ্রিয় ও আনন্দপ্রিয় হ'লেও কোনদিন অমিতাচারী ছিলেন না। ভাগ্যদেবীর বরপুত্র হওয়াতে কোনদিন তাঁকে বিশেষ বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় নি। গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরাসের আদর্শমুখ্যায়ী যে পরিতোষ ও সুপক পরিপত্তি জীবনে দেবতাদেরও কাম্য এবং যা থেকে তাঁরা সুপথগামী মানুষদেরও কখনো বঞ্চিত করেন না, তার সব কিছুই তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল। একটা স্থির প্রশান্ত ও পরিপক পরিপত্তিতে গিয়ে তিনি পৌছে-

ছিলেন। যদিও শেষ জীবনে তাঁকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে, কিন্তু মৃত্যুর আগে তাঁর মহৎ প্রচেষ্টার সাফল্য তিনি দেখে গেছেন। কল্লোলকের মাধুর্য বিতরণ করে, চিন্তারাজ্যে আগরণ এনে দিয়ে, আর দেশবাসীকে তাদের দেশমাতার মহিমময়ী মূর্তি দেখিয়ে হৃদয়ে তাদের প্রেম ও আবেগের বজ্রা বইয়ে দিয়ে যে জাতিকে তিনি প্রকৃত এক জাতি হিসাবে গড়ে তোলবার ক্ষমতা জীবনপণ করেছিলেন, সে জাতি তাঁর মৃত্যুকালে প্রচুর শোকাঙ্গপাত করেছিল।

বঙ্কিমের প্রভাব দেশের চারিদিকে ছেয়ে আছে, এখনও সে প্রভাব উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। তার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, একজন মারাঠী কিংবা গুজরাটী যদি একটা প্রয়োজনীয় কথা বলতে চায় তা হ'লে সাধারণতঃ সে তা ইংরেজীতেই বলে, কিন্তু বাঙালী বলে বাংলা ভাষায়। এ ব্যাপারের মধ্যে গভীর তাৎপর্য রয়েছে। কেবল সাহিত্যসৃষ্টি ছাড়া অন্ত সকল বিষয়ে ইংরেজী ভাষার প্রচলনই সর্বত্র ছিল, কিন্তু এখন কেবল রাজনীতির সম্পর্কে কিছু বলা ও সংবাদপত্রে লেখা ছাড়া অন্ত সব ক্ষেত্র থেকে ইংরেজী ভাষাকে ক্রমশ বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে। অতঃপর একদিন আমাদের কথোপকথনের ভিতর থেকে ইংরেজীকে একেবারে ছেঁটে দেওয়া হবে। শুনতে পাই যে, কালীপ্রসন্ন ঘোষ এই নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন। যাই হোক, আমাদের এই গদ্যসাহিত্যের স্রষ্টা সেই পথই স্বগম করে দিয়েছেন। মাত্র কিছুকাল আগেও কালী-প্রসন্নবাবুর মত মন নিয়ে কেউ ওরূপ চেষ্টা করতেই যেতেন না, ইংরেজী ভাষা ছেড়ে বাংলা ভাষায় কিছু লেখাকে তিনিও একটা অগৌরব বলে মনে করতেন। কিন্তু এখন তাঁর এই কাজ দেখে বোঝা যায় যে, আমাদের দেশের সাহিত্যরসিক ব্যক্তির নতুন বিপ্লবের পথ খোলা পেয়ে এখন সেই পথেই চলতে শুরু করেছেন, আর বাঙালীরা এমন এক উন্নতির অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যাতে এর থেকেই তারা জগতের এক বিশিষ্ট জাতি বলে পরিগণিত হতে পারবে।

সংবাদ-সাহিত্য

গো

পালদার মতি (স্ব অথবা দুঃ) বৃত্তিতে পারি এমন বুদ্ধি ধরি না, তাই তাঁহার বিচিত্র নির্দেশে মাঝে মাঝে ভারি বিপন্ন হইয়া পড়ি। গোয়ায় যখন মরণ এবং মারণ যজ্ঞ চলিতেছে, সারা উত্তর-ভারত জুড়িয়া মানুষ যখন ঘোর বিপন্ন, রাজ্য-কমিশনের ঘোষণা যখন আসন্নপ্রায়, অস্ত্র সর্ববিধ পথে ব্যাহত হইয়া ভারতের ক্রেমলিন যখন মুহুমূহ “ষ্টাইক”র মশাল জ্বালাইয়া দেশের শান্তি ও সম্পদের রোশনাই করিতে উদ্ভত, ঠিক সেই সময়ে তিনি গোয়ার প্রত্যক্ষদেশ হইতে—কারণ নাই, যুক্তি নাই—বিনোবাজীর এক প্রশস্তি পাঠাইয়া তাহা প্রচার করিবার নির্দেশ দিয়াছেন, এবং গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণাংশের বঙ্গানুবাদ করিয়া তাহার ইংরেজী অনুবাদ সহ শ্রীজগদ্বলাল নেহরুর অবগতির জ্ঞাত তাঁহার নিকট পাঠাইতে বলিয়াছেন। বঙ্গানুবাদ ‘শনিবারের চিঠি’তেও ছাপাইতে হইবে। এইরূপ খামখেয়ালী ওস্তাদের সাক্ষরদি বঙ্গায় রাখা যে কি পরিমাণ দুর্ব্বহ, সহৃদয় ব্যক্তিমাঝেই বৃষিবেন। তাঁহার পক্ষে গোয়া সম্বন্ধে একটি মাত্র বাক্য আছে, তাহা এই—

“ভারতের গোয়া-রক্তমুখে ইয়াক্কি-ইংরেজ-ইসলামের (পাকি) সম্মিলিত মূল উদ্ভূত হইয়া আছে এবং দেশের অভ্যন্তরে লোহা লাল থাকিতে থাকিতে ষ্টাইক-তৎপর হুশমনের অভাব নাই। কাজেই বিচলিত হইয়া যাহাতে ফাঁদে না পড়েন তজ্জ্ঞ শ্রীজগদ্বলালকে সাবধান করিতেছি।”

প্রথমটা ভাবিয়াছিলাম, গোপালদার ছেলেমানুষিয় প্রজ্ঞয় দিব না; কারণ আমেরিকা-ইংলণ্ডের মনোভাব বৃষিবার মত আন্তর্জাতিক জ্ঞান না থাকিলেও গোয়া-ব্যাপারে পাকিস্তান যে ভারতের বিপক্ষে দাঁড়াইবে না সে সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় ছিলাম। কাজেই গোপালদা পাকিস্তানের নামোল্লেখ করিতে তাঁহার প্রতি প্রত্যয় টলমল করিতেছিল। হঠাৎ ৩০ আগস্ট তারিখের ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র সম্পাদকীয় স্তম্ভে দেখিলাম গোয়া-প্রত্যাগত একজন সত্যাগ্রহী ঘোষণা করিয়াছেন,

পাঁচ শত পাকিস্তানী সৈন্য বর্তমানে গোয়ায় মোতায়েন আছে। ইহার পর গোপালদার নির্দেশ অমাত্র্য করিতে সাহস হইতেছে না। গোপালদা তাঁহার হুকুমনামায় সর্বপ্রাে বিনোবাজীর এই প্রশস্তি করিয়াছেন—

“বিনোবাজী পদব্রজে ভারতভূমি পরিক্রম করিয়া চলিয়াছেন, ইহার মধ্যে আমি এক মহাকাব্যিক মহিমা দেখিতে পাই। দেখিতে পাই ভারতবর্ষের বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, চৈতন্যদেব, বিবেকানন্দ ও গান্ধীর উত্তরসারক তিনি; একই বিরাট মহাকাব্যের সর্বশেষ নায়ক।

“তিনি চলিয়াছেন—ব্যক্তিগত ইষ্টের সন্ধানে নয়, দুঃস্থ পীড়িত নিপীড়িত আর্ত মানবের কল্যাণসাধনে। মানুষ স্বভাবতঃই অজ্ঞান অবোধ লাস্ত্র বিভ্রান্ত হইলেও তাহার পরম-হিতকারী স্বার্থলেশহীন মহত্তর মানুষকে যে দেখিলেই আপন বলিয়া চিনিতে পারে—বিনোবাজীর পরিক্রমায় এই সত্যটাই প্রত্যক্ষ করিলাম। জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার অকুণ্ঠ প্রকাশ দেখিয়া অনুভব করিলাম তাহার যেন কবি গোবিন্দদাসের কথায় বলিতে চাহিতেছে—

‘গীহা পহ’ অরুণচরণে চলি যাত।

তাঁহা তাঁহা ধরনী হইয়ে মন্থ গাত।’

“আড়াই হাজার বছরের অল্প যবনিকা আমার চোখের সম্মুখে উদঘাটিত হইয়া গেল। স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম—

জরামরণের ভরতীত রাজপুত্র বেগিন রাতে
কম্পিত পদে বাহিরিল একা পথে,
কেহ নাহি জানে, মোরা মাটি-তৃণ সেই ইতিহাস জানি।
রাজপুত্রের কঠোর সাধনা দ্বির বোধিক্রমন্তলে—
তপস্তা-শেষে উঠিল অমৃত, অমৃতভাণ্ড হাতে
পীড়িতে ব্যথিতে মহাভিক্রুর চির-আখাস দান,
ভাণ্ড হইতে করছে অমৃত আমরা করেছি পান।
মহাবুদ্ধের বিজয়কাহিনী মাটি ও তৃণের বৃক্ষে
পথের চিহ্নে ঝাঁকা হয়ে আছে পৃথিবীর বুক জুড়ি।

“আমরা মহাভাগ্যবান। আমাদেরই কালে সেই মহা নাটকের পুনরাবৃত্তি দেখিলাম। তপস্তার শেষে সকল মানুষের অস্ত্র নিরাসক্তভিক্ষু সাক্ষিরা বিনোবাজী চলিয়াছেন—ভূমিহীনকে ভূমি দিবেন কিংবা অস্বহীনকে অস্ত্র দিবেন,

সে বিচার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবীরা করুক। সাধারণ মানুষ আজ এই আশাসেই ধস্ত যে, প্রভু তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই, তাঁহার করুণাবিগলিত দৃষ্টি তাহাদের দিকেই নিবদ্ধ আছে, তাঁহার কল্যাণহস্ত তাহাদের কারণেই প্রসারিত।

“মুণ্ডিতমস্তক, হৃৎপাথর পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দের কথাও মনে পড়ে। মনে হয়

আসন্ন হিমালয় সমস্ত ভারত যোগে
বেন শব্দেই একখান
রক্তের চরণস্পর্শে কঙ্কাল উঠিবে কেঁপে,
তাই কি রক্তের অভিশাপ ?
নয়গড়ে নয়গায় বেন আঙনের শিখা
জ্বালালে ছুইয়া গেল মেহে;
ভারতের মুক্তিকার সে লাহুনা বিতীবিকা
অমৃত্যু করি নিজ দেহে
নয়মে উথলে অঙ্গ, অগ্নিহালা বুক জ্বলে—
শব্দসুখে শিবেয় ক্রন্দন,
ওপার মুহুরা বার গারে-বস্ত গধ চল
প্রিয় হয় এ গারের জন।

“বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ হইয়াছে, কিন্তু শরণাগতদের জন্য ‘শরণং গচ্ছামি’ মন্ত্র রহিয়া গিয়াছে; শব্দ নাই, কিন্তু তাঁহার ‘সোহম্’ মন্ত্র আছে; চৈতন্যম্বে নাই, তাঁহার ‘জীবে দয়া নামে রুচি’ মন্ত্র আছে; বিবেকানন্দ নাই, তাঁহার ‘বহুধূমে সমুখে তোমার’ মন্ত্র আছে; গান্ধী নাই, তাঁহার ‘আমার জীবনই আমার বাণী’ মন্ত্র আছে। বিনোবাও থাকিবেন না, কিন্তু তাঁহার ‘সমাজায় ইদম্ ন মম’ মন্ত্র অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

“ভারতের এই সঙ্কটকালে সর্বত্যাগী বিনোবাজীকে ব্যাকুল ভাবে স্মরণ করিতেছি।”

গোপালদার মতলব পরিষ্কার বুঝিলাম না; তিনি কি পোয়াসমস্তা সমাধানে একা বিনোবাজীকে পাঠাইবার ইচ্ছিত করিতেছেন? কে জানে!

স্থিতপ্রজ্ঞ বিষয়ক গোপালদার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ ইহা এতই সর্বজন-পরিচিত যে

দুঃখেতে বিনি উদ্বেগহীন হুঁধে নাই পুহা বীর
বিসত হয়েছে রাগভয়ক্রোধে তাঁহারে নমস্কার।

...
...
...
বিষয়চিন্তাকারী পুরুষের বিষয়াসক্তি হয়,
আসক্তি হতে জন্মে কামনা, কামে ক্রোধ উপজয়,
ক্রোধে সম্মোহ, সম্মোহ হতে স্মৃতিবিভ্রম—পরে
বুদ্ধিলপ্ত হয়ে সে পুরুষ বিনষ্ট হয়ে মরে।

এই সকল মহাবাক্য মূলেই সকলের অধিগত আছে এবং বিখ্যাত গীতা-প্রচারক এফ. টি. ব্রুক্স (F. T. Brooks) যখন প্রচার করিয়াছেন (১৯১০ খ্রি:) যে, ১৯০১ মে হইতে ১৯০৪ জুন পর্যন্ত তিনি জওহরলালের গৃহশিক্ষক থাকাকালে উভয়ে একত্র গীতা অহুশীলন করিয়াছিলেন, তখন জওহরলালেরও ইহা অবিরত নাই। বৃত্তিতেছি বর্তমান অবস্থায় গোপালদা একমাত্র জওহরলালকেই স্থিত-প্রজ্ঞ হইয়া সঙ্কট উত্তীর্ণ হইতে বলিতেছেন। ইহাতে আমাদেরও সম্পূর্ণ সমর্থন আছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

ছরতাল, ধর্মঘট, ষ্ট্রাইক—যে নামই দেওয়া হউক—এ দেশে তাহার পরিণাম ভয়াবহ। কলিকাতায় আমরা বার বার ইহা দেখিয়াছি। ট্রান্স-কর্মচারীদের প্রতি সহায়ভূতি, শিক্ষকদের প্রতি সহায়ভূতি, উদ্বাস্তুদের প্রতি সহায়ভূতি সকলেরই শেষ পরিণাম অবাধ গুণ্ডামি, সাধারণের নিত্য-ব্যবহার্য সরকারী অর্থাৎ সাধারণেরই সম্পত্তির বিনাশ। জনসাধারণের শক্তি বা ইচ্ছা নাই সমবেতভাবে ইহার প্রতিরোধ করে, নিষ্পৃহ দর্শক সাজিয়া তাহারা বরং গুণ্ডামির সমর্থনই করে; পুলিশ কাঁহুনে বোমা এবং একান্ত বেগতিক বুঝিলে গুলি ছুঁড়িয়া এই গুণ্ডামি প্রশমিত করিতে চাহিলে সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং তৎসহ কয়েকটি চিন্তাশৈলীহীন দৈনিক পত্রিকা এমনই হুলা ওলু করে যে, মনে হয় গবর্মেণ্টের পতন না হইলে তাহারা নিরস্ত হইবে না। গোয়ার ভারতভূক্তি দাবি করিয়া একদল সত্যপ্রিয় সীমান্ত অতিক্রম করিয়া লাঠি ও গুলির আঘাতে মৃত ও মৃতপ্রায় হইল—ঘটনা শোচনীয় হইলেও দেশের পক্ষে ইহা গর্বের কথা; কিন্তু এই আত্মাহুতিকে কেন্দ্র করিয়া গত ১৬ই আগস্ট বোম্বাই শহরে যে উচ্ছ্বাস ও অরাজকতা দেখা দিল তাহার তুলনা নাই।

সৌভাগ্যের বিষয় কলিকাতায় প্রাদেশিক কংগ্রেস ওই দিনটিকে শোকদিবস ঘোষণা করিয়া অল্পরূপ সঙ্কটের হাত হইতে শহরকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বোম্বাইয়ের ঘটনা হইতে আজও যদি আমাদের চৈতন্য না হয়, তাহা হইলে আমরাগিকে কতকগুলি রাজনৈতিক শয়তানের চক্রান্তে বারম্বার বিপন্ন হইতে হইবে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বোম্বাইয়ের বিবরণ এই কারণে উদ্ধৃত করিতেছি যে, জনসাধারণ অল্পধাবন করিতে পারিবে মুষ্টিমেয় কয়েকজন গুপ্তার ভয়ে নিজস্ব থাকিলে ত্রিশ লক্ষ নাগরিক সহ একটা নগরের কাজকর্ম ব্যবসাবাণিজ্য বারম্বার বন্ধ হইয়া দেশের সমূহ ক্ষতি হওয়া অসম্ভব নয়। বিবরণটি এই—

“নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের উপর পতঙ্গীদের গুলিচালনার প্রতিবাদে— ১৬ই আগস্ট বন্ধে শহরে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছিল তা অস্বাভাবিক ও অতুতপূর্ণ। বেঙ্গল হস্তাঙ্গ শেখ পর্বত গিয়ে ধাঁড়াল সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ জানানো ও জোর করে ধর্মঘট করানো। মৃত ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান ও শোক প্রকাশ করা বা গুলিচালনার প্রতিবাদ করা পরিণত হ'ল নিজেদের ক্ষতি করার অসামান্য আদর্শ। চরমার হ'ল অটোমটিকার ও বাসের দরজা জামলা, ভাঙা হ'ল দোকান ঘরের কাচ, অগ্নিস্রব করা হ'ল বিভিন্ন উপায়ে জনসাধারণকে। সত্যাগ্রহীরা বা দুঃস্থ তুলে ধরেছিল এ হ'ল ঠিক তার বিপরীত। সবাই দেখল চোখের সম্মুখে এই অসামান্যতা, কিন্তু তেমন ভাবে প্রতিবাদ করার নাহস গুলিচালনা করায়ই হয় মি বিভিন্ন কারণে।”—‘আনন্দবাজার পত্রিকা’, ৩০ আগস্ট

বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে যাহা বীরত্ব বলিয়া বিবেচিত হইত, স্বদেশী শাসনের আওতার তাহাই যে ঘোরতর কাপুরুষতা—এই বোধ সাধারণ মানুষের মধ্যে জাগ্রত করার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। বৈদেশিক পতাকাকে যাহারা দেশের জাতীয় পতাকার উপরে সম্মান দেয় দেশের সম্পত্তির ধ্বংস সাধনে এবং দেশের নিরীহ মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দেওয়ার তাহাদের লজ্জা বা অত্যাচার হয় না, বরং ইহাতে তাহারা পৈশাচিক আনন্দ বোধ করে। দেশের লোক কবে বুঝিবে, এই পৈশাচিকতা দূচহস্তে দমন করিবার সময় হইয়াছে।

প্রতি দুই বৎসর ধরিয়া উত্তর-ভারতে এত বড়া কেন ? জানী স্বমিরা বলেন, মানুষ গাপ বা অজ্ঞান না করিলে প্রকৃতি কখনই তাহার প্রতি বিরূপ হন না। বিহার ভূমিকম্পের বেলা মহাআত্মী আমাদের অস্পৃশ্যতা-পাপের

দিকে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। তেনজিং এবং হিলারি সত্যসত্যই হিমালয়ের শীর্ষদেশে আরোহণ করিয়াছিলেন কি না ইহা লইয়া অনেকের মনেই সংশয় ছিল ; কিন্তু উত্তর-ভারতে উপযুপরি দুই বৎসর বড়ার প্রকোপ দেখিয়া তাঁহাদের সম্মেহ নিরসন হইয়াছে। শাস্ত্রজ্ঞ ধার্মিক ব্যক্তির বলিতেছেন, মাধব জাতীয় ও বিজাতীয় পদাঘাতে অপমানস্কন্ধ নগাধিরাজ সেই হইতে অবিরত ক্রন্দন করিতেছেন। তাহার ফল এই বড়া। তাঁহার বলিতেছেন, বাঁধ বাঁধিয়া বা অস্ত্র উপায়ে ইহার প্রতিকার হইবে না। মাননীয় গুরুজনের মাধব পদাঘাত-পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত-বিধান স্মৃতিশাস্ত্রে আছে, অচিরে তাহা পালন করিতে হইবে। আশা করি, ভারত সরকার শাস্ত্রবাক্য বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা স্বাধীন ভারতে যে আবার পূর্ণোন্মেষে ফিরিয়া আসিতেছে তাহার প্রমাণ পাইতেছি—রাজস্থান ও পশ্চিম-ভারতের কোনও কোনও স্থানে সতী-দাহের পুণ্য মহিমা পুনঃপ্রচারিত হইতে দেখিয়া। রাম-মোহন রায় বুধাই এত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সংবাদ-পত্রে দেখিতেছি, সতীদাহদর্শনে পুণ্যলোভীরা বাধাধানকারী পুলিশকে পর্বস্ত এক স্থানে হত্যা করিয়াছে। সতীর কি হইয়াছে সংবাদপত্রে তাহার প্রকাশ নাই। জওহরলাল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়িতে চাহিলে, মেয়েদের পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ অথবা বিবাহবিচ্ছেদের স্বাধীনতা দিতে চাহিলে কি হইবে, নেংটা সন্ন্যাসীরা যতদিন চিমটা বাজাইয়া ভারতবর্ষে রাজত্ব করিবেন ততদিন পুণ্য ভারতভূমির ধর্মের মার নাই। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর যেখানে প্রবল প্রসার, সেখানেই চার্চকে ঠেকানো গেল না, এ তো ভারতবর্ষ!

পশ্চিমবঙ্গ-প্রদেশ-কংগ্রেস গুণীজনের সঙ্ঘর্ষনা করিয়া স্বাধীন ভারতে যে সন্দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন, আশা করা যায় ভারতের অন্যান্য প্রদেশে তাহা শীঘ্রই অঙ্কিত হইবে। অষ্টম বার্ষিক স্বাধীনতা-সপ্তাহ কলিকাতার থিয়েটার রোড-চৌরঙ্গী জংশনে যে রমণীয় পরিবেশের মধ্যে পালিত হইয়াছে, নগরবাসীরা হাজারে হাজারে সোৎসাহে যোগদান করিয়া তাহাকে সার্থক করিয়াছেন। যে দায়িত্ব দ্বায়তঃ

ও ধর্মতঃ রাজ্যসরকারের, সর্ববিষয়ে পুরোগামী জাতীয় কংগ্রেস তাহার প্রবর্তন করিয়া রাজ্যসরকারকে সচেতন করিলেন। তবে কংগ্রেস-এখন দেশের প্রতিনিধি, কংগ্রেস-প্রদত্ত সম্মান সমগ্র দেশের সম্মান বলিয়া গণ্যজন মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। মোটের উপর, সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা অতিশয় সুচিন্তিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। পর পর সাত দিন ধরিয়া কলিকাতা শহরে গুলীজনের এমন চমৎকার সম্মেলন আর সংঘটিত হয় নাই। অষ্টম দিনে ক্রীড়াবিদ্রী প্রগোষ্ঠ পালের সম্বন্ধনাও আপামরনির্বিশেষে কলিকাতাবাসীকে আনন্দ দিয়াছে। এই অহুষ্ঠানগুলি ভবিষ্যতে গুলীসমাজে অনেক আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিবে। যাহারা এতকাল নিজেদের অসহায় ও অনাদৃত ভাবিতেন তাঁহারা অকস্মাৎ অহুভব করিলেন, তাঁহাদের একক ও ঐকান্তিক সাধনার পশ্চাতে সমগ্র জাতির সমর্থন আছে। সহকর্মীদের সহযোগে এমন ঘটনা যিনি ঘটাইলেন সেই শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করিতেছি।

প্রাত্যহিক অহুষ্ঠানের পর নৃত্যগীত অভিনয় কবিগান প্রভৃতির যে ব্যবস্থা ছিল তাহাও পরোক্ষে শিল্পী ও গুলীদের উৎসাহিত করিয়াছে। এমন সুবৃহৎ মণ্ডপে এত দর্শক ও শ্রোতার সম্মুখে স্ব স্ব কৃতিত্ব প্রদর্শনের সুযোগ শিল্পী ও গুলীরা কদাচিত পান। উৎসাহের অভাবে ব্যক্তিগত বা দলগত ভাবে অনেকেই স্রিয়মাণ বা মুমূর্ষু। এইভাবে তাঁহাদেরও সজীবিত করিয়া তুলিতে পারিলে সত্যকার সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের কাজ করা হইবে। কংগ্রেস কিছুকাল এই আদর্শ চালু রাখিতে পারিলে শেষ পর্যন্ত রাজ্যসরকার যে ইহা গ্রহণ করিবেন, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই।

১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট হইতে পূরা আট বছরের স্বায়ত্তশাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রণের পরীক্ষা ভারতবর্ষকে নানা বিষয়ে নূতন অভিজ্ঞতা দান করিয়াছে। যে সংবিধান পরীক্ষামূলক ভাবে গোড়ায় রচিত হইয়াছিল, নূতন অভিজ্ঞতার আলোকে ইতিমধ্যেই তাহারও অনেক ধারার পরিবর্তন প্রয়োজন হইয়াছে ও প্রত্যহ হইতেছে। সর্বাপেক্ষা গোলযোগ দেখা দিয়াছে সংবিধানে ভারতের জাতীয় ভাষাবিষয়ক ধারাগুলি লইয়া। সেখানে সংস্কৃত-

ঘোষা হিন্দীকে ভারতের একমাত্র জাতীয় ভাষা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে সংবিধান চালু হওয়ার পনের বৎসরের মধ্যেই হিন্দী সম্পূর্ণ ভাবে ইংরেজীর স্থান গ্রহণ করিবে। কেন্দ্রে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকার সমূহের মধ্যে রাজকার্য সংক্রান্ত আদান-প্রদান হিন্দী ভাষাতেই পরিচালিত হইবে।

আট বৎসরের স্বাধীনতার পর আজ ভারতের সর্বত্রই অহুভূত হইতেছে যে, ইংরেজী বিতাড়ন করিয়া হিন্দীকে একাধিপত্য দিলে কলহ-কোলাহল ও বিশৃঙ্খলার সমূহ সম্ভাবনা, দক্ষিণ-ভারতে ইতিমধ্যেই গোলযোগ দেখা দিয়াছে। সুতরাং ভাষাবিষয়ক সংবিধানের অচিরান্ত পরিবর্তনের প্রয়োজন অহুভূত হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই উদ্দেশ্য লইয়াই “অফিসিয়াল ল্যাংগুয়েজ কমিশন”—জাতীয়-ভাষা-সংক্রান্ত পরামর্শ-সভা বসাইবার কথা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংবিধানের ৩৪৪ ধারা অমুযায়ী ভারতের রাষ্ট্রপতি সমগ্র ভারতের একুশজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে লইয়া যে পরামর্শ-সভা বা কমিশন বসাইয়াছেন এবং তাঁহারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির মতামত সংগ্রহের জন্য যে “কোমিশেনয়ার” বা প্রশ্নপত্র ছাড়িয়াছেন তাহাতে মোক্ষা মনোভাব এই দেখা বাইতেছে যে, হিন্দীই নিঃসংশয়ে ভারতের একমাত্র জাতীয় ভাষা হইবে এবং ইংরেজীকে সম্পূর্ণরূপে বিদায় দেওয়া হইবে। প্রশ্নপত্রে সকলের নিকট এই অভিমতই প্রার্থনা করা হইয়াছে, ইংরেজীকে তাড়াইয়া কি ভাবে কত দিনের মধ্যে হিন্দীকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দান করা যায়। অর্থাৎ আসল লক্ষ্য ঐক্যবতারার মত স্থির আছে, যত কিছু পরামর্শ ও মতামত সংগ্রহ লক্ষ্যে পৌছিবার উপায় নির্ধারণ লইয়া।

এই কমিশনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেই আমাদের ঘোরন্তর আপত্তি আছে। স্বাধীনতা-লাভের প্রথম উৎসাহে এক ও অখণ্ড ভারতের এক ও অধিতীয় ভাষার স্বপ্ন যদিও আমরা দেখিয়াছিলাম, “ইংরেজ ভারত ছাড়” এই জিগিরের সঙ্গে সঙ্গে “ইংরেজী ভারত ছাড়” জিগিরও আমরা জোর গলায় তুলিয়াছিলাম; কিন্তু আট বছরের ব্যবহারলব্ধ অভিজ্ঞতার আজ স্পষ্ট বুঝা বাইতেছে, আর যেখানেই হউক, অন্ততঃ ভাষার ক্ষেত্রে ভারতে এক ও অধিতীয়ের স্থান নাই; এবং সমগ্র পৃথিবীর সংস্কৃতি বিজ্ঞান ও ব্যবসায়ের মুখ্যতম ভাষা ইংরেজী বর্জনও সম্ভব

‘শনিবারের চিঠি’ “পূজা-সংখ্যা” আশ্বিন ১৩৬২

প্রতি বৎসরের স্তায় এবারও ‘শনিবারের চিঠি’ “পূজা-সংখ্যা” বর্ধিত আকারে ও বর্ধিত মূল্যে মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হইবে। নবীন-প্রবীণ শক্তিমান লেখকদের রচনার দ্বারা সংখ্যাটিকে যথার্থ পরিপুষ্ট করিয়া তোলার আয়োজন চলিতেছে। বিষয়-বৈচিত্র্য ও সংকলিত রচনাসমূহের উৎকর্ষগুণে সংখ্যাটি সকল শ্রেণীর পাঠকের মনোহরণ করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ধাহারা এই সংখ্যায় লিখিবেন, তাঁহাদের মধ্যে আছেন—

উপন্যাস

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বড়গল্প

শ্রীদীপক চৌধুরী

গল্প ও রসরচনা

ভার্মাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

“বনফুল”

শ্রীশৈলজ্ঞানন্দ মুখোপাধ্যায়

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীমতী অমলা দেবী

শ্রীপ্রমথনাথ বসী

শ্রীসুবোধ ঘোষ

শ্রীমরেন্দ্রনাথ মিত্র

“রঞ্জন”

শ্রীনবেন্দু ঘোষ

শ্রীসমরেশ বসু

শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

শ্রীরঞ্জনকুমার সেন

শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

শ্রীসঙ্কর্ষণ রায়, প্রভৃতি

কবিতা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

শ্রীকালিদাস রায়

শ্রীসুশীলকুমার দে

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণধন দে

শ্রীমতী উমা রায়

শ্রীমতী বাণী রায়

“আর্যপুত্র সূত্রিয়”

শ্রীদিনেশচন্দ্র দাস

শ্রী গোপাল ভৌমিক

শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী

প্রভৃতি

একাক্ষ নাটিকা

শ্রীসমিল সেন

প্রবন্ধ

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

শ্রীনির্মলকুমার বসু

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য

শ্রীশিবনারায়ণ রায়

শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দার

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী

এতদ্ব্যতীত ‘শনিবারের চিঠি’র শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ “সংবাদ-সাহিত্য”ও এই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

“পূজা-সংখ্যা”র দাম ধার্য হইল দুই টাকা।

এক্রেপ্তগণ এখন হইতেই তাঁহাদের চাহিদামত “পূজা-সংখ্যা”র অর্ডার দিয়া বাধিত করিবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাগণ যেন ৩০শে সেপ্টেম্বরের পূর্বে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন।

কর্মাধ্যক্ষ, “শনিবারের চিঠি”

নয়। সুতরাং পূর্বতন ভাষা ভিত্তির উপর যে প্রশ্নপত্র প্রেরণ করা হইয়াছে, আট বৎসরের অভিজ্ঞতালব্ধ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সর্বত্র তাহারই পরিবর্তন প্রয়োজন। গোড়াতেই স্বীকার করা চাই—ভারতের মত এত বৃহৎ এবং এমন বিচিত্র ও বিপুল জনাকীর্ণ দেশে ইংরেজী সহ অন্ততঃ পাঁচটি জাতীয় ভাষা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে— উত্তর-ভারতের দুইটি ও দক্ষিণ-ভারতের দুইটি। প্রশ্নপত্রের প্রারম্ভে কমিশনের মূল উদ্দেশ্য এইভাবে লিখিত হইয়াছে— কমিশনের কর্তব্য হইবে (১) ভারতবর্ষের দ্বিতীয় সরকারী কাজে ধীরে ধীরে হিন্দী প্রবর্তন, এবং (২) ভারতের সকল অথবা যে কোনও সরকারী কাজে ইংরেজীর ব্যবহার বর্জন—এই দুইটি কাজ কি ভাবে করা যাইবে তৎসম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ দান। আমাদের মতে এই দুইটি কাজই করা যাইবে না। কেন করা যাইবে না, তাহার কারণ একে একে বলিতেছি। হিন্দী ভাষা এখনও আমাদের সকল প্রয়োজন সাধনের উপযোগী নয়। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থ হিন্দীতে লেখা সম্ভব নয়, কারণ পরিভাষা এখনও প্রাথমিক অবস্থায় আছে। হিন্দী ভাষা এখনও তেমন ঋজু ও গাঢ়বদ্ধ হয় নাই, কাজেই ইহাতে আইন রচিত হইলে তাহার অর্থ লইয়া পদে পদে গোলযোগ বাধিবে। উত্তর-ভারতের অন্যান্য ভাষার সহিত হিন্দীর যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে, কিন্তু দক্ষিণ-ভারতের ভাষা সম্পূর্ণ ভিন্ন আধারের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহাদের নিকট ইংরেজী যতখানি বৈদেশিক ও বিজাতীয়, হিন্দীও ঠিক ততখানি। দীর্ঘকালের অভ্যাসে ইংরেজী তাহাদের কিছুটা আয়ত্তে আসিয়াছে। ইংরেজী বজায় রাখিয়া দক্ষিণ-ভারতে তামিল ও তেলেগু এই দুইটি ভাষাকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দিলে তবেই ভারতীয় সংবিধান তাহাদের নিকট স্তায়বিধান হইবে। উত্তর-ভারতেও তেমনি হিন্দী ছাড়া আর একটি ভাষাকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, এবং সে ভাষা হইবে অবিসম্বাদিতরূপে বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষা অনেক উন্নত, ইহার পরিভাষাও বিশেষ সম্পন্ন।

রুশিয়ার মত ২০ কোটি মানুষের দেশে যদি আট-চল্লিশটি ভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে গণ্য হইতে পারে, বেলজিয়ম ও সুইটজারল্যান্ডের মত ক্ষুদ্রতম দেশে যদি একাধিক ভাষা

রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পায়, কানাডায় যদি ফরাসী ইংরেজী দুই ভাষাতেই সরকারী কার্যাদি পরিচালিত হইতে পারে, তাহা হইলে ভারতে পাঁচটি ভাষা যে কেন চলিবে না বুঝা দুষ্কর। ইংরেজীকে বজায় রাখিলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা ঘটবে না, আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা-বৈষম্যের অসুবিধাও ইংরেজী দূর করিতে সক্ষম। আমাদের প্রতিবেশী ক্ষুদ্র রাজ্য পাকিস্তানও উর্দু ও বাংলা দুই ভাষাকেই রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দান করিয়াছে, ভারতেই বা তাহা দেওয়া হইবে না কেন?

ভারতে হিন্দীভাষাভাষীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা একটা কল্পিত কাহিনী মাত্র। উত্তরে পাঞ্জাব হইতে বিহার, দক্ষিণে বোম্বাই মহারাষ্ট্র মধ্যপ্রদেশ হায়দরাবাদ সকল প্রদেশকেই হিন্দী-ভাষাভাষী বলিয়া উল্লেখ করা হয়। অথচ পাঞ্জাবের ভাষা বিহারীয়া বোঝে না, বিহারের ভাষাকে হিন্দী বলিয়া উত্তর প্রদেশ স্বীকার করে না। যে হিন্দী ভারতসংবিধান স্বীকার করেন, তাহা বড় জোর পাঁচ কোটি মানুষের ভাষা, অথচ পূর্ব-পশ্চিম উভয় বঙ্গে প্রায় ছয় কোটি লোক বাংলা ভাষায় কথা বলিয়া থাকে। আসামী ও ওড়িয়া নিঃসংশয়ে বঙ্গগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সংবিধানে বাংলা-ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষা বলিয়া স্বীকৃত হইলে উত্তর-ভারতের অর্ধেক মানুষের ভাষা-সমস্কার সমাধান হইয়া যায়।

স্বাধীন হইবার পর দিকে দিকে বৈজ্ঞানিক পুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ইহার জন্য বিজ্ঞানের ব্যাপক শিক্ষার প্রয়োজন অস্বীকার্য হইতেছে। কোনও ভারতীয় ভাষায় উপযুক্ত শিক্ষালাভের কোনই ব্যবস্থা নাই; বিজ্ঞান ও উচ্চজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইংরেজীই এখনও আমাদের একমাত্র উপজীব্য। বাংলা-ভাষায় তবুও হইতে পারে, কিন্তু হিন্দীর সাহায্যে এই শিক্ষাদান এখনও হৃদ্রপরাহত। সুতরাং নবভারতে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় যে শিক্ষা, অর্থাৎ ফলিত বিজ্ঞানের শিক্ষা, এখনও ইংরেজীর মাধ্যমে দিতে হইবে; সুতরাং সংবিধান চালু হওয়ার পনের বৎসরের মধ্যে ইংরেজী বিভাগের প্রশ্ন এ ক্ষেত্রে উঠিতেই পারে না।

বিচার ব্যাপারেও ইংরেজী বজায় রাখিতে হইবে। প্রাদেশিক উচ্চবিচারালয়ের মামলা কেন্দ্রীয় উচ্চতম আদালতে প্রেরিত হইলে প্রদেশে ও কেন্দ্রে যদি বিচারের

ভাষার পার্থক্য ঘটে, তাহা হইলে স্তম্ভ বিচার সম্ভব নয়। আগেই বলিয়াছি, আইনের ক্ষেত্রে হিন্দী ভাষা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ; স্তম্ভ আরও দীর্ঘকাল, হয়তো চিরকালই, ইংরেজীর উপর আমাদের নির্ভর করিতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত আট বৎসরে বাংলা দেশের বিদ্যালয়সমূহে হিন্দী শিক্ষাইবার যথেষ্ট ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু হিন্দী মোটেই জনপ্রিয় হয় নাই। দুই ভাষা মূলতঃ এক সংস্কৃতির সন্ধান হইলেও কোথায় যেন গুরুতর শরিকী বিভেদ আছে। ভাষাতত্ত্ববিদেরা তাহা নির্ধারণ করিবেন। দেবনাগরী অক্ষরের জটিলতাও ইহার কারণ হইতে পারে। অতি সাধারণ দৈনন্দিন প্রয়োজন সাধনের উপযোগী বাজার হিন্দী আয়ত্ত করা বাঙালীর পক্ষে কঠিন নয়, কিন্তু সরকারী চাকুরির নির্বাচনী পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবার অবলম্বন যদি হিন্দী হয় তাহা হইলে একান্ত হিন্দী-ভাষাভাষী দেশ ছাড়া অন্য প্রদেশের আপত্তি করিবার সম্ভব কারণ আছে। বাংলা-ভাষাকে কোণঠাসা করিতে গিয়া পাকিস্তান সরকারকে যে ভাবে “তোবা” করিতে হইয়াছে, আশা করি ভারত সরকার সে কথা বিস্মৃত হইবেন না।

মোটের উপর সকল দিক বিবেচনা করিয়া নতুন সংবিধান রচনার এই সময়। গায়ের জোরে সবই চালানো যায়। কিন্তু শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ভাষার পরিবর্তন মটাইতে গেলে মানুষের নাড়ীতে টান পড়িবে, তখন রক্তারক্তি অনিবার্য হইয়া উঠিবে। ভাষা-কমিশনের প্রস্তাবের রকম-সকম দেখিয়া আমাদের ইহাই মনে হইতেছে যে, হিন্দী সাম্রাজ্যবাদকে একটু তৈলাক্ত ও সুসহ করিয়া প্রয়োগ করাই ইহার উদ্দেশ্য; সকল দিক বিবেচনা করিয়া সংবিধানের পরিবর্তনের দ্বারা দেশের কল্যাণসাধন ইহার লক্ষ্য নহে।

আচার্য যদুনাথ সরকার ভাষার ‘প্রবাসী’তে “বাঙালীর অগ্রগতির পথ” নির্দেশ করিয়াছেন। চোখ মেলিলেই মাধার-বড় বহরে-ছোট বাঙালীর লালনা আজকাল আমবা সর্বত্র দেখিতে পাই। চারিদিকে হতাশা ও অবসাদ। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, এই পঙ্ককুণ্ড হইতে উদ্ধারের পথ দেখাইবার জন্য এখনও চারিজন বাঙালী মনোবী জীবিত আছেন—আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়, আচার্য যদুনাথ, শ্রীরাজশেখর বসু ও ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। বাঙালীর দুর্গতির কারণ ইহারা প্রায়ই বিশ্লেষণ করেন, আশ্রয় হইবার উপদেশ দেন। ‘কোন পথে?’

(শুরুদাস) যোগেশচন্দ্রের এইরূপ একখানি ইঙ্গিতপূর্ণ বই। শ্রীরাজশেখর বসুর স্ফুটন্ত কথ্য সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় শুনিতে পাই। গত স্বাধীনতা-দিবসে পশ্চিমবঙ্গ-প্রদেশ-কংগ্রেস কে. পি. টমাস লিখিত যে জীবনীটি বিধান-সম্মেলনা উপলক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে কর্মনিম্পূহ বাঙালী জাতির বর্তমান অবসাদ ও জড়তা হইতে মুক্তির উপায় বিধানচন্দ্রের জীবনী ও বাণীমুখে প্রকাশ পাইয়াছে। আচার্য যদুনাথও তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান স্বজাতির কল্যাণের জন্য লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা হতাশার আক্ষেপোক্তি নয়, আশার বাণী। গোড়ায় আমাদের বর্তমান দুর্গতির কাহিনী বলিয়া বাচিবার রাস্তাও তিনি এই ভাবে দেখাইয়াছেন—

“...যেখানে বাঙালী জাতি এক সময় প্রায় সব বড় কাজ করিত, সেখানে আজ তাহারা লোপ পাইয়াছে। তাহার উপর নানা অন্য প্রদেশ-বাসীরা আসিয়া বঙ্গভূমির সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য, এমন কি শহরে শহরে ছোট ছোট মিল্লা ও ফেরাওয়ার কাজ পর্যন্ত নিজের হাতে লইয়াছে। তাহাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকিতে না পারিয়া ঐতিহাসিক বাঙালীর বংশ লোপ পাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে আবার পৈতৃক শ্রমিকের ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া গুল্লোলক হইতেছে অর্থাৎ বেকারের দল পূর্ণ করিতেছে। মরা দিল্লীতে ছই বা তিন জন বাঙালী দেড়-হাজারী, ছই-হাজারী মনসবদার হইয়াছেন এই সুধবরে আমাদের মধ্যে যে মধ্যবিত্ত এবং আগেকার শ্রমিক-বংশের পাঁচ লক্ষ বেকার বা অস্থায়ী টিকা চাকরে আছে, তাহাদের পেট ভরিবে না। সিনেমার আলো নিবিয়া গেলে, রাস্তা হইতে সত্যাগ্রহের হুমুড়ি চলিয়া গেলে, আমি স্থির হইয়া তাকাই। আর কি বেশি?—

দিনের দিন সব ধীন,
ভারত হয়ে পরাধীন,
অরাণ্ধবে ধীর, চিন্তাকরে ধীর, অনশনে তমু ক্ষীণ।

এই দুর্দশা অনেক দিন হইতে ক্রমে ঘনাইয়া আসিতেছে।

আজ আমরা কীদিব না। বরং দেখা উচিত যে, কোন্ কোন্ কারণে প্রথম যুগের নব্যশিক্ষিত বাঙালীরা স্মারতময় খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা ছাড়িয়া দিই, তিনি ত দেবতুল্য ছিলেন। কিন্তু রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, ডাক্তার চুণীলাল বসু (গবর্ণমেন্ট কমিশনিষ্ট এবং রাঙ্গবাহাদুর) প্রভৃতির জীবনী পড়িলে জানা যায়—কত কঠোর পরিশ্রম, কত ত্যাগ, কি বিলাসবর্জনের মধ্য দিয়া তাঁহারা শিক্ষালাভ করেন, চরিত্রগঠন করেন এবং এই সাধনার জন্য পুরস্কার পাইয়া সমাজের মাথায় স্থানলাভ করেন। ঐ পথ এখনও খোলা আছে।

আজিকার তরুণদের যদি বড় হইবার ইচ্ছা থাকে, যদি জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়, তবে ঐ পথেই চলিতে হইবে। বিলাস ও ভোগের বাসনা দমন করিয়া, কঠিন ক্রমে বিদ্যা লাভ করিয়া, যন্ত্রচালনার শিক্ষা ও চরিত্র গঠন করিতে হইবে। ক্লাসে ও পরীক্ষার কীকি দিলে চলিবে না। ক্ষমী করিয়া খুব সহজে পাস করিব এই বাহার মতলব, সে ছেলেটির ভবিষ্যৎ জীবন কীকিতেই শেষ হয়।”

গ্রন্থ-পরিচয়

প্রবন্ধ

অশোক-লিপি : অমূল্যচন্দ্র সেন। ইণ্ডিয়ান পাবলিসিটি সোসাইটি, ২১ বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৪। আট টাকা।

পুরাতন ভারতবর্ষের সঙ্গে নতুন স্বাধীন ভারতের যোগসূত্র সন্ধান অশোক। তাঁহারই স্তম্ভের সিংহলাঙ্কিত শিরোভাগ আজ ভারতবর্ষের প্রতীক, ভারতের জাতীয় পতাকায় অশোকচক্র শোভা পাইতেছে। যাহাকে আমরা এত সম্মান দিয়াছি সেই সম্রাট অশোক সারা ভারতবর্ষে গিরি-অরণ্য-প্রান্তরে গিরিগাত্রে শিলাফলকে স্তম্ভগাত্রে এবং গুহাগাত্রে খোদিত লিপির সাহায্যে স্বদেশবাসীর নিকট কি হুসুমাতার লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেই তাহা জানা উচিত। এই লিপিগুলির মধ্যে সম্রাট অশোকের সত্যকার জীবনেতিহাসও নিহিত আছে। বৌদ্ধশাস্ত্র ও অন্যান্য গ্রন্থে অশোক সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী ঢুকিয়া গিয়াছে, কিন্তু অশোক-লিপিগুলি অশোকের সময়ে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কানিংহাম সাহেব অশোক-লিপিগুলি একত্র করিয়া অমূল্যচন্দ্র প্রকাশ করেন, তাহার পর বহু পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য পণ্ডিত অশোক-লিপি লইয়া গবেষণা করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় চারুচন্দ্র বসু ও ললিতমোহন করের ‘অশোক অমূল্যচন্দ্র’ ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভাষায় সহ প্রকাশিত হয়। কিন্তু কানিংহাম ও তদনুসারীদের পরে বহু নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৯২৯ সন পর্যন্ত ভাণ্ডারকর, ওকা, দাস, উলনার প্রভৃতি পণ্ডিতদের গবেষণা নির্ভরযোগ্য ছিল। ওই সনে যেরূপাণ্ডিতের লিপি এবং ১৯৩১ সনে পালকীশঙ্কু ও গবীমঠের লিপিগুলি পাওয়া যায়। ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেন এখন-পর্যন্ত-প্রাপ্ত যাবতীয় লিপি লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন এবং বাঙালী পাঠকের বোধগম্য হুসুমত বঙ্গভাষায় দিয়াছেন। লিপিগুলির মধ্যে আমরা অশোকের জীবনী ও সমসাময়িক ইতিহাস দুইই পাইতেছি। জানিয়া সুখী হইলাম, ডক্টর সেন তাঁহার গবেষণার ব্যাপকতার প্রচারকামনায় গ্রন্থখানির ইংরেজী অমূল্যচন্দ্র প্রকাশ করিতেছেন। আলোচ্য বইখানির আট টাকা মূল্য একটু বেশীই মনে হয়।

স.

উনবিংশ শতাব্দীর পথিক : অরবিন্দ পোদ্দার।

ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড, ২১১ শ্রামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। তিন টাকা।

ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দার তাঁহার ‘বন্ধিম-মানস’ গ্রন্থে পাশ্চাত্য তথা সমগ্র বহির্বিশ্বের সংঘাতে বঙ্গ-সংস্কৃতির ধারাবিবর্তনের কাহিনী অংশতঃ বিবৃত করিয়াছিলেন, অবশ্য বন্ধিমচন্দ্রের সাহিত্যগত মানসজীবন উদ্ঘাটনই তাঁহার মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল। বর্তমান গ্রন্থে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার অপর চারিটি স্তম্ভসদৃশ পুরুষের জীবনী ও কীর্তি আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বঙ্গসংস্কৃতির ক্রমবিকাশের সেই অসম্পূর্ণ কাহিনীকেই সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিক এবং প্রগতিশীল হওয়া সত্ত্বেও নতুন যুগের নতুন পথের পথিক হিসাবে রামমোহন, বিজ্ঞানাগর, কেশবচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দকে বাছাই করিয়া পুরাতন ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতিও সমীহা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে বলিয়াছেন ভারত-পথিক, অপর তিনজনও ওই পথেরই পথিক। ডক্টর পোদ্দার অতি চমৎকার ভাবে দেখাইয়াছেন, উনবিংশ শতাব্দীর এই বিরাট পুরুষদের জীবনী ও কীর্তি আলোচনার মধ্যে আমাদের জাতীয় পুনরুজ্জীবনের রহস্যও নিহিত আছে। বর্তমান গ্রন্থখানি ‘বন্ধিম-মানস’ের পরিপূরক গ্রন্থ। ডক্টর পোদ্দারের অভিমতগুলি সূচিস্থিত স্লিথিত ও দৃঢ় প্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহারা সর্বত্র তাঁহার মতে মত না দিবেন তাঁহারাও নতুন করিয়া ভাবিবার অবকাশ পাইবেন। স.

কেন আমি মার্কসবাদী নই ? : ক্রিয়মলেন্দু ঘোষ।

সংস্কৃতি সংসদ, ৫১১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। বারো আনা।

দর্শন ও বিজ্ঞান হিসাবে মার্কসবাদের পূর্বতন প্রতিষ্ঠা আজ আর নাই। উহার অন্তর্নিহিত তত্ত্ববস্তুর সারবত্তা সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের চিন্তাশীল মহলে ইতিমধ্যেই প্রচুত সংশয় ও দ্বিজ্ঞান দেখা দিয়াছে। মার্কসবাদের মূল ভিত্তি হইল—দ্বৈতবাদ, ঐতিহাসিক দ্বৈতবাদ ও বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ। গোঁড়া মার্কসবাদীর নিকট এই

তিনি বৈশিষ্ট্য এক অঞ্চল মতবাদের অংশ ও পরস্পর পরস্পরের সহিত অবিলম্বে একত্রে গ্রহিত। কিন্তু এই ধারণার যৌক্তিকতায় পরবর্তী কালে সন্দেহ সন্দেহ দেখা দিয়াছে। নব্যবিজ্ঞানের বিশ্লেষণে ধরা পড়িয়াছে যে, ঐতিহাসিক জড়বাদ দ্বন্দ্বিক জড়বাদের আবশ্যিক পরিণাম নহে, কিংবা দ্বন্দ্বিক জড়বাদ বৈজ্ঞানিক সমাজ-বাদের অভিমুখে স্বতঃই অঙ্গুলিনির্দেশ করে না।

এতাবৎ মার্কসবাদের বিরুদ্ধে এই সকল প্রতিক্রিয়া নিতান্ত বিচ্ছিন্ন আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সব জড়াইয়া একটি সামগ্রিক সমালোচনার একান্ত অভাব ছিল। সেই অভাব পূরণ করিয়াছেন শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ তাঁহার সংক্ষিপ্ত অষ্ট যুক্তিপূর্ণ বর্তমান গ্রন্থখানিতে। গ্রন্থের গোড়ার দিকে শ্রীঘোষ মার্কসবাদের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দান করিয়াছেন, উহা অপেক্ষা নিখুঁত ও সন্তোষজনক। বিবরণ একজন মার্কসবাদীও দিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। ইহার দ্বারা লেখকের বিবরণের পরিপূর্ণ জ্ঞান বুঝাইতেছে, বাহা এই জাতীয় সমালোচনা-গ্রন্থে অত্যাবশ্যক। তারপরই তিনি প্রকৃত সমালোচনায় অবতীর্ণ হইয়াছেন।

প্রথমে লেখক মার্কসবাদী দর্শনের ভিত্তি পূর্বজ্ঞেয়বাদের (Determinism) আলোচনা করিয়াছেন। জড়বিজ্ঞানের হেতুবাদের (The Law of Causation) সহিত পূর্বজ্ঞেয়বাদের বিশেষ যোগ আছে, কিন্তু স্ববিজ্ঞ গ্রন্থকার নব্যবিজ্ঞানের আবিস্কারাদি আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, হেতুবাদ এক্ষণে আর সর্বমান্য একটি মত নহে, ভিন্নতর মতের (The Law of Statistical Probability) সম্মুখে উহা পরিত্যক্ত হইবার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। অতঃপর তিনি দ্বন্দ্বিক জড়বাদের দার্শনিক ভিত্তি পরীক্ষার স্বত্রে De Brogli, Max Bohn, Shordieger প্রমুখ আধুনিক অণু-বিজ্ঞানীদের মতামত পর্যালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, জড়বাদ এক্ষণে নিছক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও আর গ্রাহ্য নহে। তা ছাড়া যে Dialectics মার্কসবাদের প্রধান নির্ভর বলিয়া বলা হয়, জড়বাদের সহিত উহার সম্পর্ক স্বাভাবিক নহে, বরং ভাববাদই উহার প্রকৃত উৎস ও অবলম্বন। মার্কসবাদী পন্থায় শিল্প সাহিত্য ধর্ম পরিবার জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা প্রভৃতি মৌলিক বিষয়গুলির কেন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা মেলে না তাহাও লেখক সম্যক দক্ষতার সহিত এই গ্রন্থে পর্যালোচনা করিয়াছেন।

মোটের উপর গ্রন্থটি যুক্তিনিষ্ঠ ও স্থলিখিত। অতি দুর্বল একটি বিষয় লেখক এই গ্রন্থে বিচার করিয়াছেন। কিন্তু আলোচনাগুণে বিচারক্রিয়া জটিলতা-সমাজ হয় নাই। বাহারা পরস্পর-বিরোধী রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের সংঘর্ষে দিশাহারা, তাহারা এই গ্রন্থে একটি পথনির্দেশ পাইবেন বলিয়া আশা করি। প্রখ্যাত সাহিত্যিক

তারাকশর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত 'ভূমিকা গ্রন্থের আকর্ষণ আরও বাড়াইয়াছে।

গ.

কবিতা

বসন্তবাহার : গোপাল ভৌমিক। গ্রন্থ-জগৎ, ৭-জ্ঞে পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা-২২। দেড় টাকা।

'বসন্তবাহার' ২৩টি কবিতার সমষ্টি। ঠিক দশ বৎসর পূর্বে কবির 'স্বাক্ষর' প্রকাশিত হইবার পর কবি যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছেন 'বসন্তবাহার' সেইগুলিরই নির্বাচিত সংকলন; নির্বাচিত কবিতাগুলির মধ্যে একটি মধুর স্বর ফুটিয়া উঠিয়াছে, কবি সেই স্বরেরই নাম দিয়াছেন 'বসন্ত-বাহার'। বর্তমানের উগ্র-আধুনিকতার চাপে সেই স্বর মুহূর্তে ক্ষুণ্ণ হইলেও কবি তাঁহার অন্তর্লোকে একটা প্রশম্ন পরিবেশ বজায় রাখিতে পারিয়াছেন। তাই পাঁচটায় যখন আপিসের ছুটি হয়, রোদ পড়ন্ত হইয়া আসে, ক্লাইভ স্ট্রীটের মোড়ে ঘরে ফিরিবার মিথ্যা তাড়ার জোরে পা বাড়াইতে হয়, ট্রামে-বাসে মানুষের গাড়ি—সেই ভিড়ের মাঝখানেই ক্লাস্ত-দিনের শেষ রাগিণীর মত প্রেমসীকে কবি খুঁজিয়া পান, শহরের আবর্জনাশূন্যের মধ্যেই রঙ আর স্বরের মূর্ছনা কবিচিন্তকে সার্থক করিয়া তোলে। কবি গোপাল ভৌমিক বাস্তবের পূজারী হইলেও দ্বিধা-নিমিত্ত কল্পলোকের দ্বার তাঁহার পক্ষে রুদ্ধ হয় নাই। 'বসন্তবাহার'ের সর্বত্রই তাহার প্রমাণ মিলিবে। স.

গাঁয়ের মাটির গান : শ্রীশান্তি পাল। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭ ইন্ড বিমান রোড, কলিকাতা-৩৭। দুই টাকা।

'গাঁয়ের মাটির গান' শ্রীশান্তি পাল রচিত নবতন কাব্য-গ্রন্থ। বাংলার কাব্যমোদী পাঠকের নিকট শ্রীশান্তি পালের পরিচয় নিম্নয়োজন; বিশেষ, বাহারা কবিতায় বাংলার পল্লীপ্রকৃতির খাঁটি আবেশটুকু পাইতে চাহেন পল্লীপ্রাণ শান্তিবাবুর কবিতার মিঠা ও দরদী স্বর কোনও না কোনও সময়ে তাঁহাদের চিত্তহরণ করিয়াছে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে কবি পল্লী-প্রকৃতির পটভূমিতে পল্লীর বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানুষের মনোময় রূপটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কবিতাগুলির ভিতরে নির্ধাতিত শোষিত সাধারণ মানুষের প্রতি কবির সহজ মমতা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা সম্যকদর্শিতার পরিচায়ক। সাধারণ পল্লীবাসীর সহিত একজন মজাগত নাগরিকের এই আত্মীয়তা বিরল বলিয়াই আরও বেশী ভূমিদায়ক। বোকা যায়, কবি তাঁহার অন্তরের সহজাত প্রীতি-প্রসন্নতার দ্বারা এই আত্মীয়তা অর্জন করিয়াছেন, 'ইজম'-এর ব্যর্থ পথ তাঁহাকে পরিত্যক্ত করিতে হয় নাই। কবির সহজ কল্পনাপ্রবণতার উহাই প্রধান

ভিত্তি এবং উহাই প্রধান শক্তি। জেলে ধোপা নাপিত কুমোর কামার প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রামীণ বৃত্তিজীবীদের অভ্যন্তর পরিবেশ ফুটাইয়া তুলিতে উপযুক্ত দেশজ শব্দের ব্যবহারে লেখকের অদ্ভুত কুশলতা লক্ষ করা গেল।

ন. চ.

ভ্রমণ-কাহিনী

মরুতীর্থ হিংলাজ : অবধূত। মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্রামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পাঁচ টাকা।

বেলুচিস্থানের দুর্গম মরু-অঞ্চলে অবস্থিত মহাপীঠ হিংলাজ। হিন্দুলা দেবীর অধিষ্ঠান-কেন্দ্র। কথিত আছে, সতীর ব্রহ্মরজ্ঞ এসে পড়েছিল এই বিশেষ স্থানটিতে, তাইতে এর অলৌকিক তীর্থ-মাহাত্ম্য। সতীর দেহ-ভাগপূত ৫১টি পবিত্র পীঠের অন্ততম পীঠ। এই দুর্গম ও দুর্গম্য তীর্থে ১৩৫৩ সালের আষাঢ় মাসে বর্তমান গ্রন্থের লেখক অবধূত আরও জনা ত্রিশ সঙ্গী-সাথীসহ দেবীসন্দর্শন মানসে যাত্রা করেছিলেন। তদ্রাসনায় বিশ্বাসী সম্রাস-ব্রতী এই লেখকের সঙ্গে তাঁর ভৈরবীও ছিলেন। বিচিত্র সে তীর্থযাত্রা, ততোধিক বিচিত্রতায় ভরা সে তীর্থযাত্রার কাহিনী। লেখক অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে সে কাহিনী এ গ্রন্থে বিবৃত করেছেন। রচনাটি যখন ধারাবাহিক ভাবে কোনও এক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল তখনই এর প্রতি অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল, এক্ষণে গ্রন্থাকারে সংবলিত হওয়ায় কাহিনীটি সর্বসাধারণের অধিগম্য হ'ল।

তথাকথিত তদ্রাসনায় রামাচার ইত্যাদি সাধনপন্থার প্রতি বর্তমান সমালোচকের বিশেষ কোনরূপ আস্থা নেই। হুতবাং অস্বীকার করব না যে, একজন তাত্ত্বিক সাধকের রচিত এই কাহিনীটির উপর পাঠোন্মত নিয়োগের সূচনায় কিঞ্চিৎ বিমূখতার মনোভাব পাঠকের মনে ছিল।

তদ্রাসন সাধনপন্থার নানা রকম কুসংস্কারাচ্ছন্ন করণ-কারণ ক্রিয়াপ্রক্রিয়া অভিচারাদির বিমর্ষ বর্ণনা ভ্রমণ-কাহিনীর নামে গলাধঃকরণ করতে হবে আশঙ্কায় নিঃস্বের মনকে সেই বাবধে কিঞ্চিৎ প্রস্তুত করে নিতে হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল, সমালোচক-পাঠকের এই শঙ্কা অমূলক। বইটির হু-চার পাতা ওন্টাতে না ওন্টাতেই সেই অকল্পনীয় আবিষ্কারের মুখোমুখি হওয়া গেল। লেখকের মন আশ্চর্য সংস্কারমুক্ত। এই সংস্কারমুক্তির পরিচয় কি ভ্রমণের বর্ণনায় কি তীর্থযাত্রীদের পারস্পরিক মানবিক সম্পর্কের বর্ণনায় কি অন্তর্বিধ বর্ণনায় একান্ত পরিষ্কৃত। এমন কি, লেখার ধারাবাহন দৃষ্টে আমার এক এক সময় এই সন্দেহ পর্যন্ত হয় যে, তীর্থযাত্রার দ্বারা পুণ্যার্জনের গতানুগতিক সংস্কার ও অভ্যাস লেখককে আদৌ মরুতীর্থ হিংলাজের

অভিব্যুৎ আকর্ষণ করেছে কি না। মনে হয় ধর্মীয় অভীশ্বার চাইতে দুর্ভুহ ও দুঃসাহ্যের সঙ্গে পাঞ্জা লড়বার এবং মানুষকে কাছে থেকে জানবার-বোঝবার আগ্রহই পুণ্যার্থীর আচরণে আত্মগোপনকারী এই কোতুহলী মানুষটিকে তীর্থপরিক্রমার পথে টেনে এনেছে। লেখকের মনে তত্ত্বজিজ্ঞাসার চাইতে তথ্যজিজ্ঞাসা প্রবল, পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা তাঁর সহজাত, নানা জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার ও দেখাবার একটা অনায়াসকুশলতা তাঁর আছে বলে মনে হয়—লেখকের এই মানসিক গঠনের বৈশিষ্ট্য তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীটিকে সত্যিই একটি উপাদেয় রম্য-রচনায় পরিণত করেছে। একটু হয়তো হালকা চালের লেখা, একটু হয়তো অতিরিক্ত খুঁটিনাটিপরায়ণতার আভাস মেলে, তবে সব জড়িয়ে রচনার আবেদন মনোগ্রাহী। লেখকের ভিতর হস্তরসবোধও বেশ আছে। উদ্ভূপুষ্ঠে আকৃত্য পানদোস্তা-আসক্তা ভৈরবীকে লক্ষ করে মাঝে মাঝেই তিনি ভিৎক-অথচ নির্দোষ-সরস উক্তির ফোড়ন কেটেছেন—এর মধ্যে একটি প্রীতিপ্রসন্ন অন্তরের সৌরভ লিপ্ত হয়ে আছে।

চরিত্র-চিত্রণে লেখক যথেষ্ট মুসলমানের পরিচয় দিয়েছেন। ছড়িদার রূপলাল, পথের আকস্মিক সঙ্গী থিকুমল ও কুস্তী, উদ্ভূচালক গুল মহম্মদ ও তার ছেলে দিল মহম্মদ, সহযাত্রী পোপটলাল ও সর্বশেষে ভৈরবী—এদের চরিত্র যথার্থ একজন মানবমনস্বত্ব-অভিজ্ঞ শিল্পীর স্মার্য তিনি রূপায়িত করেছেন। সহযাত্রীদের প্রতি লেখকের সহন-শীলতা প্রচুর, তা থেকে বোঝা যায় সকল শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার স্নহশীলনে তিনি বিশেষ অভ্যাস ও কুশলী। যাত্রীদের স্বার্থপরতার দৃষ্টান্তে তাঁর মন পীড়িত হ'লেও বিকল হয় না, কেন না তাঁদের নিঃস্বার্থ সেবার মনোভাবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় কিছু কম নিবিড় নয়। সমগ্র বইটি পড়ে আমি একটি হৃদয়মানবতাবাদী জীবনপ্রেমী মনের পরিচয়ই মুখ্যতঃ পেলাম, অসার ইহবিমূখতা এবং তথাকথিত তাত্ত্বিক সাধনার নামে প্রাপঘাতী আত্ম-নিরোধের সংস্কার লেখকের দৃষ্টিকে কোথাও আচ্ছন্ন বা আবিল হতে দেয় নি—এইটি মত বড় একটি সাফল্য। এ বইয়ের সমাদর হবেই।

ন. চ.

তথ্য-গ্রন্থ

বর্ষপঞ্জী ১৩৬২ : সম্পাদক সন্তোষরঞ্জন সেনগুপ্ত। ২৫এ চিত্তরঞ্জন এডেনউ, কলিকাতা-১৩। চার টাকা।
সক্ষম ও শক্তিশালী একদল লেখকের সাহায্যে সম্পাদক মহাশয় নানা বিষয়ে তথ্যপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য প্রবন্ধ সম্মিলে 'বর্ষপঞ্জী'টিকে সমৃদ্ধ ও মূল্যবান-করিয়েছেন। প্রয়োজনীয় সকল খবরই ইহাতে আছে।

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্ড বিলাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা ৩৭ হইতে

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : বড়বাজার ২৮৩৮

সংবাদ-সাহিত্য

বর্ষশেষ

বর্তমান সংখ্যায় ‘শনিবারের চিঠি’ জীবনের সাতাশ বৎসর সম্পূর্ণ করিল। প্রায়ষ কাল হইতে এই দীর্ঘ সাতাশ বৎসর অনেকে নানাভাবে ইহার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, কেহ লেখক, কেহ পাঠক, কেহ চিত্রকর, কেহ বর্ষক, কেহ গ্রাহক, কেহ অগ্রগ্রাহক, কেহ বিজ্ঞাপনদাতা, কেহ উৎসাহদাতা, কেহ সজ্জন সমর্থক, কেহ নিষ্ঠুর সমালোচক-রূপে ইহাকে সজীবিত রাখিয়াছেন—সকলকেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। নব কলেবরে পুরাতন প্রিয়জনের বিরাগভাজন হইবার আশঙ্কা গত ছয় মাসে অমূলক প্রমানিত হইয়াছে। ‘শনিবারের চিঠি’র শুভষাত্রাশ শিব তাঁহার কল্যাণ-বরাভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। বর্ষশেষে তাঁহাকেই প্রণাম নিবেদন করিতেছি।

শারদীয়

শুধু একটু গোলযোগের সৃষ্টি করিতেছেন গোপালদা। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর অগ্রগামী হইয়া তিনিও রাজধানী দিল্লীতে আসিয়াছেন এবং সেখান হইতে সরকারী ধামে এক পত্রাঘাত করিয়াছেন। পত্রের শিরোনামায় “শারদীয়” কথাটি লেখা দেখিয়া মনে হইয়াছিল, গোপালদা আমাদের শারদীয় সংখ্যার জন্ম কিঞ্চিৎ রত্নরস পরিবেশন করিয়াছেন। কিন্তু পড়িতে গিয়া দেখি, এই “শারদীয়” মানে শরৎ (চাতুর্দশ) সম্পর্কিত। শ্রীমান উমানাথ সিংহ-সম্পাদিত বহরমপুরের ‘পরিক্রমা’ নামক সাপ্তাহিকের (৪ঠা আশ্বিন, ১৩৬২) পৃষ্ঠায় প্রকাশিত “কথাসিদ্ধী শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত একটি পত্র” পাঠাইয়া গোপালদা লিখিয়াছেন : “প্রাগৈতিহাসিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও আধুনিক

কালের অনেক বিবাহ-বিভ্রাটের কথা শুনিয়াছি। শ্রীরামচন্দ্র যদি শ্রীমতী শূর্ণপথার সাধু বিবাহ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না করিতেন তাহা হইলে নীতাহরণ ও লঙ্কাকাণ্ডের কোনই সম্ভাবনা থাকিত না। সভ্যসমাজ ও লোকালয়ের গভীর বাহিরে শ্রীযুক্ত ভীমসেন হিড়িম্বাকে এবং শ্রীমান অর্জুন উলুপীকে ধর্মপত্নীর মর্ষাদা দিতে সাহস করিয়াছিলেন বলিয়াই কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে কর্ণের একাঙ্গী বাণে অর্জুনের পতন হয় নাই এবং পরে পুত্র বক্রবাহনের শরাঘাত-মূর্ছিত ধনঞ্জয়ের চৈতন্য সম্পাদন সম্ভব হইয়াছিল। তেমনি ইহার উল্টা দিকও আছে। সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ডকে বিবাহের জন্মই বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দখল ছাড়িতে হইয়াছিল। আমাদের নেতাজীও বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু যতদিন বাঁচিয়াছিলেন অক্ষতকৌমার্য ব্রহ্মচারীর খ্যাতির লোভ বর্জন করিতে পারেন নাই। বিবাহ-বিষয়ক এই সকল বিভ্রাটই বুঝিতে পারি, কিন্তু তোমাদের শরৎচন্দ্রের বিবাহ-বিষয়ে কোনও হদিস পাই না। তাঁহার জীবিতকালেই মাতুল হরেন্দ্রনাথ বারবার তাঁহাকে “আজ্ঞারত্নচরী শরৎচন্দ্র” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন; তিনি তারিয়া তারিয়া বিশেষণটি পরিপাক করিয়াছিলেন, প্রতিবাদে ‘টু’ শব্দটি পর্যন্ত করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর শ্রীমতের দেব, গিরীন্দ্রনাথ সরকার, কানাইলাল ঘোষ প্রভৃতি মারকং জানা গেল, আজ্ঞারত্নচরীর এক নয়, একাধিক বিবাহ হইয়াছিল। নানা বিভ্রান্তিকর গুহবের একটা মীমাংসা করিয়া দিয়াছিলেন শেষ শরৎ-গবেষক অতুৎসাহী শ্রীমান গোপালচন্দ্র রায়। ‘ভারতবর্ষ’ ১৩৬১ অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্র পর্যন্ত পাঁচ মাস গভীর গবেষণার দ্বারা তিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়া দেন, শরৎচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল

১৯০৫-৬ সনে মেদিনীপুরের কৃষ্ণ অধিকারী (চক্রবর্তী) কত্য়া মোক্ষদা দেবীর সহিত। ইনিই বর্তমানে হিরণ্ময়ী দেবী নামে পরিচিত। বিবাহ হয় রেকুনে। এই প্রমাণের পর আমরা নিশ্চিত হইয়া পাশ ফিরিয়া যুগাইয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ শরৎচন্দ্রের আবালাভক্ত অমুজোপম “পুঁচু” অর্থাৎ ত্রিভুজিত্রুষণ ভট্ট মহাশয় ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের একখানি পত্ররূপী কালসাপ তাঁহার পুরাতন ঝাঁপি হইতে বাহির করিয়া এ কী কাণ্ড বাধাইলেন। এই পত্রে ১৯০৮ সন পর্যন্ত একটি মাত্র বিধিসঙ্গত প্রেমের উল্লেখ আছে বাহা শেষে “রজকিনী-প্রেম নিকষিত হেম” বলিয়া প্রমাণিত হইয়া চণ্ডীদাস-শরৎচন্দ্রকে বিবাগী করিয়া দেয়। এই পত্রে শরৎচন্দ্রের প্রচলিত জীবনালেখ্যগুলির ভ্রান্তিপ্রদর্শক তথ্য আরও অনেক আছে, সময়মত মিলাইয়া লইও। আপাতত তুমি শরৎচন্দ্রের এই কথাগুলি অহুধাবন করিয়া পড়—

আমার ইতিহাস একটু গুলিয়ে? মধ্যে এই রেকুনে দাম্পত্য প্রেম চর্চা করিতে গিয়া হঠাৎ দেখিলাম—পুরা গৃহী হইয়া পড়িয়াছি। দেড় কন্সরের মধ্যে সেই অসীম অগাধ প্রণয়ের তলা দেখি নাই। একদিন মধুর কলহ (!) বাধিয়া গেল এবং মানভঙ্গনের পূর্বেই দেখিলাম গৃহীণী আমার অভ্যন্তর আর একজন্ম সুপাত্রে বরমালা প্রদান করিয়াছেন। কাজেই আমি আমার পোটলা-পুঁটলি খাড়ে করিয়া এই ৩৬ মধুর গলির চারতলার একটা বর ভাড়া লইয়া বিছানা গাতিয়া চিৎ হইয়া চুকট টানিতে লাগিলাম।

এটা যে কি হইয়া গেল আজো তাহার মীমাংসা করিতে পারি নাই। বধু আমার ব্রহ্মদেশিনী ছিলেন না, বাঁটি বদেশী। বধম গুলিলাম তিনি রজককড়া, তখন কান মলিয়া এক হাত নাকথত দিয়া ঐরাবতীতে স্থান করিয়া আসিলাম ও পরদিনই Medical Certificate দিয়া Passage বুক করিয়া বিরহঝালা শান্ত করিতে হংকং চলিয়া গেলাম—কিয়তি পথে কলিকাতায় গিয়াছিলাম মাত্র। গুলিয়াছি চণ্ডীদাস নাকি ঐ রকম কি একটা করিয়া মাথুর লিখিয়াছিলেন, আমিও স্থির করিয়াছি বহুপূর্বে ‘চক্রবর্তী’ বলিয়া যেটা স্বপ্ন করিয়াছিলাম, এইবার সেটা শেষ করিব।

চিঠিখানির তারিখ ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯০৮। চিঠি জাল না হইলে, ওই দিন পর্যন্ত কোনও ব্রাহ্মণ-কস্তুর সহিত শরৎচন্দ্রের বিবাহ হয় নাই তাহা নিশ্চয় এবং পরবর্তী আঠারো বৎসরের মধ্যে যে বিবাহ হইবে না সে প্রতিজ্ঞাও করা হইয়াছে। ইহা নেশাখোরের উক্তিও নয়, কারণ এই চিঠিতেই শরৎচন্দ্র লিখিয়াছেন “মাস দুয়েক যদ খাই নাই।” তবে ?”

গোপালদাস এই “তবে ?”র জবাব দিতে পারেন শ্রীমান গোপাল দাস। আমরা তাঁহারই শরণাপন্ন হইতেছি।

“সাহিত্যিক অধ্যাতি”

গত ২২ আশ্বিন রবিবার ‘যুগান্তর সাময়িকী’তে আমাদের কালিদাসদাদা (কবি কালিদাস-রায়) এই শিরোনামায় একটি মর্মান্তিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। গোড়াটা এইরূপ :

অধ্যাতি খ্যাতিবুদ্ধির সবচেয়ে বড় মহায়ক। যে সকল সাহিত্যিকের রচনার কেবল সুখ্যাতিই হইয়াছে, তাহাদের খ্যাতি সীমাবদ্ধ—তাহাদের খ্যাতির বিস্তার হয় না। বাহাদের রচনার, সেই সঙ্গে তাহাদের আচরণের, চরিত্রের ও গতিবিধির অবিরত মিল্লা হইতে থাকে তাহাদেরই খ্যাতি ক্রমগতিতে বিস্তারিত হইয়া থাকে।

কথাগুলি প্রাণিধানযোগ্য। আমাদের আপত্তি করিবার কিছু নাই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ‘শনিবারের চিঠি’র উল্লেখ তিনি যেভাবে করিয়াছেন তাহাতে আমাদের স্বরূপটি ধরা পড়াতে আমরা চমকিত ও লজ্জিত হইয়াছি। আমাদের যেন শরৎচন্দ্রের ‘পল্লীসমাজ’ের রমার ভূমিকা ছিল। রমেশ জ্ঞাতীশঙ্কর, তথাপি—। পাঠকদের সুবিধার জন্ত ‘পল্লীসমাজ’ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :

সহসা জনতার মধ্যে একটুখানি পথের মত হইল এবং পরক্ষণেই রমা ক্রমপদে আসিয়া রমেশের হাত চাপিয়া ধরিল। কহিল,—‘হয়েছে—এবার ছেড়ে দাও।’ রমেশ তাহাও প্রতি অমৃদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল—‘কেন ?’ রমা দাঁতে দাঁত চাপিয়া অক্ষুট ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—‘এতলোকের মাঝখানে তোমার লজ্জা করে না, কিন্তু আমি যে লজ্জায় মরে যাই।’

কালিদাসদাদা অক্ষুঁক ও শাস্তভাবে যদি ‘শনিবারের চিঠি’র হিসাব খতাইয়া দেখিতেন তাহা হইলে প্রবন্ধটির উক্তি ও যুক্তি নিশ্চয়ই পরিবর্তন করিতেন। আজ ‘শনিবারের চিঠি’র বৃত্তেরা নিম্নিতদের অপেক্ষা অনেক বেশী পরিচিত, অনেক বেশী গৌরবান্বিত। শেখোক্তাদের যে দুই-চারিজন টাকের উপর টেকা মারিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেককেই সাহিত্যিক ভোল বদলাইতে হইয়াছে। ইহার অধিক টীকা নিশ্চয়োজন।

রাজ্যপুনর্গঠন

এইমাত্র (১০. ১০. ৫৫) ‘রাজ্যপুনর্গঠন’ কমিশনের সুপারিশ আমাদের হাতে আসিয়া পৌছিল। সম্যক বিবেচনা করিয়া দেখিবার সময় নাই; আজই “সংবাদ-

সাহিত্য" শেষ করিবার হুকুম পাইয়াছি। এইমাত্র জানিয়া পুলকিত হইলাম যে, কমিশন বাঙালীদের রাঁচির ধার পর্যন্ত রাস্তা অগম করিয়া দিয়াছেন। কমিশনকে অশেষ ধন্যবাদ। দুর্জয়লিঙ্গে সরাসরি আরোহণের পথ নির্মাণ করিবার স্থানও তাঁহারা দিয়াছেন। দাঁড়িলিং না হয় রাঁচি—বাহার 'বেধানে' স্থবিধা।

জপমন্ত্র

গোপালদা লিখিয়াছেন :

"যুগোপযোগী দুইটি জপমন্ত্র এই যুগের ছোকরাদের অস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছি। তোমাকে পাঠাই। প্রচার করিয়া দেখিতে পার।

এক। জপ মন জপ হারগিজ।

অয় অয় অয় নারগীজ।

দুই। ভবপারের নাইয়া।

তুমিই স্বরাইয়া।"

সেদিন ৪২০ ধারায় দেশবাসিকে লামেক করিতে নবপ্রযুক্ত দুইটি প্রতিষ্ঠানের সম্মুখে (একটি হারিসন বোডে, একটি কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে) বেক্রপ সাংঘাতিক ব্যাপার দেখিলাম তাহাতে মনে হইতেছে, গোপালদার জপমন্ত্র কাজে লাগিবে। ভাবিতেছি আমাদের জনপ্রিয় লাট সাহেবকে দিয়াই শুরু করাইব।

রবিন ছড়

লাট সাহেব বলিতে মনে পড়িল, আমাদের রাজ্যপাল সরাসরি রে-রে-রে-রে-মার্কী ভাকাতি না করিয়া ভিক্ষার ভাকাতিতে রবিন ছড় রঘুভাকাত এবং দহা মোহনের কীতিকেও শ্রান করিতে চলিয়াছেন। বাহাদের আছে এবং বাহাদের নাই তাহাদের মধ্যে সাম্যবিধানই বর্তমান যুগের সর্বাধিক সমস্ত। এই সমস্তার তিনি সহজতম সমাধান করিতেছেন। এই পরিমাণ আত্মাবনতি স্বীকার করিয়া দেশের এই পরিমাণ উন্নতি পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনও রাজ্যপাল করেন নাই। আমরা ধন্য।

রম্য

দণ্ড এবং অনীয় প্রত্যয় দুইটিই শুধু আলাদা, খাত্ত এক—রম্য খাত্ত। সেই অস্ত্রই রামরাজ্যে রম্য-রচনার এমন প্রবল তোড়। ঘোড়ার বাহাতে নেশা হয় সে খাত্ত বড়

সোজা নয়, কাজেই দেশহুঙ্ক লোক রেসের ঘোড়ার মত টগবগ করিয়া ছুটিতেছে। সাহিত্যের কমলবনে মদমত্ত হাতী প্রবেশ করিলেও রক্ষা ছিল—খানিকটা বশকীড়া দেখিয়া পরিতৃপ্ত হওয়া বাইত। কিন্তু ঘোড়ার বা গতিবেগ! ধুমকেতুর মতন পুচ্ছতাড়নাই শুধু খানিকক্ষণের অস্ত্র মালুম হইতেছে, তাহার পর সব ফাঁকা।

ইতিহাস

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়কে অশেষ ধন্যবাদ—তাঁহারা সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-সম্পর্কিত রচনাগুলি 'ইতিহাস' নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই 'ইতিহাস'র পৃষ্ঠায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহু বৈশিষ্ট্যের চমৎকার বাণীকল্প বিধৃত হইয়া আছে, ভারত-তরঙ্গীর বর্তমান নাবিকদের দিগদর্শনের অস্ত্র ভগ্নমধ্যে একটি এখানে সঙ্কলন করিয়া দিলাম :

যত যান যুরোপের আদর্শ-ধারা ভারতবর্ষের ইতিহাস পরিসের নহে।

যুরোপের আদর্শ যুরোপকে কোথায় লইয়া বাইতেছে তাহা আমরা কিছুই জানি না; তাহা যে স্থায়ী নহে, তাহার মধ্যে যে অনেক বিনাশের বীজ অন্তরিত হইয়া উঠিতেছে তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। ভারতবর্ষে প্রবৃত্তিকে যমন করিয়া শঙ্কহস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে—যুরোপ প্রবৃত্তিকে লালন করিয়া আত্মহত্যার উদ্বোধন করিতেছে। নিজদেশ এবং পরদেশের প্রতি আমাদের আসক্তি ছিল না বলিয়া বিদেশীর নিকট আমরা দেশকে বিসর্জন দিয়াছি—নিজদেশ ও পরদেশের প্রতি আসক্তি সম্বন্ধে গোবৎস করিয়া যুরোপ আজ কোন রক্তসমুদ্রের তীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অস্ত্রে শরে সর্বত্র কটকিত করিয়া তুলিয়া তাহার এ কী বিকট মূর্তি! কী সন্দেহ ও কী আতঙ্কের সহিত যুরোপের এতোক, রাজশক্তি পরশ্বরের প্রতি ক্রুর কটাক্ষপাত করিতেছে। রাজমন্ত্রীসকল টিগিরা টিগিরা পরশ্বরের মৃত্যুচাল চলিতেছে; রণতরীসকল মৃত্যুবাণে পরিপূর্ণ হইয়া পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রে যমসৌত্যে বাহির হইয়াছে। আফ্রিকায় এশিয়ার যুরোপের কুখিত লুণ্ঠগণ আসিয়া ধীরে ধীরে এক-এক পা বাড়াইয়া একটা ধাবার মাটি আক্রমণ করিতেছে এবং আর-একটা ধাবা সমুদ্রের জোলুপ অভ্যাগতের প্রতি উত্তত করিতেছে। যুরোপীয় সভ্যতার হিংসা ও লোভে অস্ত্র পৃথিবীর চারি মহাদেশ ও দুই মহাসমুদ্র জুজু হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর আবার মহাজনদের সহিত মজুরদের, বিনাশের সহিত দুর্ভিক্ষের, দুর্ভবন সমাজনীতির সহিত সোভালিজম ও নাইহিলিজমের বন্দ যুরোপের সর্বত্রই আসন্ন হইয়া রহিয়াছে। প্রবৃত্তির প্রবলতা, প্রভুত্বের সত্ততা, আর্থের উত্তেজনা কোনো কালেই শান্তি ও পরিপূর্ত্যায় লইয়া বাইতে পারে না, তাহার একটা প্রচণ্ড সংঘাত একটা তীব্র রক্তাক্ত পরিণাম আছেই। অন্তঃস্ব যুরোপের রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শকে চরম আদর্শ বিবেচনাপূর্বক তদ্বারা ভারতবর্ষকে মাপিয়া খাটো করিয়া ফেলা পাইবার হয়তো প্রয়োজন নাই। একটা কথা আছে : জীবনরং প্রাণশীল্য।

অধি কবির এই বাণী প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে প্রচারিত হইয়াছিল। আজ উপরের উদ্ধৃতিতে ‘ইউরোপ’ বলিতে পাশ্চাত্য দেশসমূহ (আমেরিকা সহ) এবং ‘নাইহিলিজম্’ বলিতে কম্যুনিজম্ বৃত্তিতে হইবে। বাহ্যের অন্ন এখনও জীর্ণ হয় নাই তাহাদের আন্দোলনে বিজ্ঞান হইয়া আমরা যেন তাহাদের অহসরণ না করি।

বস্তা

গোপালনা বস্তা সম্বন্ধে এবারে কিছুই লিখেন নাই। তবে বৈজ্ঞানিক শ্রীমতেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিয়াছেন, উড়িষ্কার জলোচ্ছ্বাস আণবিক কারণপ্রসূত হইতেও পারে। ‘শেষের কবিতা’র রবীন্দ্রনাথ আদর করিয়া লাভগ্যকে বস্তা নাম দিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, আদরের বাধ দিতে গিয়া আমরা প্রাকৃতিক লাভগ্যকে বস্তা করিয়া তুলিতেছি; বাধাবাধি যতক্ষণ পর্যন্ত পাকা না হইতেছে ততক্ষণ এ দুর্দৈব সহিতেই হইবে। তাহার পরের ভরসা রবীন্দ্রনাথ বস্তার শেষ চিঠিতে দিয়াছেন—“হে বন্ধু বিদায়!”

পূর্বাশা

‘পূর্বাশা’ তলাইয়া গেল, অথচ বাংলার সাহিত্য-সরোবরের কুজাপি এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা গেল না ইহাতে তাক্ষর বোধ করিতেছি। অথচ এই ‘পূর্বাশা’ দীর্ঘদিন

ধরিয়া অনেক রঙিন আশার স্বপ্নজাল স্বপ্নন করিয়াছিল। বেদের জন্ম পশ্চিমে, সেই বেদের ছন্দ যখন ‘পূর্বাশা’র উন্মিত হইল তখনই আমরা বলিয়াছিলাম, তদা নাশংসে বিজ্ঞানয় সম্ভব। আসলে এ যুগে পূর্ব-মার্কা কিছুই টিকিতেছে না। চাকার ‘প্রাচী’, কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর ‘পূর্বাচল’, মায় পূর্ববঙ্গ গেল, কাজেই ‘পূর্বাশা’ও টিকিল না। সেদিন ইন্স-বেঙ্গল টীমও পশ্চিমী রাজস্থানের কাছে মার খাইল। পূর্বাণর বিবেচনা করিয়া দেখিতেছি, পশ্চিমের আর্থ জাতির বংশধর আমরা—এখনও পশ্চিমই আমাদের ভরসা!

‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’

ত্রৈমাসিক ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’র পুনঃপ্রকাশ আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ‘ইতিহাসে’র অমৃততম সঞ্চলয়িতা এবং ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’র সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেন মহাশয়ের কর্মভংগপরতায় আমরা ক্রীত হইয়াছি। ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’, আশা করি, কাদম্বিনীর মত মরিয়া প্রমাণ করিবে না যে, সে বাঁচিয়া ছিল। আমরা তাহার দীর্ঘজীবন কামনা করি এই অমৃত যে, রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত মৌলিক উপাদান এখনও প্রচুর ইত্যন্ততঃ ছড়াইয়া আছে। ‘প্রবাসী’র সে উদ্ভব নাই, কাজেই ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’র বাঁচিয়া থাকা প্রয়োজন।

এই সংখ্যায় ‘শনিবারের চিঠি’র ২৭শ বর্ষ সম্পূর্ণ হইল। এই সংখ্যায় ষাঁহাদের চাঁদা শেষ হইয়াছে, তাঁহারা নূতন বার্ষিক অথবা বাৎসরিক চাঁদা (২২ অথবা ৪৪০) দয়া করিয়া আগামী ১৫ই কার্তিকের মধ্যেই পাঠাইয়া দিবেন। ঐ সঙ্গে অল্পগ্রহপূর্বক বৈশাখ ১৩৬২ হইতে আশ্বিন ১৩৬২ পর্যন্ত বর্ধিত হারে চাঁদার দরুন আমাদের প্রাপ্য ১৪০ আনাও পাঠাইবেন। ১৫ই কার্তিকের মধ্যে নূতন চাঁদা না আসিলে কার্তিক ১৩৬২ সংখ্যা যথারীতি ভি.পি. করিয়া পাঠানো হইবে। ভি.পি.-র সহিত বর্ধিত হারের দরুন প্রাপ্য ১৪০ আনাও দাবী করা হইবে। ষাঁহাদের গ্রাহক থাকিবার ইচ্ছা নাই, তাঁহারা অল্পগ্রহপূর্বক পত্রদ্বারা পূর্বাছুই জানাইবেন। নচেৎ ভি.পি. ফেরত আসিলে আমাদের অনর্থক ক্ষতি হইবে। কার্তিক সংখ্যা ২০শে কার্তিক প্রকাশিত হইবে।

আগামী সংখ্যা হইতে শ্রীমতেন্দ্রনাথ মিত্রের উপজ্ঞান ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবে।

প্রসঙ্গ কথা

শারদীয় সাহিত্য

সারায়ণ চৌধুরী

সাহিত্যের বিকাশের প্রাথমিক অধ্যায়ে ধর্মের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ ছিল নিবিড়। মধ্যযুগের শিল্প-সাহিত্যেও ধর্মের প্রভাব নিতান্ত বলবৎ দেখতে পাই। তারপর যতই দিন যাচ্ছে, আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রভাব-পরিধি থেকে শিল্প ও সাহিত্য ততই দূরে সরে যাচ্ছে বলে মনে হয়। আজকের দিনের পৃথিবীতে পরিবেশের আমূল পরিবর্তন হয়েছে : যেখানে পূর্বে ছিল ধর্মের আধিপত্য, সেখানে এক্ষণে রাজনীতি ও অর্থনীতি আসর জাঁকিয়ে বসেছে। রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রভাব অনিবার্যভাবেই একালের সাহিত্যের উপর এসে পড়েছে। ধর্মকে হটিয়ে দিয়ে রাজনীতি ও অর্থনীতির এই ক্রমপ্রাধান্যবিস্তার একালীন সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে।

কিন্তু মনে হয় ধর্ম বুদ্ধি এখনও তার পূর্ব-অধিকার সম্পূর্ণ ত্যাগ করে নি। আনুষ্ঠানিক ধর্মের আপাত-বিলীন প্রভাব এখনও বুদ্ধি সাহিত্যের ভিতর উকিঝুঁকি দেবার চেষ্টা করে। যে সংস্কার দীর্ঘকালের অনভ্যাসের ফলে মরে গিয়েছে বলে আমরা ধরে বসে আছি, দেখা যাচ্ছে তা ভিন্ন নামে ভিন্ন আকারে আজও আমাদের ভিতর কম সক্রিয় নয়। তা যদি না হত, তা হলে শারদীয়া মাহপূজার উৎসবকে অবলম্বন করে শারদীয় অবকাশের প্রাগমুহুর্তে বাংলা-সাহিত্যে প্রতি বৎসর এই আকস্মিক জোয়ারের উচ্ছ্বাস ও ফীতি কেন? আমরা কখনও কি তলিয়ে ভেবে দেখেছি, প্রতি বৎসর ঠিক এই সময়েই কেন সমসাময়িক বাংলা-সাহিত্যের তৎপরতা পরিমাণ ও ব্যাপ্তির দিক দিয়ে দ্বিগুণ চতুগুণ বহুগুণ হয়ে ওঠে? এই সময়ে প্রচলিত পত্র-পত্রিকাগুলি ব্যতিক্রম-বিরহিত ভাবে সকলেই যেমন তাঁদের পূজা-সংখ্যা প্রকাশ করেন, তেমনি এই উপলক্ষে কত যে নতুন পত্র-পত্রিকার উদ্ভব হয় তার সীমাসংখ্যা নেই। পল্লী অঞ্চলের মেলায়

যেমন ভিড়ের দাবীর মুখে নতুন নতুন দোকান বাতারাতি গজিয়ে ওঠে আবার মেলা মিলোবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা অন্তর্ধান করে, তেমনি শারদীয় পূজা-উৎসবের সূত্রে এমনি বহু ক্ষণপ্রভ পত্র-পত্রিকা বাংলার সাহিত্যাকাশে সহসা উদ্ভিত হয়ে কিঞ্চিৎ আলোক বিকিরণ করেই পরমুহুর্তে নিবে যায়। শারদোৎসব উপলক্ষে বাংলা-সাহিত্যে যেন হঠাৎ আত্মপ্রকাশের এক প্রচণ্ড হিড়িক পড়ে যায়।

যদি বলেন, এর সবটাই সামাজিক উৎসবের বহির্লক্ষণ মাত্র, সে কথায় পুরোপুরি সায় দিতে পারব না। নিছক সামাজিক উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রাণশক্তির এমন উচ্ছ্বসিত ক্রোধোন্মেষ বহিঃপ্রকাশ ঘটা সম্ভব কি না সন্দেহ। অনেকে আজকাল পূজা-উৎসবকে কেবলই মাত্র সামাজিক উৎসব আখ্যা দিয়ে তার অন্তরালে নিজেদের ঐতিহ্যবোধ-হীনতাকে গোপন করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এ-জাতীয় একপেশে দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা বাংলা দেশের শারদীয় পূজা-উৎসবের প্রকৃত তাৎপর্য উদ্ঘাটিত হয় কি না সন্দেহ। এই উৎসবের স্বরূপের পরিচয় নিতে হলে আরও অনেক গভীরে আমাদের দৃষ্টি সঞ্চালিত হওয়া প্রয়োজন। সামাজিক দিক শারদোৎসবের একটি প্রধান দিক সন্দেহ নেই, কিন্তু তা ওই উৎসবের একটি মৌলিক উপাদান নয়, মৌলিক উপাদানের পরিণামকল মাত্র। শারদীয় উৎসবের সামাজিকতার দিক স্বভাবগত নয়, স্বভাবসম্মত। ওর প্রকৃতি derivative। দেবীপূজার বহির্ভাগে রয়েছে সামাজিকতা, তার অন্তরের কেন্দ্রমধ্যে পবিত্র ধর্মভাবের প্রাধান্য। এখনও যে আমাদের স্বভাবের ভিতর আনুষ্ঠানিক ধর্মের বোধ কত প্রবল, তথাকথিত সামাজিক অনুষ্ঠানমাত্রসার সর্বজনীন পূজার মণ্ডপে প্রবীণবয়সী স্ত্রী-পুরুষের ভক্তিপ্লুত আচরণ লক্ষ্য করলে তা বোঝা যায়। আর শিশুদের মধ্যেও সহজ বিশ্বাসের স্থিরত্বাতি লক্ষণীয়।

শিশুর স্বভাব যেহেতু বাহ্যিক প্রভাবের দ্বারা তেমন স্পষ্ট নয় সুতরাং অল্পবিস্তর অবিকৃত, সেই-হেতু শিশুর আচরণের মধ্য দিয়ে বৃদ্ধি জাতীয় স্বভাবের একটি খাঁটি আদল পাওয়া যায়। শিশু ও কিশোরের স্বভাবে সহজ ধর্মবিশ্বাস ঘেন ওতপ্রোত হয়ে আছে। ওদিকে আপাতবিচারে হিন্দু-ধর্মের প্রভাবসীমা-অতিক্রমকারী এককালীন বিগ্রহপূজক অধুনা সংস্কারমুক্ত ব্যক্তির মনেও যে মাতৃপূজার ভাব কত প্রবল তারও নজর আছে। স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তাঁর আত্মজীবনীতে স্বগ্রামের (পৈল, খ্রীষ্ট) স্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, প্রতিমাপূজার সংস্কার তিনি বহুকাল বিসর্জন দিয়েছেন। কিন্তু এখনও যখন তিনি শারদীয় ছুটি উপলক্ষে তাঁর গ্রামে যান এবং পথে বেড়াতে বেরিয়ে কোন পূজামণ্ডপে স্থান্য চালচিত্র-আচ্ছাদিত দুর্গাপ্রতিমা নিরীক্ষণ করেন, ভক্তিতে তাঁর মাথা অবনত হয়ে আসে।

এ থেকে বোঝা যাবে মাতৃপূজার সংস্কার বাঙালী জাতির ভিতর কতদূর প্রবল ও দূরতীক্রম্য। মূর্তিপূজার ভালমন্দ নিয়ে আপাততঃ আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার ইচ্ছা আমাদের নেই। হয়তো অভ্যাসটি যুক্তিহীন, হয়তো নয়—কিন্তু এই অভ্যাসের সূত্রেই যে বাঙালী জাতির প্রাণ-ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি ঘটে সে কথা তো অস্বীকার করতে পারি নে। এই যে পূজা-উৎসবের পূর্ব-মুহূর্তে ইতরভ্রূনির্বিশেষে সমস্ত মাহুয়, সমগ্র বাঙালী জাতি দুর্বার প্রাণচাক্ষুসে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, দু-চার দিনের অভ্যাসে এ জিনিস গড়ে ওঠে নি। এর পিছনে আছে শত শত বর্ষের অবিচ্ছিন্ন নিয়মের অনতিক্রম্য গভীর প্রভাব। জড়বাদী হোন ঈশ্বরবিশ্বাসী হোন, প্রতিমাপূজক হোন চাই অ্যাবস্ট্রাক্ট উপাসনা-পদ্ধতিতে আত্মাশীল হোন, প্রত্যেক হিন্দু বাঙালীর স্বভাবের ভিতর এই প্রভাবের মূল খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে করি। ঐতিহ্যকে অস্বীকার করতে চাইলেই তা অস্বীকার করা যায় না, তার জড় এত সহজে বিনষ্ট হয় না।

বাঙালীর শারদীয় সাহিত্যের আকস্মিক ক্ষীতির মূলেও ওই একই কারণ নিহিত রয়েছে বলে মনে হয়। শারদীয় সাহিত্য পূজা-অহুষ্ঠানেরই যেন একটি অপরিহার্য অঙ্গ। লোকে যেমন পূজা-উৎসবের উপচার হিসাবে সেন-মহাশয়ের

সন্দেশ, জলযোগের বা গান্ধীবাসের নই, আর যে-কোন প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন-বিক্রেতার দোকান থেকে হাঁড়িতে ভরে পাস্কয়ার-রসগোল্লা কিনে নিয়ে যায়, তেমনি একটি সুপরিচিত বাংলা দৈনিকের ক্ষীতকলেবর শারদীয় সংখ্যাটিকেও বগলদাবা করে গৃহ অভিমুখে রওয়ানা হয়। আসলে ওটিও হাঁড়ির পাস্কয়ার-সংগোত্র। যেমন মেকি রঙের জোলুসে চটকদার, তেমনি কড়া মিষ্টি। পূর্বেই বলেছি, শুধু যে এই পত্রিকাটিই রঙদার ও বিচিত্র উপকরণের সমবায় হঠাৎ টাউন হয়ে আত্মপ্রকাশ করে তাই নয়, বহু বহু পত্রিকা এই উপলক্ষে শারদীয় উৎসবের সমারোহ ও সৌকর্য বিধানে সাধ্যাত্মস্বায়ী আপনাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলবার চেষ্টা করে। যার যেরূপ সঙ্গতি তার তদনুরূপ আয়োজন। শারদীয় খুশির জোয়ারে সবাই গা ভাসিয়ে দিতে ব্যগ্র, ইন্তক সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলি। এমন কি যে সাপ্তাহিক পত্রিকাটির সঙ্গে আঠেপুঠে নামাবলীর ছাপের মত সঘৎসর ছোকরা লেখকদের লিখিত এবং হঠাৎ-গজানো ভূইফোড় প্রকাশক-প্রতিষ্ঠান-গুলির প্রকাশিত বইয়ের বিজ্ঞাপন ছাড়া আর বিশেষ-কিছু পাঠ্যবস্তু থাকে না, পত্রিকা বললে যে পত্রিকার সঠিক পরিচয় দেওয়া হয়, সেই অতি তুচ্ছ কাগজটিও হঠাৎ শারদীয় উৎসবের সূত্রে পরমরমণীয় হবার চেষ্টা করে। শুধু কি তাই, পরমতম আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, ওই পাঞ্জি-সাপ্তাহিকেরও পূজা-সংখ্যায় পাঠ্যবস্তু কিছু থাকে। এদিকে অগ্রান্ত পত্রিকার বেলায়ও আয়োজন-সমারোহের অন্ত থাকে না। মোট কথা, পূজা উপলক্ষে বাংলার গোটা মূত্র-জগৎটাই যেন হঠাৎ স্বতোংসার প্রাণের আনন্দে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে।

পূজা-সংখ্যাগুলিতে গল্প-লেখকদের পোয়া-বারো। প্রকাশকরা গল্পের বই সহসা ছাপতে চান না, পত্রিকাগুলির সাধারণ সংখ্যায় গল্পের চাহিদা তেমন প্রবল নয়, কিন্তু পূজা সংখ্যায় গল্পই হল প্রধান আকর্ষণের বিষয়। পত্রিকা-পরিচালকগণ পূজা-সংখ্যার সৌষ্ঠববৃদ্ধির জন্য সংখ্যাটিতে সাধ্যাত্মস্বায়ী সর্বাধিকসংখ্যক গল্পের সমাবেশ ঘটাবার চেষ্টা করেন। প্রবন্ধ সমালোচনা চিন্তামূলক রচনা কিংবা কবিতার পক্ষে সময়টি দুঃসময়। তবু বরং কবিতার কিছু মর্দান এ সময়ে আছে, কিন্তু মননশীল সাহিত্য সাময়িক-ভাবে নিতান্তই কোণঠাসা হয়ে পড়ে। পত্র-পত্রিকার

অঙ্গসজ্জার মনোযোগের এই যে ক্ষেত্রপরিবর্তন, এটি অকারণ নয়। পূজা-উৎসবের স্থচনায় সকলেরই মনে খুশি-খুশি ভাবের উদয় হয়। শরৎ-আকাশের নিবিড় নীলিমা আর গুচ্ছ গুচ্ছ কাশফুলের মত আকাশের গায়ে সতত-সংকরমাণ সাদা মেঘ আর দিগ্‌মণ্ডল-পরিব্যাপ্ত সোনা-রঙ বোদের চেহারার মধ্যেই এমন কিছু আছে যা বাঙালীর প্রাণকে চঞ্চল করে তোলে। শারদীয় ছুটি আরম্ভ হওয়ার অনেক আগে থেকেই ছুটির আনন্দ চারিদিকের আবহাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। মাস্তবের মনে উৎসবের রঙ লাগে, কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও ছুটির খুশি চিলকিয়ে ওঠে। আকাশে বাতাসে হালকা-চটুল স্ফুতির ভাবটাই সব ছাড়িয়ে বড় হয়ে ওঠে। স্বভাবতই এ-জাতীয় সর্বব্যাপী হালকা আবহাওয়ায় গল্প উপভাস রম্যরচনা কিংবা সদৃশধর্মী রচনা ছাড়া আর কিছুই পাঠোপযোগিতা থাকতে পারে না, থাকে না। উৎসবানন্দের সংস্পর্শপ্রভাবাৎ চিন্তার অভ্যাস, মাথা খাটিয়ে কিছু বোঝবার অভ্যাস, সমগ্র মনোযোগ ও অভিনিবেশ সংহত করে পাঠ্যবস্তু অন্বেষণের অভ্যাস সাময়িকভাবে শিকায় তুলে রাখা হয়। এমন কি, যারা প্রকৃতিগতভাবে চিন্তাশীল মনোজীবী শ্রেণীর মানুষ, তাঁরাও এ সময়ে তারল্যের প্রভাবের ছোয়াচ সম্পূর্ণ এড়াতে পারেন না। তাঁদের চিন্তাভঙ্গীর মধ্যেও শৈথিল্য তথা স্রবতার আমেজ প্রবেশ করে সাময়িকভাবে তাঁদের স্ফুর্তি-প্রবণ করে তোলে। যে ব্যক্তি সম্বৎসর কাজ ছাড়া কিছু জানে না, সেই কাজ-পাগলা ব্যস্তব্যাপী প্রয়োজনসর্বধ্ব মাস্তবের মনেও অকস্মাৎ অপ্রয়োজন্যের আনন্দ এসে দোল দিয়ে যায়। গল্পোপভাসের চেহারার সঙ্গে যার ন্যূনতম পরিচয়ও নেই, তেমন অরসিক ব্যক্তিকেও পূজার ছুটির অবকাশে শারদীয় সংখ্যার দু-চারটি গল্প নাড়াচাড়া করে আনন্দ উপভোগ করতে দেখা যায়। গল্পবৃত্ত কলেজ-পড়ুয়া ছেলেছোকরা আর মেয়েদের তো কথাই নেই, তাদের কেজো অভিভাবকরাও যেন হঠাৎ গল্পের নেশায় মেতে ওঠেন।

স্বভাবতই গল্পলেখকের দল এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। সারা বৎসরের ক্ষতি তাঁরা এই সময়ে সুদে-আসলে পুষিয়ে নেন। সবাই আদাজল খেয়ে লেগে ধান এই উপলক্ষে কে কত বেশীসংখ্যক গল্প নির্মাণ

করতে পারেন সেই শাসরোধকারী প্রতিযোগিতায়। স্বজনী-তৎপরতার এই আকস্মিক আত্যস্তিক স্ফাতি ভাল মন্দ উভয় সম্ভাবনাই বহন করে। ভাল, যেহেতু পিছনে পূজা-সংখ্যার চাহিদার অঙ্কুশ-তাড়ন না থাকলে হয়তো এক-একজন লেখকের পক্ষে সাকুল্যে এত অধিকসংখ্যক গল্প লেখাই সম্ভব হত না। শারদীয় সাহিত্যের দাবীপূরণের সূত্রে লেখকদের স্বজনী-কল্পনার উৎস সহসা যেন অপ্রত্যাশিতভাবে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে এবং সেই খাত বেয়ে ভাবনাকল্পনার স্রোত স্বচ্ছন্দ ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। এইরূপ আকস্মিক প্রয়োজন্যের তাগিদে সৃষ্ট সব গল্পই উৎকর্ষলক্ষণমণ্ডিত হয় তা নয়, তবে অনেক গল্পই শেষ অবধি উৎরে যায়। অপকৃষ্ট গল্পের তুলনায় পাঠযোগ্য গল্পের সংখ্যাই যেন বেশী। কেমন করে এই অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটে সেইটে এক পরম বিস্ময়, তবু ব্যাপারটি সম্পূর্ণ সত্য। খুব সম্ভব, পূজার সর্বব্যাপী আনন্দের আবহের সঙ্গে লেখকদের স্বজনী-স্ফুতির কোনরূপ সূক্ষ্ম যোগ থেকে থাকবে।

মন্দ, কেন না সমস্ত বৎসরের তৎপরতা বৎসরের একটি মাত্র পর্বে কেন্দ্রীভূত হওয়া স্বলক্ষণ নয়। ওতে প্রচুর মানসিক ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়। জীবনব্যাপনপ্রণালীতে ছন্দ ও শৃঙ্খলাও এটি পরিপন্থী। মস্কো পড়ে তোলা নিয়মনীতি এতে ছত্রপান হয়ে যায়। এই বিশৃঙ্খলার কুকল ব্যক্তিবিশেষেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তা জাতীয় অভ্যাসের উপরও তার দাগ রেখে যায়। যে তৎপরতা ও উত্তম গোটা বৎসরের পরিধিতে পরিব্যাপ্ত হলে একটা গ্রাসমুক্ত সৌম্য ও সংযম অর্জন করতে পারত, তা বৎসরের একটি কি দুটি মাসে সংহত হওয়ার ফলে জীবনীশক্তির উপর অত্যধিক চাপ পড়ে। জাতির স্বাস্থ্যের উপর এর প্রভাব অহিতকর না হয়ে পারে না। রবীন্দ্রনাথের 'বিলাসের ফাঁস'এর উপমার অন্বেষণ করে বলতে পারি, এ যেন দেহের সমস্ত রক্ত মুখমণ্ডলে উৎক্ষিপ্ত ও সঞ্চিত হওয়ার মত প্রাণঘাতী ব্যাপার। আমাদের জাতীয় কার্যপ্রণালীর মধ্যে শৃঙ্খলা, সংযম ও পরিমিতিবোধ না আসা পর্যন্ত এই অস্বাস্থ্যের অভ্যাচার থেকে কোনক্রমেই বোধ হয় আমরা নিস্তার পাব না।

গল্প-লেখকদের কথা হচ্ছিল, তাঁদের কথাই আরও

কিছুক্ষণ বলব। যে সকল কথা-সাহিত্যিক শারদীয় সংখ্যা-গুলিকে তাঁদের নিপুণ হাতের লেখা গল্প-উপন্যাস দিয়ে সমৃদ্ধ করে তোলেন, তাঁদের প্রথম সারিতে আছেন—‘পরশুরাম’, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘বনফুল’, শৈলজ্ঞানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রবোধকুমার সাত্তাল, মনোজ বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী ও স্ববোধ ঘোষ। এর পরের ধাপে (গুণাহুক্রেমে নয়, বয়স অঙ্কসারে) আছেন—বিমল মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, দীপক চৌধুরী, নবেন্দু ঘোষ, সন্তোষকুমার ঘোষ, ‘রঞ্জন’, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, অরেন্দ্র ঘোষ, হুম্মীল আনা, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, গজেন্দ্র মিত্র, হুম্মীল রায়, রণজিৎকুমার সেন, প্রভাত দেব-সরকার প্রভৃতি। অপেক্ষাকৃত অপ্রবীণবয়সীদের মধ্যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন—সমরেশ বসু, ননী ভৌমিক, বিমল কব, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী প্রভৃতি। একেবারে হালে যারা লিখছেন তাঁদের ভিতর এই কয়জনার নাম করতে পারি—মানবেন্দ্র পাল, সঙ্কর্ষণ রায়, সত্যজি সমাজদার, ‘বিক্রমাদিত্য’ ও শচীন ভৌমিক। শেষের সারির লেখকদের রচনাবৈশিষ্ট্যের উপর এক নজর চোখ বুলোনো যেতে পারে।

গল্পলেখক হিসাবে শ্রীমানবেন্দ্র পালের ভবিষ্যৎ অতিশয় উজ্জ্বল। প্রবন্ধ ও নিষ্ঠাসাপেক্ষে তাঁর এই উজ্জ্বল সম্ভাবনা কোনক্রমেই খণ্ডিত হওয়ার নয়। বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও গল্পকথন রীতিতে এই নবীন লেখক রবীন্দ্রনাথের দ্বারার একজন শক্তিশালী উত্তরসূর্য। এঁর গল্পে চটক নেই, ভাবার জোলুস নেই, আধুনিক কালের মানুষের মনো-বিকাশের বিশ্লেষণমূলক মনস্তাত্ত্বিক কারিকুরিও নেই, অথচ সহজ সরল কথায় গল্পোচিত পরিবেশ ও চরিত্র সৃষ্টিতে এঁর কুশলতার অবধি নেই। এঁর গল্পের আবেদন স্পষ্ট ও প্রসঙ্গ। আবার এরই মধ্যে লেখক মনের ভিতর সূক্ষ্ম বেদনার একটি আশ্রয় ফুটিয়ে তোলেন। এঁর লেখায় বিজাতীয়তার প্রভাব আদৌ নেই, বাংলা দেশের মাটি ও মানুষ এঁর প্রতি রচনার উপজীব্য বিষয়।

শ্রীসঙ্কর্ষণ রায় সামান্য ছ-একটি কথার আঁচড়ে গল্পের

উপযুক্ত আবহাওয়া ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম। এই ‘শনিবারে চিঠি’তেই তাঁর “জল,” “খড়,” “মরুগ্রাস” প্রভৃতি গল্প যারা পড়েছেন তাঁরা এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন। এঁর রচনায় বাহ্যিক একেবারেই নেই, শব্দ-নির্বাচনে ও বাক্যগঠনে ইনি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক মনোভাবের দ্বারা চালিত, অথচ সব জড়িয়ে তাঁর গল্প নিটোল একটি শিল্পরূপ লাভ করে। গল্পের কারুকৃতির দিক দিয়ে ইনি যে একজন নিপুণ কলাকার সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। শ্রীসঙ্কর্ষণ রায় পত্র-পত্রিকায় বিরলদর্শন লেখক। সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হলে লেখকের পক্ষে উচিত হবে আরও অনেক বেশী সক্রিয় হওয়া, অর্থাৎ আরও ঘন-ঘন লেখা এবং আরও ঘন ঘন আত্মপ্রকাশ করা। নিছক গুণের উপর নির্ভর করে, পরিমাণের উপর একেবারেই কোনরূপ জোর না দিয়ে, পাঠকমনের উপর প্রভাব বিস্তার করবার জায়গা বাংলা সাহিত্যে নয়। এখানে রচনা প্রাচুর্যেরও কিঞ্চিৎ আবশ্যকতা আছে। আর খতিয়ে দেখলে রচনাপ্রাচুর্য ও শক্তির প্রকাশক।

শ্রীসত্যজি সমাজদার নবীনবয়সী লেখক। গল্পের চাইতে গল্পের পরিবেশ সৃষ্টির দিকে এঁর শিল্পীমনের সমবিক পক্ষপাত। ভাষাপ্রয়োগে ইনি বর্ণাঢ্যতার আদর্শের সবিশেষ অহরণী। শব্দের ধ্বনিময়তা, চটক ও সমারোহ সৃষ্টি করতে পারলে ইনি আর কিছু চান না। এতে পরিবেশ বড়দার হয়, কিন্তু গল্পের গল্পত্ব বাধা পায়। রচনারীতিতে ইনি মানবেন্দ্র পালের সম্পূর্ণ বিপরীতপন্থী লেখক। তবে এঁরও শক্তি আছে। পরিবেশের প্রতি মায়্যা কমিয়ে চরিত্রসৃষ্টির সৌকর্যের দিকে ইনি যদি আরও কিছুটা দৃষ্টি দেন তবে এঁর গল্প রসোত্তীর্ণ হবে নিঃসন্দেহ।

‘বিক্রমাদিত্য’ ও শ্রীশচীন ভৌমিকের গল্প বলার টেকনিক বিদেশীস্বরে আবৃত। গল্পের সমাপ্তিতে প্রায় দুজনেই আকস্মিক চমক সৃষ্টির আদর্শের—surprise-এর—পক্ষপাতী। পদ্ধতিটি মোপাসাঁ শেখত প্রমুখ শ্রেষ্ঠ গল্পলেখকদের দ্বারা বহুপরীক্ষিত হলেও এবং চর্চায় চর্চায় তার দার ক্ষয়ে গেলেও এ রীতির সার্থকতা বুঝি আজও সম্পূর্ণ অপগত হয়ে যায় নি।

আধারের দেশ—আলোর দেশ

শ্রীমনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

আধারেতে ভয় করি না, আধার আমি বাসি ভালো,
আধার দেখলে মনে পড়ে—ভাষা না মোর এমনি কালো।
ভয়ের আকার দেখলে পরে, ডাকি আমার ভাষা মারে—
আধার মাঝে দেখতে যে পাই মারের রাঙা পায়ের আলো।

আধারের দেশ আফ্রিকা

আফ্রিকাকে Dark Continent অর্থাৎ “আধারের মহাদেশ” বলা হ’য়েছে। সেদিন পর্যন্ত ইউরোপ আর এশিয়ার লোকেদের কাছে এই দেশ অজ্ঞাত আর অন্ধকারে পূর্ণ ছিল। কিন্তু ইউরোপীয় জাতির কোঁতুহলের কল্যাণে, আর আরব এবং ইউরোপীয় জাতির প্রসার ও শোষণ-নীতির ভাগিদে, আফ্রিকা আর “আধারের দেশ” নেই, এখন আফ্রিকা জ্ঞানের এবং পরিচয়ের পূর্ণ আলোকের মধ্যে এসে প’ড়েছে। এই পরিচয়ের অভাব ছাড়া আফ্রিকাকে “আধারের দেশ” বলার দুটো কারণ ছিল এই যে, এক, উত্তর-আফ্রিকার Hamitic হামীয় বেরবের তুমারগ প্রভৃতি জাতির মানুষ, আর Semitic শেমীয় আরব জাতির মানুষ, এবং কতক অংশে দক্ষিণ-আফ্রিকার বৃশম্যান আর হোটেন্টট জাতির মানুষ ছাড়া, আফ্রিকার বেশীর ভাগ অধিবাসী হ’চ্ছে নিগ্রো জাতির—এদের গায়ের রঙ কালো, এবং এই কালোর রকমারি সৌন্দর্য আছে—ঘন নীলাভ কৃষ্ণ থেকে আরম্ভ করে লালচে রঙের কালো, এক কালো রঙই কতো রকমের, সে কালো রঙের সৌন্দর্য বাইরের লোকেদের চোখে ধরা পড়ে না। আর দ্বিতীয় কথা হ’চ্ছে এই যে, যে-সব খ্রীষ্টান মিশনারি এই আধারের দেশে খ্রীষ্টান ধর্মের আলোক নিয়ে আসেন, তাঁদের সকলেরই এই ধারণা ছিল যে, আফ্রিকা অজ্ঞান আর কুসংস্কারের অন্ধকারে আবৃত ছিল, এবং এই মিশনারিদের কল্পনা অহুযায়ী একমাত্র খ্রীষ্টান ধর্মই সেই অন্ধকার দূর করতে পারে। তেমনি আরব আর বেরবের জাতির ইসলাম-প্রচারকদেরও মনের ভাব সেই রকমই ছিল।

রহস্যময় আফ্রিকা

কিন্তু এই নোতুন যুগে আফ্রিকা সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী बदলানোর সময় এসেছে। কতকগুলি বিষয়ে আফ্রিকা

নানা অদ্ভুত জিনিসেরই দেশ। আফ্রিকার গাছপালা আর পশুপক্ষী, উদ্ভিদজগৎ আর প্রাণিজগৎ, কতকগুলি বিষয়ে আশ্চর্য্যভাবে রক্ষণশীল—এখানে এমন অনেক প্রাচীন উদ্ভিদ আর প্রাণী বহু লক্ষ বছর থেকে প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় বিদ্যমান, এবং এখানে এমন কতকগুলি গাছপালা এবং ক্রান্ত-জানোয়ার পাওয়া যায় যেগুলি পৃথিবীর অন্তর্জ মেলে না। আফ্রিকার বাওবার গাছ, আফ্রিকার Oil Palm বা ‘তেল-সুপারি’ গাছ, আফ্রিকার কোলা-সুপারি, রকমারি ধূপ-রজনীর গাছ, আর তা ছাড়া উদ্ভিদ-জগতের কতকগুলি এ যুগের প্রাপ্তব্য প্রাগৈতিহাসিক অবশেষ—এগুলিও লক্ষণীয়। তার পর আছে আফ্রিকার হাতী—আমাদের ভারতীয় হাতীর চেয়েও বড়, কান আর দাঁত দুই-ই বড় বড়; আছে আফ্রিকার গণ্ডার, হিপোপটেমাস বা নদীর গণ্ডার; জিরাফ, জেব্রা, ওকাপি, কোয়াগা, ঘু ইত্যাদি অদ্ভুত-অদ্ভুত জন্তু; আর আছে নরাকার বানর, যেমন গরিলা আর শিম্পাঞ্জি। আরও লক্ষণীয় হচ্ছে—সত্যাকার আফ্রিকান মানব, তার দৈহিক গঠন আর মানসিক প্রকৃতি; শক্তি এবং সামর্থ্যে উজ্জল, কালো গায়ের রঙ, মনে সারল্য আর সদানন্দ-ভাব, আর প্রকৃতির সঙ্গে সায়ুজ্য—এই সব মিলে আফ্রিকার মানবকে মানব-জগতের এক অতি বিশিষ্ট শাখা-রূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। এই আফ্রিকার মানুষ সহস্রয় লোক মাত্রকেই বিশেষভাবে আকর্ষণ করবে, আর এর সঙ্গে একটু পরিচয় হ’লে, একে ভালো না বেসে পারবে না।

মানব-জাতির তিনটি প্রধান রূপভেদের মধ্যে নিগ্রো অর্থাৎ আফ্রিকার কালো মানুষ হ’চ্ছে অন্যতম। আর দুটি হচ্ছে Caucasoid অর্থাৎ ককেশীয় বা গৌরবর্ণ মানুষ (শ্রামবর্ণ মানুষের রঙ তুলনায় ময়লা হ’লেও এই পর্যায়ের পড়ে), আর Mongoloid অর্থাৎ মোঙ্গোলীয় বা পীতবর্ণ মানুষ (আমেরিকার আদিম অধিবাসী “লাল মানুষ” এরই এক শাখা)। অতি আদিম কালে মানব-জাতির মানব-রূপে আবির্ভাবের সময়েই খেত বা গৌরবর্ণ মানুষের উৎপত্তিতে এই আফ্রিকার কালো মানুষের প্রভাব বা মিশ্রণ ঘটেছিল। আমাদের দেশ ভারতবর্ষে সব-চেয়ে আদিম অধিবাসী হ’চ্ছে এই আফ্রিকার কালো মানুষেরই এক শাখা—এটা নৃতত্ত্ব-

বিদ্বদের গবেষণা। ভারতবর্ষের এই আদিম Negroid বা নিগ্রো জাতীয় কালো মানুষ এখন দু-এক জায়গা ছাড়া আর কোথাও স্বতন্ত্র-ভাবে বেঁচে নেই—কেবল দক্ষিণ-ভারতে আর আন্দামান দ্বীপে এদের কিছুটা অবশেষ অত্যন্ত হীন অবস্থায় এখনও দেখা যায়। তবে নৃতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন যে, এই আদিম কালো মানুষের ধর্মবিশ্বাস-সংক্রান্ত কতকগুলি ধারণা আর অহুষ্ঠান, পরবর্তী কালে যে-সব জাত এসে এদের আত্মসাৎ করে নিয়েছিল বা একেবারে উচ্ছেদ করে দিয়েছিল, তাদের মধ্যে পরিবেশ-প্রভাবে কিছুটা সংক্রামিত হয়েছিল। আর এই-সব পরবর্তী জাতির বংশধর আধুনিক ভারতীয়দের মধ্যে এদের এই-সব আদিম বিশ্বাস আর অহুষ্ঠান কোন-কোন ক্ষেত্রে রয়ে গিয়েছে।

আফ্রিকা ও বিশ্বজগৎ

প্রায় দু হাজার বছর আগে রোমানেরা আফ্রিকার দিকে নজর করে অভূত রসে আগ্রহ হ'য়েছিল—খালি রোমানরা নয়, গ্রীকেরাও, আর তার পরেও ইউরোপ ও এশিয়ার নানা জাতের মানুষ, আফ্রিকার সঙ্গে যাদের সংযোগ ছিল। রোমানদের লাতিন ভাষার একটা প্রবাদ আছে, তার মানে হ'চ্ছে—আফ্রিকা থেকে যা আসে, তা সদাই নিতুই-নব। যে-সব দেশ ভূগোলের দিক থেকে বিচার করলে আফ্রিকার অংশ বটে, কিন্তু সভ্যতায় আর সংস্কৃতিতে ততটা আফ্রিকার নয়, বরং এশিয়ার, সে-সব দেশের কথা আলাদা—যেমন মিসর, তুনিস্, মরক্কো। মিসরের দক্ষিণে কালো মানুষের দেশ হুবিয়া, আর তারও দক্ষিণে একেবারে অল্প আফ্রিকার জঙ্কলের মানুষ—এদের সঙ্গে সভ্য-জগতের লোকদের তেমন পরিচয় ছিল না। ক্রীতদাস হ'য়ে মিসরের মারফৎ আর উত্তর-আফ্রিকার অন্তর দেশের মারফৎ দু-দশ জন আফ্রিকার কালো মানুষ ভূমধ্য-সাগরের সভ্য দেশগুলিতে কখনও-কখনও এসে পৌঁছত। আর এই ছিল সেদিন পর্য্যন্ত আফ্রিকার সঙ্গে বাইরের জগতের যোগসূত্র। মিসরের এক রাজা নেখো খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে কতকগুলি ফিনিশীয় বণিককে জাহাজে করে আফ্রিকার কিনারা ধরে সমগ্র আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়েছিলেন বলে শোনা যায়—তারা পূর্ব-

আফ্রিকা থেকে শুরু করে দক্ষিণ-আফ্রিকা আর পশ্চিম-আফ্রিকা ঘুরে, জিব্রাল্টার প্রণালীর ভিতর দিয়ে ভূমধ্য-সাগর বেয়ে আবার উত্তর-মিসরে ফিরে আসে; আর তা ছাড়া, কার্থেজ নগরী থেকে হান্নো নামে একজন নাবিক জাহাজে করে আটলান্টিক মহাসাগর ধরে পশ্চিম-আফ্রিকার গিনি প্রদেশ পর্য্যন্ত এসে ঘুরে যান, তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তের গ্রীক অনুবাদ পাওয়া গিয়েছে। পূর্ব-আফ্রিকা থেকে গোলাম বা ক্রীতদাস ধরে নিয়ে যাওয়া আর তাদের আরব ও অন্তর মুসলমান দেশে আর ইউরোপীয়দের কাছে বিক্রি করা, মধ্যযুগের আরব ডাকাতিদের এক লাভ-জনক ব্যবসায় ছিল। এই মানুষ-খরা আর মানুষ-বেচা ব্যবসায় পশ্চিম-আফ্রিকার পরে পোতুগীজ, স্প্যানীশ, ফরাসী আর ইংরেজ ব্যবসায়ীরা আমেরিকায় তাদের নব-অধিকৃত দেশে কয়েক শতক ধরে অব্যাহত-ভাবে চালাতে থাকে। মুসলমান শাসকদের কল্যাণে ভারতবর্ষে, এমন কি বাঙলা দেশেও, আফ্রিকার এই কাকরি, এই কালো জাতের ক্রীতদাস হাবশী আর সীদী এসে পৌঁছেছিল। আফ্রিকার কালো মানুষ এই ভাবে ক্রীতদাস ব'নে গিয়েও, বিশ্বমানবের কাছে তাদের সেবার অর্থ এনে দিয়েছে। সাদা মানুষ নানা দিকে আফ্রিকার কালো মানুষের চেয়ে আরও ঢের বেশী বর্বরতা ও হ্রস্ব-হীনতার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, যে-সব দেশে তাদের আনা হয়, দৈহিক শ্রম দিয়ে তাদের সমৃদ্ধি এরাই বাড়িয়েছিল। আর তা ছাড়া, এদের মধ্যে যে সংস্কৃতি চাপা ছিল তার নোতুন বিকাশ দাসত্বের বোঝা ঘাড়ের উপর থাকা সত্ত্বেও তারা দেখাতে সমর্থ হ'য়েছে; যেমন আমেরিকার সংযুক্ত-রাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের নিগ্রো ক্রীতদাসদের কাছ থেকে আধুনিক ইউরোপীয় সঙ্গীত আর নৃত্যকলার যে অভিনব আর অভূতপূর্ব উপাদান এসে গিয়েছে, সেগুলির কথা বলতে হয়। আমেরিকার ইংরেজী আর অন্তর ইউরোপীয় ভাষার সাহিত্যেও আফ্রিকার নিগ্রো জাতির মনের ছাপ স্থান পেয়েছে। সম্ভ্রুতি ইউরোপের কলাহরণী ব্যক্তিগণ আফ্রিকার শিল্পের মোহে পড়ে গিয়েছেন—আফ্রিকার কাঠের মূর্তি, যুৎশিল্প, আর বিশেষ করে ব্রোঞ্জ ঢালা মূর্তি আর অন্তর শিল্প; আফ্রিকার নাচ আর তার বাজ; আর সর্বোপরি, আফ্রিকার কালো মানুষের জীবন-

যাত্রার বে একটা আদিম সৌন্দর্য আর শক্তি আছে, যে শক্তি আর সৌন্দর্য জীবনের পিছনে অবস্থিত অদৃশ্য জগতের সঙ্গে কখনও যোগ হারায় নি আর যার মধ্যে গভীর অহুত্বের দ্বারা লব্ধ ঈশ্বরীয় শক্তির প্রতি যে ভক্তি পাওয়া যায় সেই ভক্তিও যাতে দেখা যায়, সেই জীবনযাত্রা-পদ্ধতি।

অপ্রকাশিত সদ্গুণ

এ পর্যন্ত আফ্রিকার কালো মানুষদের কোনো সুবিধা দেওয়া হয় নি, যাতে ক'রে তারা নিজেদের জানতে পারে, বুঝতে পারে, আর নিজেদের চূড়ান্ত বা পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে বিকশিত ক'রে তুলতে পারে। সব অসুবিধা সত্ত্বেও, আফ্রিকার প্রভাব এতকাল আমেরিকায় তার যে নিগ্রো জাতির মানুষ র'য়েছে তার মধ্য দিয়েই প্রধানতঃ বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে এই নিগ্রো জাতি তার আসল সম্ভাব্যতার সম্ভান পেয়েছে তার শিল্পের মধ্যে, বিশেষতঃ, তার ভাস্কর্যকলার মধ্যে, পুরাতন সরল ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে যে ভাস্কর্যের একটা সুস্পষ্ট ঐতিহ্য বর্তমান র'য়েছে। আর সে ভাস্কর্যের রকমারি নমুনা—কাঠের কাজ, হাতীর দাঁতের খোদাই, পাথরে খোদাই ভাস্কর্য, ব্রোঞ্জ ধাতুতে ঢালা মূর্তি আর পাটা। তা ছাড়া আছে মাটির কাজ; এ শিল্প আফ্রিকা মহাদেশের অভ্যন্তরে বসবাসকারী সত্যকার আফ্রিকার মানুষদের মধ্যে বিশ্বয়কর বিকাশ লাভ ক'রেছিল। আফ্রিকার শিল্পের আর একটা দিক হ'ল তার প্রাগৈতিহাসিক চিত্রাবলী, বা উত্তরে এবং দক্ষিণাঞ্চলের পর্বতপৃষ্ঠে ও গুহাগায়ে অঙ্কিত র'য়েছে। এ বাদে, তার সহজ-সরল মুদ্রার স্থাপত্যকলা-ও উল্লেখযোগ্য। আফ্রিকা তার এই বিশেষ শিল্প-মাধ্যমটির সাহায্যে চমৎকার একটা নির্মাণশৈলী গড়ে তুলেছে যার রেখার সৌকুমার্য আজকের দিনেও পৃথিবীতে একটা অভিনব জিনিস। এই শিল্প সে গত-কয়েক শতাব্দীর ভিতর দেশের নাইগার নদীর উপকূল অববাহিকা অঞ্চলে আর তার দক্ষিণে, আর মধ্য আফ্রিকায় ধীরে ধীরে গঠিত ক'রে তুলেছে।

এভাবে আফ্রিকাবাসী ছিল যেন মানব-পরিবারের এক অবহেলিত ও অনাদৃত শিশু। এখনও কিছু-কিছু লোক আছে, যারা তাকে দাস, দরিদ্র ও অজ্ঞ অবস্থায় সকলের

থেকে আলাদা ক'রে রাখতে চায়, যাতে ক'রে তারা তাকে ভারবাহী পশুর মত ঝাটোতে পারে, অথচ মনের ভিতর কোনরূপ বিবেকের দংশন যাতে না আসতে পারে সেজন্য সচেষ্ট। আফ্রিকাবাসীদের গার্হস্থ্য তথা গোষ্ঠীগত জীবনের অন্তর্নিহিত ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগের তাৎপর্য বাইরের লোক এখনও ঠিক-ঠিক ধ'রতে পারে নি। আফ্রিকাবাসীর গৃহজীবনের কেন্দ্রে র'য়েছে আফ্রিকান নারী তার শ্রমকুশলতা, বিখ্যাততা ও পুরানো দিনের সহজ-সরল মাধুর্য নিয়ে। আফ্রিকাবাসীর জীবনযাত্রার অস্ত্রাস্ত্র মান ও মূল্যবোধের সঙ্গে অর্নেক্যও আফ্রিকাবাসীর জীবন ও ধর্মকে সরাসরি অগ্রাহ্য করবার মনোভাবের জন্ম কম দায়ী নয়। আফ্রিকার এই-সব অসভ্য জন্তু-লীদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা—ভাবখানা যেন এই।

সত্য বটে, আফ্রিকার কোন-কোন উপজাতির মধ্যে ধর্মান্তরণের অঙ্গ হিসাবে নরবলির প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু এটা শুধু আফ্রিকার বৈশিষ্ট্য মনে ক'রলে ভুল করা হবে। অধিকাংশ সভ্যজাতি—তার ভিতর বর্তমান ইউরোপীয়দের পূর্বপুরুষেরাও র'য়েছে—কোন-না-কোনও সময়ে নরবলির অহুষ্ঠান ক'রত। কিন্তু সভ্য ও খ্রীষ্টান ইউরোপ ধর্মের নামে যে নরমেঘবজ্ঞের অহুষ্ঠান ক'রেছে তার তুলনায় অহুন্নত জাতির আদিম বিশ্বাস-জন্মিত-নরবলি-প্রথা অনেক কম নিষ্ঠুর ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রোমান কাথলিক Inquisition অর্থাৎ রোমান-মতবাদের বিরোধী লোকদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা, এবং মধ্যযুগীয় তথা আধুনিক ইউরোপের স্বত্বপাতের যুগে অধিকাংশ খ্রীষ্টান দেশগুলিতে ডাইনী-সন্দেহে নিরপরাধ মানুষকে পুড়িয়ে মারার প্রথা উল্লেখ করা যেতে পারে। হাজার হাজার লোক এই ভাবে আগুনে ধীরে ধীরে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে ম'রেছে, বাদের একমাত্র অপরাধ এই ছিল যে তারা বিশেষ কোনও একটা ধর্মমতের অহুমোদিত গোঁড়া ধারণা ও বিশ্বাসগুলি মেনে নিতে পারে নি, অথবা বাদের বিরুদ্ধে কুসংস্কারবশে এই অভিযোগ আনা হয় যে তারা এক ধরণের ক্রুর বাহুবিকার অধিকারী এবং ওই বাহুবিকার প্রয়োগের দ্বারা তারা মানুষের ক্ষতিসাধন ক'রছে। এ-সব অনাচার মানব-সভ্যতার ইতিহাসের কয়েকটা অতি আলোকবীণী শতাব্দীতেই ঘটেছে। যারা আফ্রিকাবাসীর জীবনচর্যায়

ও ধর্মীচরণে তথা-কথিত বর্বরতা ও ক্রুরতার জন্য তাদের সরাসরি অপরাধী ও বর্বর বলে রায় দেন, তাঁদের যৌগুর উপদেশে উল্লিখিত সেই মানুষটির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, যে “পরের চোখে কুটো ধ’রে বেড়ায়, কিন্তু নিজের চোখে কড়ি-কাঠ থাকলেও টের পায় না।”

কিন্তু যুগধর্ম শেষ অবধি সক্রিয় হ’য়ে উঠেছে। বর্তমান কালে মানুষের ইতিহাসে অস্তুতম প্রধান বহুদূর-প্রসারী ঘটনা হ’চ্ছে এই যে, আফ্রিকার অধিবাসীরাও যুগ-যুগের নিদ্রাঘোর ও জড়তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে জেগে উঠেছে। তাদের মনে এই অসুভূতি জেগেছে যে, বিশ্বমানবের দরবারে অস্তুত সকলের সঙ্গে তাদেরও আজ যথাযোগ্য স্থান ক’রে নিতে হবে। পাশ্চাত্যের মানুষের সঙ্গে সাহচর্যের দ্বারা আফ্রিকাবাসী নিজ জীবনে এই শিক্ষা গ্রহণ ক’রেছে। সত্যের খাতিরে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এ কথা স্বীকার ক’রতে হবে যে, ওই পাশ্চাত্যের অধিবাসীদের মধ্যেই এমন কতকগুলি মানুষকে আফ্রিকাবাসী পেয়েছে যারা তার শ্রেষ্ঠ বস্তু ও হিতাকাঙ্ক্ষী, বহিঃ পাশ্চাত্যের জনসাধারণ আফ্রিকাবাসীকে লুণ্ঠন, শোষণ ও কটুত্ব করতে কিছু কম করে নি। শত শত বৎসরের অত্যাচার, ‘পীড়ন’ আর ভুল-বোঝার বাধা অতিক্রম ক’রে, আফ্রিকাবাসী শেষ অবধি এমন এক স্তরে এসে পৌঁছে, যাতে ক’রে মানবীয় কীর্তির সমৃদ্ধি বিধানে সেও তার দান রেখে যেতে পারবে, এবং প্রকৃতি তাকে যে শক্তি ও গুণাবলী দিয়েছে, তার সাহায্যে মানসিক আর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মানব-জাতির সেবা সে-ও করতে পারে। কেউ জানে না; প্রকৃতি, অথবা নিয়তি, অথবা ঈশ্বর, আমাদের জন্য কোন্ ভবিষ্যৎ নির্দিষ্ট ক’রে রেখেছেন। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বকার সূসভ্য গ্রীসে অথবা দু-হাজার বৎসর পূর্বকার সূসভ্য রোমে ব’সে কে কবে ভাবতে বা বিশ্বাস ক’রতে পেরেছিল যে, মধ্য এবং উত্তর ইউরোপের চর্মাবৃত ও বাকল-পরিহিত বর্বররা একদিন সারা পৃথিবী জুড়ে, আজকের দিনের আলোকপ্রাপ্ত জার্মান কেন্দ্রিক ও শ্লাভ জাতি হিসাবে, বর্তমানকালীন সভ্যতার নায়কত্ব ক’রবে?—এরা তো তখনকার দিনে তাদের দেবতাদের উদ্দেশে নরবলি দিত।

আত্মসম্মান-বোধের জাগরণ

মানব-সভ্যতার বৈচিত্র্যের মধ্যে একতান সংবাদী সঙ্গীত কখনও পূর্ণতা লাভ ক’রবে না, যদি না আফ্রিকাবাসী এই একতান-সঙ্গীতে এসে যোগ দেয়। এই একতান-সঙ্গীত নানা দিক দিয়ে অপূর্ণ র’য়েছে—বহু বহু মানুষ, যাদের ভিতর সম্ভাবনা আছে এবং যাদের কারো-কারো মধ্যে যথার্থ কীর্তির গৌরব বিद्यমান, তারা আজও মানব-সভ্যতার বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য বিধানে তাদের নিজেদের সবটুকু শক্তি নিয়োগ ক’রতে পারে নি। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন-জাতীয় মানবসমূহের উল্লেখ করা যায়, যাদের কেউ-কেউ পুরাতন গোলাধার প্রাচীন সূসভ্য জাতিগুলির তুলনায় কোন অংশে কম উন্নত নয়। যেমন, মেস্কিকোর নাহুয়া জাতির লোকসকল (Toltec, Aztec ও অন্যান্য), Mixtec ও Zapotec, Otomi ও অন্যান্য নানা জাতির লোকসকল; মেস্কিকো ও গুয়াটেমালার মায়ান সভ্যতার ধারক ও বাহকগণ; কলম্বিয়ার Chibcha; এবং দক্ষিণ আমেরিকার আন্দেস পর্বত অঞ্চলের Quechua ও Aymara জাতির লোকগণ। এ ছাড়া আছে পলিনেশিয়ার অধিবাসী অগণিত সংখ্যক লোক। নতুন গোলার্ধ ও ওসেয়ানিয়া থেকে এই দুই শ্রেণীর মানুষের নাম করা হ’ল, যাদের দ্বারা অনেক কিছু হতে পারত অথচ হযোগের অভাবে হয় নি। তারা যেন ‘অপ্রকটিত কীর্তির উত্তরাধিকারী’। তারা যদি তাদের মানসিক গুণের বিকাশের উপযুক্ত হযোগ পেত, তা হ’লে সামগ্রিক মানব-সভ্যতায় কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য যোজনা ক’রতে পারত। এই সব লোকদের অধিকাংশই আজ হয় বিলুপ্ত হ’য়ে গিয়েছে অথবা নির্বীর্ণ হ’য়ে প’ড়েছে, অথবা অন্যান্য জাতির সঙ্গে মিশ্রণের ফলে তাদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলি হারাতে ব’সেছে। কিন্তু আফ্রিকাবাসী এখনও টিকে আছে। সে অত্যন্ত সজীব; বিশ্বসংস্কৃতির একতান-সঙ্গীতে তাকে যদি তার নিজস্ব স্বর সংযোজন ক’রতে হয়, তা হ’লে তার আত্ম-সম্মান-বোধ ফিরিয়ে আনতে হবে, তার নিজের প্রতি তার প্রাচীন গৌরবের প্রতি তার ভিতরে আত্মার সঞ্চার ক’রতে হবে। আফ্রিকাবাসীর পুরাতন কীর্তিমালা কিছু নীচ স্তরের জিনিস নয়।

আফ্রিকাবাসীর গ’ড়ে তোলা সাম্রাজ্যসমূহের দৃশ্যপটের

উপর মনচ্ছবু বুলিয়ে নেবার আগে তাদের সভ্যতার একটা হিসাব নিলে মন্দ হয় না। এই সভ্যতা দেশের সম্পদ ও সাংস্কৃতিক আবেষ্টনীর সঙ্গে পুরোপুরি ঝাপ খেয়ে গিয়েছিল। যেমন, সেনিগাল ও নাইগার নদীর তীরবর্তী Ghana-সাম্রাজ্য, Ghana-সাম্রাজ্যের পরবর্তী Mandingo কিংবা Mali-সভ্যতা; নাইগার নদী-বাহিত দেশগুলির Songhai, Mossi ও অন্যান্য রাজ্য; পশ্চিম আফ্রিকার প্রাচীন প্রাক-ক্রিষ্টান ও প্রাক-মুসলিম সংস্কৃতি, যার অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায় সেই অঞ্চলের বিশ্বয়কর শিল্পকর্মসমূহের মধ্যে; চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর Mali-সভ্যতা—তাদের গড়ে তোলা উচ্চাঙ্গের সংস্কৃতি ও নাইগার অববাহিকা অঞ্চলের মুসলিম দেশগুলিতে আরবী ভাষায় রচিত লক্ষণীয় সাহিত্য ইত্যাদি; Ghana, Jenne, Timbuctoo, Gao, Kano প্রভৃতি একাধিক পুরাতন আফ্রিকান শহর এবং গোল্ড কোস্ট, বেনিন ও অন্যান্য অঞ্চলের নানা শহর; পূর্ব-আফ্রিকার প্রাচীন বাটু উপ-জাতির লোকদের কীর্তিমালা—যথা, সতেরো শতকের Monomotapa-সাম্রাজ্য ও তৎপূর্ববর্তী অন্যান্য রাজ্য, এবং Zimbabwe প্রমুখ কতকগুলি পুরাতন শহর, যাদের ভগ্নাবশেষ আজও আমাদের বিশ্বয়ের উদ্রেক করে; সর্বোপরি, পশ্চিম-আফ্রিকার অধিবাসী এবং মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকার বাটু জাতির লোকদের সৃষ্ট স্মহান শিল্পকলা, যে শিল্পকলা ব্রোঞ্জ ঢালাইয়ের কার্যকরী পদ্ধতির দিক দিয়ে প্রাচীন গ্রীস ও ইটালির রেনেসাঁ-যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মগুলির সহিত তুলনীয়। এ ছাড়া আছে, আফ্রিকাবাসীর সহজ ধর্মবিধানের সঙ্গে জড়িত আফ্রিকার কাঠখোদাই ও মুদ্রণ-শিল্প।

তা ছাড়া আছে নৃত্য ও সঙ্গীত—মাদল, কাঠতরঙ্গ বা কাঠের 'জল-তরঙ্গ', প্রাচীন ধরনের 'হার্প'-বীণা, ও মহুদ্রকর্ষ। এগুলি আফ্রিকার নিদ্রা 'খাঁটি ঐতিহ্যের অন্তর্গত জিনিস, এবং এদের সম্বন্ধে পুনরায় প্রকৃত মূল্যবোধের সৃষ্টি হওয়া উচিত। তা হ'লেই শুধু আফ্রিকাবাসী তার স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় রেখে চ'লেতে পারবে, এবং একই কালে এ যুগের সব জাতির মানুষের চোখে গৌরব অর্জন করতে পারবে। সঙ্গীত এবং নৃত্যাদির মাধ্যমে সহজ ও স্বপ্নময় অস্তিত্বের মহিমা, যা আফ্রিকাবাসীর

অপরিমিত উৎসাহ ও অধ্যবসায়কে একটা আভার ছায়া ঘিরে আছে, তাকে সজীব ক'রে তুলতে হবে, এবং তার দ্বারা আফ্রিকাবাসীর জীবনকে তার অন্ততম অমূল্য উত্তরাধিকার হিসাবে আলোর পরিব্যাপ্ত ক'রে দিতে হবে। এইভাবে আফ্রিকা শুধু যে নিজেরই উপকার সাধন ক'রতে পারবে তা নয়, সমগ্র মানব-জাতিরও কল্যাণ সে ক'রতে পারবে।

প্রায়শ্চিত্তের দাবী

মানব-সম্প্রদায়ের যে অংশ আফ্রিকাবাসীর প্রতি অত্যাচার-আচরণের অপরাধে অপরাধী, আজকের দিনের আফ্রিকাবাসীর প্রতি মনোভাবে তার পুরাতন পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে হবে, অন্ততঃ আংশিকভাবে তো বটেই; এবং এখনও যারা আফ্রিকাবাসীর উপর পুরাতন অন্ত্রায় ও নিষ্ঠুরতা চালিয়ে যেতে বন্ধপরিকর, তাদের অমুচিত আচরণের প্রতিরোধ ক'রে তাৎপূর্ণ পুরাতন পাপের জন্য আফ্রিকাবাসীর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রতে হবে।

যেখানে-যেখানে আফ্রিকাবাসীদের উত্তম ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রার ছন্দ ইউরোপীয় ও অন্যান্য বৈদেশিক ঔপনিবেশিকদের দ্বারা প্রভাবিত ও বিপর্যস্ত হওয়ার দুর্ভোগ আফ্রিকাবাসীর সহিতে হয় নি—যেমন পশ্চিম-আফ্রিকায় (সেখানকার কতিপয় মহাহুত্বাশীল ও দূরদর্শী ব্রিটিশ উচ্চপদস্থ কর্মচারী, শিক্ষাব্রতী ও অন্যান্য বুদ্ধিদারী ব্যক্তি তাদের নানাভাবে সাহায্য ক'রেছেন), সেখানে আফ্রিকাবাসী তার আত্মিক শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে হারায় নি। কিন্তু যেখানে উপনিবেশবাদ এবং তার আত্মবিক্রমিক শোষণ-ক্রিয়া ও বর্ণবিদ্বেষ আফ্রিকাবাসীর জীবনের উপরে বিপর্যস্ত-কারী চাপ সৃষ্টি ক'রে অবাধে চ'লেছে, সেখানে সে তার দেশেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে প্রচণ্ড বাধা অসুভব ক'রছে, তার নিজের মনোমত উন্নতির পথে নিজেকে চালিত করা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

আফ্রিকার চিন্তানেতাদের পক্ষে আফ্রিকার জাতিগত ও সাংস্কৃতিক ভিত্তিভূমির ও তার মূল্যের সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা থাকা যেমন আবশ্যক, তেমনি তাঁদের বোঝা উচিত যে আফ্রিকার লোকদের সত্য-সত্য কি-কি প্রয়োজন। এই প্রয়োজনগুলির মধ্যে পড়ে—আফ্রিকাবাসীর স্বকীয় সংস্কৃতির মধ্যে স্থায়ী মূল্যের যে সকল বস্তু জন্মের জীবনের সহায়করূপে তাদের হিতসাধন ক'রেছে, সে-সব জিনিস ধ'রে

বসন্ত-বিলাপ

শ্রীলাবিত্তীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

২

অনেক দিনের পরে তুমি এলে একেবারে কাছে
একান্তই কাছে সে যে ছিল নাক' কোন ব্যবধান।
লজ্জা ভয় উৎকর্ষীয় মুহূর্তে হইল অবসান
তোমাতে পেলাম ফিরে এর বড় আর কিবা আছে ?

বিচ্ছেদ-বেদনা মোর প্রাবণ-মেঘের ধারা জলে
ধুয়ে গেল মুছে গেল ; মেঘশূন্য নির্মল আকাশ
আলোকের প্রতিপ্রতি, সমুজ্জ্বল সূর্যের আশাস
নিলাম হৃদয় পেতে, আশা জাগে নবতৃপনলে।

তোমার অঞ্চলে ঢেকে এনেছ কি মালঞ্চের ফুল
মালা গাঁথা হয়নিক' ? পাণ্ডনিক' নিলয় নিরালা ?
গৃহতলে সন্ধ্যাদীপ এখনো কি হয় নাই জ্বালা ?
রেখেছ দুয়ার খুলে—একে একে সকলি কি ভুল ?

হোক ভুল, তবু সখী তুমি যে এসেছ সেই ভালো
পড়ে থাক শূন্যগৃহ, অবিকৃত বাসর শয়ন,

ব'স তুমি, কাছে ব'স, দেখি তোমা ভরি ছ' নয়ন
তোমার নয়নদীপে আজিকার সন্ধ্যাদীপ জ্বালো।

আরো তুমি স'রে এস, বাঁধ মোরে আল্পেষ বন্ধনে,
যে ফুল এনেছ তুমি সেই ফুলে আমি মালা গাঁথি,
তুলাই তোমার কর্ণে, আজিকার এ বিষম রাত্তি
আনন্দমুখর হোক প্রেমজ্যোতিপ্রস্ফুট নন্দনে।

আবেশবিহ্বল দেহ, বেহরকে, বিহ্বাৎ উদ্ভাস,
প্রতি রক্তকণিকায় উপবাসী আত্মার বিদ্রোহ।
রত্নবাসনার চরিতার্থে যে দুর্ময় মোহ
সবের সমাপ্তি হোক যুগান্তের পূর্ণ মনস্কাম।

কাম ও কামনা মাঝে বসন্তের প্রথম বিলাপ
বরা ফুলে রেখে যায় নৌরঙের আত্মনিবেদন।
আমাদের বসন্তের কুহুমিত প্রথম যৌবন
বার বার ফিরে চাই, ফিরে চাই প্রাণের উত্তাপ।

রাখা ; অতীতে তাদের যে-সকল জিনিসের অভাব ছিল
বর্তমানে ও ভবিষ্যতে সেই অভাব পূরণ করা ; তাদের
বৈষয়িক সমুন্নতি এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষুণ্ণের পক্ষে
ইউরোপ, এশিয়া ও আমেরিকার সংস্কৃতিসমূহের মধ্যে, যা-
কিছু অল্পকূল হবে, তার অল্পধাবন করা ও যথাসাধ্য তা গ্রহণ
করা ; এবং বিগত শতাব্দীসমূহে যে-সকল কীর্তি তারা
অর্জন করেছিল তাদের মান আরও উন্নত পর্ধ্যায়ে টেনে
নিয়ে যাওয়া। অবনমিত জাতিসমূহের দ্বারা অবনমিত
আফ্রিকাবাসীর হাহাকার যেন আর শুধুমাত্র "আমার ঈশ্বর,

আমার ঈশ্বর, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করেছ ?"
এই ক্রন্দনে পর্যাবসিত না হয় ; তা যেন এক আকাঙ্ক্ষা ও
আশাময় প্রার্থনায় রূপান্তরিত হয়। বিশ্ববিধাতা, যিনি
মানব-জাতির বিভিন্ন ভাষার মতই নানা ভাবে প্রকাশমান,
যিনি কেবল কোনও বিশেষ দল বা সম্প্রদায়ের প্রভু নন,
(অথচ ভুল করে নানা অসহিষ্ণু সম্প্রদায় বীর অহুগ্রহ
একান্ত নিজের বলে দাবী করে থাকে), বর্ষ আর ধর্মমত-
নির্বিশেষে যিনি সকল মানুষের ভগবান, আফ্রিকাবাসীকে
তার পূর্ণ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে সাহায্য করুন।

কমলে কামিনী

শ্রীকৃষ্ণদরশন মল্লিক

ওই ছবিখানি জুলায় আমার ঘন,
শিশু হয়ে যাই—করি যবে দর্শন।
সর্বপ্রথম ধ্যানে দেখেছেন
যিনি এই রূপ মা'র,
নমো নমো নমঃ—দিশ্য দৃষ্টি
সে কবি 'দামুত্ভা'র।
মাধুর্য বা কন, সত্যই বটে,
ছবি সামান্য নয়,
ও এক বিশাল অমৃত রাজ্য,
বিতরিছে বরাভয়।
চিত্রপটেতে দেবতা আসেন যান,
সেখানেও তাঁর পাওয়া যায় সন্ধান।

বিপদ পাখার গর্জন করে কোলে,
কমলে কামিনী হাসেন গণেশ কোলে।
ঝঙ্কার করে প্রলয় নৃত্য,
উত্তাল নীল জল,
ছিন্নভিন্ন সব সংযোগ,
কাঁপায় ভূমণ্ডল।
ওখানে সর্ব-শক্তিময়ী মা,
আনন্দময়ী রাজে,
নত করি কণা কাল-সমুদ্র
লুটায় পায়ের কাছে।
ভীত তনয়ের গালে মাতা দিয়া চুমা,—
বলেন 'সাগর ধাম রে—থোকন ঘুমা।'

ওই 'কালিদহ' নিরাপদ—নিশ্চিত,
বিপদও ওখানে হয় কল্যাণকর।
যত অশান্তি, যত বিপ্লব,
বিপর্ষয়ের ক্ষণে—
ও কে বিশ্বাস আশা আশ্বাস
জাগায় মানব-মনে ?
সকল বিপদ সব বিপত্তি
অপসরি দেবী আসে,
সকল গরল অমৃত হয়
মেঘ কাটে—চাঁদ হাসে।
সব তনয়ের জুড়াবার ওই ঠাই—
অভয়ার দেশ—ভয়ের প্রবেশ নাই।

ভাবই ভুবন—ভয়াল মশান-বৃকে,
দেবী দেখা দেন ওই প্রসন্ন মুখে।
ভক্তসংশ্লী ও কমলদলের
অশ্রুত মধু ভাষা,
জানাইয়া দেয় জয়, বশ লয়ে—
গৌরবে ফিরে আসা।
অতি দুর্গম দুস্তর পথ,
ও পথ ভয়ঙ্কর,—
ওই দিকে যায় অয়যাত্রীর
সাত ভিড়া মধুকর।
যুগে যুগে মাতা অকুলের সিংহলে
'শ্রীমন্তে' দেন বিজয়মাল্য গলে।

শরতের আহ্বান

শ্রীকালিদাস রায়

হাঁসের আননে মুণাল শোভিছে কাশের কাননে হাসি,
দীপালির মত শোভে অঙ্গনে শেকালিকা রাশি রাশি।
অরুণ আঞ্জিকে তরুর অঙ্কে মুঠা মুঠা ঢালে সোনা,
ফিরে এস উমা, জননীর কোলে দূরে আজ থাকিও না।
দখিধারা সম নদীধারা বয় কুলের শাসন মানি,
সাদা পাল তুলি চলে তরীগুলি কোন্ দেশে নাহি জানি।
তটপাখী 'পরে ভাঙ্ক-ভাঙ্ক চখা-চখী' কত ডাকে,
ফিরে এস মা গো, এমন দিনে কি স্বপ্ন-বাড়িতে থাকে ?
জালিতে ভরেছে লাউ-লতাগুলি, শালি ধানে সারা মাঠ,
পালি-ভরা ছুঁ ঢালিছে আজিকে কালিয়া খেঁহুর বাঁট।

মিঠা ধালি-ভরা পিঠা রসবড়া, ডালি-ভরা কত ফল,
ফিরে এস হেথা, ঘুচাও মা, ব্যথা, মুছাও চোখের জল।

তোমার মুখের মতন কমলে দীঘিতে হয়েছে শোভা,
কল্মীয়া ফুলে ভরিয়া গিয়াছে বীশবনে ঘেরা ডোবা।
বারোটি মাসের দশ মাস তুমি থেকে স্বপ্নের ঘরে।
মোদের ঘরটি আলো কর এসে দুইটি মাসের তরে।

বোধন-সানাই বেজেছে তারে মা, তব আগমনী জানি,
রঙ দিতে বাকি দোমেটে হয়েছে মায়ের প্রতিমাখানি।
ফিরে এস মা গো, তুমি না এলে কি পূর্ণ হবে এ পূজা ?
সকলের আগে তোমারেই যে মা খুঁজিবেন দশভূজা।

মৎস্তগন্ধা

শ্রীকৃষ্ণধন দে

মধু মাধবীর আশ্রমকূলে গজার তট গিয়াছে ভরি,
পিকের কণ্ঠ স্বরোচ্ছল,
মহু বান্দু বহিছে প্রান্তান্তে শীতল শীকর পরশ করি'
ধরণীবন্ধ রূপোচ্ছল।
ক্ষুদ্র তরঙ্গী ল'য়ে কোথা যাও হে স্তম্ভরি,
মৎস্তজালক স্তল পেলব হস্তে ধরি' ?
দীর্ঘবেণীর বন্ধনে স্মর ফেলি' ফুলশর করুণা মাগে
নবযৌবন-উদয়বাগে।

এল ঋষিবর নির্জনতটে, হতে চায় পার তরীতে তব,
করে আহ্বান—সুচিস্মিতে,
অনিপুণা তুমি বাহিতে তরঙ্গী, কৌশল তব কি অভিনব,
জাগে বিশ্বয় মুচ্ছিতে।
আশ্রম মোর আছে পরপারে, বাচি যে তাই
তব তরীবৃক পার হতে, আশ্রম সময় নাই,
তপোবনে মোর শতেক শিষ্ট পথ চেয়ে আছে প্রতীক্ষায়
বেদ-পাঠ মেঘ-অর্চনায়।

এল তরী ল'য়ে মৎস্তগন্ধা ঋষিবর পাশে নদীর তীরে
দ্বিজ-সেবারতা ভক্তিমতী,
কহিল, এ তরী হবে যে ধন্য তব পরমজ্ঞঃ লভিয়া শিরে,
আমিও হব যে পূণ্যবতী।

ঋষিরে লইয়া ক্ষুদ্রতরঙ্গী চলিল ভানি',
ক্ষেপণীর তালে মধি' নির্মল সলিলরাশি,
ধারা-সদয়ে যেথা দীপ এক শোভাময় অতি অরুণ করে
হেরি কহে ঋষি কোমল স্বরে :

অগ্নি বরাননে, নবযৌবনে, তম্বি, মোহিনি, শাস্তম্বীলা,
বাহুপাশে মোর দিবে না ধরা ?
কুল বহুদূর, নির্জন দীপ, রবে অজ্ঞাত মোদের লীলা,
শোন লো রূপসি বিদ্যাধরা।

জুড়ি ছুটি কর কহিল তরঙ্গী শঙ্কালাজে :
আমি দুর্বলা, এ কথা কি কহু ঋষির সাজে ?
ক্ষমা কর দেব, তুমি মহা-ঋষি, হয়ো না পাতকী এ অহুবাগে,
মৎস্তগন্ধা মিনতি মাগে।

হাসিয়া কহিল ঋষিবর : আজ পদ্মগন্ধা হও লো তুমি,
পূরাও বাসনা, নবযৌবনে অগ্নি,
যোগবলে আমি স্বজি' কুঙ্কটি আবরিব দীপ তটের তুমি,
কুণ্ঠিতা কেন ওগো লাবণ্যময়ী ?

পদ্মগন্ধে ভরিল বাতাস অঙ্গ ঘিরে'
ঘন কুঙ্কটি ফেলে যবনিকা নদীর তীরে,
জালিক-কণ্ঠা ঋষির চরণে পড়ে শরাহত হরিণীপ্রায়,
চ্যুতমঞ্জরী ঝরিয়া যায়।

কাশীনাথ আর শশিনাথ দুই বন্ধু।
কাশীনাথ কালো, শশিনাথ ফরসা। কাশীনাথ
গরম, শশিনাথ নরম। কাশীনাথ কানা, শশিনাথ কালা।

তবু তারা দুই বন্ধু।

হাতিবাগান বাজারের কাছে দুজনের দুটি খাবারের
দোকান। এদিকে একটি, ওদিকে একটি। প্রায়
মুখোমুখি।

কাশীনাথের দোকানে খরিকদার আসে। শশিনাথের
ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে।

আবার শশিনাথের দোকানে যখন খন্দেরের ভিড়,—
কাশীনাথের তখন কি যে হয় তা সে নিজেরই ভাল বুঝতে
পারে না; উনোন-খোঁচানো লোহার ডাঙাটার দিকে
হাত বাড়ায়, মনে হয়, ওই ডাঙা দিয়ে শশিনাথের মাথাটা
কাটিয়ে দিয়ে আসে।

একদিন রাতে কানা কাশীনাথ এমনি একটা স্বপ্ন
দেখলেন। স্বপ্ন যে এত স্পষ্ট পরিষ্কার হয়, তা তার
জানা ছিল না।

দেখলে, শশিনাথের দোকানে সেদিন ছু কড়াই বড়
বড় রসগোল্লা নেমেছে। কড়াইয়ের রস তখনও গরম।
সেই গরম রসের ওপর রসগোল্লাগুলো ভাসছে। শশিনাথ
লোহার একটা কাঁজরা দিয়ে চেপে চেপে রসগোল্লাগুলো
ডুবিয়ে দিচ্ছে রসের ভেতর। এমন সময় কাশীনাথ চুকল
চুপি চুপি পা টিপে টিপে, পেছন দিক থেকে লোহার ডাঙা
হাতে নিয়ে। তার পরেই, বাস, দিলে বসিয়ে সেই
ডাঙা—শশিনাথের মাথায়। চিংকার করে শশিনাথ
মুখ খুঁড়ে পড়ল সেই গরম রসের কড়াইয়ের ওপর।
মাথাটা কেটে চৌচির হয়ে গেছে। কাঁচা রক্তে রাজা
হয়ে গেল রস আর রসগোল্লা। কাশীনাথ ছুটতে লাগল
প্রাণের ভয়ে। পেছনে বিস্তর লোক তাকে তাড়া
করেছে।

শশিনাথ মরে গেছে, শশিনাথের দোকান চিরদিনের
বন্ধ হয়ে গেল, কাশীনাথ সেটা কিনে নিয়ে ওইখানে
একটা গোলদারি দোকান খুলবে—এই আনন্দে আত্মহারা
হয়ে ছুটে পালাচ্ছে কাশীনাথ।

কিন্তু স্বপ্ন যারা দেখেছে তারা জানে—স্বপ্নে সবই
সম্ভব, একমাত্র ছুটে পালানো ছাড়া। ছুটতে গেলেই পা
ছুটো কিসে যেন আটকে যায়।

কাশীনাথেরও তাই চল। ছুটে সে পালাতে পারলে
না। লোকজন তাকে ধরে ফেললে। কোথেকে হৈ-হৈ
করে পুলিশ এসে গেল।

মুখ দিয়ে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক আওয়াজ
বেরুচ্ছে কাশীনাথের। গ্যাঁ-গ্যাঁ করতে করতে, তার ঘুম
ভাঙল।

গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। এক গ্রাস জল খেয়ে
একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে কাশীনাথ।—সবই স্বপ্ন!
তাকে তা হলে পুলিশে ধরে নি। বাঁচা গেল।

নাঃ, আর সে ও-রকম বাজে কথা ভাববে না। পরের
মন্দ না ভাবাই ভাল। শশিনাথ করুক উন্নতি। যত
বড় হতে পারে হোক।

সেদিন সন্ধ্যায় কাশীনাথ তার কানা চোখ মিট মিট
করে আবার দেখলে—শশিনাথের দোকানের সামনে
অনেকগুলো খন্দের দাঁড়িয়ে। হাত বাড়িয়ে পয়সা নিচ্ছে
আর কাঠের বাস্কে পুরছে।

এমন সময় কাশীনাথের দোকানে একজন খরিকদার
এল। চেনা খরিকদার।—ছুটো সন্দেশ আর চার পয়সার
দই নেবে।

শালপাতার ঠোঙা তৈরি করতে করতে কাশীনাথ
বললে, খবরের কাগজ পড়েছেন দাদা?

—কি?

কাশীনাথ বললে, শুঁড়ো দুধ খেয়ে মেদিনীপুরে সাতজন
লোক মারা গেছে।

খন্দের বললে, শুঁড়ো দুধের কারবার তো শুনেছি
তোমরাই কর।

কাশীনাথ বললে, ভগবানের দিব্যি করে বলছি দাদা,
ছেলেপুলে নিয়ে ঘর-সংসার করি, সে রকম ছয়টি যেন
কোনদিন না হয়। তবে ই্যা, নাম করব না, সামনা-
সামনি দোকান করি, বলবে—ব্যাটার হিংসে হচ্ছে, নইলে

এখনি হাঁক মেয়ে ব'লে দিতে পারতুম—বাজার থেকে পেটি পেটি শুঁড়ো দুধ আমি কিনি না, কেনে ওই—। না বাবা, কাজ নেই, বলবে—আমার খন্দের ভাড়াচ্ছে! ওই যে ফরসা গায়ের রঙ হৃদয়ের দেখতে, আপনারাও তাই দেখে ভুলছেন। আর আমি হলুম গিয়ে কালো, একটা চোখ কানা—

এই ব'লে হাসতে হাসতে ছুটো সন্দেশের জায়গায় তিনটে সন্দেশ দিয়ে কাশীনাথ বললে, একটা বেশী দিয়ে দিলুম দাদা, খেয়ে দেখবেন।

উস্তেজনার মুখে কথাটা বেশ জোরে জোরেই বলেছিল কাশীনাথ। শশিনাথ কানে খাটো তাই শুনতে পেলো না।

শশিনাথও বলে। তবে চোঁচিয়েও বলে না, গালা-গালিও দেয় না। হাত দিয়ে খন্দের বিদ্রোহ করে, আর মুখ দিয়ে আপন মনেই অনর্গল বলতে থাকে : শুঁড়ো দুধের দই বেচে, পানতুয়া বেচে দোকলা দালান তুলবি তোলা, আমি বাবা যেমন আছি তেমনই থাকি।...কালো অলঙ্কাস মোষের স্তন চেহারাও যেমন, মনটাও তেমনি।

—কাকে কি বলছ শশি ?

শশিনাথ একটু হেসে বলে, কাউকে বলি নি আস্তে। ওসব বড় নোংরা কথা, আপনাদের শুনে কাজ নেই।

রাজি হয়ে গেছে। কাশীনাথ দোকান বন্ধ করবে।

টাকাপয়সাগুলি একটি কাপড়ের খলিতে ঢুকিয়ে কোমরে বাঁধলে প্রথমে। ধূপদানিতে আগুন দেওয়া হয়েছে। ধূপদানিটি নিয়ে গণেশ ঠাকুরকে ধোঁয়া খাইয়ে, কাঠের ক্যাশবাক্সটিতে ধোঁয়া দিলে, তারপর দোকানের চারিদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধোঁয়া দিয়ে যথাস্থানে ধূপদানিটি নামিয়ে রাখলে। গছাঙ্গল ছিটিয়ে দিলে চারিদিকে। তারপর গণেশ ঠাকুরকে প্রণাম করে বেরিয়ে এল বাইরের ফুটপাথে। শো-কেস, দরজা টেনে টেনে বন্ধ করলে। বড় বড় তিনটি তালা লাগালে। প্রত্যেকটি তালা ছু হাত দিয়ে চেপে ধরে প্রাণপণ শক্তিতে টেনে ঝুলে দেখলে বন্ধ হয়েছে কি না, তারপর দলা-পাকানো খবরের কাগজে আগুন জালিয়ে দিয়ে হুমুখে তাকিয়ে দেখলে, শশিনাথ দোকান বন্ধ করে কাগজ পুড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাবি বাজাচ্ছে।

কাশীনাথ এল শশিনাথের কাছে।

কাশীনাথ জিজ্ঞাসা করলে, বেচাকেনা কেমন ?

শশিনাথ বললে, কোন রকম।

হুজনে হাঁটতে আরম্ভ করলে।

শশিনাথ বললে, এবারের পেটিটার ওজন কম ছিল।

কাশীনাথ বললে, ও-রকম থাকে।

শশিনাথ বললে, কাল ছু পেটি মাল বেশী চাই।

কেন ?

হুজনে দোকানদার নেবে বলেছে।

কাশীনাথ বললে, তুমি বুঝি সবাইকে শেখালে এই শুঁড়ো দুধের কাজ ?

শশিনাথ বললে, শিখুক না। ওতেও তো লাভ আছে। শেষে ছুটোই চালাব। দোকানও চালাব, ওটাও চালাব।

এরই পুত্র ধরে চলল তাদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা—কত হাসি, কত গল্প।

গ্রামবাজারের মোড় থেকে হুজনে যেতে হবে হুদিকে। গল্প তখনও তাদের শেষ হয় নি। হুস্তরাং বসতে হ'ল একটা বাড়ির রকে। শহরের পথ জনবিরল হয়ে এল। হুমুখের ট্যান্ডি-স্ট্যাণ্ড ফাঁকা হয়ে গেল। মল্লিকদের পেটা বাড়িতে একটা বাজল।

চরম ভাঙল কাশীনাথের : ভোরে উঠতে হবে। আজ চলি।

এস।—ব'লে বিদায় নিলে শশিনাথ।

এমনি প্রত্যাহ।

দশ বছর আগে এমনি করে গ'ড়ে উঠেছিল তাদের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব।

দশ বছর পরে, দেখা গেল, ছুটো দোকানই তাদের বড় হয়েছে। দশ-বারোজন কর্মচারী কাজ করছে প্রত্যেকটি দোকানে। দোকানের মাথায় প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড। কাচের শো-কেসে নানারকমের মিষ্টি সাজানো। পেছ ব'লে খাবার জায়গা। তারও পেছনে দিবারাজি সাজ তৈরি হচ্ছে।

কাশীনাথ, শশিনাথ এখন মস্ত লোক তাদের মস্ত কারবার। এখন তারা শুঁড়ো দুধের শাহকারী

ব্যবসায়ী। অস্ট্রেলিয়া থেকে মাল আসছে। হল্যাণ্ড থেকে জাহাজ আসছে। লক্ষ লক্ষ টাকার লেন-দেন চলছে।

সামনে পুজো। শশিনাথ বললে, হাওড়া স্টেশনের ওপারে কি আছে তা তো জান না। চল বেড়িয়ে আসি।

কাশীনাথ জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় যাবে?

শশিনাথ বললে, পুরী।

কাশীনাথ রাজী হয়ে গেল। ঠিক হ'ল—ছজনের যা খরচ হবে, হিসেব ক'রে এ দেবে অর্ধেক, ও দেবে অর্ধেক।

শশিনাথ আগে বিড়ি টানত, এখন সিগারেট খায়। সিগারেট খায়, পান খায়, মাঝে মাঝে মত্তপান করে।

কাশীনাথের কিন্তু ও-সব বাল্যই নেই। মত্তপান দূরের কথা, সিগারেটও খায় না, পানও খায় না।

শশিনাথ বললে, নিতান্ত বে-রসিক তুমি।

এই ব'লে সে কয়েকটা দামী দামী সিগারেটের টিন কিনে নিলে। জীবনের সাধ মিটিয়ে নেবার জন্তে বেড়াতে বেরিয়েছে, এ সময় রূপণতা করার কোনও মানেই হয় না।

পুরী গিয়ে পৌঁছল দুই বন্ধু। ভাল একটা হোটেলে গিয়ে উঠল।

শশিনাথ বললে, মদ খাব।

কাশীনাথ বাধা দিলে না। বললে, খাও।

খুব দামী বিলিভী মদ এল। তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক সব কিছুই এল। শশিনাথ তার মনের সাধ মিটিয়ে মত্ত পান করলে। কাশীনাথ নিজের হাতে বোতল খুলে কাচের গ্লাসে ঢেলে দিতে লাগল।

পরের দিন ঠিক হ'ল—সমুদ্রস্নান করবে তারা।

সমুদ্রে স্নান ক'রে জগন্নাথের মন্দির দর্শন করবে।

এত এত লোক স্নান করছে সমুদ্রে, তারাই বা করবে না কেন?

দুই বন্ধু প্রস্তুত হ'ল কোষের গায়ছা বেঁধে। মনে হ'ল যেন দ্বিমুখ্য করতে চলেছে।

ধীরে ধীরে জলে গিয়ে নামল।

এই ঢেউটা নিতে হবে কিন্তু।—বলতে বলতে প্রকাণ্ড ঢেউ এসে তাদের আছড়ে ফেলে দিয়ে গেল বালির ওপর।

মন্দ লাগল না।

হাসতে হাসতে আবার এগিয়ে গেল দুই বন্ধু।

কাশীনাথ পূর্ববঙ্গের মানুষ। নদী-নালা-খাল-বিলে ভরা পূর্ববঙ্গ। সমুদ্রের লোনা জলে নাকানিচুবানি খেতে পারে, কিন্তু জলে ডুবে মরবে না সহজে।

আর শশিনাথ?

কলকাতা শহরেই চিরকাল। লালদীঘি, গোলদীঘি চোখে দেখেছে মাত্র। স্নান করেছে কলে চৌবাচ্চায়। সেই শশিনাথ নেমেছে সমুদ্রের জলে।

বার দুই-তিন ঢেউ নেবার পর তার সাহস গেল বেড়ে। ক্রমাগত এগিয়ে চলল সামনের দিকে। কাশীনাথও যাচ্ছিল তার পাশে পাশে। একটা ঢেউয়ের ধাক্কায় ছিটকে পড়ল অনেকদূরে।

ঢেউ স'রে গেল। কাশীনাথ উঠে দাঁড়াল। কিন্তু শশিনাথ কোথায়? অনেক দূরে মনে হ'ল যেন ভেসে যাচ্ছে একটা মানুষ। হাত ছুটো-একবার উপরের দিকে উঠল, তারপর আর তাকে দেখা গেল না।

কাশীনাথ চিৎকার করে উঠল, শশিনাথ! শশী!

একে কালা, তায় আবার সমুদ্রের গর্জন। কারও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

হুলিয়া ছেলেরা তীরে সাঁতার কাটছিল। কাশীনাথ তাদের ডাকলে হাতের ইশারায়। আবার তেমনি ইশারা ক'রেই দেখিয়ে দিলে তার বন্ধু ডুবছে।

হুলিয়া ছেলেরা বকশিসের লোভে ছুটল তীরের মত। তারপর চারজনে ধরাধরি ক'রে অতি কষ্টে যে-মানুষটিকে তারা তুলে নিয়ে এল সেই শশিনাথ।

অনেকখানি লোনা জল খেয়ে পেটটা তখন তার ফুলে ঢাকের মত হয়ে গেছে। মুখ দিয়ে গল গল ক'রে জল বেরুচ্ছে। চোখ দুটো লাল। তাকিয়ে আছে, কিন্তু কথা বলতে পারছে না।

বিস্তর লোক জড়ো হয়ে গেল। কেউ বললে, ডাক্তার-খানায় নিয়ে যান। কেউ বললে, চিং ক'রে শুইয়ে দিন। কেউ বললে, উপুড় ক'রে দিন। কেউ বললে, ম'রে গেছে। কেউ বললে, মরে নি।

হুলিয়া ছেলেরা কিন্তু কারও কথা শুনলে না, কোনও কথার জবাব দিলে না, মিনিট দশ-পনেরো ধ'রে কত রকম

কি সব করলে, শশিনাথের মুখ দিয়ে হড়্‌হড়্‌ ক'রে খুব শানিকটা জল বেরিয়ে গেল, তারপর হঠাৎ এক সময় তাকে তুলে বসিয়ে দিয়ে একটা ছেলে বললে, এবার একে বাড়ি নিয়ে যান বাবু।

শশিনাথের হু চোখ বেয়ে দর দর ক'রে জল গড়িয়ে এল। কাশীনাথের হাত ছুটো জড়িয়ে ধ'রে সে হাউ মাউ ক'রে কেঁদে উঠল।

কাশীনাথ বললে, কাঁদে না। চুপ কর।

শশিনাথ বললে, আজ আমি ম'রে গিয়েছিলাম। তুমি আমাকে বাঁচালে।

কাশীনাথ বললে, না, আমি বাঁচাই নি।

হুলিয়াদের দেখিয়ে দিয়ে বললে, বাঁচিয়েছে এরা।

শশিনাথ বললে, চল, ওদের দশ টাকা বকশিস দেব।

হুলিয়া ছেলেগুলো বললে, না বাবু, আমরা কুড়ি টাকা নেব। পাঁচ টাকা ক'রে এক-একজন।

কুড়ি টাকাই তাদের দেওয়া হ'ল।

এই দুর্ঘটনার পর, পুরীতে তারা আর রইল না। ফিরে এল কলকাতায়।

এসেই শশিনাথ হিসেবের কাগজ নিয়ে বসল। পুরী যাওয়া-আসা খরচের হিসেব।

কাশীনাথ বললে, কত ছোটখাটো খরচো খরচ হয়েছে আমাদের, সে সব কি তোমার মনে আছে?

হাসতে হাসতে শশিনাথ তার পকেট থেকে ছোট একটি খাতা বের করলে। দেখা গেল, কোথায় হু-পয়সার পান কিনেছে, তাও সে লিখতে ভোলে নি।

কাশীনাথ ডেবেছিল, মদ ও নিজেই খেয়েছে, কাজেই সে খরচের আধাআধি বখরা নিশ্চয়ই তাকে দিতে হবে না। তার ওপর হুলিয়াদের বকশিস কুড়ি টাকা। শশিনাথের জীবন বাঁচিয়েছিল তারা। সে খরচ শশিনাথের একার।

কিন্তু আশ্চর্য, সব টাকা একসঙ্গে যোগ ক'রে নিতান্ত নির্লজ্জের মত শশিনাথ তার অর্ধেক চেয়ে বসল কাশীনাথের কাছে।

কাশীনাথ তবু একবার ভিজ্ঞাসা করলে, এ' সবের অর্ধেক দিতে হবে আমাদের?

শশিনাথ বললে, বাবার আগে সেই রকম কথাই হয়েছিল।

কাশীনাথ আর একটি কথাও বললে না। দিলে। তার আধাআধি ভাগের প্রতিটি পাই-পয়সা মিটিয়ে দিয়ে উঠে গেল সেখান থেকে।

বোল কলা পূর্ণ হ'ল সেই দিন, কাশীনাথ যেদিন শুনলে, যে টিকিটে তারা পুরী গিয়েছিল, রেলের সে টিকিট দুটোও শশিনাথ কেনে নি। পূজোর ছুটিতে রেল কোম্পানি সে বছর এক মাসের কনসেশন টিকিট বের করেছিল। শশিনাথের হু শালা দুখানি টিকিট কিনে পুরী গিয়ে সাত দিনের ভেতর ফিরে এসেছে। টিকিটে কোথাও আঁচড় পড়ে নি। টিকিট দুটো তারা কেলে দিতে যাচ্ছিল, শশিনাথ কুড়িয়ে নিয়ে বলেছিল, টিকিটের মেসার্স এখনও ফুরোয় নি। দেখি, যদি আর একবার ব্যবহার করতে পারি।

সেই টিকিটই তারা ব্যবহার করেছে।

শশিনাথের জয় হোক!

কাশীনাথ একবার স্বপ্ন দেখেছিল, শশিনাথকে সে মেঝে ফেলেছে। সে আজ অনেক দিনের কথা। আজ মনে হ'ল, পুরীর সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে সেদিন সে হুলিয়াদের বোধ করি না ডাকলেই ভাল করত।

আরও কিছুদিন পরে।

অনেক টাকার মাল ধ'রে রেখেছিল দুই বন্ধু। কাশীনাথ পকাশ হাজার, শশিনাথ পকাশ হাজার—এক লক্ষ টাকার গুড়ো দুধের পেটি।

শশিনাথের ইচ্ছা, দর না উঠলে মাল সে ছাড়বে না। অনেক টাকা লাভ করবে।

কাশীনাথ এসে খবর দিলে, হল্যাণ্ডের জাহাজ এসে গেছে। বাজারে প্রচুর মাল। দর প'ড়ে যাচ্ছে। এ সময় মাল ধ'রে রাখলে অনেক টাকা লোকসান হয়ে বাবে।

শশিনাথ বললে, ছাড়তে হয় তুমি ছাড়। আমি আরও এক সপ্তাহ দেখব।

এক সপ্তাহ দেখবার দরকার হ'ল না। দু দিন পরেই দেখা গেল, বাজারের দর অনেক নেমে গেছে। এখন

ছেড়ে দিলে তার পনেরো হাজার টাকা লোকসান।
আরও ঘেরি করলে আরও বেশী লোকসানের সম্ভাবনা।

পনেরো হাজারের ওপর দিয়েই থাক।—ব'লে একটা
দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কাশীনাথ উঠে দাঁড়াল। বললে, ও
মাল আমি আজই বিক্রি ক'রে ফেলব।

শশিনাথ বললে, বেশ, তবে আমাকেই দাও।

টাকার হিসেব ক'রে শশিনাথ চেক-বই বের করলে।

কাশীনাথ বললে, এত মাল তুমি কোন্ সাহসে ধরছ?
ডুববে যে!

শশিনাথ বললে, ডুবছিলাম একদিন পুরীর সমুদ্রে।
সেদিন তুমিই বাঁচিয়েছিলে। আবার যদি ডুবি এই
শুকনো ভাঙায়, তুমিই বাঁচাবে।

এই ব'লে সে হো-হো ক'রে হেসে উঠল।

মুখে কিছু বললে না কাশীনাথ। কিন্তু মনে মনে
বললে, এমনি হো-হো ক'রে কাঁদবে যেদিন মাথায় হাত
দিয়ে, সেই দিন আমি হাসব।

হাসবার স্বযোগ কিন্তু পেলো না কাশীনাথ।

দেখা গেল, শশিনাথ হাত মিলিয়েছে মস্ত বড় ধনী এক
মাড়োয়ারীর সঙ্গে। হল্যাণ্ডের জাহাজের সংবাদ মিথ্যা,
আর গুঁড়ো দুধ বলতে যেখানে যা কিছু ছিল—শশিনাথের
কল্যাণে সবই গিয়ে ঢুকল মাড়োয়ারীর গুদামে।

লাভ হ'ল প্রচুর, কিন্তু সে লাভের কতটুকু অংশ
পেলে শশিনাথ আর কতটুকু পেলে ধনী মাড়োয়ারী তার
হিসেব কেউ রাখলে না। শুধু জ্বলে পুড়ে মরতে লাগল
কাশীনাথ তার লোকসানের জ্বালায়।

নিতান্ত ইতরের মত শশিনাথ যে খেলা খেললে তার
সঙ্গে, সেটাকে সে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারলে না।
কাশীনাথের আহার গেল ছুটে, নিদ্রা গেল টুটে, দিবারাত্রি
শুধু সে একটি কথাই ভাবতে লাগল—কেমন ক'রে সে
এর প্রতিশোধ নেবে।

বাজারে তখন একটা মালের চাহিদা খুব বেশী।
অস্ট্রেলিয়ার তৈরী 'ফুল-ক্রিম মিক্সড-পাউডার'। কেউ দিতে
পারছে না। অস্ট্রেলিয়া থেকে খবর এসেছে, কোম্পানি
কারবার গুটিয়ে দিয়েছে। সে জিনিস আর পাওয়া যাবে

না। সামান্য ধার কাছে যেটুকু আছে, হাতছাড়া করতে
চায় না কেউ। দিনের পর দিন দাম তার বেড়েই
চলেছে।

কাশীনাথ একদিন শশিনাথের বাড়ি গিয়ে বললে,
অস্ট্রেলিয়ার ফুল-ক্রিম চাই?

শশিনাথ চমকে উঠল। মনে হ'ল যেন কাশীনাথ
বলছে—আকাশের চাঁদ চাই?

শশিনাথ বললে, নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু পাবে কোথায়?
সে-সব তোমার জানবার কি দরকার? চাই কি না
বল।

শশিনাথ বললে, চাই।

কাশীনাথ ভিজ্ঞাসা করলে, কত?

যত দিতে পার।

কাশীনাথ বললে, কাল বলব, কত দিতে পারি।

দর-দস্তুর সব ঠিক হয়ে গেল।

কাশীনাথের নতুন বাড়ির পাশেই যে গুদাম-ঘর, মাল
ডেলিভারি নিতে হবে সেইখান থেকে।

কাশীনাথ বললে, আর যদি বল তো মাল পৌছিয়েও
দিতে পারি তোমার গুদামে।

না, আমি তোমার গুদাম থেকেই নেব।—বললে
শশিনাথ।

সেই ভাল।—ব'লে নিশ্চিন্ত হয়ে কাশীনাথ বাড়ি
ফিরে গেল।

শশিনাথ কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলে না। তাকে জব্দ
করবার এ এক নতুন চাল নয় তো?

কিন্তু তাই বা কেমন ক'রে হবে? কাশীনাথ তো
অগ্রিম টাকা চাইলে না।

শশিনাথের মাথার ভেতরটা কেমন যেন করতে লাগল।
এই দুর্ভাগ্যবশত সে পেলে কোথায়?

পরের দিন সন্ধ্যায় সে হেঁটে হেঁটেই চলতে লাগল
কাশীনাথের বাড়ির দিকে। চুপি চুপি তার গুদামে গিয়ে
দেখবে, মাল সেখানে সত্যিই মজুত আছে কি না। অর্ডার
দিতে হয় তার পর দেবে।

কাশীনাথের বাড়িতে আলো জ্বলছে। গ্যারেজে নতুন
গাড়িখানাও রয়েছে। বাড়িতেই আছে সে।

যাক, শশিনাথ তাকে ডাকল না। চোরের মত চুপি-

চুপি এগিয়ে গেল তার গুদামের দিকে। গুদাম মানে
বাড়ির পেছনের দিকে টিনের একখানা লম্বা ঘর।

শশিনাথ দেখলে, গুদামের দরজায় তালা নেই। টিনের
কপাট হাত দিয়ে একটু ফাঁক করে অত্যন্ত সন্তর্পণে শশিনাথ
ভেতরে ঢুকে পড়ল। আলো জ্বলছে না। চারিদিক
অন্ধকার। ফিস ফিস করে কারা যেন কথা বলছে।
হুজুং লোক রয়েছে বলে মনে হ'ল। একজন দাঁড়িয়ে,
একজন ব'লে। যে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার হাতে একটা টর্চ।

শশিনাথ তাদের চিনতে পারে নি। ডাকলে,
কাশীনাথ।

কাশীনাথ চমকে উঠল। বললে, কে?

টর্চের আলোটা এসে পড়ল শশিনাথের মুখের ওপর।

হঠাৎ সেখানে বজ্রপাত হ'লেও বুঝি এতটা বিস্মিত হ'ত
না কাশীনাথ; তাড়াতাড়ি শশিনাথের দিকে সে এগিয়ে
এল। জিজ্ঞাসা করলে, তুমি এখানে?

শশিনাথ বুঝতে পারছিল না, কি জবাব দেবে। ফ্যাল
ফ্যাল করে কাশীনাথের মুখের পানে সে তাকিয়ে রইল।

কাশীনাথের বুকের ভেতরটা তখন টিপটিপ করছে।
শশিনাথকে এক রকম ঠেলতে ঠেলতে সেখান থেকে বাইরে
নিয়ে এল। বললে, চল, বসবে চল।

শশিনাথ বললে, না, বসব না। আমার কাজ আছে।
আমি বলতে এসেছিলাম—

কথাটা কাশীনাথ শেষ করে দিলে : অস্ট্রেলিয়ান মিস-
পাউন্ডার তুমি নেবে না। এই তো?

শশিনাথ বললে, দু-চার দিন পরে নেব।

কাশীনাথ বললে, বুঝেছি।

'বুঝেছি' বলে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সেইখানে। 'এস'
কি 'যাও' কোনও কথাই বললে না শশিনাথকে।

শশিনাথও কিছু না বলে হেঁটে হেঁটে চলে গেল তার
চোখের স্রুখ দিয়ে।

রাত্তার বাঁকে অদৃশ হয়ে গেল শশিনাথ।

কাশীনাথ চিংকার করে উঠল, শয়তান!

মুখ কেবোতেই দেখলে, হরিশ দাঁড়িয়ে আছে। এই
হরিশই এতক্ষণ গুদামে কাজ করছিল তার সঙ্গে।
নিতান্ত নিরীহ এবং অত্যন্ত বিশ্বাসী কর্মচারী। সম্পর্কে
কাশীনাথের শালা।

কাশীনাথের সব রাগ যেন তারই ওপর গিয়ে পড়ল :
হ'ল তো? শশিনাথ সব দেখে গেল। তোমাকে কি
বলেছিলাম?

হরিশ ধর ধর করে কাঁপতে লাগল। কাশীনাথের
রাগ সে জানে।

কাশীনাথ থামল না। বললে, তোমাকে বলেছিলাম,
গুদামের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করতে। করেছিলে?
করলে আজ আমার এই সর্বনাশটি হ'ত না। শশিনাথ
এসেছিল পায়ে হেঁটে। গাড়ি পর্যন্ত আনে নি। চোরের
মত চুপিচুপি এসেছে। দেখেছে গুদামের দরজা খোলা।
ভেতরে ঢুকেছে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কিছু
শুনেছে। নিজের চোখে দেখেছে—তুমি অস্ট্রেলিয়ান
মিস পাউন্ডারের ছাপা লেবেল আঁটছ টিনের গায়ে।
দাঁড়িয়ে রইলে কেন হাঁ করে? চল।

কাশীনাথ হরিশকে টেনে নিয়ে গেল গুদামের ভেতর।
বললে, নকল লেবেল যে কখনো এঁটেছ, সব ছিঁড়ে
ফেল। বাকি লেবেলগুলো নাও। এতটুকু চিহ্ন
রেখো না কোথাও। সব পুড়িয়ে ফেল। শশিনাথ
গেছে পুলিশে খবর দিতে। রাজেই হয়তো পুলিশ
এসে যাবে।

পুলিস কিছু এল না রাজে। পুলিশও এল না,
কাশীনাথের চোখে ঘুমও এল না।

এই কথা যদি জানাজানি হয়ে যায়, এ-বাজারে আর
ক'রে ধুতে হবে না কাশীনাথকে। শশিনাথ তার পরম
শত্রু। এ স্বযোগ সে ছাড়বে না কিছুতেই।

তার চেয়ে—

কাশীনাথ উঠে বসল। আলো জ্বালালে। আলমারি
খুলে তার নতুন-কেনা অটোমেটিক রিভলভারটি ঠিক করে
রাখলে।

কাঁচা টাকা-পয়সা সঙ্গে নিয়ে বাওয়া-আসা করতে হয়
কলকাতার রাস্তায়। কাশীনাথ আর শশিনাথ দুজনেই
দরখাস্ত করেছিল দুটি রিভলভারের লাইসেন্সের জন্তে।
অনেক তদ্বির-তদারক করে অনেক কষ্টে কাশীনাথ
লাইসেন্স পেয়েছে। শশিনাথ পায় নি।

পরের দিন বাজারে গেল কাশীনাথ।

শশিনাথের দেখা পেলে না। সে আসে নি।

আসবে কেন? পুলিশে খবর দিয়ে চূপ করে বসে আছে বাড়িতে। আর নয়তো কলকাতা ছেড়ে পালিয়েছে।

কাশীনাথ বাড়ি ফিরে এল। সন্ধ্যা তখনও হয় নি। ভাবলে শশিনাথের সঙ্গে একটা এপয়েন্টমেন্ট করা যাক—পোস্টকার্ড লিখে। একখানা পোস্টকার্ড টেনে নিয়ে লিখতেও গেল। কিন্তু না, পোস্টকার্ডখানা সাক্ষী থেকে যাবে।

তার চেয়ে—

টেলিফোনে কথা বলা ভাল।

টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়েও নামিয়ে রাখলে কাশীনাথ। ডাকলে, হরিশ।

হরিশ এসে দাঁড়াল : বলুন।

কাশীনাথ বললে, চট করে তুমি একুনি চলে যাও শশিনাথের বাড়ি। এখন বাজছে সাড়ে পাঁচটা। বল গিয়ে, ঠিক সাতটার সময় সে যেন তার বাড়িতে আমার জন্তে অপেক্ষা করে। আমি যাচ্ছি।

হরিশ চলে গেল।

এখনও অনেক দেরি। গাড়ি নিয়ে তার বাড়ি পৌঁছতে পনেরো মিনিটের বেশী লাগবে না। সময় যেন কাটতে চায় না কিছুতেই।

কাশীনাথ বেরিয়ে এল বাড়ির বাইরে।

ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করলে, গাড়ি বের করব? কর।

ড্রাইভার গাড়ি বের করছে, কাশীনাথ পাশচারি করছে বাড়ির সামনে। জুতো ছোড়াটা নতুন কিনেছে। কিচ-কিচ আওয়াজ হচ্ছে। তা হোক। চমৎকার জুতো। কিন্তু কালো রঙের জুতো না কিনলেই পারত। তার গায়ের রঙ কালো, তার ওপর কালো রঙের জুতো! ব্রাউন রঙের আর এক ছোড়া কিনতে হবে।

রাম রাম।

মুখ তুলে চাইতেই দেখে, দুখের বাজারের দালাল কিষণচাঁদ।

কাশীনাথ জিজ্ঞাসা করলে, কি খবর কিষণচাঁদ?

কিষণচাঁদ বললে, কুছু না বাবুসাব। এই দিক দিয়ে একঠো তাগাদায় যাচ্ছি—

বলেই সে কাশীনাথের একটু কাছ-ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। চুপিচুপি বললে, হাঁ বাবু, শুনছি নাকি অস্ট্রেলিয়ান ফুল-ক্রিম এসে গেছে বাজারে?

কাশীনাথ বললে, কোথায় শুনলে? শশিবাবুর কাছে?

—না, শশিবাবুর সঙ্গে আমার মূল্যকাৎ হয় নাই। আমি শুনেছি মধুরাপ্রসাদের গদ্বিতে। আবার শুনছি ঠিক সেই রকমের টিন বানিয়েছে, লেবিল বানিয়েছে, বাহারসে চিনা যায় না, ভিতরে রন্ধি মাল পুরিয়ে দিয়েছে।

গাড়ি এসে দাঁড়াল। কিষণচাঁদ বললে, আপনি যান বাবুসাব, আবার দেখা হবে। রাম রাম।

কিষণচাঁদ চলে গেল।

কাশীনাথ দাঁতে দাঁত চেপে ধরলে।—এ ঠিক শশিনাথের কাজ।

এখন ছটা বাজছে। আর এক ঘণ্টা। তার পরেই সব শেষ। চিরদিনের জন্তে তার মুখ বন্ধ হয়ে যাবে।

হরিশ ফিরে এল। শশিনাথের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। বাড়িতেই।

কাশীনাথ আজ কোট গায়ে দিয়েছে। পকেটে হাত দিয়ে দেখলে, ঠিক আছে।

হরিশ জিজ্ঞাসা করলে, আমি যাব সঙ্গে?

কাশীনাথ বললে, না।

ড্রাইভারকে বললে, তুমিও নাম। আমি একাই যাব।

কাশীনাথ গাড়ি চালাতে খুব বেশীদিন শেখে নি।

ড্রাইভার বললে, থাকি না আমি আপনার সঙ্গে?

কাশীনাথ ধমক দিয়ে উঠল, না না।

এই বলে সে নিজেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

শশিনাথ বাড়িতে বসে আছে কাশীনাথ আসবে বলে।

সাতটা বাজল, সাড়ে সাতটা বাজল, কাশীনাথ এল না।

শশিনাথ ভাবলে, বুঝি সে তার সঙ্গে রসিকতা করেছে। আসবে না। তার বাড়িতে একবার টেলিফোন করে দেখা যাক।

উঠতে যাবে, ঘড়িতে তখন আটটা বাজতে মিনিট পাঁচেক দেরি, এমন সময় হো-হো করে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল কানীনাথ।

শশিনাথ কেমন যেন অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকালে। তাকিয়ে আর চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলে না। এ যেন অস্ত্র কানীনাথ। এত সুন্দর হাসি কানীনাথের মুখে।

শশিনাথ বললে, এত হাসি কিসের?

কানীনাথ বললে, অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি তোমাকে।

—তাতে কি হয়েছে?

হয়েছে অনেক কিছু।—বলতে বলতে কানীনাথ বলল। বললে, দেখ, আজ তোমাকে সব কথা খুলে বলি। সারাটা জীবন ধরে কি করলাম আমরা? এমন কোনও খারাপ কাজ নেই যা আমরা করি নি। তুমি কিন্তু আমাকেও ছাড়িয়ে গেলে। বেশ ভেবে চিন্তে আমার পনেরো হাজার টাকা লোকসান করিয়ে দিয়ে তোমার কত লাভ হ'ল জানি নূ—

শশিনাথ প্রতিবাদ করতে চাইলে। বললে, না না, সেটা হচ্ছে গিয়ে—তুমি আমার কথা শোন—

কোনও কথা শুনতে চাই না।—কানীনাথ বললে, আমাকে বলতে দাও। পনেরো হাজার টাকা নয়, তুমি আমাকে ঠকালে—সেইটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারলাম না। কেমন করে তোমাকে ঠকাব, কেমন করে তোমার সর্বনাশ করব—সেই কথাটাই ভাবতে লাগলাম দিনরাত। শেষে অনেক কষ্ট করে অস্ট্রেলিয়ান দুধের টিন তৈরি করলাম, হুবহু নকল লেবেল ছাপালাম। তোমাকে বিক্রি করার জন্তে নয়। বিক্রির নাম করে তোমার গুদামে মাল পাঠিয়ে দিয়ে তোমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেব বলে। কিন্তু সব গেল ভেঙে। তুমি নিজে গিয়ে হাজির হ'লে আমার গুদামে। চোরের মত চুপিচুপি গিয়ে সব কিছু দেখে ফেললে।

শশিনাথ বললে, কী দেখে ফেললাম?

—দেখলে না? আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম টর্চ নিয়ে, আর হরিণ লেবেল আঁটছিল।

শশিনাথ বললে, না। সত্যি বলছি আমি কিছুই দেখতে পাই নি।

কানীনাথ খানিক ধেমো কি যেন ভাবলে। তারপর

বললে, তা হ'লেই দেখ কি রকম মতিভ্রম! অথচ আমি ভাবলাম, তুমি সব দেখে গেলে। গিয়েই পুলিশে খবর দেবে। বাজারে জানাজানি হয়ে যাবে, লঙ্কার আমি আর কারও কাছে মুখ দেখাতে পারব না। কারবার শুটিয়ে আমাকে স'রে পড়তে হবে। তার চেয়ে—তুমি তো জান আমি রিভলভারের লাইসেন্স পেয়েছি, ভাবলাম সেই রিভলভার দিয়ে তোমাকে একবারে শেষ করে দিই—তোমার মুখ চিরদিনের জন্ত বন্ধ হয়ে যাক।

শশিনাথ নড়ে-চড়ে বসল। ভয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

কানীনাথ বললে, বাজারে গেলাম, দেখলাম তুমি যাও নি। হরিণকে পাঠালাম তোমার কাছে।

শশিনাথ আর ব'সে থাকতে পারছে না। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেছে। পেচনের দরজাটা খোলা। ছুটে পালিয়ে যেতে পারবে কি না একবার তাকিয়ে দেখে নিলে।

কানীনাথ বললে, তোমাকে সাতটার সময় বাড়িতে থাকতে বলেছিলাম।

শশিনাথ বললে, হ্যাঁ, সাতটা।

শশিনাথ আর কথা বলতে পারছে না। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে কানীনাথের হাতের দিকে। হাতটা সরিয়েছে কি ছুটে পালাবে।

সেই দিকে তাকিয়েই শশিনাথ অতি কষ্টে উচ্চারণ করলে, তুমি কি রিভলভার নিয়ে এসেছ?

কানীনাথ আবার হো-হো করে হেসে উঠল। বুঝতে পারলে, মৃত্যুর ভয়ে শশিনাথ আধ-মরা হয়ে গেছে। বললে, না না, তোমার ভয় নেই। সাতটার সময় দেখা যদি হ'ত, তা হ'লে সত্যি আমি তোমাকে মেরে ফেলতাম। এখন আর মারব না। তুমি শুধু শোন আমার কথাগুলো শেষ পর্যন্ত।

শশিনাথের চোখ দিয়ে জল এসে গেল। বললে, বল।

কানীনাথ বললে, নিজেই গাড়ি চালিয়ে আসছিলাম তোমার এখানে। ড্রাইভারকে সঙ্গে নিলাম না, হরিণকে নিলাম না। নিলাম শুধু আমার সেই অটোমেটিক রিভলভারটা—সাতটা চেয়ার সাতটা বুলেট দিয়ে ঠাসা।

কিন্তু কে জানত এমন হবে? এখান থেকে বেশী দূর নয়—তোমার বাড়ির হুমুখে রাস্তার এই যে বাঁকটা—

ওইটে পেরিয়েই লালরঙের রকওলা বাড়িটার কাছ-বরাবর এসে গেছি, হঠাৎ দেখি হুমুখে একটা প্রকাণ্ড লরি আসছে। সেই লরিটাকে পাশ কাটাতে গিয়ে হাতটা ঠিক রাখতে পারলাম না, একটা ল্যাম্প-পোস্টের গায়ে জোরসে লাগলাম ধাক্কা। মাথাটা গেল ঘুরে—কি যে হ'ল বুঝতে পারলাম না, আবার আর এক ধাক্কা—লাল বাড়িটার রকে। আমাতে তখন আর আমি নেই। সব শেষ। চারিদিকে অন্ধকার। কিন্তু সে শুধু কিছুক্ষণের জন্তে। তার পরেই সব পরিষ্কার। তখন এ পৃথিবীর রঙ গেছে বদলে। সব দেখতে পাচ্ছি, সব বুঝতে পারছি, কিন্তু আমার কিছুই করার নেই। মনে হচ্ছে, তোমরা কে? কারও সঙ্গে আমার কোনও সম্বন্ধ নেই। আমার জী পুত্র কথা—কেউ আমার নয়। আমি একা, আমি স্বাধীন, আমার কোনও প্রয়োজন নেই, আমার কোনও কষ্ট নেই, দুঃখ নেই, অভাব নেই; কারও ওপর কোনও রাগ নেই, বিদ্বেষ নেই—শুধু আনন্দ। আনন্দ ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু সে আনন্দ আমি উপভোগ করতে পারছি না ভাই। এতদিন ধরে পৃথিবীর সঙ্গে যে সম্বন্ধ পাতিয়েছি—শুধু স্বার্থের সম্বন্ধ। শুধু আমি আর আমার। আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার ঘর, আমার বাড়ি, আমার টাকা, আমার বন্ধু, আমার শত্রু। এরাই আমাকে টেনে টেনে নামিয়ে আনছে শুধু। জ'লে পুড়ে ম'রে যাচ্ছি। আমি তোমার কাছে এসেছি শুধু ক্ষমা চাইতে, মুক্তি চাইতে। তোমাকে আমি মারতে এসেছিলাম। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমাকে মুক্তি দাও। আমি পালাই এখান থেকে।

শশিনাথ বললে, তোমার কথাগুলো আমি বুঝতে পারছি না কান্দীনাথ। পাগলের মত কি বলছ যা-তা।

কান্দীনাথ বললে, বুঝতে পারবে না যে। পৃথিবীর সব ভাল কথাই পাগলের কথা ব'লে মনে হয়। তোমাকে কিছু বুঝতে হবে না, তুমি শুধু এইটুকু বুঝলেই যথেষ্ট হবে—যে কদিন বেঁচে আছ, আমার আমার ক'রে পৃথিবীর সঙ্গে হাজার বন্ধনে বাঁধা প'ড়ে না। অনেক ধারাপ কাজ করেছ, এখন ছুটো ভাল কাজ ক'রে তার প্রায়শ্চিত্ত কর। হুখ যদি চাও, আনন্দ যদি চাও,

লোভ জিনিসটাকে প্রশ্রয় দিও না। যদি পার তো আমাকে ক্ষমা ক'র। আমি চললাম।

শশিনাথ বললে, কিন্তু তোমার গাড়িটার কি হ'ল? তোমার তো লাগে নি কোথাও?

কান্দীনাথ উঠে দাঁড়াল। বললে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটুখানি এগিয়ে যাও। রাস্তার এই মোড়টা পেরুলেই সব দেখতে পাবে, সব বুঝতে পারবে।

শশিনাথের জুতোজোড়াটা ছিল চৌকাঠের ওপারে। জুতো পায়ে দিয়ে ঘরে ঢুকে দেখলে, কান্দীনাথ নেই।

শশিনাথ রাস্তায় বেরিয়ে এল। ডাকলে, কান্দীনাথ! কান্দীনাথ!

কান্দীনাথকে দেখতেও পেলে না, তার সাড়াও পেলে না।

শশিনাথ মোড় পেরিয়ে গিয়ে দেখে, কান্দীনাথ যা বলেছিল ঠিক তাই। লাল বাড়িটার পাশে কান্দীনাথের গাড়িটা কাৎ হয়ে প'ড়ে আছে। গাড়ির সামনের দিকটা ভেঙে একেবারে চুরমার হয়ে গেছে। জায়গাটা লোকে লোকারণ্য। কয়েকজন পুলিশ কনেষ্টবল ভিড় সরাসে।

ফ্রেন্-কিট-করা একটা ট্রাক এসেছে। গাড়িটা টেনে নিয়ে যাবে।

ওদিকে পুলিশের গাড়ির কাছে স্টে চারের ওপর একটা মানুষের মৃতদেহ। আপাদমস্তক কাপড় দিয়ে ঢাকা। লোকের ভিড় সেইখানেই বেশী।

লোকজন ধরাধরি ক'রে মৃতদেহটা অ্যান্ডুলেসে তুলতে যাচ্ছিল। শশিনাথ তাড়াতাড়ি সেইখানে গিয়ে দাঁড়াল। থানার ও.সি. শশিনাথের চেনা লোক।

শশিনাথ বললে, গাড়িটা তো কান্দীনাথের।

ও.সি. বললেন, এই যে, আপনি এসেছেন? আপনার বন্ধু।

শশিনাথ জিজ্ঞাসা করলে, অ্যান্ড্রিডেন্ট কখন হয়েছে?

ও.সি. বললেন, এঁরা তো বলছেন সাতটার সময়। এদিকে উনি যাচ্ছিলেন কোথায়? আপনার বাড়িতেই বোধ হয়।

শশিনাথ কোনও কথা বলতে পারলে না। চুপ ক'রে রইল।

ও.সি. বললেন, পকেটে একটা নতুন চক্চকে রিভলভার

তিনি বলিতেছিলেন, সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিতেছিল। “দেখ, আমরা সকলেই ভ্রমশীল, কেহই এক স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি না। বসিয়া থাকিবার উপায় নাই, জীবনই আমাদের চালিত করিতেছে, আন্তরিক প্রেরণার বশবর্তী হইয়াই, আমরা ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছি। কত স্থানে যে গিয়াছি তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কিন্তু সেদিন যে অভূত দেশে আমি গিয়া পড়িয়াছিলাম, তেমন বিচিত্র দেশে আমি আর কখনও যাই নাই, যাইব বলিয়া কল্পনাও করি নাই। সে দেশের গল্পই আজ তোমাদের শুনাইব।

আমি সেদিন যে ভ্রমণের উদ্দেশ্যেই বাহির হইয়াছিলাম তাহা নয়। আমি বাহির হইয়াছিলাম খাণ্ড-সন্ধানের। যে স্থানে প্রত্যহ খাণ্ড পাই, সেই স্থানেই আমি গিয়াছিলাম, খাণ্ডের সন্ধানও পাইয়াছিলাম। একাগ্র চিত্তে খাণ্ড সংগ্রহ করিতেছি, এমন সময় এক প্রলয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। আমি যে স্থানটায় ছিলাম, সেই স্থানটাই যেন উৎক্ষিপ্ত হইয়া দূরে ছিটকাইয়া পড়িল। আমি স্থানচ্যুত হইয়া একটা ঘন জঙ্গলের ভিতর পড়িয়া গেলাম। বিশ্বয়ের ভাবটা যখন কাটিয়া গেল চারিদিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, স্থানটা নিতান্ত মন্দ নহে। মোটামুটি খাণ্ডদ্রব্য সবই পাওয়া যায়। কিছু কিছু সংগ্রহ করিলাম। তাহার পর ইচ্ছা হইল বাড়ি কিরি, আমার বিলম্ব দেখিয়া তোমরা হয়তো ভাবিতেছ। কি যে ঘটিয়াছে তাহা তোমাদের বলিবার জ্ঞানও মনটা ছটফট করিতেছিল। সেই ঘন অরণ্য হইতে বাহির হইয়া কিন্তু ঘরের দিকে ফিরিতে

পারিলাম না। একটা অপরূপ গন্ধ আমাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কিসের গন্ধ তাহা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে অস্বভব করিলাম, ওই গন্ধকে অহুসরণ করা ছাড়া আমার উপায় নাই। একটা অদৃশ্য হস্ত যেন আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল। কতক্ষণ চলিয়াছিলাম জানি না, কিছুক্ষণ পরে আবিষ্কার করিলাম আমি একটা কালো রঙের টিপির উপর উঠিয়াছি। টিপি হইতে নামিতে যাইব এমন সময় দেখিলাম, টিপিটাই চলিতেছে। সে-ও যেন গন্ধটাকেই অহুসরণ করিতেছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। তাহার পর লক্ষ্য করিলাম টিপির উপর একটা লম্বা গাছের মত কি যেন রহিয়াছে। সেটা বাহিয়া উঠিতে লাগিলাম, কিছুদূর উঠিয়াই কিন্তু বিপন্ন হইতে হইল। কে যেন ঝটকা মারিয়া আমাকে ফেলিয়া দিল। যেখানে আমি পড়িলাম তাহা পাথরের মত কঠিন, ঘোর রক্তবর্ণ এবং অতিশয় ময়ূপ। একরূপ দেশ পূর্বে কখনও দেখি নাই। সবুজের কোন চিহ্ন বা মাটির কোনও আভাস কুত্রাপি দেখিতে পাইলাম না। সেই মধুর গন্ধটা কিন্তু আরও তীব্র আরও হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিল। তাহা যেন আমার সমস্ত সন্তাকে আবিষ্ট করিয়া ফেলিল। আমি আচ্ছন্নতার মত দ্রুতপদে সেই ময়ূপ কঠিন রক্তবর্ণ দেশ অতিক্রম করিতে লাগিলাম, সেই মধুর গন্ধই যেন আমার বাহক হইল। কিছুক্ষণ চলিবার পর আর একটি আশ্চর্য-জনক বৃক্ষ দেখিলাম। বাদামী রঙ, সোজা উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পূর্বে এইরূপ একটি অভূত

পাওয়া গেল। লোডেড রিভলভার। সাতটা চেম্বারে সাতটা বুলেট।

মৃতদেহ অ্যাংগুলস্‌মে তুলে দেখয়া হ’ল।

ও.সি. বললেন, বন্ধুকে একবার দেখবেন নাকি ?

ব’লেই তিনি এগিয়ে গিয়ে মৃতদেহের মুখের ঢাকা তুলে দিলেন। শশিনাথ দেখলে। মনে হ’ল, কাশীনাথ যেন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুচ্ছে। মুখে কোথাও এতটুকু বিকৃতির চিহ্ন নেই।

ও.সি. বললেন, চোটটা লেগেছে বুকে। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছেন। আসি। নমস্কার।

গাড়ি চ’লে গেল। শশিনাথ কাঠের মত দাঁড়িয়ে। তার চোখ দুটো তখন জলে ভ’রে এসেছে। এতক্ষণ পরে কাশীনাথের কথাগুলো সে বুঝতে পারলে।—তোমাকে আমি ক্ষমা করেছি কাশীনাথ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

বৃক্ষে আরোহণ করিয়া বিপন্ন হইয়াছিলাম, এই বৃক্ষটিতে উঠিব কি না ইতস্তত করিতে লাগিলাম। আমার ইতস্তত ভাব কিন্তু বেশীক্ষণ টিকিল না। যে গন্ধ আমাকে আকৃষ্ট করিতেছিল মনে হইল তাহার উৎস যেন উর্ধ্বে, অদৃশ্য শতধারায় তাহা যেন শূন্য হইতে বসিত হইতেছে। আর আশ্বাসংবরণ করিতে পারিলাম না, সেই অদ্ভুত বৃক্ষে আরোহণ করিতে লাগিলাম। এবার কিন্তু কোনও বিপদ হইল না। বৃক্ষশীর্ষে উঠিয়া দেখিলাম, আর একটি নূতন দেশে উপনীত হইয়াছি। চতুর্দিক শ্রামল। এমন অদ্ভুত সবুজ রঙ আমি ইতিপূর্বে আর দেখি নাই। মুগ্ধ হইয়া গেলাম। মনে হইল, ইহাই বৃষ্টি, স্বর্গ। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আরও মুগ্ধ হইতে হইল। দেখিলাম, বিরাট এক দুধের নদী সেই শ্রামল দেশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে। বিষয়ে অবাক হইয়া গেলাম। তাহার পর আগাইয়া গিয়া দুগ্ধ পান করিতে লাগিলাম। আকর্ষণ পান করিলাম। এমন স্নিগ্ধ স্মিষ্ট দুগ্ধ বহুকাল পান করি নাই। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছিল, বৃকট যেন জুড়াইয়া গেল। সেই স্নমধুর গন্ধ কিন্তু তখনও আমাকে উন্নয়ন করিয়া তুলিতেছিল। চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, কাছাকাছি কোনও ফুল ফুটিয়াছে কি না। ফুল দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু গন্ধের উৎসটি দেখিতে পাইলাম। দুগ্ধ-নদীর পরপারে বিরাট একটি হ্রদ রহিয়াছে, জলপূর্ণ হ্রদ নয়, মধুপূর্ণ হ্রদ। সেই হ্রদ হইতেই যে এই অপূর্ব সৌরভ

নিঃসৃত হইতেছে তাহারে সন্দেহ রহিল না। সেই হ্রদের সমীপবর্তী হইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিলাম। কিন্তু সেই বিরাট দুগ্ধনদী অতিক্রম করিব কিরূপে? শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া তাহা সমস্ত দেশটাই জুড়িয়া রহিয়াছে। নদীর তীরে তীরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, যদি সম্ভবযোগ্য কোনও কাণ ধরা পাই।...

যিনি কাহিনীটি বলিতেছিলেন তিনি যবিনসন্ ক্রুশো, গালিভার অথবা সিদ্ধবাদ নহেন, সামান্য একটি পিপীলিকা মাত্র। তাঁহার দৃষ্টি দিয়া তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন মানবীয় দৃষ্টিতে তাহা এইরূপ—এক কাঠুরিয়া একটি গাছের ডাল কাটিতেছিল। ডাল যখন ছিন্ন হইল, তখন তাহা একটি ঝোপের মধ্যে পড়িল। ডালে একটি পিপীলিকা ছিল, সেটিও ঝোপে পড়িয়া গেল। যে ব্যক্তি গাছের ডাল কাটাইতেছিলেন তিনি ঝোপের নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন। পিপীলিকা ঝোপ হইতে বাহির হইয়া তাঁহার জুতার উপর উঠিল। তিনি যখন বাড়ি ফিরিলেন তখন পিপীলিকা তাঁহার পা বাহিয়া হাঁটুতে উঠিয়াছে। তিনি হাত দিয়া তাহাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। পিপীলিকা তখন লাল সিমেন্ট বাঁধানো ঘরের মেঝের উপর পড়িল। সেখান হইতে সে একটি টেবিলের নিকট উপনীত হইল। টেবিলের পায় বাহিয়া সে সবুজ অয়েল-ক্লথ-মোড়া টেবিলে আরোহণ করিল। টেবিলের উপর একটু আগে খানিকটা দুধ পড়িয়া গিয়া নানা ধারায় বহিয়া যাইতেছিল। টেবিলের উপর একটি বড় কাচপাত্রে খানিকটা মধুও ছিল।

তখনো মানুষ থাকে

শান্তিকুমার যোষ

তিন-শূন্য-তিন-নয় উচ্চতায় অকস্মাৎ দেখে বৈমানিক :

নীচেই সংকেত-আলো, ঘন প্রস্থ কুয়াশায় তাড় গেল মুখে ;

উজ্জ্বল ডায়ালে তবু কম্পাশের কাঁটা ঘোরে একান্ত নিভুল—

বিমানবন্দর নয়, মেঘের ওপরে প্লেন চলেছেই ঠিক।

সংশয় মুহূর্ত মাত্র ; চেতনায় দীপ্ত ক্রমে মহাশূন্যপার :

মরীচিকা নয় ক্রব, মৃত্তিকা আশ্রয় ঝাঁপে—ঘাস পাখি ছর।

নিয়ন্ত্রণ হাতে তার—স্বৈরস্বাত মুখে সেই জলন্ত প্রত্যয়।

বন্ধও বিকল হলে তখনো সে স্থির থাকে প্রজ্ঞা নিয়ে তার।

কি একটা খেলনা নিয়েই ব্যাপারটার সূত্রপাত হয়েছে, কি ভাবে জানি না, তবে দেখছি প্রায় ঘটাপ্রধানক ধরে ঐটুকু একটা শিশু শুধু বাড়ি কেন, সমস্ত পাঁড়াটাকে বেন তোলপাড় ক’রে তুলেছে। আরও সঙ্গীন হয়ে উঠেছে এই জন্তে যে কর্তা স্বয়ং হয়েছেন নাতির দিকে।...এদিকে শিশুর চীৎকার, ওদিকে ওর গলা মাঝে মাঝে সপ্তমে উঠেছে—উনি জানতে চান কেন সে খেলনা হয় নি আনা? কার গাফিলতি? হ্যাঁ, ছেলেমানুষের আবদার আগে সামলাতে হবে—সব কাজ ছেড়ে...ওর চের ধৈর্য, কালও আনতে গেছে শুনে চুপ করে ছিল...কেন এল না আজ পর্যন্ত?

জমিদারী গলা, বাড়ির সমস্ত মহলগুলো গমগম করে উঠেছে। আরও একটা আওয়াজ উঠছে মাঝে মাঝে, জীকঠে। অতটা না হলেও বেশ জানান-দেওয়া—আদর দিয়ে দিয়ে এ রকম জিদ হতে দেওয়া আর ভালো নয় নাতির...যুগ পালটেছে, এসব জিদ আর চলবে?—ঠিক যেটা চাইবে সেই জিনিসটি এসে পড়া চাই হাতের মুঠোর মধ্যে!...তার চেয়ে ভালো ভালো খেলনা সব দেওয়া হচ্ছে—না, আমার ঠিক সেই খেলনা চাই—বাজার তো উটকে এল—সে খেলনা যদি না পাওয়া যায় বাজারে...

“কলকাতার বাজারে বাঘের দুধ পাওয়া যায় পয়সা ফেললে।”

“তার কারণ বাঘ পাওয়া যায়; সহজে আছে, দেশেও আছে। খেলনাটার জন্তে কলুটোলা-রাধাবাজার থেকে নিয়ে, চোরদ্বীপ বড় বড় দোকান, মায় হগশায়েবের বাজার পর্যন্ত সব চ’ষে ফেলেছে—কোন জার্মেনী কোম্পানীর তৈরী জিনিস—লড়াইয়ে কোম্পানী নষ্ট হয়ে গেছে, আর আসে না চালান; কোথা থেকে পাবে লোকে এ বাঘের দুধ তা বলো...”

কর্তা কুট চালও দিচ্ছেন মাঝে মাঝে—

আমলা-মুহুরী চাকর-পেয়াদাদের হাঁক দিচ্ছেন নাম ধরে, ক’ষে চুমড়ে দিচ্ছেন, নাতি বুক কী জলুজ্বল কাণ্ডটা লাগিয়েছেন উনি তার জন্তে।...এতেও যদি বাগ মানেন।

কিছুই খাটছে না। ভেতরে কি কাণ্ড হচ্ছেল এতক্ষণ

চোখে দেখিনি, রক্তবেরঙের আওয়াজ থেকেই বা আনন্দ হয়, হঠাৎ ছেলেটা ঘেন কার পাজা থেকে ছিটকে তীরের মতো ছুটে বেরিয়ে এসে বৈঠকখানায় ঢুকে বন্ধ দরজাটার ওপর আছড়ে পড়ল। সেই খেলনা চাই— থাকবে না এ বাড়িতে—কখনও থাকবে না।...

এসে ধ’রে ফেলল সবাই। কিন্তু রাখবে কে ধ’রে? শ্রিভৈরব-দম-দেওয়া খেলনার মতোই ছিটকে ছিটকে পড়ছে, কোল থেকে, পাজা থেকে; মোটা-গালচে পাতা তাই রক্ষা, তবু দেখছি মুখে হাতে পায়ে এক একটা ঘেন রক্তের টানা দাগ, ওলটাতে পালটাতে চিকামক ক’রে উঠেছে—কি ক’রে ছ’ড়ে গেছে, দেয়ালে লেগে, কি শানে আছাড় পেয়ে, কি কোনও আসবাববই ঠোক্তর খেয়ে। নমুনা বা দেখছি তাতে এতক্ষণ সে আস্ত আছে কি ক’রে সেইটেই আশ্চর্য।

এক প্রস্তুত খেলনা এসে পড়ল। সম্ভবতঃ একেবারে নূতন আমদানি; কেউ বেরিয়ে গিয়েছিল, এইমাত্র খরিশ ক’রে এসে পৌছাল, কটাতে কাগজ লড়ানো রয়েছে এখনও।

“এই তোমার বোড়া, নিজে চ’ড়ে গিয়ে কিনে আনবে তোমার খেলনা, লাথুবাবু...”

চীৎকারের সঙ্গে গড়াগড়ি দিচ্ছিল, বিদ্যাত্ববেগে ঘুরে উঠে কাঠের দোলনা বোড়াটা পাজিয়ে ধ’রে একটা কুশন চেয়ারের গায়ে আছাড়। কয়েকটা টুকরায় ছিটকে পড়ল ছুটোই। তারপর আর হাতের কাছে এগিয়ে দিতেও হোল না, ভল, এয়ার গান, বিউগল, রেলের সেট, পাম্প-করা ফুটবল—এক একটা ধরে আর আছড়ে আছড়ে কেলে, দেয়ালের গায়ে। আসবাবের গায়ে, দোরের গায়ে, জানলার গরামের গায়ে। ছুমদাম শব্দ, তার সঙ্গে গলা-ফাটানো চীৎকার। নূতন খেলনার লাট ঘেন ঘুতাহতি হয়ে দাঁড়াল। বাড়িটা সদর রাস্তা থেকে একটু দূরে। গেটের ভেতর, পাশের গলির মধ্যে লোক জমে গেছে। বিশেষ ক’রে ছেলে ছোকরার দল। এক উদ্ভট কাণ্ড।

ভেতর-বাড়ি ওদিকে নিস্তব্ধ; শুধু মাঝে মাঝে কর্তা-গিন্নীর মধ্যে সেই উত্তর-প্রত্যুত্তরের আদান-প্রদান। এ

ছাড়া আর বিশেষ শব্দ নেই। মনে হয় বাড়ির সবই এতে অভ্যস্ত, কিছা এলে দিয়েছে, কিন্তু নিরুপায়।

বাইরের বাড়িতেও এক গোমস্তা চাকর ছাড়া কেউ নেই। শুধু বৈঠকখানার ভেতরের দিকে জানলায় মুখ চেপে চার পাঁচটি ছেলে-মেয়ে নিবিচার ভাবে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছে। মনে হয় বাড়ির মধ্যে যেন একটা অলিখিত কাছনই আছে যে লাখু চটলে যেন কেউ তার সামনে না যায়।

এদিকে তাণ্ডব সমান ভাবেই চলেছে। ভাবছি এই ভাবে যদি চলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে।

এই ভাবে কি ; আর একটা তোড় নামল।

বৈঠকখানার সামনে গাড়ি-বারান্দায় একটা মোটর এসে দাঁড়াল : বাড়ির বড় শেজোলেটাই। এদিকে ভেতর থেকে কর্তাও জামা জুতো প’রে বৈঠকখানায় এসে প্রবেশ করলেন। বললেন—“হয়েছে। চল আমার সঙ্গে, নিজেরা গিয়ে কিনে আনব যেখান থেকে পারি। খেলনা নাকি এতবড় কলকাতার শহরটায় পাওয়া যাবে না। না পাওয়া যায় ওদিক থেকে বসে, সেখানে না পাওয়া যায় একেবারে বিলেত। চল, আর।”

আরও চীৎকার, আরও আছড়ানি, কোনমতেই যাবে না—কোন খেলনাই নেবে না। রাগের সঙ্গে জুটেছে আবার অভিমান, দাহুর ডাকে। যে যাচ্ছে ধরতে তাকে আঁচড়ে কামড়ে একশা ক’রে দিচ্ছে—নিজের সঙ্গেও কয়েকটা রক্তের দাগ নতুন ক’রে উঠল ফুটে। কর্তা নিজেও এগিয়ে গেলেন, ঠিক আঁচড়ানি-কামড়ানি না হোক, হাত পা ছোঁড়ার কয়েকটা ধকোল পড়লই এসে গায়ে আর আঙ্গুর পাঞ্জাবীটাতে যে টানা বিদারণ-রেখা পড়ল সেটাকে আঁচড়ানো কামড়ানোর বাইরে কেলা যায়ই বা কি ক’রে ?

তবে সম্পর্কটা তো দাছ নাতিরই ; এসব নিশ্চয় অজ্ঞের ভূষণ। হেসে, একটা মধুর সম্পর্ক পাতিয়ে বললেন—
“দেখলে কি করলে.. ?”

চাকরকে আর একটা পাঞ্জাবী আনতে বললেন, এলে বললে নিয়ে বললেন, “আচ্ছা, তোকে যেতে হবে না, আমি একাই যাচ্ছি। তুই চুপ কর, আমি খেলনা নিয়ে এলুম য’লে।”

তাতে আরও আপত্তি। ভেবেছিলুম গলা আর হাত-পা-ছোঁড়া চরম হয়ে গেছে, কিন্তু দেখলুম আরও শক্তি ধরে ছোকরা। লাকিয়ে উঠে ছুটে যায়,—না, যেতে দেবে না—কিছু খেলনা নেবে না—মোটর ভেঙে চুরমার ক’রে দেবে...

সবাই ধ’রে রইল। কর্তা মোটরে গিয়ে ঢুকলেন, গলা বাড়িয়ে বললেন—“সামলে-সমলে রাখো সবাই একটু।”

তা কি যায় রাখা ? কর্তা যেতে আরও যেন উৎকট হয়ে উঠল। তারপর যখন শক্তি হয়ে উঠেছি—একটা কিছু হয়ে না পড়ে, ভিঁমি না খায়, সেই সময় একেবারেই হঠাৎ সব ঠাণ্ডা।

আর একখানি মোটর এসে গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়াল এবং একটি বছর ত্রিশের যুবা ছাণ্ডল ঘুরিয়ে নেমে এল। লাখুর বাবা। দাঁড়ি দিয়ে উঠে এসে বৈঠকখানায় ঢুক প্রণাম করল, “ব্যাপার কি ?” তারপরই লাখুর দিকে চেয়ে—“ওঠ।”

বাপ ঢুকতেই লাখু চুপ ক’রে গিয়েছিল, উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

বাপ ঘরটার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে প্রণাম করল—
“এসব কি কাণ্ড ?”

উত্তর নেই, শুধু চাপা কান্নাটা কয়েকটা ক্ষত কৌপানির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে গিয়ে আবার ধেমে গেল ; সোভাওয়াটারের বোতলটা খুলতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যেন ছিপি এঁটে দেওয়া হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত বিচারপর্বও শেষ হয়েছে ওদিকে ; সঙ্গে সঙ্গে রায়ও বেরিয়ে গেল। বিচারক শুধু একবার জিজ্ঞেস ক’রে নিল, বাবা বাড়িতে কিনা ; নেই শুনে চরম দণ্ড দিতে আর বাধল না, একেবারে নির্বাসন।

বলল—“বাড়িতে ডাকাত পোষা যায় না। বের ক’রে দোর দিয়ে দাও।”

একটু ইতস্তত করবেই সবাই। নিজেই ঘুরে দোরের দিকে আঙুল বাড়াল। চোখে দেখলেও বিশ্বাস করা শক্ত হচ্ছে,—সেই ছেলে আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। বাপ নিজের হাতেই দরজাটা বন্ধ ক’রে গটগট ক’রে ভেতরে চলে গেল। একটা চাকর ঘরটা গুলিয়ে নিতে রয়ে গেল। বাকি সবাই নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

মন্দ লাগল না। জমিদারের তিন পুরুষ—বাপ, ছেলে, নাতি। কতদিনের সঞ্চিত একটা তেজ—একটা প্রতাপ—নিশেদ, আবার শব্দ—চেয়ে চেয়ে দেখবার যোগ্য বইকি।

তারপর ..

বলতে যাচ্ছিলাম—তারপর ঐ নাতিতেই এসে সমস্ত যুগটা গেল পালটে। বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তাই বা বলি কি করে? এ আবার সে প্রতাপ তা তো যুগে যুগেই নিমেষে যুগ দিয়েছে পালটে।

ঘর থেকে বেরিয়েই গাড়ি-বারান্দার ওপর যে রকটুকু সেটা ঘুরে এদিকে গলির দিক পর্যন্ত চলে এসেছে। বেশ টানটা, এদিকে হাত আড়াইয়েক চওড়া। নির্বাসন-দণ্ডদেশের পর লাখু প্রথমটা গাড়ি-বারান্দার সামনেই এসে দাঁড়াল, তারপর পা-পা করে চলে গলির এদিকটার রকটায় এসে দাঁড়াল।

বেখলাম রাগ যায় নি মোটেই, অভিমানও ছিলই, তার ওপর এখন আবার এই অপমান এসে বেন উগ্র ত্রাহস্পর্শ দোষের মতো কি একটা দাঁড়িয়েছে। মুখটা রাঙা টক টক করছে, বুকে ফুলে ফুলে উঠছে, চাপা ফোপানিতে শরীরটা উঠছে কেঁপে কেঁপে। একটা ভয় তো এসেছেই ছেলেমানুষের, কিন্তু সে-ভয়টাকে ঠেলে চোখ দুটো বেন এক একবার জলে জলে উঠছে—একটা বেন প্রতিশোধের কঠোর সংকল্প, সেটাকে ভাষায় রূপান্তরিত করলে কতকটা বেন এই রকম দাঁড়ায়—রোস না, দাছুকে একবার আসতে দাও, তারপর তোমারও হচ্ছে!

এ ভাবটা তো আরও খারাপ; ওরকম একটা উগ্র বিকোভ যদি নিজের মধ্যেই এমন করে ঘুরপাক খেতে থাকে তো শিল্পের পক্ষে সে যে আরও সংঘাতিক। একটু শক্তিতই হয়ে উঠেছি। তারপর মনে করছি কাউকে ডেকে না হয় বলি, এভাবে একলা দাঁড় করিয়ে না রেখে বাবুকে ব'লে ভেতরে নিয়ে গিয়ে ঠাণ্ডা করুক, এমন সময় মেয়েটির ওপর নজর পড়ল।

‘নজর পড়ল’—বলা ঠিক হবে না, দেখেছি আগেই, তবে যা খণ্ড-প্রলয়টা গেল তাকে অন্তটা খেয়াল হয়নি।

এই গলিটা অল্প একটু গিয়েই লাখুদের বাড়ির পেছন

দিক দিয়ে বায়ে ঘুরে গেছে। ঠিক মোড়ের ওপর যে ছোট্ট একতলা বাড়িটি, সেই বাড়ির মেয়ে। ওদেরও দরজার বাইরে ছোট্ট একটুখানি রক, একটু কোণাকূর্ণি পড়ে আমার ঘরের জানলা থেকে, অল্প যে ক’দিন এসেছি এখানে তার মধ্যে বিকালের দিকে কয়েক বারই নজরে পড়ল মেয়েটি ইট দিয়ে ঘর পেতে নিজের খেলনা নিয়ে বসেছে। ‘ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েটি, বিকেলের পড়ন্ত রোদটা গলি বেয়ে গিয়ে পড়েছে ঘরগী থেকে ঘর-করণা—সমস্তটুকুর ওপর, নড়তে-চড়তে ঝিকমিক করে উঠছে, আপিস-ফেরৎ আলস্তের ঘোরে ব’লে ব’লে দেখি।

একই থাকে মেয়েটি, গলিটা বিরল-বসতিও, তবে বার দুই তিন চোখে পড়ল জমিদার বাড়ির পেছন দিয়ে একটি প্রায় সমবয়সী ছেলে কতকটা বেন প্রচ্ছন্নভাবেই গিয়ে উপস্থিত হোল, এবং এদিকে পিঠ করেই খেলায় জুমে গেল। মেয়েটিকে বেন চোখ তুলে তুলে এ বাড়ির দিকে চাইতেও দেখে থাকত মাঝে মাঝে। নিশ্চয় ওরই প্রত্যাশায়।

এ গেল ওদিককার ইতিহাস।

আজও বার দুই পড়েছিল নজর; একটি মেয়ে একতলা বাড়ির দরজার চৌকাঠ ঘেঁসে একটু বাড়িট বেকিয়ে নিরুন্ম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাঁ-হাতটা ঝোলানো, তাতে একটা মাঝারি সাইজের টিনের বাস্ক, বিস্কুটের বাস্ক ব’লে মনে হোল। রাস্তায় যে ভীড়টা জমেছিল তার মধ্যে এসে দাঁড়ায়নি কিন্তু মেয়েটি। এই বার, যখন সব ঠাণ্ডা, নাটকের পট-পরিবর্তনের সঙ্গে রাস্তা একেবারে নির্জন, দেখি মেয়েটি চৌকাঠ ছেড়ে নেমে পড়ল; তারপর দু-একবার এদিক-ওদিক চেয়ে আস্তে আস্তে পা বাড়াল এদিকে।

আমার জানলাটা আস্তে আস্তে টেনে দিয়ে একটু আঙ্গগোপন করে বসলাম।

মেয়েটি রকের ও-প্রান্তে এসে আর একবার চারিদিকে একটু দেখে নিল, তারপর বাস্কটা রকের কিনারায় রেখে, বুকে রকের পাশে চেপে হাতের চেটোয় চিবুকটা রেখে গলিটার ওপরই নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। লাখু এর আগেই কখন ব’লে পড়েছে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে হাঁটু মুড়ে সামনের দিকে চেয়েই বসেছিল, মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে, মেয়েটি আসতে একবার ঘুরে চেয়ে

নিম্নে আবার দৃষ্টি সামনে ফেলল খানিকটা সময় এই ভাবেই গেল।

কিন্তু লক্ষ্য করলাম সময়টা যথাই যায়নি একেবারে। লাথুর মুখের সেই ধমধমে ভাবটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গিয়ে ঠিক সহজ না হোক, একটা যেন নিলিগততার ভাব ফুটে উঠছে, কতকটা যেন—এই-যে নতুন পরিবেশটুকু স্থষ্ট হোল এর সঙ্গেও তার অসহযোগ।

মেয়েটি বাস্তব ডালাটা খুলল; যে-শব্দটুকু হোল, তাতে লাথু একবার ঘুরে চাইল। এবং চেয়েই রইল একটু। মেয়েটি কতকটা যেন অবহেলার সঙ্গে বাস্তব অল্প-সঞ্চয় নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল—কয়েকটা কাচের পুতুল, গোটা দুই ত্রাকড়ার, বাড়িতেই তৈরী, কাপড়-চোপড় পরানো ছোটো সেলুলয়েডের, একটা ভাঙা তার মধ্যে; আর গান-খানেক নানা রঙের ছোটবড় কাপড়ের টুকরো—মনে হয় দরজির দোকান থেকে সংগ্রহ করে আনবার কেউ আছে যেন; ছিট আছে, সিঁদ আছে, শাদা মলমল আছে, মখমল আছে। এইগুলো হাতের মুঠায় তুলে নিয়ে, আবার হাত আগলা করে বুর-বুর করে বাস্তব ফেলতে লাগল নিজের মনেই; লাথুর দিকে দেখলাম মাত্র একবারটি চোখের একটুখানি কোণ তুলে চাইল। তারপর হঠাৎই সবগুলোর ওপর একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বাস্তব ডালাটা চেপে দিয়ে লাথুর উর্দে দিকে ঘাড়টা ফিরিয়েনিয়ে আবার আগেকার মত দাঁড়িয়ে রইল।

লাথু বলল, “উঠে আয় না নিরু। আসবি?”

মিনিটকয়েক আগের সেই যে বজ্র-নির্ঘোষ তার সঙ্গে এ কণ্ঠস্বরের কোন সঘনাই নেই। সেটা অবশ্য কিছু আশ্চর্য নয়, যে জালামুখ দিয়ে অগ্নি বর্ষায় তাই থেকে আবার স্বরণাও তো নামে।

উঠে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তো আসা চলে না। একটু দাঁড়িয়েই রইল নিরু, তারপর বাস্তব কাঁধে তুলে নিয়ে ফ্রক-পরা ছোট্ট শরীরে সামান্য একটু দোলা দিয়ে বকের শ্রেণের সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে উঠে এল। তবে একেবারে এদিকে নয়; মাঝামাঝি। লাথুও উঠে গিয়ে বসল। আমার একটু স্থিতিশীল হোল, একেবারে সামনা-সামনি হওয়ায় পাঁজা ছোটো আরও একটু চেপে দিয়েও সবটুকু ধরতে পারছি।

নিরুও বসেছে। আড়ষ্ট ভাবটা আর একেবারে নেই, ডালাটা খুলতে খুলতে হঠাৎ জ-ছটো তুলে, মুখটা একটু ছলিয়ে জিগোস করল, “তোমার বুকি খেলনা হারিয়েছে?”

লাথু বলল, “হঁ।...দাদু আনতে গেছে। আমি কিন্তু নোব নাকি ভেবেছিলাম?”

নিরু ডালাটা পাশে রেখে নীচের ঠোঁট দিয়ে ওপরেরটা ঠেলে, তারই সঙ্গে একটু স্ক্রু হাঙ্গি মিশিয়ে মাথাটা ছলিয়ে দিলে। বোধ হয় তাৎপর্যটা—এমন খাতিরও দেখেনি, এমন জিদও দেখেনি। তারপর ওর মুখের দিকে চেয়ে বেশ স্পষ্ট করে হেসে উঠল।

লাথু দেখলই না, কিদা ব্যাকটুকু গায়েই মাখল না। গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে বাস্তব মধ্য চেয়ে ছিল, বলল, “তুই একটা চমৎকার জিনিস পেয়েছিস তো নিরু, মখমল বলে ওটাকে।”

“জানি।...দাদা এনে দিয়েছে।—তুই নিবি?”

সামনে মেলে ধরল। আট আঙুল × আট আঙুল—এই রকম একটা টুকরো।

লাথুর চোখ দুটো হঠাৎ লুভ হয়ে উঠে চকচক করছে। তবুও একবার বলল, “তোমার থাকবে না যে। এমন ভালো মখমলটা...”

নিরু বাড়িয়েই ধরল, বলল—“তুই নে তো। আমার কথা ভাবতে হবে না।...আয় খেলি একটু, আঁা?”

নিম্নে বাঁ হাতের ওপর বিছিয়ে চেয়ে রইল লাথু। কী অপূর্ব জিনিসই সে পেয়েছে। চোখ ফেরাতে পারছে না। ...ওদের তো মুখ নয়, শরতের আকাশ, এই ছিল বজ্রগর্ভ কৃষ্ণ মেঘে ঢাকা, এখন একেবারেই আলোয় ঝলমল।

বিস্মিত হতে হয়েছে বৈকি। কোথায় আট আঙুলের এক টুকরো পরিত্যক্ত মখমল, আর কোথায় একটা এমনই ছলভ খেলনা যার অল্প দ্বারকে হয়তো বিলাত পর্যন্ত ছুটতে হবে। তাও, যেমন শোনা গেল, পেলেও পণ্ড্রম।

বিস্মিত হয়েছি বৈকি, তবে খুব বেশিও নয়; ওদের জগতের ধারাটাই তো মোটামুটি এই।

তারপর যেটুকুও বা বিস্ময় ছিল তাও গেল কেটে, দেখলাম বহুতল আরও গভীর—

চেয়েই ছিল লাথু। দৃষ্টিতে অসীম কৃতজ্ঞতা। একটু

পরে ডান হাতটা টুকরোটুকর ওপর ধীরে ধীরে বুলুতে বুলুতে বলল—“তুই সত্যি বেশ নিরু।”

নিরু খেলাঘর পাতছিল, প্রশংসায় কান দিল না, ঠোঁট ছুটি অল্প একটু বা কুঁচকে গেল।

এর পরেই—“তুইও আমায় লব্ করিস, নারে ?...বিয়ে করবি তো ?”

বেশ স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছে সংলাপ। নিরু সেলুলয়েডের একটা পুতুল তুলে নিয়ে কাপড় পরাতে পরাতে বলল—“না ভাই, তোমরা হচ্ছে জমিদার, রাজা, আমরা গরীব...”

নিরাশার ছায়া মুখে পড়তে না পড়তে লাথুর মনে পড়ে গেছে, নিরুর পিঠে হাত দিয়ে মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে বলল—“নারে জমিদারি আর আমাদের নেই আর।”

নিরু কাপড় পরাতে পরাতেই বলল—“বাঃ, তাই না আরও কিছু।”

“মাইরি বলছি, মাইরি, মাইরি। কাল ঠাকরুণ মা বললেন—কেড়ে নিয়েছে আমাদের জমিদারি।”

—মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ক্ষতিটা কত বড় যে লাভ, কী যে এক ঘোর সমস্তা গেছে মিটে।

এর পর আর একটু মুখটা ঝুঁকিয়ে—

“করবি তো বিয়ে এবার ?”

কাপড় পরাতে পরাতেই একটা হাসিকে চেপে চেপে রাখবার চেষ্টা করছে নিরু; ওরা তো স্পষ্ট ক’রে কিছু বলতে জানেও না। মুখটা বরং একটু ঘুরিয়েই নিল উন্ট দিকে, তারপর পুতুলটা বাসায় রেখে দিয়ে বাস উটকে উটকে আর একটা টুকরো বের করল।

রাজা টকটকে খানিকটা সিদ্ধ। এবার আর নিতান্ত আট আঙুলেরও নয়, প্রায় আধ হাত চওড়া একটা লম্বাটে কালি। ঘর ক’রে ভাঁজ করা ছিল, মেলে ধরতে পড়ন্ত রোদে ঝলমল করে উঠে খানিকটা ঘেন আলো ছড়িয়ে দিলে জায়গাটায়। লাথুর মুখটা আরও খেন শতগুণ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে; নিরু হাতটা বাড়িয়ে বলল—“তুই বরং এইটে নে তাই’লে, ওটা দে আমায়।...কী চমৎকার এটা, নারে! তুই-ই নে।”

শস্যার শিশুনায়ক

অর্থপুত্র স্ত্রীশ্রম

নিবৃত্তি নিরুত।

এখন প্রহর কত ?

ঘুম ভাঙা রাতে জেগে,

চেয়ে চেয়ে দেখি এক অপক্লপ ঘুম।

তিলোত্তম, স্বপ্নর তোমার ঘুম

আর হাওয়া-পাওয়া চুল একরাশ।

আগামী দিনের পাই নতুন আভাস।

নির্মীলিত দুই চোখে স্বপ্নর ফাগুন,

দিগন্তের প্রত্যাশায় কৃষ্ণ অক মরাল মিথুন।

অনাচার-ক্লান্ত মুখ,

এখন নিভন্ত কামাহাসি,—

দিনের দুরন্ত শিশু, ক্লান্ত কক্ষ কপট সম্রাসী।

নিঃশব্দ—নিঃশব্দ ঘুমে লীলায়িত তিলোত্তম,

আগামী দিনের এক দুরন্ত নায়ক।

জ্যোৎস্নার সোনালী শায়ক

ছুটোছুটি ক’বে মরে হাওয়া-ছাওয়া আকাশের

গায়;

চাঁদ যেন লুকালো কোথায়।

শেষ হল তৃতীয় প্রহর। দূরের জলসা শেষ।

পরজ-বসন্ত রাগ মুহিত বাতাসে—

দূর থেকে ভেসে আসে রেশ।

ক্রমশঃ চঞ্চল হল আলোর পাখার।

এবার সময় হল পাশ কিরবার।

শ্রীশিক্ষাপ্রচারের আদিকথা

শ্রীশ্রীলকুমার দে

বাংলা দেশে আধুনিক ভাবে শ্রীশিক্ষার প্রচার কবে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে ইহা সম্ভব, শ্রীরামপুর মিশনরীদের স্থলে এবং ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত স্কুল সোসাইটির অধীনস্থ কতকগুলি বিদ্যালয়ে ছোট-ছোট বালকদিগের সহিত বালিকাদিগেরও শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু এ শিক্ষা ছিল স্বসামান্য ও অনিয়মিত। সে-সময়ে সম্ভ্রান্ত হিন্দু সমাজের আশঙ্কা ছিল, শিক্ষাবিস্তার জীলোকদের মনকে গ্রহের কর্তৃত্ব হইতে বাহিরের কাজে লইয়া যাইবে। সেই অশঙ্কায় মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া শিক্ষাদানের তাঁহারা সফলপাতি ছিলেন না; গৃহেই স্বল্প বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

প্রধানতঃ ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রীশিক্ষাবিস্তারের ব্যাপক চেষ্টা প্রথম করিয়াছিলেন খ্রীষ্টান পাদরীগণ। ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল ব্যাপ্টিস্ট মিশনরী জন লসন ও উইলিয়াম পিয়ার্সের তৎকালে প্রসিদ্ধ সেমিনারী বা বিদ্যালয়ে। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী লসন, শ্রীমতী পিয়ার্স প্রভৃতির উদ্যোগে ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে Female Juvenile Society (ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি) স্থাপিত হইয়া, Juvenile School নামে কলিকাতায় একটি স্কুল বালিকা-বিদ্যালয়ের আরম্ভ হইল। এ সম্বন্ধে ১৮২২ সনে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার লিখিতেছেন: “প্রথম ইং ১৮২০ সালের জুন মাসে শ্রীযুত সাহেব লোকেরা এই কলিকাতায় নন্দনবাগানে যুবনাইল পাঠশালা নামে এক পাঠশালা করিলেন। তাহাতে আগে কোন কল্পা পড়িতে স্বীকার করিয়াছিল না, এই ক্ষণে কলিকাতায় প্রায় পঞ্চাশটা জীপাঠশালা হইয়াছে। তাহার প্রত্যেক পাঠশালায় নূন সংখ্যাত্তে ১৬ জন কল্পা গণনা করিলেও ৮০০ কল্পার শিক্ষা হইতেছে। ইহাতে কাহারও কিছু ক্ষতি কিম্বা ক্ষতিয়াতি হয় নাই।” পঞ্চাশটি বিদ্যালয় না হউক, নন্দনবাগানের জুভেনাইল স্কুল ছাড়া, কলিকাতায় উক্ত সোসাইটির ছিল তিনটি বালিকা-বিদ্যালয় গৌরীবেড়ে, জানবাজার ও চিংপুর অঞ্চলে। যাহারা অর্থসাহায্য

করিতেন তাঁহাদের বাসস্থানের নামানুযায়ী এই বিদ্যালয়গুলির নাম হইয়াছিল গিভারপুল স্কুল, সালেম স্কুল ও বার্মিংহাম স্কুল। ১৮২৩ সনের মধ্যে সোসাইটির বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল আটটি।

ইতিমধ্যে ১৮২১ সনের নভেম্বর মাসে কলিকাতা স্কুল সোসাইটির অধ্যক্ষের British and Foreign Bible Society মিস মেয়ী অ্যান্ কুক নামী একটি মহিলাকে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের অল্প এ দেশে প্রেরণ করে। কিন্তু স্কুল সোসাইটির অত্যন্তম সেক্রেটারি রাধাকান্ত দেব আপত্তি করিয়া লিখিলেন: “I fear none of the good and respectable families will give her access of their women's apartment, nor send their females to her school if organised.” শেষ পর্যন্ত স্কুল সোসাইটি মিস কুককে সাহায্য দানে সম্মত হইল না বলিয়া চার্চ মিশনরী সোসাইটি তাঁহাকে নিযুক্ত করিল।^১ মিস কুকের উদ্যোগে ১৮২২ সনের মধ্যে আটটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, যাহাতে মোট ছাত্রী-সংখ্যা ছিল ২১৭।^২ ১৮২৩ সনে বিদ্যালয়ের সংখ্যা পাঁড়ায় ৩২ এবং ছাত্রীসংখ্যা ৪০০।

ইহার পর ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে চার্চ মিশনরী সোসাইটির আনুকূলে Ladies' Society for Native Female Education in Calcutta and its Vicinity স্থাপিত হইয়া, জুন মাস হইতে উক্ত সোসাইটির অধীনস্থ বিদ্যালয়গুলির পরিচালনার ভার গ্রহণ করিল। লার্টপট্রী লেডি আমহার্ট ছিলেন ইহার সভানেত্রী। লেডিস্ সোসাইটির উদ্যোগে ১৮২৬ সনের ১৮ই মে কর্নওয়ালিস স্কোয়ারের পূর্বকোণে সিমলা অঞ্চলে মহা-সমারোহে মেট্রাল স্কুল নামে একটি বালিকা-বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। ইতিমধ্যে মিস কুকের সহিত চার্চ

১ পিয়ার্স সাহেব স্কুল সোসাইটির ইউরোপীয় সেক্রেটারি ছিলেন, যোধ হয় তাঁহারই উদ্যোগে এই নূতন নিয়োগ সম্ভব হইয়াছিল। পিয়ার্স সাহেব Female Juvenile Societyর সভাপতি ছিলেন।

২ Priscilla Chapman: Hindu Female Education, London 1889, p. 81.

মিশনরী সোসাইটির পাদরী আইজাক উইলসনের বিবাহ হয়। ১৮২৮ সনের ১লা এপ্রিল মিস্টার ও মিসেস উইলসন ৫৮টি বালিকা লইয়া এই বিদ্যালয়ের কার্যরম্ভ করেন। এই স্কুলই ক্রমে ১৮৪২ সনে প্রসিদ্ধ বীটন (Bethune) স্কুলে পরিণত হয়।

সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত হিন্দুরা যে জীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন এ কথা ঠিক নয়। সেন্ট্রাল স্কুলের প্রতিষ্ঠাকালে রাজা বৈষ্ণনাথ কুড়ি হাজার টাকা দান করেন। হিন্দু ধর্মভাব সম্ভাপতি রাধাকান্ত দেবও বিরূপ ছিলেন না। ইহার কিছু পূর্বে বিবিলোকদের উত্তোগের সমর্থনের জন্ত স্কুল সোসাইটির প্রধান পণ্ডিত ও সংস্কৃত কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের ভ্রাতুষ্পুত্র গৌরমোহন বিদ্যালয়কার জীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার জন্ত ‘জীশিক্ষাবিধায়ক’ নামে যে পুস্তক রচনা করেন, তাহা ১৮২২ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল রাধাকান্ত দেবের আহ্বকল্যে।^১ জীশিক্ষা যে শাস্ত্রমন্মত তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে গৌরমোহন গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন : “যতপি জীলোকের বিদ্যা শিখিতে শাস্ত্রে এবং ব্যবহারে কোন দোষ থাকিত তবে পূর্বকার সাক্ষী জীগণ কদাচ বিদ্যা শিখিতেন না। যৈজ্ঞেয়ী, শকুন্তলা, অননুয়া, বাহুট রাজার কন্যা, দ্রৌপদী, ভগবতী, কঙ্কিনী, চিত্রলেখা, লীলাবতী, মালতী, কর্ণাট রাজার জ্যেষ্ঠা, লক্ষণ সেনের জ্যেষ্ঠা, খনা প্রভৃতি পূর্বকার জীসকল নানা শাস্ত্র পড়িয়া সেই শাস্ত্রের পারদর্শিরূপে বিখ্যাত ছিলেন। এবং এখনকার রাণী ভবানী, হটী বিদ্যালয়কার, শ্রীমাহেন্দ্রী ব্রাহ্মণী, ইহারও লেখাপড়া এবং নানা শাস্ত্র ও দর্শন বিদ্যাতে অতি সুখ্যাতি পাইয়াছেন। বিদ্যাশিক্ষাতে কোনরূপে মানহানি কিম্বা অখ্যাতি হয় নাই বরং সুখ্যাতি বাড়িয়াছে।”

এইরূপে বাংলা দেশে জীশিক্ষার আরম্ভ হইয়াছিল। আদম (Adam) সাহেবের রিপোর্টে ১৮৩৪ সনে ১৯টি বালিকা-বিদ্যালয়ের উল্লেখ আছে।

কিন্তু ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এ বিষয়ে সরকারী মনো-

৪ ইহা উল্লেখযোগ্য, ১৮৪৯ সনে রাধাকান্ত দেব নিজ ভগ্নে একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। (‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা’, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪২)।

যোগ দেখা যায় না। তৎকালীন Council of Education বা শিক্ষাপরিষদের সভাপতি জন এলিয়ট ড্রিন্কাওয়াটার বীটনের (John Elliot Drinkwater Bethune) ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতায় ও রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির উৎসাহে ১৮৪২ সনের ৭ই মে তারিখে বীটন নারীবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে ইহার নাম ছিল হিন্দু নারীবিদ্যালয়, এবং ইহা আরম্ভ হয় (বিনা ভাড়া) সিমলাস্থিত দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা-বাড়িতে একুশটি শিক্ষার্থিনী বালিকা লইয়া। স্থির হয়, হেতুয়া পুকুরের পশ্চিমে যে সরকারী জমি আছে তাহা ক্রয় করিয়া বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণ হইবে। দক্ষিণারঞ্জন মিজাপুরে তাহার যে পাঁচ বিঘা জমি ছিল তাহার বিক্রয়-লব্ধ বারো হাজার টাকা সিমলার জাম ক্রয় করিবার জন্য দান করেন; গৃহনির্মাণের বাকি সমস্ত টাকা বীটন সাহেব স্বয়ং বহন করেন। অনেক পরে ১৮৫৬ সনে এই বিদ্যালয় সরকারী স্কুলে পরিণত হয়; এবং ইহার পরিচালনার জন্ত রাজা কালীকৃষ্ণ দেব, রমাশ্রীনাথ রায়, কালীশ্রীনাথ ঘোষ প্রভৃতি কলিকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ওই বৎসর আগস্ট মাসে এই কমিটির সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। নারীশিক্ষা-বিষয়ে ইহাই প্রথম সরকারী সংযোগ। বলা বাহুল্য, এই বিদ্যালয় বর্তমানে বেথুন স্কুল ও কলেজ নামে পরিচিত।

দক্ষিণারঞ্জন ও বিদ্যাসাগর ছাড়া, বীটন সাহেবের অন্য একজন উল্লেখযোগ্য সহায়ক ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও বিদ্যাসাগরের সতীর্থ বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার। জীশিক্ষার তিনি যে উৎসাহী পক্ষপাতী ছিলেন, তাহা দেখা যায় ‘সর্বশুভকরী’ নামক মাসিক পত্রিকায় (আশ্বিন শক ১৭৭২=ইং ১৮৫০) প্রকাশিত তাঁহার “জীশিক্ষা” শীর্ষক বিস্তৃত প্রবন্ধে^২। রাজনারায়ণ বসু তাঁহার

১ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংকলিত ‘বিদ্যাকর্মসম্মেলন’ ত্রয়োদশ কাণ্ডে প্রকাশিত “জীবনবৃত্তান্তে” (২য় খণ্ড) যে গালিলিওর চরিত্র ছাপা হইয়াছে, তাহা অনুসৃত হইয়াছিল, বীটন সাহেবের লিখিত ইংরেজী জীবনবৃত্তান্ত হইতে। এই খণ্ডের ভূমিকায় শিক্ষাব্রতী বীটন সাহেবেরও সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে।

২ এই দুস্তাপ্য প্রবন্ধটি ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্য-সাধক চরিত্রমালা, ১ম খণ্ড, ১৯৫১, পৃঃ ৩১-৪৮) পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন। এই

আশ্চর্যিতে এই প্রবন্ধের প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন : “জীশিক্ষা বিষয়ক ঐরূপ উৎকৃষ্ট প্রস্তাব অস্ত্যাপি বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই।” বীটন-নারী-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ঐহার উদ্যোগী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মদনমোহনের উল্লেখ করিয়া বীটন সাহেব স্বয়ং লিখিয়াছেন : “Pundit Madun Mohun Tarkalunkar, one of the pundits of Sanscrit College...not only sent two daughters to the school, but has continued to attend it daily to give gratuitous instruction to the children in Bengali, and has employed his leisure time in the compilation of a series of elementary Bengali Books expressly for their use।” মদনমোহন যে কেবল তাঁহার নিজের দুই কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে এই বিদ্যালয়ে পাঠান তাহা নয়, স্বয়ং প্রত্যহ আদিয়া বিনা বেতনে বালিকাদের শিক্ষাদান করেন এবং ইহাদের জন্য শিশুপাঠ্য পুস্তকও রচনা করেন। তাঁহার ‘শিশুশিক্ষা’ ১ম ভাগ বীটন সাহেবকে উৎসর্গ করিয়া মদনমোহন লিখিয়াছেন : “বিশেষতঃ বালিকাগণের শিক্ষা সংসাধন করিবার আশয়ে যে পুস্তকপরম্পরা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই কয়েকটি পত্রদ্বারা তাহার প্রাথমিক সূত্রপাত করিলাম।”

বীটন সাহেবের মত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও বিশ্বাস করিতেন যে, তৎকালে জীশিক্ষাবিস্তার আমাদের দেশে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু তাঁহার উৎসাহ ও কর্ম-তৎপরতা কেবল বীটন স্কুলের কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পূর্বে তিনি বালকদের জন্য মডেল বাংলা স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন, এখন মফস্বলে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হইলেন। বালক-বিদ্যালয় সম্বন্ধে সরকারের অসহমোদন ছিল। তিনি ধরিয়া লইলেন, বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতেও সেইরূপ সমর্থন পাইবেন। এই ধারণার বশে

ইন্স্পেক্টর অফ স্কুল হিসাবে, তিনি নিজের এলাকাভূক্ত জেলাগুলিতে প্রথমে নিজের দায়িত্বে ও অর্থব্যয়ে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। পরে লেখালেখির ফলে সরকার ব্যয়ের সমস্ত টাকা পরিশোধ করিলেন বটে, কিন্তু বালিকা-বিদ্যালয়গুলির জন্য কোন স্থায়ী সাহায্যদান করিতে অস্বীকার করিলেন। নভেম্বর ১৮৫৭ হইতে মে ১৮৫৮ পর্যন্ত এই কয় মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলায় ৩৫টি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন; ছাত্রীসংখ্যা ছিল মোট ১,৩০০। স্থানীয় অর্থ-সাহায্য অতি অল্পই ছিল।

কিন্তু গোড়া সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত জীশিক্ষার ঘোরতর বিপক্ষবাদী ছিলেন, এবং তাঁহার বাস্তব-কবিতায় শিক্ষিত মেয়েদের বিক্রম করিয়াছেন। বেথুন সাহেবের চেষ্টার নিন্দা করিয়া তিনি ছড়া কাটিয়াছেন :

“আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো

ব্রতধর্ম করতো সবে ;

একা ‘বেথুন’ এসে শেষ কোরেছে

আর কি তাদের তেমন পাবে ?

যত ছুঁড়িগুলো তুড়ী মেয়ে

কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে,

তখন ‘এ বি’ শিখে বিবি সেজে

বিলাতী বোল কবেই কবে।

এখন আর কি তারা সাজি নিয়ে

সাঁজ সোঁজোতির ব্রত গাবে ?

সব কাঁটা চামচে ধোরবে শেষে,

পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে ?

ও ভাই ! আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে,

পাবেই পাবে দেখতে পাবে !”

কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের অনিষ্টপঙ্কী বিক্রম সত্ত্বেও জীশিক্ষার বিস্তার, বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহে, ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমান সমুদ্র অবস্থায় আদিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে ভাল কি মন্দ হইয়াছে, সে প্রশ্ন এখানে উঠে না। ইহাই ছিল যুগধর্মের অগ্রগতি, তাহাকে রোধ করিবার চেষ্টা নিফল ও হান্তাম্পাদ।

সঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কুমারমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় *A Pious Essay on Native Female Education* (Calcutta : Lepage and Co, 1848) নামক ইংরেজী প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন।

নানা রঙের দিনগুলি

পরিমল গোস্বামী

আমরা যে-কালের ভিতর দিয়ে চলি, তা অত্যন্ত কাছে থাকে বলে তাকে আমরা দেখি না। বোধ হয় অব্যবহিত বর্তমানকে সম্পূর্ণ করে চিনতে পারা মনের ধর্মই নয়। তার দুখানি মাত্র পা, অথচ কাল তিনটি, তাই তিনটি কালে সে সমান ভাবে পা ফেলতে পারে না। যদি কেউ পারে তবে জানা যাবে সে ব্যাকরণের পাতা খুলে ব্যাকরণের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে আবদ্ধ হয়ে আছে। ব্যাকরণের বাইরে যে তিনটি কাল তার উপরে মনের গতি পেণ্ডুলামের গতি। পেণ্ডুলাম তার গতিসীমার দুই প্রান্তে একবার করে ধামে, মধ্যপথে কখনো ধামে না।

লিখতে বসে প্রথমেই এই কথাগুলো মনে আসছে, কারণ অতীতে যে কয়েকটি বছরের কথা মনে আনতে চেষ্টা করছি, এখন মনে হয় তাদের সম্পূর্ণ করে দেখতে পাচ্ছি। তখন পারি নি।—তখন, অর্থাৎ যে সময় সে কালের মধ্যে বর্তমান ছিলাম।

সে দিনের স্মৃতি মনে বোমাঞ্চ জাগায়। আজকের এই মন ও দৃষ্টি নিয়ে সেই দিনগুলোর মধ্যে ফিরে গিয়ে সেই কালকে একটু আদর করে আসতে ইচ্ছে হয়।

অতীত ও ভবিষ্যৎ কালেই যে মানুষ বেশি বাস করে তার আর একটি প্রমাণ দিয়ে থাকেন গণংকার। কেউ হাত দেখে, কেউ কোণী দেখে, মানুষের অতীত ও ভবিষ্যৎ বলে চলেছেন। বর্তমান তাঁর কাছে তুচ্ছ, কারণ বর্তমানের জ্ঞানের উপর কারও দাবি নেই। গণংকারও তাই সাধারণ মানুষের মতো ত্রিকালদর্শী। আমিও তাই। ত্রিকালদর্শী হ'লে স্মৃতি হতে পারতাম।

১৯৩০-৩৪-৩৫-৩৬ সনের সেই দিনগুলি—যা সোনার খাঁচায় রইল না, অথচ যা হারিয়ে যায় নি।

গণংকার বসে আছেন ৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রিটের দোতলার একটি প্রশস্ত ঘরে।

সুরেশ বিশ্বাস। এ কালের কেউ তাঁকে চেনে না, চেনবার উপায়ও নেই, তিনি স্বেচ্ছায় নিজেকে লুপ্ত করেছেন ইহকালের দৃষ্টির আড়ালে।

সুরেশ বিশ্বাস হাতের রেখা দেখছেন। সজনীকান্তের হাত। অতিকায় অতিপুষ্ট আঙুলসম্বলিত হাত।

“আপনার আরও কয়েক বছর গণগোল আছে—তারপর দিন আসছে উন্নতির—ভীষণ উন্নতি সামনে—কেউ ঠেকাতে পারবে না।”

সজনীকান্ত হয়তো অবিশ্বাসের হাসি হাসছেন মুহূর্ত, তবু কথাটা বিশ্বাস করতে ভাল লাগে।

একটু দূরে কিরণ রায় টেবিলে মনোযোগ দিয়ে প্রাক্ষ দেখছেন হট্টগোলের মধ্যে। জনারণ্যে কিরণকুমার এক।

ডক্টর সুনীলকুমার দে হাত এগিয়েছেন সুরেশ বিশ্বাসের দিকে।

“ঢাকার চাকরি ছাড়তে হবে—you will have to fly away from Dacca!”

এখনও সে ধ্বনি কানে বাজছে।

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হাত।

বিলেত যাওয়া আবার ঘটবে অল্পদিনের মধ্যে। নিশ্চয় ঘটবে।

সাড়ে তিন বছরের ঘটনা, যে কথাটি এখন মনে আসছে পর পর লিখে চলেছি। চলন্ত ছবি। এক-একটি ছবি ঘিরে কত রঙ, তা শুধু আমার মনের মধ্যেই উজ্জ্বল।

অমৃতবিলাসী প্রেমেন্দ্র মিত্র নিজের যে-কোনো তুচ্ছ অল্পবয়সী কথা নিয়ে কিরণের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক ধরে আলাপ চালাচ্ছেন।

এক পাশে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীরদচন্দ্র চৌধুরী ইংল্যান্ডে একটি বিশেষ জাতীয় কর্নি গাছ আছে কি না তা নিয়ে তুমুল তর্ক বাধিয়েছেন। সামনে গ্রাশজাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন এক খণ্ড খোলা পড়ে আছে।

শৈলজ্ঞানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর ক্রমশঃ-প্রকাশিত ‘অভিশাপ’ উপন্যাসের কিস্তি অতি বিলম্বে এনেছেন। তা নিয়ে কিছু ভিত্ততার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি অভিশপ্তের মত বসে আছেন নীরবে। পাশে তাঁর অল্পচর কবি সুরেশ মুখোপাধ্যায়, মুখে স্থিত হাসি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিতান্তই তরুণ যুবক, চেহারায় উদাসীন বাউলের ভাব। বেণরোয়া লেখক। লিখছেন প্রচুর। নতুন প্রতিভা আবিষ্কারে সজনীকান্তের ইনটুইশন দেখে অবাক হই।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মধুর কণ্ঠে সরস গল্প জন্মিয়ে তুলেছেন। পরম উপভোগ্য মুহূর্তগুলি উড়ে চলেছে পাখা মেলে।

হৃদয়ে বজ্রকণ্ঠ প্রমথনাথ বিশীর সঙ্গে শিল্পী অরবিন্দ দত্তের তুমুল তর্ক চলছে। এ তর্কের কোনো হেতু নেই। তর্কের অন্তাই তর্ক। আর্ট ফর আর্টস সেক।

মোহিতলাল মজুমদার রবীন্দ্রনাথের প্রতি বড়ই স্নেহ। তাঁর সমালোচনা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে খেয়াল নেই। বলছেন—খুব দস্তের সঙ্গে—“রবীন্দ্রনাথ একটি লাইন ইংরেজী লিখতে জানেন না।” এবং আরও কত কি, লেখবার মত নয়।

তাকে সামনে পেলে রক্তপান করেন এই রকম ভাব।

পাশের ঘরে ঢুকছেন কজন। নলিনীকান্ত সরকারের গান হবে। মাসিকপত্র অফিসে গান! অতএব একটা ঘরে খিল বন্ধ হল। দেহতত্ত্বের গান সব “A” মার্ক। রচনানৈপুণ্যে পুরস্কার পাবার উপযুক্ত।

বড় ঘরটাতে অন্তত পঁচিশজন বসে তর্কবিতর্ক চলছে।

নবাগতের প্রশ্ন—“সজ্জনীবাবু কোথায়?”

“তিনি বেরিয়ে গেছেন।”

“বড়ই দরকার ছিল।”

“ঘণ্টাখানেক পরে এলে দেখা পাবেন।”

আধ ঘণ্টা পরে পাশের তালাবন্ধ ঘর (গণপতি চক্রবর্তীর ইলিউশন বক্স।) থেকে আর এক দরজার খিল খুলে সজ্জনীকান্তের আবির্ভাব।

বাইরে যান নি তিনি। ওটি আশ্রয়কার ব্যবস্থা। নইলে ভিড়ের মধ্যে সম্পাদনা বা লেখার কাজে কিছু অসুবিধা হ’ত।

স্বদেশ বিশ্বাস গল্প জন্মিয়ে বসেছেন। “নীরদ চৌধুরী কেমন জানেন? মস্ত বড় পণ্ডিত। সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান দর্শন সব জানেন। ভূগোলের জ্ঞান অদ্ভুত। সমস্ত দেশের খবর ইঞ্চি ইঞ্চি হিসেবে বলে দিতে পারেন। ইউরোপের কোন্‌ গ্যালারিতে কোন্‌ বিখ্যাত ছবি আছে তা বলে দিতে পারেন। তবে তাঁর সামান্য একটু জ্ঞান আছে।—তিনি লিলুয়ার বেশি দেশ নিজ চোখে দেখেন নি।”

স্বদেশ কম্পোজিটর প্রকৃ হাতে ঘোঁত-ঘোঁত করতে

করতে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠছেন, “বাবু! সব লেখক হয়েছেন, একটা বানান ঠিক ক’রে লিখতে শেখেন নি।” ইত্যাদি।

অশোক চট্টোপাধ্যায় এসেছেন। খুদা তিনি নবাব। আড্ডা জমানোর নোবেল প্রাইজ পাবার উপযুক্ত। রবীন্দ্রকাব্যের নতুন অহুবাদ শোনাচ্ছেন, “ওগো তুমি কোথা যাও—O cow, where do you go.” অথবা “বোবন নিকুঞ্জ In the bowerless jow forest” অথবা “তিমির আড়ালে—Behind the whale”।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় অশরীরী, একেবারে শেলীর স্বাইলার্ক—স্বলস্ব কিছু নেই, সবখানি আবেগ আর উচ্ছ্বাস। সব কাজ তাঁর ইনস্পারাদ। স্বন্দর কিছু পেলেই গদগদ ভাব। মধুর কণ্ঠ, গীতধর্মী স্বর, সেই স্বরের কাছে সত্য মিথ্যা সব একাকার। অবিস্মৃত চল—দেখলেই মনে হয় ছুনিয়া চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ধ্বংস হয়ে বাবে এই খবরটি তাঁর মুখে এখনি শুনে পাব।

ঘোর গরম, পাখার হাওয়া তুচ্ছ মনে হচ্ছে। এমনি সময় পাখা বন্ধ ক’রে দিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। একটি সিগারেট যোগাড় করেছেন, সেটিকে পুরো খেতে হবে আরাম ক’রে। পাখার হাওয়ার অকারণ বেশি পুড়ে যায়। তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠ। অবিচলিত, আশ্রয়, আপন ব্যবসয়ে সচেতনতাহীন। গ্রাম্য বালক যেন। উদ্বেজনাহীন রাগশেষহীন।

বিভূতিবাবু বলছেন ব্যবসা করবেন। তার ফলে এক তুমুল কাণ্ড ঘটে গেল। এই ঘটনাকে একটু প্রলম্বিত করে “প্ল্যান” গল্পটি লিখেছিলাম। সেটি ‘বঙ্গভূমি’ জ্যৈষ্ঠ (১৩৪০) সংখ্যায় ছেপেছিলেন সজ্জনীবাবু।

এর বছর দুই আগে যখন এই বৃহৎ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হই নি, তখন হারিসন রোডের ট্রামে যেতে যেতে এক নকল রবি ঠাকুরকে দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলাম। এক দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলাম তাঁর দিকে। গায়ের রঙ ফরসা হ’লে আসল বলে ভুল হত।

চেহারাটা মনে রেখেছিলাম, মনে রাখবার মত বলে। সেই নকল রবীন্দ্রনাথকে দেখলাম এই ‘বঙ্গভূমি’র আসরে। সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত। লেখেন, ছবি আঁকেন, অভিনয় করেন।

ইতিপূর্বে বাইরে থাকে সামান্য চিনেছি, একে একে সবাইকে দেখি 'বঙ্গলী'র আসরে।

বাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে শনিরঞ্জন প্রেসের টাইপ-ঘরের বিপরীত ঘরে আমি নিজে যখন ১৮ পয়েন্ট কম্প্রেসড টাইপের মত বাস করছি, তখন এক ব্যক্তির সঙ্গে ঘটনাস্থ্রে আলাপ হয়। হৃষদেহ, গম্ভীর স্বাস্থ্য। বাড়িতে দেহচর্চা করেন। লোহার রিঙ খোলানো আছে কড়িকাঠে। কারলাইলের গাঁড়া ভক্ত, তাঁর ছবি টাঙানো আছে ঘরে।

কিছুদিন আগে ভাগলপুর থেকে বনফুলের কয়েকটি ছন্দে লেখা গল্প সংগ্রহ করে এনেছি। "জনার্দন জোয়ার্দার" ছাপা হচ্ছে 'শনিবারের চিঠি'তে। তাঁকে পড়ে শোনাচ্ছি। গম্ভীর লোকের উপর কৌতুক কাহিনীর কি প্রতিক্রিয়া হবে জানতাম না।

স্টুট-পরা নিখিলচন্দ্র দাস গল্পের শেষ অংশ শুনে মেঝেতে গড়াতে লাগলেন। সে কি দৃষ্ট! আমি তো স্তম্ভিত।

তার পরদিন আবার এসেছেন।

"ঐ কবিতাটার শেষ কটা লাইন আবার পড়ুন তো।"

আমি আবার পড়লাম।

পুত্র জনপ্রিয় জনার্দনকে ধরে পিতা গর্জন করছেন আর মারছেন। প্রচুর মার খেয়ে—

"ক্বিপ করে

জনার্দন প্রথম পিতায়

সার্কাসি কায়দায়

জালিউট করি

গেল সরি।"

আবার নিখিলচন্দ্র দাসের কোট-প্যাণ্টের ডাঁজ ভাঙল, ধুলোমাখা হলেন আপাদমস্তক।

তাঁকেও দেখলাম 'বঙ্গলী' অফিসে, প্রথমে গম্ভীর মূর্তিতে; পরে মার মূর্তিতে; হাসিয়ে দিলে আর রক্ষা ছিল না। নলিনীকান্ত সরকার ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য থাকলে সেদিন রক্তপাত হত।

কিছুদিন পরে এবং কিছুদিনের জন্ত তিনি ও সজনীকান্ত পরস্পর স্বথ-দুঃখের ভাগী হলেন।

শিল্পী যামিনী রায় এসে বসেছেন। ব্যাখ্যা করছেন তাঁর আপন শিল্পভঙ্গী। শিল্পী অভুল বসু, চৈতন্যদেব

চট্টোপাধ্যায়, মনোজ্ঞভূষণ গুপ্ত, হরিপদ রায় আসছেন নিয়মিত।

বনফুল সিনেমা দেখে জ্যানেট গেনরকে উদ্দেশ্য করে কবিতা লিখে টেলিফোনে শোনাচ্ছেন কিরণকুমারকে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছেন মুন্সের থেকে। আলাপ হ'ল তাঁর সঙ্গে। আবিষ্কার করলাম পনেরো বছর আগে আমরা একই কলেজে একই ক্লাসে এবং সেকশনে পড়েছি। কেউ কাউকে চিনতাম না, 'বঙ্গলী' অফিসে বসে পরিচয় হ'ল। কেউ কাউকে কখনো দেখেছি বলেও মনে হ'ল না।

ভক্তার রামচন্দ্র অধিকারী আবৃত্তি শোনাচ্ছেন সবাইকে অবাক করে। স্মৃতি এবং কণ্ঠ দুইই চমকপ্রদ। অপরের ফুসফুস নিয়ে কারবার, কিন্তু তাঁর নিজের অন্তরটা আর সবারই কাছে উন্মুক্ত থাকত।

ভক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য আসতেন কদাচিত। সব রকম বিষয়ে লেখায় ওস্তাদ। আর আসতেন উকিল জ্ঞান রায়, দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ কবি জগদীশ ভট্টাচার্য, বাসবেন্দ্র ঠাকুর, খুনো কবি কৃষ্ণধন দে।

কবি হেমচন্দ্র বাগচী শাস্ত্র মধুর ভাবে এসে বসতেন। প্রকাণ্ড ব্যাগে গান্ধীজি, উড়িয়ার মন্দির এবং অসহযোগ আন্দোলনকে পুরে নির্মলকুমার বসু আসতেন প্রসন্ন হাসিমুখে।

সকল বিষয়ে সকল বিধিনিষেধভঙ্গকারী সজনীকান্ত খামখেয়ালিতে সবাইকে হার মানাতেন। দল ধ'রে হঠাৎ অফিসের সময় ডায়মণ্ড হারবার যেতে হবে। সজনীকান্ত সহকারী কিরণকে বলছেন, "সঙ্গে না গেলে চাকরি খেয়ে দেব।"

শিক্ষক মনোজ বসু, 'নবশক্তি' সম্পাদক সরোজকুমার রায় চৌধুরী, কর্মযোগী যোগানন্দ দাস, হৃষীকেশ গবেষক ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যিক কলহপ্রিয় গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী—সবাই আসছেন, আর যখন খুশি। চলচ্চিত্রের মত নিজ নিজ ভূমিকা অভিনয় করে চলে যাচ্ছেন।

আশ্চর্য আড্ডা। লেখক, শিল্পী, শিল্প-রসিক, সাহিত্য-রসিক—সবারই দুখানা পা সচল তাঁকেই দেখা যাচ্ছে সেখানে। বেলা একটা থেকে ভিড় জমছে। সংখ্যা বাড়ছে ক্রমে। উক্টর বটকৃষ্ণ ঘোষ, হুকুমার সেনকে দেখা

বাছে বিকেলের দিকে, কখনো দুপুরে। তারানন্দ করবেন, একটি চরিত্রের এই রহস্যময় বৈচিত্র্যই সেদিনের বন্দোপাধ্যায় তখনও আত্মপ্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত নন, কিন্তু ছিল সর্বপ্রধান আকর্ষণ। ভাল লেগেছিল সে বৈচিত্র্য।

সজ্ঞানীর উৎসাহে সজ্ঞানী উৎস খুলছে আশ্চর্য ক্রান্ত।

ভীকতা দেখি নি কখনো।

কিছুমাত্র ক্ষমতার পরিচয়ও দৃষ্টি এড়ায় না সজ্ঞানীকান্তের।

অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা দেখি নি কখনো, তা সে নিজের জন্মই হোক বা আশ্রিতের জন্মই হোক।

তার গুণগ্রহণের ভাষা ছিল “ওয়াটারফুল।” বা শুনতেন, সব ওয়াটারফুল। এ জন্ম কোনো কোনো লেখকের অধঃপতন ঘটেছে সন্দেহ নেই, সময়কালে অগ্রিম সত্য বললে হয়তো লেখকের উপকার হত। কিন্তু তবু বলব ওই ‘ওয়াটারফুল’ কথাটি পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হয়েছিল বলে আজও অনেকে সাহিত্যের পথে চলেছেন আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে।

‘বঙ্গলী’ থেকে সরে যাবার বেলাতেও সেই অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়া। অথচ সম্পাদক সজ্ঞানীকান্ত ‘বঙ্গলী’ সম্পাদনায় চরম যোগ্যতাই দেখিয়েছিলেন। ‘বঙ্গলী’ প্রথম শ্রেণীর কাগজ হয়েছিল। সম্পাদনার আঙ্গিক বা কৌশল বিষয়ে আমি তো তার কাছে প্রায় সবটাই ঋণী।

সজ্ঞানী-কেন্দ্রিক ‘বঙ্গলী’কে ঘিরে কি বিচিত্র ভিড়, কি বিচিত্র সম্ভাবনা।

এই ‘বঙ্গলী’কে কেন্দ্র করে যে শক্তি গড়ে উঠেছিল তার ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে আজ কি হত বলা যায় না। ‘বঙ্গলী’ খুব বড় কাগজ হত অবশ্যই, কিন্তু সুরেশ বিশ্বাসের ভবিষ্যদ্বাণী যে ফলতে পারত না তাতে সন্দেহ নেই।

সজ্ঞানীকান্তের চরিত্র ছিল রহস্যময়। তিনি কখনো তার শেষ দেখতে দিতেন না। প্রতি পদে বিস্মিত হয়েছি। অনেক সময় ইচ্ছে করে রহস্য বাড়াতেন। অনেক জটিল সমস্যার কি করে যে সহজ সমাধান খুঁজে পেতেন তা আজও জানি না।

আঠারো বছর হ’ল ‘বঙ্গলী’র কাল গত হয়েছে। তখন যে সব পুত্র জামাতা পিতা সেখানে একত্র হয়েছিলেন, এখন তাঁদের প্রায় সবাই পিতা মৃত্যুর বা পিতামহের স্থান নিয়েছেন। শুধু স্মৃতির মধ্যে সেই কাল আজ বেশি উজ্জ্বল, বেশি রোমাঞ্চকর।

সেদিনের আড্ডায় ধারা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা স্বীকার

শ্যামলীর জন্ম

প্রভাকর মারি

একটি কবিতা লিখছি তোমার জন্মে
রাত জেগে জেগে মেলাচ্ছি মোর ছন্দ।
তুমি জেনে রেখো—নাই বা জানল অন্ধে,
ঘড়ি টিক্‌টিক্‌ নিব্বন্ধ নিষ্পন্দ।
মনে জাগে, আহা, মুরতি শ্যামলী বর্ণা,
স্বভৌল বাহু, ভীক পারাবত-বন্ধ।
আধো-জ্যোৎস্নায় নীল স্বপ্নের বর্ণা,
টানা টানা ভূক, হৃদয়-প্রসারী লক্ষ্য।
আকাশ ঘিরেছে লক্ষ তারকাপুঞ্জ
কোন তারকার দীপ্তি আনলে সঙ্গে?
তরু-লতা ঘিরি মত্ত মধুপ গুঞ্জে,
টলটল করে ঘোবন সারা অঙ্গে।

অহুভব করি চিকন চুম্বের গন্ধ
আলতো বাতাসে রহি রহি যেন আসছে।
মনের সেতারে জাগছে বেতুল ছন্দ,
উর্ধ্ব আকাশে আধখানা চাঁদ হাসছে।
শ্যামলী, তোমার নীল নয়নের প্রাস্তে
রাখলে কেমন স্নেহ আর সৌজন্ম,
একটি মনকে রাভালে, পেয়েছ জানতে,
একটি হৃদয় করলে যে প্রোষে ধন্য?
রাত জেগে তাই লিখছি তোমার জন্মে,
তুমি তো জানবে, নাই বা জানল অন্ধে।

চোখে মোর ঘুম নেই

শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য

চোখে মোর ঘুম নেই—

চেপে রাখা শক্তির জোয়ার

রক্তে তোলে সমুদ্রের ঢেউ,

সমুদ্রের লোনাঞ্জল—লোনা রক্তে আবর্ত কেনার—

অহুভব করেছ কি কেউ

আদিম সম্পর্ক আছে প্রাণে আর সমুদ্র-কেনায় ?

আমি এই পৃথিবীর আদিম সন্তান

জীবনে দেদীপ্যমান—দ্রবস্ত যৌবনে টলমল

অবারিত গতিবেগে সঞ্চারিত আমি

বহমান বায়ু স্তরে স্তরে ।

সেই আমি—

স্ববিরা এ পৃথিবীতে অসহায় আজ,

রুদ্ধগতি রক্ত ফেলে ধমনীতে আক্রোশ-নিখাস,

বন্দীপ্রাণ মুক্তি চায়,

উৎসুক উন্মুখ

উৎক্ষেপে ছড়ায় পড়ি' আকাশের দিগন্ত প্রসার

হু হাতে চাকিতে চায় ।

সবলে তাহার টুঁটি চাপি ।

রক্তে ওঠা তীব্র বড় অস্থির সস্তায় মরে কাঁপি

ভাস্কর্য্য মুক বেদনায় ।

উন্মাদ প্রাণের বস্তা—সমুদ্রের উৎসুক জোয়ার

ব্যাকুল প্রহর গোনে কোন দূরতম প্রত্যাশার ।

মুক্তি-মাগে বন্দী প্রমিথ্যাস ।

চোখে মোর ঘুম নেই, পলু ইচ্ছা রক্তে গুমরায়,

ক্লীব শক্তি ফিরে মর্মতলে,

দাব-দাহ করি অহুভব,

দন্তে ওষ্ঠ চাপি জোরে—লোনা স্বাদে মুখ ভরি ওঠে ।

চোখে মোর ঘুম নেই—

অস্বাস্থ্যের স্থিতি ভেসে আসে—

রেখা টেনে আসে স্রোত বিস্থত যুগের ।

আকাশে আশ্বিন-লাগা অশোকের বন—

মদির নেশায় বৃঁদ মহয়া ফুলের গন্ধমাখা

মাতাল হাওয়ার স্পর্শ,

আর—

পেলব তোমার বাহু কণ্ঠ বেড়ি', স্ববন্ধিম গ্রীবা,

মহুণ চিকণ ত্বক—উষাদেহ প্রাণ-তরঙ্গিত ।

সেদিনের সে নিখাস গায়ে লেগে আজো

কৈপে ওঠে জীর্ণ ধরণীর

গলিত বিবর্ণ মাংস—অলিত পাজর ।

অগ্নে তার গুটি নেই আজ,

ঘোলাটে হু চোখ

চেয়ে আছে খোলা দৃষ্টি মেলি ।

যৌবনে স্ববিরা তুমি তাই—

তুহিন-শীতল রক্তে চাপবাঁধা আশা-আকাঙ্ক্ষার

অসংখ্য মৃতজীবগু—ঠিক যুত নয়,

নিশ্বেজ নির্বীৰ্য পলু ক্লীব অধমুত ।

চোখে মোর ঘুম নেই—

অবরুদ্ধ প্রাণের জোয়ার,

শক্তি ভারে আমি টলোমলো,

পলু ইচ্ছা মরে কাঁদি,

বেদনায় ভ'রে ওঠে প্রাণ ।

সুদূর অতীত হতে রূপালি বে রেখা কলমল

গেছে চলি ভবিষ্যের পানে

স্থিতিতে আভাস পাই তার ।

বেকবার আগে সমীর আয়নার একবার তার মুখটা দেখে নিল। বহুকালের অভ্যাস এটা। কিন্তু আজ মনে হ'ল, আরও একটা কিছু দেখা দরকার। কী? সামনে ছিল ছেঁড়া একখানা 'সঞ্চয়িতা'। দু'চার পাতা উলটেই মনে হ'ল, কাজটা নিরর্থক। সারা বছর না প'ড়ে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করবার পূর্ব-মুহুর্তে বই দেখার মত। পরীক্ষা? কী একটা অজানা ভয়ে সমীর প্রশ্নটাকে সজোরে শাস্ত করল। পরীক্ষার কথাটা বানানোও হতে পারে? সে যে-হলে যাচ্ছে সেখান থেকে ফিরে এসে কে কবে ঠিক কথা বলতে পেরেছে? কারও কথায় বিশ্বাস নেই। 'সঞ্চয়িতা' বন্ধ ক'রে সমীর বেরিয়ে পড়ল।

গেল চৌরঙ্গীতে বাসে ক'রে। জায়গাটা ওর ভাল লাগে এমনতেও। বিশেষ ক'রে আজ, কেন না, কেন না—কারণের চিন্তাটাকেও সমীর মনের মধ্যে হত্যা করল নৃশংসভাবে। সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয়ে গেছে। এখন দ্বিতীয় চিন্তার অবকাশ নেই। তবু মনের মধ্যে একটা অজানা অপূর্ণতা যেন রয়েই গেল। সমীর গ্র্যাণ্ড হোটেল আর্কেড দিয়ে চলতে চলতে বা দিকের বইয়ের দোকানগুলি দেখেছিল। বই সম্বন্ধে তার উৎসাহ ছেলেবেলা থেকে। কিন্তু সম্প্রতি সে বই সম্বন্ধে শ্রদ্ধা হারিয়েছে। ওতে সব কথা লেখা আছে, শুধু সেই কথাটি ছাড়া ঘেটু বাদে সব কথা বাজে কথা। তবু সমীর একটা বইয়ের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল, পুরনো অভ্যাস। এ-বই ও-বই দেখতে দেখতে সমীর ধমকে গেল একটা অতি নতুন উপন্যাসের প্রথম কটি লাইন প'ড়ে। লেখকের নাম জন ওয়েইন, বয়স নাকি ত্রিশের বেশী নয়। বইয়ের নাম, 'লিভিং ইন দি প্রেক্সেন্ট'। সমীর তাড়াতাড়ি প'ড়ে নিজের মনে মনে অমুগ্ধ করল এই বকম: "যে মুহুর্তে এডগার স্থির করল সে আত্মহত্যা করবে, সেই মুহুর্ত থেকে সে বাঁচতে থাকল বর্তমানে। অদ্ভুত একটা অমুগ্ধতা, এই বর্তমানে বাঁচা। তার গত উনত্রিশ বছরের জীবনে সব সময় অতীতে থেকেছে একটা অমুগ্ধতাপাসক গতকাল, সামনে একটা ভয়াবহ আগামীকাল: ছুয়ে ষড়ষ্ম ক'রে সব সময় মাটি ক'রে দিয়েছে তার আজ, তার বর্তমান।

কিন্তু এখন...তার সব শেষ হয়ে গেছে। সে স্থির ক'রে ফেলেছে। এখন আর তার সামনে আগামীকাল নেই। আর ভবিষ্যতের এই শরিককে হারিয়ে অতীতও অর্থহীন! এডগার এখন বর্তমানে বাঁচছে।"

সমীর এখানেই থামতে পারল না। আরও কয়েক পাতা প'ড়ে জানল, এডগার ঠিক করেছে, পৃথিবী থেকে সে বিদায় নেবে ঠিকই, কিন্তু তার আগে জীবনকে, পৃথিবীকে, সে একটি উপহার দিয়ে যাবে। কী উপহার? তার সঙ্গে সে এমন একটি লোককে নিয়ে যাবে যে জীবনের শত্রু, যার অপসারণে পৃথিবী স্থখি হবে। সে কে? সমীর আর পড়ল না।

সমীরের শরীর শিহরিত হ'ল এই একান্ত আকস্মিক আবিষ্কারে। তার নিজের অবস্থা ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে কী বিস্ময়কর সাদৃশ্য একটা হঠাৎ-দেখা (এবং হয়তো মাঝারি) উপন্যাসের প্রথম কয়েক পাতার। সমীরের মনে হ'ল, সে জীবনের অর্থ এত দিন খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছে; হঠাৎ মিলল মৃত্যুর অর্থ। সমীরের মনে হ'ল, তার মনের উপর থেকে বিরাট একটা বোকা যেন নিমেষে নেমে গেল। মৃত্যুর অর্থ পেয়ে চারদিকের সব কিছু তার কাছে অর্থহীন হয়ে উঠল। পায়ের তলার বাঁধানো পেভ্‌মেন্টে সমীর পেল মৃত্তিকার স্পর্শ—মৃদু, প্রায় স্নেহ। অদ্ভুত আনন্দ-পূর্ণ অমুগ্ধতা।

কিন্তু সমীর বইয়ের দোকান পিছনে রেখে এগিয়ে যেতে যেতে ভাবল, তার সিদ্ধান্তে সে অবিচল থাকবে।

এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে অপরিচিত ব্যক্তির মনে করা স্বাভাবিক যে, সমীর খুব তাড়াতাড়ি হাঁটছিল। আদৌ তা নয়। সে বরং আর সবাইয়ের চেয়ে আস্তে হাঁটছিল। তাড়া কিসের তার? আমাদের সবাইকে অতীত জোরে ঠেলা দিচ্ছে পিছন থেকে, ভবিষ্যৎ টানছে প্রাণপণে। তাই তো বর্তমানটা এমন তাড়ায় ভরা। সমীর দাঁড়িয়ে আছে গতকাল আর আগামীকালের মাঝখানে এক নো-ম্যান'স ল্যান্ডে। তার তাড়া নেই। সমীর কোথাও থেকে আসছে না, সে কোথাও যাচ্ছে না। সে এসে দাঁড়াল

সাভার স্ট্রিটের মোড়ে। সামনেই মুজিয়ম। দরজা বন্ধ। সমীর হাসল তৃপ্তির সঙ্গে। সে জানে তার জন্ম ও-দরজা খোলা। খোলা বলেই খুলতে তাড়া নেই, বন্ধ থাকলেও নিজেকে মনে হ'ল না প্রত্যাখ্যাত।

আর কারো কাছে দণ্ডায়মান সমীরকে মনে হ'ল একান্তই গ্রহণীয়। সে সমীরকে অনেক কিছুই দিতে চাইল। “স্বর্গের স্বপ্ন”। অনেক কাউকে। সেবিকা, শিক্ষয়িত্রী—জাতীয়া, বিজ্ঞাতীয়া। অল্প কোনদিন হ'লে সমীর ক্রুদ্ধ হ'ত। নিজের উপর, তার আকৃতি কি ওই প্রাচীন ব্যবসায়ের প্রতি স্থপতি নিয়ন্ত্রণ? পৃথিবীর উপর, কেন এসব ব্যবস্থা আজও আছে? আজ সমীরের সহিষ্ণুতার সীমা রইল না। প্রায় অহুঙ্কা হ'ল তার পাশে দাঁড়ানো ওই গুজনকারী গাড়িওয়ালার জন্ম। আহা, বেচারী জানে না, ও কী করছে। আহা, বেচারীকে কালও বাঁচতে হবে যে! ও তো মুক্ত নয় আমার মত ভবিষ্যতের দাসত্ব থেকে। সমীর ওকে চার আনা পয়সা দিয়ে এগিয়ে গেল।

মুজিয়ম ছাড়িয়ে সমীর চলল দক্ষিণে। পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে এসে দেখল, একটি স্পষ্টতঃই ধনী ইংরেজ সম্পত্তিকে। দুজনের সামনে একটা পেরাঘুলেটর; মধ্যে একটি শিশু; খুম্বত। পিছনে পিছনে চলেছে একটা নাছোড়বান্দা ভিখারী।

দে না বাবু, কুছ ধায়া নেই।

সাহেব দৃষ্টতঃই নবাগত। বললেন, নে মাটা।—যেন ভিখারী কিছু দিতে চাইছিল তাকে। আর একবার বিরক্ত করাতে সাহেব আরও জোরে ধমক দিয়ে উঠলেন। এক মিনিটের জন্ম সমীর রাগ করল সাহেবের উপর; এত আছে, কী ক্ষতি হয় দুটো পয়সা দিলে? ভিখারীটার উপকার হয়।

সাভার স্ট্রিটের গাড়িওয়ালা সমীরকে সম্ভাব্য গ্রাহক বলে মনে করেছিল। একবার কষ্ট হ'ল পার্ক স্ট্রিটের ভিখারী তাকে আবেদন না জানিয়ে গেছে নির্দয় বিদেশীর কাছে। কিন্তু সমীর এখন সবাইকে ক্ষমা করতে পারে। ভিখারীকেও করল। না চাইতেই তাকে এক আনা দান করল। সাহেবকেও ক্ষমা করল। বেচারীর সঙ্গে ভিখারীর প্রভেদ নিভাস্তই সামান্য। ওদের দুজনেরই আগামীকাল

আছে। আজ তাই ডিঙ্কার দিন বা সঞ্চয়ের ও সতর্কতার দিন। ভিখারী কি ক'রে তার আত্মসম্মান আজ অক্ষুণ্ণ রাখবে? সাহেব কি ক'রে আজ উদ্বার হবে? মহাজন আগামীকালের কাছে ওদের আজ বাঁধা। পরশুর কাছে আগামীকাল। উদ্বার হতে পারে একমাত্র সমীরচন্দ্র সরকার। কালের শিকল সে চূর্ণ করেছে সাহসের সঙ্গে। তার সঙ্গে তুলনা কার? জীবনের প্রান্তে আসার আগে অবধি সমীর স্বপ্নের স্বাদ পায় নি কখনো।

অথচ কত সহজ কাজটা। আর কিছুক্ষণ পরেই সমীর পৌঁছে ঘাবে টালিগঞ্জে যেখানে তার বিদায়ের সব আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে তার আগমনের প্রতীকা করছে। সমীর ইচ্ছা করলেই একটা ট্যাক্সি নিতে পারত। তার মত পয়সা ছিল তার কাছে, এবং তার সঞ্চয়ের বা কার্পণ্যের প্রয়োজন নেই। কারো কাছে তার ধার নেই। কারো কাছে কিছু পাওনা নেই। সমীর মুক্ত। তবু সে ট্যাক্সি নিল না। হাঁটতে তার ভাল লাগছিল। সে ভাবছিল, সে হাওয়ার উপর হাঁটছে। ট্যাক্সিতে তার কী প্রয়োজন?

ডানদিকের বিস্তীর্ণ ময়দানের দিকে তাকিয়ে সমীর ওই রকমই বিরাট ও পরিব্যাপ্ত শাস্তি অহুভব করল। সে মৃত্যুর সঙ্গে এখন তার সন্ধি করেছে, তাই জীবনের কোনো কিছুই আর তাকে আঘাত করতে পারে না। তার চেয়েও বড় কথা, এখন তার যে পৃথিবীটাকে ভাল লাগছে তার মধ্যে লেশমাত্র আসক্তি নেই। আসক্তি কেন, অল্প কোনো অহুভূতিরও মিশ্রণ নেই তার বর্তমান শাস্তিতে। সমীরের মনে পড়ল একটু আগে দেখে আসা উপগ্রাসটার কথা। তার নায়ক এডগার কি ক'রে তার আত্মহত্যার সিদ্ধান্তের পরে অপর একজনকে সঙ্গে নিয়ে ঘাবার কথা, অর্থাৎ একজনকে হত্যা করবার কথা ভাবতে পায়ল? এমন ঘৃণা চিন্তা এমন শাস্ত মনে আশ্রয় পেল কি ক'রে? কিন্তু উপগ্রাসিকের প্রতিও সমীর ক্ষমাশীল। ভাবল, আহা, বেচারীকে গল্প বানাতে হয়। আত্মহত্যার সিদ্ধান্তটা পর্যন্ত লেখক কল্পনা করতে পারে, তার পরবর্তী মনোভাব কল্পনার অতীত। সে শুধু প্রত্যক্ষভাবেই জানা যায়, যেমন সমীর এখন জানছে। দু-চারজন এমন লোক ছিল ঘাবের প্রতি সমীরের খুশি থাকবার কথা নয়। ওই

যে সম্পাদক তার লেখা ছাপে নি। ওই যে বাড়িওয়ালা তাকে অপমান করেছিল কয়েক বছর আগে। ওই যে মেসের ম্যানেজার তার অস্বাভাবিক কথা জেনেও অস্বাভাবিকভাবে দাবি করেছিল তিন মাসের অগ্রিম দাম। কিন্তু এলগিন রোডের মোড়ে পৌছানো সমীর তাদের সবাইকে বিনা বিদায় কমা করল। একবার ভাবল, টেলিফোন ক'রে তাদের জানিয়ে দেয় কথাটা। সামনেই ছিল একটা ঘোঁকানে টেলিফোন।

অহমতি নিয়ে ডাকল সম্পাদককে।

হালো, আমি সমীর সরকার। সম্পাদকের সঙ্গে কথা বলছি কি?

হ্যাঁ, আপনি কে বলছেন? একটু তাড়াতাড়ি বলুন, আমার হাতে সময় কম।

সময়ের কথা শুনে সমীর হাসল, বলল, সময় আমার আরো কম। টেলিফোন করেছি শুধু আপনাকে জানাতে যে, আমি আপনাকে কমা করেছি।

কমা করেছেন? ঠিক সুনতে পারছি না।

ঠিকই শুনেছেন। আমি আপনাকে আমার লেখা না ছাপাবার ক্ষমতা কমা করেছি। কিন্তু যাক সে কথা। কাল সকালে একটা খবর পাঠাব, সেটা নিশ্চয় ছাপবেন যেন।

কি বলছেন বা নয় তা? আমার সময় নেই।

ব্যস্ত সম্পাদক মশাই টেলিফোন রেখে দিলেন। সমীর এতটুকু আহত হ'ল না। শুধু মনে মনে বলল, ছাপবে না আবার। বাংলা দৈনিক আত্মহত্যার সংবাদ ছাপবে না তো ছাপবে কী! দেড় কলম সম্পাদকীয় লিখবে কী নিয়ে? সমীর হো-হো ক'রে হাসতে হাসতে দোকানীকে টেলিফোন কলের জন্ত পরমা দিয়ে বেরিয়ে এল। আহ, জীবন কী আরামের, শুধু যদি জান জীবনকে কলা দেখাতে।

রাত তখন কটা? অভ্যাসের বশে সমীরের একবার লোভ হ'ল নিজের কবিতা উলটে সময় দেখে নিতে। কথাটা মনে হওয়াবাত্র সমীর সেটা দমন করল। বাজুক না ঘড়ির যত খুশি। সমীর অল্পই পরোয়া করে। সময়ের কথা তার ভাবতে তো হয় শুধু অফিসের দায়ে। অফিসের কথা মনে হতেই বিতীয় এক চুষ্ট বুদ্ধি চাপল

সমীরের মাথায়। জন সাহেবকে এক টেলিফোন ক'রে জানিয়ে দেওয়া যাক না যে, সমীর তাকেও কমা করেছে। হোয়াই নট?—জন সাহেব যেমন বলে।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ।

হালো, শুভ ষ্টেডিনিং।

কে?

সরকার। সমীর সরকার, তোমার ফ্রেইট ডিপার্ট-মেন্টের সিনিয়র কেরানী।

বেশ। কিন্তু এই অপার্থিব ঘটনায়? কী হয়েছে?

কিছু হয় নি। টেলিফোন করেছিলুম শুধু তোমায় জানাতে যে, তোমাকে কমা করেছি।

আমাকে কমা? কী জন্ত? হোয়াট অন আর্থ আর যু টকিং অ্যাবাউট?

অন আর্থ নয় সাহেব, অন আর্থ নয়। তার বাইরে যাবার পথে।

যু মাস্ট বি ম্যাড।

এর চাইতে বৃহৎ কখনো বোধ করি নি।

যু মাস্ট বি ড্রাক।

আহ, মন্দ বল নি। খ্যাক যু ফর দি সাক্সেসশন, সার। সার সাই ফুট। শুভ নাইট অ্যাণ্ড শুভ বাই।

সাহেব কী যেন গালাগালি দিচ্ছিল। সমীর তার আগেই টেলিফোন রেখে দিয়ে বেরিয়ে এল দোকান থেকে। সর্বশেষ অসৌজন্যের জন্তও সাহেবকে কমা করল। মনে মনে আবৃত্তি করল আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত, তুমি মোরে করেছে সত্ৰাট—রবীন্দ্রনাথের কবিতার কেরানীকে প্রেম যেমন করেছিল। প্রেমের কথায় সমীরের রচনা রায়ের কথা মনে পড়ল না, যেমন হ'ত কয়েক ঘণ্টা আগেও। মনে হ'ল, অন্ততঃ সেই মুহূর্তে চৈতন্তের কথা—যিনি সবাইকে প্রেম বিতরণ করেছিলেন, যারা কলসীর কানা মেয়েছিল সেই জগাই মাধাইকেও।

সমীর ভাবতে লাগল আর ক্লে কে তাকে কলসীর কানা মেয়েছে, এডগার যেমন ভাবতে বসেছিল তার সহস্র যুগ্মিত ব্যক্তিদের মধ্যে কাকে সে খুন করবে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে। এবার মনে পড়ল রচনা রায়ের কথা। সত্য বলতে কি, সমীরের আত্মহত্যার সিদ্ধান্তে এই মহিলার দান অল্প ছিল না। তিনি একদা সমীরকে

ভালবাসতেন ব'লে মনে করেছিলেন, এবং সমীরকে জানিয়েছিলেন সে কথা। পরে মন পারবর্তন করেছিলেন, কিন্তু সমীরকে জানানি কথাটা। আহা, বেচারী আঘাত পাবে! সমীরকে তাই দিনের পর দিন অবর্ণনীয় দ্বৈধ ও যন্ত্রণার সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে ওই মর্যাদাসিক সত্যটা আবিষ্কার করতে হয়েছিল। দীর্ঘ দেড় বৎসরের সেই অসহনীয় দুঃখের (অনির্বচনীয় আনন্দের কাঁটা মেশানো) প্রতিটি খুঁটিনাটি সমীরের মনে ছিল।

কিন্তু এখন সমীর রচনাকেও যেন ক্ষমা করতে পারে। সে আরো কিছুটা পথ হাঁটতে হাঁটতে একটা দোকানের সামনে দাঁড়াল সিগারেট ধরতে। দেখল, দোকানে লেখা আছে—আজ নগদ কাল বাকি। এই বিখ্যাত বাগীটি চিরকালই সমীরের কাছে হাস্তকর মনে হ'ত। কিন্তু আজ এই প্রথম সে এই গ্রাম্য চাতুরীর পূর্ণ দার্শনিক তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করল। কিন্তু ওই উপলব্ধিও তাকে বেহুনা দিল না। তার কাল নেই। আজকের অল্পই বাকি আছে। নগদ সে সবাইকে দিয়েছে, কালকের জন্ম বাকির প্রতিশ্রুতি আন্তরিক হ'লেও সে তা প্রত্যাখান করতে পারে।

রচনাকে যে সে ক্ষমা করেছে—এই কথাটাও তাকে জানানো উচিত নয় কি? এবার সমীর একটু স্বরাষ্ট্র প্রয়োজন অনুভব করল। তা ছাড়া হাঁটতেও আর ভাল লাগছিল না। পাশ দিয়ে যাচ্ছিল একটা থালি ট্যান্ডি, বাচ্চা। সমীর সেটাকে নিল না। ক্ষুদ্র কোনো কিছুতে আর তার রুচি নেই। কিছুক্ষণ পরেই এল একটা বড় ট্যান্ডি। সমীর সেটাতে উঠল।

সোজা গিয়ে বাঁ দিকে। যেতে লাগবে মিনিট নয়েক। পথে লাল আলোর বাধা পেলে এগারো মিনিট। বিদায়-দেওয়া জীবন আর অনাগত নিঃসময়ের মধ্যে ছ মিনিট এমন কিছু বেশী নয়। কিন্তু ট্যান্ডি-ড্রাইভারের বোধ হয় তাড়া ছিল, সে চলছিল যেমনসে সর্বদা চলে, ফায়ার ব্রিগেডের মত। সমীর বলল, ইতনা জলদি কেয়া সর্দারজী? যো আগে যানা মাংতা, থব্বর উপকো যানে দীজিয়ে।

একেই বলে দার্শনিক নির্লিপ্ততা। কিন্তু সর্দারজী ভাবলেন বাঙালী বাবু ভয় পেয়েছেন। বললেন, ডরনেকা কুছ হায় নেই বাবুজী। হামারা ভি জ্ঞান হায়।

হায় রে! সমীর কী ক'রে বোঝাবে ওই সর্দারজীকে যে পৃথিবীতে ওই মুহূর্তে সমীর সরকারই একমাত্র ব্যক্তি ছিল যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। সজ্ঞানে, স্বস্থ মস্তিষ্কে, কোন অভিযোগ না নিয়ে। বস্তুতঃ সবাইকে ক্ষমা করে। সর্দারজী সমীরকে যে মিশনে নিয়ে যাচ্ছিল তার নাম প্রায় হতে পারত মিশন অব মার্সি। সমীর চলছে রচনাকে ক্ষমা করতে। আঃ, কী শাস্তি ক্ষমায়!

রচনার প্রসাধন তখন অর্ধদীপ্ত। সমীর ঘরে ঢুকতেই বলল, আরে, এতদিন পরে সমীর যে!

সেই সন্ধ্যায় এই প্রথম সমীর একটু অনিশ্চিত বোধ করল। সম্পাদক বা সাহেবের সঙ্গে সমীর কথা বলেছিল যেন ওরা কেউই নয়। শত চেষ্টা সত্ত্বেও সমীর পারল না রচনার সঙ্গে তেমন স্বাভাবিক হতে। একটু থেমে বলল, এই এলুম।

বেশ করেছ। ব'ল।

রচনা কথাটা বলল বটে, কিন্তু সমীরের বুঝতে বাকি রইল না যে রচনা বেরবার উদ্যোগ করছিল। লুকিয়ে রচনা একবার ঘড়িটা দেখল, কিন্তু তা সমীরের দৃষ্টি এড়াল না। সমীর এবার হাসল। আবার তার কাছে স্পষ্ট হ'ল তার ও রচনার বিপুল প্রভেদ। একজন এ জগতের অধিবাসী। আর একজন এ জগতের বাইরে পা বাড়িয়েই আছে, দ্বিতীয় পা তুলতে বাকি নেই বেশী। সমীর স্থির করল সে তাড়াতাড়ি তার কথা সেরে বিদায় নেবে। হঠাৎ বলল, রচনা, আমি তোমায় ক্ষমা করেছি। সেই কথাটাই জানাতে এসেছি। এবার আমি উঠব।

রচনা আরনার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ ব'লে পড়ল সামনের হাতলহীন চেয়ারটার। চিরুনিটা আঙুল দিয়ে বাজাতে লাগল, যেন ওটা সেতার বা হার্প। পুরু পাউডারের বাঁধ ভেঙে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। চোখ দুটো তাকিয়ে রইল সমীরের দিকে। সেই চোখ। রচনা জানত, ক্ষমা হচ্ছে সর্বশেষ অহুভূতির ঠিক আগেরটা, লাস্ট বাট ওয়ান। মাহুভ ক্ষমা করতে পারে একমাত্র তাকেই যার সম্বন্ধে তার সর্ব অহুভূতি সমাধি লাভ করেছে। তা নইলে ব্যর্থ, ক্রুদ্ধ ভালবাসা থাকবে। কিংবা থাকবে উন্টে-বাওয়া ভালবাসা, অর্থাৎ ঘৃণা। কিন্তু সমীর রচনাকে ক্ষমা করেছে মানেই রচনা সম্বন্ধে সমীরের আর কোনো তীব্র অহুভূতি নেই। এর পরেই পরিপূর্ণ

বিস্মৃতি। সমীরের আকাশে রচনা তখন হবে নিবে-
শাওয়া তারা। রচনার অশ্রুবিসর্জন তাই অভিনীত নয়,
একান্ত আন্তরিক।

সমীর তবু চূপ করে রইল। মনে মনে আওড়াল,
আমার সিদ্ধান্তে আমি অবিচল।

রচনা আর একবার ঘড়ি দেখল। চোখ মুছে ভাবগম্ভীর
কণ্ঠে বলল, সমীর, তুমি ক্ষমা করলে কী হবে? আমি
নিজেকে ক্ষমা করি নি। একটা কথা দেবে?

কী?

কাল সন্ধ্যায় এসো, সব কথা তোমায় বলব, যা এতদিন
শত চেষ্টা করেও বলতে পারি নি।

কাল আমি আসতে পারব না।

কিন্তু আজ যে আমার সময় নেই, সমীর!

আজও আমি কিছু জানতে চাই নি তো!

তোমার দরকারে নয় সমীর, আমারই প্রয়োজনে।
না বলা কথার—

থাক। কিন্তু ওই যে বললুম, কাল আমি আসতে
পারব না।

কথা বলার সময় রচনার প্রসাধন স্বগিত থাকে নি।
এখন তা সমাপ্ত। রচনা বলল, চল, একসঙ্গে বেরনো
যাক। আমি ওই মোড়ে গিয়ে একটা ট্যাক্সি নেব।
বাসে যাবার আর সময় নেই, ন'টা প্রায় বাজে।

চল।

আবার অহরোধ করছি সমীর, দীর্ঘ, কাল একবার
এসো। আমি বাড়ি থাকব।

বলেছি, পারব না। কিন্তু আজ এত তাড়া কিসের?
রচনা সত্যিই প্রায় ছুটছিল। পথেই একটা ট্যাক্সি
পাওয়া গেল। রচনা সেটা ধামিয়ে উঠে বসল। দরজা
বন্ধ করবার আগে বলল, কাল সত্যি একবার এসো, সমীর।
সব তোমাকে বুঝিয়ে বলব।

সমীর হেসে বলল, কাল! কিন্তু বুঝতে তো চাই নি।
রচনা বলল, আমার আর একদম সময় নেই সমীর,
ন'টা বাজতে আর আট মিনিটও বাকি নেই। যেতে হবে
সেই লাইটহাউসে। বেচারী দাঁড়িয়ে থাকবে।

বেচারী! কিন্তু কে? সমীর জিজ্ঞাসা না করে
পারল না।

রচনা তাড়াতাড়ি ট্যাক্সির দরজা বন্ধ করে বলল, কে?
তাও কাল বলব সমীর। কাল নিশ্চয়ই এসো।

শেষ কথাগুলি ধাবমান ট্যাক্সির মধ্য থেকে অস্পষ্টভাবে
শোনা গেল। কিন্তু সমীর ভাবল, কে? কার সঙ্গে
রচনা সিনেমা দেখতে যাচ্ছে?

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সমীর যে বাস নিল সেটা
শ্রামবাজারের। বাসে বসে শুধু ভাবছিল, কে? জানতে
তাকে হবেই।

যতদূর জানা যায়, সমীর কালও অফিসে গেছে।

জ্যোৎস্নার
মিষ্ণ
মাড়ী



জ্যোৎস্নার
বনারমী
মাড়ী

ইঞ্জিয়ান মিষ্ণ হাউস

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

গান্ধীজী

শ্রীনির্মলকুমার বসু

১৯৩৪ সনে হরিজন-আন্দোলন সম্পর্কে সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণের পর যখন গান্ধীজী গুয়াখাটি শহরের পূর্বপ্রান্তে মহিলাশ্রমের দোতলায় সাময়িকভাবে বসবাস করছেন, সেই সময়ে আমি প্রথম তাঁর সামিথ্যে আসবার সুযোগ লাভ করি। গান্ধীজীর চরিত্রের যে বিশেষত্বটি তখন হতেই আমাকে আকৃষ্ট করেছিল, সেটি হ'ল তাঁর গোহাল, পরিপাটিভাবে কাজ করার ক্ষমতা এবং একান্তভাবে নিয়ম মেনে চলাফেরার অভ্যাস।

গুয়াখাটি পৌছে আমরা দুজন বন্ধু গান্ধীজীর সঙ্গে অর্থনৈতিক আদর্শ সম্পর্কে কয়েকটি কূটপ্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। বিকালবেলা যে সময়ে তিনি যিনের মধ্যে শেষবারের মত আহার গ্রহণ করতেন, তাঁর ইচ্ছানুসারে সেই সময়ে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ এবং প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গান্ধীজীর আহারের আয়োজন অবশ্য গুরুতর কিছু নয়; এক বাটি ছুধ, কিছু ছাড়ানো কমলালেবু, মধু প্রভৃতি তখন তাঁর সাক্ষ্য আহার ছিল।

খাবার কিছুক্ষণ পরে তাঁর বেড়াবার পালা। আজকাল যেখানে সেবাগ্রামের আশ্রম হয়েছে, একুশ বছর পূর্বে সেখানে সেগাঁও নামে একটি চাষীদের গ্রাম ছাড়া কিছু ছিল না। গান্ধীজী মহিলাশ্রম থেকে সেগাঁওয়ের কাছে মাঠে প্রায় এক মাইল হেঁটে যেতেন, আবার এক মাইল হেঁটে আসতেন। বেড়াবার সময়ে গান্ধীজী চপ্পল প'রে বেশ জোরে হাঁটতেন।

প্রথম দিন কথাবার্তার পর আমরা সকলে গান্ধীজীর সঙ্গে ভ্রমণে রওনা হলাম। খোলা মাঠ, মাঠের ফসল সব কাটা হয়ে গেছে; পাথুরে দেশ ব'লে ইতস্তত কালো রঙের পাথরের ছোট বড় টুকরা প'ড়ে আছে, তার মধ্য দিয়ে গান্ধীজী বেশ জরতভাবেই হেঁটে চললেন। কিছুক্ষণ পরে ঘড়ি দেখে যখন তাঁর অস্থান হ'ল যে কেরবার সময় হয়েছে, তখন তিনি, দেখতে পেলাম, চাদরের মধ্যে কয়েকখণ্ড মাঝারি-গোছের পাথর কুড়িয়ে নিলেন। তার পরেই, তাঁর দেখাদেখি অপর সকলেও পাথরের টুকরা সংগ্রহে মন দিলেন। সীমান্ত গান্ধী আবহুল গক্কার খান

ঐ দলে ছিলেন। তিনি বেশ বড় কয়েকখণ্ড পাথর চাদরে জড়িয়ে কাঁধের উপর কেলে চলতে আরম্ভ করলেন।

মহিলাশ্রম পর্যন্ত আমরা যখন ফিরে এলাম তখন দেখা গেল, আশ্রমের এক প্রান্তে বেশ বড় একটি পাথরের স্তূপ জ'মে রয়েছে। খবর নিয়ে জানতে পারলাম, মহিলাশ্রম থেকে নিকটে সদর রাস্তা পর্যন্ত কোনও পাকা সড়ক নেই। বর্ষাকালে এঁঠেল মাটির জঙ্গ কাঁচা পথে চলাফেরার বিশেষ অসুবিধা হয়। তাই রাস্তা তৈয়ারির খরচ কমানোর উদ্দেশ্যে গান্ধীজী ব্যবস্থা করেছেন, সকাল বিকাল বেড়াবার সময়ে প্রত্যেকে কিছু কিছু পাথর নিয়ে আসবে। এইভাবে দু-এক বৎসরের পর যথেষ্ট পাথর সংগ্রহ হ'লে তখন ঠিকাদারের উপরে রাস্তা তৈরি করার ভার দেওয়া হবে।

কবে কাজ শেষ হবে সে বিষয়ে চিন্তা ক'রে অসহিষ্ণু হওয়ার চেয়ে ধীরভাবে প্রত্যেক লোকের পক্ষে নিজের কর্তব্য সম্পাদন করা উচিত, গান্ধীজী সর্বদা দেশবাসীর সম্মুখে এই উপদেশ দিতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, কাজ যতই বড় হোক না কেন, নিষ্ঠা এবং দৃঢ়তার সঙ্গে যদি প্রত্যেক মানুষ অপরের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়ে নিজের কর্তব্যটুকু সম্পাদন ক'রে যায়, তা হ'লে একদিন সকলের পক্ষে সিদ্ধিলাভ হবেই হবে।

১৯৪৬ সনে নোয়াখালি জেলায় দাঙ্গার পর গান্ধীজী শ্রীরামপুর নামে একটি গ্রামে নূতনভাবে সাম্প্রদায়িক সমস্তা সমাধানের ব্রত গ্রহণ করেন। সে-সময়ে তিনি স্থির করলেন যে, তাঁর পক্ষে বাংলা ভাষা শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। প্রতিদিন ভোরবেলা প্রার্থনার পর তিনি একখানি বাংলা শিক্ষার বই নিয়ে খানিকক্ষণ পড়তেন এবং হাতের লেখা লিখতেন। ১৯৪৬ সনে ভারতের রাজনৈতিক গগন ঘনঘটাৎ আচ্ছন্ন ছিল এবং মুহম্মদ জারিদিকে ঘৃণনা ঘটছিল। এই সকল ঘটনার প্রতি গান্ধীজী নোয়াখালি হতেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন এবং কোথায় কংগ্রেস গভর্নমেন্ট অথবা জনসাধারণের পক্ষে কি করা কর্তব্য সে সম্বন্ধে নিরন্তর নির্দেশ দিয়ে যেতেন। তখন তাঁর বয়স ৭৭ পূর্ণ হয়ে ৭৮য়ে পৌছেছে। সেই বয়সেও নূতন ক'রে বাংলাভাষা শেখা বা লেখা অভ্যাস করার ব্যাপারে তাঁর ক্লাস্তি বা উৎসাহের

অভাব ছিল না। এক-একদিন কাজের চাপে গান্ধীজী ভোরের পড়ায় মাত্র পনের মিনিট, কখনও বা শুধু পাঁচ মিনিট সময় নিয়োগ করতেন। কিন্তু কোনও দিন তাঁর বাংলা পড়া বা লেখা বাদ গিয়েছিল বলে মনে হয় না। ৩০শে জাহুয়ারি ১৯৪৮ সন, বিকালবেলা যেদিন আমরা তাঁকে হারাই, সেদিনও নিয়মিতভাবে তাঁর বাংলা লেখা চলেছিল। শেষের দিনের লেখা পাতাটুকু সম্বন্ধে গান্ধী-জ্বতি-মন্দিরে রেখে দেওয়া হয়েছে।

নোয়াখালির কথা মনে পড়ে গেল। ১৯৪৬ সনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার পর যখন তিনি বাংলা দেশে উপস্থিত হলেন, তখন ছোট বড় সকলেরই অন্তরে যেন নূতন এক সাহসের সঞ্চার হ'ল। একদিনকার ঘটনা মনে পড়ে। তখন গান্ধীজী নোয়াখালি জেলার গ্রাম হতে গ্রামান্তরে পদব্রজে পরিক্রমা আরম্ভ করেছেন। দাঙ্গার সময়ে বহু টির বিনষ্ট হয়েছিল, অনেক নিরীহ ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছিলেন। এমনই এক বিধ্বস্ত গ্রামের মধ্য দিয়ে যখন তিনি একদিন চলেছেন, তখন কোনও এক পরিবারের কয়েকজন শোকার্ত বিধবা সজলনয়নে তাঁকে প্রণাম করার জন্ত উপস্থিত হলেন। কান্নার স্বামী, কান্নার বা পুত্র দুর্ঘটনার সময়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন। নারীদের মধ্যে একজন মুখপাত্র হিসাবে অগ্রসর হয়ে গান্ধীজীকে প্রণাম ক'রে বললেন, “আপনার কাছে আমরা সাহসনার জন্ত উপস্থিত হয়েছি।” গান্ধীজীর মুখের ভাব যেন কঠিন হয়ে গেল এবং তিনি হিন্দীভাষায় আমাকে বললেন, “এঁদের বুঝিয়ে বল যে আমি বাংলা দেশে সাহসনা দিতে আসি নি, সাহসের সংবাদ দিতে এসেছি।”

গান্ধীজীর দৃঢ় ধারণা হয়েছিল, নিজের ধর্মবিশ্বাস বা স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মরতে প্রস্তুত না হচ্ছি, ততক্ষণ নূতন ভারতবর্ষ গড়ে তোলা আদৌ সম্ভব হবে না।

আর শুধু ধর্মের জন্তই নয়। ১৯২১ সনে যখন গান্ধীজী প্রথম অসহযোগ-আন্দোলন আরম্ভ করেন, তখনই তিনি বলেছিলেন, শহরের বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের মানুষ শুকিয়ে ম'রে যাচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রামের জীবন বাঁচানোর জন্ত আমরা শহরের বৈষয়িক এবং সর্ববিধ সম্পদকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে না পারব, ততদিন পর্যন্ত ভারতের

সাড়ে সাত লক্ষ গ্রামের মানুষকে মহান্ধের সত্যাকারের পর্যায়ে তোলা সম্ভব হবে না।

নোয়াখালিতে থাকার সময়ে তিনি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী অথবা শিক্ষাপ্রজীবী সকলকে আহ্বান ক'রে বলতেন, “তোমরা যে-সকল দরিদ্র মানুষের অর্থ সংগ্রহ ক'রে বিচার্যনের স্বযোগ লাভ করেছ, সেই বিচার দ্বারা গ্রামের জীবনকে, সেখানকার ঘরবাড়ি, পুকুর, পথঘাট, মানুষের স্বাস্থ্য সম্পদ এবং শিক্ষাকে সর্বতোভাবে উন্নত কর। তবেই গ্রামে থাকার নৈতিক অধিকার তোমরা লাভ করবে। যাদের নিকট তোমরা সর্বতোভাবে শ্রী, তাদের শ্রুণ অস্ততঃ আংশিকভাবে পরিশোধ করার চেষ্টা কর।”

দাঙ্গার গৃহহারা ধনী মধ্যবিত্ত অথবা দরিদ্র জনসাধারণ যে-সকল সরকারী অথবা বেসরকারী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের নিকটও গান্ধীজী নিরন্তর একই উপদেশবার্তা বহন ক'রে নিয়ে যেতেন। তিনি বলতেন, “ভগবান স্বয়ং যখন তোমাদের সঞ্চিত ধনকে বিনষ্ট হতে দিয়েছেন, তখন মাথা পেতে এই দুর্ভোগকে আশীর্বাদরূপে গ্রহণ কর এবং নূতন ভাবে নিজের জীবনকে গড়ে তোলার চেষ্টা কর। যারা পরশ্রমজীবী তারা প্রকৃতির নিয়মকে লঙ্ঘন করে। অতএব এই শ্রমশানভূমির মধ্যে যখন নিজের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করার স্বযোগ পেয়েছ, তখন জীবনের এক নূতন ব্রতে তোমরা দীক্ষিত হও।”

যে-সকল ব্যক্তির কখনও দৈহিক পরিশ্রমের অভ্যাস ছিল না গান্ধীজী তাঁদেরও উপদেশ দিতেন, গভর্নমেন্টের প্রদত্ত অম্মের মুখোপেক্ষী তাঁরা যেন কদাচ না হন। সরকার কাজের স্বযোগ দিক, এবং সেই কাজের বিনিময়ে অন্ন বিতরণ করুক। ভাঙা ঘরবাড়ি পুনর্নির্মাণ করা, পানীয় জলের জন্ত পুকুরিগীর সংস্কার করা, ঢেঁকিতে ধান ভানা, নারিকেলের তৈল নিকাষণ করা, পথঘাট মেরামত করা, সূতা কাটা ও কাপড় বোনা প্রভৃতি বহু দক্ষা কাজের ফর্দ নিয়ে গান্ধীজী সরকারের নিকট দাবী জানান যে, এই সকল কাজের ব্যবস্থা ক'রে সরকার যেন আর্ডজনের প্রাণ ও তৎসহ আত্মমর্যাদা রক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করেন।

এ কথা গান্ধীজী জানতেন যে, অকস্মাৎ বিপদের সম্মুখীন হ'লে উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে আদর্শবাদী মানুষ সময়ে সময়ে অসীম সাহসের পরিচয় দিয়ে থাকে, মৃত্যুর ভয়কে অতিক্রম

করতে পারে। কিন্তু প্রতিদিনের উত্তেজনাবিহীন, শাস্ত পরিবেশের মধ্যে, যেখানে আমাদের আচরণে লুক্কায়িতভাবে শোষণের কলুষ সঞ্চিত হয়ে আছে, মনে প্রাণে সে কথা স্বীকার করা অথবা শুদ্ধভাবে শোষণবিহীন সামাজিক ব্যবস্থা রচনা করার জন্ত যে সংকল্প অথবা দৃঢ়তার প্রয়োজন, সে সাহস অসম্ভব করার জন্ত মৃত্যুবরণের চেয়ে কম সাহসের প্রয়োজন হয় না।

অথচ গান্ধীজীর দৃঢ় ধারণা ছিল, এই সাহস ব্যতিরেকে নতুন ভারতবর্ষ অথবা জগতের বৃহত্তর ক্ষেত্রে নতুনতর জীবনপ্রণালী রচনা করা সম্ভব হবে না। এই সর্বোত্তম সাহসের ত্রুটেই তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে সাধারণ মানুষকে আহ্বান করতেন।

মানুষের দুর্বলতার বিষয়ে গান্ধীজীর যে জ্ঞান ছিল না তা নয়। মানুষের শক্তির সম্পর্কে তিনি কোনও ভ্রান্ত বা অমূলক আশাও পোষণ করতেন না। কিন্তু তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল যে আমাদের অন্তরে কতখানি শক্তি লুক্কায়িত আছে, সে সম্বন্ধে আমরা নিজেরাই অচেতন হয়ে আছি।

আশুত্বের বিষয়, অহিংসার ত্রুটে গান্ধীজী মাতৃজাতিকে আদর্শস্থানীয়া ব'লে মনে করতেন। অপরের হৃদয়কে জয় করার জন্ত যে সংঘম ও তিতিকার প্রয়োজন, হিংসার অন্তকে সংবরণ করার জন্ত মানুষের প্রতি যে অনাবিল প্রেম ও অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস রাখার প্রয়োজন, তার জন্ত মাতৃজাতিকেই গান্ধীজী পুরুষের চেয়ে উত্তম অধিকারী ব'লে বিবেচনা করতেন।

গান্ধীজীর নিজের চরিত্রের মধ্যেও দীর্ঘদিনের অহিংস-সাধনার ফলে মাতৃস্বহৃদ কতকগুলি গুণের বিকাশ হয়েছিল। গান্ধীচরিত্রের ব্যাখ্যান সমাপ্ত করার পূর্বে দুটি ক্ষুদ্র ঘটনা এখানে উপস্থিত করব।

নোয়াখালিতে অবস্থানের সময়ে ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের বিষয় নিয়ে ইংরেজ গবর্নমেন্টের সঙ্গে তখন কুট রাজনীতিক বন্দ চলেছে। গান্ধীজীর মন কখনও চিন্তাগ্রস্ত, কখনও বিষন্ন। এইরূপ অবস্থায় একদিন জর্নৈক রুগ্ন ভদ্রলোক শিবিরে উপস্থিত হয়ে আমাদের নিবেদন করলেন, “আমি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে এসেছি। গান্ধীজী দেশের কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। এমন অবস্থায় তাঁর কাছে নিজের সামান্য দুঃখ নিয়ে এসেছি। আমি বাত-

রোগগ্রস্ত। শুনেছি, তিনি প্রাকৃতিক চিকিৎসাবিদানে পারদর্শী। কিন্তু তাঁর সঙ্গে নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রয়োজনে দেখা করা কি উচিত হবে?”

আমরা গান্ধীজীর কাছে জিজ্ঞাসা করতে গেলাম, তিনি শোনামাত্র প্রশ্ন করলেন, “তোমরা রোগীকে বসতে দিয়েছ তো?” আমরা অবশু যথোচিত ব্যবস্থা করেছিলাম।

আধঘণ্টাকাল পরে শরীরের ব্যাধির সম্বন্ধে পথ্য, স্নান, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে লিখিত নির্দেশ নিয়ে ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে ব'লে গেলেন, “আমার মত লোকের জন্ত কেউ যে এত যত্ন, এত চিন্তা, এত সহায়কৃতি দেখাতে পারেন, এ কথা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।”

আর একটি ঘটনা। জর্নৈক যুবক এক যুবতীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গান্ধীজীর নিকট কাতরভাবে চিঠি লেখেন, তিনি যেন যুবকের পিতার অনমনীয় মনোভাবকে শিথিল করার ব্যাপারে সহায়তা করেন। চিঠিখানি গান্ধীজীকে শোনানোর পর যখন আমি ছিঁড়ে ফেলে দেবার ব্যবস্থা করছি, তখন তিনি সম্বন্ধে আমার কাছ থেকে সেটি চেয়ে নিলেন এবং নিজের হাতে সেদিনই তাঁর উত্তর লিখলেন। তিনি যুবকটিকে লিখেছিলেন, “তুমি নিশ্চয়ই পিতার আশ্রয়ে রয়েছ। আমার উপদেশ, তুমি বাইরে এসে নিজের পায়ে দাঁড়াও। যখন স্বাধীন হয়ে দাঁড়াতে পারবে, তার পর যদি বিবাহে আমার আশীর্বাদ চাও, আমি সর্বাস্তঃকরণে আশীর্বাদ করব।”

পরবর্তী কালে গান্ধীজীর নিকট এই চিঠিখানি লেখার হেতু জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, “যে যুবক নিজের জীবনের একটি সম্বন্ধে পথহারা হয়ে গেছে, তাকে যদি বলি—দেশের জন্ত আত্মনিবেদন কর, তা হ'লে তার কানে এ ধর্মোপদেশ প্রবেশও করবে না। যদি আমার সামান্য সময় ব্যয় ক'রে তার ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানে আমি কিছু মাত্র সহায়তা করতে পারি, সেই তো আমার সকলের চেয়ে বড় সেবা।”

বস্তুতঃ কঠোরের সঙ্গে একরূপ নমনীয়, মাতৃস্নেহের সমাবেশ গান্ধীজীর ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়েছিল। এই বিচিত্র কোমলতার জন্ত তাঁর বস্ত্রের মত কঠিন সংকল্প ও সংগ্রাম কখনও মানুষকে দহন ক'রে নি, বরং স্বীয় প্রসাদে সমগ্র ভারতের চিত্তকে সমুজ্জ্বল ও শক্তিমান ক'রে তুলেছিল।

শেষ পর্যন্ত গ্র্যান্ট স্ট্রীটেই একটা ফ্ল্যাট পাওয়া গেল। রাস্তাটা খুব বেশী লম্বা নয়—ধর্মতলার ট্রাম-রাস্তা থেকে শুরু হয়ে গ্র্যান্ট স্ট্রীট শেষ হয়েছে স্বরেন্দ্র ব্যানার্জি রোডের গায়ে। একমাত্র স্বরেন্দ্র ব্যানার্জি নামটাই পরিচিত, নইলে ও-অঞ্চলের কোন কিছুই চেনেন না অধ্যাপক অধিকা গুপ্ত। রাস্তার দু'ধারে সারি সারি দোকান। কাপড়ের দোকানই বেশী। সাইনবোর্ড প'ড়ে প'ড়ে অধ্যাপক অধিকা গুপ্ত বুঝতে পেরেছেন যে, এখানে বাঙালীর দোকান একটিও নেই। বাঙালী-দোকান তো দূরের কথা, গ্র্যান্ট স্ট্রীটের রাস্তা দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশজন বাঙালী যাওয়া-আসাও করে না। একতলার দোকান, দোতলা আর তিনতলায় সব ফ্ল্যাট। প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটে অরাজালীর আড্ডা—অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের ভিড়ই সব চেয়ে বেশী। দিল্লীওয়াল মুসলমান কিংবা পার্সীদের ভিড়ও কম নয়। অধ্যাপক অধিকা গুপ্ত গ্র্যান্ট স্ট্রীটের প্রত্যেকটা বাড়ির দোতলা, তিনতলা এবং চারতলা পর্যন্ত উঁকি দিয়ে এসেছেন, না, কোথাও একটি বাঙালীর মুখ তিনি দেখতে পান নি।

গ্র্যান্ট স্ট্রীটের কোন ফ্ল্যাটেই বাঙালী থাকে না। এখানকার রাস্তার ভিথিরীগুলো পর্যন্ত অরাজালী। এই ধরনের এতগুলো স্থিতি এখানে আছে ব'লেই অধিকা গুপ্ত বহু চেষ্টার পরে এখানে একটা ফ্ল্যাট পেয়েছেন। বি.এ. কিংবা এম.এ. পরীক্ষার প্রথম হয়ে পাস করবার জন্তে এত বেশী চেষ্টা করতে হয় নি তাঁকে। কিন্তু একটা ফ্ল্যাট খুঁজে বার করতে তিনি কিই না করলেন! মাইনের টাকা থেকে দশ পারসেন্ট টাকা চ'লে গেল দালালের পকেটে। তিনি রিকশাতে চেপে ঘুরে বেড়ালেন প্রায় গোটা কলকাতাটা। হঠাৎ অসুস্থ হওয়ার কারণ দেখিয়ে তিনি কলেজ থেকে ছুটি নিলেন ফ্ল্যাট খোঁজবার জন্তে। বাঙালীশূন্য পাড়ায় তাঁর একটা ফ্ল্যাট চাই। চীনেদের সঙ্গে থাকতেও তাঁর আপত্তি ছিল না। কিন্তু চীনেপাড়াতাই বা ফ্ল্যাট কই? শেষ পর্যন্ত গ্র্যান্ট স্ট্রীটে তিনি জায়গা পেলেন। দুখানা পাশাপাশি ঘর। সামনে-পেছনে বারান্দা। পেছনের বারান্দাটা ডাইনিং-রুম হিসেবে ব্যবহার করা চলে। বেশ

ভাল ব্যবস্থা। সমাজ-টমাজের ঝামেলা নেই। আত্মীয়-স্বজনের যাওয়া-আসার রাস্তা বন্ধ। কে বিশ্বাস করবে যে, অধিকা গুপ্ত গ্র্যান্ট স্ট্রীটের ফ্ল্যাট-বাড়িতে বাস করেন? তাঁর কলেজের প্রধান অধ্যাপক পর্যন্ত অধিকা গুপ্তের নতুন ঠিকানা জানেন না। কলেজের সহকর্মীরা জানেন যে, তিনি হারিসন রোডের 'পাশালা'তেই বাস করছেন। পাশালায় বন্ধুরা জানেন যে, তিনি বালিগঞ্জের দিকে উঠে গেছেন। বালিগঞ্জের দিকে তিনি উঠে যেতে পারতেন। কিন্তু তাঁর শুরুর শ্রীধরীকুমার দাশ ঐ অঞ্চলে থাকেন ব'লে অধিকাবাবু গোটা বালিগঞ্জকেই বর্জন করেছেন। শুরুরবাড়ি থেকে দূরে না থাকলে তাঁর অসুবিধে হ'ত অনেক। সামাজিক নিয়ম মানতে হ'ত তাঁকে। তাতেও অধিকা গুপ্তের নিজের খুব একটা ভীষণ রকমের বিপদ কিছু হ'ত না—বিপদ হ'ত অতসীর। অতসী হচ্ছে তাঁর স্ত্রী। স্বধীর দাশের কন্যা। একমাত্র সন্তান। শ্রীধরী দাশ হচ্ছেন স্বরাষ্ট্র বিভাগের কি এক হোমরা-টোমরা অফিসার।

দুখানা পাশাপাশি ঘর। দুটোই শোবার ঘর। দক্ষিণ দিকের ঘরখানা অতসীর, পুরোটাই অতসীর। উত্তর দিকের ঘরটাতে থাকেন অধিকা গুপ্ত। এক কোণায় একটা ফোল্ডিং খাট। ইচ্ছে করলে দু'মিনিটের মধ্যেই খাটখানা গুটিয়ে নিয়ে অধিকা গুপ্ত নিরুদ্ধেশ হয়ে যেতে পারেন। নিরুদ্ধেশ হয়ে যাবেন ব'লে মনে মনে একবার তিনি ঠিক ক'রে রেখেছিলেন। শুরুরকে তিনি আজ আর ভয় করেন না। কংগ্রেসী আমলের স্বরাষ্ট্র বিভাগের বড় কর্তা তো কলকাতার বাড়িওয়ালার চেয়েও নরম মাহুষ। তবে? তবে তিনি নিরুদ্ধেশ হয়ে যান নি কেন?

দুখানা পাশাপাশি ঘর, ঘোল ফুট বাই দশ ফুট। পাঁচ ফুট বাই তিন ফুটের মত ছোট ঘর হ'লেও অধিকা গুপ্তের অসুবিধে হ'ত না। গা এলিয়ে তিনি শুয়ে থাকেন ফোল্ডিং খাটের ওপর। কোন বিশেষ দেশে কিংবা কোন বিশেষ ঘরে তিনি শুয়ে আছেন ব'লে মনে হয় না তাঁর। শুতে হয় ব'লে শুয়ে থাকেন, ঘুমতে হয় ব'লে ঘুমন।

ঘরের এক কোণায় তিনটে কাঠের বাক্স সাজানো রয়েছে। বেশ বড় বড় বাক্স তিনটে। বাক্সগুলোতে বই

আছে। বেশীর ভাগ বই তাঁর ইতিহাসের। অধিকা গুপ্ত কলেজ স্ট্রিটের কলেজে ইতিহাস পড়ান। গ্র্যান্ট স্ট্রিটে উঠে আসবার পরে বাক্সগুলো বন্ধই আছে। নতুন ক'রে বিজ্ঞা অর্জন করবার প্রয়োজন হয় নি তাঁর। প্রয়োজন বোধ করেন নি অধিকা গুপ্ত।

দক্ষিণ দিকের ঘরটা অতসীর। ছোটো ঘরের মাঝখানে একটা দরজা। রাত্রে শোবার সময় অধিকা গুপ্ত এদিক থেকে দরজায় খিল লাগিয়ে রাখেন। অতসী প্রথম দু-একদিন আপত্তি করেছিল বটে, কিন্তু অধিকা গুপ্ত তাতে কান দেন নি। বিয়ের পর থেকে অতসীকে আলাদা ঘরে স্ততে হ'ল বাধ্য হয়ে। বাধ্য করলেন অধ্যাপক অধিকা গুপ্ত। তাঁর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অতসী কোনদিনও পারে নি অধিকাবাবুর ঘরে প্রবেশ করতে। প্রবেশ করতে পারে নি মানে, মার্করাতে প্রবেশ করতে পারে নি। দিনের বেলায় কোন অসুবিধে হয় না, দরজা খোলাই থাকে। দরজা খোলা থাকে বটে, কিন্তু অধিকাবাবু থাকেন না। বেলা আটটা বাজতেই তিনি চান ক'রে বেরিয়ে পড়েন বাইরে। গ্র্যান্ট স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে খাওয়াদাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। তিনি বাইরের হোটেলেই খেয়ে আসেন। অতসীর খাবার আসে টিফিন-কেরিয়ারে ক'রে। আসে হোটেল থেকেই।

আজ অতসীর বাবা রাত প্রায় নটার সময় হঠাৎ অতসীকে এসে নিয়ে গেছেন বালিগঞ্জে। অধিকাবাবু তখন গ্র্যান্ট স্ট্রিটে ছিলেন না। থাকলেও তিনি স্বপ্নরূপে বাধা দিতেন না। এ সময় মেয়ে তো বাপের বাড়িতে যাবেই। এ সময় মানে, সন্তান হওয়ার সময়। অতসীর সন্তান হওয়ার সময় হয়েছে।

রাত দশটার সময় তিনি ফ্ল্যাটে ফিরে এলেন। বাইরের ফটকে বাড়িওয়ালার দরওয়ান ব'সে ছিল। অধিকাবাবু দরওয়ানের কাছেই খবর পেলেন যে, অতসী তার বাবার সঙ্গে চ'লে গেছে বালিগঞ্জে। ঘরের চাবিটা দরওয়ানের হাত থেকে নিয়ে নিলেন অধিকাবাবু। অতসী যদি চাবিটা সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেত তাতেও কোন অসুবিধা হত না তাঁর। অধিকাবাবুর পকেটে ডুপ্লিকেট চাবি আছে।

ভালা খোলবার আগেই, সিঁড়ির ওপরে দেখা হয়ে গেল

বাজাজ সাহেবের সঙ্গে। কুন্দনলাল বাজাজ। পাঞ্জাবী। অধিকাবাবুর ডান পাশের ফ্ল্যাটে থাকেন। পশ্চিম পাঞ্জাবের মানুষ। লাহোরে তাঁর মস্তবড় কারবার ছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার সময় তিনি লাহোরেই ছিলেন। মস্ত ধনী এবং মানী লোকই ছিলেন কুন্দনলাল বাজাজ। তারপর? তারপর ঘরবাড়ি, টাকাপয়সা সব কিছু ফেলে তাঁকে ঐকদিন পালিয়ে আসতে হ'ল ভারতবর্ষে। সঙ্গে তাঁর কেবল বউ ছিলেন। বউকে সঙ্গে নিয়েই তিনি পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এলেন। গভর্নমেন্টের সাহায্য ছাড়াই পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করলেন তিনি—যে-কোন রকম কারবারে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলেই তাঁর আত্মসম্মান বাঁচে। কোথাও কিছু হ'ল না। দিল্লী কানপুর বোম্বাই কোথাও তিনি কিছুই করতে পারলেন না। লজ্জায় এবং অপমানে মুখের সাদা রঙ তাঁর কিঞ্চিৎ কালো হয়ে গেল। লজ্জা এবং অপমান থেকে তিনি শেষ পর্যন্ত মুক্তি পেলেন কলকাতায় এসে। কারবার খুললেন এখানে। পুরনো লোহার কারবার। কারবার খুলতে সাহায্য করলেন আরও দশজন পাঞ্জাবী। দ্বিতীয় মাস থেকেই তাঁর মুনাকা আসতে লাগল। পরিশ্রম, পুরুষকার এবং পুঁজি থাকলেই যে কলকাতায় কারবার ভাল চলে তেমন মস্তব্য বাজাজ সাহেব প্রায়ই প্রকাশ করেন অধিকাবাবুর কাছে। বাঙালীরা তবে ব্যবসা করতে পারে না কেন? গ্র্যান্ট স্ট্রিটের এই দোতলার ফ্ল্যাটে ব'সে অধিকাবাবু প্রশ্নটার জবাব খোঁজেন। কুন্দনলাল বাজাজদের দেখে দেখে প্রশ্নটার জবাব তিনি পান। পান, কিন্তু প্রকাশ করেন না।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসতেই বাজাজ সাহেব বললেন, আপনাকে কোনে কে যেন ডাকছেন। দোতলায় সাতটা ফ্ল্যাট। কোন ফ্ল্যাটেই ফোন নেই। ফোন আছে কেবল বাজাজ সাহেবের ঘরে। অধিকাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, বহীনজী কি ঘরে আছেন? বাজাজ সাহেবের বউকে বোন ছাড়া কি ব'লেই বা ডাকবেন তিনি? বাজাজ সাহেব সিঁড়ি দিয়ে নীচের দিকে নেমে গেলেন। নেমে যেতে যেতে বললেন, ইয়া, ইয়া—আপনি যান। আমার এক শালী এসেছে দিল্লী থেকে। দাদার সময় লাহোর থেকে ওকে গুওয়ারা ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল।

ছ মাস পরে আমরা ওকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসি।
বড় ভাল স্নেহে।—এই ব'লে তিনি নেমে গেলেন নীচে।

মেয়ে ভাল কি খারাপ অধিকাবাবু তা নিয়ে মাথা ঘামাবার
চেষ্টা করলেন না। তিনি এসে দাঁড়ালেন বাজাজ সাহেবের
ঘরের সামনে। আঙুল দিয়ে টোকা মারলেন দরজায়।
দু-তিনবার টোকা মারতেই দরজা খুলে গেল। দরজা
খুলে দিলেন বাজাজ সাহেবের শালী।

অধিকাবাবু দেখলেন মেয়েটিকে। বোম্বাই কিংবা
কলকাতার যে-কোন ফিল্মের অভিনেত্রীর চেয়ে অনেক
ভাল দেখতে। সাধারণ ভাল নয়, মেয়েটি খুবই সুন্দরী।
বাজাজ সাহেবের স্ত্রী বোন ব'লে বোঝা যায় না।

ইতিহাসের অধ্যাপক অধিকা গুপ্ত হস্তকর হিন্দী
ভাষায় প্রশ্ন করলেন, আমায় কি কোনে কেউ ডাকছে?

পাশের ঘর থেকে বাজাজ সাহেবের বউ বেরিয়ে এলেন
এই সময়। বললেন, ভেতরে আসুন ভাই সাহেব।

আমার টেলিফোন—

হ্যাঁ, ভাই সাহেব, টেলিফোন এসেছিল। খবরটা
আমি কাগজে লিখে রেখেছি।

কি খবর?—জিজ্ঞাসা করলেন অধিকাবাবু।

আপনার স্ত্রী বালিগঞ্জে যায় নি।

আর কোন খবর নেই?—বিস্ত্রির স্বর ফুটে বেরল
অধিকাবাবুর গলার স্বরে।

বাজাজ সাহেবের স্ত্রী এবার অধিকাবাবুর হাতে একটা
টুকরো কাগজ গুঁজে দিয়ে বললেন, নার্সিং হোমে গেছে, ঐ
কাগজটাতে তার ঠিকানা লেখা আছে।

নিজের ঘরে ফিরে এলেন অধিকাবাবু। ফোল্ডিং
খাটের ওপর শুয়ে পড়লেন তিনি। শুয়ে রইলেন প্রায়
এক ঘণ্টা। গ্র্যান্ট স্ট্রিটের কোথায় যেন ঘড়িতে ঘণ্টা
বাজার শব্দ হ'ল। প্রত্যেকটা শব্দ তিনি শুনলেন। রাত
বারোটা বাজল। তেইশ পার হয়ে চব্বিশ বছর চলছে
তার, বিছানায় শুয়ে তাও শুনলেন তিনি।

ঘুম আসছে না অধিকাবাবুর। গ্র্যান্ট স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে
অধিকাবাবুর ঘুম হয়তো কোনদিনই আসবে না। তিনি
এবার উঠে বসলেন। রাস্তার দিকের বারান্দায় এসে
দাঁড়ালেন তিনি। এত রাত্রে গ্র্যান্ট স্ট্রিটে আর লোক
নেই। থাকলেও তিনি দেখতে পেতেন না। চোখ

দুটো তাঁর কি রকম ঝাপসা হয়ে এল। বোধ হয় চোখের
জল তিনি আর ঝুখতে পারলেন না।

প্রায় সাত মাস এক সঙ্গে থাকবার পর অভিনী আজ
চলে গেল। বালিগঞ্জে সে যেতে পারে নি। গেলে
নিশ্চয়ই অনেক রকমের কথা উঠত। সেই জগ্রেই
অভিনী বাবা ওকে এখান থেকে সোজা নিয়ে তুলেছেন
নার্সিং হোমে। বালিগঞ্জের কেউ জানতেও পারবে না
যে, অভিনী নার্সিং হোমে গেছে। গ্র্যান্ট স্ট্রিট থেকে
বালিগঞ্জ তিন কি চার মাইল দূর বটে। কিন্তু বাংলার
সমাজ-জীবনে গ্র্যান্ট স্ট্রিটের পরিচয় কিছু নেই। নেই
ব'লেই অভিনী সাতটা মাস এখানে কাটিয়ে গেল খুবই
পরিচ্ছন্নভাবে। সামাজিক কুসংসার ময়লা ওর গায়ে লাগল
না একদিনের জন্তেও। লাগতে দিলেন না অধ্যাপক
অধিকা গুপ্ত। গ্র্যান্ট স্ট্রিটে ফ্ল্যাট খুঁজে পেয়েছেন তিনি-ই।
এবং গ্র্যান্ট স্ট্রিটই রক্ষা করল অভিনীকে সব রকম কুসংসার
আবাত থেকে। অভিনী বাবা এবং নতুন-পরিচিত ডাক্তার
অন্নদা সেন ছাড়া এখানকার ঠিকানা আর কেউ জানে না।
গত সাত মাসের মধ্যে ডাক্তার সেন এখানে দুবার
এসেছেন অভিনীকে পরীক্ষা করবার জন্তে। রাস্তার দিকের
বারান্দায় দাঁড়িয়ে অধিকাবাবু ভাবলেন যে, ডাক্তার
সেনের নার্সিং হোমেই সম্ভবতঃ অভিনীকে নিয়ে গেছেন
স্বখীরবাবু।

বা দিকের ফ্ল্যাটে একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেমসাহেব
থাকেন। অধিকাবাবু চেনেন তাঁকে। তিনিও চেনেন
অধিকাবাবুকে। পাশাপাশি ফ্ল্যাট, না চিনবার কারণ নেই।
বারান্দায় দাঁড়িয়ে অধিকাবাবু দেখলেন যে, মেমসাহেবটি
এখনো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে পাউডার মাখছেন।
রাত এখন বারোটার বেশী, বোধ হয় একটা হবে। খুবই
আশ্চর্য হয়ে গেলেন অধ্যাপক অধিকা গুপ্ত। এত রাত্রে
এই অল্পবয়সের মেয়েটি মুখে পাউডার মাখেন কেন? কে
আসবে তাঁর কাছে? রাস্তায় তো একটুও লোক নেই!

পাউডার মাখা শেষ ক'রে মেমসাহেবটিও তাঁর ঘরের
সামনে এসে দাঁড়ালেন, রাস্তার দিকের বারান্দায়। অধিকা-
বাবু স'রে যাচ্ছিলেন, মেয়েটি সহসা জিজ্ঞাসা করলেন,
কোথায় যাচ্ছি মিস্টার গুপ্ত?

অ্যা? তুমি আমার নাম জান নাকি?

জানি।—লিপ-ষ্টিক মাথা ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে তুললেন মেমসাহেব।

অধিকাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আমার নাম জানলে কি ক'রে?

কেন, বাড়িওয়ালার দরওয়ানের কাছে।

বাড়িওয়ালার দরওয়ানের কাছে আমার নাম জানতে গেলে কেন?

না জানলে আমাদের চলবে কি ক'রে মিস্টার গুপ্ত। ইচ্ছাকৃত চাপা-হাসির প্রয়াস পেল মেমসাহেবের মুখে, থানিকটা চ'লে পড়বার ভঙ্গী ক'রে তিনিই পুনরায় বললেন, তোমার বউ তো আজ চ'লে গেলেন—

তুমি জানলে কি ক'রে?

কেন, আমি নিজের চোখেই তো দেখলাম। হাত-পা-গুলো রোগা-রোগা—আর পেটের দিকটা—ও কি, মিঃ গুপ্ত, ভেতরে চ'লে যাচ্ছ কেন? ক'মাস হ'ল তাঁর?

প্রশ্নটার জবাব দেবেন কি না ভাবছিলেন অধিকাবাবু। ভেবে নিয়েই তিনি জবাব দিলেন, দশ মাস। তাই নার্সিং হোমে ভতি হয়েছে আজই। তোমার কোন ছেল-পিলে নেই?

মাই গুডনেস! ছেলেপিলে থাকলে আমাদের কাছে লোক আসবে কেন? আজ তো একজনও কেউ এল না। মিঃ গুপ্ত, তোমার খুব খারাপ লাগছে আজ, না? বড্ড একা একা বোধ হচ্ছে, না? আমিও আজ একা। আসব তোমার কাছে?

একটু বুকে দাঁড়িয়ে অধিকাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আমার কাছে কেন? কি চাও?

সঙ্গ।

সঙ্গ? ভুরু কঁচকে অধিকাবাবুই বললেন, আর—

বাধা দিয়ে মেমসাহেব বললেন, আর কি চাইব? মানে, ক'মাস থেকে তো তুমি—

ক'মাস থেকে নয় মেমসাহেব, একবারে প্রথম মাস থেকেই।

আঁ্যা? প্রথম মাস থেকে কি ক'রে হয়? মিঃ গুপ্ত, কথারটা মানে কি?

অত মানে জানতে চেয়ে না। যাক এসব কথা। আমি ঘুমুতে যাচ্ছি, আমার ঘরে এসে তোমার কোন লাভ হবে না।

লাভ চাই নে মিঃ গুপ্ত, লাভ তো প্রত্যেক দিনই হয়।

আজ না হয় কয়েক ঘণ্টা লোকসানই হবে।

তোমার লোকসানের প্রতি লোভ থাকতে পারে, আমার নেই। জান, আমার বয়স মাত্র চব্বিশ?

বাই জোভ! আমিও তোমার চেয়ে বড়, আমার পঁচিশ।

এই ব'লে মেমসাহেবটি হাতের ক্রমাল দিয়ে ঠোঁটের রঙ যেন একটু একটু ক'রে উঠিয়ে ফেলতে লাগলেন। অধিকাবাবু মেমসাহেবের দিকে চেয়ে বললেন, তুমি এবার ঘুমুতে যাও, আমিও চলি।

আমি তো রাজিতে ঘুমই না, ঘুমই দিনের বেলা।

তা হ'লে তুমি কি করবে এখন?—জিজ্ঞাসা করলেন অধিকা গুপ্ত।

আমার কথা ছেড়ে দাও। কিন্তু খালি বিছানায় তোমার কি ঘুম আসবে, গুপ্ত?—বারান্দার শেষ-সীমায় অধিকাবাবুর দিকে এগিয়ে এলেন মেমসাহেব।

বিছানা তো আমার খালি অনেক দিন থেকেই।

কেন?

সে অনেক কথা, তোমায় বলা যায় না।

গ্র্যান্ট স্ট্রীটে বাস করবার সুবিধে এই যে, এখানে সব কিছুই বলা যায় এবং করাও যায়।—এই ব'লে মেমসাহেবটি এবার ঠোঁটের রঙ সব বেশ ভাল ক'রেই তুলতে লাগলেন। অধিকা গুপ্ত মেয়েটির গলার সুরে এবং মুখের ভাষায় থানিকটা ভদ্রতার আভাস পেলেন। পেলেন ব'লেই তাঁকে একেবারে উপেক্ষা করতে পারলেন না।

গ্র্যান্ট স্ট্রীট বালিগঞ্জ নয়। নয় এমন কি বাংলা দেশের অংশও। এখানে কেউ কাউকে উপেক্ষা করে না। অধিকাবাবুও তাই মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে বললেন, ঠোঁটের রঙ সব মুছে ফেললে, আর কেউ আসবে না বুঝি?

না, সে আর আসবে না।

সে? সে কে? মানে, বিশেষ কেউ নাকি?

তা তোমায় বলব কেন?—মেয়েটি যেন সহসা গম্ভীর হয়ে গেলেন।

অধিকাবাবু মেমসাহেবের দিকে বেশী ক'রে বুকে দাঁড়িয়ে বললেন, আমার তো রাজে আর ঘুম আসবে না, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার জীবনীটা শুনেছি কিন্তু

ভালই হ'ত। সমস্তটা রাত গল্প করলেও কেউ কোন প্রশ্ন করবে না।

করবে গুপ্ত, কেউ যদি দেখতে পায়। ভাবছ, তোমার আর আমার মধ্যে দূরত্ব বুঝি খুব বেশী? তুমি কি বোকা! হবেই তো, বয়স মাত্র চব্বিশ। এবার আমি চললুম।—চ'লেই যাচ্ছিলেন মেমসাহেব, এমন সময় অধিকাবাবু মুখটা তাঁর পাশের বারান্দার দিকে এগিয়ে নিয়ে বেশ মিষ্টি স্বরেই জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার রাত কাটবে কি ক'রে? বই-টাই কিছু পড়বে? আমার ঘরে অনেক বই।

দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে মেমসাহেব জবাব দিলেন, না, আমার ঘরেও বই আছে।

তোমার ঘরে কি বই মিস্—?

মিস নয়, মিসেস—

মিসেস কি?

তা বলব না। সেইটেই আমার সব চেয়ে বড় সিক্রেট, আর—

আর কি?—হাতীর গুঁড়ের মত মুখ বাড়িয়ে দিলেন অধিকাবাবু গুপ্ত।

আর সেইটেই সবচেয়ে হোলি। গুপ্ত নাইট, গুপ্ত।

দরজাটা বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন তিনি। অধিকাবাবু

যেন শেষ বারের মত তাঁর সঙ্গে কথা কইছেন এমন ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বইটার নাম বললে না তো?

বইটা হচ্ছে হোলি বাইবেল।

বাইবেল? বাইবেল তুমি পেলে কোথায়?

সে ফেলে গেছে, গুপ্ত।—দরজা বন্ধ করলেন মেমসাহেব।

অধিকাবাবু চ'লে এলেন নিজের ঘরে। ব'সে পড়লেন ফোল্ডিং খাটের ওপর। রাত এখন কটা? দুটোর কম নয়, ভাবলেন অধিকাবাবু। বাকী রাতটুকু বোধ হয় আর ঘুম আসবে না। ঘরে তো বই অনেক, কি বই পড়বেন তিনি? এমন একটা বিশেষ রাত্রে কি বই পড়া যায়? আজকের এই রাতটা কাটাবার মত কোন বই কি কেউ লিখতে পেরেছে? না, পারে নি—ভাবলেন অধিকাবাবু। মেমসাহেবটিকে ডেকে নিয়ে এলে কেমন হয়?

সাত মাস পরে অতসী আজ চ'লে গেল। বিয়ের প্রায় এক বছর আগেই অতসীকে চিনতেন তিনি। রবিকরের মাসতুতো বোন অতসী। রবিকর ছিল অধিকাবাবুর সহপাঠী। একসঙ্গে বি. এ. পড়তেন। রবিকর বি. এ. পাস করতে পারল না। পাস করবার জন্তে কোন চেষ্টাও ছিল না তার। রবিকরের বাবা ছিলেন মত্ত ধনীলোক। চারটে না পাঁচটা চা-বাগানের মালিক। বি. এ. পরীক্ষায় ফেল করবার পরে রবিকর তার বাবার অফিসে ঢুকে পড়ল কাজ শেখবার জন্তে। কাজ হয়তো সে সত্যিই শিখছে কিন্তু অধিকাবাবুর সঙ্গে তার আর দেখা হয় না। দেখা হওয়ার সহজ রাস্তা বন্ধ ক'রে দিয়েছে রবিকর নিজেই। আর কেউ না জাহুক, রবিকর আর তার মাসতুতো বোন অতসী নিশ্চয়ই জানে যে, এমন একটা সাংসারিক বিপর্যয়ের জন্তে অধিকাবাবুর কোন দায়িত্বই ছিল না।

অতসীকে ভালবাসতেন তিনি। রবিকর যেদিন তাঁকে প্রথম নিয়ে এল অতসীদের বাড়িতে, সেদিন থেকেই তিনি অতসীকে ভালবাসলেন। প্রথম দর্শনেই প্রেম! অধিকাবাবু থাকতেন বউবাজারের কোন্ একটা রাস্তার মেসে। সেখান থেকে তিনি কলেজ স্ট্রীটে আসতেন এম. এ. পড়তে।

খুঁট ক'রে শব্দ হ'ল দরজায়। কেউ এল না কি? কে আসবে এত রাত্রে? মেমসাহেব নয় তো? চূপ ক'রে ব'সে রইলেন অধিকাবাবু। দরজার দিকে কান পেতে রাখলেন। না, কেউ নয়। আলো জ্বালাবার দরকার নেই। অন্ধকার ঘরে ব'সে অধিকাবাবু ভাবতে লাগলেন আগেকার কথা। কী গরীব সংসারেই না তিনি জন্মেছিলেন! বাবা কাজ করতেন মেহেরপুর জমিদার-বাড়ির কাছারিতে। হিসেবের খাতা লিখতেন। মাস গেলে মাইনে পেতেন ত্রিশ। অধিকাবাবুর বয়স যখন চার, তখন তাঁর মা মারা যান। বিশেষ কিছু অল্পবিস্ত্র হয়েছিল ব'লে অধিকাবাবুর বিশ্বাস হয় না। মা বোধহয় না খেতে পেয়েই মারা গেছেন। ত্রিশ টাকা তিনটে জীবন চলতে পারে না, চললও না, মা মারা গেলেন। বড়ো জমিদার শশাঙ্ক চৌধুরী বাবাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, শুনলুম, তোমার স্ত্রী নাকি ম্যালেরিয়ায় মারা গেলেন?

আজ্ঞে, হ্যাঁ। জবাব দিলেন বাবা।

মেহেরপুরের বড়লোকেরা অনাহার রোগকে ম্যালেরিয়া বলতেন। কী বিচিত্র এ দেশের সমাজব্যবস্থা! যে জমিদার বাবাকে ত্রিশ টাকার বেশী মাইনে দিতেন না, তিনিই আবার অধিকাবাবুকে মাসে মাসে পঞ্চাশ-টাকা ক'রে পাঠাতেন কলকাতায়। মেহেরপুর হাই ইন্ডুল থেকে বৃত্তি পেয়ে ম্যাট্রিক পাস করবার পরে শশাঙ্ক চৌধুরীই তাঁকে টাকা দিয়ে কলকাতায় পাঠালেন আই. এ. পড়বার জন্তে। আই.এ. পরীক্ষায়ও তিনি বৃত্তি পেলেন। বি.এ. এবং এম.এ. পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে পাস করলেন। বড়ো শশাঙ্ক চৌধুরী গেল-বছর মারা গেলেন। মরবার আগে তিনি অধিকাবাবুকে একবার দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যান নি, যেতে পারলেন না। গেল-বছর ঠিক সেই সময় তিনি বিয়ে করলেন অতসীকে। কেবল বিয়ে করেছেন বলে নয়, পাস করবার অল্প দিনের মধ্যেই গেল বছর তিনি কলেজে চাকরি পেয়েছেন বলেও তাঁর মেহেরপুরে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

মেহেরপুরে তিনি যাবেন। অতসীকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে না গেলে বাবাই বা কি বলবেন? তিনি তো আজও বউ দেখেন নি। লোকের মুখ থেকে বাবা কি জানতে পারেন নি যে, তিনি বিয়ে করেছেন? অধিকাবাবু আজও তাঁর বিয়ের কথা বাবাকে জানান নি। জানান নি তার কারণ, অধিকাবাবু মনে করেন যে, তাঁর বিয়ের ব্যাপারটা পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। পাপের স্পর্শ তিনি অশুভব করেন মাঝখানের দরজাটা খুলে ফেললেই। গ্র্যান্ট স্ট্রীটে ঘর বেঁধেছেন বলে তিনি তো পাপপুণ্যের সীমারেখা সব মুছে ফেলতে পারেন না। সামাজিক শাসন কিছু নেই বলে নীতির শাসন উপেক্ষা করবেন কি ক'রে? দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেললেন অধ্যাপক অধিকা গুপ্ত। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সেই কী বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন তিনি!

দু'ঘরের মাঝখানের দরজাটা আজ খোলাই প'ড়ে রয়েছে। অতসী আজ ওখানে নেই। অধিকাবাবু উঠে দাঁড়ালেন, এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। অতসীর ঘরে তিনি কোনদিনও প্রবেশ করেন নি। চব্বিশ বছরের যুবক অধিকাবাবু অতসীর ঘরে ঢোকবার চেষ্টাও করেন নি। অতসীর আন্তরিক আমন্ত্রণ তিনি ভনতে পেয়েছেন। কিন্তু

সে-আমন্ত্রণ তিনি এযাবৎকাল উপেক্ষা ক'রেই এলেন। পাপের প্রশ্রয় তিনি দিতে পারেন না, কারণ পুণ্যের প্রতি লোভ তাঁর অসীম।

দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেললেন অধিকাবাবু। অতসী যখন নেই, তখন পাপও নেই। ঢুকে পড়লেন অতসীর ঘরে। কে যেন তাঁকে আজ ওখানে টেনে নিয়ে গেল। অতসী নয়, এমন কি অতসীর ছায়াও নয়।

সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন তিনি। ড্রেসিং-টেবিলের ওপর প্রসাধনের জিনিসগুলো সব সাজানো রয়েছে। অধিকাবাবু প্রত্যেকটা জিনিস নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগলেন। পাউডারের টিনটা পরীক্ষা করে দেখলেন, পুরোই রয়েছে। ইভনিং ইন প্যারিস? না, এক ফোটা সেন্টও অতসী খরচ করে নি। সাতটা মাস অতসী এখানে কাটিয়ে গেল, কিন্তু কই, মুখে তো এতটুকু ক্রীম সে ব্যবহার করে নি। সাত মাসের মধ্যে একদিনও সে বাইরে যায় নি। এই একটা ঘরের মধ্যে অতসী কাটিয়ে গেল সাতটা মাস! কি ভয়াবহ নিঃসঙ্গ জীবন! মানুষের সংস্পর্শ থেকে আলাদা হয়ে গেল বলেই তো অতসীর উচিত ছিল ঘরের প্রতিটি আসবাব ও বস্তুর সঙ্গে বেশী ক'রে মেলামেশা করা। খুবই বিস্মিত হয়ে গেলেন অধিকাবাবু। এত কষ্টের জীবন কি ক'রে কাটিয়ে গেল অতসী?

তাই তো, ও পাশের ওই শেলফের দিকটা তো তিনি আগে দেখতে পান নি! ওখানে কি? তাড়াতাড়ি ক'রে অধিকাবাবু এগিয়ে গেলেন শেলফের কাছে। অধিকাবাবু দেখলেন যে, শেলফের ওপরে খানিকটা নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। অতসী কি ক'রে যে তাঁর একটা ফোটা ধোঁগাড় করেছে তিনি তা ভেবে পেলেন না। ফোটোর সামনে সাজানো রয়েছে একটা রেকাবি, রেকাবির ওপরে সিঁহরের কোটো এবং কয়েকটা তাজা ফুল। অতসী ফুল পেল কোথায়? কি মনে ক'রে অধিকাবাবু সিঁহরের কোটোটা তুলে নিলেন হাতে। কোটোটা খুলে তিনি দেখলেন যে, ওতে সিঁহরের পরিমাণ খুবই কম। এই ঘরের এত জিনিসের মধ্যে অতসী কেবল সিঁহরটাই নিয়মিতভাবে ব্যবহার করেছে। নাটক? নাটক ছাড়া আর কি, এই মনে ক'রে অধিকাবাবু ড্রেসিং-টেবিলের একটা ড্রয়ার খুলে ফেললেন।

ভীষণভাবে অস্বাভাবিক হয়ে গেলেন অম্বিকাবাবু। মেহেরপুর থেকে তাঁর বাবা তাঁকে চিঠি লিখেছেন। খামের ওপরে তাঁর ঠিকানা লেখা রয়েছে বালিগঞ্জের। বাবা তা হ'লে তাঁর বিয়ের খবরটা জেনে গেছেন। না জানলে তিনি তাঁর শশুরবাড়ির ঠিকানা জানলেন কি করে? বাবা দুঃখ পাবেন ব'লেই তো প্রায় একটা বছর তিনি তাঁর বিয়ের খবরটা তাঁকে দিতে পারেন নি। তাঁকে খবর দিতে সাহস পান নি অম্বিকাবাবু। বৃদ্ধ হওয়ায় তাঁর এক মাত্র সন্তানের এত বড় অন্তরায় সহ্য করতে পারতেন না। হার্ট-ফেল করে মারা যেতেন।

খামখানা তিনি তুলে নিলেন ড্রয়ার থেকে। অতলী চিঠিখানা খুলেই রেখেছিল। চিঠি পড়তে পড়তে অম্বিকাবাবু এত বেশী অস্বাভাবিক হয়ে গেলেন যে, সবটা চিঠি তিনি পড়তে পারলেন না। খানিকটা চিঠি পড়েই তিনি বুঝতে পারলেন যে, অতলী নিজেরই বাবাকে তাঁদের বিয়ের খবর দিয়েছে। এ কি করে সম্ভব হ'ল? অতলী কি তার পাপের কথা বাবাকে জানিয়েছে? না, সবটা জানায় নি। কিন্তু যতটুকু জানিয়েছে তাতেই বা বাবা ওকে ক্ষমা করলেন কি করে? অম্বিকাবাবু ভাবলেন, বাহাদুর বছর বয়সের মাহুম বোধ হয় খুনীকেও ক্ষমা করতে পারে। মৃত্যুকে যে এত কাছে দেখতে পায়, সে তো সবাইকেই ক্ষমা করবে। কিন্তু চব্বিশ বছর বয়সের অম্বিকাবাবু অতলীকে ক্ষমা করবেন কি করে?

অতলীর বিছানার ওপর বসে পড়লেন তিনি। বিছানার দিকে ভাল করে দৃষ্টি দিতে গিয়ে অম্বিকাবাবুর মনে হ'ল, অতলী বোধ হয় এ বিছানা কোনদিনই ব্যবহার করে নি। বিছানার চাদরে তাঁর পড়ে নি এক ইঞ্চিও। অতলী কি তবে গ্র্যান্ট স্ট্রীটে এসেছিল প্রায়শ্চিত্ত করতে?

গ্র্যান্ট স্ট্রীটের কোথায় যেন ঘড়ির আওয়াজ হচ্ছে— একটা, দুটো, তিনটে। বিছানার ওপর গড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে করল অম্বিকাবাবুর। বোধ হয় ঘুম আসবে। খুট ক'রে ও-ঘরের দরজায় শব্দ হ'ল। এত রাত্রে দরজায় টোকা দিচ্ছে কে? ভেতর থেকে দরজা তো বন্ধ ক'রে আসেন নি, সম্ভবত সেই মেমসাহেবটি তাঁর ঘরে ঢুকলেন।

অম্বিকাবাবু অতলীর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর নিজের ঘরের দরজায় সত্যিই কে যেন বাইরে থেকে টোকা

মারছে। দরজা তো খোলা আছে, মেমসাহেবটি ঘরে ঢুকছেন না কেন? মেমসাহেব ব'লেই বোধ হয় তিনি ঘরে ঢুকছেন না। মেমসাহেবেরা যত খাপাপই হোক না কেন, ভদ্রতা কখনো ভুলে যান না। অম্বিকাবাবু দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

দরজা খুললেন অম্বিকাবাবু। মেমসাহেব নন, বাজাজ সাহেবের শালী। হতভম্বের মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। কেমন যেন এলোমেলোভাবে শাড়ি পরেছেন মহিলাটি। হঠাৎ ঘুম ভাঙার জড়তা যেন মহিলাটিকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তুলেছে—আকর্ষণ অস্বাভাবিক করলেন অম্বিকাবাবু।

অম্বিকাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি? এই সময়ে? এই ব'লে হাজা ফোলডিং খাট-টা তিনি টেনে নিয়ে এলেন মহিলাটির দিকে। এনে বললেন, এখানেই বসুন, ঘরে তো চেয়ার-টেবিল কিছু নেই।

মাথা নেড়ে মহিলাটি বললেন, রাত তিনটের সময় আমি আর বসব না, বড্ড ঘুম পাচ্ছে। আমি এসেছিলাম আপনাকে খবর দিতে—

খবর দিতে? এত রাত্রে এখানে, কেবল খবর দিতেই এলেন?

জী, হ্যাঁ। আপনার টেলিফোন এসেছে।

টেলিফোন? ও, বুঝেছি আমার টেলিফোন এসেছে।

চলুন, খুব জরুরী খবর আছে—

জানি, জানি খবর খুব জরুরী, নইলে রাত তিনটের সময় টেলিফোন আসবে কেন? টেলিফোনের রিসিভারটা তো নামানো আছে, আওয়াজ হওয়ার আর ভয় নেই। বাকী রাতটুকু নামিয়েই রাখবেন, নইলে আপনার ঘুম ভেঙে যাবে।—অম্বিকাবাবু মুহুমুহ হাসতে লাগলেন। তাঁর গাঞ্জাকেজে আলোড়ন হচ্ছে। নইলে তাঁর হাসির গায়ে আকাজক্ষার স্পষ্টতা প্রকাশ পেল না।

অম্বিকাবাবুর ব্যবহারে মহিলাটি খুবই বিব্রত বোধ করলেন। তাঁর ভয়ীপতি এবং বোনের খুব বিশেষ বন্ধু ব'লেই তো তিনি এসেছিলেন টেলিফোনের খবরটা পৌছে দিতে। নইলে রাত তিনটের সময় কে আসত অম্বিকাবাবুর ঘরে। গ্র্যান্ট স্ট্রীটে কোন সমাজ নেই বটে, কিন্তু ভদ্রতা আছে। অম্বিকা বাবু ভদ্রলোক বলেই তো তিনি জানেন। তবে?

টেলিফোনে বিনি ডাকছেন, তাঁকে কি বলব?—প্রশ্ন করলেন বাজাজ সাহেবের শালী।

অধ্যাপক বললেন, চলুন, আমি যাচ্ছি।

বাজাজ সাহেবের ফ্ল্যাটেও ছুখানা পাশাপাশি ঘর। প্রথম ঘরখানা বাজাজ সাহেবের শোবার ঘর। সামনের দিকের ঘরখানা তাঁর ড্রইং-রুম ছিল। আজকে থেকে এই ঘরখানাও শোবার ঘর হয়েছে। মিসেস বাজাজের বোনের সঙ্গে এই ঘরে একটা ফোল্ডিং খাট আনা হয়েছে। অধিকাবাবু মহিলাটির পেছনে পেছনে এসে উপস্থিত হলেন এই ঘরে। টেলিফোনের রিসিভারটা হাতে তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যালো, কে?

ও-পাশ থেকে জবাব শুনলেন তিনি, আমি—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার স্বস্তর, আমি।

অধিকাবাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, এত রাত্রে টেলিফোন কেন?

অতনী যে নার্সিং-হোমে এসেছে তুমি কি জান না, অধিকা?

জানি। আমি বলছিলুম কি, দরকার থাকলে আপনি চ'লে এলেই তো পারতেন এখানে। আমি রাত্রিতে ঘুমই না, জেগে ব'লে থাকি।

ওসব পাড়ায় এত রাত্রে যাই কি ক'রে? কি বললে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, গ্র্যান্ট স্ট্রীট যে কলকাতায় তা কি আমি জানি না? কলকাতায় তা ঠিক, তবুও মনে হয় যেন চিনি না। ওসব দিকের ফ্ল্যাটে তুমি থাক ব'লেই তো গ্র্যান্ট স্ট্রীট আমার বাধ্য হয়ে চিনতে হয়েছে। অধিকা—হ্যালো হ্যালো—ও, আমি ডাবলুম লাইনটা কেটে দিলে বৃষ্টি।

কেটে দিতে বাচ্ছিলুম, কিন্তু ঠেকে আবার বিরক্ত করবেন ব'লেই কাটলুম না। উনি এখানে ব'লে আছেন?

উনি? উনি কে?

একজন পাঞ্জাবী যুবতী।—এই ব'লে তিনি দৃষ্টি ফেললেন মিসেস বাজাজের বোনের দিকে। বাংলায় বললেন ব'লেই তিনি বুঝতে পারলেন না। মাথা নীচু ক'রে ফোল্ডিং খাটের ওপর ব'সে রইলেন, মিসেস বাজাজের বোন। অধিকাবাবুর কথা শুনে ওপাশ থেকে তাঁর স্বস্তর সুধীরকুমার দাশ জিজ্ঞেস করলেন, ওখানে তো

বাজাজ সাহেবের বউ আছেন, যুবতী পাঞ্জাবী আবার কোথা থেকে এল?

দিল্লী থেকে। হ্যালো, হ্যালো—আমি ডাবলুম লাইনটা কেটে দিলেন বৃষ্টি। ও কি রাগ করছেন কেন? ছি-ছি, আমার রাস্কেল-বললেন? মেয়েটি তো মিসেস বাজাজের বোন। এটা তার বেড-রুম।

হ্যালো, তোমার কি লজ্জা ব'লে কোন জিনিসই নেই? অতনীর এতবড় সর্বনাশ তুমি করেছিলে—তোমার কি সে সব কথা মনে নেই নাকি? তোমার মত এতবড় একটা শিক্ষিত জন্ত ব্রিটিশ আমলেও আমার চোখে পড়ে নি।

হ্যালো, মনে রাখবেন, এটা ব্রিটিশ রাজত্ব নয়। স্বরাষ্ট্র বিভাগের হোমরা-চোমরা অফিসার ব'লে আর আমার, আপনি যা-তা গালাগালি দিতে পারবেন না। আমি আপনার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনব।

আদালতে গিয়ে বিচারকের সামনেই তোমায় আমি আরও দশবার শিক্ষিত জন্ত ব'লে গালি দেব। ক্রট!

ক্রট আর জন্ত তো একই—হ্যালো, আর পনেরো বছরের মধ্যে ইংরেজী উঠে যাবে, তখন কোন ভাষায় গাল দেবেন?

কেন, ইংরেজীর বদলে তো হিন্দী আসবে—হ্যালো, কে? অধিকা? শেম! অতনীকে পড়াতে এসে কি করেছিলে মনে নেই? ওর বেড-রুমে যদি তোমায় ঢুকতে না দিতুম! যাক সেসব কথা। মিসেস বাজাজের বোন কি বিবাহিতা?

খুব নরম হ'লে অধিকাবাবু জবাব দিলেন, না।

কেন?

বর পাওয়া যাচ্ছে না বোধ হয়। সব দেশেই কি আমার মত আহাম্মক পাওয়া যায়?

কেন, কি হয়েছিল মেয়েটির?

রাজনীতির ঘোলা জলে ডুবে গিয়েছিল, স্ত্রীর। ওই যে কখন দেশ স্বাধীন হ'ল না কি? সেই সময় লাহোরে দাঙ্গা হয়েছিল, মনে পড়ে ছজুর? আপনার পুরনো মালিক ইংরেজের হাত ছিল এই সব হত্যাকাণ্ডের মধ্যে। মেয়েটি অবশিষ্ট মরে নি। ছ মাস পরে পশ্চিম-পাঞ্জাবের কোন এক পাড়াগাঁ থেকে মেয়েটিকে বাজাজ সাহেবরা উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসেন। যাক, রাত তিনটের সময় আপনি আমার ডেকেছেন কেন?

ছি-ছি, তোমার লজ্জা করে না, অধিকা? তোমার বউয়ের জন্তে আমরা সবাই রাত জাগছি এখানে। বোধ হয় অপারেশন করতে হবে। ডাক্তার সেন ওকে ভাল করে পরীক্ষা করছেন। ঘর থেকে বেরুলে তোমায় ফলাফল সব জানাব, হ্যালো—এই যে ডাক্তার সেন আসছেন। তিনি নিজেই তোমার সঙ্গে কথা কইবেন। হ্যালো—অতসীর কাছে শুনলুম, গত সাত মাসের মধ্যে তুমি নাকি ওর সঙ্গে এক দিনও কথা বল নি? এর পরেও অতসীর মত মেয়ে কি করে যে তোমার এত সুখ্যাতি করে ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই! অতসী আমার একমাত্র সন্তান।

ডাক্তার সেন কোথায় গেলেন?

এই যে আসছেন, ধরো। হ্যালো—গলার স্বর খুব নীচু করে তিনিই আবার বললেন, অধিকা, ডাক্তার সেন আমাদের নতুন পরিচিত মানুষ। ঘরের কথা তিনি কিছুই জানেন না। তাঁকে যেন ভুল করে কোন রহস্য ফাঁস করে দিও না। ভুল করে অন্তত বিয়ের সন তারিখ কিছু প্রকাশ করে বস না। অধিকা, বাপ হওয়ার ঝুঁকিমাঝি যে কত তা তো তুমি এখনও বুঝতে পারবে না। এক এক বার মনে হয় পৃথিবীতে মানুষের চেয়ে বড় আর কিছু নেই। সমাজ, সংসার, নীতি এবং আরও কত কি—সবই তো মানুষেরই সৃষ্টি। অধিকা, তোমার কি মনে হয়?

ডাক্তার সেন গেলেন কোথায়?

বাধ-ঝুমে ঢুকেছেন। অধিকা, দোষ তো সবটুকুই তোমার, অতসীর তো কোন অপরাধই ছিল না। কিন্তু একটু আগে অতসী কি বলল, জান?

কি বলল?—জিজ্ঞাসা করলেন অধিকাবাবু।

একটু আগে, মানে প্রায় এক ঘণ্টা আগে, চিংকার করছিল অতসী। ডাক্তার সেন তখনও এসে পৌঁছেন নি। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নার্সের পাশে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। চৈত্যাতে চৈত্যাতে অতসী কি বলল, জান? হ্যালো?

শুনছি, বলুন।

যুবতী পাঞ্জাবীটি করছে কি?

পাঞ্জাবী যুবতীটি শুয়ে পড়েছেন ফোল্ডিং খাটের ওপর। টেলিফোনটা ঠিক ওর খাটের পাশেই।

তুমি দাঁড়িয়ে, না, বসে আছ?

অনেকক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিলাম, এখন—

এখন কি?

ফোল্ডিং খাটের পাশেই বসে পড়েছি। ভয় পাবেন না, পাঞ্জাবী মেয়েরা আপনাদের ওদিকের মেয়েদের মত মোমের পুতুল নন। ইনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। ডাক্তার সেনকে একটু দিন।

দিচ্ছি। অতসী কি বলল, জান? হ্যালো—অধিকা—অতসী আমার বলল যে, সন্তান সে চায় না।

এই পর্যন্ত বলে অধিকাবাবুর শব্দ হঠাৎ থেমে গেলেন।

এক সেকেন্ড পর্যন্ত অপেক্ষা করে অধিকাবাবু ডাকলেন, হ্যালো, কে? ও, শব্দ মশাই?

হ্যাঁ।

হঠাৎ কথা বন্ধ করে দিলেন কেন? ওদিকে কিছু হচ্ছে নাকি?

না। ডাক্তার সেন এখনও বাধ-ঝুমে। আর কি শুনতে চাও, অধিকা?

অতসী সন্তান চায় না কেন?

তোমারই পাপের জন্তে বোধ হয়। তুমি পাপ করেছ বলেই সে সন্তানটাকে ডার্টবিনে ফেলে দিয়ে আসতে বলছে।

হ্যালো—অধিকাবাবুর গলার স্বর কাঁপতে লাগল, হ্যালো, ডার্টবিনে ফেলে দেওয়ার কথাটা সত্যি নাকি?

পাগল হয়েছ তুমি? ব্যথাটা বোধ হয় অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তাই ভুল বকছিল, হ্যালো, এই যে ডাক্তার সেন এসেছেন। ধরো।

ধরেছি। কে? ডাক্তার সেন? বলুন, আমি অধিকা শুধু কথা বলছি। কি বললেন? অপারেশন করতে হবে? ও হ্যাঁ, কালকেই অপারেশন করা দরকার? হ্যালো, কি বললেন? ছুঁজনকে বাঁচানো যাবে না?

ওধার থেকে ডাক্তার সেন জবাব দিলেন, না, মিঃ শুধু, ছুঁজনকে বাঁচানো চলবে না বোধ হয়। কি চাই আপনার—জী, না, সন্তান?

আজই জবাব চান না কি?—জিজ্ঞাসা করলেন অধিকাবাবু। ডাক্তার সেন বললেন, হ'লে ভালই হ'ত। কাল সকালে বললেও চলবে। বলার আর আছেই বা কি? এমন অবস্থায় সবাই যা চায়, আপনিও তাই

চাইবেন নিশ্চয়ই। হ্যালো? সবাই তো বউ চায়—
বউ থাকলে সন্তান আবার হবে। আচ্ছা, আচ্ছা, কাল
সকালে আটটা নাগাদ এলেই চলবে। ভয় পাওয়ার
কিছু নেই, অপারেশন করতে হবেই। শুভ নাইট!

শুভ নাইট!—অধিকাবাবু রিসিভারটা রেখে দিয়ে
নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন বাইরে।

পরের দিন কলেজে গেলেন না অধিকাবাবু। বেলা
আটটার সময় নার্সিং-হোমে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু
সেখানেও যাবেন না ব'লে মনে মনে ঠিক ক'রে রাখলেন
তিনি। অপারেশন করবেন ডাক্তার সেন, তাঁর তো
কোন কাজ নেই সেখানে! অতএব ফোল্ডিং খাটের
ওপরে শুয়ে প্রায় সমস্তটা দিনই তিনি কাটিয়ে দিলেন
গ্র্যাণ্ট স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে। ঘুম আসে নি তাঁর। টেলি-
ফোনে খবর আসবে ব'লে বোধ হয় তিনি ঘুমতে
পারেন নি। অপারেশন হ'ল কি না, তা তিনি জানেন
না—কে বাঁচল আর কে মরল তার খবরও তিনি কিছু
পেলেন না। হয়তো দুজনের জীবনই রক্ষা পেয়েছে ব'লে
কেউ তাঁকে টেলিফোন করে নি।

বেলা তিনটির সময় ঘরে ঢুকলেন মিসেস বাজাজ।
তাড়াতাড়ি ক'রে উঠে বসলেন অধিকাবাবু। বোধ হয়
খবর এসেছে। বাচ্চাটা বোধ হয় বাঁচে নি।

মিসেস বাজাজ জিজ্ঞাসা করলেন, খবর কি ভাই
সাহেব?

খবর?—হতাশার সুরে অধিকাবাবু বললেন, খবর
কিছুই জানি না। কাল ডাক্তার যা বললেন, তাতে
মনে হয়, বাচ্চাটাকে বাঁচানো যাবে না।

কেন? কেন, ভাই সাহেব?—মিসেস বাজাজের
মুখে উৎকণ্ঠার ধ্বনি।

অপারেশন করতে হবে। ডাক্তার বললেন যে,
দুজনকে বাঁচানো যাবে না। জী কিংবা সন্তান দুজনের
মধ্যে আমরা একজনকে বেছে নিতে হবে। ভাবছি—

কি ভাবছেন?

ভাবছি জী, না, সন্তান, মানে—

এ কি রকম কথা, ভাই সাহেব? জী বাঁচলে তো
সন্তান আরও হবে। কিন্তু জী যদি ম'রে যায়—

বাধা দিয়ে অধিকাবাবু বললেন, না না, জী কেন
মারা যাবে! ডাক্তার বললেন যে, জী তো ভালই আছে।
যদি মরে, তবে বাচ্চাটাই মরবে। মরাই উচিত।

চমকে উঠলেন মিসেস বাজাজ। বাঙালীরা সব
শিক্ষিত মানুষ ব'লেই তো তিনি জানতেন। যতদিন
লাহোরে ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত বাঙালীদের সম্বন্ধে তাঁর
খুব ভাল ধারণাই ছিল। কাছে এসে এ কি তিনি
দেখছেন? বাজাজ সাহেব তো বোঝই বলেন যে,
বাঙালীদের কথাই কোন দাম নেই। কথার যদি দাম
না থাকে, তা হ'লে তো মানুষটারও দাম রইল না।
যে-মানুষদের দাম নেই, তারা কি করবে? তারা কবিতা
কিংবা উপন্যাস লিখলেও তো দেশকে বড় করতে পারবে
না। মিসেস বাজাজের মুখের দিকে চেয়ে অধিকাবাবু
বুঝতে পারলেন যে, তাঁর কথা শুনে ভদ্রমহিলাটি অত্যন্ত
দুঃখিত হয়েছেন। গ্র্যাণ্ট স্ট্রিটে সমাজ না থাকতে পারে,
মানুষ তো আছে। পাঞ্জাবীরা কি মানুষ নন? কেবল
গাঙ্গা গাঙ্গা কবিতা-উপন্যাস লিখলেই মানুষ হওয়া যায়
না, ভাবলেন অধিকাবাবু। ভাবলেন ব'লেই তিনি বললেন,
আপনাকে দুঃখ দিলুম ব'লে খুবই লজ্জিত বোধ করছি।
বাচ্চাটার একটা ইতিহাস আছে ব'লেই আমি বোধ
হয় তার মৃত্যু-কামনা করেছিলাম।

ফোল্ডিং খাটের ওপর ব'সে পড়লেন মিসেস বাজাজ।
চুপ ক'রে কি যেন ভাবলেন তিনি, তারপর বললেন,
ইতিহাস যত খারাপই হোক না কেন, মানুষের কখনও
মৃত্যু কামনা করতে নেই। মানুষের চেয়ে বড় হুনিয়ায়
আর কি আছে, ভাই সাহেব? পাপ-পুণ্য মানুষেরই
সৃষ্টি। ক্ষমা যদি না করতে পারলেন, তা হ'লে পুণ্যের
তপস্শায় তো আপনার সিদ্ধি আসবে না। আমার
বোনের কথা যদি শোনেন, তা হ'লে তো—না থাক্,
বাংলা দেশকে আমরা এখনও চিনতে পারি নি।

গ্র্যাণ্ট স্ট্রিটে ব'সে বাংলা দেশকে চেনা যায় না।

কেন যায় না, ভাই সাহেব? আপনাকে ধৈর্যে
বাংলা দেশকে চিনতে পারব না কেন? সমাজের চেয়ে
মানুষ বড়—এ কথা কি আপনি বিশ্বাস করেন? আমাদের
পাঞ্জাবের পুরুষ মানুষরা এত বলিষ্ঠ যে, সমাজ কখনও
তাদের মাথায় চাটি মারতে পারে না। ভাই সাহেব,

আমার বোনকে যে চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছিল সে কথা তো কাল আপনাকে বলেছিলাম। দিল্লীতে যখন লুক্কিরে এল, তখন সে গর্ভবতী। বাচ্চাটাও বাঁচল না। আমাদের সমাজের সবাই ওর খবর জানত। ভাই সাহেব—

অধিকারবাবু মুখ নীচু ক'রে গল্প শুনছিলেন। সামনের দিকে হঠাৎ দৃষ্টি ফেললেন তিনি। মিসেস বাজাজের বোন দাঁড়িয়ে ছিলেন বাইরে। অধিকারবাবু বললেন, আপনার বোন বোধ হয় আপনাকে ডাকছেন।

বাইরের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, কি রে, সোহন এসেছে না কি?

হ্যাঁ।—বাইরে থেকেই জবাব দিলেন মিসেস বাজাজের বোন।

আচ্ছা, তুই যা, আমি আসছি।—এই ব'লে মিসেস বাজাজ অধিকারবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, ভাবছেন, আমার বোনকে সেই জন্তে কেউ বিয়ে করে নি? না, ভাই সাহেব, এ ধারণা আপনার ভুল। ওকে বিয়ে করবার জন্তে এষাবৎকাল অনেক ছেলেই এগিয়ে এসেছিল। প্রত্যেকেই বড় বড় চাকরি করে। বোন নিজেই এতদিন বিয়ে করতে চায় নি। এবার সে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। সোহনের সঙ্গে কাল বিয়ে হবে—দিল্লীতে থাকতেই ওদের মধ্যে মহব্বত হয়। আপনাদের সমাজে আমার বোনকে নিয়ে আপনারা কি করতেন? ডাক্তারবিনে ফেলে দিতেন নিশ্চয়ই?

ডাক্তারবিনে?—হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন অধিকারবাবু। তারপর একটু হেসে তিনিই আবার বললেন, না না। ডাক্তারবিনে কি মানুষ থাকতে পারে? ওখানে সব ময়লা ফেলা হয়। বাংলার সমাজ তো ডাক্তারবিন নয়। সোহন কি কাজ করে, বহীনজী?

দিল্লীতে কোন্ এক কলেজে যেন পড়ায়। প্রফেসর। বিলেত থেকে দু-তিনটে ডিগ্রী এনেছে। এখন চল্লুম। সোহনকে চা খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছি পার্ক স্ট্রীটে। যাবেন নাকি সঙ্গে?

না না, নার্সিং-হোম থেকে যে-কোন মুহূর্তে খবর আসতে পারে। আমি তো খবরের জন্তেই সারাটা দিন ঘরে ব'সে আছি।

তা হ'লে এখন চলি, ভাই সাহেব। বাচ্চাটার ইতিহাস আমি পরে শুনব। সোহনের সঙ্গে আলাপ করবেন নাকি?

আজ থাক, বিয়ের পরেই আলাপ করা যাবে। চাকরি পূলে আমিও হয়তো একদিন দিল্লী চ'লে যেতে পারি। মুন্সেফী নেই ব'লেই তো প্রাদেশিক সরকারের দরজায় কয়েকটা টাকার জন্তে মাথা কুটে মরছি। বাঙালী যদি একবার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে, তা হ'লে দিল্লী আর গ্র্যান্ট স্ট্রীটের মধ্যে তার কাছে কোন পার্থক্য থাকে না। আচ্ছা, আচ্ছা, নমস্কে।

মিসেস বাজাজ হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। অধিকা গুপ্তর মুখে আর একবিন্দু হাসি নেই। গভীরভাবে সব কিছু উল্টেপাল্টে গোড়া থেকে ভাবতে লাগলেন তিনি। অতসী আর তাঁর নিজের জীবনের ইতিহাসটাকে লুকিয়ে রাখবার জন্তে তিনি ক্ল্যাট নিয়েছিলেন গ্র্যান্ট স্ট্রীটে। তিনি জানতেন, এখানে লোকের ভিড় খুব বেশী, কিন্তু মানুষ নেই।

আজ তাঁর সেই পুরনো বিশ্বাসটা যেন আর টিকতে চাইছে না। গ্র্যান্ট স্ট্রীটে মানুষের সন্ধান তিনি পেয়েছেন। হয়তো এখানকার প্রতিটি ক্ল্যাটে সত্যিকারের মানুষই বাস করে। অধিকারবাবু তাঁর পশ্চাৎ-ইতিহাস স্মরণ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। বালিগঞ্জের সেই বড় বাড়িটার মধ্যে কী সাংঘাতিক পরিস্থিতিরই না সৃষ্টি হয়েছিল! অমন সুন্দর সাজানো গোছানো বাড়ির মধ্যে সেদিন একবিন্দু সভ্যতার সন্ধান পান নি।

রবিকরের সঙ্গে অধিকা গুপ্তর পরিচয় হয় কলেজ থেকে। অধিকারবাবু ছিলেন কলেজের সবচেয়ে ভাল ছেলে। রবিকর ছিল সবচেয়ে বড়লোকের ছেলে। সে কলেজে আসত মোটর পাড়িতে চেপে, আর অধিকারবাবু বড়বাজার থেকে হেঁটে আসতেন প্রত্যেক দিন। অতএব রবিকরের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হওয়ার কোন কারণই ছিল না। বন্ধুত্ব তবু হ'ল। অধিকারবাবু যখন এম.এ. পড়তেন, তখন রবিকর একদিন তাঁর বউবাজারের মেসে এসে বলল, চল, তোকে আজ আমি অতসীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।

অতসী কে রবি?—জানতে চাইলেন অধিকারবাবু।

আমার মাসতুতো বোন, ভিক্টোরিয়া পার্ভ ইয়ারে পড়ছে।

কিন্তু আমি সেখানে গিয়ে কি করব?

মোসামশাই তোকে দেখতে চেয়েছেন। স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্তব্য অফিসার তিনি।

তোরা সব বড়লোক, আমি তোদের সমাজে গিয়ে ঠাই পাব না।

সন্ধ্যার একটু পরেই অধিকাবাবু এলেন বালিগঞ্জের সেই বড় বাড়িটায়। রবিকরই নিয়ে এল। পরিচয় হ'ল স্বাধীনবাবুর সঙ্গে, হ'ল অতসীর সঙ্গেও। বালিগঞ্জের বিচিত্র এই সমাজের প্রতি আকর্ষণ বাড়তে লাগল অধিকাবাবুর। অতসীদের ড্রইং-রুমে ব'সে তিনি মেহেরপুরের কথা ভুলতে লাগলেন ক্রমে ক্রমে। অতসীকে তিনি ভালবাসলেন। ভালবাসলেন বালিগঞ্জের এই বড় বাড়িটাকে।

প্রায়ই বিকেলবেলা অধিকাবাবু আসতেন অতসীদের বাড়িতে। মাঝে মাঝে অতসীর সঙ্গে দেখা হ'ত না। বাড়ির চাকরদের কাছেই খবর পেতেন যে, সে রবিকরের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে, কখন ফিরবে তার ঠিক নেই। ট্রামে চেপে আসা-যাওয়ার পরমা নষ্ট হতে লাগল তাঁর। অতসীর মা বেঁচে নেই, অতসীর অল্পপস্থিতিতে কার সঙ্গেই বা গল্প করবেন তিনি?

কিছুদিন পরে এম. এ. পরীক্ষার সময় এসে গেল। অধিকাবাবু বালিগঞ্জ যাওয়ার আর সময় পেয়ে ওঠেন না। ভাল ক'রে পাস না করতে পারলে বাবার কাছে গিয়ে কি জবাবদিহি করবেন? কত আশা ক'রে বুড়ো মেহেরপুরে ব'সে আছেন। অধিকা তাঁর ভাল ক'রে পাস করবে, বড় চাকরি পাবে সে। মেহেরপুরে বুড়োর আর থাকতে ভাল লাগছে না। অধিকার চাকরি হ'লেই তিনি ছেলের কাছে চ'লে আসবেন। মাঝে মাঝে বাবা অধিকাবাবুকে এই সব কথা লেখেন চিঠিতে। অধিকাবাবু তাঁকে চিঠি লিখে জবাব দেন : আর ক'টা দিন অপেক্ষা কর, বাবা। পরীক্ষার ফল বেরুতে আর বেশী দিন বাকি নেই। মনে তো হয়, প্রথম শ্রেণীতেই পাস করব। পাস করার পরে চাকরি পেতে আর খুব বেশী দিন সময় নেবে না। নিজের কৃতিত্বের জন্তে যদি বাংলা দেশে চাকরি না জোটে, তবুও আমার ভয় নেই। একজন মুন্সীবী পেয়েছি, বাবা। আমাদেরই স্বজাতি। মন্ত বড় সরকারী চাকরি করেন তিনি। চাকরির আমার অভাব হবে না।

চিঠি পেয়ে বুড়ো আবার চিঠি লেখেন অধিকাবাবুর কাছে : অধিকা, তোমার চিঠি প'ড়ে খুবই স্বাধীন হলাম। কলকাতার মত স্বার্থপর জায়গায় মুন্সীবী পাওয়া খুবই ভাগ্যের কথা। তোমার ফল বেরুতে আর ক'মাস লাগবে? চাকরি তুমি একটা পাবেই, অতএব এখন থেকেই একটা বাড়ির খোঁজ কর না কেন? মেহেরপুরের সবাই বলছে যে, কলকাতায় নাকি চাকরি পাওয়ার চেয়ে বাড়ি পাওয়া কঠিন।

চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অধিকাবাবু জবাব দেন : বাবা, তোমার চিঠি পেয়েছি। আমি একটা ফ্ল্যাটের সন্ধান করছি। দু-ঘরের ফ্ল্যাট হ'লেই আমাদের চ'লে যাবে। দক্ষিণ-খোলা ফ্ল্যাট হ'লেই ভাল হয়। বুড়ো ব্যসে তোমার গায়ে যদি হাওয়া না লাগে, তা হ'লে স্বাস্থ্য তোমার ভেঙে পড়বে।

এ চিঠি পেয়ে বুড়ো পুনরায় লিখলেন : তোমার চিঠি পেয়ে মনটা বড় ধারাপ হয়ে গেল। বাড়িতে না থেকে আমরা ফ্ল্যাটে থাকব কেন? ফ্ল্যাট যে কি বস্তু আমি তা বুঝতে পারলুম না, অধিকা। গরিব লোকরাই বুঝি ফ্ল্যাটে থাকে?

অধিকাবাবু লিখলেন : আজকাল শিক্ষিত লোকেরা সব ফ্ল্যাটেই থাকে, বাবা। ফ্ল্যাট মানে কি? বাড়ির মধ্যে বাড়ি। একটা মন্তবড় বাড়ির মধ্যে আলাদা আলাদা অংশ। কারো সঙ্গে কারো সম্পর্ক থাকে না। বাইরের দিকের দরজা বন্ধ ক'রে দিলে তোমার ফ্ল্যাট-ই একটা আলাদা বাড়ি। তেমন একটা ফ্ল্যাট খোঁজ করছি, পেয়ে গেলেই তোমায় জানাব। পরীক্ষার ফল বেরুতে আরও এক মাস বাকি।

ঠিক এই সময় হঠাৎ রবিকর এসে একদিন অধিকাবাবুর মেসে উপস্থিত হ'ল। এসেই সে বলল, কি রে অধিকা, বালিগঞ্জে যাওয়া যে ছেড়েই দিলি? ব্যাপার কি? পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, ঘরে ব'সে ক'রিস কি সারাদিন?

অধিকাবাবু বললেন, করবার বিশেষ কিছু নেই ব'লেই ঘরে ব'সে থাকি। বালিগঞ্জ গেলে তো অতসীকে পাওয়া যায় না।

পাওয়া যায় না?—রবিকর যেন আকাশ থেকে পড়ল : পাওয়া যায় না কেন, কোথায় সে যায়?

অধিকারবাবু বললেন, কাল তো সন্ধ্যার সময় দেখলুম, অতসী চৌরঙ্গী পার হচ্ছে গাড়িতে—পাশে বসে তুই নিজেই তো গাড়ি চালাচ্ছিলি রবি।

ও, হ্যাঁ। আমাদের বাড়িতে অতসীর নেমস্তম্ভ ছিল কাল। মা বললেন, অতসীকে বাড়ি পৌছে দেবার জন্তে—ধাক সে সব কথা। অতসী তোকে একবার আজ যেতে বলেছে।

আমি বোধ হয় মেহেরপুর চলে যাব বাবার কাছে।

কেন?

মেহেরপুরের জমিদার শশাঙ্ক চৌধুরী মারা গেছেন। এবার এখানকার খরচ চলবে কি করে?

রবিকর একটু নড়ে-চড়ে বসল। তারপর অধিকারবাবুর মুখের দিকে চেয়ে সহাস্রভূতির স্বরে সে বললে, তোর কথা আমরা আগে থেকেই ভেবে রেখেছি। আসছে বছর অতসী বি. এ. পরীক্ষা দেবে। মেসোমশাই তাই বলছিলেন যে, অধিকা তো আর আমাদের পর নয়, অতসীকে সে তো পড়াতে পারে রোজ। কাজটা নে না অধিকা। মাইনেটা অবশিষ্ট বড় কথা নয়।

রোজই সন্ধ্যার সময় অধিকারবাবু আসেন বালিগঞ্জে অতসীকে পড়াতে। প্রায় মাসখানেক থেকে অতসী পড়ছে তাঁর কাছে। এই সময় একদিন এম. এ. পরীক্ষার ফল বেরলো। অধিকা গুপ্ত প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে পাস করেছেন। সুধীরবাবু একদিন বললেন তাঁকে, কি করবে ভাবছ, অধিকা? বিলিভী কোম্পানীতে চাকরি যদি কর, আমি তা হলে চেষ্টা করতে পারি।

অধিকারবাবু বললেন, না, আমি কলেজেই চাকরি নেব বলে ঠিক করেছি। চাকরির জন্তে দরখাস্ত করেছি। পরশু আমার ইন্টারভিউ আছে।

প্রায় এক মাস পরে অতসীদের বাড়িতে বিরাট এক নৈশ-ভোজের ব্যবস্থা হ'ল। অধিকারবাবু প্রথম হয়ে পাস করেছেন বলেই অতসী এই ভোজের ব্যবস্থা করেছেন। সুধীরবাবু ছপ্পরের দিকে মেয়েকে একলা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়াং অতসী, অধিকার বাবার কাছে কি আমি চিঠি লিখব?

কেন বাবা?

বিয়ের প্রস্তাব করব বলেই ভাবছি। রবি

মেহেরপুরের ঠিকানাটা আমার দিয়ে গেছে। তোদের বিয়ের জন্তে রবি বড় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

চিঠি এখন দিয়ে না, বাবা। আমি আজ ঠেকে একবার জিজ্ঞাসা করে নিই।

হ্যাঁ, সন্ধ্যার সময় খবরটা আমার দিস। আজ তা হলে সবার কাছেই খবরটা আমি ঘোষণা করে দেব।

ঠেকে এখনো আমি কিছু জিজ্ঞাসা করি নি, আজ আমি ঠর সঙ্গে পাকা কথা কইব।

সন্ধ্যার সময় অধিকারবাবু এলেন। বেশ একটু ষড় নিয়ে সেজে-গুজেই এসেছেন বলে মনে হ'ল সুধীরবাবুর। বসবার ঘরে সুধীরবাবু বসে ছিলেন। তিনি বললেন, এখনো তো কেউ আসে নি, তুমি বরং ওপরে যাও।

সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে ছিল অতসী। অতসীকে দেখে অধিকারবাবু অবাক হয়ে গেলেন। এমন একটা বিশেষ দিনে অতসী সাধারণ একটা সাদা শাড়ি পরেছে। অতসী কি তা হলে তাঁর মনের কথা বুঝতে পারে নি? আজ যে তিনি সরকারীভাবে সুধীরবাবুর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করবেন তেমন ইঙ্গিত তিনি তো কাল প্রকাশ করেছিলেন অতসীর কাছে। ইঙ্গিত বলেই অতসী হয়তো বুঝতে পারে নি। অধিকারবাবু ধীরে ধীরে উঠে এলেন ওপরে। ওপরে এসে হাত রাখলেন অতসীর কাঁধে। হৃদয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলেন দক্ষিণ দিকে, অতসীর শোবার ঘরে।

অধিকারবাবু বললেন, তোমার অহুমতি পেলে, তোমার বাবার কাছে আমি বিয়ের প্রস্তাব করতে চাই আজ। তোমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা প্রচুর, আমার সৈনিক দিয়ে কিছু নেই বলে তিনি কি এ বিষয়েতে সম্মতি দেবেন না?

দেবেন। দেওয়ার জন্তে তিনি অস্থির হয়ে উঠেছেন।

কিন্তু—

কিন্তু কি? থেমে গেলে কেন, অতসী?—ব্যস্ততা প্রকাশ পেল অধিকা গুপ্তর প্রসঙ্গে। অতসী তবু মাথা নীচু করে চুপ করে বসে রইল। অধিকারবাবু বললেন, কোথায় কি যেন বড় রকমের একটা গোলমাল বেধে গেছে। প্রতিদিনকার চেনা অতসীকে আজ যেন সহসা অচেনা বলে মনে হচ্ছে। সুধীরবাবুর আদর-পাওয়া একমাত্র সন্তান আজ যেন এই প্রথম গভীর হতে শিখল। মনে মনে

শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলেন অধিকারবাবু। অতনীর তিন ভালবাসেন। অতএব হাজার অপরাধও তিনি তার ক্ষমা করবেন। ভালবাসেন বলেই তো ক্ষমা করবার মত মনের গঠন তাঁর মহৎ হয়েছে।

না না, এত বড় অপরাধ কি তুমি ক্ষমা করতে পার?—মাথা নীচু করেই প্রশ্ন করল অতনী।

কি অপরাধ? খুন করেছ নাকি?—জিজ্ঞাসা করলেন অধিকারবাবু।

এরই মধ্যে স্বধীরবাবু নীচে থেকে লোক পাঠিয়েছেন ছুবার। অধিকারবাবুকে ডাকছেন নীচে। কলেজ স্ট্রীটের কলেজ থেকে প্রধান অধ্যক্ষ এসেছেন। অস্ত্রাস্ত্র অতিথিরাও সব এসে গেছেন। মেয়ের বিয়ের খবরটা ঘোষণা করবার জন্তে স্বধীরবাবু খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। অতনীই বা খবর দিচ্ছে না কেন? স্বধীরবাবু ভাবলেন, অধিকা কি অতনীকে বিয়ে করতে রাজী হচ্ছে না? স্বরাষ্ট্র বিভাগের এতবড় একজন অফিসারের মুখে কঞ্চার হাসি ভেসে উঠল। কোথাকার কোন্ এক পরীগ্রামের অধিকা গুপ্তর সঙ্গে তিনি যে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী হয়েছেন, সেই তো আশ্চর্যের কথা। অধিকার আবার মতামত আছে নাকি? থাকলেও তাঁর দায় কিছু নেই। অধিকার মত একটা চুনোপুটিকে তো তিনি ছুঁতেই টিপে মেয়ে ফেলতে পারেন। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে স্বধীরবাবু উঠে পড়লেন। অতিথিদের বললেন, দেখি, খাবার ব্যবস্থা সব ঠিক হ'ল কিনা।

কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ ডক্টর রায় জিজ্ঞাসা করলেন, অধিকা গেল কোথায়?

অধিকাকে আমি এন্ট্রি পাঠিয়ে দিচ্ছি।—বললেন স্বধীরবাবু।

ডক্টর রায় হাসতে হাসতে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আজকের এই নৈশ ভোজের কারণটা কি, স্বধীরবাবু? অধিকা যে প্রথম হয়ে পাস করেছে সে তো পুরনো হয়ে গেল। আসল ব্যাপারটা কি?

স্বধীরবাবু সহস্রাঙ্গবাবু দিলেন না। কি জবাব দেবেন তাই বোধ হয় মনে মনে ভাবলেন তিনি। অধিকা কিংবা অতনীর মতামতের জন্তে তাঁর কি দরকার অপেক্ষা করবার? তিনিই তো পারেন ওদের হয়ে জবাবটা দিয়ে দিতে।

তিনি ডক্টর রায়ের দিকে চেয়ে বললেন, আপনাদের সামনে আজ আমি একটা বিশেষ খবর ঘোষণা করতে চাই। অধিকা গুপ্তর সঙ্গে অতনীর বিয়ে আমি ঠিক করে ফেলেছি।

দেখি দেখি, ওদের ডাকুন।

বেশ ভাল ব্যাচ হয়েছে।

কি বলেন দত্ত সাহেব, সখস্কাটা ভাল হয় নি?

আরে, রেখে দিন ওসব পুরনো আমলের সামাজিক নিয়ম। বাপ ওর পাড়ারগারে থাকে বলে কি ওরা মাহবু না?

রবিকরের কাছে শুনেছিলুম, বিয়ের পরেই নাকি জামাই আর মেয়েকে বিলেত পাঠিয়ে দেবেন, স্বধীরবাবু?

শ্রীস্বধীরকুমার দাশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নানা রকমের মন্তব্য শুনেছিলেন। ভাল লাগছিল শুনে। অধিকার প্রশংসা শুনে কার না ভাল লাগে? ছেলেটা সারাজীবন প্রথম হয়ে পাস করেছে। গরিবের ঘরে জন্মেছে বলে তো সে কোন পাপ করে নি? সবাই ভোঁ 'সোনার চামচে' মুখে দিয়ে জন্মান না, ভাবলেন স্বধীরবাবু। তিনি আরও ভাবলেন যে, অধিকা ভাগ্যান। জীবনের পরীক্ষায়ও অধিকা প্রথম হয়ে পাস করবে। অতনীর মত পয়লা নম্বর মেয়ে সে পেল—রূপে গুণে বালিগন্ধে এমন কটা মেয়ে আছে যে অতনীর ওপর টেকা মাত্রতে পারে? স্বধীরবাবু বেরিয়ে এলেন বসবার ঘর থেকে। অধিকা এবং অতনীকে ডাকতে চললেন তিনি। মেয়ে এবং জামাই-গর্বে তাঁর যেন মাটিতে পা পড়তে চায় না! সিঁড়ির কাছে আসতেই সামনের দিকে চোখ পড়ল স্বধীরবাবুর। দৌতলার দেওয়ালের গায়ে অতনীর মার একখানা ফোটা টাঙানো রয়েছে। ফোটোর উদ্দেশ্যে তিনি যেন মনে মনে বললেন, সচ্ছ, এর চেয়ে ভাল সখস্কা তুমি নিজের করতে পারতে না। তুমি আশীর্বাদ কর, অতনী যেন স্থায়ী হয়। স্বধীরবাবু ওপরে উঠতে লাগলেন। চোখের জলে অতনী বিছানার খানিকটা জায়গা ভিজিয়ে ফেলেছে। জীবনে সে মারাত্মক ভুল করেছে। কোটি কোটি মেয়ের মধ্যে কটা মেয়ে এমন ভুল করে? অতনীকে ভালবাসেন বলে ঈশ্বর পূর্বে অধিকারবাবু বুঝিয়ে কথা বলছিলেন। অতনী যদি খুন করেও থাকে, তবুও তাকে তিনি ক্ষমা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন।

কিন্তু অতসীর কথা শুনে অধিকাবাবু পাথরের মত শক্ত হয়ে গেলেন। ক্ষমা করবার মত নয়ম অহুভূতি তাঁর একটুও রইল না। চরিত্রের বলিষ্ঠতা তাঁর গলা মোমের মত গলে যেতে লাগল। কেমন ক'রে তিনি যুদ্ধ করবেন? অধিকাবাবুর প্রেম, কি তবে সত্য নয়? অতসীর কথা শুনে এইটুকু সময়ের মধ্যেই অধিকাবাবু যেন তাকে ঘৃণা করতে লাগলেন। সবচেয়ে প্রয়োজনের মুহূর্তে অধিকাবাবু তাঁর সবটুকু শক্তিই হারিয়ে ফেললেন আজ।

অতসী উঠে এল বিছানা থেকে। হতভয়ের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন অধিকাবাবু। কি যে করবেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না। একগাছা সোনার হার তিনি গড়িয়ে নিয়ে এসেছিলেন অতসীর জন্তে। পকেট থেকে সেটা বার করবার সময় পেলেন না অধিকা গুপ্ত। অতসী এসে ব'সে পড়ল তাঁর পায়ের কাছে। ধীরে ধীরে সে বলতে লাগল, আজ না হয় তুমি আমার ক্ষমা করতে পারবে না, কিন্তু এমন একদিন আসবে যেদিন তুমি আমার সত্যতায় বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে। আমার হযোগ দাঁও—

আজ আমি চলি।—অতি ক্লান্ত হুঁরে বললেন অধিকাবাবু।

আর তুমি আসবে না জানি। কিন্তু আমার কি উপায় হবে?

সে তো আমি বলতে পারব না। আমার যেতে দাঁও।— অধিকাবাবু এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। অধিকাবাবুর মনে হ'ল, কি একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র চলেছে তাঁর চারদিকে। অতসীকে পড়াতে আসার ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক ব'লে মনে হচ্ছে না। এমন একটা ব্যাপারের মধ্যে তাঁকে জড়াবার জন্তেই যেন রবিকর তাঁকে আমন্ত্রণ ক'রে এনেছিল। এনেছিল সত্যি, ষড়যন্ত্রটাও হয়তো মিথ্যে নয়, কিন্তু তিনি তো তা সব্বেও অতসীকে ভালবাসেন।

হৃদীরবাবু দরজার ওপাশ থেকেই কথা বলতে বলতে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। তোমাদের বিয়ের খবরটা আমি সবার কাছে ঘোষণা ক'রে এলাম, অধিকা। ও কি? ব্যাপার কি অতসী?

অধিকা গুপ্ত দরজার ওপাশে গিয়ে দাঁড়াতেই অতসী বলল, ঠেকে যেতে দিয়ে না, বাবা।

কেন? ও কোথায় যাচ্ছে?—জিজ্ঞাসা করলেন হৃদীরবাবু।

চ'লে যাচ্ছে, বিয়ে করতে চায় না।—বলল অতসী।

না-ই বা করল বিয়ে, তোকে বিয়ে করবার জন্তে লোকের অভাব হবে না কি?

ওকে যে আমি ভালবাসি, আর—

ধমকে দাঁড়িয়ে গেলেন অধিকাবাবু। অতসীর হুঁরে সত্যতার ধ্বনি। হৃদীরবাবু মেয়ের দিকে চেয়ে ছিলেন। অতসী এবার হৃদীরবাবুর দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে মূখ নীচু ক'রে বলতে লাগল, ঠেকে ছাড়া আমি যে আর কাউকে বিয়ে করতে পারি না। আমি যে মা হতে যাচ্ছি। কথাটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে হৃদীরবাবুর যেন মনে হ'ল, তাঁর সংসার-সাম্রাজ্যের ওপর লক্ষ লক্ষ বোমা পড়ল—যেন সব ভেঙে চূরে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কী অপূর্ব নাটকীয় পরিবেশের মধ্যে কেবল অধিকাবাবুই কলঙ্কের বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন দরজার ওপাশে! তারপর? হৃদীরবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সারা জীবনের পিতৃ-স্নেহ এক মুহূর্তের মধ্যে বিস্মৃত হয়ে উঠল। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতে হৃদীরবাবু কেবল একটা কথাই সেদিন ব্যবহার করেছিলেন, অধিকাবাবুর তা আজও মনে আছে। কথাটা যেন কি? ক্রট! মনে পড়ল অধিকা গুপ্তর। আরও একটা কথা তাঁর আজও মনে পড়ে যে, সেদিনের সেই নৈশ-ভোজে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে সবাই এসেছিল যোগ দিতে, আসে নি কেবল অতসীর মাসভূতো ভাই রবিকর।

সন্ধ্যা তো হয়ে এল, এখনো কোন খবর এল না নার্সিং হোম থেকে। অধিকাবাবু রাস্তার দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। সমস্তটা দিন ঘরে ব'সেই কাটিয়ে দিলেন তিনি। কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না।

পার্ক স্ট্রীট থেকে মিসেস বাজাজ ফিরে এলেন। সঙ্গে সোহন সিংও আছেন। বিয়ে করবার জন্তে তিনি দিল্লী থেকে কলকাতা এসেছেন। রাস্তার ইলেক্ট্রিকের আলোয় সোহন সিংকে খুবই বলিষ্ঠ দেখাচ্ছিল। অধিকাবাবু মনে মনে খুবই তারিফ করলেন সোহন সিংকে। ভাঙতে সবাই পারে, কিন্তু জোড়া দিতে পারে কজন? মিসেস

বাজাজের বোনের ভাড়া-জীবন জোড়া দিতে এসেছেন
সোহন সিং।

অধিকাবাবুর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল মেমসাহেবের ঘরের
দিকে। মেমসাহেব আজ আর মুখে পাউডার মাখছেন
না। প্রসাধনের কোন আড়ম্বর নেই তাঁর। অধিকাবাবু
দেখলেন, খুব মনোযোগ দিয়ে কি একটা বই পড়ছেন
তিনি। বাইবেল নয় তো? অধিকাবাবু ভেবেছিলেন যে,
এই সব পাড়াশুলো কলকাতার ডাস্টবিন—নোংরা ফেলবার
জায়গা। কিন্তু সে ধারণা তাঁর বদলে গেছে। বদলাচ্ছে
প্রতি মুহূর্তে।

অধিকাবাবুকে দেখতে পেয়ে মেমসাহেবটিও রাত্তার
দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞাসা করলেন
অধিকাবাবুকে, কি খবর গুপ্ত? বউয়ের খবর কি?

কোন খবর এখনো আসে নি। তোমার খবর কি
মিস—?

মিস নয়, মিসেস—

বেশ ভাই হ'ল। তোমার বিছানাপত্র সব বাঁধা
রয়েছে কেন?

মেমসাহেবটি ঘরের দিকে দৃষ্টি দিয়ে তারপর বললেন,
আমি আজ চ'লে যাচ্ছি। সে নিতে আসবে।

সে কে? গল্পটা তো শোনাগে না?—তু'কে
দাঁড়ালেন অধিকাবাবু। এই সময়ে বাজাজ সাহেবের বউ
বাইরে থেকে ডাকতে লাগলেন, ভাই সাহেব, ভাই সাহেব—

বোধ হয় নার্সিং-হোম থেকে খবর এসেছে, আমি
চললুম। তোমার গল্পটা শোনবার লোভ রইল। এক্ষুনি
চ'লে যাবে নাকি?

যে-কোন মুহূর্তে সে আসতে পারে। গুড নাইট,
গুপ্ত।

বাজাজ সাহেবের ক্ল্যাটে এসে টেলিফোন ধরলেন
অধিকাবাবু। ভাস্কর সেন টেলিফোন করছেন।

হ্যালো, কে?

আমি অধিকা গুপ্ত।

সারাদিনে একবারও তো এলেন না?

অপারেশন হয়ে গেছে নাকি?

অপারেশন করতে হয় নি, ডেলিভারি হয়ে গেছে
এমনিতেই—এ ডেড চাইল্ড।

খুন নয় তো?

কি বললেন?

অতসী কেমন আছে?

একবার আসুন না। রাত এগারোটোর মধ্যে যখন হয়
একবার আসতে পারেন, আমি থাকব।

অতসী কেমন আছে, তা তো বললেন না?

তিনি ভাল আছেন। হ্যালো, ধরুন, আপনার শব্দর
কথা বলছেন।

অধিকাবাবু লাইনটা ধ'রে রেখেই বললেন, হ্যালো?

কে? অধিকা?

আজ্ঞে, হ্যাঁ। বলুন, আমি শুনিছি।

অধিকা, আমার তুমি কমা কর।

হঠাৎ?

আমি ভুল বুঝেছিলাম, অধিকা। অতসীর কাছে
আজ আমি সত্য ঘটনা সব শুনলুম। বালিগঞ্জের বাড়িতে
একবার আসবে কি আজ?

কেন?

তোমার বাবা এসেছেন। হ্যালো, হ্যালো—

যাব। ছেড়ে দিলুম।

রাত বোধ হয় তখন আটটাই হবে। অধিকাবাবু
ঘরের জানলা-দরজা সব বন্ধ করতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর
গ্র্যাট স্প্রিংয়ের ক্ল্যাটের ওপরে মায়া জন্মাল নাকি? অতসীর
ট্রাক আর হটকেদণ্ডলোতে সব তাল দেওয়া আছে কি
না পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন অধিকাবাবু। অতসী
বোধ হয় বিয়ের পরে ট্রাকের তালটা একদিনও
খোলে নি।

দু-দশ মিনিটের মধ্যে অতসীর ঘরটা সাজানো হয়ে
গেল। অধিকাবাবুর মনে পড়ল বিয়ের রাতটার কথা।
সেই নতুন বিছানা, নতুন আসবাবপত্র সব যেন একই
রকম রয়েছে। বালিগঞ্জের বাসরঘর গ্র্যাট স্প্রিংয়ে এসেও
পুরনো হয় নি। বিছানার ওপর হাতটা রাখতে গিয়ে
অধিকাবাবুর যেন মনে হ'ল, সারা বিছানাটা ঠাণ্ডা এবং
ভেজা ভেজা। অতসী কি তবে সাতটা মাস এখানে কেবল
কৈদে কৈদে কাটিয়ে গেল? পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে
অতসী। আর তাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি? সোহন সিং
বা পারেন, তিনি তা পারেন না-কেন?

অধিকাবাবু বাইরে থেকে ঘরে তালা লাগিয়ে নেমে এলেন রাত্তায়। ট্রামে চেপে দক্ষিণ কলকাতায় যেতে গেলে অনেক সময় নষ্ট হবে মনে ক'রে তিনি ট্যাক্সি চেপে বসলেন। প্রায়শ্চিত্ত যা করবার তা তো করেছে অতসী।

অধিকাবাবু ট্যাক্সি থেকে নামলেন নার্সিং-হোমের সামনেই। শব্দ কিংবা ডাক্তার সেনকে তিনি দেখতে পেলেন না। একজন বেয়ারার কাছ থেকে অতসীর ঘরের নম্বর জেনে নিয়ে তিনি দোতলায় উঠতে লাগলেন। বিন্দুমাত্র দুর্বলতা অনুভব করলেন না অধিকা গুপ্ত। আজ তিনি আশাতীতভাবে বলিষ্ঠ হয়ে উঠছেন—ঘুণা কিংবা বিদ্বেষ আর বইল না তাঁর মনে। গ্র্যান্ট স্ট্রিট থেকে তিনি শক্তি সঞ্চয় ক'রে এনেছেন। সোহন সিংকে তিনি দেখে এসেছেন। অধিকাবাবু এইমাত্র দেখে এলেন যে মেমসাহেবটিও উঠে দাঁড়িয়েছেন। নর্দমার মাহুষও হাত বাড়িয়েছে ওপরে উঠবার জন্তে।

অতসী ভয়ে ছিল, ঘুম নি। অধিকাবাবু কখন যে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, অতসী তা টের পায় নি। অধিকাবাবু আরও একটু খাটের দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছ?

কে? তুমি?—হাসবার চেষ্টা করল অতসী।

অধিকাবাবু একটু পরেই আবার জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা এসেছেন, জান?

জানি।—এই ব'লে অধিকাবাবুর দিকে হাত বাড়াল অতসী।

পূর্বদিকের জানলা দিয়ে প্রচুর জ্যোৎস্না এসে ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের মেঝেতে। আজ বোধ হয় পূর্ণিমা।

অতসী অধিকাবাবুর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, বড় আলোটা জালিয়ে দাও না।

কেন, এই অন্ধ-আলোই তো ভাল।—বললেন অধিকাবাবু।

অতসী তবুও পুনরায় বলল, তোমাকে আমি ভাল ক'রে দেখতে পাচ্ছি না। তোমার মুখটা অত শুকনো কেন? কাল থেকে বোধ হয় কিছুই খাওয়া হয় নি?

অতসীর প্রশ্নের জবাব কিছু দিলেন না অধিকাবাবু। তিনি বড় বাতিটা জালিয়ে দিয়ে এসে ব'সে পড়লেন অতসীর পাশে। অতসী তার স্বামীর পাঞ্জাবির কোণটা

হাতের মুঠোতে ধ'রে বলল, সাত মাস আগে এই পাঞ্জাবিটা প'রে তুমি আমার বিয়ে করতে গিয়েছিলে। মনে পড়ে?

মাথা নেড়ে অধিকাবাবু বললেন, পড়ে।

একটু পরে অতসীই আবার বলল, সেদিন এই ধুতিটাও তুমি প'রে এসেছিলে। ঠিক কি না বল?

ঠিক।—বললেন অধিকাবাবু।

তোমার এই ধুতি আর পাঞ্জাবিটা আমার ট্রাকে বন্ধ করা ছিল। তুমি পেলে কি ক'রে?

তোমার ট্রাক খুলে আজ আমি এগুলো বার ক'রে নিয়েছি।

আজকে বার করলে কেন?

প্রশ্নটার জবাব দিলেন না অধিকাবাবু। পাঞ্জাবির পকেট থেকে সর একটা সোনার হার বার ক'রে তিনি বললেন, তোমার মনে পড়ে কি না জানি না, তোমাদের বাড়িতে একদিন রাত্রিতে নেমস্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম—

কথাটা শেষ করবার আগেই অতসী ব'লে উঠল, মাগো, কি কুৎসিত ছিল সেই রাতটা! কত বড় অপবাদ তোমার ঘাড়ে আমি চাপিয়ে দিয়েছিলাম সেদিন। অপবাদ দিয়েছিলাম ব'লেই তুমি বোধ হয় আমার বিয়ে করেছিলে। না?

অতসীর অনেক দিনের একটা ভুল ভেঙে দিলেন অধিকাবাবু। তিনি বললেন, অপবাদের ভয়ে নয়। তোমাকে ভালবেসেছিলাম ব'লেই বিয়ে করেছিলাম। বাক সে সব কথা। অতসী, সেই রাতে আমি তোমার জন্তে এই হারটা নিয়ে গিয়েছিলাম, দেওয়ার সুযোগ তো সেদিন পাই নি—

অতসী মাথাটা হেলিয়ে দিল অধিকাবাবুর দিকে কথা বলার প্রয়োজন বোধ করলেন না তিনি। হারটা অতসীর গলায় নিজের হাতে পরিয়ে দিলেন অধিকাবাবু। অতসী জিজ্ঞাসা করল, সেদিনের সেই লগ্ন আজ কিরে এল নাকি?

শুকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে এলুম অতীতের সেই অন্ধকার রাত থেকে—বিয়ের রাত।

এই ব'লে অধিকাবাবু স'রে বসলেন অতসীর বিছানার কাছে।

রাত সাড়ে নটার সময় অধিকাবাবু বেরিয়ে এলেন

রাখাল

শ্রীশান্তি পাল

রাখাল চলে বাড়িয়ে বেণু
খেয়র পালে তাড়িয়ে আগে,
মুছে যাওয়া কতই ছবি
আজকে কবির মনে জাগে।
ব্রজের কাছ এমনি ক'রে
গোষ্ঠে যেত নিতুই ভোরে,
আহীর বালা পরিষে মালা
চুমতো কপোল অমুয়াগে।
কাদন-বেদন ভুলত সব—
বাঁকা শলীর বংশী-রবে;

যমুনা-জল রঙীন হ'ত
বাধার গোপন সরম-কাগে।
আজো কদম তমাল গাছে—
তাদের স্মৃতি জড়িয়ে আছে;
পল্লী-নারী ঘাটের পথে—
নৃপুং-ধ্বনির চমক মাগে।
যুমান হরি শ্রীধাম সনে,
বৃষ্টি মনের বৃন্দাবনে;
তাই বিপিনে বাঁশীর তালে
তিন ভুবনে দোলা লাগে।

উদ্যাপন

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

নিবিড় ঐশ্বর্য আমি তোমাকেই দেই বারে-বারে।
যখন হৃদয়ে নামে বস্ত্রাধারা বিচিত্র অরুণ
আবেগচেতনাময়, যখন উদ্বেল ভীরুমন
আরক্ত গোলাপ হয়ে কোটে তুচ্ছ বিহ্বল জোয়ারে
ক্ষণ অবকাশ পেয়ে, যে-নিমেঘে বিহ্বলের মত
নীড়ের আশ্রয় খোঁজে আজকের যত ভাবনারা—
কে যেন আড়াল থেকে প্রাণেকেন্দ্রকেই দেয় নাড়া,
হৃদয় মুহূর্ত কাঁপে প্রত্যাশার ভারে অবিরত।

সকল সময় নয় কিন্তু কোনো নিবিড় নিমেঘে
যা-কিছু সম্বল আছে তুলে দেই তোমার হৃ-হাতে
নিজেরি আকাঙ্ক্ষা-চাপে; আমি না যে তুমি হেসে
চালবে করুণাধারা জ্যেষ্ঠে কিংবা শাস্ত্রনের রাতে!

অতুল প্রধামত হানা দেয় অর্গলিত দ্বারে,
সঞ্চিত স্মৃতি যত তোমাকেই দেই বারে-বারে।

অতসীর ঘর থেকে। বাইরের রাস্তা থেকে বিরাট একটা
হল্লার আওয়াজ এসে অতসীর ঘরে পৌঁছল। অতসী
জিজ্ঞাসা করল, এত হল্লা-চিংকার কেন?

বোধ হয় কেউ মোটর চাপা পড়েছে।—বললেন
অধিকাবাবু।

আহা, একটু বাইরে গিয়ে দেখে এসো না।—অতসীর
গলায় অল্পরোধের স্বর : ঝরে যায় নি তো?

দেখে আসছি।

সিঁড়ি থেকেই অধিকাবাবু দেখলেন, নার্সিং-হোমের
বারান্দায় ভিড় জমেছে। নার্সিং-হোমেরই লোক সব।
নার্স ডাক্তার বেয়ারা সব এসে জড় হয়েছে বারান্দায়।

অধিকাবাবু স্বস্তির স্বধীরবাবু ছিলেন ভিড়ের মধ্যে।
জামাইকে দেখতে পেয়ে স্বধীরবাবু উঠে এসে দাঁড়ালেন
অধিকাবাবুর পাশে। তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে তিনি
বললেন, অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। গেট দিয়ে যে রবিকর
চুকছিল আগে তা আমি লক্ষ্য করি নি। হাত থেকে হঠাৎ
ট্রয়ারিংটা আমার কসকে গেল! গাড়িটা ঘুরে গিয়ে পড়ল
রবির গুপ্তর।

বাঁচবার আশা আছে তো?—প্রশ্ন করলেন অধিকা-
বাবু।

স্বধীরবাবু কোন উত্তর দিলেন না। অধিকা গুপ্তর
প্রশ্ন শুনে তিনি কেবল পাগলের মত হাসতে লাগলেন।

ভোলানাথ ইনস্টিটিউশনের সহকারী প্রধান শিক্ষক অমরেশবাবু সন্ধ্যায় দুটো টিউশান সেরে রাত নটায় বাড়ি ফিরছেন। কলকাতার জনবহুল ফুটপাথে ভিড় ঠেলে ঠেলে চলেছেন। দেহ ও মন দুইই ক্লান্ত।

চারটের সময় স্কুলের কাজ শেষ হয়, অর্থাৎ শিক্ষাদান-পর্ব শেষ হয়। তা ছাড়া আরও কাজ থাকে। তা শেষ করতে সাড়ে চারটে বেজে যায়। ইতিমধ্যে জন কয়েক শিক্ষক স্কুলের সামনেই একটা চায়ের দোকানে জমায়েত হন। অমরেশবাবু যেতেই সকলে আপ্যায়নসহকারে বসান তাঁকে : আহ্নান দাখ। কেউ বলেন : এই যে দাখ, এখানে। অনেকদিন কাজ করছেন এঁদের সঙ্গে। জীবন-পথে অনেকখানি পথ পাশাপাশি চ'লে এসেছেন। পরস্পরের সম্পর্কে বিপদে পরস্পরের পাশে দাঁড়িয়েছেন। পরস্পরের মনের ও মতের মিল হয়ে গেছে অনেকটা। অধিকাংশই অমরেশবাবুর প্রায় সমবয়সী। দু-একজন বয়সে কিছু ছোট। গৃহিণী সম্পর্কীয় রসিকতাও চলে পরস্পরের মধ্যে।

এক কাপ ক'রে চা খান প্রত্যেকে। দু-একখানা ক'রে বিস্কুট। কোন কোন দিন। নগদ পয়সা দিতে হয় না। হিসেব আছে প্রত্যেকের। মাসকাবার হ'লে মাইনে পাবার দিন দোকানদার পাওনা মিটিয়ে দেন সবাই। দোকানটি লোক ভাল। ওর ছেলেরা শিক্ষক মশায়দের ছাত্র। খাতির করে সবাইকে। কোন কোন দিন পান-সিগারেট খাওয়ায় সবাইকে। দাম নেয় না।

চা খেতে খেতে নানা আলোচনা চলে। সারাদিনের নিজের নিজের কাজের কথা; নবাগত প্রধান শিক্ষকের মতি-গতির কথা; স্কুলের আর্থিক সজ্জতি ও নিজেদের ভবিষ্যৎ; শিক্ষা-বিভাগের প্রতি সরকারের কার্পণ্য ও ঔদাসীন্য; সারা দেশের শিক্ষকদের দুর্বস্থা; দেশের বর্তমান পরিস্থিতি; শাসকবর্গের কার্যকলাপ; সর্বশেষে, দেশের সর্বসাধারণের অবশ্রম্ভাবী চরম দুর্দশার সম্বন্ধে উৎকর্ষ-প্রকাশ। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যদি কারও কোনদিন মতভেদ ও তর্ক-বিতর্ক ঘটে যায়, সেদিন সেই

আলোচনাটাই আসর জমিয়ে রাখে। অন্য কোন আলোচনা মাথা গলাতে পারে না।

চা-পর্ব শেষ ক'রে সকলেই নিজের নিজের কাজে চ'লে যান। অর্থাৎ, নিজের টিউশানিতে। এক-একজনের তিন-চারটা টিউশান। কেউ দেয় পনের টাকা; কেউ হুড়ি। একটু দ্বিলাদরিয়া লোকের বাড়ির ছেলে হ'লে পঁচিশ। এক-একজনের মোটামুটি বাড়তি আয় ষাট-সত্তর টাকা। মাইনে সত্তর পঁচাত্তর থেকে একশো টাকা। মাগি-ভাতা মাসে হুড়ি টাকা। অমরেশবাবুর মাইনে একশো হুড়ি টাকা। একশো টাকা মাইনে; কিছু অফিসের কাজ করতে হয় ব'লে হুড়ি টাকা বেশী পান। টিউশানি আছে তিনটি। সকালে একটি নিজের পাড়াতেই। পারিশ্রমিক হুড়ি টাকা। সন্ধ্যায় দুটি। বউবাজার অঞ্চলে। পঁচিশ টাকা ক'রে পান। বাড়ি ভাড়াটা চ'লে যায়। বাকী টাকায় নিজের ও পরিজনবর্গের কোন মতে দু বেলা দু মুঠো খাওয়া ও গা-ঢাকানো চলে। টিউশানি না থাকলে উপোস করতে হ'ত। স্ত্রী ও যুবতী কস্তার আঁক রাখা দায় হয়ে উঠত। এ অবস্থা শুধু অমরেশবাবুর নয়, বাংলা দেশের প্রায় সব শিক্ষকেরই। ভাগ্যে সচ্ছল গৃহস্থেরা তাদের ছেলেদের জন্ত পয়সা খরচ করে, শিক্ষকদের অবসরটুকু কিনে নেয়; না হ'লে তাদের দুর্বস্থার সীমা থাকত না। অথচ, সারাদিনের পরিশ্রমের পর, খালি পেটে, বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ছেলে পড়ানো যে কত কষ্টকর ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বোঝে না। অপমানজনকও বটে। ছাত্রের বাড়িতে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় অনেককণ। বাড়ির চাকর-বাকররা নিজেদের সমশ্রেণী ভেবে বাড়ি হাত দিয়ে কথা বলবার চেষ্টা করে। বাড়ির ভিতরে যিহ্নের খনখনে গলায় 'খোকামণি, মাষ্টার এসে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে যে' স্পষ্ট শোনা যায়। খোকামণির পড়বার ইচ্ছা না থাকলে গৃহিণীর কঠোর 'খোকা আজ পড়বে না। মাষ্টারকে যেতে ব'লে দে; কাল যেন ঠিক সময়ে আসে।' তাও স্পষ্ট কানে আসে। গা ঘিনঘিন করে শুনে; লজ্জায় অপমানে মাথা হেঁট হয়ে আসে মাষ্টার মশায়ের। কোন কোন বাড়িতে খাতিরও করে : আহ্নান মাষ্টার মশায়, বসুন। এক কাপ

চা আসে বাড়ির ভিতর থেকে। এক-আধ দিন থাকারও।

এমনই ক'রে জীবন কাটছে। ভাল লাগে না জীবন। মনে হয় দিন দিন নেমে যাচ্ছেন। যে উচু স্থরে জীবনের তার বেঁধেছিলেন একদিন, সে বাঁধন আলগা হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। বেহরো বাজছে। এই কি মানুষের জীবন! সকাল থেকে রাত্রি দশটা অবধি প্রাণধারণের জন্ত এই প্রাণপণ প্রয়াস। মহুগুড়ের এই অপমান! আনন্দের মাধুর্য নেই, আশার আবেগ নেই; বাহ্যিক জীবনের কুৎসিত পরিবেশ থেকে পালিয়ে এসে অন্তরের নিভৃত নিলয়ে কিছুক্ষণের জন্তও আত্মগোপনের উপায় নেই; যুগ-যুগান্তরের দেশ-দেশান্তরের গুণী ও জ্ঞানী জন যে অক্ষয় রস ও জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চয় ক'রে গেছেন, তা আত্মদান করবার অবকাশ নেই। এই যদি স্বাধীন দেশের সভ্য শিক্ষিত মানুষের জীবনের রূপ হয়, তা হ'লে সভ্যতার মূল্য কি? স্বাধীনতার মূল্য কি? শিক্ষা-বীক্ষার মূল্য কি?

অমরেশবাবু পথ চলছেন আর এই সব কথা ভাবছেন। নিজের জীবনটার ওপর আত্মোপাস্ত চোখ বুলিয়ে নিচ্ছেন। বাবা ছিলেন মফস্বল কলেজের অধ্যাপক। সামান্ত বেতন পেতেন। তখনকার সস্তা-গণ্ডার দিনে কোন রকমে সংসার চ'লে যেত। চাকর বামুন রাখবার ক্ষমতা ছিল না। সংসারের সব কাজ মা করতেন। নীরবে হাসিমুখে। বাবা রোজ বাজার ক'রে আনতেন নিজে। শহরের মাঝ দিয়ে একটা ভারী বোঝা বুলিয়ে গটগট ক'রে হেঁটে আসতেন। মাথা উচু হয়েই থাকত। লজ্জা-সঙ্কোচের লেশমাত্র ছায়াপাত পড়ত না তাঁর প্রসন্ন মুখে, তাঁর প্রশস্ত ললাটে, তাঁর উন্নত মস্তকে। জীবনে কারও কাছে মাথা নোয়ান নি; কারও তোষামোদ করেন নি; কারও কাছে হাত পাতেন নি। নিরহঙ্কার, নিরভিমান, সদানন্দ পুরুষ। মাও ছিলেন তেমনি। স্বামীর যোগ্য স্ত্রী। স্বামীর স্বল্প আয়ে কুলিয়ে গুছিয়ে সংসার চালিয়ে গেছেন। কোনদিন অভাব-অনটনের কথা মুখ ফুটে স্বামীকে জানান নি। শাখা লোহা ছাড়া কোন আভরণ ছিল না অঙ্গে; সিঁথিতে সিঁচুর ও পায়ে আলতা পরা ছাড়া কোন প্রসাধন করেন নি কোনদিন। তবু মুখে কোনদিন অসন্তোষের

ছায়া পড়ে নি। লেশমাত্র অহুযোগ বা খেদ করেন নি কোনদিন। সারাদিন সারাক্ষণ একটি মিষ্টি হাসি ঠোঁটে লেগেই থাকত। আরও দুটি বোন ছিল অমরেশবাবুর। মাকে জ্বালাতন করত কত! মুখ বুজে সহ্য করতেন মা; একটিবারও শাসন করতেন না। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় দশ টাকা বৃত্তি পেলেন। বাবাকে বলতেই বললেন, কম্পিট করতে পারলি না? মাকে জানিয়ে প্রণাম করতেই মাধায় হাত বুলিয়ে চুমু খেলেন। বললেন, মুখখানা শুকিয়ে গেছে। একটু শরবত ক'রে দিই। দেবতে পেলেন মার চোখ দুটি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মুখ ফুটে কিছু বললেন না। বি. এ. পরীক্ষায় ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেলেন। এবার বাবা গিঠে হাত চাপড়ে বললেন, বেশ, বেশ! মা বললেন, ওঁর মত হও বাবা। স্বামীর উপরে জীবন এতখানি, শ্রদ্ধা জীবনে আর দেখেন নি। এম. এ. পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণীতে পাস করলেন। পরীক্ষার কিছু আগেই মা মারা গিয়েছিলেন। পরীক্ষার খবরে দ'মে গিয়েছিলেন তিনি। কাউকে খবর দিতে সঙ্কোচ হচ্ছিল। পড়বার ঘরে পড়ছিলেন বাবা। তাঁকে প্রণাম করতেই বললেন, কি হ'ল? খবর শুনেই মুখটা শুকিয়ে উঠল বাবার। মুহূর্তে আত্মসংবরণ ক'রে বললেন, তা হোক। স্নান হাসি হেসে বললেন, মাকে খবর দাও। ব'লেই মুখ নামিয়ে পড়তে শুরু করলেন। বাবার চোখে জল এসেছিল, তাই গোপন করলেন। শোবার ঘরে মায়ের ফোটোর নীচে মাথা ঠেকিয়ে বলেছিলেন—মা, পাস করেছি। বাবার মত পারি নি। ক্ষমা কর মা। আশীর্বাদ কর মা। মেঝেতে ব'সে প'ড়ে কঁদেছিলেন। বাবা এলেন একটু পরেই; বললেন, স্নান ক'রে খেয়ে-দেয়ে নাও। প্রক্ষেপারি জুটল না। নিজেদের শহরে একটা স্কুলে মাস্টারি পেলেন। বাবা বললেন, এই-ই কর। এর মধ্যে পড়াশুনা ক'রে আর একটা গ্রুপে পরীক্ষা দেবার চেষ্টা কর। যে দিন প্রথম কাজে যোগ দিলেন, বাবাকে প্রণাম করতেই বললেন, শিক্ষকের কাজ অত্যন্ত কঠিন কাজ। জাতির ভবিষ্যতের ভিত্তি গঠন করবে তোমরা। শিক্ষকের বাক্য কর্ম চিন্তা চরিত্র ও জীবনযাত্রাপ্রণালী একটি মহৎ আদর্শ অহুয্যায়ী নিয়ন্ত্রিত হবে। শিক্ষক ছাত্রদের সামনে সর্বদা একটি মহৎ আদর্শ স্থাপন করবেন, এবং সেই আদর্শ অহুসরণ

করার জন্য তাদের অহুপ্রাণিত করবেন। শিক্ষক সভ্য-নিষ্ঠ নিরহকার বিনয়ী নির্লোভ হবেন। কোন অবস্থাতেই কারও কাছে আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হতে দেবেন না। অনেকদিন শিক্ষকতা করেছেন। কিন্তু আদর্শ বজায় রাখতে পেরেছেন কি? তাঁর বাবার কাছে অনেক ছাত্র পড়তে আসত। কোনদিন কারও কাছ থেকে একটি পয়সাও নেন নি। কোন ছাত্র হয়তো কোনদিন একটা বড় মাছ নিয়ে এসে বলল, বাবা পাঠিয়ে দিলেন সার। সঙ্গে সঙ্গে ফেরত দিতেন। বলতেন, আমরা চুনা মাছ খাই। একদিন একটা বড় মাছ খেলে লোভ বেড়ে যাবে। নিয়ে যাও। তিনি কি করেছেন? বাড়িতে বাড়িতে বিজ্ঞা বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। আত্ম-অবমাননা করছেন প্রতি পদে পদে। সে দিনের একটা ঘটনা মনে এল। মাস কয়েক আগে শহরে শিক্ষক-সম্মেলন হ'ল। তাঁদের স্কুলের একজন যুবক শিক্ষক সম্মেলনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করলেন। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল: বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি ও সংস্কার। তাতে অনেক কথার সঙ্গে এই কথাটি বলা হয়েছিল যে, বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না হ'লে শিক্ষা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত হতে পারবে না। শিক্ষকের দুর্দশাও সূচবে না। প্রবন্ধটি তিনিই লিখে দিয়েছিলেন। সেই সম্মেলনে যুবক শিক্ষকদের চেঁচায়, শিক্ষা-বিভাগ ও শিক্ষকদের প্রতি সরকারের ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে একদিনের জন্ত ধর্মঘট করবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ফলে নির্দিষ্ট দিনে তাঁদের স্কুলে ও শহরের অনেক স্কুলে ধর্মঘট হয়েছিল। তিনি ধর্মঘটে যোগদান করেন নি। তাঁদের স্কুলের প্রধান-শিক্ষক বিলেত-ফেরত লোক। বিলিভী ডিগ্রীধারী। পরিচালক-সমিতির জরনৈক সভ্যের আত্মীয়। মেজাজ বেজায় কড়া। তিনি সঙ্গে সঙ্গে পরিচালক-সমিতির সভা ডাকলেন। সভায় প্রস্তাব করলেন, যে সব শিক্ষক ধর্মঘটে যোগদান করেছেন, তাঁরা যদি ক্ষমা প্রার্থনা না করেন, তাঁদের কাছে যোগদান করতে দেওয়া হবে না। সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। বয়স্ক শিক্ষকেরা ক্ষমা প্রার্থনা করে কাছে যোগ দিলেন। যুবক শিক্ষকেরা ক্ষমা প্রার্থনা করতে রাজী হ'ল না। বলা বাহুল্য, তাঁদের চাকরি গেল। যুবক-

শিক্ষকেরা দিন কয়েক হৈ-চৈ করল। বাকী শিক্ষকদের মনেও অসন্তোষের হাওয়া বইতে লাগল। প্রধান শিক্ষক চতুর ব্যক্তি। তিনি যুবক শিক্ষকদের জায়গায় আর নতুন লোক নিয়োগ করলেন না। তাদের কাজ বাকী শিক্ষকদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন, এবং প্রত্যেকের মাগিয়া ভাতা দশ টাকা করে বাড়িয়ে দিলেন। ফলে, শিক্ষকদের সহানুভূতি ঠাণ্ডা হয়ে এল। মাস খানেক পরে প্রধান শিক্ষক মহাশয় একদিন তাঁকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন। যেতেই বললেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। আশা করি, সভ্য কথা বলবেন। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, মিথ্যা বলা আমার অভ্যাস নেই।

একজন শিক্ষকের উপযুক্ত কথা। শুনে স্থগী হলাম। আচ্ছা, শিক্ষক-সম্মেলনে যে প্রবন্ধটি আমাদের স্কুলের স্থানান্তর পড়েছিলেন, সেটা কি আপনার লেখা?

হ্যাঁ।

তা হ'লে এ কথা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, তাঁদের মতের সঙ্গে আপনার মতের অমিল নেই।

না।

তবে আপনি ধর্মঘটে যোগ দেন নি কেন?

ধর্মঘটে যোগ দেওয়া আমি শিক্ষকের পক্ষে অহুচিত মনে করি।

একটু চুপ করে থেকে প্রধান শিক্ষক বললেন, ওঁরা যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন নি, সে কি আপনারই পরামর্শে?

না। ওঁরা যা করেছেন, নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা মতেই করেছেন।

ওঁদের চাকরি যাওয়াতে আপনি তো কোন আপত্তি করেন নি? বাড়তি মাগিয়া ভাতা নিতেও আপত্তি করেন নি?

তিনি জবাব দিতে পারেন নি। লজ্জায় মাথা নীচু করে ছিলেন।

প্রধান শিক্ষকের অধরোষ্ঠ তীব্র বিজ্ঞপের হাসিতে ছুরির কলার মত বাঁকা হয়ে উঠল। বললেন, আমি হ'লে ওঁদের পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই পদত্যাগ করতুম।

নীরবে অপমান হতুম করেছিলেন তিনি। তাঁর বাবা হ'লে কি করতেন? সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগপত্র লিখে প্রধান শিক্ষকের সামনে ছুঁড়ে দিয়ে স্কুল থেকে চিরদিনের মত চ'লে

আসতেন। ও-লোকটার মুখদর্শন করতেন না কোনদিন।
অভাবের তাড়নায় আত্মমর্দনাবোধ ভোঁতা হয়ে এসেছে।
যদি মফস্বল শহরে চাকরি করতেন, যদি সংসারে এমন ক'রে
জড়িয়ে না পড়তেন, তা হ'লে হয়তো আত্মসম্মান বজায়
রেখে, মাথা উচু রেখে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতেন।
বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। একেবারে একা হয়ে পড়লেন।
খালি বাড়িতে মন টিকত না। এমন সময় কলকাতার
স্থলের চাকরিটার খবর পেলেন। মাইনে আশি টাকা।
ওখানে ষাট টাকা পেতেন মাত্র। দরখাস্ত করলেন।
চাকরি পেয়ে কলকাতায় চ'লে এলেন। একটা মেসে
থাকতেন প্রথমে। ওই ভাবেই একা একা জীবনটা কাটিয়ে
দেবেন স্থির করেছিলেন। বোনেরা প্রায়ই চিঠি লিখত;
অহরোধ করত—বিয়ে কর। কর্ণপাত করতেন না তাদের
অহরোধে। শেষে তাঁর এক সহকর্মীর বোগসাজসে বিয়ে
করতে হ'ল। কি একটা ছুটিতে সহকর্মীর সঙ্গে ওদের দেশে
গিয়েছিলেন। ওর এক আত্মীয়কন্যাকে দেখানো হ'ল
তাকে। মেয়েটির বাপ মা বেঁচে ছিল না। কাকাই
অভিভাবক। মেয়েটির নাম কমলা। ওকে দেখে ভাল
লাগল তাঁর। ওর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল মাস দুই পরে।
আরও মাস দুই পরে ওকে কলকাতায় এনে সংসার
পাতলেন। নিমতলা স্ট্রীটের কাছাকাছি একটা গলিতে
একটি ছোট একতলা বাড়ি ভাড়া নিলেন। পাশাপাশি
দুটি মাত্র কুঠরি। সামনে একফালি বারান্দা। ভাড়া
মাসে ত্রিশ টাকা। কমলা যেন হাতে স্বর্গ পেল। কি
আনন্দ! ক ক্ষুধা। সেই ছোট ঘর দুটি মেজে ঘ'সে
ঝকঝকে পরিষ্কার ক'রে তুলল। স্বপ্ন আসবাবপত্র শুছিয়ে-
গাছিয়ে রাখল। নূতন-কেনা সস্তা খাটটিতে নিজের
সামান্য শয্যা পরিপাটি ক'রে পাতল। তাঁকে ভাগিদে দিয়ে
বিয়ে দু-চারটে ছবি, ঠাকুর-দেবতার পট, নানা রকম সস্তা
আসবাবপত্র কিনিয়ে ঘর সাজাল। ধীরে ধীরে ছোট
সংসারটির চারদিকে নিজেই জড়িয়ে ফেলল, জড়িয়ে
ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকেও জড়িয়ে ফেলল ভালবাসার
সহস্র ভক্ত দিয়ে। ঢেলে সাজল তাঁকে। ধমক দিত, এ
রকম ক'রে কাপড় পরে না। তুমি যেন কি! একটু
সেজে-গুজে থাকতে পার না? পাঁচজনে বলবে কি?
যখন একা ছিলে, যা করেছ, করেছ। এখন সবাই আমাকে

দোষ দেবে যে। খাওয়াপাওয়ার বিষয়েও তাই। রাত-
দিন অহুযোগ, এত কম খেলে বাঁচবে কি ক'রে? এত
পরিশ্রম করতে হয়। অভিমান ক'রে বলত, আমার হাতের
রান্না খেতে কষ্ট হয় তোমার? জিজ্ঞাসা করত, হ্যাঁ গো,
বরাবর মার হাতে খেতে বুঝি! খুব ভাল রান্না করতেন
মা? বল না, কি রাঁধতেন? কেমন ক'রে রাঁধতেন?
এমনই ক'রে ছোট্ট সংসারটির সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতার মধ্যে
দুটি জীবন সম্পূর্ণভাবে মিশে গেল; দুটি মনের মিলন ঘটল
নিখুঁতভাবে। পরস্পর পরস্পরকে পাওয়ার মধ্যে তিলমাত্র
ছেদ রইল না, খেদ রইল না। দুজনের কোন ক্রটি, কোন
অভাব পরস্পরের চোখে পড়ত না। পরিপূর্ণ প্রেমের
রঙিন আলোতে দুজন দুজনের কাছে অপরূপ সুন্দর হয়ে
উঠতেন।

দু-তিন বৎসর কাটল এমনই ক'রে। জীবনের সর্ব-
শ্রেষ্ঠ অংশ। জীবন-বর্ষের বসন্ত কাল। এর মধ্যে খুকী
এসে গেল। কমলার কাজ বাড়ল আরও। খুকীর সারাদিন
খবরদারী। খরচ কিছু বাড়ল। টিউশনি করতে শুরু
করলেন। কমলা খুঁতখুঁত করত, হ্যাঁ গো, সারাদিনই
বাইরে বাইরে থাকবে নাকি? একলা ঘরে সন্ধ্যার পর
মন টেকে না বাপু! খুকী আজ কাঁদছিল তোমার
জন্মে। তিনি হয়তো বলতেন, খুকীর মা? কমলা বলত,
খুকীর মার তো খুকীর মত পাড়া মাতিয়ে কাঁদা চলে
না! কাঁদছিল বই কি। মনে মনে—আমর করতেন—
ওকে নানাভাবে। রাখে শুয়ে শুয়ে কত গল্প! কত
স্বপ্ন রচনা! জীবন আরও সুন্দর হবে, সার্থক হবে,
স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে। পরিপূর্ণ আনন্দস্রোত একটানা বইতে
থাকবে জীবন-নদীতে। দুদিনের দুঃসহ উত্তাপে সব
শুকিয়ে গিয়ে তলার পাক ঘুলিয়ে উঠবে, কে ভেবেছিল
তখন? দুঃখের দিন শুরু হ'ল যুদ্ধ বাধবার পর থেকেই।
চাল-ভাল তরি-তরকারি কাপড়-চোপড় সব জিনিসের দাম
চতুর্গুণ চড়ল, বাড়িভাড়া দ্বিগুণ বেড়ে গেল। দুশো
টাকাতেও সংসার চালাতো দায় হয়ে উঠল।

কলকাতায় বোমা পড়ল। শহর থেকে লোক পালাতে
শুরু করল। তিনি কমলা ও খুকীকে ওর কাকির বাড়িতে
পাঠিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। কিছুতেই গেল না।
মরতে যদি হয়ই, একসঙ্গে পাশাপাশি মরবে—জানিয়ে

দিল কমলা। ছুভিক হ'ল। চালের মণ চল্লিশ টাকা ছাড়িয়ে গেল। তিনটি প্রাণীর সংসার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে লাগল। সরকারী বরাদ্দ চালে পেট ভরত না হুজনের। তরকারি মাছ দুখুঁল্য। সব দিন কেনা চলত না। ধুতি শাড়ি দুখুঁপা। কমলা ছেঁড়া কাপড় সেলাই ক'রে পরতে লাগল। তিনি বাড়িতে লুজি পরতে শুরু করলেন। দুধ বন্ধ ক'রে দিয়ে খুকীকে ভাত খাওয়ানো শুরু হ'ল। জীবনের জোলুস দিন দিন ক'মে এল। তবু তখনও কমলার মুখের হাসি স্নান হয় নি। খোকা এল বৎসর কয়েক পরে। অস্থখ হ'ল কমলার। স্ত্রিতিকা নিয়ে শুরু হ'ল। বধাসাধ্য চিকিৎসা করালেন। কমলার দু-একখানা অলঙ্কার বিক্রয় ক'রে ভাল ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করালেন। কিছুই হ'ল না। রোগের উপশম হ'ল না। বরং আরও নানা রোগ দেখা দিল। কিডনির দোষ। লিভারের দোষ। শরীর দিন দিন শীর্ণ দুর্বল হয়ে উঠতে লাগল। মেজাজ হয়ে উঠল খিটখিটে। মুখের সেই মিষ্ট হাসি কোথায় গেল উবে, মিষ্ট কথা কোথায় গেল হারিয়ে। এখন কথায় কথায় রাগ, কটু কথা। প্রতিটি কথা ঘেন মনের গায়ে হল ফোটাতে থাকে। তারপর, খোকার অস্থখ হ'ল। ওরও লিভার-কিডনির দোষ। পাড়ার ডাক্তার-বাবু চিকিৎসা করতে লাগলেন খোকার, খোকার মায়েরও। ভাল চিকিৎসক নন, কিন্তু সত্যিকারের ভাল লোক, যা আজকালকার পৃথিবীতে দুর্লভ। সত্যিকার দরদ দিয়ে চিকিৎসা করতেন। প্রথম যেদিন এলেন, ফী দিতে গিয়েছিলেন। হাতটা ঠেলে দিয়ে বলেছিলেন, শিক্ষকের কাছ থেকে ফী নিই না। দু বৎসর বিনা ফীতে চিকিৎসা করেছেন। তিনি অবশ্য ডাক্তারবাবুর ছুটি ছেলেকে বিনা পারিশ্রমিকে পড়িয়ে দিয়েছেন। ছেলে দুটি স্থল থেকে পাস ক'রে কলেজে পড়ছে। কমলা ও খোকা দুজনেই ভুগছে এখনও। ডাক্তারবাবুর চিকিৎসা বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি নিজে থেকে বন্ধ করেন নি। কমলা বন্ধ করেছে। মৃত্তর চিকিৎসায় বিশ্বাস নেই ওর। কমলার ইচ্ছা কোন নামজাদা ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাতে। পয়সার অভাবে তা সম্ভব হচ্ছে না। মাঝে একজন তরুণ ডাক্তার ডেকে এনেছিলেন। তাঁর ভূতপূর্ব ছাত্র। বড়লোকের ছেলে। নাম সুবিমল। বিলেত থেকে পাস ক'রে এসে

ডাক্তারি শুরু করেছে; একদিন রাস্তায় দেখা হ'ল। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। সম্মানে নিজের ডাক্তারখানায় নিয়ে গিয়ে বসাল। তাঁর ও পরিবারের কুশল জিজ্ঞাসা করল। তিনি স্ত্রী ও পুত্রের পরিচয় দিলেন। পরদিন সুবিমল এসে রোগীদের দেখে গেল। ঔষধের ব্যবস্থা করল। নিজের ডাক্তারখানা থেকে বিনা পয়সায় ওষুধ দিতে লাগল। মাস খানেকের মধ্যে বেশ কাজ হ'ল। কমলা উঠে দাঁড়াল। সংসারের কাজকর্ম কিছু কিছু করতে লাগল। খোকাও অনেকটা ভাল হয়ে উঠল। ফুলে ছিল। ফোলাটা অনেক ক'মে গেল। ফ্যাকাশে ভাবটাও ক'মে এল। আশাষিত হয়ে উঠলেন স্বামী-স্ত্রীতে। কমলার মুখে আবার হাসি ফুটল। দুজনে সুবিমলকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করতে লাগলেন।

চিকিৎসা চলতে লাগল। কিন্তু আর উন্নতি হ'ল না। বরং আবার খারাপ হতে শুরু করল। কমলার মুখে আবার অন্ধকার জ'মে উঠল। মুখের হাসি গেল মিলিয়ে। সুবিমলের উপর বিশ্বাস অন্তর্হিত হ'ল। শেষে সুবিমলের ওষুধ খাওয়া বন্ধ করল। খোকাকেও খেতে দিল না। সুবিমলের সঙ্গে লজ্জায় দেখা করেন না আজকাল। মাঝে মাঝে দেখা হয়ে যায়। সুবিমল জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছেন সব? চিকিৎসা বন্ধ করলেন কেন? মিথ্যা কথা বলতে হয়—ভাল আছে অনেকটা। অনেকদিন ওষুধ ব্যবহার করা তো হ'ল। সিন্টেটিকে একটু ট্রায়াল দেওয়া উচিত। সুবিমল বলে, বেশ। বেশ। একটু ধারাপের দিকে গেলেই কিন্তু ব্যবস্থা করবেন। একদিন সুবিমল বলল, আমার মনে হয় দিন কতক কলকাতার বাইরে নিয়ে গেলে সুবিধে হবে। আপনাদের দেশে পাঠিয়ে দিন না। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, চেষ্টা ক'রে দেখবেন। চেষ্টা করেছিলেন। সুবিধা হয় নি। দেশের বাড়ি বাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। তাঁর বাবা দেশের বাড়ি বেগী যেতেন না। তিনি নিজে তো একেবারেই সম্পর্ক রাখেন নি। কমলাকে ওর কাকার কাছে পাঠাবার চেষ্টা করেছিলেন। কমলা রাজী হয় নি। কমলার কাকীমা লোক ভাল নন। কমলার সঙ্গে কোনও দিন ভাল ব্যবহার করেন নি। কলকাতা আসার পর থেকে কমলা আর যায় নি সেখানে। ধীরে ধীরে তাঁর

চোখের সামনে তাঁর স্ত্রী ও পুত্র মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অল্পম অপদার্থ স্বামীর প্রতি গভীর বিরাগ ও অভিমান নিয়ে সপুত্র চ'লে যাচ্ছে কমলা। তিনি নিরুপায় দাঁড়িয়ে ওদের শেষ-বিদায় দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

একটি মাত্র উপায় আছে ওদের বাঁচাবার, নিজের বাঁচাবার। উপায়টি সহজ, কিন্তু অত্যন্ত গ্লানিকর। আদর্শের যে উচ্চ শিখরে একদা শিক্ষকজীবন বরণ করেছিলেন, সেখান থেকে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছেন ধীরে ধীরে প্রতি পদক্ষেপে। হঠাৎ যেন লাক দিয়ে একেবারে নীচে পড়তে হবে। আদর্শ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুতি ঘটবে। সত্য পথ ছেড়ে মিথ্যা পথে চলতে হবে। সরল সমতল পথ। জনতা-সম্মুল। কিন্তু পঙ্কিল পুতিগন্ধময়। আর্থিক উন্নতি হুনিশ্চিত, আর্থিক অধোগতিও হুনিশ্চিত। বাবা বলতেন—শিক্ষক সর্বপ্রকার দীনতা ও হীনতার উপরে মাথা উচু করে থাকবেন। তাঁর মাথা উচু থাকলে, জাতিরও মাথা উচু থাকবে। তিনি ভেঙে পড়লে জাতিও ভেঙে পড়বে একদিন। মাথা তো নীচু করেছেন অনেকখানি। তা ব'লে মাটিতে নুটিয়ে পড়বেন? পঙ্কুগুণ্ডে গড়াগড়ি দেবেন? মন কিছুতেই রাজী হচ্ছে না। সপ্তাহ বানেক বাদে তাঁর বাড়িওয়ালা মনোহরবাবু তাঁকে ডেকে পাঠালেন। গত মাসের ভাড়াটা কিছু বাকি ছিল। তারই অন্তে ডেকে পাঠিয়েছেন, ভেবে তিনি দেখা করতে গেলেন। ভক্তলোক কোন একটা মাড়োয়ারী ফার্মের বড়বাবু। বঁটে খোটা দেহ। মাথায় চকচকে টাক। গায়ে ফতুয়া। বাইরের রকে উবু হয়ে ব'সে হাঁকো টানছিলেন এবং পাড়ার বন্ধু-বান্ধবদের বাজারের বর্তমান হাল-চাল ও অজ্ঞাত খবর জানাছিলেন। তাঁকে দেখে লাক দিয়ে উঠে বললেন, আহুন, আহুন। বিশেষ কথা আছে আপনার সঙ্গে—বন্ধু-বান্ধবদের বিদায় দিয়ে, তাঁকে নিয়ে গিয়ে বৈঠকখানায় বসালেন। হাঁকোটি ক্ষেওয়ালে চেষ্টা দিয়ে রেখে এসে, সামনে ব'সে, কিছুক্ষণ টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, আপনি ম্যাট্রিকের পরীক্ষক?

তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। কে বলেছে আপনাকে? ভক্তলোক বললেন, অরুণবাবু।

অরুণ তাঁর বন্ধু-পুত্র। তাঁদের স্কুলে শিক্ষকতা করত।

ধর্মঘটের ফলে চাকরি গেছে। এখন বেকার। তাঁর বাড়িতেই থাকে। বাড়িওয়ালার ছেলেটিকে পড়ায়। মাসে দশ টাকা পায়। হাতখরচটা চ'লে যায়। তাঁর কাছেই বরাবর থাকা ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা। যখন চাকরি ছিল, খরচ দিত। এখন কিছুই দেয় না।

ভক্তলোক বললেন, আমাদের ফার্মের মালিকের একটি ছেলে এ বছর ম্যাট্রিক দিয়েছে। তার খাতা নাকি আপনার কাছেই আছে।

তিনি বললেন, এ খবরটাও অরুণ দিয়েছে বুঝি?

আজ্ঞে, হ্যাঁ। উনিই দিয়েছেন।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, অরুণবাবু বলছিলেন—পাস নম্বরের চেয়ে পাঁচ নম্বর কম আছে। অল্প অল্প বিষয়ে ছেলেটি পাস করেছে—খবর নিয়ে জানা গেছে। এখন আপনার কাছে পাস করলেই পাস করে যাবে। হঠাৎ তাঁর হাত দুটো জড়িয়ে ধ'রে বললেন, আপনাকে একটি কাজ করতে হবে, অমরেশবাবু, ছেলেটিকে পাস করিয়ে দিতে হবে। আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন লোকটির কথা শুনে। এ রকম অহরোধ কেউ তাঁকে করতে পারে ব'লে তিনি কোনদিন কল্পনা করেন নি। তাঁর দারিদ্র্যের স্বযোগ নিয়ে লোকটি তাঁকে এই অজ্ঞায় কাজের জন্য অহরোধ করতে সাহস করেছে, ভেবে রাগ হয়েছিল তাঁর। কড়া জবাব এসেছিল ঠোটে। আশ্ব-সংবরণ করেছিলেন মুহূর্ত মধ্যে। শাস্ত কঠে জবাব দিয়েছিলেন, স্কুলের পরীক্ষাতে কোন ছেলেকে যদি এমনভাবে পাস করিয়ে দিতে অহরোধ করতেন, অহরোধ রাখতাম না। এ তো বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা। মনোহরবাবু বললেন, আপনার কাছে অহুগ্রহ ভিক্ষা করছি অমরেশবাবু। এতে আমার নিজের কোন স্বার্থ নেই। একজন ভক্তমহিলার কাতর অহরোধ আপনাকে জানাচ্ছি আমি। যদি প্রয়োজন হয়, তিনি নিজে এসে আপনাকে অহরোধ করবেন। তারপর তড়বড় করে মনোহরবাবু যা যা বললেন, তার ভাবার্থ এই—মনোহরবাবুর মনিবের ছই বিবাহ। বড় স্ত্রীর একটিমাত্র পুত্র। বয়স প্রায় পঁচিশ। লেখাপড়া বিশেষ করে নি। কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য বেশ বোঝে। ব্যবসাতেই তাকে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছোট স্ত্রীরও একটিমাত্র পুত্র। প্রায় বুড়ি। সেই ছেলেটিই

এ বৎসর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে। শহরের একজন বিখ্যাত মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যাকে মনোহরবাবুর মনিব পুত্রবধূরূপে গৃহে আনতে চান। কন্যার পিতার ইংরেজী-লেখাপড়া-জানা ছেলের হাতে কন্যা সম্প্রদান করার একান্ত বাসনা। ছোট জীব ছেলেটি যদি ম্যাট্রিক পাস করেতে পারে, তার সঙ্গেই বিবাহ হবে। এবং বিবাহ হ'লেই সে ছেলেটি ভবিষ্যতে শহরের ব্যবসায়ের মালিক হতে পারবে। ছোট গিন্নী মনোহরবাবুকে ভেঁকে বলেছেন, ছেলেটিকে যে কোন রকমে পাস করিয়ে দিতেই হবে। যা খরচ হবে আমি দেব। সব পরিচয় দিয়ে মনোহরবাবু মুখখানা তাঁর মুখের কাছে এনে কণ্ঠস্বর নীচু পর্দায় নামিয়ে বললেন, হাজার টাকা পৰ্বস্ত মেবে বলেছে। কলমের একটা আঁচড়ে হাজার টাকা! ব্যাপারটা বিবেচনা ক'রে দেখুন অমরেশবাবু।

অমরেশবাবু চুপ ক'রে রইলেন। মনোহরবাবু বললেন, আজ এখনই জবাব দিতে হবে না। বাড়িতে গিয়ে ভাবুন গে। অরুণবাবুকে দিয়ে যা বলবার ব'লে পাঠাবেন। তার পরদিন অরুণের হাতেই খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, ওর দ্বারা ও-কাজ সম্ভব হবে না। মনোহরবাবুর, নিজের চেষ্টা সমানভাবেই চলছে। প্রত্যেক দিন সকালে একবার ক'রে জোর তাগিদ দিচ্ছেন। তা ছাড়া অরুণকে দিয়েও চেষ্টা চালাচ্ছেন। পুরস্কার আরও লোভনীয় ক'রে তোলা হয়েছে। হাজার টাকা নগদ। তা ছাড়া, আসানসোলের কাছে ওদের ফার্মের নানা রাসায়নিক দ্রব্য ও নানা ঔষধ তৈয়ারির কারখানা আছে, সেখানে অরুণের কেমিস্টের চাকরি হবে। অরুণ বি. এস-সি. পাস। কমলা তার হাতেই খুকীকে সম্প্রদান করবে ব'লে অনেক দিন থেকে স্থির ক'রে রেখেছে। খুকী ও অরুণের কাছে কমলার এ সম্বন্ধ অজানা নেই। তা ছাড়া তাঁরও ভাল চাকরি হবে। চিত্তরঞ্জনর কাছাকাছি ওরা একটি ছোট শহর তৈরী করছে। সেখানে একটি উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেছে। সেই স্কুলের হেড মাস্টার করা হবে তাঁকে। মাসিক বেতন বর্তমানে দুশো টাকা। বধ্যাযোগ্য মাগি-ভাত। বিনা ভাড়ায় ভাল বাড়ি। স্বাস্থ্যকর জায়গা। এমন চমৎকার জল বায়ু যে, দু মাস জলপান ও বায়ুসেবন করলেই শরীর সুস্থ সবল হয়ে উঠবে। এই-সব কথা

মনোহরবাবু প্রতিদিন শোনাচ্ছেন তাঁকে। আর অরুণ শোনাচ্ছে কমলাকে। শুনতে শুনতে লোভে কমলার চোখ দুটো চকচক ক'রে ওঠে। তাঁরও লোভ হয়। শোবার ঘরে বাবার ফোটোর সামনে দাঁড়িয়ে মনের বল সংগ্রহ করেন। প্রতিদিন মনোহরবাবুর অহরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। কমলা অহবোধ করে, কলহ করে, কান্নাকাটি করে, নিজের ভাগ্যকে তীব্র কটু ভাষায় শিকার দেয়। কিন্তু তিনি চোখ-কান বুজে, মনকে শক্ত ক'রে নিজ সঙ্কল্পে স্থির হয়ে আছেন এখনও।

কাছেই সুবিমলের ডাক্তারখানা। সামনে রাস্তায় ওর মোটর গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। সুবিমল পিছন ফিরে মোটরের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। চমৎকার চেহারা সুবিমলের। লম্বা দোহারা গঠন। ফরসা রঙ। পরনে বিলিভী পোশাক। ফিটফিট থাকে সর্বদা। মনটিও চমৎকার। বড় খাতির করে তাঁকে। অনেক ছেলে তো বেরিয়ে গেছে তাঁর হাত দিয়ে। আর কেউ সুবিমলের মত খাতির করে ব'লে মনে পড়ে না। ছেলেটির ভাল হবে, মনে মনে আশীর্বাদ করলেন অমরেশবাবু। হঠাৎ সুবিমল পিছন ফিরল। অমরেশবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হেসে কাছে এসে নমস্কার ক'রে বলল, এতক্ষণে ফিরছেন? চলুন, বসবেন। অমরেশবাবু বললেন, তুমি কোথাও বেরিয়েছিলে বুঝি? সুবিমল বলল, হ্যাঁ, তা হোক, একটু পরে গেলে ক্ষতি হবে না। ডাক্তারখানায় বসিয়ে, নিজে ব'সে বলল; আজ কদিন আপনার কথা ভাবছিলাম। দুটো বিলিভী পেটেন্ট ওষুধ ঠিক ক'রে রেখেছি। দিন কয়েক আগে একজন এজেন্ট দিয়ে গেছে। লিটারেচার প'ড়ে যা দেখেছি তাতে মনে হচ্ছে, মায়ের আর খোকার ওতে বেশ কাজ হবে। ব'লেই কম্পাউণ্ডারকে ওষুধ দুটো বার করতে বলল। কম্পাউণ্ডার ওষুধ দুটো এনে টেবিলে নামিয়ে দিল। অমরেশবাবু বললেন, দাম কত? সুবিমল বলল, দাম একটু বেশীই। আমাকে তো এমনই দিয়ে গেছে। তা হ'লে চলুন। আশিতো ওই দিকেই যাচ্ছি। হেদোর কাছে নামিয়ে দেব আপনাকে। গাড়ি থেকে নামবার সময় সুবিমল বলল, দিন কয়েক ব্যবহার ক'রে কি ফল হয় জানাবেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস ওদের কলকাতার বাইরে নিয়ে না গেলে কোন ওষুধেই রোগ সম্পূর্ণ সারবে না—

বাড়ি পৌছতে রাাত্র দশটা বেজে গেল। বাইরের দরজায় ধাক্কা দিলেন। ‘মাই বাবা!’ সাড়া এল সঙ্গে সঙ্গেই। দরজা খুলে দিল পনের-বোল বৎসরের একটি মেয়ে। স্বাস্থ্যবতী শ্রামলী মেয়ে। হাতে একটি লঠন। অমরেশবাবু বললেন, এইখানেই বসেছিলি বুঝি?

মেয়েটি মুহূ হেসে বলল, হ্যাঁ বাবা।

তোমার মা কি করছে?

জুয়ে আছেন?

খোঁকা?

ঘুমিয়ে পড়েছে।

অমরেশবাবু সন্মুখে মেয়েটির পিঠে মাথায় হাত বুলোলেন। মনে মনে বললেন, ভাগ্যে তুই ছিলি মা! না হলে দুর্দশার শেষ থাকত না।

নীচে তলায় পাশাপাশি দুখানি ঘর। সামনে এক ফালি বারান্দা। বারান্দার এক দিক থেকে ছাদে যাবার সিঁড়ি উঠে গেছে। বারান্দার অন্ত দিকটা ছোট দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। সেইখানেই রান্নার ব্যবস্থা।

অমরেশবাবু ঘরে ঢুকলেন। এক পাশে খাটে খোঁকা ও তাঁর জী জুয়ে আছে। জীর সঙ্গে কোন কথা বললেন না। জামা কাপড় ছাড়লেন। কলে মুখ হাত ধুয়ে এলেন। ফিরে এসে দেখলেন, জী উঠে বসে আছে। কাছেই একটা ছোট টেবিলে ওষুধের শিশি দুটো নামানো ছিল। মুখ-চোখের ইজিতে শিশি দুটোকে নির্দেশ করে কমলা বলল, ও দুটো কি? অমরেশবাবু লাগ্নহে বললেন, ওষুধ। স্ববিমল দিল তোমার আর খোঁকার জন্ত। খুব ভাল ওষুধ। খেলেই সেরে যাবে।

কমলা মুখ টিপে হেসে বলল, তাই নাকি।—কণ্ঠস্বরে ব্যস্তের আভাস সম্পষ্ট।

অমরেশবাবুর রাগ হ’ল। রাগ চেপে শাস্ত স্বরে বললেন, প’ড়ে দেখ না কি সব লেখা রয়েছে।

কমলা মুখ বেকিয়ে বলল, পড়েছি।

অমরেশবাবু বললেন, স্ববিমল বলল—এই ওষুধ তোমাদের চেয়েও অনেক শক্ত রোগী সেরে উঠেছে।

কমলা কটু-কঠে ব’লে উঠল, তবে আর কি! সেরে উঠে রাজ্যপাট ভোগ করব।

অমরেশবাবু চুপ করে গেলেন। সারাদিনের আশ্চর্য-

মোচনের শাস্তির নীড়। সারাদিনের অদর্শনের পর প্রিয়া-সম্মর্শন। কঠে স্বধা, মুখে মমতা নিয়ে, সেবাকুশল দুটি হাত দিয়ে জীবনসঙ্গিনী ক্লাস্তি অপনোদনে ব্যগ্র। অথচ একধিন তো সবই ছিল। দারিদ্র্যের ধরতাপে প্রেম ভালবাসা মায়া মমতা সব একেবারে শুকিয়ে গেছে।

কমলা বলল, দেখ, আমার ওষুধপত্রের দরকার নেই। সেরে উঠতে চাই নে আমি। বেঁচে আমার কি হবে? দিনের পর দিন তো এই নরকভোগ। ওর চেয়ে বড় ঈগগির যেতে পারি, ভতই ভাল। তবে খোঁকাটাকে বাঁচাবার চেষ্টা ক’রো। মেগে হোক, যেচে হোক, চুরি-চামারি ক’রে হোক, যেমন ক’রে পার ওকে ভাল ক’রে চিকিৎসা করিয়ে বাঁচাও। পৃথিবীতে এনে এমন ক’রে যেতে দিও না—

অমরেশবাবু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন জীর মুখের দিকে তাকিয়ে। কমলা বলতে লাগল, বিয়ের পর যখন প্রথম দেশে গেলুম, কত লোক বলতে লাগল—শিক্ষিত ছেলেয় হাতে পড়েছিল। মাহুষের মত মাহুষ। শাড়ি গয়না বেশী হবে না হয়তো; কিন্তু চিরকাল স্থখে শান্তিতে থাকবি। জলন্ত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, শিক্ষিত! জীকে ছেলেকে তিলে তিলে মরতে দেখে যে হুঁটো জগন্নাথের মত দাঁড়িয়ে থাকে, সে শিক্ষিত! সে মাহুষ। মুখ্য ছোটলোকরাও জীকে ছেলেমেয়েকে বাঁচাবার জন্ত চুরি ডাকাতি করে, তুমি একটা কলমের আঁচড় দিতে পারবে না? কার কি হবে সংসারে এমন শিক্ষিত মাহুষ নিয়ে? এ সব লোকের সংসারেই বা থাকা কেন? বিয়ে ক’রে ছেলে-মেয়েই বা সংসারে আনা কেন? লোটা-কঞ্চল নিয়ে শয়ানী হয়ে বেরিয়ে যাওয়াই উচিত ছিল—

অমরেশবাবু চুপ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আগের দিনের কথা মনে পড়ল। স্থল থেকে বাড়ি ফিরতেন। কমলা তার আগেই খাবার তৈরি করত, মুখ হাত ধোবার জন্ত বালতিতে জল ধ’রে এনে রাখত। এসে পরবার জন্ত ধুতি গেঞ্জিটি চেয়ারের হাতলে ঝুলিয়ে রাখত। চেয়ারের সামনেই রাখত চটিজুতো দুটি। তারপর নিজে চুল বেঁধে, গা ধুয়ে, রঙিন ডুরে শাড়িখানি প’রে বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাঁর আগমন প্রতীক্ষা করত।

তিনি বাইরের দরজার কড়া নাড়বামাত্র ছুটে এসে দরজা খুলে দিত। ওর মুখে চোখে আনন্দের রোসনাই জ্বলত। যেন ছ-সাত ঘণ্টার বিচ্ছেদ নয়—ছ-সাত যুগের বিচ্ছেদ। ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসতেন, কমলা সামনে বসে পড়ে জুতো খুলে দিত, চটি ছুটো পরিবে দিত, জামা গেঞ্জি খুলে নিয়ে আলনায় টাঙিয়ে রাখত। পাশে দাঁড়িয়ে পাখা করত কতক্ষণ। সঙ্গে সঙ্গে নানা গল্প। গায়ের ঘাম ম'রে আসতেই তাগিদ দিয়ে হাত পা ধুতে পাঠাত। ফিরে এসে কাপড় ছেড়ে, ধোয়া শুকনো গেঞ্জি প'রে, পাশের ঘরে যেতেই দেখতেন—কমলা আসন পেতে খাবার দিয়ে বসে আছে। খেতে বসতেন, সামনে বসে পাখা করতে করতে খাওয়াত কমলা।

কোথায় গেল সে সব দিন! জীবনের কোন্ বাক্য হারিয়ে গেল। অমরেশবাবুর মনে হ'ল, জীবনে ছুটি মাত্র ধাতু—বসন্ত ও শীত।

কমলা বলতে লাগল, অরুণ বলছিল—যে কোন লোকের কাছে ছেলেটি আরও দশ নম্বর বেশী পেত। তার শ্রাব্য পাণ্ডনা দেবে না কেন? পরের ছেলের সর্বনাশ ক'রে কি সুখ হবে তোমার বল দেখি? এমনই পরের ক্ষতি ক'রে এসেছ ব'লেই তোমার জী-ছেলে মরতে বসেছে। একটু থেমে বলল, অরুণ বলছিল—তোমার আত্মসম্মানে বাধছে। বিনা পরসায় জী-ছেলের চিকিৎসা করাতে, ওষুধ ভিক্ষে ক'রে আনতে আত্মসম্মানে বাধে না, আর পরের একটা উপকার করতে আত্মসম্মানে বাধছে? কিসের আত্মসম্মান তোমার? জী-পুত্র-কন্যাকে ভাল ক'রে খেতে-পরতে দিতে পার না, তাদের সাধ আহ্লাব মেটাতে পার না। এত বড় একটা ঘেড়ে মেয়েকে লেখা-পড়া না শিখিয়ে বাড়িতে বসিয়ে রেখেছ; দাসী-বাদীর মত খাটছে; তার বিয়ে দিতে পারছ না; বরং কেউ চেষ্টা করলে তা ভগ্ন ক'রে দিচ্ছ। পাণ্ডনাররা দু'বেলা দরজায় দাঁড়িয়ে পিতৃপুরুষের পিণ্ডি চটকে যাচ্ছে—আত্মসম্মানের বড়াই করতে তোমার লজ্জা করে না? তোমার বাবার গর্ব কর! সম্ভ্র-গণ্ডার দিন ব'লেই অমন ক'রে কাটিয়ে গেছেন। তোমার বাবার চেয়ে কত ভাল ভাল লোক নিজের সংসারের ভালর জন্তে আজকাল কত কি করছে দেখে গে।

একটু থেমে বলল, আমার গয়নাগুলো ফেরত দাও দেখি। তখন ভাল ভাল বচন শুনিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে গা থেকে খুলে নিয়ে গিয়ে বিক্রি ক'রে দিয়ে এলে! কত রকম বক্তিরে—এমন দিন থাকবে না, আবার আগের মত সব হবে, সব নতুন ক'রে গড়িয়ে দেব। অমরেশের মূখের দিকে ক্রুদ্ধ-ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তীব্র কণ্ঠে বলল, কেন মিথ্যে ভুলিয়ে দিয়ে ভুলিয়ে নিলে? দাও, ফিরিয়ে দাও আমার গয়না। আমি গয়না বিক্রি ক'রে আমার ছেলেকে বাঁচাব। হঠাৎ কেন্দ্রে ফেলে বলল, ছেলে আমার চোখের সামনে ম'রে যাচ্ছে, এ আর দেখতে পারছি না। বিষ এনে দাও—হুজনে খেয়ে এক সঙ্গে মরি। না হ'লে গলা টিপে মেরে ফেল আমাদের হুজনকে।

বাইরে থেকে ডাকল খুকী, বাবা, খেতে আসুন।

অমরেশবাবু বেরিয়ে গেলেন। বারান্দায় আসন পেতে জল ও খাবার দিয়ে গিয়েছিল খুকী। খেতে বসলেন।

জীব কথামূলি মনের গায়ে কাঁটার মত ফুটে আছে। জ্বালা করছে সারা মন। কিন্তু কথামূলি তো সত্য! জী-পুত্রকন্যার প্রতি কর্তব্য তো তিনি করতে পারেন নি। দুর্ভিক্ষের বৎসরে এবং পরে জীব চিকিৎসার অল্প গয়না তো তিনি বিক্রি করেছেন। যুদ্ধ শেষ হ'লে আবার স্বমিন আসবে, তখন আবার সব গড়িয়ে দেবেন, সে আশাও তো দিয়েছিলেন। যখন স্বাধীনতা এল, তখন সত্যই আশা করেছিলেন স্বমিন আসবে, তাঁদের দুর্দশা দূর হবে। দেশের যে প্রক্কেয় নেতারা দেশের শাসনভার হাতে নেবেন, তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁদের সম্বন্ধে স্ববিচার করবেন। তাঁদের কাজের সত্য-মূল্য নির্ধারণ ক'রে, তাঁদের জীবন-যাত্রার পথ স্বগম ক'রে দেবেন। কিন্তু কিছুই হ'ল না যে! সমাজে ও রাষ্ট্রে শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা বিদেশী শাসকেরা যতটুকু স্বীকার করত, এঁরা যে ততটুকু পর্যন্ত স্বীকার করতে নারাজ!

মেয়ে অদূরে বাবার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, বাবা! চারটি ভাত দেব? হঠাৎ সম্মিত পেয়ে অমরেশবাবু বললেন, ভাত! দে মা চারটি। তবকারিটা তো বেশ বেঁধেছিস!

মেয়ে সাগ্রহে বলল, আর একটু দেব বাবা?

অমরেশবাবু বললেন, না থাক, তোদের কুলোবে না।

মেয়ে ভাত দিয়ে বাবাকে চুপি চুপি বলল, তরকারি মা রেখেছেন বাবা।

অমরেশবাবু বিশ্বয়ের স্বরে বললেন, তাই নাকি! তোর মা কি খাবে?

রুটি খাবেন। আমি রুটি করেছি।

ঘরের ভিতর থেকে কমলা হাঁক দিয়ে বলল, খুকী, তোর বাবাকে আরও তরকারি এনে দে। আমার জন্তে রাখতে হবে না। আমি ভাতা দিয়ে খেয়ে নেব।

অমরেশবাবুর ভয় হ'ল, রাগ ক'রে বলছে বুঝি। খুকী তরকারি আনতেই চোখ টিপে বেশী দিতে নিষেধ করলেন। আগের দিন হ'লে ভয় হ'ত না, রান্নার একটু প্রশংসা করলেই কমলা সব উজাড় ক'রে তাঁকে দিয়ে দিত। নিজের হুন টিপে ভাত খেত। মুখ ফুটে জানাত না কোনদিন। মুখের হাসি একটুও কমত না। কিন্তু তখনকার দিন ছিল আলাদা। তখন ওর হৃদয় ছিল ভালবাসায় ভরা, চোখে ছিল মমতার মায়াজন।

মুখ ধুয়ে উঠনে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঝিরঝির ক'রে মিষ্টি হাওয়া দিচ্ছে। ঘরের ভিতরে অত্যন্ত গরম। কমলার মেজাজও অত্যন্ত গরম। ঘরের ভিতরে ঢুকে কমলার চোখের সামনে দাঁড়াতে ইচ্ছা হ'ল না অমরেশবাবুর, সাহসও হ'ল না।

যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে পাশের ঘরটা দেখা যাচ্ছে। এ ঘরটা ভাঁড়ার ঘর হিসাবেই ব্যবহার হয়। ঘরের এক পাশে একটা বোর্ডের উপর ছোট বড় টিনে চাল-ভাল-মসলাপাতি। মেঝেতে নানা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। আর এক পাশে একটি ছোট খাট। সেখানেই সাধারণতঃ তিনি শয়ন করেন। অরুণ শোয় চিলে ঘরে। পরীক্ষার খাতা পাওয়া অবধি চিলেঘরেই নিজের শোওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। অরুণের বন্ধু স্ত্রীরাও কাছেই একটা মেসে থাকে। বন্ধুর কাছেই রাজে শোয়ার একটা সাময়িক ব্যবস্থা করেছে অরুণ।

ঘরের মেঝেতে ব'সে খুকী নতমুখে পান সাজছিল তার বাবার জন্তে। তার দিকে তাকিয়ে রইলেন অমরেশবাবু। মুখখানি শুষ্ক মান। আগের চেয়ে কাহিল হয়ে গেছে যেন! হবে না কেন? সারা সংসার তো ওই সাথায় ক'রে রেখেছে। অথচ ওর জন্তে কিছুই করতে পারেন নি।

স্থলে পাঠিয়েছিলেন। নিয়মিত মাইনে দিতে পারেন নি। ক্রী-স্টুডেন্টশিপের অল্প স্থলের কর্তৃপক্ষদের কাছে আবেদন করেছিলেন। আবেদন অগ্রাহ্য হয়েছে। তা ছাড়া, ওর মায়ের অসুখ হওয়ার পর থেকে ওর প্রায় স্থল-কামাই হতে লাগল। কাজেই স্থল থেকে ছাড়িয়ে দিতে হ'ল। এখন বাড়িতে পড়ে, অর্থায় পড়ে না। কখনও ভাল শাড়ি-ব্লাউজ কিনে দিতে পারেন নি। প'য়ে থাকে মোটা শাড়ি আর মার্কিনের সেমিজ। পাশের বাড়ির মেয়েরা ওর বন্ধু। ওরা কত ভাল শাড়ি ব্লাউজ গরনা পরে। ও দেখে। ওর মুখে কোনদিন অসন্তোষ বা ক্ষোভের ছায়া পড়তে দেখেন নি। একটি সরল স্নিগ্ধ হাসি সর্বদাই মুখে লেগে থাকে ওর। তারি নিরীহ ভাল মানুষ। ওর মা কত ধর্মক দেখ, কত তিরস্কার করে। মুখটি কাঁচু-মাচু ক'রে নতমুখকৈ দাঁড়িয়ে থাকে। কোনদিন মুখ ফুটে প্রতিবাদ করে না, নিজের দোষখালনের চেষ্টা করে না। অমরেশবাবুর মনের একান্ত সাধ—ওকে একটি স্বাস্থ্যবান সচ্চরিত্র সক্ষম ছেলের হাতে দেবেন। অক্ষম পিতার কাছে অনেক কষ্ট পেল ও। স্বামীর কাছে গিয়ে যেন ওর সব অভাব ঘুচে যায়, সব সাধ মেটে। কিন্তু সে সাধ তাঁর মিটেবে কি? অরুণ ছেলে ভাল। স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ শিক্ষিত। কমলার ভারি ইচ্ছা খুকীকে ওর হাতে দিতে। খুকীর ও অরুণের ইচ্ছাও কম নয়। তাঁরও অনিচ্ছা ছিল না। এতদিন বিয়ে হয়েও যেত। কিন্তু অরুণ বেকার হয়ে পড়ল যে! ক মাসে একটা চাকরি পর্বন্ত যোগাড় করতে পারল না। ভারি লাজুক প্রকৃতির ছেলে। তাঁর সামনে মুখ তুলে কথা বলতে পারে না। যত আবদার, যত কথা-বার্তা কমলার কাছে। কমলা ছেলের মত ভালবাসে ওকে। পাশের বাড়িতে ওর বাবা থাকত। চাকরি করত পোস্ট-আপিসে। তাঁর সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। অরুণের মা ছিল না। যখন-তখন তাঁদের বাড়িতে আসত। খুকীর সঙ্গে খেলা করত। কমলা তখন থেকেই ওকে স্নেহ করে। ওর বাবা হঠাৎ মারা গেল। অরুণকে নিজের কাছে নিয়ে এল কমলা। তখন থেকেই তাদের কাছে আছে। মানুষ হয়েছে। পড়াশুনা করেছে। বি.এস-সি. পাস করেছে। ওর পড়ার খরচ অবশ্য তাঁর লাগে নি। ওর বাবা কিছু টাকা রেখে গিয়েছিল, তাতেই চ'লে গেছে।

খুকী এসে হাতে পান দিল। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বুকের ভিতরটা কেমন ক'রে উঠল অমরেশবাবুর। একটি করুণ বেদনাময় স্নেহ ন'ড়ে চ'ড়ে উঠল বুকের মধ্যে। মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে, মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে, স্নেহে বললেন, খাবি না? মেয়ে বলল, যাচ্ছি বাবা।

অরুণ খেয়ে গেল কখন?

আপনি আসবার একটু আগে।

মুখখানির উপরে স্নেহ-ব্যাফুল দৃষ্টি বুলিয়ে মনে মনে প্রশ্ন করলেন, তোর মুখে এতখানি মেঘ জমেছে কেন মা? মেয়ের কপালে হাত বুলিয়ে কপালের উপর এসে-পড়া চুলগুলি সরিয়ে দিয়ে বললেন, যাও মা। খেয়ে নাওগে।

হঠাৎ কি জানি কেন, চোখে জল এল তাঁর। মেয়ে চলে যেতেই মুছে ফেললেন।

চিলেঘরটি নেহাত ছোট। এক পাশে শতরঙ্গির উপরে বিছানাটি গুটিনো। আর এক পাশে দেওয়াল-ঘেঁষে-পাতা খান কয়েক খবরের কাগজের উপরে স্তূপীকৃত বইখাতা। অমরেশবাবুর অধিকাংশ, কিছু কিছু অরুণেরও। একটি ছোট মাজুরের উপর একটি জলচৌকি পাতা। পাশে পরীক্ষার খাতার বাঙালি। এইখানে বসে অমরেশবাবু পরীক্ষার খাতা দেখেন। দেওয়ালে কয়েকটা ফোটা। এক পাশের দেওয়ালে অরুণের, অরুণের বাবা ও মায়ের ফোটা। আর এক পাশের দেওয়ালে অমরেশবাবুর বাবার ফোটা। একটি শুকনো মালা ঝুলছে কোটোটি থেকে। বাবার মৃত্যু-দিবসে বুলিয়ে দিয়েছিলেন অমরেশবাবু।

বাবার ফোটার সামনে দাঁড়ালেন অমরেশবাবু। মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। চোখ বুজলেন। বাবার মুখখানি মনের পটে জলজল ক'রে উঠল। সরল হাসি-ভরা মুখ। চোখে অভল প্রশান্তি। মনে মনে প্রার্থনা করলেন, কি করি বলুন বাবা? আর যে পারছি না। কি করতে হবে ব'লে দিন। বাবার আদেশ মনে পড়ল—Fight to the last. Better fight and fall but never surrender. মনে মনে কথাগুলি মস্তের মত উচ্চারণ করলেন। হৃদয়ে বল এল, মনে সাহস এল। শিথিল সঙ্কল্প দৃঢ় হ'ল। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, বাবা, তোমার আদর্শ থেকে অনেকখানি নেমেছি। আর নামব না। স্ত্রী পুত্র কন্তার ভাগ্যে যা আছে হবে,

আমি আমার মনুষ্যত্বের অবমাননা করব না, আমার আত্ম-সম্মানকে কলঙ্কিত করব না। বাবা, আমাকে আশীর্বাদ করুন। দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন তিনি।

খাতা দেখতে লাগলেন অমরেশবাবু। অনেকগুলি খাতা দেখা হ'ল। খুকী এল। হাতে কুঁজো-ভর্তি জল। এক পাশে রাখল। অমরেশবাবুকে বলল, বাবা, জল দেব আপনাকে? অমরেশবাবু বললেন, দে মা। অমরেশবাবুকে জল দিল। তাঁর বিছানাটি বেড়ে-ঝুড়ে পাতঙ্গ। তারপর তাঁর বাবার ফোটার কাছে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। অমরেশবাবু মাথা নীচু ক'রে খাতা দেখছিলেন। তাঁর দিকে একবার তাকাল খুকী। তারপর আলগা পায়ে অস্ত্র দেওয়ালের কাছে গিয়ে অরুণের বাবা ও মায়ের ফোটার নীচে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল এবং একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে অরুণের ফোটার নীচেও মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। তারপর ধীরপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অমরেশবাবু খাতা দেখছিলেন না তখন। খাতার পৃষ্ঠায় দৃষ্টি কেলে বসে ছিলেন, কিন্তু সে দৃষ্টির সঙ্গে মনের যোগ ছিল না। তাঁর মানসচক্রে দেখছিল অরুণের প্রতি খুকীর সসঙ্কোচ প্রজ্ঞা-নিবেদন। অনেকবার তাঁর চোখে প'ড়ে গেছে। অরুণের প্রতি খুকীর গভীর অহুসার ও প্রজ্ঞার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছেন। অরুণের সঙ্গে ওর যদি বিয়ে না হয়, ও অসুখী হবে, ওর জীবন ব্যর্থ হবে—এ সম্বন্ধেও তাঁর কোন সন্দেহ নেই। অরুণের সঙ্গে ওর বিয়ে দেবেন। অরুণের একটা চাকরি-বাংকরি হোক, তার পরে। উনি চেষ্টা করছেন ওর জন্তে। অন্তান্ত স্কুলের অনেক শিক্ষককে ব'লে রেখেছেন। সুবিমলকে ব'লে রেখেছেন। সুবিমলের সঙ্গে অনেক বড়লোকের আলাপ আছে। তা ছাড়া ওর বাবা শহরে একজন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তি। সুবিমল কথা দিয়েছে, ওর বাবাকে ব'লে কোথাও ঢুকিয়ে দেবে অরুণকে। দেবি হবে একটু। কিছুদিন অপেক্ষা করুক দুজনে। সত্য পথে, জ্ঞান পথে যা হবার হোক। কিন্তু মনোহরবাবুর প্রলোভনে ভুলে, তুচ্ছ সাংসারিক সুখ-সুবিধার আশায় অন্তায় ও অসত্যের কাছে আত্মবিক্রম করা চলেবে না। অনেক দিন আগে একটা গল্প পড়েছিলেন। একজন অতি-দরিদ্র লোক শয়তানের কাছে আত্মাকে বন্ধক

দিয়ে তার সাহায্যে দৌভাগ্যের চরম শিখরে উঠেছে। কিন্তু একদিনের তরেও শান্তি পেল না। প্রতি মুহূর্ত, প্রতি আনন্দ-ভোগ শয়তানের ক্রুর হিংস্র মুখের ছায়ায় কালো হয়ে উঠত, বিবাক্ত হয়ে উঠত। পরিব অবস্থায় শক্ত অপরিচ্ছন্ন মাটির উপরে শুয়ে অচিরে ঘুমিয়ে পড়ত। কিন্তু এখন নয়ম পুরু ছুখের মত ধবধবে সাদা বিছানায় শুয়েও চোখে ঘুম আসত না। তারপর একদিন একটি চরমতম উপভোগের মুহূর্তে শয়তান ছিনিয়ে নিয়ে গেল তাকে। বন্দী ক'রে রাখল চিরকালের জন্য নিজের বন্দীশালায়। গল্পটিতে খুব ভাল একটি উপদেশ রয়েছে। জীবনে সংপথে থেকে, সংকল্প ক'রে যদি শুধু দুঃখ-দুর্দশাই পাওয়া যায়, তাইই মাথা পেতে নিতে হবে। এতে হুখ না থাক, আচ্ছন্দ্য না থাক, শান্তি আছে, তৃপ্তি আছে। অসং পথে, অসং কর্মে যত হুখ-সম্পদই আহুক, তাতে শান্তি নেই, তৃপ্তি নেই, আশ্বাস মুক্তি নেই।

চিন্তা-জাল থেকে মনকে ছিনিয়ে নিয়ে পরীক্ষার খাতার উপরে স্তম্ভ করলেন।

অনেকক্ষণ পরে কার কাশির শব্দে চমকে উঠলেন। ডাক দিলেন, কে?

খুকীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আমি বাবা।

এখনও ঘুমোয় নি?

ঘুম আসছে না। ভারি গরম ঘরের মধ্যে—

খাতাটা রেখে বাইরে এলেন অমরেশবাবু। এক টুকরা ছোট ছাদ। চার দিকে উঁচু উঁচু বাড়ি আলো-বাতাস রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে এক পাশের আলসে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে খুকী। বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে, মূর্তির মত স্থিরভাবে। এত রাত্রে এমন ভাবে কি ভাবছে ও? মনে উৎকর্ষা জাগল অমরেশবাবুর। তাঁর ধু-ধু-করা জীবন-মরুতে ওই তো ছিল এক টুকরা মরুস্থান, যেখানে তাঁর মন অপেক্ষের জন্য ছায়া পেত, আশ্রয় পেত, বিশ্রাম পেত। তাও কি উবে গেল নাকি? কাছে আসতেই চমকে উঠল খুকী। তিনি বাইরে আসবেন আশা করে নি সন্তবতঃ। পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে কাঁচুমাচু মুখে তাকাল। অমরেশবাবু সম্মুখেই পিঠে হাত দিয়ে বললেন, কি এত ভাবছিলি?

খুকী উত্তর দিল, কিছু নয় বাবা। আমি বাচ্ছি ঘুমোতে।

চ'লে যাওয়ার উপক্রম করল সে। অমরেশবাবু বাধা দিয়ে বললেন, অরুণ যে চাকরির জগ্রে কোথায় যাবে বলছিল, গিয়েছিল কি? খুকী বলল, গিয়েছিলেন, হয় নি কিছু। অমরেশবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তার মুখের ভাব ঠাহর করতে চেষ্টা করলেন। অন্ধকারে পেয়ে উঠলেন না। কণ্ঠস্বরে ওর মনোবেদনার পরিচয় পেলেন।

খুকী চ'লে গেল। অমরেশবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। খুকীর মনোবেদনার কারণ কি? অরুণের চাকরি হচ্ছে না ব'লে? তিনি অরুণের জগ্রে কিছু ক'রে উঠতে পারছেন না ব'লে? তিনি তো চেষ্টা করছেন। আজ না হোক, দু দিন পরে হবে, বার বার বুঝিয়ে বলেছেন ওকে। ও তো অবুঝ মেয়ে নয়। তবে মনে মনে কেন ও দুঃখ পাচ্ছে? তবে কি ওর ভয় হয়েছে, অরুণ তাঁর উপর রাগ ক'রে ওকে ত্যাগ করবে? অরুণ কি এতখানি অম্মায় করতে পারবে? তাঁর কাছ থেকে এত উপকার পেয়েছে, কমলার কাছ থেকে এতখানি মেহ পেয়েছে, খুকীর কাছ থেকে এতখানি সেবা পেয়েছে, ভালবাসা পেয়েছে। তবু সে চ'লে যেতে পারবে তাদের ছেড়ে? পারবে না কেন? পুত্র পিতা-মাতাকে ছেড়ে যায়; স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে ছেড়ে যায়; জন্মের বাঁধন, ধর্মের বাঁধন মানুষ অবলীলাক্রমে ছিঁড়তে পারে, আর এই সামান্য দেওয়া-নেওয়ার হীনকো বাঁধন ছিঁড়তে পারবে না অরুণ? খুব পারবে। বুকের ভিতরটা কেমন ক'রে উঠল অমরেশবাবুর। অরুণ চ'লে গেলে খুকীর কি বাঁচা সম্ভব হবে? ও নিশ্চয়ই মরবে। তারপর? স্ত্রী যাবে, পুত্র-কন্যা যাবে, সংসারে আপনার বলতে কেউ থাকবে না; কারও উপর কোন দায়িত্ব থাকবে না; সম্পূর্ণ ভারমুক্ত দায়মুক্ত বাধ্যমুক্ত হবেন তিনি। তারপর, আদর্শের স্বর্গভূমির প্রতি নিবন্ধদৃষ্টি হয়ে যুধিষ্ঠিরের মত সম্পূর্ণ একা জীবনের পথে চলতে পারবেন কি? বাইরের কাজ থেকে বাড়ি ফিরে দেখবেন, কমলা নেই, খোকা নেই, খুকী নেই; ঘরে ঢুকলেই নিঃসীম নিরবচ্ছিন্ন নির্জনতা হা ক'রে গিলতে আসবে—ভাবতেই তাঁর বুকের ভিতরটা ভয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠল।

ফিরে এসে ব'লে খাতা দেখতে শুরু করলেন। মনটা

চকল হয়ে উঠেছে। বেশীক্ষণ দেখতে পারলেন না। খাতা-দেখা বন্ধ ক'রে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। চোখের সামনে একে একে সব চ'লে যাবে। সমস্ত পৃথিবী খুঁজলেও আর কারও দেখা পাবেন না! জন্ম-জন্মান্তরেও আর দেখা পাবেন না! অথচ তিনি ওদের বাঁচাবার চেষ্টা করবেন না? ওদের প্রতি তাঁর কর্তব্য করবেন না? তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন না? তাঁর প্রতি গভীর অভিমান নিয়ে ওদের চ'লে যেতে देंবেন? অথচ সামান্য একটু কাজ করলেই, স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়ে বাস করবেন, পদোন্নতি হবে, আয়বৃদ্ধি হবে, কমলা ও খোকা গেরে উঠবে, কমলার মুখের হাসি মনের আনন্দ আবার ফিরে আসবে, অরুণের চাকরি হবে, অরুণের সঙ্গে খুকীর বিয়ে হয়ে যাবে, ওরা দুজনে সুখী হবে। এমন তো কিছু গুরুতর অন্তায় কাজ করতে হবে না। জ্বলের বার্ষিক পরীক্ষায় কত গরিব ছেলেকে পাস করিয়ে দিয়েছেন। এই ছেলেটির পাঁচ নম্বর মাত্র বাড়িয়ে দিতে এমন কি দোষ! হয়তো ওর প্রতি দ্বায় বিচার করেন নি; এঁটার দ্বারা তা শুধরে যাবে। যে ভাবে তাঁরা খাতা দেখেন, তাতে ছাত্রদের প্রতি সব সময় হুঁচকার করতে পারেন কি? সারাদিনের পরিশ্রমের পর, ক্লান্ত দেহে উদ্বিগ্ন বা বিরক্ত মন নিয়ে কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে করা যায় কি? তা ছাড়া ছেলেটির মা এত অহুন্নয় ক'রে অহরোধ ক'রে পাঠিয়েছে, সেটা কি অগ্রাহ করা উচিত? মনোহরবাবু আজও সকালে ভেঁকে বসিয়ে বলেছেন, ছেলেটির মা নিজে এসে অহরোধ করতে প্রস্তুত। অবশ্য অর্থের বিনিময়ে, নানা সুখসুবিধার বিনিময়ে এ কাজটা করা নীতিসঙ্গত হবে না। কমলার কথাটি মনে পড়ল—তোমার সম্যাসী হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। খুব সত্য কথা। তিনি তো সম্যাসী নন! তিনি গৃহী। তাঁর আত্মীয়-পরিজন আছে, তাদের প্রতি কর্তব্য আছে, দায়িত্ব আছে। সেই কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জন্ত যদি কোন নীতিবিরুদ্ধ কাজ করবার প্রয়োজন হয়, তা করতেই হবে। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও তো যুদ্ধে জয়লাভের জন্ত মিথ্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

বাঙাল থেকে সেই ছেলেটির খাতাটি বার করলেন। প্রত্যেকটি উত্তরের উপর চোখ বুলিয়ে গেলেন। কয়েকটি উত্তরে দু-এক নম্বর বাড়িয়ে দিলেই ছেলেটি পাস হয়ে

যাবে। দেবেন নাকি এখনই? বিবেক খুঁতখুঁত করতে লাগল তখনও। বোঝাতে শুরু করলেন বিবেককে। পরীক্ষক কি প্রত্যেক উত্তরের প্রতি হুঁচকার করতে পারেন? উত্তরের মূল্যনিরূপণ উত্তরের প্রকৃত যোগ্যতার উপরে সবটা নির্ভর করে না। অনেকটা নির্ভর করে পরীক্ষকের মানসিক অবস্থার উপর। একই উত্তর একই পরীক্ষকের কাছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মূল্য পায়। পরীক্ষকের মানসিক অবস্থারভেদে উত্তর-পত্রের মোট মূল্য পাঁচ-সাত নম্বর বেশী-কম হয়ে যেতে পারে। বিবেক বলল, এ ছেলেটির ক্ষেত্রে বেশী না হয়ে ক'য়েও তো যেতে পারে। অমরেশবাবু চেপে গিয়ে আবার খাতাটি ভাল ক'রে দেখতে শুরু করলেন। কমবে না নিশ্চয়। তবে বাড়ানোও যায় না। কি করবেন তা হ'লে?

পায়ের শব্দে সামনে তাকিয়ে দেখলেন, কমলা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। সিঁড়ি ভেঙে এসে হাঁপাচ্ছে। গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে অমরেশবাবু বললেন, তুমি এ সময়ে? যুমোও নি? কমলা তাঁর কণ্ঠ বলল, না, ঘুমোব পরে—একেবারে চিরদিনের জন্তে—তুমি একবার নীচে এস দেখি।

গভীরতর বিস্ময় ও উৎকণ্ঠায় অমরেশবাবু বললেন, কি হয়েছে?

খুকী প'ড়ে প'ড়ে কানছে—কিছুতেই থামাতে পারছি না।

কেন?

অরুণ কি বলেছে ওকে। আমরা তো মরণের পথে চলছি। আমাদের জন্তে কিছু ক'রে কাজ নেই তোমার। কিন্তু ওই মেয়েটার মুখের দিকে একবার তাকাও। ওকে অন্ততঃ বাঁচাবার চেষ্টা কর। ও এত করেছে তোমার সংসারের জন্তে, ওর জন্তে কি তোমার কিছুই করবার নেই? অনেক মানুষ দেখেছি, তোমার মত এত আত্মসুখী স্বার্থপর একদুয়ে মানুষ আর দেখি নি।

অমরেশবাবু কমলার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ওর শীর্ণ হাড়-বার-করা মুখ ও কোটরগত দুই চোখ থেকে যুগ্ম বিতৃষ্ণা ও বিদ্রোহ যেন ঠিকরে পড়ছে। অথচ এই মুখ ও চোখ থেকে একদিন সুখ-জয় হ'ত। এই জীবনেই তো!

চল, যাচ্ছি।—ব'লে অমরেশবাবু উঠলেন। নীচে নেমে এলেন কমলার পাছু পাছু।

শয়নকক্ষে মেঝেতে সামান্য শয্যার উপরে খুঁকী উপুড় হয়ে শুয়ে, বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কঁাদছে। অমরেশবাবু মাথায় কাছে ব'সে মাথায় হাত দিয়ে বললেন, কেন কঁাদছিস বল দেখি? কি হয়েছে?

খুঁকী তেমনই কঁাদতে লাগল। কমলা বলল, বল না, অরুণ কি ব'লে গেছে? শুধু প'ড়ে প'ড়ে কৈদে কি করবি? যা বলেছে সব খুলে বল।

অমরেশবাবু বললেন, তুই উঠে ব'সে আমাকে সব বল দেখি। যদি প্রতিকার আমার হাতে থাকে তো করব।

খুঁকী উঠে ব'সে অশ্রুজড়িত স্বরে বলল, উনি কাল এখান থেকে চ'লে গিয়ে গুঁর বন্ধুর ওখানে উঠবেন। গুঁরা কখন বন্ধু এক সঙ্গে দেশ ছেড়ে চ'লে যাবেন।

অমরেশবাবু সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, কোথায় যাবে?

খুঁকী বলল, আন্দামান যাবেন। কি সব করবেন সেখানে—

যাওয়ার সব ঠিক হয়ে গেছে?

উনি তো তাই বললেন—

অরুণ কাল সকালে আসবে তো?

হ্যাঁ, এসে জিনিসপত্র নিয়ে যাবেন—

অমরেশবাবু মেয়ের দিকে তাকালেন। কৈদে কৈদে চোখ মুখ ফুলে গেছে। গুঁর ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল। বড় আদরের ছিল তাঁর। যতক্ষণ বাড়িতে থাকতেন, তাঁর কাছে কাছে থাকত। যা আবদার করত, এলেন সেটিকে।

যেমন ক'রে হোক তা পূর্ণ করতেন। কমলা রাগ করত—মেয়েটাকে আদর দিয়ে মাটি ক'রে দিচ্ছেন ব'লে। সেই তাঁর অতি পরমস্নেহাস্পর্শের কস্তার জীবন ছুঃখময় হয়ে উঠবে, তার সব সাধ সব আশা ব্যর্থ হয়ে যাবে—এর প্রতিকার তাঁর হাতে থাকতেও তিনি করবেন না?

অমরেশবাবু আশ্বাসের স্বরে খুঁকীকে বললেন, আর কঁাদতে হবে না। ঘুমো। আমি সব ব্যবস্থা করব। অরুণকে কোথাও যেতে হবে না। আমাদের কাছেই থাকবে ও। তোর কোন চিন্তা নেই।

উপরে উঠে গেলেন অমরেশবাবু। বাবার কোটোর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনার পক্ষে আর চলতে পারলাম না বাবা। বাস্তব জীবনের দাবির কাছে আত্মসমর্পণ না ক'রে পারলাম না। আমাকে ক্ষমা করুন বাবা।

চোখ বুজলেন। বাবার প্রশান্ত প্রসন্ন মুখখানি এখন আর মনের পটে ফুটে উঠল না। ধীরে ধীরে ফুটে উঠল মৃত্যুর অব্যবহিত পরের মুখখানি। ভাবলেশহীন বিবর্ণ পাখুর। চোখ দুটি অধনিমীলিত নিশ্চরণ নিশ্চত। সেদিন তাঁর আত্মকণ্ঠের কোন কথাই তাঁর কানে পৌঁছয় নি। আজও আর পৌঁছল না।

মাড়রে বসলেন। ছেলেটির উত্তর-পত্র আবার পড়তে শুরু করলেন। তারপর স্বাভাবিক ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

সে রাত্রে আর ঘুমতে পারলেন না অমরেশবাবু। ছাদে পায়চারি করলেন বাকি রাত। ভোরে গঙ্গাস্নান করতে গেলেন। বাবার সময় বাবার কোটোটি খবরের কাগজে মুড়ে বগলদাঁবা করলেন। গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিয়ে এলেন সেটিকে।

ছড়ায় আঁকা

আনন্দ বাগচী

কোথায় ভূমি পৌরাণিক ছড়ায় আঁকা মেয়ে।

যমুনাবতী সরস্বতী কিংবা সতী কঙ্কাবতী
রোদের বাঁকা কলস কাঁখে চলেছ গান গেয়ে ॥

নটেগাছের কড়ে-আঙুল ছায়াটি দোলে জলে।
কালের চর তেপান্তর ব্যঙ্গ ক'রে বানায় ঘর,
আবার সেই বালু-শহর ভাঙে সে শিশু-ছলে ॥

লঙ্কাগাছে রবিবারটি রাঙা টুকটুক করে।

এখন শুধু ক্রুদ্ধ দিন আকাশে তোলে বাঁকা সড়িন,
বৃষ্টি পড়ে মনে-মনের ধূসর ছায়াঘরে ॥

কোথায় ভূমি গিয়েছ চ'লে লঙ্কাবতী বধু।

বকুলতলা অঙ্ককার অচিনকালের পাকীটার
বন্ধ ঘরে দিগন্তের স্বপ্ন করে ধুধু ॥

গাড়া পরেশনাথের পায়ে কাছ থেকে ঢালু ধরে ধরে আমলকীর বন যেখানে এসে শেষ হয়েছে, সেখানে বেশ ঘন ছায়া জমিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শিশু আর সেগুনের ছোট একটা ভিড়; তারই পাশে দাঁড়িয়ে আছে হলদে রঙের ডাকবাংলো; এবং এই ডাকবাংলোরই হাতার লতা-জড়ানো বেড়ার কাছাকাছি এসে বাঁ দিকে ঘুরে গিয়েছে কাকর-ছড়ানো গিরিভি রোড।

ছোট ডাকবাংলো। বারান্দায় দাঁড়ালে দেখা যায়, পরেশনাথের পাথুরে মাথা জড়িয়ে একটা কালো মেঘ ঘোঁরাটে হয়ে ঝুলছে। বৃষ্টি হবে, বোধ হয়।

বাংলার মধ্যে পাশাপাশি মাত্র চারটি কামরা। তিনটি কামরাই খালি। শুধু একটি কামরার দরজার কড়াতে, আজ তিন দিন হ'ল, স্ততো দিয়ে বাঁধা কার্ড ঝুলছে। কার্ডের উপর লাল পেনসিলে লেখা—মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস চক্রবর্তী।

কিন্তু বৃষ্টি হ'ল না। আজ তিন দিন হ'ল রোজ সকালে যেমন হ'ল, আজ সকালেও তেমনি, হঠাৎ বড়ের হাওয়া ছুটেতে আরম্ভ করে, মেঘের ঘোর কেটে যায়। আর বলক দিয়ে রোদ ছড়িয়ে পড়ে আমলকীর বনের উপর। যেমন এই তিন দিন, তেমনি আজও বেড়াতে বের হয়ে যান মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস চক্রবর্তী। অর্থাৎ, এন. চক্রবর্তী ও তাঁর স্ত্রী স্বস্তিকা চক্রবর্তী।

বাংলার গাড়ি-বারান্দা থেকে ছুটে বের হয়ে যায় চক্রবর্তী-দম্পতির মোটর গাড়ি, নতুন মডেলের একটি টুরার। গাড়ির নম্বর হ'ল পাঞ্জাব জলদ্বরের একটি নম্বর।

ড্রাইভার এই সময় বাংলার খানসামার ঘরে খাটিয়ার উপর পড়ে ঘুমোতে থাকে। গাড়ি ড্রাইভ করছেন স্বয়ং এন. চক্রবর্তী। স্বামীর পাশে, স্বামীর সঙ্গে বড় বেশী গা ঘেঁষে বসে থাকেন স্বস্তিকা চক্রবর্তী। স্বস্তিকার মাথাটা জ্বলন্ত একটি নেট-জড়ানো খোপা নিয়ে আধভাঙা বোটার ফুলের মত এলিয়ে পড়ে এন. চক্রবর্তীর কাঁধের উপর।

গাড়ি চালান এন. চক্রবর্তী, কিন্তু গাড়ি থামে স্বস্তিকা চক্রবর্তীর ইচ্ছায়। পৃথিবীর বুকের উপর এমন একটা ভাল জায়গায় এলে কিছুক্ষণ থামতে আর থাকতে চায়

স্বস্তিকা, যেখানে আরও অব্যাহত স্বচ্ছন্দ্য নিজেকে স্বামীর বুকের কাছে আরও আপন করে দিতে পারা যায়।

এন. চক্রবর্তী হঠাৎ গাড়ির স্পীড মুহূর্তে ক'রে দিয়ে বলেন, এই তো একটা ভাল জায়গা, এর চেয়ে নির্জন জায়গা আর হতে পারে না স্বস্তি।

স্বস্তিকা বলে, থেং।

এন. চক্রবর্তী আশ্চর্য হন : থেং কেন ?

স্বস্তিকা। দেখছ না, একটা রাখাল ছোঁড়া ওই গাছটার তলায় ঘুমিয়ে রয়েছে।

এন. চক্রবর্তী। তাতে কি হয়েছে ?

স্বস্তিকা। না, এখানে থেমে কোন লাভ হবে না। এর চেয়ে বরং ডাকবাংলোটাই টের বেশী ভাল জায়গা। চল, ফিরে যাই।

এই হ'ল এন. চক্রবর্তীর আর স্বস্তিকা চক্রবর্তীর বেড়াতে যাওয়া আর বেড়িয়ে আসা। এবং এই ছোট হলদে রঙের ডাকবাংলোটাও সত্যিই বেশ ভাল জায়গা। তাই তো মাত্র এক ঘণ্টার জন্ত থাকতে এসে এই ডাকবাংলোতে তিন দিন ধ'রে থেকেই গিয়েছে ছ'জনে। স্বস্তিকারই ইচ্ছা, আরও কটা দিন থেকে যেতে হবে। তিনটি কামরাই খালি, ডাকবাংলোর বুক জুড়ে বড় জ্বলন্ত আর বড় মিষ্টি একটা নির্জনতা যেন থমথম করে। বারান্দার উপর পড়ে আছে একটি মাত্র চেয়ার এবং ওই এক চেয়ারের উপর স্বামীর সঙ্গে ইচ্ছামত আর যেমন খুশি তেমনি ক'রে বসে থাকতে পারে স্বস্তিকা। কোন বাধা নেই। ঘণ্টা না বাজালে খানসামাও কখনো হঠাৎ এদিকে এসে পড়ে না।

আজ তিন দিন হ'ল যেমন রোজ সকালে তেমনি আজও সকালে বেড়িয়ে ফিরে আসেন এন. চক্রবর্তী ও স্বস্তিকা, স্বামী আর স্ত্রী, জলদ্বরের সব চেয়ে বেশী নামকরা সার্জন এন. চক্রবর্তী ও লুইয়ানার সব চেয়ে বড় ফার্মাসির মালিক এস. ভট্টাচার্যের শ্রালিকার মেয়ে স্বস্তিকা।

আজ মাত্র এক মাস হ'ল বিয়ে হয়েছে স্বস্তিকার। যে বয়সে বিয়ে হ'লে ভাল হয়, তার চেয়ে বেশ একটু বেশী বয়স হয়েছে স্বস্তিকার। স্বস্তি পেয়েছে, স্বস্তি হয়েছে, স্বস্তি

হয়েছে স্বস্তিকার জীবন। মনে হয়েছে স্বস্তিকার, আট বছর ধরে লুধিয়ানাতে এসে লুকিয়ে-প'ড়ে থাকা জীবনের একমাত্র আশা এতদিনে সফল হয়েছে। ব্যর্থ হয় নি তার বয়সের প্রতীক্ষা।

ডাকবাংলোর বারান্দার উপর উঠেই স্বস্তিকার এতক্ষণের উল্লাসচঞ্চল ছুটি চোখের দৃষ্টি হঠাৎ অপ্রসন্ন হয়ে একটি কামরার বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। কেউ একজন এসেছে। লোকটাকে একটু বেহায়া বলেই মনে হয়। আরও ছোটো কামরা খালি প'ড়ে থাকতে, লোকটা বেছে বেছে ঠিক স্বামী-স্ত্রীর মেলামেশার নীড় এই সবুজ রঙের কামরাটিরই পাশের কামরায় এসে ঠাই নিয়েছে। কার্ড বুলছে বন্ধ দরজার কড়াতে—পরিতোষ গাঙ্গুলী, টিয়ার মার্চেন্ট।

এন. চক্রবর্তীর চোখে কৌতূহলের হাসি ফুটে ওঠে : কি ভাবছ স্বস্তি ? এ জায়গার চেয়ে সেই জায়গাটাই তো ভাল ছিল, কেনন ?

উত্তর দেয় না স্বস্তিকা। এন. চক্রবর্তী হেসে ফেলেন : আর ক'দিন এখানে থাকতে চাও স্বস্তি ?

স্বস্তিকার মনের অপ্রসন্নতা যেন ঝংকার দিয়ে বেজে ওঠে : আর এক মিনিটও না।

পাশের কামরার বন্ধ দরজা হঠাৎ খুলে যায়। দু'বার জোরে জোরে গলা কেশে দরজার বাইরে এসে দাঁড়ান এক ভদ্রলোক। সিন্ধের গেঞ্জি গায়ে, পায়ে হরিণের চামড়ার চটি, তাঁতের ঘুতি পরা এক ভদ্রলোক।

কে জানে কেন, বোধ হয় আলাপ করার জন্য ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসেছেন ভদ্রলোক। কিন্তু বের হয়েই যেন থমকে গিয়েছেন। কোন কথা বললেন না ভদ্রলোক। স্বস্তিকার মুখের দিকে কিছুক্ষণ অপলক চোখে তাকিয়ে রইলেন, তার পরেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বোধ হয় পরেশনাথের চূড়ার আলো-বলসানো রূপ আরও ভাল করে দেখবার জন্য বারান্দার ওই প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন টিয়ার মার্চেন্ট পরিতোষ গাঙ্গুলী।

এক হাত দিয়ে এন. চক্রবর্তীর একটা হাত বড় বেগী শক্ত করে আঁকড়ে ধরে থাকে স্বস্তিকা। আন্তে আন্তে বলে; ঘরের ভেতর চল।

এন. চক্রবর্তী আবার হাসেন : কি হ'ল ?

স্বস্তিকা বলে, না, সত্যিই আর এক মিনিটও না। চল, এখনি এখান থেকে স'রে পড়ি।

এন. চক্রবর্তী। এখনি মানে আজকের দিনটা কাটিয়ে কাল সকালে, এই তো ?

স্বস্তিকা ছটকট করে ওঠে : না না, এখনি, এইমাত্র চ'লে যেতে হবে। ড্রাইভারকে ডাক, জিনিসপত্র গাড়িতে তুলুক। খানসামাকে ডেকে বিল চুকিয়ে দাও।

ঘরের ভিতরে ঢুকে রূপ করে একটা চেয়ারের উপর ব'সে পড়েন এন. চক্রবর্তী। মুখের পাইপে ছোট ছোট টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়েন, মাঝে মাঝে শিশ দেন আর পা দোলাতে থাকেন।

ঘরের ভিতরেও ওই একটি মাত্র চেয়ার। ওই চেয়ারে স্বামীর সঙ্গে গা বেঁবে বসবার জন্য দু'পা এগিয়ে যাবার আগেই স্বস্তিকার পা ছোটো বেন ট'লে ওঠে। দরজার কপাট বন্ধ করে দিয়ে, বন্ধ কপাটের উপর পিঠ ঠেকান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, যেন শ্রান্ত ক্লান্ত ও ভীত দেহের আলস্ত-ভার কোন মতে সামলে রাখবার চেষ্টা করছে স্বস্তিকা।

এন. চক্রবর্তী বলেন, কিন্তু আমার যে আজই সন্ধ্যায় একবার সিরিডি পর্যন্ত দৌড়ে আসবার কথা।

শিউরে ওঠে স্বস্তিকার চোখের পাতা : হঠাৎ গিরিডিতে কিসের দরকার হ'ল ?

এন. চক্রবর্তী। আমার বন্ধু লেকটেন্যান্ট জয়সোয়ালের বিয়ে।

স্বস্তিকা আতঙ্কিতের মত চেষ্টা করে ওঠে, না, আমি একা থাকতে পারব না।

এন. চক্রবর্তী। তা হ'লে তুমিও চল।

স্বস্তিকা। না না, তুমি তো জানই যে আমি লোকজনের ভীড় সহ্য করতে পারি না, তবে মিছে কেন ওসবের মধ্যে আমাকে যেতে বলছ ?

এন. চক্রবর্তী। কিন্তু—

স্বস্তিকা। কিন্তু-টি কিন্তু নেই। এখান থেকে এখনি সোজা ফিরে চল জলজ্বরে। আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম, এমিকে বেড়াতে এসো না, দ্রিস্ট ইণ্ডিয়া আমার মোটেই ভাল লাগে না।

—এটা একটা নতুন কথা বটে, এই প্রথম শুনলাম। হাসিমুখেই স্বস্তিকার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে তারপর

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকেন এন. চক্রবর্তী, এবং বোধ হয় ভাবতে থাকেন, স্বস্তিকার মনে তা হ'লে আরও একটা বাতিক আছে। বিয়ে হবার পর এই এক মাসের মধ্যে স্বস্তিকার মন আর মেজাজের অনেক কিছু জানবার সঙ্গে সঙ্গে এন. চক্রবর্তী শুধু এইটুকুই জেনেছেন যে, লোকের চোখের দৃষ্টি সহ্য করতে পারে না স্বস্তিকা। ভীড়ের চোখের সামনে পড়লেই যেন ছটকট করে স্বস্তিকা, লোকের চোখের দৃষ্টি সত্যিই যেন ওর গায়ে বিঁধছে। অনেক ঠাট্টা করেও স্বস্তিকার মনের এই বাতিক আজও সারাতে পারেন নি এন. চক্রবর্তী।

ভাবতে ভাল লাগে এন. চক্রবর্তীর। স্বস্তিকা চায়, যেন সারা জগতের মধ্যে শুধু একজনেরই চোখ সারান্ধ তাকিয়ে থাকে স্বস্তিকার হৃদয় মুখের দিকে। স্বস্তিকার স্বামী নবেন্দুর চোখ।

—বড় বেশী তাড়াতাড়ি করতে বলছ স্বস্তি। এখন মাত্র সকাল নটা, না খেয়েদেয়ে এখুনি রওনা হ'লে—

স্বস্তিকার মুখের দিকে তাকিয়েই একটু চমকে ওঠেন এন. চক্রবর্তী। ভয়-পাওয়া রোগীর চোখের মত চোখ,

স্বস্তিকা অদ্ভুত চোখের দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে আছে তাঁরই মুখের দিকে।

—কি? জ্বর-টর হ'ল নাকি?

—জ্বরের মতনই লাগছে। খুব মাথা ধরেছে।

—তাই বল। জ্বরে পড় এখুনি। আমি মনে করলাম, তুমি তোমার মনের বাতিকে ওই একটা বাজে লোকের তাকানিতে রাগ করে আর ভয় পেয়ে একেবারে একটা... ইয়ে হয়ে গেলে... বুদ্ধিহ্রাসি হারিয়েই ফেললে।

আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে, তার পরেই শরীরটাকে যেন ঝুপ করে হঠাৎ একটা আছাড় খাইয়ে বিছানার উপর শুয়ে পড়ে স্বস্তিকা। আঁচলটা টেনে মুখের উপর আলগা করে ছড়িয়ে দেয়। কী ভয়ানক সত্য কথা স্বস্তিকার স্বামী এন. চক্রবর্তীর মুখে নতুন একটা আদালতের রায়ের মত ধ্বনিত হয়েছে। ওই লোকটা সত্যিই যে সেই বাজে লোকটা, আট বছর আগে যে লোকটা স্বস্তিকার মুখের দিকে শেষবারের মত তাকিয়েছিল।

সেই রকমই সিঁড়ের গেঞ্জি; সেই রকমই তাঁতের ধুতি, আর সেই ধরনেরই হরিণের চামড়ার চটি। আট বছরের



দাঁত ও মাড়ির পক্ষে

বিশেষ উপকারী—

নিমের সক্রিয় সারাস্রা দিয়ে প্রস্তুত

একমাত্র টুথ পেস্ট!

ক্যালকাটা



কেমিক্যাল

মধ্যেও কোন অপঘাতে মরে যায় নি লোকটা, সেই গানির আশ্বনে পুড়ে কয়লা হয়ে গিয়েও আবার বেঁচে উঠেছে দেখা যায়।

কোন দিন কোন মুহুর্তে ওই লোকটাকে ভয় করে নি স্বস্তিকা। শুধু ঘুণাই করেছিল আর রাগ করেছিল। কিন্তু আজ স্বস্তিকারই ভয়ঙ্কর ঘুণায় দিকৃত সেই লোকটা কী হিংস্র ভয়ের মূর্তি ধরে স্বস্তিকার স্থায়ী জীবনের ঘরের পাশে এসে ঢুকছে।

কেমন ক'রে এখানে এল লোকটা? লোকটা কি দৈববাণী শুনেছিল যে, আলিপুরের সেই দোতলা বাড়ির মেয়েকে একদিন এই হলদে রঙের ডাকবাংলোর ভিতরে পাওয়া যাবে?

মাটির একটা রঙিন পুতুলকে যত সহজে গুঁড়ো ক'রে আর ধুলো ক'রে দিতে পারা যায়, আজ স্বস্তিকার এই স্বপ্নের জীবনকে তার চেয়েও সহজে ধুলো ক'রে দিতে পারে লোকটা। তার জন্ত স্বস্তিকার গায়ে একটা টোকা দিতেও হবে না, শুধু কয়েকটা কথা এন. চক্রবর্তীর কানের কাছে ব'লে দিয়ে চ'লে গেলেই হ'ল। আট বছর আগের আলিপুর দায়রা-জজের আদালতের একটি মামলার রায়। বাস, তার পর মুখের উপর থেকে এই আঁচল সরিয়ে তাকালে স্বামীকে এই ঘরের মধ্যে আর কি দেখতে পাবে স্বস্তিকা? এই বিছানার উপর স্বস্তিকাকে এই ভাবেই একটা ছাঃস্বপ্নের ছঃসহ ক্লেশের মত ফেলে রেখে এন. চক্রবর্তী তাঁর টুরার নিয়ে ছুটে চ'লে যাবেন জলদ্বার।

আসছে বোধ হয়; হরিণের চামড়ার চটি বাংলোর বারান্দার উপর উল্লাস ক'রে শব্দ ছটকটিয়ে ছুটে আসছে। সেই শব্দ শুনে স্বস্তিকার কানের কাছে ঘাম হয়ে ফুটে উঠছে শরীরের ভয়ানক রক্তের কণাগুলি।

স্বস্তিকার আঁচল-ঢাকা মুখটা বোধ হয় আস্তে ফুঁপিয়ে উঠেছিল। তাই, হাতের বইয়ের উপর থেকে চোখ তুলে স্বস্তিকার দিকে তাকিয়ে এন. চক্রবর্তী বলেন, ঘুমোবার চেষ্টা কর স্বস্তিকা। বেশ ভাল একটা স্বপ্ন দেখলে সব মাথাধরা সেরে যাবে।

না, কেউ এল না। বন্ধ দরজার কড়া শব্দ ক'রে বেজে উঠল না। বোধ হয় আর একটু পরেই আসবে।

অসহায়ের মত সব পরিণাম দৈবের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে শাস্ত্রহতে চেষ্টা করে স্বস্তিকা, এবং ঘুমোতেও চেষ্টা করে। ঘুম আসে না ঠিকই, কিন্তু আট বছর আগের সেই ঘটনার ছবিগুলি যেন টুকরো টুকরো স্বপ্নের মত চোখের উপর ভাসতে থাকে।

পরিতোষ গাঙ্গুলী নয়, ওর নাম হ'ল রতন গাঙ্গুলী। পূর্বনো নাম কেলে দিয়ে নতুন নামের আড়ালে জীবনটাকে লুকিয়ে বোধ হয় পৃথিবীর এই দিকের গোপন আনাচে-কানাচে ঘোরাফেরা করে লোকটা। ওর দোষ নেই, দোষ হ'ল স্বস্তিকার ভাগ্যের। নইলে পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে স্বামীর সঙ্গে এখানে বেড়াতে আসবে কেন স্বস্তিকা?

স্বস্তিকা নামটাও যে নিতান্ত নতুন একটা নাম, নামটার বয়স আট বছরের বেশী নয়। আট বছর আগের সেই আলিপুরের দোতলা বাড়ির মেয়ে রেবা মজুমদারই নতুন নামের আবরণ জীবনের উপর জড়িয়ে নিয়ে আর স্বস্তিকা মজুমদার হয়ে লুধিয়ানার মেনো মশাইয়ের বাড়িতে এতদিন ছিল। মাত্র এক মাস হ'ল স্বামীর পাশে দাঁড়াবার পর স্বস্তিকা মজুমদার হয়েছে স্বস্তিকা চক্রবর্তী।

আলিপুরের সেই দোতলা বাড়িতে মামা-মামীর আদরে বেশ ভালই তো কাটছিল বাপ-মা-মরা মেয়ে রেবা মজুমদারের জীবন।

বাইশ বছর বয়সের সব অহংকার আর কল্পনা নিয়ে গান গেয়ে গেয়ে আর বি.এ. ফাইনালের পড়া পড়ে পড়ে, মুখটাকে স্বন্দর ক'রে রাঙিয়ে আর শরীরটাকে নানা ছাঁদে সাজিয়ে স্বপ্নের দিনগুলি তরতর ক'রে পার হয়ে যাচ্ছিল। তার পরেই হঠাৎ সেই ঘটনা।

ঘরের ভিতরের নীরব স্তব্ধতাকে সনেহ ক'রে চমকে ওঠে আর ধড়ফড় ক'রে বিছানার উপর উঠে বসে স্বস্তিকা। লোকটা কি সত্যিই এরই মধ্যে ঘরের ভিতরে এসে এন. চক্রবর্তীর কানে কানে সেই হিংস্র গল্পটা ফিসফিস ক'রে শুনিতে দিয়ে চ'লে গিয়েছে?

না, আসে নি লোকটা। দেখতে পায় রেবা, এন. চক্রবর্তী তেমনি মন দিয়ে বই পড়ছেন, আর দরজাটা তেমনি বন্ধ আছে। কিন্তু বুঝতে পারে না রেবা, রেবার

উপর প্রতিশোধ না নিয়ে থাকতে পারবে কেমন করে ওই রতন গাঙ্গুলী ?

কল্পনা করতে পারে রেবা, এই ঘরের দরজার বাইরে বারান্দার উপর এখন পা টিপে টিপে ঘুরছে প্রতিশোধের একটা কঠোর প্রতিজ্ঞা। এন. চক্রবর্তী এই ঘরের বাইরে যাওয়া মাত্র ওই প্রতিজ্ঞা হেসে হেসে এগিয়ে এসে এন. চক্রবর্তীর কানের কাছে সেই রাস্কুসে ঘটনার গল্পটা বলে দেবে। এই ঘরের ভিতরে আসবার দরকার হয় না, রেবার জীবনের ভালবাসার মানুষটাকে শুধু একটু একা আর আড্ডালে পেতে চার রতন গাঙ্গুলী।

এন. চক্রবর্তী বই বন্ধ করে উঠে দাঁড়ান। টেচিয়ে ওঠে রেবা, কোথায় যাচ্ছ তুমি ?

এন. চক্রবর্তী। যাই, ড্রাইভারকে বলে দিয়ে আসি, গাড়ির ইঞ্জিনটাকে একটু ভাল করে চেক করে রাখুক।

রেবা। না, যেতে হবে না। কখনো যেয়ো না।

এন. চক্রবর্তী আশ্চর্য হন : তার মানে।

রেবা। তুমি এখানেই আমার কাছে বসে থাক, লক্ষ্মীটি। দেখেও বুঝতে পারছ না কেন, মাথাধরাটা আমাকে কি রকম জ্বালাচ্ছে ?

চেয়ারের উপর বসে আবার বই হাতে তুলে নেন এন. চক্রবর্তী। বলেন, এতটুকু ঘুমোলে ভাল স্বপ্ন দেখা যায় না, আর মাথাধরাও ছাড়ে না স্বস্তি।

স্বপ্ন না দেখলেও আট বছর আগের সেই জীবনকে এখন যে স্বপ্নেরই মত মনে হচ্ছে রেবার।

বসিরহাটের অত বড় বাড়িটা বিক্রি করে দিয়েও সব দেনায় দায় মিটাতে পারেন নি মামা। বিক্রি করবার আর কিছুই ছিল না। দেউলে হয়ে গিয়ে আর বসিরহাট থেকে সবাইকেই সঙ্গে নিয়ে চলে এসে আলিপুরের সেই দোতলা বাড়িতে যেদিন উঠলেন মামা, সেই দিন মামী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এত বড় বাড়ির ভাড়া আসবে কোথা থেকে আর দিন চলবেই বা কেমন করে ?

বিছানার উপর বসে বসেই টলতে থাকেন মামা। বিছানার উপরেই মামার হাতের কাছে কাঠের একটা টে, তার উপর ছইস্বির বোতল আর গেলাস। গেলাসে আর একটা চুমুক দিয়ে, আর কোলের উপর একটা বালিশ টেনে নিয়ে মামা এলোমেলো করে বলতে থাকেন, আমি সেই স্বপ্নময় চৌধুরী, আমি জানি কি করে দিন চালাতে হয় মঙ্গলা।

চুপ করে থাকেন মঙ্গলা। স্বপ্নময় চৌধুরী আবার বলেন, আমার বাবার মুহুরী ছিল ষার বাবা, ওই বিনোদ গাঙ্গুলী যদি এত স্টাইল আর চটক দেখিয়ে দিন কাটাতে পারে, তা হলে আমিই বা পারব না কেন ?

মঙ্গলা জানেন, এর মধ্যে একটা সত্য কথা বলেছেন তাঁর স্বামী। এই দোতলা বাড়ির চোখের সামনেই বাস্তার গুপারে ওই মন্ত চারতলা বাড়িতে থাকেন যে বিনোদ গাঙ্গুলী, তাঁর বাবা একদিন এই স্বপ্নময় চৌধুরীর বাপেরই মুহুরী ছিলেন। কিন্তু সেই গাঙ্গুলীরাই দিন-দিন উঠেছে আর এই চৌধুরীরা পড়েছে। একই গ্রামে ওদের দেশ। মুহুরীর ছেলে বিনোদ গাঙ্গুলীই বিলেত থেকে পাস করে



এস.সি. সরকার এন্ড কোং
 ১২৫ বি. বহু রাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
 (ব্রাং)-১৬৭ বি. বহু রাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

এসে ত্রিশ বছর ধরে বড় বড় চাকরি করেছে, আর নিজের রোজগারের টাকায় এত বড় বাড়ি তুলেছে। কিন্তু মুহুরীর বড়বাবু ছেলে স্বধর্ম চৌধুরী বাপের আমলের বাড়ি বেচে দিয়ে আর দেউলে হয়ে এই দোতলা বাড়ির ডাড়াটে হয়েছে।

প্রথম মাসটা কঠেই কেটেছিল। কিন্তু তার পরেই আর নয়। স্বধর্ম চৌধুরী সত্যিই প্রমাণ করে দেখিয়ে দিলেন যে, এক পয়সা রোজগার না করেও স্টাইল করে থাকবার আর নিত্য হুইঙ্কি খাবার বিজ্ঞান তিনি জানেন। তেজ বাহাদুর, ভীম বাহাদুর আর বংশীলাল—তিন চাকরের কোন চাকরকেই বিদায় দিতে হ'ল না। নতুন রেডিও আর গ্রামোফোন কিনলেন, একটা বিলিভী কুকুরও কিনে ফেললেন। কুকুরের জন্য চৌরঙ্গীর দোকান থেকে বিস্কুট কিনে আনতে যায় ভীম বাহাদুর।

রেবা বলে, আমি তা হ'লে বি. এ. ফাইন্সালের জন্য তৈরী হই মামা।

স্বধর্ম চৌধুরী বলেন, নিশ্চয়।

রেবার জন্য প্রাইভেট টিউটরও রেখে দিলেন মামা। প্রতি মাসে একশো টাকা নেন প্রাইভেট টিউটর।

রবিবারের সন্ধ্যায় সিনেমা ছবি দেখতে যায় রেবা। কিন্তু যেতে আসতে বড় কষ্ট হয়। মামার কাছে এসে অভিযোগ করে রেবা: ট্রাম-বাসে যাওয়া-আসা করতে বড় বিলী লাগে মামা।

স্বধর্ম চৌধুরী বলেন, এবার থেকে ট্যাক্সি করে যাবি, সঙ্গে যাবে তেজ বাহাদুর।

রেবা একদিন বলে, ট্যাক্সিও একটা ঝড়াত। একটা গাড়ি কিনে ফেল না মামা?

স্বধর্ম চৌধুরী বলেন, এইবার কিনেই ফেলব বোধ হয়।

স্বধর্ম চৌধুরীর ভাইনে বায়ে সর্বক্ষণ গেলাস-ভতি হুইঙ্কি ছলছল করে, মাথাটা সর্বক্ষণ হুঁকেই রয়েছে, যেন গ'লে গিয়েছে মেরুদণ্ডটা। এক মুহূর্তের জন্যও বাড়ির বাইরে যান না। কিন্তু এই বাড়ির সব স্ত্রী তৃষ্ণা আর দরকারের দাবী পূর্ণ করার জন্য তাঁর হাতের কাছে থোকা থোকা নোট এসেই যাচ্ছে। আদরের ভাগ্নী রেবার সব স্টাইলের আশা ও আবদার মিটিয়ে দিচ্ছেন স্বধর্ম চৌধুরী।

রেবা হেসে হেসে বলে, আমি যদি বিলেত গিয়ে পড়াশুনা করতে চাই মামা?

স্বধর্ম চৌধুরী বলেন, বেশ তো, তার ব্যবস্থাও করে দেব।

রেবা মজুমদারের জীবনের অনেক আশা ও অনেক কল্পনা মত্ত হয়ে রেবার মনটাকে মাতিয়ে রাখে সর্বক্ষণ। এই স্বধর্মের জীবনের মধ্যে শুধু একটা উপদ্রব দিনের মধ্যে অন্তত: তিন-চারবার রেবার মনটাকে দুঃসহ স্বপ্না দিয়ে উত্তাক্ত করে। সামনের চারতলা বাড়ির বিনোদ পান্ডুলীর ছেলে রতনের চোখের দৃষ্টি। সারা দিনের মধ্যে অন্তত: একবার এই বাড়ির ভিতরে আসবেই রতন, আর অন্তত: দুবার এই বাড়ির ফটকের কাছে এসে দাঁড়াবে ও চ'লে যাবে। ওর চোখ দুটো যেন সারাক্ষণ একটা পিপাসার রোগে ভুগছে; দিনের মধ্যে তিন-চারবার রেবা মজুমদারের স্বন্দর মুখটার দিকে তাকাতো না পারলে ওর চোখের রোগের জ্বালা যেন শান্ত হয় না।

রেবা মজুমদারের মনটাও জ'লে ওঠে। মামার উপরেও রাগ হয়। গল্প করার জন্য পৃথিবীতে আর লোক পান নি মামা! বার্ড ক্লাস না ফোর্থ ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে, বিজ্ঞা আর-এগেয় নি; হু বেলা কুড়ি আর কমরং করে, বোহার মত রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে ভীম বাহাদুরের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে। সন্ধ্যা হ'লে থিয়েটারের ক্লাবে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য চম্পুগুপ্ত হয়ে গর্জন করে। এই তো ওর মহুড়া। এই মাহুড়ের সঙ্গে গল্প করে মামা কী যে আনন্দ পান কে জানে!

বারান্দার নামনে এক টুকরো খোলা জমির উপর পাতাবাহারের কয়েকটা-কেয়ারি, আর একটা শিউলি-গাছ। সেই শিউলির কাছে নিশ্চিন্ত মনে সন্ধ্যাবেলাটা একবার দাঁড়াতেও পারে না রেবা মজুমদার। দেখতে পায় রেবা, ঠিকই, আর কেউ নয়, সেই রতনই ফটক পার হয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে বারান্দার উঠল, আর সোজা মামার ঘরের দিকে চ'লে গেল। তাঁতের কৌচানো ধুতি, পায়ে হরিণের চামড়ার চটি, গায়ে শুধু একটা সিল্কের গেঞ্জি; ভদ্রতামস্কৃত একটা জামাও পরতে ভুলে গিয়েছে ওই অশিক্ষিতা। যেন এই বাড়িরই কত আপন জন। স্বচ্ছন্দে আসে আর স্বচ্ছন্দে চ'লে যায়।

রেবার সঙ্গে কথা বলতে কোনদিন ভুলেও সাহস করে নি

রতন। যদি সে সাহস কোনদিন করে রতন, তবে রেবাও কী করবে সেটা মনে মনে জেনেই রেখেছে রেবা। তখনি ভীম বাহাদুরকে ডেকে ব'লে দেবে রেবা : এই ভক্তলোক কী বলছেন শোন।

কিন্তু ভীম বাহাদুরকে ডাকবার দরকার হয় নি এখনো। মুখে নয়, রতনের চোখেই যত দুঃসাহস। অযোগ্যের আকাঙ্ক্ষার লোভ। গাছের অনেক উপরের একটা কোটা শিউলির দিকে শুধু লুকুভাবে তাকিয়ে থাকার মত মূৰ্খতা। যেন শুধু ওরকম ক'রে তাকালেই দয়া ক'রে সেই শিউলি টুপ ক'রে ওর বুকের উপর ঝরে পড়বে। কী স্বপ্নণা! রেবার মুখের দিকে রতন তাকালেই মুখ কিরিয়ে নেয় রেবা। রেবা মজুমদারের সব কল্পনার অহংকারে শেষ পর্যন্ত ঘেমা ধরিয়ে দেবে এই লোকটার ওই বিলী আশার দৃষ্টি। নিরেট একটা লিপ্সা যেন রেবার জন্মের মুখের আর শিক্ষিত কচির মান-সম্মান ধ্বংস করার ক্ষমতা সব সময় স্বযোগ খুঁজছে। রতন গাঙ্গুলীর ছায়ার দিকে তাকাতেও ঘেমা করে রেবার।

রেবা জানে না, মায়া স্বথময় চৌধুরী রেবার বোঝবার অনেক আগেই বিনোদ গাঙ্গুলীর ছেলে রতনের ওই চোখের আশা আর ইচ্ছাকে বুঝে ফেলেছেন। অশিক্ষিত রতনের চোখের সেই লুকুতা ও মুগ্ধতার, সেই আশা ও ইচ্ছার স্বযোগ নিতে একটুও দেরি করেন নি বসিরহাটের মেউলে জমিদার স্বথময় চৌধুরী, হইন্ডির লোভে সীয়াতসেতে হয়ে ধীর জীবনের মেরুদণ্ড গ'লে গিয়েছে। তাই রতন গাঙ্গুলীর হাত থেকে থোকা থোকা নোট আর থলিভরা টাকা পেয়েই যাচ্ছেন স্বথময় চৌধুরী। এই তিন মাসের মধ্যে একটি বারের মতও 'না' করে নি রতন।

তোয়ালে তুলে ভেজা ঠোট মুখে নিয়ে স্বথময় চৌধুরী বলেন, আমার জীবনে টাকার আর কি দরকার! আমি তো একরকমের সম্যসী হয়েই গিয়েছি। রেবার জন্মই বলছি। সাজতে ভালবাসে মেয়েটা, সাজলে মানায়ও স্বথময়। অন্ততঃ হাঁড়ার পাঁচেক পেলে রেবার জন্ত একটা জড়োয়া সেট অর্ডার দিতে পারি।

রতন বলে, কবে টাকা পেলে চলতে পারে?

স্বথময় চৌধুরী। আজই নাও না।

রতন বলে, অন্ততঃ একটা দিন সময় পেলে ভাল হয়।

স্বথময় চৌধুরী। বেশ, তা হ'লে কালই টাকা পৌঁছে দিয়ে।

প্রায় প্রতিদিনই, স্বথময় চৌধুরীর চোখের সামনে এসে ব'সে এই রকমই গল্প শোনে চারতলা বাড়ির ছেলে রতন চৌধুরী। গল্প শুনে একটু ভয়-ভয়ও করে রতনের। কিন্তু গল্পের মধ্যে রেবার দরকারের দাবীটা মুখ খুলে ফেললেই সেই গল্প রূপকথার মত মিষ্টি হয়ে যায়। এই তিন মাসের মধ্যে যতবার যত টাকা চেয়েছেন স্বথময় চৌধুরী, ততবার তত টাকা এনে দিয়েছে রতন।

এর পরেই সেই সন্ধ্যা, কি স্বন্দর বাতাসে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল বৈশাখের সেই সন্ধ্যাটা। রেবা মজুমদার তার একলা ঘরের নিভুতে ব'সে এসরাজ বাজিয়ে গান করে। বাড়ির পিছনের পাঁচিলের গায়ে হেলান দিয়ে ব'সে ভাঙ খায় আর গলা ছেড়ে হুলা করে ভীম বাহাদুর ও তেজ বাহাদুর। চৌধুরী-গৃহিণী মজলা আছেন তাঁর পুঞ্জোর ঘরে। আর বাইরের ঘরে স্বথময় চৌধুরীর সঙ্গে গল্প করে রতন।

রতন কুণ্ঠিত ভাবে বলে, এত টাকা?

স্বথময় চৌধুরী চোঁচিয়ে বলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, এত টাকাই লাগবে। ওর কমে হয় কি ক'রে?

রতন। রেবা কি সত্যিই বিলেতে গিয়ে পড়াশুনা করতে চায়?

—তাই তো ওর ইচ্ছে। কিন্তু তার জন্তে আমাদেরও তো এখন থেকেই টাকার বোগাড় ক'রে রাখতে হবে।

—আমার মনে হয়, রেবার বিলেত যাবার কোন দরকার নেই।

—হয়তো দরকার নাও হতে পারে। কিন্তু টাকাটা আমার চাই।

—আমার ইচ্ছা—

—কী তোমার ইচ্ছা?

—অর্থাৎ আপনারই ইচ্ছা, অর্থাৎ আপনি সেই যে বলেছিলেন, আমার সঙ্গে রেবার বিয়ে দিতে চান, সে ব্যাপারে আর দেরি না হওয়াই ভাল।

—আহা! সে ইচ্ছে তো আছেই; এবং আমার সেই ইচ্ছা পূর্ণও করব একদিন। কিন্তু এই টাকাটা আমার অবিলম্বে চাই।

—এত টাকা কোথা থেকে পাব বুঝতে পারছি না।

—একটু ভেবে দেখ রতন, রেবার মত মেয়ে তোমার জী হবে। জীরস্বই হ'ল রত্ন, এর কাছে তোমার ওই ক'টা টাকা কত তুচ্ছ জিনিস বল তো?

—কিন্তু আমি যে বাবার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছি চৌধুরী মশাই, আর টাকা পাওয়ার পথ বন্ধ।

—তাই নাকি? কী বললেন বিনোদবাবু?

—বাবা বললেন, তুমি আমার সহী ছাল ক'রে চেক কেটে ব্যাঙ্ক থেকে যে এতগুলি টাকা সরিয়েছ, তার জন্তে খুব বেশী দুঃখ করি না। কিন্তু বুঝতে পেরেছি, তুমি নিশ্চয় কোন খারাপ জীলোকের সংসর্গে প'ড়ে লম্পট হয়েছ। বলতে বলতে কেন্দেই ফেলেছেন বাবা।

স্বথময় চৌধুরী মুখ বিকৃত ক'রে হাসেন: বিনোদটা ওই রকমই একটা অসভ্য।

ছাঁক ক'রে ঘেন চমকে ওঠে রতনের চোখ: বাবার সম্পর্কে ওরকম ক'রে কথা বলবেন না চৌধুরী মশাই।

স্বথময় চৌধুরী বলেন, আমি কিছুই বলতে চাই না, শুধু জানতে চাই টাকাটা কবে পাব!

রতন। আমার পক্ষে এত টাকা দেওয়া আর সম্ভব হবে না চৌধুরী মশাই। কিন্তু একটা উপায় হতে পারে।

—বল, কী উপায়?

—আপনি যদি রেবাকে সঙ্গে নিয়ে বাবার কাছে একবার যান, আর দরকারের কথাটা একটু বুঝিয়ে বলতে পারেন, তবে বোধ হয়—

ক্রুদ্ধ বিড়ালের মত কিছুক্ষণ রতনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন স্বথময় চৌধুরী। তার পরেই ফ্যাস ক'রে টেচিয়ে ওঠেন, তোমার বাবা আমাকে টাকা দেবে? আমার কথা বিশ্বাস করবে তোমার বাবা। বিনোদ গাঙ্গুলী কি সেই কাঁচা লোক? সে মুহুরীর বাচ্চাকে কি আমি চিনি না?

ক্রুদ্ধ চিত্তা বাঘের মত লাক দিয়ে উঠে দাঁড়ায় রতন। এক থাবা দিয়ে স্বথময় চৌধুরীর গলা টিপে ধরবার জন্ত হাত বাড়ায়।

মরিয়া হয়ে চিংকার করেন স্বথময় চৌধুরী, জলদি আও ভীম বাহাদুর, তেজ বাহাদুর। শালা আমাকে খুন ক'রে ফেলেছে।

খোলা ভোজালি হাতে নিয়ে ছুটে আসে ভীম বাহাদুর আর তেজ বাহাদুর। শুক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রতন। স্বথময় চৌধুরীর মুখটা কাঁপতে কাঁপতে বীভৎস হয়ে ওঠে।

—মুহুরীর বাচ্চার বাচ্চা এই হতভাগা আমার গলা টিপে ধরতে চায়। বলতে বলতে হইকির বোতল হাতে তুলে নিয়ে রতনের কপালের উপর প্রচণ্ড এক আঘাত আছড়ে দেন স্বথময় চৌধুরী। রক্তার দিয়ে চূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ভাঙা বোতলের কাচ। রতনের কপালে আঁকা-বাঁকা একটা ফাটলের রেখা ভেদ ক'রে ফুটে উঠতে থাকে রক্তের বৃষ্টি।

হাত দিয়ে কপাল টিপে ধ'রে ঘরের ভিতর থেকে ছুটে বের হয়ে যায় রতন। কিন্তু কটক পর্যন্ত পৌছবার আগেই, শিউলির কাছে এসে হঠাৎ কাটা গাছের মত আন্তে আন্তে হেলতে হেলতে মাটির উপর প'ড়ে যায় রতন।

বারান্দার দাঁড়িয়ে দেখতে থাকেন স্বথময় চৌধুরী। তাকিয়ে থাকে ভীম বাহাদুর আর তেজ বাহাদুর। এসবাজ ফেলে ছুটে এসে বাইরের ঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে রেবা মজুমদার।

স্বথময় চৌধুরীর কুঁজো শরীরটা থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে। তার পরেই ভয়ানক ককঁশস্বরে টেচিয়ে ওঠেন স্বথময় চৌধুরী, ম'রে গিয়েছে শালা।

কটকের কাছে দাঁড়িয়ে একটা ভীড় তাকিয়ে দেখতে থাকে, শিউলির কাছে রক্ত-মাখা-মাখা একটা মানুষ প'ড়ে আছে। টেচিয়ে ওঠে ভিড়ের লোক, পুলিশ পুলিশ। খুন খুন।

ছুটে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়েন স্বথময় চৌধুরী। সিরসির ক'রে কাঁপতে থাকে কুঁজো শরীরের পাঁজরাগুলো। ভূতের ভয়ে আতঙ্কিত ছোটছেলের মত চিংকার ক'রে ওঠেন স্বথময় চৌধুরী, রেবা! রেবা!

রেবা কাছে এসে দাঁড়ায়: কী হ'ল মামা?

ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে আর ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে কাঁপতে স্বথময় চৌধুরীর বুকের ভিতর থেকে ঘেন একটা আধমরা প্রাণ হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, আর রক্ষে নেই রেবা। বিনোদ গাঙ্গুলী আমাকে ফাঁসিতে না ঝুলিয়ে ছাড়বে না।

আত্মকে চেঁচিয়ে ওঠে রেবা, এ কি সর্বনেশে কথা বলছ মামা?

স্বধর্ম চৌধুরী। রতন গাঙ্গুলীকে মেরেছি; ম'রেই গিয়েছে বোধ হয়। কিন্তু আমি বাঁচব কী করে?

রেবা। কী করেছিল লোকটা?

ফটকের কাছে পুলিশের লরি এসে থেমেছে। জানলা দিয়ে উকি দিয়ে তাকিয়ে পুলিশের মূর্তি দেখতে পেয়েই স্বধর্ম চৌধুরীর কুঁজো শরীরটা যেন এক বিভীষিকার ভয়ে টলতে টলতে দেয়ালের কোণের দিকে হেলে পড়তে থাকে। কিন্তু সামলে নেন। দেয়াল ধ'রে শক্ত ক'রে দাঁড়িয়ে থাকেন স্বধর্ম চৌধুরী। রেবার দিকে তাকিয়ে বলেন, রতন তোরই সর্বনাশ করতে এসেছিল।

জুকুটি ক'রে তাকায় রেবা: তার মানে?

স্বধর্ম চৌধুরী দাঁতে দাঁত ঘষে বলতে থাকেন, তাকে নষ্ট করতে চেয়েছিল। তাই আমি ওকে মেরেছি।

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রেবা বলে, ঠিক করেছ।

—পুলিসকে এই কথা তুইও বলবি রেবা। সোজা স্পষ্ট ভাষায় কোন পরোয়া না ক'রে বলে দিবি।

—নিশ্চয় বলব।

এগিয়ে আসছে পুলিশ। শক্ত হয়ে আর দেয়াল ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকে স্বধর্ম চৌধুরীর কুঁজো শরীর। হঠাৎ ছটফট ক'রে যেন দমবন্ধ গলাটা দীর্ঘ ক'রে ফুটে ওঠে স্বধর্ম চৌধুরীর এক ভয়ানক আবেদন: শুধু এ কথা বললে আমি পার পা'ব না রেবা। আর একটু বাড়িয়ে বলতে হবে।

রেবা। কী বলতে হবে ব'লে দাও।

স্বধর্ম চৌধুরীর ভীষণ চোখের দৃষ্টিটা দপদপ করে: ওই ভয়ানক লোকটা তাকে নষ্ট ক'রেই দিয়েছে। জোর ক'রে খুন করবার ভয় দেখিয়ে, তোর শরীরের লজ্জা আর সম্মান ধ্বংস ক'রে দিয়েছে।

—তাই ব'লে দেব মামা। অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে হাঁপাতে থাকে রেবা।

বারান্দার উপরে পুলিশের পায়ের শব্দ। স্বধর্ম চৌধুরী বলেন, ওই ঘরের ভিতরে গিয়ে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ে থাক রেবা। শ্লিগসির যা। মনে থাকে যেন, রতন তোর খোঁপা ভেঙে দিয়েছে, তোর গলা টিপে দম বন্ধ ক'রে

দিয়েছে, তোর গায়ের শাড়ি লুটপাট ক'রে সরিয়ে দিয়েছে। তুই কত কঁদেছিল, তবু রতন তাকে ছাড়ে নি।

স্বচক্ষে অনেক কিছুই দেখে নিল পুলিশ। স্বকর্ণে অনেক কথা শুনে নিল। রেবা মজুমদারের সম্মুখায়া সেই বিধ্বস্ত মূর্তির দিকে তাকিয়ে আর স্বধর্ম চৌধুরীর মুখের সেই করুণ বিলাপ শুনে খুবই ব্যথিত। হ'ল পুলিশ অফিসারের চক্ষু। এত বড় ভদ্রলোকের ছেলে হয়েও যে কত বড় পশু হতে পারে, বুঝতে পেরে আশ্চর্য হয়ে গেলেন অফিসার। যেমন মামা স্বধর্ম চৌধুরী, তেমনি ভায়ী রেবা মজুমদারের হাত বেশ স্বচ্ছন্দে সই ক'রে দিল স্টেটমেন্টে, এক মুহূর্তের জঙ্ঘম হাত কাঁপে নি।

কিন্তু মরে নি বিনোদ গাঙ্গুলীর ছেলে রতন গাঙ্গুলী। কপালের আঘাত এমন কিছু সাংঘাতিক হয় নি। ক'দিন পরে স্বধর্ম সেয়ে যাবার পরেও হাসপাতাল থেকে সোজা পুলিশ-হাজতে চ'লে গেল রতন। এত বড় পাপের মামলার আসামী ওই ছেলের জন্ত জামিন হতে রাজী হন নি বিনোদ গাঙ্গুলী।

কী আশ্চর্য! আসামী অপরাধ অস্বীকার করল না। সব সাক্ষীর সাক্ষ্য দায়রা-জজের আদালতের সব প্রশ্নের সম্মুখে সত্য ব'লে প্রমাণিতও হল। একটি কথা না ব'লে, একটুও বিচলিত না হয়ে, কোন আক্ষেপ প্রকাশ না ক'রে, চার বছরের সশ্রম কারাবাসের আদেশ বরণ ক'রে নিল রতন গাঙ্গুলী।

মামলার রায় বের হবার পর দশ দিনের মধ্যেই চারতলা বাড়ি বিক্রি ক'রে দিয়ে চ'লে গেলেন বিনোদ গাঙ্গুলী। কোথায় চলে গেলেন কে জানে।

দোতলা বাড়ির সব জানলা সব সময় বন্ধ। বাড়ির সামনের রাস্তার উপর যখন-তখন ছোট ছোট এক-একটা ভিড় জ'রে ওঠে। জানলার দিকে তাকিয়ে থাকে জোড়াজোড়া চোখের সতৃষ্ণ কৌতূহল। মামলার সেই বিচিত্র কাহিনীর নায়িকা যে থাকে এই বাড়িরই কোন একটি ঘরে।

এ কি হল? একদিন যেন রেবা মজুমদারের মনটাই হঠাৎ-ঘুম-ভাঙা শিশুর মত চমকে জেগে ওঠে আর ভয় পেয়ে চারিদিকে তাকায়। জানলাগুলো কি আর এই জীবনে খোলা যাবে না? ওই চোখগুলো গাথের উপর থেকে

স'রে যাবে কবে? জেলের চেয়েও বেশী বন্ধ এই ঘরের বাইরের আলোতে এই মুখ নিয়ে কি আর দাঁড়াতে পারা যাবে? রেবার বিলেতে পড়তে যাবার কথা নিয়ে রেবার সঙ্গে আর কোন আলোচনা কেন করেন না মামা? হঠাৎ এই রকম একটা অস্থির পড়েন কেন? হঠাৎ আবার পুরোহিত ডেকে প্রায়শ্চিত্ত করেন কেন মামা?

মামার কাছে এসে আর একবার আবদার করে রেবা: এই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে নতুন একটা বাড়ি কিনে ফেল মামা।

কোন উত্তর দেন না স্বথময় চৌধুরী। এবং তারপর আর ক'টাই বা দিন। স্বথময় চৌধুরীর হইন্সলিভাভী মুখ চিরকালের মত নিরুপ্তর হয়ে যাবার পর এবং আরও কয়েকটা দিনের বর্ষার ঘোর কেটে যাবার পর হঠাৎ এক সন্ধ্যায় পুজোর ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে মামী বলেন, সেদিন তুমি কী ঘেন জানতে চেয়েছিলি রেবা?

রেবা বলে, মামা যাবার কদিন আগে মামা প্রায়শ্চিত্ত করলেন কেন?

—তা হ'লে শুনবি সব?

—সবই শুনব মামীমা।

মামীমা সবই বলেন, এবং সবই শোনে রেবা। রেবার চোখ দুটো পাখরের চোখের মত শুক্ন হয়ে থাকে। জোরে নিশ্বাস টানতে গিয়ে ঘেন একটা জ্বালা গিলে ফেলে রেবা। ছটফট ক'রে টেচিয়ে ওঠে রেবা—তুমি কি অদ্ভুত কথা বলছ মামীমা!

মামী বলেন, হ্যাঁ রে মেয়ে, আমি যে শেষে তোমার মামার মুখ থেকে সবই জানতে পেরেছি।

বন্ধ-জানলা ঘরের ভিতর হাঁসফাঁস ক'রে মুহূর্তগুলিকে আর খুব বেশীদিন সহ্য করতে হয় নি রেবার। কালী চ'লে যাবার জন্ত প্রস্তুত হলেন মামী, এবং যাবার আগে রেবাকে লুইয়ানায় যেসো মশাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দেবার সময় একটি কথা বললেন, এখান থেকে তোমার এখন অনেক দূরে স'রে গিয়ে থাকাই ভাল রেবা, বাঁচতে যদি চাস।

লুইয়ানা রওনা হবার সময় মামীকে প্রণাম করতেই রেবাকে আর একটা কথা বলেছিলেন মামী, পারিস যদি ফুইও একটা স্বস্ত্যয়ন করিস রেবা।

আট বছর আগের সেই ঘটনার জ্বালা কি সত্যিই আজ

স্বস্ত্যয়ন খুঁজছে? আমলকী-বনের হাওয়া জানলার পর্দা উড়িয়ে দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে রেবার নেট-জড়ানো খোপার উপর ফুরফুর করে। চোখের পাতায় কেমন একটা ঠাণ্ডা শিহর, হাওয়া লাগলে বাসি চোখের জল যেমন স্নিগ্ধ হয়ে সিরসির করে। আন্তে আন্তে চোখ মেলে তাকায় রেবা।

এন. চক্রবর্তী বলেন, ব'লে ব'লেই অনেকক্ষণ বেশ তো ঝিমোলে স্বস্তি।

হ্যাঁ! অনেকক্ষণ বেশ ভাল ক'রে ঝিমিয়েছে রেবা। খানসামা এসে কখন খাবার দিয়ে চ'লে গিয়েছে, তাও টের পায় নি রেবা। সত্যিই, একটা স্বপ্নের পাল্লায় প'ড়ে মনটা ঘেন কোথায় চ'লে গিয়েছিল।

এন. চক্রবর্তীর খাওয়া হয়ে গিয়েছে। একটা বাজলে খাবার খেতে আর এক মিনিটও দেরি করেন না এন. চক্রবর্তী, তাঁর দশ বৎসরের অভ্যাসের রুটিন। খাবার-গুলোকে ছোঁয়াছুঁয়ি ক'রে সামান্য একটু খেয়ে ব্যস্তভাবে হাত ধুয়ে ফেলে রেবা। রেবার মনেরই ভিতরে কী ঘেন কিসের একটা ব্যস্ততা জেগে উঠেছে। দু চোখের চাকুল্যের মধ্যে ঘেন একটা ইচ্ছার বিদ্যুৎ মাঝে মাঝে ঝিক ক'রে চমকে ওঠে। কী ঘেন বুঝতে চায় রেবার মন, কিসের একটা সন্দেহকে ঘেন নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করতে চায় রেবা।

এন. চক্রবর্তী চেয়ারের উপরেই ঘাড় কাত ক'রে চোখ বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন। রেবা বলে, তোমাকে অনেকক্ষণ ঘরের ভেতর আটক ক'রে রেখেছি ব'লে রাগ কর নি তো?

এন. চক্রবর্তী চোখ বড় ক'রে তাকিয়ে আশ্চর্য হন: রাগের কোন প্রমাণ পেয়েছ না কি?

হেসে হেসে মিনাতমাথা করে রেবা বলে, যাও, বাইরে গিয়ে একটু ব'স লম্বীটি। তোমাকে এখানে অনেকক্ষণ মিছিমিছি বসিয়ে রেখে কষ্ট দিয়েছি।

এন. চক্রবর্তী। আঃ, বলছি কোন কষ্ট হয় নি।

রেবা আবার হাসে: কিন্তু ভাবতে আমার মনে কষ্ট হচ্ছে যে। অন্ততঃ আমার মনের বাস্তবিক খুশি-করবার জন্তে এই বারান্দাতেই কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে তারপর চ'লে এস।

পাইপ ধরিয়ে ঘরের বাইরে বারান্দার উপর এদিক থেকে ওদিক আন্তে আন্তে হেঁটে আর শিশ দিয়ে আনাগোনা করেন এন. চক্রবর্তী। রেবা ঘেন তার কল্পনা

থেকে কুড়োনো এক হৃদয় বিশ্বাসকে এক পরীক্ষার কাছে ইচ্ছে করেই পাঠিয়েছে। ওই তো, উৎকর্ষ হয়ে শুনতে থাকে রেবা, পাশের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে শিস দিচ্ছে রেবার স্বামী। এই তো রতনের স্বযোগ। তবু চুপ করে ঘরের ভিতরে কেন বসে আছে রতন? এখুনি ছুটে বের হয়ে রেবার স্বামীর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে দিচ্ছে না কেন, স্বস্তিকা নামে এই নারী হ'ল পরপুরুষের লালসায় লালিত রেবা মজুমদার নামে এক নারী।

রেবা যদি শপথ করে স্বামীর কাছে বলে যে, সেই কাহিনী হ'ল এক স্নেহমূলক মামাকে ফাঁসির মরণ থেকে বাঁচাবার জন্য মামার আদরে লালিত এক ভারী কতগুলি ভয়ানক মিথ্যা কথার কাহিনী, তা হ'লে? আদালতের সেই বিশ্বাসগুলি মিথ্যা, আর স্বস্তিকার এই কথামূলকি শুধু সত্য, এতটা বিশ্বাস করবার মত কোন মোহ এখনো ঘনিষে ওঠে নি জলজ্বরের সার্জনের মনে, স্বস্তিকার মুখ দেখে যতই মুগ্ধ হোক না কেন তার চোখ।

শুনে হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই করুণা করবেন স্বামী এন. চক্রবর্তী। মনে করবেন শুধু, আট বছর আগে একটা ক্যাপা কুহুরের কামড়ে আহত হয়েছিল স্বস্তিকার শরীরটা। নিগৃহীতা নারীর মনের বেদনাগুলি কল্পনা করতেও পারবেন। স্বস্তিকাকে তেমনি আগ্রহে বুকের কাছে টেনে আর আপন করে ধরে রাখবেন। মিথ্যাই সারা সকালটা শুধু একটা মিথ্যা ভয়ে নিজেকে আতঙ্কিত করেছে, আর মাথাধরার জ্বালা লুপ্ত করেছে।

কিন্তু শুধুই কি এই বিশ্বাসের সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য? রেবা কি নিজেই বুঝতে পারছে, কোন সত্য জানবার জন্য এই ভাবে ঘরের ভিতর উৎকর্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রেবা?

ঘরের ভিতরে ফিরে আসেন এন. চক্রবর্তী। রেবার দুই চোখের তারায় অদ্ভুত এক কৌতূহলের উল্লাস জ্বলজ্বল করে: দেখা হ'ল ঠিক সন্ধ্যা?

—কার সঙ্গে।

—এই যে, যিনি এই পাশের ঘরেই রয়েছেন, এই টিয়ার-মার্চেন্টের সঙ্গে?

—হ্যাঁ।

—কী বললেন ভদ্রলোক?

—ভদ্রলোক না অদ্ভুত লোক! কথা বলা ঘুরে থাক, ভদ্রলোক একবার তাকালেনও না।

বাস, আর কোন প্রশ্ন করবার দরকার নেই। যা সন্দেহ করেছিল রেবা, তাই সত্য হয়েছে। যে বিশ্বাস মনের মধ্যে পাওয়ার জন্য ছটফট করছিল সেই বিশ্বাস এতক্ষণে পেয়ে গেল রেবা। রেবার স্বামীর কাছে নয়; রেবারই কাছে এসে কথা বলবার অপেক্ষার আছে আর স্বযোগ খুঁজছে রতন। এন. চক্রবর্তীকে নয়; স্বস্তিকা চক্রবর্তীকেই একবার একা পেতে চায় রতন। বুঝতে পারে রেবা, পাশের ঘরে এখন নীরব হয়ে বসে রয়েছে যেন একটা প্রবল অভিমান; রাগ নয়; প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞাও নয়। রেবার সেই হিংস্র মিথ্যার আঘাতে কতানুত হয়েছে যার জীবনের সম্মান, সেই মানুষ আজও শুধু রেবারই কাছে এসে প্রশ্ন করতে চায়: তুমি আমার জীবনের উপর এতখানি বিষ ঢেলে দিলে কেন? কোন অপরাধে? তোমাকেই হবে রাখবার জন্যে চোর হয়েছিলাম বলে? তোমার হৃদয় মুখের মায়ায় বড় বেশী লুক্ক হয়েছিলাম বলে?

আহুক, সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিতে পারবে রেবা। শুনে থাক রতন, সেই মিথ্যা কথামূলকি রেবার মিথ্যা কথা নয়। জেনে থাক রতন, তার মত মানুষের চোখের আশাকে একদিন ঘুণা করেছিল বলে আজও রেবা তার বিশ্বাস দিয়ে একটা জ্বালাকে চুপ করে বুকের ভিতরে গিলে গিলে শাস্ত হতে চেষ্টা করে।

কোন সন্দেহ নেই, এক স্বযোগে হঠাৎ ঘরের ভিতরে এসে একলা রেবার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে রতনের মনের অভিমান ওই কয়েকটা প্রশ্ন করতে চায়। প্রশ্ন করতে কতক্ষণই বা সময় লাগবে? আধ মিনিটের বেশী নয়। উত্তর দিতে রেবারই বা কতটুকু সময় লাগবে? আধ মিনিটের বেশী নয়। ভালই হবে, এক মিনিটের মধ্যে আট বছরের পুরনো একটা অশান্ত ক্ষোভ মিটে যাবে। রেবার কথা শুনে কমা করে আর স্থায়ী হয়ে চলে যাবে রতন, রেবার মনের জ্বালাও মিটে যাবে।

বিকালের চা দিয়ে যায় খানসামা। চায়ের কাপ হাতে ভুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ান এন. চক্রবর্তী। রেবা বলে, যাচ্ছ কোথায়?

এন. চক্রবর্তী। যাই, লনের ওপর একটু বেড়িয়ে বেড়িয়ে চা খেতে ইচ্ছে করছে।

চ'লে যান. এন. চক্রবর্তী। অদ্ভুত একটা ছায়া ছায়া হাসির আভা যেন হঠাৎ শিউরে উঠেছে রেবার ঠোঁটের উপর। রেবা তার ইচ্ছার ভাগ্যটা দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। ব্যস্তভাবে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে পাউডারের কোঁটা খুলে ফেলে রেবা। মিরারের সামনে দাঁড়ায়। তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে মুখের উপর এখানে-ওখানে পাউডারের পাফ বুলিয়ে নেয়। ডান গালের নীচটায়, কপালের বাঁ দিকটায়, আর ঘাড়ের চারদিকে একটু পাউডার দরকার।

ঘরের জানলার পর্দা সরিয়ে একবার তাকায় রেবা। দেখতে পায়, লনের শেষ প্রান্তে লতা-জড়ানো পাঁচিলের কাছে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এন. চক্রবর্তী।

বারান্দায় পায়ের চলার শব্দ শোনা যায়। হরিণের চামড়ার চটি মুহূর্তে শব্দ করে আনাগোনা করছে। রেবার বুকের ভিতরটা টিপটিপ করে। কিন্তু তবু মুখটাকে হাসিয়ে নিয়ে মনটাকে প্রস্তুত করে রাখে রেবা। রতন এসে হঠাৎ ঘরে ঢুকলে বোকার মত ভয়ে চমকে উঠবে না রেবা।

এক মিনিট, দু মিনিট, তিন মিনিট। ঘরের ভিতরে এসে একলা রেবার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকটি কথা বলে চ'লে যাবার স্বযোগ অনেকক্ষণ ধরে তো পেয়েই যাচ্ছে রতন, কিন্তু তবু আসে না কেন? হঠাৎ একটা সম্ভ্রম চমকে ওঠে. রেবার মনে। এবং সেই সম্ভ্রম ধীরে ধীরে বিহ্বল করে. তুলতে থাকে রেবার স্বপ্নের চোখের আনমনা আর অপলক দৃষ্টি।

এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে রেবা, কিসের অভিমান এবং কেমন অভিমান রেবার এই ঘরের পাশেই এখন কী আশা করে বসে আছে। আমলকী-বনের হাওয়া বড় বেশী ফুরফুর করে রেবার নেট-জড়ানো খোঁপার চারদিকে। এক মিনিট বা দু মিনিটের স্বযোগ পাওয়ার জন্য কোন লোভ নেই ওই অভিমানের মনে? রতনের মনের ইচ্ছার গুঞ্জন যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে রেবার হৃদয় কান। অর্থাৎ, অনেকক্ষণ ধরে, দু চোখের দৃষ্টিতে যত খুশি তত লোভ মায়া আর মুগ্ধতা নিয়ে তাকাবার জন্য রতন আজ তার

সেই রেবা মজুমদারের স্বপ্নের মুখটাকে চোখের সামনে পেতে চায়।

শিশু দিতে দিতে ঘরের ভিতর ঢোকেন এন. চক্রবর্তী। রেবা বলে, আচ্ছা, যদি তুমি এখুনি গিরিডি রওনা হও, তবে লেক্টেঞ্চার্ট জয়সোয়ালের বিয়ে দেখে তোমার কিরে আসতে কতক্ষণ সময় লাগবে?

এন. চক্রবর্তী বলেন, কত আর সময় লাগবে? চার-পাঁচ ঘণ্টার বেশী নয়। রাত দশটার মধ্যেই কিরে আসতে পারব।

রেবা। তাই বল। মাত্র চার-পাঁচ ঘণ্টা! তা হ'লে যাও, ঘুরে এস।

এন. চক্রবর্তী। আর দরকার নেই গিয়ে। আমার এমন কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু নয় জয়সোয়াল যে ওর বিয়েতে যেতেই হবে।

রেবা। না না, যাওয়াই ভাল। যতই কম ঘনিষ্ঠ বন্ধু হোক না কেন, ভ্রলোক যখন তাঁর বিয়েতে নেমস্কর করেছেন, তখন যাওয়াই উচিত।

এন. চক্রবর্তী নতুন টাই হাতে তুলে নিয়ে গলায় জড়াতে থাকেন : তা হ'লে যেতেই বলছ তুমি?

রেবা। এস। আমি এই চার-পাঁচ ঘণ্টা গলা ছেড়ে পাঞ্জাবী গজল টেচিয়েই পার করে দিতে পারব।

এন. চক্রবর্তীর টুরার কাকর-ছড়ানো গিরিডি রোডের ধূলা উড়িয়ে চ'লে যায়। সন্ধ্যা হয়ে আসে। রেবার একলা ঘরের দেয়ালের গায়ে আলো ঝুলিয়ে দিয়ে চ'লে যায় খানসামা।

তাড়াতাড়ি করে সাজতে গিয়েও বেশ একটু দেরি করে ফেলল রেবা। সবুজ রঙের শাড়িটা যখন প্রায় অর্ধেক পরা হয়ে গিয়েছে, তখন হাত ধামিয়ে কি-যেন ভাবে রেবা। না, রাতের আলোয় এই সবুজকে নিভাস্তাই কালো দেখাবে। অল্প রঙের শাড়ি বাছে রেবা। সাজ শেষ হবার পরেও মিরারের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। কপালটার গড়নে বেশ একটু খুঁত আছে, দু পাশে কেমন যেন চাপা-চাপা ভাব। এই খুঁত নিশ্চয়ই রতনের চোখে পড়ে নি কোনদিন। কাছে এসে রেবার স্বপ্নের মুখের দিকে তাকাবার স্বযোগ জীবনে কোনদিন পায় নি তো রতন। শুধু দু'থেকেই দেখেছে। কিন্তু আজ যে রেবার

কপালের এই খুঁত রতনের চোখে ধরা পড়ে যাবে।
কানের ছুঁপাশে হাত রেখে খোঁপা চাপে রেবা।

সারা পৃথিবীর মধ্যে এমন একটি নির্জনতা কি আর কোথাও আছে? কোটি কোটি লোকচক্ষুর নাগাল থেকে ছিন্ন-করা এমন একটি নিভৃত? ঘরের দরজা খুলে দিয়েছে রেবা। খোলা দরজা দিয়ে ঘরের আলো ছড়িয়ে পড়েছে বারান্দার উপর, যেন রেবার বিহ্বল মনের প্রতীক্ষাটাই পথের উপর আঁচল পেতে দিয়েছে। চেয়ারের উপর বসে হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে রেবা। সোনার চেন দিয়ে কব্জি জড়িয়ে বাঁধা ছোট্ট হাতঘড়ি। চলছে বলেই তো মনে হয়। কানের কাছে তুলে নিয়ে হাতঘড়ির শব্দ শোনে রেবা।

বুকে পেয়েছে রেবা, শুধু রেবার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেই স্থবী হবে না ওই অভিমানের মন। হতে পারে না। ওর চোখে যে বড় দুর্বল একটা পিপাসা ছিল। এসেই যদি হাত ধরে? যদি আদর করে আস্তে আস্তে বুকের কাছে টেনে নেয়? যদি রেবার এই সাজানো দেহের উপর সব পিপাসা ঢেলে দেয় রতন?

ছটফট করে একটা হাত তুলে কপাল টিপে ধরে রেবা। কিন্তু রেবাকে বুকের কাছে নিয়ে সব চেয়ে বেশী স্থবী হবার সব চেয়ে বেশী অধিকার যে ওরই ছিল।

পাশের ঘরে এলোমেলা শব্দ উসখুস করে। দরজা খোলার শব্দ শোনা যায়। বারান্দার দিকে তাকিয়ে হেঁটমুখ হয়ে বসে থাকলেও বুকেতে পারে রেবা, রতনের ছায়ার চঞ্চলতা এই ঘরের দরজার বড় কাছাকাছি এসে আবার চলে গেল। চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের ওদিকের খাটের উপর এসে বসে থাকে রেবা। হুঁকু হুঁকু বুকের যত মিথ্যা ভয়ের শহরগুলিকে হু হাতে আঁকড়ে ধরে চুপ করিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। ভয় করবার কী আছে? ওই মানুষকে কি ভয় করতে আছে? ও যে ভয়ালি হতেই জানে না।

আসতে বড় দেরি করছে। আসে না কেন রতন? রেবাকে আদর করবার আর ইচ্ছামত স্থবী হবার এমন অবাধ সুযোগ আর কবে পাবে রতন? রেবার বিহ্বল চোখের প্রতীক্ষার মধ্যে বেশ একটু অভিমানের ছায়াও ফুটে ওঠে।

সন্ধ্যা ফুরিয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। রাতের অন্ধকারে একেবারে ঢাকা পড়ে গিয়েছে পরেশনাথ। আমলকী-বনের ফুরফুরে হাওয়াই বা কোথায় চলে গেল? শুধু মুহূর্তে শব্দ ছড়ায় শিশু আর সেগুনের ভীড়।

জল জলজল করতে থাকে রেবার চোখে। আর একটা সন্বেহ দেখা দিয়েছে রেবার মনে, এবং এইবার বুকেতে পেরেছে রেবা, এতক্ষণ ধরে রতনের আশা আর ইচ্ছাকে বুকেতে খুবই ভুল হয়েছে রেবার।

কাঠের বাধ রাগ করে না, কিন্তু মাটির মাছুষও অপমানিত হলে বোধ হয় রাগ না করে পারে না। তবে বিনোদ গাঙ্গুলীর ছেলে, এমন কুস্তিকরা হট্টাকট্টা একটা মাছুষ, সেই রতন গাঙ্গুলীই বা কেমন করে সেই অপমানের জালা ভুলে যাবে? যে মেয়েকে এত ভালবেসেছিল আর উপকার করেছিল রতন, সেই মেয়েই রতনের জীবনের বুকে এক মিথ্যা অপবাদে ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। সেই মিথ্যা অপবাদকেই বর্ষে বর্ষে সত্য করে দিয়ে চলে যাবার সুযোগ খুঁজছে রতন। এই রকমই একটি প্রতিশোধ না নিলে কেমন করে তৃপ্ত হবে রতনের মত মাছুষ, পুরুষের মত পুরুষ?

ডাকাতের মত হঠাৎ এসে গলা টিপে ধরতে চায়? একটা অসহায় শরীরকে, একটা অনিচ্ছাকে, কতকগুলি আর্তনাদকে, এক জোড়া চোখের সজল কান্নাকে, আর সাজসজ্জার সব সজ্জালুতাকে লুটপাট করে সরিয়ে দিয়ে তৃপ্ত হতে চায় ওই প্রচণ্ড অভিলাষ? চায় বইকি, নইলে শাস্ত হতে পারে না রতন গাঙ্গুলীর আঁট বছরের অশান্ত আত্মার ক্ষোভ।

আজ আর পুলিশ আসবে না; সেদিনের সেই মিথ্যা এক্সাহারের কাহিনীটাকে শুধু আর একবার অভিনয় করতে হবে। শুধু ইচ্ছা করে একটা অনিচ্ছার জ্বলনা হয়ে যেতে হবে। অসহায়ের মত আর্তনাদ করে আর চোখের জল ফেলে রতন গাঙ্গুলীর দহনতা বরণ করে নিতে হবে। ওর ক্ষমাহীন প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞাকে স্থবী করে দিতে হবে। রতনের উগ্র চক্ষুর রূপ দেখে মনে মনে হেসে উঠবে রেবা।

আত্মক তা হলে। বিছানার উপর লুটিয়ে গুয়ে পড়ে আর একবার অসহায় হয়ে যায় রেবার দেহটা। মনে

হয়, এখুনি ঘুমে জড়িয়ে যাবে চোখের পাতা। বুঝতে পারবে না রেবা, কখন রতন এসে ঘরের ভিতরে ঢুকে রেবার ঘুমন্ত অসহায় ও একলা পড়ে থাকা এই সাজানো রাঙানো সুন্দর মূর্তিটার উপর ক্ষুধার্তের মত ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্তু ভৈরী হয়েছে।

হিঃ, নিজেরই উপর রাগ করে উঠে বসে রেবা। রতনের মত মানুষের মনকে এত ছোট মন নিয়ে এসব কী ছাই আবোল-তাবোল চিন্তা করছে রেবা। এ ভাবে রেবার কাছে আসবার মানুষ নয় রতন। রেবার মনটা যেন এককণ পাগলামি করে রতনের মনের একটা অত্যন্ত সহজ সরল ও স্বাভাবিক ইচ্ছাকেই বুঝতে পারছিল না। রেবার কাছে আসবার জন্তু বড়ই ব্যাকুল হয়ে উঠুক না কেন রতনের মন, তবু আসবে কেন রতন, কোন্ সাহসে, রেবা যদি নিজের গিয়ে হাত ধরে না নিয়ে আসে?

এতকণে রেবার সারা মুখের উপর হাসিভরা বিহ্বলতা একেবারে উজ্জল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এই হ'ল রতনের আশা! হাত ধরে ডেকে নিয়ে না এলে রেবাকে আর বিশ্বাস করা যায় না। বেশ তো, তাই হোক। তোমাকে হাত ধরে ডেকে আনতে পারলে যে আমাকেও নিঃশাস দিয়ে সেই জালা আর গিলতে হবে না কোনদিন।

আসছি আমি।—মনে মনে বলতে গিয়ে প্রায় মুখ ফুটে ব'লেই ফেলছিল রেবা। বিছানা থেকে এক লাফ দিয়ে উঠে নেট-জড়ানো খোঁপাটাকে চটপট ছুটো গুঁতো দিয়ে ছাদে বসিয়ে দেয়। তার পর আর এক মুহূর্তও দেরি করে না রেবা। ঘরের দরজা পার হয়ে বারান্দার উপরে এসে দাঁড়ায়। মুখচোরা অথচ প্রাণঢালা এক ভালবাসার আঁট বছরের মান ভেঙে সম্মান দেবার জন্তু রেবার মুখেও যেন একটা ছুঁছুঁ হালির প্রতিজ্ঞা মিটিমিট করে। রতনের ঘরের দিকে তাকায় রেবা।

হুই চোখ হুই হাতে ঢেকে ডুকরে টেঁচিয়ে ওঠে রেবা, খানসামা।

রতনের ঘরের দরজা বন্ধ। বন্ধ ভালো বুলছে দরজার কড়াতে। নেই, টিয়ার মার্চেন্ট পরিতোষ গাঙ্গুলীর নাম লেখা সেই কার্ড আর নেই। কখন কোন্ ঝড়ের হাওয়ায় উড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ওই কার্ড?

প্রায় দৌড়ে দৌড়ে চলতে থাকে রেবা। বারান্দা

পার হয়ে খানসামা লনের উপর নেমে, দূরের কিচেনের সেই কেরোসিনের আলোর দিকে তাকিয়ে চিন্তার করে রেবা, খানসামা।

ছুটে আসে খানসামা : কি হুকুম মেম সাব?

—আমার পাশের ঘরের সেই বাবু কোথায়?

—গাঙ্গুলীবাবু?

—হ্যাঁ।

—এই তো খোঁড়া আগে চলিয়ে গেলেন বাবু।

কী ভয়ংকর মানুষ! কী ভয়ানক প্রতিশোধ নিতে জানে লোকটা। রেবার বুকের গভীর থেকে উর্ধ্বল-পড়া উৎসবের মত এত বড় ইচ্ছাটাকে যেন খেঁতলে দিয়ে আছাড় মেরে চূর্ণ করে আর ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে পালিয়ে গেল লোকটা। আজ ওর কপালে বোঁতল ছুঁড়ে মারবার কেউ নেই। পুলিশ নেই, হাকত নেই, জেল নেই।

আন্তে আন্তে যেন বারান্দার বাতাস ঠেলে ঠেলে ঘরের দিকে চলে যায় রেবা। সারা গায়ে যেন হুঃসহ এক অপমানের কামড় লেগে রয়েছে। অনিচ্ছার উপর দৃষ্টান্ত করলে অপমানের যে জালা লাগে মনে, সে জালা কি এই জ্বালায় চেয়ে বেশী হুঃসহ?

ঘরের ভিতরে ঢুকে চেয়ারের উপর স্থির হয়ে ব'লে থাকতে চেষ্টা করে রেবা। কিন্তু পারে না। রতনের আজকের এই সত্যিকারের দৃষ্টান্তকে যে অপরাধ ব'লেই মনে করে না পৃথিবীর শাস্ত। কোন্ পুলিশের কাছে এজাহার দেবে রেবা?

রেবার নিজেরই হাত ছুটো যেন থেকে থেকে পাগল হয়ে উঠতে চাইছে। খোঁপা ভেঙে দিয়ে, গলা টিপে দম বন্ধ করে দিয়ে, পটপট করে এক টানে এই শাড়ি আর ব্লাউজের সব লজ্জালুতা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রেবাকে পৃথিবীর এই নিভৃত আঁট বছর আগের একটা এজাহার করে মাটির উপর লুটিয়ে দিতে চায়।

চেয়ার থেকে উঠে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ে রেবা। বালিশের উপর ভেজা চোখ ধ'বে ধ'বে, আর জালাভরা শরীরটাকে নিয়ে লুটিপুটি করতে করতে যখন ক্লান্ত হয় রেবা, তখন আমলকী-বনের হাওয়া আবার নতুন করে রাতের বুক ঠাণ্ডা করতে আরম্ভ করেছে।

রাত দশটার কয়েক মিনিট আগেই গিরিডি থেকে

অতন্দ্র

গোপাল ভৌমিক

আমি চাই জেগে থাকি
রাত্রিদিন নিঃশব্দ একাকী
সময়-সমুদ্রে ভেসে,
মেখে বাই পৃথিবীর খেলা
শাশ্ব নেড়ে কিংবা মুছ হেসে।
দেখি যত্ন, দেখি প্রেম,
তিতিক্ষা ও মহাক্ষম,
দেখি স্থণা প্রেমের সংশ্লেষে
কি করে বন্ধনা করে
অনাকীর্ণ দেশে মহাদেশে।

লতায় পাতায় ফুলে
ধে-প্রাণ সত্তত ফুলে
গান গায় আদি-অন্তহীন
একটি বলকে দেখা
সে বিচিত্র রূপ-রেশা
হয়ে যাবে নিঃশব্দে বিলীন
যদি হই অক্ষয়না

যদি না হৃদয়ে মেলি দৃষ্টি-দুববীন।
তাই খুঁজে ফিরি
স্পষ্ট দীপ্ত দৃঢ় সূৰ্ব-সিঁড়ি।
সংহত সজ্জাগ শিরা
অহেতুক মাঝে মাঝে করে বগ্নজীড়া
শিথিল কোঁতুকে :
চেতনা বিলুপ্ত হয়,
দৃষ্টির সম্মুখে
নামে ঘন অন্ধ যবনিকা।
চিন্তাময় প্রমিথিউন
হাতে নিয়ে মান অগ্নিশিখা
আবার বধন জাগে
সময়-সীমান্তে লাগে
বন্ধনার বেদনা-বিকোভ :
তুই চোখ রক্ত-রাঙা
সূৰ্ব-সিঁড়ি আধ-ভাঙা
বিজয়ীযু ভয় কোণ
সীমাহীন মৃত্তিকার লোভ।

ফিরে এলেন এন. চক্রবর্তী। টুরারের হর্নের শব্দেও ঘুম
ভাঙে নি রেবার।

দরজা খোলা। ঘরে আলো। তবু বিছানার উপর
এ রকম অদ্ভুতভাবে ঘুমিয়ে পড়ে আছে কেন স্বস্তি ?
এ কী ছিরি ? খোঁপাটা নেট ছিঁড়ে যেন ভেঙে
পড়েছে, এলোমেলো কতগুলি চুলের কুণ্ডলী ছড়িয়ে রয়েছে
হালিশের পাশে। শাড়িটার প্রায় সবটাই যে বিছানা
যেয়ে মেকের উপর ঝুলে লুটিয়ে রয়েছে। স্বস্তির অমন
হৃদয়ের চেহারাটাই যেন এই বিলী ঘুমের ঘোরে বিধ্বস্ত
হয়ে লালের মত পড়ে রয়েছে। এ রকম ক'রেও রাখব
ঘুমোয় ?

স্বস্তি !—বেশ জোরে টেঁচিয়ে ডাক যেন এন. চক্রবর্তী।
খড়খড় করে উঠে বসে স্বস্তিকা।

এন. চক্রবর্তী হাসেন : এ কি ?

স্বস্তিকা। কি ?

এন. চক্রবর্তী। মেখে মনে হচ্ছে, যেন একটা বাঘে
তোমাকে খেয়ে গিয়েছে।

স্বস্তিকা। খেল আর কোথায় ? খেলে তো ভালই
হ'ত।

এন. চক্রবর্তী। কী ভাল হ'ত ?

স্বস্তিকা হেসে ফেলে : তোমার তা হ'লে আবার
একটা বিয়ে করতে হ'ত।

মা ও মেয়ে

উমা দেবী

৫

আকাশের নীল উতল হয়েছে আকুল নয়ন-নভে,
ও চোখ তোমার—ও যুগনয়না! কাদবার নয় কাদবার।
শকুন্তলা গো! কি হ'ল তোমার? কি হ'ল? কখন? কবে?
এ কান্না কেন? আবার কি হ'ল? আবার?
(মা ভেবে আকুল, বেদনায় বুক কাতরায়।
মেয়ে তার ব্যথা পায় কি অবুঝ কান্নায়?)

কুন্তলা কাদে গভীর নিশীথে—নীরব যখন চারদার,
বালিশের বুকে ক্লান্ত করণ মুখটি লুকিয়ে বার বার।
এ কান্না তার হৃথের? হৃথের? কিংবা এ শুধু যৌবন
আপন খেয়ালে ছড়ায় আধারে অশ্রুযুক্তা অগণন?
(মা ভেবে আকুল, বেদনায় বুক কাতরায়—
মেয়ে তার ব্যথা পায় কি অবুঝ কান্নায়?)

মেয়ে তার মেয়ে—আহা ছোট্ট সে—কি জানে
বল সে পৃথিবীর।
নদী-আবর্ত কতটা কুটিল সে কথা জানে কি নদীতীর?
কমলকুঁড়ির মত মুখখানি যখন বুকের হৃদাধার
পান করেছিল সে বয়স থেকে হয়েছে কতই বড় আর।
(মা ভেবে আকুল, বেদনায় বুক কাতরায়,
মেয়ে তার ব্যথা পায় কি অবুঝ কান্নায়?)

দূরের আকাশে তারাগুলি কীপে—তারি কোন কথা
বলবে না।
রাত্রির বুক স্বপ্নের মধু-মৌচাক গড়া চলবে না।
নিষ্ঠুর কেউ নিশ্চয় তার মেয়েকে এমন কাদিয়েছে,
নীল দীঘিটির মতন নয়নে অশ্রুর মেঘ নামিয়েছে।
(মা ভেবে আকুল, বেদনায় বুক কাতরায়,
মেয়ে তার ব্যথা পায় কি অবুঝ কান্নায়?)

কুন্তলা কাদে বালিশে ছড়ানো ক্লান্ত কুটিল কেশভার
নিশীথের ষত লুকানো কান্না নেমেছে আজকে চোখে তার।
মৃণাল বাহাট আড়াল করেছে পদ্মের মত মুখখানি—
একটি সনাল কমল সমেত উলটে পড়েছে ফুলখানি।
(মা ভেবে আকুল, বেদনায় বুক কাতরায়,
মেয়ে তার ব্যথা পায় কি অবুঝ কান্নায়?)

কুমারী কন্যা—নিশ্চয় জানি অস্তুর তার অকলুষা,
শ্বেতপদ্মের মত পবিত্র রাগবিমুক্ত ঘন উষা।
কুমারীর মন শরৎ-কালের আকাশের মত আলোময়,
সেখানে এমন বাষ্পছড়ান কেন এ অকাল মেঘোদয়।
(মা ভেবে আকুল, বেদনায় বুক কাতরায়—
মেয়ে তার ব্যথা পায় কি অবুঝ কান্নায়?)

মেয়ের শিয়রে মা ব'সে নীরবে চিত্তে যেন বা অকিত
বাতায়নপটে আকাশের চাঁদ ভয়ে ভয়ে নামে শঙ্কিত,
পাপিয়া পাখিরা কুঞ্জনের মুখে আধবোলে ধামে সঙ্কোচে
আঁচলের কোণে মায়ে আর মেয়ে দুজনেই আঁখিজল মোছে।
(মা ভেবে আকুল, বেদনায় বুক কাতরায়,
মেয়ে তার ব্যথা পায় কি অবুঝ কান্নায়?)

—আশ্বে উঠে এস শকুন্তলা
হু চোখে কেন এত জলধার,
জড়াও ধীরে ধীরে মায়ের গলা—
নাম্নাতে চাও যদি মনোভার—
মা ছাড়া বুঝবে কে কথা আর?
আপন সব চেয়ে মা আর মেয়ে—গভীর—সুগভীর বন্ধন,
একের ব্যথা নামে হু চোখ বেয়ে—বকে অপরের ক্রন্দন।

অপত্য

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

এক

জী

বনের অন্তত এই একটি জায়গায় রসবোধের পরিচয় দিয়েছে পরমেশ পেশকার। মেয়ের নাম রেখেছে তরুকা। কেমন রসভাসের মত মনে হয়। যে পরমেশ পেশকারের হাতের নোখগুলো ময়লা জমে জমে নীলবর্ণ, বা পা-টাকে যে একটু টেনে টেনে চলে, চশমার ফ্রেম ভাঙলে যে লোকটা দড়ি বেঁধেই চালিয়ে দেয় দিনকতক আর বিকেলের বাজারে গিয়ে যে খুঁজে খুঁজে পচা মাছ কেনে, তার মেয়ের তরুকা নাম হতে পারে, এ কথা বিশ্বাস করাই শক্ত।

তবু এমন অবটনটাই ঘটেছে।

কিন্তু ওই পর্বস্তুই। এর পরে আর প্রশ্ন দেয় নি পরমেশ পেশকার। পান থেকে চুনটি খসলে মেয়েরে নির্মমভাবে; যেদিন খেতে দেয় নি, সেদিন সারা দিনই উপোস করিয়ে রেখেছে। অজ্ঞকার ঘরে যেদিন আটকে রেখেছে, সেদিন দাঁত কপাটি না লাগা পর্বস্তু আর শিকল খুলে দেয় নি।

অজ্ঞত এই লোকটা।

কেউ কোনদিন হাসতে দেখেছে বলে মনে করতে পারে না। কাউকে হাসতে দেখলে তার গা জালা করে। ছেলেমেয়েরা কোনদিন খুশী হয়ে জোরে হেসে উঠলে কশাইয়ের মত মেয়েছে তাদের। বীভৎস মুখে আরও বীভৎস ভঙ্গি টেনে বলেছে : অত হাসি কিসের ? এমন করে হাসবার মত কী হয়েছে ?

পাড়ার ছেলেরা বলে, রাম-গরুড়। অক্ষিসের সহকর্মীরা স্পর্শ বাঁচিয়ে চলে যথাসম্ভব। আদালী-বেয়ারারা পর্বস্তু আড়ালে ভেঁচি কাটে। সব টের পায় পরমেশ পেশকার।

কিন্তু কোন কিছুকে সে গ্রাহ করে না—গ্রাহ করবার মত মেজাজই তার নয়।

লোকটা টাকা ভালবাসে। টাকা পায়ও। পেশকারের দক্ষিণ হাতে দক্ষিণার দক্ষিণ্য অব্যাহত।

আগে ছিল ডিষ্ট্রিক্ট অ্যাণ্ড সেশন জজের পার্সোনাল অ্যাডমিনিস্ট্রাটর আর স্টেনোগ্রাফার। মামলার রায় কী হবে অনেক আগে থেকেই জানতে পারত। যে পক্ষ মামলার জিতেছে তাদের ডেকে বলত, তোমাদের হার হয়েছে। তবে আমাকে যদি ছুশো টাকা দাও, তা হলে জজকে বলে আমি রায় বদলে দিতে পারি।

বেশ নিখুঁত রোজগার।

তারপর এল পেশকারী। বাঁধা দস্তুরের মত উপরি-পাওনা। তীর্থে পূজা দেবার আগে পাণ্ডার দর্শনী। ইচ্ছে না হয়, দিয়ো না আমাকে। দেখি কী করে তুমি নথির নকল পাও, দেখি তোমার দরখাস্ত কেমন করে জজুরে হাজির হয়, দেখি কেমন করে তোমার জামিনের ব্যবস্থা কর।

পেশকার তুষ্ট হলেই জজ আধখানা হাতের মধ্যে। নন্দীকে পূজা না দিয়ে শিবের সমরে যাওয়া অসম্ভব। পরমেশ মোক্তার ছু হাতে টাকা রোজগার করে।

কিন্তু লোকটার স্বপ্ন নেই।

স্বপ্ন নেই মনের মধ্যেই। সমস্ত পৃথিবীর বিকল্পেই তার একটা অসহ্য অভিযোগ। হাপি, আনন্দ, গান—সব কিছুই তার কাছে একটা অনাবশ্যক উপদ্রব বলে মনে হয়। পরমেশ পেশকারের কাছে জীবন একটা লাস-কাটা ঘর। যেন বিকৃত মুখে কতগুলো অধর্গলিত মৃতদেহের ব্যবচ্ছেদ করে চলেছে সে।

একটা ছোট্ট ঘটনাতেই হাছফটাকে চেনা যাবে।

কী মনে ক'রে বাড়ির পুরোনো বুড়ী খিটা উঠানে গোটােকয়েক গাঁদাফুলের চারা লাগিয়েছিল। পরমেশ পেশকারের বাড়িতেও সেই চারাগুলো আশ্বে আশ্বে প্রাণ পেয়ে উঠল। একটি দুটি ক'রে সবুজ পাতায় তারা আকাশের দিকে অঞ্জলি পাতল, তারপর নরম রোদ আর মিঠে বৃষ্টিতে শ্রামল-স্বিচ্ছ ঘোবনে পরিপূর্ণ হ'ল। তারও পরে সারা উঠান একদিন গাঢ় হলুদ আর উজ্জ্বল সোনালী রঙের ফুলে ছেয়ে গেল। খবর পেয়ে গোটা কয়েক প্রজাপতি উড়ে এল, এক জোড়া বুলবুলি বারকয়েক ঘুরে ঘুরে দেখে গেল ফুলগুলোকে।

পরমেশ পেশকারের অতটা খেয়াল হয় নি। ফুল হয়েছে—তাতে কী! ফুল না হ'লেই বা সংসারে কী ক্ষতিটা ঘটত! উঠান দিয়ে হাঁটবার সময় কতগুলো গাছ যে তার খড়মের তলায় নিম্পিষ্ট হয়ে গেছে, পরমেশ পেশকার সেদিকে লক্ষ্য ক'রেও দেখে নি।

খেয়াল ক'রে দিলে তহুকাই। চমৎকার একটি বিকেলের খুশি-খুশি মন নিয়ে।

ইস, কী সুন্দর দেখাচ্ছে গাঁদাফুলগুলোকে! যেন আমাদের উঠান ভ'রে সোনা কলেছে।

পরমেশ পেশকার তক্লি কাটছিল। এই একটা অভ্যাস আছে তার। অবশ্য অহেতুকী নয়, নিজের পৈতে নিজের হাতেই তৈরি করে সে। তহুকার কথা শুনে চমকে উঠল। কটু ক'রে কেটে গেল তক্লির হুতো।

কী-বললি?—কেমন বিকৃত গলায় জিজ্ঞেস করলে পরমেশ।

ততক্ষণে তহুকা বুঝতে পেরেছে। হরিণ চিনতে পেরেছে বাঘের চোখ।

বাপের হাতের কাছ থেকে প্রায় দশ গজ দূরে ন'রে গিয়ে তহুকা বললে, না বাবা, আমি কিছু তো বলি নি।

বলিস নি—না? ফুলগুলো দেখতে খুবই চমৎকার—তাই নয়?—বীভৎসভাবে মুখভঙ্গি করলে পরমেশ: মেয়ের আমার কাব্য হচ্ছে! আর কাব্য করার জন্তেই মাস মাস মাইনে শুনে তোমায় ইতুলে পাঠাই—তাই নয়? আচ্ছা, দাঁড়া—

তহুকা কাঠ হয়ে গেল। ভেবেছিল কয়েক ঘা এবার

তারই পিঠে পড়বে। বিনা দোষে মার খেয়ে খেয়ে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে কেন মার খেল, নিজেরদেও ওরা আর সে প্রের করে না। তাই সারা শরীরকে শক্ত ক'রে মুখের ওপর প্রচণ্ড একটা চড় পড়বার জন্তে প্রতীক্ষা করতে লাগল তহুকা।

কিন্তু মেয়ের গায়ে হাত তুলল না পরমেশ পেশকার। সোজা নেমে গেল উঠানে। হিংস্র একটা জন্তুর মত দু হাতে ফুলগুলো ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললে, খুব ভাল লাগছে দেখতে—না? খুব চমৎকার—তাই নয়?

একটি ফুলও বাদ দিলে না পরমেশ পেশকার। একটিও না। প্রত্যেকটি টেনে টেনে তুলল বোঁটা থেকে, তারপর উপড়ে দিলে গাছগুলোকে। দাঁতে দাঁত ঘ'বে হিংস্র ক্রোধে আঙড়াতে লাগল: কাব্য হচ্ছে—কাব্য।

বীভৎসতার পালা সেইখানেই শেষ হ'ল না। ফুল-গুলোকে তুলে নিয়ে সোজা ফেলল রাস্তায়। স্ত্রীকে ডেকে বললে, আজ এই ফুলের ভাজা হবে, আর ফুলের চচ্চড়ি।

রাস্তাে সেই ফুলভাজা খেতে চায় নি ব'লে খড়ম ছুঁড়ে মেরেছিল তহুকার দিকে। ঠং ক'রে সেটা এসে পড়ল কপালে। খালার ওপরে মুখ খুঁড়ে পড়ল তহুকা, কপালের একটা কোণা কেটে রক্ত নামতে লাগল দ্রুদরিয়ে। আজ এগারো বছর পরেও সে দাগ মিলেয় নি তহুকার।

তহুকার এখন একুশ বছর। এবার সে বি.এ. পাস করেছে।

এর মধ্যে সাত ঘাটের জল খেয়েছে পরমেশ পেশকার। বদলি হয়েছে এ জেলা থেকে অন্য জেলায়। শেষে যেখানে এসে স্থায়ী হয়েছে, আর দু বছরের মধ্যেই সেখান থেকে সে রিটারায় করবে। একস্টেনশনের আশা নেই, ওপর-ওয়ালারা তার ওপরে প্রসন্ন নয়।

সংসারেরও অনেক অদলবদল হয়ে গেছে এর ভেতর। বাপের খড়মের ঘা খেতে খেতে থার্ড ডিভিশনে ম্যাস্ট্রিক পাস করেছিল বড় ছেলেটা। তার পরেই সে উদ্যোগ হয়েছে। কেউ বলে সে সাউথ আফ্রিকায়, কেউ বলে উত্তরকামণ্ডে। কেউ বলে, সে মিলিটারিতে জাঁদরেল অফিসার এখন, কারো মতে সে গুণ্ডার দলে ভিড়েছে। দুটোই সম্ভব। মোটের ওপর বাপের সঙ্গে কোন সম্পর্কই

সে আর রাখে না—জীবনের এ অংশটাকে সে জলের লেখার মত মুছে ফেলেছে।

খাকবার মধ্যে পরমেশ পেশকারের ওই একটিমাত্র মেয়ে।
অখ্যর দিক থেকে একটু ভুল হ'ল অবশ্য।

সন্ধান তার আরো আছে। আরো তিনটি। সব চেয়ে ছোটটার বয়স চার বছর। ছুটি ছেলে, শেষেরটি মেয়ে। কিন্তু তিনটিই বিকলাঙ্গ। বড় বড় মাথা, কাঠি কাঠি হাড়-পা। মাঝেরটা তবু দু-চার পা চলে বেড়াতে পারে, কিন্তু বাকি দুটোর আর বিছানা ছেড়ে নড়বারই কয়তা নেই।

মা বথাসাধ্য করে। কিন্তু একা হাতে কতদূর সামলাবে সে? পরমেশের সংসারে চাকর-ঝি বেশি-দিন টিকে থাকে না—হয় পালায়, নইলে পরমেশই তাড়িয়ে দেয় তাদের। যাওয়ার আগে বাজেয়াপ্ত করে মাইনে। শুধু একজন একটা পুরোনো পকেট ঘড়ি নিয়ে স'রে পড়তে পেরেছিল। অবশ্য তাতে যে তার কতটা লাভ হয়েছে বলা শক্ত,—কারণ সতেরো বছর আগে সতেরো টাকা দিয়ে সেকেন্ড হাণ্ড ঘড়িটা কিনেছিল পরমেশ।

বুড়ী কীটা অবশ্য আছে। জাতিতে আদিবাসী, পরমেশের চাকরিজীবনের একেবারে প্রথম পর্বে বাঁকুড়া থেকে এই সংসারে এসে ভিড়েছিল। তিন কুলে কেউ ছিল না—পরমেশের স্ত্রী বাসন্তীকে কী চোখে যে দেখেছিল সে, শুধু সে-ই জানে। তারপর থেকে মার খেয়েছে অনেক, তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বছবার, তিন টাকা মাইনে বাকি পড়েছে বছরের পর বছর, বুড়ী রাগ ক'রে বেরিয়েও গেছে কতদিন। কিন্তু একেবারে চলে যেতে পারে নি। কী একটা অলক্ষ্য স্ত্রীতোর টানে আবার গজগজ করতে করতে ফিরে এসেছে।

সে আছে। কিন্তু তার চোখে এখন ছানি। রাতে একেবারে কানা। পরমেশের তিনটে গল্পর পরিচর্যা ক'রে তার সময় কাটে। তা ছাড়া আরো কাজ আছে। সকাল-বৈলায় তাকে পাড়ায় দুধ আর তরকারি কিরি করতে বেরতে হয়।

তার মানে সে যে স্বাধীন ব্যবসা করে, তা নয়। ওটা তার চাকরির আর একটা দিক।

আরো একটু খুলে বলতে হ'ল।

পরমেশ পেশকার আর দু-বছর পরেই রিটার্ন করবে।

শেষ পর্যন্ত যে শহরে এসে ঠেকেছে, সেইখানে একটা বাড়ি তৈরি করেছে সে। পৈতৃক ভিটে তার আরামবাগের কাছাকাছি কোথাও, কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক, তার সঙ্গে সে কোনও সম্পর্ক রাখতে চায় না। তার ইচ্ছে, জীবনের বাকি দিনগুলো এখানেই সে কাটায়।

উত্তর-বঙ্গের পুরোনো আমলের শহর। ছাড়া-ছাড়া বাড়ি, ইতস্তত বড় বড় আমের বাগান আর রাশি রাশি ধুলো। শহরের বুকের মধ্য দিয়ে সাপের মত একটা আঁকা-বাঁকা ক্যানাল, বর্ষায় কিছুটা স্রোত আসে, অন্য সময়ে টুকরো-টুকরো বহু জলের সমষ্টি। শহরের ঘত আবর্জনা তাদের মধ্যে এসে পড়ে, আর তা থেকে ছড়ায় অবুঁদ-নিবুঁদ মশা আর অবিধাত ম্যালেরিয়া। লোকে বলে, এই শহরের জলে নাকি পৃথিবীর সব রকম ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান মেলে।

বাড়ি করবার পক্ষে আদর্শ জায়গা এ শহর নিশ্চয়ই নয়। তবুও পরমেশ পেশকারের পছন্দ হয়েছে। দুটো কারণে। প্রথমতঃ, চাল এখানে অসম্ভব সস্তা। বাংলা দেশের তিনটি সেরা ধানের জেলার একটি। দ্বিতীয় কারণ, খুব সস্তায় একটা পুরোনো বাড়ি কিনতে পাওয়া গিয়েছিল। কাঠা দশেক জমিও তার সঙ্গে।

দু-চারজন বলেছিল, সর্বনাশ, ও কি বাড়ি কিনছ ওখানে? ওটা যে ভূতের বাড়ি?

পরমেশ পেশকার বিজ্ঞী রকমের মুখভঙ্গি করেছিল একটা : ভাবনা নেই, ভূতেও আমায় ভয় করে।

কথাটা মিথ্যে নয়। কেউ প্রতিবাদ করে নি।

শুধু স্ত্রী আরও দু-একবার স্বামীর কাছে কথাটা তুলতে চেয়েছিল।

লোকে বলে, বাড়িটা ভাল নয়?

অপরাধ?

নানারকম শোনা যায়—

কী শোনা যায়?

ও-বাড়িতে কারা সব ছিল, একসঙ্গে কলেরা হয়ে মারা যায়—

পরমেশ পেশকার পায়রার পালক দিয়ে কান চুলকোতে চুলকোতে বলেছিল, সব বাড়িতেই কারা সব থাকে, তাদের

কেউ কেউ কলেরা হয়ে ম'রেও যায়। এটা কিছু নতুন ব্যাপার নয়।

কিন্তু বাড়িটা একেবারে ফাঁকা জায়গায়—

আমি তো মুদিখানা করব না যে, বাজারে গিয়ে বাড়ি করতে হবে!

আমার বড় ভয় করছে। ছেলেপুলে নিয়ে থাকা, তায় বাড়িটার নানা অপবাদ—

তোমার যদি সাহস না থাকে, ছেলেপুলে নিয়ে স্বচ্ছন্দে অন্য জায়গায় গিয়ে থাকতে পার। আমি কিন্তু একটি পরিসাও মাসোহারা দেব না, সেটা যেন খেয়াল থাকে।

পরিষ্কার কথা—মামলা খতম। জ্বী উঠে গিয়েছিল সামনে থেকে। তারপর নিরুপায়ের শেষ সাত্বনায় ঠাকুরকে ডেকে বলেছিল, ওদের ভাল-মন্দ কিছু হওয়ার আগে ভূমি আমাকেই টেনে নিয়ে।

এ কথা অনেকবার বলেছে সে, আরো অনেকবার। কিন্তু দেবতা শুনতে পান নি। কতবার একান্ত ক'রে মৃত্যু প্রার্থনা করেছে ঈশ্বরের কাছে, আজো সে প্রার্থনা পূর্ণ হয় নি। কিন্তু এ ছাড়া আর কীই-বা করতে পারে সে?

পরমেশ পেশকার সেই বাড়িই কিনল।

রেল-লাইন ছাড়িয়ে বাড়ি। এক দিকে পুরনো একটা অঙ্ককার আমবাগান, আর এক দিকে কাল-কান্দ্রিমির জঙ্গল। অনেকখানি দূরে মূলমানপাড়া, এখান থেকে ডাক-চিৎকার ছাড়লেও সহজে তারা শুনতে পায় না।

এই বাড়ির শাওলা-আঁকা দেওয়াল আর খুলে-পড়া ছাদের দিকে তাকিয়ে বুক ছন্দ ছন্দ ক'রে উঠেছিল পরমেশের জ্বী বাসন্তীর।

কিন্তু ভয় পাওয়ার মত সময়ও হয় নি পরমেশ।

বিকলেই এল গাড়ি-ভর্তি চুন-সুরকি, এল সিমেন্ট। শুধু রাজমিস্ত্রিই এল না।

পরমেশ বললে, এ আর শক্ত কাজ কি! একটু ঠিকঠাক ক'রে নেওয়া বই তো নয়। এস, হাতে হাতে এটুকু আমরা সেরে ফেলি।

সত্যিই তো এ আর শক্ত কাজ কি! এখানে-ওখানে চাবড়া চাবড়া বালি ধরিয়ে দেওয়া, দেওয়ালে চুনকাম করা, সিমেন্ট দিয়ে মেজে পালিশ করা আর সাপের ফোকর

বুজিয়ে দেওয়া—এগুলোকে শক্ত কাজ কে বলবে! কোট থেকে দু'দিন ছুটি নিল পরমেশ। আবার বললে, হাতে হাতে হয়ে যাবে।

হ'লও। চুন প'ড়ে তিন দিন চোখ ফুলে রইল বাসন্তীর। চুনে হাত ধেয়ে গিয়ে দু'রাত বস্ত্রণায় ঘুমতে পারল না তরুকা। পরমেশ ধমক দিয়ে বললে, এ, বাছার আমার ননীর শরীর! একেবারে গ'লেই গেলেন। কৌপানি বন্ধ কর বলছি; নইলে লাগি মেরে রাস্তায় ফেলে দেব।

বুড়ী বিটার মাথায় ইট প'ড়ে রক্তারক্তি হয়েছিল। শুধু তাকেই কিছু বলে নি পরমেশ।

বাড়ির চেহারা যা হ'ল সে লোককে ডেকে দেখাবার মত। এখানে এক খাবলা সিমেন্ট—ওখানে এক পৌচ রঙ। জরাজীর্ণ রূপটা আরও বীভৎস দেখাতে লাগল।

দিন কয়েক কী যে আতকে বাসন্তীর কেটেছে বলার নয়। দিন-দুপুরেই শেয়াল এসে বারান্দায় ঘুরেছে, কুয়োতলায় দু'দিন দুটো গোখরো বেরিয়েছে, নিশি-রাজে কাল-কান্দ্রিমির বনে অদ্ভুত পাখির বিকৃত কান্না শোনা গেছে, মনে হয়েছে দেওয়াল ঘেঁষে কারা সব ছান্না-ছান্না হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিকলাঙ্গ হাবা ছেলেমেয়েগুলো পর্যন্ত আশ্বব ভয়ে আর্তনাদ ক'রে উঠেছে থেকে থেকে। আর নিশিচিন্তে ঘড় ঘড় ক'রে নাক ডাকিয়েছে পরমেশ।

তরুকা ফিসফিসিয়ে বলেছে, মা!

কি রে?

ওই জানলাটা বন্ধ ক'রে দিই?

তারি গরম লাগবে যে! ওইটুকু দিয়েই তো বা-হোক একটু হাওয়া আসে।

লাগুক না একটু গরম। আমি যে কিছুতেই ওই আমবাগানটার দিকে চাইতে পারছি না মা। মনে হচ্ছে, কে যেন ওখান থেকে একখানা লম্বা হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে আমার দিকে।

হঠাৎ কী ক'রে নাকের ডাক বন্ধ হয়ে গেছে পরমেশের। ঘুমের মধ্যেও সজাগ কুকুরের মত সতর্ক লোকটা।

কী হয়েছে এত রাত্রে? এত ফিসফিসানি কিসের?

তহু বলছিল, খোলা জানালাটা দেখে ওর ভয় করছে—
বন্ধ ক'রে দেবে ?

বন্ধ ক'রে দেবে।—পরমেশ দাঁত খিঁচিয়েছে : তারপর
ঘরভুক্ত সবাই স্বেচ্ছা হয়ে মরবে; তাই নয় ? ভয় করছে !
ওরে আমার আহলাদী পুতুল রে ! এক চড় মেরে বাইরে
বের ক'রে দেব—এই বলে রাখছি।

একশ বছরের মেয়ে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। বালিশের
মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থেকেছে সারা রাত—শরীর ঘামে
ভিজ্ঞে গেছে তার।

তারপর সব স'য়ে গেছে আশ্বে আশ্বে।

বাড়ির কীকা জমিটায় একদিকে গোয়াল। বাকিটা
শুধু শুধু পড়ে থাকবে ? অতখানি অপব্যয় করতে রাজী
নয় পরমেশ পেশকার।

একদিন নিজেই কোদাল নিয়ে এসে কোপাতে আরম্ভ
করল।

তরি-তরকারির চাব হবে এখানে।—তারপর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি
ফেলল মেয়ের দিকে : এই হারামজাদী, কী দেখছিল
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ? আগাছাগুলোও পরিষ্কার ক'রে দিতে
পারিস নে ?

নতুন কাজ শুরু হ'ল তরকারি।

পরমেশ পেশকারের বাঁধা হুকুম : ভোরে উঠে ক্ষেতে
জল দিতে হবে। বিকেলবেলা কিরে এসে আর একবার।
ভাল ক'রে তদারক করিতে হবে। শুয়াপোকা না লাগে,
লক্ষ্য রাখতে হবে সেদিকে। কোন্ পাঁছের কখন মাচা
ক'রে দিতে হবে, তার হিসেবে যেন ভুল না হয়।

আর যদি এই হুকুমের এক-আধটুও এদিক ওদিক ঘটে ?

পরমেশ পেশকারের খড়ম ছুটে আসবে কপাল লক্ষ্য
ক'রে। এবং আশ্চর্য হাতের টিপ পরমেশের। একেবারে
মোক্খম গিয়ে লাগবে।

এত পরিচর্যা শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মী-লী ফুটল বাগানে।

পরমেশের টাকার ভাগ্য ভাল, ক্ষেতের ভাগ্যও নেহাত
মন্দ নয়। কিছুদিনের মধ্যেই সমস্ত জমিটুকু সব্জের ঔষধে
ভরে উঠল। নতুন ডাঁটাগুলো বাঁধা বাঁধা পাতা মেলল,
হলধে রঙের কুমড়ো ফুলে আলো হয়ে গেল চারদিক,
লকলকে লাউয়ের ডগায় পোড়ো-মাটির ঘুম ভাঙার আনন্দ
লাড়া দিয়ে উঠল।

তারপরে আরও কত ফল ! এল আলতা-পাটী সীম,
এল বিড়োরা, ফলল অপরাধী বেস্টন, স্বর্ঘমুখী লক্ষা মুখ তুলল
আকাশের দিকে। ফুলকপির রঙ আরও সাদা হ'ল, বাঁধা-
কপিয়া আরও শক্ত ক'রে আঁট বাঁধল, মুলোর ফুল মরশুমি
ফুলের মত হাওয়ায় দোল খেতে লাগল। আলুশাকের
গন্ধে বেড়ার ওপার থেকে ছাগলের নোলায় জল পড়তে
লাগল।

এত শাক-সজী—এত ফল-পাকড় ! কিন্তু এদের
একটিও নিজেদের খাবার জ্ঞানে নয়।

একবার ঘূণাক্ষরেও সে-কথা তুললে মুখ ভ্যাংচায়
পরমেশ পেশকার।

থাক, থাক, অত খেয়ে আর দরকার নেই। রাতদিন
তো সমানে খাচ্ছে, খেবে আমাকে পর্যন্ত খাবে নাকি ?

রাতদিন সমানে খাচ্ছে ! তাই বটে। বিকেলে যে
মাছঘটা পচা চিংড়ির বাজার করে আর সস্তার দেশের
সস্তার মুড়ি ছাড়া যার ঘরে কোন জলখাবার থাকে না,
তার ছেলেমেয়েরা সমানেই খায় বটে। বাসন্তীর চোখে
জল আসে।

এই হাবা-হুলো ছেলেমেয়েগুলো এক ফোঁটা দুধ পর্যন্ত
পায় না—

কথা শেষ হয় না, তার আগেই গ'র্জে ওঠে পরমেশ
পেশকার, হাবা-হুলো ! কে ওদের পয়সা করতে বলেছিল ?
কেন ওই শূয়োয়ের পালকে পেটে ধরেছ, শুনি ? মাছঘের
ছেলেমেয়ে দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়—কেমন স্বাস্থ্য, কেমন
চটপটে ; আর আমার কপালগুণে কতগুলো যমের অরুচি
হাবা-হুলো এসে জন্মেছে। মেয়ে ফেলে দাও, গলা টিপে
মেয়ে ফেলে দাও—

পরমেশ সে কথা বলতে পারে বইকি। গলা টিপে
মারতে পারলেই তার সংসারের ভার কমে। যত দোষ—
যত দায়—সবই বাসন্তীর। সে-ই এই সব অক্ষম
বিকৃতভাঙ্গ সন্তানকে টেনে এনেছে, সে-ই এদের বাঁচিয়ে
রাখছে বুকের রক্ত দিয়ে—দোষ তার ছাড়া আর কার ?

বাগান থেকে চকচকে নতুন আলু ওঠে ; লাউ, মিঠে
কুমড়ো, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বিড়ো, বেস্টন, মুলোর কাঁকা
ভাজে যায়। শাকের ডগা-পাতা লকলক করে। কিন্তু
ওর একটিও বাসন্তীর রামাঘরে যায় না। পরমেশ নিজে

শাকের আঁটি বেঁধে দেয়, হিসেব ক'রে দেয় লাউ কুমড়া, ওজন ক'রে দেয় আলু বেগুন শিম। তার পর বুড়ী কি সেগুলো নিয়ে ফিরি করতে বেরোয়। বিক্রিও হয়। পাড়ার লোকে খুশী হয়েই টাকা তরি-তরকারি কেনে, বরং বাজারের দামের-চাইতে দু পয়সা বেশীই দেয়।

দৈনিক তিনটে থেকে চারটে টাকা রোজগার পরমেশ পেশকারের। বুড়ী ফাঁকি দিতে পারে না। সন্দেহ হ'লে পরমেশ পেশকার তার আঁচলের গিট পর্বস্ত পরীক্ষা ক'রে দেখে।

বাগানের তরি-তরকারি একেবারেই কি যায় না বামা-ঘরে? যায়। যখন ডাঁটার ঝাড় বুড়ো হয়ে বাঁশঝাড়ের মত শক্ত হয়ে যায়, তখন; যখন চৈত্র মাসের শেষে বাঁধা-কপি ছেৎরে-ফেৎরে একাকার হয়ে যায়, পাতাগুলো শুকিয়ে যায় চামড়ার মত, তখন; যখন বেগুনে পোকা ঢুকে সেগুলো বেকে ঝুঁকড়ে যায় আর শক্ত হয়ে যায় পাটকেলের মত, সেই তখন। তার আগে নয়। তার আগে একটি পাতা ছোঁয়া যায় না, একটি শশাও দাঁতে কাটা যায় না।

আর যদি এক-আধটু চুরি ক'রে ছেলেমেয়েদের খাওয়ায় বাসন্তী! তারও উপায় নেই—পুঁইগাছের প্রত্যেকটা পাতা পর্বস্ত শুনে রেখেছে পরমেশ পেশকার।

একবার তার পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল।

মেজো ছেলেটা এক-আধটু চ'লে-কিরে বেড়ায়—দু-চারটে কথাও বলতে পারে। একদিন বাঘনা ধরল সে, বেগুনভাজা খাবে।

সামান্যই জিনিস। কিন্তু ঘরে বেগুন নেই। বাসন্তী সামান্য দিল: কাল বেগুন আনিবে ভেঙ্গে দেব বাবা, আজ তো ঘরে নেই।

ছেলে বললে, ওই যে। বাগানে। বেগুন।

এমনি ভাবেই কথা বলে। কেটে কেটে, ছেঁটে ছেঁটে। টেলিগ্রাফের ভঙ্গিতে।

বাসন্তী শঙ্কিত হয়ে বললে; ও বেগুন খেতে নেই বাবা। ও খারাপ।

না, খাব। বাগানে। বেগুন।

ও বেগুন পাঁচ, ওতে গন্ধ।—বাসন্তী ভোলাতে চাইল: ওতে পোকা আছে, থুং!

ছেলেটা তখন হাত-পা ছড়িয়ে কাদতে বলল। এক

ঘেয়ে টানা-টানা কান্না: বাগানে। বেগুন। ভাজা। খাব।
আঁ—আঁ—আঁ—

অসহ্য যন্ত্রণায় এমন ভাবে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরল বাসন্তী যে, কেটে রক্ত পড়তে চাইল। কিছুই নয়, সামান্য বেগুন একটা। তার নিজের ক্ষেতেই রয়েছে। অথচ হাত দিয়ে ছোঁবার উপায় নেই।

ছেলেটা কাদতে লাগল। শেষে ঠক ঠক ক'রে মাথা ঠুকতে লাগল মেঝের ওপর।

বাসন্তী আর পায়ল না। কিছুক্ষণ নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে শেষে একটা বেগুন তুলেই আনল গাছ থেকে। আনল পাতার তলা থেকে, যেখানে প্রথম বারেই পরমেশের নজর গিয়ে পড়ে না। ভাবল, একটা মাত্র তো বেগুন, ও কি আর টের পাবে?

কিন্তু নিজের স্বামীকে চিনতে তখনও কিছু বাকি ছিল তার।

কোর্ট থেকে ফিরে চা খেলে পরমেশ, মুড়ি খেলে, একটা বিড়ি ধরাল, তারপর নেমে গেল বাগানে। তত্বকা তখন গাছে জল দিচ্ছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই চোখে পড়ল।

এ গাছ থেকে বেগুন ছিঁড়ে নিলে কে?—পরমেশ প্রায় আতর্জনাক ক'রে উঠল।

সভয়ে তত্বকা বললে, আমি তো জানি নে বাবা।

তুমি জান না?—পরমেশ বিকট মুখ ক'রে বলল, জাকামি করা হচ্ছে আমার সঙ্গে? তুমি জান না? তবে জানে কে শুনি? খিদি মেয়ে—রাতদিন নোলা লকলক করছে, এ নিশ্চয় তোমারই কাজ! ক্যাক ক'রে পরমেশ তত্বকার চুলের মুঠি টেনে ধরল: বল হারামজাদী, কোন্ সাহসে গাছ থেকে বেগুন ছিঁড়েছিস তুই?

বাসন্তী ছুটে এল।

ও নয়—ও নয়।—আতর্জনে বললে, বিনা দোষে অভাব মেয়ের গায়ে হাত তুলো না তুমি। আমি নিয়েছি।

তুই?

পরমেশের দাঁত কড়মড় ক'রে উঠল। তত্বকার চুল থেকে খুলে এল বজ্রমুষ্টি। পরমেশ আবার বললে, তুই? এ সময় ওর মুখ দিয়ে যে ভাষা বেরোয়, তা ভদ্রসমাজে শোনার মত নয়।

বাসন্তী চোখ বুজে বলল, ই্যা, আমি।

পরমেশ এগিয়ে এল। এবার মূঠোর মধ্যে টেনে ধরল বাসন্তীর চুল। সে-রাফস মূঠির আকর্ষণে স্বল্পায়া মুখ নীল হয়ে গেল বাসন্তীর।

তারপর পরমেশ তাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল। নিয়ে চলল ঘরের ভেতরে।

ওইটুকু চক্ষুলজ্জা এখনও আছে পরমেশের। বাসন্তীর সামনে খোলা বাগানের মধ্যে সে তার স্ত্রীকে শাসন করতে চায় না।

এখনও কিছু কচিবোধ আছে বই কি পরমেশ পেশকারের।

দুই

এই পরমেশ পেশকারের মেয়ের নাম তলুকা।

কেমন বিশ্বাস হয় না—কেমন একটা চাপা ব্যঙ্গের মত মনে হয়। যেন একটা অর্থহীন ক্রোধের তাড়নায় ওই স্ত্রীর নামটাকে প্যারডি করবার জন্তেই ওই নামকরণ করেছে পরমেশ।

পটভূমিটার সঙ্গে পরিচয় না থাকলে অবশ্য যে কেউ বলবে, নামটা যেমানান হয় নি।

বাংলা দেশের সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের স্ত্রীমল স্ত্রী মেয়ে তলুকা। রোগা ছিপছিপে শরীর। যতটা স্বাস্থ্যের জন্তে, তার চাইতেও বেশী পেট ভরে না খেতে পাওয়ার জন্তে। লাল চালের ঘোটা ঘোটা ভাত আর শুকনো ডাঁটা-পাতার চচ্চড়ি খেয়ে আপনিই সকারিগী লতার মত হয়ে উঠেছে তলুকা। মুখখানি মিষ্টি, চিবুকের নীচে ছোট্ট একটি ভাঁজ, বিয়ের আগে বাসন্তী যেমন দেখতে ছিল, প্রায় সেই রকম। গভীর চোখের দৃষ্টিতে একরাশ পুঞ্জিত ভয় স্তব্ধ হয়ে আছে, বিয়ের পরে বাসন্তীর চোখ থেকে ওটাও তলুকা পেয়েছে উত্তরাধিকারস্বত্বে।

এই মেয়েটি সম্পর্কে একটা চাপা গর্ব আছে পরমেশের মনে। তার মেয়ে স্ত্রীমল। দ্বিতীয়তঃ, মেয়েটি লেখাপড়ার ভাল, ডিস্টিংশন নিয়ে বি. এ. পাস করেছে।

কিন্তু তাই বলে মেয়ের সম্পর্কে কোনদিন সে স্নেহের বজ্রা বইয়ে দিয়েছে, এমন অপব্যব তার শত্রুতেও দিতে পারবে না। বুড়ী বি স্বধন তরি-তরকারির ঝাঁকা

বাড়ে করে পাড়ায় পাড়ায় ফিরি করতে বেরিয়েছে, তখন পরমেশের তিনটি বিকলাঙ্গ ছেলেমেয়ের সমস্ত ভার তলুকাকেই বইতে হয়েছে। বাসন্তীর সময় কেটেছে রান্না করে—আর প্রতিদিন পর্বতপ্রমাণ কাপড় কেচে। পরমেশ ধোপাকে পরমা দিয়ে কখনও অপব্যব করে না। আর কলেজে যাওয়া-আসার সময়টুকু বাদ দিয়ে এই তিনটির দায় সব সামলাতে হয়েছে তলুকাকেই। রাত ন'টায় স্বধন এরা ঘুমিয়েছে, তখনই বই খুলে পড়তে বসবার অবসর পেয়েছে সে।

তবু পাস করেছে তলুকা—পাস করেছে ডিস্টিংশনে।

যে পিণ্ডন পাসের টেলিগ্রাম এনেছিল, সে সবিনয়ে হাত কচলে বলেছিল, বাবু, দিদিমণি তো ভাল করে পাস করেছে, এবার আমাদের কিছু বকশিস—

বকশিস?—পরমেশ কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল তার দিকে। তারপর জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমার নাম কি?

হঠাৎ নাম জিজ্ঞাসা করার হেতুটা পিয়ন বুঝতে পারে নি। ধতমত খেয়ে জবাব দিয়েছিল, আচ্ছা, শিবপদ মণ্ডল। শিবপদ মণ্ডল? আচ্ছা, ঠিক আছে।

কী ঠিক আছে বাবু? দেবেন না কিছু আমাদের? আমরা এসব খবর দিলে সব বাড়ি থেকেই চার-আট আনা যা হোক বকশিস পাই—

পরমেশ বাধা দিয়ে বলেছিল, আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে। এখন তুমি যাও—পরে দেখব।

দেখলও পরমেশ। সেই দিনই তিন পাতা একখানা দরখাস্ত সে লিখল পোস্টাল সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে। তাতে সে জানতে চাইল, বাড়িতে কোন ভাল খবর পৌছে দেবার জন্তে পিয়নকে বকশিস দিতে হবে, এমন কোন আইন আছে কি না? এবং আইন যদি না থাকে তা হলে যে-সব পিয়ন ভদ্রলোকদের বাড়িতে এসে বকশিসের জন্তে উপদ্রব করে, পোস্টাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট তাদের সম্পর্কে কী ব্যবস্থা করতে ইচ্ছুক?

পুরনো পিয়ন বলে সে বাজা শিবপদ মণ্ডলের চাকরি পেল না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার বদলির হুকুম হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে একটা ভয়াবহ প্রস্তাব করে বসল বাসন্তী।

মেয়েটা তো ভাল করে পাস করেছে।

পরমেশ সংক্ষেপে বললে, হুঁ।

ও তো আরও পড়তে চায়।

হুঁ।

ওদের কলেজের আরও দু-তিনটি মেয়ে আসছে সপ্তাহে কলকাতায় যাচ্ছে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হওয়ার জন্যে।

তা আমি কী করতে পারি?—পরমেশ সম্বন্ধে একটা বিড়ি ধরাল।

তহুও বলছিল—। বাসন্তী তখনো পরমেশের মনের চেহারাটা আন্দাজ করতে না পেরে স্তম্ভপূর্ণে ব'লে চলল : ওকেও যদি ওদের সঙ্গে পাঠিয়ে দাও—

তারপর?—পরমেশ বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ল।

হস্টেলে থেকে এম. এ. পড়বে। তারি শখ ওর।—বাসন্তী তেমনি শাবধানে ব'লে চলল, ও বলছিল, বাবা যখন এতটাই পড়ালেন, তখন আর—

তখন আর এইটুকু বাকি থাকে কেন—এই তো?—পরমেশ অদ্ভুত জাস্তবদৃষ্টিতে বাসন্তীর মুখের দিকে তাকাল : এর পরে মেয়ে আমার কলকাতায় গিয়ে বোর্ডিংয়ে থাকবেন, স্বাধীনভায়ে চ'লে-কিরে বেড়াবেন, বাপের টাকা আর প্রাঙ্ক করবেন আর রাত্তায় রাত্তায় ছোঁড়াদের সঙ্গে প্রেম ক'রে বেড়াবেন—কেন, তাই নয়?

পরমেশের মুখখানা বীভৎস বিরক্তিতে কদাকার হয়ে উঠল।

বাসন্তীর তখনই খেমে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তবু ব'লে ফেলল, ছিঃ-ছিঃ, ও-কথা বলছ কেন? তোমার মেয়ে কখনো ও-রকম নয়। এত বড় হ'ল—এখনও ও কারও দিকে চোখ তুলেও তাকাতে শেখে নি।

এবার বুঝি সে শিক্ষাটা তাকে আর না দিলেই চলছে না?—হুঁ চোখে আগুন জ্বলে জানতে চাইল পরমেশ পেশকার : আর মেয়েকে ব'ধে যেতে দেবার জন্যেই গায়ের রক্ত জল করা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আমার দিতে হবে? চমৎকার।

এবারে শুদ্ধ হয়ে গেল বাসন্তী।

কিন্তু পরমেশের মুখ ছুটল।

কদম্ব ভাষায়, তার চাইতেও কদম্ব ভঙ্গিতে পরমেশ ব'লে চলল : কলকাতায় যাবেন—কলেজে পড়বেন—পথে-ঘাটে প্রেম ক'রে ঘুরে বেড়াবেন। শখ কত হারামজাদীর।

জুতো-পেটা ক'রে পিঠের ছাল তুলে দেব আমি, নোড়া দিয়ে দাঁত ভেঙে দেব এক-একটা।

এম. এ. পড়া ওইখানেই শেষ হ'ল তহুকার। তিন দিন ধ'রে ঘরের ভেতরে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদল সে, বাপের নামনে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবারও সাহস তার ছিল না।

এর পরে একদিন পাড়ার ঘোষাল-গিন্নী এসে উপস্থিত হলেন দুপুরবেলায়।

এ বাড়িতে সহজে কেউ পা দিতে চায় না। প্রতিবেশীরা সম্বন্ধে এ বাড়ির ছোঁয়াচ এড়িয়েই চলে। ঘোষাল-গিন্নীকে আসতে দেখে বাসন্তী তাই আশ্চর্য হয়ে গেল। আরও বিশেষ ক'রে ভদ্রমহিলা অবস্থাপন্ন ঘরের স্ত্রী, তাঁর স্বামী একজন নামজাদা উকিল।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে বাসন্তী বসতে দিল।

পানের ডিবে ঘোষাল-গিন্নী সঙ্গে ক'রেই এনেছিলেন। তা থেকে এক সঙ্গে দুটো পান পূরে দিলেন মুখের ভেতর, জর্দা খেলেন এক ধাবা। তারপর হাসি-হাসি মুখ ক'রে বললেন, একটু বেড়াতে এলাম।

তা বেশ তো, বেশ তো।—সবিনয়ে বাসন্তী জবাব দিল।

ঘোষাল-গিন্নী পান চিবুতে চিবুতে ইতস্ততঃ-সন্ধানী চোখ ফেললেন : আপনার মেয়েটি কোথায়? তাকে তো বেথতে পাচ্ছি না?

ঘরে আছে। সেলাই করছে।

আহা, বড় ভাল মেয়েটি।—দাওয়ার নীচে ধানিকটা পানের পিচ ফেললেন ঘোষাল-গিন্নী। বাসন্তী সভয়ে একবার তাকিয়ে দেখল সেদিকে। পরমেশ কোর্ট থেকে ফেরবার আগেই ওটা ঘুরে ফেলে দিতে হবে, নইলে বাসন্তীর গায়ের হাড় আঁত থাকবে না।

ঘোষাল-গিন্নী আবার বললেন, ভাল ক'রে পাস করেছে শুনে বড় খুশী হয়েছি আমরা।

সবই আপনাদের আশীর্বাদ—সংক্ষিপ্ত জবাব দিল বাসন্তী।

ঘোষাল-গিন্নী পচ ক'রে আবার ধানিকটা পিচ ফেললেন। তারপর ভাবলেন আসল কথাটা।

মেয়ের বিয়ে যেবেন না এবার?

দিতে হবে বইকি।

তা হ'লে দিয়ে মিন না এবার।—সোনার চশমার ভেতর দিয়ে অর্ধভরা দৃষ্টিতে ঘোষাল-গিন্নী তাকালেন : আর ঘেরি করছেন কেন ?

বিয়ে তো ইচ্ছে করলেই বেগম যাঘ না দিদি।—বাসন্তী স্নান হাসি হাসল : ভালমতন একটি পাত্র চাই, সেও তো দশ জায়গায় দেখাশুনা করতে হবে। তারপর খরচ-খরচা, এটা-সেটা আছে—

বহুশ্রম ভবিতো ঘোষাল-গিন্নী বললেন, ধরুন, সে-সব বাকি যদি আপনাদের পোয়াতে না-ই হয় ?

বাসন্তী এবার চকিত হয়ে উঠল।

আপনার কথা তো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

বুঝিয়ে বলছি।—পানের ডিবে থেকে আবার দুটো পান তুলে নিলেন ঘোষাল-গিন্নী : আমি একটা সখচ্ছের কথাই নিয়ে এসেছি দিদি !

বাসন্তী নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারল না : আমাদের তহর জন্তে ?

বিয়ের যুগ্মি আর রেয়ে কই আপনার ?—ঘোষাল-গিন্নী হাসলেন : সত্যি, বড় চমৎকার মেয়ে আপনার তহর। বাড়ির সব কাজকর্ম করে, পড়াশুনোর ভাল, চেহারাতেও দিব্যি লক্ষ্মীশ্রী আছে। আমার বড় পছন্দ হয়েছে। ওকে দিন না আমাদের ঘরে।

আপনাদের ঘরে ?

আমার বাপের বাড়ির কথা বলছি। আমার ছোট খুড়তুতো ভাইয়ের জন্তে। ছেলোটো এম. এ. বি. এল., এবার মুনসেফি পেয়েছে। অবস্থা খুবই ভাল—পয়সা-কড়ির কোন ঘাবি নেই। থাকবার মধ্যে মা আর ছোট ভাই। মা একেবারে মাটির মাহু, ভাইটি কলেজে পড়ে। দিন না দিদি, মেয়েটিকে আমাদের ঘরে। আপনার মেয়ে খুব সুখে থাকবে।

বাসন্তী বিহ্বল হয়ে চূপ ক'রে রইল।

যদি রাজী থাকেন তো খুড়ীমাকে আজই আমি চিঠি দিয়ে দিই।—ঘোষাল-গিন্নী বক্তব্য শেষ করলেন।

বাসন্তী বলল, এ তো আমার ভাগ্যের কথা দিদি।

তবু তহর বাবাকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি। তাঁর মত নইলে তো কিছু হবে না !

ঘোষাল-গিন্নী মাথা নাড়লেন : সে তো বটেই—সে তো বটেই। তিনি মেয়ের বাপ, তাঁর সঙ্গে কথা তো কইতেই হবে।—তারপর চৌপটাকে আর একবার ভাল ক'রে ছড়িয়ে দিয়ে বললেন : তবে ওই যা বললাম। ওদের ঘরে কোন অভাব নেই। একেবারে সোনার সংসার। শুধু শাখা-সিঁতুর দিয়েও যদি আপনারা সম্প্রদান করেন, ওরা একটি কথাও কইবে না।

বাসন্তীর বুকে বড় জাগিয়ে তুলে ঘোষাল-গিন্নী বিদায় নিলেন।

উত্তেজিত আরক্তমুখে বাসন্তী ঘরে এল। তহর তখন একমনে কলে জামা সেলাই করছে। বাইরের আলোচনা একটি বর্ণও সে শুনতে পায় নি।

বাসন্তী কিছুক্ষণ নিনিমেস চোখে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল। সন্দেহ নেই, তার মেয়ের মুখখানা যেন লক্ষ্মীশ্রী দিয়ে মাথা। গায়ের রঙ উজ্জ্বল গৌর নয়, কিন্তু তার শামলা রঙের এমন একটা স্নিগ্ধতা আছে যে, সেদিকে তাকিয়ে চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। নিজের মেয়ে ব'লে নয়, বাসন্তী জোর ক'রে বলতে পারে, এযুগে এমন মেয়ে লাখে একটি দেখতে পাওয়া যায় না। সাত-চড়ে মুখ দিয়ে রা ফুটেবে না তার, সারাদিন নিঃশেষে পরিশ্রম ক'রে যাবে—কোন কাজে 'না' বলবে না কোনদিন। এত যে লেখাপড়া শিখেছে, বললেও সে-কথা সহজে বিশ্বাস করতে চাইবে না লোকে।

ধানিকক্ষণ মেয়ের দিকে মুগ্ধভাবে তাকিয়ে থেকে বাসন্তী বলল, এখন সেলাই রেখে দে মা। তখন থেকে তো সমানে ঘটর ঘটর ক'রে ঘোষাচ্ছিস, হাতের নড়া ছটোয় কি একটু ব্যথাও হয় না বাপু ?

তহরকা অল্প একটু হাসল। জবাব দিল না।

নে, রেখে দে এখন।

এই হয়ে এল মা। একটুখানি।

বাসন্তী বলল, রাখ না, পরে হবে। একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।

সেলাই বন্ধ ক'রে কাপড়টা গোছাতে গোছাতে তহরকা বললে, বল।

পড়া তো তোমার হ'ল না মা। তোমার বাবা কিছুতেই রাজী নয়।

তরুকার মুখে বেদনার অস্পষ্ট ছায়া পড়েই মিলিয়ে গেল। আত্মগোপন করার একটা আশ্চর্য শক্তি আয়ত্ত করেছে সে। এদিক থেকে পরমেশ্বরের শিক্ষা ব্যর্থ হয় নি।

মাথা নামিয়ে রেখেই তরুকা বলল, আমি ভাবছি, প্রাইভেটে পরীক্ষা দেব। কল্যাণীর দাদা হিষ্ট্রি এম. এ., তার বইগুলো কল্যাণী আমাকে দেবে বলেছে।

বাসন্তী চুপ করে রইল একটুখানি। ব্যথিত দৃষ্টি মেয়েটার বিবর্ত শাস্ত্র মুখের ওপরে বুলিয়ে নিলেন। তারপর বলল, আমি ভাবছি, তোর বিয়েটা দিয়ে দিই।

বিয়ে?—গভীর ভীষণ চোখ দুটি তুলে তাকাল তরুকা। ঘোষাল-গিন্নীর প্রস্তাব শুনে যেমনভাবে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল বাসন্তী, ঠিক সেই বিষয় তারও দু চোখে ফুটে উঠল।

বাসন্তী উৎসাহিত হয়ে বলল, হ্যাঁ, বিয়ে। ভাল সম্বন্ধও এসেছে একটা।

কী যে বল তার ঠিক নেই।—তরুকা জবাব দিল। তার গালে এক বিন্দু লজ্জার আভা ফুটল না—একটুখানি সঙ্কোচের রেশ বাজল না তার গলায়। শুধু একরাশ নিকংসাহ শ্রান্তি ব'রে পড়ল কথামলোর মধ্যে।

বারান্দার রিকেট ছোট ছেলেটা পড়ে পড়ে ঝাকড়ার পুতুল চুবছিল একটা। হঠাৎ সেটা তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, খুব সম্ভব একটা ডেরো পিঁপড়ে কামড়েছে তাকে। ব্যতিব্যস্ত হয়ে তরুকা উঠে গেল সেদিকেই। কথটা তখনকার মত আর বেশী দূর এগোল না।

আলোচনাটা আবার আয়ত্ত করল বাসন্তী পরমেশ্বরের কোর্ট থেকে ফেরবার পরে।

পরমেশ্বর তখন সবে মাত্র কোর্টের কাপড়-জামা ছেড়ে, একটা বিবর্ণ লুঙ্গি প'রে আর কাঁধে একটা গামছা চড়িয়ে বারান্দায় এসে বসেছে। একটা হাত-পাখা নিয়ে হাওয়া খাচ্ছে অল্প অল্প, আর বিরল মুখে তাকিয়ে আছে প্রাচীরের খানিকটা ভাঙা জায়গার দিকে। কাল ওখান দিয়ে একটা ছাগল এসে কিছু গাছপাখা খেয়ে বরবাদ করে গেছে, এবং আরও দুঃখের কারণ এই যে পরমেশ্বর সেটাকে ধ'রে খোঁয়াড়ে দিতে পারে নি। আবার চুন-সুরকি-ইট খরচ করে ওই জায়গাটা সায়তে হবে ভেবে পরমেশ্বরের মেজাজ ধরপা হয়ে বাজিল।

তরুকা চা করছিল বাগানঘরে। এক বাটি মুড়ি এনে বাসন্তী পরমেশ্বরের সামনে ধরল।

ধাবা ভরতি করে মুড়ি নিয়ে পরমেশ্বর মুখে তুলল। তৎক্ষণাৎ পাশ থেকে গাঁ-গাঁ করে অজুত আওয়াজ শোনা গেল একটা। সর্বাঙ্গে একরাশ লাল মেখে বিকলাদ ছোট ছেলেটা বুক টেনে টেনে মুড়ির দিকে এগোতে চেষ্টা করছে।

পাখিকে যেমন করে খেতে দেয়, তেমনিভাবে এক মুঠো মুড়ি পরমেশ্বর ছেলেটার দিকে ছড়িয়ে দিল। একটা অর্থব্যস্ত জাম্বব আনন্দধ্বনি করল ছেলেটা। টপ টপ করে এক-একটা মুড়ি তুলে নিতে লাগল বাঁকা বাঁকা লীর্ণ আঙুলে।

দাঁতে দাঁত ঘষে পরমেশ্বর একবার বলল, মরেও না— শূয়োরের গাল মরেও না।

আগে বাসন্তীর চোখে জল আসত, এখন আর আসে না। অহুভূতিগুলোতে কড়া পড়ে গেছে এখন।

পরমেশ্বর হিংস্রভাবে মুড়ি চিবোতে লাগল। কড়-মড় করে শব্দ উঠতে লাগল দাঁতে। কেমন বেন মনে হ'ল, কড়কড়িয়ে একরাশ হাড় চিবুচ্ছে পরমেশ্বর।

বাসন্তী আন্তে আন্তে বলল, একটা কথা ছিল।

কী হয়েছে? চাল নেই—না, ভাল নেই?—পরমেশ্বরের চোখ জলে উঠল : মাসের কুড়ি তারিখের মধ্যেই সব খেয়ে ব'সে আহ না কি? কত খেলে তোমাদের খিদে মেটে, বলতে পার?

চাল-ডালের কথা নয়।—ঠোট কামড়ে এটাও সামলে নিল বাসন্তী : অল্প কথা ছিল।

অত ধানাই-পানাই করছ কেন? মতলব কি?—পরমেশ্বর সন্নিগ্ন হয়ে উঠল।

আজ ঘোষাল-গিন্নী এসেছিলেন।

ঘোষাল-গিন্নী! সে আবার কে?—পরমেশ্বর জ্বলন্ত করল : লাউ-কুমড়া চাইতে এসেছিল নাকি? ও-সব খাতির চলবে না—সে কথা ব'লে দিও। লাউ-কুমড়া খাওয়ার শব্দ থাকলে পরশা দিয়ে কিনে খেতে হবে।

লাউ-কুমড়া কিনে খাবার পরশা তাঁদের আছে—বাসন্তী ব্রান হাসি হাসল : উকিল জয়কৃষ্ণ ঘোষালের স্ত্রী এসেছিলেন।

জয়কেষ্ট ঘোষালের বউ।—অকৃত্রিম বিশ্বাসে পরমেশ্বর মুড়ি চিবোনো বন্ধ হয়ে গেল : হঠাৎ বড়লোকের গমীর এ বাড়িতে পায়ের ধুলো কেন ? সেই পাতিয়েছ নাকি ? না।

তা হ'লে তাঁর মতলবটা কী ?

একটা সম্বন্ধ নিয়ে এসেছিলেন।

তত্বকা চা নিয়ে আসছিল। একবার তার দিকে তাকাল পরমেশ, আর একবার তাকাল বাসন্তীর দিকে। একটা কুর সন্দেশের রেখা ফুটে উঠল তার কপালে।

সম্বন্ধ ? কিসের সম্বন্ধ ?

তত্বর।

তত্বর।—এমনভাবে পরমেশ চিংকার ক'রে উঠল যে রিকেরি ছেলেটা গলায় মুড়ি আটকে গিয়ে ট্যা ক'রে আর্ডনাদ তুলল। এক ঝলক গরম চা ছলকে পড়ল তত্বকার হাতে। বাসন্তী চমকে দু-পা পিছিয়ে গেলেন।

কী বললে ! তত্বর !

আবার চিংকার করল পরমেশ। চায়ের বাটি সামনে নামিয়ে দিয়ে উল্লেখ্যে ছুটে পালিয়ে গেল তত্বকা।

বাসন্তী নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, অত অবাধ হচ্ছ কেন ? মেয়ে বড় হয়েছে, বিয়ের কথাটা তো এখন ভাবাই দরকার। যে ছেলেটির কথা বললেন, সে এম. এ.

বি. এল., মুনসেফ হয়েছে, বাড়ির অবস্থাও খুবই ভাল।

স্বপ্ন দেখছ নাকি ?—মোটো মোটো ভুরু দুটোকে এক সঙ্গে জুড়ে নিয়ে পরমেশ পেশকার বলল, পাগল হয়ে গেছ ? খুঁটে-কুড়ুনীর মেয়ের বিয়ে দিতে চাও রাজপুত্রের সঙ্গে ? বলি, হাতী ধরবার স্বপ্ন যে দেখছ, টাকা আসবে কোথেকে ? তোমার বাপের বাড়ি থেকেই বোধ হয় ?—হিংস্রভাবে হেসে উঠল পরমেশ, যেন ঘোরতর রসিকতা ক'রে ফেলেছে একটা।

বাসন্তী মান স্বরে বলল, ওঁরা কিছুই নেবেন না। শুধু শাঁখা-সিঁহুর দিগে সম্ভাদান করলেই চলবে।

বটে ! বটে !—পরমেশ মুখভঙ্গি করলে, ওরা বুঝি তোমার মেয়ের মধ্যে ডানা-কাটা পরীকে আবিষ্কার করেছে ?

সে ওঁরাই জানেন। তবে মেয়ে ওঁদের পছন্দ হয়েছে।

পছন্দ হয়েছে ! মেয়ে ওঁদের পছন্দ হয়েছে !—রসিয়ে রসিয়ে দাঁতের মধ্যে মুড়ি চিবোনোর মত ক'রে শব্দগুলোকে

চিবুতে চিবুতে পরমেশ বলল, তবে আর কী ! এবার দোলায় চোদোলায় চাপিয়ে ওরা পাটরাগীকে নিয়ে গিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দিন—আমাকে আর এসব বলা কেন !

বাসন্তী শীর্ণ হয়ে বলল, তুমি মিথ্যে রাগ করছ। সম্বন্ধটা সত্যিই ভাল। আর মেয়েরও বিয়ে তো দিতেই হবে।

দিতেই হবে !—এক চুমুকে আঙনের মত গরম চা অর্ধেক গিলে ফেলল পরমেশ : কেন দিতে হবে ? ওঁরা আমার মেয়েকে যখন খুশি এসে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যাবেন, সেইজন্তেই খাইয়ে পরিয়ে এত বড় করেছি—না ? সেই জন্তেই বুকের রক্ত-জল-করা টাকায় ওকে কলেজে পড়িয়েছি ?

কেন, তুমি মেয়ের বিয়ে দেবে না ?

বিয়ে ! এঃ !—পরমেশের মুখধানাকে উটের মুখের মত দেখাতে লাগল : এঃ—শখ কত ! বড় ভাইটা লোপাট হয়েছে, বুড়ো বাপ দু'দিন পরে রিটারার করবে, ছোট ছোট ভাইবোনগুলোর দিকে কে দেখে তার ঠিক নেই—আর উনি ট্যাং ট্যাং ক'রে শব্দ-বাড়ি যাবেন ! আখা তো কম নয় !

কী বলছ তুমি ?—বাসন্তী বলতে চেষ্টা করল। কিন্তু নিজের গলাটাই নিজে ভাল ক'রে শুনতে পেল না সে।

বলছি আবার কি !—অসহ ক্রোধে পরমেশ মুড়ির বাটিটা ছুঁড়ে ফেলল উঠানে : বিয়ে করবে—এঃ ! তারপর এই শ্যোয়ের গুটিকে খাওয়াবে কে শুনি ? এত ক'রে লেখাপড়া শিখিয়েছি বুঝি আমার বাপের দেনা শোধ করতে ? ও-সব চলবে না, বুঝেছ ? বিয়ে-টিয়ে এখন হবে না। আমি ওদিকে স্থলের হেড-মিস্ট্রের সঙ্গে চাকরির জন্তে কথা ক'রে এলাম—এদিকে ইনি ধোয়াব দেখছেন ! চায়ের বাটিটা আর এক চুমুকে শেষ ক'রে উঠে পড়ল পরমেশ. হুম্ হুম্ ক'রে বেরিয়ে গেল বাইরের দিকে। একটা বিষাক্ত কণ্ঠস্বর দূর থেকে ভেসে এল : বিয়ে করবেন—এঃ !

বাসন্তী পাখর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আর ঘরের ভেতরে প্রায় ম'রে যেতে চাইল তত্বকা। প্রার্থনা করতে লাগল, মাটিটা ছুঁফাঁক হয়ে গিয়ে তাকে ভিতরে টেনে নিক।

ভিন

ঘোষাল-গিন্নীকে বাসন্তী কী বলেছিল কেউ জানে না। কিন্তু পনের দিন এসেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে চ'লে গিয়েছিলেন ঘোষাল-গিন্নী। বেকুবার মুখে কেবল এক-রাশ পানের পিক ফেলে ব'লে গিয়েছিলেন : কী সর্বনেশে বাপ ! যেন কশাই !

কথাটা নতুন নয়—ও গালাগালটা অনেকেই দিয়েছে পরমেশ পেশকারকে। ও তার আর গায়ে লাগে না।

কিন্তু আর একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে পরমেশের, সে হ'ল তথ্যের জোর। পেশকারির চাকরি তার অনেক আগেই বাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বায় নি এই তথ্যের জোটেই। ইঙ্কলের হেড-মিস্ট্রেসকে কী ক'রে যে অপাল লোকটা, একমাত্র সেই সে কথা জানে। কিন্তু চাকরি একটা জুটল তত্ক্ষণ।

আপাতত চল্লিশ টাকা। দশ টাকা ডি. এ.।

পরমেশ একেবারে অবিশেষক নয়। মাসের পয়সা তারিখ সন্ধ্যাবেলা ঠিক পয়তাল্লিশ টাকা শুনে নেয় তত্ক্ষণ কাছ থেকে। পাঁচ টাকা থাকে হাতখরচ।

বাড়ি থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে ইঙ্কল। মাসের রামার জোগান দিয়ে, বাগানের তদ্বির ক'রে, ভাইবোন-গুলোর পরিচর্যা ক'রে বেকুতে বেকুতে দশটা বাজে। উর্ধ্ব্বাসে ছুটতে হয় তখন।

মা হায় হায় করে।

একটু ব'সে থা মা, ভালটা ফুটল ব'লে। খালি ছুন দিয়ে শুধু ভাত খাচ্ছিল যে !

তত্ক্ষণ জবাব দেয় না, সময় কই জবাব দেবার ? কয়েক গ্রাস ভাত কোন মতে গিলে, এক গ্রাস জল গলায় ঢেলে ছুটে বেকুতে হয় তাকে। অর্ধেক দিনই হেঁটে যেতে পারে না, রিক্শা নিতে হয়। হাতখরচের পাঁচটা টাকা ওই রিক্শা ভাড়া দিতেই ফুরিয়ে যায়।

পরমেশ বলে, অত নবাবী কিসের ? দু-পা ইটলে সোনার অঙ্ক ক'রে যায় নাকি ? এর পরে দেখছি মেয়েকে মোটরে চেপে ইঙ্কলে যেতে হবে !

তা ইটবার স্বযোগ পায় বই কি তত্ক্ষণ। মধ্যে মধ্যে টীচার-বন্ধুরা জোর ক'রে দু-একটা টাকা কেড়ে নিয়ে চা খায়। তারাও খাওয়ার, হুতরাং চক্কলজ্জার খাতিরে

না দিয়ে উপায় থাকে না। তারপর থেকেই আবার পায়ে ইটটার পালা শুরু। তখন আর নাওয়া-খাওয়ার সময় থাকে না।

শুধু বাসন্তী হাহাকার করে, ওরে, একটু ব'সে বা। সারা দিনের মত বেকুচ্ছিল, খালি ছুন ভাত খেয়ে গেলে শরীরে বইবে কেন ? লক্ষ্মী মা আমার, এই হয়ে এল ভালটা।

কিন্তু তত্ক্ষণ ততক্ষণে কুয়োতলায়।

সব কটিন-বীধা নিয়মে চলছিল। কোথাও কোনও ছেদ ছিল না। পরমেশের গালাগালি, ছুলো ছেলেমেয়ে-গুলোর গোঁড়ানি, বাসন্তীর নিঃশব্দ চোখের জল, আর তরকারির পয়সার হিসেব না মেলাতে পেরে পরমেশের চড় খেয়ে বুড়ী ঝির আর্তনার। বর্ষার জল পড়লে পুরনো বাড়িটার দু-একটা বালির চাঙড় ব'সে পড়া কুয়োতলার ধারে পাঁচিলের ফাটল থেকে এক-আধটা গোখরো সাপের বেরিয়ে আসা, পেছনের জঙ্গল থেকে নিখর রাতে একটা অদ্ভুত পাখির কান্না, আর ঘুম না এলে আতঙ্কিত চোখ মেলে সামনের জংলা আমবাগানের জটে বুড়ীর মত গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকা। চল্লিশ টাকা মাইনে আর দশ টাকা ডি.এর চাকরি, মাসান্তে পরমেশের পয়তাল্লিশ টাকা শুনে শুনে নেওয়া।

সব ঠিক চলছিল। কিন্তু এর মধ্যে এসে পড়ল ধীরেন।

ছিপছিপে রোগা চেহারার লাজুক মানুষটি। কথা বলে কম, শোনে অনেক বেশী।

পরমেশ পেশকার বারান্দায় ব'সে খবরের কাগজ পড়ছিল। একদিনের বাসী কাগজ। পয়সা দিয়ে সে কাগজ কেনে না, এক বন্ধুর কাছ থেকে সন্ধ্যাবেলা চেয়ে আনে। একটা চোখে পাতলা ছানি পড়েছে, তাই রাতে আর পড়া হয় না। সকালে ব'সে চোখ বুলিয়ে নেয়, অফিস যাওয়ার সময় নিয়ে যায় বগলদাবা ক'রে।

ক্রুদ্ধকৃত ক'রে সোনার দর দেখছিল পরমেশ। এমন সময় ধীরেন এসে দাঁড়াল।

কাকা।

পরমেশ চমকে উঠল। প্রথমটা চিনতে পারল না।

তুমি ?

আমি কৃষ্ণনগরের স্বভাব রায়ের ছেলে। ধীরেন।

তাই তো, তাই তো!—পরমেশ প্রায় লাফিয়ে উঠল:

তুমি এখানে?

ধীরেন ততক্ষণ পায়ের ধুলো নিয়েছে পরমেশের।

বলল, বললি হয়ে এসেছি।

বললি হয়ে মানে? আমি তো তোমায় কলেজে পড়তে দেখেছিলাম।

ধীরেন হাসল: সে তো পাঁচ বছর আগে। বি. এ. পাস করে আমি পোস্ট অফিসে চুকছি।

বটে, বটে! চাকরি করছ? তা তোমার চাকরির নরকার কি? তোমার বাবার টাকা কে খায়, তার ঠিক নেই।

ধীরেন উত্তরে তেমনি মুহূ হাসল।

তা ভাল, তা ভাল। পুরুষ মানুষের কি আর ওভাবে বসে থাকা চলে হে! চাকরি নিয়েছ, বেশ করেছ। কিন্তু পাড়িয়ে রইলে কেন? ব'স।

বসবে? ধীরেন তার দিকে তাকাল একবার। বসবার আয়গাই খুঁজল একটা। কিন্তু বারান্দার একটিমাত্র জলচৌকিতে পরমেশ নিজেই বসে আছে।

সেই সময় হঠাৎ এসে পড়ল বাসন্তী।

এ কি—ধীরেন যে!

প্রণাম করতে করতে ধীরেন বলল, চিনতে পারছেন?

চিনতে পারব না—বল কি বাবা? পাশাপাশি বাড়িতে দু বছর রইলাম—চিনব না? বাসন্তী ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল, চল চল, ভেতরে চল। সব কথা শুনি।

পরমেশ উৎসাহিত হয়ে বলল, হাঁ হাঁ, ভেতরে যাও। তুমি তো ঘরের ছেলের মত। আমি এই খবরের কাগজে চোখ বুলিয়েই আসছি।

বাসন্তী ধীরেনকে নিয়ে ভেতরে এল। একেবারে নিজের শোবার ঘরে।

ব'স বাবা।

ধীরেন একবার ময়লা বিছানাটার দিকে চাইল, আর একবার চাইল দীন গৃহপঙ্কার দিকে। তারপর কপালের ঘাম মুছে বিছানাটার ওপরেই বসে পড়ল।

ঝেঝেতে রিকিট ছোট ছেলেটা পড়ে আছে। মুখ ভরতি লালা, তার ওপরে মাছি ভন ভন করছে। বড়টা

খাটের পায় ধরে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে, বখের মেলায় পুতুলের তারের পলার ওপরে যেমন করে মাথা কাঁপে, তেমনি করে তারও মাথাটা ধরধর করে কাঁপছে—বীভৎস মুখভঙ্গির সঙ্গে ঘুরছে চোখের তারা দুটো। বারান্দায় মেজ মেয়েটা বসে কি একটা বায়না নিয়ে সমানে ঘ্যান ঘ্যান করে কেঁদে চলেছে।

ধীরেন আর একবার কপালের ঘাম মুছে ফেলল।

বাসন্তী বলল, তুমি এখানে হঠাৎ কি করে এলে? এলেই বা কবে?

ধীরেন বলল, এসেছি দিন সাতেক। পোস্ট অফিসে চাকরি করি, বললি করেছে এখানে।

সাত দিন হ'ল এসেছ, অথচ এর মধ্যে খবর নাও নি?—বাসন্তীর স্বরে অহুযোগ মুটে বেরুল।

মাথা নীচু করে ধীরেন বলল, আপনারা এখানে আছেন তা জানতাম না। কালই খবর পেয়েছি।

তা বটে। উঠেছ কোথায়?

আমাদের মেসে।

মেসে!—বাসন্তী বিষন্ন হয়ে বলল, তোমার কষ্ট হয় না?

না, চলে যায় এক রকম।

চলে যায় এক রকম! বাসন্তীর স্বভাব রায়ের কথা মনে পড়ল। গোয়াড়ীতে প্রাসাদের মত প্রকাণ্ড বাড়ি। শোখিন বিলাসী পরিবার। স্বভাব রায়ের স্ত্রী নিজে সামনে পাড়িয়ে থেকে ছেলেমেয়েদের এক এক বাটি স্বীর মত দুখ খাওয়ান। সেই বাড়ির আদরে ছেলে ধীরেন মেসে এসে বসবাস করছে—এটা তার বিশ্বাস হতে চাইল না।

পরমেশ যে প্রণ করেছিল, বাসন্তী আবার সেই প্রণই করল।

তুমি হঠাৎ চাকরি নিতে গেলে কেন বাবা? তোমার বড়দা শুনেছি ব্যারিস্টার হয়ে কিরেছে, আমরা তো ভেবেছিলাম তুমিও বিলেত-টিলেত যাবে। তা এই ভাবে হঠাৎ পোস্ট অফিসে চুকলে কেন?

ধীরেন তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না। মেঝের গড়ানো ছেলেটার দিকে তাকিয়ে এবার হাতের তালুতেই কপালের ঘাম মুছে ফেলল।

তারপর আস্তে আস্তে বলল, বি. এ. পাস করার পরে

আর পড়তে ইচ্ছে করল না। ভাবলাম, ঘরে বসে আর বাবার অন্ন ধ্বংস করে লাভ কি! তাই—

কথার্টা সম্পূর্ণ বিশ্বাস হ'ল না। বাসন্তীর। মনে হ'ল কোথায় কি একটা যেন ঘটেছে, সব কথা স্পষ্ট করে খুলে বলতে চায় না ধীরেন।

তোমার মা আসতে দিলেন?

হ্যাঁ, চ'লে এলাম।—ধীরেনের হাসিটা কেমন শুকনো ঠেকল।

জান করে, তখন ঘরে পা দিয়েছে তত্বকা। বলতে যাচ্ছিল, মা, শিগগির ভাত—; কিন্তু ধীরেনের দিকে তাকিয়েই থমকে গেল।

বাসন্তী বলল, কি রে, লজ্জা করছিল নাকি? এ যে ধীরেন—কৃষ্ণগরের সুভাষ রায়ের ছেলে ধীরেন। সেই যে বামের বাড়িতে খুব ঘটা করে রাসের উৎসব হয়—তোমার মনে নেই?

মনে আছে বইকি! সে কথা কি ভুলতে পারে তত্বকা! চকিত হয়ে বলল, ধীরেনদা!

ধীরেন বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। সেদিনের কিশোরী তত্ব আশ্চর্য স্তম্ভর আর পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে আজ। নিজেদের বাগান থেকে যে ডুরে-শাড়ি-পর্য মেয়েটিকে সে পেয়ারা আর লিচু এনে দিত, সেই মেয়েটিই যে এই—সে কথা চট করে বিশ্বাস করা শক্ত।

তত্বকা বলল, ধীরেনদা, এখানে কী করে এলে?

ধীরেন হাসল : জানই তো, পৃথিবীটা গোল।

তত্বকা বলল, তাই দেখছি। তা ভাল আছ?

হ্যাঁ, আছি একরকম।

তোমার কথা পরে শুনব—এখন সময় নেই। কিছু মনে করো না ধীরেনদা—এখনি ছুটিতে হবে আমাকে। মা, চল খেতে দেবে, নটা বাজে—

তত্বকা অদৃষ্ট হ'ল।

ধীরেন কেমন আহত বোধ করল। ঠিক এই জিনিসটা তত্বর কাছ থেকে আশা করে নি। ডুরে-শাড়ি-পর্য যে মেয়েটিকে সে লিচু আর পেয়ারা এনে দিত নিজেদের বাগান থেকে, তার কাছে আরও একটু আতিথেয়তার প্রত্যাশা যেন তার ছিল।

বাসন্তী ধীরেনের মনের কথা বুঝতে পারল।

কিছু মনে করো না ধীরেন। ওর আবার ফুলের তাড়া কিনা—সময় হয়ে গেছে।

ফুল!

আজকাল ও চাকরি করে যে। গত বছর বি. এ. পাস করেছে, তারপর এখানকার গার্লস স্কুলে ঢুকেছে এই মাস ছয়েক হ'ল। তুমি একটু ব'সো, আমি চট করে ওকে দুটি ভাত দিয়ে আসি। ওর আবার যে রকম তাড়া, হয়তো না খেয়েই চ'লে যাবে।

ধীরেন উশখুশ করে উঠল।

তা হ'লে আমিই বরং উঠি কাকিমা। পরে একদিন আসব।

না, না, সে কি হয়! পাঁচ বছর পরে এলে, তুমি আমাদের ঘরের ছেলের মত। একটুখানি ব'স তুমি, আমি এলাম ব'লে।

আমারও তো আবার অক্লিস আছে।—হাতের বাড়িটার দিকে ধীরেন তাকাল।

আমি এক্ষুনি আসছি। যেয়ো না; দু মিনিট ব'স।

অগত্যা বসতেই হ'ল ধীরেনকে। মেঝের ছোট ছেলেটা সেই লালার মধ্যেই মুখ বুঝে প'ড়ে আছে—আচমকা সভয়ে ধীরেনের মনে হ'ল : ম'রে গেল নাকি! তারপরেই বোঝা গেল সে বিমূর্ছে। ধীরেন আবার তার দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিল ঘরময়। লক্ষ্মীজীহীন অপরিচ্ছন্নতা চারদিকে। কতগুলো ময়লা কাপড় ঝুলছে দড়ির ওপর। রঙ-চটা তোরঙ্গগুলো ইটের ওপরে মাজিয়ে রাখা। দেওয়ালে নীল নীল শ্রাণলার ছবি। মাথার ওপরে ছাতের একটা দিক কতকগুলো কালো কালো দাগে ভরা—বর্ষার সময় নিশ্চয় জল পড়ে ওখান দিয়ে।

ধীরেন তত্বর কথাই ভাবছিল। সেই চোন্ধ-পনেরো বছরের কিশোরী মেয়েটি। মধ্যে মধ্যে পড়তে আসত তার কাছে। খার্ড-ইয়ারে-পড়া ধীরেনের এক-একদিন মুঠ চোখে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করত ওর দিকে। একদিন একটা প্রবল আকাজ্জা জেপেছিল তত্বর একখানা হাত—নিজের মুঠোর মধ্যে টেনে নিতে।

কিন্তু ওই পর্বন্তই। ভদ্র মার্জিত ধীরেন ইচ্ছাটাকে ওর বেশী আর এগোতে দেয় নি। চোখের দৃষ্টিটাকে জোর করে কিরিয়ে এনে ডুবিয়ে দিয়েছিল মার্চেন্ট অব

ভেনিসের পাতায়, নিচু গলায় বলেছিল, আজ আমার সময় হবে না তুমি, তুমি কাল এস।

সেই দিনটা নিজের মনের সঙ্গে প্রাণপণে লড়াই করেছিল ধীরেন। দুপুরবেলা কলেজ পালিয়ে শহর থেকে দূরে নদীর ধারে চ'লে এসেছিল, ব'সে ছিল রেলের ব্রীজটার তলায়। চারদিকের অরণ্যময় স্তব্ধতার ভেতরে ব'সে থাকতে থাকতে বার বার নিজেকে ঝিকার দিয়ে বলেছিল, ছিঃ ছিঃ, এমন একটা কথা সে ভাবতে পারল কী ক'রে!

পরদিন ঠিক হয়ে গিয়েছিল মনটা।

তত্নকে অন্ধ বুঝিয়ে দিতে দিতে গোটাকয়েক ক্ষত নিশাস এসেছিল কয়েকবার। কিন্তু ধীরেন সামলে নিয়েছিল।

তার পরদিন—তার পরদিন। নিজেকে দমন করতে কষ্ট একটু হয়েছিল বইকি। তবু ধীরেন হার মানে নি। সব সহজ ক'রে নিয়েছিল যথাসাধ্য। কেবল পারংপক্ষে সে আর তছুর মুখের দিকে তাকাত না। বাগান থেকে পেয়ারা আর লিচু এনে বেগুয়াও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

পরমেশ বেদিন কৃষ্ণনগর থেকে বদলি হয়ে গেল, শুধু সেই দিন আর একবার একটা দুর্বোধ্য যন্ত্রণা অহুতব করেছিল সে। পাশের শৃঙ্গ বাড়িটার দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল, কোথায় যেন কী তার শৃঙ্গ হয়ে গেছে। সারারাত তার ঘুম হয় নি। আকাশের অসংখ্য তারার দিকে তাকিয়ে ছাদে সে পায়চারী ক'রে বেড়িয়েছিল। তত্নকার চ'লে যাওয়াটা তার যে এত খারাপ লাগবে, সে কথা কে জানত!

কিন্তু আশ্চর্য্যে ধীরেনও ভুলতে পারল।

এমন কি, কালও যখন শুনেছিল যে পরমেশ পেশকার এই শহরেই বাসা ক'রে আছে, তখনও বুকের ভেতরে এতটুকু দোলা জাগে নি তার। তত্নকার কথা মনে পড়েছিল বইকি। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও মনে হয়েছিল যে, এতদিনে নিশ্চয় তার বিয়ে হয়ে গেছে। কোথায় কোন্ পুণ্ডরবাড়িতে নিশ্চিন্তে সে সংসার পেতে বসেছে এখন।

সেই তত্নর আজও বিয়ে হয় নি। বি. এ. পাস ক'রে সে এখনি চাকরি করে! আশ্চর্য্য!

কিন্তু আশ্চর্য্য হওয়ারই বা কী আছে! লেখাপড়া শেষ ক'রে একটি মেয়ে চাকরিতে ঢুকবে, এটা এমন কী আর

অসম্ভব ঘটনা! তবু কোথায় যেন সবটা অসম্ভব মনে হয়।

চিন্তার খেঁই ছিঁড়ে গেল।

মাটির পুতুলের মত ঘাড় নাড়ানো ছেলেটা কখন টলতে টলতে এগিয়ে এসেছে তার দিকে, তার হাঁটু দুটো আঁকড়ে ধ'রে দাঁড়িয়ে উঠেছে। দুর্বোধ্য আওয়াজ ক'রে বলছে : গাঁ—গাঁ—

ধীরেন শিউরে উঠল। অদ্ভুত অমাহুতিক ছেলেটার চোখ। মেহের তুলনায় অতিরিক্ত বড় বড়—সে চোখের তারা দুটো অবিরাম ঘুরছে। তার দৃষ্টিতে যেন প্রেত-লোকের কোঁতুক-মেশানো।

ছেলেটার নোংরা হাতের বড় বড় নখগুলোর খোঁচা লাগল ধীরেনের হাঁটুতে। অপরিণীত বিরক্তিতে ধীরেনের ইচ্ছে হ'ল, একটা ধাক্কা দিয়ে ওটাকে সে দূরে ছিটকে ফেলে দেয়। কিন্তু কিছুই করতে পারল না, শুধু ভয়ে তার গায়ের মধ্যে কাঁটা দিয়ে উঠল।

ছেলেটা আবার বললে, গাঁ—গাঁ—

তৎক্ষণাৎ ঘরে ঢুকল পরমেশ। আর ঢুকেই তার চোখে পড়ল ব্যাপারটা।

খড়মের খটাখট আওয়াজ তুলে পরমেশ ছুটে এল।

অ্যা!—ওই শূয়োয়ের পাল আবার তোমার ওপরেও গিয়ে চড়াও হচ্ছে।

ব'লেই তৎক্ষণাৎ একটা কাণ্ড করল পরমেশ। ছেলেটার নড়া ধ'রে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গেল, তারপর সোজা ছুঁড়ে দিলে বারান্দায়। ঠাই ক'রে ছেলেটা শানের ওপর গিয়ে পড়ল, ঠুঁকে গেল মাথাটা। তারপর এমন একটা প্রচণ্ড চিংকার জুড়ল যে, সে আতর্জন বোধ হয় নরকেও শুনে পায়চারী যাব না।

ধীরেন আতঙ্কে কাঁঠ হয়ে গেল। যেন জিভটা কে তার ভেতর দিকে টেনে নিচ্ছে।

অতি কষ্টে ধীরেন বলল, ও কি! অমন ক'রে কেলে দিলেন ওকে!

বিকৃত মুখে পরমেশ বলল, ঠিক আছে।

কিন্তু অমন ভাবে, শানের ওপর—

একটা দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে কান চুলকাতে চুলকাতে পরমেশ বলল, ওতে ওগুলোর কিছু হবে না। শূয়োয়ের

বাঁচাগুলোর চেহারা দেখছ না? যমেও ওদের ছুঁতে ভয় পায়। তিন ঘণ্টা ধরে পাটের ওপর আচড়াও—যদি মরে তো আমি কী বলেছি।

ধীরেনের গায়ের মধ্যে কেমন করছিল। হঠাৎ বোধ হচ্ছিল যেন তার বমি হয়ে যাবে।

পরমেশ পাটের আর এক পাশে বসে পড়ে বলল, ছাড়ান দাও—ওগুলোর কথা ছাড়ান দাও। এখন তোমার কথা বল। আছ কোথায়?

ধীরেন জানাল পোটাল মেসেই সে আছে।

কত করে দিতে হয় মাসে?

চল্লিশ।

চল্লিশ। পরমেশ চোখ ভুলল কপালে: এ যে এক রাশ টাকা।

সকলেরই ওই রকম পড়ে।

অসম্ভব। পড়তেই পারে না।—পরমেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল: চুরি করে, বুকেই চুরি করে। একটা লোকের চল্লিশ টাকা মেসিং! অ্যাবসার্ড!

ধীরেন জবাব দিল না।

ঘর কি রকম?

তিনজন আমরা একসঙ্গে থাকি।

সিংল নীটেড নয়?—পরমেশ অস্বস্তি করল: এতগুলো টাকা দিয়েও একগাদা লোকের সঙ্গে এক ঘরে থাকতে হয়। আর খেতে দেয় কী?

ভাত আর দু বেলা টিকিন।

কী টিকিন?

পরমেশের জেরায় বিব্রত হয়ে উঠছিল ধীরেন। কাতরভাবে বলল, কটি, ডিম—

কটা করে ডিম?

ধীরেন একটা চোক গিলল: দুটো।

হাঁস, না, মুরগীর?—মনে মনে কী যেন একটা হিসেব করতে লাগল পরমেশ: হাঁসের ডিম দেয়, না, মুরগীর ডিম? সেই সঙ্গে ক স্নাইলস্ কটি?

এইবার ধীরেনের প্রায় কঁদে ফেলবার পালা। কিন্তু বাসন্তী তাকে বাঁচাল।

এক পেয়ালা চা নিয়ে ঘরে ঢুকে বলল, চা নাও বাবা।

ধীরেন কৃতজ্ঞভাবে বাসন্তীর দিকে তাকাল। চায়ের জন্তে নয়—এই সংকটের সময় মৃতিমতী করুণার মত এসে পড়েছে বলে।

ধীরেন বলল, আবাব মিথ্যে কেন কষ্ট করতে গেলেন?

কষ্ট আর কী বাবা। কতদিন পরে এলে—

হঠাৎ অত্যন্ত সদাশয় মনে হ'ল পরমেশকে।

ও কি, শুধু চা দিলে কেন? একটু হালুয়া করে দিলেই পারতে ওর সঙ্গে।

ধীরেন তাড়াতাড়ি বলল, না না, ওসব কিছু দরকার নেই। আমাকে গিয়েই খেয়ে অফিসে বেরতে হবে। এই চা-ই যথেষ্ট।

বাসন্তী কোন কথা বলল না। হালুয়া! পরমেশ সময় বুকে রসিকতা করতে পারে মন্দ নয়। হুজি বাড়ির ত্রিদীপাতেও নেই। দিন দশেক আগে অবশ্য আদালতের এক পিয়ন তার দেশ থেকে এনে সের ধানেক ভয়সা ঘি দিয়ে গেছে পরমেশকে। কিন্তু পরমেশ সে ঘি তুলে রেখেছে, এক কোঁটা কাউকে ছুঁতে দেয় নি। হালুয়া! মন্দ নয় কথাটা।

পরমেশ বলে চলল, ওই তোমাদের ঘোষ। কতদিন পরে এল, কত বড় ঘরের ছেলে—

চায়ে একটা চুমুক দিয়েই ধীরেন নামিয়ে রেখেছিল। বোধ হয় হুইপ ভাটের চা। কেমন একটা হুগন্ধ চায়ে! এত ধারাপ চা ধীরেন কখনও পায় নি—বেলওয়ায়ে ভেঙারের মাটির ভাঁড়েও নয়। ধীরেন বলল, আমার সঙ্গে কেন ভক্ততা করছেন কাকা! আমি আপনাদের ঘরের ছেলে।

তা বটে—তা বটে। সে কথা তুমি বলতে পার। তোমার সঙ্গে আমাদের তো আর লৌকিকতার সম্বন্ধ নয়।—পরমেশ হাসল।

বাসন্তী বলল, চা-টা খেলে না বাবা?

এই খাচ্ছি।—প্রাণপণে আরও দু চুমুক চা মুখে নিতে হ'ল ধীরেনকে।

পরমেশ বলল, ওর মেসের কথা শুনছিলাম—বুঝলে!

ডাকাত—শ্রেষ্ঠ ডাকাত! চল্লিশ টাকা করে মেসিং নেয়। গলা কাটা ছাড়া আর কী বলা যায় একে! আচ্ছা, ভাতের সঙ্গে কী দেয় খেতে?

ধীরেন একটা বিষম খেল।

বাসন্তী বলল, বাই বাই। অত তাড়াতাড়ি করছ কেন?

ধীরেন লজ্জিত হয়ে বলল, আমার আবার অফিস আছে কিনা! এখুনি বেরুতে হবে। সাড়া নটা বেজে গেছে।

সাড়ে নটা বেজে গেছে!—পরমেশ হঠাৎ চকিত হয়ে উঠল : তুমি স্থলে চলে গেছে তো?

বাসন্তী বলল, অনেকক্ষণ।

অনেকক্ষণ! ধীরেন যেন আঘাত পেল একটা। না হয় স্থলের তাড়া ছিলই, তাই ব'লে যাওয়ার আগে একবার দেখাও ক'রে গেল না তুমি? একটা বিদায়ের সম্ভাষণও জানিয়ে গেল না? ব'লে যেতে পারল না—আবার আসবেন?

নিখাস বন্ধ ক'রে সেই দুর্গন্ধ চা-টা শেষ করল ধীরেন। উঠে দাঁড়াল।

আমি আজ আসি কাকা।

বাসন্তীর স্বরে ক্ষোভ প্রকাশ পেল : এখুনি যেতে হবে? অফিসের তাড়া আছে।

আবার কবে আসবে? এমন অসময়ে আজ এলে যে তোমার সঙ্গে ভাল ক'রে দুটো কথাও হ'ল না!

ধীরেন সংক্ষেপে বলল, দু-চার দিনের মধ্যেই আবার আসব।

আবার পরমেশ আর বাসন্তীর পায়ের ধুলো নিয়ে ধীরেন দ্রুত বেরিয়ে এল বাইরে। এ বাড়ি যেন তার দম আটকে আনছে। পথে বেরিয়েও সে গুনতে পেল—সেই বড় ছেলেটা সমানে আতর্জন ক'রে চলেছে তখনও।

ধুলোয় ভরা পথটা দিয়েই হাঁটতে হাঁটতে একটা সূক্ষ্মমুখ বেলনার আঘাত ধীরেনকে বার বার বাজতে লাগল : এতটা কি তাড়া ছিল তুমি যে, যাওয়ার আগে একবার ব'লেও যেতে পারল না?

পুরনো বা কি এতদিনেও শুকিয়ে যায় নি ধীরেনের?

চার

কিন্তু দেখা হ'ল পরদিন। তুমি কার সঙ্গেই।

অফিস থেকে ফিরে, চা খেয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল ধীরেন। এখনও প্রায় অচেনা জায়গা—কোথায় কতদূরে

আর যাবে! কয়েক পা হেঁটে সে ক্যানালের একটা ব্রীজের ওপরে এসে দাঁড়াল।

বর্ষার শেষ এখন। মরা ক্যানালে জলের তোড় ছুটছে। রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়ে ছিল ধীরেন—তাকিয়ে ছিল নীচের দিকে। স্বর্ধ ডুবে আসছে—ক্যানালের জলে লাল রঙ দপ দপ করছে এখানে ওখানে, একটু দূরেই জনকয়েক কালো কালো ছেলে খেপ'লা জাল দিয়ে মাছ ধরছে। কী এক রকম ছোট ছোট মাছ উঠছে জালে—পড়ন্ত বোদে চিকচিক করছে তারা। ধীরেন ভাবতে চেঁচা করছিল, কী মাছ ওগুলো? পুঁটি, না, চাঁদা?

এমন সময় তুমি কার সঙ্গে দেখা হ'ল। সেইখানেই। বিষম বিকেলবেলায় সেই নির্জন ক্যানালের ধারে ব্রীজটার ওপর। একটা ছোট বোলা কাঁধে নিয়ে ক্লাস্ত পায়ে হেঁটে আসছে।

ধীরেন বলল, তুমি।

তুমি দাঁড়িয়ে পড়ল। ধীরেনকে সে লক্ষ্য করে নি। বিকেলের রঙে কেমন রাঙা হয়ে উঠল তার মুখ।

তুমি এখানে দাঁড়িয়ে যে ধীরেনদা?

আমি তো কাছাকাছিই থাকি। একটু এগিয়ে আমার মেস। তা তুমি কোথা থেকে আসছ?

স্থল থেকে।

স্থল কাছাকাছিই বুঝি?

তুমি নিরন্তরে মাথা নাড়ল।

ধীরেন বলল, ঠিক—সদর গার্লস স্কুলটা দেখেছি বটে একদিন। কিন্তু এত দেরি ক'রে যে? ছটা তো প্রায় বাজে।

আজকে টিচারদের একটা মীটিং ছিল।

ধীরেন বলল, খুব ক্লাস্ত তা হ'লে। তোমার মুখ দেখেই মনে হচ্ছে সে কথা। চল, এগিয়ে দিই।

তুমি হাসল : বেশ তো।

দুজনে হাঁটতে লাগল। কয়েক পা নিঃশব্দে এগিয়ে তুমি বলল, তুমি আমার ওপর রাগ করছ—না?

কেন?

বাঃ, পরশু তুমি আমাদের বাড়িতে গেলে, অথচ আমি ভাল ক'রে একটা কথাও বলতে পারলাম না তোমার সঙ্গে। তুমি নিশ্চয়ই ভাবলে—

ভেবেছে বইকি ধীরেন। শুধু তখনই নয়, পর পর দু দিন ধরে ভেবেছে। কিন্তু আজ এই মুহুর্তে তহুকার ক্লান্ত-কাতর মুখের দিকে তাকিয়ে তার কেমন অহুতাপ হ'ল।

না না, ওভাবে ভাববার কী আছে! তোমার স্থলের ভাড়া ছিল।

তহুকা আস্তে আস্তে বলল, চাকরিটা নতুন হয়েছে কিনা। তার ওপর হেড মিস্ট্রিস তরফর স্ট্রিক্ট। একটু মেরি হয়ে গেলেই যা মুখে আসে—

তহুকা মাঝপথেই থেমে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিষন্ন সহানুভূতিতে সমস্ত মন ভরে উঠল ধীরেনের। সেদিন বুধা দুঃখ পেয়েছিল ধীরেন। মিথ্যেই নিজের ভেতরে অনেকখানি অভিমানকে কেনিয়ে ভুলেছিল। এই শিথিল-চরণা শ্রান্ত ক্লান্ত মেয়েটির পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে একটা শূন্য অবসাদ যেন তাকেও স্পর্শ করতে লাগল। মোহের আবরণটা যেন একটা মাকড়সার আলের মত ছিন্নভিন্ন হয়ে মিলিয়ে গেল মুহুর্তে। জীবনটা কত রুঢ়—কত বাস্তব! ক্লকনগরের বাড়ি ছেড়ে চলে আসবার পরে তার পরিচয় কি ধীরেন নিজের পাশ নি?

ধীরেন হঠাৎ বলল, চল, একটু চা খাই।

তহুকা বলল, কোথায়?

যে কোন একটা চায়ের দোকানে।

তহুকা হাসি হাসি : আমাদের এ সমস্ত শহরে মেয়েদের চায়ের দোকানে ঢোকবার রেওয়াজ নেই।

ও, তাও বটে। আমার খেয়াল ছিল না। একটু চুপ করে থেকে ধীরেন বলল, তা হ'লে আমার মেসেই চল।

তহুকা ভেমনি শীর্ণ হাসি হাসল : তোমার মেসে?

চল না, দেখেই আসবে, কেমন থাকি। আরও দেখিয়ে দেব নিজের হাতে ঠোঁড় জালিয়ে কেমন চা করতে শিখেছি আজকাল।—একটা স্নিগ্ধ কল্পনায় ধীরেন প্রগল্ভ হয়ে উঠল : তুমি বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে যে, দরকার হ'লে আমি কোন কোন দিন ডিমের ডালনাও রেখে ফেলতে পারি। চল না, যাবে?

ধীরেন প্রায় আশা করতেই আরম্ভ করেছিল, হঠাৎ তহুকার শীতল কবের ছোয়াচ লাগল গায়ে। চকিতে

কুকড়ে গেল ধীরেন। যেন একটা কিছু ধরবার জন্তে হাত বাড়িয়েছিল সামনের দিকে। একটা কাঁটার খোঁচা খেয়ে সেই হাতখানাকে সরিয়ে নিল সে।

তহুকা বলল, এ কলকাতা নয়। পুরুষের মেসে মেয়েরা গেলে তাদের নিন্দে হয়।

ধীরেন বিবর্ণ হয়ে বলল, তা ঠিক, আমার মনে ছিল না।

আবার কিছুক্ষণ পাশাপাশি হাঁটা। ধীরেন ভাবতে লাগল : বদলে গেছে তহুকা—অনেকখানিই বদলে গেছে। ক্লকনগরের সেই ডুরে-শাড়ি-পর্য মেয়েটি, পেয়ারা আর লিচুর ওপরে বার অসম্ভব লোভ ছিল, যে মেয়েটি হেঁটে চলার চাইতে ছুটে চলতে ভালবাসত বেশী, পরমেশ্বর প্রচণ্ড শাসন সঙ্গেও যে চিংকার করে গান গেয়ে উঠত, সে মানুষটি আর এই মানুষটি একেবারেই আলাদা জাতের। পাঁচ বছর শুধু তহুকার বয়েসই বাড়ায় নি—মনের ওপর দিয়ে যেন যুগ-যুগান্তর পার করে দিয়েছে।

ধীরেন আবার বললে, হেঁটেই যাবে অতটা রাস্তা?

প্রায়ই তো যাই।

কষ্ট হয় না?

আমার চাইতেও বেশী পথ হাঁটতে হয় দু-একজনকে।

এড়িয়ে গেল তহুকা। ঠিক, আরও অনেককে আরও অনেক বেশী পথ হাঁটতে হয়। নীচের দিকে তাকিয়ে যদি দুঃখের পরিমাণটাকে দেখতে চাও, তা হ'লে সে দেখার কোন শেষ নেই। কেউ ভিক্ষে করে বাঁচে, কেউ পথের ধারে গাছতলায় পড়ে শীতের রাত কাটায়, একজন কুঠরোগীকে জ্যান্ত অবস্থাতেই শেয়ালে বেয়ে ফেলেছিল, সে কাহিনীও ধীরেন জানে। তহুকার এ কথার জবাব দেওয়া যায় না।

শুধু বলা চলে, তুমি রিক্সা করে চলে যাও—ভাড়াটা আমি দিয়ে দিচ্ছি।

পরমেশ পেশকার হয়তো রাজী হ'ত। কিন্তু তহুকার দু চোখে আগুন জ্বলে উঠবে। তারপরে তার সামনে এসে আর কোনদিন দাঁড়াতেও পারবে না ধীরেন।

আর বলা চলে : চল, একটা রিক্সা করি, পৌছে দিই তোমায়।

কিন্তু তাও কি সম্ভব? পাঁচ বছর আগেকার পারিবারিক অন্তরঙ্গতার জের টেনে আজ কি আর সে কথা

বলা চলে একুশ-বাইশ বছর বয়সের অনাখীয়া মেয়েকে ?
তহুর জবাবটা অহুমান করতে পারে ধীরেন।

এ মঞ্চস্থল শহর ধীরেনদা। লোকে ভাল চোখে
দেখবে না।

সুতরাং কিছুই বলতে পারল না ধীরেন। শুধু পাশা-
পাশি চলল আর লক্ষ্য করতে লাগল, তহুকা এখন আর
পা ফেলে চলছে না—যেন পা টেনে টেনে চলেছে।

কোথায় যেন একটা অস্বস্তি স্পর্শ করছিল দুজনকে।
তহুকাই সহজ হতে চাইল।

পরশু তো রবিবার আছে, একবার আমাদের বাড়িতে
এস না ধীরেনদা।

ধীরেন বলল, চেষ্টা করব।

এতে চেষ্টা করবার কী আছে? এখানে তোমার এমন
কী কাজ যে আসতে পারবে না? তারপর তুমি এমন
লাজুক মানুষ যে, ভাল করে কারও সঙ্গে আড়াও তো
দিতে পার না। এসো কিন্তু।

আচ্ছা, দেখি।

তহুকা বলল, গিয়ে গান শোনাবে।

এতক্ষণ ধীরেনও খানিকটা স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করল :
গান ছেড়ে দিয়েছি আজকাল।

সে কি! অত ভাল গাইতে তুমি!—তহুকা আশ্চর্য
হ'ল : ছেড়ে দিলে কেন?

ধীরেন বলল, ঠিক আমি ছাড়ি নি, গানই ছেড়ে দিলে
আমাকে। হঠাৎ কেমন মনে হ'ল, আর যারই হোক,
গানটা আমার জন্তে নয়। ইচ্ছে য় আসতে চায় না,
তাকে জোর করে আনা সম্ভব নয়।

এসব বাজে কথা।—তহুকা ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, তোমার
পাগলামি।

ধীরেন হাসল। জবাব দিল না।

আবার খানিকটা পথ। ধোয়া-ওঠা রাস্তা। দূরে
দূরে মন-মূর্তি মিউনিসিপ্যালিটির কেরোসিন ল্যাম্প।
প্রকাশ ধোয়াটে অপরিচ্ছন্ন অন্ধকার নেমে আসছে
চারদিকে। মাথার ওপর মশার তীব্র গুঞ্জন।

তহুকা আস্তে আস্তে বলল, জান ধীরেনদা, আমার
এম. এ. পড়বার ভারি ইচ্ছে ছিল।

পড়লে না কেন?

বাবা খরচ চালাতে পারলেন না।—একটা দীর্ঘশ্বাস
চেপে নিল তহুকা।

বাড়িতে একমাত্র তুমিই তো পড়াশুনা করছ। তা
ছাড়া এতদিন পর্যন্ত যখন খরচ চালাতে পারলেন, তখন
এটুকুর জন্তে আর—

যে কথা কোনদিন কাউকে বলে নি তহুকা, হঠাৎ সে
কথা যে কী ক'রে ব'লে ফেলল ধীরেনকে কে জানে! হয়তো
ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে মনের ওপর তার রাশ ছিল না, হয়তো
সেদিনের সেই আঘাতটা হঠাৎ উঠল রক্তাক্ত হয়ে।
অনেক দিনের পুঙ্খ পুঙ্খ যন্ত্রণার এক ঝলক মুহূর্তের
অনতর্কতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ল।

বাবাকে তুমি কি জান না ধীরেনদা? বাবা কাউকে
বাঁচতে দেবে না, একটু একটু ক'রে বিষ ধাইয়ে মেঝে
ফেলবে সকলকে। দাদা পালিয়ে বেঁচেছে, যদি আমিও
পারতাম—

এই পর্যন্ত ব'লেই তহুকা থমকে গেল। হঠাৎ যেন
ফাঁসির অপরাধ কবুল ক'রে ফেলেছে।

ধীরেন বলল, তহু!

সেই মুহূর্তে ধীরেন আবার তহুকার হাত চেপে ধরতে
পারত। শুধু তাই নয়, একেবারে বুকের মধ্যে টেনে
নিয়ে বলতে পারত, ভয় নেই, কোন ভয় নেই তোমার।
আমি আছি তহু—আমি আছি।

শান্ত-সংযত ধীরেন নিজের বুকের দোলাটাকে সামলে
নেবার আগেই তহুকা বলল, আর তোমার এগিয়ে
দেওয়ার দরকার নেই, আমি প্রায় এসে পড়েছি।

তারপরেই ধীরেনকে ছাড়িয়ে দ্রুতপায়ে এগিয়ে
গেল তহুকা।

ধীরেন দাঁড়িয়ে পড়ল। তার একবারও এ কথা
মনে হ'ল না, বাড়ির এত কাছাকাছি এসে পড়া সম্ভব
তহুকা কেন একবারও বলল না—আমুন ধীরেনদা,
আমাদের এখানে এক পেয়লা চা খেয়ে যান!

মেসে কিরে আশ্চর্য হয়ে গেল ধীরেন। মহম্মদ পর্বতের
কাছে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

আপনার ঘরে যে পরমেশ পেশকার এসে ব'সে
আছেন মশাই।

আর একজন বলল, হঠাৎ আপনার কাছে ও অপাঙ্গটা কেন ধীরেনবাবু? সাবধান থাকবেন। লোকটা ডেঙ্কারাস, কী ভাবে যে কাকে কীসিয়ে দেবে, কেউ তা জানে না।

কিন্তু এসব কথা ধীরেনের কানে গেল না। ব্যতিব্যস্ত হয়ে ধীরেন ঘরে ঢুকল।

তার ঘরের বাকি ছজন এখনও বেড়িয়ে ফেরে নি। পরমেশ ব'সে আছে তক্তাপোশের ওপর। লণ্ঠনের আলোয় জ্ব-ফুঁচকে ধবরের কাগজ থেকে সোনার ধর দেখছে।

ধীরেন বলল, আপনি কখন এলেন কাকাবাবু?

এই আধ ঘণ্টা হ'ল। বেড়াতে বেরিয়েছিলে বুঝি?

ধীরেন মাথা নাড়ল। পথে তার যে তলুকার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে কথাটা সে পরমেশকে বলবে কি না ঠিক বুঝতে পারল না। এই লোকটা তার কাছে ছবোঁধা।

ধীরেন সামনের চেয়ারটার ব'সে পড়ল।

পরমেশ বলল, তুমি কাগজ রাখ বুঝি?

ধীরেন তেমনি মাথা নাড়ল।

এটা তোমার পড়া হয়ে গেছে? নিয়ে যাব আজ?

বেশ তো, বেশ তো।

কাল অফিস যাওয়ার পথে ফেরত দিয়ে যাব, কেমন?

ধীরেন হাসল: তার দরকার নেই। এখানে তো পড়েই থাকে, লাভের মধ্যে মেসের ঠাকুর নিয়ে গিয়ে উঠুন ধরায়। ও থাক আপনার ওখানেই।

পরমেশ প্রসন্ন হ'ল। সযত্নে ভাঁজ করতে লাগল কাগজটা।

ধীরেন বলল, একটু চা খাবেন কাকাবাবু? ক'রে দিতে বলব?

পরমেশ বলল, না না, তার দরকার নেই। আমার আবার গ্যাসট্রিক আছে, বেশী চা-টা খেলে কষ্ট হয়। আমি দেখতে এলাম, কেমন আছে তুমি!

ধীরেন হেসে বলল, মন্দ কী!

মন্দ কী!—পরমেশ উদ্বেজিত হয়ে উঠল: একে থাকা বলে! এরই মধ্যে তুমি চল্লিশ টাকা দাও মাসে মাসে! এই তো ঘর, দক্ষিণ দিকটা একেবারে বন্ধ। তার জানলার শিকগুলো এত সুরু সুরু যে হাত দিয়ে টানলেই ধুক্কের মত বঁকে আসবে। একদিন চোর এসে সব নিয়ে পালালে তখন দেখছে কে!

ধীরেন শুনে যেতে লাগল।

পরমেশ বলল, তারপর একবার রান্নাঘরে ঢুকেও আমি উকি দিয়ে এলাম। কাটা ইলিশ এনেছে, ওইটেই বাজারে সব চাইতে সস্তা কিনা। অথচ ওগুলোকে রুট মাথিয়ে বিক্রি করে, ধাঁ ক'রে ফুড-পন্থন হয়ে বসতে কতক্ষণ! তরিতরকারি যা এনেছে সে একেবারে বাজারের ঝড়তি-পড়তি। আর চাল যা দেখলাম, সেও মোটা মোটা। এই খাওয়া, এই ঘর, এর গুনোগার চল্লিশ টাকা! গলা কেটে নিচ্ছে হে—শ্রেফ গলা কেটে নিচ্ছে।

আজ্ঞে, জিনিসপত্রের দামও তো খুব বেশী আজকাল?

জিনিসপত্রের তোমরা কী জান হে? বড়লোকের আত্মরে ছেলে তোমরা, হাটে-বাজারে পা বাড়িয়েছ কোনদিন? ওসব কথা বলতে হয়, তাই বলে। পড়ত আমার পাল্লায়, দু দিনেই ঠাণ্ডা ক'রে দিতাম।

পরমেশের সে শক্তি সঘনো ধীরেনের মনে সন্দেহ ছিল না।

পরমেশ আবার বলল, না, এ কখনও আমি সইতে পারব না। তোমার বাবাকে আমি নিজের বড় ভাইয়ের মত দেখতাম। তাঁর ছেলে হয়ে তুমি এমন ক'রে কষ্ট করবে, এ কিছুতেই হতে পারে না। তুমি চল আমার ওখানে।

আপনার ওখানে?—ধীরেন চমকে উঠল।

কেন, সে তো আর পরের বাড়ি নয় হে। ঘরের ছেলের মতই থাকবে। আলাদা ঘর ছেড়ে দেব তোমায়—বাড়িতে অনেক জায়গা আমার।

সেই বাড়ি! রিক্বেটি বাজাটার মুখের চারপাশে লালার ওপর মাছির ভিড়। আর সেই পুতুলের মত মাথা-কাঁপানো ছেলেটা, যে এগিয়ে এসে ছোটো নোংরা হাতে তার হাঁটু আঁকড়ে ধরেছিল! সমস্ত বাড়িময় কেমন একটা অস্বস্তি অপরিচ্ছন্নতা! ধীরেন শিউরে উঠল।

পরমেশ বলল, কোন কষ্ট হবে না তোমার—কোন কষ্ট হবে না।—তারপরেই সতর্ক রাজনীতিক পরমেশ হা-হাঁ ক'রে হেসে উঠল: ওঃ হো! তোমরা আবার আধুনিক ছেলে, তোমাদের আবার বুঝি আত্মদাম্ভানে বাধবে? বেশ তো, তা বেশ তো। না হয় যে টাকাটা এখানে দিচ্ছ, সেইটেই তোমার কাকিমার হাতে তুলে দিও।

ধীরেন বিব্রত বোধ করতে লাগল। কী যে জবাব দেবে ঠিক ক'রে উঠতে পারল না।

পরমেশ যেন সব ব্যবস্থা ক'রেই ফেলেছে এমন ভিত্তিতে বলল, তা হ'লে আর কথা কী! পরশুই চল। রবিবার আছে—আমি এসে নিয়ে যাব।

ধীরেন কুণ্ঠিত হয়ে বলল, আমাকে একটু ভাবতে দিন।

এতে আর ভাববার কী আছে! ঘরের ছেলে ঘরে চ'লে আসবে, তার জন্তে কি কারুর কাছে জবাবদিহি করতে হবে নাকি তোমায়?

ধীরেন চুপ ক'রে রইল। পরমেশ বুঝল, স্বতোয় একটু ভিল দেওয়া দরকার। হঠাৎ কী ভেবে চোখ দুটো তার চিকচিক ক'রে উঠল।

পরমেশ বলল, তুমি বলছিল—

তুমি বলছিল?—ধীরেনের চমকটা পরমেশের চোখ এড়িয়ে গেল না।

পরমেশ সন্তর্পণে বলল, তুমি বলছিল—আমাদের বাড়ি থাকতে ধীরেনদা মেসে থাকবার কথা কী ক'রে যে ভাবতে পারল সেইটেই আশ্চর্য!

ধীরেন বিব্রল হয়ে রইল।

এই কথা বলেছে তুমি? অথচ আজ পঁচৈই যখন দেখা হ'ল, তখনও তো—। বানিয়ে বলল নাকি পরমেশ? কিন্তু অনর্থক এমন কথা বানিয়েই বা বলতে যাবে কেন সে?

ধীরেনের বিভ্রান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বুঝল পরমেশ। হাসল একটুখানি।

তা বেশ তো, তা বেশ তো, ভাব না তুমি। আমি কাল আবার আসব।

কাগজটা ভাঁজ ক'রে নিয়ে পরমেশ উঠে পড়ল: আজ আমি উঠি।

পাঁচ

রবিবার সকালেই রিক্সা চেপে বাস-বিছানা নিয়ে ধীরেন পরমেশের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছল।

পরমেশ ধীরেনকে সময় দেয় নি। পরের দিনই গিয়ে হানা দিয়েছিল কারুলীওয়ার মত। আর সমস্ত রাত ধীরেনের মাথার মধ্যে একটা কথাই গুঞ্জন ক'রে ফিরেছিল: তুমি বলেছে, আমাদের বাড়ি থাকতে—

শনিবার রাজিতে পরমেশ বোষণা করেছিল, কাল সকালে ধীরেন আসছে। আমাদের এখানেই থাকবে এর পর থেকে।

ততুকা সেলাইয়ের কলে কাপড়ের কুচি টানছিল, হঠাৎ একটা শূচের ফোঁড় এসে লাগল আঙুলে। একটা আকস্মিক আঘাতে সে পাথর হয়ে গেল। আর ছোট ছেলেটাকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে সীমাহীন বিস্ময়ে বাসন্তী বলল, ধীরেন আসছে! এখানে!

পরমেশ মুখভঙ্গি করল একটা: তাতে এত আশ্চর্য হবার কী আছে! ঘরের ছেলে ঘরে আসবে, সে কথা জ্ঞানে এমন ক'রে আকাশ থেকে পড়লে কেন?

নিজে থেকেই আসতে চেয়েছে সে?—বাসন্তী তখনও ঠিক বিশ্বাস করতে পারল না।

না হ'লে আমি কি জোর ক'রে টেনে আনছি নাকি ওকে?—পরমেশ চ'টে উঠল।

বাসন্তী চুপ ক'রে গেল। ততুকা অকারণে কলের মাছুটাকে পরীক্ষা করতে লাগল।

পরমেশ বলল, ও নিজেই বলছিল, মেসের বিল্লী খাওয়াদাওয়া ওর ঠিক হাতে সহছে না। আমি বললাম—গরিব কাকার একটা বাড়ি যখন রয়েছে, তখন সেখানেই চল। যা হোক থাকার একটা ব্যবস্থা হবে—ছুটো শাক ভাত খাবে।

বাসন্তী ব'লে ফেলল, না না, সে হয় না।

কেন হয় না?—পরমেশের চোখ হিংস্র হয়ে উঠল।

এই বাড়িতে—এ অবস্থায়—

কেন, খারাপ হ'ল কিসে?—পরমেশের গলায় ক্রুদ্ধ উত্তেজনা ফুটে পড়ল: যে মেসে আছে, সেটা কি কলকাতার গ্র্যাণ্ড হোটেল নাকি?

গ্র্যাণ্ড হোটেলের কথা হচ্ছে না।—বাসন্তী বিব্রল হয়ে বলল, আমাদের যা খাওয়া-দাওয়া—

পরমেশ এবার গর্জন ক'রে উঠল: তুই চুপ কর হারামজাদী!—আদম একটা জাস্তব সত্তা আত্মপ্রকাশ করল তার সমস্ত চেহায়ায়: আমি যখন ডেকে আনছি, তখন কী খাওয়াতে হবে সে আমিই জানি। তুই তোর শূয়োরের পাল সামলা—ওকে সোনা-দানা খাওয়াতে হবে কি না সে আমিই বুঝব।

এই কুৎসিত নার্টকের মধ্যে আর থাকা চলে না। সেলাইয়ের কলের ওপর ঢাকনাটা চাপিয়ে দিয়ে তলুকা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এসে দাঁড়াল সামনে পাঁচিল-ঘেরা খোলা জায়গাটুকুর মধ্যে। দু দিকে বাগান—এইটুকুই খালি রেখেছে পরমেশ। পাঁচিলে হেলান দিয়ে তলুকা আকাশ-ভরা তারার দিকে চেয়ে রইল।

যদি ধীরেনের মেন্স চেনা থাকত, তা হ'লে এই মুহূর্তেই সে ছুটে যেত সেখানে। গিয়ে বলত, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে-ধীরেনদা? তুমি আসবে এই বাড়িতে, এই বীভৎস নরকের ভেতরে? এসো না—কিছুতেই এসো না। তুমি জান না, কত গ্লানি, কত কদম্বতার মধ্যে আমাদের অসহ্য মর্যাস্তিক দিনগুলো কাটিয়ে যেতে হয়।

কিন্তু তবু ধীরেন আসবে। তবু কাছে থাকবে ধীরেনদা। চার দিকের পাথরের মত অন্ধকারে এক বলক আলোর মত দেখা দেবে সে। কখনও কখনও তলুকার মনে হবে, এ বাড়ির বাইরেও একটা পৃথিবী আছে—জীবনের ছন্দ আছে একটা।

কতটা খুশী হ'ল কতটা দুঃখ পেল, তলুকা নিজেই সে কথা বুঝতে পারল না।

তার পরদিনই এল ধীরেন।

এই বাড়ির মধ্যেই যেটা ভাল ঘর, পরমেশ সেইটেই ধীরেনের জন্তে পরিষ্কার করিয়ে রেখেছিল। সকাল থেকেই তাড়া দিয়ে ঝুল ঝাড়িয়েছে, মেঝে পরিষ্কার করিয়েছে, আরশোলা তাড়াবার ব্যবস্থা করেছে। যেন জামাই আসছে এমন অভ্যর্থনা।

বাসস্তীর বুঝতে কিছু বাকি থাকে নি। ওই চল্লিশটা টাকা। ওর থেকে অন্ততঃ কুড়িটা টাকা পরমেশ বাঁচাতে পারবে। কুড়ি টাকার সাশ্রয় হ'ল সংসারে।

সমস্ত রাত ঘুপায় শরীর সংকুচিত হয়ে থেকেছে বাসস্তীর। পরমেশের নাকের ডাক শুনতে শুনতে তার মনে হয়েছে, কোন উপায়ে এ বাড়ি থেকে যদি সে ছুটে পালাতে পারত তাই করত তা হ'লে। কিন্তু এই নির্ভর কঠিন শেকলের হাত থেকে তার যত্ন পর্যন্ত নিস্তার নেই। পাকে পাকে সাপের ফাঁসের মত জড়িয়ে রাখবে।

তাই ধীরেন যখন এল, তখন তার দিকে ভাল ক'রে সে চাইতেও পারল না।

ঝোঁকের মাধ্যম চ'লে এসে ধীরেন নিজেও যেন কেমন অপ্রতিভ হয়ে গিয়েছিল, শুকনো ঠোঁট একবার চেটে নিয়ে বলল, শেষ পর্যন্ত আপনাদের কাছেই এলাম কাকিমা।

বাসস্তী কোন মতে বলল, বেশ তো—বেশ তো। এ তো তোমারই বাড়ি।

ওদিকে চিংকার করছে পরমেশ। একেবারে তুলকালাম বাধিয়েছে বাড়িতে।

শিগগির শিগগির। এখনি চা নাও ধীরেনকে, হালুয়া আন—

ধীরেন সমস্ত হয়ে বলল, আপনারা এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, আমি তো বলতে গেলে বাড়িরই ছেলে!

নিজের ঘরে ধীরেন কিছুক্ষণ বিব্রত হয়ে ব'সে রইল। মনের কাছে এ কথা আর গোপন করবার জো নেই যে, তলুকার অলক্ষ্য আকর্ষণেই এখানে এসে পড়েছে সে। আরও একটু ভাল ক'রে দেখতে পাবে তাকে, কিছুক্ষণ সঙ্গ পাবে তার। পাঁচ বছর আগেকার ডুরে-শাড়ি-পরা মেয়েটি তো হারিয়ে যায় নি মন থেকে। অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে ব'সে ছিল, সেখান থেকে চকিতে ফিরে এসেছে আলোর ভেতরে।

কিন্তু তার কাছে আসবার দাম অনেকখানি দিতে হবে ধীরেনকে। এই পরমেশ পেশকার। চারদিকে একটা শ্রীহীন অপরিচ্ছন্নতা। মাথার ওপরে ঝুলে পড়া ছাদ—একটু বৃষ্টি হ'লেই ধ'সে পড়বে ব'লে ভয় হয়। তার ওপর ওই বীভৎস শিশুর দল, ওদের কথা ভাবতেই চোখ বুজে আসতে চায়।

চা আর হালুয়া নিয়ে তলুকা এল।

ধীরেনদা!

ধীরেন চমকে উঠল। একরাশ মেলে-দেওয়া ভিজে চুল। ছুটি ভ্রুর মাঝখানে ছোট্ট একটি কুহুমের টিপ। পরনে নীল শাড়ি। তলুকার চুল এত কালো, এমন গভীর কালো—এ যেন ধীরেন এর আগে কোনদিন দেখে নি।

তোমার চা নাও।

সেই চা। সভয়ে পেয়ালা তুলে নিয়ে একটা চুমুক দিল ধীরেন। না, সে বিকট স্বাদটা নেই স্বাদকে।

পরমেশ পেশকার বোধ হয় নতুন ক'রে চা আনিয়েছে তার সম্মানার্থে।

তুমি চা করেছ?

তহুকা মাথা নাড়ল।

নিজের কথাটাই ঘুরিয়ে বলল ধীরেন : তাই চায়ের স্বাদটা অন্তরকম মনে হচ্ছে।

তহুকা শীর্ণ হাসি হাসল। একটু স'রে গিয়ে দাঁড়াল জানলার পাশে। চেয়ে রইল বাইরের জংলা আম-বাগানটার দিকে। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে ধীরেন দেখতে লাগল, নীল শাড়ির ওপর কেমন ক'রে রাশি রাশি কালো চুল চেঁচু খেলে নেমে এসেছে।

ধীরেন বলল, কি ভাবছ তহু?

তহুকা মুখ ফেরাল, আঁতে আঁতে বলল, ভাবছিলাম হুখে থাকতে তোমার এই ছুগতি কেন? কেন তুমি চ'লে এলে এখানে?

ধীরেন বলল, বা: রে, আসব না? তুমিই তো আমার ডেকে আনলে। মুহু হাসল ধীরেন : তোমার সেই ডাকেই তো চ'লে আসতে হ'ল আমাকে।

আমি?

তা ছাড়া আর কে?—চা খেতে খেতে ধীরেন প্রগল্ভ হয়ে উঠল : আর কারও মক্কে কি আর মেসের ক্রীডম ছেড়ে এখানে এসে উপস্থিত হতাম?

আমি!—আর একবার বলল তহুকা। অল্প অল্প কাঁপতে লাগল ঠোঁট।

ধীরেন লক্ষ্য করল না, হয়তো মনে করল ওটা লজ্জার অভিব্যক্তি। হালুয়ার প্রেটটা কাছে টেনে নিয়ে বলল, কাকা বলেছিলেন, আমি মেসে উঠেছি ব'লে তুমিই নাকি রাগ করেছ সব চাইতে বেশী। বার বার ক'রে বলেছ, আমরা কি এতই পর হয়ে গেলাম যে, এখানে আমাদের বাড়ি থাকতেও ধীরেনমা গিয়ে মেসে উঠল?

তহুকার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। একটা কিছু বুঝেছে, একটা কিছুর পরিষ্কার আভাস পেয়েছে। ধীরেনকে এখানে আনবার জন্তে তারই নাম এমন বিশেষভাবে বলবার কী দরকার ছিল পরমেশের? কেন? ধীরেনকে আনবার কথা বলা তো দূরে থাক, একবার যে সে তার নামটা উচ্চারণ করেছে, এমন কথাও মনে পড়ল না তহুকার।

তহুকা হঠাৎ বলল, আমার একরাশ কাজ আছে ধীরেনমা, আমি আসি।—ব'লেই বড় বড় পা ফেলে চ'লে গেল ঘর থেকে। ধীরেন একটু ব্যথিত হ'ল, কিন্তু আশ্চর্য হ'ল না। সে জানে পরমেশের সংসারে ব'সে ব'সে এক মুঠো ভাত খাওয়ারও জো নেই কারও। স্বতন্ত্র খাস, ততক্ষণ খাটতে হবে।

কিন্তু তহুকার কোন কাজ সত্যিই ছিল না। সে এসেছিল ধীরেনের সঙ্গে গল্প করতেই। আজ যেন অনেক কথাই ধীরেনকে তার বলবার ছিল। কী বলবে জানত না, তবু মনে হয়েছিল অনেক কিছু সে বলতে চায়। অনেক কিছু বলা তার দরকার। কিন্তু এর পরে কিছুতেই সে আর ধীরেনের সামনে দাঁড়াতে পারল না।

তহুকার মনে হ'ল, কোথাও একটুখানি লুকিয়ে ব'সে কাঁদতে পারলে তার ভাল লাগত। কিন্তু রাত্রে নিজের বালিশ ছাড়া পরমেশ পেশকারের বাড়িতে কোথাও একটু কাঁদবার জায়গা নেই, কোথাও না।

বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল সে। পরমেশ তখন দাঁড়ি-পাল্লায় ক'রে নতুন আলু মেপে দিচ্ছে বুড়ীকে। সেই দিকেই তাকিয়ে বেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল তহুকা।

পরমেশ হ'শিয়ার লোক। সন্ধ্যার পরেই এল।

ধীরেন তখন জানলার পাশে চেয়ার টেনে নিয়ে বাইরের অন্ধকার আমবাগানটাকে দেখছিল আর ভাবছিল মায়ের কথা। বড়দা বিলেত থেকে বেম বিয়ে ক'রে এনেছেন, এই অপরাধে ছোট ছেলেকে আর ইয়োরোপে পাঠাতে রাজী হলেন না বাবা। সেই যে রাগ ক'রে ধীরেন বাড়ি ছাড়ল, তারপর থেকে আর কোন সম্পর্কই নেই ওখানকার সঙ্গে। পোস্ট-অফিসে চাকরি নিয়ে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক। আর কারও জন্ত নয়, মায়ের কথাটাই তার মনে পড়ে বার বার।

দীর্ঘশ্বাস পড়ল একটা। চোখে বুঝি জলও এসেছিল একটুখানি।

ধীরেন।

পরমেশ এসেছে। চকিত হয়ে ধীরেন উঠে দাঁড়াল : আহ্নন।

তোমার কোন কষ্ট হচ্ছে না তো ?

আজ্ঞে না না।

আর কষ্ট হ'লেই বা করছ কী।—পরমেশ হাসল :
নিজের বাড়িতে আর কে অত খুঁৎ বাছে বল। তবু মেষের
বিষের চাইতে এ ঢের ভাল। যা থাকে তার মধ্যে ডেজাল
নেই। বাড়ির গরুর দুধ, বাগানের টাটকা তরকারি—

আজ্ঞে হ্যাঁ, সে তো ঠিকই।

পরমেশ একবার ইতস্তত করল : যে জন্তে এসেছিলাম।
এক্ষুনি কুড়িটা টাকা দরকার। অথচ বাড়িতে মাত্র দুখানা
একশো টাকার নোট রয়েছে। তাই বলছিলাম, তুমি
একশো টাকা ভাঙিয়ে দিতে পারবে ?

সত্যিই একশো টাকার ভাঙানি কাছে থাকলে চালটা
ব্যর্থ হয়ে যেত পরমেশের। কিন্তু পরমেশ কাঁচা লোক নয়,
এত সহজেই সে ভুল করে না। সে জানে, যত বড়লোকের
ছেলেই হোক, এখন পোস্ট-অফিসে সে চাকরি করে, মাসের
মশ তারিখে একশো টাকার চেক তার কাছে থাকা সম্ভব
নয়।

ধীরেন বলল, না, একশো টাকার চেক নেই। কুড়িটা
টাকা আমি দিচ্ছি।

পাণ্ডাবির পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে দুখানা
মশ টাকার নোট সে এগিয়ে দিল পরমেশের দিকে।

পরমেশ বলল, বাঁচালে—বড় উপকার করলে। তা,
এ টাকার জন্তে তোমার ভাবনা নেই, কালই আমি নোট
ভাঙিয়ে টাকাটা দিয়ে যাব তোমাকে।

ধীরেন বলল, না কাকাবাবু, ও টাকা এখন ফেরত দেবার
দরকার নেই। কাকিমার কাছে রেখে দিন।

পরমেশ যেন আশ্চর্য হ'ল।

কাকিমার কাছে ? তারপরেই যেন প্রচণ্ড একটা
কৌতূহলের ব্যাপার ঘটেছে, এমনভাবে শশ্বে হেসে উঠল :
ওহো! সেই পেয়িং গেস্টের ব্যাপার ? আরে না না,
সেও কি একটা কথা ? তুমি আমাদের ঘরের ছেলের মত,
তোমার কাছ থেকে কি টাকা নিতে পারি এভাবে ?

ধীরেন বিস্মিত হয়ে বলল, আমাকে বিমুখ করবেন না
কাকাবাবু। ওটুকু আমার বৎসামাত্র প্রশাসী।

পরমেশ আবার হা-হা করে হেসে উঠল : বুঝছি,
বুঝছি। তোমরা মর্ডার্ন হোকরা, তোমাদের আত্মসম্মান-

জ্ঞানটা আবার অতিরিক্ত টনটনে। তা হ'লে ঐ টাকা
নিতেই হবে ?

ধীরেন নিরুত্তর হয়ে রইল।

নাঃ, কী যে মুশকিল কর তোমরা! সুভাষনা শুনলে
কী বলবেন বল দেখি আমাকে ? কত খেয়েছি তাঁর,
বিপদে আপদে কত সাহায্য পেয়েছি তাঁর, আর তিনি যদি
শোনেন—। না না ধীরেন, এ ঠিক হচ্ছে না।

ধীরেন বলল, আপনি কিছু মনে করবেন না। ঘরের
ছেলেও সংসারে কিছু দেয়। প্রয়োজন না থাক, সেটুকু
তার আত্মতৃপ্তি। তা থেকে বঞ্চিত করবেন না আমাকে।

তাই তো—তাই তো!—পরমেশ যেন কৌতূহলে
উজ্জলিত হয়ে উঠল : এ যদি বল তা হ'লে তোমার সঙ্গে
তর্কে পারব না। নাঃ, এই আজকালকার ছেলেদের নিয়ে
কী যে মুশকিল—

সেই মুশকিলের কথা ভাবতে ভাবতেই নোট দুটোকে
একবার ভাল করে পরীক্ষা করে নিল পরমেশ, তারপর
বেরিষে গেল ঘর থেকে। ধীরেন এসে আবার বলল
জানলার কাছে, তার মায়ের মুখখানাকে আবার মনে
আনবার চেষ্টা করতে লাগল।

সেই দিন রাতে তত্বকা ছটফট করছিল অনেকক্ষণ।

বাসন্তীও জেগে ছিল। জেগেই তাকে থাকতে হয়
প্রায় সারা রাত। বিশাল মশারির ভেতরে অসহ্য গরম।
সারা রাত হাতপাখা চালাবার দায়িত্ব তারই।

বাসন্তী বলল, কি রে, ঘুমো না ?

ঘুম আসছে না।

বাসন্তী চুপ করে রইল। কেন ঘুম আসছে না,
সে কথা জানতে চাইল না। যেন দুজনে একসঙ্গে একই
কথা ভাবছিল।

তত্বকা ডাকল, মা!

কী ?

একটা কথা বলব ? পরমেশের নাকের ডাক শব্দে
নিশ্চিন্ত হয়ে চাপা গলায় তত্বকা বলল, বলব তোমাকে
একটা কথা ?

বল।

ধীরেনহাকে কেন এখানে টেনে আনলে তোমরা ?
যেতে ব'লে দাও—কালই যেতে বল এখান থেকে।

হঠাৎ অকারণে দপ ক'রে জ্বলে উঠল বাসন্তী।

কেন বলব? কিসের জ্বলে বলতে বাব? বাপে আর মেয়েতে যুক্তি ক'রে ছেলটাকে এখানে টেনে এনেছ—এখন এসব ভালমালুমি কেন আমার কাছে?

মা!—একটা আত্মস্থর বেরুল তুম্বকার।

জানি না, কিছু জানি না।—যেন একটা অবস্থায় যন্ত্রণায় বাসন্তী গোড়িয়ে উঠল: কোনও কথা জানি না আমি। আমি এখন তোমাদের হিসেবের বাইরে। যদি আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরলেই তোমাদের আশ মেটে, হুম্ব কর, আমি তাই করব।

বাসন্তীর সেই তীক্ষ্ণ উত্তেজিত স্বরে হঠাৎ ঘুমের ঘোরটা ফিকে হয়ে গেল প্রমেশের। কঁৎ ক'রে থেমে গেল মাকের ডাকটা। জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, কী হয়েছে, এত রাতে গোলমাল কিসের?

মা আর মেয়ে দুজনই নিথর। একটা শব্দ বেরুল না কারও মুখ দিয়ে।

বাইরের জ্বলে সেই অজুত পাখিটা ভৌতিক কায়ার মত একটানা ডেকে বেড়াতে লাগল।

ছয়

কয়েক দিন কেটে গেল।

প্রথম প্রথম ধীরেন একটু অস্থিতাপই বোধ করত। ছেলেমেয়েগুলোর কান্না, প্রমেশের চিংকার, সমস্ত বাড়িতে নীনতা আর ক্ষুদ্রতার একটা হাসরোধী পরিবেশ। শান্ত স্থির ধীরেন ভাবত, এখান থেকে আবার তার মেসে ফিরে যাওয়াই ভাল।

কিন্তু যেতে পারে নি শুধু তুম্বকার জ্বলে।

দীর্ঘ পাঁচ বছর-পরে বেশ স্পষ্ট রেখায় সে অস্থিতাব করেছে, তুম্বকারে সে ভালবাসে। যদি নতুন ক'রে আবার দেখা না হ'ত, তা হ'লে হয়তো অবচেতন মনের জিনিস অবচেতনাতেই তলিয়ে থাকত। হয়তো কখনও কখনও কোনও একটা ভাবানুযায় তুম্বকারে চকিতের জন্ত সামনে নিয়ে আসত, কিছুক্ষণ তন্নয় হয়ে ব'সে থাকত ধীরেন, যেমন ক'রে হঠাৎ-আসা এক ঝলক ফুলের গন্ধে একটুখানি নেশার কোঁক আসে। তারপরেই ভুলে যেত সব—যে নিশ্চেতনা থেকে এসেছিল, সেইখানই আবার তলিয়ে যেত তুম্বকা।

কিন্তু এখন আর সে হওয়ার উপায় নেই।

কৃষ্ণনগরের সেই প্রত্যেকটা দিনকে নতুন ক'রে খুঁজে পাচ্ছে। মনে পড়ে যাচ্ছে: কী অজুত লুভ চোখে সে তুম্বকার হাতের দিকে তাকিয়ে ছিল, উগ্র আকাজ্জা জেগেছিল, ওই হাতখানাকে সে মূঠোর মধ্যে টেনে নেয়। যেদিন ওরা চলে গেল বাড়ি খালি ক'রে দিয়ে, সেদিন নির্জন নদীর ধারে ব'সে জলের মধ্যে একটার পর একটা হুড়ি ছুঁড়ে দেওয়ার যন্ত্রণাও আবার নতুন ক'রে অস্থিতাব করল সে।

অথচ কী যে হয়েছে তুম্বকার, পারংপক্ষে যেন কাছেই আসতে চায় না ধীরেনের। ছু বোলা চা আর খাবার সাজিয়ে দিয়েই প্রায় ছুটে পালায় সামনে থেকে। অক্লিস যাওয়ার আগেই তুম্ব থেকে স্থলে ছোট্ট, ধীরেনের সামনে ভাত বেড়ে দেয় বাসন্তী। রাত্রে যখন সে খেতে বসে, তখন ঘরের ভেতর থেকে তুম্ব সেলাইয়ের কলের আওয়াজ পাওয়া যায়। এত কী সেলাই করে ও?

প্রমেশ অবশ্য চল্লিশ টাকার কথা ভোলে নি। বাড়িতে সকলের জ্বলেই পচা মাছ আর শুকনো ডাঁটা-চচ্চড়ির ব্যবস্থা, কিন্তু ধীরেনের জ্বলে নিজে হাতে ক'রে সে তরকারি তুলে দেয় বাগান থেকে। স্পেশাল মাছ আসে তার জ্বলে, বরাদ্দ হয় এক বাটি দুধের। বাসন্তীর যিকটি ছেলেমেয়েগুলো দূর থেকে সেই মাছ আর দুধের বাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। এক হাতে চোখের জল মুছে আর এক হাতে বাসন্তী তাদের কী ক'রে সামলায়, ধীরেন তা টেরও পায় না।

কাজেই খাওয়া-দাওয়ার দিক থেকে ধীরেন ভালই আছে। একলা একটা ঘরও পেয়েছে। হোক ভাঙাচুরো, মধ্যে মধ্যে দু-চারটে আরশোলা আর ইঁহুর এসে উৎপাত করুক, তবু বেশ আছে ধীরেন। একা একা জানলার ধারে চেয়ার টেনে নিয়ে অস্থিকারের মধ্যে চোখ ডুবিয়ে থাকার বিলাসিতাটা তার কাছে মূল্যবান।

শুধু তুম্বকাই কাছে আসে না। সেইটেই সব চেয়ে বড় অস্থিত তার।

একদিন দেখা হয়ে গেল রাস্তায়। বাড়ির কাছাকাছি।

দূর থেকেই ধীরেন দেখতে পেল, স্থল-ফেরত মস্থর গতিতে এগিয়ে আসছে তুম্বকা।

ধীরেনের চোখ চকিত হয়ে উঠল। বাড়িতে পা দিলেই আর পাওয়া যাবে না তাকে। সেই যে কোথায় সে পালিয়ে বসে থাকবে, মধ্যে মধ্যে এক-আধটা হৃদয় কণ্ঠস্বর আর এক-আধবার শাড়ির ঝলক ছাড়া তার অস্তিত্বের আর কোন পরিচয়ই পাবে না ধীরেন। ওই শাড়ির আঁচল দেখে তার চোখ জ্বালা করতে থাকে, ওই গলায় স্বর তার হৃৎপিণ্ডে ছুরির আঁচড় কাটতে থাকবে একটার পর একটা।

ধীরেন পা চালাল।

তরুকা টের পেয়েছিল। কিন্তু ধীরেনকে সে এড়িয়ে যেতে চাইল না। দু-একবার পেছন দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ধীরেন এসে পড়ল, হাঁপাচ্ছিল অল্প অল্প।

আজ এত তাড়াতাড়ি যে জ্বল থেকে? সাড়ে পাঁচটার আগে তো তুমি ফের না।

তরুকা স্নান গলায় বলল, হেঁটে আসি নি আজ। একজন টাচার রেলের গেটটা পর্যন্ত রিক্শা করে পৌঁছে দিলে।

ধীরেন বলল, আমার সৌভাগ্যই বলতে হবে।

তরুকা প্রশ্ন করল না। ধীরেনের কথাগুলো যেন আগে থেকেই সে জানে।

বাড়িতে ঢুকলে সেই যে তুমি দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়, আর তোমার পাত্তাই পাওয়া যায় না।—সুদূর অহুযোগ ফুটে বেরল ধীরেনের গলায়।

বাড়িতে অনেক কাজ ধীরেনদা। জানই তো।

ধীরেন বলল, না, জানি না। তবে এটুকু জানি, তুমি আমাকে এড়িয়ে চলতে চাও।

ছায়া ছায়া আলোর দুটো গভীর চোখ তরুকা ধীরেনের দিকে তুলে ধরল।

তোমাকে এড়িয়ে চলে আমার লাভ কী?

ধীরেন চকল গলায় বলল, তোমার কী লাভ সে তুমিই জান। কিন্তু আমার যে ক্ষতি হচ্ছে, সে আমি বুঝতে পারছি। তুমি তো জান—তোমার জন্মেই এ বাড়িতে আমি এসেছি। আর কোন আকর্ষণই আমার ছিল না।

তরুকা বলল, না এলেই পারতে ধীরেনদা।

ধীরেনের দু চোখ জ্বলে উঠল। কী বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তেমনি সময় পেছন থেকে হঠাৎ হঠাৎ করে রিক্শার আওয়াজ পাওয়া গেল।

পথ ছেড়ে দিয়ে সবে দাঁড়াল দুজনে। দেখল এক সঙ্গেই। রিক্শায় পরমেশ বসে।

তরুকা কাঁঠ হয়ে গেল, বিবর্ণ হয়ে গেল ধীরেন।

কিন্তু পরমেশ যেন দেখেও দেখতে পেল না। নির্বিকার মুখে সামনের দিকে তাকিয়ে বসে রইল রিক্শায়। যেন অপরিচিত দুজন মানুষকে দেখেছে—তাদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই।

হঠাৎ কেঁপে-ওঠা আবেগটা চূপসে ফাটা বেলুনের মত হয়ে গেল ধীরেনের।

ধীরেন নির্বোধের মত শক্তিত গলায় বলে ফেলল :
উনি কিছু মনে করলেন না তো?

মুখের ওপর জোর করে সাহসের হাসি টেনে এনে তরুকা বলল, না না, মনে করবেন কেন?

তবু একটা হৃৎস্পন্দ চোখের সামনে দেখা দিল ছায়া-মূর্তির মত। অন্ধ দানবিক ক্রোধে কড় কড় করে তরুকার চুলের মুঠি টেনে ধরেছে পরমেশ। কুৎসিত গর্জনে কদর্ঘ গালাগাল দিয়ে বলছে—হারামজাদী, রাস্তায় দাঁড়িয়ে বুঝি রসালাপ হচ্ছেল?

যেটা শুরু হয়েছিল, সেটা সারা হ'ল সঙ্গে সঙ্গেই। তরুকা আন্তে আন্তে ছাড়িয়ে চলে গেল ধীরেনকে—ধীরেন আর তার সঙ্গ ধরবার চেষ্টাও করল না।

আশ্চর্য, কিছুই ঘটল না সন্ধ্যায়। কিছুই না।

প্রতি মূহুর্তে যে অনিবার্ধের জন্মে আশঙ্কা করছিল তরুকা—তার কিছুই ঘটল না। পরমেশ সত্যিই কি তাদের দেখতে পায় নি? রিক্শা থেকে মাত্র দু হাত দূরে দাঁড়িয়ে ছিল তারা, তবু দেখতে পায় নি? একটা চোখে পাতলা ছানি পড়েছে তার, তাই বলে কি সত্যি সত্যিই অন্ধ হয়ে গেছে পরমেশ?

কলে সেলাই করতে গিয়ে বার বার হুতো কেটে যেতে লাগল তরুকার।

আর নিজের ঘরে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে ধীরেনও একটা কিছু প্রতীক্ষা করছিল। লণ্ঠনের স্নান আলো

জলছে একটা লোহার চেয়ারের ওপর। দেওয়ালের গায়ে
শ্রাওলার দাগগুলো একরাশ বিকৃত মুখের মত মনে হচ্ছে।

শ্রমোট গরমে মশার তীব্র গুঞ্জন বাজছে ঘরের ভেতর।
বাইরের অন্ধকারে জংলা বাগানটা শুকনু হয়ে দাঁড়িয়ে
রয়েছে—একটা পাতা পর্যন্ত নড়ছে না।

বাইরে কাশির শব্দ। পরমেশ।

ধীরেন সচকিত ভাবে উঠে বসল। সমস্ত ঘাড়
উৎকণ্ঠায় ঢঞ্চল হয়ে উঠেছে।

পরমেশ ঘরে ঢুকল। ধীরে ধীরে এসে বসল তক্তাপোশের
ওপর। ধীরেন কিছুক্ষণ ধরে অসহ প্রতীকার যন্ত্রণায়
নিঃশব্দ রক্তস্পন্দন শুনতে লাগল।

পরমেশ কথা কইল, একা চুপ ক'রে শুয়ে আছ যে?

ঘরে একটা কৃত্রিম স্নেহের আভাস। আরও শঙ্কিত
হ'ল ধীরেন।

এমনি।

শরীর খারাপ নাকি?

না না, সে সব কিছু নয়।

তবে কি বাড়ির জন্তে মন খারাপ? হবেই তো, সে
আর আশ্চর্য কী!—একটা বিড়ি ধরিয়ে পরমেশ বলল,
কতদিন বাপ-মা চাড়া হয়ে রয়েছ।

ধীরেন কেমন বিভ্রান্তি বোধ করতে লাগল। ঠিক
এই জিনিসটা সে আশা করে নি এখন। যা ডেবেছিল,
তার ঠিক বিপরীত ভূমিকায় অভিনয় করছে পরমেশ।

ধীরেন টোট ছোটো চোটে নিয়ে বসল, আপনি ডাববেন
না, আমি ভালই আছি।

ভাল আর আছ কোথায়?—পরমেশ একটা দীর্ঘশ্বাস
ফেলল : এ রকম একা একা কারুর ভাল লাগে?—পরমেশ
আর একবার কাশল : তুমুরও ভারি অসুস্থ। ও-ও তো
সন্ধ্যাবেলা এসে একটু-আধটু গল্প-গুজব করতে পারে
তোমার সঙ্গে।

ধীরেনের মনে হ'ল, যেন স্বপ্ন দেখছে।

ব'লে দেব তুমকে।—পরমেশ হাসল : আমার মনে
আছে—। একবার থেমে বসল, আমার মনে আছে
গোয়াড়ীতে সেই দু বছরের ভেতরই কত ভাব হয়েছিল
তোমাদের মধ্যে। মেয়েটা এমন এখন ক'রে বেড়ায় যেন
তোমাকে চেনেই না। অসুস্থ—ভারি অসুস্থ।

বোকার মত চেয়ে রইল ধীরেন। একটা কথাও
বলতে পারল না।

পরমেশ উঠে দাঁড়াল : আমি যাই—মেয়েটাকে পাঠিয়ে
দিই গে।

এতক্ষণে ধীরেনের যেন সন্ধিৎ ফিরে এল। এতক্ষণ সে
বুঝতে পারল, পরমেশ তাকে নিয়ে একটা নিষ্ঠুর কৌতুক
করছে না, সত্যিই সে তুমকাকে পাঠিয়ে দিতে
যাচ্ছে।

ধীরেন সন্ধ্যাে বসল, না, এখন দরকার নেই। আমি
একটু একাই থাকব।

তা বেশ।—পরমেশ সহজ ভাবেই নিলেন সবটা :
কখনও কখনও একা থাকতেও ভাল লাগে। কিন্তু তুমুর
এ সত্যিই অসুস্থ। ঘরের ছেলেকে এমনভাবে পর ক'রে
রাখা কি ঠিক?

নাটকীয় ভঙ্গিতে পরমেশ বেরিয়ে গেল।

ধীরেন হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল বোকার মত। নাটক
বটে—হুবোধ্য নাটক! আর সে নাটকে আরও হুবোধ্য
চরিত্র পরমেশের।

লঠনের ম্লান আলোয় হতাশ চোখে ধীরেন দেওয়ালের
দিকে চেয়ে রইল। শ্রাওলার কতকগুলো এলোমেলো রেখা
জোঁগে আছে দেওয়ালে—যেন একরাশ কদাকার মুখের
প্রতিকৃতি—যেন পরমেশের অন্ধকার আত্মার মধ্য থেকে
বেরিয়ে-আগা কতকগুলো বিকৃত প্রতিকৃতি।

ধীরেন একটা হতাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

রাত্রে আর ঘুম আসবে না।

ধীরেন উঠে বসল। সমস্ত সন্ধ্যা শ্রমোটের পর এখন
প্রাচণ্ড বৃষ্টি নেমেছে মাঝরাতে। বৃষ্টির ছাট আসছিল ঘরে,
ধীরেন জানলাটা বন্ধ ক'রে দিলে।

বাইরে অশ্রান্ত বর্ষণের শব্দ। জংলা আমের বাগানটার
ঝড়ের হাওয়া মাতলামি করছে। ছাদের একটা কোণা
দিয়ে জল চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে। ওইদিকে, হটকেসটা
ছিল, ধীরেন উঠে গিয়ে সেটাকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে
নিয়ে এল।

আজ রাত্রে তার ঘুম আসবে না। প্রথমতঃ তার ভয়
করছে। ক্রমাগত মনে হচ্ছে, এই পুরনো জীর্ণ বাড়িটা
এই বৃষ্টি আর বাতাসের ধাক্কায় বুঝি খানকয়েক ভাসের

মস্ত উড়ে যাবে চারদিকে। মাথার ওপর হয়ে-পড়া ফাট-ধরা ছাদটার নিকে তাকিয়ে ভরসা হচ্ছে না।

দ্বিতীয় কারণ, আজকে পরমেশ্বর বিচিত্র ভূমিকাটা। হঠাৎ তম্বুর সম্পর্কে কেন এত উদার হয়ে উঠল ভদ্রলোক? কোন উদ্দেশ্য নেই? শুধুই ঘরের ছেলে? আর কোন কথাই বলতে চায় না পরমেশ—একেবারে কিছুই নয়?

সন্ধ্যা থেকে এই প্রশ্নটারই উত্তর খুঁজছে সে।

দরজায় কিসের শব্দ? হাওয়া?

না, হাওয়া নয়। কেউ এসেছে।

আবার শব্দ-উঠল। লঠনটা বাড়িয়ে দিয়ে দরজা খুলল ধীরেন। তম্বুর।

তম্বুর, তুমি!

তম্বুরা বলল, বাবা-মা ঘুমিয়ে পড়েছেন, চোবের মত পালিয়ে এসেছি ঘর থেকে। ধরা পড়লে কী হবে সে কথা জানি না। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা ভাবছি ধীরেনদা। তুমি চ'লে যাও।

লঠনের আলোয় আশ্চর্য দেখাল তম্বুরাকে। অর্ধ কল্প আর সুন্দর মনে হ'ল তার মুখখানা। তম্বুরার শেষ কথাগুলো বুঝি ভাল ক'রে শুনতেও পেল না ধীরেন।

মাতালের মত জড়ানো গলায় ধীরেন বলল, আমি যাব না।

কী একটা আশঙ্কা ক'রে তম্বুরা দু পা পিছিয়ে গেল। বলল, পাগলামি ক'রো না ধীরেনদা। তোমাকে যেতে হবে এখান থেকে। কালই।

ধীরেনের ঠোঁট ছোটো নিঃশব্দে ন'ড়ে উঠল একবার।

কেন যে এ কথা বলছি সে তুমি বুঝবে না। আর তা না বোঝাই ভাল ধীরেনদা।—তম্বুরার চোখের কোণায় জল কাঁপতে লাগল : কিন্তু আর একদিনও তুমি থাকতে পারবে না এখানে—একদিনও না।

বেশ, চ'লে যাব।—ধীরেন বিহ্বল ভাবে বলল, কিন্তু যাওয়ার আগে প্রস্তাব করব তোমার বাবার কাছে। তিনি রাজী হবেন।

কিসের প্রস্তাব? কী রাজী হবেন?—তম্বুরা চমকে উঠল।

তোমাকে বিয়ে করার।

বিয়ে করার। হঠাৎ মর্মহেঁড়া ভীষ্ম যমুনা তম্বুরাকে হেসে উঠল : বাবাকে আজও তুমি চেন না। আমাকে বাবা কোনদিনই বিয়ে দেবেন না। তাঁর ভাষায়—তা হ'লে তাঁর এই শূন্যের পালকে ধাওয়াবে কে? আমার জীবনে বিয়ের বিলাসিতার কোন জায়গা নেই ধীরেনদা।

ধীরেন শুনতেও শুনল না। বাইরে ধরধার বৃষ্টি। এলোমেলো হাওয়া। ধীরেনের বুকের ভেতরেও সেই হাওয়া আর বৃষ্টির ধোলা চলতে লাগল।

পাঁচ বছর আগে যে আকাজক্ষা একবার মাথা তুলেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল, এবার সেটা সাপের মত ফণা তুলল। ধীরেন হাত চেপে ধরল তম্বুরার।

তোমাকে আমার পেতেই হবে তম্বুর। কোন বাধাই আমি মানব না।

আর তৎক্ষণাৎ ঘরে এসে ঢুকল পরমেশ।

নিঃশব্দে এসেছিল তম্বুরার পেছনে পেছনে। কিন্তু এতক্ষণ ঘরে ঢোকে নি। যেন এই স্ত্র্যাগটারই অপেক্ষায় ছিল সে।

দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে পরমেশ। পালানোর পথ বন্ধ। একটা চাপা চিংকার ক'রে তম্বুরা দেওয়ালের একদিকে ন'রে গেল। কাঠের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল ধীরেন।

আশ্চর্য, এবারেও সেই বিচিত্র ভূমিকা পরমেশের। চিংকার ক'রে উঠল না, একটা ক্রম মূষ্টি হানল না তম্বুরাকে লক্ষ্য ক'রে। মুখের ওপর আশ্চর্য এক বলক হাসি টেনে এনে বলল, তোমরা গল্প করছিলে? তা কর—তা কর। তোমরা বাড়ির ছেলেমেয়ে, একটু-আধটু গল্পগুজব করবে এ আর বেশী কথা কা!

তম্বুরার চোখের তারা ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল। অল্প অল্প কাঁপতে লাগল ধীরেন। মনের মধ্যে একটা জিজ্ঞাসা পাক দিয়ে দিয়ে উঠতে লাগল : কার মাথা ধারাপ হয়ে গেছে—তার, না, পরমেশের? এই রাত সাড়ে এগারোটায় তম্বুরা যখন এ-ভাবে তার ঘরে এসেছে—

পরমেশ আবার বলল, যে জন্তে এসেছিলাম। হঠাৎ বিশেষ দরকার প'ড়ে গেল একটা। কাল নকালেই কুড়িটা টাকা দিতে হবে একজনকে। তোমার কাছে হবে ধীরেন?

ধীরেন নড়তে পারল না।

পরমেশ আবার বলল, খুব যদি অসুবিধে তোমার না থাকে—

অসামান্য শক্তিতে ধীরেন আশ্বস্ত হ'ল।

দিচ্ছি।

বালিশের তলা থেকে দুখানা নোট সে এগিয়ে দিল পরমেশের দিকে।

পরমেশ নোট নিল হাত বাড়িয়ে। অভ্যাসমত একবার আলোর দিকে তুলে পরীক্ষা করল সে ছোটো। তারপর বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, আচ্ছা, তোমরা গল্প-টল্প কর।

হাওয়ার মুখে ভেজিয়ে দিয়ে গেল দরজাটা। যেন প্রহসনের বাকিটুকুও সম্পূর্ণ করে দিয়ে গেল।

এতক্ষণ পরে তরুকার কথা ফুটল। মুখ থেকে সমস্ত রক্ত স'রে গেল তার।

তুমি এর পরেও থাকবে ধীরেনদা, এর পরেও ?—
তরুকার স্বরে বিন্দু বিন্দু রক্তের মত স্বর্ণাণী ঝ'রে পড়তে লাগল : জ্ঞান, ও কুড়িটা টাকা তুমি কেন দিলে ? জ্ঞান ও কিসের দাম ?

বাইরে একটা বাজ পড়ল। কিন্তু তার চাইতেও বড় বাজ পড়ল ধীরেনের বুকে। পরমেশের এই ঔদার্য, তরুকা সম্পর্কে তার এই অবাধ্য প্রশ্ন, এই রাতের এই নাটক— এদের একটিমাত্র মানে আছে। একটি মাত্রই।

হিঃ হিঃ, তরুকার এত বড় অপমানের নিমিত্ত হবে সে ? তরুকাকে সে ভালবাসে, কিন্তু সে ভালবাসার নৈবেদ্য দিনের পর দিন সে উৎসর্গ করবে কোন্ লোলুপতা, কোন্ কলনাতীত কদম্বতার পায়ে ?

মড়ার মত বিবর্ণ মুখে ধীরেন বলল, আমি যাচ্ছি—
এখনি চ'লে যাচ্ছি।

জামাটা গায়ে গলিয়ে নিতে সময় লাগল না। বর্ষাতিটা কাঁধে ফেলল ধীরেন। বিছানা তুলে নেবার সময় ছিল না, প্রবৃত্তিও না। শুধু স্টকেসটা উঠিয়ে নিয়ে ধীরেন বলল, আমি-বাই।

দেওয়ালে ঠেস দিয়ে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল তরুকা। কথা বলল না। শুধু জল গড়াতে লাগল চোখ দিয়ে। বাইরের বারান্দার দিকে দরজা ছিল একটা। সেইটে খুলে

বেরিয়ে গেল ধীরেন। বেরিয়ে গেল অঝোর বৃষ্টির মধ্যে।

ঝড়ো হাওয়ার ক্যাপামি চারদিকে। কেরোসিন ল্যাম্পগুলো নিবে গেছে। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে অন্ধকারেই এগিয়ে চলেছিল ধীরেন। বর্ষাতিটা খোলবার মত উজ্জ্বল পর্দা তার ছিল না।

ধীরেনদা।

দূর থেকে একটা আর্ত আহ্বান আবার ভেসে এল :
ধীরেনদা।

ধীরেন দাঁড়িয়ে পড়ল। বৃষ্টিতে চশমার কাচ আচ্ছন্ন। অন্ধের মত চোখ মেলে ঝড়ের প্রেতের মত দাঁড়িয়ে রইল সে।

তরুকা ছুটে এসেছে। একবারের বিদ্রোহ-ঝলকে ধীরেন অপরিচিত মূর্তি দেখতে পেল একটা। সেই ঘন নিবিড় কালো চুলগুলো ঝড়ো হাওয়ায় উড়ছে—দু চোখেও বিদ্রোহ জ্বলছে তরুকার।

তরুকা পাশে এসে দাঁড়াল। বৃষ্টি আর বাতাসের মধ্যেও তার স্বর শোনা গেল : আমিও যাব ধীরেনদা। আমাকে নিয়ে চল।

তুমি।

কি করব ? আজ একজন ধীরেন যাবে, কাল আর একজন ধীরেন আসবে। সবাই আমাকে ভালবাসবে না, সবাই আমাকে শ্রদ্ধা করবে না। কুড়ি টাকার স্বর্ণ তারা উত্তল ক'রে নেবে হাতে হাতে। তুমি কি সেই অপমানের মধ্যে আমাকে ফেলে যেতে চাও ধীরেনদা, সেই মানির মধ্যে তুলিয়ে দিতে চাও আমাকে ?

মুহূর্তের ক্ষণে চুপ করে রইল ধীরেন।

তারপর, সেই বৃষ্টি আর হাওয়ার মধ্যে, এই প্রথম আত্মবিশ্বাস আর শক্তি দিয়ে সে তরুকার হাত চেপে ধরল। না। কিছুতেই না। নিজের রেডিয়াম ডায়াল ঘড়িটার ওপর থেকে বৃষ্টির জল পান্ডাবিতে মুছে নিয়ে ধীরেন বলল, কিছুতেই না। একটু যদি পা চালিয়ে চল তরু, তা হ'লে রাত বারোটার কলকাতার ট্রেনটা আমরা ধরতে পারি এখনও।

লেখক ও পাঠক

শিবনারায়ণ রায়

অভিমানবশে ভবভূতি লিখেছিলেন, পৃথিবী বিপুল এবং কাল নিরবধি। অর্থাৎ তাঁর দেশকালে যদি সন্দেহ পাঠক না মেলে তিনি বয়ঃ অপেক্ষা করবেন দূর দেশ এবং ভবিষ্যৎ কালের জন্যে, তবু সমকালীন ইতরজনের বাহবা পাবার জন্যে নিজের লেখাকে খেলো হতে দেবেন না। তাঁর প্রতিশ্রুতি তিনি ভঙ্গ করেন নি; সংস্কৃতাহুরাগী পাঠকদের চোখে তাঁর স্থান তাই কালিদাসের পাশে।

ভবভূতির এ উক্তি মধ্য সভ্য দেশকালের অধিকাংশ সংলেখকের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। সংলেখক মাত্রই অবশ্য ভিতরকার তাগিদে লিখে থাকেন; যা তিনি লেখেন তা না লিখে তাঁর শাস্তি নেই; লেখার মধ্যেই তাঁর মুক্তি। তবু এ কথাও সত্যি যে, শুধু লিখে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন না; সে লেখা অন্তরে গোচরে আনার তাগিদও তাঁর মধ্যে সক্রিয়; শুধু গোচরে আনা নয়, তাঁর স্বকীয় অভিজ্ঞতাকে অন্তরে সঞ্চারিত করতে পারলে তবেই তিনি সুখী। স্বরকার কিংবা চিত্রশিল্পী হয়তো একেবারে অপরনিরপেক্ষ হতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যিকের পক্ষে এ বিমুক্ততা অকল্পনীয়। তার প্রধান কারণ সাহিত্যের মাধ্যম হ'ল ভাষা আর ভাষার প্রকৃতিই পরোক্ষ। ফলে পাঠক-বিষয়ে চেতনা সংলেখকের রচনাতেই কম বেশী প্রভাব ফেলে থাকে। এ প্রভাব হোমার বায়ীকি হতে শুরু করে শেক্সপীয়র কি রবি ঠাকুর কেউই এড়াতে পারেন নি। রবীন্দ্র এবং বিলকে-কেও তাঁদের কবিতা অপরবোধ্য ভাষায় লিখতে হয়েছে; এমন কি লীমতী সিমরন ও বোভোয়ার ম্যাগারিনরাও এ প্রভাবের অনতিক্রমতা অস্বীকারে অকৃতকাম।

তবে ভবভূতির অভিমানোক্তির যথার্থ্য কোথায়?

যথার্থ্য এইখানে যে, যদিও কোন সংলেখকই পাঠকের প্রভাব সম্পূর্ণ এড়াতে পারেন না, তবু সংলেখক সং পাঠকের জন্যে অপেক্ষা করতে পারেন। অর্থাৎ তাঁর দেশে তাঁর কালে যদি মনের মত পাঠক নাও জোটে, তবু বেকারুক্ষদের তারিফের লোভে তিনি তাঁর বক্তব্য বা বাচনভঙ্গী বদলাতে চান না, কল্পনা করে নেন এমন যুগকাল যখন তাঁর লেখার যথার্থ সমঝদারেরা তাঁর

এই অপেক্ষা করার দায় স্বয়ং আসলে পুষিয়ে দেবে। অথবা যেটা আরো সচরাচর দেখা যায়, তিনি সংখ্যা-গরিষ্ঠ ইতরসাধারণের মনোরঞ্জন চেষ্টা না করে তাঁর সমকালীন স্বল্পসংখ্যক বিদগ্ধ জনের কথা স্মরণে রেখে সাহিত্য রচনা করেন। তাতে গণপতির চরিত্র তাঁকে যদি উচ্চপালে ব'লে বিদ্রূপ করে তা তাঁর নয়, কিন্তু অরসিকদের দাবীর কাছে নিজের কল্পনাকে খাটো করতে তিনি একেবারেই নারাজ। ফলতঃ সংলেখক সন্দেহসন্দেহসন্দেহ হতে পারলেই চরিতার্থ; তার ওপরে যদি তিনি সর্বসন্দেহসন্দেহ হতে পারেন, সেটা তাঁর হিসেবের উপরিপাওনা।

কিন্তু এ অভিমানের বিপদ আছে। লেখকের দিক হতেও বটে, পাঠকের দিক হতে তো বটেই। কিন্তু লেখক এবং পাঠকের অনেক সময়ে সে কথা স্মরণে থাকে না। তাই সে কথা আলোচনা করা দরকার।

প্রথমতঃ, সাহিত্যিক মাত্রেরই উপজীব্য হচ্ছে মানুষ—মানুষের স্বর্গ-দুঃখ, ভাবনা-কল্পনা, ক্রিয়া-কলাপ, অহুত্ব-অভিজ্ঞতার উপাদান ছাড়া সাহিত্যে সৃষ্টি সম্ভব নয়। তন লিখেছেন, “কোন মানুষই দ্বীপ নয়, প্রতি মানুষই মহাসাগরের একটা অংশ; সমুদ্র যদি একদলা মাটিও ধুয়ে নিয়ে যায় তবে ইউরোপ ততটুকু ক্ষুদ্রতর হয়ে আসে...আমি মানবজাতির সঙ্গে জড়িত।” এগুলি সাহিত্যিকের কথা। এখন অধিকাংশ পাঠক ইতর-সাধারণ ব'লে সংলেখক যদি তাদের দিক হতে মুখ ফেরান, তবে মানবজাতির সঙ্গে তাঁর সংযোগ যে সন্ধীর্ণ এবং ছর্ব্বলতর হয়ে আসবে এ আশঙ্কা অযৌক্তিক নয়। তিনি যতই আত্মবিশ্লেষণ বা আত্মোপলব্ধির দ্বারা এ অভাব পূরণ করার চেষ্টা করুন না কেন, তাঁর পক্ষে মানবীয় সত্যের বিচিত্র রূপটির সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠবে। তাঁর উপজীব্য অভিজ্ঞতায় ব্যাপ্তি এবং বহুমুখীনতা কমে আসবে; তাঁর উন্মুখ জীবন-জিজ্ঞাসা অভিমানী আদর্শের আওতায় ক্রমেই শীর্ণতর হবে; এবং এ কথাও বস্তুকল্পনা নয় যে, অবশেষে তিনি জীবনের চাহিতে প্রতীককে বড় ঠাউরে ভাষা প্রয়োগে

নিপুণতা অর্জনের মধ্যেই সাহিত্যিক চরিতার্থতা সন্ধান করবেন। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, শব্দ প্রয়োগের নিপুণতার দ্বারাই ভাষা সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ সহজ কথাটিও স্মরণে রাখা দরকার যে, ভাষা মাধ্যম মাত্র, তার নিজস্ব কোন মূল্য নেই, তার দ্বারা মানুষ আপন আপন অমূল্য-অভিজ্ঞতাকে সাধারণবোধ্য রূপ দিতে এবং ফলে পরস্পরের গোচর করতে পারে বলেই তা মূল্যবান। সাহিত্যিক এই সহজ কথাটি ভুলে যখন সমাজের 'পরে অভিমান' করে শুধু রীতিপ্রকরণের চর্চাকেই সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য করে তুলতে চান, তখনই সাহিত্যের একেবারে গোড়াতে কোপ পড়ে।

গ্রীকসভ্যতার পতনের পর বৈজ্ঞানিক আলোকায়নের এই সহজ কথাটি ভুলেছিলেন; সেদিন তাঁদের সাহিত্যাদর্শে অল্পপ্রেরিত হয়ে যা কিছু রচিত হয়েছিল তার মধ্যে বিশ্বয়কর শব্দচাতুর্য ছিল, কিন্তু মানবীয় বক্তব্য ছিল অতি সামান্য। উনিশ শতকের মাঝামাঝি ফ্রান্সে যে প্রতীকবাদী সাহিত্যাদর্শ প্রবল হয়ে ওঠে তার মধ্যেও আমরা এই জীবনবিমুখতা দেখতে পাই, এবং যদিও সেই আন্দোলনের ফলে ফরাসী সাহিত্যের, বিশেষ করে কাব্য-সাহিত্যের, কলাকৌশলে বিশেষ বিশেষ দিক হতে লক্ষণীয় উন্নতি সাধিত হয়েছিল, তবু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে তারি সঙ্গে সঙ্গে ও-সাহিত্যের প্রাণধারা শীর্ণ হয়ে আসে। উনিশ শতকের শেষভাগ এবং বিশ শতকের গোড়ার দিককার ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে দিদেরো-ভালজাক-স্টান্দালের রচনার তুলনা করলে এ শীর্ণতার হেতু বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। ফলতঃ সংলেখকের সঙ্গে সাধারণ পাঠকের অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ জনের মানসিক ব্যবধান যত বৃদ্ধি পায় ততই লেখকের ভাবনা-কল্পনা মানবজাতির সঙ্গে সংযোগের কথা ভুলে এক ধারে আত্মকেন্দ্রিক, অন্য ধারে প্রকরণপ্রধান হয়ে ওঠে। তাঁর কল্পনার প্রাণশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে, তাঁর রচনায় শূন্যগর্ততা, পুনরাবৃত্তি এবং আত্মপ্রবন্ধনা একে একে প্রকট হয়ে ওঠে। তাঁর বক্তব্য যত কমে, তাঁর বলার ঢঙ তত প্যাচালো, তাঁর বাক্যগঠন তত জটিল, তাঁর শব্দপ্রয়োগ তত অশুদ্ধ হয়ে ওঠে। তখন যে শুধু ইতরজনেরাই তাঁর লেখা দেখে ভয় পায় তা নয়, রসিকজনদের পক্ষেও সে লেখা

সম্ভোগ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। পটুই, অধ্যবসায় এবং আদর্শনিষ্ঠা সত্ত্বেও তিনি লেখক হিসেবে সার্থক হয়ে উঠতে পারেন না। যেহেতু তিনি বস্তুতঃই সংলেখক, তাঁর রচনায় অবশ্য বহু সম্পদ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে; পরবর্তী লেখকেরা হয়তো তা হতে অনেক মূল্যবান শিক্ষা এবং উপাদান সংগ্রহ করেন; তবু সে রচনা প্রাণবান সমগ্রতার সঙ্গমসঙ্গমসম্বাদী হয়ে ওঠে না। মহৎ সাহিত্য-প্রতিভার এবিধ ট্রাজিক অপচয়ের দুটি প্রামাণিক উদাহরণ জেমস জয়েসের শেষ রচনা ফিনেগান্স ওয়েক এবং এঞ্জো পাউণ্ডের অসমাপ্ত মহাকাব্য "মর্গমালা" বা ক্যাটোস।

দ্বিতীয়তঃ, যে লেখক সচেতনভাবে স্বল্পসংখ্যক অধিকারী পাঠকের জন্য লেখেন, মানবজাতির প্রতি তাঁর মনোভাবের মধ্যে কিছুটা অশ্রদ্ধা থাকা স্বাভাবিক। এই অশ্রদ্ধার সঙ্গে যখন লেখক হিসেবে ব্যাপক স্বীকৃতি না পাওয়ার তিক্ততা এসে মেশে, তখন যদি তাঁর বিচার-বিবেচনায় ঐদার্যের অভাব ঘটে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তখন মানুষের দোষত্রুটি নিয়ে ব্যঙ্গ করার প্রলোভন তাঁর মনে বিশেষ প্রবল হয়ে দেখা দেয়; ভাল মন্দ সব কিছু মিশিয়ে মানুষের সমগ্র অস্তিত্ব বিষয়ে সাহিত্যিকের যে সহজাত কৌতুহল, তাঁর মনে সেটি ক্ষীণ হয়ে আসে; সাধারণ মানুষের আত্মীয়তা অর্জন করতে না পারার ফলে তিনি ক্রমেই মানুষকে ভালবাসার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন; যা বিকৃত এবং অস্বাভাবিক তাই শুধু তাঁকে আকৃষ্ট করে; এক ধারে তিনি হয়ে ওঠেন উৎকেন্দ্রিক, অন্য ধারে সংনাস্তিক। এ অবস্থায় শুধু যে সাহিত্যিকের অভিজ্ঞতার জগৎ ব্যাপ্তিতে এবং বৈচিত্র্যে সঙ্গীর্ণতর হয়ে আসে তা নয়, সে অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন এবং উপস্থাপনেও সঙ্গীর্ণ-বুদ্ধির ক্ষতিকর প্রভাব প্রকট হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, এ মনোভাব কোন সাহিত্যিকের পক্ষে কল্যাণকর নয়। কেন না, যে আনন্দ সাহিত্যিকের সৃষ্টিতে ছন্দের সঞ্চারণ করে, এ মনোভাব স্বভাবতঃই তার প্রতিবন্ধক। তা ছাড়া এ মনোভাবের ফলে সাহিত্যিকের জীবনজিজ্ঞাসা পদে পদে ব্যাহত হতে বাধ্য। তাঁর কল্পনার কৌতুকসরসতাও এর ফলে ক্ষীণ হয়ে আসে। এ মনোভাব হতে যে সাহিত্য জন্ম নেয়, বিদগ্ধ পাঠকের পক্ষেও তাকে স্বাগত করা কঠিন।

কারণ সে সাহিত্য পাঠকমনেও যে ঐ-জাতীয় আশ্ব-সঙ্কোচনশীল মনোভাব সংক্রামিত করতে পারে, এ আশঙ্কা নিশ্চয়ই অমূলক নয়।

এ পর্বস্ত আমরা লেখকের বিপদের কথা আলোচনা করেছি। কিন্তু সৎ লেখকের সঙ্গে পাঠকের বর্ধিত ব্যবধানের ফলে শেখোস্তের ক্ষতির সম্ভাবনা আরও বেশী। লেখক স্বজনসামর্থ্যে ক্ষতিকেও ফলপ্রসূ ক'রে তুলতে পারেন; মনোজগতের কোন সঙ্কটই তাঁর পক্ষে একেবারে অনতিক্রম্য নয়। ফলে যে সব বিপদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে শক্তিশালী লেখকের পক্ষে তার কোনটিই অবশ্যসম্ভাবী বলা চলে না। সমকালীন অনাস্বীয়তার রানি নব্বোও তিনি মনের ভারসাম্য এবং উন্মুক্ততা নাও হারাতে পারেন; সৃষ্টির দুর্লভ আনন্দ তাঁর কল্পনাকে নিত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থাতেও সরস রাখতে পারে। মনভেনের মানসিক নিঃসঙ্গতার কথা কে না জানে? অথচ পশ্চিম ইউরোপের সাহিত্যে এই স্থিতধী মানুষটির কোঁতুক-প্রোজ্জ্বল প্রবন্ধাবলীর তুলনা আজও মেলা কঠিন। গয়টেকে আপনজন ব'লে জার্মানী কোন দিনই গ্রহণ করতে পারে নি। তাতে জার্মান জাতির অপরিমেয় ক্ষতি হয়েছে—সে ক্ষতি যে কত বড় সে দেশের অধিকাংশ স্ত্রীপুরুষ আজও তা বুঝতে শিখল না—কিন্তু তার ফলে গয়টের মানবতাবাদী প্রত্যয় এবং জীবনজিজ্ঞাসা এতটুকু শিখিল কি অবসাদগ্রস্ত হয় নি। সাহিত্যিক শিল্পী, স্রষ্টা; তিনি সেই দুর্লভ ক্ষমতার অধিকারী যার বীজ নৈঃসঙ্গ্যের বক্ষ্যাক্রমিতেও ফসল ফলাতে পারে। তাই স্বদেশত্যাগী জয়েসের পক্ষে ইউলিসিসের মত এপিক উপন্যাস লেখা সম্ভব হয়েছিল; বুলেভার হাউজ্‌মান-এর জ্ঞানলাবদ্ধ কর্কমোড়া ঘরে জীবন কাটিয়েও প্রস্তুত এ যুগের শ্রেষ্ঠ ফরাসী উপন্যাস লিখতে পেরেছিলেন; জার্মানী ছাড়তে বাধ্য হয়েও টমাস মান কলম ছাড়েন নি; ডক্টর ফাউস্টাসের কাহিনীতে জার্মান সভ্যতার ট্রাজেডির মহত্তম বিবরণ লিপিবদ্ধ ক'রে গিয়েছেন।

সাধারণ পাঠক সে ক্ষমতার অধিকারী নন। সৎ লেখকের মনোজগতে যদি তিনি প্রবেশ করতে অসমর্থ হন, তবে তাঁর যে লোকসান তা পূরণ করা তাঁর সাধ্যের বাইরে। সাহিত্য আমাদের অহুভূতিকে সূক্ষ্মতর করে, আমাদের বোধে গভীরতা আনে, আমাদের বুদ্ধির পরিশীলন

ঘটায়, আমাদের বিচিত্র এবং অনেক সময়ে পরস্পরবিরোধী চিন্তাবৃত্তির মধ্যে সঙ্গতি আনে, অভ্যাসের আড়ন্ত সঙ্গীর্ণতা দূর ক'রে মনুষ্যত্বের অমিত সম্ভাবনা বিষয়ে আমাদের জাগ্রত ক'রে তোলে। সাহিত্যপাঠে আমাদের মন সরস হয়, আমাদের বিচারে ঐক্যের সঞ্চার ঘটে, আমরা সব দেশের সব কালের মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনের শক্তি অর্জন করি। সব চাইতে বড় কথা, সাহিত্যসম্ভোগের মধ্য দিয়ে আমরা কিছুমাত্র সাহিত্যিকের স্বজন-অভিজ্ঞতার স্বাদ পাই; এবং যেহেতু স্বজনের মধ্যেই মানুষের মুক্তি, সে কারণে মানুষের জীবনে এ অভিজ্ঞতা অমূল্য। তাই সাহিত্যের এই দুর্লভ সম্পদে যে মানুষ অংশীদার হতে পারল না, তাকে নিত্যন্ত হতভাগ্য বলা ছাড়া উপায় দেখি না।

এখন সব লেখকই কিছু আর এ-জাতীয় সম্পদ সৃষ্টি করতে পারেন না। ধারা পারেন, তাঁরাই সৎ লেখক। কিন্তু তাঁরা ছাড়াও আরও বহু লোক লিখে থাকেন—সংখ্যায় এঁরাই চিরকাল গরিষ্ঠ—এবং মনের দিক হতে এঁরা সাধারণ পাঠকদেরই স্তরের মানুষ। সাধারণ পাঠক এবং সমকালীন সৎ লেখকদের মধ্যে যখন মানসিক ব্যবধান বৃহৎ হয়ে দেখা দেয়, তখন এই ইতর লেখকদের পোয়া-বারো; সৎ লেখকেরা অভিমান বশে যতই সাধারণ পাঠক হতে মুখ ফেরান, সাধারণ পাঠকেরা ততই এই ইতর লেখকদের খপ্পরে পড়েন। কিন্তু এ লেখকদের কাছ হতে তাঁরা না পান কোন গভীরতর জীবনবোধ, না কোন বিকাশশীল সংগতির ইঙ্গিত, না কোন স্বজনধর্মী মুক্তির আশ্বাদ। এঁদের দোঁড় ধরতাই বুলি পর্বস্ত। যে নিজে ভাবে মি সে অন্যকে ভাবাবে কি ক'রে; যে নিজে ধনী নয় অন্যকে সে কি সম্পদের অংশ দেবে? এ-জাতীয় লেখক শুধু সাময়িক বাহবা লুটে এবং সে বাহবা ভাঙিয়ে কিছু স্বাচ্ছন্দ্য রোজগার করতে পারলেই ধনী। এঁদের আবেদন সাধারণ পাঠকদের অভ্যাসাত্মীয় গড্ডল-বৃত্তির কাছে; তাদের অপরিণত বুদ্ধি, অন্ধ সংস্কার, সঙ্গীর্ণ বিচার, স্থূল অহুভূতি, মোহাচ্ছন্ন আশা-আকাজ্জা, বোধ জাভ্যাকে ভাঙিয়ে এঁদের কারবার। এঁরা পাঠকের বিকাশে সাহায্য করেনই না; বরং এঁদের ব্যাপক প্রভাবের ফলে সে বিকাশের সম্ভাবনা পর্বস্ত দীর্ঘকালের মত রুদ্ধ এবং

বিকৃত হবার আশঙ্কা আছে। শুধু তাই নয়, এদের প্রভাবের ফলে যে পাঠকবৃদ্ধি গড়ে ওঠে তার টানে অনেক ষথার্থ ক্ষমতাবান সাহিত্যিক পর্বস্ত স্বমার্গচ্যুত হতে পারেন। বিশেষ করে আধুনিক কালে যখন অধিকাংশ লেখক জীবিকাসংস্থানের জন্ত সাধারণ পাঠকের পৃষ্ঠপোষণার পুরে নির্ভর করেন, তখন এ জাতীয় পদস্থলন সং সাহিত্যিকের পক্ষেও একেবারে অসম্ভব বলা চলে না। সে স্থলন শুধু যে ঐ বিশেষ বিশেষ সাহিত্যিকের পক্ষেই মারাত্মক তা নয়, সে স্থলন সমস্ত মানবসমাজের পক্ষেই মারাত্মক। কারণ যতক্ষণ সং লেখক তাঁর স্বধর্ম প্রতিনিধিত্ব আছেন, ততক্ষণ পর্বস্ত সাধারণ পাঠকের কচিবিকৃতিকে সাময়িক সঙ্কট মনে করে তা হতে উদ্ধারের আশা আমরা পোষণ করতে পারি। কিন্তু সং লেখকও যদি মায়ুষের সম্ভাবনায় আসে

হারান, তবে আর কোন্ খুটির জোরে আমরা সে প্রত্যয় টিকিয়ে রাখব?

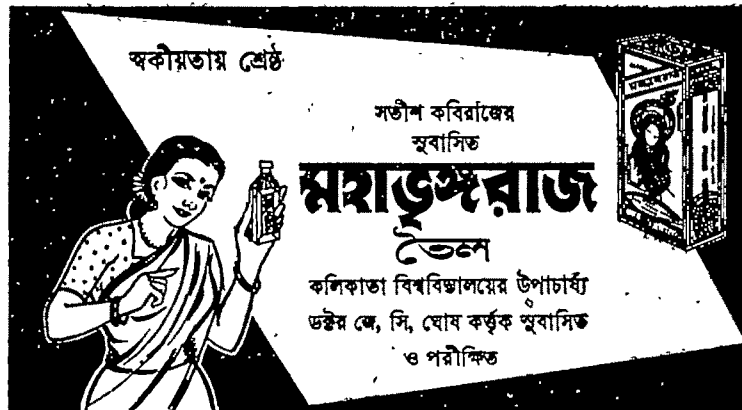
আধুনিক কালে কমবেশী প্রায় সব দেশেই সং লেখক এবং সাধারণ পাঠকের মধ্যে এই বুদ্ধিশীল ব্যবধানের সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে। বাংলা দেশেও এ সমস্যা অতুপস্থিত নয়। এ সমস্যার মূল স্বদূরপ্রসারী; সে আলোচনা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের অপেক্ষা রাখে। তবে এর কারণ যাই হোক না কেন, এ যুগের লেখক এবং পাঠক উভয়েরই ভাগ্য এ সমস্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাঁরা যদি এ সমস্যার বিষয়ে এখনও অবহিত না হন এবং তার সমাধানের জন্ত অবিলম্বে চেষ্টা শুরু না করেন, তা হ'লে সাম্প্রতিক সংস্কৃতি-সঙ্কট যে ক্রমেই দুরতিক্রম্য হয়ে উঠবে তাতে সন্দেহ নেই।

অকীয়তায় প্রেষ্ঠ

সতীশ কবিরাজের
সুবাদিত

মহাভূদ্ররাজ
তৈল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য
ডক্টর জে. সি. ঘোষ কর্তৃক সুবাদিত
ও পরীক্ষিত



আর্য্য ঔষধালয়ের মহাভূদ্ররাজ
তৈলের আয়ুর্বেদীয় শাস্ত্রমতে ৩০
খাঁটি উপাদানে প্রস্তুত প্রণালীতে
সজ্জ হওয়ার ইহার অশ্রুতিক মূল
গন্ধ দূর করার জন্ত কয়েকটি নির্দোষ
স্বগন্ধ দ্রব্য আমার পরামর্জনে
মিশ্রিত হইয়াছে।—ডে. সি. ঘোষ

**আর্য্য
ঔষধালয়**

(ঢাকা)

৬১ বি, থিয়েটার রোড,
কলিকাতা-১৭

এক পাখি

দিনেশ দাস

[‘এক পাখি’ কবিতাটির উৎস হল : আমার একটি পোষা টিয়া ছিল, সেটা হঠাৎ উড়ে গেল খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে। যে টিয়া সর্বদাই পোষা বুলি বলত, উড়ে বাবার সময় কিন্তু তার নিজের সহজ সরল ডাকই ডাকল। তখন মনে হ’ল, রবীন্দ্রনাথের খাঁচার পাখি ও বনের পাখি— “হুই পাখি” আসলে “এক পাখি”—একটাই। অর্থাৎ এই বিভাগই বনে গেলে বনবোঁড়াল হয়। অর্থাৎ আমার ‘আমি একটাই’, কখনো “কাঁচ-আমি,” কখনো বা “পাকা-আমি”।]

একাকী

আমার টিয়াপাখি,

সবুজ পাতার মত দিনরাত নড়েচড়ে লোহার খাঁচায়।

বনের কাকলি ভুলে গিয়ে,

পোষাবুলি বলে যোজ্ঞ ধান-ছোলা চায়।

আমার খাঁচার পাখি হঠাৎ পেয়েছে ছাড়া

একটি নিমিষে

উড়ে বসে উচু কানিসে,

আমার শেখানো বুলি বেড়ে ফেলে, এ কেমন ধার

কথা কয়, কথা কয় আকাশের উদার অবাধ নীল স্বরে,

হৃপ্তির মেছোবক সন্ধ্যার বলাকা হয়ে উড়ে গেল দূরে।

বনের একটি ছেঁড়া পাতা

ঝড়ে উড়ে এসেছিল, এতদিন ছিল চোখ বুজে :

সে আবার কিরে গেল

হাওয়া হয়ে মিশে গেল অরণ্যের অনন্ত সবুজে।

হলাম অবাধ

কণ্ঠে তার বনের সবুজ গান আকাশের ডাক।

শুধু চেয়ে থাকি,

কখন খাঁচার টিয়া হয়েছে বনের টিয়াপাখি।

বাণীসাধনার পুরস্কার

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

তখন কিশোর বয়স, বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা ছাড়ব ছাড়ব করছি। উৎসাহের প্রাবল্যে বাংলার কৃষকদের ঋণভার ও সেই সংক্রান্ত আইনকাহন নিয়ে একটি পুস্তিকা ছাপিয়ে ফেলেছি। তাতে বিলেতের কিছু নজীর ছিল। তার এক অংশ সম্বন্ধে আমার কোনও এক অধ্যাপক কিছু সংশয় প্রকাশ করায় সালিসী মেনে বদলুম একেবারে কেন্স সাহেবকে। অভাবনীয় সৌভাগ্যবশে কেন্স সাহেবের চিঠি পেলুম। আমার মতের স্বপক্ষে তিনি স্বয়ং তো দিলেনই, উপরন্তু তার সম্পাদিত ইকনমিক জার্নালের পরবর্তী সংখ্যায় একটি সুন্দর সমালোচনাও করলেন। খুশিতে ভগ্নমগ্ন অবস্থা। এমন সময় আমাদের স্বল্পপরিচিত একজন মুনসেফ এসে ওই পুস্তিকা একখানি উপহার চাইলেন। শুধু উপহার নয়, তাঁর নামে উপহার লিখে স্বাক্ষর করে দিতে হবে। তৎক্ষণাৎ রাজী। মনটা আনন্দে ফুলে উঠল। বাণীসাধনার এই তো পুরস্কার। আমার রচনা সম্বন্ধীয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেয়েছে তা হ’লে।

দু-তিন মাস পরের কথা। প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। কলেজের রেলিঙে কিরিওয়ালারা পুরনো বইয়ের মালা টাঙিয়েছে। হঠাৎ নজরে পড়ল, সেই মালার মধ্যে আমার ওই পুস্তিকা একখানি রয়েছে। কোতুলী হয়ে পাতা উলটে দেখতেই দেখি, সেই বইটি— আমার স্বাক্ষর-সম্বলিত উপহারের প্রথম পাতাটাও অক্ষত রয়েছে।

পুঁথো দাম দিয়ে সেই বইটিই আবার কিনে নিয়ে এসে সম্বন্ধে তুলে রেখে দিলাম। বাণীসাধনার পুরস্কার।

২। কদিন হ’ল জবে পড়ে আছি। বাজার থেকে এক ঠোঙা মুড়ি আনিয়েছি। খেতে যাব, এমন সময় হঠাৎ ঠোঙাটির দিকে নজর পড়ল। এ কি? ঠোঙার গায়ে আমারই সারি সারি হাতের লেখা বে! আমার অনেক খেটেখুটে লেখা একটি বইয়ের একপাতা পাণ্ডুলিপি।

একটা বাটিতে মুড়িগুলি ঢেলে নিয়ে ঠোঙাটি সম্বন্ধে তুলে রেখে দিলাম। বাণীসাধনার পুরস্কার।

প্রাচীন পারস্যীক হইতে

প্রথমমধ্যম বিংশ

১

আমার মানসনীরে রাজহংসী তুমি
নীলে সাদা মিনা-করা, আকাশের পটে
চন্দ্র পৌর্ণমাসী যথা, সমুদ্রের তটে
তরঙ্গের দোলা 'পরে শুভ্র বেলাতুমি।
আমার তুমিলা মাকে ডাঠলে কুহুমি
পূর্ববাগ দ্যুতি সম, বাস্তবের ঘটে
অলকানন্দার বারি বহু ভাগ্যে জোটে,
সে আশায় রক্ত মোর বাজে রুমকুমি।
স্বপ্নে মোর কাটে সখী অধেক জীবন
বাকি অর্ধ বাস্তবের সলিলে মগন।

তুমি মোর স্বপ্ন সখী, তাই দিবানিশি
তোমার অস্তিত্ব মাকে রহিয়াছি মিশি,
তোমাতেই সঞ্চরণ, তোমাতেই বাস
জেনো সখী তুমি মোর আশ্রয় নিবাস ॥

২

প্রসন্ন ললাটে তব আবির্ভাব সখী
শরভের, সঘরিলে মৌহমী কুন্তল
লীলাভার, ছুটি চোখে চঞ্চলে চমকি
শেফালির লাবণ্য চিকণ, টলমল
স্বন্দ শিশিরের বিন্দু কপোলে গ্রীবায়।
মৌক্তিক ধবল পদা নিন্ত্য ব'য়ে বায়
অমল অঞ্চলে তব, দৃষ্টি যে তোমার
সৃষ্টি করে শত শত হংস বলাকার
মানস-উৎসুক গতি, নীলিম-বিলীন
চাতকের পাখা ছুটি কুরুপ্রান্তে ক্ষীণ।

বাসনার সোনাগলা রৌদ্রে মাজা তব
আজি সখী শরগায়ী মূর্তি অভিনব
কবির হৃদয়পদ্মে হ'ল অধিষ্ঠান,
বিস্ময়িল গুহুরিতে সব তার গান ॥

তোমার বিরহে

অসিতকুমার চক্রবর্তী

তোমার বিরহে আজিকে/আমার এ কথাই মনে হয়,
ভালবেসে সখি ভুল করিয়াছি, ভালবাসা স্থগনয়।
অঙ্কে তোমার অপকল্প রূপ, সে রূপহারা লাগি
তব মন মোর আকুল আবেগে অস্থবন আছে জাগি।
হৃদয়ে তোমার সীমাহীন প্রেম সে প্রেমে এ মন জাগে
ভ'রে ওঠে মন এই পৃথিবীর অজস্র অহুরাগে।
এতদিন আমি চলেছিহু ভাঙ্গি হালকা মেঘের মত
তুমি যেন এই মাটির মতন সৃষ্টি স্বপ্নে রত

যকে তোমার অপার ভূষণা ঘাঘবর মেঘ তাই
ধমকে দাঁড়ায় চলতে চলতে চলার শক্তি নাই।
তোমার ভূষণা আকাশে বাতানে গান হয়ে ভেসে চলে,
সে গানের সুরে মেঘ আর মাটি এক সুরে কথা বলে।
মেঘমন তাই মাটির বেদনা শুনে যে আশ্রহারা,
বৃষ্টির সুরে মেঘ আজ তাই হঠাৎ জাগায় সাড়া।
ভূষণাকরণ মাটি ডাক দেয় : কখন আসবে বল ?
মেঘমন বুঝি সেই ডাকে আজ মমতার টেলোমলো।
বৃষ্টির ধারা নেমে আসে তাই-এ মাটির অহুরাগে
একাকার হয় মাটি আর মেঘ, সবুজ ফসল জাগে।

যদিও পূর্বদিকে চৌরঙ্গীর অনতিদূরে একটি মস্ত বড় পুকুর, সায়েব-সুবোদের মাছ ধরবার শখ মেটাবার জন্ত একদা কার্টানো হয়েছিল। পুকুরটির দু দিকে স্থলর ফুলের বাগান, আর দু দিকে কয়েক হাত অন্তর অন্তর শান-বাধানো বসবার জায়গা। পিচ-বাধানো ঝকঝকে রাস্তা পুকুরটির তিন দিক বেঁঠন ক'রে প্রায় সমান্তরালভাবে কিউ স্ট্রীটে গিয়ে পড়েছে। পুকুরটির পশ্চিম ও উত্তর দিকে বিশাল ছুটি অটালিকার অবরোধ রাজপথের কোলাহল আটকে রাখে। দক্ষিণে লতাকুঞ্জ।

তরু হুপূর। মাছের প্রাচ্যাদী জন দু-তিন ইতস্ততঃ পরস্পরের মধ্যে বেশ খানিকটা ব্যবধান রেখে ব'সে আছে পুকুরের ধারে। কাকুর মাধায় টোকা, কাকুর মাধায় ফ্লেটহাট। পুকুরের ঈশান কোণে ব'সে আছে রূপার্ট—ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের অধিবাসী। বাঁশের কক্ষির মত সরু তার লম্বা হাড়জিরজিরে দেহখানি। মুখ রোদে পোড়া, তামাটে। কপালে ও মুখে জটিল বলিরেখার সমারোহ। চোখ ছুটি ছোট ছোট, অথচ আশ্চর্য রকম জীবন্ত। চোম্বালের হাড় দুটি যেন ঠেলে বেরিয়ে আসবার উপক্রম করেছে। বয়স তার পঁচিশ কি পঞ্চাশ তাকে দেখে কেউ অস্বস্তি করতে পারবে না। পরনে তার শতচ্ছিন্ন জীর্ণ সূট। গত পাঁচ বছরের মধ্যে এই সূটটি ছাড়া দ্বিতীয় কোন পোশাক ব্যবহার করতে দেখা যায় নি তাকে। একদা-জমকালো নীল রঙের সার্জ এখন প্রায় ছাতার কাপড়ের সামিল—কোট ও পাতালুনে সব মিলিয়ে প্রায় তিরিশটা তালি। নেকটাইটা অবশ্য নতুন, তার বিগত জন্মদিন উপলক্ষ্যে তার ফি'য়াসে নগদ দেড় টাকা খরচ ক'রে কিনে উপহার দিয়েছে তাকে।

লম্বা লিকলিকে একটি ছিপ রূপার্টের শীর্ষ হাতের মুঠোয় এসে শেষ হয়েছে। ছিপটির মতই তার হাতের পরিধি, কোথায় যে ছিপের শেষ, হাতের আরম্ভ, একটু দূর থেকে বোঝা শক্ত। ছিপের অস্ত্র প্রান্তটি জলের ওপর ঝুঁকে আছে। হাতের কাছে হুইল থেকে শুরু ক'রে আগাগোড়া ছিপটিকে আলিঙ্গন ক'রে জলের ওপর এসে পড়েছে রূপোলী রঙের স্তম্ভ—জলের মধ্যে যেখানে অদৃশ্য

হয়েছে সেখানে ফাৎনার নিশানা। নিরুপস্থ জলের ওপর ভাসমান ফাৎনাটি একেবারে স্থির। লোকটি অনেকটা যেন অভ্যস্ত ঔদাস্তের সঙ্গে ফাৎনাটির দিকে চেয়ে ব'সে আছে। ফাৎনা যে ডুববে না তা যেন স্বতঃসিদ্ধ।

লক্ষ্যভেদের পরীক্ষার সময় অর্জুন গাছে পাখি ছাড়া কিছু দেখেন নি—পাকা মাছের শিকারীরা জলের ওপর ভাসমান ফাৎনাটি ছাড়া আর সব কিছুই অস্তিত্ব তুলে যান। রূপার্টের নজরও ফাৎনাসর্ব্ব্ব—জল ছেড়ে ডাঙার দিকে কখনও সে তাকায় না। কিন্তু আজ তার দৃষ্টি বার বার ফাৎনা থেকে সরে যাচ্ছে। এ হেন অনিবিষ্টতা মাছশিকারীর স্বভাববিরুদ্ধ; কিন্তু ডাঙার যদি হঠাৎ একটি কালো কুচকুচে নেটিভের আবির্ভাব হয় এবং সে যদি দিবিয় আয়েস ক'রে পাঞ্জাবিটি কাঁধে ফেলে অনতিদূরে ছিপ ফেলে মাছ ধরতে বসে—তখন রূপার্টের মত শেতাঙ্গ-কুলতিলকের পক্ষে তা উপেক্ষা বা সহ্য করা কঠিন হয় বই কি। ফাৎনার দিকে চোখ রেখে লোকটির উপস্থিতি মুখমণ্ডলে ষথাসম্ভব একটা যুরোপীয় ঔদ্ধত্য সূত্রে তুলে হয়তো বা উপেক্ষা করা চলে—কিন্তু লোকটি একেবারে রূপার্টের পাশে যেখানে সারু বেসিল ওয়াটসন ব'সে মাছ ধরতেন, সেখানে তার স্বগোল ভূঁড়িটি বাগিয়ে বসেছে—তার এই স্পর্ধা বা সাহস উপেক্ষা করবার মত উদারতা অন্ততঃ রূপার্টের নেই। এসেক্সের লর্ডদের বংশের রক্ত তার গায়ে—নেটিভদের দেখলেই সে রক্ত মাধায় চ'ড়ে ওঠে।

চড়লও।

লুক হিয়ার।—রূপার্ট টেঁচিয়ে ওঠে, পুকুরের ধারে এই সব বসবার জায়গাগুলো এক সময় যুরোপীয়ানদের জন্ত তৈরি করা হয়েছিল। দেশ স্বাধীন হ'লেও যুরোপীয়ানরা সব বিদেয় হয় নি—ফর ইণ্ডর বেনেফিট তাদের অনেকে র'য়ে গেছে এ দেশে। তাদের অনেকেই এখানে আসে মাছ ধরতে—অন্ততঃ ডিসেম্বির খাতিরে, তোমাদের মত নেটিভদের এখানে আসা উচিত নয়।

লোকটি একটু চমকে উঠে রূপার্টের মুখের পানে তাকায়। রূপার্টের আপাদমস্তক—তার জীর্ণ ফ্লেটহাট থেকে শুরু ক'রে হেঁড়া তালি-মারা জুতো পর্যন্ত পুখুপু-

পুষাভাবে নিরীক্ষণ করে লোকটা একটু হাসে। ভুরু কুঁচকে সবিস্ময়ে সে বলে, তা হ'লে তুমি এখানে কেন? পুরোপুরি না হ'লেও তুমি তো আধা-নেটিভ!

ছিপছড় হাতটি কাঁপতে থাকে রূপার্টের। মুখ প্রথমে একটু ফ্যাকাশে, পরক্ষণে লাল হয়ে ওঠে। কালা আদমির ইম্পার্টিনেন্সের জবাবে সবুট পদাঘাতের রীতিটা সম্ভ্রান্তি আর নেই—সে ক্ষত তার আফসোসের অস্ত্র রইল না। কাজেই তার মুখ দিয়ে শুধু বেরায়, ইউ—ইউ—

বেশী যুরোপীয়ান মেজাজ ফলাতে ধোয়া না—মুখে একটা পান পুরে বাডালীটি বললে, তোমাদের স্বর্ণযুগ তো আর নেই!

কি ক্লগেই না ইংরেজ এই সব কালা আদমিদের স্বাধীনতা দিয়ে গেছে। অনতিদূরে পুরুরের ধারে পৌতা খুঁটির দিকে চেয়ে রূপার্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে। খুঁটির ওপর লটকানো একটি প্র্যাকার্ডে 'ফর যুরোপীয়ান্স ওনলি' বড় বড় হরফে লেখা ছিল বছর তিনেক আগেও। প্র্যাকার্ডটি ফেলে দেওয়া হয়েছে। অনাবশ্যক শুল্ক খুঁটিটা রূপার্টের চোখে যেন খোঁচা মারবার জগাই দাঁড়িয়ে আছে।

অবশ্যক বোঝে রূপার্টের বুকের ভেতরটা ফুলে ফুলে ওঠে। নেটিভটার দিকে একটা জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে আবার ফাংনার দিকে মন দিল।

ফাংনা ভোবে না। তিন বছর আগেও ডুবত না। তবু মাছ ধরতে আসার মধ্যে কী আনন্দই না ছিল! খেতান ও খেতানিনীরা পাশাপাশি ছিপ হাতে বসতেন এখানে। কোনও নেটিভ কাছে ঘেঁষবার সাহস পেত না। কত হৈ-ছল্লোড়, নাচে-গানে পুরুরের চারদিক মুখর হয়ে উঠত, রূপার্ট তার মনশ্চক্ষে আজও যেন দেখতে পায়।

সাবু বেসিল ওয়ার্টসনের সঙ্গে রূপার্ট এখানে আসতে শুরু করে। রিটার্ন করার পর থেকে মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত প্রত্যহ এখানে ছিপ নিয়ে বসেছেন সাবু বেসিল। অদ্ভুত ছিল তাঁর মাছ ধরবার বাতিক। ছোট বড় প্রায় একশোটি ছিপ ছিল তাঁর। মাছ ধরবার ব্যাপারে উৎসাহী মাজই একটি করে ছিপ উপহার পেয়েছে তাঁর কাছে। রূপার্টও পেয়েছিল।

মনে আছে রূপার্টের, মৃত্যুর পনেরো দিন আগে সাবু

আপনার মুখের সৌন্দর্য ও সার্বণ্য বাড়ানো আপনারই হাতে!

টাইটকা ফুলের মত সৌরভ আর স্বকের পুষ্টি রক্ষার উপাদানে সমৃদ্ধ হয়েছে **নতুন বোরোলীন**।

ধীরে ধীরে বোরোলীন মুখে লাগিয়ে দেবার কয়েকমিনিট পরে পবিত্র কাপড় দিয়ে মুছে ফেলেই স্বক মনন ও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে আর সার্বক্ষণ এর স্নিগ্ধ স্বাস মনকে মাতিয়ে রাখবে।

নিয়মিত ব্যবহারে ত্বন, মেচেতা এবং সব রকম কালচে দাগ উঠে গিয়ে স্বক সুলভ ও কমণীয় হয় এবং এর হালকা প্রলেপে সজীব থাকে। শীতের দিনে বোরোলীন মুখ ও টোট ফাটা এবং স্বকের রুম্মতার হাত থেকে রক্ষা করবে এবং মুখশ্রীর কোমলতা ও সজীবতা অক্ষুণ্ন রাখবে।

বোরোলীন এক অভিনব, স্বরচিত উচ্চাঙ্গের প্রসাধনী।

বোরোলীন

সব ডাক্তারখানায় ও ষ্টেশনারী দোকানে পাওয়া যায়।



বেসিল মাছের পোনা আনিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন পুকুরের মধ্যে। বড় কইমাছ ধরবার শখ তাঁর চিরদিনই।

পোনাগুলো বড় বড় মাছে পরিণত হয়ে সারু বেসিলের ছিপে গাঁথা পড়বার আগেই অমর্ত্য লোকের অদৃশ্ ছিপে গাঁথা পড়লেন সারু বেসিল ওয়াটসন।

মাছ ধরবার শখের ব্যাপারে রুপার্টকে সারু বেসিলের মানসপুত্র বলা চলে। একশো ছিপহুচ্ছ মাছ ধরবার বাতিকের উত্তরাধিকারটি তিনি রুপার্টকে দিয়ে গেলেন—মাছ ধরতে না পারলেও ছিপগুলোর মর্যাদা রাখবে রুপার্ট।

রেখেছেও রুপার্ট। সকাল নটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে তার ছিপ নিয়ে পুকুরের ধারটিতে এসে বসে, পাঁচটা বাজতেই ছিপ গুটিয়ে উঠে দাঁড়ানো—গত দু-তিন বছরের মধ্যে এর ব্যতিক্রম হয় নি একদিনও। প্রচণ্ড বর্ষার মধ্যেও দেখা গেছে যে, ছিন্নিভিন্ন একটি বর্ষাতি পায়ে টোকা মাধায় দিয়ে সে তার নিষিষ্ট জায়গাটিতে ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে এসে বসেছে। এক পাশে কুচ্ছূড়ার গাছ, অন্য পাশে ফুল গাছের কেয়ারি—দুয়ের মাঝখানে তাকেও একটি স্থাবর বস্তু ব'লে মনে হয়েছে স্থানীয় লোকদের।

দেখতে দেখতে দু-তিন বছর গেছে কেটে। সারু বেসিলের পোনাগুলো বড় বড় মাছে রূপান্তরিত হওয়ার খবর জলের তলায় আর উছ নয়, গোটা পাঁচ-ছয় কই-কাতলা ধরা হয়েছে গত এক বছরের মধ্যেই। অবশ্য একটিও রুপার্টের বঁড়িশিতে নয়।

পুকুরের এখনকার বড় মাছগুলোর সবই যে সারু বেসিলের পোনাগুলির রূপান্তরিত পরিবর্তিত সংস্করণ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই রুপার্টের। অবশ্য এ কথা বলা চলে না কাউকে। বললে যে-কেউ কথাটি হেসে উড়িয়ে দিতে পারে। অস্ত্রের ছিপে বড় বড় মাছ ধরা পড়ার দুঃখ নীরবে হজম ক'রে যেতে হয়। মাছগুলোকে নেমক-হারামই বলতে হবে। সারু বেসিল ওয়াটসনের পোনাগুলো থেকে তাদের উৎপত্তি, অথচ তাঁর সম্ভবতঃ সূক্ষ্ম থেকে উপেক্ষা ক'রে যার-তার ছিপে তারা ধরা দিয়েছে। তার বধাতে শুধু জুটেছে ছোট ছোট চুনোপুটি! অকৃতজ্ঞতা সবচেয়ে শেক্সপীরের কী যেন বলেছিলেন। ঠিক যে কী বলেছিলেন স্মরণ নেই রুপার্টের—নিশ্চয়ই খুব কঠিন তাঁর মর্মেভেদী একটা কিছু।

এক সপ্তাহের মধ্যে পর পর দুটো বড় মাছ ধরলেন মর্টন হিল—দুটি ক্লাবের সেক্রেটারি। রুপার্টের মনের মধ্যে তার প্রতিদ্বন্দ্বী একটা মিশ্র ক্ষোভ, অভিমান, হিংসা ইত্যাদি দিয়ে পাক করা অহুত্বের আকারে উদ্বেগিত হয়ে ওঠে। তার ছিপটি না হয় একটু জীর্ণ, টোপে উত্তম কোন ধাতুদ্রব্য জুড়ে দেবার সংস্থান আর নেই—তাই ব'লে প্রকাশ্য দিবালোকে এমনই বিবাদঘাতকতা করবে মাছগুলো।

তবু বড় বড় মাছগুলোর একটিও যে কোন নেটিভের ছিপে ধরা পড়ে নি, এইটুকু বা সান্ত্বনা। কালা আদমিদের বঁড়িশির টোপ না গিলে যে তারা নিজেদের কোলিঙ্গ বজায় রাখতে পেরেছে, এতে তাদের প্রতি মনে মনে গভীর কৃতজ্ঞতা বোধ করে রুপার্ট।

মাছ ধারা ধরেছেন ক্ষেতাজদের মধ্যে, তাঁরা সব বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁদের সাহচর্যলাভের স্বপ্নের কথা ভেবে মাছের শোক ভোলা যায় বই কি। এখানে মাছ ধরতে আসা তো শুধু নয়—বজ্রাতিদের সঙ্গে এক পংক্তিতে ব'সে গুটিব্ব অহুত্ব করাও বটে—দেই সঙ্গে লেক ডিষ্ট্রিক্টের অ্যাংলিংয়ের মধুর সব স্মৃতি যোময়ন করার আনন্দের মধ্যে গাঁ ভাসিয়ে দেওয়া। তার গতিবিধি ষড়গুপ্ত, কাঁচা, জামালপুত্র ইত্যাদি কয়েকটি রেলওয়ে টাউনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হ'লেও সে আনন্দে অংশ নেওয়া শক্ত নয় তার পক্ষে—মাতৃকুমির সঙ্গে পরিচয় চাক্ষুষ না হ'লেই বা কী।

কিন্তু নেটিভদের সম্পর্কে আশঙ্কা তো সহজে দূর হবার নয়। এখন তারা না হয় চুনোপুটি ধরছে। কিন্তু দু-একটা বড় মাছ যদি হঠাৎ ধরা পড়ে যায় তাদের বঁড়িশিতে! তার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারে না রুপার্ট। তাই যে সব কালা আদমি মাছ ধরতে আসে তাদের সম্পর্কে তার উদ্বেগের অস্ত নেই। তারা যেখানে বসে সেখানে জলের মধ্যে সামান্য একটু শব্দ হ'লেই চমকে ওঠে সে।

সাদা-চামড়া থেকে তফাত থাকার নাতি কালো-চামড়ার এখনও অনেকটা মেনে চলে ব'লে সাদা-চামড়ার স্বত্তি। রুপার্টের ধারেকাছেও কোন নেটিভ বসে নি এ পর্যন্ত—এ জন্ত মনে মনে তারি একটা আত্মপ্রসাদ অহুত্ব করেছে সে।

কিন্তু শেষরক্ষা হ'ল কই? কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল ওই আলকাভরার মত কালো হোঁৎকা লোকটা! সারু বেসিলের জায়গাটিতে আরাম ক'রে ব'সে কুৎকুতে চোখ দুটো মেলে তার দিকে চেয়ে নির্লব্ধের মত হাসছে। উর্দি-পরা যে সর্বদরোয়ান তিন বছর আগে এই পুকুরের ধারে ঘুরে বেড়াত তাদের কথা মনে প'ড়ে গেল রূপার্টের। তারা থাকলে একে ঘাড় ধ'রে এখান থেকে দূর ক'রে দিত। অমন দৈত্যো হাসি আর হাসতে হ'ত না লোকটাকে।

ওহে মিস্টার! লোকটার আহ্বানে চমকে ওঠে রূপার্ট। নেটিভহুলত মিনমিনে স্বর নয়—সাদা-চামড়াকে তোয়াক্কা না রাখার হুস্পষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ বাজখাই গলা তার : এ পুকুরে দেখছি বড় বড় জাঁদরেল সব মাছ রয়েছে।

রূপার্ট রুই মুখে বাঙালীটির মুখের দিকে তাকাল। গায়ে প'ড়ে আলাপ করাটা নেটিভদের সঙ্গে না, এ কথা নেটিভটিকে বুঝিয়ে দেবে কি না ভাবে সে।

রূপার্টের ভ্রুকুটি উপেক্ষা ক'রে বাঙালীটি বলল, অন্ততঃ একটি মাছ না ধ'রে ছাড়ছি নে আজ।

অসম্ভব!—অফুটকর্থে ব'লে ওঠে রূপার্ট, হতেই পারে না।

সারু বেসিলের মাছ নেটিভের ছিপে ধরা পড়েছে ভাবতে শিউরে ওঠে রূপার্ট। বিশেষ ক'রে সে যখন এ পর্যন্ত একটিও বড় মাছ ধরতে পারে নি।

সে নিজে ধরতে না পারুক, ওই নেটিভটা যেন কোন ক্রমেও মাছ ধরতে না পারে। একটি নেটিভের সাফল্যে পুকুরটির মাছদের কোলিচ্ছ নষ্ট হয়ে যাবে—ভাবাও যায় না।

শঙ্কিত দৃষ্টিতে বার বার বাঙালীটির বঁড়শির ফাৎনার দিকে তাকায় রূপার্ট। বাঙালীটি হাসে রূপার্টের সর্বাঙ্গে জলবিছুরি আলা ছড়িয়ে দিয়ে।

ফাৎনা ভাসছে। ডুবছে না। ডুববেও না। একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আন্দোলিত ক'রে রূপার্ট বলল, মাছের আশা ছাড়। এখানকার মাছ ধরা তোমাদের মত নেটিভদের কর্ম নয়। এখানকার মাছ না খেয়ে ম'রে গেলেও নেটিভদের টোপ গিলবে না। গেলে নি কখনও।

রূপার্টের কথাগুলো লোকটার কানে যায় না। রূপার্ট দেখতে পেল, হঠাৎ তার চোখের দৃষ্টি যেন অসম্ভবরকম

উগ্র হয়ে উঠছে—নিজের ছিপের ফাৎনার দিকে একাগ্র। দৃষ্টিতে চেয়ে আছে লোকটা।

তৎক্ষণাৎ রূপার্টের চোখ নেমে আসে ফাৎনার ওপর। ফাৎনা ডুবছে।

বেশ জুঁমত টোপ গিলেছে ব'লে বোধ হ'ল রূপার্টের। হইল থেকে স্ততো ছাড়তে ছাড়তে বাঙালীটি উঠে দাঁড়াল। তার সঙ্গে সঙ্গে রূপার্টও উঠে দাঁড়ায়, তাঁর সর্বাঙ্গে উত্তেজনার শিহরণ। দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে সে বলে, এ হতেই পারে না। এখানকার মাছ কোন নেটিভ ধরতে পারবে না।

লোকটা পাকা শিকারী। বড় একটা মাছকে কী ভাবে খেলিয়ে খেলিয়ে ধরতে হয় তার বাবতীয় কায়দা-কাহুন তার নখদর্পণে। ক্ষিপ্ততার সঙ্গে হইল থেকে স্ততো ছেড়ে মাছটিকে বেশ খানিকটা দূরে ধাবার স্বযোগ দিয়ে আবার হইলটাকে উঠে। দিকে ঘুরিয়ে মাছটিকে কাছে টেনে নিয়ে আসা, স্ততোর মাত্রাতিরিক্ত টান পড়লে আবার স্ততো ছেড়ে দেওয়া, এমনি ভাবে বার বার মাছটিকে খেলাতে থাকে লোকটা। মাছটা ক্রমশ ক্লান্ত ও নিশ্তেজ হয়ে পড়বে—তখন হইলে স্ততো গুটিয়ে মাছটিকে ডাঙায় টেনে তোলা চলবে অনায়াসে।

পুকুরের ধারে যারা ইতস্ততঃ উদ্বেগহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তারা মাছে-মাছবে টাগ-অব-ওয়ারের দৃশ্যে ধমকে দাঁড়াল। তাদের দাঁড়াতে দেখে পথ-চলতি অনেকে—এমন কি আশেপাশের কয়েকটি অফিস থেকে বাবুবাও, এসে দাঁড়াল পুকুরের ধারে। দেখতে দেখতে কোতুহলী জনতার রীতিমত একটা ভিড় জ'মে গেল। যারা আগে দাঁড়িয়েছে তাদের পেছনে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে বা দুইটি মুণ্ডুর ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি চালনা করবার চেষ্টা করে পশ্চাদ্বর্তীরা। পুকুরের উত্তর ধারের কেন্দ্রীয় সরকারী অফিসের দরোয়ানেরা তাদের বসবার টুলের ওপর দাঁড়িয়ে মজা সোটবার চেষ্টা করে। সেই অফিসের কেরানীবাবুবা টুলগুলোর দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কাতর মিনতি জানায়, দোহাই দরোয়ানজী, টুলের ওপর আমাদের একটু দাঁড়াতে দাও—আমরা একটু দেখি।

সাবাস!—বাবুদের ভাবাচ্যাকা খাইয়ে দিয়ে চৌচিয়ে

ওঠে দরোয়ানরা। তাদের সন্ধান অসম্ভবের মধ্যে দরোয়ানজীরা বাহবা দেওয়ার কী উপকরণ খুঁজে পেল তাঁ ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে বাবুরা ক্যালক্যাল করে চেয়ে থাকে।

আউর খোড়া খিঁচকে।—দরোয়ানদের মধ্যে একজন তার পেশল হাতটি হৃদয়ে প্রসারিত করে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পেছনের দিকে টেনে এনে উত্তেজিত স্বরে বলে ওঠে। বাবুরা এবারে বোকে, ওদের বাহবার লক্ষ্য পুকুরের ধারে—তারা নয়।

মাছের মুণ্ড ও দেহের খানিকটা হঠাৎ তখন ভেসে ওঠে। ভেসে উঠেই মাছটা আবার জলের মধ্যে তলিয়ে যায়। আবার হুইল থেকে স্রোত ছাড়া হতে থাকে।

সারু বেসিল ওয়াটসনের মাছ গিলেছে একটি নেটিভের টোপ! নিষেধ মাথার চুলগুলো ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে রূপার্টের। একটা নিরুপায় কোন্ড মনের মধ্যে ফেঁপে ফুলে ওঠে।

ধারালো তীর দৃষ্টিতে সে চেয়ে থাকে ইতস্ততঃ সঙ্করমান বঁড়শির স্রোতের দিকে।

আই উইল নেভার এলাও।—আপন মনে গর্জাচ্ছে থাকে রূপার্ট।

হঠাৎ একটা হ্যাচকা টান মেরে মাছটা দিক পরিবর্তন করল। দেখতে দেখতে বঁড়শির স্রোত রূপার্টের নাগালের মধ্যে এসে যায়।

বিদ্যুৎগতিতে একটা মতলব খেলে যায় রূপার্টের মাথায়।

গট ইট।—বলে সোমাসে চিৎকার করে উঠে সে পকেট থেকে একটি ছুরি বার করল।

এক সেকেন্ড। ধারালো ইম্পাতের মুখে দু টুকরো হয়ে যায় বঁড়শির স্রোত। স্রোতহৃৎ মাছটি জলের মধ্যে অদৃশ্য হয়।

সঙ্গে সঙ্গে রূপার্টের অট্টহাসিতে মুখর হয়ে ওঠে পুকুরের ধার।



কিরণ ল্যাম্প

কয়েন্ড কয়েল

২০% বেশী আলো দেয়

ভারত গভর্নমেন্ট কর্তৃক
অনুমোদিত ও নির্বাচিত

দি ওরিয়েন্টাল মার্কেটাইল কোং লিঃ.

কলিকাতা • দিল্লী • বম্বাই • কাণপুর • মাদ্রাজ

দিন-পনেরোর জন্ম পুরীতে এসেছি। বহু দিনের আকাজিক অবসর—একটু ভালভাবেই কাটাবার ইচ্ছা। একটা হোটেলে এসেই উঠেছিলাম। কিন্তু এক বেলার পরই অসহ্য লাগল। পাওয়া ভাল, ঘরগুলিও মন্দ নয়; কিন্তু পরিবেশ এত নোংরা, প্রাকৃতিক কার্ণের স্থানগুলি এমন অপরিষ্কার যে মন একেবারে বিবিয়ে উঠল। বেলা চারটে বাজতে না বাজতেই বৈকালিক চা-জলখাবারের জন্ম অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে পড়লাম এবং সামনেই যে স্থানীয় লোকটিকে দেখতে পেলাম তাঁকে প্রশ্ন করলাম, হ্যাঁ মশাই, এখানে একটা ভাল ঘর কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন? মানে কুণী-টুণী থাকে নি এমন বাড়ি—আমি অবশ্য একখানা ঘর চাই শুধু।

তিনি ধমকে ভাবলেন একটু। তারপর আমি যে হোটেলটাতে এসে উঠেছিলাম ঠিক তার পাশের বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ঐ বাড়িতে দেখুন তো খোজ করে। কোন মেয়েছেলের বাড়ি, সব তৈরি হয়েছে। ওর মালীর মুখে শুনলাম যে, একখানা ঘর বৃষ্টি ভাড়া দেবে। একবার জিজ্ঞাসা করে দেখুনই না।

গেলাম সেখানে। মালীটি বাড়িতেই ছিল। সে আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সন্দ্বিগ্ধচিত্তে প্রশ্ন করলে, কে থাকিবে? কয়জন-অ? আমি একা থাকব শুনে আরও শঙ্কিত হয়ে উঠল বোধ হয়: আপনক অহুখটা কি?

কোন অহুখ নেই, শুধু হাওয়া খেতে এসেছি শুনে বোধ হয় আশস্ত হ'ল একটু; কিন্তু জেরা ধামল না। তৃতীয় প্রশ্ন হ'ল—কেসে দিন-অ রহিবে? চোদ্দ দিন শুনে একটু চুপ করে থেকে বললে, মিলিবে। ভড়া লাগিবে দেইলি দি-তকা।

অর্থাৎ দৈনিক দু টাকা।

তাই নই। বললাম, দেখি বাবা ঘরটা।

বাংলা প্যাটার্ন বাড়ি। সামনেই বারান্দা এবং একটা বড় হলঘর। দু পাশে দুটি শোবার ঘর। ভাড়া দেবেন বলেই বাড়িওয়ালী ডান পাশের ঘরটির সঙ্গে আলাদা শৌচাগার ইত্যাদি তৈরি করিয়েছেন। সম্পূর্ণ পৃথক ব্যবস্থা। কল আছে, কুয়াও আছে একটা। বাড়িটা

শুনলাম একেবারে নতুন নয়, এখানে এই প্রায়েরই একটা বাড়ি ছিল, তবে তার বিশেষ কিছু আর নেই—বলতে গেলে সবটাই ঢেলে সাজা হয়েছে।

যাই হোক, তাতে আমার আপত্তি নেই। নবশায়ে তৈরি হবার পর কেউ আসে নি—আমার সেইটুকুই যথেষ্ট। তখনই কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল। ঠিক হ'ল যে, উক্ত মালী দৈনিক চার আনার বদলে আমাকে দু বেলা স্নানের জল ও পানের জল দেবে এবং ঘর ঝেড়ে বিছানা ঝেড়ে দেবে। অগ্রিম দশটি টাকা তার হাতে দিয়ে হোটেলের ফিরলাম। ম্যানেজারবাবুকে সংবাদটি দিয়ে তাঁর সঙ্গেই বন্দোবস্ত করলাম। দু বেলায় চা-জলখাবার তিনি আমার নতুন বাসায় পাঠিয়ে দেবেন এবং স্থল আহারগুলো এখানে এসে আমি খেয়ে যাব। পাশেই থাকব, স্ত্রীর তিন খুব আশস্তি করলেন না।—যদিচ সিটটা ছেড়ে দেবার জন্ম দৈনিক চার্জ থেকে তিনি আট আনার বেশী কমাতে রাজী হলেন না কিছুতেই।

দিন-দুই বেশ নিরুপদ্রব শান্তিতে কাটল। একা একা এত বড় বাড়িতে, সমুদ্রগর্জন ছাড়া কোন শব্দ নেই। মালী বড় ঘর খুলে একখানা ক্যাম্প-চেয়ার বার করে দিয়েছে, সেইটে পেতে চুপ করে বসে থাকি বারান্দায়, ঢেউ দেখি আর ঢেউয়ের শব্দ শুনি। নিশ্চিন্ত অবসর। সঙ্গে বই এনেছি খান দুই, কিন্তু পড়তে ইচ্ছা করে না। সমুদ্রের দিকে চেয়েই দিন কেটে যায়, পড়ব কখন? বুঝতে পারি ভিক্টর হুগো শুধু সমুদ্র দেখেই তাঁর নির্বাসনের বারো বৎসর কেটে যাবে, একথা কেন বলেছিলেন। ঠিক এমনি একটি বিশ্রামেরই বৃষ্টি কল্পনা করছিলাম এতদিন।

কিন্তু তৃতীয় দিন সকালবেলা সমুদ্রতীর থেকে বেড়িয়ে ফিরে দেখি, বিষম কাণ্ড। তিনখানা রিক্শা ঠাঁড়িয়ে আমাদেরই বাড়ির সামনে, তা ছাড়াও একটা ঠেলাগাড়ি। একখানা রিক্শা এবং ঠেলাগাড়ি বোকাই নানা রকমের ডয়েন্ডাকনা, আর একটিতে একটি দাসী-গোছের স্ত্রীলোক—তাতেও যৎপরোনাস্তি মাল বোকাই দেওয়া

হয়েছে এবং বাকি একটি রিকশা জুড়ে একটি ভদ্র-মহিলা।

অহুমানের বৃদ্ধা, ইনিই বাড়ির মালিক। ফরসা রঙ, খুবই ফরসা তাতে সন্দেহ নেই, বয়সকালে হয়তো স্বন্দরীই ছিলেন—কারণ নাক চোখ মুখ ভালই, কিন্তু বেচপ ও বেডোল মোটা ব'লে প্রথম দর্শনে কিছুই বোঝা যায় না, চোখে পড়ে শুধুই মেদ—ভাল ভাল, ডেলা ডেলা মেদ। বয়স হয়েছে, পঞ্চাশের কাছাকাছিই হবে হয়তো, মাথার চুলে বিশেষ পাক ধরে নি, কিন্তু টাক ধরেছে—সামনেটা ঘেথানে এককালে সিঁথির সরু গলি ছিল সেখানে আজ চৌরঙ্গীর চণ্ডা রাস্তা। অবশ্য সিঁথিতে সিঁচরের কোন চিহ্ন নেই, যদিচ চণ্ডা কালাপাড় শাড়ি পরনে এবং হাতে গোছাভর্তি চুড়ি। গলার হারটা দেহের অহুপাতেই বোধ করি তৈরি। জাহাজবাঁধা শেকলের মতই মোটা।

ভদ্রমহিলা বহু কষ্টে একেবেঁকে নামলেন। দেহের সঙ্গে কণ্ঠস্বরটাও বেশ মানানসই। হাঁক-ডাক ক'রে রিকশাওয়ালা, ঠেলাগাড়িওয়ালা এবং মালীকে ধমক দিয়ে চারিদিক সজ্জ ক'রে তুললেন।

মনটা বিরক্তিতে ভ'রে গেল। মনে হ'ল আমার এই সীমিত তপোবনে যেন মৃত্যুমতী অশান্তি এসে দেখা দিলেন। এটাকে কতকটা অনধিকার প্রবেশ ব'লেই বোধ হ'ল এবং মনটা বিচিষ্ট হয়ে উঠল। অথচ উপায়ই বা কি? ওঁর বাড়িতে যে উনি আসবেন না—এ রকম কোন শর্ত তো হয় নি।

মালের স্তুপ, গাড়ি প্রভৃতি পাশ কাটিয়ে বাড়িতে ঢুকলাম। বারান্দাতে ডেক-চেয়ারটা পাতাই ছিল, সেটাকে টেনে ঘরে তুলে দরজা বন্ধ ক'রে অত্যন্ত অগ্রসর মুখে এসে বিছানায় বসলাম। বা ক'রে এখন জানলা—বারান্দায় ব'সে শান্তিতে একটু সমুদ্র দেখব—সে সম্ভাবনা তো গেল।

কিন্তু প্রথম তোলপাড়টা ক'রে যেতে কোলাহলটাও আশ্চর্য রকম শান্ত হয়ে গেল। অহুমান করলাম, বাঁ দিকের ঘরটিতেই তিনি শয়ন করবেন। স্বতরাং ভবিষ্যতে ঐ নাকাড়ার মত গলা অন্ততঃ কানের কাছে বাজবে না। অনেকক্ষণ চূপচূপ রেখে আস্তে আস্তে একবার বাইরে বেরুলাম ভরসা ক'রে, দেখলাম আমার অহুমানই ঠিক। ডেকো-ডাকনা। বেশীর ভাগই ওঁদের বড় রাস্তাবরে তোলা

হয়েছে, বাঁ দিকের ঘরেই বিছানাপত্র উঠেছে। কিন্তু বিশ্বয়ও কিছু তোলা ছিল বইকি আমার জন্ত। হলঘরের জানলা দুটি খোলা হয়েছে, তার ভেতর দিয়ে চেয়ে দেখি—কিমাশ্চর্যমতঃপরম—সেটি রীতিমত হাল-ক্যাশানের ড্রয়িং-রুমের মত সাজানো। গদিমোড়া দোফল-সেটি, তাতে থাকি কাপড়ের ঢাকা, মধ্যে নীচু কান্দীরী টিপস—পাশে একটা ছোট হোয়াটনটে কিছু বই ও কাগজ। এ ছাড়াও খান চারেক বেতের চেয়ার এবং ডেক-চেয়ার। কি বাণ্ড! এ যে গুচ্ছির মধ্যে থাসা চাল।

ফিরে এসে, আবার দোর ভেজিয়ে দিয়ে বিছানায় বসলাম। মালীর পাতা নেই। সে বোধ হয় ওঁদের জন্ত বাজারে গিয়েছে। সন্ধ্যার মেয়েছেলেটি ইতিমধ্যেই উঠুনে আঁচ দিয়েছে। বেশ শাস্ত অবস্থা। আমি বিছানায় গা ঢেলে একখানা বই টেনে নিলাম। বাইরে ব'সে যেমন সমুদ্রের দিকে চেয়ে কাটানো যায়, ঘরের ভেতর তা সম্ভব নয়।

মিনিট পাঁচেক মাত্র কেটেছে, এমন সময় অত্যন্ত শান্ত এবং মধুর-গম্ভীর একটি নারীকণ্ঠ কানে এল, বাবা ঘরে আছেন নাকি?

শশব্যস্তে উঠে দোর খুললুম। দেখি বাড়িওয়ালী স্বয়ং। কিছুক্ষণ পূর্বের সে বজ্রনাদ এমন মাধুর্য পেলে কোথা থেকে? আশ্চর্য তো! সে ঘাই হোক, উনি স্থান করেছেন। ভিজ়ে চুল গিঠে এলানো, পরনে গরদের শাড়ি। বেশ মহিমময়ী মূর্তি। অতখানি মেদও যেন এখন আর বেমানান বোধ হচ্ছে না।

ভদ্রমহিলার হাতে একটি রূপোর রেকাবিতে কলকাতা-মার্কী চারটি আবার-খাব সন্দেশ, আর এক হাতে একটি কাচের গ্লাসে এক গ্লাস জল। আমায় দেখে একগাল হেসে বললেন, একটু জল খান বাবা। বাড়িতে আছেন—ছেলে-মাছ, ছেলের মত, আপনাকে না দিয়ে তো মুখে তুলতে পারি নে বাবা। আপনি নির্ভর খান, কলকাতা থেকে এনেছি। আপনারা তো অত জাত-ফাত মানেন না, আর মানলেও সন্দেশে দোষ নেই, এ বাব-তার হাতে খাওয়া যায়।

আগেকার বিরূপ মনোভাব যেন কোন মায়ামন্ত্রবলে চ'লে যায়। বড় ভাল লাগে মাছটাকে। হেসে বলি,

আমাকে আর 'আপনি' 'আপনি' করছেন কেন? আপনি আমার মায়ের মত। আমাকে 'তুমি'ই বলবেন। আমিও বরং আপনাকে 'মাসিমা' বলে ডাকব।

একপাল হেসে মাসিমা বললেন, বাবা, তোমার কথা শুনে প্রাণটা জুড়ল। মালীর মুখে ছোকরা ভাড়াটে এসেছে শুনে যা ভয় হয়েছিল! আমরা হলুম সেকলে মাছুষ, চেষ্টামেচি করা স্বভাব। না জানি কি মনে করবেন, হয়তো বিরক্ত হবেন—ভয় হয়েছিল এমন। তারপর আবার মালীটা বললে, বাবু কাকর সঙ্গে কথা কয় না—চুপ ক'রে থাকে। তাই শুনে তাড়াতাড়ি পারুলের মাকে বলি, অত চেষ্টা নি মা, চুপ কবু। বাবু হয়তো অসভ্য ভাববে। তা একটু বসি বাবা—তুমি একটু মুখে দাঁও দেখি। ল্যাংড়া আমও এনেছি। এ-বেলা ভিজুক, ও-বেলা ছাড়িয়ে দেব।

অগত্যা সন্দেশের থালা হাত থেকে নিতে হয়।

ভয়তর খাতিরে প্রশ্ন করি, আপনি জল খেয়েছেন?

না বাবা। এখনও আত্মিক-পূজো কিছুই হয় নি। এইবার যাব। একটু চা করতে বলেছি। আমার গুরুত্ব অহমাত নেওয়া আছে—চা খেয়ে আত্মিক করি। তা হ'লে মনটা স্থির হয়ে পূজোর বসে। নইলে কেবল তেষ্ঠা পায় আর ছটকট করি—কখন পূজো শেষ হবে,—চা খাব।

এই ব'লে একটু হাসলেন।

প্রশ্ন করলাম, কদিন থাকবেন?

এখন তো রথ অবধি আছিই। উনি যদি হুকুম দেন তো আরও কিছুদিন থাকব, নইলে তার পরই পালাতে হবে। অনেক ব'লে এই দেড় মাস ছুটি নিয়েছি। আমার বাবা বাতের খাত কিনা! বৃকেরও একটু গোলমাল আছে, এখানে থাকলেই ভাল থাকি। কিন্তু কি করব, ঠরং যে একদম ছুটি নেই। পাঁচ রকম ব্যবসা, দিনরাত তাই নিয়ে মেতে আছেন। একটা দিন বাইরে যাবার উপায় নেই। কত বোঝাই যে শরীরটার দিকে তাকাও—বয়স হয়েছে একটু বিশ্রাম নেওয়াও দরকার। তা কে কার কড়ি ধারে! বাড়ি হতে গৃহ প্রবেশের সময় পাঁচটি দিন এসে ছিলেন। বাসু—তাই আমার ভাগ্যি। উনি থাকবেন ব'লে কত শখ ক'রে ড্রয়িং-রুম সাজালুম—তা বরাতে থাকলে তো বাবা ছুটি ভোগ করবে—ইহজীবন খালি গাধার মত ষাটতেই এসেছিল। আবার বললে বলে—

যতদিন ষাটছি ততদিনই আছি, বসলেই একেবারে শুয়ে পড়ব।

আবারও সিঁথির দিকে তাকাই। না, সিঁথিতে সিঁথুর নেই।

ভয়মহিলা আর যাই হোন, নির্বোধ নন। আমার চাহনির অর্থ বুঝতে তাঁর দেরি হ'ল না। মাথাটা ঈষৎ নামিয়ে বললেন, না বাবা, আমি ঠরং ঠিক বিবাহিতা স্ত্রী নই। আমি—আমরা—এই পথেরই। মিছে কথা কেন বলব বাবা তীর্থস্থানে এসে? জগন্নাথ যা করতে পাঠিয়েছেন তাই করছি। আমার দুঃখ করার কিছু নেই। তবে হ্যাঁ, আজকাল অনেকে সিঁথুর পরে বটে, কিন্তু আমি ওটাকে পবিত্র চিহ্ন ব'লেই মনে করি। ও আমাদের নেবার অধিকার নেই।...তুমি বোধ হয় একটু আঘাত পেলে বাবা মনে মনে, তাই না?

তাড়াতাড়ি সন্দেশের থালা নামিয়ে দু হাত জোড় ক'রে বলি, আপনি আমার মাসিমা, সেই পরিচয়ই আমার কাছে ঢের!

ঠরং চোখ ছলছলিয়ে এল। বোধ হয় কি বলতেও গেলেন; কিন্তু তার আগেই পারুলের মা চা নিয়ে এল। ঠরং অল্প সাদা পাথরের বাটিতে, আমার জন্ত রাতিমত হালক্যাশানের এক কাপে।

চা খেয়ে তিনি আহিকে চ'লে গেলেন। আমিও যথারীতি চেয়ারটা বার ক'রে বারান্দায় এনে বসলুম। বাঁচা গেল।

বিকলে তিনটে বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই পারুলের মা চা দিয়ে গেল। ঘণ্টাখানেক পরে মাসিমা নিয়ে এলেন গ্যাংড়া আম আর সন্দেশ, আর এক দফা চা।

একটু বিরতই বোধ করলাম।

সবিনয়ে বললাম, এসব আর কেন মাসিমা? এখনই আবার হোটেল থেকে চা দিতে আসবৈ।

প্রথম নির্বিকার মুখে মাসিমা উত্তর দিলেন, সে আমি ব্যর্থ ক'রে দিয়েছি বাবা। ব'লে পাঠিয়েছি, চা জলখাবার আর প্যাঠাতে হবে না। ভাতটাও বন্ধ ক'রে দিতাম, কেন না পারুলের মা ভাল কায়স্থর মেয়ে—ওর হাতে খেলে তোমার জাত যেত না। কিন্তু তুমি হয়তো বড় বেশী লজ্জা পাবে

ব'লেই বললুম না। কিন্তু তা ব'লে মাসিমার কাছে থেকে হোটেল থেকে চা আনিয়ে খাবে, এ বাবা আমার পক্ষে বড় লজ্জার কথা—নয় কি ?

বাঁচলুম। মাসিমা দেখলুম মাহুবিট খুব শৌখিন, উৎকৃষ্ট দার্জিলিং চা এনেছেন সঙ্গে। আমিও ঠিক এই চা-ই পছন্দ করি। হোটেলের চা খেতে গিয়ে চোখে জল আসে।

পরের দিন আরও খুশী হলুম—একটু বিস্মিতও হলুম ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় পারুলের মা চা নিয়ে আসাতে। এখানে এসে বেড-টি পাব—এ আশা কখনই করি নি। যাকে বলে প্লেজ্যান্ট সারপ্রাইজ।

জিজ্ঞাসা করলাম, মাসিমারও এ অভ্যাস আছে বুঝি পারুলের-মা ?

না দাদাবাবু, উনি জান না ক'রে খান না। আপনাদের জন্তেই ব'লে রেখেছিলেন। দেখানে বাবু খান কিনা। স্পিরিট-টোড, স্পিরিট সব সঙ্গেই আছে। মা বললেন, ওরা কলকাতার ছেলে, বিছানায় শুয়ে চা খাওয়া ওদের অভ্যাস। কাল ভোরবেলাই চা দিস।

মুহূর্ত্ত হয়ে গেলাম মাসিমার বিবেচনায়।

আরও ঘণ্টাখানেক পরে এল গাওয়া-ঘিয়ে ভাজা লুচি, নমোশ ও চা। কিন্তু তার চেয়েও কৃতজ্ঞ হলুম যখন বেলা দশটার সময়-মালী নিঃশব্দে আমার পাশে এসে একটি ছোট টিপস এবং তার ওপর এক কাপ চা রেখে গেল। এই চা-টির জন্ত এখানে এসে পর্যন্ত অসুবিধা বোধ করি। কাছাকাছি চায়ের দোকান নেই, তা হ'লে যেতাম। অথচ জান করার ঘণ্টাখানেক আগে এই চা খাওয়া আমার চিরদিনের অভ্যাস।

এমন ক'রে অন্তর্ধর্মীর মত মনের কথা বুঝতে পারেন কি ক'রে ?

বিকেলবেলা চা এবং চা-জলখাবার শেষ ক'রে যথারীতি বাইরের চেয়ারে বসেছি, মাসিমা এসে পাশে মাটিতেই বসে পড়লেন।

এ-কথা-সে-কথার পর প্রশ্ন করলেন, তুমি কি কর বাবা ?

মাথা চুলকে বললুম, সে এমন কিছু নয় মাসিমা। লিখি-টিখি।

ও, বই লেখো বুঝি ? কি বই, ইন্ডুলের বই ? না, নাটক নভেল ?

নাটক নভেল।

তাতেই সংসার চলে ?

কায়রুশে চলে। খুব কি আর সচ্ছলে চলে ?

হ্যাঁ, আজকাল স্তনোছি লেখকরা অনেকে শুধু লিখেই খান। এখন তা হ'লে বই বিক্রি বেড়েছে। আগে বই লিখে সংসার চলত না বিশেষ।

মাসিমা দেখছি এ জগতের খবরও রাখেন।

বিস্ময় চাপতে পারলুম না। বললুম, আপনি এসব খবর এত রাখেন কি ক'রে ?

মাসিমা মুখ টিপে হাসলেন। বললেন, দু-চারজন লেখককে আমিও চিনতুম বাবা, এখনও চিনি। তবে অনেক দিন দেখাসাক্ষাৎ নেই। দু-একজন দয়া ক'রে তাঁদের বইও দিতেন—নতুন বই বেরুলে।

আগ্রহ বেড়েই যায়। প্রশ্ন করি, কাকে কাকে চিনতেন।—উনি—মানে মেসোমশাই কি এসব লাইনের লোক নাকি ? কিংবা প্রকাশক-ট্রকাশক ?

না না বাবা, উনি নিরেট লোহার কারবারী। লোহা আছে, গিমেট আছে, কিছু কিছু কন্ট্রাক্টরিও করেন, ওর এসব করবার সময় কোথায় ?

তবে আপনার সঙ্গে পরিচয়ের সূত্র কি ?

মাসিমা কথাটা এড়িয়ে যান। বলেন, সে আর একদিন বলব এখন। তারপর খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললেন, অনিল ঘোষালকে চিনতে বাবা ?

কে অনিল ঘোষাল ? আর্টিস্ট ? মানে ছবি আঁকতেন যিনি ?

হ্যাঁ, তার কথাই বলছি।

তাকে বাংলা দেশের কে না জানে মাসিমা। বাংলা দেশের সব কাগজেই একসময় তাঁর ছবি ছাপা হ'ত। কোথাও ছবির প্রদর্শনী হ'লে রাজারাজড়ারা এসে তাঁর ছবিই আগে খুঁজতেন, আর কি দামে বিক্রি হ'ত—দেড় হাজার দু হাজার আড়াই হাজার পর্যন্ত এক-একটা ছবির দাম উঠত। আপনি তাঁকে চিনতেন নাকি ?

চিনতুম বইকি ! ওর ছবির অ্যালবামও আছে আমার কাছে। এখানেই আছে। দেখাব ? পাঁড়াও, আনছি।

হল-ঘরের বইয়ের ব্যাকেই ছিল। মাসিমা উঠে গিয়ে ঘুলো বেড়ে এনে দিলেন। ব'সে ব'সে পাতা গুলটাতে লাগলাম। টাইটেল-পৃষ্ঠায় উপহার লেখা আছে, 'কল্যাণীয়া ভ্রমতী সত্যবালার করকমলে—অনিল ঘোষাল।' অর্থাৎ মাসিমার নাম সত্যবালা। শুধু সাহিত্যিক নয়, শিল্পীদের সঙ্গেও তাঁর দহরম-মহরম যথেষ্ট। কারণটা কি?

প্রশ্ন করতে সঙ্কোচ বোধ হয়। স্পষ্টই দেখছি মাসিমা সঙ্কোচ বোধ করছেন। স্তবরাং নীরবে অ্যালবামের পাতা গুলটাই। সব ছবিই পরিচিত। এককালে আমি অনিল ঘোষালের খুব ভক্ত ছিলাম, আজও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা কম নেই। এসব ছবিরই ইতিহাস আমি জানি, কোন্ প্রদর্শনীতে কোন্‌খানা কত দামে বিক্রি হয়েছে এবং কোন্ মহারাজা বা লাট সাহেব কিনেছিলেন, তা আমার এখনও মুখস্থ।

তেলের ছবি আঁকতেন অনিল ঘোষাল। আশ্চর্য ছিল তাঁর তুলির টান। রঙে ছিল অদ্ভুত দক্ষতা। অধিকাংশই নারীদেহের ছবি। একই মডেলের ছবি সবগুলো। ভক্তলোক বোধ হয় কখনও দ্বিতীয় মডেল ব্যবহার করেন নি। করার প্রয়োজনও ছিল না, কারণ যাকে সামনে রেখে তিনি ছবি আঁকতেন, সে মেয়েটি আশ্চর্য সুন্দরী—অমন রূপ বাঙালীর ঘরে দুর্লভ। হয়তো বাঙালী নয়। যেমন দেহ-লাবণ্য, তেমনি মুখশ্রী। এই একই মূর্তি কত রকমের কত চঙেই না এঁকেছেন, কোনটা খারাপ লাগে নি। কেউ স্নানরতা, কেউ কলনী-কাঁখে, কেউ প্রণতা, কেউ দপিণী—নানা রূপ ওই একই মেয়ের। বিচিত্র ভঙ্গীতে ছবি নিয়েছেন, ভিন্ন ভিন্ন মেয়ে ব'লে মনে হয় তাই। ওঁর ছবির প্রতি ক্রেতাদের যে পক্ষপাত ছিল, তার জন্ত হয়তো শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্যের প্রতি শ্রদ্ধাই সবটা দায়ী নয়—এই আশ্চর্য সুন্দরী মেয়েটির দেহসৌন্দর্যও খানিকটা দায়ী। হয়তো বা বেশীর ভাগই।

অনিল ঘোষাল মারা গিয়েছেন। শোচনীয় মৃত্যু। শুনেছি কোন্ এক পতিতা রমণীর প্রতি প্রণয়াসক্ত ছিলেন তিনি, তার পেছনে ব্যয় ক'রেই তিনি সর্বস্বাস্ত হন। তবুও নাকি তার মন পান নি—সে ওকে ত্যাগ করে। সেই দুঃখে তিনি আত্মহত্যা করেন। এবং করেন সেই রমণীরই বাড়ির সামনে রাস্তায়। অতবড় শিল্পীর মৃত্যু হয় পথে।

এতদিন মনে হয় নি—আজ মনে হ'ল—যে-মেয়েটিকে মডেল ক'রে তিনি আঁকতেন, নিশ্চয় তাঁরই প্রেমে পড়ে ছিলেন তিনি। ঠিক তাই। এ কথাটা এতদিন কেন মনে পড়ে নি। আচ্ছা নির্বোধ তো আমি! এমন মেয়ের প্রেমে না পড়াই অস্বাভাবিক।

কে এ মেয়েটি! এত নিষ্ঠুর! যে শিল্পী এমন ক'রে স্বল্পমাত্র তাকেই অমর ক'রে রেখে গেল নিজের সাধনায়—সারা জীবন শুধু ওই একটি রূপই আঁকল—তার দিকে ফিরেও তাকাল না, এমন নিষ্ঠুর এমন পাষণ্ডী—সে কে?

সহসা প্রশ্নটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আচ্ছা, এই যে ওঁর মডেল—মানে, যাকে সামনে রেখে এই সব ছবি উনি এঁকেছেন, এঁকে চিনতেন?

মনে হ'ল মাসিমার স্বপ্নের মুখে কে একরাশ আলতা ঢেলে দিলে। উনি মাথা হেঁট করলেন। অকারণে ওঁর লজ্জার কারণ হওয়ায় নিজেই লজ্জা পেলাম। প্রশ্নের আর পুনরুক্তি না ক'রে নীরবে ছবিই দেখে যেতে লাগলাম।

একটু পরে কিন্তু উনিই মুখ তুললেন। আড়চোখে চেয়ে দেখলাম এবং অবাক হয়ে গেলাম—ওঁর মুখে শুধুই লজ্জা নয়, যেন একটু গৌরবেরও আভাস ফুটে উঠেছে। ধীরে ধীরে বললেন, জগন্নাথের কাছে এসে আর মিছে কথা বলব না বাবা, ও মডেল আমিই।

সামনে সহসা জগন্নাথদেবকে লম্বারীয়ে আবির্ভূত দেখলেও হয়তো অত বিস্মিত হতুম না, যতটা হলুম ওঁর কথা শুনে।

এই মেদবিপুল স্ববিরা শ্রোতা রমণী আর সেই পূর্ণ-যৌবনা, স্বাস্থ্য-লাবণ্যবতী স্ত্রী, মেয়েটি—এক এবং অভিন্না? এ কি সত্য?

অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। ই্যা তো, ভাল ক'রে লক্ষ করলে চোখ ললাট এবং চিবুকের গঠনে একটা সাদৃশ্য ধরা পড়ে বই কি!

কিন্তু তাই বলে ওই—আর এই!

না না, এ অসম্ভব।

লজ্জিতভাবে একটু হাসলেন মাসিমা। বললেন, ই্যা বাবা, আজকের এ চেহারা দেখলে সেদিনকার ওই চেহারার মিল পাওয়া শক্ত। কিন্তু এই তো ভগবানের

নিয়ম বাবা। সকলেরই ঘোঁষন একদিন এই পরিণামে এসে পৌঁছয়।

তবু অবিখ্যাস যায় না। বলি, কিন্তু উনি তো মারা গেছেন মোটে পাঁচ-ছ বছর। তার আগে অবধি তো ছবি এঁকেছেন আর এই ছবিই এঁকেছেন। তা হ'লে—

মাসিমা বললেন, যা কিছু ছবি দেখেছ বাবা—সব ছ বছরের ভেতর স্কেচ করা—তারপর আর ঠর দরকার হয় নি। উনি জানতেন যে মেয়েদের, বিশেষত বাঙালী মেয়েদের, ঘোঁষন কত অগ্ন্যবস্থা। বলতেনও তো প্রায়ই, এইবার তো বেচপ মোটা হয়ে যাবে, এই বেলা যা পারি ক'রে নিই। তা নিয়েছেনও প্রায় তিনশ স্কেচ। তার কথানাই বা কাজে লাগিয়েছেন! যদি আরও বছর কতক বাঁচতেন তা হ'লে হয়তো সেগুলো শেষ হ'ত।

তা হ'লে ইনিই সেই, যার জন্ত অতবড় একজন শিল্পী প্রাণ দিল।

স্বপ্নায় বিতৃষ্ণায় মনটা ভ'রে যায়।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থাকি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোতুলকেরই জয় হয়। প্রশ্ন করি, কিন্তু ঠর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ঘুচল কেন? কি নিয়ে অশান্তি হ'ল?

ব'লেই বুঝতে পারি যে, অশোভন হয়ে গেছে প্রশ্নটা। অনধিকার চর্চা তো বটেই। লজ্জিত হয়ে অল্প কথা পাড়তে যাব, তার আগেই তিনি সবিস্ময়ে ব'লে উঠলেন, কই, সম্পর্ক তো ঘোচে নি। মরবার সাত দিন আগেও আমার বাড়িতে এসেছিলেন, কত গল্প ক'রে গেছেন। তখন কি জানি যে, এই সব সাংঘাতিক মতলব ঠর মাথায় খেলছে। স্কীরের পানতুয়া তৈরি করেছিলুম, চেয়ে চেয়ে খেয়ে গেলেন বাবুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

এ আবার কি কথা?

কিন্তু তখন আর কোতুলক চাপবার ক্ষমতা নেই। লজ্জলঙ্কার মাথা খেয়ে ব'লেই ফেললাম, বাবু? উনি তা হ'লে আপনার কে ছিলেন?

পোড়া কপাল! বাবুর বন্ধু ব'লেই তো ঠর সঙ্গে আমার আলাপ। আমি শুকে ঠাকুরপো বলতুম, উনি বলতেন বউদি। একদিন বাবুকে এসে বললেন, বউদির এমন ফিগার—ওঁকে যদি মডেল পেতুম, তা হ'লে ভারি

হৃবিধে হ'ত। বাস, বাবুর ছকুম হ'ল যে, ঠর স্টুডিওতে যাও। তা অবিশ্তি আমি যাই নি। আমারই বাইরের একটা ঘরে উনি তখনকার মত স্টুডিও করেছিলেন। এই পর্যন্ত। শেষে আমার রিফক্সি ধ'রে গেল, তা ছাড়া তখনই মোটা হতে শুরু করেছি। ঠরও আর দরকার রইল না।

প্রতি মুহূর্তেই ভয় হচ্ছিল, এই বুঝি ধমক খাব; কিন্তু তবু সাহস যেন বেড়েই চলছিল।

ব'লে বসলাম, কিন্তু ছবি আঁকতে আঁকতে কোন ঘনিষ্ঠতা হয় নি?

কি দুঃখে হবে বাবা! আমার এমন রাজা বাবু। যোল বছর বয়সে ঠর পায়ে ঠাই পেয়েছি, আজ পর্যন্ত অল্প কোথাও কান্সর কাছে উনি যান নি। মস্তুর পড়া হয় নি শুধু, নইলে আমরা স্বামী-স্ত্রীই। তা ছাড়া ঠর ছেলেও আমাদের নতুনমা বলে, বাড়িতে আসে। এসব বিষয়-সম্পত্তিও সে-ই পাবে, উইল ক'রে দিয়েছি। তুমি হাসালে বাবা, ওই বাউলুলে আর্টিস্ট, কি ছিল ঠর? ছবি বিক্রি যখন হ'ত—ছ-চার দিন খুব উড়ত, তারপরই তো এসে হাত পাতত বন্ধুবান্ধবদের কাছে।

চুপ ক'রেই থাকি।

শিল্পীর সাধনা, ধ্যান, তাঁর কৃতিত্ব—এসব তা হ'লে নিতান্তই কথার কথা। নারীর প্রেম পেতে হ'লে সেই সনাতন কাঞ্চনমূল্যেই পেতে হবে?

ধানিক পরে বললাম, আমার কথায় রাগ করছেন না তো মাসিমা?

না না বাবা। ছি! তুমি তো অস্তায় কিছু বল নি।

আচ্ছা, তবে যে শুনেছিলুম উনি কোন এক মেয়ের জন্মেই—

মাথা হেঁট করলেন মাসিমা। নীরবে নতমুখে ব'সে ব'সে উড়ে-আসা বালির ওপর দাগ কাটতে লাগলেন।

আমি মনে মনে একটা বিজয়গর্ব বোধ করলাম। এইবার ধরেছি তা হ'লে। কিছু একটা ছিল বই কি!

মাসিমা মাথা তুলে বললেন, সে আমারই লজ্জার কথা বাবা। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমিই ঠর মৃত্যুর জন্ত দায়ী। তখন কি জানি ছাই যে, ঠর প্রকৃতি এমন হবে! একটা মেয়ে আমার বাড়ির নীচের তলায় ভাড়াটে আসে। যে ঘরে ঠর স্টুডিও ছিল, সেই ঘরেই। খালি প'ড়ে থাকে,

নীচের তলায় ব'লে আমিই জোর ক'রে ভাড়া দিয়েছিলুম। নইলে ওঁর মত ছিল না মোটেই। আমার এক পাতানো মাসি ব'লে দিয়েছিলেন—ভাড়া নিয়ে কোন গণ্ডগোল হবে না, তিনি দায়ী। যে ভাড়া এল—নীরি, তার একটা সন্তেয়ো বছরের মেয়ে ছিল সোনা ব'লে। কী বলব বাবা, এমন শ্রীহান মেয়ে আমি ছুটি দেখি নি। যেমন কালো তেমন বেগাড়া কাঠ-কাঠ গড়ন। একেবারে পুরুষ মাহুস। বলতে লজ্জা করে, মেয়েলী ধরন তার চেহারায় কোথাও ছিল না। নীরির এক বাবু ছিল ওই রকম, মেয়েটি নাকি তার মতই হয়েছে। ইদানীং নীরির কেউ ছিল না, বয়সও হয়েছিল, টাকা হুদে খাটাত আর খেত। মেয়েটার বাবু জুটবে না তা সেও জানত। বিয়ের চেষ্টা করেছিল।

আমাদের ঘরে এমন বিয়ে আখছার হয়, কিন্তু ওকে কে নেবে বাবা? সে আশাও ছিল না। ওর নামই র'টে গিয়েছিল গাড়োয়ান-সোনা, গাড়োয়ানের মত চেহারা। আমার বাড়ি আসবার পর, বোধ হয় ওর মায়ের টাকার গন্ধ পেয়েই পাড়ার এক বিশ্বখ্যাতে ছোঁড়া লাগল ওর পেছনে। সোনাও—এর আগে তো ও স্বাদ পায় নি, সেমিকে ঢলল। এর ভেতর কি ক'রে কি হ'ল, একদিন ঠাকুরপোর চোখে প'ড়ে গেল মেয়েটা। কি যে দেখলেন ওর মধ্যে তিনি, ঈশ্বর জানেন, এত বড় শিল্পী ওই গাড়োয়ানের মত মেয়েটার জন্ত পাগল হয়ে উঠলেন।

কাপড় গয়না কত কি দিয়ে ডুবিয়ে দিলেন। ইদানীং কাজ পেয়েছিলেন ভাল, খুব রোজগার হ'ত, সবই ঢালতেন ওর পায়ে। মায়ের ভয়ে সোনা ওকে বাবু করলে। আর

একখানা ঘর ভাড়া ক'রে সেখানে রাজপ্রাসাদের মত সংসার পাতলেন ঠাকুরপো। অভাব নেই কিছু, কিন্তু সে বেটীরও কি যে নজর, সেই বখাটে ছোঁড়ার জন্ত প্রাণ ধেত ওর। ক'বার ধরা পড়ল। রাগারাগি অভিমান কত কি! সোনা ওঁর পরোয়া করত না, কথায় কথায় বলত—দূর হও, অমন বাবু আমার দরকার নেই। ঠাকুরপোই শেষে পায়ের ধ'রে আবার আসতেন। যেন কি গুণ করেছিল ছুঁড়ী। কিন্তু তবু এত ক'রেও মন পেলেন না। একদিন রাজে বাড়ি চ'লে গেছেন কিন্তু থাকতে পারেন নি, অনেক রাতে আবার ফিরে এসেছেন—দেখেন সেই মূর্তিমান ওর ঘরে, ওর বিছানায় ব'সে গল্প করছে। হেসে চ'লে পড়ছে তার গায়ে সোনা। কান পেতে শুনলেন ওঁকে নিয়েই হাসাহাসি—বাস, পকেটে পিস্তল ছিল, হয়তো কিছু সন্দেহ ক'রেই এসেছিলেন। কিন্তু সোনাকে মারতে হাত উঠল না, বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজের বুকই করলেন গুলি।

মাসিমা চোখ মুছলেন। বলতে বলতে ওর কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে এসেছিল।

আমি চুপ ক'রে ব'সে রইলাম। অপরাহ্নের রোদ মিলিয়ে এসেছে। নীল সমুদ্রে নামছে অন্ধ রাত্রির কালিমা। সমুদ্রবেলা থেকে ভেসে আসছে টেড্ডয়ের শব্দের সঙ্গে বহুকণ্ঠের মিলিত কলরব।

এখানে আমরা দুজনেই চুপচাপ।

বোধ করি একই ভাবনার অতলে তলিয়ে গেছি দুজন, মানব-মনের বিচিত্র তুচ্ছের রহস্তের গহনে হারিয়ে গেছি।

তারাকর

প্রেমাকর আত্মীয়

সমুদ্রের

ধাত্রী দেবতা

আদর্শ জীবনের রূপায়ণে তারাকর
সর্বোত্তম স্রবহ উপভাস। ৪৯।
অমলা দেবীর

সরোজিনী

বিহ্বলী এবং স্নানরী বিশ্বা সরোজিনীর
জীবন নিয়ে রচিত বিচিত্র উপভাস। ৪৮।

স্বর্গের চাবি

ধোঁয়ার কারবার নেই—খাঁটি রসের
গল্প। এই চাবি সংগ্রহ করুন। ৩।
সমনীকান্ত দাসের

কলিকাল

কলিকালের ব্যঙ্গ গল্প সবকালেই উপ-
ভোগ করা যায়। বহু চিত্রশোভিত। ৪৮।

শিকার-কাহিনী

বিখ্যাত কান্দি চৌধুরী-কথিত শিকারের
কয়েকটি মজার গল্পের সংকলন। ২১।
রামপল মুখোপাধ্যায়ের

আবর্ত

আবর্তের গল্পগুলি ছোটগল্পের রস-
পিপাসা মনকে পরিভূষিত দেবে। ১৮।

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস : ৫৭ ইস্ট বিশ্বাস রোড : কলিকাতা-৩৭

প্রার্থনা

অসিতকুমার

তুমি দেখে গেলে ক্লান্ত কাতর দেহ,
পাণ্ডু ললাটে মুদ্রিত পরাজয়—
ওষ্ঠ অধর নিরুচ্ছ হতবাক ।
লোলূপ কালের বিষগ্ন অবলোহ,
যৌবন জরা একাকার মনে হয়—
দেয় নাক' সাড়া, শোনে না প্রাণের ডাক ।
অপগত হোক শঙ্কা ও সন্দেহ,
হে বরদাত্রী দাও তুমি বরাভয়—
মস্থিত হোক সকল দুর্বিপাক ।
ভরুক এবার উজ্জল ঐ স্নেহ,
স্পর্শে তোমার কলুষ যা পাক লয়,
শুধু ঐ চোখ চেতনায় চেয়ে থাক ॥
সারারাত আমি আয়ুর গ্রহণ গনি—
উদয় তোমার সহজ সঙ্গীণা
হর্ব জাগায় তিমিরে জ্যোতির্ময়,
শূন্তে শূন্তে পরাও আলোর মালা
জ্যোতির প্রদীপ তোমারই হু হাতে জ্বালা,
হে বরদাত্রী দাও তুমি বরাভয় ।

খড়া তোমার, আন মৃত্যুর শিরে,
স্বর্ণ শায়ক শকার বৃকে হান'—
শব্দে তোমার ধ্বংসের বৃক চিরে
মৃত জাতকেবে চেতনায় আস্থানো ।

* * *

প্রাণময়ি, তুমি দু হাতে ছড়াও প্রাণ,
কর কর রোধ মৃত্যুর অভিযান,
দিকে দিগন্তে ছড়াও আলোর সোনা—
মাটির শিশুরা আবার মাটির বৃকে
ঘোষণা করুক আদিম হর্ব স্বথে—
মানব না হার, মানব না, মানব না ।
আলোকে তোমার স্নেহের তপ্ত স্বাদ
বাতাসে তোমার অমেয় আশীর্বাদ
মাটিতে তোমার অনন্ত আশ্বাস—
চিন্ময়ি, তুমি মরচেতনায় আজ
মাটির শিশুকে দুই হাতে বৃকে টান',
দাও, ফিরে দাও নির্ভয় নিখাস ॥

হয়তো জান না তুমি

শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী

হয়তো জান না তুমি, না পাওয়া গো, আমার এ গান
তোমারি কন্যা । তুমি সন্ধ্যার করেছ তাতে প্রাণ
তোমারি প্রাণ দিয়ে । তাই তো সে চায় বারংবার
তোমারে জানাতে চির-কৃতজ্ঞের মৌন নমস্কার ।
তাই তো সে-রোম্ব রাতে অকস্মাৎ ঘুম-ভাঙা চোখে
শয্যা ছেড়ে চুপি-চুপি মিটিমিটি তারার আলোকে
হরের পুষ্পক বধে পাখা মেলে তোমারি সন্ধান
পাংলয়ের মত শুধু ছুটে চলে নিরুদ্ধেশ পানে ।
চারিধার স্তম্ভিমাগ্ন, অন্ধকারে ছেয়ে যায় সব,
জোনাকীর আলো জলে, মাঝে মাঝে ওঠে ঝিল্লীরব,
সেই সে নিশীথ-রাতে আধ-খোলা জানালার পাশে
পথ চেয়ে বসে থাকি—কখন সে ঘরে ফিরে আসে ।

হয়তো জান না তুমি । স্বপ্নোপ যে নেই জানাবার ।
মায়-মরীচিকা তুমি, তোমার নাগাল পাওয়া ভার ।
তৃষাতুর কত পাখ তৃষাহরা স্থায় সন্ধান
চলেছে মিছিল করে তোমা পানে দুর্নিবার টানে ;
আমি সে পথের ধারে সকলের অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে
দেখেছি সে লীলা । বামনের মত তৃষাহ বাড়িয়ে
ধরতে যাই নি ছুটে ভুল করে আকাশের চাঁদ,
অন্তরে পেয়েছি সঙ্গ, কল্পনায় আনন্দ অবাধ ।
সে আনন্দ-মুহূর্ত্তনায় ধীরে ধীরে হয়েছে মুখর
আমার অলস দিন-রজনীর নির্বাক প্রহর ;
ভাবের ভেলায় ভেসে সহসা এসেছে কঠে গান,
সহসা দেখেছি তাতে তোমার বিদেহী অধিষ্ঠান ।

একটা দুঃখপ্লের ঘোরে মাঝরাতেই ঘুম ভেঙে গেল বিনয় রায়ের। গভীর জলের মধ্যে পড়েছে সে। উঠবার চেষ্টা করছে আর খাবি খাচ্ছে। তলিয়ে যাচ্ছে শরীরটা ক্রমে ক্রমে।

বিনয় রায় উঠে বসল। একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে। এত জল খেয়েও হ'ল না। তৃষ্ণার গলাটা শুকিয়ে গেছে। আলোর সূইচটা টিপল সে।

পাশাপাশি ঘুমিয়ে আছে মা ও মেয়ে। বিনয় রায়ের স্ত্রী কমলা আর চার বছরের মেয়ে রুণু। সন্তকোটা একরাশ জুইফুল ঘেন/ছড়িয়ে রয়েছে বিনয়ের বিছানায়। বিনয় রায় জল খেতে তুলে গেল। মুখ চোখে চেয়ে রইল স্নেহ এবং সৌন্দর্যের এই অনাবিল পরিবেশটির দিকে।

কমলার কাছে কত নীচু হয়ে গেছে সে। একদিন নয়, পরপর তিন দিন সেই একই প্রস্তাব করেছে বিনয় কমলার কাছে। প্রস্তাব শুনে কমলার শরীর শক্ত হয়ে গেছে পাখরের মত, কঠিন ভারী হয়ে এসেছে, তবু মুখে একটিও রক্ত কথা আসে নি তার। ইচ্ছা করলে অনেক কথাই বলতে পারত সে। শুধু বলছে, ওকথা আমাকে ব'লো না। উদ্ভবের মেয়ে হয়ে—। তার আগে ম'রে যাই না কেন? আমারও শাস্তি, তুমিও বাঁচবে।

না, আর কোনদিন কমলার কাছে ওকথা তুলবে না বিনয়। কপালে যা আছে থাক, তাই ব'লে নিজের স্ত্রীকে শেষ পর্বস্ত—

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল বিনয় রায়। গত এক বছরের মধ্যে এরকম অনেক দীর্ঘনিশ্বাস সে কেলেছে। কতবড় নামকরা ব্যবসায়ী ছিলেন তার বাবা! কত টাকা রেখে গিয়েছিলেন বিনয়ের জন্তে। চরম অব্যবস্থার পরিচয় দিয়েছে বিনয়। বাপের টাকা রাখতে পারে নি সে। ব্যবসাতেই হোক আর ঘে-ভাবেই, হোক, কুবেরের ভাণ্ডারও অবশেষে একদিন শূন্য হয়ে এল। বিজ্ঞানস ম্যাগনেট হবার আকাঙ্ক্ষা পরিণত হল দুর্বাকাঙ্ক্ষায়।

শেষবারের মত যা খেল বিনয় ওই লঞ্চের ব্যবসারে নামতে গিয়ে। লঞ্চ তো ডুবলই, সঙ্গে সঙ্গে বিনয়কেও ডুবিয়ে গেল। শেষ পঞ্চল বাড়িটা বাঁধা পড়ল ভূধর

মল্লিকের কাছে—কুড়ি হাজার টাকায়। ছ মাসের মধ্যে শোধ করা চাই। নইলে স্ত্রীকঙ্কাসম্মত পথে দাঁড়াতে হবে।

বিনয় রায় কি করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছে না। বিদ্যাতের আঁচড়-কাটা নিকষ, কালো জমাট মেঘের মত ভবিষ্যৎটা একটা নিষ্ঠুর চেহারা নিয়ে এগিয়ে আসছে।

কমলা ঘুমচ্ছে অকাতরে। একটা হাত এসে পড়েছে ওর গলার ওপর। আঁকাবাঁকা শরীরটা যেন ধলুকের মত প'ড়ে আছে।

কমলা হুন্দরী। শুধু হুন্দরী নয়, অসাধারণ হুন্দরী। দেহ-গঠনের কোথাও এতটুকু খুঁত নেই তার। সেই জন্তেই না করেন ওই পরামর্শটা দিতে পেরেছিল তাকে। বিনয় রায়ের বাল্যবন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষী করেন চৌধুরী। প্রবল স্রোতের মুখে হরেনের ওই পরামর্শটাকে কুটোর মত আশ্রয় করেছে বিনয়। অনেক আশা ছিল তার, কমলা হয়তো শেষ পর্বস্ত তার কথা রাখবে। কিন্তু হ'ল না।

নিজ্জিত কমলার ভান হাতখানিকে পরম স্নেহে সন্তর্পণে গলার ওপর থেকে নামিয়ে দেয় বিনয়।

সারাটা দিন বাইরে কাটিয়ে বেশ একটু রাগেই বাড়ি ফিরল বিনয়। ভূধর মল্লিক সকালে এসে ঘুরে গেছে। কিস্তির টাকার তাগাদা দিতেই সে এসেছিল। ভূধর মল্লিক কিস্তির ধার ধারে না, নেহাত বিনয় অহরোধ করেছিল বলেই ভূধর রাজী হয়েছে কিস্তি নিতে।

সারা দিন ঘুরেছে বিনয়। বন্ধুবান্ধব সকলে নানা রকম পরামর্শ দিয়েছে, উপদেশও দিয়েছে অনেকে। সমস্ত মাথাটা উপদেশ এবং পরামর্শের বোঝায় ভারী হয়ে আছে। চাকরির জন্তেও ছ-এক জায়গায় চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। টাকার প্রাচুর্যে ভিখীর অভাবটা এতদিন বুরতে পারে নি বিনয়, এখন অভাবের দিনে ভিখীর দৈন্যটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে হচ্ছে তাকে।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য হ'ল বিনয় কমলাকে দেখে। কমলার সারা দেহে মনে আজ যেন উৎসবের সাদা

জ্যেগেছে। একটা আনন্দ-হিজল বইছে তার সর্বাঙ্গে। সাজপোশাকেও একটু ঘটা লক্ষ্য করল বিনয়। জিজ্ঞাস্থনেজে সে চেয়ে রইল কমলার দিকে।

খাবার জায়গা করাই ছিল। কমলা বললে, নাও খেয়ে নাও। পরে বলছি। সারাটা দিন রোমে রোমে কোথায় ঘুরে বেড়িয়েছ বল তো? মুখটা শুকিয়ে গেছে।

বিনয় রায় স্ববোধ বালকের মত খেতে ব'সে গেল।

সংসারের পাট চুকিয়ে একটু তাড়াতাড়িই ঘরে এল কমলা। ঘরে ঢুকে বিনা ভূমিকাত্তে সরাসরি প্রবেশ করলে বিনয়কে, আচ্ছা, আমি সিনেমায় নামলে তুমি খুশি হবে?

বিনয় একটা বিশ্বয়ের প্রতীক্ষায় ছিলই। কিন্তু এতটা নয়। বিছানার ওপর সোজা হয়ে ব'সে কমলার একটা হাত ধরে ফেলল : বল কি। রাতারাতি মত পালটে গেল যে?

আজ দুপুরে নীচের বীণা মাসির ঘরে গিয়ে দেখি, জ্যেব আড্ডা চলেছে। সিনেমার গল্প নিয়েই খুব আলোচনা করছিল সবাই। সুনলাম, আজকাল নাকি ভদ্রঘরের মেয়েরা আকচাঁর সিনেমায় নামছে। সত্যি?

বিনয়ের চোখ দুটো আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, আমি তো তোমায় আগেই বলেছিলাম কমলা। নইলে আমি নিজে কি পারি তোমায় এমন কথা বলতে?

কমলা উঠে বসল বিছানার ওপর। বিনয়ের গা ঘেঁষে ব'সে বলল, তারপর ও-বাড়ির সেজবউদি কি বললেন জান? বললেন, তুমি যদি সিনেমায় নাম ভাই তা হলে ও লাইনের অনেক তারকাবৈ খসে পড়তে হবে। এমন হুন্দর চেহারা নিয়ে সিনেমা তো দূরের কথা—রাজ্য জয় ক'রে আশা যায়। আর তা ছাড়া...

বলতে বলতে কমলার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। মুখের কথা অসমাপ্তই রয়ে গেল তার।

বিনয় রায় ও-বাড়ির সেজবৌদিকে মনে মনে শতসহস্র প্রণাম জানালে। আশার আলো দেখা দিয়েছে। হরেনের পরামর্শমত ছ মাসের আগেই বাড়ির দেনা শোধ হয়ে যাবে। আবার বিনয় রায় দাঁড়াবে। হ'লই বা জীব সাহায্যে! এঁতো আর এমন কিছু পরের নয়।

স্বামী-স্ত্রীতে বিমিশ্র ব'সে কত অল্পনা-কল্পনা চলল তারপর। এতদিনের সমস্ত সমস্তা এত সহজে মিটে যেতে

পারে, এ ধারণা কারুরই ছিল না। হিসেবপত্তর ক'বে বিনয় দেখালে ছ মাসের মধ্যেই দেনা শোধ হয়ে যাচ্ছে। তারপর যদি কমলা সে স্বকম নাম করতে পারে—

কমলা বলল—বেশ, তা হ'লে তোমায় সেই বন্ধু হরেনকে বল।

বেশ, বলব।

আমার কিন্তু ভয় করবে।

আমি তো তোমার সঙ্গেই থাকব।—বিনয় আশ্বাস দেয়।

বিনয়ের বন্ধু হরেন শোনামাত্রই তার পরিচিত পরিচালকের নামে চিঠি দিয়ে বললে, একেবারে স্টুডিওতে গিয়ে দেখা কর। বউকে বেশ সাক্ষিয়ে-জিজ্ঞিয়ে নিয়ে যাবে, মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে না কিন্তু।

একগলা ঘোমটা টেনে কমলা বিনয়ের সঙ্গে স্টুডিওতে প্রবেশ করল। প্রথম স্বস্তরবাড়ি যাওয়ার মত একটা লজ্জা ও ভয় চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছিল তাকে। পরিচালক মশাই অভিজ্ঞ লোক। কমলাকে দেখে একটু গম্ভীরভাবে হরেনের চিঠিটা নেড়েচেড়ে বললেন, ঠিক আছে। এর আগে কোথাও অভিনয় করেছেন?

কমলা ঘোমটা টেনে মাথা হেঁট করে।

আজ্ঞে না।—বিনয় রায়ই কমলার হয়ে উত্তর দেয় : আবৃত্তি-টার্বৃত্তি করতে পারে, শিথিয়ে পড়িয়ে নিলে পারবে আশা করি।

পরিচালক একটু গম্ভীর থেকে, ক্রিপ্টের একটা পাতা খুলে কমলার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন, পড়ুন তো।

কমলা ঘোমটাটা আর একটু টেনে নাকের কাছে এনে মাথাটাকে আরও নীচু করে। পরিচালক হেসে বলেন, এত লজ্জা করলে অভিনয় করবেন কি ক'রে?

কমলা কলাবউয়ের মতন ঘোমটার আড়ালে নীরব হয়েই থাকে।

বিনয় ব্যস্ত হয়ে উৎসাহ দেয় : পড় পড়, লজ্জার কি আছে, উনি তোমার দাদার মতন—

অনেক সাধাসাধির পর কমলা ঘোমটার আড়ালেই কম্পিতকণ্ঠে ক্রিপ্টের সংলাপগুলো প'ড়ে গেল। অভিজ্ঞ পরিচালক অতঃপর নানাভাবে কমলাকে পরীক্ষা করলেন। সবগুলিভেই কমলা সাক্ষ্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে গেল।

আপনার দুর্ঘটিত রক্তকে পরিষ্কার করতে অদ্বিতীয়!

মানব শরীরে ঠিকমত রক্ত চলাচলে দীর্ঘজীবন লাভ করতে পারা যায়। রক্তপ্রবাহের ধারা বন্ধন ব্যাহত হয়, তখনই নানারকম ব্যাধির আক্রমণে মাহুষ কষ্ট পায়।



স্বর্ণঘটিত অমৃত-সালসা তিন পুরুষের পরিচিত।
এই অমৃত-সালসা সেবনে ছুষিত ক্ষত, খোস,
পাঁচড়া, নানাপ্রকার চর্মরোগ, বাত সম্পূর্ণরূপে
আরোগ্য হয়। যকৃতের গোলযোগ দূরীভূত হয়,
অগ্নিমান্দ্য নষ্ট করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় ও কোষ্ঠ
পরিষ্কার করে।



স্বর্ণ ঘাটিত

অমৃত-সালসা

মহৎ আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়

১৪৪-১, নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৫

অবশেষে পরিচালক আগামী ছবিতে কমলাকে উপনায়িকার চরিত্রে নির্বাচিত ক'রে বললেন, ভাল ক'রে মন দিয়ে কাজ করুন। এ লাইনে পরসা এবং নাম দুটোই-বধেট।

সত্যিই ভাল ক'রে কাজ করতে থাকে কমলা। মন দিয়ে ভাল ক'রে বুঝে পাঠ মুখস্থ করে। ঠিক সময়মত বিনয়ের সঙ্গে স্টুডিওতে যায়, কিন্তু মুশকিল হয় বিনয় ছাড়া কমলা এক পা নড়তে পারে না। প্রত্যেকটি দিনের প্রতিটি শটে বিনয়কে সেটে থাকতে হয়। একদিন বিনয়কে কি একটা কাজে ফ্লোরের বাইরে যেতে হয়েছিল, বাড়িতে এসে কমলার সে কি রাগ : তুমি আমাকে একা ফেলে আর কখনও সেটের বাইরে যাবে না—আমার ডয়ানক ভয় করে। জান তো ওরা কি জাতের লোক !

আচ্ছা, আচ্ছা।—বিনয় কমলাকে শাস্ত ক'রে বলে, তবু তোমাকে ওদের সঙ্গে মিশতে হবে; না মিশলে চলবে কি ক'রে ?

ছবিটি বাজারে নাম করল। তবে সবচেয়ে বেশী চমক লাগাল কমলা। প্রত্যেক প্রযোজক, পরিচালকের নজর পড়ল কমলার ওপর। সবাই এক বাক্যে মন্তব্য করল, এই নতুন মেয়েটির ভিতর পসিবিলিটি আছে। এমন কি বিনয় পর্যন্ত কমলার অভিনয় দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। একসঙ্গে দুটো ছবিতে চুক্তি হ'ল কমলার। দুটিতেই নায়িকার ভূমিকা। কন্ট্রাক্টের আগাম এক হাজার টাকার চেকটা কমলা বিনয়ের হাতে দিয়ে বলে, এটা আগে ভুখরকে দিয়ে ধারটা আস্তে আস্তে শোধ ক'রে বাড়িটা উদ্ধার কর।

কমলা স্টুডিওতে ক্রমশই সপ্রতিভ হয়ে উঠতে থাকে। ভাইরেক্টর, হিরো, প্রোডাকশন-ম্যানেজার প্রত্যেকের সঙ্গে মুখ তুলে ভাল ভাবেই কথা বলে, হেসে হেসে রসিকতাও করে দু-একটা। ঘোমটার বালাইও ক্রমশ কমতে থাকে। বিনয় রায় পাশে ব'সে পরম নিশ্চিন্তে সিগারেট ধরিয়ে মুহু মুহু হাসতে থাকে। ঠিক মানিয়ে নিয়েছে কমলা, বিনয়ের মনটা উৎসাহে ভ'রে ওঠে।

ক্রমশ বিনয় রায়ের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হ'ল যে, এ লাইনে ভাগ্য আর উন্নতিটা ভোরবেলার পূব আকাশের

মতন, নামের আলোটা যেন দেখতে দেখতে বেড়ে যায়। কয়েক মাসের মধ্যেই কয়েকখানা ছবিতে কাজ পেয়ে গেল কমলা। টাকার অঙ্ক ক্রমশ বড় হয়ে আসতে থাকে। কন্ট্রাক্টের কথাবার্তা অবশ্য বিনয়ই বলে বিভিন্ন পার্টি আসে, জুয়েলারি শপের মালিক যেমন নো-কেসের ওপর হীরের নেকলেসটা রেখে দামটা জানিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, বিনয়ও ঠিক তেমনিভাবে কমলাকে সামনে বসিয়ে দর হাঁকে।

লক্ষ্যবতী কমলার ভোল পালটে গেল। লিপষ্টিক-মাখা ঠোটে হাসির ঝিলিক তুলে স্টুডিওর মধ্যে সকলের সঙ্গেই অন্তরঙ্গতা জমিয়ে তোলে সে। বয়সটা তার যেন অনেক পেছিয়ে গেল সহসা।

স্টুডিওতে বিনয় রায়ের মনের বা মানের মাপকাঠি মেপে দেখার চেষ্টা করে না কেউ। তবে এটা ঠিক, খ্যাতিনামী অভিনেত্রী কমলা রায়ের আর এসকটের প্রয়োজন নেই। তবু বিনয় রায় তার পতিষের ধ্বজা হাতে নিয়ে একটা মূর্তিমান অপ্রয়োজনের মত স্টুডিওতে ঘুরে বেড়ায়। কমলার সঙ্গে এক গাড়িতে আসে। গাড়ি থেকে নামামাত্র সবাই কমলাকে স্বর্ঘনা করে। পরিচালক হয়তো কমলার কাঁধ ধ'রে ঘনিষ্ঠভাবে তাকে মেক-আপ রুমের পাশে নিয়ে যান। ওদিকে সাউণ্ডট্রাকের পাশে বিনয় রায় একটা জীবন্ত অস্বস্তির মতন মুখে হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। হয়তো প্রোডাকশন-ম্যানেজার একটু তাক্সিলা ক'রেই 'বয়'টাকে বলে দেন, ওরে মিস্টার রায়ের জন্তে এক কাপ চা দিয়ে যা। মধ্যে মধ্যে কমলার ডাকে মেক-আপ-রুমে যেতে হয়। কমলা যখন সেটে যায়, পাশে পাশে হাসিমুখে বিনয় রায়ও থাকে।

কখনও কখনও বিনয় রায় দেখে, কমলা কোনও অভিনেতার সঙ্গে গভীর অন্তরঙ্গতায় মত্ত হয়ে উঠেছে। খুশীর প্রাচুর্যে ওর সারা দেহ উচ্ছল হয়ে উঠেছে। বিনয় রায় যেন কমলা নারী কেন নারীর জীবনে জীবন্ত কমা, কমলা তার কাছে থামে—কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকে না।

সবাই স্মৃতি নিয়ে ব্যস্ত। সহকারী পরিচালক কমলাকে সংলাপ পড়ান। পরিচালক সিনটা বুঝিয়ে দেন। ক্যামেরাম্যান পজিশন বলেন : 'এবনি' ভাবে দাঁড়ান

ম্যাডাম। সাউণ্ড রেকর্ডিস্ট মাইকের বুটটা ঠিক করে। ইলেক্ট্রিশিয়ান আলো ভালো, মেক-আপ ম্যান একটা পাউডারের পাক দিয়ে কমলার গালে প্যাড ক'রে দেয়। কর্মমুখর সেটের সকলেই ব্যস্ত, কেবল সেটের এক কোণে আখ-অঙ্ককারে একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে ম্যান মুখে ব'সে ব'সে সব লক্ষ্য করে বিনয় রায়। বিনয়ের নিশ্চয়ই একটা সাস্থনা আছে। তা বোধ হয় স্বনামধন্য আর্টিস্ট কমলা রায়ের মুখে মিসেস বিনয় রায়ের নামের লাগাম লাগানোর সাস্থনা; ওই আলোকিত সেটে মেক-আপ-লাহিত মুখে কমলা যতই হেসে হেসে ঘুরে বেড়াক, তার ইহকালের সর্বস্ব যে এই আখ-অঙ্ককারে নীরবে ব'সে থাকে। মাহুটিই। আর একটা সাস্থনা আছে বিনয় রায়ের। ভূধরের ঋণ প্রায় শোধ ক'রে ফেলেছে। আর মাত্র হাজার তিনেক টাকা বাকি। সেটা দিলেই বাড়িটা উদ্ধার হয়ে যাবে। কমলা যে রকম নাম করেছে, তাড়াতাড়িই হবে ব'লে আশা করছে সে।

দিন কয়েক পরে স্টুডিওতে—বেলা চারটে কি পাঁচটা হবে, পুরোনো স্টাডিং চলেছে। কমলার মনও খুব ভাল।

একটা নতুন পার্টি আগাম তিন হাজার টাকা একটু আগে দিয়ে গেছে। কিন্তু তবু একটা রোমান্টিক সিনের শটে বার বার ভুল হচ্ছে কমলার। শটটা এমন কিছু শক্ত নয়। বেডরুমে রাজিবেলা নায়ক তাকে বুকের কাছে টেনে নেবে। আর তার বুকেই মাথা রেখে কমলা বলবে: তোমাকে ছাড়া আমি আর কাউকে ভাবতে পারি না।

পরিচালক সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন, বার বার এন. জি. হচ্ছে কেন কমলা?

কমলা আড়চোখে আখ-অঙ্ককারে বসা বিনয় রায়কে ইশারা ক'রে দেখিয়ে দেয়। দু'রে বিনয় রায় জুলজুল ক'রে তার দিকে তাকিয়ে আছে। পরিচালক প্রথমে বুঝতে পারেন না, ছবির নায়ক ফিসফিস ক'রে বুঝিয়ে দেয়: স্বামীর সামনে পরপুরুষের সঙ্গে প্রেম করতে লজ্জা করছে।

কমলা খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে তার কথায়। পরিচালক মশাই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কমলাকে বলেন, তা তুমি শুকে একটু বাইরে যেতে বল না।

কি ক'রে বলি বলুন তো?—কমলা চিন্তিত হয়। হঠাৎ যেন একটা স্বরাহা পেয়ে বিনয়ের কাছে ছুটে যায় সে। বলে, তুমি এখনি ভূধরবাবুর কাছে গিয়ে এই তিন হাজার টাকা দিয়ে এসো। মনে ক'রে দলিল আর বসিদটা নিয়ে। আমি এঁদের গাড়িতে চ'লে যাব, কিছু ভেবো না।

কমলা বিনয়ের হাতে টাকাগুলো গুঁজে দিয়ে উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে সেই আখ-অঙ্ককার কোণটা থেকে ছুটতে ছুটতে সেটের আলোয় ফিরে যায়। বিনয় একটু থতমত খেয়ে নোটগুলো গুনতে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে সেট থেকে বেরিয়ে এসে ফ্লোরের বাইরে সাউণ্ড ট্রাকটার পাশে মৃতিমান প্রেতের মতন দাঁড়িয়ে থাকে। ভেতরে সেটের কথাগুলো সাউণ্ড ট্রাকের লাউডস্পীকারে স্পষ্ট শোনা যায়। নায়ক হেসে হেসে বলে, তোমার ওয়াচ ডগটাকে কি ব'লে তাড়ালে? কমলার হাসির গিটকিরি মেশানো কণ্ঠ শোনা গেল—ঘুঘু দিয়ে।



পুজার আনন্দে
স বা ই
প্রিয়জনকে
মৃতন অলঙ্কারে
সাজাতে
চায়—
ভাতেই মনের
আনন্দ।
“পা ই ও
নিয়া রে র
অলঙ্কারই”
আপনার
আনন্দের
দাবী রাখে।

পাইওনিয়ার জুয়েলারী
হাউস

রাজিকার ও স্বর্ণশিল্পী
৯৯এ, বড়বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সত্যি, লোকটার কোন কমনসেন্স নেই।—পরিচালকের কণ্ঠ! বাধণ করতে পার না।—নায়কের স্বর। এর পর কমলার রূঢ় কণ্ঠস্বর—ওরই বোঝা উচিত। বেহায়ার মতন আমার সঙ্গে রোজ কেন যে আসে বুঝি না।

বিনয় রায় যেন তার নিজের স্বীর বাসরঘরে আড়ি পাততে গিয়ে সাউণ্ড রেকর্ডিংকে দেখে চমকে ওঠে। পতিত্বের একটা বেআইনি ব্যক্তিত্ব নিয়ে ঠুঁড়িও থেকে বেরিয়ে ভূধর মল্লিকের বাড়ির দিকে রওনা হ'ল বিনয় রায়। পা দুটো আর চলতে চাইছিল না তার। সমস্ত পৃথিবীটা যেন পায়ের নীচে ঢুলছে।

ভূধর মল্লিক টাকাটা নিয়ে রসিদ আর দলিল ফিরিয়ে দিয়ে মুহূ হেসে বলেন, একেই ব'লে জীভাগ্যে ধন। আগনি ভাগ্যবান পুরুষ বিনয়বাবু।

বিনয় রসিদ আর দলিলটা পকেটে পুরে বাড়ির দিকে রওনা হ'ল।

আজকের দিনটা বিনয়ের আনন্দের দিন। বাড়িটা ভূধরের কবল থেকে রক্ষা পেল আজ। কিন্তু তার বদলে অনেকখানি মূল্য দিতে হয়েছে তাকে।

রাত্রি সাড়ে এগারোটা নাগাদ বিরাট একটা মোটর নামিয়ে দিয়ে গেল কমলাকে। পরিচালক মশাই গাড়ির দরজা খুলে দিলেন সসন্মানে।

বিনয় রায় চূপ ক'রে ঘরের এক ধারে ব'সে ছিল।

তুমি খেয়েছ?—কমলা ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করে।

না।—কমলার দিকে না তাকিয়ে উত্তর দেয় বিনয় রায়।

আমি খেয়ে এসেছি।—নিঃসঙ্কোচে বলে যায় কমলা: মিস্টার ঘোষ কিছুতেই শুনলেন না, হোটেল নিয়ে গিয়ে তবে ছাড়লেন। নাও, তুমি খেয়ে নাও।

মনের বোবা অভিমানটা রাগী ভোমরাব মতন শুঙ্কন ক'রে ওঠে। বিনয় আর কিছু না ব'লে খাবার ঘরের দিকে চ'লে যায়।

বিনয়ের যখন খাওয়া শেষ হ'ল, তখন রাত্রি বারোটা বাজে। কমলা শোবার যোগাড় করছে, মেক-আপ তুলে মুখে সর ও হলুদ মাখা হয়ে গেছে। তবুও ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে গালটা ঘষছে।

বিনয় পাশে এসে দাঁড়াল। কমলার আবরণহীন স্বভোল বাহু দুটির দিকে নুত্ন অথচ ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল বিনয় রায়। বিনয়ের ছোট ছোট লাল চোখ দুটোর দিকে চেয়ে কমলা হেসে বলে, ও-রকম ক'রে কি দেখছ? আবার আয়নার দিকে মুখ ঘুরিয়ে গাল ঘষতে থাকে কমলা। আয়নার বুকে দুটি স্বভোল বাহুর ওঠা-নামায় যেন অস্থির হয়ে ওঠে বিনয়। আজ সন্ধ্যায় ঠুঁড়িওতে স্টিং-এর সময় ছবির নায়ক যেমন ক'রে কমলার হাত দুটো ধ'রে তাকে বুকের কাছে চেপে ধরেছিল, ঠিক তেমনি ক'রে কমলাকে পরম আগ্রহে সবলে কাছে আকর্ষণ করলে বিনয় রায়। কিন্তু এর পরের ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিল না সে মোটেই।

এক রটকায় তাকে সরিয়ে কমলা সরোষে বলে, কি হচ্ছে? যাও। তোমার মত অপদার্থের সোহাগ খাবার সময় আমার নেই।

সোহাগ? তার মানে?

হ্যাঁ, সোহাগ। তোমাকে এতদিন সোহাগ দিয়ে দিয়ে তো পথে বসেছিলাম।

বিনয় রায় শুশুতি হয়ে যায়।

আদালতের বিচারকের ভদ্রিতে সহসা প্রমত্ত করে কমলা, ভূধরকে টাকা দিয়ে রসিদ এনেছ?

হ্যাঁ—কাঠগড়ার আসামীর মতন বিনয় রায় সবিনয়ে উত্তর দেয়।

যাও, নিজের ঘরে যাও।—স্বামীকে সামনের খোলা দরজাটা দেখিয়ে ধেয় কমলা।

বিনয় রায় তবু চূপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে।

যাও। দাঁড়িয়ে আছ কেন, আমার ঘুম পাচ্ছে।—কমলার হলুদ-সর-মাখা মুখটাকে বাধিনীর মতন মনে হয় বিনয়ের। ধীরে ধীরে ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় কমলা রায়ের স্বামী বিনয় রায়।

দরজাটা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়।

গির্নি বর্নের
কলকাতার বিপণন ও বৈশিষ্ট্য
আইডিয়াল ড্রয়লারী
২১০, বহুবিহারী স্ট্রীট, কলকাতা

রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হতে থাকে। অশান্তভাবে বিনয় বাইরের ব্যালকনিটায় পায়চারি করছিল। অসম্ভব গরম। জামাটা খুলতে গিয়ে পকেট থেকে ভূধরের রসিদ আর দলিলটা প'ড়ে গেল মাটিতে। চূপ ক'রে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে বিনয় রায়। তারপর বাড়ি ফিরে পাওয়ার রসিদ আর দলিলটা হাতের মুঠোয় চেপে রেখে রাত-জাগা চোবের মত জ্বর বন্ধ দরজার সামনে পায়চারি করতে করতে ভাবতে থাকে বিনয় রায়, আজ সে যেন সত্যিই দেউলিয়া হয়ে গেল।

স্বপ্ন-প্রিয়া

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

অসীমের প্রবতারা,

আজো আঁখি মেলে আছি তুমি জেগে আকাশে তজ্রাহারা।

দিবসের আলো ম্লান হয়ে আসে ঘনায় অন্ধকার—

ছায়াপথে মেলি ধূসর পাখায় বেদনার ব্যথাভার!

ক্লান্ত কৃৎজন-কেলি-কলরব—কাতর কুণ্ডলভরে

জীবনের পাখি বুঝি চ'লে পড়ে তন্ত্রিত চরাচরে।

ঘন তমসায় দেখা নাহি যায় নিঃসীম অঘর—

তরুণমর্মে স্ত্রীমল বনানী কম্পিত কলেবর।

নিপুণা নটিনী ছন্দে তটিনী সীমাহীন অভিবানে—

ছুটে চ'লে যায় সাগরের বুকে কল্লোল কলতানে।

সে কী ব্যথা বুকে তার—

তুমি কী জান না কার লাগি সেই অনন্ত অভিমার?

স্বস্তি-বেদনার বিহ্বলভায় হৃদয় স্বপ্ন ছাওয়া—

শোন নাই সে কি বিরামবিহীন অসীমের গান গাওয়া।

আমি খুঁজে কিরি সেই নিখিলের সঙ্গীতে ভরপুর—

জানা-অজানার সন্ধি-গগনে ছন্দিত নব স্বর।

জীবনের প্রবতারা,

এসেছিলে তুমি সে কোন্ ফাণ্ডনে, আপনাতে হয়ে হারা—

কম-তলুখানি সাজিয়ে যতনে, নয়নে কাঁদল মায়া—

লীলাচঞ্চল অঞ্চলপাতে বিশ্ব-ভুবন ছায়া—

কণ্ঠে দোলানো মুকুতার হার কাঞ্চন রাখী হাতে,

ইজিতভরা ছন্দ বিখারি মাধবী পূর্ণিমাতে

কয়েছিলে তুমি কানে কানে কথা, “হে মোর বিহ্বল,

এখনো কী আর বাকি আছে কিছু? বল, তবে প্রিয়তম,

কেন বাঁধবে না হৃদয়নীড়খানি আমার পরাগমাঝে?”

কহিছ তাহারে, “বিহগী আমার, এখনো যে কানে বাজে

সেই হাসি গান, প্রেম-আহ্বান জীবনের পারাবারে।

কত সাধনায় গড়েছিছ মোর স্বপ্নের প্রতিমারে—

এ কী সেই তুমি? সে কী এই রূপ? আমার স্বপ্ন-প্রিয়া—

মানসের পটে একেছিছ বায়ে কল্পনা-তুলি দিয়া।

তুমি যে সীমার ছবি

বন্ধ-মনের অন্ধশূন্য পথে না প্রভাত-রবি।

আঁখিপল্লবে কই জাগে না তো অসীমের নীরবতা

জাগে না নিখিল-বিরহ-পাখার উজ্জ্বলে ব্যাকুলতা!

ওগো প্রিয়তমে, এ তো তুমি সেই স্বপ্নের প্রিয়া নও—

মিছেই মর্ম নিভাড়া ব্যথার প্রদীপ জালিয়া বও—

স্বপ্ন-মুকুরে কোথা সেই ছবি—ললিত লাস্ত্রভরা—

হাস্ত-মধুর লাবণি-উছল রক্ত-বিষাধরা।

তুমি মোরে ভোল নাই—

কবরীবক্ষে মল্লিকাফুলে মণিচূড়া বাঁধা তাই।

চুষনে তব ফুটে ওঠে যেন রক্তিম শতদল—

পিয়াসী মনের সঞ্চিত ব্যথা নিরুদ্ধ-পরিমল

যেন পেতে চায় আশ্রয় তার আমার গুণ্ড-পুটে—

দেহের দেউলে নীরবে কখন মনের আয়তি লুটে।

হে মোর মানসী প্রিয়া—

এই চাওয়া-পাওয়া নিঃশেষ করি নিজেই ঢালিয়া দিয়া,

ভাল তো লাগে না, এই ভুলে থাকা ওই বাহবন্ধনে—

ভালবাসি তোমা গৈরিক বাসে অহুঃসাগ-চন্দনে!

চৈত্র নিশীথে বকুল-গন্ধে সমীরণ মধুর—

দিগন্ত দেয় হাতছানি মোরে কেন যে নিরন্তর—

কোন্ হৃদয়ের বারতা বহিয়া স্রবণনদীর কূলে—

স্বপ্নের খেয়া রহিয়া রহিয়া তাই কি উঠিছে ঢলে।

জানি তুমি পাবে তুষ,

জানি মোর মুখে একটু হাসির লাগি তুমি উন্মুখ।

তবু, তবু মোর বিধুর পরাণে তোমারে ধরিতে নারি—

কল্পনা-রসে রাঙায়ে তবুও রয়েছে তোমারে ছাড়ি।

তুষিত ধরণী 'পরে

সে কোন্ মিলন-রাগিণী-মধুর বাঁদলের ধারা ঝরে।

চুষনে তার নেচে ওঠে ধরা জেগে ওঠে তার প্রাণ—

সোহাগপরশে ফুলে ফলে চলে নিবিড় আশ্রয়দান।

তপ্ত নিদ্রাঘে সেই জলধারা আবার উঠে ওঠে—

উধাও পরাণে নীলিমার পানে আকুল হইয়া ছোটে।

মোর জীবনের ওই রূপছবি হেরিয়া মুখ আমি—
তোমাতে ঘিরিয়া আমারো স্বপন হয়েছে উল্লস গামী।

নয়নে বিজলী হানি

স্বপনের প্রবর্তা—

তোমারি লাগিয়া আগর নয়নে স্থপ্তি হয়েছে হারা।
সেদিন বধন মান সন্ধ্যায় ছয়াতে দাঁড়ায়ে আছি—
জানি তুমি আছ স্বপ্নে আমার একান্ত কাছাকাছি—

তবু কেন, বল, আরো কাছে যেতে সংশয় নিশিদিন—
তুমি কি পারো না আমার স্বপ্নে তোমাতে করিতে সীন ?

কহিল প্রেমসা, “না না প্রিয়তম, এ কথা কত না মানি—
বাস্তব তবে সত্য নহে কি—সে কি গো মিথ্যা সবি ?
সত্য কি তবে স্বপ্ন তোমার, আমি শুধু তারি ছবি ?”
কহিল প্রিয়ারে, “পূর্ণ আলোকে তোমাতে পাই না কাছে—
তুমি থাকো মোর আশির বন্ধে কল্পনালোক মাঝে।
নিত্য সেখায়-বাঞ্চে উৎসবে আমার চিত্তবীণা—
চিরমহিমায় বিরাজো তুমি যে চির প্রেমে অমলিনা।”

কামনার প্রবর্তা—

আমার মানস-কবিতাকূলে তোমাতে আশ্রয়হারা।

উপনিবেশ

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

আকাশের উপকূলে আষাঢ়ের মেঘের শিবির
নির্জন নিবিড় হয়, শেষ আলো নেভে পৃথিবীর।
বাল নদী গ্রাম ঘর ‘কিরাই’র খেয়াঘাট দূরে,
স্টেশনের লাল আলো ধ্যানের গানের মুহূর্তে,
সব যেন কথা কর ছায়া-ছায়া অন্ধকার মেখে—
নাগর-স্বপ্নের রাত পথে পথে চলে যায় ডেকে।

শিরীষ ও সুপারির সারি সারি বিষণ্ণ বন :
এখানে কি ক’রে যেন মিলে গেছে মৃত্যু ও জীবন
আমাদের সকলের। তারপর
কতদিন কত যুগ অতলান্ত দুসর গ্রহর
প্রতিদিন বয়ে চলে দান্য মৃত মুহূর্তের ডালি,
স্বপ্নান আকাশ শূন্য, জেগে নাই দীপের দেয়ালি।

আমার স্বপ্নের চোখে মৃত্যুর বরফ ঢাকা দেশ
মেঘলা সন্ধ্যায় নামে। দিগিদিকে কোথা তার শেষ।
মালভূমি গিরিপথ দুই মেরু প্রান্ত পার হয়ে
তিমির তুষার জমে। পৃথিবীর রাজি চলে বেয়ে
নূতন দীপের দিকে, অস্থিত জীবনকে ফেলে
রাজির প্রতীক আসে আকাশের রুদ্ধঘর ঠেলে।

আমি কি কসিল কোন ? স্বগতীর অরণ্যের স্তরে
আমার প্রাণের আলো জ’মে গেছে মাটি বালুচরে ?
তবে কেন এই সন্ধ্যা কেবল মৃত্যুর ছবি আনে
আকাশ প্রান্তর পথ নদীতট বন সবখানে।
কেন এই পাণ্ডুলিপি, মেঘের শিবির আগা দেশে—
আমি যে জীবন চাই ঘাস-মাটি আরো ভালবেসে।

প্রশ্নোত্তর

প্রভাত বস্তু

ক্ষুদ্রতম কবিতাটি লিখিলাম কাহার ললাটে ?
সবচেয়ে বেশি মূল্য দিই বারে সাহিত্যের হাতে।

বিশ্ব-শিশু

কুমারেশ ঘোষ

[রসরচনা]

উদ্ভাসনাগরে সূর্য অস্ত গিয়াছে অনেকক্ষণ।

সমুদ্রের নীল জল লাল হইয়া, ধূসর হইয়া, অন্ধকারে কালো হইয়া গিয়াছে কখন কেমন করিয়া, ধোলাই নাই। অথচ রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম সারাক্ষণই।

চমক ভাঙিল সহযাত্রী বন্ধুটির ডাকে। মনে করাইয়া দিল, আজ ডিনারের পর বল-ভাঙ্গ। শুধু তাই নয়, ডিনারের পর এক বকম জোর করিয়াই সে আমাকে টানিয়া লইয়া গেল ডালিং হলে এবং বসাইল আমাকে একখানি চেয়ারে এবং নিজেও বসিল আর একখানিতে।

সাজানো হল। জাজ-বাজনা বাজিতেছে। নারী পুরুষ নাচিতেছে জোড়ায় জোড়ায়। একধারে বার। নানা রঙের তরল পদার্থ বিক্রয় হইতেছে গেলাসে বোতলে। স্বর আর স্বরার ঘরখানি ভরপুর।

স্বর আর স্বরার স্রোতে কতক্ষণ হাবুডুবু খাইয়াছিলাম জানি না, হল হইতে বাহির হইয়া আসিলাম প্রায় টলিতে টলিতে। জাহাজ টলিতেছে, না, আমি টলিতেছি? মাথাটা ঝিমঝিম করিতেছে। পা ভারি। করিডর দিয়া কোনক্রমে বাহির হইয়া ডেকে আসিয়া দাঁড়াইলাম সেই রেলিংয়ের ধারে।

চারিদিক কালো আর কালো। অন্ধকার। নিঃসঙ্গ জাহাজখানি একটানা চলিয়াছে পশ্চিম বিশ্ব হইতে পূর্ব বিশ্বের দিকে। হু-হু করিয়া বাতাস বহিতেছে, যেন ঝড়। জলের একবেয়ে মশক দাপানি, সন্দেশ আলোড়ন। জাহাজের গায়ের ম্লান আলো পড়িয়াছে সেই অশাস্ত জলরাশিতে। একটু ঝিকমিক করিতেছে মাত্র। মাথার উপরে এক আকাশ তারা। সী-গালগুলির আর দেখা নাই। কোথায় গেল তাহারা?

গলার নেকটাইটা ঢিলা করিয়া একখানি ডেক-চেয়ারে পা ছড়াইয়া শুইলাম। আঃ! ভিতরে ডালিং হল হইতে আগিতেছে জাজ-বাজনার স্বর। আনন্দের হুজোড় চলিয়াছে। জাহাজের প্রায় সব লোক জড় হইয়াছে সেইখানে, কাজেই ডেকটা খালি।

উয়া! উয়া!

সহসা শিশুর ক্রন্দনধ্বনি ভাসিয়া আসিল কানে। কোন যাত্রীর শিশু-সন্তান হয়তো। ঝাড় ফিরাইয়া এদিক ওদিক দেখিলাম, কই, কেহই নাই তো!

আমি চোখ বুজিয়া ডেক-চেয়ারটায় শুইয়া রহিলাম।

হঠাৎ মনে হইল, কে যেন আমার হাঁটু ধরিয়া কোলে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। চোখ মেলিয়া দেখি, এক নবর-কান্তি নয় শিশু। আশ্চর্য, বড়টি তার হরি-হরের মত অর্ধেক সাদা, অর্ধেক কালো। চোখে কান্নার চিহ্ন নাই, মুখ দিয়া লালার ঝরিতেছে।

কে তুমি?—চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম।

আমি বিশ্ব-শিশু।—শিশুটি পরিকার গলায় বলিল।

সে আবার কি?

শিশুটি বলিল, তুমি না বিশ্ব ঘুরে এলে?

তা তো এলাম।

আর বিশ্ব-শিশু কি জান না? গ্রাকা!

কথাটি শুনিয়া রাগ হইল। আচ্ছা অসভ্য তো! বিশ্ব-বকাটে! কাকানি দিয়া ছেলেটাকে কোল হইতে সরাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সে আমার নেকটাই চাপিয়া ধরিল : আহা-হা রাগ করছ কেন?

তবু ঝাঁজাইয়া উঠিলাম : বিশ্ব-বকাটে তুমি। বেশ তো কথা শিখেছ দেখছি! কত নবর কেবিন তোমাদের? তোমার বাবা মা কোথায়? এখানেই বা এনেছ কেন জালাতে? জামা কাপড় জোটে নি? কি জাত তোমরা? অদ্ভুত তো-গায়ের রঙ! বাংলায় কথাও তো বলছ! বাঙালী?

বিশ্ব-শিশু একগাল হাসিয়া আমার বুকে মাথা ঘষিল। এঃ, শার্টটায় লাল লাগিয়া গেল। তাহার মাথা উচাইয়া ধরিলাম। বিশ্ব-শিশু বলিল, বাবা, এতগুলো প্রশ্ন! মাষ্টারি কর বুঝি?

ঝাড় প্রেসার ছিলই, বাড়িয়া গেল। বলিলাম, সে ধবরে তোমার কি দরকার? উত্তর দাও আমার কথা।

বিশ্ব-শিশু বলিল, একটু মাথা ঠাণ্ডা করে শোন। একটুতেই ছোট ছেলের মত অর্ধেক হলে চলে?

বটে। এক রত্তি ছেলের মুখে কথা শোন। ছেলোট
বজ্রাত তো কম নয়।

বিশ্ব-শিশু বলিল, জাত আমার নেই। শিশুর আবার
জাত থাকে নাকি? জান না?

কিন্তু বাংলায় তো কথা বলছ?

জাপানীতে কথা বললে বুঝবে?—বিশ্ব-শিশু মাড়ি
বাহির করিয়া ফাজিল হাসি হাসিল।

বলিলাম, জাপানী জানি না, তা বুঝব কেমন করে?

আরবী?

তাড়াতাড়ি বলিলাম, না।

তাই মশাইয়ের সঙ্গে বাংলাতেই কথা বলছিলাম।

তাহাকে খোঁচা দিয়া বলিলাম, এত কথা, কিন্তু একটা
ছেঁড়া কাঁধও তো জোটে নি দেখছি। একেবারে
দিগম্বর।

বিশ্ব-শিশু হাসিল, মশায় বুঝি কোর্ট-প্যান্ট-নেকটাই
বগলে ক'রেই এসেছিলেন এ পৃথিবীতে? না, একেবারে
উজবুক—সরি। কিছু মনে ক'রো না।

কিন্তু খামা খামা বলি তো মুখে পুরে এনেছ দেখছি।

বলি।—বিশ্ব-শিশু যেন অবাক হইল : জান না, এ সব
পাকা পাকা বলি মুখে না থাকলে এ সংসারে টেকাই হুহুয়?
তাই বোধ হয় বিশ্ব-পিতা পাষ্প ক'রে মুখে পুরে দিয়েছেন
বলিগুলো।

কিন্তু বিশ্ব-পিতা তোমার গায়ের রঙটি অমন বিদ্যুটে
করেছেন কেন?—হাসিয়া বলিলাম, এখানে আসবার জন্তে
হাঁকপাক করছিলে বুঝি, তাই সাদা-কালো রঙটা ভাল ক'রে
মিশিয়ে দিতে পারেন নি?

বিশ্ব-শিশু এবার আমার নেকটাইটি তার কচি আঙুলে
জড়াইতে জড়াইতে মুখ ভার করিয়া আহুরে গলায় বলিল,
এই জন্তেই তোমাকে যা-তা বলতে ইচ্ছে করে। সারাটা
বিশ্ব যখন সাদা আর কালোয় ভাগ হয়ে গেছে, তখন বিশ্ব-
শিশুর গায়ের রঙটা তিনি মিলিয়ে দেবেন কোন্ আক্কেলে?
তুমিই বল?

ঠিকই তো। চুপ করিয়া সেলাম।

হঠাৎ মনে-পড়িল, বিশ্ব-শিশুর কামা যেন শুনিয়াছিলাম
—উয়া-উয়া! জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কীদছিলে কেন?
যিমে পেয়েছে? বিস্কুট খাবে? কেবিনে আছে, এনে দেব?

না।—বিশ্ব-শিশু হাসিল : এ যিমে বিস্কুটে যায় নাকি?
এ যে বিশ্ব-সুখ। এই উয়া-উয়াই হচ্ছে বিশ্ব-ক্রন্দন।
এ কি তোমার ক্রীম-ক্র্যাকার বা খিন এরাকুট বিস্কুটে যায়?

বিশ্ব-শিশু আমার পেটের দুই ধারে তাহার দুই পা
ছড়াইয়া ঘোড়-সওয়ার হইয়া বসিল। দুই হাত নাড়িয়া
শুরু করিল : এই যে দেখছ আমার একধারে ইউরোপের
সাদা বিশ্ব, আর এক দিকে আফ্রিকার কালো বিশ্ব, শুনতে
পাচ্ছ এদের বিশ্ব-ক্রন্দন? এক দিকে সাদা বিশ্বের লালা-
ঝরানো খাই-খাই বায়না, আর এক দিকে কালো বিশ্বের
ছাড়-ছাড় ক্রন্দন। এবার আরও মনোযোগ দিয়ে শোন,
শুনতে পাবে বিশ্ব-মানবের চাপা কামা—উয়া-উয়া।

কান পাতিয়া শুনিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কানে
আসিতে লাগিল ডাম্‌পিং হলের বাজনা। বলিলাম, কই
কিছুই তো শুনতে পাচ্ছি না।

বিশ্ব-শিশু ভেংচাইল : তা শুনবে কেন? কানে তুলো
গোঁজা আছে বুঝি?—বলিয়াই তাহার দুই আঙ্গুল আমার
দুই কানের ছিদ্রে ভরিয়া খানিকটা ঘুরাইয়া দিল : নাও,
শোন এবার। শুনছ?

শুনছি। ডাম্‌পিং হলের বাজনা।

ঘোড়ার ডিম!—বিশ্ব-শিশু তাহার বড়া আঙ্গুল
দেখাইল : ওই বাজনার আড়ালে শুনতে পাচ্ছ না উয়া-উয়া
কামা, দাও-দাও রব। এই দাও-দাও রবের বিশ্ব-ভাবা
হচ্ছে—উয়া-উয়া। তাই বিশ্বের সব জাতের শিশুরই ওই
এক কামা—উয়া-উয়া, দাও দাও, খেতে দাও। তফাত
শুধু, আমাদের মত সরল শিশুরা চোঁচিয়ে কাঁদে, তোমরা
পাকা বুড়োরা রেখে-ঢেকে কাঁদো।

বিশ্ব-শিশু কথার তুবড়ি ছুটাইল যেন : দেখো নি ঐ
নাচের আসরে মুখে রঙ ঘষা মেয়েরা তুটানানার মত দাঁত
বার ক'রে হেসে হেসে কথা বলছে, অন্তরে কিন্তু চলেছে
সেই উয়া-উয়া কামা, দাও-দাও, আরো দু পেগ দাও, আরো
দুটো স্কাউটইচ দাও। পুরুষ-সদীরাও তেমনি মুখে হাসি
নিরে বলছে, দাও-দাও, দাও, কিন্তু অন্তরে উয়া-উয়া, দাও-
দাও, একটু আনন্দ দাও, আঙুনের পরশমণি ছোঁয়াও
প্রাণে।

বটে।—বলিলাম : আমাদের কবির গানও জান
দেখছি।

বিশ্ব-শিশু আমার নাকটা মুচড়াইয়া দিয়া বলিল : ওহে স্বার্থপর, কবি তোমাদের একলার নয়। বিশ্ব-কবির গান বিশ্ব-শিশু জানবে না? হ্যাঁ, বা বলছিলাম, ওই সাদা বিশ্ব উয়া-উয়া কাদছে—আমাদের জায়গা কম, খাওয়া কম, দাঁও-দাঁও। কালো বিশ্বও কাদছে—উয়া-উয়া, যাও-যাও, ঢের হয়েছে, দাঁও আমাদের স্বাধীনতা। তবে হ্যাঁ, তোমাদের ভারত দেখাল বটে!

কি রকম?

ইংরেজের লাঠি আর বৃট্ট খেলে, তবু তার পা ছাড়লে না। সেই যে শুরু করলে ছিঁয়ে-পেছুর মত উয়া-উয়া কান্না, দাঁও-দাঁও, আমাদের দেশ আমাদের দাঁও, ইংরেজের সে কান্নায় ঘেমা ধ'রে গেল। শেষ পর্যন্ত তোমাদের হাত থেকে পা ছাড়িয়ে দেশে পাড়ি দেবার পথ পায় নি। এবার আবার কান্না শুরু করেছে, গোয়া দাঁও, গোয়া দাঁও।

বলিলাম, কিন্তু গোয়ার ব্যাটারা শুনেছে কৈ? ইংরেজ সভ্য, তাই মানে মানে চ'লে গেল।

বিশ্ব-শিশু বলিল, এটা বোক না কেন? পৃথিবীর একটা পুঁটিরাজ্য ওই পজু'গাল। কই-কাতলার সংস্কৃতি ওরা পাবে কোথায়? তবে ছেড়ো না ওই বিশ্ব-জয়ী উয়া-উয়া কান্না। ওই কান্নাই এ যুগের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। এ সংসারে দুর্বলের একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র। দেখো নি, শিশু হাত ছুটি মুঠো করে প্রাণপণে উয়া-উয়া করছে—হুহু দাঁও। ছাত্তর মন্দিরে মাথা ঝুঁকে উয়া-উয়া করছে, পাস করিয়ে দাঁও। তরুণ তরুণীর আঁচল ধ'রে উয়া-উয়া করছে, প্রেম দাঁও। গ্রহিণী কর্তার কাছা ধ'রে উয়া-উয়া করছে—খরচ দাঁও, শাড়ি দাঁও, গয়না দাঁও। বেকার-অফিসে অফিসে উয়া-উয়া করছে—চাকরি দাঁও। চাকুরে প্ল্যাকার্ড কাঁধে দল পাকিয়ে উয়া-উয়া করছে—ভাতা দাঁও, বোনাস দাঁও। এমন কি, যে লোকটা পরপারে যাবার জন্তে খাবি খাচ্ছে, তার পাশেও আত্মীয়দের ওই উয়া-উয়া কান্না—যাবে যাও, তোমার সম্পত্তি দাঁও।

কি, এবার পেয়েছ শুনেতে ওই কান্না?

হ্যাঁ!

এমন সময় কানে আসিল, পুরুষ-নারীর মিলিত হাসির শব্দ। ঘাড় ফিরাইয়া দেখি, উপরের ছোট ডেকটার আমার পূর্ব-বিশ্বের বন্ধুটি পশ্চিম-বিশ্বের এক তরুণীর সঙ্গে হাসি-ঠাট্টায় মত্ত। স্থানটি নির্জন, প্রেমোপযোগী।

বিশ্ব-শিশু বলিল, দেখছ সাদা আর কালো বিশ্বের স্বার্থে ভরা প্রেমালাপ! ওরাই বিশ্ব-শিশুর বাপ-মা। বিশ্ব-প্রেমিকরা আজকাল জলে-স্থলে আকাশে বিচরণ করছে। আর, জগৎ পারাবারের তীরে যে সব ছেলেরা করে খেলা, তা'রাই আমার মত বিশ্ব-শিশু। বুঝলে?

আমি এক মনে বন্ধুবরের কাণ্ডটা দেখিতেছিলাম, বিশ্ব-শিশু হঠাৎ আমার চোখ টিপিয়া ধরিল, ওদের দিকে অমন ক'রে হাঁ ক'রে কি দেখছ? বোক-চন্দর!

লজ্জা পাইয়া ঘাড় ফিরাইলাম।

এ কি! বিশ্ব-শিশু কখন যেন কোল হইতে নামিয়া পড়িয়া রেলিংয়ের কাছে দাঁড়াইয়া কোকলা দাঁতে হাসিতেছে। ডান হাতখানি উচাইয়া নাড়িল সে, শুভবাই—আরেভোয়া—বিদায়!

বাস! সঙ্গে সঙ্গে রেলিং গলাইয়া ঝাঁপ দিল সমুদ্রে।

চমক ভাঙিল : আরে! আরে! তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গেলাম রেলিংয়ের কাছে।

জাহাজের গায়ের ম্যান আলোয় ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখি, কেনিল জলতরঙ্গে ভাসিতেছে একটি বড় ডল পুতুল।

মনে পড়িল, পুতুলটি মেরীর, মহম্মাদী মার্টিন-মস্পতির শিশুকন্ডার। সন্ধ্যাবেলায় পুতুলটি লইয়া খেলিতে খেলিতে আমার কোলে রাখিয়াই চলিয়া গিয়াছিল সে। বুঝি, ঝ'ড়ে হাওয়া ডলটিকে উড়াইয়া লইয়া জলে ফেলিয়াছে।

ডল হারাইয়া পরদিন মেরী কাদিতে লাগিল : উয়া-উয়া—দাঁও—আমার ডল দাঁও।

বসে নামিয়া কিনিয়া দিয়াছিলাম তাহাকে একটি পোশাক-পরা ডল।

এই একটি মাস কল্যাণীর আর অবসর বলতে এক তিলও থাকে না। সংসারের ‘ছিটি’ কাজ তো আছেই, তার উপর ‘মায়ের রূপরচনা’। ই্যা, পাড়ার আর সবাই বলে ঠাকুর তৈরি, কিন্তু কল্যাণী বলে রূপরচনা—এ কথাটা ‘ওর নিজস্ব নয়, স্বর্গতঃ ঠাকুর অর্থাৎ স্বর্গের শিবশঙ্কর ঠাকুর এই আখ্যাই দিতেন প্রতিমা-মূর্তিকে।

কৌলিক পূজার আর কিছুই বজায় নেই।

পাড়ার কোঁতুলী ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এসে জমেছে। আজ মো-মেটে হবে। ওরা যোজ আসে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে দেখে—স্নান মুখে কথার জবাব দিতে দিতে কল্যাণী হাতে কাজ করে যায়।

আজও সকালে উঠে বাসিপাট সাত-তাড়াতাড়ি চুকিয়ে পুকুরে ডুব দিয়ে এসে রূপরচনার কাজে লাগল কল্যাণী। হাতে আর মোটে সময় নেই, ক’দিনই বা বাকি। অথচ এবারে চাঁদাপত্র একদম আদার হচ্ছে না। হবে কি করে, পাড়াতে যে বড়লোকেরা ঘরবাড়ি করেছে, তাদের সর্বজনীন পূজোর দিকেই সবাই ঝুঁকছে। সর্বজনীন পূজোর বিরাট প্যাণ্ডাল, ঠাকুর আসেন লরিতে চড়ে। তিন দিন তিন রাত ধরে চলে নানা রকমের তামাশা। সেখানেই যায় মোটা মোটা চাঁদা। তা বাক, সে জন্তে কল্যাণীর চুখ নেই, কিন্তু আটআনা-চারআনার বরাদ্দটুকুও যদি বন্ধ হয়ে যায় তো মায়ের সামনে ধূপ-ধুনোটুকু দেবার সামর্থ্য থাকবে না যে কল্যাণীর। শুধু কি চোখের জলেই মাকে আবাহন করবে কল্যাণী এবার। তার জন্তে রূপরচনার দরকার ছিল না, প্রতিনিয়ত ধ্যানেই তো সে মায়ের কাছে মিনতি জানায়, মুক্ত কর মা, মুক্তি দিয়ে তোমার চরণে টেনে নাও।

তবু কল্যাণী মাটি থেকে ফাল্গু ইট-পাটকেল বেছে ফেলে দিয়ে জল ঢালে। নরম কাদা মাখতে মাখতে স্বামীর উদ্দেশ্যে গলা একটু চড়িয়ে বলে, ওগো, ওঠ। বেলা যে অনেক হ’ল, চাতাল ছাড়িয়ে স্বর্গি ঠাকুর মন্দিরে চুকলেন।

মন্দির, তবে মাথার খোলার খাপরা, মাটি-লেপন ছাচাচর বেড়া, অবশ্য মেঝেটুকু লাল সিমেন্টের। সবই

তো সেই স্বর্গের আমলের। তাঁর কাছেই কল্যাণী ঠাকুর-গড়া শিখেছে। বারো বছরের মেয়ে, আদর করে ঠাকুর বলতেন—গৌরী। গৌরীদান করেছিলেন কল্যাণীর বাবা। তখন এই সংসারে লক্ষ্মী ছিলেন বাবা। শিবশঙ্করের পূজার্নার রীতি ছিল রাজসিক। আর পাড়া ছাড়িয়ে মহল্লার তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল।... কল্যাণীর চোখে সে সব স্বপ্ন ছবি হয়ে আজও বেঁচে আছে। এখনও প্রতিমার রূপরচনার কালে সেই ছবিগুলিই ভেসে ভেসে আসে।

পাশের ঘরে অন্নদাশঙ্করের খড়মের শবে কল্যাণীর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। বাক, আজ তা হ’লে মা মুখে তুলে চাইবেন মনে হচ্ছে। একবারের ভাকে অন্নদার ওঠার কথা নয়, তিন-চার দফা ভাকাভাকির পর বিরজি-ভরা জুকুটি নিয়ে সে ওঠে। হবে না কেন, গাঁজার আড্ডায় নিমতলার শ্রমদ্বাটেই তো রাত এগারোটা-বারোটা বাজে। কিছু বলবার উপায় নেই। বললেই কটাস করে জবাব মিলবে: তা গৈজেলের ঘরে থাকতে মন না চায় তো গেলেই পারিস মাতাল নাগরের পাকা দালানে। এর পিছনে যে ইতিহাস আছে সেটা কল্যাণী মন থেকে মুছে ফেলতে চায়। তবু এক-এক সময়ে অন্নদার খোঁচা খেয়ে স্থিতিপটে জেগে ওঠে একটি স্বপ্নের দিব্যকান্ত তরুণ মুখ। আহা, শেষ পর্যন্ত ছেলেটা মাতাল হয়ে গলায় দড়ি দিয়ে চৌমাথার মোড়ে অশ্বখগাছের ডালে ঝুলে ছিল—শীতের রাতে। গা শিউরে ওঠে। মিথ্যে কথা নয়, কল্যাণীকে ছেলেটা ভালবেসেছিল। নল-খাগড়ার জ্বলল কেঁটে প্রথম দোতলা ইয়ারং এ পাড়ায় ওরাই প্রথম তোলে। অন্নদার সঙ্গে রোজই আসত ছেলেটা। কল্যাণীকে ‘বউদি’ বলে ডাকত। আস্ত পাগল ছিল। পাগল না হ’লে অমন ভালবাসতে পারে। সে বাক, আজ অন্নদাকে বুঝিয়ে স্থিতিয়ে চাঁদা আদায়ে পাঠাতে হবে। নইলে মায়ের কোরা শাড়ি অন্ততঃ একখানা কিনবে কি দিয়ে? নিজের সাধ্যমত কল্যাণী প্রতিমা গড়ছে। কিন্তু তিনখানা শাড়ি তো চাই,—মা দুর্গার দশহাত শাড়ি, লক্ষ্মী-সরস্বতীর নয়—আটহাতী হ’লেও

চলে। কলা-বউয়ের জন্ত বড় গামছা একখানা। আর—
আরও আছে কান্তিক-গণেশের ধূতি। আর ভাবতে
পারে না কল্যাণী, অনেক টাকা চাই যে।

কোন কালেই অন্ন কিছুর ভাবে না। তবে তাকে
দিয়ে করিয়ে নিতে হয়। তাতে কল্যাণীর আপত্তি নেই।
পুরুষ মানুষ একটু আলা-ভোলা হতেই পারে। কিন্তু
মেয়েদের তো হাল ছেড়ে হাত-পা ছড়িয়ে বসে থাকলে
চলে না। কুলবধুর দায়িত্ব সামান্য নয়। লৌকিক মর্যাদা
তাকে বজায় রাখতে হবে।

এই মর্যাদার দায়িত্ব কল্যাণীকে অষ্টপ্রহর উদ্বাস্ত ক'রে
রেখেছে। তবু রক্ষে যে ছেলেপুলে নেই। তাদের
খাওয়ানো-মাখানোর কামেলা নেই। আছে এই মন্দির,
আর আছে অন্নদাশঙ্কর। দু-দশ ঘর যজমান এখনও যেতে
যেতে টিকে রয়েছে। তাদের অন্নপ্রাশন, বিয়ে, শ্রাদ্ধ,
সত্যনারায়ণ, লক্ষ্মীপূজার কল্যাণে এখনও বংশসামান্য
রোজগারপত্র হয় অন্নদাশঙ্করের। তবে তারা নিতান্ত
গরিব বস্তির বাসিন্দে। বড় বড় ঘর তো অন্নদাশঙ্করের
হাতছাড়া হয়ে গেছে কবেই।...মাটির ওপর নতুন মাটির
হালকা প্রলেপ দিতে দিতে কল্যাণী বলল, ওগো, একবার
ইদিকে শোন।

মাড়া এল : কলকে সাজা নেই কেন ?

ওমা, দেখেছ, একদম ভুলে গেছি। এই যে, আমার হয়ে
এসেছে। দাঁড়াও, যাই।

থাক, আর সোহাগ কাড়তে হবে না। যা করছ তাই
কর। আমি আবার একটা মানুষ, তার আবার তামাক !

আচ্ছা, এই সাত-সকালে স্বগড়া মুখে ক'রে উঠলে !
বলছি, ভুল হয়ে গেছে।

ভুল ! আমি আর বুঝি নে ! অচ্ছেদা ! আচ্ছা, আমিও
শিবুঠাকুরের ব্যাটা তোমাকে দেখাব, ভুলকে ঠিক করতে
হয় কি ক'রে ?

মুখ বুজে থাকাই ভাল। আর একটি কথা কইলে,
কলকেটা আছড়ে ভাঙবে, তখন কেনার পরসী যোগাড়
করতে হবে কল্যাণীকেই। যোগাড় মানে—ধার। সে
ধারটুকু শোধ হবে কবে তার ঠিক নেই। মনে মনে
কল্যাণী প্রমাদ গনল—এই মেজাজের ওপর চাঁদা চাইতে
যাওয়ার কথা বললে আর রক্ষে থাকবে না। কিন্তু না

বললেই বা চলবে কি ক'রে। এমনি সঙ্কোচ ক'রে ক'রে তো
এতদিন কেটেছে। আর চলে না।

ওদিকে বাচ্চাদের প্রশ্ন : খড়ি দেবেন কবে ? রঙ
দেবেন কবে ? এমন মাখনের মত মাটি কোথায় পাওয়া
যায় ? আমার একটু দেবেন ?

কল্যাণী হাসিমুখে ওদের কথার জবাব জুগিয়ে যায়।
আর উৎকর্ষ হয়ে থাকে। পাশের ঘরে কি ঘটছে-না-ঘটছে
শুনে বোঝবার চেষ্টা করে।

হাঁকোর টান উঠতে কল্যাণী স্বস্তির নিশ্বাস কেলে
বাচল।

পাশের ঘর থেকে অন্নদার সাড়া এল : বলি মাটি তো
খুব লাগানো হচ্ছে। তারপর, কি দিয়ে কি হবে শুনি ?

মন্দির থেকে কল্যাণী হেসে উত্তর দিল, মায়ের কাজ
তিনিই করিয়ে নেবেন। ইত্যিকাল তো এইভাবেই মা এসে
পূজো নিয়েছেন, এবারও নেবেন।

তোমার আর কি, বসে বসে মাটি মাখছ, খড়ের
গোঁজা দিচ্ছ। কিন্তু বাইরের ছুনিয়া যে বদলে বরবাদ হয়ে
গেল সে খবর রাখ ? জান এবার আরও একটা পূজো
বাড়ল পাড়াতে। চাটুজ্যোদের দলের সঙ্গে গাঙ্গুলীরা আর
এক হয়ে পূজো করছে না। 'সাধারণ' দল বেরিয়ে গিয়ে
নতুন পূজো করছে। বলি, চাঁদা তো দেবে এই পাড়ার
লোকেই, তোমার এবার আশার গলায় থোলামুচি।

বসে বসে অত না ভেবে একবার বেরোও না গো।
তুমি গিয়ে দাঁড়ালে মুখের ওপর না বলতে পারবে ভেবেছ !
ছ-চার আনাও তো দেবে মায়ের নামে।

মাথা ধারাপ নাকি ! এই কেলেঙ্কারির পর—

কেলেঙ্কারি অবশ্য একটা বড় রকমেরই হয়ে গেছে—
মাস দেড়েক আগে। এর আগেও ছ-চারবার এ রকম
কেলেঙ্কারি অন্নদার দৌলতে ঘটেছে, তবে এবারের মত
টিটিকার পড়ে নি কখনও। তা, তখন পাড়ার তেমন
লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা কমই ছিল। আর দেব-
দ্বিজে ভক্তির এতটা দৈন্তও ঘটে নি। এবার যেন বড়
বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। ওই পুকুরপাড়ের ফুটফুটে
বউটার সঙ্গে অন্নদার ফটিনটি কল্যাণীর নজর এড়ায় নি।
দু-একবার আকারে-ইজিতে কল্যাণী বুঝিয়েও দিয়েছে
অন্নদাকে, সাবধান হও। কিন্তু গরিবের কথা বাসি না
হ'লে তো মিষ্টি লাগে না !

একদিন সন্ধ্যাবেলা হৈ-চৈ প'ড়ে গেল। একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়েছে আসামী। ঘোঁট চলল রাতহুপুর অবধি। পাড়ার এখানে-ওখানে জটলা-চকরবা, হাফশাট আর গেঞ্জি গায়ে রাস্তার ওপারের বাবুরা এসে জুটেছে। অবশেষে রাম-পাগলা ব্যাপারটা সামলে দিলে। রাম ভটচাঁষ গুরকে রাম-পাগলা, বস্তির তরফের মাতব্বর লোক। স্বভাবচরিত্রের কথা বাদ দিলে, লোকটি ক্ষুতিবাজ।

রাস্তার দু পাশে ছুটি সমাজ। ডান দিকে বস্তি এলাকা, একটিও পাকা বাড়ি নেই। সারি সারি খোলার ঘর, টিনের চালা। আর সামনে দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে চণ্ডা বাঁধানো ড্রেনের জল। আর রাস্তার এপারে দোতলা তিনতলা নতুন ডিক্রাইনের বাড়ি। দু তরফের মধ্যে অলিখিত পার্থক্য চাক্ষুষ করতে সবাই অভ্যস্ত।

রাম-পাগলা ভিড়ের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে চৈচিয়ে বললে, আমাদের বস্তির ব্যাপারে ভদ্রলোকের নাক গলাবার কোন প্রয়োজন নেই। আপনারা দয়া ক'রে অন্তর্ধান করুন। আমাদের ব্যাপার আমরা বুঝব মশাই।

তারপর অম্মদাকে আর মেয়েটির স্বামীকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কি বুঝিয়ে দিল রাম-পাগলা, কে জানে! তবে ব্যাপারটা মিটে গেল।

আজ এতদিন পরে যে চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে সেই কেলেকারিই কাল হয়ে দাঁড়াবে, তা কল্যাণী ভাবতে পারে নি।

অম্মদা বেড়ে জবাব দিয়ে দিল—সে পারবে না চাঁদা সাধতে যেতে। ভদ্রলোকদের সে বেশ ভাল ক'রেই চেনে। চাঁদা তো দেবেই না, উণ্টে কতকগুলো কথা শুনিয়ে দেবে। কল্যাণী বলবার আগেই সে নাকি দু-এক জায়গায় চেষ্টা করেছিল। তারা ঠোট উণ্টে বলেছে, মায়ের খেয়েদেয়ে কাছ নেই, তাই তাঁর কপালে অম্মদার মত সেবক জুটেছে। মায়ের নামে পরমা আদায় ক'রে তো অম্মদা সৌখিন সাদা চটি কিনবে কিংবা জালি গেঞ্জি। আরও কি যে বলেছে তা-অম্মদা না বললেও কল্যাণীর বুঝতে অসুবিধা হয় না। আশেপাশে বস্তির ঘরে ঘরে প্রায়ই এসব ছোটবড় চ্যুতি ঘটে, তা নিয়ে হাঙ্গামাও হয়, আবার চাপা পড়তেও বেশী সময় লাগে না। কল্যাণীকে সবই দেখতে হয়, চোখ কাম তো আর বন্ধ রাখা যায় না—তবে এসব ও

গায়ে মাখে না। ও থাকে নিজের মন্দির নিয়ে। সবাই ওকে সমীহ করে। সুধবারা সাবিত্তীকৃত করলে ওকেই প্রদীপ দেয়। ওর সম্মান নেই তাতে কি, এমন সতীকে কে না পূজা করবে!

অবশেষে চাঁদা আদায়ের ভারটুকুও কল্যাণীর ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল। আহুক। কল্যাণীর কিছুতেই আপত্তি নেই, শরীরে বইলে ওর আর কি!

সেদিন দুপুরে ঠাকুরের গায়ে খড়ি লাগিয়ে কল্যাণী বেরিয়ে পড়ল। ওকে যেন ওই পাকা বাড়িগুলো হাতছানি দিয়ে ডাকছে। রাস্তার কলে জল নেবার সময় তিনতলা ফ্ল্যাট-বাড়ির বউ-মেয়ে সবাইকেই কল্যাণী দেখেছে—আগে ওখানেই যাবে। এক বাড়িতে অনেকগুলি পরিবার থাকে। কাছাকাছিও বটে।

প্রথমেই তেতলায় উঠল। কড়া নাড়তেই সাড়া পাওয়া গেল : কে, কে ?

আমি, একবার এদিকে শুধুন না।

দরজা খুলে দিল একটি বউ : কি চাই ?

আপনাদের কাছে একটু সাহায্য চাই। আমরা মায়ের পূজো করি—

ও। আহুন আহুন।

বসতে বললে বউটি। বেশ মিষ্টি কথা। বললে, আপনাকে যেন দেখেছি কোথায়!

এই তো আপনাদের সামনেই, ওই মন্দির আমাদের।

মন্দির শুনে বউটি অবাক হয়ে চেয়ে রইল। কল্যাণী বললে, এই তো সামনের ওই বস্তিতে।

অ, তাই বল। মন্দির বললে কি ক'রে বুঝব ডাই! তা কি ব্যাপার বলুন তো, আপনাকে দেখে বস্তির লোক বলে কার সাধ্য! বেশবাস সবই ভদ্রঘরের মত—কথাও বলেন ভাল।

আমরা ব্রাহ্মণ। স্বপ্ন ছিলেন পণ্ডিত। আর তাঁর ছেলেও পূজার্তনাই করেন।

ছেলে মানে, ওই সেই ঠাকুর তো। তার কথা আর কে না জানে।—ব'লে বউটি অর্ধপূর্ণ হাসি হাসল।

কল্যাণী মুগ্ধ বুজে রইল।

বউটি বললে, রাগ করলেন ডাই! না না, আমি

সেভাবে বলি নি। এমনি কথা ক'থা। পুরুষদের কথা না তোলাই ভাল—ওর আর ইতর-ভদ্র নেই। যাক যে কাজে এসেছেন সেটাই হোক। ছেলেমেয়েদের কাছে শুনি বস্তিতে ঠাকুর হচ্ছে—একটি মেয়েলোক নিজে হাতে ঠাকুর গড়ে। মেয়ে-কুমোর পেলেন কোথায় ভাই?

কল্যাণী গলার আড়ষ্টতা কাটিয়ে খুশী মুখে বললে, কুমোর ডাকার পরসা কোথায় দাদ! আমিই মায়ের রূপরচনা করি। আর পরসা যখন ছিল তখনও ওঁদের বংশের বিধি এই রকমই ছিল, আমার স্বস্তরও নিজেই রূপরচনা করতেন।

আপনি নিজেই সব করেন! সময় পান কি ক'রে? আর এ তো সহজ কাজ নয়। তা মেয়েদের মধ্যেও আর্টিস্ট আছে, অ্যা!

বউটির কথা ধরন অন্তরকম। কল্যাণী এ রকম মেয়ে এর আগে দেখে নি। ওর প্রশংসা এতদিন বস্তির মাহুবেই করেছে, আজ প্রথম ও স্বকর্ণে তিনতলার ক্যাটের মাহুবেই তারিক পেল।

বউটি বললে, আপনি একটু বহন। আমার নন্দ-জা ওদের সবাইকে ডাকি।

একে একে অনেকগুলি নানাবয়সী মেয়ে জুটে গেল। পাশের ক্যাটেরও বউ-বি এসেছে বস্তীর ঠাকুরগকে দেখতে, যে মেয়ে নিজের হাতে দুর্গা-প্রতিমা গড়তে পারে সে তো ক্যাটিবাসিনীদের ব্রষ্টব্যই।

সবাই সায় দিল, চাঁদা অবিশ্রি দেওয়া উচিত। সর্বজনীন পূজার জন্তে অনেক কাজের লোক আছে। কিন্তু এরকম একটা মৌলিক প্রচেষ্টাকে মেয়েরা সাহায্য সমর্থন না করলে মেয়েদেরই কর্তব্যে অবহেলা করা হবে। কেউ বলল, আমার নামে এক টাকার রসিদ কাটুন ভাই। কেউ আট আনা, কেউ বা দু টাকার রসিদ কাটতে স্বরমাস করল। চাঁদাটা এখন আর বাড়ি-পিছু ধরছে না ওরা, প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে চাঁদা দেবে। এদের রকমসকম দেখে কল্যাণীর ঘোবন-অতিক্রান্ত বুকের মধ্যে খুশির ঝড় ব'য়ে যায়। এই তো হুদিনের সূচনা। তবে নাকি পূজা হবে না? মায়ের দয়া থাকলে কেন হবে না? কল্যাণী তো অধর্ম করে নি, অস্ত্রায়কে প্রশ্রয় দেয় নি, নিরস্তর মায়ের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। মা তো সবই দেখেছেন অন্তরে অন্তরীক্ষে থেকে।

বউটি বললে, ওমা, আপনি চুপ ক'রে ব'সে কেন? আজ যা পাচ্ছেন নিন। কাল আমি আপনার হয়ে আর সবাইকে ব'লে দেব। চটপট রসিদ কাটতে থাকুন।

কল্যাণী ম্লান হেসে প্রশ্ন করলে, রসিদ কি দিদি? একটি মেয়ে বললে, চাঁদা নেবেন। রসিদ দেবেন না? রসিদ তো নেই ভাই। মায়ের পূজোয় যে যা দেবেন হাত পেতে নেব। তাঁর ভোগে লাগবে।

হু-একজন মুখ টিপে হাসল।

বউটি বললে, আচ্ছা, এবার আপনাকে বিশ্বাস ক'রে দিচ্ছি। কিন্তু এর পর রসিদ-বই একটা ছাপিয়ে নেবেন। বুঝলেন, শুধু-হাতে চাঁদা কেউ দিতে চায় না।

কল্যাণী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

তা মন্দ উঠল না। এক জায়গায় ব'সেই সাড়ে আট টাকা চাঁদা উঠল।

একে একে সবাই চ'লে গেল। কল্যাণী ব'সে আছে। বেশ লাগছে এখানে ব'সে থাকতে। এদের এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশটিতে লক্ষ্মীশ্রী রয়েছে। ঠিক এমনটি অনেক কাল পরে নজরে পড়ল কল্যাণীর।

বউটি এক সময়ে বললে, বহন ভাই, চা খাবেন?

চা তো খাই নি কখনো দিদি।

ওমা, স্বাক কাণ্ড! চা খান নি? তা খেয়ে দেখুন না।

আর একদিন খাব। মায়ের পূজোটা চুকে-বুকে যাক। এখন তো খুব বিচার আচারে থাকতে হয়! মায়ের রূপরচনার সময় কত সংযম মেনে চলতে হয় দিদি, কি আর বলব!

কেন?

মায়ের ধ্যানকে মন থেকে বাইরে ফুটিয়ে তোলা তো সাধনার ব্যাপার।

বউটি বললে, রাগ করবেন না দিদি। আপনার মুখে কথাগুলো শুনে মন্দ লাগছে না। কিন্তু আপনার এই অন্নদা ঠাকুরকে দেখলে সবাই মুখ টিপে টিপে হাসে। আচ্ছা, ও কি ক'রে ঠাকুরের পূজা করে ভাই?

কল্যাণী হাত জোড় করে বললে, সবই মায়ের ইচ্ছা দিদি। তাঁর ক্ষমা দয়া না থাকলে কি আর মাহু বঁচত।

বউটি বললে, অবিশ্রি ভক্তি আলাদা জিনিস। কিন্তু, না—থাক।

কথাটা চেপে গেলেও বউটি মুখ টিপে হাসতে লাগল।
হাসছেন কেন দিদি!
এমনি। আপনাকে ভাবি পছন্দ হয়েছে আমার।
অবিশ্রু আপনি মেয়েমানুষ, তাই আপনার পছন্দতে
ভয়ের কিছু নেই।
আচ্ছা, এককালে আপনি খুব সুন্দরী ছিলেন, তাই না?
কি জানি, হয়তো ছিলাম, হয়তো ছিলাম না।
এখন তাই সত্যি কথা বলি, আপনাকে আমরা সবাই
চিনি। এমনিই তখন না-চেনার ভান করেছিলাম।
ও, তাই নাকি! বাঃ রে, বেশ মজা তো!
বউটি আরও বনিষ্ঠতা করল এক খিলি পান দিয়ে।
তার পর যে কথাটা বলল, তার অস্ত্র কল্যাণী মোটেই
প্রস্তুত ছিল না।

হঠাৎ ওর দু হাত চেপে ধরে বলল বউটি, আচ্ছা
তোমাকে ওই অমদা হতভাগা ভাগিয়ে এনেছিল, বার করে,
তাই না? সত্যি বলবে, আমার গা ছুঁয়ে আছ।
কল্যাণীর আপাদমস্তকে কে যেন আগুন জালিয়ে
দিয়েছে। একটা অসহ্য যন্ত্রণার কল্যাণী সোজা হয়ে
দাঁড়াল। ঘুণায় ওর সর্বাঙ্গ যেন রি-রি করে উঠল।
দৃষ্ট কণ্ঠে কল্যাণী বলল, আপনি গেরস্হের বউ, তাই
আর শাপশাস্ত করলাম না। নইলে বলতাম, কুলটা ছাড়া
এ কথা কেউ মুখে আনতে পারে না। ঢের হয়েছে,
আপনাদের সাহায্য আমার দরকার নেই। এই রইল
আপনারের চাঁদা।
স্তম্ভিত ভাবে বউটি দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখের
সামনে দিয়ে কল্যাণী তর-তর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

পারিকল্পনা ও কল্প-লৈখ্যের
বিচিত্র গল্পবিশ্ব!



ফোন
৩৪-৪৮৪৮

এইচ.এল.সরকার

এও কোং

১২৫ এন হুজার ফ্রীট, কলিকাতা-১২

১২৫ এন হুজার ফ্রীট, কলিকাতা-১২

কল্যাণী নিজে আর কোথাও চাঁদা আদায়
বেয়োর নি। অমদাকে বলেছে বস্তির বাইরে
কারুর কাছে হাত পাতবে না। আমার
মাথার চিবি রইল। তাতে মায়ের পুঞ্জো
যেমন হয় তেমনিই হবে।

অমদা পরদিন সকালে পুরনো লাল শালুর
ওপর লেখা দুর্গাপূজার ফেস্টুনটা টাঙিয়ে
দিতে দিতে বলল, ঠিক হয়ে যাবে বউ, তুই
তোব কাজ করে যা। আমি দেবি ইদিকে।

ছেলেমেয়েরা আজও ভিড় জমিয়েছে।
সর্বজনীন ভলার এখনো কোনো আয়োজনের
চিহ্ন নেই—ওদের ঠাকুর আসে লরিতে চড়ে।
কণ্টক্টর এসে ম্যারাপ বাঁধে বধীর দিন
সকালে। ঢোল-সানাই বসে সেও বধীপূজোর
দিন। তখন আর ছেলেমেয়েরা এখানে কেউ
উকি দেয় না। তা না-ই দিক, এখন তো
ওরা রয়েছে। কল্যাণী রঙ চড়াতে চড়াতে
খুশী হয়ে ওঠে। ওর ভরসা আছে, ধী-
পূজোর বোগাড় করিয়ে নেবেন। এই তো
অমদাও হাত লাগিয়েছে কাজে, তবে আর
ভাবনা কি!

রবীন্দ্রমানসের নাট্যরূপ

অরবিন্দ পোদ্দার

১১১

বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ‘শারদোৎসব’ থেকে ‘কান্তনৌ’ এই পর্যায়ের নাটকগুলি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা; এবং এই সব নাটকের ঘটনা, সংলাপ ও ভাববস্তুর অন্তরালে যে রবীন্দ্র-মানস ক্রিয়াশীল তার সহিত পরিচিত হওয়া।

এই পরিচয় সত্য ও ঘনিষ্ঠ হবে এই আশায় প্রথমে বিভিন্ন নাটকের রচনাকালীন রবীন্দ্রজীবন-পরিবেশ ও মানসপরিমণ্ডলের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস টেনে যাব।

‘শারদোৎসব’ রচনার ঠিক পূর্বাঙ্কেই রবীন্দ্রজীবনের একটি বিশিষ্ট অধ্যায় শেষ হয়েছে। সে যুগ পার হয়ে বর্তমান কালে তিনি আর স্বদেশী আমলের “অত্যাচারের বক্ষে পড়ি, হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি” এই আদর্শে আস্থাশীল থাকতে পারছেন না। বলতে আরম্ভ করেছেন, “নিজের বা পরিবারের বা দেশের কাজে ধর্মকে লঙ্ঘন করিলে ঈশ্বর ক্ষমা করেন না,” “আমাদিগের সকল দাবিই আমাদিগকে জয় করিয়া লইতে হইবে—হীনতার দ্বারা নহে, কিন্তু মহত্বের দ্বারা, মহত্ত্বের দ্বারা।...তীর্থ উক্তির দ্বারা নহে, হুঃসাহসিক কার্যের দ্বারা নহে, কিন্তু ত্যাগের দ্বারা আমাদিগকে শ্রেয়ঃকে বরণ করিয়া লইতে হইবে।” বলছেন, ভারতবর্ষের নায়ক হবেন যিনি, তাঁকে আমরা পেতে চাই সর্বত্যাগী সর্বজয়ী সন্ন্যাসীরূপে। ভোগের আকাঙ্ক্ষায় তিনি পৃথিবীর পানে তাকাবেন না, সব কিছু ত্যাগের যে মহত্ব সেই মহত্বের দ্বারাই তিনি জয় করবেন অকল্যাণকে। মনের এই আকৃতিকে রক্তমাংসের আধারে প্রতিষ্ঠিত করার বাসনা জেগেছিল তাঁর; এবং সেই বাসনাই দক্ষিণ-আফ্রিকা পরিলম্বণ করে ধনজয়-বৈরাগীরূপে জীবন্ত হয়ে উঠল ‘প্রায়শ্চিত্ত’ নাটকে। এই বৈরাগীর মধ্যেই যেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর আদর্শ আবিষ্কার করেছেন; তিনি উঠেছেন ক্ষণিক চিন্তচঞ্চলকারী ভোগবিলাস চাওয়া-পাওয়ার উদ্দেশ্যে, এবং আশ্রয় লাভ করেছেন একটা স্থায়ী জীবনবেদে। সেখানে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি বাংলা দেশের সমকালীন রাজনৈতিক আদর্শ ও উচ্ছ্বাসের মূল ধারাকে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করে এই বলে আত্মস্থ হতে পারছেন; “...মারেন মরি বল ভাই ধন্য হরি।”

নব-উন্মেষিত এই ভাবধারায় কবি যখন অবগাহন করছেন, তখন তিনি রচনা করেন ‘শারদোৎসব’। এই নাটকটি মূলতঃ ঋতু-উৎসব পালনের জন্ত রচিত হ’লেও শুধু মাত্র উৎসবপালনের আনন্দের মধ্যে কবি একে আবদ্ধ রাখেন নি (স্বরূপযোগ্য যে, ইতিপূর্বেই তিনি ঋতু-উৎসবে বৈদিক মন্ত্রাদির প্রচলন করেছেন); আপাত আনন্দমধুর সংলাপ ও সঙ্গীতের অন্তরালে স্বগভীর তব্ব প্রবহমান।

‘শারদোৎসব’ রচনার কিছুদিনের মধ্যেই কবি পর পর ছুটি যুত্বসংবাদ পান; একটি তাঁর মধ্যম জামাতা মতোজ্ঞ ভট্টাচার্যের, অপরটি বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের। কয়েক মাস পূর্বে কবি হারিয়েছেন কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথকে, কয়েক বছর আগে কন্যা রেণুকা ও পত্নী মৃণালিনী দেবীকে। নিজ দেহও অস্থিরে বিস্থিরে অত্যন্ত ক্লিষ্ট। ক্রমাগত এতগুলি শোক ও হুঃসংবাদ, বিয়োগ ও বিচ্ছেদ কবি-চিন্তে এই জগৎসংসার, এই মানবজীবন, বিশ্বজীবন ইত্যাদি সম্পর্কে নানা প্রকার প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে, কবি এই সময়ে সম্ভবতঃ অত্যন্ত বিচলিতও হয়ে পড়েছিলেন। বিয়োগবেদনার স্পর্শ থেকে অল্প কোন আনন্দময় সত্তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আকৃতিও অত্যন্ত তীব্রভাবে বেজে ওঠে। তাই এ সময়ে, শাস্তিনিকেতনের নিঃসঙ্গ জীবন-ধাপনের মধ্যে কবিকে প্রতি প্রত্যুবে মন্দিরের “পূর্ব তোরণতলে” ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকতে দেখি। এই ধ্যানলব্ধ বাণীই ক্রমে ‘শাস্তিনিকেতন’ উপদেশমালায় রূপান্তরিত হয়। রবীন্দ্রমানসে একটা তীব্র অধ্যাত্ম-সংগ্রাম চলতে থাকে। বিরোধকে জয় করার, হুঃখ-শোককে উত্তীর্ণ হওয়ার, চির শান্ত চির আনন্দময় কোন লোকে আশ্রয় লাভ করার আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল তাঁর চিত্ত। এই সময়ে অধ্যাত্মচিন্তায় কবি কিরূপ নিমগ্ন ছিলেন তার একটি চিত্র পাওয়া যাবে কাউন্ট কাইজারলিঙ-এর উক্তি-তে। তিনি বলছেন, “Rabindranath, the poet, impressed me, like a guest from higher, more spiritual world. Never perhaps have I seen so much spiritualised substance of soul condensed into one man.”

এমনি মানসপরিবেশে ‘গীতাঞ্জলি’ রচিত হওয়ার পর

কবি লিখলেন ‘রাজা’। কবির নিজের কথায় “রাজা নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে। রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা—তার পর সেই ভুলের মধ্য দিয়ে পাপের মধ্য দিয়ে যে অগ্নিদাহ ঘটালে যে বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে তা অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে তাতেই তো তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে।”

তার অল্পকাল বাদেই ‘অচলায়তন’ রচিত হয়। কবির কথায় “অন্তরের যে-সকল মর্যাস্তিক বন্ধন আছে বাহিরের শৃঙ্খল তাহারই স্থূল প্রকাশ মাত্র—অন্তরের সেই পাপগুলোকে বাবু বাছা বলিয়া নাচাইব, আর দিকার দিবার বেলায় ওই বাহিরের শিকলটাই আছে? আমাদের পাপ আছে বলিয়াই শান্তি আছে—যত লড়াই ওই শান্তির সঙ্গে, আর যত মমতা ওই পাপের প্রতি? আমার পক্ষে প্রতিদিন ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের সমস্ত দেশব্যাপী এই বন্দিশালাকে একদিন আমিও নানা মিষ্ট নাম দিয়া ভালবাসিতে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু তাহাতে অন্তরাত্ম তৃপ্তি পায় নাই। অচলায়তনে আমার সেই বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে। শুধু বেদনা নয়, আশাও আছে।”

অল্পকাল পরে এল ‘ডাকঘর’। ‘ডাকঘর’ রচনার পিছনকার ইতিহাসটি চমকপ্রদ। কিছুকাল যাবৎই কবিচিত্ত সাংসারিক বন্ধন ও দৈনন্দিন জীবনের গ্রানি থেকে মুক্তি অর্জনের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। তাঁর তৎকালীন মানসিক অবস্থা একটি পত্রের কিয়দংশ থেকে উপলব্ধি করা যাবে: “আমার টাকা নেই, কাজ রয়েছে, আমার অনেক অসুবিধা, তবু আমাকে আর বন্ধ হয়ে বসে থাকতে দিচ্ছে না, আমাকে আজ এমন করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে যে কালের কোনো প্রয়োজন সংসারের কোনো দারিদ্ৰ আমাকে কোনো মতেই বসে থাকতে দিচ্ছে না। বেয়ো, বেয়ো, বেয়ো, রাস্তায় বেরিয়ে পড়... আজ আমার আর অন্য কোনো চিন্তা করবার জো নেই—তাই বেরিয়ে পড়বার আয়োজনে আমার একটুও ক্লান্তি বা ক্লপণতা নেই—মম একবারো পিছনে ফিরে তাকাতে চাইবে না।” প্রথমে সিঙ্গাপুর জাপান, পরে ইউরোপ পরিভ্রমণের পরিকল্পনাও কবি করেছিলেন, কিন্তু কার্যত: গেলেন শিলাইদহ। সেখানে নৌকায় বসে কবি

বিশ্রমের স্বাদ গ্রহণ করতে বাধ্য হন। মন সর্বতোভাবেই অন্তর্মুখীন হয়ে পড়ে। এই সময়ে লেখা একটি পত্রের অংশবিশেষ এইরূপ: “যেমন করে হোক নিজের গর্তটার ভিতর থেকে নিজের নির্মল বিষুদ্ধ সত্যটিকে বাহির করে আনতেই হবে।...মৃত্যু ভালো কিন্তু মুক্তি চাই...খোলা রাস্তার খোলা আলোয় খোলা হাওয়ায় ডাক পড়েছে... আবরণ সব জীর্ণ হয়েছে মলিন হয়েছে সেগুলো এবার ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাক—সর্বদা লাগুক আকাশ।” মনের এই অন্ধকার নিয়েই কিছুদিন বাদে কবি শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানেও এই একই বেদনা।... “আমার মনে হচ্ছিল, একটা কিছু ঘটবে, হয়তো মৃত্যু। স্টেশনে যেন তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠতে হবে সেই রকমের একটা আনন্দ আমার মনে জাগছিল। যেন এখান হতে যাচ্ছি। বেঁচে গেলুম। এমন করে যখন ডাকছেন তখন আমার দায় নেই। কোথাও যাবার ডাক ও মৃত্যুর কথা উভয়ে মিলে, খুব একটা আবেগে, সেই চকলতাকে ডাঘাতে ডাকঘরে কলম চালিয়ে প্রকাশ করলুম।”

তার তিন বৎসরাধিক কাল পরে এসেছে ‘ফাল্গুনী’। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রজীবনপ্রবাহশ্রোতে আমরা অনেকটা দূর অগ্রসর হয়েছি। কবি নানাবিধ দম্বকোলাহল, তর্ক-বিতর্ক সমালোচনা প্রতি-সমালোচনা ইত্যাদি উত্তীর্ণ হয়ে এসেছেন। ধর্মগত দিক থেকেও তাঁতে কিছু পরিবর্তন এসেছে। তারপর ইউরোপ আমেরিকা পরিভ্রমণ করে এসেছেন কবি, ‘গীতাঞ্জলি’ ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে, স্বদেশ প্রত্যাগমনের পর কবি নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন; যে-দেশ একদা তাঁকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত ছিল সে দেশ তাঁকে আপনীর করার জন্তে ব্যগ্র হয়েছে; তারপর আবির্ভাব হয়েছে ‘সবুজপত্রের’, দেখা দিয়েছে প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধ; ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করার অন্তরালে কবি-জীবনে ‘বলাকা’পর্বের স্ফূর্তিপাত হয়েছে; গান্ধীজী সপরিবারে শান্তিনিকেতন ভ্রমণে এসেছেন; গান্ধীজী সঙ্গ কবির দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অমুভব করেছেন, “দেশে আজ প্রচণ্ড শক্তি শিশুবশে এসেছে। আমরা তা অন্তরে অমুভব করছি। যদি তা না অমুভব করি, তবে বুধা জন্মেছি এই দেশে, বুধা জন্মেছি এই কালে। এমন সময়ে এ দেশে জন্মেছি যে-সময়ে আমরা একটা নূতন

সৃষ্টির আরম্ভ দেখতে পাব।” সেই আরম্ভ দেখার জন্তেই যৌবনের আহ্বান, “দেশের যৌবন—যে যৌবন নতুনকে বিশ্বাস করতে পারে, প্রাণকে নিত্য-জিহ্বাভব করতে পারে,”—সেই এ দেশকে বাঁচাবে, প্রাণ দেবে। “অরুণ-লেখা তো পূর্ব গগনে দেখা দিয়েছে, ভয় নেই, আমাদের ভয় নেই।” যৌবনের এই মার্ভে: যৌবণাই ‘কালানী’তে স্রবের স্বরনাধারায় প্রবাহিত হ’ল।

॥ ২ ॥

এই মাত্র রবীন্দ্রনাথের জীবনের নির্দিষ্ট ক’বছরের মানস-পরিমণ্ডল নিয়ে যে আলোচনা করা হ’ল, তাতে আমরা কবিকে একটা হুমিত অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার পরিব্যাপ্ত দেখতে পাই। নিব্বারের স্বপ্নভবের পর কবি ঔপনিষদিক তত্ত্বে দীক্ষাগ্রহণ করেন; সমস্ত বস্তু ও চৈতন্তের অভিব্যক্তি পার হয়ে কবি বিরাট এক পুরুষে উপনীত হয়েছেন। অহুভব করছেন, সেই বিরাট পুরুষের লীলাই অভিনীত হয়ে চলেছে এই বিশ্বের বিচিত্র প্রাণযাত্রার মধ্য দিয়ে। তাঁরই লীলা এই আলোয় আলোয়, আকাশে আকাশে। এই স্থানকালাতীত সস্তার পটভূমিতে স্থানকালবিধৃত মানব-জীবনের একটা বৃহত্তর তাৎপর্য ও সংজ্ঞা গ্রহণে কবি-মানস উদ্যত। সম্ভবতঃ, বাস্তব জীবনের শোক-দুঃখ-ব্যথাকে জয় ক’রে কবি মানসজীবনে সেই বিরাটের সঙ্গে মিলনের জন্মই ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। কবি বহুদিন পূর্বেই জেনেছেন, যা অসত্য-মৃত্যুর অধীন, তা সত্য নয়; সত্য, যে তার ক্ষয় নেই, তা অব্যয়। এই ক্ষয়ের উদ্দেশ্যে ওঠার সাধনাই সম্ভবতঃ তাঁর অস্তরের গোপনে চলছিল। স্তবরাং তাঁর এ-কালের মানসসৃষ্টির মধ্যে এই সাধনার অভিব্যক্তি লাভ করা বিচিত্র নয়।

প্রসঙ্গতঃ এটা বোধ করি কোনরূপ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না যে, রবীন্দ্রনাটক আমাদের পাখির সমাজসম্পর্ক-বিধৃত চিন্তাধারা, কল্যাণবোধ, দ্বার-অত্যাচার আদর্শ অথবা মূল্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এখানকার ধ্যানধারণা, কল্যাণের আদর্শ ও জীবনবোধ স্বতন্ত্র। এবং স্বতন্ত্র হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, এই যে পৃথিবীতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ও জীবনমরণের অভিজ্ঞতা আমরা সংগ্ৰহ করি, তার ব্যবহারিক প্রকাশটা রুচিকর নয়, শুভকর হওয়া তো দূরের কথা। রুচিকর নয় বলেই যারা রুচিবান,



জীবনকে সুন্দর দেখতে চান, মানুষকে প্রকৃত মানবিক গুণে মণ্ডিত দেখতে চান, পৃথিবীকে স্রের ঐলজ্জালিকতায় রূপস্বয় দেখতে চান, অথবা শরতের কাশগুচ্ছের মত স্বচ্ছ দেখতে চান, তাঁরা আমাদের সমাজজীবনের এই রূঢ় প্রকাশকে নিয়ে সমস্ত খাঙতে পারেন না। মানবিক গুণে যদি তাঁদের কারো কারো হৃদয়তন্ত্রী সজীব হয়ে থাকে, তা হ'লে ওই পৃথিবীর স্পর্শ থেকে আভ্যন্তরিক মুক্তিও কামনা করবেন। তাঁরা, অথবা অস্তিত্বের নতুনতর সংজ্ঞা বা নতুনতর প্রকাশ সন্ধান করবেন। কারণ, কদর্ঘতার মধ্যে, দিন-রাপনের প্রাণধারণের গ্রানির মধ্যে, অস্তিত্বের বোঝা বহন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও তা সম্ভব নয়। এই অসুন্দর মানবিক জীবনের ততোধিক অসুন্দর প্রকাশকে তিনি স্বীকার করতে পারেন না। যে পৃথিবীকে তিনি ভাল-বাসেন, তার বাস্তব অস্তিত্বের কদর্ঘতা তাঁর নিকট তাই এত বেশী বেদনাদায়ক। এই ব্যবহারিক পৃথিবীতে কদর্ঘতার অস্তিত্ব অজ্ঞাত্ন মাহ্মশের কাছে যেমন, রবীন্দ্রনাথের কাছেও তেমনি একটা বাস্তব-সমস্যা; শুধু পার্থক্য এই যে, অজ্ঞাত্ন অনেকে যেখানে এই কদর্ঘতার মধ্যেই নিমজ্জিত থেকে সুখাহুভব করেন, রবীন্দ্রনাথ ওর স্পর্শ থেকে মুক্তি কামনা করে আনন্দের সাক্ষাৎ লাভ করতে ইচ্ছুক। স্বীকার করতে বাধ্য নেই যে, ওই সমস্যাটির মত রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাটাও একান্তই বাস্তব, সকলের নিকটই বোধগম্য একটা সমস্যা।

এবং এই সমস্যার সমাধানের জন্তই 'শায়দোংসবে' রাজা বিজয়াদিত্য সন্ন্যাসীবেশে সকলের সঙ্গে মিলিত হতে চলেছেন। বিজয়াদিত্যের কথায়,—“জগৎ আনন্দের স্রণ শোধ করছে। বড়ো সহজে করছে না, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্ত ত্যাগ করে করছে।” তাই সমস্ত ত্যাগ করে সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনিও আনন্দের স্রণ শোধ করে পৃথিবীর প্রকাশকে সুন্দর করতে চলেছেন। আর তেমনি আমাদের মানবিক অস্তিত্বের ক্ষুদ্রতা বিনষ্ট করে দিয়ে একে পত্নীরতর তাৎপর্য ও মহিমায় মণ্ডিত করে দিয়ে তিনি বলছেন, “বাইরে যে আজ সোনা ঢেলে দিয়েছে। তারই সঙ্গে আমাদেরও আজ অন্তরে বাইরে মিলে যেতে হবে তো? নইলে এই শরতের-উৎসবে

আমরা বোগ দিতে পারব কী করে। আজ এই আলোর সঙ্গে আকাশের সঙ্গে মিলব বলেই তো উৎসব।” এবং এই মিলনের ভিতর দিয়েই কদর্ঘ মানবজীবন সুন্দর হয়ে ওঠে; আমরা ব্যবহারিক জীবনের কুশ্রীতা, নিরানন্দ, ধণ্ডতা ও বিচ্ছিন্নতার উল্লে উঠে কদর্ঘতা থেকে মুক্ত হই, এবং আমাদের অস্তিত্বের নবতর মহিমার চেতনায় সুন্দর হয়ে উঠি। রবীন্দ্রনাথ কথাটাকে প্রকাশ করেছেন এভাবে, “বিশ্বপ্রকৃতিতে ও মানবপ্রকৃতিতে এই অমৃতের প্রকাশকেই বলে সৌন্দর্য; আনন্দরূপময়তম।”

‘রাজা’ নাটকে এই সুন্দরকেই অগ্রভাবে উপলব্ধি করার প্রয়াস। বস্তুর উপাসনা আমাদের চোখের দৃষ্টিকে করেছে বিভ্রান্ত, আর মনের বোধকে করেছে বিকৃত। “যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁয়া যায়, ভাঙারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধনজনখ্যাতি,” সেখানে সুন্দরনা সুন্দরকে খুঁজেছিল। পেল না। সুন্দরকে খোঁজা আমাদের সকলের জীবনেই একটা বাস্তবকঠিন সমস্যা। বস্তুর স্থূলতা তেমনি ওই পথে কঠিন একটা বাধা। সেই বাধা অপসারণের উপায় কি? রবীন্দ্রনাথ সুন্দরনার দৃষ্টিকে বাইরে থেকে অন্তরের পানে, বস্তু থেকে আত্মায়, বিশেষ থেকে নির্বিশেষে, অহং থেকে অহংহীনতায় রূপান্তরিত করে তার উত্তর দিয়েছেন। এই রূপান্তর সুন্দরনার পক্ষে নতুন জীবন, নিজস্ব অস্তিত্বের নতুন উপলব্ধি; এই উপলব্ধিতে বাস্তব অস্তিত্ব আর শুধুমাত্র অস্তিত্ব নয়, সুন্দরও।

‘অচলায়তনে’ কবি আরও বেশী প্রত্যক্ষ ও সত্য সমস্যা নিয়ে ব্যাপৃত হলেন। এর তুলনায় ‘শায়দোংসবে’ ‘রাজা’ ‘ভাকঘর’ ইত্যাদির বিষয়বস্তু বড় বেশী রকমের অ্যাংষ্ট্রিক। ‘অচলায়তনে’ নির্বিশেষ নয়, তাঁর বিশেষ কাল, বিশেষ সমাজ, বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থা ও ধর্ম কবিকে ভাবিয়ে তোলে, এবং এখানকার যেটা অহিত, অকল্যাণ, যেটা গর্হিত, মানব-অস্তিত্বের সমস্ত মহিমা-অপহরণকারী, কবি তার বিরুদ্ধে জাগ্রত হওয়ার, বুদ্ধিকে অপহৃত না করে বোধকে সর্বগামী করার প্রেরণায় সকলকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এখানকার সমস্যা অধিকতর বাস্তব এবং বিশেষ হওয়া-সঙ্গেও মূল স্রর এবং বৈশিষ্ট্য এদের মধ্যে কোন তফাত নেই। বিশেষকে

ত্যাগ ক'রে নির্বিশেষে যাওয়ার, মানবসীমা পার হয়ে
বিশ্বসীমায় পৌঁছানোর তাগিদ এক্ষেত্রেও সমান প্রবল।

এই উদ্ভূতি থেকেই তা বোঝা যাবে।

পৃথক। অচলায়তনে প্রণাম করে করে ঘাড়ো ব্যাথা হয়ে গেছে।
তাতে নিজেকেই কেবল ছোটো করেছি, ছড়োকে পাইনি।

দাশাটকুর। এই আনার সবার বাড়ী বড়োর মধ্যে এসে যখন বসি
তখন বা করি তাই প্রণাম হয়ে ওঠে। এই যে খোলা আকাশের
নিচে দাঁড়িয়ে তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মন তোমাকে
আলীঙ্গন করছে এও আমার প্রণাম।

সুতরাং, পাণ্ডস্কেন্দ্র অশ্বপাণ্ডস্কেন্দ্র, প্রাচীন নবীন, দেহ-
বাহী ব্রহ্মবাদী, সকলকেই উন্মুক্ত রাজপথে এসে মিলিত
হতে হবে। অভ্যাসের নিগড় ভেঙে, পরিচিত পরিধির
গতানুগতাকতা বিসর্জন দিয়ে, সকলের সঙ্গে এবার
আকাশের তলায় মিলিত হবার পালা।

‘ভাকঘরের ক্রন্দনও তেমনি যাকে জানি না সেই
অজ্ঞাতে যাওয়ার ক্রন্দন, সেই Beyond-এ যাওয়ার
আকৃতি। এই আকৃতির বিশেষ কোন রূপ নেই, কারণ যার
পাশে সে খেয়ে চলেছে তারও কোন নির্দিষ্ট বা বিশেষ
রূপ নেই; কিন্তু তার মাধুর্য়টুকু অনস্বীকার্য। শুধুমাত্র
এর প্রকাশ বা অভিব্যক্তির মধ্যেই সে মধুর এবং
সুন্দর।

‘ফাক্তনী’তে অনন্ত ‘প্রাণশক্তিই মৃত্যুর ভিতর দিয়ে
আপনাকে বারে বারে উপলব্ধি করছে।’ কবি বলেছেন,
“Facts-এর দিকে দেখি জরা মৃত্যু, Truth-এর দিকে
দেখি অক্ষয় জীবন, যৌবন।” আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, কবি
বুঝি বা জগৎ-পরিধির মধ্যে নানা উত্থান-পতন, রূপ-
রূপান্তরের মধ্যে প্রাণবাহ্যার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করছেন,
এবং প্রাণশক্তির প্রবাহকে একটা process হিসেবে উপলব্ধি
করেছেন। কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে,
তা ঠিক নয়। Process-এর চেতনা রবীন্দ্রমানসে খুবই
অগভীর। তিনি প্রাণশক্তির শুধুমাত্র নির্বিশেষ রূপকেই
উপলব্ধি করেছেন, বিশেষ রূপে তাকে দেখে তার রূপান্তর-
প্রবাহের ভিতর থেকে তার নির্বিশেষ রূপকে আবিষ্কার
করতে পারেন নি।

এদিক থেকে এক ক’টি নাটকের ভাববস্তুর এক্য অঙ্গান।
রবীন্দ্রনাথও আয়সদতরূপেই এদের সকলের ভিতরকার
ধুমার মধ্যে মিল দেখতে পেয়েছেন।

॥ ৩ ॥

এই মিলের পরিচয় রবীন্দ্রসাহিত্য-পাঠকের পক্ষে
শুধুস্বপূর্ণ। কারণ তাঁর বাস্তব জীবনপরিবেশের সঙ্গেও
এদের পরিপূর্ণ মিল রয়েছে—কবির মানসপরিবেশ ও
নাটকে রূপায়িত ভাবপরিমণ্ডল—এই দুয়ের মধ্যে গভীর
আত্মিক সঙ্গতি দেখতে পাই। এবং এই সঙ্গতির কথা
স্মরণ রেখেই এটা বলা বোধ করি অমৌক্তিক হবে না
যে, বাস্তব জীবনসম্পর্ক, তার পীড়ন, তার দুঃসহ স্থূলতা,
তার মূল্যবোধ, সব কিছু থেকে মুক্ত হওয়া অথবা তার
উপেক্ষা ওঠাই যেন রবীন্দ্রমানসের ঐকান্তিক গরজ।
অথচ, এইমাত্র নাটকগুলি সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা
করা হয়েছে তাতে দেখা গিয়েছে যে, এদের প্রত্যেকটিরই
মূল প্রেরণায় অথবা সমস্তার স্বীকৃতিতে ও রূপায়ণে
সত্যকার বাস্তব সংকেত রয়েছে। কবি এই সমস্তাকে
স্বীকার করছেন, এবং অস্ত্রান্ত কল্যাণধর্মী মাহুঘের মত
তার সমাধানও অহুসন্ধান করছেন। কিন্তু তাকে বাস্তব
পৃথিবীর প্রবহমান মানবিক সম্পর্কের মধ্যে সংস্থাপন ক’রে
বাস্তব পথে বাস্তব সমস্তার সমাধান করা তাঁর পক্ষে
সম্ভব হয় নি। নাটকগুলির ঘটনাবিত্তাস এমন, এবং
তা সংঘটিতও হচ্ছে এমন এক পরিবেশে যার সঙ্গে
আমাদের প্রাত্যহিক পৃথিবীর সম্পর্ক বা যোগাযোগ
অতি ক্ষীণ, এক রকম নেই বললেও চলে। এখানকার
কুলীলবও আমাদের মত মাহুঘ নয়, অন্তরকমের। এই
পৃথিবী স্বতন্ত্র, তার রূপও পৃথক। রবীন্দ্রনাটকের মূল
বৈশিষ্ট্য, তার অস্ত্রনিহিত সত্তা ও ভাবার্থের কথা বিশ্বত
না হয়ে এ কথা ঘোষণা করা যায় যে, এই নাট্যপৃথিবীর
অস্তিত্ব কোন কালে ছিল না, নেই এবং কোন কালে
থাকবেও না।

কারণ, এ জগৎ রবীন্দ্রকবি-মানসের সৃষ্টি। কবি-
মানস এই জগৎ সৃষ্টি করেছে তার নিজস্ব প্রয়োজনে,
নিজস্ব ভঙ্গিতে বিশেষ বিশেষ সমস্তার সমাধান করার
জন্ত, এবং সমগ্র বিশ্বচরাচরে তিনি যে বিরাট চৈতন্যের
অভিপ্রকাশ দেখতে পান এবং যে বড়কে পাওয়ার
মানেই হ’ল নিজেকে পাওয়া, সেই অভিপ্রকাশের সঙ্গে
নিজেকে এক ক’রে মিলিয়ে দেওয়ার জন্ত। এই জগৎ
আশ্চর্য, অপরূপ, মধুর, কিন্তু কৃত্রিম। এবং এই কৃত্রিম

জগৎ সৃষ্টি করার পথে তিনি আমাদের পরিচিত পৃথিবীকে অস্বীকার করে গেছেন; প্রতি পদে পদে একে অস্বীকার না করে কবির পক্ষে তাঁর মানসজগৎকে স্বীকার করাও সম্ভব নয়। একটার মৃত্যু আর একটার বেঁচে ওঠাকে সার্থক করে তুলেছে। কি ভাবে করেছে, তার বিদ্বত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। দু-একটি দৃষ্টান্তের সহায়তায় তার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করব।

‘শারদোৎসব’-রচনাকালীন প্রচলিত রাজনীতি ও সমাজসংস্কারের মূল দাবী বোধ করি ছিল, সবার সঙ্গে সবার মিলিত হওয়ার প্রেরণা ও উচ্ছ্বাস। বাস্তব সমাজ-নীতির দিক থেকে দেখলে সমস্তাটা দাঁড়ায় এইরূপ: মানুষে মানুষে প্রকৃত হৃদয়বন্ধনে মিলিত হতে পারছে না, তার কারণ, ধন-বৈষম্য, সামাজিক ভেদ-বিচার, অজ্ঞানতা, কুসংস্কার ইত্যাদি; অর্থাৎ চলতি সমাজবিজ্ঞানই এইরূপ মিলনের অন্তরায়। কিন্তু এই বিজ্ঞানটা যদি পাটানো যায়, যদি এর পরিবর্তে সর্বমানবিক অধিকারাদির ভিত্তিতে নতুন বিজ্ঞান গড়ে তোলা যায়, তা হ’লে মানুষে মানুষে বিভেদ ব্যবধান ইত্যাদি দূর হয়ে যায়, একটা সমতল ভূমিতে সমস্ত মানুষ এক হয়ে দাঁড়াতে পারে। এবং এই রূপান্তরের সম্ভাবনা সমাজপ্রবাহের প্রবাহিত নিয়মের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নাটকে প্রসঙ্গটা তুলে ধরেন এভাবে—রাজা বিজ্ঞানবিজ্ঞানকে সম্যাসী বানিয়ে রাজপথে নামিয়ে দিলেন; বললেন, রাজা হতে গেলে সম্যাসী হওয়া চাই। সম্যাসীকে দিয়ে বললেন, “লক্ষ্মী যখন মানবের মর্তলোকে আসেন তখন দুঃখিনী হয়েই আসেন; তাঁর সেই সাধনার তপস্বিনী বেশেই ভগবান মুক্ত...শত দুঃখেরই বলে তাঁর সোনার পদ্ম সংসারে ফুটে উঠেছে...” এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য, “যে-মানুষ বা যে-জাতির মধ্যে এই ত্যাগ নাই তপস্বী নাই, দুঃখ-স্বীকারে জড়তা, সেখানে লক্ষ্মী নাই, স্বতন্ত্র-সেখানে ভগবানের প্রেম আকৃষ্ট হয় না।”

এই তত্ত্বগত উক্তি একটা অনুমান মাত্রই আছে যাতে আকৃষ্ট না হয়ে পারা যায় না। এর সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করে। কিন্তু সত্য এই, রাজা সম্যাসীবেশে সকলের সঙ্গে মিলিত হয়েছে শেষ পর্যন্ত রাজাই থেকে গেলেন; তাঁর প্রজারাও প্রজাই থেকে গেলেন; সমস্তার

সমাধানও তাই অসম্পূর্ণ থেকে গেল। অথচ বাস্তব পৃথিবীকেও আমরা এই ভাবজগতের মধ্যে পেলাম না। ফলে আমরা উভয় দিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হলাম। হৃদয়নার মধ্যে যে হৃদয়ের অহুসঙ্কান, তাও পরিণামে এমন এক প্রভুর সন্ধানে পরিণত করা হয়েছে “যে-প্রভু কোন বিশেষ রূপে বিশেষ স্থানে বিশেষ দ্রব্যে নাই, যে-প্রভু সকল দেশে সকল কালে; আপন অন্তরের আনন্দরসে বাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়।” ‘ডাকঘরে’ একটি সৌন্দর্য-পিপাসু চিত্রের ব্যাকুল আকৃতিকে মৃত্যুঞ্জিয়ার সঙ্গে একীভূত করে অভিব্যক্ত করা হয়েছে। এমনভাবে, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ আশু উদ্বেগ ও লক্ষ্যকে অত্যন্ত দূর্বগাহী ভাবের সঙ্গে সংযুক্ত করে প্রকাশ করেছেন। ফলে, লক্ষ্যের রূপ, সমস্তার চেহারা ইত্যাদিও এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে; এবং এই প্রক্রিয়ার পরিণতিও তাই। এতে বস্তু ভাবে, বিশেষ নির্বিশেষে, বস্তুক নির্বস্তুকে পরিণত হয়।

এ থেকে রবীন্দ্রনাথের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সহিত আমরা পরিচিত হই। কোন স্থূল, বাস্তব, মূর্ত (concrete) সমস্তার সমাধান তিনি স্থূল মূর্ত পথে করতে পারেন না। স্থূলকে তার স্থূল সত্তা থেকে মুক্ত করে, মূর্তকে বিমূর্তে (abstract) পরিণত করে, বস্তুকে ভাবে রূপান্তরিত করে কবি তাকে গ্রহণ করতে পারেন। স্থূলকে স্থূলরূপে, মূর্তকে মূর্তরূপে গ্রহণ করতে যেন তাঁর কবি-মানস কুঠিত। ভাববাদী দর্শনচিন্তার বৈশিষ্ট্যই তাই। সমস্ত ভাববাদী দার্শনিকদের মত রবীন্দ্রনাথও স্থূলকে তার স্থূল সত্তা থেকে বিমুক্ত করে শোধন করে নেন, এবং তারপর তাকে বিমূর্ত ভাবরাজ্যে সংস্থাপিত করে সেসব সমস্তার সমাধান অহুসঙ্কান করেন। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, স্থূল বাস্তব পৃথিবীর মৃত্যু ঘটে যায়। সম্ভবতঃ, দার্শনিক স্বয়ং এ সম্পর্কে কোন সময়েই সচেতন হতে পারেন না। ফলে, ওই বিমূর্ত ভাবের রাজ্যে সমস্তার সমাধান যদিও বা কোন একটা থাকে, তা হ’লেও আমাদের মর্ত্য পৃথিবীর বিশেষ কোন কাজে সে লাগে না। কারণ, ওই মানসলোকে বস্তু-পৃথিবীর কোন স্থান নেই, কোন স্বীকৃতি নেই।

রবীন্দ্রনাট্য-পরিবেশও এই বিমূর্ত ভাব-পরিবেশ। কবির সংলাপ-চাতুর্ঘ্য, গান, গানের কাব্যধর্মিতা এই

পরিবেশকে আশ্চর্যভাবে রসঘন ক'রে রেখেছে। 'আমরা মুর্খ হই, রস আশ্বাদন করি; কিন্তু আশ্বাদন করার মুহূর্তেও এ কথা অহুর্কণ অহুতব না ক'রে থাকা যায় না যে, এ জগৎ আমাদের জগৎ নয়; এর প্রকাশ আমাদের মানবিক জগতের প্রকাশ থেকে স্বতন্ত্র। এর আলোর দীপ্তি আমাদের পৃথিবীতে পৌঁছায় কি না সম্ভেদ। এমন কি 'অচলায়তন', যেখানে সংলাপ ও ঘটনাসমাবেশ অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ, স্থূল, আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হতে পারত, সেখানেও সংলাপের ধারা এইরূপ:

দাদাঠাকুর। আমার বন্ধু এমন বস্ত্র আমাকে গড়িয়েছেন যে তাতে চিরদিনের জন্য ভয়ের বিষবীত জেগে যায়।

পঞ্চক। তোমাকে দেখে তা বোঝা যায়। কিন্তু সেই বন্ধু পোলে কোথা গাঁকুর।

দাদাঠাকুর। পাবই বলে সাহস করে বুক বাড়িয়ে দিলুম, তাই পেলুম। কোথাও যেতে হয় নি।

পঞ্চক। সে কি রকম।

দাদাঠাকুর। যে ছেলের ভরসা নেই সে অন্ধকারে বিছানায় মাকে না দেখতে পেলেই কাঁদে, আর খার ভরসা আছে সেও হাত বাড়ালেই মাকে তখনই বুক ভরে পায়। তখন ভয়ের অন্ধকারটাই আরো নিবিড় নিট হয়ে ওঠে।...

মধুর স্বরলহরীর মত এ কথা হালকা ভাষায় ভর ক'রে

উড়ে উড়ে বেড়ায়, কিন্তু সত্য কোন বস্তুকে আশ্রয় ক'রে কখনও মুর্ত হয়ে ওঠে না। ভেসে চলে, কিন্তু দাঁড়ায় না। দাঁড়াতে পারেও না। কারণ, রবীন্দ্রনাটকের সমস্ত সংলাপের উৎসও হ'ল সেই বিমূর্ত ভাবরাজ্য, যেখানে রয়েছে তাদের প্রাণকেন্দ্র। শুধু 'অচলায়তন' নয়, এ পর্যায়ের যে কোন নাটক থেকে সংলাপের এই নির্বাক্তক রূপ দেখানো যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সংলাপ পুরোপুরি-ভাবেই ভাবসত্তার উপযোগী ও অহুর্কণ হয়েছে।

অবশ্য রবীন্দ্রমানস স্থূলকে এমনভাবে তার স্থূলত্ব থেকে মুক্ত না ক'রে পারে না। কারণ স্থূল তো অরা-মৃত্যু-কর্ম-কৃতির অধীন; আর সেই ক্ষেত্রেই তা কখনও সত্য হতে পারে না। সত্যের ক্ষয় নেই, সে চির পুরাতন হয়েও চির নবীন। সুতরাং আমাদের মানবিক অস্তিত্বকে যদি সত্য বলে গ্রহণ করতে হয়, তা হ'লে তাকে ঐ বিরাট পুরুষের সঙ্গে সেই অনন্তের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রেই উপলব্ধি করতে হবে। 'শায়দোৎসব' থেকে 'ফান্ডানী' পর্যন্ত পর্যায়ের নাটকগুলিতে রবীন্দ্রনাথ মানবজীবন ও মানবিক পৃথিবীকে সেইভাবে উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু পৃথিবীকে তার সমস্ত পার্শ্ববর্তিতা থেকে মুক্ত ক'রে।

তুমি

শ্রীঅনিলেন্দু চক্রবর্তী

হৃদয় আমার নিরুন্ম সবসী নীল,
আলগোছে নেমে ডুব দাঁও এসে চাঁদ;
দিনরাত্রি মোর নিবিড় মেঘের কালো,
কিনারে কিনারে তুমি যে মৌনার সাধ।

মৌন বখন সাধের বীণায় তার,
অলপ পরশে কর মধু-আলাপন;

বাণী মোর ঝরা ফুলের পাপড়ি-দল,
তুমি যে বহুল দখিণের সমীরণ।

তৃষ্ণা আমার ফেনিল সায়র-মোলা,
আনন্ত আকাশ তুমি চ্যুরিতিক ঘিরে;
জীবন বখন পথহারা প্রান্তর,—
চকিত বাঁশরী তুমি বটছায়া-তীরে।

জন্মদিনে

শ্রীমতী বাণী রায়

কেন আনিয়াছ তুমি ?
নিঃসঙ্গ ধরায় চির ভ্রাম্যমাণ জনে
এনেছ কোথায় ?
সঙ্গীতের বেশ নাই,
ভুলেছি ভাষণ,
অমর স্বর্গীয় বাণী ভুলে গেছে মন,
জ্যোতিহার ছন্দোহারা গোলকের প্রায়
কেন তুমি এনেছ এ নিঃসঙ্গ ধরায় ?
তবু আছে কোন মূল্য ।
হেমন্তশিশির বারে না, বারে না তবু
বৃথা তৃণশিবে ;
সামান্তকে রেখে দেয় অসামান্ত ঘিরে ।
তুচ্ছ ছোটপাতা !
হে ঈশ্বর, তারও মূল্য থাকে ।
খুলে দেখ হিসাবের খাতা,
কোনদিন কোন প্রাস্ত পথিককে দিতে
নিমেষ আশ্রয় ছিল তার অবদান ।
প্রসন্ন হাসিতে
বুকে নাও সেই ছোটপাতা
পেয়েছে তাহার মূল্য তোমার খাতায়,
তাই বুঝি এনেছ ধরায় ?

আত্মার অমরটীকা ধরে ললাটেতে
বেই আমি আজ জন্মদিনে
পশু পাখী কীট থেকে স্বতন্ত্র জনম
স্বর্ষের আলোকস্নাতা শ্রামা ধরিত্রীকে
জীবনের আলুগতো করেছি গ্রহণ ;
সেই আমি মৃত চিন্তে আজ জন্মদিনে
বার বার ভেবে দেখি স্বাতন্ত্র্য আমার,
গর্বে পুলকিত হয়ে, কভু অশ্রুচোখে ।
আত্মার অমর শিখা নিভিয়াছে প্রাণে,
জানি না পথের দিশা, দিশারী কোথায় ।
তবু যেন প্রতিহত স্পৃষ্টতাড়নায়
ছুটেছি জীবনপথে ।
কলুর বলদ,

মে-ও জানে কতটুকু ঘোরার পরিধি ।
আমার নয়নসীমা অসীমে হারায়
কানন-কুন্তলা এই ধরনী সীমায় ।
আসমুদ্র, আদিগন্ত ধরিত্রী জননী,
জানি না তোমার শেষ ;
জানি না তেমনি
আমার নিহিষ্ট পথ কত বহু দূর,
জাগায় তজ্রার রাজি প্রতীক্ষাভঙ্গুর ।
শুধু দেখি চোখ মেলে
ঘোবন-মাগকে শুচ্ছে শুচ্ছে মাথা তোলে
অশোক-কিংকর ;
শুধু দেখি দক্ষিণায় শাখাপত্র দোলে,
আবার শুকিয়ে বারে ব্যর্থ নিরুৎসাহক ।
আমি তো বাঁধি নি ঘর বালুবেলাতটে,
ঘরা বাঁধিয়াছে ঘর
ব'লে যাক তারা—
ব'লে যাক কানে কানে বীজমন্ত্র-প্রায়
জীবনে পেয়েছে কিছু, ঘর বাঁধে ঘরা ?
সারি সারি বাসনার দীপ্ত দীপ জলে
সময়ের সাগরের আবর্তিত শ্রোতে ;
টেউ ভাঙে, টেউ ওঠে, মিলায় প্রদীপ,
একে একে নিভে যায় কালসিদ্ধুতলে ।
সে মুহূর্ত বাসনার কিবা পরিণাম,
যা তারা পেয়েছে আর আমি না পেলাম ?
আমি তো বাসনা-দীপে জ্বলে পূর্ণাহুতি
ডাকি নি বিমুক্ত-প্রাণ জন্মসীমানায় ।
নিজে আছি বাঁধা প'ড়ে,
দিন চ'লে যায়
তাই তো অমরজ্যোতি বিনীর্ণ-বিরহী ।
তাই বিরহের সিদ্ধু কাঁদে রহি রহি
চারিদিকে পৃথিবীর মত্ত কোলাহল
পারে না, পারে না দিতে আবরণ টানি ।
সকল ধরনের মধ্যে বিরহের বাণী
বুকেঁড়া ব্যথা নিয়ে করে হাহাকার—
কই তুমি, কই তুমি, হে মিত্র, আমার !

ইলা বউদির কোলে-কাঁধে নেই।

বাড়ির ওপরের সবাইর ধারণা, সে হচ্ছে আছে। তাই তার শব্দের অভাব নেই। বিকালে ঢাকাই শাড়ির পাট ভাঙে তো সকালে বোম্বাই ছাপার শাড়ির। এ সপ্তাহে কানপাশা তো ও সপ্তাহে মীনাকরা টব। এ-মাসে স্ট্রাওল হ'লে ও-মাসে হিলতোলা ছুতো চাই।

এমনি তার ঘরের আসবাবও বদল হয় মাঝে মাঝে। কখনও কোঁচের বদলে জলচৌকি। কখন বা হাত-মেশিনটার বদলে চরকা।

ইলা বউদির কিছুতেই তৃপ্তি নেই।

বাড়ির ওপরের অস্বস্তি বউ-ঝিদের গা ঘেন জলে : ইস, কি পরসাতাই না নষ্ট করছে। কাকুর কাকুর আবার হিংসা হয়। কারণ সকলের স্বামী আবার শিশিরবাবুর মত নয়। একেবারে যেন ইলা-অস্বস্তি প্রাণ। নইলে এমন আবদারে আত্মের বউকে কি কেউ পুষতে পারে!

একদিন একটা কাঠের দামী আলমারি প্রায় জলের ঘরে বেচে ইলা। সেজে-গুজে বেরিয়ে যায় দুপুরবেলা। তার ভ্যানিটি ব্যাগটা বোঝাই টাকা সিকি আনুলি।

বাড়ির তোলা ঝিটি আজ একটু সকাল সকালই এসেছে। জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাচ্ছ বউদি?

তোর ঘরকার কি?

ভেবেছিছ একটু আগে-ভাগে কাজ-কাম সেরে বাড়ি যাব। ছেলেটার জ্বর—তা বৃষ্টি হ'ল নি।

কেন হবে না? এই চাবি রইল। ও-ঘরের মিনতির কাছে দিয়ে যাস।

ঝিটি তবু কি যেন বলতে চায়। সে ইতস্তত করে।

ভাল ক'রে মুখের ওপর গাফিটা বুলিয়ে, জু জোড়া একবার বাকিয়ে ইলা জিজ্ঞাসা করে, আর কিছু বলার আছে নাকি?

না। তবে কি জান বউদি, অমন সেজে-গুজে অতগুলো টাকা নিয়ে এক একা বার না হওয়াই ভাল। সেদিন জঙ্গগিঙ্গীর—

আমি একা যাচ্ছি জানলি কি ক'রে?

বাবু তো আপিসে।

মুখ মচকে ইলা বলে, আরও তো বাবু থাকতে পারে। পাশের ভাড়াটে ব্রজেশ্বরবাবুর বউ ছি-ছি-ক'রে ওঠেন।

ইলা গট-গট ক'রে বেরিয়ে যায়। গেটের বাইরে একটি জিশ-বজিশ বছরের বুঝা দাঁড়িয়ে। সে বলে, ক্ষমা কর বউদি, আমার একটু দেরি হয়ে গেছে। রিক্সা ডাকব?

না।

ইলা বউদির যেটুকু রূপ, তার চেয়ে তার অধিক রহস্ত বয়স। কেউ বলে জিশ। কেউ বা পয়জিশ। দু-একজন বলে, না লো, চল্লিশ। ঘাই হোক, ওর বয়সের ব্যারোমিটারটা মেয়েদের মুখের উত্তাপে আশ্চর্য ওঠা-নামা করে। কেউই সঠিক কিছু ধরতে পারে না। শিশিরবাবু কাছে এসে দাঁড়ালে তৃতীয় পক্ষের দ্বী ব'লে ভ্রম হয়।

দুটি মেয়ে আছে ইলার। তারা এখন বড় হয়েছে। কলেজে পড়ে। থাকে বন্ধুবান্ধব পড়াশুনা নিয়ে। তাই ইলা বউদি এখন আর আদর সোহাগ ক'রে কোলে পিঠে জড়িয়ে ধরতে পারে না ওদের। শত হ'লেও ওরা সেয়ানা হয়েছে। নিজেই কেমন লাগে যেন।

বাড়ির ওপরের কাকুর কচি ছেলে-মেয়ে দেখলে ইলা অমনি ছুটে যায়। চুমোয় চুমোয় তাকে একেবারে কাঁদিয়ে ছাড়ে। সকলে ভাবে, ইলার এও এক সর্বনাশা খেয়াল। কিন্তু কাকুর প্রতিবাদ করতে কেন যেন মন সরে না।

ইলার সময় কাটে না। তার সারা দেহের স্বাস্থ্য-ঘোবন ভাবের ভরা গাঙের মত উছলে পড়তে চায়। অভাব বলতে বা বোঝায় তা তার নেই, শোক তাপ সে কখনও পায় নি। তাই তার সংস্রবের বোড়া বন্ধা-বীধা থাকতে চায় না।

বিকানের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে গিয়ে ট্রামে ওঠে। দুজনে পাশাপাশি বসে। হাসে অল্পবয়সী মেয়ের মত।

খুব স্মার্ট ছেলে হ'লেও বিকাশ সময় সময় রাডা হয়ে ওঠে। তবু মাঝে মাঝে চুরি করে তাকায় ইলা বউদির দিকে। বিকাশ শিশিরবাবুর আপন ভাই নয়। এ

পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে মাত্র মাস ছয় আগে। কিন্তু ইলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে হালফিল। তাই ইলা শিশিরবাবুর কাছে এর একটা চাকরির জন্তে অনেক সুপারিশ করেছে।

ইলা বিকাশের হাত ধরে নানা স্থানে ঘোরে, চকলেট কেনে, শরৎ খায়, দর করে ফুটপাথের রকমারী জিনিস-পত্রের। হাটে পার্ক স্ট্রিট থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত।

তুমি যেন কি একটা জরুরী জিনিস কিনবে বললে ?

হ্যাঁ, একটা পেন কিনব।

কত দামের মধ্যে ?

কত দামের হ'লে তোমার পছন্দসই হয় ?

জিনিস তোমার, পছন্দসই হবে আমার ?

তোমাকে উপহার দেব যে।

হঠাৎ ?

টাকা আছে, ভাল লাগছে। কেন, তুমি কি নিতে কুষ্ঠা বোধ করছ ?

বিকাশ সলজ্জ কণ্ঠে বলে, করলেও তো এখন আর বলার উপায় নেই।—ব'লেই সে হেসে ওঠে।

বিকাশের এ সরল হাসি ইলার বড় ভাল লাগে। একটা কলম নইলে বিকাশের বড় অসুবিধা। অনেক দিন ইলা শুনেছে, আজ তার খেয়াল হয়েছে।

একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছুজনে অনেকগুলো কলম দেখে। বহু বিচিত্র গঠন, বহু বিচিত্র রঙ। ছুজনে মিলেই পছন্দ করে। তবে ইলার পছন্দটাই আসল পছন্দ। একটা কলমের দাম স্থির হয় পঁয়ত্রিশ টাকা। যেমন রঙ, তেমনি ভোল ও নিবের সুস্বভা।

তা হ'লে এইটা নিচ্ছি ঠাকুরপো ?

বিকাশ কিছু না ব'লে সংযমের দৃঢ়তা দেখায়। কিন্তু তার মুখ-চোখে খুশি উপচে পড়ে।

সহসা ইলা বলে, আচ্ছা ঠাকুরপো, চল না এই বিকেল-বেলাটা একটু গঙ্গার ধারে ঘুরে আসি। কিরতি পথে এটা নিয়ে যাব 'ধন।

বিকাশ একটু বিমুগ্ধ মুখে বলে, বেশ, তাই হবে।

একটা ট্যাক্সি ডাকে ইলা। সে টুক ক'রে উঠে বসে। বিকাশের যেন ভিতরে ঢুকতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। অথচ সে দোহার গঠন—আদৌ মোটা নয়।

দেখছ ঠাকুরপো, কি সুন্দর এদিকের রাস্তাগুলো ?

বিকাশ কিছুই যেন দেখছে না।

ওরা গিয়ে গঙ্গার ধারে নামে। ইলা ট্যাক্সি ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে বিকাশের হাত ধরে টানে : ভাড়াভাড়ি এস, এই গাছটার তলায় বসি। আবার অন্য কেউ এসে দখল ক'রে না বসে !

সন্ধ্যার অন্ধকার আসন্ন। ঘেরালী মালার মত দেখা যায় জাহাজের আলোগুলো। আর জাহাজগুলোকে দেখা যায় প্রাগৈতিহাসিক জীবের মত। যেন অনেক পথ ঘুরে অনেক ভাড়া ক'রে এসে বিশ্রাম করছে চোখ বুজে।

ইলা তন্ময় হয়ে চারদিকে তাকায়। এত জল সে কতদিন দেখে নি। কলকল ছলছল করছে গেক্সা স্রোত।

ঠাকুরপো, একদিন গঙ্গায় স্নান করতে এলে কেমন হয় ?

ভাল।

তুমি আসবে ?

আসব।

এত সংক্ষিপ্ত জবাবে খুব খুশী হয় না ইলা। সে বোঝে, কি যেন একটা হয়েছে। নইলে ঘাগের মত ছুটছে না কেন বিকাশের মনের কাঁটাটা মিনিট চণ্টা পেরিয়ে।

ফাউন্টেন পেনটা পেলে তুমি প্রথম কি লিখবে ?

বিকাশ কোনও জবাব দেয় না।

ইলা গা ঘেঁষে এসে কের জিজ্ঞাসা করে, শুনছ ?

শুনেছি—কিন্তু বলা তো শক্ত।

তবু একবার ভেবে দেখ।

কিছু তো ঠিক ক'রে রাখি নি যে, চট ক'রে বলব। তবে হ্যাঁ, আর কিছু না হ'লেও চাকরির দরখাস্ত দিয়েই বউনি করতে হবে।

এ কথাটার ইলার যেন মনে ছোঁয়া লাগে না। বিকাশের মত স্বাস্থ্যবান শিক্ষিত যুবকের মুখ দিয়ে যা বেরিয়েছে তা অত্যন্ত সঙ্গত। তবু ইলার কেন যেন হৃদয় স্পর্শ করে না। সে অনেকক্ষণ উদাসিনীর মত চেত্নে থাকে। একটু ম'রে বসে অভিমানী মেয়ের মত। অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসে। কয়েকখানা ফেরি স্টীমার হুইসেল দিয়ে ওপারে পাড়ি জমায়। একটা জেনের শেষ আর্ডনার শোনা যায় একটু দূরে।

ইলা চকিত চমকে জিজ্ঞাসা করে, কথা বলছ না কেন ঠাকুরপো? দেখছি তুমি অনেকক্ষণ ধ'রেই যেন একটু অনমনস্ক।

একটা এনগেজমেন্ট ছিল এই সন্ধ্যাবেলা।

আজ ওসব রেখে দাও।

কিন্তু জরুরী যে?

হোক, তবু রেখে দাও—আজ কোনো কাজ নয়, সব ফেলে দিয়ে—

ইলা আর আবৃত্তি করে না। অসমাপ্ত পংক্তিগুলির ব্যঙ্গনা সে চোখের সহাস্ত ইঙ্গিতে প্রকাশ করে। একে সাদ্য পরিবেশ, তাতে জ'লো হাওয়া—ইলার বয়সের ব্যারোমিটারটা যেন পচিশের কোঠায় নেমে আসে। শাড়ির খসখসানি, চুড়ির বিনিতিটিনি একটা মাদকতা সৃষ্টি করে।

তবু বিকাশ বলে, না গেলে বিপদ হতে পারে।

কি বিপদ?

জানি নে।

কেউ কি পথ চেয়ে বসে আছে?

আমাদের ভাগ্যে তা নেই বউদি।

কম্পিত বক্ষে ইলা জিজ্ঞাসা করে, কেন?

এটা মেঘদূতের যুগ নয়।

তবু তো পুরুষ নারীকে ভালবাসে।

সে সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই।

তবু তো ব্যস্ত হচ্ছে—যেতে চাইছ এমন সুন্দর জায়গাটা ছেড়ে! শুধু কল চৌবাচ্চা দেখে হাঁপিয়ে উঠেছি আমি।

আমরা কিন্তু তোমার ঠিক উল্টো। কলের কুলি হবার জন্তে নিত্য আবেদন জানাচ্ছি। একটা কিছু হয়ে গেলেই বাচতাম।

ছিঃ, তুমি নিজেকে অত তুচ্ছ মনে করছ কেন? উনি যখন চেষ্টা করছেন, তোমার একটা ভাল কিছু হয়ে যাবেই। অনেক লোককেই তো উনি কাজ দিয়েছেন, তবে সময়টা খারাপ ব'লে একটু দেরি হচ্ছে।

হ্যাঁ, তা বুঝতে পারছি। কিন্তু—

ইলা সম্মেহে প্রশ্ন করে, কিন্তু কি আছে ঠাকুরপো?

কিছু নেই বউদি, কিছু নেই।—বিকাশ যত দূরত্বের সঙ্গেই বলুক না কেন, ওর কণ্ঠে যেন দুর্বলতা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে।

ইলার তা কানে বাধে। কেন এ দুর্বলতা? তবে বিকাশের এ কি সন্দেহ? কারণ অহুসন্ধান ক'রে ফেরে ইলা, কিন্তু পায় না। তার নিজের ব্যবহার তো সন্দেহাতীত, শিশিরবাবুরও তাই। তবে বিকাশের মনে এ খটকা এল কি ক'রে?

ইলা প্রশ্ন করে।

বিকাশ মাহুঘের মনের অপার রহস্য ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারে না।

ইলা যতদূর বোঝে সে হেসে আশ্বাস দেয়, এখানে তোমার সে ভয় নেই।

আরও ঘণ্টাখানেক কাটে। এপারের দু-একখানা স্ত্রীমার মন্থরগতিতে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছড়িয়ে ওপারে চ'লে যায়। কখনো দিটি বাজে, কখনো চাকার শব্দ হয়, কখনো বা জলে উত্তাল তরঙ্গ। কিন্তু ইলার আর এমব ভাল লাগে না। সে যা কাছে চেয়েছিল, তা যেন পায় নি। তা যেন ঘাট ছাড়িয়ে মন্থর গতিতে দূরে স'রে গেছে। সে উঠে পড়ে। কল, আজ তবে চল।

এবার আর ট্যান্ডি নয়। ওরা পাশাপাশি হেঁটে এগুতে থাকে। যত আলোর ভিতর আসে তত উচ্ছল হয়ে ওঠে ইলা। বিকাশকেও যেন চুম্বকে স্পর্শ করে। ওরা যেন হুঃখপের ঢেউ কাটিয়ে ধর্মতলায় এসে কুল পায়।

চল, পেনটা কিনে নিই আগে।

তার পরও তোমার কেনাকাটা আছে! চল, দেরি যখন হয়েছে রাত বারোটায়ও আপত্তি নেই আমার।

ইলা রেখে-গুনে কলমটা কিনে নিজের ব্লাউজের সঙ্গে গেঁথে রাখে। বিকাশ সতৃষ্ণ নয়নে তাকায়।

কি দেখছ? ব্যস্ত হ'য়ে না। একটু অহুষ্ঠান ক'রে দেব।

তুমি বউদি, মাহুঘকে যে কতখানি নাজেহাল করতে পার!

এমন ক'রে তাকালে বলব না।

বিকাশ মাথা নত ক'রে থাকে। কলমটার দিকে সে আর চেয়ে দেখে না।

ওরা হগ মার্কেটের দিকে আবার হাঁটতে থাকে।

স্নাবছি কিছু ফুল কিনে নেব।

এত রাত্রে ফুল দিয়ে কি হবে?

শ্রীঅন্নবিন্দনের বন্ধিমডল

অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

৭

আমাদের ভবিষ্যৎ-আশা

সাক্ষ্য কিছু দেখা গেলেও আমাদের দেশের ভাব-
বিপ্লবের মাত্র এটা শৈশবাবস্থা। যদিও আজকাল তরুণ
সমাজে সকল দিক থেকে এর নানারূপ লক্ষণ উত্তরোত্তর
প্রকাশ পাচ্ছে,—যথা, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের আগেকার
প্রভাবটা ক্রমশ ক'মে আসা, হিন্দুধর্মের দিকে আবার ফিরে
যাওয়া, বাংলা ভাষার ব্যুৎপত্তি ঘটানো, বাঙালী হয়ে জন্মেছি
ব'লে একটা গৌরব বোধ করা, জাতীয়তাবোধ জাগ্রত
হওয়া ও জাতির অপমানের মর্মবেদনা বোধ করা,—যদিও
এই সব লক্ষণ এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, তবুও এ কাজ
সবেমাত্র শুরু হয়েছে বলতে হবে, এর সার্থকতা আসতে
এখনও অনেক বাকি। কলকাতা শহরে এখনও আগেকার
রুচির রেওয়াজ পূর্ববৎ রয়েছে; চাকুরে মহলে এখনও
জাতীয়তাবিরোধী মনোভাব মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে রয়েছে;
রাজনীতির ও সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে এখনও নব-বিপ্লবের
লক্ষণ তেমন দৃষ্টিগোচর নয়। ইংরেজিয়ানায় দীক্ষাপ্রাপ্ত
বাবুদের দলই এখন সকল উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে
দোর্দণ্ডপ্রতাপে এখনকার ছুনিয়াটাকে দমন ক'রে
রেখেছেন। তাঁরাই কংগ্রেসের বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে জোর
গলায় বক্তৃতা দিচ্ছেন, আবার ব্যবস্থাপক সভাতেও তাঁরাই
প্রশ্নোত্তরের তৃকান তুলে কুতূহলে কেলি ক'রে বেড়াচ্ছেন,
কর্পোরেশনের সদস্য হয়ে নগর-পরিচালনার ভার নিয়ে
তাঁরাই যত কিছু অজ্ঞায়-অবিধানের রাজস্ব ভোগ করছেন।

এই ইঙ্গ-বঙ্গ বাবুর্সাই এখনকার যুগের সর্বসর্বা, ভবিষ্যতে
যদিও এঁদের এ কদর কিছুই থাকবে না। ইংরেজ প্রভুর
দাসভাবাপন্ন এই বাবুপ্রাধান্তের যুগ কেশবচন্দ্র ও কৃষ্ণদাস
পালের প্রভাবটাই এতকাল বলবান ছিল, বন্ধিমের প্রভাব
তার মধ্যে খুব বেশী কাজ করতে পারে নি। এখনও ওই
সকল ইঙ্গ-বঙ্গ বাবুদের মুখে শোনা যাবে, তারা নাসিকা
হুঙ্কিত ক'রে বলছে যে বাংলায় লেখা বইগুলো কেবল
বাঙালী মেয়েরাই প'ড়ে থাকে। এ ধারণা যদিও এখন
আর ততটা সর্বজনীন নয়, কিন্তু কয়েক বছর আগে পর্যন্ত
তাই ছিল। জয় হোক এই বাঙালী মেয়েদের, এরাই
তা হ'লে বাংলা সাহিত্যকে এতকাল বাঁচিয়ে রেখেছে।
আর জয় হোক জনকয়েক মহৎপ্রাণ ব্যক্তির, যারা এই
মেয়েদের এবং সামান্য কয়েক জনের মুখ চেয়ে তাদের
আপন মাতৃভাষাকেই আঁকড়ে ছিল, বিদেশী ভাষার কাছে
নিজেদের মন প্রাণ বিকিয়ে দেয় নি। সমগ্র জাতির
কৃতজ্ঞতা আর যশোগান তাঁদের প্রাপ্য পুরস্কার।
সত্য কথা, বাংলার মেয়েদের কাছেই দেশের সাহিত্য মর্যাদা
পাচ্ছে, তাদের এই সাহিত্যপ্ৰীতি ঘেন চিরদিন বজায়
থাকে; কিন্তু মেয়েরা ছাড়া বাংলা বই আর কেউ পড়ে
না—এমন কথা অতঃপর আর বলা চলবে না। এখনকার নব
যুগে যারা জন্মেছে তারা ইতিমধ্যেই বন্ধিমের আদর্শে
অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছে, কেশব সেন ও কৃষ্ণদাস পালের

তুমি দেখছি নিতান্তই অরসিক। ফুলের প্রয়োজন
তো রাতেই। ফুল ছাড়া কি কোন অলুষ্ঠান হয়?

বিকাশ চূপ ক'রে থাকে।

ওরা বাড়ি ফিরে দেখে যে, গেটের বাইরে একটি বুড়ি-
বাইশ বছরের মেয়ে দাঁড়িয়ে। হাতে তার একটা ফাইল।
অগ্রসৃত হয়ে বিকাশ জিজ্ঞাসা করে, কখন এসেছ?

প্রায় ঘণ্টাখানেক। উঃ, কি খোঁজটাই না তোমায়
খুঁজছি। কথা দিয়ে এমন কেউ করে?

ভাল ক'রে ইলা দেখে নেয় মেয়েটিকে। তারপর
ফুলগুলো বুকে সাপটে নিয়ে ভিতরের দিকে চ'লে যায়।

ইলা ঘরে পৌছাবার আগেই বিকাশ ছুটে আসে :
কলমটা একটু দাও তো বউদি।

কি হবে?

ওকে একটা ঠিকানা লিখে দেব—বড্ড জরুরী।
ইন্টারভিউ দিতে যাবে।

ফুলগুলো বুকে চেপে ইলা বলে, হায় রে, পেনটা তো
পাচ্ছি নে।

পরদিন বাড়ির সবাই আবার জ্ঞানভে পারে, ইলা কি
ঘেন জলের দরে বেচে কটা বড় বড় ডল পুতুল কিনে
এনেছে।

আদর্শের দিকে তারা আর ঝোঁকে না, জাতীয়তাবোধ তাদের খুবই উগ্র, বাংলা দেশকে তারা ভালবাসতে শিখেছে আর দেশের গৌরবে তারা গৌরবাবিত। যদিও তারা হিন্দুয়ানির গোঁড়ামি করে না কিন্তু দেশের প্রাচীন ধর্মকে তারা অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করে ও বারং বারং তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে যায় তাদের আন্তরিক যুগা করে। আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ এদেরই উপর নির্ভর করছে, জাতীয়তাবিরোধী কংগ্রেস বা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উপর নয়। এই নতুন যুগের অগ্রগামী দল ইতিমধ্যেই আমাদের মাঝে এসে দেখা দিয়েছে। এদের মধ্যে যথেষ্ট শক্তি আছে, সংস্কৃতি আছে, প্রতিভা আছে। এরা যদি কেবল নিজেদের খাঁটি রেখে চলতে পারে, তা হ'লে এদেরই দিয়ে আমরা ভবিষ্যৎকালে অতীতের চেয়ে আরও বেশী আশ্চর্য কাজ দেখাতে পারব। কোন আশাবাদী বাঙালী যদি এখনকার এই বিশ্বয়কর স্থানা দেখে ভবিষ্যতের উজ্জলতার সম্ভাবনা নিয়ে এখন থেকেই গর্ববোধ করতে থাকে, তবে এ দোষটুকু তার ক্ষমার্য।

সাহিত্যসৃষ্টি করা ও বিজ্ঞা অর্জন করা—এ দুটি বিষয়ে বাঙালী সকলকে টেকা দিয়ে প্রথম পুরস্কার পেতে পারে, বিশেষত এই সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে। অত্যন্ত ক্ষেত্রেও বাঙালীর কৃতিত্বটা যদিও তার চেয়ে কিছু কম, কিন্তু চেষ্টা করলে সেই সব ক্ষেত্রেও যে সম্মানের শিখরে গিয়ে সে উঠতে পারে তার দৃষ্টান্তও একেবারে বিরল নয়। অন্ধন-বিজ্ঞায়, স্থাপত্যে ও চাকশিল্পে এদের এ-যুগে তেমন বেশী দখল ছিল না। যা কিছু করতে তাতে বরং বিকৃত রুচির পরিচয় পাওয়া যেত। কিন্তু এই অনভ্যস্ত বিজ্ঞাতেও বাঙালী সেই র্যাফেল ও দাভিঞ্চি ও এঞ্জেলোর দেশ ইটালিতে গিয়ে খ্যাতি অর্জন করতে পেরেছে। ধর্মের ব্যাপারেও বাঙালীর ভবিষ্যৎ অতি উজ্জল। এই বাঙালীই সর্বপ্রথমে হিন্দুধর্মের সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিপ্লব এনেছিল এবং হিন্দুধর্মকে সংস্কারমুক্ত ক'রে ভেঙেচুরে নতুন একটা আকার দিয়েছিল, তাতেই মনে হয় এদিক দিয়েও তার ভবিষ্যৎ খুব আশাপ্রদ। পরধর্মের দিকে কিছু কালের জন্তে এদের খুব ঝোঁক হয়েছিল বটে, কিন্তু তার ভিতর থেকে অনেক বহুমূল্য জিনিস আহরণ ক'রে নিয়ে এরা আবার আগেকার পিতৃপিতামহদের ধর্মেই ফিরে আসছে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে বাঙালী বরাবরই নেতৃস্থানীয় ছিল, এখনও তাই আছে। বাংলা দেশে সেকালের কংগ্রেসের অস্তিমকাল ঘনিয়ে এসেছে; প্রতি বছরেই তার অমুখবর্তীনের সংখ্যা ক্রমশঃ গুটিয়ে আসছে। বনার্জি ও ব্যানার্জি ও লাল-মোহন ঘোষের দল ব্যবস্থাপক সভায় নাম লিখিয়ে দেশের যুবকদের আস্থা হারিয়েছেন। ওই আদর্শের চেয়ে বৃহত্তর ও মহত্তর আদর্শের খাঁটি দেশপ্রেম এখন সমাজের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে; স্থানীয় বাণিজ্য-সম্প্রদায় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠার মধ্যে আমরা ওর লক্ষণ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। বাংলার ভবিষ্যতের আশা খুবই উজ্জল; কারণ বাংলা কাল যে কথা ভাববে সমগ্র ভারত তার পরবর্তী সপ্তাহে তাই ভাবতে শুরু করবে। ব্যবসা বাণিজ্য ও বিজ্ঞানের ব্যাপারে বাঙালী এতকাল কাঁচা ছিল, কিন্তু এদিকেও তার দৃষ্টি পড়েছে। তবে অত্যন্ত ব্যাপারের মত এতেও সে সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে কি না সেটা পরের কথা। বাঙালী স্বভাবতঃই ভাবপ্রবণ ও অস্থিরমতি, যে পথে চলতে গেলে আবেগশূন্য ও স্থিরমস্তিষ্ক হয়ে থাকা দরকার সে পথে চলা তার পক্ষে কঠিন। তবুও সে যদি তার আস্থারিকতা বজায় রেখে চলে তা হ'লে এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে সে অসাধ্যসাধন করতে না পারে। এই বিশেষ গুণটি বাঙালী জাতির মধ্যে এসেছে প্রধানতঃ বন্ধিমেরই জাগরণ-মন্ত্রের প্রভাবে। তরুণ বাংলা তাদের স্থূল কলেজ থেকে এই চেতনা ও সংস্কৃতির ধোরাক পায় নি, যা কিছু পেয়েছে তা বন্ধিমের উপস্থাস ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য থেকে। এই জন্তেই বলতে হয় যে, জাতির ভাষাটাই হ'ল তার প্রাণমাতা।

গল্পে ও পণ্ডে অনেকেই এখন দেশের সাহিত্যসৃষ্টির মহৎ কাজটি করছেন—হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, কামিনী সেন, নারীপ্রগতির শিরোমণি ও রবীন্দ্রনাথের ভগ্নী স্বর্ণকুমারী দেবী, এমনি আরও অনেকের নাম করা যেতে পারে। কিন্তু এমন একজন বন্ধিম কিংবা একজন মধুসূদন আর কখনো জন্মাবে না। কেউ কেউ বলেন যে দেশের মস্তিষ্ক-প্রতিভার ক্ষেত্র এবার বন্ধা হয়ে গেল; সে কথা ঠিক নয়। একই শতাব্দীর মধ্যে শেক্সপিয়ার ও মিলটনের আবির্ভাব হয়েছিল। এদের পর এলেন কীটস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, টেমিসন, কিন্তু দ্বিতীয় শেক্সপিয়ার বা মিলটন আর জন্মায় নি। দাস্তে আর বোকাসিও ট্রপমুগরি এসে

পড়েছিলেন; তারপর এলেন বনি, বোইয়ার্ড, আলফিয়েরি, টাসো, কিন্তু দাস্তে কিংবা বোকাসিও আর নয়। এই ধরনের মাহুসরা অনেক শতাব্দীর পরে এক-আধবার দৈবাৎ আসে। কেবল গ্রীস দেশেই উপযুপরি অনেকগুলি প্রতিভার আমদানি হয়েছিল। হিন্দুজাতিও চিন্তাগর্ভতা ও সাহিত্যিক প্রবণতার দিক দিয়ে তাদের চেয়ে কিছু কম নয়, এখানেও যে তা হবে না এমন কোনো কথা নেই। গ্রীসের নামটাই খুব বড়, কিন্তু মাহুসের মধ্যে একবার যা সম্ভব হয়েছে, মাহুসের মধ্যে আবার তা সম্ভব হতে পারে। কেবল আমাদের এইটুকুই দেখা দরকার যেন কোনো ভ্রান্ত আদর্শের শৃঙ্খলে আমরা জড়িত না হই, আর ভ্রান্ত শিক্ষায় মগজ ভরে বিজ্ঞাভিমানের স্ফীত না হয়ে এই সব উন্নতির অগ্রদূতগণের মত নিজদের বুদ্ধি ও অন্তরকে উন্মুক্ত রাখতে পারি। এই ভাব নিয়ে থাকলে বাংলার স্বাভাবিক সৃষ্টি-শক্তি নিঃশেষ হবে না। আর তেমন কিছু না ঘটলেও বঙ্কিমের কীতি কখনো লোপ পাবে না। এখনই তা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ব্যবধান ডিঙিয়ে চলে গেছে, ইংরেজী ও জার্মান ভাষায় তাঁর লেখার অমূল্য বেরিয়েছে, সকল দেশের লোক তাই পড়ে আনন্দে ও বিশ্বাসে অবাক হয়েছে। রাজনীতিতে যারা দক্ষ, অর্থনৈতিক শাস্ত্রে যারা পণ্ডিত, বড় বড় পরীক্ষা পাসের দিকে যাদের মন আর ব্যবস্থাপক সভায় স্থান পাওয়া যাদের লক্ষ্য, তাদের এই দেখে কিছু শিক্ষা হোক। আইনের কূটতর্কিক হয়ে আর কারুনদক্ষ হয়ে অসংখ্য জাতির সঙ্গে আমরা পাল্লা দিতে পারব না। এই তার পন্থা নয়; তার জন্তে চাই উন্নত চিন্তা, মহৎ কর্মপ্রবণতা, অমৃতাস্করা লেখনী।

বঙ্কিম ও মধুসূদন জগৎকে তিনটি অমূল্য অবদান দিয়ে গেছেন। তাঁরা গড়ে দিয়ে গেছেন এই বাংলা সাহিত্য, যার অমর সৃষ্টিগুলি আধুনিক ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনার সঙ্গে সমান পর্যায়ে দাঁড়াতে পারে। তাঁরা দিয়ে গেছেন এই নতুন বাংলা ভাষা। বাংলা এখন আর প্রাদেশিক বুলি মাত্র নয়, এ হ'ল এক দেবভাষা যা আবহমানকাল পর্যন্ত অক্ষয় অমর হয়ে থাকবে। বাঙালী জাতি যদি ম'রে না যায় তা হ'লে এরও আর মৃত্যু নেই। এই জাতির মধ্যে উদ্দীপনা আছে, তেজস্বিতা আছে, প্রচুর কল্পনাশক্তি ও উদ্ভাবনাশক্তি আছে, এরা জগতের বুদ্ধিমান জাতিগুলির মধ্যে প্রথম শ্রেণীর। কেবল যদি এদের যথেষ্ট অধ্যবসায় ও সহনশীলতা থাকে তা হ'লে এরা একদিন জগতের বরেন্দ্র জাতিদের মধ্যে স্থান ক'রে নেবে। এটা কম কথা নয়। উপর থেকেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, এরা ম'রে ম'রেও এতকাল বেঁচে আছে। ভবিষ্যকাল যখন ভারতের স্বরগীন্দ্রদের জন্তে বরমালা নিয়ে আসবে, তখন সে কোন পদলোলুপ রাজনৈতিক বা সংস্কারকে বেছে নেবে না, সে বেছে নেবে নেই নিরহঙ্কার বাঙালীকে যিনি নামঘরের জন্তে কিছুই করেন নি, কেবল কাজকে ভালবেসে নীরবে তাঁর কাজই ক'রে গেছেন, বিনা স্বার্থে জগৎকে নিজের অন্তরের সর্বশ্রেষ্ঠ রত্নরাজি বিতরণ ক'রে গেছেন, আর নতুন রকম ভাষা ও নতুন রকম সাহিত্যের সৃষ্টি ক'রে একটা জাতির প্রতিষ্ঠা ক'রে দিয়ে গেছেন।

সংক্ষেপ

ত্রিগুণানন চট্টোপাধ্যায়

নির্মীলিত ছুই চোখ, তমিস্রা নিবিড়,
সুস্তিত অন্তর আর মুহিত চেঁতনা।
গতি রুদ্ধ অকস্মাৎ ছরস্তু নদীর,
সংহত উত্তাল স্রোত—নাই উন্মাদনা।
আনন্দের ধারা নামে প্রশান্ত গভীর,
তীক্ষ্ণদৃষ্টি নক্ষত্রের নিঃশব্দ ব্যঙ্গনা—
তমসায় বিচ্ছুরিত উজ্জ্বল জ্যোতির—
বিচিত্র প্রকাশে খোঁজে প্রদীপ্ত প্রেরণা।

প্রণবের ধ্বনি শুনি মনের নির্জনে,
জ্ঞান-চক্ষুহীন অন্ধ—শুধু দুর্দশায়
দৃষ্টির প্রদীপ জ্বলে—বিজ্ঞান গহনে
উদ্ভাসি তুলিতে চাই আলোকমালায়।
গুহায়িত সত্য—যাত্রা শুরু অঘেষণে।
সম্মুখে সংকেত কাঁপে—আগ্নির শিখায়।

মধ্য কলকাতার একটি বড় ফ্ল্যাট-বাড়ি। পাশাপাশি ঘর, সব মিলিয়ে গোটা পঁচিশেক ফ্ল্যাট হবে; কিন্তু নীচের বারান্দা না হ'লেও দোতলার বারান্দাটা 'কমন'। একই সিঁড়ি ভেঙে একই বারান্দা পেরিয়ে তবে বার বার ফ্ল্যাটে যেতে হয়। বাড়িওয়ালা নিবারণ হালদার নিজে থাকেন তিনতলায়। দিবি নিস্তরঙ্গ শাস্ত্র। সেই তুলনায় দোতলার জীবনযাত্রা অনেকটা শব্দমুখর। কিন্তু ইদানীং সমস্তাও দেখা দিয়েছে নানা বিষয় নিয়ে। উত্তর কোণের ফ্ল্যাটে এতদিন বাস করতেন মুগাক চ্যাটার্জি। দেখা হ'লেই হেসে কথা বলতেন, মাঝে মাঝে ঘরে ডেকে নিয়ে চা খাওয়াতেন। কিছু মধ্য কিছু নয়, হঠাৎ শোনা গেল তাঁর মেয়ে বীথি কোন এক গ্রামোফোন কোম্পানির ম্যাগোলিন বাজিয়ের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে'বিয়ে ক'রে বসেছে। শাস্ত্র মাল্লু মুগাকবাবুকে হঠাৎ কেমন খিটখিটে হয়ে উঠতে দেখা গেল। বীথির ঘটনাটা গোটা ফ্ল্যাট বাড়িটায় রাষ্ট্র হয়ে পড়তে দেরি হ'ল না। সবার মুখেই মুগাকবাবুর প্রতি অযাচিত সহানুভূতি।

জীবন মল্লিক বললেন, কি করবেন মশাই, যে যুগের যে রীতি। আজকালকার থিয়েটার-বায়স্কোপগুলোই আরও বেশী ক'রে ছেলেমেয়েগুলোর মাথা খেয়েছে।

ভদ্রেশ্বর বড়াল বললেন, গার্জেন হিসেবে আপনার আগে থেকেই স্কিষ্ট হওয়া উচিত ছিল। বাইরের ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের অবাধ মেলামেশা করবার স্বযোগ দিলে তার পরিণতি কোথায় গিয়ে পড়ায়, দেখলেন তো?

দক্ষিণ ফ্ল্যাটের ঋতেন ঘটক কিছু রসিক লোক, হাতের প্রায়-নিঃশেষিত সিগারেটে গোটা দুই শেবটান দিয়ে বললেন, চেপে ধান মশাই, চেপে ধান। যে দিনকাল আর যে বাজার পড়েছে, তাতে বেঁচে গেছেন মশাই। মেয়েকে নিজে থেকে কারুর হাতে তুলে দিতে গেলে এ বাজারে কম ক'রেও তিনটি হাজার টাকার থাকায় পড়তেন। তার চাইতে নিখরচায় থাকে জামাই পেয়েছেন তাকে আদর ক'রে ঘরে ডেকে আনুন। আমরা বরং তার ম্যাগোলিন শুনে কিছু সময় কাটাই।

বিরক্তিতে এতক্ষণ দাঁত দিয়ে চোঁট কামড়াচ্ছিলেন

মুগাক চ্যাটার্জি। এবারে চ'টে উঠে বললেন, বলি, আপনারা কি আমাকে একটুও একা থাকতে দেবেন না ঠিক করেছেন? এ তো দেখছি একটা বাজার মিলিয়ে নিচ্ছেন আপনারা। ধান, দোহাই আপনারা, এবারে নিজেদের কাছে গিয়ে আমাকে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে দিন দিকিনি, হাত জোড় করছি আপনারদের কাছে।

কোথায় গেল ডেকে ডেকে চা খাওয়ানো, কোথায় গেল হেসে কাছে ব'সে গল্প করা। ক্রমেই যেন কেমন অল্প রকম মাল্লু হয়ে উঠলেন মুগাকবাবু। স্ত্রী সূচন্দনার কিছু বায়ুরোগ ছিল আগে থেকেই, এবারে মাথায় রীতিমত পাগলামি চেপে বসল। নিজে থেকেই মাঝে মাঝে অত্যধিক মূখরা হয়ে উঠে অনর্থ বাধিয়ে নিলেন তিনি। মুগাকবাবুর এমন সাধ্য বইল না যে স্ত্রীকে নিবৃত্ত করেন। কখনও অট্টহাসি হাসেন, কখনও বা বীথির উদ্দেশ্যে অনাবশ্যক চিৎকার ক'রে হাউ-হাউ ক'রে কাদেন সূচন্দনা। পাশাপাশি ফ্ল্যাটের লোকগুলো ক্রমেই অস্থির হ'য়ে উঠল।

বিশেষ ক'রে পশ্চিম ফ্ল্যাটের তারক ঘোষ এই নিয়ে বাড়িওয়ালার কাছে গিয়ে একদিন জলুজ্বল বাধিয়ে দিল। বলল, বাড়ি কিরে একটুও যদি শান্তিতে কাটাতে পারি মশাই। দিনরাত কান্নাকাটি, চিৎকার আর অট্টহাসি; কতক্ষণ লোকে সহ্য করতে পারে বলুন? একটা ফ্যামিলির জন্তে এখানে আর পাঁচটা ফ্যামিলি তো সাফার করতে পারে না! এই জন্তেই কবে থেকে আপনাকে বলছি, এমন ভাড়াটেকে আপনি দয়া ক'রে তুলে দিন। ভাড়াটে পেতে দেরি হ'লে আমিই বরং দু-টাকা বেশী ভাড়া দিয়ে ও-ফ্ল্যাটটা নিয়ে নেব। তবু দয়া ক'রে আমাদের একটু শান্তিতে বাস করতে দিন দিকিনি।

আসলে তারক ঘোষ এত তড়পানি তড়পাত না, যদি না ওই উত্তর কোণের ফ্ল্যাটটার প্রতি তার লোভ থাকত। তার পশ্চিম ফ্ল্যাটের জানলা দিয়ে সারাদিনেও যদি এক ফোঁটা হাওয়া আর রোদ ঢোকে! ছোট মেয়েটা তাই বারো মাস ভুগছে। অথচ তারই সামনে উত্তর

ফ্ল্যাটটা দিব্বি খোলামেলা। রাস্তার সামনের দিকে বারান্দার মত এক চিলতে কাঁচ-ছাদ থাকায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখতেও সুবিধে। কিন্তু অমন ফ্ল্যাটে এমন কেলেঙ্কারি! কোনও ভাবে মুগাকবাবুকে তুলে দিয়ে যদি ফ্ল্যাটটা হাত করা যায়, তবে আর তারক ঘোষকে পায় কে? এখান থেকেই সটান একদিন নিমতলা। তার আগে নতুন করে আর বাড়ি বদলের কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

বাড়িওয়ালা তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, আপনি ঘরে বান, আমি দেখছি কি করা যায়।

ঘরে এসে জীকে কাছে ডেকে মুখ টিপে হেসে তারক ঘোষ বলল, দিয়ে এলাম একটু আশ্বাস ধরিয়ে। এবারে বোধ করি ফ্ল্যাটটা পেয়েও যেতে পার। বাপ রে বাপ, কি হাঁপানোই না হাঁপিয়ে উঠেছি এ ঘরে।

জী রমলা বলল, আগে পাও কিনা দেখ, তোমার তো আবার সব কিছুতেই আগে থাকতে লাফানি।

উত্তরে আর কিছু না বলে এক সময় নিজের কাছে বেরিয়ে গেল তারক ঘোষ।

শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই উত্তরের ফ্ল্যাটটা খালি হ'ল। সকলের কাছে বিদায় নিয়ে একদিন বিমর্ষ মুখে এ বাড়ি থেকে উঠে গেলেন মুগাক চ্যাটার্জি। কিন্তু তারক ঘোষ 'পজেশন' পাবার আগেই ফ্ল্যাটটাকে এসে আগলে বসল, অপরিচিত এক অনাদি পোদ্ধার। বিচিত্র ধোব-ছুরন্ত, মাথায় বাবরি-ছাঁটা চুল, বয়স খুব বেশী হ'লে বছর ত্রিশেক হবে। সঙ্গে মাসখানেকের জ্ঞাত একটি মহিলা এলেন বছর পাঁচেকের একটি ছেলে কোলে। সবাই ভাবল, অনাদি পোদ্ধারেরই সবৎসা জী। কিন্তু আলাপের সূত্রে জানা গেল—মহিলাটি জী নন, দিদি। মাস খানেকের বেশী একটা দিনও তাঁর থাকবার উপায় ছিল না। এই একটা মাস সবাই তাকিয়ে দেখল—অনাদি পোদ্ধারের ফ্ল্যাটটা লোকে লোকারণ্য। জীপুরুষ-নির্বিশেষে লোক আসার কামাই নেই। তাদের জুতোর শব্দে সিঁড়ি থেকে শুরু করে দোতলার কমন বারান্দাটা এক মুহূর্তও যদি ফাঁকা গেল! জীবন মল্লিক, ভদ্রেশ্বর বড়াল আর ঋতেন ঘটকেরা তো অবাক! কিন্তু এদিকে বোধ করি তারক ঘোষকে আবার কিছু সর্বাক না হ'লে চলল না।

একদিন মধ্যরাতে কেমন একটা আতঙ্কর শব্দে জী রমলার ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে যেতেই কান খাড়া করে উঠে বসল সে। শীতের রাত। চারপাশে দরজা জানলা বন্ধ। তবু শব্দটা এসে কানে ভেঙে পড়তে বাধা রইল না। রমলা শুনল, কে যেন বলছে, 'খুন করব, আমি খুন করব তোমাকে।' পিশাচী, শয়তান, ভেবেছ আমারই বুকে মাথা রেখে পরপুরুষের চিন্তার সারা রাত কাটিয়ে দেবে? তোমার সব শয়তানি আমি এত দিনে ধরে ফেলেছি। ভেবেছ—ভালবাসার নামে সতী-নাশ্বীর ভান করে চিরকাল তুমি আমার সঙ্গে শুধু অভিনয় করেই কাটাবে? আমি খুন করব তোমাকে, খুন করব শয়তান!...

ভয়ে সারা গায়ে কেমন একবার কাঁটা দিয়ে উঠল রমলার। স্বামীকে সজোরে একবার ঠেলে দিয়ে বলল, পারলে না তো এ ফ্ল্যাট ছেড়ে কোথাও উঠে যেতে, এবারে শোন ওদিকে কোথায় কি হচ্ছে!

তারক ঘোষ সাড়া দিল বটে, কিন্তু ঘুম-চোখে ভাল করে তাকাতে পারল না; অলক্ষণের মধ্যেই আবার বেঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে জেগে উঠে রমলার মুখে আছোপাছু শুনে সে অবাক। এ বলে কি রমলা? ব্যাপারটা তবে তো সাংঘাতিক! আর শব্দটা যখন ঠিক ওদিক থেকে আসছে তখন তো উত্তর ফ্ল্যাটেরই ব্যাপার!

পরদিন ইচ্ছে করেই অনেক রাত অবগি জেগে রইল তারক ঘোষ। জাগরণের মুহূর্তগুলি রমলাকে সে প্রেমের ও শোহাগে আচ্ছন্ন করে রাখল। অকস্মাৎ বন্ধ দরজা ভেদ করে প্রেতায়িত সেই জহলাদ-ধ্বনি এসে কানে বাজল। রমলা বলল, ওই-ওই যে, শুনতে পাচ্ছি? এ তো দেখছি দু'দিন বাদে আমাদেরই খুন করবে।

মনে মনে তারক ঘোষও যে একবার ভয় না পেল, এমন নয়। কিন্তু তা হ'লেও পুরুষ মত বিছানায় পড়ে থাকতেও লজ্জা পেল। ঠোঁটের উপর একবার দক্ষিণ হাতের তর্জনীটাকে রেখে রমলাকে চুপ করবার ইশারা করে ধীরে ধীরে উঠে এবারে আস্তে দরজাটা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল সে। দেখল—যা ভেবেছিল, তাই। বাইরে থেকে নিরিখ করে বসন্তু বোঝা যায় তাই দিয়েই সে স্পষ্ট বুঝতে পারল—উত্তর ফ্ল্যাটের আলো নেবানো নয়।

চাপা হিংস্রকণ্ঠে লোকটি চোঁচিয়ে চোঁচিয়ে বলছে, কাল সকালে সূর্য উঠলে তোমার চোখে সে আলো এসে আর পৌঁছাবে না। এই মুহূর্তে সেই নটোরিয়াস রাস্কেলটাকে যদি হাতের মুঠোয় পেতাম, তবে তোমাদের দুজনের দেহকে এই রিভলবারের দুটি অব্যর্থ গুলিতে একসঙ্গেই শুইয়ে দিতে পারতুম। বাচ্চি হি ইজ ফার ফ্রম মাই রিচ।

উত্তরে মহিলাটি বলছে, যদি সত্যিই এমন কেউ থেকে থাকে, তবে দূর থেকেই সে তোমার এই কুৎসিত মনো-বৃত্তি ওপর দিক্কার হেনে নিজের মর্ধান্দা নিয়ে বেঁচে থাকবে। তোমার স্ত্রী হয়ে আমার আর একটা মুহূর্তও বাঁচবার সাধ নেই। কই, থামলে কেন, ছোঁড়, ছোঁড় তোমার রিভলবারের গুলি। এই তো বুক পেতে দাঁড়িয়েছি।

প্রতিদিন রাত্রে এই ভাবেই তবে উত্তর ফ্ল্যাটের দাম্পত্য জিবাংনা প্রচণ্ড হয়ে ওঠে! দরজাটাকে আশে ভেজিয়ে দিয়ে ঘরের ভিতর এসে তারক ঘোষ বলল, শুনেছিলাম অনাদি পোন্ধরের দিদি চ'লে যাবার পর থেকে সে একাই এখানে আছে। ভেবেছিলাম—বিয়ে-খা করে নি এখনও পোন্ধর। কিন্তু এ তো দেখছি বেশ বোরালো ব্যাপার। মুগাক চ্যাটার্জির বউয়ের মাথার পাগলামি এসে এখন ওর মাথায় ভর করেছে। এই জন্তেই আমাদের শাস্ত্রে বলে, শাস্তি স্বস্ত্যয়ন আর পূজো-আচ্ছা না করে কোন ঘরে হঠাৎ বাস করতে নেই। কিন্তু এ তো দেখতে পাচ্ছি, মুগাক চ্যাটার্জির ফ্যামিলির চাইতেও মারাত্মক। পাশাপাশি এমন লোক বাস করলে সেখানে নিজেদের মর্ধান্দা নিয়ে টিকে থাকাই তো বিপদ। কালই আমি বাড়িওয়ালাকে ব'লে এর কি বিহিত করি, দেখ।

সঙ্গে সঙ্গেই রমলা বলল, তাই দেখ গো, এ ভাবে এখানে আর বাস করা চলে না। শেষ পর্যন্ত গুলি-বারুদের ব্যাপার নিয়ে দারোগা পুলিশ এসে হাজির হ'লে আমাদের নিয়ে অবশিষ্টান পড়বে।

তারক ঘোষ একবার ভাবল এখনই গিয়ে কড়া নেড়ে অনাদি পোন্ধরকে ডেকে বেশ আচ্ছা ক'রে কড়া কথা শুনিয়ে দেয়, কিন্তু পাছে অপরের দাম্পত্য কলহে নাক ঢোকাবার স্বত্ব তুলে উঠে সে তাকে অপমান ক'রে দেয়, এই ভয়ে আবার এসে বিছানায় আশ্রয় নিলে তারক

ঘোষ। বলল, ও-ফ্ল্যাটটা না পেয়েছি, ভালই হয়েছে; আসলে ঐ ফ্ল্যাটটারই ঘোষ। পেলে দু'দিন বাদে হয়তো তোমার আর আমারও মাথা ধারাপ হয়ে যেত।

অখুঁট কণ্ঠে রমলা বলল, তোমার মাথা ঠিক থাকলে আমার মাথা দেখতে ঠাণ্ডাই থেকে যেত।

কিন্তু এ কথাও আর কোন জবাব দিল না তারক ঘোষ। সারাদিনের পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন। অলক্ষ্যেই কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়ল সে।...

সকালে উঠে অত্যন্ত দিনের মত আজ কিন্তু রমনার হাতের এক পেয়লা চা খেয়েই উদ্বাসে বাজারে ছুটল না তারক ঘোষ। চায়ের পেয়লা শেষ ক'রে সোজা তরতর ক'রে উঠে গেল সে তিনতলায়। বাড়িওয়ালার নিবারণ হালদার ঘরেই ছিলেন। সোজা তাঁর কাছে এসে আত্মোপাস্ত সমস্ত বিষয়টা বিবৃত ক'রে তারক ঘোষ বলল, তখন পই পই ক'রে আপনাকে বললাম যে, ফ্ল্যাটটা আমাকে দিন, তার জন্তে দু'টাকা বেশী দিতেও আমি রাজী আছি। কিন্তু আপনি শুনলেন না। ভাবলেন, কোন মাসেই যখন সময়মত ভাড়া দিয়ে উঠতে পারি না, তখন মিহিমিহি কেন ঠকবেন! কিন্তু এই জাতীয় ভাড়াটে এনে বসাবারই বা মানে কি? জীবনবাবু, ভদ্রেস্বরবাবু, ঋতেনবাবু ওদের সবাইকে এদিকের বামেলা-পোয়াতে হয় না, তাই তাঁদের কারুর নালিশও নেই। কিন্তু আমার পক্ষে যে স্ত্রীপুত্র নিয়ে বাস করা এখন রীতিমত হুঁসখ্য হয়ে উঠল।

নিবারণ হালদার যে সন্তুষ্ট ছিলেন তারক ঘোষের উপর, এমন নয়। তবু তার বক্তব্যের উপর গুরুত্ব দিয়ে বললেন, আজ যদি আবার এমন কিছু হয়, তবে আমাকে এসে খবর দেবেন। আমি ঘুমিয়ে থাকলেও উঠে যাব।

বেশ, আমি নিজেই এসে আপনাকে ডেকে নিয়ে যাব।—ব'লে এক মিনিটও আর দেরি করল না তারক ঘোষ। সোজা সিঁড়ি দিয়ে তরতর ক'রে নেমে বাজারের পথে চ'লে গেল।

উত্তর ফ্ল্যাটের দরজায় তখন তাঁলা ঝুলছে, না, ভিতর থেকেই কোন নারীর সাবধানী হাত সশব্দে খিলটা এঁটে দিচ্ছে, সেদিকে কারুর লক্ষ্য যাবার কথা নয়। মুখোমুখি ফ্ল্যাট হ'লেও না-হয় কথা ছিল, কিন্তু পশ্চিম ফ্ল্যাটের গা-বেয়ে উপরের সিঁড়ি উঠে যাওয়ায় দোতলার এ পাশের

ঘরগুলো অনেকটা আগুপিছু ভাবে সাজানো। ফলে তারক ঘোষ ঘর থেকে বেরোলেই অমনি অনাদি পোন্ধারের মুখোমুখি হবার কোন সম্ভাবনা নেই। তা নিয়ে আগ্রহও ছিল না তারক ঘোষের।

অফিস থেকে ফিরে ষষ্ঠারীতি রেষ্ট নিয়ে একসময় সে জিজ্ঞেস করল রমলাকে, শুদিককার খবর কি?

এখনও তো কিছু শোনা যায় নি!—ব'লে রমলা নিজের কাজে উঠে গেল।

কিন্তু গোটা ফ্ল্যাট বাড়িটা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর ফ্ল্যাটটা অকস্মাৎ আবার অশান্ত হয়ে উঠল।

রমলা বলল, বাস, হ'ল তো? এবার পার তো তুমিও নাচতে শুরু ক'রে দাও।

দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি আজ হারামজাদাকে। একটা দিনও যদি ছু চোখের পাতা এক ক'রে শাস্তিতে একটু ঘুমোতে দিল!—ব'লে সঙ্গে সঙ্গেই দরজার খিল খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল তারক ঘোষ। শুনল, তেমনি বজ্রকঠোর কণ্ঠেই দ্বারকদ্ধ ঘরের ভিতর থেকে লোকটি বলছে, দেমাক, চোখ-রাঙানি! ভেবেছ, তোমার ওই মোহিনী চোখ দিয়ে একদিন আমার হৃদয়কে বশ করেছ ব'লে আজ তোমার ওই চোখের জলন্ত শিখা দেখে অমনি আমি নিরস্ত হব? ভেবেছ কি তুমি, কি ভেবেছ তুমি নিজেকে? কুলটা, রাঙ্গুনী, শয়তান!

হঠাৎ মহিলাটির কণ্ঠে কঁয়াক ক'রে একটি শব্দ উঠল। বোধ করি অনাদি পোন্ধার রিভলবার রেখে গলা টিপেই মারবে এবার বউটাকে—যদি অস্ত্র কেউ না হয়ে মহিলাটি সত্যিই বউ হয়। একটা মুহূর্তও আর দেরী করল না তারক ঘোষ, লোজা ছই লাফে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে গিয়ে নিবারণ হালদারকে সঙ্গে নিয়ে এসে অনাদি পোন্ধারের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

এবারে কান্নার শব্দে মহিলাটির কাতর কণ্ঠ শোনা গেল: ছাড়, ছেড়ে দাঁও বলছি, বর্বর, অসভ্য, পশু কোথাকার! তোমার মত পুরুষের জমানো উচিত ছিল কসাইয়ের ঘরে! এত নীচ, এত কুৎসিত আর এত হিংস্র তুমি!

তারক ঘোষ কিছু একটা বলবার আগেই এবারে

নিবারণ হালদার অনাদি পোন্ধারের দরজায় ঘা মেয়ে চিংকার ক'রে উঠলেন, দরজা খুলুন অনাদিবাবু, দরজা খুলুন—বলি শুনতে পাচ্ছেন, আগে দরজা খুলুন বলছি।

শব্দ শুনে পাশাপাশি ফ্ল্যাটের লোকেরা পর্যন্ত দেখতে দেখতে এসে সারা বারান্দায় ভিড় জমিয়ে তুলল।

কিন্তু বাইরের এত বড় ঘটনার বিন্দুবিদগ্দ অবধি জানতে পারে নি এতক্ষণ অনাদি পোন্ধার। ঘরের ঘাট পাওয়ারের বাস্তবতা তখনও একই ভাবে জ্বলছে। আর একবার সজোরে দরজায় আঘাত হতেই ভিতর থেকে সে চৈতন্যে উঠল, কে, কে ডাকছেন? এবং সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে বাইরের অবস্থাটা দেখে সে অবাক।

তাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই ঘরের চৌকাঠের উপর এসে দাঁড়িয়ে নিবারণ হালদার ব'লে উঠলেন, বলি, ভেবেছেন কি আপনি, বলতে পারেন? এটা বস্তিবাড়ি নয় যে প্রত্যেকদিন ঘা-খুশী ক'রে চিংকার করবেন আর অগ্রাগ্র ফ্ল্যাটের লোকদের আতঙ্ক সৃষ্টি করবেন। আর তিনিই বা কোথায় আপনার, এই মুহূর্তে থাকে গলা টিপে মারতে যাচ্ছিলেন?

সকলের মুখের উপর দিয়ে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে এনে নিবারণ হালদারের চোখের দিকে চোখ রেখে স্মিতহাস্তে অনাদি পোন্ধার বলল, এই রে, তাই নিয়েই এত কাণ্ড! ঘর থেকে বন্ধ দরজা ভেদ ক'রে আমার গলার শব্দ যে আর কান্নার ঘর অবধি গিয়ে পৌঁছাতে পারে, তা আমার ধারণাই ছিল না। এজ্ঞে আমি সত্যিই লজ্জিত। ব'লে মুখের সামনে একবার যুক্তকর তুলে ধরল অনাদি পোন্ধার।

কিন্তু তাতেই দমবার পাত্র নয় কেউ। তারক ঘোষ গায়ের ঝাল মিটিয়ে ব'লে উঠল, আপনার মত ইতর বদমাস ভাড়াটেকে উচিত প্রকাশ্য রাজপথে নিয়ে দাঁড় করিয়ে হুইপ করা। এমন দিন নেই যে ঘরের মেয়েছেলের উপর অত্যাচার ক'রে সারা বাড়িটাকে তটস্থ ক'রে না তোলােন—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে এবারে নিবারণ হালদার বললেন, রাত হয়েছে। অত কথা নিয়ে দরকার নেই; আপনি কালই আমার ফ্ল্যাটখানি ছেড়ে দিয়ে চ'লে যান। নইলে আমি আপনাকে পুলিশে হাণ্ডোভার করব।

অনাদি পোন্ধারের ছু চোখ এবারের কপালে গিয়ে

উঠল। এরা সবাই বলে কি? বিশেষ ক'রে বাড়িওয়ালা নিজে যখন ক্ষেপেছেন, তখন তাকে নিছক ঠাট্টা করলে কেউ আসে নি এত রাত্রে। উপস্থিত সকলকে এবারে ঘরে গিয়ে বসবার আহ্বান জানিয়ে তেমনি স্থিতহাস্তেই অনাদি পোন্ধার বলল, আবহাওয়াটা তা হ'লে বেশ গরম হয়েছে উঠেছে দেখতে পাচ্ছি। তা, সবাই মিলে এত কাণ্ড করবার দরকার ছিল কি বলুন তো? ছিঃ ছিঃ ছিঃ! সবাই আমরা পাশাপাশি বস করি, একবার দ্বন্দ্ব ক'রে কেউ এসে মুখ ফুটে দ্বিজেস করলেই তো পারতেন, আমার পেশা কি, কি ক'রে চলে আমার। তা না ক'রে শেষ পর্যন্ত এত কাণ্ড। স্থির হয়ে দু' দণ্ড বহন আপনারা, খুলে বলছি।

কিন্তু বসতে কেউ রাজী হলেন না, একই ভাবে ছদ্মবেশের সামনে মুখ উচিয়ে পাড়িয়ে রইলেন।

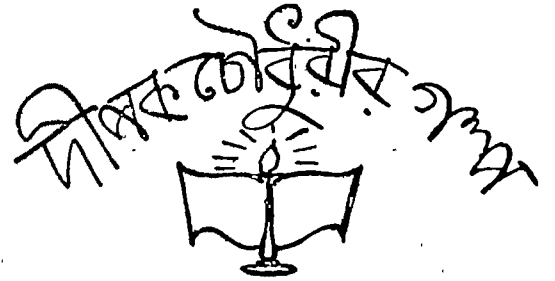
একটু থেমে অনাদি পোন্ধার বলল, পেশা আমার অভিনয়। সেই সঙ্গে এক-আধটু ভেনিট্রিলোকুইজ্‌ম প্রাকটিস করি; তাতে একই কণ্ঠে স্ত্রী-পুরুষের দ্বৈত অভিনয় খোলে ভাল। এককালে দানীয়াবু এরকম একক অভিনয় ক'রে প্রশংসা পেয়েছিলেন। আমি তাঁর থেকে আর-একটু এগিয়ে যেতে চেষ্টা করছি মাত্র। নইলে এ ঘরে আমার মেয়েছেলে আসবে কোথেকে? বোধ করি আমার দ্বৈত অভিনয়ের পার্ট শুনেই আপনাদের এমন অলৌকিক ধারণা হয়েছে। যদি বিশ্বাস না করেন তো আমার খাতা থেকে প্যারাগ্রাফ পড়ে আপনাদের শোনাতে পারি।—ব'লে টেবিলের উপর থেকে একখানি খোলা খাতা এনে নিবারণ হালদারের হাতের সামনে তুলে ধরল অনাদি পোন্ধার।

দেখতে দেখতে উপস্থিত সকলে এসে একেবারে ছড়-মুড় ক'রে পড়ল খাতাখানির পৃষ্ঠায় এবং প্যারাগ্রাফগুলোর এক-একটা লাইনের উপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়েই মশলে হো-হো ক'রে হেসে উঠল সকলে। এমন যে প্রধান আক্রমণকারী তারক ঘোষ, তারও বিস্তৃত সাধা ঠোট দুটি হাসির তরঙ্গে লাল না হয়ে পারল না। এতক্ষণের সমস্ত রাগ নিজের মধ্যে চেপে নিয়ে বিশ্বয়ের কণ্ঠে সে বলল, আপনি তবে অভিনেতা, রোজ তবে এত রাত্রে এমনি ক'রে আপনি অভিনয় প্রাকটিস করেন?

নিবারণ হালদারের বত রাগ এবারে গিয়ে পড়ল তারক ঘোষের উপরেই। তার কথার জবাবে অনাদি পোন্ধার কিছু একটা বলার আগেই তার উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গোক্তি প্রকাশ ক'রে তিনি বললেন, তা উনি ঘরে ব'সে অভিনয় কেন প্রাকটিস করবেন, প্রাকটিস করবেন আপনার মত রাত দুপুরে সারা বাড়ির লোকজনের ঘুম ভাঙিয়ে কেস্তন-গাইতে! যান, যান, ঘরে যান মশাই।—ব'লে তিনতলার সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন নিবারণ হালদার, তারপর হঠাৎ কি মনে ক'রে থেমে একবার কাছে ডাকলেন অনাদি পোন্ধারকে, বললেন, ভাল বই-টাই হ'লে দেবেন তো মশাই দু'একখানা পাস-টাস, দেখে আসব কেমন অভিনয় আপনাদের।

বিগলিত কণ্ঠে অনাদি পোন্ধার বলল, বিলম্ব, আমি নিজেই যে ভেবেছিলাম—একদিন আপনাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে যাব। তা—দেখলেন তো ব্যাপারটা স্ত্রীর?

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে চাপকণ্ঠে নিবারণ হালদার বললেন, যেতে দিন মশাই, আপনিও যেমন। রাত অনেক হ'ল। যান, এবারে শুয়ে পড়ুন গিয়ে।



হৃদয়বেগ এবং বুদ্ধিপ্ৰাণবর্ষের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে দীপক চৌধুরীর গল্পে। সাম্প্রতিক কালের বাংলা গল্প-সাহিত্যে

শ্রেষ্ঠতম সংযোজন

দীপক চৌধুরীর গল্প

আড়াই টাকা

ব্রহ্মন পাবলিশিং হাউস : ৫৭ ইল্ল বিখাস রোড

কলিকাতা-৩৭

শ্রাবণ মাসে মহিষমর্দিনী পূজা শুধু কালনার নয়, কালনার চারপাশের বহু গ্রামে চাঞ্চল্য এনে দেয়। এত বড় পূজা ও-তল্লাটে আর হয় না।

আরও পূজা অবশ্য আছে—দশহরা, দুর্গা, কালী, সরস্বতী, অন্নপূর্ণা। কিন্তু এমন ধুমধাম জাঁকজমক আর কোন সময়ে হয় না।

শুধু পূজাই নয়—এই পূজাকে উপলক্ষ্য করে বসে মেলা, সার্কাস পার্টি তাঁবু ফেলে চকবাজারের মাঠে, ঘাটালের পুতুলনাচ শুরু হয় পাথরমহলের ঘাটে। এ ছাড়া অশ্বক্ষেত্র আছে, চাল-বিতরণ আছে, বলিদান আছে; চার রাস্তার ধরে কলকাতার অপেরা গান গেয়ে যায়, বিজয়ার পরের দিন হয় শখের থিয়েটার।

পূজার আগের দিন থেকেই লোক আসতে শুরু করে। কাছেপিঠের গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে ছেলে-ছোকরারা আসে। তারা আগে এসে দেখে যায়, আভাস নিয়ে যায় পূজার জাঁকজমকের। সেই খবর তারা ছড়িয়ে বেড়ায় পাড়ায় পাড়ায়। মেয়েমহলে চাঞ্চল্য জাগে। কে কবে কার সঙ্গে মেলায় যাবে, এই নিয়ে শুরু হয় আলোচনা।

গিন্নীরা বলেন, মহাষ্টমীতেই চল। বউরা কানাকানি করে; বলে, নবমীর বলিদানই যদি না দেখা হ'ল তবে আর কি? ছোট ছেলেমেয়েরা আবদার করে বলে, তার চেয়ে বিসর্জনের দিনই ভাল; অত বড় ঠাকুর কেমন করে ভাসান দেয় দেখব। ছোকরাদের কিন্তু উৎসাহ সবচেয়ে বেশী। তারা বলে, যেতে গেলে চারটে দিনই যেতে হয়। একদিনে কি অত দেখা ফুরায়?

কিন্তু এর মীমাংসা নেই। এ-বাড়ির মেয়েরা আজ্ঞা না গেলে ও-বাড়ির মেয়েরা তার জন্তে অপেক্ষা করে না। পূজার চারটে দিনই তাই মলে মলে লোক চলে। কেউ কেউ যায় গরুর গাড়িতে। যাদের সঙ্গতি নেই, তারা হাঁটে। তবু যাওয়া চাইই।

তরফদারদের বাড়ি রাস্তার ঠিক ওপরেই। এ-বাড়ির ছেলেমেয়েরাও পাজির দিকে তাকিয়ে দিন গোনে কবে শ্রাবণ আসবে। শ্রাবণ মাস এলেই ওরা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কবে কালনার পূজার খবর পাবে।

প্রতি বছরের মত পূজা ঠিক সময়েতেই শুরু হয়। ঠিক সময়েতেই গ্রামের ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে যায় মেলা দেখতে। ফিরে এসে তারা গল্প করে, মেলা থেকে কেনা জিনিসপত্র বাড়ি বাড়ি দেখিয়ে বেড়ায়।

কিন্তু তরফদার-বাড়ির কারও মেলায় যাওয়া হয় না। প্রতিবারই যাব যাব করে, কিন্তু হয়ে ওঠে না।

কি করেই বা হবে? কতী থাকেন বাইরে বাইরে। অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ। গিন্নীমার সর্বদা বাত এই বয়েসেই, ওঠবার শক্তি নেই। বড় ছেলে কোনরকমে একটা কাজ জুটিয়েছে বংশবাটিতে। মাইনে অল্প। ডেলি-প্যাগেঞ্জারি করে।

তাই কখন যে শ্রাবণ মাস পড়ে, কখন যে চ'লে যায়—এ খবর বড় একটা কেউ রাখে না। যারা রাখে তারা ওই তিনজন—চিহ্ন বিহ্ন আর বেলা। বিষম্মখে রকে পা ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে লোকের ভিড় দেখে, আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। তাদের বোধ হয় কোনদিনই কালনার মেলা দেখা হবে না।

কিন্তু এমন সময়ে তরফদার-বাড়িতে ঘটল একটা শুভ ঘটনা। যদিও পরেশ প্রথমে সর্বাঙ্গতঃ করণে অসম্মতি জানিয়েছিল তবুও শেষ পর্যন্ত তার কথা টিকল না। বাবা-মায়ের বিশেষ আগ্রহে পরেশকে বিয়ে করত হ'ল।

পরেশ তবু একবার ক্ষীণ প্রতিবাদ তুলেছিল, আমার যা মাইনে—

পরেশের মা ধমক দিয়ে বলেছিলেন, আমার যখন বিয়ে হয় তখন তোর বাবার একটা পয়সাও রোজগার ছিল না।

রোজগার আজকেও তেমন কিছু নয়। তবু তিনি এতদিন পর্যন্ত তিন ছেলে এক মেয়েকে প্রতিপালন করে এসেছেন, পরেশকে কিছুদূর লেখাপড়াও শিখিয়েছেন এবং আজও অর্থোপায়ের জন্তে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন।

পরেশ সবই বোঝে। তবু সে একালের ছেলে। এ যুগ আর সে যুগে তফাত যে অনেক।

কিন্তু অনেক ব'লেও পরেশ যাকে বোঝাতে পারল না। শেষে তাকে রাজী হতে হল। এবং এক বিশেষ দিনে কোন এক শাস্ত্র নিবিড় ছায়াশীতল গ্রাম থেকে সম্পূর্ণ অপরিচিতা এক তরুণী বালিকার হাত ধরে নিয়ে এল মায়ের কাছে।

বধু শান্তডীকে প্রণাম করলে।

শান্তডী মিত্র হেসে তাড়াতাড়ি বউকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

বউটি বড় স্বন্দর। এক বলক দখিনা বাতাসের মত হঠাৎ যেন এসে তরফদার-বাড়ির এতকালের বন্ধ ঘরের মধ্যে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এতদিন ঘরের স্ত্রী ছিল না, গৌরীর হাতের ছোঁওয়ায় আজ সেই বাড়ি বলমূল ক'রে উঠল। এতদিন জিনিসপত্র ছিল তখনই হয়ে—কোনটা কোথায় কেউ তা বলতে পারত না, আজ গৌরী এসে একটি একটি ক'রে সব কটা জিনিস গুছিয়ে রাখল। এতদিন চিহ্ন বিহীন আর বেলা প্রকৃতির নিয়মেই বড় হয়ে উঠেছে, আজ গৌরী এসে তাদের ধুলো থেকে বুকে তুলে নিল।

আর পরেশ এই অপরিচিতাটিকে চিনতে চিনতেই বছর কাটিয়ে দিলে। তবু যেন ভাল ক'রে চেনা হ'ল না। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, ও যেন পরের বাড়ির কেউ। কাছে এলে ভ্রম হয়, এ কি সত্যিই তার?

গৌরী কোন কথা বলে না। বিমূঢ় পরেশের মুখের ওপর একটি সলাজ সকৌতুক জলন্তরা দৃষ্টি বর্ষণ ক'রে চ'লে যায়।

এমনি ক'রে একটির পর একটি মাস কখন কেমন ক'রে কেটে গেল, কেউ যেন টের পেল না। কেবল শ্রাবণ পালাতে পারল না চুপিসারে।

পাড়ায় পাড়ায় হুল্লোড় লেগে গেছে। কালনার মেলায় যেতে হবে। যা-তা মেলা নয়,—মহিষমর্দিনী পূজোর মেলা। নাগরদোলা, মার্কাস খেলা, পুতুলনাচ!

পাশের বাড়ির বউরা এসে ধরল গৌরীকে—কালনার যেতেই হবে তাদের সঙ্গে।

গৌরী আনন্দে চঞ্চল হয়ে তখনই ছুটে গেল শান্তডীর কাছে।

মা!

কি গো?

মা, আমি এঁদের সঙ্গে কালনার যাব?

শান্তডী একটু হেসে বললেন, বেশ তো, যাও না। আমিও কবে থেকে যাব যাব করছিলাম, কত বছর যে

যাই নি, কিন্তু পোড়া বাত কি একটু নরম পড়বে।—এই ব'লে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

পাশের বাড়ির বউরা বললে, তা হ'লে আজ রাঁধাবাড়ি তাড়াতাড়ি সেয়ে নিও। বেলাবেলি বেরোয়।

গৌরী কি ভেবে বললে, না, আজ নয়, কাল।

ওরা কেমন যেন একটু মিইয়ে গেল। বললে, কেন?

গৌরী কারণ দেখাল না। শুধু বললে, আজ থাক, কাল।

রাস্তিরে লাস্ট ট্রেনে পরেশ বাড়ি ফেরে। পরেশের মা তখন আরাউঠতে পারেন না। পাশের ঘর থেকে শুয়ে শুয়ে জিজ্ঞেস করেন, বউমা, পরেশ এল?

সলজ্জ উত্তর দেয় গৌরী, হ্যাঁ।

তখন পরেশের সমস্ত ভার গৌরীর ওপর। হাত মুখ ধোবার জল দেওয়া, কাচা কাপড় এগিয়ে দেওয়া, আসন পেতে দেওয়া।

খেতে ব'লেও পরেশ বিশেষ গল্প করতে পারে না। সামনে ওই যে অষ্টাদশী যুবতী একাগ্র নয়নে তার দিকে তাকিয়ে আছে, এটা যেন কেমন! কেমন যেন অসোয়াস্তি বোধ ক'রে পরেশ লজ্জা পায়।

এক-একবার মনে হয়, ষাবার সময় কেউ সামনে না বসলেই যেন ভাল হয়। কিন্তু মুখ ফুটে বা আকার-ইকিতে তা প্রকাশ করতে পারে না। গৌরী যদি আঘাত পায়!

রাত্রে শুয়ে শুয়ে গৌরী অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করল। একবার চুপ ক'রে পাশ ফিরে শুল, একবার উপড় হ'য়ে থাকল বাগিশে মাথা গুঁজে। কিন্তু তেমন কোন রোমাঞ্চকর করম্পর্শ তার দেহ পর্যন্ত পৌছল না। তখন একবার বুঝি গৌরীর ভয় হ'ল, হয়তো বা ঘুমিয়ে পড়েছে। কি ভেবে গৌরী নীচু গলায় একবার ডাকল, শুনছ?

উ।

যুমোচ্ছ?

পরেশের তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। গৌরীর ডাকে একটু চমকে উঠে বললে, না তো!

মা বলছিলেন, কালকে হেনা-বউদিদের সঙ্গে কালনার মহিষমর্দিনীর মেলা যেতে হবে।

পরেশ বললে, আমি কি ক'রে যাব? আমায় যে—

না না, তোমার যেতে হবে না। পাণ্ডা? তোমার

কি এত কষ্ট নয়? তা ছাড়া গোটা একদিন আপিস কামাই করে আমাদের সঙ্গে নিয়ে শহরবাজারে ঘুরে বেড়ানো, এ কি সহজ কথা!—এই ব'লে রাজির স্তব্ধতার মধ্যে গৌরী বৃষ্টি একটু জোরেই হেসে উঠেছিল।

পরেই ইতিহাসটা ধরতে পারল না। নির্লিপ্তভাবে বললে, যাবে, কিন্তু সাবধানে যোগে। বড় ভিড়।

গৌরী একটু হেসে বললে, হারিয়ে যাব ভাবছ? তা হারিয়ে গেলে আমিই তো হারাব। তোমার তো কিছু হারাবে না।

পরেই বললে, ওরে বাবা, হারিয়ে গেলে সে ভয়ানক হাজারি। পুলিশ-খানা করতে হবে। একটু সাবধানে যোগে।

গৌরী হঠাৎ অস্ত্র প্রসঙ্গ পাড়ল : আমায় কিন্তু একটা জিনিস দিতে হবে।

কি?

দেবে বল?

আচ্ছা, দেব।

গৌরীর স্বর সংকোচে ভেঙে পড়ল। বললে, ছোটো টাকা।

দু টাকা! কি হবে?

বাঃ রে, মেলায় যাব, চিহ্ন-বিহ্নর জন্তে খেলনা কিনতে হবে না? তা ছাড়া, হেনা-বউদির ডলুটার জন্তে?

পরেই বললে, না না, ওসবে দরকার নেই। যাবে আর ঠাকুর প্রণাম করে চলে আসবে। ভিড়ে ঘোরাঘুরি ভাল নয়।

গৌরী সজলনয়নে বলে, তা হয় না। তবে থাক, আমি আর যাব না।

পরেই বললে, কি মুশকিল। আমি কি তোমায় যেতে বাধা করছি?

গৌরী বললে, নাও, তুমি ঘুমোও। আমি যাব না।

পরেই তখন উঠে-বসেছে। বললে, কি করব, আমার কাছে একেবারে টাকা নেই। এ মাসে দুদিন কামাই হয়েছিল ব'লে আবার মাইনে কেটে নিয়েছে। ওই যে ঘোষ সাহেব, ও হচ্ছে একের নম্বর—যেমন চেহারা—

গৌরী ম্লান হেসে বললে, তুমি ঘুমোও তো। তোরে উঠতে হয় না। নইলে শেষে আবার একদিন কামাই হয়ে যাবে।

পরেই অনেকক্ষণ কি ভাবল। তারপর হঠাৎ মশারি থেকে বেরিয়ে আলনার কাছে গেল। হারিকেনের আলোটা বাড়িয়ে জামার ভেতর-পকেট থেকে সাবধানে ভাঁজ করে রাখা তিনটে এক টাকার নোট থেকে একটা নোট বের করে এনে গৌরীর হাতে দিল।

গৌরী মুঠো খুলছিল না। পরেই দু হাত দিয়ে সেই মুষ্টিবদ্ধ হাতখানি বুকের কাছে টেনে নিয়ে গাঢ়স্বরে বললে, একটা টাকা রাখ।

গৌরী সে মুহূর্তে আর কিছু বলতে পারল না।

পরের দিন গৌরীর সত্যই কালনা ঘাওয়া হ'ল। চিহ্ন বিহ্ন আর বেলা অস্ত্রবারের মত এবারও রকে ব'লে পা ঝুলিয়ে চূপ করে লোকের ভিড় দেখছিল। এরা সবাই যাচ্ছে কালনায়। কালনা কত দূর! মহিষমর্দিনী ঠাকুর কত বড়!

এমনি সময়ে গৌরী হঠাৎ ডেকে পাঠাল। বললে, নে, চট করে জামা প্যাট প'রে নে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে পরেশের মা বললেন, ও বউমা, ওদের নিয়ে যাচ্ছ নাকি?

হ্যাঁ মা।

পরেই মা খুশী হলেন। তবু বললেন, ওরা কি ইটতে পারবে?

খুব পারবে। ওই তো ও-বাড়ির বউদিরাও ছেলেমেয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

তবে যাও। আহা, ওদের অনেক দিনের বড় শখ। কিন্তু একটু সাবধানে যোগে মা, বড় ভিড়।

মেলায় গিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়তে হয়। নাগরদোলা, মার্কার্স, ম্যাজিক খেলা, পুতুলনাচ এ তো আছেই, এ ছাড়া কত রকমের খেলনা, কত রকমের কাচের চুড়ি, শাঁখ, চাকি-বেলুন, অ্যালুমিনিয়ামের জিনিসপত্র। কোন্টা রেখে কোন্টা নেবে।

হেনা-বউদির অবস্থা ভাল। জিনিস কেনাকাটা করার জন্তে একটা থলি এনেছিল। থলি বইবার জন্তে একটা বাচ্চা চাকরও।

অনেক কিছুই কিনে ফেললেন হেনা-বউদি। এবার দর করছিলেন একটা ফুলদানির।

ঠিক কত হবে ?

ওই যে বললাম ঠাকরণ, আড়াই টাকা।

আড়াই টাকা! একটুও কমাবে না?

কি বলব ঠাকরণ, একেবারে কেনা দামে মাল ছাড়ছি।

আচ্ছা, তু টাকা চার আনা দিচ্ছি, দাও।

দোকানদার একটু নকল ভ্রূণের ভাব এনে বললে, কি আর বলি! বছরকার দিন। তাই নেন। আমার না হয় লাভ হ'লই না।

হেনা-বউদি খুশী মনে ফুলদানিটা নিয়ে গৌরীকে দেখাল।

কেমন হ'ল দেখ তো?

গৌরী বললে, চমৎকার।

তুমি একটা নাও?

গৌরী স্নান হেসে বললে, এবারটা থাক।

হেনা-বউদি বললে, কই, তুমি তো কিছুই নাও নি দেখছি।

গৌরী এবারও হাসল।

কিন্তু গৌরীর কিছু কেনা হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। চিহ্ন বিহ্ন বেলা সেই সব মাটির খেলনা পেয়ে আনন্দে ভুলে রয়েছে।

খেলনাগুলো বড় দাম নিলে। তা নিক। উপায় কি।

হেনা-বউদি বললে, সার্কস দেখবে নাকি?

গৌরীর তখন সমস্ত শরীর টলছে। এতটা পথ বেলাকে বুকে ক'রে নিয়ে এসেছে। তার জন্তে প্রস্তুতই ছিল। গৌরী জানত, বেলা হাঁটতে পারবে না। তবু তাদের মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে তোলার জন্তে এ কষ্টভোগ করতেও রাজী।

কিন্তু এখন আর পারছে না। এই ভিড়ের মধ্যে একা নিজেরই দম আটকে আসে। তার ওপর ওই তিনটি নাবালকের দায়িত্ব।

গৌরী বললে, চলুন, এবার ফেরা যাক। পথ তো কম নয়।

পরের বছর কিন্তু এ রকম কাটল না। সেবারও শ্রাবণ এল, কালনায় মহিষমর্দিনীর পূজাও বলল, হেনা-বউদিও এল। কিন্তু গৌরীর যাওয়া হল না।

হেনা-বউদি একটু হেসে বললে, কি, এবার তো আর তোমার যাওয়া হচ্ছে না?

গৌরী একটু হাসল মাত্র।

হেনা-বউদি এবারও সাজসজ্জা ক'রে থলি হাতে বাহক সঙ্গে নিয়ে কালনার মেলায় যাচ্ছিল, গৌরী হঠাৎ নীচু গলায় ডাকল, শুমন।

এই ব'লে হেনা-বউদি কাছে আসতেই অপরাধীর মত এদিক ওদিক তাকিয়ে চট্ ক'রে ঠর হাতে একটা টাকা গুঁজে দিয়ে চাপা স্বরে বললে, চিহ্ন বিহ্ন আর বেলায় জুড়ে মেলা থেকে কিছু খেলনা নিয়ে আসবেন।

গতবারের মত এবারও গৌরী আগের দিন রাতে পরেশের কাছ থেকে একটা টাকা চেয়ে রেখেছিল।

পরেশ বললে, এই কচি ছেলে কোলে নিয়ে মেলায় যাচ্ছ নাকি?

গৌরী যত্ন ধমকের স্বরে বললে, দূর! আমি যাব কেন? হেনা-বউদি যাচ্ছেন, তাঁকেই খেলনা আনতে দেব।

পরেশ বললে, খেলনা আবার কার জন্তে!

বাঃ রে, ছেলেমেয়েগুলো আশা ক'রে নেই?

পরেশ কিন্তু খুব খুশী হয় নি। বললে, এভাবে পয়সা নষ্ট করা ঠিক নয়। তোমার স্বামীর অবস্থা কি, তা তুমি কল্পনাও করতে পার না।

কল্পনা করতে গৌরী খুবই পারে। কিন্তু কল্পনার তো দরকার হয় না। সে তো অহরহই দেখছে। অতি সামান্য মাইনের চাকরি। ছুটি-ছাটার বালাই নেই—কামাই হ'লেই কৈফিয়ৎ। জীবনে কোনদিনই সে যে এই টাকার চেয়ে বেশী কিছু পাবে তার আশা নেই। এ চাকরি ছেড়ে যে আবার নতুন কোথাও চেষ্টা করবে সে সাহসও বুঝি গৌরী আসার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে। যেটুকু বাকি ছিল সেটুকুও নিঃশেষ করেছে পোপোন। এরই মধ্যে পোপোনের জন্তে অনেক কিছু খরচ হয়ে গেছে—যে খরচ পরেশ ভাবতেও পারে নি।

কিন্তু এসব নিয়ে পরেশ কোনদিন বাড়িতে আলোচনা করে নি। বাড়িতে সে স্বল্পবাক। পুরুষমানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা মেয়েরা বুঝবে কতটুকু?

অকালবৃদ্ধ বাপের দিকে তো তাকানোই যায় না। পাড়ার গায়ের অর্ডার-সাপ্রদায়। এই ভয়ঙ্কর নিয়েও

রোদ জল মাথায় ক'রে তিনি হাঁটেন। কিন্তু বা পান তাতে কি হয়? কয় মাসের চিকিৎসাটাও ভাল ক'রে হয় না।

এ সংসারের কাছে পরেশের প্রত্যাশা কতটুকু?

তবু এমনি ভাবেই দিন কাটে—মাস কাটে—বছর কাটে। একটার পর একটা শ্রাবণ আসে, আবার চলে যায়। গৌরী প্রত্যেকবারের মত প্রতিবার একটা ক'রে টাকা চেয়ে নেয়। সেই একটা টাকা যে পরেশের কতখানি, তা গৌরী বোঝে কিনা পরেশ আজ পর্যন্ত টের পায় নি। তবু একটা টাকা—সারা বছরের মধ্যে ওই একটি দিন গৌরী তার কাছে হাত পাতে। পরেশ মনে মনে বিরক্ত হয়, কিন্তু ফেরাতে পারে না।

পরেশের বাবা রমানাথ তরফদারের কিন্তু এখন আর একটা মুশকিল হয়েছে। আগের মত ঠিক সময়ে আর বেরতে পারেন না। পোপোন যত বড় হচ্ছে তত যেন সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে এই প্রোটকে আঁকড়ে ধরছে। সে আদরের প্রতিদান না দিয়ে রমানাথ অর্ডার সাপ্লাইয়ের বৈজ্ঞানিক দৈনন্দিন হিসেব-পাওনার কড়াগণ্ডা আদায়-অনাদায়ের ব্যাপারে ঢুকতে চান না।

প্রোট বাপ যখন নাতিকে বকে চেপে আদর করেন, দূর থেকে পরেশ তখন রমানাথকে মনে মনে গাল দেয়। ছেলে বড় হচ্ছে—খরচ বাড়ছে, কিন্তু আয় কোথায়?

বাতে পদ্ম প্রোট ঠাকুরমার বাহবন্ধনে বদ্ধ হয়ে পোপোন যখন মনের আনন্দে বকে যায়, দূর থেকে ছেলের কঙ্কালসার মেহের দিকে তাকিয়ে গৌরী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

এসব চিন্তা আগে ছিল না। ইদানীং যেন ছর্ভাবনা মাথায় আসছে। এই তো চেহারা! পাজরের আড়ালে প্রাণটুকু ধুকধুক করছে। এক ফোঁটা দুধ চোখে দেখতে পায় না। বাঁচবে কি ক'রে?

ভাবতে গিয়ে শিউরে ওঠে গৌরী।

একদিন গৌরীর নামে এল বাড়ি থেকে একটা চিঠি—মা লিখছেন। বড় একটা লেখা হয় না তাঁর। দীর্ঘদিন পর তাই যখন লেখেন তখন পত্রও হয়ে দাঁড়ায় দীর্ঘ। জমির ধান, চালের কুমড়া থেকে গরু-বাছুর বিয়োনোর প্রত্যেকটি খবর খুঁটিনাটি জানিয়ে পরিশেষে লিখছেন, অনেক দিন মেথি নি। এই শ্রাবণে একবার আয়। ভাজ মাসটা থেকে না হয় পূজোর আগেই পাঠিয়ে দেব।

চিঠিটা পড়ে গৌরীর হৃৎচোখ হঠাৎ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মাসের কাছে বাবে, এটা বড় নতুন কিছু আশ্রয় নয়; কিন্তু ওই চিঠির মধ্যে আরও একটা সুসংবাদ থেকে গিয়েছে।

মনে মনে স্থির করল গৌরী, আর দেরি নয়। এখনই তাকে মাসের কাছে যেতে হবে। একটা মাসও যদি ছেলেটা পেট ভরে দুধ খেতে পায় তা হ'লে—

আর ভাবতে পারল না গৌরী। দীর্ঘদিন পর হঠাৎ যেন তার সমস্ত মন পুলকে ভরে উঠল। তখনই সেই চিঠি নিয়ে গেল শান্তডীর কাছে।

আরজি মঞ্জুর হতে দেরি হ'ল না।

ঠিক হ'ল এই শ্রাবণেই গৌরী যাবে।

শুভদিন যখন স্থির হ'য়ে গেছে, তখন বেলা হঠাৎ একদিন ছুটে এসে গৌরীর কাপড় জড়িয়ে ধরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, বউদি, এবার কালনার মেলা থেকে খেলনা এনে দেবে না?

মনে মনে চমকে উঠল গৌরী। তাই তো! একেবারে ভুলেই গিয়েছিল।

শুধু বেলা নয়, আরও হুজুন আছে। তারা যদিও এখন যথেষ্ট বড় হয়েছে—বেলাকে হাত ধরে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে, তবুও খেলনার শখ বেলার মতই গভীর ভাবে তাদের লুক্কানোর মধ্যে দৃঢ়মূল হয়ে আছে।

গৌরী ক্ষণকাল কি ভাবল। তারপর বললে, আচ্ছা, কালনার মেলায় পরই না হয় যাব।

আবার এল মহিমমির্জানী-পূজা। লাল-নীল কাগজে পূজার প্রোগ্রাম কালনা থেকে এতদূরেও ছিটকে এল দু-চারখানা। দু-চারটে দোকানের দরজায় দরজায় আঠা দিয়ে সেই প্রোগ্রাম আটকে রেখেছে কেউ। আবার সেই ছলোড়। আবার সেই চাকলা!

হেনা-বউদি বললেন, কি, কাল মেলায় যাব তো?

গৌরী একটু হেসে মাথা তুলিয়ে বললে, হ্যাঁ।

রাস্তির বেলায় এবারও গৌরী পরেশের কাছে টাকার কথা তুললে। পরেশ প্রথমে সাড়াই দিল না।

গৌরী তখন আন্তে আন্তে পরেশের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললে, ও মশাই, শুনছেন?

পরেশ একটু বিরক্তির স্বরে বললে, কি ?

আমার পাকুনিটা ?

কিসের পাকুনি ?

গৌরী চোখ বড় বড় ক'রে বললে, বাঃ রে। মনে নেই ? কাল যে কালনাশ ঘাচ্ছি।

পরেশ বললে, না, ওসব শখ ছাড়। আমার কাছে একটা পয়সা নেই।

গৌরী এতখানি আঘাতের জন্তে প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ মুখখানা নীচু হয়ে গেল।

পরেশ বললে, এবার সামনে কত খরচ জান ? তুমি তো বাপের বাড়ি যাচ্ছ। এক গরুর গাড়ির ভাড়া যোগাতেই আমার পাগল হতে হবে। তার ওপর এখন যদি আবার তোমার শখের জন্তে একটা টাকা জলে ফেলতে হয়, তা হ'লে বল, সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে সম্যসী হয়ে বেরিয়ে পড়ি।

গৌরী এবারও কোনও কথা বলল না।

অপর পক্ষকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে পরেশের পুঞ্জীভূত

ক্রোধ বেন জ্বলে উঠল। কিন্তু চিংকার করল না। চিংকার করা তার স্বভাব নয়।

ধীরে ধীরে কথাগুলোকে তীক্ষ্ণতর ক'রে বললে, আমি আশ্চর্য হলাম, আমার এই ছুঃসময়ে তোমার বাপের বাড়ি যাওয়ার শখ কি ক'রে হয়। মা ডাকল ব'লেই যেতে হবে ?

গৌরী একবার ভাবল, ব'লে কেলে কেন সে আজ মায়ের কাছে ছুটছে। পোপন কি তার একার ? পোপনের কি দশা হয়েছে তা কি শুধু তারই লক্ষ্য করবার ?

কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। নিঃশব্দে চোখের জলে ভাসতে লাগল।

পরেশ বললে, গরুর গাড়ি ভাড়া এক পিঠ দিয়েই ক্ষান্ত হ'লে চলবে না। আসবার সময়কার ভাড়াটাও দিতে হবে গৌরী, সেটা ভুলো না।

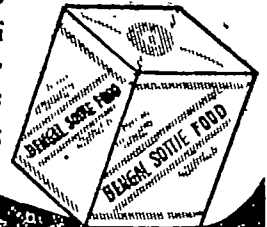
এবার গৌরীর বুকখানা হু-হু ক'রে উঠল।

ফেরবার ভাড়া মা কতবার নিজেই আগাম দিতে এসেছেন, কিন্তু অশোভন হবে ব'লেই গৌরী কিছুতেই নেয় নি। যদিবা জোর ক'রে মা তার হাতে গুঁজে দিয়েছেন,



শিশুর খাদ্য ও বোগীর পথ্য বেঙ্গল শাটী ফুড

ই হা বি শু ক
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে
প্রস্তুত। প্রসিদ্ধ
ডাক্তার ও কবিরাজ-
গণ কর্তৃক উচ্চ
প্রশংসিত ও ব্যবহৃত



অমূল্যধন পাল এণ্ড কোঃ

১১৩ নং খোঁরাপট্টা স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

গৌরী তখনই সে টাকা দানার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ডেকে মিষ্টি খেতে দিয়ে দিয়েছে।

এ খবর পরেশও জানে। কিন্তু গৌরী জানত না, এই তুচ্ছ ক্ষতিটুকু পরেশ এমন সযত্নে পালন করে এসেছে। এবং আজ তারই সামনে সেই ক্ষতিপূরণের ইঙ্গিত দিতে তার সংকোচবোধও হ'ল না।

পরেশ আবার বললে, এবার গরুর গাড়ির ভাড়া কত জান?

গৌরী সহসা ফুঁসে উঠল। বললে, যত ভাড়াই হোক, আমি এক মাস না থাকলে যে খরচ বাঁচবে তা থেকে ভাড়া পুষিয়ে যাবে নিশ্চয়ই।—এই বলে বিছানা থেকে নেমে শূন্য মাটিতে গিয়ে উপুড় হয়ে শুল।

পরেশ বোধ হয় কোন জবাব খুঁজে পেল না। চুপ করে রইল।

ভোরবেলা যথাসময়েই পরেশের ঘুম ভাঙল। অল্প দিন এতক্ষণ গৌরীও ওঠে। তাড়াতাড়ি চা করে দেয়। কিন্তু আজ মেয়ের ওপর স্তরে গৌরী অকাতরে ঘুমোচ্ছে।

পরেশ ডাকল না। নিজেই সব কাজ চুকিয়ে যাবার সময় এক টাকার একটা নোট বের করে গৌরীর মাথার কাছে ধোয়াতানি চাপা দিয়ে রেখে গেল।

হেনা-বউদি এল ঠিক দুপুরবেলায়।

ছেলেমেয়ে আর হয় নি। বেশ মোটা হয়েছে। সেজেগুজে পান খেয়ে আলতা প'রে কপালে বড় করে সিঁচুরের টিপ দিয়ে ভারি স্নম্বর লাগছিল।

হেসে বললে, কই, কাপড় পর নি যে?

গৌরী একটু বিমর্ষ হাসি হেসে বললে, আমি যাব না।

সে কি!

শরীরটা একটু ঋণাপ।

হেনা-বউদি একটু ইঙ্গিতপূর্ণ চোখে তাকিয়ে হেসে বললে, শরীর ঋণাপ। কেমন ধারা ঋণাপ?

গৌরী লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি বললে, যাং, এমনই মাথাটা বড় ধরেছে।

তবে প'ড়ে প'ড়ে ঘুমোও।—এই বলে হেনা-বউদি চলে গেলেন।

কিন্তু গৌরী সত্যিই পুজোর চার দিনের মধ্যে কোন-দিনই গেল না। পরেশ সেদিন যখন চলে গিয়েছিল টের

পায় নি। টাকাটা প্রথমে স্থির করেছিল, নেবেই না। কিন্তু পরে ভেবে দেখল, মায়ের কাছে যখন যেতেই হবে তখন ও-টাকাটা তার চাইই। অন্ততঃ ওখানে গিয়ে গায়ে মাখবার জন্তে সাবানটুকু যেন বউদির কাছে হাত পেতে নিতে না হয়।

পুজো শেষ হয়ে গেল। এ কটা দিন যে কি ভাবে গৌরী চিহ্ন বিহ্ন আর বেলাকে এড়িয়ে এসেছে তা সেই জানে। আজও ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারে না। আশ্চর্য! ওরাও যেন সেটা বুঝেছে। তাই ওরাও যেন এড়িয়ে চলে।-বউদি তাদের মধ্যে করে ভুলিয়েছে এবার।

দুপুরবেলায় বাড়িতে বড় একটা কেউ থাকে না। পরেশ চলে যায়, রমানাথ ঘোরেন বাজারে বাজারে, ছেলে-মেয়েরা যায় ইস্কুলে। ও-ঘরে শান্তী ঘুমে অচেতন পোপনকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে।

এই রকম নির্জন বিগ্রহে গৌরী রাস্তার ধারের জানলাটির কাছ ঘেঁষে বসে। এ সময়ে লোক চলাচল বড় একটা নেই। মাঝে মধ্যে দু-একটা গরুর গাড়ি যায়। হয়তো দূর গ্রাম থেকে স্নানার্থীরা স্নান সেরে ঘড়াভর্তি গঙ্গাজল নিয়ে গরুর গাড়ি চড়ে বাড়ি ফেরে। কোন কোন গাড়িতে ছই নেই। শুধু খড় বোঝাই। এ-হাট থেকে ও-হাটে যায়। কখনও যায় কেরিওয়াল কাঁধে কাপড়ের পুঁটলি নিয়ে।

চাই বাড়ি জামা সেমিজ—

এ সময়ের আকাশটা এক এক সময়ে মেঘশূন্য হয়ে ওঠে। এক মুঠো রোদ আকাশ ছেয়ে বলমল করে ওঠে। তখন অকস্মাৎই যেন মনে হয়, পুজো আসছে। শ্রাবণ শেষ হতে চলল। তার পরই ভাদ্র। ভাদ্র মাসেই শরৎকাল। ভাদ্রের শেষে আশ্বিনের প্রথমে শিউলি ফুটবে, স্থলপদ্মগাছ আলো করে পাপড়ি মেলবে।

রাস্তা দিয়ে এই সময়ে কালনার মেলা থেকে খেলনা-ওয়ালারা ফেরে। ফেরে বাঁশিওয়াল—বেলুনওয়াল।

গৌরীর ছই লুঙ্গ চোথ চঞ্চল হয়ে ওঠে। কখন এক সময়ে খেলনাওয়ালাকে ডেকে বসে : এই খেলনাওয়াল!

খেলনাওয়াল এসে দাঁড়ায়।

কোথা থেকে আসছ গো?

কালনার মেলা থেকে যা।

ইচ্ছে ক'রেই যাচিয়ে নেয় গৌরী। এয়া তা হ'লে সত্যিই সেই কালনার মহিষমর্দিনীতলার মেলা থেকে আসছে।

এমনি সময় কখন পোপন ঘুম থেকে নিশেষে উঠে এসে দাঁড়িয়েছে। খেলনা দেখেই ছ হাত বাড়িয়ে ছুটে গেল।

ও কি পোপন!—মুহু ধমকের স্বরে গৌরী হাত ধরে টানল। কিন্তু খেলনাওয়ালা ততক্ষণে একটা স্বন্দর রামসীতার মূর্তি পোপনের হাতে তুলে দিয়েছে।

পোপন ছ হাতে সেই খেলনা বুকে জড়িয়ে নিয়ে ছুটে পালাল।

নিরুপায় হয়ে গৌরী জিজ্ঞেস করল, কত দাম?

খেলনাওয়ালা মুহু হেসে বললে, বা নেবে সব আট আনা।

আট আনা।

চমকে উঠল গৌরী।

না বাপু, তোমার খেলনা তুমি নিয়ে যাও।—এই ব'লে সত্যি সত্যিই গৌরী উঠে যাচ্ছিল পোপনের হাত থেকে খেলনাটা ফিরিয়ে আনবার জন্যে। কিন্তু—

খেলনাওয়ালা বললে, আচ্ছা মাঠাকরন শোনেন, চারটে পয়সা না হয় কম দেবেন। ছেলে নিয়েছে—

গৌরী নিজের মনেই মাথা নাড়ল, না না, তাই বা কি ক'রে হয়! তার কাছে সাবান কেনার পর পুঁজি তো মোটে ন আনা। শাওড়ীর কাছেও একটি পয়সা নেই। তিনিও নিঃস্ব।

খেলনাওয়ালা তেমনি হেসে বললে, আচ্ছা, আর চারটে পয়সা না হয় কম ক'রেই দেন। ভাড়া মেলার জিনিস, লাভের মুখ না হয় নাই দেখলাম।

গৌরী আর ভাবতে পারল না। নিরুপায় হয়ে চুপি-চুপি আঁচল থেকে ছ আনা পয়সা বের ক'রে দিল।

খেলনাওয়ালা খুশি হয়ে বেরিয়ে গেল।

কয়েকটা মুহূর্ত গৌরী স্বাপুর মত ব'লে রইল। কী যেন একটা চিন্তা তাকে পীড়ন করছে, বারে বারে নিঃশব্দে পীড়ন করছে।

ঠিক এই সময়ে কোথা থেকে রক্তবর্ণ মুখে রাড়ের মত বেলা ছুটে এল : বউদি—

বাঁকি কথা তার মুখ থেকে বেরুল না। শিশুকণ্ঠ তখন রুদ্ধ হয়ে গেছে অভিমানে।

পোপনের খেলনা তা হ'লে এরই মধ্যে সকলের চোখে পড়েছে।

কুক-লজ্জিত গৌরী আত্মগোপন করবার জন্যে তাড়া-তাড়ি বাস্তায় দিকে মুখ ফেরাল।

চোখে পড়ল, খেলনাওয়ালা তখনও যায় নি। আর এক নতুন ধরিকারের উপস্থিতি টের পেয়ে আবার সে ফিরে দাঁড়িয়েছে।

গৌরী ভাবল, আর একবার ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করে—

কিন্তু ডাকতে পারল না।

মনে হ'ল, ও খেলনাওয়ালাটা যেন বড় নিষ্ঠুর।

বন্ধন ও মুক্তি

শ্রীস্বধাকান্ত রায় চৌধুরী

লোহার কঠিন বন্দীশালায়

কংস রাজ্যের দেশে

জন্মেছিলেন মুক্তির রাজা

নন্দ-শিশুর বেশে।

পর্বত-শিরে গগনচুম্বী

নীরব হিমের রাশি

সমতলে ধায় তটিনীর বেশে,

গলিত প্রেমের হাসি।

বৃক্ষে বন্দী পুষ্পমল্লের

মর্মের কোষ ছাড়ি

সীমা হতে রোজ অসীমের পথে

সৌরভ মেঘ পাড়ি।

বন্ধনে বাঁধা মুক্তির বাণী—

ঘাট ছেড়ে ঘাটে যায় তরীধানি।

বসন্ত-শেষের এক স্নিগ্ধ সকালে নৈনিতালের দরজায় এসে নামলুম। হিমালয় এখানে দু'ধার থেকে স্তরে স্তরে নেমে এসে স্তম্ভের একটি সরোবর সৃষ্টি করেছে। আমাদের মোটর বাস এরই ধার ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। রিকশাওয়ালা ও নৌকোওয়ালা দু'দলেই তারস্বরে চিৎকার করছে। একটুখানি সন্মতির ইশারা পেলেই ছৌঁ মেয়ে মালপত্র নিয়ে তুলছে তার রিকশায় কিংবা নৌকোয়।

হোটেলের গাইডরাও তৎপরভাবে যাত্রী সংগ্রহের চেষ্টা করছে। আমার গাইডকেও দেখতে পেলুম। আমার লেখা চিঠিখানা হাতে ক'রে আমাকেই খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছিল। মার্জিতরুচি পাহাড়ী যুবক, সসম্মানে অভিযান ক'রে হিন্দীতে প্রশ্ন করল, পথে কষ্ট হয় নি নিশ্চয়ই?

পথে কষ্টের সীমা ছিল না। লন্দৌ থেকে কাঠ-গোদাম এসেছি ছোট লাইনের গাড়িতে গড়িয়ে গড়িয়ে। তারপর ব'সে ব'সে বাইশ মাইল পাহাড়ী পথে পাক খেয়েছি চরকির মত। মেয়েদের গা ঘুলিয়েছে, অস্বস্তি বোধ হয়েছে আমাদেরও। এখন সমস্ত চেতনা সংহত ক'রে অল্পভব কলম নিজে, মাথাটা এখনও ঝিম ঝিম করছে ঝাঁকুনিতে। কিন্তু ভদ্রতার উত্তর দিলুম ভদ্রলোকের মত। তার শিষ্টাচারে ধন্যবাদ জানিয়ে বললুম, কিছুমাত্র নয়।

গাইড বললে, তা হ'লে নৌকোতেই যাওয়া যাক। লেকের হাওয়ায় সামান্য পথশ্রমটুকুও দূর হয়ে যাবে।

বাসের ছাত থেকে ততক্ষণে আমার স্ট্রেকস আর হোল্ডঅলটা নামানো হয়ে গেছে। চক্ষের নিম্নে তা অদৃশ্য হয়ে গেল। এবং খানিকক্ষণ পরেই দেখতে পেলুম, একখানা নৌকোর ওপর থেকে একজন পাহাড়ী নৌকোওয়ালা প্রচুর আগ্রহ নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

নৌকোয় ব'সে ঝিরঝিরে সকালের বাতাসে সত্যিই শরীর মন জুড়িয়ে গেল। ছোট নৌকো। স্থির গভীর জলের ওপর হালকা দাঁড়ে ছপছপ আওয়াজ তুলে এগিয়ে চলেছে। তন্মিতালের বাসস্ট্যাণ্ড সজ্জিবাজার নোংরা স্তম্ভ ও দোকানপাট পেছনে পড়ে রইল। লেকের অপরপ্রান্তে

মন্মিতালের পরিচ্ছন্ন ঘরবাড়ি দোকানপাট হোটেল ক্লাব সিনেমা-হাউসগুলি দৃষ্টির সামনে এগিয়ে এল একে একে বা দিকের নির্জন পাহাড়ের অন্ধকার ছায়া পড়েছে লেনে-জলে। স্তম্ভ রেখার মত একটা সরু রাস্তায় কখনো বা ছাত্তা হাতে কোনো ঋণ মহিলাকে, কখনো তেজ ঘোড়ার পিঠে কোনো নির্ভীক পুরুষকে দেখা যাচ্ছে। ডান দিকের চওড়া বাঁধানো রাস্তা জনবহুল ব্যস্ত ও মুখর পাহাড়ের রৌদ্রালোকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে ঘন লোকালয়। আশেপাশে নীলজলে ছোট বড় অসংখ্য নৌকো ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। অবসরকান্ত নরনারী ভেসে বেড়াচ্ছে উদ্বেগহীনভাবে। চঞ্চল ধারা, তারা ছুটোছুটি করছে। বয়ঃপ্রাপ্তেরা দাঁড় গুটিয়ে রেখে কাগজ পড়ছেন, কিংবা সঙ্গীর সঙ্গে গল্প করছেন পাইপ মুখে।

গাইড ভাঙা হিন্দীতে সব কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছে। একটা উঁচু চূড়া দেখিয়ে বললে, এঁটে 'চীনা পিক'। মহুরির 'গান হিলের' মত এখানকার এইটেই সবচেয়ে উঁচু পাহাড়। প্রায় শেষ পর্যন্ত ঘোড়াতেই ওঠা যায়। এই দিকে 'টিকিন টপ'—

এক সময় নৌকো এসে পাড়ে ভিড়ল। রাস্তার ওপরেই আমাদের হোটেল। গেটের ভেতরে মাঝবয়সী যে ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে পায়চারি করছিলেন, পরিচয় হ'লে জানলুম তিনিই হোটেলের ম্যানেজার জোগ সাহেব। একগাল হেসে অভ্যর্থনা করলেন, বললেন, আজকের সকালটি ঘেন আরও মিষ্টি।

বললুম, এ তো হিমালয়ের মাহুষ আকর্ষণের আদিম প্রথা। মাতাল হবার মত দু'বার নেশা ছড়িয়ে রেখেছে তার সারা গায়ে।

ভদ্রলোক পথ দেখিয়ে এগিয়ে চললেন। ঘরে পৌঁছে বললেন, এই হোটেলটির যে একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে, তা এই ঘরে ব'সেও উপলব্ধি করবেন।

সামনের জানলার লেসের পরশ দু'ধারে সরিয়ে দিলেন। পাহাড়ের কোলে বিস্তীর্ণ জলরাশি আপন মায়ী বিস্তার ক'রে রেখেছে। সূর্যের আলো তখন প্রথর হচ্ছে, ছোট ছোট রূপোর কণায় ভরে গেছে ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি।

ম্যানেজার বললেন, নৌকোগুলো এখনও পাল শুটিয়ে
ছে। বাতাস আর একটু বাড়লেই তারা পাখা মেলবে।

দৃষ্টি মনে মনে কল্পনা করবার অবকাশ দিলেন তিনি।
বললুম, সত্যিই অপূর্ব!

ভদ্রলোক গর্বিতভাবে বললেন, এখন আমাদের ঘর
লি ক'রে রাখা যে কত বড় একটা সমস্যা, তা দু দিনেই
দেখতে পাবেন।

চায়ের ট্রে নিয়ে বেয়ারা এল ঘরে। পরিষ্কার প্লেটটা
এগিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, এ বেলার চায়ের পাট তো
চুকে গেছে, তাই আপনার জন্মে ঘরেই দিতে বললুম।

খাওয়া শেষ হ'লে ভদ্রলোক বললেন, চলুন একটু ঘুরে
আপনাকে সব দেখিয়ে দিই। আমাদের খাবার ঘর,
গাউজ, লন—

পাহাড়ে হাওয়ায় কী জাহ্ন আছে জানি নে, শ্রান্তি
হুড়িয়ে গেছে। উৎসাহ পেলুম তাঁর কথায়, বললুম, চলুন।

বারান্দায় থামের পাশে পাশে নানা জাতের অকিড
বুলছে। সামনে ছোট লন। ক্লব অ্যান্ডার আর অ্যান্ডারি-
নামে এখনো আলো আছে। স্নাইট পির বেড়া, ডালিয়ার
। পেনে যে ফুল নিঃশেষিত হয়েছে অনেকদিন
তার প্রাচুর্য এখনও অক্ষুণ্ণ। বেশ লাগল
ট।

আমার প্রতিবাসিনীর সঙ্গেও আলাপ হ'ল। বয়স
নিশ্চয়ই তিরিশ পেরোয় নি, কিন্তু চপলতা নেই। চোখের
উনিতে। স্ত্রী গৌরমুখ স্বাস্থ্যভাবে পাণ্ডুর। কালো
পড়ে শ্রান্তি জড়িয়ে আছে ঘন হয়ে, বিরক্তির রেখা
কে ও জন্মদাঁতে। মেয়েটি বেড়িয়ে ফিরছিল, পরিচয়
ল ম্যানেজারের মধ্যস্থতায়। বললেন, উমিলা স্ত্রীবাস্তব,
গাল এসেছেন দিল্লী থেকে। আর ডক্টর রায়, লক্ষ্মীয়ার
অধ্যাপক।

নমস্কার বিনিময়ের সময় দেখলুম, পরম কোতূকে জ্বলছে
মিলার চোখ দুটো। বললে, থাকবেন তো কিছুদিন?

বললুম, হ্যাঁ, ষ্টেটার পেরিয়েও থাকব।

উমিলা খুশী হয়ে বললে, থাক, একজন সঙ্গী পাওয়া
গেল।

কয়েক পা এগিয়ে উমিলা নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল,
গ গেল, বিকেলে আলাপ হবে ভাল ক'রে।

আমি আরও একটু শব্দ পেলুম। মনে হ'ল, ঘুরে
ঢুকেই সে হাসল ফিক ক'রে।

বিকালে ম্যানেজার এলেন শরীরের খবর নিতে।
বললেন, আজ অনেকের ইচ্ছেয় সামনের লনে চায়ের
আয়োজন করা হয়েছে—

বললুম, বেশ তো, লেকের ওপর প্রকৃতির রূপ-
পরিবর্তনটাও দেখা যাবে।

ম্যানেজার খুশী হয়ে বললেন, তা হ'লে আপনারও
ব্যবস্থা ক'রে দিই?—ব'লে বেরিয়ে গেলেন।

উমিলা যেন আমার অপেক্ষাই করছিল, এমনি ভাবে
ঘর থেকে বেরিয়ে আমার পাশে পাশে চলতে লাগল।
লনে দুখানা বেতের চেয়ার দখল ক'রে দুজনে মুখোমুখি
বসলুম।

এক সময় উমিলা বললে, আপনি বড় লাজুক।—ব'লে
হাসল ফিক ক'রে। আরও বললে, কিন্তু ভাবখানা
এমন যে আপনার নাগাল পাওয়া ভার।

অস্তরের পুঞ্জিত অবজ্ঞা যেন ক'রে পড়ল এবারের
হাসিতে। পুরুষের সনাতন অহমিকার প্রতি নারীর
আদিম অবজ্ঞা।

বেতের টেবিলের ওপর বেয়ারা চা দিয়ে গেল। উত্তর
না দিয়ে খাওয়ায় মনোনিবেশ করলুম।

সামনে লেকের স্বচ্ছ নীল জল শান্ত স্তব্ধ। ছেলে-
মেয়েরা ছোট ছোট পাল-তোলা নৌকায় চেপে অশান্ত
ক'রে তুলেছে তার মাঝখানটা। আমার মনও যেন চঞ্চল
হয়ে উঠল। ম্যাকডুগালের মনোবিজ্ঞানে এমন মেয়ের ছায়া
দেখতে পাই নি কোনখানে। এমন কথা কেউ কখনও
বলে নি আগে। উত্তর দেবার মত কোনও কথা খুঁজে
পেলুম না।

মুখের স্কাণ্ডইচ একটু সামলে উমিলাই আবার বললে,
আপনার মত আমিও এখানে নতুন এসেছি। অথচ
দু জনের আসাটা কত ভিন্ন কারণে! মুখে এক চুমুক চা
নিয়ে বললে, আপনি এসেছেন হাওয়া বদলের জন্মে।
আর আমি?

উমিলা থেমে গেল। জ্ঞান কি কারণে হতে পারে?
এমন স্বন্দর পরিবেশের ভেতর এই স্ত্রী মেয়েটি কি স্বদয়ের

সমস্ত আবেগ দিয়ে হিমালয়ের এই উদার ঐশ্বর্য আকর্ষণ পান করতে আসে নি ?

সমস্ত মুখমণ্ডল সরল হাসিতে উজ্জ্বল করে জোগ সাহেব এসে দাঁড়ালেন। বললেন, ভাল লাগছে তো বিকেলটা ?—ব'লে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। পাশ দিয়ে বেয়ারা যাচ্ছিল, তাকে ডেকে পাহাড়ী ভাষায় কি আদেশ করলেন।

আমি প্রশ্নের দৃষ্টি মেলে তাঁর মুখের দিকে চাইলুম।

ভ্রমলোক বললেন, আজ আমার নিজের টেব একটা গোলাপী ক্যামেলিয়া ফুটেছে। এ ফুল এখানে কদাচিৎ ফোটে। আমি এ'র জন্যে জন্তে আনতে বললুম।—ব'লে উমিলাকে দেখালেন।

এবারেও উমিলা হাসল ফিক করে। এ কোন্ উপেক্ষার হাসি ! এমন হাসি তো অনেকেই হাসে, কিন্তু তাতে তো জ্বালা নেই।

ম্যানেজার অপ্রতিভ হলেন, কিন্তু চুপ করেও রইলেন। নাচের তাল কেটেছে বিশিষ্ট দর্শকের বেয়াদবিতে, প্রতিবাদের প্রহ্ন তাই ওঠে না।

নিজের হাতে ক্যামেলিয়া উপহার দেবার লোভ সংবরণ করে ম্যানেজার এক সময় উঠে পড়ল। উমিলা হেসে উঠল খিল খিল করে। এ কোন্ গৌরবের হাসি ! লক্ষ্য বেন আমারই মাথা কাটা গেল।

মনোবিজ্ঞান পড়িয়ে পড়িয়ে ভাবতুম যে, মানুষের মনস্তত্ত্ব বুঝতে শিখেছি। আজ একদিনেই যে অহংকার ভেঙে গেল। সৌন্দর্যকে চিরকাল ভালবেসেছি, কিন্তু আজকের এই সুন্দর মেয়েটি এত সন্নিহিতে থেকেও কেন সাজা জাগাতে পারল না ! কেন সে অকারণে হাসে, কেন অভ্যস্তের মত হাসে, এর অর্থই যদি না পরিষ্কার হ'ল নিজের কাছে তো মিথ্যে আমার সাইকলজির ডক্টরেট, মিথ্যে আমার বারো বছরের অধ্যাপনা। দিক্কার দিলুম নিজেকে।

এক সময় উমিলা বললে, আসুন, একটু বেড়ানো যাক।

সাগ্রহে রাজী হয়ে গেলুম। তার সঙ্গলাভের লোভে নয়, তাকে আবিষ্কার করার লোভে।

অনেকে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছেন। অনেকে চায়ের

পেয়ালা শেষ করেও গল্প করছেন পার্শ্ববর্তিনীর সান্নিধ্য আমবা উঠে পড়লুম বেড়াবার জন্যে।

আজ বয়সে ও গাভীর্ষে এমন এক ধাপে পৌঁছেছি যে, সব জিনিসেরই একটু অর্থ খুঁজি। ভেতরের মানুষটি সর্বদাই স্তব্ধ। বাইরের মানুষটি তার মর্মান্বয় আঘাত পেলেই অস্থির হয়ে ওঠে একটা অদ্ভুত আতঙ্কে, উপভোগ্য পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াকে উপেক্ষা করে সমস্ত চিন্তাশক্তি কেন্দ্রীভূত হয় সেই একটি মাত্র রহস্যোদ্ভাবের আয়োজনে। পাশের ঘরের নতুন মেয়েটিকে দেখলুম, আমার ভেতরের মানুষটিকে জাগিয়ে দিয়েছে নিবিড়ভাবে নাড়া দিয়ে।

অল্পদিনেই পরিচয় নিবিড় হ'ল, কিন্তু সেটা নিতান্তই বাইরের পরিচয়। অন্তরের অন্তঃপুরে পদচারণার সুযোগ পাই নি একটি দিনও। শুধু এইটুকু বুঝতে পেরেছি যে উমিলা নিজে হাসে না, তাকে হাসায় কোনও প্রতিক্রিয়া, যেটা একান্তভাবে তার আগনার। সামান্য পরিচয়ের দাবিতে এর কারণ জানবার কৌতূহল প্রকাশ করতে সাহস পাই নি।

আজ আমরা 'টিফিন টপে'র রাস্তা ধরলুম। আগে এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, পাহাড়ের গায়ে মেঘ ঝুলে আছে। বাউয়ের মাথায় সোনালী মেঘ লেগেছে ইন্দ্রধনুর মায়া। উমিলাকে আজ একটু অল্প-মনস্ত দেখাচ্ছে। এক সময় একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে বললে, শুনে আপনি আমায় পাগল ভাববেন ডক্টর রায়। কিছুদিন থেকে আমার মানুষ-পাগল-করার তৃষ্ণা জেগেছে। দেখতে ইচ্ছে করে পৃথিবীর সমস্ত লোক পাগল হয়ে হাসছে হা-হা করে। আর সারা পৃথিবীটা হয়েছে একটা বিরাট পাগলা-গারম।

উমিলা খিলখিল করে হেসে উঠল। 'কসাই যেমন হাসতে হাসতে পশুবলি দেয়, তেমনই একটা পৈশাচিক উল্লাস। আমার শরীরটা উঠল কঁপে।

উমিলা বললে, সত্যি বলছি ডক্টর রায়, আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি। ইচ্ছে করে সমস্ত জ্ঞান দিয়ে আমার স্বপ্নকে সত্য করে তুলি।

আমি চুপ করে রইলুম।

দেশে থাকলে হয়তো পাগল হয়েই যেতুম। তাই
শ পাগলিয়ে বেড়াচ্ছি।

মুহূর্ত জমা হচ্ছে মুহূর্তের ওপর।

একদিন এই সংকল্প নিয়ে বেরিয়েছিলুম যে, এক-একটা
ধীরে তাকে পাগল করব, আর তারপর তার
আমি দেখে হা-হা করে হাসব মাতালের মত।

উমিলা হাসতে লাগল। মনে হ'ল, সে-ই বুঝি পাগল
গেছে। এক সময় হঠাৎ শাস্ত হয়ে বললে, কিন্তু মানুষ
দুখতে পাই নে ডক্টর রায়। মানুষের এত অভাব
কিভাবে!

এ কথাও উত্তর নেই।

এক একজন পাশ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল।
এন পাহাড়ী সহিস হাতে দেবদারুণ একটা কচি ডাল
চলেছে। প্রয়োজন হ'লে সেটা চাবুকের মত
হার করে। আমরা ধীরে ধীরে হেঁটে হেঁটে উঠছি।

এক সময় উমিলা আমার দিকে চেয়ে ফিক ক'রে
ল। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল তার এই হাসিতে।
দিন পরে কি সে একজন মানুষ খুঁজে পেয়েছে,
সে পাগল করবার উপযুক্ত মনে করে! কিন্তু কেন
হিংসা? মানুষ কেন এমন নৃশংস হবে?

উমিলা হাঁপাচ্ছিল। বললে, আর উঠতে পারছি নে
রায়। এবারে একটু বিশ্রাম করা যাক।

একটু আড়াল ঘেঁষে এক খণ্ড সবুজ ঘাসের ওপর

বসলুম দুজনে। সামনে দিগন্তবিস্তৃত নীল জলরাশি।
পেছনে কঠিন পাহাড় উঠেছে স্তরে স্তরে। লতাগুলো
কটকিত প্রাচীন পাহাড়। নীচে পুরনো জলের ওপর
চারিদিকের ছায়া পড়েছে, ওপরে স্বচ্ছ আকাশ অনাদিকাল
থেকে অবিরাম চেয়ে আছে। আমাদের জীবন নতুন,
পুরনো দিনের কথা জিজ্ঞেস ক'রে আমরা পুরনো হতে
চাই নি আজও।

অনেক কথা হ'ল, অনেক অর্থহীন অনাবশ্যক কথা।
মনে হ'ল, তার হৃদয়ের আগল খুলেছে আজ, ভেতরে
প্রবেশ করবার দরজাটি যেন খানিকটা খোলা দেখছি।

এক সময় ও নিবিড়ভাবে কাছে ঘনিয়ে এল।

আবেগে অন্ধ হলুম।

হঠাৎ কি কেউ হাদল ফিক ক'রে? চমকে উঠে
পিছিয়ে এলুম। তার চোখের দৃষ্টিতে দেখলুম একটা বর্বর
হিংসা। এ কোন্ ছলনা তার।

ভয় পেলেন ডক্টর রায়?

সত্যিই ভয় পেয়েছি আমি। মনোবিজ্ঞানের ক্লাস
হ'লে হয়তো ভয় পেতুম না।

উমিলা খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। এ কোন্
বিজয়িনীর হাসি!

রাস্তে হোটেলের কিরতে আঙ্গু আর ঘেরি হ'ল না।

খেয়েদেয়ে বৃদ্ধের দল আশ্রয় নিয়েছেন কয়লের নীচে।



আর.প্রি.দে.মন্ড

আর.প্রি.দে.মন্ড

১৯১-নতুনমার্গের ফাট • ন. কলকাতা

ফ্রেট-পাইপ মুখে পাখচারি করছেন বারান্দায়। হয়তো অশ্বলের রোগ আছে, তাই এই ঘুমের চোখে খানিকটা গতাহুগতিক কসরৎ। আজকের 'ঈভনিং নিউজ' প'ড়ে রইল টেবিলের ওপর, তাতে মন লাগল না। রেডিওতে ক্রিকেটের টেস্টমুখ শুনছেন জনকয়েক ক্রীড়ামোদী তরুণ যুবক, বিজ্ঞক মনটা আজ সেদিকেও গেল না। ছোটগল্প লেখার তরস্ত সাধ জেগেছে কিছুদিন থেকে, সে কাজেও আজ উৎসাহ পেলুম না। মনে হ'ল, এ সবই যেন মিথো। জগতে যদি সত্য কিছু থাকে তো ওই মেয়েটির মনের কথা, যে কথা জানতে পারলে জগতের সব কথা জানা হবে; সব চাওয়া পাওয়া হবে। জগতের মনস্বীদের ওপর বড় করুণা হ'ল, কত তুচ্ছ তাঁদের জ্ঞানের ভাণ্ডার! একটা সামান্য মেয়ের মনের কথা জানবার বলকাঠি খাঁদের হাতে নেই, সত্যিই তাঁরা কুপার পাত্র।

রাত বেড়ে চলেছে। পাহাড়ের গায়ে এক-একটা ক'রে বাতি নিবে যাচ্ছে। রেডিও নিস্তক হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আরামচৌকি থেকে উঠে গিয়ে সামনের লেসের পরদা তুখানা সরিয়ে দিলুম। চোখের সামনে অনন্ত আকাশ উন্মুক্ত হয়ে গেল। কোন্ তিথি জানি নে, বাইরে পাতুর চাঁদের আলো। আর নক্ষত্রের সভা বসেছে নিস্তক লেকের শান্ত নীল জলে।

হোটেলের কোন একটা ঘরে জলতরঙ্গের মত শব্দ উঠল, তারপর বাজল বারোটা। আজ আমার কি হয়েছে জানি নে, মাথার ভেতর কেবলই জট পাকিয়ে যাচ্ছে।—বুক-ভরা হিংসা নিয়েও কি মানুষ আত্মসমর্পণ করতে পারে! এ কি টোপ ফেলে শিকার খরার মত নয়! কিন্তু কেন টোপ ফেলবে!

রাত আরও বাড়ছে। পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়েছে, শুধু তার বৃকের ক্ষেতর হৃদয়স্ত্রের ক্রিয়া চলেছে অশ্রুতভাবে। হঠাৎ চমকে সোজা হয়ে বসলুম। বাইরে কি কেউ ফুঁপিয়ে কাঁদছে? তার শীর্ণ ছায়া পড়েছে ঘেন সাগা দেয়ালের গায়ে। ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলুম, উমিলাই বটে। কিন্তু এখন তার হাসি কোথায়! এ তো কান্না। হাসির নীচেই কি কান্না জ'মে থাকে!

দরজা খুলে পাশে এসে দাঁড়ালুম, ভেবেছিলুম, টের পায় নি। কিন্তু পরক্ষণেই দেখলুম, এ সবই তার ফিক ক'রে হেসে ফেলল। আমি কি তার কুপার প' ঘুমতে পাচ্ছেন না তো?—এবারে হাসল কি ক'রে। অস্বচ্ছ আলোয় তার গালের ওপরের তরল এখনও চিকচিক করছে। পাশে একটা ঝোঁকানো অপ্রস্তুতিত গুচ্ছ হিমেল হাওয়ায় ঢুলছে মধুরভাবে। হ'ল, সেও কি কুপার পাত্রী নয়! আমি তাই তার হাসির উত্তর দিলুম।

উমিলা চমকে উঠল, বললে, তুমি হাসছ? বিকরেছি আমি হাসবার মত?

তাকে আঘাত দিয়ে তুখ পেলুম। গভীরভাবে টেনে নিয়ে বললুম, আমাকে ভুল বুঝো না উমিলা।

এবারে উমিলা আত্মসমর্পণ করলে না। তার দৃ দেখলুম না সেই বর্বর হিংসা। চোখের জলে সব ঘুমে স্বচ্ছ নির্মল হয়ে গেছে। নিজেকে মুক্ত ক'রে আমাকে চেয়ে না ডক্টর রায়, আমি তোমাকে পাগল পালিয়ে বাব।

অধীরভাবে বললে, তোমার মত পাগল করেছি জনকে তার আর হিসেব নেই আমার কাছে।

র'য়ে র'য়ে কান্নার মত করুণ হাসি হাসল উ তারপর শাস্ত হয়ে বললে, আজ আমি ম'রে গেছি, সঙ্কল্প গেছে ভেঙে।

দু হাতে মুখ ঢেকে উমিলা পালিয়ে গেল তার ভেতর। দরজা বন্ধ করার শব্দের সঙ্গে আরও এক পেলুম। সে কি তার হাসির শব্দ, না, কান্নার!

সকালে একটু বেলায় ঘুম ভাঙল, উমিলার ঘরে নতুন ভদ্রলোককে ঢুকতে দেখলুম। সহাস্তে মা বললেন, দেখছেন তো ডক্টর রায়, এ হোটেলের ঘর রাখা কত শক্ত। ভোরেই মিস শ্রীবাণ্টব চ'লে গেছে চ'লে গেলেন। তার যাবার তো কথা ছিল। ম্যানেজার বললেন, আমিও কম জখ্ম খুব বেঁচে গেলেন ফ্রেড আর ম কাছে থাকলে আজ আর রক্ষা পেতেন না।